পূজাবার্ষিকী ১৪০৩
আনন্দমেলা

পূজাবার্ষিকী ১৪০৩

৭৬.০০

আনন্দমেলা

পূজাবার্ষিকী ১৪০৩

সূচিপত্র

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা তথা ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর সৃষ্ট শিশুসাহিত্যও আমাদের সম্পদ। এবারের পূজাবার্ষিকী 'আনন্দমেলা'-য় পাঠকদের উপহার দেওয়া হল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত একটি কবিতা। সঙ্গের স্কেচটিও এঁকেছেন এই বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী।
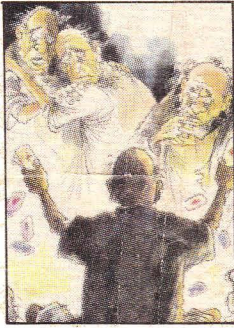
রাখাল ছেলেটার একটা বাছুর হারিয়ে গেছে। খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে সে দেখতে পেল, জলের মধ্যে কী যেন দাপাদাপি করছে। বোধ হয় বাছুরটাই জল খেতে গিয়ে হড়কে পড়ে মরেছে। পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার একটা ঠ্যাং হাতে পেয়েছে বলে বিস্তর টানাটানি করল। কিন্তু কী দেখল সে? ...আশাপূর্ণা দেবীর অপ্রকাশিত গল্প 'চার বুড়োর আড্ডা'।

ওর নাম অমূল্য। ডাকনাম খোকা। বয়স সবে চার পূর্ণ হয়েছে। উঠোনের কোণে পা পিছলে হঠাৎ একদিন পড়ে গিয়েছিল খোকা। মাথার বাঁ দিকে চোট লেগে ফুলে উঠেছিল। ফোলা দু'দিনে কমে গেলেও, তারপর থেকেই খোকা আবোল তাবোল বকতে শুরু করল। প্রোফেসর শঙ্কু খোকাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন।

...সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ গল্প 'প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা'।

ড্রাম্যাজিক
পি.সি.সরকার (জুনিয়ার) ১৬০

নাটকের নায়ক কাচ্চু। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। বিজ্ঞান সে ভালবাসে। কাচ্চুর বোন বিবি পড়ে ক্লাস ফাইভে। ওদের নিয়ে অভিনয় করবার মতো চমৎকার একটি নাটক, তার সঙ্গে কিছু ম্যাজিক। এই নিয়ে পি. সি. সরকার (জুনিয়ার) লিখেছেন ড্রাম্যাজিক 'কাচ্চু-বিবি-টুইংবিটা ইনটু রাহা স্কোয়ার'।

উপন্যাস

একটি অভিশপ্ত পুঁথি ও অষ্টধাতু।
বিমল কর ৩৬

তারাপদ কথা শেষ করতে দিল না কিকিরাকে। তার মজা লেগেছিল ; বলল, "অষ্টধাতু ! বাঃ নামটা তো দারুণ দিয়েছেন। ওই আটজন সাসপেক্টকে আপনি একেবারে ধাতু করে ফেলেছেন।" ... বিমল করের উপন্যাস 'একটি অভিশপ্ত পুঁথি ও অষ্টধাতু'। সব রহস্যের সমাধান করলেন কিকিরা। কিন্তু কীভাবে ?

কাকাবাবুর প্রথম অভিযান।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭৬
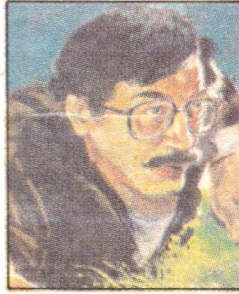
কাকাবাবু তখন কাজ করতেন ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে। সরকার থেকে তাঁদের আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এবারের উপন্যাসে লিখেছেন কাকাবাবুর সেই প্রথম অভিযানের কাহিনী। উপন্যাসটির নামও তাই 'কাকাবাবুর প্রথম অভিযান'।

দুধসায়রের দ্বীপ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৩২
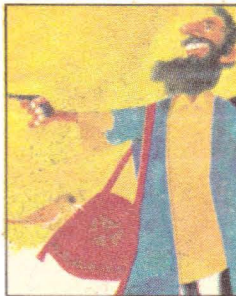
মন্দিরের পেছনের অন্ধকার বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে একটি ছায়ামূর্তি সর্পিল গতিতে বেরিয়ে এল। তার গায়ে কালো পোশাক। মুখটাও ঢাকা। জোরালো টর্চের আলো ফেলে সে কিছু একটা খুঁজল। তারপর পিস্তলটা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিল। এবার টর্চের আলো গিয়ে পড়ল মরা কাকটার ওপর। ... শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'দুধসায়রের দ্বীপ'।

বুড়ো ঘোড়া
মতি নন্দী ১৭২

বয়স হয়েছে ক্রিকেটার জহর পালের। কিন্তু তিনি চান সি কে নাইডুর মতো আরও অনেকদিন ক্রিকেট খেলতে। বিধায়ক অরুণ বিশ্বাস বলেছিলেন, ক্রিকেট খেলা আর জীবনের খেলা একই জিনিস। দুটো খেলাতেই দরকার মনোনিবেশ। জহর পাল কি পারবেন একষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত ক্রিকেট খেলতে ? ... মতি নন্দীর উপন্যাস 'বুড়ো ঘোড়া'।

হিসেবে ভুল ছিল
সমরেশ মজুমদার ২৬৮

অর্জুন মাথা তুলল। শরীরটাকে সোজা করা যাবে না। পায়ের সামান্য চাপেই নুড়ি গড়িয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড আঘাত লাগছে পাথরে। শেষ পর্যন্ত দু'হাতে একটা পাথর আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলাতে পারল সে। সমস্ত শরীর জ্বলছে। রক্ত বেরিয়ে গেছে কোথাও কোথাও। ... সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস 'হিসেবে ভুল ছিল'।

আলোর আকাশে ঈগল
শৈলেন ঘোষ ৩৯৬

বাইরে কী ভীষণ শীত। বুকের রক্তও বুঝি ঠাণ্ডায় জমে যায়। গুহার ভেতরটা তবু ভাল। অবশ্য ততক্ষণ ভাল, যতক্ষণ না হাওয়া ঢুকে পড়ছে। হাওয়া ঢুকলে হিহি করে উঠছে সারা শরীর। অন্যদিন গুহার ভেতর আগুন জ্বলে। আজ জ্বলছে না।...
শৈলেন ঘোষের উপন্যাস 'আলোর আকাশে ঈগল'।

পাণ্ডব গোয়েন্দা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৪৯২

বাবলু বলল, "লোকগুলোকে ধরবার আমি একটা চমৎকার 'প্ল্যান' করেছিলাম। ওরা ব্রিফকেস নিয়ে অলি আর বাবুয়াকে ফেরত দিলেই পঞ্চু পেছনদিক থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ত ওদের ওপর। আর সেই সুযোগে আমি ব্রিফকেসটা ছিনিয়ে নিতাম ওদের কাছ থেকে। তারপর গোলমাল বুঝলেই দেখাতাম পিস্তল।" ... ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'।
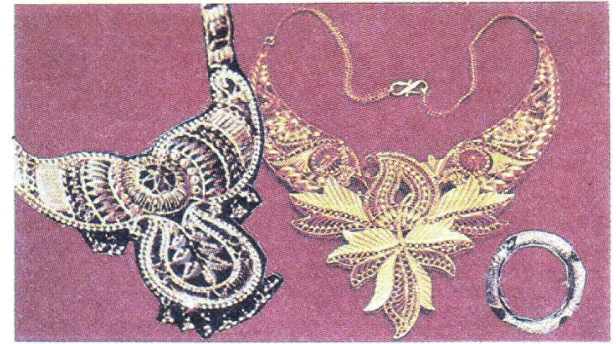
Godrej® STORWEL

ডাকের সাজ আর
সহজে পড়েনা চোখে,
শোলার বদলে এসেছে থার্মোকল-
ঢাকের বাদ্যি শুনতে চায়না লোকে,
পূজামন্ডপে মাইক-এর কোলাহল।

এসব বদল ভালো কি মন্দ-পরে,
তারই সাথে সাথে এ কথাটা মানা চাই-
পরিবর্তন হয়নি তো অন্তরে-
একই ভক্তি, আনন্দ, রোশনাই।

কিছু কিছু থাকে, সময়ের ছাপ যাকে
ছোঁয়না কখনো, চিরন্তন আমেজ,
উদাহরণটি দিয়ে রাখি এই ফাঁকে-
শোবার ঘরের **স্টোরওয়েল-গোদরেজ**।
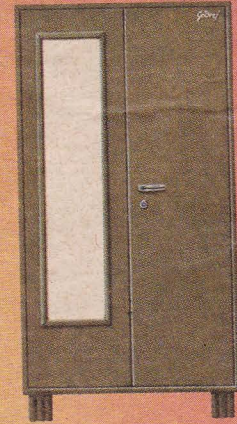
দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা সহ

গোদরেজ®
স্টোরওয়েল

Mileage 782

বড়গল্প

গল্প

কবিতা ও ছড়া

অ্যাডভেঞ্চার

ভ্রমণ

জ্ঞান-বিজ্ঞান

ঢাক দুম্ দুম্ ঢাকের তাল।
বিগ বাব্লে ফোলানো গাল।।
এবার পুজোয় নতুন রেশ।
ফুর্তি মজার নেই যে শেষ।।
soft bubble gum
Big Babol
fruits flavour
non sticking
নরম চটচটেহীন বাব্ল গাম
PERFETTI

খেলাধুলো

রঙিন পোস্টার

ফোটো ফিচার

চিত্রকাহিনী

অন্যান্য আকর্ষণ

প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বিমান মাশুল : উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চার টাকা

দাম : ছিয়াত্তর টাকা
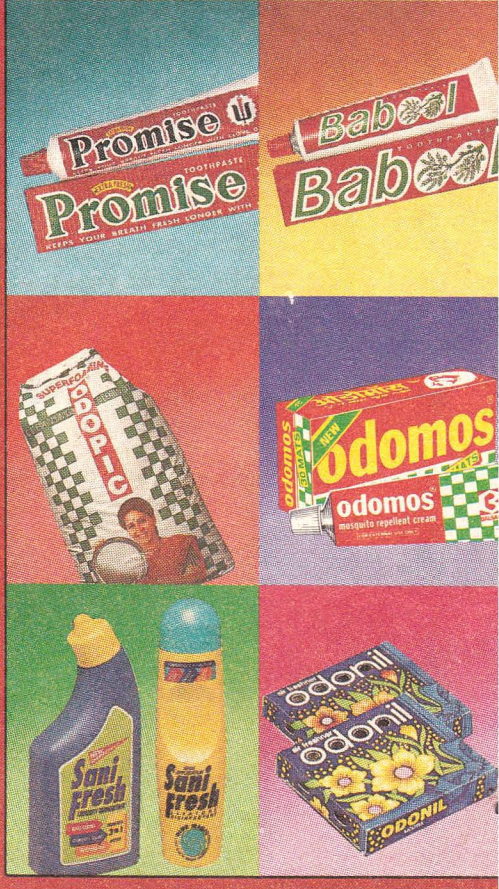
অপ্রকাশিত কবিতা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগৎ মিথ্যা—
মায়াই সত্য
ছায়া-বীর
কায়া ছাড়—
মনে মন
দীর্ঘপ্রভু।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Calcutta
6-1-32

(দেববাণী ঠাকুরের সৌজন্যে)
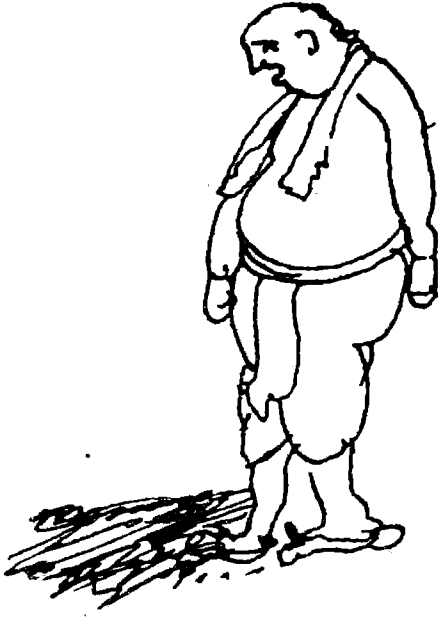
অপ্রকাশিত গল্প

চার বুড়োর আড্ডা

আশাপূর্ণা দেবী

সকাল থেকে আকাশ থমথমে মেঘলা, বিকেল হতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দেখে মজিলপুরের বিখ্যাত 'চার বুড়োর আড্ডা'-র তিন বুড়ো হরিহর, গদাধর আর মুকুন্দ ছটফটিয়ে উঠল, "সেরেছে! বুনোটা আসতে পারলে হয়!"

মুকুন্দ এরই মধ্যেই তাসের প্যাকেটটা বার করে অকারণ ভাঁজছিল, হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠল, "না, না, আসবে

মাগো— আজই চিঠি পেলাম,
দুঃখ কিসের বলো তো মা —
গত বছরেই তো গেলাম ॥

কার্তিকেয়, গনেশ আর
লক্ষ্মী, সরস্বতী —
এদের নিয়ে যাওয়া মানেই
পড়াশুনার ক্ষতি ॥

তোমার চিঠি পেয়ে সবাই
আনন্দে আটখানা —
বলো তো মা কেমন করে
ধরি এদের মানা ॥

সবার উপর আছে আবার
তোমার হাতের গুণ —
সানরাইজ-এর মশলা দিয়ে
রান্না সুনিপুন ॥

মাগো, ছুটি দিনেক তিন
দেখা হবে তোমার সাথে —
মাঝে মাত্র কটা দিন ॥

প্রনাম জেনো, ইতি
তোমার পার্বতী ॥

মা আসছেন ঘরে—
আজ একটি বছর পরে।।

STRATEGY 22001

ঠিকই ! আড্ডায় আসেনি, এমন কোনওদিন হয়েছে ?”

হরিহর বলল, “হয়নি ! সেটা আজন্মকাল গায়ে-গায়ে থাকার জন্যে ! চারজনেই দু'মিনিটের রাস্তায় ! বুনোটার যে বুড়ো বয়সে মতিভ্রম ঘটল ! এই শেষ বয়েসে কিনা শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পেয়ে, সাতপুরুষের বাড়িঘর ছেড়ে ঠেলে গিয়ে সেখান সামলাতে গেল। এখান থেকে ক'মাইল রে গদা ?”

“এখন তো আর মাইল বলে না রে। কিলোমিটার-ফিটার কী যেন বলে।”

“থাম তো ! এখন কী বলে তা নিয়ে তোর কী দরকার ? তোর যা জানা তাই বল।”

“তা সেটা কত আর ? আধমাইলটাক। বুনোর কাছে তো নস্যি। তবে কাল যেন বলছিল, ক'দিন থেকে হাঁটুটা বড় জ্বালাচ্ছে। ব্যথা, যন্ত্রনা।”

“তাই যখন, তখন একটু সময় থাকতে বেরিয়ে পড়লেই হত ! সকাল থেকেই তো আকাশের অবস্থা দেখছিস ! কী এত রাজকার্য তোর !” .

“এমনভাবে বলে, যেন সামনেই রয়েছে ‘বুদ্ধু' বনমালী !”

গদাধর বলল, “তা বুনোর তো নিজের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাস করতে যাওয়ার মন ছিল না। বউ ছেলেমেয়েকে বলেছিল, ‘তোমরা গিয়ে থাকো গে, আমি এখানে বেশ থাকব। দূর তো বেশি না, দুপুরের দিকে গিয়ে না হয় ভাতটা খেয়ে আসব। রাতে তো খাদ্য খই-দুধ, সে এখানে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দক্ষর মা রয়েছে। চারদিকে এত বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি !' তো বউ ছেলেরা রাজি হল ? বলল, ‘পাগলের মতো কথা বোলো না !'”

“ওই সম্পত্তিটা পাওয়াই কাল হল।”

“আহা ! এদিকে ছেলেমেয়ে তো আহ্লাদে উর্ধ্ববাহু হয়ে নেচেছিল ! তাদের তো হাল ফিরে গেল। বুনোর শাশুড়িবুড়ির তো কম ঐশ্বর্য ছিল না ! জমিজমা, বাগান, মাছের পুকুর, গোয়ালে গোয়ালভরা গোরু, উঠোনে গোলাভরা ধান ! তায় আবার সে-বাড়ির কাছাকাছি সিনেমা হল !”

মুকুন্দ তাসটা জোরে-জোরে ভাঁজ করতে-করতে বেজার মুখে বলে, “বুনোর আর ওর কোনটা কাজে লাগবে ? পেটরোগা মানুষ ! রাতে তো খায় এক ছটাক দুধে একটু খই ভিজিয়ে, আর দিনে একটু শিঙিমাছের ঝোল আর গলা-গলা ভাত।”

“সে-কথা কে বুঝছে ? বয়েস হলেই পরাধীন। একদা ওই বুনো যখন রেল আপিসে কাজ করত ? ছুটিছাটায় বাড়ি এলে গুষ্ঠিসুদ্ধু সবাই থরহরিকম্প।”

মুকুন্দ বলল, “এখন সকলেরই এক অবস্থা।”

গদাই বলে ওঠে, “তুই আর বলিসনে। তোর না আছে বউ-ছেলে, না আছে সংসার। পিসিমার যাওয়া পর্যন্ত তো মুক্ত পুরুষ। তা পিসিই কি কম দিন গেছে ? পিসির মেয়েটাই গিন্নি হয়ে উঠল।”

কথাটা ঠিক ! মুকুন্দ ঝাড়া হাত-পা। কোনও একসময় সেও চাকরি-বাকরি করত, তবে মজিলপুর থেকে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি এমন কিছু ব্যাপার ছিল না ! তা যাকগে, সেসব গত কথা !

মুকুন্দ বরাবরই রীতিমত স্বাধীন ! পিসি থাকতেও। পিসি ছিল ভাল মানুষের রাজা ! তো পিসির মেয়েটার সঙ্গে মুকুন্দ পাড়াতেই তার এক জ্ঞাতিভাইয়ের ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। সেখানেই দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে আসে। আর সারাদিনের চা, জলখাবার, আড্ডায় মুড়ি-তেলেভাজা, রাত্তিরে দু'খানা রুটি আর এক থাবা তরকারি পিসির মেয়ে বা ভাই-বউ নিজে এসে-এসে সাপ্লাই করে যায়।

হরিহর আর গদাধরের অবশ্য মস্ত একখানা করে সংসার। ছেলে, বউ, নাতি-নাতনি, গিন্নি ! তা তাতে তার নিয়মিত সময় আড্ডায় হাজ্‌রে দেওয়ায় কোনও বিঘ্ন ঘটে না।

বড় সুখেই কাটায় এই চার বুড়ো !

আজন্মের বন্ধু !

ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়ে পরের বাগানের ফলপাকুড় চুরি করতে, আরও একটু বড় হলে পরের পুকুরের মাছ ধরতে, একেবারে একাত্মা। পাড়ার লোক বলত, “দু'জোড়া মানিকজোড় !”

এখন ক্ষমতা গেছে। তবু সারাটা দিন খেয়ে, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে কাটিয়ে, ছটফট করতে থাকে এই সন্ধেবেলার তাসের আড্ডার জন্য ! যেই চারজনে এক হল, যেন কী এক পরম পাওয়া পেল !

তা বনমালী অন্য পাড়ায় চলে গিয়েই যে আড্ডায় ঘাটতি ঘটেছে তা নয়। পৃথিবী উলটে গেলেও— ঠিকই যথাসময়ে এসে হাজির হয় !

আজই একটু যেন দেরি হচ্ছে !

কাজেই বাকি তিনজনে বলে চলেছে, “চিরদিনের হাড়-মুখ্যু ! আকাশটা তো দেখছিস সকাল থেকে ? দু'ঘণ্টা আগে বেরোলেই বা কী হত ?”

এদিকে বৃষ্টিটা যেন একটু জোরেই এসে গেল।

নাঃ। মাটি করেছে !

তিন বুড়োই ফরাসপাতা ফৌজি ছেড়ে বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। উদ্বিগ্ন মুখ। উৎকণ্ঠ দৃষ্টি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হরিহর, “ওই তো, ওই তো আসছে ! হুঁ বাবা। বলেছি না, পৃথিবী উলটে গেলেও, আসা রদ হবে না !”

কিন্তু কী আশ্চর্য !

ছাতা মাথায় নেই কেন ?

খালি মাথায় ভিজতে-ভিজতে আসছে !

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি নিজের ছাতাটা নিয়ে, নিজের মাথায় দিয়েই এগিয়ে গেল।

সেকেলে ঢাউস মার্কা ছাতা ! দু'জনের মাথা অনায়াসেই ঢাকা পড়তে পারে !

একজন আসছে।

অপরজন যাচ্ছে।

মাঝখানেই দেখা !

ভিজে চুপচুপে বনমালী বলে ওঠে, “আঃ, তুই আবার কেন কষ্ট করে ? যা ভেজবার, তা তো ভিজেইছি !”

“তা হোক। চোখে দেখে স্থির হয়ে থাকা যায় ; কিন্তু ছাতা নিয়ে বেরোসনি কী বলে ?”

বনমালী কেমন একরকম বোকাটে হাসি হেসে বলে, “বেরিয়েছিলাম ! নাতনি তার শৌখিন ছাতাখানা দিল হাতে। হঠাৎ সেই হালকা ছাতাখানা ঝোড়ো হাওয়ায় হাত ফসকে উড়ে গিয়ে ঘোষের পুকুরে গিয়ে পড়ল ! ঢের চেষ্টা করলাম, হল না।”

বলতে বলতে এসে পড়ে।

বাকি দু'জন হইহই করে ওঠে, “এসে গেছে। এসে গেছে।”

মুকুন্দ বলে, “আহা, এখন ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে, গা-মাথা মুছে আমার শুকনো কিছু জামা-কাপড় পরে তবে গুছিয়ে বোস !”

বনমালী তাড়াতাড়ি বলে, “না, না ! বেশ আছি। গায়ে-গায়ে শুকিয়ে যাবে !”

“গায়ে-গায়ে শুকিয়ে যাবে ? বলিস কী ? ভিজে টুসটুস করছিস ! কেন, আপত্তিটা কিসের ?”

বনমালী আবারও তেমনই বোকাটে হাসি হেসে (এটা ওর মুদ্রাদোষ) বলে, “কে আবার তোর জামা-কাপড় ফেরত

দিতে আসবে ?

"কেন ? তুইই আসবি। কাল কি আর এত বিষ্টি পড়বে ? তোরটা কাচিয়ে শুকিয়ে রাখব, আমারটা দিয়ে যাবি, তোরটা নিয়ে যাবি। প্রবলেমটা কোথায় ?"

"তাই বলছিস ? আসলে কী জানিস, আচ্ছা দিচ্ছিস দে, নাতনির ছাতাটা গেল।"

বনমালী একখানা গামছা আর মুকুন্দর একখানা শুকনো ধুতি-গেঞ্জি আর হাফ পাঞ্জাবি হাতে নিয়ে পাশের দালানটায় চলে গেল !

গদাধর আর হরিহর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, "যাক বাবা, শেষপর্যন্ত এল তা হলে ! ... দ্যাখ কাণ্ড ! এখন বিষ্টিটা ছেড়ে গেল !"

যাক ! এখন যেখানে যাই হোক অন্তত ঘণ্টাতিনেকের মতো তো নিশ্চিন্তি !

পৃথিবীতে তখন থাকবে শুধু এই একখানা ফরাসপাতা মস্ত ফৌজি চারটে গোল্লা-গোল্লা তাকিয়া, চারটে বুড়ো আর একজোড়া তাস !

বনমালী মুকুন্দর জামা-কাপড়ে সজ্জিত হয়ে চলে এসে গুছিয়ে বসতেই, গদাধর বলে ওঠে, "যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত এলি ! ভাবনা ধরেছিল, বুঝিবা আজকের আড্ডাটা ফসকে গেল।"

"আজকেরটা ফসকাবে মানে ?"

বনমালী তার রুপোর নস্যির কৌটো থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে নাকে গুঁজতে গিয়ে বলে, "এ হে হে ভিজে গেছে— যাকগে। ভিজেই সই।"

হরিহর বলে উঠল, "নস্যির কৌটো তো তোর ট্যাঁকে গোঁজা থাকে। সেখান থেকে কৌটোর ভেতরের নস্যি ভিজল কী করে ?"

বনমালী ভিজে নস্যির হাতটা তাকিয়ায় মুছে হেসে বলে, "ওই তো খুড়োর কলে পড়ে গিয়েই তো ... যাকগে, তাস সাজা ! আজ না এসে থাকতে পারা যেত ? কাল মুকুন্দ, আর তোর কাছে হেরে মরেছি না ? ... শেষ পিটে হঠাৎ রঙের টেক্কা তুরুপ মেরে ছক্কা দিয়ে বসলি ! আজ তার শোধ নিতে হবে না ?"

"আজও তা হলে একই পার্টনার ?"

"নিশ্চয় ! অ্যাই মুকুন্দ, ওখানে করছিস কী ?"

"কিছু না ! তোর ভিজে জামা-কাপড়গুলো ঠেলে রাখছি ! কী হল ? তাস দেওয়া হয়েছে ?"

"কখন !"

"রংটা কী হল ?"

"চিড়িতন। চিড়িতনের সাহেব !"

"সেরেছে ! চিড়িতন। ওটা আমার চিরকেলে অপয়া ! যাক দেখি কী হাত তাস ?"

এই চার-চারটে আশি বছরের বুড়ো কী এমন খানদানি খেলা নিয়ে মশগুল থাকে !

এমন কিছুই না ! সেই আদি-অন্তকালের 'গাবু' খেলা ! ছেলেবেলায় গরমের ছুটির দুপুরে পিসিমা, জেঠিমা, পাড়ার কাকিমাদের যে নিত্য তাসের আড্ডা বসত, সেইখানে কাছ ঘেঁষে বসে থেকে, আর মনপ্রাণ চোখ সব দিয়ে দেখে-দেখে যা শিখেছিল তাই চালিয়ে আসছে চিরকাল !

সেই সাবেকি— দু'কুড়ি সাতের খেলা ! এতে এখনকার খেলার মতো একসঙ্গে দু'জোড়া তাস লাগে না, পয়সা নিয়ে বাজি ধরাধরি নেই, হারজিতের মধ্যে, অপর পক্ষের পিট-এর ওপর টেক্কা মেরে, কিংবা তুরুপ মেরে বেশি পিট বাগিয়ে দিতে যাওয়া।"

"আর হারা মানে ?"

"ছক্কা-পঞ্জা খাওয়া !"

এখনকার ছেলেমেয়েরা এই জোলো-জোলো খেলা দেখে আর তারই জন্য বুড়ো চারটের হানফানানি দেখে হাসে !

তা তাতে বয়েই গেল !

কে ওদের কথার ধার ধারে ?

এরা নিজেদের আনন্দেই মশগুল !

কিন্তু 'কালকের শোধ নেব' বলে যতই তড়পাক, বনমালীর যেন আজ কেমন অন্যমনস্ক-অন্যমনস্ক ভাব ! ... বেশ দু-একবারে ভুলই করে বসল। তার পার্টনার মুকুন্দর কারসাজি আর বাহাদুরিতে অবশ্য সামলে গেল।

শেষপর্যন্ত অবশ্য জিতেই গেল বনমালীরা !

যাক বাবা ! বাঁচা গেল !

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বনমালী। চৌকি থেকে নেমে পড়ে বলে, " হেরো হয়ে মরতে হল না ! আচ্ছা—"

মুকুন্দ হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "আরে, আরে, চলে যাচ্ছিস যে ? বিষ্টি ছেড়ে গেছে। এক্ষুনি চা, মুড়ি, ফুলুরি চলে আসবে—"

"তোরা খাস।"

"কেন, তোর কী এত তাড়া ? গিন্নি গঞ্জনা দেবে ?"

শুনে বনমালী জোর পায়ে হাঁটা দিতে দিতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বাঁধানো দাঁতে ঝিলিক মেরে হেসে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নেড়ে বলে যায়, "সে গুড়ে বালি।"

"আরে, আরে, এই বুনো ! তোর নস্যির কৌটোটা যে পড়ে রইল !"

তা সে-কথা আর বনমালীর কান পর্যন্ত পৌঁছল না বোধ হয়, ফিরে তাকাল না ! হঠাৎ যেন অন্ধকারে মিশে গেল।

এরা তিনজন—হরিহর, গদাধর আর মুকুন্দ কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বলাবলি করে, "বুনোটার আজ যেন কেমন বেভাব, দেখলি না ?"

"তাই মনে হল। বাড়িতে বকাবকি হয়েছে বোধ হয়।"

"বাড়ির বকাবকিকে ও ভারী কেয়ার করে ! শরীরটাই বোধ হয় জুতসই নেই !"

"হতে পারে। তা আমরাও তা হলে এবার চলেই যাই।"

মুকুন্দ হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "কেন ? তোদের এত কী তাড়া পড়ল ? এই তো সবে আটটা কুড়ি ! তোদের তো আর মাঠ ভেঙে এক মাইল পথ হাঁটতে হবে না। মুড়িটা এসে পড়বে হয়তো এখনই ..."

"মুড়ি ? বলছিস ? তা হলে বসেই যাই আর একটু ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ! ততক্ষণ না-হয় 'গোলাম চোর' খেলাই চালিয়ে যাওয়া যাবে ছেলেবেলার মতো।"

বলে হা-হা করে হেসে ওঠে !

অতএব আবার দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে চৌকিতে বসা ! তাসের গোছা নিয়ে নাড়াচাড়া।

একটু পরেই দরজায় ধাক্কা পড়ল, যেন জোর তলবে দুমদাম।

ওই এসে গেল মুড়ি-ফুলুরি ! এত ধাক্কাচ্ছে কেন ?

মুকুন্দ নেমে পড়ে এসে দরজাটা খুলেই প্রায় পাথর হয়ে গেল।

মুড়ি-বেগুনির বদলে এ আবার কী ?

সামনে গোটাআষ্টেক ছোকরা। একজন একটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন নিয়ে হাতে দোল খাওয়াচ্ছে !

"তোমরা কে বাবা ?"

"আমাদের চিনতে পারছেন না ?"

"না তো—ঠিক—"

"তা চিনবেন না। আমরা ও-পাড়ার। সিনেমা হল-এর পাশে থাকি আমরা। তো দাদুরা কি এখনও তাস

পেটাচ্ছেন নাকি ? অ্যাঁ ? আচ্ছা লোক তো ! চারজনের আড্ডার একজন যে আজ এল না, তার জন্যে প্রাণে একটু ধড়ফড়ানি আসেনি ?"

"এল না মানে ? বনমালীর কথা বলছ তো ?"

তিনজনেই উঠে এসে মারমুখি হয়ে বলে ওঠে, "এই তো তাস খেলা সেরে একটু আগে চলে গেল !"

"কী ? কী বলছেন দাদুরা ? একটু আগে তাস খেলে উঠে গেলেন বনমালী বাঁড়ুজ্যে ! হ্যা হ্যা হ্যা !... দাদুরা কি সন্ধেবেলাই আফিমের মৌতাতে ঝিমোন ?...লোকটা তো সেই কোন বিকেলবেলা ঘোষের পুকুরে ডুবে মরে, এখন পেট ফুলে বাড়ির উঠোনে শুয়ে ! ওঁর স্ত্রী কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, আপনারা নাকি ওঁর চিরকালের প্রাণের বন্ধু, তাই একবার শেষ দেখা দেখতে—"

হরিহর, গদাধর আর মুকুন্দ তিনজনের কেউই ব্রাহ্মণ নয়, হলে চিৎকার করে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে বসত। তবে শুধু চিৎকার করতে তো পৈতে লাগে না !

তিনজনে একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে, "কী ? আমরা অফিমের ঝোঁকে ? অসভ্য, বেয়াদপ ইয়ার ছোকরারা ! নিজেরা নেশার ঝোঁকে এসে যা মুখে আসছে বলে চলেছ ? ...ইয়ার্কি মারবার আর বিষয় পাওনি ? একটা জলজ্যান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাকে মেরে পেট ফুলিয়ে উঠোনে শুইয়ে রেখে, ছি ছি। নরকেও ঠাঁই হবে না তোমাদের !"

"ওঃ, বটে নাকি ?"

আটজনের সমস্বর প্রতিবাদ !

"তা হলে এই চললুম ! নেহাত আপনাদের খবরটা দিতে বললেন নবগোপালের ঠাকুমা, তাই আসা !... শেষ দেখা দেখতে ইচ্ছে হয় তো যান চটপট ! নইলে পুলিশে এক্ষুনি লাশ তুলে নিয়ে গিয়ে মর্গে চালান দিয়ে দেবে। অপঘাত মিত্যু বলে কথা !"

নবগোপাল বনমালীর নাতি।

তিন বন্ধু হকচকিয়ে বলে, "ব্যাপারটা কী বল তো ?"

"কী আবার ? বদমাশ ছেলেদের বদমায়েশি। মজা করার এক নতুন ফন্দি।... আমরা ভয় পেয়ে ছুটতে-ছুটতে যাব, আর ওরা তখন দাঁত বার করে হাসবে !"

"তা হোক। তবু একবার যাওয়া যাক !"

এখন তিনজনের তিন মত।

"গিয়ে কী হবে ? ওদের মজা করার হাসি দেখতে ?"

"কিন্তু এত সব বলল। যদি সত্যি মর্গে চালান দিয়ে বসে ! তা-হলে শেষ দেখাটা—"

"যদি মর্গে চালান দিয়ে বসে ? জলজ্যান্ত লোকটাকে ! বলি নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করব, না এই ফক্কড়দের কথা বিশ্বাস করব ?"

"সেও তো কথা ! নস্যির কৌটোটা তো এই চোখের সামনেই পড়ে থেকে চকচক করছে ! খাঁটি রুপোর জিনিস ! অফিসে রিটায়ার করার সময় ফেয়ারওয়েলে দিয়েছিল !"

কিন্তু নিজের চোখকে যে অবিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হয়। অথবা অলৌকিক কোনও ভৌতিক কাণ্ডকে বিশ্বাস করতে হয় !

অথচ—ততক্ষণে পাড়ার লোকেরা মুকুন্দর দরজায় এসে ভেঙে পড়েছে।

"বামুনজ্যাঠার খবর শুনলেন ?"

"বামুনদাদুর খবর শুনলেন ?"

"নবুর ঠাকুর্দার খবর শুনলেন ?"

"কী কাণ্ড ! কী কাণ্ড ! হায় ! হায় ।"

"শুনলাম, বাড়ির লোকের কথা না শুনে, 'বিষ্টি আসছে বলে' বেলা তিনটের সময় আপনাদের এই আড্ডায় আসছিলেন !...হঠাৎ যে কী করতে পুকুরধারে গেলেন !"..

এই তিন বুড়ো, বিশেষ করে মুকুন্দ, গলার শির ফুলিয়ে, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করল, "কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো..."

তা কে শোনে কার কথা ?

যে মানুষটাকে বেলা পাঁচটায় পুকুর থেকে টেনে তোলা হয়েছে এবং এখনও জল খেয়ে পেট জয়ঢাক করে বাড়ির উঠোনে পড়ে আছে, সে লোক সন্ধে সাড়ে ছ'টায় এঁদের সঙ্গে তাস খেলে গেছে, এ-কথা কে বিশ্বাস করবে ?

সমবেতর রায় আসলে, 'আসছে-আসছে' করে ভাবতে-ভাবতে, 'এল না' দেখে বুড়োরা বাদলা হাওয়ার আমেজে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর সেই ঘোরের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছে, 'এসেছিল'—খেলে গেছে ।"

"বেশ, তাই যদি হয় তো নস্যির কৌটোটা ?"

"ও কিছু না। হয়তো কালকেই ফেলে গিয়েছিল, তাকিয়ার তলায় পড়ে ছিল ।"

"বটে ! তাকিয়ার তলায় ? তাকিয়া রোজ ঝেড়েঝুড়ে তোলা হয় না ?... ঠিক আছে, তাই-ই যদি হয়, ওই ভিজে জামাকাপড়গুলো ? যেগুলো দালানের কোণে পড়ে রয়েছে ?"

দু'-একজন বাড়ির মধ্যে ঢুকে এসে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে মুকুন্দকে বলল, "ওসব বোধ হয় দাদু, আপনারই ! সকালে চানের সময় ছেড়েছিলেন, বাদলা দেখে। আপনার কাজের লোক বোধ হয় কাচেনি। ভেবেছে শুকোবে না তো। কেচে আর লাভ কী ? কাল কাচলেই হবে !"

মুকুন্দ রেগেমেগে সেই ভিজে সপসপে ধুতিখানা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলে ওঠে, "এই ধুতি আমার ? এই ঝুলপাড় বাবুধাক্কা দেওয়া ধুতি ? জন্মে এরকম শৌখিন ধুতি পরি আমি ? দেখেছে কেউ ? কেউই পরতাম না। তো ইদানীং বুনোর নক্কামার্কা নাতিটা শখ করে দাদুকে পয়লা বোশেখে, পুজোর সময় ওইরকম বাহারি ধুতি কিনে এনে উপহার দেয়, তাই ।"

কিন্তু এতেও কারও তেমন মন বদলাল বলে মনে হল না।

কোন বুড়ো কী পাড়-ধুতি পরে, সে আবার কে কবে তাকিয়ে দেখেছে ?

অকাট্য আর প্রত্যক্ষ সত্য তো সেই জলে ডুবে মরা পেটফোলা লাশটা। যা নাকি সব্বাই স্পষ্ট চোখে দেখে এসেছে !

হঠাৎ পাড়ার ঠানদি গঙ্গাবুড়ি বলে ওঠে, "ওরে, শুনেছি, এমন হয় ! হঠাৎ ঘটলে—সদ্য মড়াটা, আপনজনদের একটু দেখা দিতে যায় !"

তা 'একটু দেখা দিতে' যেতে পারে। হয়তো ছায়া-ছায়া শরীর নিয়ে। কিন্তু তিন ঘণ্টা ধরে তাস পিটে যায় ? ..."এই মারলাম টেক্কা ! এই দিলাম তুরুপ !" বলে হুঙ্কার ছেড়ে যায় ? কার মড়া তুলে কার নাম করেছে।

মুকুন্দ বনমালীর সেই ছেড়ে রেখে যাওয়া ভিজে জামা-কাপড়গুলো গামছায় জড়িয়ে পুঁটুলি বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে হনহন করে এগোতে থাকে বনমালীর শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে !

এত জোরে হাঁটা অভ্যেস এখন আর নেই। কিন্তু রাগে, দুঃখে, অপমানে আর বিভ্রান্তিতে গায়ে পাগলা হাতির বল !

হরিহরের হাতে লণ্ঠন, সে হাঁক ছাড়ে, "এই মুকুন্দ। অত ছুটছিস কেন ? আমি তাল দিতে পারছি না ।"

তো তারপর ?

বনমালীর শ্বশুরবাড়ির উঠোনে তো সেই দৃশ্যই !

'কার না কার মড়া' বলার উপায় কোথা ? নাকের ওপরকার ওই মস্ত আঁচিলটি ? এই মজিলপুর গ্রামে আশপাশে আর কারও ছিল অমন ?

আর ভিজে ধুতিখানা দেখেই তো বনমালীর গিন্নি ডুকরে উঠল, "ওগো, হ্যাঁগো ! এই কাপড়টা পরেই বেরিয়েছিল গো !... ওমা—এখন পরনে কী ? ছি ছি। এই সরু নরুনপাড় চটের মতন মোটা খেঁটে ধুতি সাতজন্মে পরেছেন তিনি কখনও ? ওগো সেই যে বলে 'মরা' মানে নতুন কাপড় পরা। এ তাই না কি ?... হায়। হায়। যাক্‌গে গিয়ে এইরকম কাপড় পরতে হবে তোমায় ?"

নিজের ধুতিখানা সম্পর্কে এমন তাচ্ছিল্য শুনে বিরক্ত হয়ে সরে এল মুকুন্দ।

এই সময় পুলিশের লোক এল।

বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন, "কখন দেখা গিয়েছিল পুকুরে ভাসতে ?"

"আজ্ঞে, বেলা পাঁচটা নাগাদ ।"

"কে প্রথম দেখেছিল ?"

"আজ্ঞে, এই যে এই রাখাল ছেলেটা। ওর একটা বাছুর হারিয়ে যাওয়ায় খুঁজে বেড়াতে-বেড়াতে চোখে পড়ে জলের মধ্যে কী দাপাদাপি করছে। ... ভাবল বোধ হয় বাছুরটাই জল খেতে গিয়ে হড়কে পড়ে মরেছে। তা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার একটা ঠ্যাং হাতে পেয়েছে বলে বিস্তর টানাটানি করল বেচারা, কিন্তু এই রোগাপটকা বছরদশেকের ছেলের সাধ্য কী বনমালীর ওই লাশ টেনে তোলার ?... তা ছাড়া দেখল যেটাকে বাছুরে ঠ্যাঙ ভেবেছিল, সেটা হচ্ছে বনমালীর পাঞ্জাবি পরা একখানা হাত ! তারপর আর কী ? চেঁচামেচি করে পাড়াসুদ্ধু লোক জড়ো করে—"

"মাছধরা জেলেরা এসে টেনে তুলল ।"

"দেখল, লোকটার অন্য হাতে একটা ফুলকাটা ছাতার বাঁট ধরা। ছাতার কাপড়টা জলে সুপসুপে ছেঁড়াখোঁড়া ।"

"তার মানে টানাটানি করেছিল বুড়ো বিস্তর নাতনির ছাতাটা বাঁচাতে !"

তারপর ?

তারপর আবার কী ? পুলিশ লাশটাকে মর্গে নিয়ে চলে গেল। যতই যা হোক, অপঘাতের মড়াকে মর্গে নিয়ে যেতেই হবে ! ফিরে ফিরে দেখে হিসেব করে বুঝতে হবে, সত্যিই নিজে অসাবধানে ডুবে গেছে ; না কেউ শত্রুতা করে জলে ঠেলে দিয়ে চুবিয়ে মেরেছে !

অনেক রাত্রে ফিরে এল তিন বুড়ো।

হরিহর আর গদাধর বলল, "আজ রাত্তিরে আর তোর একা বাড়িতে শুয়ে কাজ নেই মুকুন্দ, আমরা দু'জনা থাকি !"

"থাকবি, তা থাক !"

হাতের হ্যারিকেনটার পলতে বাড়িয়ে দিয়ে, দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকে এল মুকুন্দ। পিছু-পিছু ওরা দু'জনও।

ঘরের দরজার শেকলটা খুলল !

আর খুলেই তিন-তিনটে আড়ে-দৈর্ঘ্যে প্রকাণ্ড লোক "আঁ—আঁ—আঁ" করে চেঁচিয়ে উঠে সপাটে মাটিতে !

জ্ঞান হারাবার আগে দেখতে পেয়েছিল চৌকির ওপর নিজের তাকিয়া ঠেস দিয়ে বনমালী তাস ভাঁজছে। এদের দেখেই খিখি করে হেসে উঠে ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠেছিল, "দুঃখু করিস না, আড্ডা ভাঙবে না। আসব রোজ ।"

ছবি : দেবাশিস দেব

শ ঙ্কু - কা হি নী

সত্যজিৎ রায়

৭ই সেপ্টেম্বর

আজ এক মজার ব্যাপার হল। আমি কাল সকালে আমার ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, এমন সময় আমার চাকর প্রহ্লাদ এসে খবর দিল যে একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কে লোক জিগ্যেস করতে প্রহ্লাদ মাথা চুলকে, বলল, 'আজ্ঞে, সে ত নাম বলেনি, বাবু। তবে আপনার কাছে সচরাচর য্যামন লোক আসে ঠিক ত্যামনটি নয়।'

আমি বললাম, 'দেখা না করলেই নয়? বড় ব্যস্ত আছি যে।'

প্রহ্লাদ বলল, 'আজ্ঞে, বলতেছেন বিশেষ জরুরী দরকার। না দেখা করি যাইতে চায়েন না।'

কি আর করি, কাজ বন্ধ করেই যেতে হল।

গিয়ে দেখি একটি অতি গোবেচারা সাধারণ গোছের ভদ্রলোক, বছর ত্রিশেক বয়স, পরনে ময়লা খাটো ধুতি, হাতকাটা শার্টের চারটে বোতামের দুটো নেই, মুখে তিনদিনের দাড়ি, হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কি ব্যাপার জিগ্যেস করাতে ভদ্রলোক ঢোক গিলে বললেন, 'আজ্ঞে আপনি যদি দয়া করে একবার আমাদের বাড়িতে আসতে পারেন ত বড় ভালো হয়।'

আমি বললাম, 'কেন বলুন ত? আমি ত এখন বিশেষ ব্যস্ত।'

ভদ্রলোক যেন আরো খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আপনি ছাড়া আর কার কাছে যাব বলুন। আমি থাকি ঝাঝায়। আমার ছেলেটার ব্যারাম—কি যে ব্যারাম তা বুঝতেও পারছি না। আপনি হলেন এ মুল্লুকের সবচেয়ে বড় ডাক্তার, তাই আপনার কাছেই—'

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনার একটু ভুল হয়েছে। আমি ডাক্তার নই, বৈজ্ঞানিক।'

ভদ্রলোক একেবারে যেন চুপ্‌সে গেলেন।

'ভুল হয়েছে ? বৈজ্ঞানিক ! ও, তাহলে বোধহয় ভুলই হয়েছে। কিন্তু তাহলে কোথায় যাব বলুন ত ?'

'কেন, আপনাদের ওদিকে ত আরো অন্য ডাক্তার রয়েছেন।'

'তা আছে। তবে তারাও কিছু করতে পারল না আমার খোকার জন্য।'

'কি হয়েছে আপনার ছেলের ? কত বয়স ?'

'আজ্ঞে, ছেলের আমার চার পুরেছে গত জষ্ঠি মাসে। খোকা বলে ডাকি, ভালো নাম অমূল্য। হয়েছে কি—এই সেদিন—এই গত বুধবার সকালে—আমার উঠানের একটা কোণে শেওলা ধরে ভারী পেছল হয়ে আছে—সেখানে খেলা করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মাথার এই বাঁ দিকটায় একটা চোট লাগল। খুব কান্নাকাটি করলে খানিকটা। পরে দেখলাম মাথার ওইখানটা ফুলেওছে বেশ। ফোলা অবিশ্যি দুদিনেই কমে গেল, কিন্তু সে থেকে কি যে আবোল তাবোল বকছে তা বুঝতেই পারছি না। অমন কথা সে এর আগে কক্ষণো বলেনি বাবু ! তবে কেমন যেন মনে হয়—বুঝতে পারি না—তবু মনে হয়—সে কথার যেন মানে আছে। তবে আমরা ত মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—পোস্টাপিসের কেরানী—আমরা তার মানে বুঝি না।'

'ডাক্তার বোঝেনি তার মানে ?'

'আজ্ঞে না। আর সে ডাক্তার ত তেমন নয়, তাই ভাবলাম যে...আপনার কাছে...।'

আমি বললাম, 'কেন, ঝাঝার ডাক্তার গুহ মজুমদারকে ত আমি চিনি। তিনি ত ভালো চিকিৎসক।'

তাতে ভদ্রলোক খুব কাতরভাবে বললেন, 'আমার কি তেমন সামর্থ্য আছে বাবু, যে আমি বড় ডাক্তারকে ডাকব ! আমায় সবাই বললে যে গিরিডির শঙ্কু ডাক্তারের কাছে যাও—তিনি দয়ালু লোক বিনি পয়সায় তোমার ছেলেকে দেখে দেবেন। তাই এলুম আর কি।'

লোকটিকে দেখে মায়া হচ্ছিল, তাই আমার ব্যাগ থেকে কুড়িটা টাকা বার করে দিয়ে বললাম, 'আপনি গুহ মজুমদারকে দেখান। তিনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলেকে ভালো করে দেবেন।'

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞভাবে টাকাটা পকেটে পুরে হাত জোড় করে মাথা হেঁট করে বললেন, 'আসি তাহলে। আপনাকে অযথা বিরক্ত করলুম—মাপ করবেন।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ ছেড়ে ল্যাবরেটরিতে ফিরে এলাম। এরা আমাকে ডাক্তার বলে ভুল করল কি করে, সেটা ভেবে যেমন হাসি পাচ্ছে, তেমন অবাকও লাগছে।

১০ই সেপ্টেম্বর

সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠা আমার চিরকালের অভ্যাস। উঠে হাত মুখ ধুয়ে একটু উশ্রীর ধারে বেড়াতে যাই। আজ প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে দেখি ঝাঝার ডাক্তার প্রতুল গুহ মজুমদার ও সেদিনের সেই ভদ্রলোকটি আমার বৈঠকখানায় বসে আছেন। আমি ত অবাক। প্রতুলবাবু এমনিতে বেশ হাসিখুশি, কিন্তু আজ দেখলাম তিনি রীতিমত গম্ভীর ও চিন্তিত। আমাকে দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে নমস্কার করে বললেন, 'আপনি ত মশাই বেশ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন, এ-চিকিৎসা ত আমার দ্বারা সম্ভব নয়, প্রোফেসর শঙ্কু !'

আমি প্রহ্লাদকে ডেকে কফি আনতে বলে সোফায় বসে প্রতুলবাবুকে বললাম, 'কি অসুখ হয়েছে বলুন ত ছেলেটির। কষ্টটা কি ?'

'কোন কষ্ট আছে বলে মনে হয় না।'

'তবে ? মাথায় চোট লেগে ব্রেনে কিছু হয়েছে কি ? ভুল বকছে ?'

'বকছে—তবে ভুল-ঠিক বলা শক্ত। এখন পর্যন্ত এমন কিছু বলতে শুনিনি যেটাকে জোর দিয়ে ভুল বলা চলে। আবার এমন কিছু বলতে শুনেছি যেগুলো একেবারে অবিশ্বাস্য রকম ঠিক।'

'কিন্তু আমিই বা এ ব্যাপারে কি করতে পারি বলুন।'

প্রতুলবাবু ও অন্য ভদ্রলোকটি পরস্পরের দিকে চাইলেন। তারপর প্রতুলবাবু বললেন, 'আপনি একবার আমাদের সঙ্গে চলুন। আমার গাড়ি আছে—একবার দেখে আসুন অন্তত। আমার মনে হয়—আর কিছু না হোক আপনার খুব আশ্চর্য ও ইন্টারেস্টিং লাগবে। সত্যি বলতে কি, কেউ যদি এর একটা কিনারা করতে পারে, তবে সেটা আপনিই পারবেন।'

খুব একটা জরুরী কারণ না থাকলে প্রতুলবাবু আমাকে এমন অনুরোধ করতেন না সেটা জানি। কাজেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গ নিতেই হল। ফিয়াট গাড়িতে করে গিরিডি থেকে ঝাঝা পৌঁছতে আমাদের লাগল দু' ঘণ্টা।

পথে আসতে আসতেই জেনেছিলাম অন্য ভদ্রলোকটির নাম দয়ারাম বোস। সাত বছর হল ঝাঝার পোস্টাপিসের চাকরি করছেন। বাড়িতে স্ত্রী আছেন, আর ওই একটিমাত্র ছেলে অমূল্য ওরফে খোকা। বাড়িটাও দেখলাম ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে মানানসই। খোলার ছাতওয়ালা একতলা বাড়ি, দুটি মাত্র ঘর, আর একটা আট হাত বাই দশ হাত উঠোন—যে উঠোনে খোকা পিছলে পড়েছিল। পুবদিকে ঘরের একটা ছোট্ট খাটের উপর বালিশে মাথা দিয়ে 'খোকা' শুয়ে আছে। রোগা শরীর, মাথাটা আর চোখদুটো বড়, চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই খোকা বলল, 'স্বাগতম।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'তুমি সংস্কৃতে অভ্যর্থনা জানাতে শিখলে কি করে ?'

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে খোকা কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'সিক্স,অ্যান্ড সেভেন টু ফাইভ ?'

পরিষ্কার ইংরিজি উচ্চারণ—কিন্তু এ প্রশ্নের মানে কি ?

আমি দয়ারামবাবুর দিকে চেয়ে বললাম, 'এসব কথা ও কোত্থেকে শিখল ?'

দয়ারামের বদলে প্রতুলবাবু ফিস ফিস করে বললেন, 'যা বুঝছি ও যে সমস্ত কথা কদিন থেকে বলছে, তা ওকে কেউ শেখায়নি। ও নিজে থেকেই বলছে। সেইখানেই ত গণ্ডগোল। অথচ খাচ্ছে-দাচ্ছে ঠিকই। ঘুমটা বোধহয় একটু কমেছে। আমরা যখন বেরিয়েছি পাঁচটায় তখনই ও উঠে গিয়ে কথা শুরু করেছে।'

আমি বললাম, 'সকালে কি বলছিল ?'

এ প্রশ্নের উত্তর খোকা নিজেই দিল। সে বলল, 'করভাস স্প্লেন্ডেন্ পাসের ডোমেস্টিকাস।'

আমার পিছনেই একটা চেয়ার ছিল ; আমি সেটায় ধপ করে বসে পড়লাম। এ যে আমাদের অতি পরিচিত সব পাখির ল্যাটিন নামগুলো বলছে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে যে সব পাখিকে প্রথম ডাকতে শুনি সেগুলোরই ল্যাটিন নাম হল এই দুটো। করভাস্ স্প্লেন্ডেন্ হল কাক আর পাসের ডোমেস্টিকাস্ হল চড়াই।

এবারে আমি খোকাকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমাকে এসব নামগুলো কে শেখালে বলতে পার ?'

কোন উত্তর নেই। সে একদৃষ্টে একটা দেয়ালের টিকটিকির দিকে চেয়ে রয়েছে। এবার বললাম, 'একটুক্ষণ আগে আমাকে দেখে যে কথাটা বললে সেটা কি ?'

'সিক্স, অ্যান্ড সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ।'

'তা ত বুঝলাম, কিন্তু সেটার—'

কথা শেষ করলাম না, কারণ আমার হঠাৎ খেয়াল হল আমার চশমার দুটো লেন্সের পাওয়ার হল মাইনাস সিক্স ও মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ !

এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আর আমার জীবনে কখনো হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

এবার বিছানার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে খোকার উপর একটু ঝুঁকে পড়ে প্রতুলবাবুকে জিগ্যেস করলাম, 'ব্যথাটা মাথার ঠিক কোনখানটায় লেগেছিল বলুন ত।'

প্রতুল ডাক্তারের মুখ খোলার আগেই খোকা জবাব দিল, 'অস্ টেম্পোরালে।'

নাঃ, একেবারে অবিশ্বাস্য অভাবনীয় ব্যাপার। মাথার হাড়ের ডাক্তারি নামও জেনে ফেলেছে এই সাড়ে চার বছরের ছেলে।

আমি ঠিক করলাম খোকাকে আমার বাড়িতে এনে কয়েকদিন রাখব, তাকে পর্যবেক্ষণ করব, পরীক্ষা করব। মানুষের ব্রেন সম্বন্ধে অনেক কিছু স্টাডি করা হয়ত এ থেকে সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমার হয়ত অনেক উপকারও হবে।

দয়ারাম ও প্রতুলবাবু দুজনেই আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন। খোকার মা কেবল বললেন, 'আপনি ওকে নিয়ে যেতে চান ত নিয়ে যান, কিন্তু দয়া করে ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটি করে আমাদের আবার ফেরত দিয়ে যাবেন। চার বছরের ছেলের চার বছরের বুদ্ধিই ভালো ও যা কথা বলছে আজকাল, সে ত আর আমাদের সঙ্গে নয়, সে ওর নিজের সঙ্গে। আমরা ওর কথা বুঝিই না! ছেলে যেন আর আমাদের ছেলেই নেই। এতে মনে বড় কষ্ট পাই, ডাক্তারবাবু! আমার ওই একমাত্র ছেলে, তাই আমাদের কথাটাও একটু ভেবে দেখবেন!'

এ রোগের ওষুধ আমারও জানা নেই তবে আমার মত বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মাথা খাটিয়ে চেষ্টা করলে এর একটা চিকিৎসা বার করা সম্ভব নয়—সেটাই বা ভাবি কি করে? তবে মুশকিল হয়েছে কি, খোকার যে জিনিসটা, হয়েছে, সেটাকে ব্যারাম বলা চলে কি না সেখানেই সন্দেহ। তবু বুঝতে পারি, ছেলে বেশি বদলে গেলে বাপ-মায়ের কখনো ভালো লাগে না—বিশেষ করে রাতারাতি বদলালে ত কথাই নেই।

ঝাঝা ছাড়লাম প্রায় দুপুর সাড়ে এগারটায়। প্রতুলবাবুই পৌঁছে দিলেন। পথে সাতাশ মাইলের মাথায় গাড়িটা হঠাৎ একটু বিগড়ে থেমে গিয়েছিল, তাতে খোকা শুধু একবার বলে 'স্পার্কিং প্লাগ'। বনেট খুলে দেখা যায় স্পার্কিং প্লাগেই গণ্ডগোলটা হচ্ছে, এবং সেটা ঠিক করাতেই গাড়িটা চলে। এছাড়া আর কোন ঘটনা ঘটেনি, বা খোকাও কোন কথা বলেনি।

কাল থেকেই খোকা আমার এখানে আছে। আমার দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় ওকে রেখেছি। দিব্যি নিশ্চিন্তে আছে। বাড়ির কথা মা-বাবার কথা একবারও উচ্চারণ করেনি। আমার বেড়ালের নাম নিউটন শুনে খোকা খালি বলল, 'গ্র্যাভিটি'। বুঝলাম স্যার আইজ্যাক নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন সেটাও খোকা কি করে জানি জেনে ফেলেছে।

বেশির ভাগ সময় খোকা চুপচাপ খাটেই শুয়ে থাকে, আর কি জানি ভাবে। আমার চাকর প্রহ্লাদ ত ওকে পেয়ে ভারি খুশি। আমি যেটুকু সময় ঘরে থাকি না, সে সময়টুকু প্রহ্লাদ ওর কাছে থাকে। তবে খোকার সঙ্গে কোন কথাবার্তা চলে না এইটেতেই তার দুঃখ। আমার কাছে তাই নিয়ে আপসোস করাতে আমি বললাম, 'কিছুদিন এখানে থাকতে আশা করছি ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।' কথাটা বলেই অবিশ্যি মনে হল যে সেটা সত্যি হবে কি না আমার জানা নেই।

খোকার মাথাটা যাতে একটু ঠাণ্ডা হয় তার জন্য দুটো নাগাৎ ওকে একটা ঘুম পাড়ানো বড়ি গুলে খেতে দিয়েছিলাম! খোকা গেলাসটা হাতে নিয়েই বলল, 'সম্নোলিন'! অথচ দুধটা দেখে বা শুঁকে ওষুধের অস্তিত্বটা টের পাবার কোন উপায় নেই! এদিকে আমি ত মিথ্যে কথা বলতে পারি না! ধরা যখন পড়েই গেছি, তখন সেটা স্বীকার করেই বললাম, 'তোমার ঘুমলে ভাল হবে। ওটা খেয়ে নাও।'

খোকা শান্ত স্বরে বলল, 'না, ওষুধ দিও না। ভুল কোর না।'

আমি বললাম, 'তুমি কি করে জানলে আমি ভুল করেছি? তোমার কি হয়েছে তুমি জান?'

খোকা চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। আমি আবার বললাম, 'তোমার কি কোন অসুখ করেছে? সে অসুখের নাম তুমি জান?'

খোকা কোন কথা বলল না। এ প্রশ্নের

উত্তর কোনদিন তার কাছে পাওয়া যাবে কি না জানি না। দেখি, বইপত্তর ঘেঁটে যদি কোন কূলকিনারা করতে পারি।

আজ সকাল থেকে খোকার কথা ও জ্ঞানের পরিধি অসম্ভব বেড়ে গেছে।

কাল সারাদিন নানান ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক বই ঘেঁটেও খোকার এই অদ্ভুত 'ব্যারাম' সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। দুপুরবেলা আমার দোতালার স্টাডিতে বসে জুলিয়াস রেডেলের লেখা মস্তিষ্কের ব্যারামের উপর বিরাট মোটা বইটা এক মনে পড়ছি, এমন সময় হঠাৎ খোকার গলা কানে এল— 'ওতে পাবে না।'

আমি অবাক হয়ে মুখ তুলে দেখি সে কখন জানি তার ঘর থেকে উঠে চলে এসেছে। এর আগে এখানে এসে অবধি সে তার নিজের ঘরের বাইরে কোথাও যায়নি, বা যাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি।

আমি বইটা বন্ধ করে দিলাম। খোকার কথার মধ্যে এমন একটা স্থির বিশ্বাসের সুর, যে সেটা অগ্রাহ্য করার কোন উপায় নেই। একজন ষাট বছর বয়সের বুদ্ধিমান বুড়ো যদি আমায় এসে গম্ভীর গলায় বলত রেডেলের বই-এ কোন একটা জিনিস নেই, আমি হয়ত তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস নাও করতে পারতাম। কিন্তু সাড়ে চার বছরের খোকার কথায় আমার হাতের বইটা যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

খোকা কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বলল, 'টির‍্যানিয়াম্ ফস্‌ফেট।'

আশ্চর্য! একতলায় আমার ল্যাবরেটরিতে রাখা আমার তৈরি নতুন অ্যাসিডের নাম খোকা জানল কি করে। আমি বললাম, 'ভারী কড়া অ্যাসিড।'

খোকার মুখে যেন এই প্রথম একটু হাসির আভাস দেখলাম। সে বলল, 'ল্যাবরেটরি দেখব।'

এই সেরেছে! ওকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই আমার। এ অবস্থায় ওকে ওই সব কড়া কড়া অ্যাসিড, গ্যাস ইত্যাদির মধ্যে নিয়ে গেলে যে কখন কি ক'রে বসবে তার কি ঠিক আছে? আমি তাই একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ওখানে গিয়ে কি হবে?—ধুলো, তাছাড়া গন্ধও ভালো নয়। নানারকম আজেবাজে ওষুধপত্র।'

খোকা কিছু না বলে আবার পায়চারি শুরু করল। আমার টেবিলের উপর একটা গ্লোব ছিল, সেটা সে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। গ্লোবটায় সাউথ আমেরিকার একটা জায়গায় খানিকটা রং চটে গিয়েছিল, ফলে কিছু জায়গার নাম চিরকালের মত সেটা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। খোকা কিছুক্ষণ সেই ছোট্ট রং ওঠা জায়গাটার দিকে চেয়ে থেকে, তারপর আমার টেবিলের উপর থেকে ফাউন্টেন পেন তুলে খুদে খুদে অক্ষরে সেই জায়গাটায় কি জানি লিখল। শেষ হলে পর গ্লোবটার উপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলাম লিখেছে Serinha, Jacobina, Campo, Formosa। এই তিনটি নামই গ্লোবটা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে নিয়ে আর সারাদিন খোকা যে কত কি বলেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। আইনস্টাইনের ইকুয়েশন, আমার নিজের পোলার রিপলেয়ন থিয়োরি, চাঁদে কোন উপত্যকা সব চেয়ে বড়, কোন পাহাড় সব চেয়ে উঁচু, বুধগ্রহের আবহাওয়ায় কেন এত কার্বনডাইঅক্সাইড, এমন কি আমার ঘরের বাতাসে কি কি জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ সবই খোকা আউড়ে গেছে। এক ফাঁকে একটা আস্ত মাদ্রাজি গান গেয়েছে ও হ্যামলেট থেকে 'টু বী অর নট টু বী' আবৃত্তি করেছে। বিকেল চারটে নাগাদ আমি আমার ঘরে বসে কাজ করছিলাম, প্রহ্লাদ খোকার কাছে বসে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আর সেই ফাঁকে খোকা তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে প্রহ্লাদ ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখতে না পেয়ে আমার কাছে এসেছে। তারপর আমরা দুজনে নিচে গিয়ে দেখি সে আমার

ল্যাবরেটরির তালা দেওয়া দরজাটা ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখছে।

আমি অবিশ্যি তাকে ধমক টমক কিছুই দিলাম না, কেবল ওর হাতটা ধরে বললাম, 'চল, আমরা পাশের বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।' সে অমনি বাধ্য ছেলের মত আমার সঙ্গে বৈঠকখানায় সোফায় গিয়ে বসল, আর ঠিক সেই সময়ই এসে পড়লেন আমার পড়শী অবিনাশবাবু।

তাঁর আবির্ভাবটা আমার কাছে খুব ভাল লাগল না, কারণ অবিনাশবাবু ভারি গপ্পে মানুষ ; খোকাকে দেখে এবং তার কীর্তিকলাপ শুনে যদি আর পাঁচজনের কাছে গল্প করেন তা হলে আর রক্ষে নেই। আমার বাড়িতে একেবারে দেখতে দেখতে মেলা বসে যাবে, আর সেই মেলার প্রধান ও একমাত্র আকর্ষণ হবে খোকা।

বলা বাহুল্য খোকাকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে অবিনাশবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'ইনি আবার কোত্থেকে আমদানি হলেন ? গিরিডি শহরে ত এনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না !'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'ও আমার কাছে এসে কিছুদিন রয়েছে। এক জ্ঞাতির ছেলে।'

অবিনাশবাবু বাচ্চাদের আদর করার মত করে তাঁর ডানহাতের তর্জনী দিয়ে খোকার গালে একটা টোকা মেরে বললেন, 'কি নাম তোমার, খোকা, অ্যাঁ ?'

খোকা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'এক্টোমরফিক সেরিব্রেটনিক।'

অবিনাশবাবু চমকে উঠে দু চোখ বড় বড় করে বললেন, 'ও বাবা এ কোন দিশি নাম, ও অধ্যাপক মশাই !'

আমি একটু হেসে বললাম, 'ওটা ওর নাম নয় অবিনাশবাবু, ও যেটা বল্ল সেটা হচ্ছে আপনার বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা। ওর নাম আসলে, অমূল্যকুমার বসু, ডাকনাম খোকা।'

'বৈজ্ঞানিক নাম ?' অবিনাশবাবু দেখলাম বেশ অবাক হয়েছেন। 'আপনি আজকাল কচি খোকাদের ধরে ধরে ওই সব শেখাচ্ছেন নাকি ?'

এ কথার উত্তরে হয়ত আমি চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু আমার বদলে খোকাই মন্তব্য করে বসল।

'উনি আমায় কিছুই শেখাননি।'

এই বলেই খোকা চুপ করে গেল।

এরপরেই অবিনাশবাবু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চা কফি কিচ্ছু না খেয়ে উঠে পড়লেন। যে রকম ভাব নিয়ে গেলেন, তাতে আমার ভয় হচ্ছে উনি খোকার খবরটা না রটিয়ে ছাড়বেন না। তেমন উৎপাত আরম্ভ হলে বাড়িতে পুলিশ রাখবার বন্দোবস্ত করব। এখানকার ইনস্পেক্টর সমাদ্দারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট খাতির আছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর

খোকার বিচিত্র কাহিনীর যে এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটবে তা ভাবতেই পারিনি। গত দু'দিন এক মুহূর্ত ডায়রি লেখার ফুরসৎ পাইনি। কি ঝক্কি যে গেছে আমার উপর দিয়ে সেটা একমাত্র আমিই জানি। কারণটা অবিশ্যি যা ভয় পেয়েছিলাম তাই-ই। সেদিন অবিনাশবাবু আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে ফেরার আগে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে খোকার কীর্তির বর্ণনা দেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকে লোকজন উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে। খোকাকে আমি তার দোতলার ঘরেই রেখেছিলাম এবং সে ঘুমোচ্ছে এই বলে লোক তাড়ানোর মতলব করেছিলাম। কিন্তু সারাক্ষণই ঘুমোচ্ছে এ কথাটা তো লোকে বিশ্বাস করবে না। রাত আটটা নাগাদ যখন আমার নিচের বৈঠকখানায় রীতিমত ভিড় জমে গেছে, আর লোকেরা শাসাচ্ছে যে খোকাকে না দেখে সেখান থেকে তারা নড়বে না, তখন বাধ্য হয়েই খোকাকে নিয়ে আসতে হল। আর অমনি সকলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কি। আমি যথাসম্ভব দৃঢ়ভাবে বললাম, 'দেখুন—মাত্র সাড়ে চার বছরের ছেলে—আপনারা যদি এভাবে ভিড় করেন, তা হলে ত আলোবাতাস বন্ধ হয়ে এমনিতেই তার

শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

তখন তারা বলল, 'তা হলে ওকে বাইরে আপনার বাগানে নিয়ে আসুন না।'

শেষ পর্যন্ত তাই হল। খোকাও বাগানে আসেনি কখনও—এসেই তার মুখে কথা ফুটল। সে ঘাস থেকে আরম্ভ করে যত ফুল ফল গাছ পাতা ঝোপঝাড় বাগানে রয়েছে, তার প্রত্যেকটির ল্যাটিন নাম আউড়ে যেতে লাগল। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবার এখানকার মিশনারি ইস্কুলের হেডমাস্টার ফাদার গলওয়ে ছিলেন। তিনি আবার বটানিস্ট। খোকার জ্ঞানের বহর দেখে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে আমার বেতের চেয়ারে বসে পড়লেন।

এই ত গেল পরশুর কথা। কাল আমার বাড়িতে কত লোক এসেছিল সেটা খোকা নিজেই রাত্রে বিছানায় শোবার সময় বলল। তার কথায় জানলাম, লোকের হিসেব হচ্ছে—সবসুদ্ধ তিনশ' ছাপ্পান্ন জন, তার মধ্যে তিনজন সাহেব, সাতজন উড়িয়া, পাঁচজন আসামী, একজন জাপানী, ছাপ্পান্নজন বিহারী, দুজন মাদ্রাজী আর বাকি সব বাঙালী।

গতকাল সকালে কলকাতা থেকে তিনজন খবরের কাগজের রিপোর্টার এসে হাজির। তারা খোকার সঙ্গে কথা না বলে ছাড়বে না। খোকা কথা বলল ঠিকই, কিন্তু তাদের কোন প্রশ্নের জবাব সে দিল না। কেবল তিনজনকে আলাদা করে তাদের কাগজে কত ছাপার কালি খরচ হয়, ক লাইন খবর তাতে থাকে আর কত সংখ্যা কাগজ ছাপা হয়—এই সমস্ত হিসেব তাদের দিয়ে দিল।

একজন রিপোর্টারের সঙ্গে একটি ফটোগ্রাফার এসেছিল, সে এক সময় ফ্ল্যাশ ক্যামেরা দিয়ে খোকার একটি ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা উঁচিয়ে দাঁড়াল। খোকা বলল, 'ফ্ল্যাশ না। চোখে লাগে।'

ফটোগ্রাফার একটু হেসে খোকা-খোকা গলা করে বলল, 'একটা ছবি, খোকাবাবু। দেখনা কেমন সুন্দর ছবি হবে তোমার।'

এই বলে তুলতে গিয়ে কিছুতেই আর

ফ্ল্যাশ জ্বলে না— অথচ বাল্‌বটা ঠিকই পুড়ে যাচ্ছে। এই করে সাতখানা বাল্‌ব পুড়ল— কিন্তু ফ্ল্যাশ আর জ্বলল না।

বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন যিনি সমীরণ চৌধুরী বলে নিজের পরিচয় দিলেন। কলকাতা থেকে আসছেন। বললাম, 'কি প্রয়োজন আপনার ?'

ভদ্রলোক বললেন তিনি নাকি একজন ইম্প্রেসারিও। অর্থাৎ, বড় বড় নাচিয়ে বাজিয়ে গাইয়ে ম্যাজিশিয়ান ইত্যাদির শো-এর বন্দোবস্ত করে দেন। তাঁর ইচ্ছে খোকাকে তিনি কলকাতার নিউ এম্পায়ার স্টেজে উপস্থিত করবেন। খোকা সেখানে প্রশ্নের জবাব দিয়ে, মন থেকে অঙ্ক কষে, ল্যাটিন আউড়ে, গান গেয়ে লোককে অবাক করে দেবে! এ থেকে খোকার

খ্যাতিও হবে, রোজগারও হবে। তেমন বুঝলে বিলেতে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করা যেতে পারে।

আমি বললাম, 'খোকার মা-বাবার অনুমতি ছাড়া আমি এ ব্যাপারে মত দিতে পারি না ! ওর বাবার ঠিকানা আমি দিয়ে যাচ্ছি আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন।'

সন্ধ্যার দিকে পাঁচ-ছশো লোকের সামনে বসে নানারকম আশ্চর্য কথা বলার পর খোকা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'মির ইস্ট্‌ মুয়েডা।'

আমার ভাষা অনেকগুলোই জানা আছে—জার্মানটা রীতিমত সড়গড়। বুঝলাম খোকা জার্মানে বলেছে— 'আমি ক্লান্ত।'

আমি তৎক্ষণাৎ সমবেত লোকদের বললাম যে খোকা এখন ভেতরে যাবে, সে বিশ্রাম করতে চায়। লোকেরা হয়ত এ কথায় একটু গোলমাল করতে পারত, কিন্তু পুলিশ থাকায় ব্যাপারটা বেশ সহজেই ম্যানেজড্‌ হয়ে গেল।

খোকাকে আমার ঘরেই শোওয়ালাম।

প্রায় যখন বারোটা বাজে, তখন দেখে মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি হাতের বইটা রেখে বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। আমার মনটা ভাল ছিল না। আমি নিজে নির্জনতা ভালবাসি। গত দু-দিন ভিড়ের ঠেলায় আমারও ক্লান্ত লাগছিল, যদিও ক্লান্তি জিনিসটা আমার সহজে আসে না। চার দিন চার রাত্রি না ঘুমিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে এবং কোনবারেই কাবু হইনি ! আসলে কাল খোকার ক্লান্তির আভাস পেয়েই আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কি উপায় হবে এই আশ্চর্য খোকার ? তার মা বাবার কাছে যদি তাকে ফেরত দিয়ে আসি, তা হলেই বা সে রেহাই পাবে কি করে ? সেখানেও ত উৎপাত শুরু হবে। এর একটা ব্যবস্থা করব বলে ত আমি নিজেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। আর এমনও নয় যে অন্য কোন একটা বড় ডাক্তারের পরামর্শ নিলেই একটা উপায় হয়। ব্রেনে কি কি জাতীয় গোলমাল হতে পারে না-পারে সেই নিয়ে আগেই আমার অনেক পড়াশুনা ছিল। তাছাড়া গত কদিনে আমি একমাত্র এই বিষয়টা নিয়েই এগারোখানা বই পড়ে ফেলেছি। কোনখানেই খোকার যেটা হয়েছে সে জাতীয় ঘটনার কোন উল্লেখ পাইনি। পৃথিবীর ইতিহাসে খোকার এ ঘটনা একেবারে অনন্য ও অভূতপূর্ব এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

এইসব ভাবতে ভাবতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই ! ঘুমটা ভাঙল আচমকা একটা বাজ পড়ার শব্দে। উঠে দেখি ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জন। একঝলক বিদ্যুতের আলোয় পাশের বিছানার দিকে চেয়ে দেখি—খোকা নেই !

আমি ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। কি জানি কি মনে হল—আমার বালিশটা তুলে দেখি, তার তলা থেকে আমার চাবির গোছাটাও উধাও। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে, সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে এসে ল্যাবরেটরির দিকে গিয়ে দেখি—দরজা হাঁ করে খোলা, আর ভিতরে বাতি জ্বলছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে যা দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার রক্ত জল হয়ে এল।

খোকা আমার কাজের টেবিলের সামনে টুলের উপর বসে আছে। তার সামনে টেবিলের উপর সার করে সাজানো আমার বিষাক্ত, মারাত্মক অ্যাসিডের সব বোতল। বুনসেন বার্নারটাও জ্বলছে, আর তার পাশেই ফ্লাস্কে কি যেন একটা তরল পদার্থ সবে মাত্র গরম করা হয়েছে। খোকার হাতে এখন টির‍্যানিয়াম ফস্‌ফেটের বোতল। সেটা কাত করে তার থেকে কয়েক ফোঁটা অ্যাসিড সে ফ্লাস্কটার মধ্যে ঢেলে দিতেই তার থেকে ভক্‌ ভক্‌ করে হলদে রং-এর ধোঁয়া বেরোল, সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে গেল একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে, যাতে আমার প্রায় চোখে জল এসে গেল।

এবার, আমি ঘরে ঢুকেছি বুঝতে পেরে

খোকা আমার দিকে ফিরে চাইল।

'অ্যানাইহিলিন কোথায় ?' খোকা গর্জন করে উঠল।

অ্যানাইহিলিন ? খোকা আমার অ্যানাইহিলিন চাইছে ? তার মত সাংঘাতিক অ্যাসিড তো আর নেই। ও অ্যাসিড দিয়ে খোকা করবে কি ? ওটা ত আমার আলমারির উপরের তাকে বন্ধ থাকে। কিন্তু যে সব জিনিস খোকা এতক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করছে তাতেও প্রায় খান ত্রিশেক হাতিকে অনায়াসে ঘায়েল করা চলে !

আবার আদেশ এলো—'অ্যানাইহিলিন দাও। দরকার ! এক্ষুণি।'

আমি নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে খোকার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'খোকা, তুমি যে সব জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ, সেগুলো ভাল না। হাতে লাগলে হাত পুড়ে যাবে, ব্যথা পাবে। তুমি আমার সঙ্গে ওপরে ফিরে চলো, এসো।'

এই বলে হাতটা বাড়িয়ে ওর দিকে একটু এগিয়ে গেছি, এমন সময় খোকা হঠাৎ টির‍্যানিয়াম ফস্‌ফেটের বোতলটা হাতে নিয়ে এমন ভাবে সেটাকে তুলে ধরল, যে আর এক পা যদি এগোই আমি তাহলেই যেন সে সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে মারবে। আর তাহলেই—মৃত্যু না হলেও—আমি যে চিরকালের মত পুড়ে পঙ্গু হয়ে যাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

খোকা অ্যাসিডের বোতলটা আমার দিকে তাগ করে দাঁতে দাঁত চেপে আবার বলল, 'অ্যানাইহিলিন দাও—ভালো চাও ত দাও।'

এ অবস্থা থেকে আর বেরোবার কোন উপায় নেই দেখে—এবং এত অ্যাসিড হ্যান্ড্‌ল করেও খোকা জখম হয়নি দেখে একটা ভরসা পেয়ে আমি আলমারিটা খুলে একেবারে ওপরের তাকের পিছন থেকে অ্যানাইহিলিনের বোতলটা বার করে খোকার সামনে রেখে মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম, যে অ্যাসিডের বোতলটা খুলে তার থেকে অত্যন্ত সাবধানে ঠিক তিন ফোঁটা অ্যাসিড খোকা তার সামনে ফ্লাস্কটায় ঢালল। তারপর আমি কিছু করতে পারবার আগেই অবাক হয়ে দেখলাম যে খোকা তার নিজের তৈরি সবুজ রঙের মিক্‌সচার ঢক্ ঢক্ করে চার ঢোকে গিলে ফেলল। আর পরমুহূর্তেই তার শরীরটা টেবিলের উপর কাৎ হয়ে এলিয়ে পড়ল।

আমি দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে একেবারে সোজা দোতলায় তার খাটে নিয়ে গিয়ে ফেললাম। তার নাড়ী আর বুক পরীক্ষা করে দেখলাম—কোন গোলমাল নেই, ঠিক চলছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসও ঠিক চলছে, মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই, বরং বেশ শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। অজ্ঞান যে হয়েছে, তাও মনে হল না। ভাবটা ঘুমের—গভীর ঘুমের।

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আমিও চুপ করে খোকার খাটের পাশে বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে বৃষ্টি থেমে মেঘ কেটে যেতে দেখলাম ভোর হয়ে গেছে। কাক চড়ুই ডাকতে শুরু করেছে।

ঠিক ছটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় খোকা একটু এপাশ ওপাশ করে চোখ মেলে চাইল। তার চাহনিতে কেমন যেন একটা নতুন ভাব। একটুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে একটু কাঁদো কাঁদো ভাব করে খোকা বলল, 'মা কোথায় ? মা'র কাছে যাব।'

আধ ঘণ্টা হল খোকাকে ঝাঝায় তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। ঝাঝা যাবার পথে গাড়িতেই খোকার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। যখন চলে আসছি, তখন সে তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়িয়ে বলল, 'আমায় লজঞ্চুস এনে দেবে দাদু, লজঞ্চুস ?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই দেবো। কালই দেবো। কালই আবার গিরিডি থেকে এসে তোমায় লজঞ্চুস দিয়ে যাব।'

মনে মনে বললাম, খোকাবাবু, একদিন আগে হলেও তুমি আর লজঞ্চুস চাইতে না—তুমি চাইতে দাঁতভাঙা ল্যাটিন নাম-ওয়ালা কোন এক বিচিত্র, বিজাতীয় বস্তু !

ছবি : সত্যজিৎ রায় *(পুনর্মুদ্রিত)*

এ-ও ভাল সে-ও ভাল ওরফে ঘোড়াবাজি

লীলা মজুমদার

কেউ বা বলে গোরু ভাল, কেউ-বা বলে ঘোড়া ভাল ; আবার কেউ বলে, "কম করেও কুকুর মেকুর থোড়া ভাল।

তাদের মতো প্রভুভক্ত আর কে বা আছে ?

আমার জেরিকে ছেড়ে একদিনও চলে না। ক্ষণে-ক্ষণে খালি বলি, "জেরি কোথায় ? জেরিকে কেন দেখতে পাচ্ছি না ?"

তাই শুনে মহা বিরক্ত হয়ে, আমার খাটের তলার নিভৃত আরাম থেকে বেরিয়ে এসে, আমার দিকে আড়চোখে তাকাতে-তাকাতে জেরি রান্নাঘর অভিমুখে চলে যায়। স্পষ্ট টের পাই মনে-মনে সে আমাকে যা নয় তাই বলে গেল ! রান্নাঘরে তার সহানুভূতিশীল বন্ধুবান্ধব আছে।

তাই আমার মনের মন্দিরে কুকুরের বদলে বেড়াল বাস করে। হ্যাঁ, বেড়াল। গেছো বেড়াল, মেছো বেড়াল, ভাল বেড়াল, কালো বেড়াল। সবাই থাকে। মনে-মনে ডাকে। কেউ টের পায় না, দেখাও যায় না। নিঃশব্দে চলে বলে !

আমার একটা বেড়ালের বই-ও আছে। তার গোড়ায় আমি লিখেছি :

ধলো বেড়াল, কালো বেড়াল ;
বদ বেড়াল, ভাল বেড়াল ;
হুলো বেড়াল, নুলো বেড়াল,
কুনো বেড়াল, বুনো বেড়াল ;
গেছো বেড়াল, মেছো বেড়াল ;
সবাইকে এই বই দিলাম,
বইতে নিজের সই দিলাম।

এই তো গেল গোড়ার কথা। ছেলেবেলায় খাসিয়া পাহাড়ের শিলং শহরে বেড়ালদের খুব কাছাকাছি থাকতাম। আমার বারো বছর বয়সে সে জায়গা ছেড়ে এসে অবধি, সেখান থেকে অনেক দূরে-দূরে জীবন কেটেছে।

কলকাতায় আমাদের সাহেবপাড়ার দোতলার ফ্ল্যাটটি দিব্যি খোলামেলা, সাজানোগোছানা এবং ধেড়ে-ধেড়ে ইঁদুর অধ্যুষিত।

নীচের তলায় বিলিতি প্যাটার্নের দোকানে চিজ, শুকনো মাছ ইত্যাদির গন্ধ ভুরভুর করে, আর ঘরের ইঁদুর পরের ইঁদুর, তাই নিয়ে গভীর রাতে, ফরসা দিনে খ্যাঁচর ম্যাচর করে। তবে আমাদের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। আমরা যে খাই জঘন্য ডালের বড়া, থোড়-বড়ি-খাড়া।

এই তো গেল প্রথম পর্ব। তারপর দিন গেছে, ক্ষণ গেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আম-কাঁঠালের গাছে ঘেরা গাঁয়ের দিকে মন গেছে। তা গাঁ বললেই তো হল না। বলি, "গাঁ কোথায় পাব বল দিকিনি ?"

আমাদের পিতৃপুরুষরা পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ জেলা থেকে চলে এসে কলকাতায় বসবাস শুরু না করে অন্য কোথাও যেতেন, তা হলে সেখানকার নাম দিতে পারতেন 'মার্জারিস্থান'। মার্জার হল গিয়ে বেড়াল, যাদের নরম-নরম গা, বাঁকা চোখ, ধারালো নখ, সেই বেড়াল।

তাঁদের কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। সেই কথারই কিছুটা আজ বলি।

আমার ছেলেবেলাটা কেটেছিল খাসিয়া পাহাড়ের চুড়োর কাছাকাছি শিলং শহরে। সে-জায়গা যেমন সুন্দর, তেমনই ঠাণ্ডা। শীতকালে ঘাসের ওপর রাতের শিশির জমে বরফ হয়ে থাকত। তার ওপর হাঁটলে মটমট করে ভাঙত !

এদিকে ঘরের মধ্যেও রাত্তিরবেলায় দিদির পাশে শুয়েও আমার পা গরম হত না ! মা তাই পায়ের কাছে গরম জলের ব্যাগ দিয়ে দিতেন। বলতেন, গরমে আরামে ঘুমিয়ে পড়লে আর শীত-টিত মালুম দেবে না !

কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি, ব্যাগের জল ঠাণ্ডা, আমার পা দুটো বরফ! দিদির নরম-গরম গায়ে পা লাগালেই সে চটে কাঁই হবে!

তবু একদিন ভয়ে-ভয়ে লেপের তলায় যেই-না পা সোজা করেছি, অমনই নরম গরম কিসে যেন পা ঠেকল! সঙ্গে-সঙ্গে পরম আরামে আমি ঘুমিয়ে কাদা।

ভোরের বেলায় ঘুম ভাঙলে দেখি, তখনও আমার পা গরম, লেপের তলার সেই জায়গাটা গরম আর তার আশেপাশে কয়েকটা ছাই রঙের লোম লেগে রয়েছে!

এসব ঋণ কি কোনও জন্মে শোধ করা যায়? বরং ঋণী হয়ে থাকাতেই আমার গর্ব!

এর ৫০ বছর পরের কথা। তখন আমরা বছরের বেশিরভাগ সময় শান্তিনিকেতনে কাটাই। কিন্তু বেশি শীতের সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে আসতে হয়।

তখন আমাদের পুসি-মেনিকে নিয়ে বড়ই ভাবনা হয়। আমার সুজনির তলায় তারা রাত কাটায়। নইলে তাদের ঘুম হয় না। আমি না থাকলে শেষটা তাদের বিপদ-আপদ হবে না তো?

কিন্তু আমার কথায় কেউ কান দিল না। সবাই বলল "হ্যাঁ! তাও যদি ল্যাজবিহীন বিলিতি 'ম্যাংস্ক ক্যাট' হত। তাদের এক-একটার নাকি হাজার-হাজার টাকা দাম। তা ছাড়া এ-দেশের আবহাওয়ায় বাঁচবেও কি না সন্দেহ!

তবে বিল্লি নিয়ে অত হিল্লিদিল্লি চিন্তার কী আছে? ইংরিজিতে বলে নাকি এক-একটা বিল্লির সাতটা করে জান। যেভাবে রাখবে, সেইভাবেই থাকবে। অন্তত আমাদের দিশি বিল্লি তো বটেই।

সে যাই হোক, সে-বছর শীতকালে খুড়ো এসে কিছুদিন থাকতে চাইলেন। তাঁর কোবরেজ বলেছেন, শুকনো এবং ঠাণ্ডা ঠাঁই হল ওঁর দাওয়াই। তিনি আমাদের চিঠি দিলেন। লিখলেন যে, পুজোর ছুটিতে আমরা তো বাড়ির সদর দোরে চাবি দিয়ে, কাউকে একটু দেখাশুনোর ভার দিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি, উনিই না হয় বাড়ি আগলাবেন।

সবাই বলল, বাঃ! এই তো দিব্যি সমস্যা মিটে গেল। খুড়ো বাড়ি আগলাবেন।

মাণ্টু-পিণ্টুরা গরমের দু'মাস আমাদের জোত-জমি দেখবে। তার বদলে আমাদের আম-কাঁঠালের ভাগ নেবে আর পুসি-মেনিকে নিজেদের কোয়ার্টারে নিয়ে রাখবে। রাতে কাছে নিয়ে শোবে। দিনে ওদের পিসি পুসি-মেনির দেখাশুনো করবেন। ফলে তাঁরও একা লাগবে না। ব্যস, এই তো সমস্যা মিটে গেল।

শেষপর্যন্ত এই ব্যবস্থাই হয়েছিল। আমরা সারা শীতকাল মহানন্দে হেথা-হোথা কাটিয়ে, শান্তিনিকেতনে ফিরেছি। এবং ফিরেই শুনেছি পুসি-মেনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! এদিকে আমাদের বাড়িতে লেপ-কম্বল গায়ে দিয়ে কাকাবাবু দিব্যি নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন! কিন্তু সেদিকে আমাদের হুঁশ নেই। এ আবার কী সাঙ্ঘাতিক কথা! পুসি-মেনিকে ছাড়া আমরা বাঁচব কী করে? বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল!

তারই মধ্যে শোওয়ার ঘরথেকে বুড়ো কাকাবাবুর হাঁক শোনা গেল। "অ্যাঁ! বাড়িতে পা দিতে না দিতেই কী লাগিয়েছিস তোরা? হিঁয়াও!" এবং সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবুর লেপের তলা থেকে গাবদাগোবদা দুটো বেড়ালছানা, মস্ত-মস্ত দু' লাফে ওরা আমাদের বুকে আছড়ে পড়ল!

সেই ইস্তক সবাই মিলে গাদাগাদি করে ওই বাড়িতেই থাকি। একটুও অসুবিধে হয় না। খুড়োর বিল্লি-ব্যাধি একদম সেরে গেছে!

ছবি : দেবাশিস দেব

সামনে আকাল

অন্নদাশঙ্কর রায়

আলিসাহেব বসে ছিলেন
বিষাদভরা মনে
"কী হয়েছে, আলিসাহেব ?"
শুধাই গোপনে।
বলেন তিনি, "সামনে দেখি
মাছের আকাল
মাছের খোঁজে বাঙালি লোক
হবে যে নাকাল।
হাওয়াই জাহাজ চড়ে
মাছ যে হবে হাওয়া
রুই কাতলা ইলিশ মাগুর
আর যাবে না খাওয়া।
এই কথাটা শুনেছিলুম
বিশ দশকের শেষে
এরোপ্লেনের যাত্রী হওয়া
শুরু যখন দেশে।
আমিও আজ বসে আছি
বিষাদভরা মনে
গলদা বাগদা কিনে খাওয়া
হবে না জীবনে।
ধানের চাষের চেয়ে নাকি
চিংড়ি চাষেই টাকা
জাহাজ ভরা চালান দেয়
কলকাতা আর ঢাকা।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী
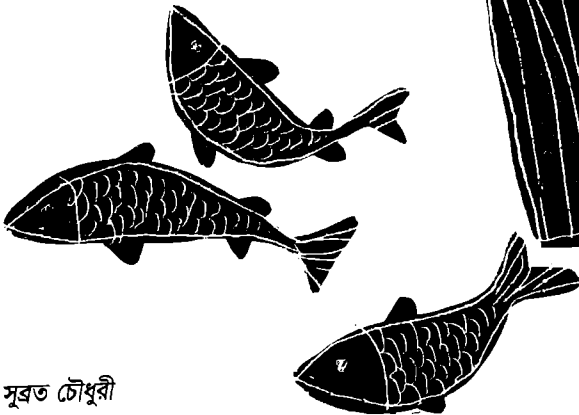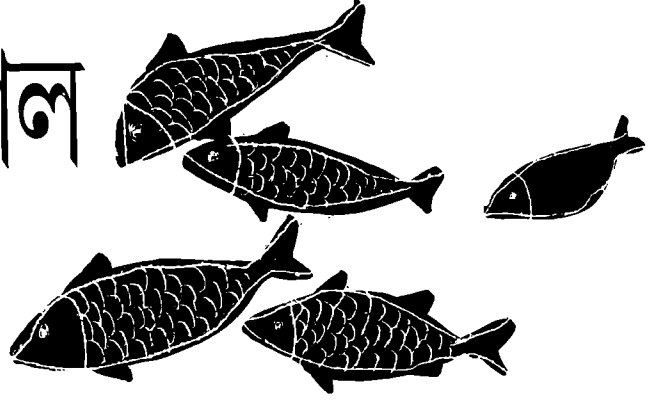
রহস্যের জাল জালের রহস্য

যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

কয়েক কোটি বছর ধরে পাশাপাশি বেঁচে-থাকা ফুল, পতঙ্গ আর মাকড়সাদের স্বভাব এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যা একমাত্র অতি বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষেই মাথা খাটিয়ে বের করা সম্ভব।

বাগান-মাকড়সা আরজিয়োপির জালে সাদা আল্পনা পতঙ্গের চোখে কোনও বাহারি ফুল

গোয়েন্দা গল্প পড়তে-পড়তে পাঠকরা যেমন জড়িয়ে যায় রহস্যের জালে, আমেরিকার দুই বিজ্ঞানীকে তেমনই জড়িয়ে ধরেছিল একটা অদ্ভুত প্রশ্ন। পাকা গোয়েন্দার মতো শেষপর্যন্ত তার উত্তর খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা, আর সেইসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে মাকড়সার জালের অনেক অজানা রহস্য।

মাকড়সার জাল !

শুনে মনে হবে, এতে আর রহস্য কী ? জাল ঝোলানো থাকে, জালের সুতোয় থাকে আঠা। পতঙ্গরা উড়তে-উড়তে অজান্তে তাতে জড়িয়ে যায়। অর্থাৎ, জালটা যেন বাতাসে পেতে রাখা একটা ছাঁকনি। কিন্তু অমন সরল সাদাসিধে যে নয় ব্যাপারটা, সেটা বেশ আগে থেকেই অনেকে বুঝেছিলেন। প্রথম কথা, মাত্র একরকমের জাল তো তৈরি করে না মাকড়সারা !

মাকড়সারা যে সুতো তৈরি করে তা-ও মাত্র একরকম নয়। কখনও-কখনও একই মাকড়সা তৈরি করে আটরকমের আলাদা-আলাদা সুতো ! কোনও সুতো কাজে লাগে মাকড়সার ডিমের থলি তৈরি করতে, কোনও সুতো দিয়ে মাকড়সা শিকারকে জড়িয়ে ফেলে, আবার কোনও সুতো হাঁটাচলার সময় জুড়তে-জুড়তে যায় মাকড়সা। এই সুতো গাছের পাতা বা অন্য যে জায়গা দিয়ে হাঁটছে মাকড়সা তার সঙ্গে নোঙরের মতো আটকে আটকে চলে। হঠাৎ আক্রান্ত হলে এই সুতো ধরেই সে ঝুলে পড়ে। আবার অন্য একরকমের সুতো দিয়ে তৈরি করে জালের বাইরের কাঠামো বা 'ফ্রেম', আর একরকম সুতো দিয়ে মাঝখানের সর্পিলাকার আঠালো অংশ। এত জটিল যে কাণ্ডকারখানা, তাতে রহস্য থাকতেই পারে।

আমেরিকার স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ক্যাথেরিন ক্রেগ আর ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যারি বার্নার্ড মাকড়সাদের এতরকম জালের সুতোর রহস্য বোঝার চেষ্টা করছিলেন, করতে-করতে নিজেরাও জড়িয়ে গেলেন রহস্যের জালে।

ক্রেগ আর বার্নার্ড পরীক্ষা করেছিলেন যাকে নিয়ে, সেটি মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতি *নেফিলা ক্ল্যাভিপেস*। বহুদূর থেকে চোখে পড়ে এইসব মাকড়সার জাল। কারণ সেগুলো যেমন অতিকায়, তেমনই উজ্জ্বল হলুদ এদের রং।

কেন হলুদ ? রহস্যের শুরু এইখান থেকে। এটা জানি, জাল তৈরির সময় এই মাকড়সারা তাদের শরীর থেকে একটা হলুদ রং বের করে সুতোর গায়ে লাগিয়ে দেয়। কিন্তু কেন ?

এর উত্তরটা বিজ্ঞানীরা বের করলেন। শুনলে উলটো মনে হবে, কিন্তু সত্যিই হলুদ জালের উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে পোকামাকড়ের নজরে পড়া। পতঙ্গদের চোখে এই জাল অবশ্য তখন জাল নয়, হলুদ ফুলের গুচ্ছ।

জাল কীভাবে ফুল মনে হতে পারে, তা অনেকের কাছেই খুব বিস্ময়ের।

আসলে, আমাদের আর পতঙ্গদের দৃষ্টিতে দেখা পৃথিবী হুবহু একরকম নয়।

আমাদের মতো সূক্ষ্ম নজর পতঙ্গদের নেই। ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে দেখলে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় না, শুধু এক-একরকম রঙের ছোপ দেখে আন্দাজ করে নেওয়া যায় মোটামুটি কোনটি কী বস্তু, পতঙ্গদের চোখেও দৃশ্যগুলো অনেকটা ওরকম। তাই দূর থেকে দেখা হলুদ জাল তাদের সাবধান করে না, বরং মধুর আশা জাগায়, আকর্ষণ করে।

ভাবতে অবাক লাগে মাকড়সাদের কি এতই বুদ্ধি আছে যে, তারা পতঙ্গদের ঝাপসা দৃষ্টি কাজে লাগিয়ে জালের রং বেছে নেবে ?

না, সত্যিই কোনও বুদ্ধি নেই মাকড়সাদের। কিন্তু কয়েক কোটি বছর পাশাপাশি বেঁচে থাকা পতঙ্গ আর মাকড়সাদের স্বভাব এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যা একমাত্র অতি বুদ্ধিমান কারও পক্ষে মাথা খাটিয়ে বের করা সম্ভব।

ক্রেগ আর বার্নার্ডের মনে প্রশ্ন জাগল, পতঙ্গরা তো হলুদের চেয়েও নীল বা বেগুনি ফুলের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। তবে মাকড়সাদের এই জাল কেন কেবলই হলুদ ? কেন বেগুনি নয় ? দেখা যাক, বেগুনি হলে পতঙ্গদের মধ্যে কেমন সাড়া জাগে ? যেমন ভাবা তেমনই কাজ। হলুদ, সবুজ, বেগুনি-নীল, সাদা নানারকম রঙে জালগুলোকে রাঙিয়ে দিলেন তাঁরা। এবার দেখতে থাকলেন, পতঙ্গরা কোন রঙের জালে কেমন সংখ্যায় আটকায়।

অবাক কাণ্ড ! সত্যি-সত্যিই বেগুনি জালে বেশি-বেশি পোকা পড়ছে। তবে কি মাকড়সারা পতঙ্গদের স্বভাব এখনও তেমন করে কাজে লাগাতে শেখেনি ? কিন্তু দেখা গেল বেগুনি জালের একটা বিপত্তি আছে। যেসব পতঙ্গ একবার বেগুনি জালে আটকেও পালিয়ে যেতে পারে, তারা পরের বার থেকে সতর্কভাবে ওই জাল এড়িয়ে চলে। এটা ওঁরা দেখেছিলেন একঝাঁক হুলবিহীন মৌমাছির বাসার কাছাকাছি বেগুনি জাল রেখে। *নেফিলা ক্ল্যাভিপেস*-এর অন্যতম প্রধান শিকার এই মৌমাছিরা। পরীক্ষা শুরু করার আগে থেকেই মৌমাছির বাসা থেকে অল্প দূরে একটা পাত্রে চিনির রস রেখে দিয়েছিলেন তাঁরা। একসময় মৌমাছিরা যখন ওই রস খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন ওই রসের পাত্র আর মৌমাছিদের বাসার মাঝামাঝি এমন একজায়গায় বেগুনি জাল পেতে দিলেন বিজ্ঞানীরা যে, সেটা এড়িয়ে যাওয়া আর সহজ রইল না। ফলে চিনির রস খেতে গিয়ে বারবার ধরা পড়ছিল মৌমাছিরা। কিন্তু তাতে বিপদ কিছু ছিল না, কারণ পরীক্ষার সময় জালের মালিককে তাঁরা জাল থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে মৌমাছিরা প্রথমে আটকে গেলেও একটু ধস্তাধস্তি করে জাল ছিঁড়ে পালাতে পারছিল। এদের গায়ে এক-একরকম রঙের চিহ্ন লাগিয়ে চিনে রেখেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাই বুঝতে পারলেন, একবার জালে আটকে ছাড়া পেলে পরে আর ওমুখো হচ্ছে না তারা, মনে রাখতে পারছে বেগুনি রঙের সঙ্গে বিপদের সম্পর্ক। অর্থাৎ, বেগুনি রঙের সঙ্গে এরা যত সহজে মধুর সম্পর্ক মনে রাখে, বিপদের সম্পর্কও আঁচ করে তেমন সহজেই। অথচ হলুদ রঙের জালের বেলায় তাদের শেখাটা তেমন ভাল হয় না। একবার ধরা পড়ে রেহাই পেলেও ঘুরেফিরে ভুল করে তারা হলুদ জালের দিকে ধেয়ে আসে। বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত ! বেগুনি জাল বেশি আকর্ষণ করলেও যে হলুদ জালেই বেশি লাভ, এটা মাকড়সাদের জানা হয়ে গেছে !

তাঁদের এমনই বিস্মিত করেছিল আরও একটা মাকড়সা— *আরজিয়োপি আরজেনটাটা*। প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এই ধরনের মাকড়সাদের নাম দিয়েছিলেন বাগান-মাকড়সা। *আরজিয়োপি পালচেল্লা* বা *আরজিয়োপি অ্যানিসুজা* এই দুটি প্রজাতিকে হামেশাই এ-দেশে মফস্বলের বাগানে কি গ্রামে পথের ধারে চোখে পড়ে। পেটের ওপর হলদে আর কালচে-খয়েরি রঙের ডোরাকাটা এই মাকড়সারাও চক্রাকার জাল তৈরি করে। কিন্তু তা নেফিলার জালের মতো হলুদ

নয়, বরং প্রায়-স্বচ্ছ, বর্ণহীন, কাছ থেকেও ঠাহর করা মুশকিল। তার বদলে চোখ টানে জালে লাগানো একটা সাদা নকশা, ঘন সাদা সুতোর এলোমেলো বুনন। মাকড়সাটা বসে জালের ঠিক মাঝখানে। মাথা নীচের দিকে করে। আটটা পা, দুটো-দুটো করে জোড়া করে চারকোণে ছড়ানো। আর প্রতি জোড়া পায়ের ডগার থেকে বাইরের দিকে টানা থাকে ইঞ্চিদুয়েক লম্বা ওই এলোমেলো সুতোর আলপনা। যেন সাদা একটা এক্স। যার মাঝামাঝি কিছুটা দাগ মুছে গেছে।

এখানেও রহস্য। কেন এই আলপনা? বহুদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা চলেছে এর কারণ নিয়ে। গোড়ায় মনে করা হত এগুলো জালটাকে শক্ত করছে, পতঙ্গের ঝটাপটিতে যাতে ছিঁড়ে না যায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছিলেন 'স্ট্যাবিলিমেন্টাম'। কিন্তু পরে সে মত টেকেনি। কেউ-কেউ বললেন এগুলো তৈরি হয়েছে পাখিদের নজরে পড়ার জন্য। তার কারণ পাখিরা ঝোপেঝাড়ে উড়তে-উড়তে প্রায়ই ছিঁড়ে ফেলে মাকড়সার জাল। তাতে নিজেদেরও অস্বস্তি, আঠালো সুতো গায়ে জড়িয়ে ঘুরতে কার ভাল লাগে? আর মাকড়সাদেরও এতে ক্ষতি। তাই দূর থেকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য এই চিহ্ন। এই ধারণাও শেষপর্যন্ত টেকেনি। তা হলে?

ক্রেগ আর বার্নার্ড বুঝেছিলেন, পাখিদের নয়, এগুলো বানানো হয়েছে খোদ পতঙ্গদের দৃষ্টি ফেরানোর জন্যই। আমাদের তুলনায় পতঙ্গদের দৃষ্টি ঝাপসা হলে কী হবে, তারা এমন অনেক কিছু দেখতে পায়, যা আবার আমরা পাই না। আমাদের চোখে অদৃশ্য অতিবেগুনি আলোয় দেখার ক্ষমতা আছে বহু পতঙ্গের। মৌমাছিরা তাদের অন্যতম। ক্রেগ আর বার্নার্ড পরীক্ষা করে দেখলেন *আরজিয়োপি* -র জালের এই নকশা থেকে অতিবেগুনি আলোর প্রচুর প্রতিফলন হয়। অতিবেগুনি আলোর অর্থ পতঙ্গদের কাছে অনেকরকম। তার একটার সঙ্গে আছে ফুলের সম্পর্ক। ফুলের কাছে পতঙ্গদের কদর আছে। ফুল চায় মধুর লোভ দেখিয়ে পতঙ্গদের টেনে আনতে, তারপর তাদের মারফত ফুলের রেণু অন্য ফুলের কাছে পাঠিয়ে দিতে। এজন্যই ফুলের পাপড়ি অমন রঙিন, তাতে অমন সুগন্ধ। ফুলের কোথায় মধু আছে, এটা বোঝানোর জন্য মাঝে-মাঝে পাপড়ির ওপর টানা-টানা দাগ মধুভাণ্ডারের দিকে বাড়ানো থাকে। এই দাগ আমাদের চোখে যদি না-ও পড়ে, পতঙ্গদের চোখে পড়বেই, কারণ, অন্য রঙের সঙ্গে এখান থেকে অতিবেগুনির প্রতিফলন হয় প্রচুর পরিমাণে। রাস্তায় দেওয়া নিশানার মতো পতঙ্গরা ওই দাগ ধরে এগিয়ে যায় মধুর দিকে।

বিজ্ঞানী দু'জনের মন্তব্য, বাগান-মাকড়সার জালের নকশা ওই ফুলের নকশার নকল। হুবহু এক আলপনা হয়তো নয়, কিন্তু পতঙ্গরা ঝাপসা দৃষ্টিতে সে-দুটোয় ফারাক করতে পারে না, ফুলের মধুর খোঁজে এগিয়ে চলে জালের মাঝখানে, যেখানে মাকড়সা স্বয়ং বসে আছে।

নেফিলা মাকড়সার হলুদ জাল পতঙ্গ আকর্ষণ করে

এখানেই শেষ নয়। ক্রেগ আর বার্নার্ড এবারেও জাল থেকে মাকড়সাটা সরিয়ে ফেলে দেখতে চাইলেন মৌমাছিরা এই নকশার সঙ্গে বিপদের সম্পর্ক মনে রাখতে পারে কি না। হ্যাঁ, পারে। একবার ধরা পড়লে দ্বিতীয়বার ওমুখো হয় খুব কম মৌমাছিই। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ পরে মাত্র অল্প ক'টি মৌমাছি জালে ধরা পড়তে থাকল। তা হলে মাকড়সার চলে কী করে?

বিজ্ঞানীরা এবার নকশাটা পালটে পালটে দিলেন। অন্য জাল থেকে একটা নকশা কেটে এনে উলটো করে বসালেন। কখনও চারকোণে চারটের বদলে মাত্র একটা বা দুটো নকশা রাখলেন জালে। ব্যস, আবার বেশি-বেশি মৌমাছি জালে জড়াতে থাকল। তাঁরা বলছেন, প্রকৃতিতে মাকড়সারাও এরকমই করে। প্রায় প্রতিদিনই তারা জালটা নতুন করে তৈরি করে। আর প্রতিবার নকশাটা পালটে দেয়। কখনও মাত্র একটা টানা থাকে, কখনও দুটো বা তিনটে। কোনও দিন পুরো চারটে টানা থাকে, কোনও দিন একটাও না। এতদিন যারা ওই মাকড়সার জাল লক্ষ করেছে, তাদের মনে হয়েছে, এটা বুঝি মাকড়সার ভুল, অথবা কোনও কারণে ছিঁড়ে গেছে বুঝি নকশাটা। কিন্তু আসলে এ হল মাকড়সার হিসেব-করা কাজ।

কারুকাজ-করা নানা নকশাদার জাল তৈরি করে আরও অনেকরকম মাকড়সা, *সাইক্লোসা* যেমন। কারও-কারও আলপনা চোখভরে দেখার মতো। এর প্রত্যেকটিই কি ফুলের নকল? অতিবেগুনি আলোর ঝলক পতঙ্গদের কাছে সবসময় ফুলের নকশাই বোঝায় না, কখনও তা ঘন জঙ্গলের একটা ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া আলোভরা আকাশ। ফুলের দিকে যেমন এগোয় পতঙ্গরা, আকাশ মনে করে মুক্ত হাওয়ার দিকেও উড়ে যেতে চায়। হতে পারে এই এতরকম জালের নকশার কয়েকটিকে অতিবেগুনি আলো-ঠিকরনো মুক্ত আকাশ মনে করে এগিয়ে আসে পতঙ্গরা। খোলা আকাশের বদলে তাদের জন্য তখন অপেক্ষায় থাকে আঠালো জাল আর তার পেছনে বিষাক্ত দাড়া।

ফোটো : লেখক

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

সম্পূর্ণ উপন্যাস

একটি অভিশপ্ত পুঁথি ও অষ্টধাতু

বিমল কর

পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, গলায় চাদর, মাথার চুল যত্ন করে আঁচড়ানো—কিকিরার এমন বাহারি বেশবাস তারাপদ বিশেষ দেখেনি। মামুলি প্যান্ট, বেখাপ্পা জামা, ঢলঢলে কোট বা একটা জোব্বা চাপিয়েই এই মানুষটি সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ান। সাজপোশাকে তাঁর মতি নেই কোনওদিনই। সেই কিকিরাকে হঠাৎ ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর-শোভিত দেখে তারাপদর মজা লাগল, অবাকও হল।

তারাপদ বলল, "এ কী সার, এক্কেবারে বাবু-ড্রেস!" বলে হাসল।

কিকিরা চোখ বেঁকিয়ে বললেন, "দাঁড়াও, এখনও বাকি আছে। হাতে ছড়ি, চোখে চশমা।"

"বাঃ! তা একটু আতর বা সেন্ট হবে না? চুলে একটু কলপ করে নিলেও পারতেন। পাকা চুলগুলো বেশ চোখে পড়ছে।"
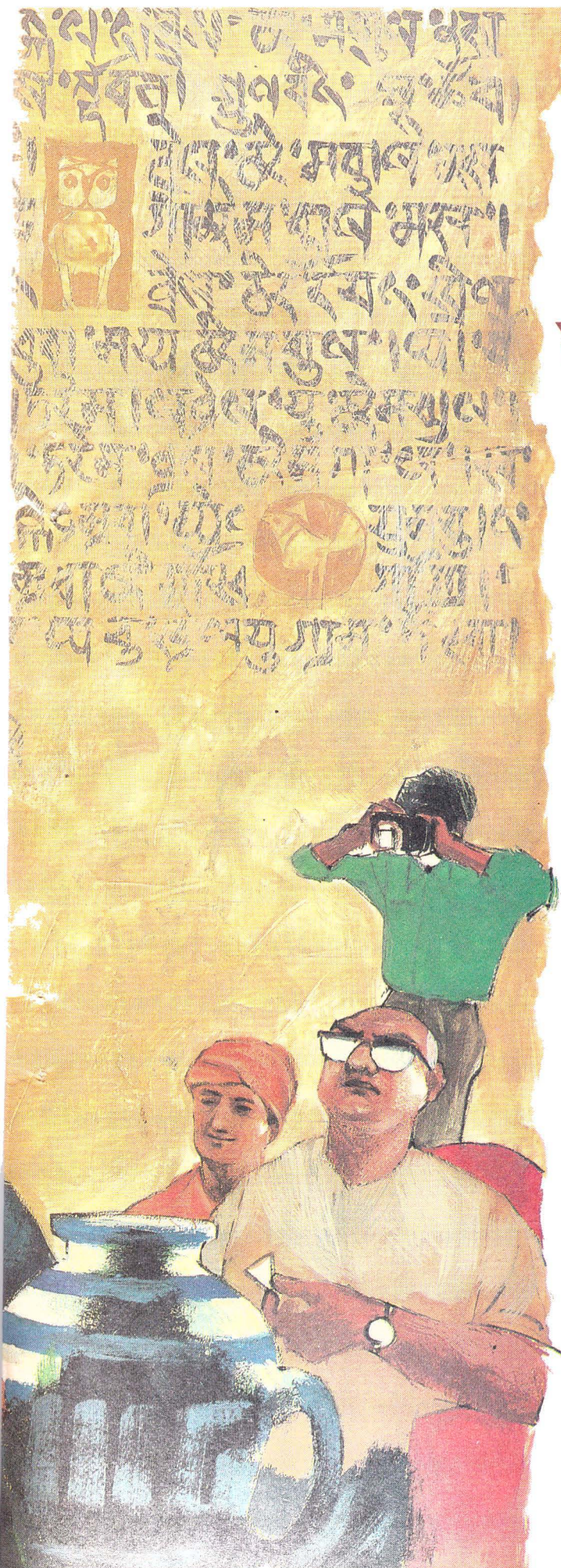
কিকিরা তাঁর লম্বা-লম্বা বাবরি ধরনের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "শ্যাম্পু করা চুল হে তারাবাবু, একটু-আধটু উড়বেই, পাকাগুলো আরও পাকামি করবে, তা বলে কলপ ! রামশ্চ ! চুল পাকবে, সাদা হবে—এটাই রেওয়াজ, নেচারকে মান্য করতে হয় তারাবাবু। তা ছাড়া পাকা চুলের একটা মহিমা আছে।"

"মহিমা !"

"অবশ্যই। আমাদের দেশের মুনিঋষিরা ছেলেবেলা থেকেই চুল দাড়ি গোঁফ পাকিয়ে নিতেন। বশিষ্ঠমুনি, পরাশর..."

"সার, বশিষ্ঠ থাক ; বশিষ্ঠকে আপনিও দেখেননি, আমিও দেখিনি। আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো ? হঠাৎ এই ড্রেস ?"

"এই আবার কী ! পিওর বেঙ্গলি ড্রেস !"

"চাঁদু হলে বলত, বঙ্গবাসী সংস্করণ।" তারাপদ মজা করে বলল, বলে হেসে ফেলল। "কোথাও যাচ্ছেন নাকি ! বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন !"

"নেমন্তন্ন ঠিকই, তবে বিয়েবাড়ির নয়।"

"তা হলে !"

"নৃপতিনারায়ণ দত্তর বাড়িতে নেমন্তন্ন, ঘরোয়া ভোজন।"

"ঘরোয়া ভোজন বলছেন, তা হলে বিয়েবাড়ির সাজ কেন ?"

"যস্মিন দেশে যদাচারঃ।"

"মানে ?"

"দত্তমশাই নিজে খানদানি বাঙালি। মানে অভিজাত বাঙালি বলতে যা বোঝায়। ওঁর এসব পোশাকই পছন্দ। বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছেন যখন, তখন তোমাকে খাঁটি বাঙালি-বেশেই যেতে হবে। অবশ্য গলার চাদর কাঁধে রাখলেও ক্ষতি নেই।" বলে কিকিরা হাসলেন।

তারাপদর সন্দেহ হল। কিকিরা আসল কথাটা চেপে যাচ্ছেন। বলল, "এই নৃপতিনারায়ণ দত্ত মশাইটি কে ? কোথায় থাকেন ?"

কিকিরা তাঁর ঘরের একপাশে রাখা সাবেকি দেরাজের ড্রয়ার খুলে একটা ছোট বাক্স বার করলেন। তার মধ্যে হরেকরকম চশমা, আট-দশটা তো হবেই। চশমা তিনি এমনিতে পরেন না, তবে শখ করে কিনে রেখেছেন, বেশিরভাগই সেকেলে ঢঙের। এগুলো তাঁর জাদুকর জীবনের স্মৃতিচিহ্নও বলা যায়।

চশমা বাছতে-বাছতে কিকিরা বললেন, "তুমি কি ফ্যামিলি হিস্ট্রি জানতে চাইছ ? তা হলে শোনো, এই দত্তরা হলেন আদিতে হুগলির লোক। কলকাতায় বসবাস—তা শ'দেড়েক বছর তো হবেই। কাশীপুরে পেল্লায় বাড়ি, হাওড়ার দিকে রোলিং মিল, পাট-অপাটের ব্যবসা, দু'পুরুষ দিব্যি চলেছিল। তারপর শরিকি ঝগড়া, ভাগ বাঁটোয়ারার পর যে যার অংশ নিয়ে এক-একজন এক এক জায়গায় থিতু হল। নৃপতিনারায়ণ দত্ত বেহালার দিকে জমি বাড়ি কিনে বসে পড়লেন। তখন তাঁর বয়েস চল্লিশের ঘরে। এখন দত্তমশাই সেভেনটির ঘর ছুঁয়েছেন। ওঁর পেশা ছিল ওকালতি। সেটা বেশিদিন করেননি। পুরনো ঘরবাড়ি জমিজায়গা বেচাকেনার একটা ফার্ম ছিল। যাকে বলে প্রপার্টি ডিলার্স। ওটাই দেখাশোনা করতেন। এখন আর করেন না।"

"বড়লোক মানুষ !"

"তা বলতে পারো। আজকালকার হিসেবে হাফ-মাঝারি বড়লোক, বা তার এক-দু' ডিগ্রি নীচে।"

"জমানো পয়সায় দিন চলে !"

"বোধ হয়। তবে ফার্মটা আছে। নিজের সন্তানাদি নেই। এক পোষ্য নিয়েছিলেন দত্তমশাই। সে-ই ফার্ম দেখে।"

"আর উনি ?"

"উনি কিছু করেন না। করার মধ্যে গল্পগুজব, বাগান, ফুলের টব নাড়াচাড়া, কাগজ, বইপত্র পড়া, আর হপ্তা-দু'হপ্তা অন্তর চেনাজানা লোকজন ডেকে চর্ব্যচোষ্য খাওয়ানো।"

"মাথায় কোনওরকম গোলমাল... ?" তারাপদ ঠাট্টা করে বলল।

"বিন্দুমাত্র নয়," কিকিরা একটা চশমা বেছে নিয়ে পরতে-পরতে বললেন। চশমাটা পুরনো ধরনের, গোল কাচের। "পাগল হলে আর নৃপতি দত্তকে ক্রিপটোলজিস্ট হতে হত না।"

তারাপদ ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, "কী বললেন কথাটা সার ?"

"ক্রিপটোলজিস্ট !" ভেঙে-ভেঙে টেনে-টেনে বললেন কিকিরা।

"মানে ?"

"মানে—মানেটা বলাই মুশকিল। আমি নিজেই কি বুঝি হে ঠিকমতন। তবে সোজা বাংলায় হল—ইয়ে তোমার ওই সাঙ্কেতিক ভাবে লেখা চিঠিপত্র আঁকাজোকার অর্থ উদ্ধার করার মাস্টার। আরও যদি সহজ করে বুঝতে চাও, তা হলে বলব সাঁটে সাট্যং সমাচারেত—, তুমি যদি সাঁট চালাও আমিও তোমার সাঁটের জবাবে..."

"ডেনজারাস সার," তারাপদ আর কথা শেষ করতে দিল না কিকিরাকে, জোরে হেসে উঠল। বলল, "আপনার আজ হয়েছে কী ! একের পর এক সংস্কৃত ঝাড়ছেন !"

"তেমন আর কী হবে ! সকালে হঠাৎ স্তোত্রপাঠ করেছিলাম। মুড রয়েছে। মুখে এসে গেল !"

"সকালের মুড সন্ধেতেও কন্টিনিউ করছে ! বেশ ! যাক গে, ভদ্রলোক তা হলে পাগল নয় বলছেন !"

"তোমাদের আজকালকার ছেলেদের অনেক দোষ। সাদামাটা ভাল জিনিসকেও ভাল মনে নিতে পারো না। আরে বাবা, এক একজন মানুষের এক-একরকম শখ থাকে, মরজি থাকে। কারও থাকে বেড়াবার শখ, কারও গান-বাজনা শোনার শখ, কেউ বা যত্রতত্র ফোটো তুলে বেড়ায়, কেউ বা কুকুর পোষে। অদ্ভুত শখও কত দেখলাম। চিৎপুরের পঞ্চুবাবুর শখ ছিল মশারির। কমপক্ষে পঞ্চাশ রকম মশারি তাঁর স্টকে থাকত।"

"মশারি ! পঞ্চাশ রকম ! কী বলছেন ! পঞ্চাশ রকম মশাই নেই জগতে তো মশারি !" তারাপদ তামাশার গলায় বলল।

কিকিরা বললেন, "তুমি কিস্যু জানো না। মশা না থাক মশারি থাকতে আপত্তি কোথায় ! সাহেব বাড়িতে—আগেকার দিনে নানান কায়দার মশারি ঝুলত, তার দেখাদেখি কলকাতার বাবুরাও ঘর-মশারি, দরজা-মশারি, জানলা-মশারি, পালকি-মশারি—কত রকম কী বানিয়ে নিলেন। পঞ্চুবাবুর কালেকশানে..."

"বুঝেছি। সোজা কথাটা হল উনি মশারি-পঞ্চু, আর ইনি নেমন্তন্ন-দত্ত, মানে আপনার দত্তমশাই বাড়িতে লোকজন ডেকে খাওয়াতে পছন্দ করেন, এই তো ?"

"হ্যাঁ, তবে আরও একটু আছে তারাবাবু," কিকিরা কথা বলতে বলতে বগলাকে হাঁক মারলেন, তারপর আবার বললেন, "দত্তমশাইয়ের নিজের একটা কিচেন-কাম-ডাইনিং আছে নীচের তলায়। উনি নীচেই থাকেন। বৈঠকখানার গায়ে বাগান ঘেঁষে তাঁর নিজস্ব এক রান্নাঘর, জনা দুয়েক রাঁধুনি। তবে রাঁধুনি বলা চলবে না, বলতে হবে ঠাকুরবাবা। ওরা একেবারে মানিকজোড়। জগাই-মাধাই। দত্তমশাই যখন বাইরের বন্ধুবান্ধব, জানাশোনাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, তখন রান্নার বাজার থেকে শুরু করে, খাওয়ার মেনু, কোনটা কীভাবে রাঁধতে হবে তার একমাত্র কর্তৃত্ব নৃপতিবাবুর নিজের।"

"বাঃ, চমৎকার ! এ সেই অনেকটা সেইরকম, ফোর-ইন-ওয়ান। তা কিকিরাসার, আপনার সঙ্গে এতকাল ঘুরছি, শাগরেদি করছি—কই, আগে তো কখনও নৃপতিনারায়ণ দত্তর নাম শুনিনি।"

"তাতে কী হয়েছে, শোনাবার দরকার হয়নি তাই শোনোনি। আমার জানাশোনা কম নাকি ভাবছ ! পাঁচশো তো বটেই ! তা ছাড়া নৃপতিবাবু আমাকে বর্জন করেছিলেন।"

"বর্জন ! কেন ?"

"সে পুরনো কথা ; কুকিং নিয়ে তক্ক, হিং-এর ইউজ নিয়ে হুজ্জোত। পরে শুনবে।...ও বগলা, চায়ের কী হল ?"

তারাপদ বলল, "চা না হয় থাক। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"না না, চা খেয়েই বেরুবো। দত্তমশাই আবার কথার নড়চড় পছন্দ করেন না। বলেছি, সাড়ে সাতটা নাগাদ যাব, ওই সময়েই হাজির হতে হবে। এখন তো সবে সোয়া ছয়। সন্ধেও জমেনি।"

"আপনার একার নেমন্তন্ন নিশ্চয় নয় ! একটু দেরি হলে..."

"নেমন্তন্ন দশজনের। আমাকে বাদ দাও, থাকল ন'জন। ন'জনের মধ্যে একজন আমার বন্ধু, তিনিই আমার কাছে এসেছিলেন দত্তমশাইয়ের ডাক নিয়ে। বাকি আটজনকে আমি চিনি না। ওর মধ্যে দু'জন নাকি নৃপতি দত্তর কাছ থেকে একটা জিনিস হাতাবার চেষ্টা করছে। জিনিসটা মহামূল্যবান। হাতাতে পারলে হেসেখেলে দু-চার লাখ টাকা কামানো যায়।"

তারাপদর সময় লাগল কথাটা খেয়াল করতে। তারপর অবাক হয়ে বলল, "কী বললেন ! দু-চার লাখ টাকা... !"

বগলা চা নিয়ে এসেছিল। এল খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। ডান হাঁটুতে বাত হয়েছে বগলার। বগলা অন্তত তাই বলে। চন্দন ভাল করে দেখেছে, বগলাকে, বলেছে, "আসল বাত নয়, নকল বাত। পুরনো কোনও চোট—তোমায় একটু কাবু করছে। তুমি পায়ের এক্সারসাইজ করো, গরম লাগাও, সেরে যাবে বগলাদা, অনর্থক ওষুধপত্র খেয়ো না। দরকার হলে আমি তোমায় ওষুধ এনে দেব।"

চা দিয়ে চলে গেল বগলা। দু-একটা কথা হল তারাপদর সঙ্গে।

বগলা চলে গেলে তারাপদ বলল, "কিকিরা, আপনি তা হলে ঠিক দত্তমশাইয়ের নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন না, অন্যরকম মতলব—!"

"আমার আবার কিসের মতলব," কিকিরা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "আই নো নাথিং। নৃপতিবাবু আমায় কয়েক ছত্র চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করেছেন। উনি আমায় বাড়তি একটা কথাও লেখেননি। কথাটা আমি শুনলাম রথীদার কাছে। রথীদা আমার বন্ধু। তিনিই দত্তমশাইয়ের কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে এসেছিলেন।

রথীবাবুকে তারাপদরা দেখেছে। এই বাড়িতেই বার কয়েক। ভদ্রলোক কিকিরার চেয়ে বয়েসে খানিকটা বড়। চেহারাখানা খাসা। উনি নাকি একসময়ে কলকাতার পাবলিক থিয়েটারে অভিনয়ও করেছেন। শখ করেই। নামের পর ব্র্যাকেটে লেখা থাকত—'এ', মানে অ্যামেচার। অভিনয় ওঁর নেশা ছিল, পেশা নয়। পেশায় ভদ্রলোক সরকারি কর্মচারী ছিলেন। বড় কাজই করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। বড় পরিবারের মানুষ। কথাবার্তা বলেন চমৎকার, হাসিখুশি মেজাজে।

তারাপদ বলল, "কিকিরা, আপনি সার রহস্য-রহস্য গন্ধ শুঁকিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। আসল কথা বলছেন না।"

"আমি নিজেই জানি না, তোমায় কী বলব ?"

"আমরা আপনার কেটিসি এজেন্সির পার্টনার..." তারাপদ ঠাট্টা করে বলল।

"হাজারবার," কিকিরাও মজা করে মাথা নাড়লেন। "দাঁড়াও আজ আগে যাই। রথীদার কথা শুনে মনে হল, নেমন্তন্নর ব্যাপারটা ছক করা, যে আটজন অতিথি আজ টেবিলে খেতে বসবেন তার মধ্যে সেই দু'জন আছেন যাঁরা নৃপতিবাবুর চোখে সন্দেহজনক ব্যক্তি। কিন্তু কোন দু'জন, তিনি বলতে পারবেন না।"

"আশ্চর্য ! আটজনের মধ্যে সন্দেহ করছেন দু'জনকে, অথচ বলতে পারবেন না ! এ কেমন করে হয় !"

"কেন হবে না ! আটজনই বোধ হয় সন্দেহজনক, কিন্তু ঠিকঠাক কাউকেই সন্দেহ করা যাচ্ছে না।"

তারাপদর চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। ঘড়িতে প্রায় সাতটা হতে চলল। ফাল্গুন মাস। কলকাতায় গরম পড়তে শুরু করেছে দোলের পর থেকেই। আজকাল আলো ফুরোতেও দেরি হয়, সন্ধে নামতে-নামতে সাড়ে ছয় পৌনে সাত।

কিকিরারও চা খাওয়া শেষ।

"উঠবেন তো ?"

"হ্যাঁ। চলো।"

"চলুন।...আমি আর খানিকটা পরে এলে আপনাকে বাড়িতে পেতাম না।"

"তোমার তো আজ আসার কথা নয়... !"

"চলে এলাম। অফিসের এক কোলিগ হুট করে মারা গেল। মনটা খারাপ। ভাল লাগছিল না। চাঁদুও কলকাতায় নেই। কোথায় নাকি মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে গিয়েছে। আসছে হপ্তায় ফিরবে।"

কিকিরা উঠে পড়েছিলেন। একটা ছড়িও নিলেন সত্যি-সত্যি, বাবুছড়ি। টাকাপয়সার ব্যাগটা পকেটে পুরলেন। "চলো। কেমন দেখাচ্ছে আমায় তারা।"

"ফাইন ! বাবু কিঙ্করকিশোর রায়।" তারাপদ হাসতে লাগল।

"নামটা পালটেও যেতে পারে !"

"মানে ?"

"মানে, নৃপতিবাবু যদি খাওয়ার টেবিলে আমার নামটা পালটে দিয়ে বলেন, ইন্দুভূষণ সেন—তা হলেও বলার কিছু নেই।"

ঘরের বাইরে আসতে-আসতে তারাপদ বলল, "উনি আবার মানুষের নামও পালটান নাকি ?"

"না, তা বলছি না। নাম নিয়ে মজা করাটাও ওঁর স্বভাব। যাকে যেমন মনে হয় একটা নাম দিয়ে দেন। তবে এ-ক্ষেত্রে যদি খেয়াল হয়, ওই অষ্টধাতুর কাছ থেকে আমাকে আড়ালে রাখবেন, তবে পালটাতেও পারেন। যেমন ধরো—তোমার—"

তারাপদ কথা শেষ করতে দিল না কিকিরাকে। তার মজা লেগেছিল ; বলল, "অষ্টধাতু ! বাঃ, নামটা তো দারুণ দিয়েছেন। ওই আটজন সাসপেক্টকে আপনি একেবারে ধাতু করে ফেলেছেন !"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন কিকিরা। সাবধানেই। ধুতি পরে কোঁচা লুটিয়ে হাঁটার মতন সিঁড়ি এটা নয়, তার ওপর বাতি জ্বলে না অর্ধেক দিন সিঁড়ির, অসাবধান হলে কোঁচার বাহারে পা জড়িয়ে পড়ে যেতে পারেন।

নীচে নেমে তারাপদ বলল, "ট্যাক্সি নেবেন নাকি ?"

"নিতে তো হবেই। এখন একটা বনেদি-চাল না থাকলে চলে ! কোথায় যাচ্ছি দেখবে তো !"

"আমায় তা হলে কোথাও নামিয়ে দেবেন..."

"দেব। কাল তোমার কী কাজ ?"

"এমনিতে আলাদা কোনও কাজ নেই। একটা সিনেমা দেখতে যাব ভাবছিলাম ; চাঁদু নেই, একলা যেতে ইচ্ছেও করে না— !"

"তবে কাল-পরশু একবার চলে এসো। তখন তোমায় খানিকটা বলতে পারব। আজ আমি নিজেই অন্ধকারে, তোমায় আলো দেখাতে পারছি না।"

খানিকটা এগিয়ে এসে ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ট্যাক্সিতে উঠে কিকিরা বললেন, "বেহালা।"

তারাপদ অল্পসময় চুপ করে থেকে বলল, "অষ্টধাতু কী-কী ধাতু সার ?"

কিকিরা যেন ধন্দে পড়ে গেলেন। অষ্টধাতু যে কী তা তিনিও জানেন না, মুখে একটা লাগসই কথা এসেছিল, বলে ফেলেছিলেন। কিন্তু হার মানার কোনও মানে হয় না। কিকিরা হেসে-হেসে বললেন, "আরে, অষ্টধাতু আবার কী, আট-আটটা ধাতু। অষ্টধাতুর মূর্তি জানো না ? অষ্টধাতুর আংটিও হয় শুনেছি। সোনা, রুপো, তামা, সিসে, লোহা আর ওই ইয়ে ইয়ে—।"

তারাপদ হেসে ফেলল, "ক'টা ইয়ে ?"

"দু-তিনটে হবে," কিকিরাও হাসতে লাগলেন।

তারাপদ শেষে বলল, "আপনি মচকাবেন তবু ভাঙবেন না !"

"ভাঙলে যে খেলাই খতম।...দাও, তোমার সিগারেট দাও একটা।"

তারাপদ পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করে দিল কিকিরাকে।

॥ ২ ॥

নৃপতিনারায়ণ তাঁর বৈঠকখানা ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন।

এই ঘরটির সামান্য বর্ণনা দেওয়া দরকার। রীতিমতন লম্বাটে ঘর, বড়-বড় দরজা-জানলা, সেকেলে বাড়ির ছাঁদ মতনই উঁচু ছাদ, লোহার কড়ি বরগা, জানলায় খড়িখড়ি আর ভাঁজকরা কাচের পাল্লা। আসবাবপত্র সবই পুরনো ধরনের প্রায়, ভারী আর অ-পলকা। মোটা-মোটা সোফাসেটির চেহারাগুলো খানিকটা রাজকীয়, গোটা দুয়েক সিঙ্গাপুরি বেতের বাহারি চেয়ার, একপাশে ফরাসও। আলমারি, ছোট দেরাজ, পাথরঢাকা টেবিল, দেওয়াল-আয়না, বাঁধানো ছবি, হরিণের শিং—যেখানে যেমনটি থাকার তেমনই আছে। আছে মস্ত ঘড়ি, ছোট দেরাজের মাথায় রাখা। টেলিফোন। বৈঠকখানা যথেষ্ট লম্বা বলে দু' প্রান্তে দুটি পাখা।

বৈঠকখানার পশ্চিম দিকের দরজা হাট করা। দরজার বাইরে সরু মতন ঢাকা বারান্দা, করিডোর বলতে যেমন বোঝায় ; তার পরই নৃপতিনারায়ণের শখের রান্না আর খাওয়ার ঘর। এটিকে তাঁর অতিথি আপ্যায়নের ঘর বলা যায়। অন্য সময় তাঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয় সংসারের নিয়ম মেনে। নীচের খাওয়ার ঘর বাঁ দিকে,ডান দিকে রান্নাঘর। এই দুটো ঘরই বৈঠকখানা থেকে খানিকটা চোখে পড়ে। ওদিকের ঘর, বারান্দা এমনভাবে তৈরি মনে হয় ওগুলো যেন আউট হাউস ধরনের। রান্না আর খাওয়ার ঘরের পাশে পেছনে বাগান। সজ্জি বাগান। বাগান অবশ্য অনেকটাই, পেছনদিকে বড়-বড় ক'টা গাছ, একটা ডোবা, তারপর পাঁচিল।

বাড়ির এই পাশটায়, নীচের তলায় নৃপতিনারায়ণ থাকেন। তাঁর শোওয়া, বসা, মায় মামুলি এক অফিসঘরও এইদিকটায়। অন্যপাশে দোতলার সিঁড়ি, দোতলায় পরিবারের লোকজন থাকে। সংখ্যায় চার-পাঁচজন তো অবশ্যই। বাড়ির কাজকর্মের লোকও তো আছে। তেতলায় দুটি মাত্র ঘর, বাকিটা খোলা ছাদ।

নৃপতিনারায়ণ একপাশে বসে ছিলেন বৈঠকখানায়। পেছনে কাচের জানলা। তিনি এমনভাবে বসে ছিলেন যাতে তাঁর চোখ থাকে করিডোরে। হাঁকডাক করতে পারেন তাঁর জগাই মাধাইকে।

কিকিরা ঘরে ঢুকতেই নৃপতিনারায়ণের নজরে পড়ল। তিনি অবশ্য মাঝ দরজা দিয়ে বৈঠকখানায় এসেছেন।

"এই যে কিঙ্কর, এসো—।"

কিকিরা কাছে এলেন। দেখলেন নৃপতিনারায়ণকে। আর্ম চেয়ারে বসে আছেন উনি, পরনে পাতলা ধুতি, গায়ে হাফ-হাতা

পাঞ্জাবি, হাতে লাঠি। শরীর-স্বাস্থ্য খানিকটা ভাঙা-ভাঙা। কিকিরা অনেকদিন পর নৃপতিনারায়ণকে দেখছেন।

"কেমন আছেন আপনি?" কিকিরা বললেন। "কোমরের ব্যথাটা— !"

"কেমন দেখছ! আরও বুড়ো হয়ে গিয়েছি?...তা হয়েছি। সেই যে গত বছর পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভাঙল—তিন-চার মাস বিছানায়, তখন থেকেই কাবু হয়ে পড়লাম। প্রেশার গণ্ডগোল করতে লাগল, ঘুম হত না ভাল, খুচখাচ লেগেই ছিল। আগের মতন..."

"আপনি তো কলকাতায় ছিলেন না অনেকদিন।"

"মাস ছয়েক। শরীর সারাব বলে হাওয়া বদল করেছিলাম। তুমি বসো, এখানেই বসো," নৃপতিনারায়ণ বললেন। "কোমর নিয়ে ভোগভোগান্তি শেষ হওয়ার পর গেলাম দেওঘর। সেখানে আমাদের আসা-যাওয়া ছিল এক সময়। মাস দুই দেওঘরে কাটিয়ে এলাম মধুপুর। মাস চারেক ছিলাম। তারপর নিজের জায়গা!"

"শরীর সারল?"

"চলনসই হল।...তোমার খবর বলো? কেমন আছ?"

"ভালই। চলে যাচ্ছে।"

"কী খাবে? চা, না, শরবত?"

"যা হোক..."

নৃপতিনারায়ণের হাতের সামনে ঘণ্টি ছিল। পুজোর ঘণ্টির মতন। নাড়তে লাগলেন।

কিকিরা হেসে বললেন, "এটা আপনি ভাল করেছেন। ওল্ড স্টাইল। আবার অফিস-ঘণ্টির চেয়েও এই ঘণ্টি নাড়ার শব্দটাই অন্যরকম। লোড শেডিংয়েরও ঝামেলা নেই।"

রান্নাঘরের দিক থেকে এল একজন। মাধাই। আসলে মথুরা।

"শরবত দাও। ঠাণ্ডা।"

মাধাই চলে গেল শরবত তৈরি করে আনতে।

কিকিরা বললেন, "আমি আপনার খোঁজ রাখি। এদিকে এসেওছিলাম দু-একবার। আপনি ছিলেন না। তখন বোধ হয় মধুপুরে ছিলেন।"

নৃপতিনারায়ণ পান খান। হাতের পাশেই পানের ডিবে। পান নিতে-নিতে বললেন, "রথী তোমায় কিছু বলেছে?"

"না। সেরকম কিছু নয়। শুনলাম, আপনি ডাকছেন। জরুরি কাজও আছে।"

"আমি তোমায় একটু আগে-আগে আসতে বলেছিলাম," নৃপতিনারায়ণ মুখে পান দিলেন, "রথীও হয়তো এসে পড়বে এখনই। অন্যদের সাড়ে আটটা নাগাদ আসার কথা। এখন ক'টা বাজল? সাড়ে সাত হয়ে গিয়েছে?"

"সবেই হল!"

"আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি কেন, পরে বলছি। তার আগে বলো, তোমার হাতে কাজকর্ম কেমন? কী করছ এখন!"

কিকিরা হেসে বললেন, "বেকার বসে আছি। মাঝে-মাঝে দু-একজনকে নতুন খেলাটেলার যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়ে দিই।"

"রথী বলছিল, তুমি নাকি আজকাল চোর-ছ্যাঁচড় ধরে বেড়াচ্ছ!" বলে নৃপতি নিজেই একটু হাসলেন। কিকিরার খবরাখবর তিনি রাখেন মোটামুটি, সব যে জানেন তা নয়। জানার কথাও নয়। দেখাসাক্ষাৎ কমই হয়। তবু কিকিরাকে তিনি পছন্দ করেন। আবার কখনও-কখনও রাগারাগিও করেন। নৃপতিনারায়ণের বরাবরই ধারণা, কিকিরার উদ্যম-উদ্যোগ কম, উদ্যম থাকলে কিছু হয়তো হত মানুষটার!

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "আজ আমার এখানে কারা-কারা আসছে জানো?"

"না। রথীদা বলছিলেন, আপনি আরও অনেককে নেমন্তন্ন করেছেন।"

"হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনকে বাদ দিলে আরও আটজনকে।"

শরবত এল।

কিকিরা শরবত নিলেন। মাধাই চলে গেল।

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "ওই আটজন সম্পর্কে তোমায় আগে একটু বলে রাখি। সব হয়তো বলার সময় হবে না আজ। পরে বলব। আজ শুধু ওদের চোখে দেখে নাও। আটজনের মধ্যে পাঁচজন বাঙালি, তিনজন অবাঙালি। অবাঙালি হলেও দু-তিন পুরুষ এদিকেই মানুষ, ব্যবসাপত্র, কাজকর্ম নিয়ে থাকে, তাদের বাংলা বলতে-কইতে কোনও অসুবিধে হয় না।"

কিকিরা শরবত খেতে-খেতে মন দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলো। নৃপতিনারায়ণকেও দেখছিলেন। সত্তর বছর বয়েস হলেও মুখের চেহারা একেবারে ভাঙা নয়। আগের চেয়ে খানিকটা ক্লান্ত ও শুকনো দেখায়। পরিষ্কার ধাঁচ মুখের, মাথার চুল যা আছে সবই সাদা, লম্বা নাক আরও পাতলা হয়েছে যেন, চোখের দৃষ্টি চকচকে। আভিজাত্যের একটা ছাপ বেশ স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে নৃপতিনারায়ণের চেহারায়।

উনি বললেন, "পাঁচজন বাঙালির মধ্যে একজনের নাম তুমি শুনে থাকতে পারো। একসময় শিকারি হিসেবে খুব নাম করেছিল, ছবিটবি বেরুত কাগজে, একটা-দুটো বইও লিখেছে, বাঘ শিকার নিয়ে, ধূর্জটিপ্রসাদ সিংহ। নিজেকে ও সিন্‌হা বলে। নাম শুনেছ?"

কিকিরা ভাল মনে করতে পারলেন না, তবে শোনা-শোনা লাগল নামটা।

"ধূর্জটির বয়েস বাষট্টি-চৌষট্টি হবে। শিকার অনেককাল হল ছেড়ে দিয়েছে। এখন একটা ট্রাভেলিং এজেন্সির মালিক। পুরো মালিক নয়, ওর এক পার্টনার আছে।"

কিকিরা তখনও মনে-মনে বাঘ-শিকারি ধূর্জটিকে যেন খুঁজছিলেন।

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "দ্বিতীয়জনের নাম অরবিন্দ মজুমদার। অরবিন্দের বয়েস হয়েছে। আমার চেয়ে দু-চার বছরের ছোট। তা বলতে নেই, এই বয়েসেও আমার মতন বুড়িয়ে যায়নি। হাঁটাচলা, ঘোরাফেরা, খাওয়াদাওয়া ভালই। অরবিন্দ ছিল রেঞ্জার। বনেজঙ্গলে ঘুরে অর্ধেক জীবন কেটেছে। ডেয়ারডেভিল টাইপের। আমি তাকে বনমানুষ বলি। চেহারাটাও সেইরকম ছিল এককালে। এখন সে রিটায়ার্ড লাইফ কাটায়।"

শরবত শেষ হয়ে এসেছিল কিকিরার। পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন। রথীন ঘরে ঢুকলেন।

রথীন পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে একপাশে রেখে দিলেন দেরাজের, তারপর নৃপতিনারায়ণকে বললেন, "কাকাবাবু, আপনার ওষুধটা পেয়েছি। লিন্ডসে স্ট্রিটের দোকানেই পেলাম। মাত্র দু'ফাইল ছিল। আজকাল এগুলোর মার্কেট নেই। চলে না।" বলতে-বলতে এগিয়ে এলেন। কিকিরাকে বললেন, "কতক্ষণ এসেছ?"

"সাড়ে সাত..."

"বসো রথী," নৃপতিনারায়ণ বললেন, "কিঙ্করকে ওদের পরিচয় দিচ্ছিলাম। খাবে কিছু? চা, কফি...?"

"না। অনেকবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে...।"

"বসো তা হলে।" বলে নৃপতিনারায়ণ কিকিরার দিকে তাকালেন। "অরবিন্দ থাকে নিউ আলিপুরে। আগে থাকত চেতলায়। ধূর্জটি কোথায় থাকে বলিনি তোমায়? ও থাকে ভবানীপুরে। দু'জনেই এসে পড়বে এবার।"

"তিন নম্বর কে?" কিকিরা বললেন।

"ভাদুড়ি। জে. ভাদুড়ি। পুরো নাম জগন্নাথ ভাদুড়ি। জগন্নাথের চেয়ে ওই জে ভাদুড়িই বেশি চলে। ভাদুড়ির বয়েস বছর পঞ্চান্ন হবে। আমাদের চেয়ে অনেক ছোট। ওর হল শৌখিন জিনিস বেচাকেনার ব্যবসা। এখানকার হাতের কাজ, সেলাই, চামড়ার জিনিসপত্র থেকে ছোটদের খেলনা, পুতুল—এইসব চালান দেয়। লখনউয়ের দিকে একটা জায়গা আছে। পুতুল তৈরির জন্যে বিখ্যাত। বিশেষ করে মোমের পুতুল। বাইরের কয়েকটা দেশে জিনিসগুলোর ভাল কাটতি। ভাদুড়ি বড় স্কেলে ব্যবসা করতে পারে না ঠিকই, তবে যা করে তা একেবারে খারাপও নয়। ওর দেখেছি ব্যবসায় যত না মন তার চেয়ে বেশি টান দাবা খেলায়। দাবা আমি বুঝি না। ভাদুড়ি কত নাম আর খেলার কথা বলে—কানেই শুনি শুধু। ওর আবার নানারকমের দাবার বাহারি বোর্ড, গুটি জমানোর শখ। তা একটা কথা শুনেছি, ভাদুড়ির দোকানের পুতুলগুলো বাইরের বাজারে বেশ চলে।"

রথীন হঠাৎ বললেন, "বাইরে গাড়ি এসে থামল। শব্দ পেলাম।"

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "ওরা এল তা হলে, বিশ্বপতি আর কাশীনাথ। বিশ্বপতির গাড়িতেই এসেছে। কাশীর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে গ্যারাজে। মাসখানেকের ধাক্কা এখন।"

রথীন বৈঠকখানা ঘরের মাঝ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "আগেভাগেই চলে এসেছে দু'জনে।"

সামান্য পরেই দুই ভদ্রলোক ঘরে এলেন। মাথায় প্রায় সমান সমান। একজন গোলগাল ধরনের, ফরসা রং গায়ের, মাথায় টাক, চোখে মোটা কালচে ফ্রেমের চশমা। তাঁর পরনে ধুতি আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। হাতের ঘড়ির চেন সোনালি রঙের। বয়েস ষাটের ওপর। অন্যজনের পরনে প্যান্ট আর হাফ-হাতা বুশ শার্ট। রোগা চেহারা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, দু'পাশে পাক ধরেছে। চোখমুখ দেখলে মনে হয়, মেজাজ যেন খানিকটা রুক্ষ।

কিকিরা যে তারাপদকে বলেছিলেন, নৃপতি দত্তর নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার সময় ধুতি-পাঞ্জাবি চড়াতে হয় গায়ে—সেটা নিতান্তই ঠাট্টা। তেমন কোনও নিয়ম নেই ধরাবাঁধা, তবে দত্তমশাই নিজে ওই পোশাকটা পছন্দ করেন।

বিশ্বপতিরা ঘরে ঢুকতেই নৃপতিনারায়ণ বললেন, "এসো, এসো। বসো ওখানে। আমি আসছি। বিশ্ব কি নিজেই গাড়ি চালিয়ে আনলে, না, ড্রাইভার এনেছ সঙ্গে করে? তোমার সেই ঘাড়ের পট্টি কী হল? খুলে ফেলেছ?"

গোলগাল ফরসা রং টাকমাথা ভদ্রলোক বিশ্বপতি। তিনি বললেন, "ওটা আর পরিনি। কত আর পরা যায়! মাঝে-মাঝে খুলে রাখি। তবে ঘাড় ঘোরাতে এখনও কষ্ট হচ্ছে! স্পন্ডিলাইটিস যে এত ভোগায় জানতাম না, দাদা। দু'মাস হতে চলল।...গাড়িতে ড্রাইভার আছে।"

"কলকাতায় এখন শতকরা নব্বইজনের ওই রোগ। কাগজে দেখছিলাম। কোন ডাক্তারবাবু নাকি বলেছেন, দোষটা ঘাড়ের নয়, শহুরে হাড়ের।" বলে হাসলেন নৃপতি।

কথা বলতে-বলতে নৃপতিনারায়ণ উঠলেন। লাঠিতে আলগাভাবে ভর দিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনেই সোফাসেটি। বিশ্বপতিদের বসতে বললেন।

বিশ্বপতিরা বসলেন।

কিকিরাকে ডাকলেন নৃপতি। রথীন নিজেই উঠে এলেন। অতিথিরা তাঁর পরিচিত। আজকের অতিথিদের যে তিনি সকলকেই ভালভাবে চেনেন তা নয়, কাউকে হয়তো সামান্য বেশি, কাউকে কম।

নৃপতিনারায়ণ বিশ্বপতিদের সঙ্গে কিকিরার পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয়টা অদ্ভুত। কিকিরা এতটা কল্পনা করেননি। নৃপতি বললেন, "এই যে বাবু লোকটিকে দেখছ বিশ্ব, এর নাম কিঙ্কর। এক সময়ে আমি কলকাতা শহরের বড়-বড় গান-বাজনার আসর বসলে সেখানে হাজির হওয়ার চেষ্টা করতাম। তখন কিঙ্কর ছিল আমার বাহন। বয়েস হল, শখ কমল, আসরে যাওয়া ঘুচল। কিঙ্কর আমার অনেককালের চেনাজানা। দেখাসাক্ষাৎ আজকাল কম হয়। সেদিন কিঙ্কর একটা বাগান বিক্রির খবর নিয়ে এসেছিল। কোথায় যেন বাগানটা কিঙ্কর, দেগঙ্গা না কী যেন বললে?"

"কিকিরা চট করে বললেন, "ওই কাছাকাছি... !"

"কিঙ্করের কাছে বাগানবাড়ি, বাগানের খোঁজখবর থাকে..." নৃপতি হাসতে-হাসতে বললেন।

দু-দশটা অন্য কথাবার্তা। জল এল। বিশ্বপতি জলের পর চা খেলেন। কাশীনাথও চায়ের ভক্ত।

ঘড়িতে সোয়া আট। একে-একে বাকিরা এসে গেলেন: ধূর্জটিবাবু, অরবিন্দ মজুমদার, ভাদুড়ি। তার আগেই অবশ্য শ্যামলাল এসেছেন, শ্যামলাল গুপ্ত। একেবারে শেষে এলেন ধনরাজ ত্রিবেদী আর গোস্বামীজি। এঁদের কারও বয়েস পঞ্চাশের নীচে নয়। পঞ্চান্ন, ষাট—মাঝামাঝি হবে। শ্যামলালের চুল বারোআনাই পাকা, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, ধনরাজ প্যান্ট পরেই এসেছেন। গোস্বামীজি পরেছেন ফিনফিনে ধুতি, কমলা-গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। গলায় লাল রুদ্রাক্ষের মালা। ছোট-ছোট রুদ্রাক্ষ।

পরিচয় পর্ব শেষ হতে-হতে সাড়ে আটটা বেজে গেল।

খাওয়াদাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।

খাওয়ার ঘরটা চওড়ায় বড় নয়, লম্বায় অনেকটা। লাগোয়া রান্নাঘর। খাওয়ার ঘরের জানলাগুলো কাচের, পাল্লার কাঠ চওড়া। ঘরে গোটা দুই বাতি জ্বলছিল। পাখাও চলছে। লম্বাটে খাওয়ার টেবিল, নয়-নয় করেও দশ-বারোটা খাওয়ার চেয়ার। কোনওটাই মামুলি নয়। খাওয়ার ঘরের দেওয়ালে কয়েকটা ছবি—বাঁধানো—সবক'টাই ল্যান্ডস্কেপ। দেওয়াল-দানিতে কিছু ফুল সাজানো।

অতিথিরা সকলেই আমিষ খান না। যেমন শ্যামলাল, গোস্বামীজি, অরবিন্দ। একসময়ে রেঞ্জার অরবিন্দ এতরকম আমিষ খেয়েছেন যে, এখন আর তাতে রুচি নেই। এখন তিনি নিরামিষ খাবারের গুণগান করে বেড়ান। আর মান্য করেন হ্যানিমান সাহেবকে। বলেন, 'হোমিওপ্যাথি ওষুধই একমাত্র খাঁটি ওষুধ, শরীরের কোনও ক্ষতি করে না। অ্যালোপ্যাথি হল বিষ; কবিরাজী ভাল, তবে নাড়িজ্ঞান জানা কবিরাজ আর নেই। গাছগাছড়াও চেনে না এখনকার বৈদ্যরা।'

নৃপতিনারায়ণ লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসেন ঠিকই, তবে তাঁর পছন্দ হোটেল-মার্কা রান্নাবান্না নয়। হালকা, স্বাদে-গন্ধে সুন্দর, মুখরোচক। অথচ নতুন-নতুন কিছু খাওয়াতে তাঁর যেন জুড়ি নেই।

নিরামিষাশীরা টেবিলের একপাশে পাশাপাশি; অন্যদিকে ওরা তিনজন— ধূর্জটিবাবু, বিশ্বপতি আর কাশীনাথ। রথীন আর কিকিরা সরু দিকটায়। উলটো দিকে নৃপতিনারায়ণ।

খেতে-খেতে গল্পগুজব চলছিল।

মাঝে-মাঝে হাসিঠাট্টাও।

খাওয়াদাওয়ার মাঝামাঝি পর্বে নৃপতিনারায়ণ হঠাৎ বললেন, "আজ কিছুদিন ধরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি, বুঝলেন অরবিন্দবাবু! ভুতুড়ে কাণ্ডই বলা যায়।" এক অরবিন্দকেই 'আপনি' করে কথা বলেন নৃপতি। অন্যদের 'তুমি'।

"ভুতুড়ে! কীরকম?" অরবিন্দ বললেন।

"আমি যখন এই পুরনো বাড়িটা কিনি, পরে অবশ্য বাড়িয়ে নিয়েছিলাম অনেকটা— তখন আমার কম্পাউন্ডের পেছনে ছিল জংলা মাঠ আর পুকুর। পুকুর পরে ভরাট হয়ে গেল। লোকে ঘরবাড়ি করল। কোঠা ধরনের মাঠটার পশ্চিমদিকের খানিকটাও জনবসতি হল। বস্তি বাড়ি হল দশ-বারো ঘর। কিন্তু আমার বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে বাকি জমি— জংলা জমি কেউ আর কিনতে এল না।"

"কেন ?"

"ওখানে নাকি এক সময় কবরখানা ছিল। কবরখানার জমি লোকে কিনবে কেন ? তা ছাড়া ওই জমির মালিকানা..."

"তা ঠিক। ওসব জমিতে হাত দিতে নেই। দিলেই ফ্যাসাদ। ওপাশে রাজ্যের গাছপালা, জঙ্গল আর জঞ্জালের পাহাড় দেখি।"

"জায়গাটা ওইভাবেই পড়ে আছে। জঙ্গল, আগাছা বাড়ছে। ধাপার মাঠ হয়ে যাচ্ছে প্রায়। তা আছে থাক— আমার আর কী ! কিন্তু হালে ওখান থেকে মাঝে-মাঝে ভূত এসে উৎপাত শুরু করেছে।"

ধূর্জটিবাবু হেসে ফেললেন, "ভূতের উৎপাত মানে হয় ঢিল ছোড়া, না হয় হা-হা করে অট্টহাসি ! মেয়ে ভূত হলে কাঁদে, সিনেমার মেয়ে ভূত আবার গান গায়— !"

সকলেই হেসে ফেললেন।

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "না, ঢিল ছুড়ছে না ; হাসিকান্নাও শুনছি না। এই ভূত আমার বাগানে ঘোরাফেরা করছে, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার দুটো জানলা নষ্ট করেছে। মানে বাইরে থেকে ভেতরের ছিটকিনি ভাঙার চেষ্টা করেছে, একটা জানলার শার্সি ফাটিয়েছে। তা ছাড়া রান্নাঘরের দরজাও ভাঙবার চেষ্টা করেছিল বাইরে থেকে।"

"চোর ! বার্গলার," শ্যামলাল বললেন, "থানায় খবর দিন।"

"চোরই। তবে ছিঁচকে না পাকা বুঝতে পারছি না। নীচে আমার এখানে কী থাকে যে চুরি করতে আসবে ! দু-চার শো নগদ টাকা, দুটো চেক্ বই। টাকা-পয়সা গয়নাগাটি সব তো আমাদেরই দোতলায়, বউমার হেফাজতে। তা ছাড়া সোনাদানা আজকাল বাড়িতে কেউ রাখে না। ব্যাঙ্কের ভল্টে থাকে।"

ধূর্জটিবাবু বললেন, "তা হলে আসছে কেন ?"

"কেন আসছে সেটাই তো রহস্য ! চোরই হোক আর ভূতই হোক—তার একটা বড় রুমাল আর ছোট্ট টর্চ আমি বাগানে আমাদের পুকুরপাড়ে পেয়েছি।"

"রুমাল !"

"বড় রুমাল। স্কার্ফের মতন। কালচে রং। আর টর্চটা হল—পেনসিল টর্চ, ওই ডাক্তাররা যেগুলো পকেটে রাখে—সেই রকম।"

গোস্বামীজি বললেন, "আপনার বাড়িতে এত্তো লোক কাম করে। কোই কুছ জানে না, দাদা ?"

"দোতলায় ওরা কিছু জানে না। আমার ছেলে সারাদিন খাটাখাটনি, দৌড়ঝাঁপ করে এসে রাত্রে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। ও বেটা দুটি জিনিস বোঝে। গাধার মতন খাটো আর কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোও। বউমারও নজরে পড়েনি। নাতি-নাতনি আর কী জানবে !"

"কোই তো জানবে !"

"জানে না। তবে আমি একটা আন্দাজ করছি।"

"কী আন্দাজ করছেন ?"

"আ-ন্দা-জ !" টেনে-টেনে বললেন নৃপতিনারায়ণ। তারপর সামান্য চুপ করে থেকে অতিথিদের মুখ দেখলেন একে-একে। শেষে চাপা হাসি হেসে বললেন, "মিসিং লিঙ্ক। বা বলা যায়, গোটা ছয়েক হারানো পাতা, পুঁথির পাতা, লিথোগ্রাফ। ওগুলো চেহারায় নিরীহ, কিন্তু ওর জন্যে খুনোখুনি অনেক হয়েছে। জিনিসটা ভয়ঙ্কর।...আমার কাছে ওগুলো আছে—এ গুজব কে রটালো কে জানে ! না না, আমি কেন ওসব রাখতে যাব !"

নৃপতিনারায়ণ যখন কথাগুলো বলছিলেন—অন্যরা খাওয়া বন্ধ করে তাঁর কথা শুনছিলেন। মুখের ভাব সকলের সমান নয়। কেউ বোকার মতন তাকিয়ে; কেউ বা কৌতূহল বোধ করে অবাক চোখে দেখছেন। কারও চোখেমুখে অবিশ্বাস, যেন কানে তুলতেই চান না কথাগুলো। কার মুখের ভাবে কতটুকু সত্যি আছে, কিংবা মিথ্যে, বোঝা যায় না।

কিকিরা কোনওরকম উৎসাহ দেখালেন না। আবার খেতে শুরু করলেন।

ধূর্জটিবাবু বললেন, "পুঁথি মানে ? তালপাতার লেখাটেখা !"

নৃপতিনারায়ণ মাথা নাড়লেন, "পাতা, গাছের ছাল, হাতে তৈরি কাগজ—এমনকী একরকম গাছের পাতলা ফিনফিনে কাঠও হতে পারে...।"

"তা এই পুঁথি কার ?"

"কা-র !" নৃপতিনারায়ণ টেনে-টেনে বললেন। "কা-র যে সেটা বলা যাবে না। কেউ বলেন, অনন্তদাস স্বামীর, কেউ বলেন, এক ইতালিয়ান পাদ্রী আলাবার্তোর।"

অরবিন্দ বললেন, "বলেন কী ! পাদ্রীর লেখা পুঁথি ! তাই আবার হয় নাকি ?"

"হয়তো নিজে লেখেননি। অন্যের মুখে শুনে-শুনে লিখেছেন," নৃপতি বললেন, "খোদাই করা লেখা।"

শ্যামলাল বললেন, "কাঁহাকার পাদ্রী কাঁহা এসে খোদাইয়ের কাম করল, দাদা ! আনবিলিভেব্‌ল !"

"অবাক হওয়ার কিছু নেই শ্যামলাল। খবর রাখলে জানতে, এমন কাজ অনেক হয়েছে। এই পাদ্রীসাহেব চোদ্দ বছর এদেশে ছিলেন। বেতিয়ার দিকে। নর্থ বিহারের অনেক জায়গায় ঘোরাফেরা করেছেন। মেলামেশা করেছেন মানুষজনের সঙ্গে। লোকাল ভাষায় কথাবার্তা বলতে শিখেছেন, লিখতে শিখেছেন...।"

"তা না হয় হল ! যারই পুঁথি হোক এ নিয়ে গোলমালটা কিসের !" অরবিন্দ বললেন।

"গোলমাল !" নৃপতিনারায়ণ বললেন, "গোলমালের অনেক কারণ আছে। এই পুঁথি হল সন্ত রামস্বামীজির বাণী ও শিক্ষা। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের কেউ—হয়তো অনন্তদাসজি সেগুলো সঙ্কলন করেন। করে একটা পুঁথি লিখে যান। সেটা লিথোগ্রাফ প্রসেসে থেকে যায়। এই পুঁথি সন্ত রামস্বামীজির শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায়ের কাছে বিগ্রহের মতন। ওরা সেটা পুজো করে। গত তিন-চার মাস আগে ওদের আদি মঠ থেকে পুঁথিটি চুরি যায়। আবার ফেরতও পাওয়া যায় ক'দিন পরে। কিন্তু মাঝের ক'টা পাতা আর পাওয়া যায়নি। পাতাগুলোর মূল্য আপনি-আমি বুঝব না। ওরা বোঝে। আপনাদের মঠ মন্দির থেকে কয়েক শো বছরের পুরনো বিগ্রহ, যার নিত্যপুজো হয়, চুরি গেলে কেমন লাগে, মশাই !...যাই হোক, ওই হারানো পাতার জন্যে ওরা লাখ কয়েক টাকাও যেমন খরচ করতে পারে, আবার সেগুলো উদ্ধারের জন্যে দু-চারটে খুনখারাপিও করতে পারে।" বলে একটু থেমে উনি কেমন করে হাসলেন যেন, বললেন আবার, "আর আপনারা অনেকেই তো একজনকে দেখেছেন এ-বাড়িতে। রাজকমল। শুনেছেনও ওর কথা। কী বলেন !"

সবাই চুপ। কেউ কোনও কথা বললেন না।

॥ ৩ ॥

দিন দুই পরে তারাপদ এল। বাঁ চোখ লাল টকটকে। চোখের তলায় ফোলা, সামান্য কালচে হয়ে আছে।

কিকিরা বললেন, "ও কী ? চোখে তোমার হল কী ?"

তারাপদ বলল, "গুঁতো। বাসে একটা লোকের গুঁতো খেয়েছি। ঝুলে-ঝুলে আসছিলাম অফিস থেকে। আচমকা ব্রেক। আমার সামনের ভদ্রলোকের কনুই এসে লাগল চোখে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার। ভদ্রলোক অপদস্থ। যাক গে, এ তো শহর কলকাতার নিত্যকার ব্যাপার, সার। ট্রাম বাস মিনিবাসে যারা চলাফেরা করে তাদের রুটিন ইনজিউরি।"

"ওষুধ লাগাচ্ছ ?"

"ওই একটা আই ড্রপ। চাঁদু নেই, পাড়ার ব্যোমডাক্তার যা বলল তাই চলছে। এখন লালটা কমেছে।"

"কমবে। তবে সময় লাগবে।"

"আপনার খবর বলুন ?"

"কোনও খবর নেই।"

"সে আবার কী ! নেমন্তন্ন খেতে গেলেন বাবু সেজে..."

"গেলাম। খাওয়াটাও খারাপ হল না। তবে মোদ্দা ব্যাপারটা জানতে পারলাম না।"

তারপদ আসার সময়েই বলে এসেছিল বগলাকে ; জল নিয়ে এল বগলা। জল নিল তারাপদ। এক নিশ্বাসেই শেষ। গরমটা যেন প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এখনও ফাল্গুনের ক'টা দিন বাকি।

বগলা চলে গেল।

তারাপদ বলল, "নেহাতই খাওয়ার নেমন্তন্ন তবে ! আপনি বলছিলেন...।"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। বললেন, "না। রেলগাড়ি যেতে যেতে বেলাইন হয়ে যায়, জানো তো ! এও সেরকম ! নৃপতিনারায়ণ কথা শুরু করার আগেই অন্যরা একে-একে চলে এলেন। উনি ওঁদের পরিচয় জানাচ্ছিলেন আমাকে—তার আগেই ভদ্রজনরা এসে পড়লেন। কী আর করা যাবে ! ওরই মধ্যে যেটুকু শুনলাম, অন্যদের সামনে তাতে আমার মাথায় কিছু ঢোকেনি," বলে একটু থেমে কী যেন ভাবলেন তিনি ; আবার বললেন, "কাল আমি নৃপতিবাবুকে ফোন করেছিলাম বলাইয়ের দোকান থেকে। উনি বললেন, সবাই এসে পড়ায় কাজের কথা বলা হল না। আবার যেতে বললেন।"

"কবে ?"

"আজই বলেছিলেন। আমি একটা দিন পিছিয়ে দিলাম।"

"কেন ?"

"তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।"

তারাপদ চোখ মুছল। বলল, "উনি আমায় অ্যালাও করবেন কেন ?"

"কথা হয়ে গিয়েছে। আমি তোমাদের কথা বলেছি। উনি রাজি।"

"ভাল কথা। কিন্তু আমি যদি আজ না আসতাম ?"

"কাল সকালে তোমার হোটেলে ছুটতে হত আমাকে।"

তারাপদ হেসে বলল, "আমার কদর বাড়ছে, সার।"

কিছু হালকা কথাবার্তা। হাসিঠাট্টা।

শেষে কিকিরা বললেন, "তারাপদ, ওই যে কথায় বলে ছোট মাথায় বড় টুপি মানায় না—নৃপতিবাবুর ব্যাপারটাও আমার ছোট বুদ্ধিতে কুলোবে না। আমি তো কিছুই বুঝলাম না। বিন্দুবিসর্গও নয়। এটুকু শুধু বুঝলাম, আমার-তোমার সাধ্য নেই অত পণ্ডিতি ব্যাপার বুঝি। পুরনো পুঁথি, ইতালিয়ান পাদ্রী, কোন্ বাবাজি না স্বামীজি, লিথোগ্রাফ—এত্তো কথা কে জানে ! আমাদের বিদ্যেতে ভূত, রুমাল, পেনসিল টর্চ পর্যন্ত চলতে পারে—তার বেশি নয়।"

তারাপদ কিছুই জানে না। বলল, "আমি তো কিছুই জানি না, সার। তবে তেমন বুঝলে আপনি ও-পথ আর মাড়াবেন না। বরং মানে-মানে সরে আসুন।"

"আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু নৃপতিবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর কথাবার্তা সব না-শুনে তো পালিয়ে আসা যায় না। যায় ?"

"তা ঠিক।"

"তা হলে, কাল একবার চলো, ওঁর কাছে যাই। পুরো বৃত্তান্ত শুনি। তারপর বুঝিয়ে বলব ওঁকে, আমাদের দ্বারা হবে না। সেটাই উচিত হবে।"

তারাপদ মাথা হেলিয়ে বলল, "চলুন, আমার আপত্তি নেই। অন্তত ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হবে ! আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক এক ক্যারেক্টার। আজকাল সার এঁরা হারিয়ে যাচ্ছেন।" তারপদ হাসল।

কিকিরা তারাপদর কথা বোধ হয় খেয়াল করে শুনলেন না। বললেন, "তুমি কাল অফিস-ফেরত হোটেলেই থেকো, আমি তোমায় ডেকে নেব।"

"কখন ডাকবেন ?"

"ছয়, সোয়া ছয়।"

"বেশ।"

"চাঁদু কবে ফিরবে ?"

"ঠিক নেই। আগামী হপ্তার মাঝামাঝি ফিরতে পারে। মেডিক্যাল ক্যাম্পের ও সিনিয়ার মেম্বার, পালিয়ে আসা মুশকিল—।" বলতে-বলতে হেসে ফেলল তারাপদ।

পরের দিন সন্ধের মুখেই কিকিরা তারাপদকে নিয়ে নৃপতিনারায়ণের বাড়িতে হাজির। অপেক্ষাই করছিলেন নৃপতিনারায়ণ। কথা বলছিলেন ফোনে। কথা শেষ করে ঘরের মাঝখানে এগিয়ে এলেন। "এসো কিঙ্কর, তোমার কথাই ভাবছিলাম। বসো।"

কিকিরা তারাপদর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন নৃপতিনারায়ণের।

নৃপতিবাবু তারাপদকে দেখতে-দেখতে হাসলেন। তারপর কিকিরাকে বললেন, "ওটি তোমার নস্যির ডিবে নাকি ? মাথা সাফের কাজে লাগে !"

নস্যির ডিবে ! কথাটায় মজা পেলেন কিকিরা। হেসে ফেললেন। তারাপদও না হেসে পারল না। নৃপতিনারায়ণকে বেশ রসিক মনে হল।

নৃপতি নিজেই বললেন, "আজ গোড়া থেকেই কাজের কথা, বুঝলে। গপ্পটপ্প হবে না। ভজুডাক্তার ফোন করেছিল। ন'টার আগেই আসবে। মামুলি চেক্‌আপ। এখন ক'টা বাজল !" বলতে-বলতে তিনি নিজেই ঘাড় ফিরিয়ে ছোট-দেরাজের ওপর বসানো বড় ঘড়িটা দেখলেন।

"বলুন আপনি—" কিকিরা বললেন।

"এক মিনিট— !" নৃপতিনারায়ণ নিজেই ঘরের শেষ প্রান্তে—বাঁ দিকের করিডোরের দরজা পর্যন্ত চলে গেলেন, আজ আর ঘন্টি নয়, হাঁক মেরে কী যেন বললেন আউটহাউসের দিকে তাকিয়ে ; তারপর ফিরে এলেন।

তারাপদ অবাক হয়ে এই ঘরটা দেখছিল। ঘর, আসবাবপত্র, দেরাজের ওপর রাখা বড় ঘড়ি, বইয়ের আলমারি, আলো, পাখা, ছবি। দেখছিল আর মুগ্ধ হচ্ছিল।

নৃপতিনারায়ণ ফিরে এসে সোফায় বসলেন, কিকিরার মুখোমুখি।

"সেদিনের কথা দিয়ে শুরু করি," নৃপতিনারায়ণ বললেন, "সেদিন যাদের তুমি দেখলে তারা সকলেই আমার জানা-শোনা। তবে দু-একজন বাদে অন্যদের যে অনেকদিন থেকে চিনি—তাও নয়। যেমন ধরো, অরবিন্দ, ধূর্জটি, শ্যামলালকে আমি পাঁচ-সাত বছর ধরে চিনি। অরবিন্দকে তো আরও বেশি। উনি আবার আমাদের কুটুমও হন, আমার ছেলের শ্বশুরবাড়ির তরফের

লোক। এদের বাদ দিলে বাকিদের আমি অতটা চিনি না। কাজেকর্মে দু-তিন বছর ধরে যা পরিচয়।"

কিকিরা বললেন, "মানে বাকি পাঁচজনকে..."

"না, পাঁচ নয়, চার। ভাদুড়িকে চিনি বছর চারেক। তা এই যে আটজনকে তুমি দেখলে—সবাইকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তুমি বলবে, তা হলে আটজনকে ডাকলাম কেন খানাপিনা করতে! আমি বলব, ওরকম করতে হয়। কেন করতে হয়? করতে হয়, ধাপ্পা মারার জন্যে। অনেক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের একটা অভ্যেস থাকে। তারা যদি নিজেরা রোগীর ওষুধ তৈরি করিয়ে দেয়—বেশিরভাগ সময় জানবে, ওয়ান ইজ্ টু থ্রি; মানে গোড়ায় এক দাগ সত্যি ওষুধ, বাকি দু' ডোজ নেহাত ব্ল্যাঙ্ক বা ব্লাফ। আবার ওষুধ, পরে আবার ব্লাফ। এতে রোগী সাইকোলজিক্যাল সান্ত্বনা পায়। রোগী ভাবে রোজই ওষুধ খাচ্ছে, আসলে খাচ্ছে হয়তো হপ্তায় দু' দিন। এক্ষেত্রেও তাই। আমি ডেকেছি আটজনকে, তার মধ্যে ক'জনকে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ডাকিনি—, এমনি ডেকেছি, আর যদি উদ্দেশ্যের কথা বলো—তবে বলব বাকিদের ধাপ্পা দেওয়ার জন্যে।"

তারাপদ নৃপতির কথা শুনতে-শুনতে কিকিরার দিকে তাকাল।

কিকিরা বললেন, "আসলে আদত ব্যাপারটাই জানি না তো..."

"জানাব বলেই না ডেকেছি তোমায়! একটু রয়েসয়ে শোনো ভাই। এ তো হনুমানের লম্ফ নয় যে, এক লাফে সমুদ্র ডিঙিয়ে যাবে।"

"বলুন।" হাসলেন কিকিরা।

"সেদিন তুমি কী শুনলে? শুনলে যে, একটা পুরনো পুঁথির মাঝের ক'টা পাতা খোয়া গিয়েছে। মনে আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। লিথোগ্রাফ কপি।"

"ঠিক। এই লিথোগ্রাফ-করা কপি কত পুরনো তা তুমি জানো না। জানার কথাও তোমার নয়। আমি যেটুকু জানি তাতে বলতে পারি তিনশো বছরের মতন পুরনো হবে। মানে, সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরির। তার আগের না হওয়ারই সম্ভাবনা।

তারাপদ কিছু না বুঝলেও অস্ফুট এক শব্দ করল। হয়তো বলতে যাচ্ছিল, এত পুরনো, তিনশো বছরের বেশি বই কম নয়।

কিকিরা কোনওরকম লুকোচুরি না করে বললেন, "আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, পুঁথিপত্র বই বুঝি না। নিজে একটা বই লিখব ভেবেছিলুম, ভারতের প্রাচীনকালের ভোজবিদ্যা থেকে এখনকার সময় পর্যন্ত—, কত কী ঘাঁটলাম, হাতড়ালাম—শেষপর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাট পাতা লিখে আমার দম ফুরিয়ে গেল। বুঝলাম, লার্নিং আমার পেটে হজম হবে না।" বলে হাসলেন।

নৃপতিনারায়ণ পানের ডিবের দিকে হাত বাড়ালেন। কাছেই ছিল। বললেন, "বলব বলেই তো বসে আছি।...আগে একটু ভূগোল ঘেঁটে নিই। তুমি কখনও নর্থ বিহারের দিকে বেড়াতে গিয়েছ?"

"না, বেড়াতে যাইনি; ট্রেনে করে যাওয়ার সময় দেখেছি...।"

"আমারও একই দশা। তবে ছোকরা বয়েসে একবার মাস কয়েকের জন্যে মতিহারীতে ছিলাম। এক মামার বাড়ি। আমার মায়ের শরীর সারাতে যেতে হয়েছিল ওদিকেই, অনেকটা দূরে বেতিয়া। বেতিয়া থেকে নেপাল বর্ডারে যেতে বেশি সময় লাগে না। আবার বেতিয়ার পশ্চিমে হল ইউ.পি.। ধরতে পারছ, না ম্যাপ দেখতে হবে?"

"পরে দেখব।"

"ভূগোলটা মোটামুটি আন্দাজ করলে তো! এবার ইতিহাস।" মুখে পান দিলেন নৃপতিনারায়ণ। কয়েক মুহূর্ত পরে পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "আমাদের দেশে মধ্যযুগের একটা বড়—কী বলব—বৈশিষ্ট্য হল নানা ধর্ম, মত, পথ। আচার-বিচারের জগাখিচুড়ি। আমি বললাম বটে জগাখিচুড়ি—আসলে ওটা মিক্সিং অব সো মেনি থট্স, রিলিজিয়াস টিচিং অ্যান্ড সোশ্যাল কাস্টম্স। সোজা কথায়, মিলমিশ। কিন্তু মিলমিশ বললেই তো মেলামেশা হয় না, খানিকটা নেয় তো বাকিটা নেয় না, নিজের জেদ ছাড়ে না। তা এই সময় একদিকে যেমন বড়-বড় সাধু সন্ত কবি দেখা গিয়েছিল সেইরকম আবার ছোট-ছোট দল, উপদল, সম্প্রদায়, গুরু, আশ্রম, আখড়াও দেখা দেয়।...তোমাদের অবশ্য অত কথায় যাওয়ার দরকার নেই। শুধু একটি সম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে। এদের মূল গুরু কে ছিলেন বলা মুশকিল। রামানন্দ স্বামীর শিষ্য-প্রশিষ্য, না রামস্বামীজির কোনও প্রশিষ্য, জানা যায় না। যাই হোক, এক সময় 'পউরি' বলে এক সম্প্রদায় দেখা দিল।"

কিকিরা সবই গুলিয়ে ফেলছিলেন। এমন সময় নৃপতিনারায়ণের জগাই-মাধাই ট্রে করে জল, চা, খাবার এনে সামনে নামিয়ে রাখল। ঠাণ্ডা জল, বড়-বড় দু' প্লেট খাবার, চায়ের পট, কাপ, চিনির পাত্র।

কিকিরারা জলের গ্লাস তুলে নিলেন।

"চা তোমরা পরে ঢেলে নিয়ো কেমন? খাবারগুলো খাও। বেশি কিছু নেই।"

জগাই-মাধাই চলে গেল।

নৃপতিনারায়ণ নিজেই আবার কথা শুরু করলেন। বললেন, "এই যে সম্প্রদায়—এদের আদত ঘাঁটি হল বেতিয়া থেকে আরও উত্তরে, নেপাল বর্ডারের গায়ে। পাহাড়ি জায়গা, একটা বড় গ্রামই বলা চলে জায়গাটাকে। সেখানেই ওদের আদি আশ্রমই বলো, আর মঠ মন্দির বিহার যা বলো বলতে পারো। আরও একটা ছোট মঠ তাদের আছে। সেটা বেনারস আর জৌনপুরের মাঝামাঝি। মঠে-মঠে রেষারেষি। ধর্মে ওরা হিন্দু হলেও ওদের আচারে বিচারে, কাজকর্মে ওরা অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের মিশ্রণ। ওরা কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, হীনযান, তন্ত্রমন্ত্র, যোগী—সব একাকার করে নিজেদের মতন এক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধর্ম করে নিয়েছে। ওদের রাম-কাহিনীও অনেকটা আলাদা...।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "সে কী?"

নৃপতিনারায়ণ হেসে বললেন, "কিছু না। এরকম অনেক আছে এদেশে। দেশটা তো আর ছোট নয়, আমরা তার কতটুকু জানি?"

কিকিরা প্লেট তুলে নিয়েছিলেন। বললেন, "তারপর?"

"ওদের মূল ঘাঁটি যেখানে—সিনাইতারা—সেখানে যে মঠ মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে খুব যত্নে এবং সাবধানে ওই লিথোগ্রাফ রাখা ছিল। ওটি ওদের কাছে পরম পবিত্র জিনিস। যাকে বলে 'স্যাক্রেড বুক'। পবিত্র গ্রন্থ। এতকাল পরে হঠাৎ গত মাস তিন-চার হবে, সেই মূল লিথোগ্রাফের বান্ডিল থেকে মাঝের ছ'টি পাতা খোয়া গিয়েছে। বিপত্তি সেখানেই। 'পউরি' সম্প্রদায় যতই ছোট হোক—ওদের ক্ষমতা খানিকটা আছে। সাধারণভাবে শান্তশিষ্ট হলেও খেপে গেলে বড় ভয়ঙ্কর। দু-চারটের গলা কাটতে আটকাবে না। মৌচাকে খোঁচা মারলে যেমন অবস্থা হয়, মউমাছির ঝাঁক বেরিয়ে পড়ে বনবন করে—সেইভাবে ওদের কিছু লোক বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় গেল সেই ছ'টা পাতা? কে নিল? কেন নিল? টাকার লোভে, না, ওদের সঙ্গে শত্রুতা করতে!"

তারাপদ বলল, "আপনি নিজে ওই লিথোগ্রাফ দেখেছেন?"

কিকিরাও তাকিয়ে থাকলেন নৃপতিনারায়ণের দিকে।

নৃপতিনারায়ণ সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন না। বার কয়েক ঘাড় নাড়াচাড়া করলেন, হাত বোলালেন হাঁটুতে, তারপর ধীরেসুস্থে বললেন, "একজন আমাকে ওই পুঁথির ছ'টা পাতার ফোটো কপি

দেখিয়েছিল। ফোটো কপি বুঝলে তো ? অরিজিনালের ফোটো-প্রিন্ট।"

"কে সে ? কবে দেখিয়েছিল ?"

"যে আমাকে ওটা দেখায় তার পরিচয় শুনে গোড়ায় আমার নিজেরই খানিকটা সন্দেহ হয়েছিল। পরে আর হয়নি। পণ্ডিত পণ্ডিত চেহারা ওর ; সাহেব পণ্ডিত নয়। দিশি পণ্ডিত। মাথায় খাটো, গোল মতন মুখ, ফরসা রং গায়ের, পরনে ধুতি, পট্টিতোলা পাঞ্জাবি, জহর কোট, পায়ে চপ্পল, চোখে মোটা- মোটা চশমা, মাথা প্রায় নেড়া। বয়েস যে বেশি তা নয়, পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে। নাম বলেছিল রাজকমল মুনশি।"

"অবাঙালি ?" তারাপদ বলল।

"হ্যাঁ। কলকাতার লোকও নয়। কাশীর লোক। ওখানে এক প্রাচীন সমাজ সাহিত্যের গবেষণা ও প্রচার সমিতি আছে। হিন্দি নিয়েই কাজ করে অবশ্য। এই যে আমি এত কথা বলছি তোমাদের, এসব আমার জানা ছিল না। রাজকমল মুনশিজি আমাকে একটা চটি খাত দেয়। টাইপ কপি। সেটা ভূমিকা হিসেবে লেখা। সেটা পড়েই আমি ওই লিথোগ্রাফ পুঁথি, 'পউরি' সম্প্রদায়, তাদের ধর্মকর্ম, আচার-আচরণের কথা যেটুকু জানার জেনেছি। তবে বিশ-পঁচিশ পাতার খাতায় কতটুকু আর জানা যায় ! শতকরা বিশ ভাগও নয়।"

"আপনার কাছে কেন এসেছিল মুনশি ? আপনি চিনতেন ?"

"না, কোনওদিনই নয়। এসেছিল আমার নাম শুনে, মানে আমি যে একজন শখের ক্রিপটোলজিস্ট, সাইফার স্পেশালিস্ট—এসব জেনেই এসেছিল।"

"কেমন করে জানল আপনার কথা ?"

নৃপতিনারায়ণ এবার হাসলেন। বললেন, "তা যারা খোঁজখবর রাখে, রাখতে চায়, তারা দু-চারজন জানে বইকি নামটা ! তা ছাড়া কাশীতে আমার বন্ধু সতীশ শ্রীবাস্তব রয়েছে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। সতীশের কাছে শুনেছে।"

কিকিরা প্লেট নামিয়ে চা ঢালতে লাগলেন। আবার বললেন, "মুনশিজি কেন এসেছিলেন ?"

"আমাকে ওই ফোটো কপির পাতা দেখাতে।"

"কেন ?"

"কেন আবার আসবে, এসেছিল ওই লেখা আর ছবি দেখে আমি যদি তার অর্থ উদ্ধার করতে পারি !"

"লেখা আর ছবি ? কিসের ছবি ?" কিকিরা অবাক হয়ে বললেন।

"ছবি মানে মানুষের চোখমুখ নয়, লতাপাতা, ফুল, পাখির পাশাপাশি কয়েকটা অন্য ধরনের ড্রয়িং, যেমন গোল মতন এক মাছ, গাছের ডালে ঝোলা সাপ, একটা বেড়ালের মুখ—গা শজারুর মতন।"

তারাপদ বলল, "ব্যাপারটা কি সেই নকশা আঁকার মতন ? মানে লেখার পাশে-পাশে নকশা। অর্নামেন্টাল...।"

"তা তো বলতেই হবে। অর্নামেন্টাল। এরকম অর্নামেন্টাল ডিজাইন করার রেওয়াজ পুরনো বইপত্রে ছিল। ছবিতেও। কিন্তু বাবা, সাপ, ব্যাঙ দিয়ে অর্নামেন্টাল করা দেখিনি। আমি এখানে যা দেখলাম—তাতে বলতে পারি ফুল, পাতা, পাখির কোনও নকশাই তোমার চেনা লতাপাতা, ফুল, পাখির মতন নয়। তা সেটা হতেই পারে, নকশার ডিজাইন আর কত স্বাভাবিক হয় ! কিন্তু এখানে যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই নকশাগুলো নিছক নকশা নয়, তার এক-একটা লুকনো মানে আছে। পাখির তো একটাই ঠোঁট হয়, এখানে দেখলাম তার দুটো ঠোঁট, সামনে-পেছনে, কিংবা পরপর চার-ছ'টা ঠ্যাং। ফুলের পাপড়ির নীচে পাশে জ্যোতিষীদের সেই রাশিচক্রের ছবি।"

"আপনি কিছু বুঝলেন না ?"

"না।"

"আর লেখা ?"

"একেবারেই নয় বলতে পারো। তিনশো বছর আগের হিন্দি হরফ—তাও দেহাতি হরফ। তার ওপর হরফের খোদাই কিম্ভূত। কী আর বুঝব ?"

কিকিরা চা খেতে-খেতে বললেন, "মুনশিজি তবে বৃথাই এলেন আপনার কাছে, আর ফিরে গেলেন।"

"এলেন ঠিকই। আমিও দেখলাম। চেষ্টা করলাম মানে বোঝার—যদি একটু-আধটু পারি ! পারলাম না। এক- আধটা হয়তো আন্দাজে ধরলাম। মুনশিজিকে বললাম, আমার দ্বারা হবে না। তিনি চলে গেলেন।...তারপর অবাক কাণ্ড, একদিন সতীশের চিঠি পেলাম, রাজকমল মুনশি কলকাতা থেকে ফেরার পথে—ট্রেনেই মারা গিয়েছে। মিস্টিরিয়াস ডেথ।"

কিকিরা আর তারাপদ দু'জনেই আঁতকে ওঠার শব্দ করলেন।

কিকিরা বললেন, "সে আবার কী ! কেমন করে ? মিস্টিরিয়াস কেন ?"

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "মিস্টিরিয়াস তো বটেই। একটা লোক রেলগাড়িতে যাচ্ছে, হঠাৎ তার এমনই ফুড পয়জেনিং হবে যে দু-চার ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে ! ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক নয়, সেরিব্রাল স্ট্রোক নয় যে, সঙ্গে-সঙ্গে মারা যেতে পারে। ফুড পয়জেনিং কত মারাত্মক হতে পারে যে ঘণ্টা দুই- তিনের মধ্যে রাজকমল মারা যাবে !"

"কোনও ডাক্তার-বদ্যি... ?"

"মোগলসরাই স্টেশনে ওকে যখন নামিয়ে নেওয়া হল—নিশ্বাস পড়ছে না আর, মারা গিয়েছে রাজকমল।"

"হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও হল না ?"

"হলেও যা, না হলেও তাই। যে মারা গিয়েছে তাকে কাটাছেঁড়া করে একটা রিপোর্ট নিয়ে পুলিশ যা করার করতে পারে, তাতে আর আমাদের কী ! সতীশ আমায় চিঠিতে রাজকমলের এই অদ্ভুত মৃত্যুর কথা জানায়। আর জানায় যে, অজানা কোনও ভয়ঙ্কর ধরনের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান থেকে মারাত্মক এই ফুড পয়জেনিং হয়েছে বলে ডাক্তারদের ধারণা। তবে সতীশের ধারণা, রাজকমলকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে।"

কিকিরা সামান্য সময় চুপচাপ থাকলেন। চা খাওয়া শেষ। নামিয়ে রাখলেন কাপটা।

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "আরও মিস্ট্রি আছে হে ! রাজকমল মারা গেল—ঠিক আছে, কিন্তু তার মালপত্র ? কোথায় তার সুটকেস ? তালেগোলে তার সুটকেস উধাও। যে নেওয়ার নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। বিছানা, বালিশ, ঝোলা পড়ে আছে শুধু। এমনকী এঁটো টিফিন কেরিয়ার পর্যন্ত। রাতের খাবার খেয়েছিল ট্রেনে।"

তারাপদ বলল, "সুটকেসের মধ্যে ফোটো কপিগুলো ছিল !"

"নিশ্চয় থাকবে। যাবে কোথায় ?"

কিকিরা বললেন, "যার জিনিস তার কাছে ছিল—ঠিক কথা। কিন্তু আপনি বলছিলেন, আপনার এখানে চোরের উৎপাত হচ্ছে। কেন হচ্ছে তাও বলছিলেন। আপনার এখানে তবে চোর আসবে কেন ?"

"কেন আসবে সেটাই তো জানতে চাই।...শোনো কিঙ্কর, তোমায় সত্যি কথাটা বলি। রাজকমলের ফোটো কপি থেকে আমি ওই পাতা ক'টা ট্রান্সফার করিয়ে নিয়েছিলাম। ফোটো ট্রান্সফার। রাজকমল জানত। বলেছিলাম, আমার কাছে থাক একটা কপি—অবসরে দেখব।"

"শুধু রাজকমল জানতেন..."

"আর রথী। তাকে দিয়ে ট্রান্সফারের কাজটা করিয়েছি।"

"তা হলে ওই ওঁরা—যাঁরা সেদিন খাওয়াদাওয়া করতে এসেছিলেন—"

"ওদের কাছে আমি ভূত আর চোরের কথা তুললাম। কেন তুললাম— ?" নৃপতিনারায়ণ একটু যেন হাসির মুখ করলেন। বললেন, "তুমি বলবে, ওদের কেন সন্দেহ করছি !...করছি, কারণ দু' দিন দুটো ঘটনা ঘটেছিল এখানে—রাজকমল যখন আমার সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছিল। একটা ঘটনা, একদিন আমাদের কাজের কথার সময় গোস্বামী এসে হাজির। সে আসার পর আমরা নিজেদের কথা থামিয়ে অন্য কথাবার্তা শুরু করি। গোস্বামীর সঙ্গে রাজকমলের আলাপও করিয়ে দিই। আমি জানি না, পরে ওদের মধ্যে গল্পে-গল্পে এসব কথা উঠেছিল কিনা ! কিংবা রাজকমল কিছু বলেছিল ? গোস্বামীও খুঁচিয়ে কিছু জেনেছে কিনা !"

"আর-একটা ঘটনা ?"

"সেদিনও আমি আর রাজকমল কাজের কথা বলছি, হঠাৎ ঝড়, তারপরই বৃষ্টি। ঠিক সেই সময় বিশ্বপতি এসে পড়ল। গাড়ি ছিল সঙ্গে। নিজেদের কাজের কথা শিকেয় তুলে রেখে আমরা অন্য গল্প শুরু করলাম। কথায়-কথায় বেরিয়ে পড়ল, বিশ্বপতির সেজো শালা বেনারসে যে-মহল্লায় থাকে—রাজকমলও সেই মহল্লার লোক।..."

"বিশ্বপতিবাবুর শালা কী করেন সেখানে ?"

"এল আই সি-র এক কর্তা অফিসার। বিশ্বপতির শ্বশুরবাড়ির দেশ কাশী। এখন অবশ্য সেজো শালা আর তার ফ্যামিলি ছাড়া অন্য কেউ থাকে না।...দু'জনে বেশ জমে গেল কথাবার্তায়। আমি তখন বিশ্বপতিকে বললাম, বৃষ্টি তো পড়ছে অল্পস্বল্প, তুমি যাওয়ার সময় রাজকমলকে নিয়ে যেয়ো।"

"বুঝেছি। ওঁরা দু'জনে—"

"একই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল রাত সোয়া ন'টা নাগাদ। গাড়িতে দু'জনের মধ্যে যদি কোনও কথাবার্তা হয়ে থাকে আমি জানি না।"

"আপনি তা হলে সন্দেহ করছেন, হয় গোস্বামীজি না হয় বিশ্বপতি—এদের কেউ, বা দু'জনেই রাজকমলের কাছে মোটামুটি ফোটো কপির বৃত্তান্ত শুনে এখন আপনার কাছ থেকে—"

"সন্দেহ আমি সকলকেই করতে পারি। বিশ্বপতি আর কাশীনাথ হরিহর আত্মা। আবার গোস্বামীর সঙ্গে ভাদুড়ির। দু'জনেই টালিগঞ্জে একই জায়গায় ফ্ল্যাট কিনেছে, সেখানেই থাকে। দহরম-মহরম আছে। তবে গোস্বামীর সঙ্গে বেশি মেশামিশি শ্যামলালের।"

"এই আটজনই কি জানেন রাজকমল কীভাবে মারা গিয়েছেন ?"

"জানে। আমি বলেছি। তবে সতীশের সন্দেহের কথা বলিনি।"

"কেন ?"

"সতীশের মতন আমারও সন্দেহ রাজকমলকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে।" বলে নৃপতিনারায়ণ আবার একটা পান তুলে নিলেন। "রাজকমলের সুটকেস চুরির কথাটা ভুলে যেয়ো না। তার মধ্যে ফোটো কপিগুলো ছিল।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। অন্যমনস্ক। তারাপদর দিকে তাকালেন। তারাপদ হতভম্ব হয়ে বসে আছে।

খানিক পরে কিকিরা বললেন, "আমার কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাথায় ঢুকছে না। ভাবতে হবে পরে।...আচ্ছা, আপনি যা দেখেছেন—লেখা আর ছবি—কিছুই বুঝতে পারেননি ?"

"না। দু-একটা আন্দাজ করেছি।"

"যেমন ?"

"ওই পাতাগুলোয় বোধ হয় 'পউরিদের' কিছু ক্রিয়াকর্ম, ওদের

কোনও মন্ত্রতন্ত্র, দু-চারটে গোপনীয় ওষুধ-বিষুধের কথা লেখা আছে।"

"ওদের ক্রিয়াকর্ম ! সে কেমন ?"

"আছে। আমি তো জানি না। রাজকমল আমায় যে খাতা দিয়েছে—সেটা তুমি নিয়ে গিয়ে পড়তে পারো। তাতে কিছু-কিছু পাবে।"

তারাপদ বলল, "বুকলেট ?"

"না, টাইপ করা কাগজ। বাঁধিয়ে খাতার মতন করা। অরিজিন্যাল টাইপ থেকে কপি...।" পানটা মুখে দিলেন নৃপতিনারায়ণ, তারপর যেন নিজের মনেই বললেন, "ওদের মধ্যে অদ্ভুত প্রথা। কেউ মারা গেলে দাহ করার আগে তাকে নিম গাছের তলায় বসিয়ে পুরো একটা দিন স্নান করাতে হবে, গন্ধ তেল মাখাতে হবে সারা গায়ে, ফুলচন্দন ছিটোতে হবে। তারপর দাহকাজের ঠিক আগে গোল হয়ে বসে গান। শেষে দাহ।"

তারাপদ বলল, "ওরা পরকাল, পরজন্ম বিশ্বাস করে নাকি ?"

"ওরা পরকাল, ভূত-প্রেত, মায়া, মার, মন্ত্রতন্ত্র সবই বিশ্বাস করে। আগেই বলেছি, তখনকার সমাজের নানান ধর্মকর্ম আচার-বিচার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস—যা প্রচলিত ছিল তার থেকে পউরিরা এটা-ওটা নিয়েছে, অর্থাৎ প্রভাব এড়াতে পারেনি। তার সঙ্গে নিজেদের রুচি আর মরজি মতন একটা নিজস্বতা মিশিয়ে নিয়েছিল।"

তারাপদ অন্যমনস্কভাবে বলল, "আমার বড় অদ্ভুত লাগছে।"

"অদ্ভুত লাগার কিছু নেই," নৃপতিনারায়ণ বললেন, "মধ্যযুগের ইতিহাসে এরকম অজস্র হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। এক-একটা ঢেউ এসেছে, আছড়ে পড়েছে, মিশে গিয়েছে। কার মধ্যে কতটা মিশেছে সেসব নিয়ে পণ্ডিতরা মাথা ঘামান—আমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।...আমার নিজের ইন্টারেস্ট, রাজকমলের কাছ থেকে আমি যে কয়েকটা পাতা ট্রান্সফার করিয়ে নিজের কাছে রেখেছি—এই কথাটা কেমন করে বাইরের লোকে জানল ? রাজকমল না বললে জানা সম্ভব নয়। আর রথী ছাড়া অন্য কেউ ট্রান্সফারের কথা জানে না। রথী আমার নিজের লোক, সন্তানতুল্য। তাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।...তা সে যাই হোক, যারা জেনেছে তারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমার বাড়িতে..."

কথার মধ্যে বাধা দিয়ে কিকিরা বললেন, "আপনার বাড়িতে চোর আসছে, এ-ব্যাপারে আপনি নিঃসন্দেহ ?"

"একশো ভাগ। সেদিন তবে বললাম কী ? রুমাল, পেনসিল টর্চ..."

"মামুলি চোরও তো আসতে পারে।"

"না। মামুলি চোর আমার ঘরে আর কী পাবে ! যদি বলো ছিঁচকে ঘটিবাটি-চোর এসেছিল, তবে অন্য কথা।"

"আপনার কাছে সেই ফোটো পাতাগুলো সব আছে ?"

"মাত্র তিনটে।"

"কেন ?" কিকিরা অবাক ! বললেন, "রাজকমল আপনাকে মাত্র তিনটে পাতা..."

"তা হলে স্পষ্ট করে বলি তোমায়, রাজকমল নিজে ছ'-সাতটার বেশি পাতা জোগাড় করতে পারেনি। তার মধ্যে মাত্র তিনটে পাতা আমাকে নকল করে রাখতে দিয়েছে। তাও পর পর পাতা নয়, অলটারনেট পেজ, মানে একটা বাদ দিয়ে অন্যটা। আমার কাছে যে পাতাগুলো আছে তার সংখ্যা ধরা বেশ মুশকিল। আমার মনে হয়, সাতান্ন, উনষাট আর একষট্টি পাতা তিনটে আমার কাছে আছে।"

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, "এরকম করার কারণ ?"

নৃপতিনারায়ণ হেসে বললেন, "সাবধান হওয়া। রাজকমলও সাবধান হতে চেয়েছিল। পরপর পাতা না থাকলে লিঙ্ক নষ্ট হয়ে যায়। রাজকমল ভেবেছিল, কে জানে—এই বুড়ো লোকটা যদি পাতাগুলো পরপর হাতে পেয়ে কোনও সুবিধে করে নেয় !"

"অবাক কাণ্ড ! আপনার কাছে এল, আবার আপনাকেই অবিশ্বাস !"

"অমন হয়। যাক গে, এবার আমায় ডাক্তারের জন্যে তৈরি হতে হবে।...তোমায় সেই টাইপ-করা কাগজগুলো দিচ্ছি। পড়ে নিয়ো। ওগুলো ইংরিজিতে লেখা। আগে পড়ো, তারপর আবার কথাবার্তা হবে।...তবে কিঙ্কর, চোর আমাকে ধরতেই হবে।"

॥ ৪ ॥

চন্দন ফিরে এসেছিল।

ক্যাম্প থেকে ফিরে বেচারির অবস্থা কাহিল। পরিশ্রম যা হওয়ার তা তো হয়েছেই, উপরন্তু গরমে, নানা ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় একেবারে বিপর্যস্ত।

ওরই মধ্যে তারাপদ এল বন্ধুর কাছে। খবরাখবর নিল, নতুন খবর জানাল কিকিরার। তারপর সেদিন চন্দনকে নিয়ে কিকিরার বাড়ি।

দিন চার-পাঁচ পরে তারাপদকে দেখলেন কিকিরা। চন্দনকে অন্তত দিন দশ-বারো পর।

কলকাতায় একনাগাড়ে গরম চড়তে-চড়তে হঠাৎ আগের দিন দু' পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় দিনটা সামান্য ঠাণ্ডা। আরাম লাগছিল খানিকটা।

কিকিরা বসে-বসে ঘোলের শরবত খাচ্ছিলেন। বগলা দিয়েছে বলে খাচ্ছিলেন, নয়তো ঘোলে তাঁর রুচি নেই। আমপোড়ার শরবতই তাঁর পছন্দ। কিন্তু বাজারে এখনও পোড়াবার মতন আম ওঠেনি।

চন্দনকে দেখে কিকিরা খুশি হলেন।

"আরে এসো, এসো স্যান্ডেলউড ! কোথায় ক্যাম্প করতে গিয়েছিলে ? বেশ কাহিল দেখাচ্ছে যে ! একেবারে রোদপোড়া চেহারা দেখছি !"

চন্দনরা বসল। কথা বলল। গিয়েছিল সুন্দরবনের দিকে। একটা 'এপিডেমিক' লাগব-লাগব করছিল, আন্ত্রিক ধরনের। সামলাতে গিয়েছিল। হেল্থ সেন্টারগুলোর সাধ্য ছিল না সামলাবার। আর ক'টাই বা সেন্টার !

কিছুক্ষণ চন্দনের বৃত্তান্ত শোনার পর কিকিরা বললেন, "তোমায় তো ফ্যাসাদেই পড়তে হয়েছিল।"

"তা হয়েছিল। তবে এসব আমাদের পার্ট অব দ্য জব ! কী আর করা যাবে ! আপনার কথা বলুন। তারার মুখে শুনলাম, আপনি বেহালা-কেস নিয়ে পড়েছেন ?"

"বেহালা-কেস !" বলেই কিকিরা তামাশাটা ধরে ফেললেন। হাসলেন। "বলেছ ভাল, বেহালা-কেস ! তা বেহালা- কেস না বলে বেহাল কেসও বলতে পারো। না, আমি ওই কেস নিচ্ছি না।"

"সে আবার কী ! কেন ?"

"ধ্যুত, ও বড় জটিল। দলা পাকানো উলের পুরনো বান্ডিল, খেই পাচ্ছি না।"

"উইথড্র করছেন তবে ?"

"হ্যাঁ। না করে উপায় কী বলো ? আমি তো আর বেতিয়া বা বেনারস যেতে পারব না। ইচ্ছেও নেই।"

"বেনারসে আপনারও বন্ধু আছে না, সার ? সেই যে সেবার গেলেন বগলাদাকে নিয়ে। আপনি তো পালিয়ে এলেন ক'দিন পরেই, এসেই ফুলকুমার-কেস ! বেনারস ছেড়ে এসে বগলাদার কী আফসোস !"

কিকিরা বললেন, "বগলা কেন হে, কাশীর নামে অনেকেরই জিভে জল পড়ে। আমারও ভাল লাগত এককালে। এখন আর

নিজের জায়গাটি ছেড়ে বাইরে যেতে মন চায় না। সেবার এক পুরনো বন্ধু এসেছিল, কলকাতায় ধরে নিয়ে গেল। ওরা সব এককালে ছোটখাট রইস লোক ছিল বেনারসের। পেল্লায়-পেল্লায় বাড়ি করেছিল, তাতে আর কিছু না হোক ভাঙাচোরা কুঠরিগুলোয় শেষপর্যন্ত টিকটিকি, গিরগিটি, বেড়াল, পায়রা, বিছে থাকার সুবিধে হয়েছিল।"

"কোথায় ছিল বাড়িটা ?"

"নাগোয়া। বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগও নেই এখন। ও তখনই একটা হোটেল খোলার মতলব করছিল গোধুলিয়ার দিকে। কী জানি হোটেল খুলেছে কিনা !"

"আপনি তা হলে সত্যি-সত্যি বেহাল ?" চন্দন ঠাট্টা করে বলল।

"কী করব বলো ! কিছু একটা ধরতে পারলে তো এগুবো— ! তোমাদের সিগারেট দাও একটা।"

চন্দন সিগারেট দিল। কিকিরা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান মারলেন কয়েকবার। কাশলেন। তারপর বললেন, "আজ ক'দিন ওই একই চিন্তা মাথায় চক্কর মারছে। ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। সোনাদানা, মণিমুক্তো, দলিল-দস্তাবেজ, পাঁচ-সাত শো বছরের পুরনো মূর্তি—এসব কিছুই নয়, শুধু তিনটে ফোটোকপি পাতার জন্যে চুরিচামারিতে নেমে পড়বে ক'টা লোক—বিশ্বাসই হয় না।"

তারাপদ বলল, "নৃপতিবাবুর সঙ্গে আপনার আর কথা হয়েছে ?"

"ফোনে হয়েছে। চাঁদু, আমাদের একটা ফোন দরকার। পরের ঘরবাড়ি, দোকান থেকে মন খুলে কথা বলা যায় না।"

"আপনি কি ওঁকে বলে দিয়েছেন, কেস ছেড়ে দিচ্ছেন ?" ঠাট্টার গলা তারাপদর।

"না, তা বলিনি। বলেছি, বিদ্যেয় কুলোচ্ছে না।"

"তা বলুন। বলতে আপত্তি কিসের !··· তা আপনি রাজকমলের দেওয়া ওই টাইপ-করা পাতাগুলো সব পড়েছেন, সার ? দত্তমশাইকে যেগুলো দিয়েছিল রাজকমল !"

"একবার নয়, অনেকবার।"

"নতুন কিছু পেলেন ?"

"পাওয়া বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ ? ওটা কোনও গোপনীয় ব্যাপার নয়। 'পউরি' সম্প্রদায় তাদের রীতিনীতি, ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে একটা ভূমিকা। নোট্স বলতে যা বোঝায়। ওর মধ্যে আর কিছু নেই। নৃপতিবাবুর মুখে যা শুনেছ মোটামুটি তাই আছে। তুমিও পড়ে দেখতে পারো। এটা ঠিকই যে, 'পউরি'রা একট আলাদা সম্প্রদায়। সেক্ট ছোট, কিন্তু অনেক পুরনো। রামানন্দ স্বামী কিংবা কবিরের সময়, সেটা যাই হোক, তার অনেক, অনেক পরে ওরা দেখা দেয়। নেপালের দিক থেকে ওরা আসেনি। তবে বৌদ্ধদের ছাপ পড়েছে। যোগীটোগী, বৈষ্ণব—সুফি সবই নাকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তা তত্ত্ব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। একবর্ণও বুঝব না। মোদ্দা কথা হল—'পউরি'দের কাছে ওই পুঁথি সত্যিই অতি মূল্যবান। বিগ্রহই বলা যায়। প্রতিদিন পুজো হয় পুঁথির।"

চন্দন অবাক হয়ে বলল, "পুঁথির পুজো ?"

"হ্যাঁ। অবাক হওয়ার কী আছে ! আমরা যদি বিগ্রহ পুজো করতে পারি রোজ, ওরা পারবে না ? ওই পুঁথি ওদের কাছে বিগ্রহের মতন।"

"এরকম হয় ?"

"কেন হবে না ! কাশীতেই হয়। কবির চৌরা মঠের কথা শুনেছি।"

"পউরিদের অমন পুঁথি তবে চুরি গেল কেমন করে ? আবার উদ্ধারই বা হল কীভাবে ?" তারাপদ বলল।

কিকিরা বললেন, "এই লেখার মধ্যে সেসব কথা নেই। থাকার কথাও নয়। লেখাটা হল ইতিহাস, বিবরণ—'পউরি'দের সম্পর্কে। তাতে আছে মঠের মধ্যে যে মন্দির আছে, সমাধিমন্দির—তার মাঝখানের ঘরে, গালা আর কাচের চৌকোনা বাক্সের মধ্যে পুঁথি রাখা থাকে। পুজো হয় তার সামনে বসে। এই পুঁথি বাইরের কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। শুধু বছরে একদিন সেটা বাইরে রাখা হয়। উৎসবের দিন। যারা দেখতে চায় দেখতে পারে—তবে তফাত থেকে।"

"সেই দিনটা কবে ?"

"জন্মাষ্টমীর পরের দিন।"

চন্দন খেয়াল করতে পারল না। জন্মাষ্টমী শুনলে বর্ষা-বর্ষা মনে হয়। বলল, "সেটা কবে যেন ?"

কিকিরা বললেন, "পাঁজিতে যেমন থাকে। ভাদ্রমাসেই মোটামুটি।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "বলেন কী সার ! ভাদ্র হলে তো মাস ছয়েক হতে চলল। গত ভাদ্রেই তবে চুরিচামারি হয়েছে।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "মনে হয় না ! গত জন্মাষ্টমীতে উৎসব হতে পারে মঠের, ভিড়ও হতে পারে ভক্ত লোকজনের, পউরিদের, বাইরের লোকেরও— তা বলে পুঁথি চুরি যাবে কেন ? দেখার জন্যে বাইরে সাজিয়ে রাখলেই চুরি যাবে ? বরং তখন আরও সাবধান হবে মঠের লোক। সেদিন চুরি হওয়া মুশকিল।"

"তা হলে কবে চুরি হয়েছিল ?"

"বলতে পারব না। আমার মনে হয়, বেশিদিন আগে হয়নি। হলে সঙ্গে-সঙ্গে ধরা পড়ত। এ তো আর সিন্দুকে বন্ধ-থাকা জিনিস নয় যে, চোখের আড়ালে থাকবে। যা সামনে নিত্যি দেখা যাচ্ছে তা নজর এড়াবে কেমন করে !"

চন্দন বলল, "মজা মন্দ নয় দেখছি। চুরিও হল, আবার ফিরেও পাওয়া গেল। মাঝখান থেকে ক'টা পাতা মিসিং।"

বগলা চা এনেছিল। ঠাণ্ডা লেবু-চা। বগলার তাগাদায় পড়ে কিকিরাকে একটা আইস বক্স কিনতে হয়েছে। আইস বক্সের মধ্যে বোতল রেখে জল ঠাণ্ডা করে বগলা। বাজারের পানের দোকানের কাঁচা বরফ জলে দেওয়া তার পছন্দ নয়। বরফ থাকুক বাক্সে। ব্যবস্থাটা ভালই করেছে বগলা। বাবু কবে যে একটা ঠাণ্ডা-মেশিন কিনবেন কে জানে !

চা তুলে নিয়ে তারাপদ বলল, "ব্যাপারটা তা হলে এখন কী দাঁড়াচ্ছে, কিকিরা ?"

"কী দাঁড়াচ্ছে ! দাঁড়াচ্ছে এই যে, চুরি বেশিদিন হয়নি। আবার চুরি যাওয়ার পর পুঁথিটা পাঁচ-সাতদিনের বেশি বেপাত্তাও থাকেনি। তা যদি হত তবে ঝঞ্ঝাট বেড়ে যেত মঠের মহান্তদের।"

"মহান্ত ?"

"এমনি বললাম, মহান্ত কথাটা মুখে এসে গেল। মঠ বললেই মহান্ত মুখে আসে। মহান্ত না বলে যদি মঠের গুরুজি স্বামী বলতে চাও বলতে পারো।··· আমি কী বলছি বুঝতে পারছ ? আমি বলছি, এই চুরির কেচ্ছা দু-চারদিন চেপে রাখা যায়, তার বেশি যায় না। মঠে যারা পুঁথির পুজো করে—তারা ছাড়া অন্যরা তো রোজ ভেতরে ঢুকে পুঁথি দেখছে না। কাজেই চুরি চোখে পড়েছে দু-একজনের, যারা মঠের মাথা। আবার হইচই হওয়ার আগে পুঁথি ফেরত। কাজেই মঠের অন্যরাও চুরির কথা জানতে পারল না।"

"পুঁথির ভেতর থেকে ছ'টা পাতা মিসিং তাও বা কেমন করে জানবে অন্যরা ?"

"জানতে পারবে না। তুমি একটা বই কিনলে, বইয়ের মধ্যে থেকে যদি দু-দশটা পাতা কেউ ব্লেড মেরে সরিয়ে নিয়ে

থাকে—তুমি জানবে কেমন করে যতক্ষণ না নিজে বইটা ঘাঁটাঘাঁটি করছ। আমরা তাসের যেসব 'ইজি ম্যাজিক' দেখাই— তাতে অমন কাটাকুটির কায়দা অনেক থাকে! ও- কথা বাদ দাও, এই কেসটায় আমার মনে হয় পুঁথি ফেরত পাওয়ার পর মঠের হেড বাবাজিরা যখন খুঁটিয়ে পাতাগুলো দেখতে যায়— তখন ধরা পড়ে মাঝের ছ'টা পাতা নেই।"

"কত পাতার পুঁথি ওটা?" চন্দন জানতে চাইল।

"নৃপতিবাবুকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন, রাজকমলের হিসেব মতন একশো পঁচিশ পাতার মতন। তার বেশি পাওয়া যায়নি।"

"রাজকমল কোন সময়ে নৃপতিবাবুর কাছে এসেছিলেন?"

"পুজোর পর, দেওয়ালির সময়।"

"এ-বছর দেওয়ালি গিয়েছে নভেম্বরের গোড়ায়।"

"ফার্স্ট উইকে।"

"রাজকমল কতদিন ছিলেন কলকাতায়?"

"হপ্তা দুই-তিন।"

"ট্রেনে মারা যাওয়ার ঘটনা কবে ঘটে সার?"

"নৃপতিবাবু বলেছেন, ডিসেম্বরের শেষে।" কিকিরা বললেন। "উনি অবশ্য খবরটা পান অনেক পরে, প্রায় মাস খানেক পরে। কাশী থেকে সতীশবাবুর চিঠি পাওয়ার পর।"

"রাজকমল কি কলকাতায় আরও বেশিদিন ছিল? নৃপতিবাবুকে না জানিয়ে, কিংবা উনি অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন— ?"

"নৃপতিবাবু তা জানেন না।"

আরাম করে চা খেতে-খেতে তারাপদ বলল, "চাঁদু, একটা লোক ফুড পয়জেনিং হয়ে দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে?"

চন্দন বলল, "পারে। সাধারণ ফুড পয়জেনিং হলে হওয়ার কথা নয়। যদি মারাত্মক কোনও পয়জেন পেটে যায়—তবে হতে পারে। তা ছাড়া এটাও তো দেখতে হবে রানিং ট্রেনে মেডিক্যাল হেল্প পাওয়া সম্ভব নয়। কেউ যদি খুব খারাপ কোনও বিষ রাজকমলকে দিয়ে থাকে —তবে তিনি মারা যেতে পারেন। একে ফুড পয়জেনিং না বলে পয়জেনিং করে মেরে ফেলার চেষ্টা বলা যায়। এখন সেটা মুখে খাওয়ানো হয়েছিল, না, অন্যভাবে শরীরে দেওয়া হয়েছিল, কেমন করে বলব!"

কিকিরা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় প্যাসেজে শব্দ পাওয়া গেল। দরজা খুলল বগলা। গলা শোনা গেল রথীনের। রথীন এসে ঘরে ঢুকলেন।

"আসুন রথীদা।"

রথীন দেখলেন তারাপদদের। চেনা মুখ। ওরা— তারাপদ আর ওই ডাক্তার ছোকরা যে কিকিরার শাগরেদ তাও জানেন। চেনা-চেনা হাসিমুখ করে তারাপদদের যেন 'খবর কী' গোছের সৌজন্য জানিয়ে কিকিরাকে বললেন, "তুমি আমার সকাল-সন্ধের আড্ডার বারোটা বাজিয়ে দিলে! আমি বাপু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—তোমরা আমায় ফাঁসিয়ে দিলে।"

"বসুন আগে।"

"বসছি না হয়। আগে জল আনতে বলো! তেষ্টায় মরে যাচ্ছি।"

কিকিরা হাঁক দিলেন বগলাকে, জল আনতে বললেন।

তারাপদ লক্ষ করে দেখল, রথীনবাবুর মুখ, গলা ঘামে ভিজে গিয়েছে। কপাল গড়িয়ে ঘাম নামছে চোখে। ভদ্রলোকের চেহারা মোটেই মোটাসোটা নয় যে, এত ঘামতে পারেন। বিশেষ করে আজ গরম খানিকটা কম।

বগলা জল নিয়ে এল।

জল খেয়ে রথীন মুখ, গলা মুছতে লাগলেন রুমালে।

কিকিরা বললেন, "আপনি কি খুব দৌড়ঝাঁপ করেছেন ?"

"করব না ? একদিকে ওই বৃদ্ধ আর অন্যদিকে তুমি। বৃদ্ধ একবার ফোন ধরলে সহজে ছাড়তে চান না। ওঁর কথার শেষ নেই। কী করব বলো। দত্তকাকা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। উনি বরাবরই আমাদের আত্মীয়ের মতন ভাবেন। বাবা নেই, মা আমার বেঁচে আছেন। ও-বাড়ি সম্পর্কে মায়েরও আবার টান।... যাকগে এসব কথা, তুমি আমায় যে-খোঁজগুলো নিতে বলেছিলে, নিয়েছি।"

"নিয়েছেন ! কী মনে হচ্ছে— ?"

"তিনজনকে তুমি স্ট্রেট বাদ দিতে পারো।"

"অরবিন্দবাবু, ধূর্জটি সিংহ... আর ?"

"ধনরাজ।" বলে রথীন একবার পাখার দিকে তাকালেন, রুমালটা রাখলেন পকেটে। "কিঙ্কর, তোমার এই পাখাটা ওয়েলিংটনে বেচে দিয়ে এসো। এটা আর পাখা নেই, খাঁখাঁ হয়ে গিয়েছে। এখন বেচলে শ'খানেক টাকা পেতে পারো।"

কিকিরা হাসলেন। তারাপদরাও।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন রথীন। বললেন, "আমি ভাল করে খোঁজখবর নিয়েই তোমায় বলছি—ওই তিনজন—মজুমদার, সিংহ আর ধনরাজের সঙ্গে রাজকমলের কোনও সম্পর্ক নেই। ধূর্জটিবাবু তাঁর ট্রাভেলিং এজেন্সি নিয়ে পড়ে থাকেন, বয়স্ক মানুষ ; অরবিন্দবাবু আছেন তাঁর পরিবারের লোকজন নিয়ে, স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি আছে। ওদের নিয়েই থাকেন, আর পাড়ায় অল্পস্বল্প সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন। ভদ্রলোকের দুর্নাম নেই পাড়ায়, বরং সুনাম রয়েছে। আমিও তো ওঁকে অনেকদিন ধরে দেখছি।"

কিকিরা বললেন, "আর ধনরাজ ?"

"ধনরাজ সাদামাটা ব্যবসাদার। নিরীহ প্রকৃতির। তার হল কাগজের দোকান। ক্যানিং স্ট্রিটে। দেশবাড়ি ছিল পূর্ণিয়ায়। কলকাতায় দু' পুরুষ। ধনরাজ সরল মানুষ।"

"আটের মধ্যে তিন বাদ। থাকল পাঁচ..."

তারাপদ হঠাৎ ঠাট্টা করে বলল, "রইলো বাকি পাঁচ।"

রথীন বললেন, "পাঁচের মধ্যে একজন সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

"কে ?"

"কাশীনাথ।"

"কাশীনাথ ! কেন ?" কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, "কাশীনাথের সঙ্গে রাজকমলের সম্পর্ক কী ! বরং কাশীনাথের প্রাণের বন্ধু বিশ্বপতির শালা আর রাজকমলের বাড়ি কাশীর একই মহল্লায়। নৃপতিবাবু যা বলেছেন তাতে মনে হল, বিশ্বপতির সঙ্গেই রাজকমলের দোস্তি জমেছিল।"

"তা আমি জানি না," রথীন বললেন, "দত্তকাকার মুখে আমিও শুনেছি, বিশ্বপতি আর রাজকমলের মধ্যে ভাবসাব হয়েছিল। তবে আমি ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, রাজকমল কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকদিন কাশীনাথের কব্জায় ছিল।"

"কব্জায় ! মানে ?"

"কাশীনাথ রাজকমলকে মাঝ কলকাতার এক মাঝারি হোটেলে ঘর ঠিক করে দিয়েছিল। সাউথ ইন্ডিয়ান হোটেল।"

"কে বলল ?"

রথীন হাসলেন।

কিকিরা বললেন, "এটা তো মস্ত ইমপর্টেন্ট খবর।" গলায় যত আগ্রহ, চোখে ততটাই কৌতূহল। কেমন করে খবরটা জোগাড় করলেন ?"

রথীন সিগারেট খাওয়ার সময় অনেকটা করেই ধোঁয়া টেনে নেন। এটা ওঁর অভ্যেস। একমুখ ধোঁয়া গিলে রথীন বললেন, "কাশীনাথবাবুর হালফিলের খোঁজখবর করতে গিয়ে জেনেছি। ওঁকে আমি চিনি অনেকদিনই, তবে ওপর-ওপর, দত্তকাকার ওখানেই পরিচয়। ভদ্রলোক ম্যাডান স্ট্রিটে ইলেকট্রনিক্সের কাজ কারবার করেন। পরেশ মিত্তির বলে আমার চেনা একজন কাশীনাথকে চেনে। পরেশ একটা ক্যাসেট কোম্পানি খুলে চালাবার চেষ্টা করছে। সে খবরটা দিল। বলল, 'আরে ওই কাশীনাথবাবুকে দেখি একটা সাউথ ইন্ডিয়ান হোটেলে হরদম যায়। সঙ্গে এক নন-বেঙ্গলি।'"

"রাজকমল !" তারাপদ বলল।

"রাজকমলই। পরে আমি হোটেলে গিয়ে নানান বাহানা করে খোঁজ নিয়ে দেখলাম। পরেশ ঠিকই বলেছে। রাজকমল ওই হোটেলে ছিল।"

"কতদিন ?"

"দশদিন। খাতায় আছে।"

"আগে যেন কোথায় থাকতেন রাজকমল ? দত্তবাবুর কাছে যখন আসতেন। আমার মনে হচ্ছে দত্তবাবু কোন এক নিবাসের কথা বলেছিলেন—দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি।"

"মহেশ্বরী নিবাস।"

"রাজকমল কবে হোটেল ছাড়েন ?"

"উনিশে জানুয়ারি।"

চন্দন কিকিরার দিকে তাকাল। "সার, নৃপতিবাবু এই খবরটা জানেন না। না জানায় হিসেব গোলমাল হচ্ছে। ভদ্রলোক কবে মারা যান ?"

"বিশে জানুয়ারি," কিকিরা বললেন। "তবে তারিখ নিয়ে একটু গণ্ডগোল আছে। রাজকমল মারা যাওয়ার খবরটা দত্তমশাই তো সঙ্গে-সঙ্গে পাননি। অনেকটা পরে পেয়েছেন। কারণ খবরটা যিনি চিঠিতে দিয়েছেন সেই কাশীর সতীশবাবু নিজেই খবর শুনেছেন সামান্য পরে, তারপর চিঠি লিখেছেন। আর আজকাল চিঠি পাওয়ার ঝকমারি তো জানোই তুমি। যে চিঠি একদিন-দু'দিনে পাওয়ার কথা, তা পেতে-পেতে, যদি একান্তই পাও— অন্তত এক হপ্তা।"

বগলা চা এনে দিল রথীনকে। দুধ-চিনি দেওয়া চা।

রথীন চুমুক দিলেন চায়ে। বললেন, "আমার যতটুকু খোঁজখবর নেওয়া—তাতে দেখছি শ্যামলাল, জে. ভাদুড়ি— এঁদেরও বাদ দেওয়া যায়।"

কিকিরা বললেন, "রথীদা, বাদ যাওয়ার লিস্ট পরে হবে, এখন একবার হাওয়া খেতে বেরুতে হয়। চলুন, বাইরে কোথাও গিয়ে বসি। ঘরে আর পারা যাচ্ছে না।"

॥ ৫ ॥

পরের একটা সপ্তাহে যা ঘটল তাতে মনে হতে পারে, রাজকমল মুনশির ঘটনাই হোক বা পুঁথির পাতা চুরির ঘটনা—কোনও ব্যাপারেই আর এক পা-ও এগুতে পারলেন না কিকিরা। অর্থাৎ হাত ধুয়ে ফেলা ছাড়া উপায় ছিল না তাঁর।

ফাল্গুনের একেবারে শেষ। পরপর দু'দিন কালবৈশাখী দেখা দিল। প্রথমটা জোর, রীতিমত ঘণ্টাখানেক ধরে তছনছ করল গাছপালা, ডাল ভাঙল গাছের, তার ছিঁড়ে গেল ট্রাম লাইনের, কাঁচা বাড়ি পড়ল দু-একটা, আর জল জমে গেল বৃষ্টিতে রাস্তায় রাস্তায়।

পরের দিন অত ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিল না কালবৈশাখী। তবে বৃষ্টি হল দু-এক পশলা।

নৃপতিনারায়ণ তলব করছিলেন কিকিরাকে।

সপ্তাহখানেক পরে কিকিরা বেহালায় গেলেন। সঙ্গে তারাপদ। চন্দন যেতে পারল না। কথা ছিল রথীনও চলে

যাবেন সরাসরি।

নৃপতিনারায়ণের বাড়ি ঢোকার মুখেই অমরের সঙ্গে দেখা। নৃপতি দত্তের ছেলে। দত্তকপুত্র যদিও, তবু ব্যাপারটা এত পুরনো যে, কথাটা কারও মনে থাকে না। অমর পরিশ্রমী, সৎ, বাধ্য ছেলে নৃপতির। আচার-আচরণ অতি ভদ্র। স্বভাবটিও সুন্দর। শান্ত প্রকৃতির মানুষ অমর।

কিকিরা চিনতেন অমরকে।

"বাবা ?" অমর বলল। মুখে হাসি।

"হ্যাঁ, ডাক পড়েছে। তুমি কেমন আছ ?"

"ভাল।"

"শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে যে !"

"বয়েস হচ্ছে কিঙ্করদা।"

"অ্যাই তো ! বয়েস ! তোমার ! আমার চেয়ে ছোট তুমি। তোমার বোধ হয় ফরটি ফাইভ হবে।"

অমর হাসল। "কাজকর্মের অবস্থা ভাল নয়। যা পারছি করছি। বাবাকে ব্যস্ত করতে চাই না। একে বয়েস, তার ওপর শরীরের গোলমাল তো আছেই। আজকাল তো প্রেশার নিয়ে বেশ ভোগেন !...ভাল কথা, আরেক দিন আপনাকে দেখেছি। আমি দোতলায় ছিলাম।"

কিকিরা হেসে বললেন, "দেখতে পারো। কর্তার ডাক পড়লে আসতেই হয়।"

কী ভেবে অমর বলল, "কর্তাকে বলবেন, ডাক্তার ওঁকে ফিট সার্টিফিকেট দেননি। রাত জেগে বাগানে পায়চারি করতেও নয়।"

কিকিরা অবাক ! "মানে ? তুমি দেখেছ পায়চারি করতে ?"

"পরশুই দেখেছি। গত পরশু আমার হজমের গোলমালে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল বারবার। এটা-ওটা—হাতের কাছে যা জুটছিল, অ্যান্টাসিড, পুদিনার আরক খাচ্ছিলাম। বিশ্রী অস্বস্তি। তখন খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ল কর্তা বাগানে ঘুরছেন। হাতে টর্চ।"

"রাত তখন ক'টা ?"

"বারো-সাড়ে বারো হবে।"

"তুমি বলোনি কিছু ?"

"আমি ? না ! আমার স্ত্রী বলেছে।"

"কী বললেন ?"

"বললেন না কিছু, শুধু মাথা নাড়লেন, হুঁ।"

অমর আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

তারাপদ বলল, "কিকিরাসার, ছেলে বাবাকে খুব ভয় পান ! তাই না ?"

"সমীহ করে। দত্তবাবু একসময়ে বড় মেজাজি ছিলেন। নিজের মরজিতেই যা করার করতেন। ওঁকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করত না। তবে তারা, মানুষ বড় বিচিত্র। এই দত্তবাবু ছেলেকে যত ভালবাসেন, তার দশগুণ বেশি বাসেন ছেলের বউ আর নাতিনাতনিদের। সকালটা ওদের নিয়েই কাটান শুনেছি।"

কথা বলতে-বলতে কিকিরারা ভেতরে এলেন।

নৃপতিনারায়ণ রেডিওতে কিছু শুনছিলেন, বন্ধ করে দিলেন। "এসো।"

কিকিরারা সামনে এসে দাঁড়ালেন। "ডেকে পাঠিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। আগে বসো।"

কিকিরারা বসলেন।

সামান্য অপেক্ষা করে নৃপতিনারায়ণ বললেন, "তোমায় কয়েকটা ইমপর্টেন্ট কথা বলার আছে। দেখাবারও।" বলতে গিয়ে হাসলেন কয়েক মুহূর্ত, আবার বললেন, "পরশুদিন আমি কাশী থেকে সতীশের চিঠি পেয়েছি। তুমি ওকে আর-একটা চিঠি লিখতে বলেছিলে—মনে আছে। লিখেছিলাম। জবাবও পেয়েছি। পেয়ে আমি অবাক ! সতীশ লিখেছে, রাজকমল কলকাতায় আসার আগে ওকে কোনও কাগজপত্র, ফোটো, লেখাটেখা দেখায়নি। শুধু কথায়-কথায় একজন ক্রিপ্টোলজিস্টের কথা জানতে চায়। সতীশ নিজেই একজন স্কলার। তবে সে হিন্দু ফিলোজফি নিয়ে চর্চা করেছে আজীবন। ক্রিপ্টোলজি সম্পর্কে তার ধারণা নেই। সে রাজকমলকে আমার নাম-ঠিকানা দেয়। দু' কলম লিখে দেওয়ার উপায় ছিল না তার। চোখে একটা অপারেশান হয়েছিল সতীশের। ছোট অপারেশান। ঠুলি আঁটা চোখ বলে কিছু লেখেনি। রাজকমলের কাছে কী আছে, সে দেখেনি ; রাজকমলও দেখায়নি। তার মানে কোনও সন্দেহও হয়নি।...আবার ওদিকে রাজকমল যে মারা গিয়েছে সেই খবরটাও ও লোকাল হিন্দি কাগজে দেখেছে। কাগজে দেখে পরে খোঁজ করেছে। এর বেশি সে কিছু জানে না।"

"ও ! উনিও জানতেন না রাজকমল কেন কলকাতায় আসছেন ?"

"না। সঠিক জানত না। তবে রাজকমলের মুখে শুনেছিল, দু- একটা পুরনো সাইফার দেখিয়ে নিতে চায় সে।"

"রাজকমল কাশীতে যে কাজটা করত—গবেষণা ও প্রচার সমিতির, সেটা তো ঠিক ?"

"সেটা ঠিকই। 'পউরি'দের সম্পর্কে যে টাইপ-করা কাগজপত্র রাজকমল দেখিয়েছিল সেটাও যথার্থ। সতীশ খোঁজ নিয়ে জেনেছে, সমিতির অফিসে ওই নোট্স—সামারি, রিপোর্ট-এর কপি আরও আছে। হিন্দিতে, ইংরিজিতে।"

তারাপদ বলল, "রাজকমলের মারা যাওয়ার ব্যাপারটা— !"

"কোনও ভুল নেই।"

"ভদ্রলোককে খুন করা হয়েছে—সতীশের এমন ধারণা হল কেন ?"

"হল, কারণ রাজকমলের বিছানা, হ্যান্ডব্যাগ পাওয়া গেলেও সুটকেস পাওয়া যায়নি। কেন ? সামান্য জামাকাপড়ের জন্যে সুটকেস চুরি হবে না। তা ছাড়া সে ফার্স্ট ক্লাসে আসছিল। ফার্স্ট ক্লাসের অন্য কোনও প্যাসেঞ্জার জামাকাপড়ের জন্যে সুটকেস চুরি করবে, ভাবা যায় না ! রাজকমল নিশ্চয় এমন কিছু আনছিল ভ্যালুয়েব্‌ল কিছু, যা কেউ জানত। সেটা সোনাদানা, মোটা ক্যাশ হলেও হতে পারে। জানত বলেই খুন করে সেটা হাতিয়েছে। লোকাল কাগজেও নাকি এমন একটা সন্দেহ নিয়ে লেখালিখি করেছিল।"

কিকিরা মন দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলো।

রথীন এসে পড়লেন। অল্প দেরিই হয়ে গিয়েছে। ঘরে এসে কিকিরাদের দেখলেন। বসলেন কাছাকাছি।

"কোথ্ থেকে আসছ ?" নৃপতিনারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন।

"বাড়ির একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম।"

"সতীশের চিঠির কথা বলছিলাম কিঙ্করদের। তুমি তো পরশুই শুনেছ !"

"শুনেছি," মাথা নাড়লেন রথীন। "আমি একজনকে পেয়েছি, কালই বেনারস যাচ্ছে। ওদের কারখানার কাজে। ওকে দিয়ে..."

"কাশী নিয়ে এখন আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যা জানার, মোটামুটি জেনেছি। সতীশ জানিয়েছে।" নৃপতিনারায়ণ বললেন, "বরং ওই বেতিয়ার সিনাইতারার খবরটবর পেলে কাজে দিত।"

"সিনাইতারা— !" রথীন মাথা নাড়লেন, "অসম্ভব কাকা ! ওখানের খবর কে দেবে ?"

"ভাল কথা কিঙ্কর—, তোমাকে দুটো জিনিস দেখাই। বসো।" নৃপতিনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। "দেখলে অবশ্য কিছু বুঝবে না, তবু অবাক হবে খুব।" বলতে-বলতে তিনি ধীরে-ধীরে

লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলেন।

এই লম্বা হলঘরের মতন ঘরটার শেষপ্রান্তে বড় দরজা, দরজার ওপারে নৃপতিনারায়ণের শোওয়ার ঘর।

ওঁকে দেখা গেল না। শোওয়ার ঘরে চলে গিয়েছেন।

রথীন আর কিকিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। তারাপদ চুপচাপ। রথীন মাঝখানে উঠে গেলেন। "আসছি। ওপরে একটা কথা বলে আসি।"

খানিকটা পরে ফিরলেন নৃপতিনারায়ণ। হাতে একটা বড় খাম। বইয়ের আলমারির কাছে দাঁড়ালেন। খুঁজলেন কিছু। শেষে একটা বই নিয়ে ফিরে এলেন।

মাধাই এসে চা দিয়ে গেল। চা, জল, মিষ্টি।

নৃপতিনারায়ণ প্রথমে বই খুলে একটা পাতা দেখালেন। বললেন, "এই দেখো, ছবিটা দেখো, লেখাগুলো পড়তে বসলে অনেক সময় যাবে।"

ছবিটা দেখলেন কিকিরারা। বিচিত্র। বইয়ের পাতায় ছাপা ফোটো প্রিন্টের ছবি কত আর সুস্পষ্ট হবে? তবু ধরা যায় আভাসে। বিচিত্র ফুল, গাছ, গাছের শিকড়ের ছবি, পিঁপড়ের মতন কিসের লেখা সামান্য, পদ্য-পদ্য দেখতে।

তারাপদও ঝুঁকে পড়ে দেখছিল।

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "তোমাদের দেখাব বলে বইটা খুঁজে বার করে রেখে দিয়েছি।"

"এটা কী? বই বলেই মনে হচ্ছে।"

"এটাকে বলা হয় The Voynich Manuscript. বিরাট ইতিহাস রয়েছে এই পাণ্ডুলিপির। ষোলো শো ছেষট্টি সাল নাগাদ পাণ্ডুলিপিটি এক পণ্ডিতের নজরে পড়ে। তিনি আবার এটিকে আরেক পণ্ডিতের কাছে পাঠান, যাতে লেখা আর ছবিগুলোর মর্ম উদ্ধার করা যায়। কতটা কী উদ্ধার হয়েছিল বলতে পারব না। তবে এই পাণ্ডুলিপির ব্যাপারটা চাপাই পড়ে থাকত কতকাল কে জানে! কে বা ছাই উলটেপালটে দেখত ওই বিচিত্র জিনিস! দৈবাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। এক আমেরিকান ভদ্রলোক দুষ্প্রাপ্য বইপত্রের ব্যবসা করতেন, যাকে বলে 'রেয়ার বুক্স'-এর ডিলার। তিনি কেমন করে যেন খবর পান, ইতালির অখ্যাত এক জায়গায় বিচিত্র এক পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে। ভদ্রলোক খোঁজখবর করে পাণ্ডুলিপিটি কিনে নেন। দাম কত পড়েছিল তা তিনি বলেননি। তবে প্রচুর পড়েছিল নিশ্চয়। এটা ১৯১২ সালের কথা। পাণ্ডুলিপির অনেক পাতা—প্রায় তিরিশটা পাতা, পাওয়া যায়নি।"

তারাপদ বলল, "অদ্ভুত তো! তিনশো বছর পরে খোঁজ পাওয়া গেল জিনিসটার!"

"অদ্ভুতের কিছু নেই। এরকম অনেক হয়।"

কিকিরা বললেন, "রাজকমলের আনা ছবিগুলো এইরকমই নাকি?"

"দেখাচ্ছি।"

হাতের খাম থেকে সরু লম্বা ধরনের তিনটে ফোটো-প্রিন্ট বার করে সামনে রাখলেন নৃপতিনারায়ণ।

কিকিরা আর তারাপদ সেগুলো তুলে নিল এক- একটা করে। দেখল মন দিয়ে। কিছুই বুঝল না। লেখার হরফ বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। আর নকশা যা আছে হরফের চারপাশ ঘিরে তা এমনই বিচিত্র ধরনের, অদ্ভুত, অস্বাভাবিক যে, হাজার মাথা ঘামিয়েও বোঝা অসম্ভব!

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "বইয়ের ছবি আর এই ফোটো কপির মধ্যে মিল সামান্য। যেমন ধরো, লেখার সঙ্গে নকশা, আর নকশাগুলো অদ্ভুত ধরনের—এই যা মিল, অন্য কোনও মিল নেই। বরং আমি বলব, রাজকমলের কাছে পাওয়া কপিগুলোয়

যে নকশা রয়েছে তা আরও কিম্ভূত। কোনও মানেই বোঝা যায় না।"

কথার মধ্যে রথীন আবার এসে পড়লেন।

"বসো।"

"বসছি। একটা ফোন করে আসি।" বলেই রথীন ফোনের দিকে চলে গেলেন।

বই আর ফোটো প্রিন্টগুলো গুছিয়ে রাখতে-রাখতে নৃপতিনারায়ণ বললেন, "আমার এখানে চোরের উৎপাত বেড়েই যাচ্ছে কিঙ্কর।"

কিকিরা বললেন, "আপনি রাত্রে টর্চ নিয়ে বাগানে চোর খুঁজে বেড়ান?"

"কে বলল!"

"আসবার সময় অমরের সঙ্গে দেখা। সে বলল, আপনি রাত্রে বাগানে ঘোরেন। সে দেখেছে।"

"তুমি পাগল নাকি! আমি কোমরভাঙা বুড়ো, লাঠি নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরি, রাত্তিরে আমি বাগানে ঘুরব! দিনের বেলায় পায়চারি করি ঠিকই, তা বলে রাত্তিরে! পড়ে মরব যে!"

"তা হলে টর্চ নিয়ে কে ঘুরে বেড়ায়?"

"বুড়ো—মানে অমর ভুল দেখেছে। ভুল বুঝেছে। আমি বাগানে ঘুরি না। টর্চ ফেলে-ফেলে বাইরেটা দেখি জানলা দিয়ে—সেটা ঠিকই। আর জগাকে বলি দেখতে। বুড়ো কী দেখতে কী দেখেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার তো এখন।"

রথীন ফিরে এলেন।

কিকিরা বললেন, "চোরের উৎপাত বেড়েছে আপনি কেমন করে জানলেন?"

"জানলাম-আওয়াজ শুনে। আমি বুড়ো মানুষ ; ঘুম কমই হয়, এমনিতেও পাতলা হয়ে গিয়েছে ঘুম। এই হপ্তায় দু'দিন, শেষ রাতে আমার এই হলঘরের জানলা ভাঙার চেষ্টা হয়েছে, বাইরে থেকে। আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছে! বাতি জ্বেলে কে রে—কে রে— করতেই চোর পালিয়েছে। আজ থেকে জগারা আমার ওই হলঘরে শোবে, বলে দিয়েছি।"

"ভাল করেছেন।...এবার আমি একটা কথা বলি?"

"বলো?"

"কাশীনাথের কথা আপনি শুনেছেন? রথীদা বলেছেন!"

"শুনেছি," নৃপতিনারায়ণ রথীনের দিকে তাকালেন।

"আপনার কী মনে হয়?"

"কাশীনাথ তেমন সুবিধের লোক নয়। আমি শুনেছি, ওর দোকানে পুলিশ বারকয়েক হানা দিয়েছে। স্মাগলড্, চোরাই মালপত্র বিক্রি করে, ধরা পড়েছে। তবে কথা হল, যা নিয়ে গোলমাল সেটা তো ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপার নয়, গ্যারাজ নয়, রাজকমলের সঙ্গে দোস্তি করে ঘুরেফিরে সে কী করবে? কিসের লাভ তার!"

রথীন বললেন, "তা হলে কাশীনাথ কেন রাজকমলকে একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলবে? দেখাসাক্ষাৎ করবে রোজ?"

"আমি বুঝতে পারছি না।"

"কাশীনাথ নিমিত্ত," কিকিরা বললেন, "কাশীনাথের পেছনে কেউ আছেন। তিনি খুব সাবধানী, চালাক। সামনে আসতে চান না। কাশীনাথকে দিয়ে যা করাবার করিয়ে নিতে চান।"

"এমন লোক বিশ্বপতি," রথীন বললেন, "কাশীনাথের সঙ্গে হরিহর আত্মার সম্পর্ক। বিশ্বপতিবাবুর শালা বেনারসে থাকেন। পুরনো লোক। রাজকমলের মহল্লাতেই বাড়ি। বিশ্বপতির সঙ্গে রাজকমলের আলাপ হয়েছিল, খাতিরও জমেছিল।" বলে রথীন কিকিরার দিকে তাকালেন। তারপর নৃপতিনারায়ণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কাকাবাবু, কিঙ্কর আর আমি— এই দু'জনকে সন্দেহ করছি। আপনি নিজেই বলেছেন, একদিন আপনি বৃষ্টিবাদলার মধ্যে রাজকমলকে ওদের গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন এই বাড়ি থেকে।"

"হ্যাঁ, তুলে দিয়েছি। রাজকমল আর আমি কাজের কথা বলছিলাম। তার মধ্যে ওরা এসে পড়ে। পরিচয় করিয়ে দি।"

"আপনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, দিতেই পারেন। এমন তো হতে পারে, আপনি নিজেও বলেছেন, রাজকমল হয়তো কথায়-কথায় তার কলকাতায় আসা, আপনার সঙ্গে দেখা করার কারণটাও বলেছেন বিশ্বপতিদের।" কিকিরা বললেন।

"বলতেই পারে," নৃপতিনারায়ণ বললেন, "ভুলিয়ে- ভালিয়ে জেনে নেওয়াও সম্ভব।"

"এই দু'জনের ওপরেই সন্দেহ করা যায়। কিন্তু ওঁদের উদ্দেশ্য কী ছিল? রাজকমলের কাছ থেকে ফোটো কপিগুলো বাগানো? চুরি করা? না, কেনা? চুরি করা হোক বা কেনাই হোক, ওগুলো নিয়ে কী করবে বিশ্বপতিরা?

নৃপতিনারায়ণ জবাব দিলেন না সঙ্গে-সঙ্গে। মুখের পান ফুরিয়ে গিয়েছে। অভ্যাসবশে চিবোবার ভঙ্গি করলেন, তারপর বললেন, "টাকা। এক-একটা পাতা লাখ-দু' লাখে বিক্রি হতে পারে।"

তারাপদর বিশ্বাস হল না। বলল, "এত টাকা! তাও নকল পাতার জন্যে! পুঁথির অরিজিন্যাল পাতা হলেও বুঝতাম। ওগুলো তো ফোটো কপি!"

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "নকল হলেও হারানো পাতাগুলোরই নকল তো! দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হয়তো। তবু, অরিজিন্যাল টেক্সট বলতে যা বোঝায় তা তো থাকছে। তারও বহুত দাম।"

তারাপদ আবার বলল, "এত যার মূল্য— পুঁথির কথাই বলছি— হারায় কেমন করে!" তারাপদ মাথা চুলকে নিল। "চুরিই বা কেমন করে যায়। বছরে তো মাত্র একদিন দূর থেকে ভক্তরা, বা যারা সেখানে যায়— দেখতে পায়। তাও আবার সেদিন জোর পাহারা থাকে।"

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "চুরি ওভাবে হতে পারে না।"

"তবে?"

"চুরি করানোর ব্যবস্থা হয়েছে ভেতর থেকে। ভেতরের হাত না থাকলে চুরি হয় না।"

কিকিরা বললেন, "ভেতর বলতে আপনি কাদের বোঝাতে চাইছেন? মহান্তদের? না, যারা মঠে থাকে?"

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "রাজকমলের মুখে যা শুনেছি তাতে মনে হয় মঠের মাথা তিন-চারজন। এদের এক বা দু'জনের হাতে নিশ্চয় পুঁথির দায়িত্ব দেওয়া ছিল। তাদের মধ্যে কেউ একজন কাজটা করেছে। পুঁথি বার করে দিয়েছে লুকিয়ে, আবার নকলের কাজ শেষ হওয়ার পর জায়গামতন রেখে দিয়েছে। চুরি করা, আবার যথাস্থানে রাখা— এই কাজটা করতে গিয়ে কোনওভাবে পুঁথির ক'টা পাতা হারিয়েছে।"

কিকিরা বললেন, "চুরির একটা কারণ থাকে। কারণটা কী, কেই বা চুরি করতে যাবে!"

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "তোমার কী মনে হয়?"

"আমার ঘোর সন্দেহ হয়। আমি বাড়িতে ম্যাপ ঘেঁটে যা দেখেছি— তাতে দেখছি বেতিয়া কোথায় আর বেনারস কোথায়! বেতিয়ার কাছে সিনাইতারার মঠ থেকে যে পুঁথি চুরি হয় তার নকল পাতা বেনারসে রাজকমলের হাতে কেমন করে আসে? ও কি বেতিয়ায় আসা-যাওয়া করত?"

নৃপতিনারায়ণ হঠাৎ একটু হাসলেন। বললেন, "কিঙ্কর, তোমার বুদ্ধি আছে। ধরেছ ভাল। এই কথাটা রাজকমলকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে ভাঙতে চায়নি। বানিয়ে-বানিয়ে

গল্প বলেছে এলোমেলো। তবে আমি একটা অনুমান করছি।"

"কী ?"

"তোমায় আগেই একদিন বলেছি, বেনারস আর জৌনপুরের মধ্যে একটা জায়গায় পউরিদের আরও একটা মঠ আছে। আদি মঠের সঙ্গে এদের প্রচণ্ড রেষারেষি। এ বলে আমি খাঁটি, ও বলে আমি খাঁটি। আমাদের দেশে যত মঠ সম্প্রদায় আছে, সমস্ত জায়গাতেই এই একই রকম ঝগড়াঝাটি। জৌনপুরের মঠ ছোট, গড়ে উঠেছে অনেক পরে, তবে ওরা কেতায়, অর্থে, সামর্থ্যে, কম নয়। ওখানে দেশি-বিদেশি দু'রকম ক্লাসের লোকেরই আসা-যাওয়া আছে। ওরাও দু-একটা পুঁথিপত্তর দেখায়, বলে ওগুলো আসল। তা সে যাই হোক, জৌনপুরের মঠের কোনও মহান্ত যদি সিনাইতারা মঠের আদি পুঁথি বাগাবার জন্যে সেখানকার মঠের বড় বা মেজো মহান্তর সঙ্গে সাঁট করে থাকে— তবে এই চুরি হতে পারে।"

কিকিরা মন দিয়ে শুনছেন কথাগুলো। জৌনপুরের দিকে পউরিদের মঠের কথা টাইপ করা পাতাতেও লেখা আছে। তবে সামান্য। নৃপতিনারায়ণ যা বললেন— কিকিরার মনে ধরল। কথাগুলোর একটা যুক্তি আছে। অন্তত এটা ঠিক যে, রাজকমলের পক্ষে, কাশী থেকে জৌনপুরের মঠের খোঁজখবর করা, যোগাযোগ রাখা অনেক সহজ। রাজকমল কি তবে নিজেও জৌনপুর মঠের সমর্থক ছিল ?

"আপনি যা বলছেন তা মিথ্যে না হতে পারে," কিকিরা বললেন, "কিন্তু কথা আছে। জৌনপুরের মঠ কি শুধুই রেষারেষি করে পুঁথি চুরি করার মতলব করবে ? তাতে লাভ ? আর সিনাইতারার মঠের যে মহান্ত এমন কাজ করবে তার পরে কী হবে ?"

"মঠ তাকে তাড়িয়ে দেবে। না হয় লোক দিয়ে খুন করে ফেলবে !"

"এমন কিছু হয়েছে ?"

"বলতে পারব না। ...তবে আমার মনে হয়, সিনাইতারার মূল পুঁথি যখন বরাবরের মতন চুরি হয়নি তখন বুঝতে হবে, ওই পুঁথির একটা নকল করার চেষ্টাই হয়েছিল। এটা করা আজকাল খুবই সহজ। একবার হাতে পেলে তার মাইক্রোফিল্ম করতে কত আর সময় যায়।"

"নকলটা নিজেদের কাছে রেখে ওদের লাভ ?"

"এখানেই তো ঝঞ্ঝাট, কিঙ্কর ! আমি বুঝতে পারছি না, মঠই নকল রাখতে চেয়েছে ? নাকি কোনও এদেশি ধনী লোক। পউরিদের সম্প্রদায়ের— তার কথা মতন এই কাজ হয়েছে। আর না হলে, কোনও বিদেশি লোক— অর্থ যার কাছে সমস্যাই নয়, জৌনপুরের কাউকে হাত করে এ-কাজ করেছে।"

"তা যদি হবে, তবে সে তো সিনাইতারায় গিয়ে এ-কাজ করতে পারত।"

"পারত। তবে সেটা বোধ হয় কঠিন ছিল। তা ছাড়া সরাসরি নিজে ছিপ ফেলার চেয়ে অন্য লোককে দিয়ে ছিপ ফেলানোয় বিপদ কম। রাজকমলের হাতে যদি নকল কয়েকটা পাতা না আসত, আমি জৌনপুর মঠের কথা ভাবতাম না। রাজকমল আমাকে গল্পগাছা করে ভোলাবার চেষ্টা করলেও তার মুখে আমি জৌনপুর মঠের কথা শুনেছি। টাইপ করা নোট্সের মধ্যেও আছে ! দেখেছ না !"

কিকিরা ঘাড় কাত করলেন। দেখেছেন।

॥ ৬ ॥

দায়িত্বটা পড়েছিল চন্দন আর তারাপদর ওপর। কাশীনাথের দোকানে গিয়ে ব্যবসার হালচাল একটু বুঝে আসার, মানুষটিকেও দেখে আসার। কিকিরা নিজে যেতে পারেন না, কাশীনাথ তাঁকে দেখেছেন নৃপতিবাবুর খাবার টেবিলে। রথীন তো ভদ্রলোকের চেনাই। কাজেই চন্দন আর তারাপদ গিয়ে দেখে আসতে পারে একবার। রথীনের কথায়, কাশীনাথ বেশ নাজেহাল হয়ে আছেন এখন। আর্থিক, পারিবারিক দু' ভাবেই।

ম্যাডান স্ট্রিটে ইলেকট্রনিক্সের দোকান কম নয়। হালে রাস্তাটার যা চেহারা হয়েছে, মনে হয় যত রাজ্যের টিভি, টেপ রেকর্ডার, মিউজিক সিস্টেম, সাত-সতেরোর এক মেলা বসেছে এখানে। এত লোক, এত চেল্লাচিল্লি। রাস্তাটাও গিজগিজ করছে লোকে। বিশেষ করে এই সন্ধের মুখে।

কাশীনাথের দোকানের নামটা জেনে নিয়েছিল চন্দনরা। চন্দনরা দোকানে পা দেওয়ার আগেই শুনল এক কর্মচারীকে বিশ্রীভাবে ধমকাচ্ছেন কাশীনাথ।

চন্দনই দোকানে ঢুকল প্রথমে, তারাপদ তার পেছনে।

দোকানে লোক কম। কর্মচারী জনা তিনেক। আর কাশীনাথ নিজে। ভদ্রলোক একেবারে পেছনের দিকে বড় একটা টেবিলের সামনে বসে। মনে হল, তিনি বেচাকেনার টাকা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, কর্মচারীরা খরিদ্দারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, জিনিস দেখায়।

চন্দন ঠিক করেই গিয়েছিল সে একটা বিদেশি পকেট কম্পিউটার খোঁজ করবে। সাধারণত এসব দোকানে এগুলো পাওয়া যায় না।

চন্দন নাম বলল একটা পকেট কম্পিউটারের। বেয়াড়া নাম। জীবনেও সে এমন জিনিস দেখেনি নিজে। জার্নালে বিজ্ঞাপন দেখেছে।

কর্মচারী মাথা নাড়ল। তারা কম্পিউটার বিক্রি করে না।

চন্দন অবাক হওয়ার ভান করে তারাপদকে বলল, "কিরে, দোকান ভুল হল ! আশু এই দোকানটার কথা বলেছিল না !"

"ভুল করেছেন। অন্য দোকানে খোঁজ করুন," কর্মচারী বলল। ততক্ষণে ধমকানো- পর্ব শেষ হয়েছে কাশীনাথের। ফোন এসেছিল। ফোন ধরেছেন। ধমক খাওয়া কর্মচারীটি মাথা নিচু করে অন্য কাজ করছে।

"দাঁড়ান দাদা, অন্য দোকান তো আছেই। এই দোকানের নাম শুনে এসেছি।"

"ওসব জিনিস আমরা রাখি না।"

"আচ্ছা, ইয়ে— একটা আনিয়ে দেওয়া যায় না ! আপনারা তো কত বিদেশি জিনিস আনান। ওই যে বড় রেকর্ডারটা...ওটা.... দেখেছিস তারা, কী দারুণ দেখতে, ওটা জার্মানি কিংবা জাপানি হবে.... ফরেন জিনিস...."

"দামেও ভাল," কর্মচারী বলল, "হাজার এগারো।"

"এগারো। ইলেভন থাউজেন্ড !.... হাই প্রাইস ! আমাদের দ্বারা হবে না, তারা। তো ইয়ে আপনি বলছেন একটা বিদেশি পকেট কম্পিউটার আনিয়ে দেওয়া যাবে না !"

কর্মচারী মাথা নাড়ল।

"দাদা, ওই ভদ্রলোককে বললে হয় না ! ওই যে ফোনে কথা বলছেন ! মালিক ?"

"হ্যাঁ। বলুন ওঁকে—" কর্মচারী যেন বিরক্ত হয়ে বলল।

চন্দন ইশারায় তারাপদকে ডাকল। এগিয়ে গেল ক'পা।

কাশীনাথ সবেই ফোন নামিয়েছেন। ফোন নামিয়ে এক টুকরো কাগজে কী লিখলেন। টাকার অঙ্ক মনে হল। তাকালেন চন্দনদের দিকে। কথা বললেন না, চোখের দৃষ্টি বলল, কী চাই ? চোখমুখ দেখলে মনে হয়, বিরক্ত এবং চিন্তিত।

চন্দন বলল, "আমি একটা পকেট কম্পিউটারের খোঁজে এসেছিলাম। আমার এক বন্ধু আপনাদের দোকানের কথা বলেছিল। বলেছিল, বড় দোকান, পুরনো, রিলায়েবল, খোঁজ করলে পেয়ে যেতে পারি।"

কাশীনাথের মুখের ভাবটাই রুক্ষ। কেমন এক বিরক্তি-মাখানো। কপাল, ভুরু কুঁচকেই থাকে। গলার শিরা ফোলা। পাতলা বুশ শার্টের বুকের ওপরের দিকের বোতাম খোলা। কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোককে রোগাটেই দেখায়।

কাশীনাথ বিরক্ত গলায় বললেন, "কম্পিউটার আমরা বিক্রি করি না।"

"উনি তাই বলছিলেন," বলে ঘাড় ঘুরিয়ে কর্মচারীটিকে দেখাল চন্দন। "আপনারা শুনেছি বাইরের জিনিস আনিয়ে দেন। আমার..."

"কী করা হয় ?"

"আমাদের একটা ছোট বিজনেস আছে। ইলেকট্রোথেরাপির একটা মেশিন তৈরি করি।"

কাশীনাথ কী ভেবে বললেন, "পার্ক স্ট্রিটে রাসেল কোম্পানিতে খোঁজ করুন। ওরা বলতে পারবে।"

তারাপদ আড়াল থেকে কাশীনাথের টেবিল লক্ষ করছিল। যা আছে সবই মামুলি জিনিস, আলাদা করে কিছুই নজর করার মতন নয়। কাশীনাথের ডানপাশে দেওয়ালে গণেশের ছবি। তার নীচে কিসের এক সার্টিফিকেট। বাঁধানো অবস্থায় ঝুলছে।

চন্দন আর-একবার পার্ক স্ট্রিটের দোকানটার নাম জানতে চাইল। জেনে 'ধন্যবাদ' বলে চলে আসছিল, দোকানের বাইরেই প্রায়, ওদের পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক দোকানে ঢুকলেন। রঙিন পাঞ্জাবি, কমলা গেরুয়া— বাসন্তী রঙের মতনই দেখায়। মিহি কাপড় পাঞ্জাবির। আদ্দি ধরনের। পরনে ধুতি। ভদ্রলোককে দেখতে ভাল। মাথার চুল ঝাঁকড়া। পাকা চুলও নজরে পড়ে। গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা।

"কাশীবাবু, জলদি করুন। গাড়ি পার্কিং হবে না।"

"কার গাড়ি ?"

"গোস্বামী গাড়ি আনল, বাস্, বাত রাখল। জলদি করুন।"

দোকান থেকে নেমে এসেছিল তারাপদরা। আসবার সময় কানে গিয়েছে গোস্বামীর কথাগুলো।

দাঁড়িয়ে পড়ল তারাপদ।

"চাঁদু।"

"কী ?"

"আরে, এ তো ওই গোস্বামীজি মনে হচ্ছে। কিকিরা বলেছিলেন।" তারাপদ গোস্বামীজিকে দেখেনি। কিন্তু কিকিরার মুখে অষ্টধাতু বা অষ্টজনের বর্ণনা ও কথা শুনেছে। ভদ্রলোকের জামাটাও রঙিন। কিকিরা তামাশা করে বলেছিলেন, 'গোঁসাইজির মতন জামা পরেছিল গোস্বামীজি, বুঝলে তারাপদ।'

চন্দন বলল, "হবে। কিন্তু তাতে কী ?"

"একটু দাঁড়া, দেখি।"

"কী দেখবি ?"

"দু'জনে কোন গাড়িতে ওঠে।"

"তাতে লাভ ?"

"দাঁড়া না দু' মিনিট। চল, পাশে সরে দাঁড়াই।"

সরে দাঁড়াল তারাপদরা।

অল্পক্ষণ পরেই কাশীনাথ আর গোস্বামীজি বেরিয়ে এলেন। দশ-বিশ পা হাঁটলেন। রাস্তা ঘেঁষে, অন্য গাড়ির গায়ে গা লাগিয়ে একটা কালো রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ফিয়েট। গোস্বামীজি এসে দরজা খুললেন। কাশীনাথ আগে উঠলেন, পরে গোস্বামী। গাড়ি স্টার্ট দিল।

ভিড় আর গাড়ির জট বলে কালো গাড়িটা সহজে এগুতে পারছিল না। তারাপদ নম্বরটা দেখে নিল। গাড়ির নম্বর প্লেট থেকে বোঝা যাচ্ছিল— ওটা পুরনো। চেহারাও ময়লা।

ভিড়ের মধ্যে গাড়িটা লাইন ধরে এগুতে লাগল। অন্য গাড়িকে পাশ কাটানোর উপায় নেই।

চন্দন বেখয়ালে বলল, "ফলো করলে হত !" বলেই হাসল, "আমাদের একটা গাড়ি-ফাড়ি চাই। অন্তত স্কুটার।"

"তুই একটা কিনে ফেল। চালাতে পারিস তো।"

"নো মানি। চল, একটু পান সিগারেট খাই। ওই তো পানের দোকান।"

চন্দনরা পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই কর্মচারীটিকে দেখতে পেল, কাশীনাথ যাকে ধমকাচ্ছিলেন। কর্মচারীটির বয়েস বোঝা যায় না। রোগা, মুখে দাড়ি, চোখ দুটো লালচে, একেবারে মামুলি প্যান্ট-শার্ট পরনে, ময়লা, কোঁচকানো। দেখলে মায়া হয়।

ধারে একটা সিগারেট নিয়ে দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাচ্ছিল কর্মচারীটি, হঠাৎ পথ-চলতি লোকের ধাক্কা খেয়ে সিগারেটটা রাস্তায় পড়ে গেল।

আর একটু হলেই ঝগড়া শুরু হয়ে যেত। চন্দনের কী মনে হল, ছোকরা কর্মচারীটিকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বলল, "দাদা, ছেড়ে দিন। এমন হয়। ইচ্ছে করে তো ধাক্কা মারেনি আপনাকে। নিন, আমাদের একটা সিগারেট নিন। তারা, একটা সিগারেট দে ! আরে নিন না, নিন।"

নিল ও। দেখল চন্দনদের। চিনতে পারল। খানিকটা আগেই দোকানে দেখেছে দু'জনকে।

চন্দন গায়ে পড়ে বলল, "পান চলবে ?"

"পান ! না। পান খাই না। কোথায় পাব ! এক- আধটা সিগারেট জোটাতেই পারি না। কী করব ! নেশা !"

"আমরা খাচ্ছি, খান একটা।"

পানও নিল ও।

"আপনি ওই দোকানটায় কাজ করেন না ? আমরা দেখলাম আপনাকে দোকানে !"

"হ্যাঁ ; আমিও দেখেছি আপনাদের।"

রাস্তার একপাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আলাপ চলছিল।

"আপনাদের দোকানের খুব নাম শুনেছিলাম। তাই একটা দরকারি জিনিস..."

বাধা দিল ছোকরা। বিদ্রূপ করে বলল, "নাম ! বাজে কথা শুনেছেন। এ-পাড়ায় অনেক বড়-বড় দোকান আছে।"

"তা হলে এত নাম শুনলাম।"

"আগে ছিল। অনেক আগে। আমি তখন আসিনি। মালিকের বাবার আমলে।"

তারাপদ বলল, "আপনাদের মালিক ভদ্রলোক যেন কেমন ! রাফ টাইপ।"

"ছোটলোক ! ব্যবহার জানে না। দোকানে রোজ একটা-না-একটা হুজ্জোত মাচিয়ে রাখে।"

"রগচটা ?"

"না মশাই, ওর ওটাই স্বভাব। লোকের টাকা দেবে না, যার ঘর থেকে জিনিস তুলবে তাকে ভোগাবে। চোরাই জিনিস বেচে। এই দোকানটার এখন যা হাল— তিন বছর আগেও তেমন ছিল না। এখন তো ভিখিরি। চেয়ে-চিন্তে এনে দোকানের ঠাট রেখেছে কোনওরকমে।"

তারাপদ আর চন্দনের মধ্যে চোখে-চোখে কথা হল।

চন্দন বলল, "বাজারে ধারদেনা বোধ হয় বেশি। তাই না !"

"লাখ তিন-চার তো হবেই। শুনেছি বসতবাড়ি মর্টগেজ রেখেছে। মামলা-মোকদ্দমা তো আছেই। তাতে কম টাকা খরচ হয় ! তার ওপর মালিকের বাড়িতে ওঁর স্ত্রীর অসুখ। ডাক্তার সন্দেহ করে ক্যানসার। বড় ছেলে দিল্লি পালিয়ে গেছে। ছোটটা— কী বলব— জড়।"

চন্দন যেন স্তম্ভিত ! তারাপদও। কিকিরা কি রথীনবাবুর মুখে

এত কথা শুনেছেন! কিংবা নৃপতিনারায়ণের মুখে! হয়তো শুনেছেন, তারাপদদের বলেননি।

তারাপদ বলল, "আপনি এখানে কতদিন আছেন!"

"ছ' বছর। কত মাইনে দেয় জানেন? মাত্তর সাত শো। তাও সময় মতন পাই না। কী করব! চাকরির চেষ্টায় আছি। পেলেই কেটে পড়ব।"

"তা ছাড়া করবেন কী!" তারাপদ বলল, "আপনার নামটা দাদা?"

"বিভূতি দাশ।"

"আচ্ছা, আলাপ হল। এদিকে এলে দেখা হবে।... ভাল কথা দাদা, ওই রঙিন পাঞ্জাবি গায়ে ভদ্রলোকটি কে? সাধু-সাধু সাজ।"

"গোস্বামী! মালিকের বন্ধু। ও আজকাল বিকেলে প্রায় আসে।"

চন্দন হঠাৎ বলল, "একসঙ্গে বাড়ি ফেরেন বোধ হয়!"

"বাড়ি! ধ্যুত বাড়ি হবে কেন! ওদের একটা জুয়ার আড্ডা আছে শুনি। ঠিকঠাক জানি না। বাচ্চুদা বলে।"

"বাচ্চুদা?"

"যাঁর সঙ্গে আপনারা কথা বলছিলেন।"

চন্দন গা টিপল তারাপদর। আর নয়।

আর দাঁড়াল না চন্দনরা।

॥ ৭ ॥

নৃপতিনারায়ণের সামনে শুধু কিকিরা আর রথীন।

গতকাল চন্দন আর তারাপদ কাশীনাথের দোকান ঘুরে এসে তাদের যা বলার সবই বলেছিল কিকিরাকে। আজ তারা অন্য কাজে লেগে পড়েছে। খোঁজখবর করছে আরও কিছুর।

কিকিরা এসেছেন রথীনকে নিয়ে বেহালায়। কাশীনাথকে নিয়েই কথা হচ্ছিল।

নৃপতিনারায়ণ বললেন, কাশীবাবুর সবরকম খবর তাঁর কানে না এলেও অনেক কথাই তিনি শুনেছেন। যেমন দেনার কথা। বাজারে বহু টাকা দেনা হয়ে আছে কাশীর। একবার তো তিনি নৃপতিনারায়ণের কাছেই হাজার তিরিশ টাকা ঋণ চেয়েছিলেন। নৃপতি দিতে পারেননি। ইচ্ছেও হয়নি। মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে বিস্তর টাকা জলে ঢালছে কাশী— তাও নৃপতি জানেন। পারিবারিক কথাও শুনেছেন কম-বেশি।

রথীন বললেন, কাশীবাবুর সম্পর্কে বিস্তারিত না জানলেও ভদ্রলোকের ধারদেনা বা বাড়ির রোগ-অশান্তির কথা শুনেছেন বই কী! যে-কোনও কারণেই হোক, রথীন নিজে কাশীবাবুকে পছন্দ করেননি কোনও সময়েই। দূরে-দূরে থেকেছেন। পরিচয় সাধারণ।

কিকিরা শেষপর্যন্ত বললেন, "তবে কী দাঁড়াচ্ছে, দত্তমশাই!"

"তুমি বলো।"

"আমি দেখছি, কাশীবাবুর কাছে অর্থই এখন জরুরি। মানে ভদ্রলোক ঋণে বিকিয়ে আছেন বলা যায়। এটা তাঁর মানসিক অশান্তির একটা কারণ। আবার টাকার জন্যে যে- কোনও কাজই হয়তো করতে পারেন। তাই না!"

রথীন বললেন, "কাশীবাবুর স্ত্রী ক্যানসারে ভুগছেন— আমি জানতাম না। শুনেছি, তিনি অসুস্থ। অবশ্য ছোট ছেলেটির কথা সবাই জানে। ও যে একেবারে জড়পিণ্ড তা নয়। বলা যেতে পারে ইন্‌ভ্যালিড। তাই না, কাকা?"

নৃপতিনারায়ণ সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "কিঙ্কর, তুমি আমার নিজের কথা জানো! আমার নিজের সন্তান ছিল না বলে যে কষ্ট পেয়েছি— বুড়োকে নিয়ে নেওয়ার পর তার বারোআনাই দূর হয়েছে আমার। আমি ওই ব্যাপারে বড় দুর্বল। কাশীর ওই ছেলের কথা আমি নিজে থেকে কখনও জানতে চাই না। ওর কষ্ট। আমারও কষ্ট। আর কাশীর স্ত্রীর ব্যাপারেও বা কী বলব! বিশ্বপতি আমায় বলে, ক্যানসার হলে আজ দু' বছর কাশীর স্ত্রী টিকে আছে কেমন করে! হয়তো ক্যানসার নয়। কিংবা....."

নৃপতিনারায়ণকে কথা শেষ করতে হল না। কীই-বা বলবেন উনি। কিকিরা কথা ঘুরিয়ে নিলেন।

কিকিরা বললেন, "জুয়ার আড্ডার কথা কিছু জানেন আপনি?"

"না। ওরা তাসের আড্ডা বসায় আমি শুনেছি। বিশ্বপতি, কাশীনাথ ভাদুড়ি, আরও আছে বন্ধুবান্ধব ওদের...। কাশী আগে রেসের মাঠেও যেত। এখনকার কথা জানি না।"

"ভাদুড়ি না দাবার ভক্ত?"

"দাবার ভক্ত হলে তাস খেলতে নেই!" নৃপতিনারায়ণ হেসে বললেন। "দাবাও খেলে, তাসও খেলে। দাবার ওপর ওর ঝোঁক বেশি। তার ওপর নানা ধরনের ঘুঁটি কালেকশানের নেশা আছে।"

"তাসের আড্ডা কোথায় বসায়? তাসেও জুয়া হয়।"

নৃপতিনারায়ণ মাথা নাড়লেন।

রথীন বললেন, "তাস খেলার জন্যে স্পেশ্যাল কোনও জায়গা থাকে নাকি কিঙ্কর! বাড়ির বৈঠকখানা থেকে পাড়ার ক্লাব— সব জায়গাতেই তাস খেলা যায়।"

"তাস খেলা আর তাসের জুয়া খেলা আলাদা। জুয়াটা লুকিয়ে হয়।... আচ্ছা রথীদা, ভাদুড়ির বাড়ি কোথায়, তাঁর দোকানই বা কোথায়?"

"বাড়ি খিদিরপুর। দোকান লিন্ডসে স্ট্রিটের শেষদিকে; নিউ মার্কেটের পেছনের দিকে বলতে পারো।"

"কেমন দোকান?"

"মাঝারি। শোরুম ছাড়া পেছনে একটা ঘর আছে ছোট। অফিস আর গোডাউন। আমি দোকানে বারকয়েক গিয়েছি।"

কিকিরা একটা পান চাইলেন নৃপতিনারায়ণের কাছে। পান নিয়ে মুখেও দিলেন। তারপর নৃপতিকে বললেন, "কাশীনাথবাবু যে রাজকমলের সঙ্গে দোস্তি জমিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে রাজকমলকে তিনিই হোটেল জুটিয়ে দিয়েছিলেন, না, রাজকমল নিজেই হোটেল জুটিয়ে নিয়েছিল— তা বলা যাবে না। ওটা অবশ্য বড় কথা নয়। দোস্তিটাই বড় কথা। কিন্তু কেন?"

"কেন, তা তুমিই বলো।"

"আমি ভেবে পাচ্ছি না দত্তমশাই। ব্যাপারটা মেলাতে পারছি না। কাশীবাবু ধারেদেনায় ডুবে আছেন। তিনি যে রাজকমলের কাছ থেকে পাতাগুলোর প্রিন্ট টাকা দিয়ে কিনে নেবেন, তা হয় না। বহু টাকার ব্যাপার। লাখ দুই-তিনও হতে পারে।"

"কম করেও।... এ হল দাঁওয়ের ব্যাপার।" কোন পক্ষ কতটা মারবে কে জানে!"

"যদি টাকা দিয়ে কেনার ব্যাপার হয়—" কিকিরা বললেন, "তবে কাশীবাবু নিজে পারচেজার হিসেবে অক্ষম। উনি অন্য কারও হয়ে কাজটা করছিলেন। রাজকমলের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো, দরদস্তুর করা— এগুলো করেছেন।"

রথীন তাকিয়ে থাকলেন। "ইয়েস— ঠিক ধরেছ! কারেক্ট। কাশীবাবু টাকা কোথায় পাবেন। তাঁর নিজেরই টাকার দরকার। উনি তবে অন্যের এজেন্ট হয়ে কাজটা করছিলেন?"

"এখন তাই ধরে নিতে হবে। পসিবিলিটি রয়েছে," নৃপতিনারায়ণ বললেন। "কিন্তু কার হয়ে? কেন?"

কিকিরা বললেন, "নিজের স্বার্থ ছাড়া করবেন এমন মনে হয় না। হয়তো কথা হয়েছিল, রাজকমলকে ম্যানেজ করতে পারলে তিনিও একটা টাকা পেতে পারেন। সেটা একেবারে তুচ্ছ করার

মতন নয়।"

"বেশ। কিন্তু টাকা কে দেবে? যে দেবে সে নিশ্চয় জানে, দশ টাকা দিয়ে কিনলে বিশ টাকায় বেচা যাবে। এমন লোক কে আছে?"

"আপনিই বলতে পারেন, আমি কেমন করে বলব! ওই অষ্টধাতুর কার কত টাকা!"

রথীন হাসলেন। কিকিরা অষ্টধাতু নামটা বেশ দিয়েছে। রথীনই বললেন, "টাকার বান্ডিল ওদের মধ্যে বোধ হয় বিশ্বপতিবাবু। ধূর্জটিবাবুর ট্রাভেলিং ব্যবসায় লাখ- লাখ টাকা কামাবার উপায় নেই। মজুমদারবাবু রিটায়ার্ড লোক। হাতে তাঁর কত টাকা থাকবে? ভাদুড়ির যা ব্যবসা তাতে বিশ-পঁচিশ হাজারের রিস্ক নিতে পারে, তার বেশি নয় বলেই আমার মনে হয়। শ্যামলাল? না, তার পক্ষেও সম্ভব নয়। ধনরাজ অত টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে না। সে ইলেকট্রিকাল গুডসের ব্যবসা করে। নিজের পাড়ায়। আর গোস্বামী..."

"গোস্বামীজির সঙ্গে কাশীবাবুর দোস্তি খুব।

"কই! তা জানি না," নৃপতিনারায়ণ বললেন, "তাস খেলার দোস্তি হয়তো।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন সামান্য। চুপ করে থাকলেন, পরে বললেন, "খোঁজ লাগান। গোস্বামীজি কিসের ব্যবসা করেন?"

"কাপড়ের। ওর নিজের একটা গদি আছে। তবে সেখান থেকে বিক্রিবাটা হয় না। ও কাশীপুরের একটা মিলের ছাপা শাড়ি আর ছিট কাপড়ের ছোট এজেন্ট। কলকাতার দোকানে সেগুলো সাপ্লাই করে। ওর কয়েকটা বাঁধা ঘর আছে।"

"গোস্বামীজি আর ভাদুড়ি একই ফ্ল্যাটে থাকে না? আপনি বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ," নৃপতিনারায়ণ মাথা নাড়লেন। "টালিগঞ্জে ওরা ফ্ল্যাট কিনেছে। একই প্রমোটারের ফ্ল্যাট। আমি কোনওদিন যাইনি। শুনেছি, আনোয়ার শা রোডের গায়ে। ভাল ফ্ল্যাট।"

রথীন নিজেই বললেন, "আমার ওদিকে যাওয়া-আসা আছে। আমি যাই ছোট বোনের খোঁজখবর নিতে। বোনের বাড়ির কাছেই ফ্ল্যাটগুলো। বাইরে থেকে দেখতে ভালই লাগে।"

কিকিরা পান চিবোতে লাগলেন। "গোস্বামীজির তহবিল কেমন?"

"তহবিল!"

"টাকাপয়সার কথা বলছি। বেশ কিছু আছে, না, মামুলি... ?"

"আমি জানি না," নৃপতিনারায়ণ বললেন, "ধনী বলে মনে হয় না, আবার অবস্থাও খারাপ নয়।"

"কোথাকার লোক উনি?"

"গোরখপুরের। বাড়িটাড়ি ওখানে, জন্মও গোরখপুরে। কলকাতায় ওর মামা মোটর পার্টসের ব্যবসা করতেন। ছেলেবেলা থেকেই আসত-যেত কলকাতায়। বাবা নেই। লেখাপড়া শিখেছে ওদিকেই। তারপর কানপুরে দু- চার বছর চাকরি করে শেষে এখানে চলে এসে ব্যবসা শুরু করে। গোস্বামীর একটা বড় গুণ, জমিয়ে গল্প করতে পারে। নানারকম গল্প।" বলেই কী মনে পড়ে গেল নৃপতির, আবার বললেন, "গোস্বামী অনেক টোটকা জানে।"

"টোটকা!"

"দিশি ওষুধপত্র, গাছগাছড়া, এটার সঙ্গে ওটা মেশানো, মধু বেলপাতা, কাঁচা হলুদ—কতরকম," উনি হাসলেন একটু। "একবার আমার কী হল—যা খাই বমি-বমি লাগে, নশিয়া, তা ডাক্তারই দেখছিল, গোস্বামী বলল—সে একটা ওষুধ বানিয়ে দিচ্ছে, দুটো করে দু'বার খেতে। বিশ্বাস হয়নি, খেলাম তবু। তোমায় কী বলব কিঙ্কর, তিনদিনেই ফিট।"

"গুণী লোক তবে," কিঙ্করও হাসলেন। "উনি কি খুব ধর্মভীরু। গলায় মালা পরে থাকেন। গায়ে গেরুয়া গোছের পাঞ্জাবি। হাতে একজোড়া আংটি।"

"ধর্মভীরু! তা বলতে বইকী? ওসব বাতিক আছে বই কী! পুজোআর্চা করে, তেলকও কাটে, তীর্থ করতেও বেরোয় মাঝে মাঝে।"

"আপনার সঙ্গে এদের আলাপ হল কেমন করে দত্তমশাই?"

"হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আলাপ হয় হে কিঙ্কর। কাজে-কর্মে হয়, আপদে-বিপদে হয়, আবার কারণে- অকারণেও হয়। সকলের সঙ্গে একই সময়ে তো আলাপ হয়নি। কারও সঙ্গে পুরনো আলাপ। কারও সঙ্গে নতুন।"

"গোস্বামীজির সঙ্গে আলাপ?"

"বছর কয়েক হল। তখন আমি আমাদের ব্যবসাটা দেখি না যদিও, বুড়োই দেখে, তবু একদিন গোস্বামী আমার কাছে একটা জমির খোঁজে এসেছিল। বুড়োকে ম্যানেজ করতে না পেরে আমায় ধরতে এসেছিল। তখনই আলাপ।"

"জমি হয়নি?"

"না। ওটা নিয়ে গণ্ডগোল ছিল।"

কিকিরা চুপ করে থাকলেন অল্পসময়। তফাত থেকে দেরাজের ওপর রাখা ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে আট বেজে গিয়েছে। এবার উঠতে হবে।

আরও একটু বসে কিকিরা বললেন, "এবার আমরা উঠব। একটা কথা আপনাকে বলি দত্তমশাই। আমার মনে হচ্ছে, কাশীনাথকে কেউ কব্জা করেছে। মানে, তাকে কাজে লাগিয়েছে। কে করেছে আমি জানি না। আর কাশীনাথ নিশ্চয় নিঃস্বার্থে অন্যের হাতে ধরা দেয়নি। হয় বিপদে পড়ে ধরা দিয়েছে, না হয় অর্থের লোভে। ভুল বললাম। অর্থের প্রয়োজনে। আমার এই অনুমান ঠিক কিনা এখনই জোর করে বলতে পারছি না। আরও ক'দিন সময় লাগবে জানতে।"

"লাগুক। আমি সাবধানে থাকি আজকাল!"

"আপনি যদি পারেন, জুয়ার আড্ডার খোঁজখবর করার চেষ্টা করুন। আমরাও করছি।"

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "কিঙ্কর, দোকানের একটা ছেলে রাগের মাথায় মালিকের জুয়ার আড্ডার গল্প বলল আর সেটা বিশ্বাস করবে। আমার মনে হয়, এটা বাড়াবাড়ি। তাস, পাশা, দাবা কত লোকই খেলে, সেগুলোকে জুয়া বললে বাড়াবাড়ি হয় না?"

"তাস নিয়েও জুয়া হয় দত্তমশাই। হাজার-হাজার টাকা উড়ে যায়। এই কলকাতায় কী না হয়!"

নৃপতিনারায়ণ কিছু বললেন না।

রথীনও উঠে পড়েছিলেন।

"আজ আসি, পরে আসব," কিকিরা পা বাড়ালেন।

রথীনও বললেন, "আসি কাকাবাবু!"

॥ ৮ ॥

দু-তিনটে দিন শুধু ঘোরাফেরাই সার। চন্দন আর তারাপদ একলা-একলা ঘুরতেও চায় না। সময়ই বা কোথায় অত; তারাপদর অফিস, চন্দনের হাসপাতাল। বিকেলের পরই ওদের দেখা হয়। তারপর দু'জনে বেরুনো। এদিকে গরম বাড়তে বাড়তে চৈত্রমাস। দু-একবার ছোটখাট কালবৈশাখীর দেখা পাওয়া গেলেও তার জের একদিন হয়তো থাকে, আবার যে কে সেই গরম, কলকাতা শহর পুড়ে যাচ্ছে যেন।

শেষমেশ একদিন দু' বন্ধু সন্ধের মুখে ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে সোজা কার্জন পার্ক।

পার্কে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল মাঠে।

অফিস ফেরত লোকজনের ভিড় অল্প কমেছে। ট্রাম বাস মিনিবাসের ধুলো ধোঁয়ায় চারদিক ঘোলাটে। ডিজেলের গন্ধ বাতাসে। গুমোট।

মাঠে শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ আকাশ দেখল ওরা। তারা ফুটে আছে আকাশে। কোথাও না একটু মেঘ, না মেঘের আঁচড়। মানে, এই গুমোট কমবে না আজ, এইভাবেই চলবে।

তারাপদই কথা বলল শেষপর্যন্ত। "চাঁদু, এভাবে হয় না! বুনো হাঁসের পেছনে ছুটে বেড়ানো! আমি ফেডআপ।"

চন্দন বলল, "কী আর করবি! কিকিরাকে তুই চিনিস তো...!"

কিকিরার একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। উনি আমাদের কাছে নতুন করে কী আর জানতে পারবেন অষ্টধাতুদের ব্যাপারে। সেসব তো উনি নৃপতিবাবু, রথীনবাবুর কাছ থেকেই জানতে পারছেন। আমরা কেন এদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে বেড়াচ্ছি...।"

"কিকিরার অভ্যেস। তা ছাড়া সব খোঁজ সবাই রাখে না। রাখা সম্ভব নয়। কাশীবাবার সঙ্গে গোঁসাইবাবার এত ফ্রেন্ডশিপ নৃপতিবাবু কি জানতেন? না রথীনবাবু!"

"চেষ্টা করলে জানা যেত।...আচ্ছা, বিভূতির কী হল বল তো?"

"কেন?"

"আর একদিন ধরা হল ওকে। জুয়ার আড্ডার ঠিকানা দিতে পারল কই! বলল, জানে না। আমাদের বলল না বোধ হয়।"

"ও জানে না। জানলে বলে দিত।"

"কী জানি! তা তুই যা বলিস, দুটো লোকের ভেতরের খবর আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। বিশ্বপতিবাবু আর ধনরাজের।"

"বিশ্বপতি পেটি লোক নন রে তারা, বুর্জোয়া ক্লাস। বাড়িখানা দেখেছিস! দেখলেই মনে হবে, রায়বাহাদুর কিংবা রায়সাহেব অমুক মুখুজ্যের আমলের বাড়ি। বাড়ি, না, ব্যারাক, বোঝা যায় না। কী পাঁচিল, কিয়া ফটক, দরোয়ান, বাড়ির কী রং-বাহার!" চন্দন তামাশা করে বলছিল, মুখ টিপে হাসতে- হাসতে। "যায়সা বাড়ি তেমনই লোকজনের চেহারা, পাশ বালিশ কোল বালিশ ফরাস তাকিয়া—সব দেখবি গোল আর ধবধবে। ফ্যামিলিটাই গোল।"

তারাপদ হাসতে-হাসতে বলল, "যা বলেছিস!...ওদের ব্যবসাপত্রও কত রে?"

"পাঁচ-সাতটার তো আমরাই খোঁজ পেলাম। আরও আছে নিশ্চয়, নামে-বেনামে। তবে লোক ভীষণ কিপ্পুস!"

"কেমন করে বুঝলি!"

"গাড়ি দেখে। কবেকার এক ঢাউস অস্টিন, এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটার চেহারা দেখলে তোর মনে হবে, বুড়ো লোমওঠা অ্যালসেসিয়ান...!"

"ভদ্রলোক পাকা ঘুঘু, কী বলিস!"

"কে জানে! আমি কেমন করে জানব।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। গুমোটের মধ্যে এক ঝলক হাওয়া এল। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে আরও। ট্রামগুমটিতে কারা বুঝি ঝগড়া করছে।

"চাঁদু, কাল একবার ভাদুড়ির পাত্তা নেব। তারপর আমাদের কাজ শেষ।"

"ভাদুড়ি! কাছেই তো!"

"নিউ মার্কেটের পেছনে।"

"ভাদুড়ির দোকানের নাম কী?"

"জানি না। জেনে নেব।"

"নে, ওঠ। আর ভাল লাগছে না। চা খাবি?"

"এই গরমে চা!"

"বিষে বিষক্ষয়। চল। ওঠা যাক।"

চন্দনরা উঠে পড়ল।

রাস্তার উলটো দিকেই মিষ্টি আর চায়ের দোকান।

চা খেয়ে ট্রামগুমটির কাছে ফিরে আসছিল দু'জনে। প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাছতলা ঘেঁষে, কোনও গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনও গাড়ি এসে পার্কিং করছে। হঠাৎ তারাপদর নজরে পড়ল, একটা গাড়ি এসে থামল। সাধারণভাবে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছিল সে, আচমকা গাড়ি আর নাম্বার প্লেটে চোখ পড়ে গেল। কালো রঙের ফিয়েট গাড়ি, আর নাম্বার প্লেটটাও দেখা-দেখা মনে হল তারাপদর।

গাড়ির দরজা খুলে নেমে এলেন দু'জন। গোস্বামীজি আর অন্য এক ভদ্রলোক। গোস্বামীজিকে সঙ্গে-সঙ্গে চিনতে পারল তারাপদ। সেই রঙিন পাঞ্জাবি। অন্য লোকটিকে চিনতে পারল না। দেখেনি। পাজামা, পাঞ্জাবি, গলায় হার। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা।

চন্দনের জামা ধরে টানল তারাপদ।

দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দন।

গোস্বামীজি সঙ্গের ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে- বলতে সাবধানে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে চলে গেলেন।

"চাঁদু।"

"দেখেছি।"

"গোস্বামী!"

"হ্যাঁ। গাড়িটাও সেই না!"

"একই গাড়ি, একই নম্বর। দাঁড়া একটু দেখে যাই।" তারাপদ চন্দনকে টেনে নিয়ে গোস্বামীদের গাড়ির গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাশাপাশি নানান গাড়ি, লোকজন এ- পাশে ও- পাশে দাঁড়িয়ে, কেউ অপেক্ষা করছে মিনিবাসের, কেউ- বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করছে। যে যার মতন দাঁড়িয়ে।

গোস্বামীদের গাড়ি থেকে ড্রাইভার নেমে এল। পরনে কালচে প্যান্ট, গায়ে কলার দেওয়া গেঞ্জি, হলদেটে রঙের। ড্রাইভারকে দেখলে নেপালি বলে মনে হয়। চেহারা গাট্টাগোট্টা। রাস্তায় নেমে ড্রাইভার একটা বিড়ি ধরাল।

তারাপদ চন্দনকে বলল, "গাড়ির ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিস!"

"কিছু নেই। ব্যাক সিটের ওপর একটা কাগজ পড়ে আছে।"

"সামনে?"

"নাথিং।"

তারাপদ বলল, "ওয়েট কর। ওরা ফিরুক।"

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। গোস্বামীজিরা ফিরে এলেন। মুখ ভর্তি পান। দু'জনের হাতেই কাগজে মোড়া গোল গোল কী যেন! রসগোল্লার টিন বলেই মনে হয়। কথা বলতে বলতে আসছিলেন ওঁরা। দু'জনের কথাই জড়িয়ে যাচ্ছে পানের জন্য।

গাড়ির কাছে আসতেই ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

গোস্বামীজি মাথা নাড়লেন। মানে, গাড়িতে উঠতে দেরি আছে।

তারাপদ আর চন্দন আড়চোখে দেখছিল। কান খাড়া।

নিচু গলায় দু'জনের সামান্য যা কথা হল তার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না তারাপদরা।

শেষে অন্য ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক হ্যায়। বাত ফাইন্যাল। চালিয়ে!"

গোস্বামী ভদ্রলোককে আগে গাড়িতে উঠতে বললেন।

ভদ্রলোক পিঠ নুইয়ে গাড়িতে উঠতে-উঠতে হঠাৎ বললেন, "গোস্বামীজি, ইয়ে কলকাতার রসগুল্লা ভেরি গুড, মাগর ওহি রসগুল্লা..."

গোস্বামীজি একটু হাসলেন। "কেয়া মালুম কভ মিলেগি! আই অ্যাম ট্রায়িং মাই বেস্ট।"

দু'জনে ওঠার পর ড্রাইভার স্টার্ট দিল গাড়িতে।

তারাপদ আর চন্দন তাকিয়ে থাকল। গাড়িটা রাজভবনের দিকে চলে যাচ্ছে।

চাঁদু বলল, "নে, চল।"

"চল।...চাঁদু, গোস্বামীর সঙ্গী ভদ্রলোক কি হিন্দি সিনেমা করে?"

"কেন?" চন্দন অবাক!

"খাসা চেহারা। হিরো হওয়ার চান্স নেই। তবে ভাল ফাইট চালাতে পারবে।"

"তোর যত্ত।"

"কথা শুনলি লোকটার?"

"কী?"

"কলকাতার রসগোল্লা ভাল, কিন্তু, কিন্তু ওহি রসগুল্লা—" বলতে-বলতে আচমকা থেমে গেল তারাপদ। থেমে গিয়ে কেমন থতমত ভাবে বলল, "কথাটার মানে কী রে!"

চন্দন অবাক! বলল, "কী আবার মানে! তুই..."

"না, না। আমি এমনি বলছি না।"

"কী জন্যে বলছিস তবে?

"গোস্বামীজিকে আমি কেমন যেন দেখলাম। অপ্রস্তুত। তারপর হেসে উঠলেন।"

"তোর মাথা। মামুলি কথা। তা নিয়ে ভাববার কী আছে?"

তারাপদ আর কিছু বলল না। কথাটা হয়তো সত্যিই মামুলি! কিন্তু তার কানে লেগে গেল। কেন লাগল?

॥ ৯ ॥

অনেকদিন পরে কিকিরাকে খানিকটা হালকা মনে হচ্ছিল। এক-একজন মানুষের এক-একরকম অভ্যেস। গুরুতর চিন্তা-টিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও কিকিরাকে কখনওই গম্ভীর দেখায় না। অল্পস্বল্প গাম্ভীর্য, খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন হয়তো মাঝে-মাঝে, আবার নিজেকে সামলে নেন, সেই হাসি-হাসি মুখ, মজার কথাবার্তা।

তারাপদরা ঘরে এসে দেখল কিকিরা নিজের মনে পেসেন্স খেলছেন, আর মাঝে-মাঝে রামপ্রসাদী শ্যামাসঙ্গীতের সুরে 'বল মা আমি দাঁড়াই কোথায়'—গান গাইছেন।

ঘরে ঢুকে চন্দন হেসে বলল, "রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান।"

তাস মেলাতে-মেলাতে আড়চোখে তারাপদ, চন্দনকে দেখলেন কিকিরা, "রাস্তায় কেন! হল্লা দেখতে?"

"না, ড্রপ-ড্রপ বৃষ্টি পড়ছে। গন্ধ ছুটবে একটু পরেই, সোঁদা গন্ধ।"

"ধ্যুত, একে বৃষ্টি বলে না। বৃষ্টি আজ হবে না। কাগজে লিখেছে, আকাশে মেঘ থাকলেও বৃষ্টি এখন হবে না। দিন দুই আপাতত নয়।"

তারাপদ বলল, "একটা নিম্নচাপ লেগে গেলে বেঁচে যাই সার, আর পারছি না!"

"তোমাদের দেখি সব ব্যাপারেই পারছি না। গরমে পারো না, বর্ষায় পারো না, শীতে পারো না—! বাঙালি ছেলেদের কী অধঃপতন! আমরা বুড়োরা কেমন করে পারছি হে!"

"কাঠামো সার," তারাপদ ঠাট্টার গলায় বলল, "আপনাদের কাঠামোর কাঠই আলাদা, ঘুণ ধরে না।"

কিকিরা হেসে ফেললেন। বললেন, "ও ইয়েস! কোয়ালিটি অব কাঠ! তা তোমাদের লেটেস্ট খবর? রুটিন ডিউটি?"

তারাপদরা বসে পড়েছিল যে যার মতন। বাইরে বৃষ্টি পড়ুক না পড়ুক হাওয়া এল কয়েক ঝলক। কিকিরার এই ঘরটা যতই কেন না জাদুঘরের মতন মনে হোক, জানলাগুলো সত্যিই বড়

এবং দক্ষিণ খোলা। পুরনো বাড়ির ছাদ বলে মাথার ছাদও উঁচু।

চন্দন বলল, "আমাদের আর কী ডিউটি সার, কনস্টেবলের চাকরি। ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"কনস্টেবল! আরে রামো, কনস্টেবল কী, তোমরা হলে পি.ডি. পুলিশ অফিসার।"

তারাপদ অবাক! "পি. ডি. আবার কী?"

"প্লেইন ড্রেস পুলিশ অফিসার।"

চন্দন হো-হো করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। তারাপদও হাসছিল, তবে জোরে নয়।

"ভাদুড়ির দোকানে গিয়েছিলে? মেরি শো শপ!"

"গিয়েছিলাম কাল।" চন্দন বলল।

"কী মনে হল?"

চন্দন তারাপদর দিকে তাকাল। "তারা, কীরকম মনে হল রে?"

তারাপদ হাতের ঘড়িটা খুলে কী দেখছিল। দেখতে-দেখতে কানের কাছে তুলে ধরল, তারপর বলল, "বন্ধ।"

"দোকান বন্ধ।"

"না, ঘড়ি।"

"ঘড়িতে দম দাও না?"

"দিই। গোলমাল করছে আজকাল। অয়েলিং করতে হবে।"

"মেরি শো কেমন দেখলে বলো?"

"দোকান বড় নয়, মাঝারি। তবে এত সুন্দর করে সাজানো। শো কেসগুলোই কী সুন্দর, ডিজাইনও নানারকম। দেওয়ালে ছবি, শো পিস, রুপোর মোমদান, পাখির পালক দিয়ে তৈরি হাত-পাখা, কড়ির কাজ, শাঁখের ভ্যারাইটি, চামড়া আর হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট...দারুণ সার।"

কিকিরা মাথা নাড়তে লাগলেন। "লোকটি কেমন দেখলে?"

"খারাপ নয়। আমরা কীই-বা কিনলাম দোকান থেকে! একটা সাইড ব্যাগ। পুঁতির কাজ আছে একপাশে। দাম বেশি পড়ল। তা কী করা যাবে বলুন! কাস্টমার সেজে গিয়েছি, একটা এলেবেলে জিনিসও তো কিনতে হয়!"

"তা তো বটেই।...তোমরা মোমের পুতুল দেখলে না? শুনেছি ওটাই ভাদুড়িবাবুর দোকানের বেস্ট, মানে দেখতেও ভাল, বিক্রিও হয় ভাল। বাইরে কাস্টমার আছে ওয়াক্স ডলের।"

তারাপদ কিছু বলার আগেই চন্দন বলল, "সুপার্ব সার। রিয়েলি বিউটিফুল।" চন্দনের গলার স্বরে উচ্ছ্বাস। "আমি এ রকম আগে দেখিনি।"

তারাপদও মাথা দুলিয়ে বলল, "সত্যি কিকিরা, দেখার মতন। আমরা অবশ্য মাত্র চার-পাঁচটা দেখেছি। মানে বড়গুলো। ছোটই বেশি ছিল। ছোটগুলো কুচোকাচা, এমনি বাড়িতে সাজিয়ে রাখার মতন, শো কেসে, আলমারিতে...। বড়গুলো ওভাবে রাখা যাবে না।"

"বড়গুলো কেমন? সাইজ, কেমন দেখতে— ?"

"সাইজ—সাইজ আপনার ধরুন মাথায় দু' ফুট সোয়া দু' ফুট। চওড়াও হবে মন্দ নয়। একটা পুতুল ছিল বাচ্চা কোলে মা বসে আছে। সেটা চওড়ায় বেশি। একটা দেখলাম যিশু খ্রিস্ট; আর একটা আপনার রাজপুত যোদ্ধা। পশুপাখির মধ্যে মৎস্যকন্যা আছে।"

চন্দন বলল, "পুতুলগুলো একরঙা। রাজপুত যোদ্ধাটা দু-তিন রঙে তৈরি করা। কেমন করে করেছে কে জানে! তবে সার, শুধু মোমের পুতুল এগুলো নয়, আমার ধারণা, মোমের সঙ্গে অন্য কিছু মেশানো আছে।"

তারাপদ বলল, "পুতুলগুলো যেন ময়লা না হয়, প্রত্যেকটি পুতুল সাদা পাতলা কাচের কেস-এর মধ্যে রাখা।"

কিকিরা তাস গোটাতে লাগলেন। "বড় পুতুল আর দেখতে পেলে না?"

"না। ভেতরের ঘরে কোথাও রাখা আছে বোধ হয়। আমরা জিজ্ঞেস করিনি। উনিও বলেননি।"

"ভাদুড়ি মানুষটিকে কেমন মনে হল?"

"ভালই তো! জেন্টেলম্যান!"

তারাপদ বলল, "ওঁকে আপনি লিস্ট থেকে বাদ দিতে পারেন।"

"না হয় দেওয়া গেল। তা হলে থাকছে কে?"

"আমার সাসপেক্ট গোস্বামীজি, কাশীনাথ। ওই লোকটাকেও আমি সুবিধের মনে করি না, রসগোল্লার টিন হাতে যাকে সেদিন গোস্বামীর সঙ্গে দেখলাম। ওকে দেখলেই আপনার কেমন যেন লাগবে। বাইরের লোকের চোখমুখ।"

কথার মধ্যে বগলার গলা, বাইরের দরজা খোলার শব্দ, তারপর রথীনের গলাও পাওয়া গেল।

ঘরে এলেন রথীন। দু-চার ফোঁটা জল গায়ে। এসেই বললেন, "বৃষ্টি হবে না বুঝলে কিঙ্কর, কোনও আশা নেই, দু-পাঁচ ফোঁটা শান্তিবারি ছড়ানোর মতন করে মেঘটা পালিয়ে যাচ্ছে।" বলতে-বলতে তারাপদদের দিকে তাকালেন, দেখলেন, হাসলেন। "ভাল তো?"

তারাপদরাও হাসল।

কিকিরা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রথীন বললেন, "তোমার অর্ডারি মতন জিনিসপত্র সাপ্লাই করতে পারব বলে ভাবিনি। অনেক খুঁজে-খুঁজে আমাদের পানুবাবুদের ক্লাবে একজনকে পেলাম। আরে সে আবার এল.আই.সি.অফিসে কাজ করে। কম্পিউটার সেকশানে। পানুবাবুর ক্লাবের মেম্বার। ছোটখাট পার্টে দিব্যি চালিয়ে দেয় শুনলাম।"

"রিলায়েব্‌ল?"

"তাই মনে হল। পানুবাবু বললেন।"

"মানাবে?"

"মানাবে মানে বারোআনা মানিয়ে যাবে। গড়ন, হাইট—একই ধরনের। মুখের মিলও আছে খানিকটা। বাকি যা তা হল মেকআপ ম্যান আর ড্রেসারের হাতে। সে লোক আমার হাতে আছে। জকি চৌধুরী।"

"জকি!"

"লাইনে সবাই তাকে জকি বলে। ওটা ওর ডাকনাম। হাত ভাল। নামও আছে।"

তারাপদ আর চন্দন হাঁ করে রথীনের কথা শুনছিল। কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না তাদের। কিকিরার মাথায় কখন যে কী ফন্দি ঘোরে, বোঝা দায়! উনি যে রথীনবাবুর সঙ্গে নতুন কোনও ফন্দি আঁটছেন বোঝা গেলেও, ফন্দিটা কী, তারা বুঝতে পারল না।

রথীন বসে পড়ে সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, "তোমার এই ঝঞ্ঝাটটা এবার চুকিয়ে ফেলো তো কিঙ্কর! আর পারা যাচ্ছে না। দত্তকাকার তাড়া একদিকে, অন্যদিকে আমার চাকরি..."

"বাঃ রথীদা! আমার চাকরি! আপনিই আমাকে চাকরিতে জুতে দিয়ে এখন আমাকে দুষছেন!"

"না রে ভাই, জাস্ট বললাম কথাটা। আসছে মাস থেকে আমি একটা প্রফেশন্যাল পার্টির সঙ্গে হপ্তায় তিনদিন স্টেজে নেচে বেড়াতে রাজি হয়েছি! কী করব, সময় কাটে না। শুধু আড্ডা মেরে-মেরে দিন কাটাতে ভাল লাগে না। সামথিং চাই, বুঝলে!" বলে চন্দনদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "কী বলো ডাক্তারসাহেব! বসে-বসে আড্ডা মেরে সময় কাটালে ফ্যাট বেড়ে যায়, সুগার উঁকি মারে—ঠিক কি না! দুম করে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি ভাবলেই আমার..."

"বুড়ো হতে আপনার আরও আট-দশটা বছর লাগবে," কিকিরা

হেসে বললেন, "আপনি এখনও সুস্থ শরীরে চালিয়ে যেতে পারবেন।"

বগলা চা দিয়ে গেল। চায়ের সঙ্গে সেউ, কুচো নিমকি।

চা খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, "রথীদা, তা হলে দিনটা ঠিক করে ফেলুন। কথা বলে নিন দত্তবাবুর সঙ্গে।"

"বলে নেব।"

"বলে নেব বললে হবে না," কিকিরা বললেন, "ওঁকেও তো অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। অষ্টধাতুর সকলের আসা চাই। তাঁদের সুবিধে-অসুবিধে আছে। আগে থেকে জানাতে হবে তাঁদের।"

"আবার একটা নেমন্তন্ন।"

"পুরো নেমন্তন্ন নাই হোক, চায়ের নেমন্তন্ন হলেই চলবে। তবে ওঁদের সকলেরই আসা চাই।"

"বলব দত্তকাকাকে।"

"বলবেন, দেরি না করাই ভাল।...বলবেন, এটা আমাদের ফাইন্যাল অ্যাসাল্ট, না, কী বলে যেন—সেইরকম একটা চেষ্টা। লাস্ট ক্যাম্প থেকে চুড়োয় ওঠার ব্যাপার। হয় আরোহণ, না হয় পতন।"

তারাপদ ঠাট্টা করে বলল, "গড়গড়িয়ে গাড্ডায় পড়া নাকি সার?"

"ওইরকম।"

"কিন্তু আমরা যে কিছুই বুঝলাম না!"

"কী মুশকিল! তোমরা না বুঝলে হয়? বুঝিয়ে দেব। তোমাদেরও স্টেজে নামা আছে। তবে ব্যাপারটা ফাইন্যাল না হওয়া পর্যন্ত মতলব বোঝাতে পারছিলাম না। বুঝিয়ে লাভ হত না। নাকি রথীদা?"

"ঠিকই বলেছ।" রথীন বললেন, "সিক্রেট কাণ্ডকারখানা আগে জানাতে নেই, জানালেই কেচ্ছা! আরে, আমাদের সিক্রেটটা আবার এমন যে, তারাপদরা শুনলে ভাববে, দুই বুদ্ধু মিলে ছেলেখেলা করার চেষ্টা করছি।" বলে তারাপদদের দিকে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, "আরে ভাই, তোমরা হলে কিঙ্করের দুই লেফটেনান্ট; তোমাদের না জানিয়ে কি ও পা বাড়াতে পারে!...সবই জানবে। বলে দাও, কিঙ্কর। তোমার লেফ্‌ট-রাইটদের বলে দাও।"

কিকিরা হাসিমুখে বললেন, "চা-টা শেষ করুক, বলছি। নয়তো বিষম খেয়ে মরবে।"

তারাপদরা চা খেতে-খেতে কিকিরা আর রথীনবাবুর লুকনো হাসি লক্ষ করছিল।

॥ ১০ ॥

চায়ের মজলিস বসতে-বসতে সন্ধে। একজন আগে এলো তো অন্যজন পরে, কাজকর্ম সেরে তবে আসা, আর কলকাতা শহরে কে কখন কোথায় আটকে যায় কেউ বলতে পারে না! তবু এলেন সবাই। না এসে উপায় নেই, নৃপতিনারায়ণের বিশেষ তাগাদা, সেইসঙ্গে ছোট্ট চিরকুট—'জরুরি দরকার'।

দিনটা আজ কিন্তু মনোরম। গতকাল মাঝরাত থেকে ঘণ্টা দুই বৃষ্টি হয়েছে কয়েক পশলা, জোরে এবং মাঝারি ধরনে। আজ সকালেও আকাশ মেঘলা ছিল। ঘোলাটে রোদের দুপুর ফুরোতেই আবার হালকা মেঘের ছায়া। ধূসর বিকেল। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ আর ঠাণ্ডা হাওয়া। মনে হয়, সামান্য রাতে এদিকেও একপশলা নামতে পারে।

খাওয়ার ঘরে নয়, বসার ঘরেই চায়ের মজলিস বসেছে। সবাই হাজির। কিকিরা আর রথীনও বসে আছেন একপাশে।

চা, জল, রাধাবল্লভী, আলুর দম আর শুকনো মিষ্টিমাষ্টা খেতে খেতে গল্প চলছিল। এলোমেলো গল্প, কথা, অল্পস্বল্প হাসি-তামাশা।

শেষে অরবিন্দ মজুমদার নৃপতিনারায়ণকে বললেন, "দত্তমশাই, আপনার জরুরি কথাটা তো শুনলাম না?"

নৃপতিনারায়ণ মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ, বলি। বলব বলেই তো ডাকলাম আপনাদের।...এর আগে সেদিন আমি আমার বাড়িতে

চোরের উৎপাতের কথা বলছিলাম। চোর বেটা কেন আসছিল তাও একটা আন্দাজে বলেছি। কিন্তু আজ ক'দিন ধরে আরেক উৎপাত শুরু হয়েছে। জ্যান্ত উৎপাত।"

"কীরকম ?"

"একটা লোক ক'দিন ধরেই বাড়িতে এসে জ্বালাচ্ছে। বলছে সে রাজকমলের ভাই, বেনারস থেকে আসছে।"

"রাজকমল ! মানে সেই কাশীর ভদ্রলোক ! ফেরার পথে মারা গিয়েছে ফুড পয়জেন হয়ে ?"

"হ্যাঁ। সেই রাজকমলের ভাই। বাড়িতে এসে উলটোপালটা কথা বলছে। তার ওপর খানিকটা হাবা গোছের। কথাও ভাল করে বলতে পারে না। আমার বিশ্বাস হয়নি গোড়ায়। তারপর দেখলাম, রাজকমলের সঙ্গে চেহারায় অনেকটা মিল। সাজপোশাকের ধরনটাও প্রায় একই রকম।

"কী বলছে সে ?" ধূর্জটি বললেন।

"যা বলছে সেটা যদি আমি বলি ধূর্জটিবাবু, তোমরা আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আমি তাকে বলেছি, বিরক্ত হয়েই, দেখো বাপু আমায় এসব কথা বলে লাভ নেই। বরং তুমি অমুক দিন সন্ধেবেলায় এসো, আমার বন্ধুবান্ধবরা হাজির থাকবেন, সকলের সামনে তোমার কথা বোলো।"

"লোকটিকে আপনি আজ আসতে বলেছেন ?"

"বলেছি। সে আসবে। হয়তো একটু দেরি হচ্ছে।"

"কথাটা কী, আপনিই বলুন না, শুনি—"

"শুনবে ! আমার মুখ থেকে শুনতে পারো, তবে কথাটা আমার নয়, তার।"

"বলুন আপনি।"

নৃপতিনারায়ণ মুখের পান নাড়াচাড়া করছিলেন। একবার দেখে নিলেন সকলকে। কিকিরার চোখের ইশারা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হল না। তারপর অনিচ্ছার ভান করে বললেন, "রাজকমলের ভাই বলছে, তার দাদাকে কলকাতায় মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। আমাকে সে বলল, তার দাদাকে একজন—সেন্ট্রাল ক্যালকাটার এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে দিন পনেরো রেখেছিল। আমি ভাবছিলাম—ভুল বকছে। পরে শুনলাম, আমার সঙ্গে রাজকমলের শেষ যেদিন দেখা হয়—তার পরও দিন দশ-পনেরো সে কলকাতায় ছিল। আমি অবশ্য জানতাম না। আমার ধারণা ছিল ও বেনারস ফিরে গিয়েছে। আমায় বলেছিল, ও দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছে।"

সবাই চুপ। হঠাৎ এক স্তব্ধ ভাব যেন ঘরটাকে কেমন আড়ষ্ট করে তুলল।

নৃপতিনারায়ণই আবার বললেন, "ভাইকে ও হোটেল থেকে চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, সময় মতন ফিরতে পারছে না, ক'দিন দেরি হবে।"

"তবে তো ঠিকই, চিঠি যখন লিখেছিল... !"

"এখন কথা হচ্ছে, রাজকমল হঠাৎ হোটেলে গিয়ে উঠল কেন ? নিজের মর্জিতে গিয়ে উঠল ? না, কেউ ওকে..."

অরবিন্দ বললেন, "সাবালক একটা লোককে কে আবার অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্যে ভজাবে ? কেনই বা ?"

বিশ্বপতি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কাশীনাথ বিরক্তভাবে বললেন, "একটা চিঠি ? কী দাম ! লিখলেই হল ! কে আর দেখতে যাচ্ছে রাজকমল কোথায় ছিল ?"

রথীন হঠাৎ বললেন, "না কাশীবাবু ! দাম আছে। রাজকমল মাঝ কলকাতার যে সাউথ ইন্ডিয়ান হোটেলে গিয়ে উঠেছিল—সেখানে আমি নিজে গিয়ে চেকআপ করেছি। কথা বলেছি। দশদিন সে হোটেলে ছিল। আপনি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার প্রমাণও আছে। ওই হোটেলে রাজকমলের কাছে আপনি প্রতিদিন যেতেন।"

কাশীনাথ থতমত খেয়ে গেলেন। উদ্‌ভ্রান্তের মতন চোখ করে দেখলেন রথীনকে, তারপর নৃপতিনারায়ণকে। কী বলবেন বুঝতে না পেরে শেষে জোর করে বললেন, "ধরে নিলাম, আমিই ওকে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলাম। খোঁজখবরও করতাম রাজকমলের। তাতে কী ? কেউ যদি আমাকে একটা হোটেল খুঁজে দিতে বলে—আমি তাকে আস্তানা খুঁজে দিই, তাতে কী প্রমাণ হয় ?"

"প্রমাণ হয়, আপনি রাজকমলের খবরাখবর রাখতেন, অথচ একবারও দত্তকাকাকে এ-ব্যাপারে জানাননি।"

"রাজকমল বারণ করেছিল।"

"আপনি তো রাজকমলের বেনারস যাওয়ার টিকিটও কেটে সিট বুক করিয়ে দিয়েছিলেন।" আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতন কথাটা বেরিয়ে গেল রথীনের মুখ থেকে।

"না, আমি নই। কাশীনাথ যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে, নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"আপনি সত্যি কথা বলছেন না।"

"টিকিট কাটা, সিট বুক করা—যা করার গোস্বামী করেছে।"

গোস্বামী ভয় না পেলেও ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, "হাঁ, আমি টিকিট কেটেছি, রিজার্ভেশান করিয়ে দিয়েছি। আমার লোক আছে, হরদম এইসব কাম-কাজ করিয়ে দ্যায়। হেল্পিং আদার ইজ নো অফেন্স !"

কিকিরা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। তাঁর যে পরিচয় নৃপতিনারায়ণ গোড়াতে এই ভদ্রজনের কাছে শুনিয়ে দিয়েছেন তাতে তিনি কোন মুখে গুরুতর বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন ! কিন্তু আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয়।

কিকিরা বললেন, "গোস্বামীজি, আপনি যদি কিছু না মনে করেন— !"

বাধা দিয়ে গোস্বামী বললেন, "আপনি কী বলবেন ! আপ..."

"আমি," কিকিরা অমায়িক মুখে হাসলেন, "আমি বাগানবাড়ি, বাগান, জমি-জায়গার দালাল নয় পণ্ডিতজি ! আমি কিকিরা। ম্যাজিশিয়ান। আজকাল দু-চারটে ক্রিমিন্যাল ধরে বেড়াচ্ছি।"

"তামাশা লাগাচ্ছেন ?"

"না, সার ; তামাশা নয়," কিকিরা মাথা নাড়লেন। দেখালেন নৃপতিনারায়ণকে। নৃপতিনারায়ণ এমন করে মাথা নাড়লেন যে বোঝা গেল, কথাটা ঠিকই।

গোস্বামী অবাক ! তবু জোর করে যেন ঠাট্টার গলায় বললেন, "এক জাসুস... !"

"না। আমি ডিটেকটিভ নই।" কিকিরা বললেন, "আপনি রাজকমলকে হেল্প করতে চাইছিলেন। তাতে আর অন্যায় কী আছে ? কিন্তু শুধু-শুধু হেল্প করতে চাইছিলেন কী ? আর ওই যে রাজকমল ফুড পয়জেন হয়ে মারা গেল ট্রেনে, ওকে কে মারল ?"

"বাঃ মশাই, বাঃ ! ট্রেনের টিকিট কেটে দিলাম আর আমি ফুড পয়জেন ভি করলাম ! তাজ্জব কি বাত !"

কিকিরা জানতেন এরকম প্রশ্ন স্বাভাবিক। তিনি আগেভাগেই তৈরি ছিলেন। শুধু কি নিজে তৈরি ? গত তিন হপ্তা কতরকম ভাবনাচিন্তা করেছেন, তাঁর দুই চেলা তারাপদ আর চন্দনকে খাটিয়েছেন বিস্তর, সেইসঙ্গে রথীদাকে নিয়ে মতলব বার করেছেন, তৈরি করিয়েছেন তাঁকেও। শিখিয়ে, পড়িয়ে দেখছেন, রথীদাও কাজের সময় চমৎকার চাল দিতে পারছেন।

কিকিরা বললেন, "হাওড়া স্টেশনে কে গিয়েছিল রাজকমলকে পৌঁছে দিতে ! আপনি। লুকোবার চেষ্টা করবেন না পণ্ডিতজি, আমরা জানি। রাত্রের ট্রেন। হাওড়া থেকে আটটা নাগাদ ছাড়ে। আপনি ওকে পৌঁছে দেন। খাবারটাবারও দিয়েছিলেন নাকি রাত্রে খাওয়ার জন্যে।"

"ঝুটা বাত। বিলকুল ঝুটা।"

"কে তা হলে খাবার দিয়েছিল ?"

"আমি জানি না।"

"জরুর জানেন।"

"না।"

"জানেন না—। বেশ, আমি পরে বলছি," বলেই কিকিরা কাশীনাথের দিকে তাকালেন। "আপনি কেন রাজকমলকে এই ভাবে হোটেলে রেখে আগলে রেখেছিলেন কাশীবাবু ! পণ্ডিতজি বলেছিলেন ? দু'জনে..."

গোস্বামী বললেন, "আটক আমি করিনি, ওই বিশ্ববাবু করেছিলেন।" বলে বিশ্বপতির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। "পুছে লিন। বিশুবাবু আপনি...।"

বিশ্বপতি নির্বিকার। কোনও কথা বললেন না। তবে তাঁর চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ভেতরে চঞ্চল হয়ে পড়েছেন।

নৃপতিনারায়ণ কাশীনাথকে বললেন, "কাশীবাবু, ইজ ইট ট্রু ?"

কাশীনাথ মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ। বললেন, "আমি আপনার কাছে কথা লুকবো না। বিশুই আমায় বলেছিল। রাজকমল যখন আপনার কাছে আসত-যেত—তখনই বিশু আমায় বলত, ওকে আপনার হাতছাড়া করিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে। কাশীর ওই লোকটাকে হাতে রাখলে মোটা টাকা পাওয়া যাবে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম। দত্তদা, আপনার কাছে আমি কবুল করছি, আমার পৈতৃক বাড়ি যে প্রপার্টি-মর্টগেজ কোম্পানির কাছে মর্টগেজ রাখা, বিশু সেই কোম্পানির একজন মালিক। আমার হাতে টাকা নেই। মর্টগেজ ছাড়াতে পারছি না। তার ওপর এমন নয় পার্টলি ধার শোধ করব, কিছু-কিছু করলেও এক সময়ে শোধ হয়ে যায়। ন হলে ওরা সুদ ঘাড়ে চাপিয়ে আমাকে শেষ করে দিচ্ছে।"

"ও ! বিশুবাবু তোমায় টাকা দেবে বলেছিল ? মানে তার কথা মতন কাজ করতে পারলে।"

"হ্যাঁ।"

বিশ্বপতি হঠাৎ বলেন, "টাকা আমি তোমায় দিয়েছি।"

"অর্ধেক দাওনি। মাত্র হাজার পঁচিশ দিয়েছ। তোমার দেওয়ার কথা পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।" রাগে, ক্ষোভে কাশীনাথ আর কথা বলতে পারল না।

"যা দিয়েছি তাও তোমার পাওয়ার কথা নয়," বিশ্বপতি বললেন, "তুমি চিট। তুমি গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। যেদিন থেকে আমি জানতে পারলাম তুমি গোস্বামীর সঙ্গেও রাজকমলকে দেখিয়ে টাকা নিচ্ছ, আমি আর তোমায় টাকা দিইনি। দিতামও না। তুমি জোচ্চোর। শেষদিন পর্যন্ত তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। আমিও তোমাদের ওয়াচ করেছি।"

কাশীনাথ আর বিশ্বপতি প্রায় ঝগড়া লাগিয়ে দিলেন। পারলে বুঝি এই বয়েসেও হাতাহাতি লাগিয়ে দেন।

ওঁদের ঝগড়ার মধ্যে চেঁচামেচি থেকে জানা গেল, বিশ্বপতি বেনারসে শালাকে চিঠি লিখে অনেক খোঁজখবর নিয়েছিলেন রাজকমল সম্পর্কে। আর তাঁর ধারণা হয়েছিল, রাজকমলের কাছ থেকে পুঁথির পাতাগুলো কিনে নিতে পারলে, অন্তত্পক্ষে পাঁচ-ছ' লাখ টাকা কামাতে পারবেন। পাতাগুলোর যে বাজারে অনেক দাম—এই কথাটা তো রাজকমলই তাঁদের বলেছিল।

কিকিরা এবার গোস্বামীজির দিকে তাকালেন। "পণ্ডিতজি, আপনি তা হলে রাজকমলের ওই ক'টা পুঁথির পাতা হাতাবার জন্যে কাশীবাবুর সঙ্গে ষড় করছিলেন ?"

"হাঁ।"

"কেন ?"

গোস্বামীজি অল্পসময় চুপ করে থেকে পরে বললেন, "আমি 'পউরি' কমিউনিটির লোক," বলে পাঞ্জাবির ডান হাতের হাতার অনেকটা গুটিয়ে ফেললেন। একেবারে উঁচুর দিকে একটা উলকি। লাল-কালোয় মেশানো। পদ্মফুলের মতন নকশা। হাতার কাপড় নামালেন। বললেন, "আমাদের চৌরা জৌনপুর। রাজকমল চোর-চোট্টা। সে ছোটি মহারাজের কাছ থেকে পাত্তিগুলো নিয়ে ভেগে এসেছিল।"

"আপনি জানলেন কেমন করে ?"

গোস্বামীজি একটু হাসলেন। গলার মালা কপালে ঠেকালেন। বললেন, "রাজকমল কলকাতায় টাকা কামাতে এসেছিল। সওদা করতে। দত্তবাবুজির বাড়িতে চেনা-জানা হল। আমায় চুপি-চুপি পাত্তির কথা বলল। ওর মালুম ছিল না আমি 'পউরি'। জৌনপুরে আমি চিঠি দিলাম। আমার সব মালুম হয়ে গেল। ছোটি মহারাজ আমায় হুকুম দিলেন, পাত্তিগুলো হাত করে নিতে।"

"আপনি— ?"

"শুনে নিন, মশাই। আমি খুনি আদমি নই। রাজকমলকে আমি দো লাখ টাকা আর সোনার চেইন দিলাম। আড়াই-তিন ভরিকো চেইন। ও আমায় একটা লেফাফা দিল। গাড়ি তখন ছুটে যাচ্ছে। লেফাফায় তিনটে পাত্তি ছিল। রাজকমল বহুত চিট। ভগবান ওকে ছাড়েনি।"

কিকিরা বললেন, "তা হলে রাজকমলকে বিষ খাওয়াল কে ? কে ওর সুটকেস নিয়ে হাওয়া হল ?"

গোস্বামী মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "আমার মালুম নেই।"

"আপনি এমন কাউকে দেখেননি ওর কম্পার্টমেন্টে, যাকে সন্দেহ হয় ?"

"ট্রেনে ভিড় ছিল। কামরায়...কামরায়..." হঠাৎ থেমে গেলেন গোস্বামী, চোখ বুজে কী যেন মনে করার চেষ্টা করলেন, শেষে আচমকা বললেন, "ঠিক বাত। হাঁ, আমার ইয়াদ আসছে। লাস্ট টাইমে এক প্যাসেঞ্জার এসে গেল। ওর থোড়া লাগেজ, টিফিন কেরিয়ার আর পানি নিয়ে একটা লোক।... সেই লোকটা..." বলতে-বলতে বিশ্বপতির দিকে তাকালেন গোস্বামীজি। "ওহি লোককে আমি দেখেছি, বিশুবাবুর গাড়ির ড্রাইভার।"

বিশ্বপতি সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন। "লায়ার ! তুমি মিথ্যে কথা বলছ গোস্বামী ! আমাকে তুমি ফাঁসাবার চেষ্টা করছ ! ...আমি তোমাকে, তোমাদের দেখে নেব।.... দত্তমশাই, কোথায় আপনার সেই রাজকমলের ভাই ? কোথায় সে ?"

কিকিরা রথীনকে ইশারা করলেন।

রথীন উঠে গেলেন। তবে বসার এই লম্বা বড় ঘরটার সামনের দিকে নয়। সামনের দিকেই বড় দরজা বাইরে থেকে আসার, দরজার বাইরে হাত কয়েক ঢাকা বারান্দা, দু-তিন ধাপ সিঁড়ি। রথীন সেদিকে গেলেন না। সোজা চলে গেলেন নৃপতিনারায়ণের সেই নিজস্ব রান্নাঘর আর খাবার ঘরের দিকে।

বসার ঘরের অবস্থাটা যেন ঝড় ওঠার মুখ। কেমন এক থম, লণ্ডভণ্ড হয়ে আসার আশঙ্কা চমকাচ্ছে। বিশ্বপতি চেঁচাচ্ছেন। অন্যরা চুপ।

এমন সময় রান্নাঘরের দিক থেকে প্যাসেজ দিয়ে বসার ঘরের পুবের এক পাল্লা দরজা দিয়ে রথীন ঘরে এলেন। তাঁর পেছনে রাজকমলের ভাই আর চন্দন, তারাপদ।

রাজকমলের ভাইকে দেখে বিশ্বপতি চুপ।

অন্যরাও দেখছিলেন। এঁরা প্রায় সকলেই দেখেছেন রাজকমলকে। কেউ বেশি, কেউ কম। মুখের গড়ন, সাজপোশাকের ধরনটা অনেকটাই এক।

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "এই লোকটি আমার কাছে ক'দিন ধরে আসছে, উত্যক্ত করছে। নিজেকে ও রাজকমলের ভাই বলছে। এখন তোমরা ওকে যা চাও জিজ্ঞেস করতে পারো।"

কাশীনাথ চন্দন আর তারাপদদের দেখতে-দেখতে বললেন,

"ওরা কারা ? আমি ওদের দেখেছি দোকানে।"

ভাদুড়িও মাথা নাড়লেন। "আমিও তো সেদিন দেখলাম আমার ওখানে।"

কিকিরা বললেন, "ওঁরা প্লেইন ড্রেস পুলিশ অফিসার 'ডি.ডি.' ডিপার্টমেন্টের।"

বিশ্বপতি আর কথা বলতে পারলেন না।

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "রাজকমলের হাঙ্গামাটা আমার আর ভাল লাগছে না। এ এক উটকো ঝামেলা। আজ তোমাদের সকলের সামনে সেই ঝামেলা আমি মিটিয়ে দিতে চাই।" বলে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক পা হেঁটে গিয়ে দেরাজের ওপর বড় ঘড়িটার তলায় হাত দিলেন। সেখানে এক ছোট্ট শুকনো ড্রয়ার। এমনভাবে মেশানো যে, চোখে পড়ে না।

ড্রয়ার থেকে একটা খাম বার করে ফিরে এলেন নিজের জায়গায়।

"রথীন, ওই সাজি ফুলদানিটা দাও।....মজুমদারমশাই, আপনার লাইটারটা দিন তো!"

ফুলদানি এল। লাইটার নিলেন নৃপতিনারায়ণ।

ফুলদানিটা গামলা বা বাটি ধরনের। কাছেই জলের জগ ছিল। খানিকটা জল ঢেলে নিলেন নৃপতিনারায়ণ ফুলদানিতে। তারপর খামের মধ্যে থেকে তিনটে লম্বাটে ফোটো প্রিন্ট বার করে লাইটার জ্বাললেন।

ধূর্জটি বললেন, "আপনি ওগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছেন নাকি? পুঁথির সেই ফোটো?"

"হ্যাঁ।"

"পুড়িয়ে কী লাভ নৃপতিবাবু! যাদের জিনিস তাদের না হয় ফেরত পাঠিয়ে দিন।"

"কী লাভ! এগুলো তো নকলের নকল। রাজকমলের কাছে যে নকল ছিল তার তিনটে পাতা গোস্বামী পেয়েছে। বাকি তিনটে পাতা— রাজকমল যা দেয়নি, তা ওর সুটকেসে রাখা টাকা, সোনার হারের সঙ্গে লোপাট হয়ে গিয়েছে।... ঠিক কিনা, গোস্বামী?"

গোস্বামীজি মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক। তো দাদা, একটা রিকোয়েস্ট আমার। আবার আপনি ওই পাত্তি তিনটে আমায় কাইন্ডলি গিফ্ট করেন তো আমি জৌনপুরের চৌরার ছোটি মহারাজকে পাঠিয়ে দিই। আপনাকে আমি ডিলের কথা বলছি না। আমি ওতনা বেয়াদপ নই। তবভি বলছি, আগর আপনি সেল্ ভি করতে চান, উই আর রেডি। জৌনপুরের চৌরার পউরিদের টাকা আছে, দাদা।....আমি আপনার কাছে মাফ্ চাইছি। আমায় চোর বলুন। তব্ এই চুরি আমার চৌরার জন্যে।"

নৃপতিনারায়ণ বললেন, "গোস্বামী, তোমাদের ওই দুই মঠ— সিনাইতারা আর জৌনপুরের রেষারেষি লড়াইয়ের মধ্যে আমি নেই। তোমরা কে কত পুরনো, কার কতটা ক্ষমতা, কে কতটা খাঁটি— তাও আমি জানতে চাই না। আমি কোনও দলেরই পেছনে নেই। শুধু একটা কথা তোমায় বলছি, এই পুঁথির মধ্যে কী আছে তার মর্ম উদ্ধার করা বোধ হয় যাবে না। যার কোনও অর্থ বোঝা যাচ্ছে না— তা নিয়ে দু' পক্ষের লড়াই অর্থহীন।"

লাইটার জ্বলে উঠেছিল। নৃপতিনারায়ণ পাতা তিনটে পুড়িয়ে ফুলদানির জলে ঢেলে দিলেন।

গোস্বামী শুধু হতাশ নয়, আহত হয়ে বিমর্ষ মুখে বসে থাকলেন। চোখে বোধ হয় জল এসে গিয়েছিল।

বিশ্বপতি উঠে পড়লেন হঠাৎ। তিনি চলে যাবেন।

কিকিরা বললেন, "আপনি চলে যাচ্ছেন? আপনার ড্রাইভারকে একবার ডাকি।"

"তো কী করব! বসে-বসে নাটক দেখব!"

"না। নাটক আপনাকে দেখতে হবে না। তবে জেনে যান, রাজকমলের মারা যাওয়ার পেছনে আপনার হাত আছে।"

"রাখুন মশাই, আপনি বললেই হাত থাকবে! কে আপনি?"

"আমি কেউ নই, কিন্তু প্রমাণগুলো তো আছে!"

"কীসের প্রমাণ?"

"আপনি রাজকমলের কাছ থেকে পাতাগুলো হাতাবার চেষ্টা করেছিলেন। মোটা টাকা দাঁও মারবেন বলে। পারেননি। না পেরে তার পিছু ধাওয়া করেছিলেন। তলায়-তলায় আপনি সবই খবর রাখতেন। রাজকমল যেদিন ফিরে যায় সেদিনও আপনি তার পেছনে নিজের ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়েছিলেন। আপনি ভেবেছিলেন, খালি সুটকেস নিয়ে ফেরার পাত্র রাজকমল নয়। কপালে থাকলে কিছু জুটে যেতে পারে। অন্তত দু-তিনটে পাতা।"

"এই প্রমাণ?" বিশ্বপতি পা বাড়ালেন।

"আপনার ড্রাইভারও কি প্রমাণ নয়?"

"না।"

"আপনার গাড়ি? প্ল্যাটফর্মে কার পার্কিংয়ে গাড়ি ছিল না আপনার?"

"কে দেখেছে?"

"দেখার লোক আছে।"

বিশ্বপতি তাচ্ছিল্যের শব্দ করলেন। করে এগুতে গেলেন।

কিকিরা বললেন, "আপনি এখন চলে যাচ্ছেন যান। কিন্তু থানা, পুলিশ আপনাকে ছাড়বে না, সার।...আর টিফিন কেরিয়ারের কথাটা মনে রাখবেন।"

"দেখা যাবে।"

বিশ্বপতি চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যের অবস্থাটা তখন কেমন এলোমেলো। সকলেই বোকা বোবার মতন বসে। বড় করে নিশ্বাস ফেললেন অরবিন্দ মজুমদার, ধূর্জটি বললেন, "আশ্চর্য, এসব ভাবাই যায় না।" শ্যামলাল চুপ। গোস্বামী তখনও বিষণ্ণ মুখে বসে।

কিকিরাই শেষে সামান্য হেসে বললেন, "রথীদা, রাজকমলের ভাইকে তবে দেখিয়ে দিন..."

রথীনকে কিছু করতে হল না। রাজকমলের ভাই, ওরফে গৌরাঙ্গ পাল নিজেই মাথার খোঁচা-খোঁচা পরচুলা খুলে ফেলে গাল, গলা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "ধ্যুত, আপনার যে কী কাণ্ডকারখানা রথীদা, এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকা যায়! স্টেজেও কোনওদিন থাকিনি।"

কিকিরা, রথীন হেসে ফেললেন। তারাপদ, চন্দনও হেসে উঠল।

অরবিন্দ, ধূর্জটি, গোস্বামী, কাশীনাথ, শ্যামলাল, ধনরাজ অবাক হয়ে দেখছিলেন গৌরাঙ্গকে।

গোস্বামীজি দেখলেন। নিশ্বাস ফেললেন দীর্ঘ করে। চোখে জল। কাঁদছেন।

সুন্দরবনের বাঘ

অরবিন্দ গুহ

টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। একখানা জমাটি উপন্যাসে মজে আছেন মাধবী, ছেড়ে যাওয়া চলে না। আর কেউ ধরুক টেলিফোন।

কিন্তু বাড়িতে এখন উনি ছাড়া আর কেউ নেই। টেলিফোন তো ওঁর হাতের কাছেই। হাত বাড়িয়ে ধরলেই হয়। উনিই ধরুন। জমাটি উপন্যাস ছেড়ে টেলিফোন ধরার জন্য মাধবীর ছুটে যাওয়ার দরকার নেই।

টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। ধেত, উনি কি তা হলে বাড়িতে নেই? বাইরে গেছেন? না, তা তো অসম্ভব ব্যাপার, মাধবীকে না জানিয়ে উনি তো কখনও বাইরে যান না।

টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। অগত্যা উপন্যাস ছেড়ে মাধবীকে উঠতে হল।

উনি ঘরেই আছেন, আপিসের কাগজপত্তরের মধ্যে ডুবে আছেন।

রিসিভার তুলে মাধবী বললেন, "হ্যালো।"

ফোনের ওপার থেকে শম্ভু বলল, "পিসিমা? আমি শম্ভু বলছি।"

"বলো।"

"পিসেমশাই বাড়িতে আছেন?"

"আছেন। দেব?"

"না, না। কী করছেন এখন পিসেমশাই?"

"আপিসের কাগজপত্তরের মধ্যে ডুবে আছেন।"

গলা নামিয়ে শম্ভু বলল, "পিসেমশাইয়ের আপিস আর ফ্যাক্টরি থেকে অদ্ভুত সব কথা আমার কানে আসছে। তুমি কিছু শুনেছ?"

"না তো!"

"যাকগে, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথাবার্তা আছে। আজ বিকেল পাঁচটায় আমি তোমার কাছে যাব। তুমি তখন বাড়ি থাকবে তো?"

"হ্যাঁ, আমি বাড়ি থাকব। কিন্তু তোমার পিসেমশাই তো তখন বাড়ি থাকবেন না। উনি তো রাত আটটার আগে কোনওদিন বাড়ি ফেরেন না।"

"তা তো জানি। কথাগুলো গোপন, ওঁর সামনে বলা চলবে না। শুধু তোমাকেই বলতে হবে। আজ বিকেল পাঁচটায়। ছেড়ে দিচ্ছি।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে মাধবী তাকালেন শিবশঙ্করের দিকে। শিবশঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে, মাধবী। গত বছর ব্যবসায় আমার লাভ হয়েছিল ষাট কোটি টাকা, এবার লাভ

হয়েছে মাত্র আশি কোটি টাকা। কিন্তু এবার অন্তত একশো কোটি টাকা লাভ হওয়া উচিত ছিল।"

কফি শিবশঙ্করের খুব প্রিয়। মাধবী বললেন, "তুমি কি এখন আর-এক কাপ কফি খাবে ?"

শিবশঙ্কর বিষণ্ণ হয়ে বললেন, "ব্যবসার যদি এই হাল হয় তা হলে আমাদের শাকভাতও জুটবে না, উপোস করে মরতে হবে।"

মাধবী চুপ করে রইলেন।

টেবিলে ঘুসি মেরে শিবশঙ্কর বললেন, "আসলে ষড়যন্ত্র। ফ্যাক্টরিতেই বলো আর আপিসেই বলো, সকলেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সকলেই ভিজে বেড়াল হয়ে আছে, মিউ-মিউ ছাড়া কারও মুখে কোনও আওয়াজ নেই। কিন্তু আমিও দেখে নেব, শক্ত হাতে লাগাম ধরব, সব ব্যাটাকে টাইট করে দেব।"

শিবশঙ্কর চোখমুখ পাকিয়ে খানিকক্ষণ মাধবীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মাধবী শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কি আপিসে যাবে, না ফ্যাক্টরিতে ? না কি বাড়িতে বসেই কাজ করবে ?"

ঘুরন্ত পাখার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শিবশঙ্কর বললেন, "শুধু ঝোলভাত হলেই আমার যথেষ্ট। এখন আমার আর কিছু গলা দিয়ে নামবে না।"

কী কথার কী উত্তর !

মাধবী আর কথা বাড়ালেন না। ফ্যাক্টরি আর আপিসের কথা ভেবে-ভেবে শিবশঙ্করের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না তো ? হে ভগবান, অমন সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার যেন না হয়।

অবশ্য একশো কোটির বদলে মাত্র আশি কোটি টাকা লাভ হবে, মাথা ঠিক রাখা শক্ত। সেদিকটাও ভগবানের বিবেচনা করে দেখা উচিত। হে ভগবান, যেন উপোস করে মরতে না হয়।

ঝোলভাত খেয়ে গাড়িতে উঠলেন শিবশঙ্কর। দোতলা থেকে মাধবী হাত নাড়লেন। গাড়িতে বসে শিবশঙ্করও হাত নেড়ে দিলেন।

আপিসে নিজের ঘরে এসে বসলেন শিবশঙ্কর। বাসুদেব পাখা খুলে দিয়ে সেলাম করল। বাসুদেব শিবশঙ্করের খাস বেয়ারা। শিবশঙ্কর খুব পছন্দ করেন বাসুদেবকে। কখনও কোনও কথা বলে না বাসুদেব, সব হুকুম নিঃশব্দে নির্ভুলভাবে তামিল করে যায়। আপিসে আর ফ্যাক্টরিতে সকলে যদি বাসুদেবের মতো হত তা হলে শিবশঙ্করের মনে আর কোনও অশান্তি থাকত না।

শিবশঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাসুদেবকে বললেন, "তরফদারবাবুকে ডাকো।"

বাসুদেব চলে গেল। হন্তদন্ত হয়ে তরফদারবাবু ঘরে ঢুকলেন।

শিবশঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "আপনি শুধু হাতে এসেছেন কেন ? আমি কি আপনার মুখ দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি ? একটু কষ্ট করে ফ্যাক্টরির এ-মাসের প্রোডাকশনের ফাইলটা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেননি ? না কি হাতে আপনার গোদ হয়েছে ?"

মুখ লাল করে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেলেন তরফদারবাবু। আগে এমন রাগী কথাবার্তা বলতেন না শিবশঙ্কর, হালে কিছুদিন থেকে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। হয়তো এমনই হয়, কোটি-কোটি টাকার গরমে মানুষের মাথাও হয়তো গরম হয়ে যায়।

ফাইল নিয়ে এলেন তরফদারবাবু। নিচু গলায় বললেন, "সার, আগের মাসের ফাইলটাও কি আনব ?"

শিবশঙ্কর রাগ করে বললেন, "আমার সামনে দাঁড়িয়ে অত মিনমিন করতে হবে না। যান, নিজের জায়গায় গিয়ে কাজ করুন।"

তরফদারবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ বাদে শিবশঙ্কর কলিংবেল বাজালেন। বাসুদেব হাজির। শিবশঙ্কর মোলায়েম গলায় বললেন, "বাসুদেব, ব্যানার্জিসাহেবকে একবার ডাকো।"

ব্যানার্জিসাহেব এলেন।

তাঁকে দেখেই ফেটে পড়লেন শিবশঙ্কর, "আজকাল কিছুই দেখছেন না আপনি, চোখ বুজে আছেন, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, এদিকে সকলে লুটেপুটে খাচ্ছে।"

দেওয়ালের কান আছে। অতএব ব্যানার্জিসাহেব গলা খাদে নামিয়ে বললেন, "সার, আপনি তো জানেন যে আমি একজন সৎ লোক, আমাদের বংশে আজ পর্যন্ত কোনও অসৎ লোক জন্মায়নি, ভবিষ্যতেও জন্মাবে না..."

কথা শেষ করতে না দিয়ে শিবশঙ্কর টেবিলে কিল মেরে বললেন, "অত ফিসফিস করে যা-তা কী বলছেন ? আপনার কথার কোনও মানে হয় না। যান, সবদিকে নজর রেখে কাজ করুন। বি কেয়ারফুল।"

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন ব্যানার্জিসাহেব। গোপনে আরও অনেক কথা বলার ছিল তাঁর, কিন্তু কিছুই বলা গেল না, ধাতানি খেয়ে ফিরে আসতে হল।

সারাদিনে শিবশঙ্কর কত লোককে যে ধমক দিলেন তা বলে শেষ করা অসম্ভব। সকলেই ফিসফিস করছে কিংবা মিনমিন করছে, স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলছে না, শিবশঙ্কর নিশ্চিত যে, বাসুদেব ছাড়া আর সকলেই ষড়যন্ত্রের ভেতর আছে। কখনও কোনও কথা বলে না বাসুদেব, সব হুকুম নিঃশব্দে নির্ভুলভাবে তামিল করে যায়। বাসুদেবের ওপর অনায়াসে নির্ভর করা চলে।

আবার কলিংবেল বাজালেন শিবশঙ্কর। বাসুদেব হাজির।

শিবশঙ্কর শান্তভাবে বললেন, "বাসুদেব, ঠিক পাঁচটা বাজলেই আমি এখান থেকে সটান ফ্যাক্টরিতে যাব। সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে আটটা। পাঁচটার একটু আগে তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো।"

বাসুদেব সেলাম করে বিদায় নিল। এবং পাঁচটার দশ মিনিট আগে এসে আবার শিবশঙ্করকে সেলাম করল। হ্যাঁ, এবার উঠতে হয়।

ঠিক বিকেল পাঁচটার সময় ফ্যাক্টরির দিকে রওনা হল শিবশঙ্করের গাড়ি।

আর কাঁটায়-কাঁটায় বিকেল পাঁচটায় শম্ভু হাজির হল শিবশঙ্করের বাড়িতে।

পাখা চালিয়ে দিয়ে মাধবী বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো শম্ভু।"

শম্ভু চাপা গলায় বলল, "পিসিমা, ব্যাপারটা খুব গোপন। তুমি কিছুই শোনোনি ?"

মাধবী ঘাড় নেড়ে বললেন, "না।"

শম্ভু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপিসে আর ফ্যাক্টরিতে পিসেমশাইকে সকলে মাটির মানুষ বলে জানত। কিন্তু আজকাল একেবারে কেলেঙ্কারি। গালমন্দের চোটে পিসেমশাই সকলের ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছেন। কারও কোনও কথা কানে নিচ্ছেন না।"

মাধবী আস্তে-আস্তে বললেন, "শুনেছি এবার কুড়ি কোটি টাকা লোকসান..."

কথা শেষ করতে না দিয়ে শম্ভু বলল, "আরে ওসব লোকসান-ফোকসান বাজে কথা। লোকসানের জন্য গালমন্দের চোটে সকলের ভূত ভাগিয়ে দেওয়ার মতো মানুষ পিসেমশাই নন, তা হলে এখন এমন হয়ে গেলেন কেন ?"

মাধবী হাত উলটে বললেন, "তা অবশ্য ঠিক কথা।"

শম্ভু বলল, "অনেকের ধারণা, পিসেমশাইয়ের মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। তাড়াতাড়ি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার।"

মাধবী চমকে উঠে বললেন, "সাইকিয়াট্রিস্ট ? সে তো পাগলের ডাক্তার ? তোমার পিসেমশাই কি তা হলে পাগল হয়ে যাচ্ছেন ?"

শম্ভু ভুরু কুঁচকে বলল, "অত পাগল-পাগল করছ কেন ? মনের অসুখ বলো। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবেন।"

"তোমার চেনাজানা কোনও ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট আছে !"

শম্ভু বলল, "আছে। আমার বন্ধু। পীযূষ দত্ত ! বিলেতফেরত। পয়লা নম্বর ডাক্তার।"

"চলো, তা হলে একদিন তার কাছে তোমার পিসেমশাইকে নিয়ে যাই।"

শম্ভু আপত্তি করে বলল, "না, না, অমন কাজ করা যাবে না। পিসেমশাই যদি টের পান যে তাঁর মনের অসুখ হয়েছে তা হলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। কাজটা খুব গোপনে সারতে হবে।"

"কীভাবে গোপনে কাজটা সারবে ?"

শম্ভু তুড়ি মেরে বলল, "পীযূষের সঙ্গে আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। সামনের রবিবার সকালের দিকে পীযূষ আমার সঙ্গে এখানে আসবে, পিসেমশাইয়ের দু-একটা কথা শুনবে, ব্যস, তা হলেই কাজ হয়ে যাবে। যা বলার পীযূষ তোমাকে আর আমাকে সব গোপনে বলে যাবে। ভাল ব্যবস্থা করিনি ?"

পিসিমা সায় দিয়ে বললেন, "খুব ভাল ব্যবস্থা করেছ। এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।"

পরের রবিবার সকালে পীযূষকে নিয়ে শম্ভু সটান পিসেমশাইয়ের ঘরে ঢুকল।

শিবশঙ্কর খবরকাগজ পড়ছিলেন, যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, "শম্ভু, এত সকালে ? বাড়ির খবর সব ভাল তো ?"

শম্ভু ঘাড় কাত করে জানাল যে, বাড়ির খবর সব ভাল।

পীযূষ নজর করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল শিবশঙ্করকে।

শম্ভু বলল, "খবরকাগজে আজ কি বিশেষ কোনও খবর আছে ?"

শিবশঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার আর বলবার কী আছে বলো। এ-বছর কুড়ি কোটি টাকা লোকসান। আমি কী আর আমাতে আছি।"

শম্ভু ঘাড় চুলকে বলল, "ব্যাপারটা ভুলে যান। ব্যবসাতে লাভ-লোকসান তো আছেই। সামনের বছরেই আবার হয়তো দু'গুণ লাভ করবেন।"

শিবশঙ্কর একটু হাসলেন। বললেন, "তোমার পিসিমার কথা আর কী বলব ! এ-যুগে তিনি অচল ! টিভিতে তাঁর মন নেই। তিনি উপন্যাস নিয়েই মশগুল।"

পীযূষ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। শম্ভুকে বলল, "চলো।"

দু'জনেই শিবশঙ্করকে নমস্কার করে ওপরে চলে গেল পিসিমার কাছে। দু'জনের জন্য প্লেটে খাবার সাজিয়ে পিসিমা বসে আছেন।

কাঁটা দিয়ে গেঁথে অমলেটের একটা টুকরো মুখে পুরে পীযূষ বলল, "আমার যা দেখার ছিল দেখা হয়ে গিয়েছে। খুব সম্ভব মাথারই একটু এদিক-ওদিক হয়েছে। ও কিছু না। পিসিমা, উনি সকালবেলা কী খান ?"

"দু'পিস টোস্ট আর কয়েক কাপ কফি।"

"আর রাত্তিরে ?"

"রাত্তিরে খুব সামান্য ঝোলভাত খান আর একগ্লাস গরম দুধ।"

পীযূষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "ব্যস, তা হলে আর কোনও অসুবিধে নেই। এসব রুগি ওষুধ খেতে খুব আপত্তি করে। এমনভাবে এদের ওষুধ খাওয়াতে হয় যেন এরা টের না পায় যে ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে।"

মাধবী কিন্তু-কিন্তু হয়ে বললেন, "কিন্তু সেটা কেমন করে হবে ? উনি তো টের পাবেনই যে ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে। তা হলেই তো তুলকালাম কাণ্ড করে বসবেন।"

পীযূষ ঘাড় নেড়ে বলল, "আরে না, না, উনি কিছু টের পাবেন না। আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটা ট্যাবলেট লিখে দিয়ে যাচ্ছি। দিনে দু'বার খাওয়াবেন, সকালে একটা, রাত্তিরে একটা। সকালের ট্যাবলেটটা এক কাপ কফির মধ্যে ফেলে দেবেন আর রাত্তিরের ট্যাবলেটটা দুধের মধ্যে ফেলে দেবেন। সঙ্গে-সঙ্গে ট্যাবলেট গলে যাবে।"

মাধবী জিজ্ঞেস করলেন, "কফির আর দুধের স্বাদগন্ধে উনি নিশ্চয় টের পেয়ে যাবেন।"

পীযূষ একটু হেসে বলল, "না। এই ট্যাবলেটের কোনও স্বাদগন্ধ নেই। উনি কেমন করে টের পাবেন ?"

মাধবী আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "তা হলে অবশ্য খুব ভাল।"

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে পীযূষ বলল, "কিন্তু একটা কথা। এই ওষুধ খেয়ে উনি কিন্তু বাইরে বেরোতে চাইবেন না, চাইলেও পারবেন না, দিনরাত শুধু ঘুমোবেন। আপনি ভয় পাবেন না কিন্তু, সামনের রবিবার সকালে আমি আবার আসব। দেখি কতদূর কী হয়। চলি।"

শম্ভু বলল, "তুমি যাও। আমি ওষুধটা কিনে দিয়ে যাব।"

পরের রবিবার সকালে পীযূষকে নিয়ে শম্ভু আবার এল পিসেমশাইয়ের ঘরে। পিসিমাও বসে আছেন পিসেমশাইয়ের মুখোমুখি। পিসেমশাইয়ের চোখে ঢুলুঢুলু ভাব।

শম্ভু বলল, "কেমন আছেন পিসেমশাই ?"

শিবশঙ্কর লাল চোখে তাকালেন শম্ভুর দিকে। বললেন, "হ্যাঁ, আজ কাগজে দেখলাম বিকেলের দিকে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা আছে।"

শম্ভু বলল, "না, না, ঘূর্ণিঝড়ের কথা নয়। আপনি কেমন আছেন ?"

ঢুলতে-ঢুলতেই পিসেমশাই বললেন, "পুরী গিয়েছিলাম দশবছর আগে। চমৎকার সমুদ্র। তোমরা দু'জনে যদি যাও তো পিসিমাকেও নিয়ে যেয়ো। আমার এখন যাওয়া হবে না।"

পিসেমশাই ঢুলতে লাগলেন।

পীযূষের ইশারায় শম্ভু আর মাধবীকে ঘরের বাইরে যেতে হল। পীযূষও চলে এল বাইরে। পিসেমশাই তখনও ঢুলছেন।

মাধবীর সঙ্গে শম্ভু আর পীযূষ ওপরে চলে গেল।

টেবিলে আঙুল ঠুকতে-ঠুকতে পীযূষ বলল, "মনের অসুখ নয়। কানের অসুখ।"

শম্ভু বলল, "মাথার অসুখ নয় ? কানের অসুখ ?"

পীযূষ জোর দিয়ে বলল, "আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। মাথা ঠিক আছে। বোধ হয় দুটো কানই গেছে, একদিনে যায়নি, আস্তে-আস্তে গেছে, একেবারে বদ্ধ কালা হয়ে যাওয়ার আর খুব দেরি নেই। কান ঠিক হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মাধবী ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী করব তুমিই বলে দাও।"

একটু ভেবে নিয়ে পীযূষ বলল, "দেখুন, এসব ব্যাপারে এ-দেশের ডাক্তারদের ওপর আমার কোনও ভরসা

নেই। কানের বারোটা তো তাঁরা বাজাবেনই, সঙ্গে-সঙ্গে আরও কত জায়গার বারোটা বাজাবেন কে জানে!"

মাধবী সায় দিয়ে বললেন, "ঠিক কথা, আমাদের ডাক্তারবাবুদের অসাধ্য কাজ নেই। তা হলে আমাদের এখন কী করা উচিত?"

পীযূষ হাত তুলে অভয় দিয়ে বলল, "ঘাবড়াবার কিছু নেই। ভগবানের দয়ায় টাকাকড়ি যখন আপনাদের অঢেল আছে, তখন আর ভাবনা কী! পিসেমশাইকে নিয়ে সোজা চলে যান জার্মানিতে, ফ্রাঙ্কফুর্টে। সেখানে আছেন ডক্টর গেয়র্গ, বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার, নাক-কান-গলার ধন্বন্তরি।"

উরুতে চাপড় মেরে শম্ভু বলল, "আরে আমার বন্ধু সন্তোষ রায়ও তো ফ্রাঙ্কফুর্টে ডাক্তারি করে।"

পীযূষ ঘাড় নেড়ে বলল, "সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম। সন্তোষ এই ডক্টর গেয়র্গের খুব প্রিয় ছাত্র, ডক্টর গেয়র্গের প্রায় সব অপারেশনেই ডক্টর গেয়র্গের পয়লা অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে সন্তোষ। তুমি টেলিফোনে সন্তোষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাখো, সব ব্যবস্থা নিখুঁত হয়ে যাবে।"

শম্ভু বলল, "আমি আজ রাত্তিরেই সন্তোষের সঙ্গে কথা বলে রাখব।"

গলাটা নামিয়ে নিয়ে পীযূষ বলল, "পিসিমা, আপনাকেও তো একটা শক্ত কাজ করতে হবে। আপনি ছাড়া আর কে পিসেমশাইকে সব কথা খুলে বলবেন? কিন্তু কথাটা খুব সোজা হবে না। একবার পিসেমশাইয়ের এ-কানে বলবেন, আর-একবার ও-কানে বলবেন, খুব চিৎকার করে বলবেন, বারবার বলবেন।"

"বারবার চিৎকার করে বলতে হবে?"

পীযূষ হতাশভাবে বলল, "উপায় কী! কিছুই না জানিয়ে পিসেমশাইকে তো আর ফ্রাঙ্কফুর্টে নিয়ে যাওয়া যায় না। আচ্ছা চলি।"

শম্ভু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কান টানলে মাথা আসে শুনেছিলাম, এখন দেখছি মাথা টানলেও কান আসে।"

সেদিন রাত্তিরেই মাধবী খাওয়াদাওয়ার পর একবার শিবশঙ্করের এ-কানে, আর একবার শিবশঙ্করের ও-কানে খুব চিৎকার করে বারংবার সব কথা খোলাখুলি বললেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট যেতে শিবশঙ্কর কোনও আপত্তি করলেন না। কিন্তু খুব চিৎকার করে বারংবার সব কথা বলার ফলে মাধবীর গলা ভেঙে গেল, ফুসফুসও আস্ত রইল কি না কে জানে। তা এখন কি ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো যায়?

শিবশঙ্কর আর মাধবীকে নিয়ে শম্ভু ফ্রাঙ্কফুর্টে এসে নামল। সন্তোষ হাজির আছে এয়ারপোর্টে, কোনও অসুবিধে হল না।

সন্তোষ আগেই হোটেল ঠিক করে রেখেছে। সেখানে উঠে সকলেই সন্তুষ্ট। চমৎকার ব্যবস্থা।

বিদায় নেওয়ার আগে সন্তোষ বলল, "কাল বিকেলে আমি আপনাদের ডক্টর গেয়র্গের কাছে নিয়ে যাব। সব তাঁকে বলে রেখেছি। আমি যখন আছি তখন আপনাদের ভাবনার কিছু নেই।"

পরদিন বিকেলে সন্তোষের সঙ্গে শিবশঙ্করকে নিয়ে শম্ভু আর মাধবী ডক্টর গেয়র্গের কাছে হাজির। শিবশঙ্করকে সন্তোষ নিয়ে গেল ভেতরে, বাইরে মাধবীকে নিয়ে বসে রইল শম্ভু।

কী হয় কে জানে! শিবশঙ্করের কান ডাঃ গেয়র্গ সত্যি-সত্যি ভাল করে দিতে পারবেন!

আধঘণ্টা বাদে সন্তোষ বেরিয়ে এল শিবশঙ্করকে নিয়ে। বলল, "ডাঃ গেয়র্গ দেখেছেন। বলেছেন, 'ভয়ের কিছু নেই। তিনদিন পর আমি দুটি কানেই অপারেশন করে দেব। পরদিন ওঁরা কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন। দুটি কানের ফুটোয় দুটি রবারের ছিপি লাগানো থাকবে। সাতদিন বাদে ছিপি দুটো খুলে ফেলতে হবে। ব্যস, আর কিছু লাগবে না।'"

মাধবী অবাক হয়ে বললেন, "তা হলেই ওঁর কান ঠিক হয়ে যাবে?"

সন্তোষ হেসে বলল, "পিসিমা, ডক্টর গেয়র্গের সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা নেই। কানের ব্যাপারে উনি অসাধ্যসাধন করতে পারেন। সাতদিন বাদেই আপনারা বুঝতে পারবেন কী কাণ্ড হয়েছে। পিসেমশাই কত দূরদূরান্তের আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পারবেন তা দেখে আপনিই অবাক হয়ে যাবেন।"

শম্ভু খুশি হয়ে বলল, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক সন্তোষ।"

তিনদিন পর অপারেশন হয়ে গেল। পরদিন পিসেমশাই আর পিসিমাকে নিয়ে এরোপ্লেনে উঠল শম্ভু।

কলকাতা। ভবানীপুরে পিসেমশাইয়ের বাড়ি। যাক, এবার নিশ্চিন্ত!

সাতদিন পর শিবশঙ্করের দু'কান থেকে শম্ভু রবারের ছিপি দুটি খুলে ফেলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে-হাসতে বললেন, "স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সুন্দরবনের বাঘের ডাক। বাপ রে বাপ, কী আওয়াজ। বাঘের গর্জনে সুন্দরবনের ডালে-ডালে বানরেরা কিচিমিচি করছে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ভয়ে হরিণেরা ছুটে পালাচ্ছে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, বাঘের গর্জনের দাপটে গাছের পাতা ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।"

শম্ভু অবাক হয়ে তাকাল মাধবীর মুখের দিকে। "ডক্টর গেয়র্গ অসাধ্যসাধন করতে পারেন, কথাটা দেখা যাচ্ছে ষোলো আনা সত্যি। ভবানীপুরে বসে সুন্দরবনের বাঘের ডাক শোনা তো সামান্য কথা নয়!"

মাধবী খুশি হয়ে বললেন, "চলো না দিনকয়েক দার্জিলিং ঘুরে আসি।"

শিবশঙ্কর ঘাড় নেড়ে বললেন, "আরে না না, এখন আর কফি খাব না। একটু আগেই তো খেলাম।"

শম্ভু একটু চমকে উঠল। পিসিমার কথার কী উত্তর দিলেন পিসেমশাই? দূরদূরান্তের সুন্দরবনের বাঘের গর্জন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন, অথচ দু'হাত দূরের পিসিমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না?

কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য শম্ভু গলা চড়িয়ে বলল, "পিসেমশাই, গতবার আপনার কুড়ি কোটি টাকা লোকসান গেছে। এবার কি আপনি সেটা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিতে পারবেন?"

শিবশঙ্কর ঘন-ঘন ঘাড় নেড়ে বললেন, "আরে না না, মাংসফাংস খেতে আর ভাল লাগে না। ওসব কি ভদ্রলোকের খাদ্য? আজ কবজি ডুবিয়ে খাব ইলিশ আর গলদা চিংড়ি। যাও শম্ভু, তুমি আর দেরি কোরো না, এখনই গড়িয়াহাট বাজারে চলে যাও, ইলিশ আর গলদা চিংড়ি নিয়ে এসো।"

শম্ভু পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাধবীও শম্ভুর মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ডক্টর গেয়র্গ অসাধ্যসাধন করেছেন বটে!

শিবশঙ্কর হ্যা-হ্যা করে হাসতে-হাসতে বলতে লাগলেন, "স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সুন্দরবনের বাঘের ডাক। বাপ রে বাপ, কী আওয়াজ। ডালে-ডালে বানরের কিচিমিচি, ছুটন্ত হরিণের পায়ের শব্দ, গাছের পাতা ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে, সব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আবার, আবার, আবার সুন্দরবনের বাঘের গর্জন।"

ছবি : দেবাশিস দেব

পাখির চোখে পৃথিবী

অতনুকুমার রাহা

পাখির মতো আকাশ পরিক্রমায় কৃত্রিম উপগ্রহের যান্ত্রিক চোখে ধরা পড়ে পৃথিবীর অনেক তথ্য। সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্যও আছে অত্যাধুনিক কম্পিউটার-প্রযুক্তি।

JALDAPAR
IRS 1B-L2-91
DEN SAL >.4
OPN SAL .1-.4
DEN MIX >.4
MIX OPN .1-.4
DEGRADED <.1
PLANTATIONS
THATCH GRASS
RIVERAIN FOR
VILLAGE ORCH
AGRICULTURE
BUILT_UP
WATER BODIES
SANDY AREAS
RRSSC_KGP

JALPAIPURI
IRS 1B-L2-91
DEN SAL >.4
OPN SAL .1-.4
DEN MIX >.4
MIX OPN .1-.4
DEGRADED <.1
TEAK PLANTATI
SAL PLANTATIO
THATCH GRASS
RIVERAIN FOR
VILLAGE ORCH
AGRICULTURE
BUILT_UP
WATER BODIES
SANDY AREAS
RRSSC_KGP
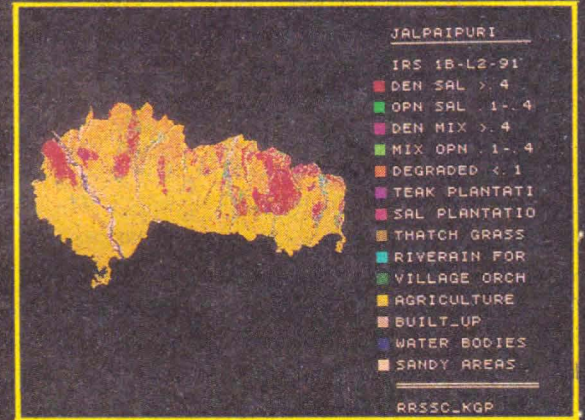
উপগ্রহ থেকে বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে তোলা ফোটোগ্রাফ : জলদাপাড়া (বাঁ দিকে) ও জলপাইগুড়ি জেলা (ডান দিকে)

ভারতের নিজস্ব দূরসংবেদী উপগ্রহ এই আই আর এস-ওয়ান এ

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর তত্ত্ব অনুযায়ী মহাজগতের শুরুও নেই শেষও নেই। আদিঅন্তহীন এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অর্বুদ কোটি তারা নাকি কোটি-কোটি বছর ধরে জন্মাচ্ছে, মারা যাচ্ছে আবার জন্ম নিচ্ছে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যাই মুশকিল। তার ওপর আবার বিজ্ঞানীরা বললেন, সময়েরও নাকি মা-বাপ নেই, অর্থাৎ কোনটা অতীত, কোনটা ভবিষ্যৎ তারও নাকি ঠিক-ঠিকানা নেই। এ তো মহা মুশকিলের ব্যাপার! তা যাই হোক, এই লক্ষ কোটি তারার মেলায় বিজ্ঞানীরা অনেক খুঁজলেন আমাদের মতো এক সৌরজগৎকে, অনেক আশা নিয়ে হাতড়ে বেড়ালেন আমাদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পৃথিবীর মতো আর-একটি গ্রহের সন্ধানে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হতাশ হতে হয়েছে আমাদের। মহাজাগতিক এই বিশালত্বের মধ্যে 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা' সত্যিই খুব একাকী, নিঃসঙ্গ। ভাবতেও অবাক লাগে, কী এমন উপাদানে তৈরি এই পৃথিবী, যা অন্য কোথাও নেই, কোন জাদুর বলে পৃথিবীর বুকে জীবন জন্ম নিল, যা অন্য সবখানে অনুপস্থিত। আবার ভাবতেও ভয় করে যে, দুর্বোধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের এই পৃথিবী তার জল, বাতাস, গাছপালা, পশু-পাখির বৈচিত্র্য নিয়ে এই নীরস ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে, আমরা সাধারণ মানুষেরাই তার ধ্বংস ডেকে আনব না তো?

গত কয়েকশো বছর ধরে আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর আবরণ অনেকখানিই ধ্বংস হয়েছে। সেইসঙ্গে ঘটেছে সারা দুনিয়া জুড়ে পরিবেশদূষণ। আমাদের ভাগ্য ভাল, বিজ্ঞানীরাই সঠিক সময়ে বিপদসঙ্কেত দিয়েছেন—ব্যস, এতদূর! আর নয়। অর্থাৎ, পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে বায়ুমণ্ডল ও গাছপালার আবরণ তাকে মহাজাগতিক রুক্ষতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই অরণ্য ও বায়ুমণ্ডলকে আর ধ্বংস হতে দিতে পারা যায় না। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ (৩৩%) ভূমির ওপর বৃক্ষের আচ্ছাদন থাকা উচিত। হিসেব করে দেখা গেছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলে, ভারতবর্ষে প্রতি বছরে গড়ে প্রায় ৪৭০ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। বর্তমানে এই অরণ্যের আচ্ছাদনের পরিমাণ মোট ভূখণ্ডের ২০ শতাংশও নয়। পরিবেশ ও অরণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়েও শুরু হয়েছে ব্যাপক চিন্তা ও আন্দোলন। পরিবেশবিদ ও বন-সংরক্ষকদের চোখে অরণ্য তাই আজ এক দুর্মূল্য সম্পত্তি, যে-সম্পত্তির ওপর নজর রাখতে হবে নিরন্তর।

কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব? বনজঙ্গল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে শত-শত বর্গ কিলোমিটার জুড়ে, তার চারদিকে আছে মানুষের বসতি। আর এই অরণ্যসম্পদ রক্ষা করার জন্য আছে গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে একজন করে বনরক্ষী। আবার ধরা যাক, সুন্দরবনের মতো জলেজঙ্গলে ঘেরা প্রায় আড়াই হাজার বর্গ কিলোমিটারের দুর্গম বন, যার জলে মানুষখেকো কুমির এবং ডাঙায় মানুখেকো বাঘ। অথবা ধরা যাক, হিমালয়ের কোলে নেওড়া নদীর উপত্যকায় প্রায় ৯০ বর্গ কিলোমিটারের দুর্ভেদ্য অরণ্য, যার অনেকখানিই এখনও অভিযাত্রীদের কাছেও দুর্গম। প্রথাগত পদ্ধতিতে এইসব অরণ্যভূমির মানচিত্র তৈরি করা রীতিমত সময় ও খরচের ব্যাপার, যার ফলে, বছরের পর বছর ধরে, এইসব অরণ্যসম্পদের পরিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞান বন-রক্ষকদের কাছে অনেকটাই থাকে অজানা। কী করে এই সমস্যার সমাধান করা যায় এবং আমাদের এই অমূল্য সম্পদের সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, এই নিয়ে বন-সংরক্ষকরা যখন পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, ঠিক তখনই বিজ্ঞান এগিয়ে এল কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সাহায্য করতে। সাত ও আটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাঁচটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছিল। যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রায় হাজার কিমি ওপর থেকে পৃথিবীর জল, মাটি, বাতাস ও অরণ্যকে নিরীক্ষণ করা এবং পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে-ঘুরতে প্রত্যেক ১৮ দিনে একই জায়গার ছবি তুলে যাওয়া। এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে বলা হল ল্যান্ডসাট এবং এই উপগ্রহের পাঠানো বৈদ্যুতিক ছবি বিশ্লেষণ করে শুরু হল ভূ-বিজ্ঞানের নানা অনুসন্ধান, যেমন কোথায় মাটির তলায় জল অথবা তেল থাকতে পারে, ভূপৃষ্ঠে যে বনভূমি আছে তার ঘনত্ব কত, কোথায় ভূমিক্ষয় ব্যাপকহারে হচ্ছে, ইত্যাদি। এর ফলে, প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্র তৈরির জগতে এল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রত্যেক ১৮ দিনে আমরা জানতে পারি, বনভূমির কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি না, অথচ সেটা জানবার জন্য আমাদের সেই বনভূমির প্রতিটি গহন প্রান্তে না গেলেও চলবে। এর পর আট ও নয়ের দশকে একে-একে উৎক্ষেপিত হল ফ্রেঞ্চ স্যাটেলাইট 'স্পট', ভারতের নিজস্ব স্যাটেলাইট সিরিজ 'আই আর এস' ইউরোপিয়ান রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট (ই আর এস) ইত্যাদি। এই ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট বলা হয়, তার কারণ, এরা ভূতল থেকে অনেক ওপরে ৯০০ কিলোমিটার দূর থেকে ভূপৃষ্ঠের ছবি তুলে, ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। ভারতের এই ধরনের চারটি কৃত্রিম উপগ্রহ আই আর এস-আই এ, আই বি, আই সি ও পি টু থেকে বৈদ্যুতিক ছবি নিয়মিত গ্রহণ ও রেকর্ডিং করার জন্য হায়দরাবাদের কাছে শাদননগরে একটা তথ্য গ্রহণকেন্দ্র আছে।

এবারে কৃত্রিম উপগ্রহের চোখে পৃথিবীটাকে একটু দেখা যাক। মাত্র এক কিলোমিটার ওপরে উড়ন্ত এরোপ্লেনে বসে ক্যামেরা দিয়ে নীচে তাকালে আমরা কী দেখি? ছোট-ছোট ঘরবাড়ি, দাবার ছকের মতো খেত-খামার আর ঝোপঝাড়ের মতো গাছপালা, আলাদা করে যাদের চেনাই যায় না। বাস-ট্রাকগুলিকে দেখা গেলেও পিঁপড়ের মতো মনে হবে। আর সেই জানলা দিয়ে, সাধারণ একটা ক্যামেরা দিয়ে যদি আমরা ছবি তুলি, তবে ছবি দেখে কি ঘরবাড়ি, গাছপালা, মানুষজনকে চেনা যাবে? অসম্ভব! তবে ৯০০ কিমি ওপর থেকে উপগ্রহ যে ছবি তুলছে সেটাই বা কতখানি বাস্তব হবে! এখানে ছবি তোলার ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বলা দরকার। প্রথমত উপগ্রহ যে ছবি তোলে সেটা সাধারণ ক্যামেরার মতো নয়। আমরা জানি, বেগুনি ও লালবর্ণের মধ্যে অবস্থিত তরঙ্গরশ্মিকে বলা হয় দৃশ্যমান আলোকরশ্মি। অর্থাৎ, কোনও বস্তু থেকে এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখের পরদায় পড়লেই, ছবি ফুটে ওঠে ও আমরা সেই বস্তুটিকে দেখতে পাই। কোন বর্ণের রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে ঢুকছে, তার ওপরই নির্ভর করে সেই বস্তুটির বর্ণ বা রং। এখন ধরা যাক, সূর্যের থেকে যে বিভিন্ন রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে বিভিন্ন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার মধ্যে যেমন

আলোকরশ্মি আছে, আবার অতিবেগুনি বা অবলোহিত রশ্মিও আছে। আমরা যখন খুব কাছ থেকে চোখ দিয়ে দেখি, তখন ছোট একটা পিঁপড়েকেও যেমন চেনা যায়, আবার লাল গোলাপের থেকে নীল অপরাজিতা ফুলকেও আলাদা করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সেই দেখার দূরত্বটা যদি হাজার কিমি দাঁড়ায় তা হলে কী হবে ? চোখে চালসে- পড়া লোকের কাছে যেমন চশমা ছাড়া বই পড়া সম্ভব নয়, তেমনই কৃত্রিম উপগ্রহের ক্যামেরার চোখেও প্রায় কয়েক হাজার বর্গ কিমি জমিকে একটা বিন্দুর মতো দেখায়। ল্যান্ডস্যাট উপগ্রহে প্রায় ৬৪০০ বর্গ মি. ভূমি একটা বিন্দুর মতো ছবিতে ধরা দিত এবং এরকম এক-একটি বিন্দুকে বলা হয় 'পিক্সেল' (আমাদের ক্যামেরার ছবির একটি পয়েন্ট-এর সমান)। ভারতীয় উপগ্রহ আই আর এস আই বি-তে এমনই একটা পিক্সেলের প্রকৃত আয়তন প্রায় ১৫০০ বর্গ মি, অর্থাৎ ছবিতে যদি পাশাপাশি চারটি পিক্সেল থাকে, তবে সেই জমির আয়তন ৬০০০ বর্গ মি.। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমেও ঘরবাড়ি, গাছপালা আলাদা করে চেনা সম্ভব নয়। যদি কোনও জমির ওপর ১৫০০ বর্গ মি বা তার চেয়ে বেশি আয়তনের কোনও অরণ্য বা জলাভূমি ইত্যাদি থাকে তবে তাকে এক বা ততোধিক পিক্সেল হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। এবার আমরা আসি দ্বিতীয় অসুবিধের কথায়। দৃশ্যমান আলোকরশ্মি যদি ভূপৃষ্ঠে কোনও বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়, প্রায় হাজার কিমি ওপরে উপগ্রহের ক্যামেরা পর্যন্ত পৌঁছতে হয়, তবে মাঝপথে সেই রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে এত ক্ষীণ হয়ে যাবে যে, তার থেকে কোনও স্বচ্ছ ছবি পাওয়া অসম্ভব। এর কারণ, বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এই বেগুনি বর্ণ থেকে লাল বর্ণের আলোকরশ্মিগুলি প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হতে-হতে তার তীব্রতা অনেক কমে যায়। ঠিক এই কারণে, উপগ্রহের ক্যামেরার ছবি তোলার জন্য দৃশ্যমান আলোকরশ্মির বদলে অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার করা হয়। এর প্রধান কারণ হল, এই অবলোহিত রশ্মিগুলি বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, হাজার কিমি দূর থেকে দৃশ্যমান আলোকরশ্মির সাহায্যে, পাইন গাছের সবুজ বর্ণ আলাদা করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, অবলোহিত রশ্মির ক্ষেত্রে, পাইন গাছ ও শাল গাছ থেকে প্রতিফলিত রশ্মির পার্থক্য করা অনেক সহজ। অর্থাৎ, অত উঁচু থেকে, বিভিন্ন গাছপালাকে পরিষ্কার করে দেখা না গেলেও, প্রতিফলিত তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে, সহজেই বিভিন্ন বস্তুপুঞ্জকে চিহ্নিত করা যায়। তবে, যেহেতু অবলোহিত রশ্মি মানুষের চোখে ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে না, তাই উপগ্রহের ক্যামেরায় সাধারণ ফোটো ফিল্মের বদলে একধরনের বিশেষ 'স্ক্যানার' থাকে, যার মাধ্যমে তরঙ্গরশ্মিগুলি বৈদ্যুতিক প্রবাহে রূপান্তরিত হয়। ওই বিদ্যুৎপ্রবাহের তীব্রতা অনুসারে, বিভিন্ন বস্তুর ছবি 'ডিজিটাল ডেটা' হিসেবে ক্যামেরার মধ্যে সৃষ্টি হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে অবলোহিত রশ্মি তো ক্যামেরার ফিল্মে বাস্তব অবস্থার ছবি তুলতে পারে না। তা হলে বিভিন্ন বস্তুকে চেনা যাবে কী করে ? কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যে ছবি তোলা হয়, তাও কৃত্রিম উপায়ে তৈরি। যেমন, কোনও এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় নানান উপায়ে, যেমন, তার চেহারার ছবি দিয়ে, অথবা আগে থেকেই যদি জানা থাকে, গলার স্বর শুনে, বা, তার সই দেখে। কোনও ব্যক্তি যদি সবসময়ই একরকম সই করেন, এবং তাঁর সই যদি অন্য কারও চেনা থাকে, তবে, সেই ব্যক্তির সই-করা চিঠি দেখলেই বোঝা যায় কে চিঠিটা লিখেছেন, তাঁর নাম না লিখলেও বা ছবি না থাকলেও চলে। ঠিক তেমনই অবলোহিত রশ্মি বিভিন্ন বস্তু থেকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলিত হয়। যেমন, নদী-নালার জল থেকে খুব সামান্যই প্রতিফলিত হবে, কিন্তু সবুজ (ক্লোরোফিল যুক্ত) গাছপালা থেকে অতিমাত্রায় প্রতিফলিত হবে। আবার বিভিন্ন বর্ণের গাছপালা থেকে প্রতিফলনের তীব্রতাও বিভিন্ন হবে। ফলে প্রতিফলিত রশ্মির তীব্রতা সম্বন্ধে যদি আগে থেকেই একটা সম্যক ধারণা থাকে, তবে বিভিন্ন বস্তু থেকে প্রতিফলিত রশ্মির তীব্রতা মেপে সেই বস্তুটিকে চিহ্নিত করা যায়। কোনও একটি বিশেষ বস্তুর, অবলোহিত রশ্মিকে প্রতিফলিত করার সুনির্দিষ্ট মাত্রাকে বলা হয় ওই বস্তুর 'সিগনেচার ক্যারেকটারিস্টিক'। কৃত্রিম উপগ্রহ যখন পৃথিবীর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তখন তার বিশেষ ক্যামেরা পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তুপুঞ্জ থেকে প্রতিফলিত অবলোহিত রশ্মিকে মাপতে ('স্ক্যানিং') থাকে। যদি দেখা যায়, কোনও অঞ্চল থেকে অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত অবলোহিত রশ্মি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, তবে ধারণা করতে হবে, ওই অঞ্চলে গাছপালার আধিক্য রয়েছে। আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে, জঙ্গলের ঘনত্ব, কী ধরনের গাছপালা আছে, এ-সবই বলা যায়। উপগ্রহ থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গের মাধ্যমে এই তথ্য সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হয় পৃথিবীপৃষ্ঠে তথ্য গ্রহণকেন্দ্রে, সেখানে 'কম্পিউটার ডিস্ক'-এ সেই তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

ভারতের দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ

আই আর এস-আই বি, আই সি এমনভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, যাতে যে কোনও একটি উপগ্রহ প্রতি ২২ দিনে পৃথিবীপৃষ্ঠের একটি বিশেষ অংশের ছবি তুলছে, অথচ দুটি উপগ্রহ মিলিয়ে প্রতি ১১ দিনে একটি বিশেষ অঞ্চলের ছবি পাওয়া যাচ্ছে। উপগ্রহগুলি এমনভাবে প্রদক্ষিণ করছে যে, কোনও বিশেষ অঞ্চলের ছবি প্রতিবারই প্রায় একই সময়ে (সকাল দশটা থেকে সকাল এগারোটার মধ্যে) উঠছে। এর কারণ, সকালের দিকে সাধারণত মেঘ কম থাকে ও পরিষ্কার ছবি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তা ছাড়াও, প্রতিবারই একই সময়ে (সূর্যের বিশেষ অবস্থায়) ছবি তুললে বিভিন্ন সময়ের ছবি তুলনা করতে সুবিধে হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ভারতের অরণ্যসম্পদের মানচিত্র তৈরির প্রথম সুসংহত প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে। এর পর প্রতি দু'বছর অন্তর এ-ধরনের মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ১৯৮৭ ও ১৯৮৯-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৪৭০০০ হেক্টর বনভূমি থেকে বৃক্ষের আচ্ছাদন ধ্বংস হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি তোলার ক্ষমতাও দ্রুতগতিতে বাড়ছে, আধুনিক উপগ্রহগুলির ছবির 'রোজোলিউশন' আরও ভাল। অর্থাৎ, একটি পিক্সেলের আয়তন কমে ১০০ বর্গ মি-এ দাঁড়িয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ ঝড়-জল, দুর্গম অঞ্চল, কোনও কিছুকেই বাধা বলে মনে করে না। এর মাধ্যমে পৃথিবীপৃষ্ঠের ছবি নিরন্তর তোলা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই দুর্লভ পৃথিবীর, ততোধিক দুর্মূল্য অরণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের কাজে কৃত্রিম উপগ্রহের তোলা মানচিত্র এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

সম্পূর্ণ উপন্যাস
কাকাবাবুর প্রথম অভিযান
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সন্তুর ঘরখানা তার নিজস্ব পৃথিবী। তিনতলার ছাদে ওই একখানাই ঘর, ছাদে বিশেষ কেউ আসে না। ঘরের মধ্যে সন্তু লম্ফঝম্ফ করে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে, কিংবা একলা-একলা তলোয়ার খেলে, কেউ দেখবার নেই। সন্তু যখন আরও ছোট ছিল, কালি দিয়ে মুখে গোঁফ-দাড়ি এঁকে কিংবা নিজেই একটা মুখোশ বানিয়ে কখনও ফ্যান্টম বা ম্যানড্রেক সাজত, কখনও সুপারম্যান, আবার কখনও তীর-ধনুক হাতে অর্জুন। খাটের মাথার দিকটায় উঠে সে ঘোড়া চালাত খুব জোরে, আর মাঝে-মাঝে চেঁচিয়ে উঠত, "হো নীল ঘোড়াকা সওয়ার। হো নীল ঘোড়াকা সওয়ার!"

সন্তু নিজের একটা নাম দিয়েছিল, সেটা খুব গোপন, আর কেউ জানে না। ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গো। সে বাঙালি নয়, এ-পৃথিবীরই কেউ নয়, দূর মহাকাশ থেকে মাঝে-মাঝে পৃথিবীতে বেড়াতে আসে। ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গোর মুখের ভাষাও তৈরি করেছিল সন্তু। 'বিলিবিলি খাণ্ডা গুলু? বুমচাক, বুমচাক ডবাংডুলু! উসুখুসু সাকিনা খিনা? কামুলু টামুলু জামুলু। ফিংকা চিংমিনিঝিনি মাজনু জানুনু লাকুনু।' পিঠে একটা সাদা চাদর বেঁধে ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গো আকাশে উড়ে বেড়ায়, চন্দ্র-সূর্য, এমনকী মেঘের সঙ্গেও সে কথা

ছবি : অনুপ রায়

বলে। ওই ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গোর ভাষা সন্তু একটা খাতাতেও লিখে রেখেছিল, তখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ে। এখন সেই লেখাটা দেখলে তার হাসি পায়।

এখন আর সন্তু ওরকম কিছু সেজে খেলা করে না বটে, কিন্তু একলা ঘরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে কবিতা আবৃত্তি করে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময়েই সে মেঘনাদবধ কাব্য পুরো মুখস্থ করে ফেলেছিল, অনেক শব্দেরই মানে বুঝত না, তাতে কিছু আসে যায় না। এখন তার একটা নতুন শখ হয়েছে, সে নাচ শিখছে। কারও কাছে শিখতে যায় না, ঘরের দরজা বন্ধ করে ক্যাসেট প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা ইংরিজি গান চালিয়ে সে নিজে-নিজে নাচে। তার এই নাচের কথা আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না।

ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা বড় বোর্ড। তাতে সন্তু তার প্রিয় সব খেলোয়াড়, গায়ক, লেখকদের ছবি পিন দিয়ে আটকে রাখে। ছবিগুলো মাঝে-মাঝেই বদলে যায়। একটা সাদা কাগজে প্রতি সপ্তাহে সে এক-একটা বাণী লিখে রাখে। বাণীটা তার নিজের জন্য, নিজেরই বানানো। গত সপ্তাহে লেখা ছিল, 'কফি গরম, আইসক্রিম ঠাণ্ডা, দুটোই একসঙ্গে খাওয়া যায়। খুব রাগ হলেও হো-হো করে হাসি প্র্যাকটিস করো।' এ সপ্তাহে তার বদলে লেখা আছে, 'খিদে পেলে গান গাও, প্রাণ খুলে গান গাও, খুব যদি গান পায়, খুব কষে ঝাল খাও, ঝাল চানাচুর খাও।'

সন্তুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র জোজো এই তিনতলার ঘরে আসে। পরশুই এসেছিল। সে সন্তুর ওই বাণীর তলায় লিখে রেখেছে, 'খুব যদি ঝাল লাগে, নদীতে সাঁতার দাও!'

সন্তু অনেক রাত জেগে বই পড়ে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, সমস্ত পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তখন বই পড়তে বেশি ভাল লাগে। পড়ার বই, গল্পের বই। ভূতের গল্প পড়তে একটু গা-ছমছম করে বটে, কিন্তু সন্তু জোজোর মতন ভূতে বিশ্বাস করে না। জোজো কখনও একলা ঘরে শুতে পারে না। জোজোদের বাড়ির ঠিক পেছনেই খানিকটা ফাঁকা জমি আর একটা ভাঙা বাড়ি আছে। জোজোর ধারণা, তিনটে ভূত থাকে ওই বাড়িতে। কোনওদিন নিজের চোখে দেখেনি, তবু কী করে জানল যে, ঠিক তিনটে ভূত, তা কে জানে। জোজোর বাবা অবশ্য এমন জোরালো মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন যে, ভূতে কোনওদিন জোজোর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

বই পড়তে-পড়তে রাত দুটো-আড়াইটে বেজে গেলেও কিন্তু বেশি বেলা করে ঘুমোবার উপায় নেই সন্তুর। ছাদে অনেক ফুলের টব আছে। প্রত্যেক দিন ঠিক পৌনে ছ'টায় মা সেই ফুলগাছগুলোতে জল দিতে আসেন। আগে ডেকে তোলেন সন্তুকে। ঘরের দরজা ভেজানো থাকে, মা ঘরের মধ্যে এসে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বই, গেঞ্জি, রুমাল, কলম সব গুছিয়ে রাখেন। তারপর সন্তুর শিয়রের কাছে এসে তার গালটা বেশ জোরে টিপে ধরে বলেন, "ঘুমপরি এবার বাড়ি যাও, আমার খোকাটি এবার ছোলা গুড় খাবে। অ্যাই সন্তু, ওঠ!"

সত্যি-সত্যি সন্তুকে রোজ সকালে ভেজানো ছোলা আর আখের গুড় খেতে হয়। তার ভাল লাগে না অবশ্য। তবু এটাই তাদের বাড়ির নিয়ম। সবাই খায়। কাকাবাবু মাঝে-মাঝে আপত্তি করে বলেন, "বউদি, এসব তো উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভাল, আমাকে জোর করে খাওয়াচ্ছ কেন?" মা শুনবেন না, খেতেই হবে।

তার আগে, চোখ-মুখ না ধুয়েই সন্তু মাকে গাছে জল দেওয়ায় সাহায্য করে। ট্যাঙ্ক থেকে জল এনে দেয়, কোনও-কোনও গাছের গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে দিতে হয়। এক-একদিন সে মাকে বলে, "মা, তুমি রোজ-রোজ কষ্ট করে ওপরে আসো কেন? আমিই তো সব গাছে জল দিয়ে দিতে পারি!"

মা হেসে বলেন, "আমি না এলে তোর আরও অনেকক্ষণ নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার খুব সুবিধে হয়, তাই না?"

তারপর একটা গাছে আদর করে হাত বুলোতে-বুলোতে আবার বলেন, "সারাদিনে তো একবারই ছাদে আসি। যে গাছগুলো লাগিয়েছি, তা একবারও দেখব না? ফুল তো দেখবার জন্যই। জানিস সন্তু, গাছকে আদর করলে গাছ ঠিক বোঝে। তাতে তাড়াতাড়ি ফুল ফোটে।"

তিনতলায় বাথরুম নেই, সকালবেলা সন্তু মায়ের সঙ্গেই নীচে নেমে যায়।

ছুটির দিনগুলোতে প্রায় সারাদিনই সন্তু নিজের ঘরে কাটায়। রান্নাঘর, খাবার জায়গা একতলায়, খিদে-তেষ্টা পেলে সেখানে যেতে হয় সন্তুকে। ছেলেবেলা থেকে তাকে শেখানো হয়েছে, বাড়ির কাজের লোককে এক গেলাস জলও এনে দিতে বলা চলবে না। নিজেরটা নিজেকে করে নিতে হবে। দরকার হলে সন্তু ডিম সেদ্ধ করতে পারে, কফি বানাতে পারে।

দোতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরটা কাকাবাবুর। ভেতরের দিকে দিদির ঘরটা এখন খালি পড়ে থাকে, অন্যটা মা-বাবার। বাবা অবশ্য বেশিরভাগ সময়ই নীচের বৈঠকখানা ঘরে কাটান। তার পাশে একটা লাইব্রেরি ঘরও আছে।

কাকাবাবুর সঙ্গে বাবার স্বভাবের কত তফাত। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও পাহাড়ে-জঙ্গলে কত অ্যাডভেঞ্চারে যান, আর বাবা বাড়ি থেকে বেরোতেই চান না। একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন, হোটেল বুক করা ছিল সাতদিনের, দু'দিন থেকেই শীতের ভয়ে পালিয়ে এলেন। মায়ের তাড়নায় বাবাকে বাধ্য হয়ে কয়েকবার বেড়াতে যেতে হয়েছে বটে, প্রত্যেকবার ফিরে এসে বলেছেন, "উঃ কী ঝকমারি! কুলির মাথায় জিনিস চাপাও, ঠিক সময় ট্রেনে ওঠো, ঠিক-ঠিক স্টেশনে নামো, আবার কুলি, গাড়ি নিয়ে দরাদরি, হোটেলে গিয়ে দেখবে বাথরুমে জল নেই...। কী দরকার বাপু এতসব ঝামেলা করার। বই পড়লেই তো সব জানা যায়।"

বাবা ভ্রমণকাহিনী পড়তে খুব ভালবাসেন। বিছানায় শুয়ে সেইসব বই পড়তে-পড়তে তিনি মনে-মনে সাহারা মরুভূমি, আফ্রিকার জঙ্গল, হিমালয় পাহাড় কিংবা আলাস্কা ঘুরে আসেন। কাকাবাবু ভ্রমণকাহিনী পড়েন না, তিনি সময় পেলেই সামনে মেলে ধরেন নানা দেশের ম্যাপ। হিসেব করেন, কোথায়-কোথায় তাঁর এখনও যাওয়া হয়নি। এ-পৃথিবীর প্রায় অনেকখানিই তাঁর দেখা।

আজ একটা ছুটির দিন। সকালবেলা জলখাবারের টেবিলে কাকাবাবুর সঙ্গে সন্তুর দেখা হয়েছিল। মাঝে-মাঝে কাকাবাবু দুপুরের খাওয়াটা বাদ দেন, আজ শুধু একবাটি সুপ খেয়েছেন নিজের ঘরে বসে। সকালবেলা সন্তু দেখেছিল, কাকাবাবুর গালে খরখরে দাড়ি। তাতে সে বেশ অবাক হয়েছিল। প্রতিদিন কাকাবাবু মর্নিংওয়াকে যান, তারপর আর বাড়ি থেকে না বেরোলেও তিনি দাড়ি কামিয়ে রোজ ফিটফাট থাকেন।

সন্তুর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পেরে কাকাবাবু নিজের গালে হাত বুলোতে-বুলোতে বলেছিলেন, "দাড়ি কামাবার সাবান ফুরিয়ে গেছে—"

বাবা বললেন, "তুই আমারটা নিলেই পারিস।"

কাকাবাবু বললেন, "না, তোমার ওই সাবানে আমার চলবে না। আমার ফোম সাবান ব্যবহার করা অভ্যেস হয়ে গেছে। সন্তু, তুই যখন বাড়ি থেকে বেরোবি, আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাস, একটা ওই সাবান কিনে আনিস।"

সারাদিন সন্তু পড়াশুনো করেছে, খানিকটা নেচেছে, খানিকটা ঘুমিয়েছে, ঘর থেকে আর বেরোয়নি। কাকাবাবুর কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। বিকেলবেলা তার ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলতে যাওয়ার কথা, সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে মনে পড়ে গেল। সারাদিন

কাকাবাবুর দাড়ি কামানো হয়নি !

কাকাবাবুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তোমার ফোম সাবান কিনে আনব, টাকাটা দাও।"

কাকাবাবুর লেখাপড়ার টেবিলটা জানলার পাশে। রিভলভিং চেয়ারে বসে কাকাবাবু জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। মুখটা ফেরালেন। কাকাবাবুর মুখের মধ্যে ওটা কী ?

সন্তু ভাল করে দেখল, কাকাবাবুর মুখে একটা থার্মোমিটার।

এই অবস্থায় কোনও কথা বলা যায় না। কাকাবাবু নিঃশব্দে ড্রয়ার খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলেন সন্তুর দিকে।

টাকাটা নিয়েও সন্তু নড়ল না।

কাকাবাবুর টেবিলের ওপর বেশ বড় একটা গ্লোব। একদিকের দেওয়ালজোড়া এভারেস্ট-এর চূড়ার ছবি। আর একদিকের দেওয়ালে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ। এই ম্যাপ কাকাবাবু প্রায়ই বদলান। কাকাবাবু কি এবার অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ? সন্তুর বেশ আনন্দ হল। তা হলে এবার অস্ট্রেলিয়া দেখা হয়ে যাবে।

মুখ থেকে থার্মোমিটারটা বার করে নিয়ে কাকাবাবু দেখতে লাগলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কত ?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু না। দেখছিলাম এই ঘরের টেম্পারেচারের সঙ্গে আমার শরীরের টেম্পারেচারের কোনও তফাত হয় কি না !"

কথাটা সন্তুর বিশ্বাস হল না।

কাকাবাবুর চোখ দুটো লালচে দেখাচ্ছে। চুল উসকোখুসকো। দেখলেই মনে হয়, বেশ জ্বর হয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, "সর্দারি করে দাদা-বউদিকে কিছু বলতে হবে না। আমার কিচ্ছু হয়নি। তুই খেলতে যা।"

সন্তু কাকাবাবুকে কখনও অসুখে ভুগতে দেখেনি। কাকাবাবুর শুধু একটা পা জখম, কিন্তু স্বাস্থ্য দারুণ ভাল। একবার শুধু তাঁর শত্রুরা তাঁকে গুলি করেছিল, সেটাও আবার বাঘকে ঘুম পাড়াবার গুলি। সেবার কাকাবাবু বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। তখনও অনেকে বলেছিল, "ওই গুলিতে মানুষের বাঁচা প্রায় অসম্ভব, কাকাবাবু সেরে উঠেছিলেন বেশ তাড়াতাড়ি।"

নীচে নেমেই সন্তু মাকে বলল, "মা, কাকাবাবুর খুব জ্বর হয়েছে। তোমাদের বলতে বারণ করলেন।"

বাবাও খুব অবাক। জলের মাছের সর্দি হওয়ার মতনই যেন কাকাবাবুর জ্বর হওয়াটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

মা আর বাবা দু'জনেই ওপরে উঠে এলেন সঙ্গে-সঙ্গে।

মা কাকাবাবুর কপালে হাত দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বেশ জ্বর। একশো তিন-চার হবে বোধ হয়।"

বাবা বললেন, "কবে থেকে জ্বর হচ্ছে ? রাজা, তুই আমাদের কাছে কিছু বলিস না কেন ? ডাক্তার দেখাতে হবে না ?"

সন্তু লুকিয়ে রইল দরজার আড়ালে।

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা আবার ব্যস্ত হলে কেন, এমন কিছু হয়নি।"

মা বললেন, "ইস, কিছু হয়নি ? জ্বরে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে। তুমি শুয়ে পড়ো, তোমার মাথা ধুইয়ে দেব।"

বাবা বললেন, "তা হলে তো ডাক্তারকে খবর দিতে হয়। চতুর্দিকে ম্যালেরিয়া হচ্ছে।"

কাকাবাবু আর্তস্বরে বলে উঠলেন, "না না, ডাক্তার ডাকতে হবে না। জ্বর হয়েছে, এমনই সেরে যাবে। ডাক্তার এলেই একগাদা ওষুধ দেবে, পটপট ইঞ্জেকশান ফুঁড়ে দেবে !"

সন্তু মুচকি হাসল। কাকাবাবু রিভলভারের সামনে বুক পেতে

RANGOLI

যে রূপকথা ফুরোয় না

চমন

সবুজের
চিরনবীন রূপটান।
বাছা বাছা তেতাল্লিশটি শেডের
মাত্র একটি।
ফিকে গাঢ় হরেক রকম।

অভিজাত ম্যাট অ্যাক্রিলিক ইমালশন। স্থায়ী আবেদন। শাশ্বত প্রেরণা।

Shape/B/R-5

দিতে ভয় পান না, কিন্তু ইঞ্জেকশান নিতে বড় ভয়। আফ্রিকা যাওয়ার সময় ইয়োলো ফিভারের ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল, তখন তিনি আড়ষ্ট মুখে চোখ বুজে ছিলেন।

টেলিফোনটা তুলতে-তুলতে বাবা বললেন, "রাজা, তুই কি মনে করিস, তুই ভীম না হারকিউলিস? সব মানুষেরই মাঝে-মাঝে অসুখ-বিসুখ করে, ডাক্তার দেখাতেও হয়। না হলে ডাক্তারদেরই বা চলবে কী করে?"

কাকাবাবু গজগজ করতে-করতে বললেন, "এবার আমার অসুখের কথা চারদিকে ছড়াবে, আর দলে-দলে আত্মীয়-বন্ধুরা দেখতে আসবে। বাঙালিদের এই এক স্বভাব, অসুস্থ লোকের ঘরে ভিড় করে বসে থাকবে আর চেনাশুনো মানুষরা কে কোন অসুখে মরে গেছে, সেই গল্প করবে। আর চা-মিষ্টি খাবে!"

ডাক্তার রথীন বসু কাকাবাবুরই বন্ধু। তিনি ঘরে ঢুকতে-ঢুকতেই বললেন, "বা বা বা, রাজার অসুখ হয়েছে। খুব খুশি হয়েছি। এমনকী ডাক্তারদেরও কখনও সখনও অসুখ হয়, আর রাজা রায়চৌধুরীর কোনওদিন অসুখ হবে না, এতে আমাদের হিংসে হয় না? আমরা বিছানায় পড়ে থাকি আর ও জঙ্গলে-পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়ায়। এবার রাজা, তোকে অন্তত সাতদিন শুইয়ে রাখব, আর রোজ দু'বেলা ইঞ্জেকশান!"

কাকাবাবু বললেন, "ইঞ্জেকশান না দিলে রোগ সারে না? তুই কি ঘোড়ার ডাক্তার? ইঞ্জেকশান দেওয়ার চেষ্টা করে দেখ না, ঘুসিতে তোর নাক ফাটিয়ে দেব!"

দু'জন বয়স্ক লোক বাচ্চাদের মতন খুনসুটি করতে লাগলেন।

কাকাবাবুকে সত্যিই কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হল। শরীর বেশ দুর্বল। রক্ত পরীক্ষায় জানা গেছে, ম্যালেরিয়া নয়, তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছে।

বাবা বললেন, "অনেকদিন এ-রোগটার নামই শুনিনি। তুই এ-রোগ কী করে বাধালি রাজা?"

কাকাবাবু অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, "কিছু না, বুকে একটু ঠাণ্ডা বসে গেছে, তাই রথীন বলে দিল নিউমোনিয়া। ওরা বড়-বড় নাম দিতে ভালবাসে। ওষুধগুলোর নাম দেখো না, কীরকম শক্ত-শক্ত।"

কয়েকদিন আগে কাকাবাবু ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন পড়াশুনো করতে। ফেরার পথে দারুণ বৃষ্টি নেমেছিল। কাকাবাবু বৃষ্টি গ্রাহ্য করেন না, ট্যাক্সি পাননি, ইচ্ছে করেই বাসে না উঠে ময়দান দিয়ে হেঁটে এসেছেন চৌরঙ্গি পর্যন্ত। তারপর সেই ভিজে জামা পরেই গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র ভার্মার সঙ্গে দেখা করতে। বুকে ঠাণ্ডা বসে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

অনেক ওষুধ খেতে হচ্ছে। কাকাবাবুর ধারণা, ওষুধগুলোর জন্যই তাঁর শরীর বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

অসুখের কথা কী করে রটে যায় কে জানে! সত্যিই, দলে-দলে লোক কাকাবাবুকে দেখতে আসতে লাগল সকালে-বিকেলে। নরেন্দ্র ভার্মা খুব হতাশ। তিনি দিল্লি থেকে এসেছিলেন একটা রহস্য সন্ধানের ব্যাপারে কাকাবাবুকে নাগাল্যান্ডে নিয়ে যেতে। দেখতে এসে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীর অসুখ, এ যেন আগুনের পেট গরম! তুমি নাগাল্যান্ডে যেতে চাও না, সেইজন্য অসুখের ভান করোনি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আমার বদলে সন্তুকে নিয়ে যাও!"

ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা পড়ার পর নরেন্দ্র ভার্মা সস্নেহে সন্তুর দিকে তাকালেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "হ্যাঁ, সন্তু এখন প্রায় হিরো হয়ে উঠেছে বটে। দু'দিন বাদে তোমাকে-আমাকে টেক্কা দেবে! কিন্তু তোমার অসুখের সময় সন্তুকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমাকে আজই রওনা দিতে হবে।"

আজ সকালে চার-পাঁচজন দেখা করতে এসেছে। কেউ মাসতুতো ভাই, কেউ পিসতুতো দাদা। একজন মহিলা মায়ের সঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন। বহুদিন এঁদের দেখা যায়নি। কাকাবাবুর কথা মিলে গেছে, মা এঁদের চা ও মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। তাই খেতে-খেতে এঁরা অন্যদের অসুখের গল্প করছেন।

মাঝখানের চেয়ারে গম্ভীরভাবে বসে আছেন একজন হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ। কাকাবাবুই বয়েসী হবেন, মুখে মোটা গোঁফ আর চাপদাড়ি, বেশ দামি সুট পরা।

তিনি সকলের কথা শুনছেন, নিজে কিছু বলছেন না। আর সবাই একে-একে চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন, "আমিও এবার উঠব রাজা, শরীরের অযত্ন কোরো না। কিছুদিন বিশ্রাম নাও।"

এরকম উপদেশ শুনতে-শুনতে কাকাবাবুর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি আবার বললেন, "শুধু ওষুধ খেলে অসুখ সারে না। এই রোগের আসল চিকিৎসা হল শুয়ে থাকা। অন্তত সাতদিন শুয়ে থাকতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ!"

লোকটি উঠে দাঁড়ালেন। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। এ-ঘরে ঢোকার সময় সবাই বাইরে জুতো খুলে আসে, এঁর পায়ে চকচকে কালো জুতো। বাঁ হাতটা আগাগোড়া কোটের পকেটেই ছিল, একবার বার করতেই সন্তু লক্ষ করল, সেই হাতটায় পাতলা রবারের দস্তানা পরা।

তিনি বললেন, "তা হলে আমি চলি? কোনও দরকার-টরকার হলে আমাকে খবর দিয়ো। আমি সপ্তাহখানেক পরে আবার আসব।"

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতেই কাকাবাবু চোখের ইঙ্গিতে মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কে?"

মা বললেন, "জানি না তো। জন্মে দেখিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী! আমিও তো চিনি না। আমি ভাবলাম, তোমাদের কোনও আত্মীয়-টাত্মিয় হবে বুঝি।"

মা বললেন, "আমিও তো ভেবেছি, তোমার কোনও বন্ধু!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার বন্ধুর চেয়ে শত্রু বেশি। তুমি-তুমি বলে কথা বলল, যেন কতদিনের চেনা। অথচ আমি একেবারেই চিনতে পারলাম না? মুখভর্তি অবশ্য দাড়ি-গোঁফ।"

চোখ বুজে কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন।

তারপর বললেন, "উহুঃ, মনে পড়ছে না। সন্তু এক কাজ কর তো। দেখে আয় তো লোকটা কোথায় যায়। সঙ্গে আর কেউ আছে কি না!"

সন্তু দৌড়ে নীচে নেমে গেল।

ভদ্রলোকটি ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি নেই। তিনি হাঁটতে লাগলেন বড় রাস্তার দিকে। সন্তু তাঁর পিছু নিল।

সন্তু ইচ্ছে করলে ছুটে গিয়ে ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াতে পারে। তারপর সে কী করবে? 'আপনার নাম কী, কোথা থেকে এসেছেন, কাকাবাবুকে আপনি কী করে চিনলেন', এসব কথা কি ওরকম একজন রাশভারী চেহারার লোককে জিজ্ঞেস করা যায়?

লোকটির দুটি হাতই এখন পকেটের বাইরে। বাঁ হাতের পাতলা দস্তানাটা সন্তুর আবার নজরে পড়ল। একজন লোক শুধু একহাতে দস্তানা পরে থাকে কেন?

সন্তু আর-একটু কাছে যেতেই ভদ্রলোক পেছন ফিরে তাকালেন এবং বাঁ হাতটা চট করে পকেটে ভরে ফেললেন।

সন্তু যেন কোনও জিনিস কিনতে বেরিয়েছে, এইরকম ভাব করে একটুখানি হাসল। ভদ্রলোক হাসলেনও না, কোনও কথাও বললেন না।

এই সময় একটা কালো রঙের গাড়ি এসে থামল লোকটির কাছে। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। ড্রাইভারটির মাথায় একটা খাকি রঙের টুপি।

ভদ্রলোক পেছনের দরজা খুলে উঠে পড়লেন গাড়িতে। তারপর সেটা চলতে শুরু করতেই জানলা দিয়ে কেমন যেন কটমট করে তাকালেন সন্তুর দিকে।

॥ ২ ॥

আগে সন্তু প্রতি বছর গরমকালে সকালবেলায় সাঁতার কাটতে যেত। সাঁতারের প্রতিযোগিতায় দু'বার পুরস্কারও পেয়েছে। এখন পড়াশুনোর চাপে আর সাঁতার কাটতে যাওয়া হয় না। সাঁতার ক্লাবের ছেলেরা তাকে মাঝে-মাঝে ডাকতে আসে।

আজ বালিগঞ্জ লেকে সন্তুদের সেই ক্লাবে একটা কবিতা পাঠের আসর হবে। নামকরা কবিরা এসে কবিতা পড়বেন। সন্তু সেই অনুষ্ঠানটা শুনতে যাবে ঠিক করে রেখেছিল, যাওয়ার আগে ভাবল, জোজোকেও নিয়ে গেলে হয়।

জোজো একেবারেই সাঁতার জানে না। জলে নামতেই ভয় পায়। মুখে অবশ্য তা স্বীকার করবে না। সাঁতারের কথা উঠলেই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, "আরে আমি বসফরাস প্রণালী আর কাস্পিয়ান হ্রদে সাঁতার কেটে এসেছি। তোদের এখানকার এইসব ছোটখাটো সুইমিং পুলে কী নামব! আমার ঘেন্না করে!"

জোজো খেলাধুলোও কিছু করে না, শুধু বই পড়ে। কবিতা পড়তেও ভালবাসে।

সন্তু ওর বাড়িতে গিয়ে ডাকতেই জোজো নেমে এল। ওর ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা, একটু-একটু খোঁড়াচ্ছে।

কলেজে এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, তাই জোজোর সঙ্গে চার-পাঁচদিন দেখা হয়নি। সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তোর পায়ে কী হল রে?"

জোজো অবহেলার সঙ্গে বলল, "এমন কিছু না। হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে একটা পা একটু মচকে গেছে।"

সন্তু বলল, "হেলিকপ্টার থেকে আবার কোথায় লাফালি?"

জোজো বলল, "বাঃ, এর মধ্যে আমাকে লাদাখ ঘুরে আসতে হল জানিস না? খুব জরুরি কাজে যেতেই হল।"

সন্তু বলল, "লাদাখ? কাগজে দেখলাম সেখানে এখনও বরফ পড়ছে, সেখানে আবার তোর কী জরুরি কাজ?"

জোজো বলল, "বাবার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার অরিজিৎ সিং ওখানে পোস্টেড, হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বুকে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা। কোনও ডাক্তারই কিছু করতে পারেনি। তখন অরিজিৎ সিং বাবাকে ফোন করে কাতরভাবে বললেন, 'বন্ধু, তোমার কবিরাজি ওষুধ পাঠিয়ে আমাকে বাঁচাও।' বাবা তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তোকে একটা গোপন কথা বলে দিচ্ছি সন্তু, কাউকে জানাবি না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন ভোটে জেতার জন্য বাবার কাছে একটা মাদুলি চেয়েছেন, বাবা সেইটা তৈরি করছিলেন। তাই বাবা বললেন, 'জোজো, তুই ওষুধটা পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবি?' একটা লোককে বাঁচাবার জন্য আমাকে যেতেই হল। প্লেনে দিল্লি হয়ে শ্রীনগর, সেখানে আর্মির হেলিকপ্টার আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।"

"তুই হেলিকপ্টার থেকে লাফাতে গেলি কেন?"

"আহা বুঝলি না, জীবন-মরণ সমস্যা। আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে অরিজিৎ সিংকে বাঁচানো যেত না। ওখানে তখন খুব বরফ পড়ছে, হেলিকপ্টারটা ল্যান্ড করতে পারছে না। তিরিশ ফুট ওপরে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, বরফের জন্য কিছু দেখাই যাচ্ছে না, আমি তখন 'জয় মা দুর্গা' বলে জাম্প দিলাম। তোকে কী বলব সন্তু, ওষুধটায় ঠিক ম্যাজিকের মতন কাজ হল। একটা ট্যাবলেট খেয়েই অরিজিৎ সিং বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নীচে নেমে এল, গোরিলার মতন নিজের বুক চাপড়ে বলতে লাগল, 'সব ঠিক হো গিয়া, বিলকুল ঠিক হো গিয়া!'"

গল্পটা হজম করে নিয়ে সন্তু বলল, "বাঃ, ভাল কাজ করেছিস। কিন্তু একটা মুশকিল হল, তুই তো হাঁটতে পারবি না। ভেবেছিলাম তোকে আমাদের সাঁতারের ক্লাবে কবিতা পাঠ শোনাতে নিয়ে যাব।"

জোজো চোখদুটো গোল-গোল করে বলল, "সাঁতারের ক্লাবে কবিতা পাঠ? এরকম অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি!"

সন্তু বলল, "কেন, যারা সাঁতার কাটে, তারা বুঝি কবিতা পড়তে বা কবিতা শুনতে পারে না? যারা ক্রিকেট খেলে, তারা কি গান শোনে না? যারা গান গায় কিংবা কবিতা লেখে, তারা কি খেলা দেখে না?"

জোজো বলল, "বাংলায় একটা কথা আছে, 'যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না?'"

সন্তু বলল, "আমার মা রান্না করেন, চুলও বাঁধেন। চুল বাঁধতে-বাঁধতে গান করেন, আর রাঁধতে-রাঁধতে উপন্যাস পড়েন।"

"তা হলে সত্যিই তোদের ক্লাবে কবিতা পড়া হচ্ছে? আমি ভেবেছিলাম, তুই গুল মারছিস!"

"ভাই জোজো, গুল মারার কায়দাটাই আমি জানি না। ওটা পুরোপুরি তোর ডিপার্টমেন্ট।"

"হাঁটতে আমার অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু সাইকেল চালাতে পারি। চল, যাই তা হলে!"

সন্তুও সাইকেল নিয়ে এসেছে। দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল।

খানিকদূর যাওয়ার পরেই জোজো বলল, "এই যাঃ, মানিব্যাগটা ফেলে এলাম যে। কী হবে?"

সন্তু বলল, "তাতে কী হয়েছে? টাকা-পয়সার তো দরকার নেই, ওখানে টিকিট কাটতে হবে না।"

জোজো বলল, "সেজন্য নয়। একটা করে চিকেন কাটলেট খেয়ে নেওয়া যেত। বিকেলবেলা কিছু খাইনি। খালি পেটে কি কবিতা শোনা যায়?"

সন্তু বলল, "তাই বল, তোর কাটলেট খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। ঠিক আছে, আমার কাছে টাকা আছে।"

জোজো বলল, "আমি কিন্তু খাওয়াব। টাকাটা তোর কাছে ধার রইল।"

লেক মার্কেটের কাছে একটা দোকানের চপ-কাটলেট খুব বিখ্যাত। দোকানটায় বেশ ভিড়। ভেতরে বসে খাওয়ার জায়গা নেই। দু'খানা কাটলেট নিয়ে ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল।

খেতে-খেতে জোজো বলল, "আমার পা-টা যখন মুচকে গেল, জানিস, প্রথম দু'দিন এমন ব্যথা যে, আমি উঠে দাঁড়াতেই পারছিলাম না। ভয় হয়েছিল, সারাজীবনের মতনই খোঁড়া হয়ে যাব নাকি! তখন কাকাবাবুর কথা খুব মনে পড়ত। কাকাবাবু ওই খোঁড়া পা নিয়েই কতবার পাহাড়ে উঠেছেন, জলে ঝাঁপিয়েছেন, হ্যাঁ রে সন্তু, কবে থেকে খোঁড়া হয়েছেন বল তো?"

সন্তু বলল, "আমি ঠিক জানি না। ছেলেবেলা থেকেই তো এরকম দেখছি।"

"কীভাবে পা-টা ওরকমভাবে খোঁড়া হল?"

"তাও ঠিক জানি না। কখনও জিজ্ঞেস করিনি।"

"কেন জিজ্ঞেস করিসনি? তুই বড় হওয়ার আগে কাকাবাবু নিশ্চয়ই একা-একা অনেক অভিযানে গেছেন। সেই গল্পগুলো শুনিসনি?"

"দু-একটা শুনেছি।"

"তা হলে এই পা ভাঙা নিয়েও নিশ্চয়ই কোনও গল্প আছে। তুই জিজ্ঞেস করতে না পারিস, আমি করব।"

"হ্যাঁ, কর না। কাকাবাবু তোকে খুব পছন্দ করেন।"

কাটলেট খাওয়া হয়ে গেছে। রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে জোজো ডান পাশে তাকাল। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক আইসক্রিমওয়ালা।

জোজো বলল, "কাটলেটের পর একখানা আইসক্রিম না খেলে কি জমে, বল?"

সন্তু বলল, "চল, চল, আর আইসক্রিম খেতে হবে না। ওখানে যেতে দেরি হয়ে যাবে।"

জোজো অভিমানের ভান করে বলল, "সন্তু, আমি পয়সা আনিনি বলে তুই এরকম অবজ্ঞা করছিস? একটা আইসক্রিম খেতে কতটা সময় লাগে? আইসক্রিমের পয়সাটাও তোর কাছে আমার ধার থাকবে।"

সন্তু বলল, "এটা সত্যিই ধার। আমার হাতখরচ ফুরিয়ে যাচ্ছে।"

আইসক্রিম শেষ করে ওরা এসে পৌঁছল সাঁতার ক্লাবে। সেখানে বেশ ভিড়। কবিতা পাঠ শুরু হয়ে গেছে। একজন লম্বা চেহারার কবি উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করছেন।

ওরা দু'জনে বসল একেবারে পেছন দিকে। একটু পরেই জোজো ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে সন্তু, এরা আমাকে একটা কবিতা পড়তে দেবে?"

সন্তু বলল, "না।"

জোজো বলল, "কেন দেবে না, আমিও কবিতা লিখি।"

সন্তু বলল, "কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় না। যে খেলে, সে-ও খেলোয়াড় নয়। যে গান গায়, সেই কি গায়ক?"

জোজো ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলল, "তোর কথাটা সত্যি বটে, আবার সত্যিও নয়। এ-নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে।"

সন্তু বলল, "এখন তর্ক করতে হবে না। মন দিয়ে শোন।"

দু-তিনজনের কবিতা শোনার পরই জোজো বলল, "ওঠ, উঠে পড়। চল, এবার যাই!"

সন্তু বলল, "তোর ভাল লাগছে না?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ ভাল লাগছে। সত্যি ভাল লাগছে। কিন্তু ভাল জিনিস বেশিক্ষণ শুনতে নেই। এর পর যদি খারাপ লাগে?"

জোজো হাত ধরে টানাটানি করাতে সন্তুকে উঠে পড়তেই হল।

বাইরে এসে জোজো বলল, "চল, তোদের বাড়ি যাই। কাকাবাবুর অসুখ, আমার একবারও দেখতে যাওয়া হয়নি।"

সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে জমেছে কালো মেঘ, মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু শব্দ। বেশ ঝড়-বৃষ্টি আসছে।

বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামার পর জোজো গলা নিচু করে বলল, "সন্তু, সন্তু, একজন স্পাই! তোদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।"

সন্তু তাকিয়ে দেখল, উলটো ফুটপাথে বেশ খানিকটা দূরে একজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আপনমনে।

সে বলল, "ধুত! তুই সব জায়গায় স্পাই দেখতে পাস। লোকটা নিশ্চয়ই কারও জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখার কী আছে?"

জোজো মাথা নাড়তে-নাড়তে বলতে লাগল, "উঁহুঃ, উঁহুঃ, আমি স্পাই দেখলেই চিনতে পারি।"

লোকটি এবার উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করল। সন্তুও জোজোকে নিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

মা জোজোকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, "জোজো অনেকদিন আসোনি। ভাল হয়েছে আজ এসেছ। আজ মাছের চপ বানিয়েছি, এক্ষুণি ভেজে দিচ্ছি।"

জোজো বলল, "আঃ মাসিমা, বাঁচালেন, কী খিদেটাই না পেয়েছে!"

সন্তু অবাক হয়ে তাকাতেই জোজো আবার বলল, "মনে হচ্ছে যেন কতদিন কিছু খাইনি।"

ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে জোজোর, সন্তু তাকে ধরে-ধরে তুলল। উঠতে-উঠতে জোজো বলল, "আমি পেটুক নই, জানিস তো! এক-একদিন রাক্ষসের মতন খিদে পায়, আবার সাতদিন কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। একবার আমি অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে তিনদিন একফোঁটা জলও না খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছি।"

কাকাবাবুর ঘরের দরজা ভেজানো। কাকাবাবু বিরক্ত হয়ে বলে দিয়েছেন যে, আর কোনও লোককে তাঁর অসুখ দেখার জন্য তাঁর ঘরে আসতে দেওয়া হবে না। যারা এখনও আসছে, তাদের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে চা-টা খাইয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একগাদা ওষুধ খেয়ে-খেয়ে কাকাবাবুর শরীরটা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। বাইরের লোকের সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

জোজোর কথা অবশ্য আলাদা। তাকে দেখে কাকাবাবু খুশিই হলেন। হেসে বললেন, "এসো, এসো জোজো, অনেকদিন তোমার গল্প শোনা হয়নি।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, অনেকদিন কোথাও অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া হচ্ছে না!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার তো শরীর ভাল নয়। তুমি আর সন্তু কোনও জায়গা থেকে ঘুরে এসো এই ছুটিতে। দেখো, যদি কোনও অ্যাডভেঞ্চার হয়!"

সন্তু বলল, "জোজো, তোর হেলিকপ্টার থেকে লাফানোর গল্পটা কাকাবাবুকে শুনিয়ে দে!"

জোজো বলল, "ওটা এমন কিছু না।"

কাকাবাবু বললেন, "শুনব, শুনব। কিন্তু তার আগে সন্তু বল তো, কালকের ওই লোকটা কে ছিল? মনে একটা খটকা লেগে আছে। আমি চিনি না, আর কেউ চেনে না, অথচ ঘরের মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। আমাকে তুমি-তুমি করে উপদেশ দিয়ে গেল! লোকটার আর হদিস পেলি না?"

সন্তু বলল, "লোকটি তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটুখানি হাঁটবার পরই একটা গাড়িতে উঠে পড়ল। আর দেখতে পাইনি।"

কাকাবাবু একটু ধমকের সুরে বললেন, "শুধু এইটুকু দেখেছিস? আর কিছু দেখিসনি? এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু দেখা যায়। লোকটার হাঁটার ভঙ্গি কেমন ছিল? যে-গাড়িটায় উঠল, তার নম্বর কত?"

সন্তু লজ্জা পেয়ে গেল। গাড়িটার নম্বর দেখতে সে ভুলে গেছে। কালো রঙের গাড়ি তো অনেক আছে।

সন্তু বলল, "হাঁটার ভঙ্গিতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সোজা হয়ে হাঁটছিল। তবে বাঁ হাতটা কোটের পকেটে ঢোকানো ছিল, একবার-দু'বার মাত্র বার করেছিল, সেই হাতে একটা দস্তানা পরা।"

কাকাবাবু বললেন, "দস্তানা? কীরকম দস্তানা?"

সন্তু বলল, "খুব পাতলা রবারের। ডাক্তাররা যেমন পরে।"

কাকাবাবু বললেন, "একহাতে দস্তানা পরে থাকবে কেন? হয় ওই হাতে কোনও ঘা আছে কিংবা একটা-দুটো আঙুল কাটা। তা লুকোতে চায়।"

সন্তু বলল, "আর একটা ব্যাপার, গাড়িতে ওঠার পর লোকটি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল। পরে আমার মনে হয়েছে, ওর চোখের মধ্যে যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওর চোখে কালো চশমা ছিল, তুই কী করে বুঝলি, কটমট করে তাকিয়েছে ?"

সন্তু বলল, "তখন চশমা খুলে ফেলেছিল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে..."

কাকাবাবু বললেন, "আর-একটু ভেবে দ্যাখ, কেন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল ?"

সন্তু বলল, "কয়েক সেকেন্ডের তো ব্যাপার, গাড়িটা হুশ করে চলে গেল, তার মধ্যেই লোকটা... কাকাবাবু, মনে পড়েছে, ওর দুটো চোখ দু'রকম !"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে ? দু'চোখের রং আলাদা ?"

সন্তু বলল, "তা দেখিনি। অত তাড়াতাড়ি কি রং বোঝা যায় ? তবু এটা আমার ধারণা, দু'চোখের দৃষ্টি একরকম নয় !"

জোজো জানলার ধার থেকে বলে উঠল, "একটা চোখ পাথরের হতে পারে !"

কাকাবাবু জোজোর দিকে প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললেন, "এটা তো জোজো ঠিক বলেছে। একটা চোখ পাথরের হলে... সেইজন্যই লোকটা ঘরের মধ্যেও কালো চশমা পরে ছিল। কিন্তু... কিন্তু, পাথরের চোখওয়ালা কোনও লোক, এক চোখ কানা, এরকম কোনও লোককেও তো আমি চিনি না ! অবশ্য, পাথরের চোখ হলেই যে সে খারাপ লোক হবে, তার কোনও মানে নেই !"

বাইরের দিকে তাকিয়ে জোজো বলল, "সেই লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "সেই লোকটা মানে কোন লোকটা ? তাকে তো জোজো দেখেনি।"

সন্তু বলল, "জোজোর ধারণা একজন স্পাই আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।"

কাকাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, "আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখার কী আছে ? এটা এমন কিছু আহামরি বাড়ি নয় !"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

কাকাবাবু বললেন, "কী ? তোমার আবার অনুমতি লাগে নাকি ?"

জোজো বলল, "আপনার একটা পা খোঁড়া হয়ে গেল কী করে ? কেউ কি পায়ে গুলি করেছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "ও, এই কথা। না, কেউ গুলি করেনি। প্রায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলতে পারো। একবার আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম একটা কাজে, এক জায়গায় গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলাম পাহাড় থেকে। অনেক চিকিৎসাতেও সারেনি।"

জোজো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "শুধু এইটুকু বললে চলবে না। ঠিক কী হয়েছিল, কেন পাহাড় থেকে পড়ে গেলেন, সবটা শুনতে চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "পুরো কাহিনীটা তোমাকে শোনাতে হবে ? তাতে যে অনেকটা সময় লাগবে। ঘটনাটা আমি কাউকে সাধারণত বলি না।"

জোজো জোর দিয়ে বলল, "আমাদের বলুন। সময় লাগুক না !"

কাকাবাবু এতক্ষণ বসে ছিলেন। এবার বালিশে মাথা হেলান দিলেন। তারপর বললেন, "আফগানিস্তান দেশটা এক সময় কী সুন্দর ছিল। মানুষগুলো লম্বা-চওড়া, কিন্তু ভারী সরল। ওরা যদি কারও বন্ধু হয়, তবে সেই বন্ধুর জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে। আবার কেউ যদি শত্রু হয়, তবে দারুণ নিষ্ঠুরভাবে তাকে খুন করতেও ওদের হাত কাঁপে না। কোনও কাবুলিওয়ালার সঙ্গে আমার শত্রুতা হয়নি, বরং বন্ধু হয়েছিল অনেক।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ওখানে আপনি কত বছর আগে গিয়েছিলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "দশ বছর, না, না, এগারো। তখন তোমরা খুব ছোট ছিলে। এখন ওদেশটায় খালি মারামারি চলছে, অন্য দু-একটা দেশ গোলমাল পাকাচ্ছে। এখন তো আর যাওয়াই যায় না। আমার আর-একবার খুব যেতে ইচ্ছে করে।"

এই সময় রঘু থালাভর্তি গরম-গরম মাছের চপ নিয়ে এল।

একটা কাগজের প্লেটে দুটো চপ তুলে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "মা আপনাকে আগে খেয়ে নিতে বলেছেন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই তো বলবেন, খাব না !"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলে দুটো ? পারব না, একটা দে।"

রঘু বলল, "বেশি বড় নয়, দুটোই খান !"

এত ওষুধের জন্য কাকাবাবুর মুখে রুচি নেই, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। মা তাই প্রত্যেকদিন কাকাবাবুর জন্য নতুন-নতুন খাবার তৈরি করছেন।

জোজো দু'হাতে দুটো চপ তুলে নিয়ে একটায় কামড় দিয়ে বলল, "গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড, দারুণ ! আগে খেয়ে নিই, তারপর আফগানিস্তানের গল্পটা শুনব।"

সন্তু একটা চপ নিয়ে জানলার কাছে চলে এল। পুরনো আমলের বাড়ি, জানলায় গ্রিল নেই, ফাঁক-ফাঁক লোহার শিক। শুধু এই জানলার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় ছবি তুললে মনে হবে, জেলখানার গরাদের মধ্যে কয়েদি !

সন্তু জোজোর সেই 'স্পাই'-কে দেখার চেষ্টা করল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা সত্যিই ফিরে এসেছে, আস্তে-আস্তে পায়চারি করছে। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা।

হঠাৎ একটা কালো রঙের গাড়ি এসে থামল। জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত। সেই হাতে একটা বন্দুক। সাধারণ বন্দুকের মতন লম্বা নয়, বেশ বেঁটে, নলটা অনেকটা মোটা। ঠিক গুলির শব্দের মতন নয়, চাপা ধরনের দুপ-দুপ শব্দ হল দু'বার।

কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। গাড়ির জানলায় বন্দুকসুদ্ধু হাতটা দেখেই সন্তু মাথা নিচু করে বসে পড়েছে মাটিতে, চেঁচিয়ে উঠল, "সাবধান !"

সঙ্গে-সঙ্গে একটা কিছু ঠং করে জানলার শিকে লেগে পড়ে গেল রাস্তার দিকে, আর-একটা এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। সেটা গুলি নয়, একটা ছোট টিনের কৌটোর মতন, তার থেকে ভস-ভস করে বেরোতে লাগল ধোঁয়া।

কাকাবাবু বিদ্যুদ্বেগে নেমে এলেন খাট থেকে। একহাতে নিজের নাক টিপে ধরে তুলে নিলেন কৌটোটা।

লাফাতে-লাফাতে চলে গেলেন বাথরুমে। সেখানে এক বালতি জল ছিল, তার মধ্যে কৌটোটা ডুবিয়ে দিলেন।

যেটুকু গ্যাস বেরিয়েছে, তাতেই মাথা ঝিমঝিম করছে সন্তুর। জোজো ঢলে পড়েছে মাটিতে।

অজ্ঞান হওয়ার ঠিক আগে সন্তু শুনতে পেল, বাইরের রাস্তায় গুড়ুম-গুড়ুম করে শব্দ হল দু'বার। এবারে সত্যিকারের রিভলভারের গুলি ছোড়ার শব্দ।

তারপরই একজন মানুষের আর্ত চিৎকার।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালে অনেকখানি জানা গেল ঘটনাটা।

বিষাক্ত ধোঁয়ায় সন্তু আর জোজো জ্ঞান হারালেও কাকাবাবু ঠিক ছিলেন। তিনি ওদের চোখে-মুখে জলের ছিটে দেওয়ায় একটু পরেই জ্ঞান ফিরেছিল। তারপর রাত্রে আর কিছু ঘটেনি। রাস্তায় গুলিটুলি চললেও কারও কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। জোজোকে আর রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেওয়া হয়নি, সে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল।

সকালবেলাতেই নরেন্দ্র ভার্মা এসে হাজির। যত বড় ঘটনাই

ঘটুক, তবু তাঁর হালকা ইয়ার্কির সুরে কথা বলা স্বভাব। তাঁর পোশাকও সবসময় নিখুঁত, ভাঁজটাঁজ লাগে না। মেরুন রঙের সুট তাঁর বেশি পছন্দ।

তিনি এসে কাকাবাবুকে বললেন, "আঃ রাজা, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। তোমার জন্য কি কলকাতার লোক শান্তিতে থাকতে পারবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আবার কলকাতার লোকের কাছে কী দোষ করলাম ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার বাড়ির সামনে গোলাগুলি চলে, তাতে পাড়ার লোকের ঘুম নষ্ট হয় না ? একগাদা শত্রু তৈরি করে রেখেছ, কে যে কখন তোমাকে মারতে আসবে, তার কি কোনও ঠিক আছে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কাল কারা এসে হামলা করল, তুমি কিছু জানো ?"

"কী করে জানব, আমি কি তখন উপস্থিত ছিলাম ! নাগাল্যান্ড থেকে ফিরেছি অনেক রাতে। তখনই খবর পেলাম।"

"কী করে তুমি অত রাতে খবর পেলে ? কে খবর দিল ?"

"পুলিশ খবর দিয়েছে। তোমার অসুখ দেখেই আমার আশঙ্কা হয়েছিল, এবার তোমার ওপর একটা অ্যাটেম্‌ট হতে পারে। সুস্থ অবস্থায় তোমার শত্রুরা তোমাকে কব্‌জা করতে পারে না। তুমি দুর্বল হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলে তোমাকে মারবার চেষ্টা করবে। সেইজন্যই তোমার বাড়ির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার জন্য আমি পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম। কাল রাতে দুটোর সময় এসে এই রাস্তাটা আমি একবার দেখেও গেছি।"

সন্তু জোজোর দিকে তাকাল। জোজো যাকে স্পাই ভেবেছিল, সে আসলে পুলিশের লোক !

নরেন্দ্র ভার্মা আবার বললেন, "তোমার ঘরের মধ্যে দুটো গ্যাস বোমা ছুড়ে চলে গেল। একটা বোমা তাও ঘরের মধ্যে পড়েনি, শিকে লেগে বাইরে পড়েছে। যদি দুটোই ঘরের মধ্যে এসে পড়ত, আর পাঁচ-সাত মিনিট গ্যাস বেরোত, তা হলে তোমরা তিনজনেই বাঁচতে না !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ওপর কার যে এত রাগ তা তো বুঝতে পারছি না। আমি তো কয়েক মাস ধরেই চুপচাপ বসে আছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "পুরনো শত্রুরা প্রতিশোধের জন্য পাগল হতে পারে না ? তোমার দোষ কি জানো রাজা, তুমি সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক লোকগুলোকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দাও, ক্ষমা করে দাও। কিছুতেই তোমার শিক্ষা হয় না !"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "তবু দেখলে তো, আমাকে মারা সহজ নয় !"

নরেন্দ্র ভার্মাও হাসতে-হাসতে বললেন, "একবার-না-একবার ঠিক ঘায়েল হয়ে যাবে, এই আমি বলে দিচ্ছি !"

সন্তু বলল, "নরেন্দ্রকাকা, কাল রাস্তায় কেউ কি রিভলভারের গুলি ছুড়েছিল ? আমি শব্দ শুনেছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমাদের পুলিশের লোকটি ছুড়েছিল। একজনের গায়েও লেগেছে। কিন্তু কালো গাড়িটাকে আটকাতে পারেনি। আহত লোকটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। গাড়ির নাম্বারটা নোট করেছিল সেই পুলিশ, কিন্তু বুঝতেই পারছ, সেটা ফল্‌স। চেক করে দেখা গেছে, ওই নাম্বারে কোনও গাড়ি নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "গ্যাস বোমা। আইডিয়াটা নতুন। ছাত্র বয়েসে আমরা দেখেছি, পুলিশে টিয়ার গ্যাস বোমা ছুড়ত। দারুণ চোখ জ্বালা করত তাতে। আমি প্রথমে সেরকমই ভেবেছিলাম।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, আগেকার দিনে লোকে অসুখে পড়ার পর চেইঞ্জে যেত মনে আছে ? হাওয়া বদলালে উপকার হয়। কলকাতার হাওয়া ছেড়ে তুমি কিছুদিন অন্য জায়গার হাওয়া খেয়ে এসো বরং। এ-বাড়িতে আবার হামলা হলে তোমার দাদা-বউদিও বিপদে পড়তে পারেন !"

কাকাবাবু বললেন, "কে আমাকে মারার চেষ্টা করছে সেটা বুঝতে পারলে তাকে ধরে ফেলা শক্ত হত না। যাই হোক, এখন কিছুদিন এ-বাড়ি থেকে দূরে থাকাই ভাল। জানো তো নরেন্দ্র, আমি আমার দাদাকে অনেকবার বলেছি, আমার জন্য যাতে তোমাদের বিপদে না পড়তে হয়, সেইজন্য আমার অন্য বাড়িতে থাকা উচিত। সল্ট লেকে একটা বাড়ি ঠিকও করেছিলাম। দাদা কিছুতেই যেতে দিলেন না। বউদিরও খুব আপত্তি।"

সন্তু বলল, "আমারও।"

নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে বললেন, "সন্তু মাস্টার, এখন তো কলেজে সামার ভ্যাকেশন। তোমার কাকাকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো। জোজো, তুমিও যাবে নাকি ?"

জোজো বলল, "বাবার সঙ্গে আমার হাওয়াই যাওয়ার কথা আছে। সেখান থেকে তাহিতি দ্বীপে। সামনের সোমবারই স্টার্ট করার কথা।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরে বাবা, আমরা তো অতদূরে যেতে পারব না। কাছাকাছি কোনও জায়গা ঠিক করা যাক।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "পুরীতে যেতে পারো। সমুদ্রের ধারে। আর যদি পাহাড় যেতে চাও, কালিম্পং-এ ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিংবা দিল্লি কিংবা বম্বে (থুড়ি মুম্বই) তো যাওয়ার ইচ্ছে হয়, আমার মতে দিল্লিতে যাওয়াটাই ভাল, আমি কাছাকাছি থাকব।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "সাতনা ! মধ্যপ্রদেশে সাতনা নামে একটা জায়গা আছে জানো ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "জানব না কেন ? খাজুরাহো যাওয়ার রাস্তায় পড়ে। তুমি সেখানে যেতে চাও ? মধ্যপ্রদেশে তো এখন খুব গরম।"

কাকাবাবু বললেন, "গরমে আমার কিছু আসে যায় না। কলকাতা কি কম গরম নাকি ? দিল্লি আরও গরম। নরেন্দ্র, তোমার কামালুদ্দিন হোসেনকে মনে আছে ? আমরা যাকে কামাল আতাতুর্ক বলে ডাকতাম ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, মনে আছে। তোমার সঙ্গে আফগানিস্তানে গিয়েছিল। ওর আর-একটা নাম ছিল কাটমিনস্কি। অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে কাটমিনস্কি ছিল, যে-কোনও সময়ে যে-কোনও জিনিস চাইলে যে জোগাড় করে আনত, আমাদের কামালুদ্দিনেরও সেই গুণ ছিল। সে বুঝি এখন সাতনায় থাকে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেইরকমই তো জানি। ওখানে কামাল ব্যবসা করে। অনেকদিন যোগাযোগ নেই। ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সাতনায় একটা ভাল হোটেল আছে। ডাক বাংলো বা গেস্ট হাউসেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "হোটেলের চেয়ে আলাদা গেস্ট হাউসই ভাল। সন্তু, তোকে খাজুরাহোর মন্দিরও দেখিয়ে আনব।"

জোজো বলে উঠল, "তা হলে আমি আর হাওয়াই-তাহিতি দ্বীপে যাব না। আমিও সাতনায় যেতে চাই।"

সন্তু বলল, "সে কী রে ? শুনেছি হাওয়াই অতি চমৎকার জায়গা।"

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "ওসব জায়গায় আমি যে-কোনও সময় যেতে পারি। এবার তোদের সঙ্গে বরং খাজুরাহো মন্দির দেখে আসি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা হলে ওই ঠিক হল। কালই

ভোরবেলায় যাত্রা শুরু। আজ রাতটা সাবধানে থাকবে। আজ অবশ্য একগাড়ি ভর্তি পুলিশ পাহারা দেবে এই বাড়ি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি যে নাগাল্যান্ডে গিয়েছিলে, সেখানে কী হল ?"

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওখানে সীমান্তের ওপার থেকে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র চালান করছে একটা দল। সেই গ্যাংটাকে ধরার কথা ছিল। কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাওয়া গেল না, তাই সুবিধে হল না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে নিয়ে গেলে কী সুবিধে হত ? আমি অস্ত্র চালানটালান ব্যাপারে কিছুই জানি না।"

নরেন্দ্র ভার্মার ঠোঁটের কোণে একটু ঝিলিক দিয়ে গেল। তিনি বললেন, "কী সুবিধে হত জানো ? একফোঁটা মধু ফেললে যেমন অনেক মাছি উড়ে আসে, সেইরকম তুমি যেখানেই যাও, সেখানকার দুর্বৃত্তদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তোমাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তোমাকে মারতে এলে আগে থেকে ফাঁদ পেতে তাদের সবক'টাকে জালে ফেলা যায়। তুমি গেলে না, তাই তারাও দূরে-দূরে রইল।"

কাকাবাবু তেড়ে উঠে বললেন, "ও, তার মানে আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করো তোমরা ? আমার প্রাণের কোনও দাম নেই তোমাদের কাছে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা একটু সরে গিয়ে জোরে-জোরে হাসতে-হাসতে বললেন, "দেশের উপকারের জন্য প্রাণ দেবে, এটা তো পুণ্য কাজ !"

কাকাবাবু বললেন, "মোটেই আমার প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছে নেই। তোমাদের কাজে আর কোথাও যাব না !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কাল ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সবাই রেডি থাকবে।"

পরদিন হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপার বদলে ওরা একটা গাড়িতে রওনা হল খড়্গপুরের দিকে। সাবধানের মার নেই। ট্রেন ধরা হবে খড়্গপুর থেকে।

গাড়ি যখন বিদ্যাসাগর সেতু পার হচ্ছে, তখন জোজো বলল, "কাকাবাবু, সেদিন আর আফগানিস্তানের গল্পটা শেষ হল না। এখন বলুন।"

কাকাবাবু বললে, "সাতনায় গিয়ে বলব। সেইজন্যই তো কামালের কথা মনে পড়ল। সে আমার সঙ্গে ছিল। সব কথা নিজের মুখে বলা যায় না। কিছুটা কামালের কাছ থেকে শুনবে। আমরা দু'জনে একসময় সহকর্মী ছিলাম। কামালকে তোমাদের ভাল লাগবে।"

দুপুরের আগেই পৌঁছে যাওয়া গেল খড়্গপুরে। সেখানে লাঞ্চ খাওয়া হল। পুলিশের এস. পি. সাহেবের বাংলোতে। নরেন্দ্র ভার্মা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কিন্তু নিজে আসেননি। তিনি ব্যস্ত মানুষ, দিল্লি ফিরে গেছেন।

বিকেলবেলা ট্রেনে ওঠার সময় জোজো যথারীতি একজন স্পাইকে দেখে ফেলেছে।

কাকাবাবু বললেন, "বলা যায় না। স্পাইয়ের ব্যাপারে জোজো এক্সপার্ট। সন্তু, নজর রাখিস। আমি ট্রেনে বই পড়ব আর ঘুমোব।"

ওদের টিকিট হয়েছে একটা ফার্স্ট ক্লাস বগিতে। একটা কিউবিক্ল-এ চারটে বার্থের মধ্যে তিনটি ওদের তিনজনের, অন্য বার্থটিতে একজন মহিলা। মাঝবয়েসী মহিলাটি কেমন যেন গোমড়ামুখো, একটা পত্রিকা খুলে পড়তে লাগলেন। ট্রেন ছাড়ার একটু পরেই তিনি উঠে গেলেন বাইরে, তারপর একজন টাকমাথা বেঁটে লোক এসে সেখানে বসে চেয়ে রইল জানলার বাইরে।

সেই লোকটিও মিনিটপাঁচেক পরে ধড়মড়িয়ে উঠে চলে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকল একজন দাড়িওয়ালা লম্বা লোক। লোকটি

বেশ ট্যারা। এই লোকটিকে দরজার কাছে দেখেই ট্রেনে ওঠার সময় জোজো স্পাই বলে শনাক্ত করেছিল।

জোজো সন্তুর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

কাকাবাবু ওপরের বাঙ্কে শুয়ে বই পড়তে-পড়তেও এইসব লোকজনদের আসা-যাওয়া লক্ষ করছেন।

ট্যারা লোকটি প্যান্ট ও হাফশার্ট পরা, বসে পড়েই পা দোলাতে লাগল জোরে-জোরে। উলটো দিকেই সন্তু ও জোজো পাশাপাশি। লোকটি ওদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কোনও কথা বলছে না। অথচ কিছু যেন বলতে চায়।

সন্তু নিয়ে এসেছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনাবলী। 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন'-এর মতন পুরনো লেখাগুলো তার আবার পড়তে ইচ্ছে করে। মাঝে-মাঝে হাসি পায়। জোজো তাকে পড়তে দিচ্ছে না, মাঝে-মাঝেই হাঁটুতে ধাক্কা মারছে।

ট্যারা লোকটি একসময় সন্তুর দিকে চেয়ে বলে উঠল, "ইয়ে, তোমরা ভাই কতদূর যাবে?"

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো ফস করে বলে দিল, "কন্যাকুমারিকা!"

ওপরের বাঙ্কে কাকাবাবু খুক করে একটু হেসে ফেললেন। জোজো তার স্পাইটিকে ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত দৌড় করাতে চায়। এই ট্রেন যাবে মোটে জব্বলপুর পর্যন্ত।

লোকটি খানিকটা অবাক হয়ে বলল, "এই ট্রেন কি অতদূর যাবে?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "মাঝপথে নামতে হবে, আমাদের কাজ আছে।"

এই লোকটিও উঠে চলে গেল বাইরে।

জোজো বলল, "দেখলি, দেখলি সন্তু, আমাদের কাছ থেকে খবর জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কেমন গুলিয়ে দিলাম।"

ওপর থেকে কাকাবাবু বললেন, "তোমরাও লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে না কেন, আপনি কতদূর যাবেন? সেটাই ভদ্রতা।"

জোজো বলল, "সেটা সন্তুর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আমি ডিফেন্সে খেলি।"

আরও একজন লোক এল এর পর। কোঁচানো ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, মাথার চুল ঢেউখেলানো, নাকের নীচে সরু তলোয়ারের মতন গোঁফ। গায়ের রং ফরসা, গুনগুন করে গান গাইছে।

এই লোকটি বেশ হাসিখুশি ধরনের। বসে পড়েই বলল, "নমস্কার। আমাদের দলের মোট ন'খানা টিকিট, তার মধ্যে একখানা আপনাদের এখানে। এই সিটে কে বসবে তা ঠিক করতে পারছে না। আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না, বসুন না! আপনাদের যাত্রাপার্টি বুঝি?"

লোকটি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বাগদেবী অপেরা। জব্বলপুরে পাঁচটা শো আছে।"

সন্তু আর জোজো দু'জনেই অবাক হল। "কাকাবাবু কী করে বুঝতে পারলেন?"

কাকাবাবু লোকটিকে বললেন, "আপনি যে গানটি গাইছিলেন, সেটা 'কদমতলায় কে এসেছে হাতেতে তার মোহন বাঁশি' তাই না? ছেলেবেলায় আমি খুব যাত্রা শুনতাম। এখন কি আর এইসব পুরনো পালা চলে?"

লোকটি বলল, "এখন লোকে আবার আগেকার অনেক পালা দেখতে চাইছে। নতুনগুলো একঘেয়ে হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই বুঝি হিরো? আপনার নাম কী?"

লোকটি হেঁ-হেঁ করে হেসে বলল, "আমার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম যাদুগোপাল চক্রবর্তী, কিন্তু এ-লাইনে ওরকম নাম চলে না। তাই ডালিমকুমার নাম নিয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "ডালিমবাবু, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব খুশি হলাম। আপনি নামকরা লোক। আপনি ওই গানটা ভাল করে শোনান না!"

ডালিমকুমার দু'হাত নেড়ে মেজাজে গান ধরলেন। কাকাবাবুও খুব তারিফ করতে লাগলেন হাততালি দিয়ে-দিয়ে। সন্তু আর জোজোর মোটেই ভাল লাগল না। কেমন যেন নাকি-নাকি সুর।

গানটা হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়ে ডালিমকুমার বললেন, "এ-লাইনের ট্রেনে প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে, রাত্তিরবেলা সাবধানে থাকতে হবে।"

সন্তু বলল, "ট্রেনে ডাকাতির কথা খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে পড়ি। আমরা যতবার ট্রেনে চেপেছি, কখনও দেখিনি।"

জোজো বলল, "বাঃ, আরাকু ভ্যালি যাওয়ার সময় কী হয়েছিল মনে নেই?"

সন্তু বলল, "সে তো অন্য ব্যাপার। ডাকাতরা কি মানুষ ধরে নিয়ে যায় নাকি?"

জোজো বলল, "একবার বাবার সঙ্গে রাজস্থানে যাচ্ছিলাম, ট্রেনটার নাম প্যালেস অন হুইল্স, গোটা দশেক দুর্দান্ত ডাকাত ঘোড়া ছুটিয়ে ট্রেনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে-যেতে গুলি ছুড়তে লাগল ..."

ডালিমকুমার চোখ বড়-বড় করে গল্পটা শুনে বললেন, "ঠিক সিনেমার মতন!"

তারপর বললেন, "যদি সত্যি ডাকাত পড়ে, তা হলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না ভাই। ঘড়ি, টাকা-পয়সা যা আছে দিয়ে দেওয়াই ভাল। নইলে প্রাণটা যাবে। এরা বড় নিষ্ঠুর, পট করে পেটে ছোরা বসিয়ে দেয়! আমার হাতে যে পাঁচটা আংটি দেখছ, এর একটাও সোনার নয়, সব গিল্টি করা। পকেটে থাকে মোটে একশো টাকা।"

কাকাবাবু বললেন, "দরজা ভাল করে লক করে দিলেই তো হয়। তা হলে আর ডাকাত ঢুকবে কী করে!"

ডালিমকুমার তক্ষুণি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু খানিক বাদেই কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল বাইরে থেকে।

ডালিমকুমার ভয়-ভয় চোখে বললেন, "খুলব?"

কাকাবাবু বললেন, "মোটে তো আটটা বাজে। দেখুন বোধ হয় আপনারই দলের লোক। তা ছাড়া খাবার দিতেও তো আসবে।"

ডালিমকুমার জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

বাইরে থেকে উত্তর এল, "খুলুন, টিকিট চেকার!"

এবার ডালিমকুমার উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতেই তাঁকে ধাক্কা দিয়ে একজন ভেতরে ঢুকে এল। পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়েস হবে, খাকি প্যান্ট আর শার্ট পরা, মুখে একটা রুমাল বাঁধা। এক হাতে পাইপগান, অন্য হাতে একটা চটের থলে।

ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় সে বলল, "সব চুপ! ট্যাঁ-ফোঁ করলে জানে মেরে দেব, কার কাছে টাকাকড়ি কী আছে ছাড়ো। ঘড়ি, টাকা-পয়সা সব এই থলিতে দাও!"

ডালিমকুমার সিঁটিয়ে গিয়ে বললেন, "দিচ্ছি! দিচ্ছি!"

বাঙ্কের ওপর থেকে কাকাবাবু বললেন, "আরে, সত্যি-সত্যি ডাকাত এসে গেল! ও মশাই, আপনার কথা মিলে গেল যে!"

ডাকাতটি পাইপগানটা কাকাবাবুর দিকে উঁচিয়ে বলল, "অ্যাই বুড়ো, চুপ করে থাক। নো স্পিকিং। মানিব্যাগ বার কর, চটপট, চটপট।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছে তো টাকা রাখি না। ওই

ছেলেটির কাছে আছে। কী রে সন্তু, টাকা-পয়সা সব দিয়ে দিবি নাকি ?"

সন্তু বিরক্ত মুখ করে বলল, "তা হলে তো আবার সুটকেস খুলতে হবে !"

ডাকাতটি জোজো আর ডালিমকুমারের দিকে ঘুরে তাকাল। ডাকাতরা বড়দের সঙ্গেও তুই-তুই করে কথা বলে। সে ডালিমকুমারকে বলল, "আংটিগুলো খোল, টাকা বার কর।"

জোজো শুকনো মুখে বলল, "আমার কাছে একটা ডট পেন ছাড়া কিছু নেই !"

ডালিমকুমার পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে ছুড়ে দিলেন ডাকাতের থলির মধ্যে, তারপর আংটিগুলো খুলতে লাগলেন।

সন্তু নিচু হয়ে সিটের তলা থেকে সুটকেসটা বার করছে, ডাকাতটা তার পেছনে এক লাথি কষিয়ে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, "দেরি করছিস কেন ?"

স্প্রিংয়ের মতন পেছন দিকে ঘুরে সন্তু ডাকাতটার পা ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিল। সে দড়াম করে পড়ে একদিকের সিটে। সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে সে পাইপগানটা তোলার চেষ্টা করল সন্তুর দিকে। সন্তু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, সে প্রায় শূন্যে লাফিয়ে উঠে একপায়ে লাথি কষাল ডাকাতটির গলায়।

সন্তু এখন ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গো। সে আকাশে উড়তে পারে। মনে-মনে বলছে, "বিলিবিলি গাগুাগুলু !"

ডাকাতটির হাত থেকে পাইপগানটা খসে গেছে, সন্তু তাকে ঠেসে ধরেছে একদিকের দেওয়ালে।

আর একটি ডাকাত মস্তবড় একটা ছোরা নিয়ে ঢুকে পড়ল। সে এমনভাবে তেড়ে গেল, যেন ছোরাটা এক্ষুণি বসিয়ে দেবে সন্তুর পিঠে।

কাকাবাবু ওপরের বাঙ্ক থেকে একটা ক্রাচ দিয়ে বেশ জোরে মারলেন দ্বিতীয় ডাকাতটির ঘাড়ে। সে আর্ত শব্দ করে বসে পড়ল মেঝেতে।

কাকাবাবু উৎফুল্লভাবে বললেন, "আর আছে নাকি ? আমাকে নামতে হবে ?"

পাশের কিউবিক্ল-এ চ্যাঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, সেখানেও ডাকাত পড়েছে। জোজো এবার লাফিয়ে গিয়ে চেনটা ধরে ঝুলে পড়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, "ডাকাত, ডাকাত !"

সন্তু প্রথম ডাকাতটির হাত থেকে পাইপগান কেড়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় ডাকাতটির হাতে ছোরাটা এখনও আছে। সে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, "এই যে দেখে নাও, আমার হাতে এটা কী রয়েছে।"

কাকাবাবুর রিভলভারটা ঠিক তার কপালের দিকে তাক করা।

সে একলাফে চলে গেল দরজার বাইরে। ট্রেনটা ছুটছে অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে, চেন টানার জন্য তার গতি কমে এল।

অন্য ডাকাতটা টপাটপ লাফিয়ে পড়ে পালালেও সন্তু যাকে ধরে আছে, সে পালাতে পারল না। সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এখন কী করব, একে ছেড়ে দেব ?"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "না, ধরে থাক, ওকে পুলিশে দিতে হবে। এই বেকার ছেলেগুলো মনে করে একটা পাইপগান আর দু-একটা ছোরাছুরি জোটালেই রেলের নিরীহ যাত্রীদের টাকা-পয়সা লুট করা যায়। এদের ধরে আচ্ছা করে মার দেওয়া দরকার। তারপর কিছুদিন জেলের ঘানি ঘোরালে উচিত শিক্ষা হবে !"

তারপর মুচকি হেসে বললেন, "ওহে, তোমাকে যদি আমি একটা চাকরি দিই, তা হলে সৎপথে থাকবে ?"

ছেলেটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "সার, আমাকে পুলিশের হাতে দেবেন না। আপনি নিজে শাস্তি দিন। আপনি যে কাজ দেবেন, তা-ই করতে রাজি আছি।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ-উ-উ ! অমনই অন্যরকম সুর বেরিয়েছে। আগে আমাকে বলেছিলে বুড়ো, তুই, আর এখন বলছ সার, আপনি ! ধরা পড়লেই দয়াভিক্ষা। কিন্তু নিজেরা কাউকে দয়া করো না !"

ট্রেনটা থেমে গেছে, শোনা যাচ্ছে হুইস্‌লের শব্দ, কারা যেন ছুটে আসছে এদিকে।

ডাকাতটি হাতজোড় করে বলল, "বাঁচান সার, মা-কালীর দিব্যি করে বলছি, আর কক্ষণো এ-কাজ করব না। আপনি যদি চাকরি দেন, আপনার পায়ে পড়ে থাকব—"

কাকাবাবু বললেন, "চটপট সিটের তলায় শুয়ে পড়ো। সাবধান, পুলিশ যেন টের না পায়। সন্তু, ওর পাইপগানটা জানলা দিয়ে ফেলে দে !"

॥ ৪ ॥

একটু পরেই সমস্ত বগি জুড়ে শোনা গেল পুলিশের বুটের আওয়াজ। গার্ডসাহেব হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। অনেক যাত্রী একসঙ্গে উত্তেজিতভাবে ডাকাতদের বিবরণ দিতে লাগল, কারও কথাই ঠিকমতন বোঝা যায় না।

দু'জন পুলিশ যখন এই কিউবিক্ল-এ উঁকি মারল, কাকাবাবু তখন ঘুমের ভান করে রয়েছেন, সন্তু আর জোজো বই খুলে বসে আছে, ডালিমকুমার আংটিগুলো আবার আঙুলে পরে ফেলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছেন।

পুলিশরা জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের কিছু খোয়া গেছে ?"

জোজো আর ডালিমকুমার বলে উঠলেন, "না, না কিচ্ছু না !"

পুলিশরা আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের এখানে কেউ ঢোকেনি ?"

জোজো বলল, "কেউ না। আমরা কিছু টের পাইনি। বাইরে চেঁচামেচি শুনেছি। কী হয়েছিল বলুন তো ?"

উত্তর না দিয়ে পুলিশরা চলে গেল। একজনকেও ধরতে পারেনি বলে তারা বেশ নিরাশ হয়েছে। ডাকাত ধরতে পারলে পুলিশদের বেশ লাভ হয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার চলতে শুরু করল ট্রেন। কাকাবাবু উঠে বসে বললেন, "যাক বাঁচা গেল, আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হল না। সন্তু, এবার দরজা বন্ধ করে দে, আর ছেলেটাকে বেরিয়ে আসতে বল। ওখানে ওর দমবন্ধ হয়ে যাবে।"

ডাকাত ছেলেটি মুখের রুমালটা খুলে ফেলেছে, এখন আর তাকে ডাকাত মনে হয় না, মনে হয় সাধারণ একটি যুবক। তেমন লম্বা-চওড়া নয়, দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথার চুল অবশ্য খুব বড়-বড়। থুতনিতে একটা কাটা দাগ। সন্তুদের পাশে সে বসল।

ডালিমকুমার বললেন, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনার এই ভাইপোটি তো খুব সাঙ্ঘাতিক ছেলে। জুডো ক্যারাটে-ফ্যারাটে সব জানে। জাপানিদের কাছে শিখেছে নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, নিজে-নিজেই শিখেছে। বইটই পড়ে প্র্যাকটিস করেছে। ওর ভরসাতেই তো আমি বাইরে বেরোই !"

জোজো বলল, "আর আমি কীরকম চেন টেনে দিলাম ! পুলিশ ডাকলাম !"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, জোজোর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। এ তো সামান্য ছিঁচকে ডাকাত, জোজো অনেকবার অনেক বড়-বড় বিপদ থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আচ্ছা ডালিমবাবু, আপনাদের যাত্রায় তো অনেক মারামারির দৃশ্য থাকে। হিরো হিসেবে আপনাকে ফাইট করতে হয়। আপনি তলোয়ার খেলা, ঘুসোঘুসি, বন্দুক চালানো এসব জানেন ?"

ডালিমকুমার লাজুকভাবে হেসে বললেন, "অত কী আর জানতে হয় ! পেছন থেকে বাজনা আর আলো দিয়ে ম্যানেজ করে দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "ইংরিজি সিনেমায় যারা পার্ট করে, তারা কিন্তু ওসব শিখে নেয়।"

ডাকাত ছেলেটির দিকে চেয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ও হে, তোমার নাম কী?"

ছেলেটি বলল, "অংশুমালী দাস। ডাকনাম হেবো।"

কাকাবাবু বললেন, "খবরের কাগজে যত ছোটখাটো চোর-ডাকাতদের নাম দেখি, সব এইরকম, হেবো, কেলো, ল্যাংচা, ভোঁদড়, পচা—সবার এইরকম বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি নাম হয় কেন?"

ডালিমকুমার বললেন, "ঠিক বলেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "কিংবা এইরকম বিচ্ছিরি নাম বাপ-মা দেয় বলেই কি এরা চোর-ডাকাত হয়? অংশুমালী তো সুন্দর নাম, তার ডাকনাম হেবো কেন হবে? ওহে অংশু, পুলিশ তো চলে গেছে, তুমি এবার পালাবার চেষ্টা করবে?"

অংশু বলল, "আজ্ঞে না সার, আপনি যা বলেন তাই শুনব!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কি একটা পাইপগান সম্বল করেই ডাকাতি করতে বেরিয়েছ? আমার ভাইপো সন্তু তোমার চেয়ে বয়েসে কত ছোট, তার সঙ্গে গায়ের জোরে পারলে না? কুস্তি-জুডো কিছু শেখোনি?"

অংশু বলল, "ওসব কথা আর বলবেন না সার। এই কান মুলে বলছি, আজ থেকে ও-লাইন ছেড়ে দিচ্ছি একেবারে!"

কাকাবাবু বললেন, "এর মধ্যেই ভাল ছেলে! দেশের কী অবস্থা, চোর-ডাকাতরাও শারীরচর্চা করে না! তোমার বাড়িতে কে-কে আছেন?"

অংশু সংক্ষেপে তার জীবনকাহিনী জানাল।

সে একজন ছুতোর মিস্তিরির ছেলে। মা সবসময় অসুস্থ থাকে, বাড়িতে সাতটি ভাইবোন। অভাবের সংসার। সে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। কোনও চাকরি পায়নি। বাড়ির কাছেই একটা বস্তির কিছু ছেলে তাকে ডাকাতির লাইনে নিয়ে এসেছে। এর আগে দু'বার ট্রেন-ডাকাতি করেছে, ধরা পড়েনি।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "তা হলে তো তোমাকে ঠিক বেকার বলা যায় না। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছ, কে চাকরি দেবে? ছুতোর মিস্তিরির ছেলে, তুমি বাবার কাছ থেকে কাজ শেখোনি কেন? কাঠের কাজের খুব ডিমান্ড, অনেক পয়সা রোজগার করা যায়। কেন সে-কাজ শেখোনি?"

অংশু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "ভাল লাগেনি সার।"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "আসলে তুমি একটা বখা ছেলে। বাজে বন্ধুদের পাল্লায় পড়েছিলে। ভেবেছিলে ডাকাতি করাটাই সহজ। কম পরিশ্রমে বেশি টাকা। ধরা পড়লে পুলিশ মারতে-মারতে হাত-পা ভেঙে দেয় না? এই সন্তুই তোমার একখানা হাত ভেঙে দিতে পারত। ওই পাইপগান দিয়ে কখনও কোনও লোককে গুলি করেছ?"

অংশু দাঁড়িয়ে উঠে কাকাবাবুর পা ছুঁতে গিয়ে বলল, "না সার, কখনও মানুষ মারিনি, বিশ্বাস করুন, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।"

কাকাবাবু আবার ধমক দিয়ে বললেন, "পা ছুঁতে হবে না, বলো! তোমাকে আমি একটা চাকরি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব, তুমি ঠিক পথে থাকতে পারো কি না। আপাতত তোমাকে আমাদের সঙ্গে অনেকদূরে যেতে হবে। রাত্তিরে যখন আমরা ঘুমোব, তখন পালাবার চেষ্টা কোরো না, কোনও লাভ হবে না।"

জোজো বলল, "পালাতে গেলেই ওর একখানা হাত ভেঙে দেওয়া হবে। আমার ঘুম একবারে কুয়াশার মতন পাতলা।"

কাকাবাবু বললেন, "ডালিমবাবু, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। একই রাতে একই ট্রেনে পরপর দু'বার ডাকাত পড়ার কোনও বিশ্বরেকর্ড নেই!"

ডালিমবাবু তবু অংশুর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন, "তবু একে এতটা বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? যদি ঘুমের মধ্যে গলা টিপে ধরে? কথায় আছে, কয়লাকে একশোবার ধুলেও তার কালো রং যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "ও সত্যিই কয়লা, না ধুলো-ময়লা-মাখা এমনিই একটা পাথর, সেটা আগে জানা দরকার।"

বাকি পথটায় আর তেমন কিছু ঘটল না। সন্তু আর জোজো ভাগাভাগি করে রইল নীচের বার্থে, ওপরের একটা বার্থ ছেড়ে দেওয়া হল অংশুকে। টিকিট চেকার আসার পর অংশুর জন্য একটা টিকিট কাটা হল, চারজনের রাত্তিরের খাবার ভাগাভাগি করে খেল পাঁচজন। এমনকী অংশু একবার একলা বাথরুমে গেল, ফিরেও এল।

জব্বলপুর থেকে গাড়ি বদল করে সাতনা যেতে হবে। ডালিমকুমাররা সদলবলে থেকে গেলেন সেখানে। বিদায় নেওয়ার সময় ডালিমকুমার বারবার কাকাবাবু ও সন্তু-জোজোকে বলে গেলেন একবার তাঁদের যাত্রা দেখতে যাওয়ার জন্য। কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই যাব, অনেকদিন যাত্রা দেখিনি।"

সাতনা স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন কামালসাহেব। নরেন্দ্র ভার্মার কাছ থেকে তিনি টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

কাকাবাবু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কামাল আতাতুর্ক, কতদিন পর দেখা হল! আমিও এদিকে আসিনি এর মধ্যে, তুমিও কলকাতায় যাওনি।"

কামাল বললেন, "আমি দু'বার গিয়েছিলাম কলকাতায়। আপনার খোঁজ করেছি, দু'বারই আপনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন!"

কাকাবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, "এই আমার ভাইপো সন্তু, ওর বন্ধু জোজো। আর অংশু নামে এই ছেলেটি আমাদের পথের সঙ্গী।"

কামালসাহেবের চেহারাটি দেখবার মতন। ছ' ফুটের বেশি লম্বা, বুকখানা যেন শক্ত পাথরের তৈরি, গায়ের রং বেশ ফরসা। হঠাৎ দেখলে বাঙালি বলে মনেই হয় না। অতবড় শরীর হলেও চোখ দুটি খুব কোমল।"

তাঁর ডান দিকের ভুরুর ওপর একটা গভীর কাটা দাগ। ভুরুর খানিকটা উঠেই গেছে। সেদিকে তাকিয়ে খানিকটা অবাক হয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার চোখের ওপরে ওটা কী হয়েছে? আগে তো দেখিনি।"

কামাল বললেন, "ও একটা ব্যাপার হয়েছে কিছুদিন আগে। আপনাকে পরে বলব।"

সবাইকে বাইরে এনে একটা স্টেশান ওয়াগনে তুললেন কামালসাহেব। নিজেই সেটা চালাতে-চালাতে বললেন, "আমার বাড়িতে অনেক জায়গা আছে, আপনারা সেখানেই থাকতে পারতেন। কিন্তু নরেন্দ্র ভার্মা জানিয়েছেন, "আপনারা গেস্ট হাউসে থাকতে চান। তাও ঠিক করে রেখেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা করে আসব, একদিন তার হাতের রান্নাও খাব। তোমার বিয়ের সময় আমি আসতে পারিনি।"

কামাল বললেন, "আমার দুটি ছেলেমেয়ে, তাদেরও আপনি দেখেননি!"

সাতনা শহরটি ছোট হলেও মাঝখানের এলাকাটা বেশ ঘিঞ্জি। অনেক দোকানপাট। গাড়ি, টাঙ্গা, ঠেলাগাড়ি, স্কুটারের যানজট। সেই জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার পর রাস্তাটা ভারী মনোরম, দু'পাশে লম্বা-লম্বা গাছ।

একটা টিলার পাশে অতিথি ভবনটি ঠিক ক্যালেন্ডারের ছবির মতো। সামনে বাগান, ডানপাশে একটা ছোট নদী, কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই। এই বাড়িটি ফিকে নীল রঙের দোতলা,

দু' তলাতেই চওড়া বারান্দা। গেটের দু'পাশে দুটি মোটা-মোটা ইউক্যালিপটাস গাছ, সে-গাছের গুঁড়ির রং এমন ফরসা যে, মনে হয় সাহেব গাছ।

কামাল বললেন, "এখানেই আপনাদের জন্য রান্নাবান্নার সব ব্যবস্থা আছে। বাইরে যেতে হবে না। অবশ্য যখন ইচ্ছে বেড়াতে যেতে পারেন, সবসময় একটা গাড়ি থাকবে।"

একতলার বারান্দায় অনেক বেতের চেয়ার পাতা। কাকাবাবু একটা চেয়ারে বসে পড়ে আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আঃ! ভারী ভাল জায়গা। এখানে আমাকে কেউ চেনে না, কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। এখানে শুধু গল্প হবে। কামাল, তোমার কাছে আমরা গল্প শুনব।"

কামাল লাজুকভাবে হেসে বললেন, "আমি কি গল্প জানি!"

কাকাবাবু বললেন, "আফগানিস্তানের গল্প। এই ছেলেরা শুনতে চেয়েছে। এখন এককাপ করে চা খাওয়াও।"

কামাল গলা চড়িয়ে "ইউসুফ, ইউসুফ" বলে ডাকলেন।

একজন লোক এসে দাঁড়াল, তার মুখে ধপধপে সাদা দাড়ি, চুলও সব সাদা। দেখলে বুড়ো বলে মনে হলেও চেহারাটা বেশ শক্তপোক্ত, টানটান। লুঙ্গির ওপর ফতুয়া পরা।

কামাল বললেন, "এই হচ্ছে বিখ্যাত ইউসুফ মিঞা, এর হাতের রান্না খেলে আর ভুলতে পারবেন না। এটা তো কোল ইন্ডিয়ার গেস্ট হাউস, বড়-বড় সব অফিসাররা আসেন। তাঁরা ইউসুফের রান্না খেয়ে অনেক সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন।"

ইউসুফকে কাকাবাবু হাত তুলে সেলাম জানালেন।

কামাল হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "ইউসুফ, সাহেবরা তো এসে গেছেন। আজ কী খাওয়াবেন?"

ইউসুফ বললেন, "মোগলাই না ইংলিশ, কোন্‌টা খাবেন বলুন। বাঙালি রান্না ভাত, মাছের ঝোলও করে দিতে পারি।"

কাকাবাবু ছেলেদের দিকে তাকাতেই জোজো বলল, "মোগলাই!"

ইউসুফ বললেন, "তা হলে শাহি কাবাব, মুর্গ মশল্লা, বাদশাহি বিরিয়ানি, রোগন জুস, মটন কোপ্তা।"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "অত না, অত না। কোনও ভেজিটেব্‌ল নেই? আমি কোনও সব্‌জি বা তরকারি ছাড়া খেতে পারি না। এখন একটু চা দিন আমাদের।"

কামাল বললেন, "আপনাদের যা খেতে ইচ্ছে করে তাই-ই অর্ডার করবেন। নরেন্দ্র ভার্মা জানিয়েছেন, আপনাদের কোনও খরচ লাগবে না। সব তিনি দেবেন। যতদিন ইচ্ছে থাকবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এ যে দেখছি তোফা ব্যবস্থা। বহুদিন এরকম ছুটি কাটাইনি। কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। কামাল, এখান থেকে পান্না কতদূরে?"

কামাল বললেন, "বেশিদূর নয়। গাড়িতে নিয়ে যাব একদিন।"

কাকাবাবু বললেন, "জানিস সন্তু, এখানে পান্না নামে যে জায়গাটা আছে—"

কাকাবাবু শেষ করার আগেই সন্তু বলল, "পান্নায় হিরের খনি আছে। ভারতের একমাত্র হিরের খনি!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। সেখানকার মাঠে-মাঠে ঘুরলেও হঠাৎ একটা হিরে পাওয়া যেতে পারে। দ্যাখ যদি তোরা হিরে আবিষ্কার করে ফেলতে পারিস।"

জোজো উৎসাহের সঙ্গে বলল, "সেখানে কবে যাব?"

কাকাবাবু বললেন, "আজ বিশ্রাম। আজ কোথাও না।"

ইউসুফ একটা ট্রেতে সাজিয়ে পাঁচকাপ চা নিয়ে এলেন। কাকাবাবু একটা কাপ তুলে চুমুক দিয়েই বললেন, "এ কী, এ যে দেখছি বাদশাহি চা! শুধু দুধে তৈরি, এলাচ-দারচিনিরও গন্ধ আছে।"

কামাল বললেন, "আপনাদের জন্য স্পেশ্যাল।"

কাকাবাবু বললেন, "ইউসুফসাহেব, এতসব বাদশাহি খানাপিনা আমাদের সহ্য হবে না। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাকে খুব কম দুধ-চিনি দিয়ে পাতলা চা দেবে। আমি ঘন-ঘন চা-কফি খাই।"

কামাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনারা তা হলে এখন বিশ্রাম নিন। আমি সন্ধের দিকে আসব।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই ভাল, সন্ধের পরই গল্প জমে। আর হ্যাঁ, ভাল কথা। এই অংশু নামের ছেলেটিকে একটা চাকরি দিতে হবে, একটু খোঁজখবর নিয়ো তো!"

অংশু চা শেষ করে বাগানে ঘুরছে। কামাল চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু ডাকলেন, "অংশু, অংশু!"

অংশু সাড়া দিল না।

কাকাবাবু আবার ডাকলেন, "ও অংশু, এখানে একবার এসো, একটা কথা শুনে যাও!"

অংশু তবু ফিরে তাকাল না।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী ব্যাপার, ও শুনতে পাচ্ছে না?"

জোজো বলল, "বুঝতে পারছেন না, ওর নাম অংশু নয়। আমাদের কাছে মিথ্যে নাম বলেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? সন্তু, ওকে ডেকে আন তো।"

সন্তু দৌড়ে গিয়ে ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, "তোমায় অংশু, অংশু বলে ডাকছিলাম, তুমি শুনতে পাওনি?"

ছেলেটি বলল, "আপনি যেন কাকে ডাকছিলেন, আমি বুঝতে পারিনি যে আমাকেই ..."

হঠাৎ সে থেমে গেল। কেমন যেন করুণ হয়ে গেল মুখের চেহারা। তারপরে আস্তে-আস্তে বলল, "অনেকদিন আমায় কেউ ওই নামে ডাকেনি, সবাই হেবো-হেবো বলে, আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমায় কেউ ভাল নামে ডাকে না?"

অংশু বলল, "না সার। পুলিশের লোকও আমাকে ওই নামেই জানে।"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ভাল নাম যখন রয়েছে, তখন কেউ সে-নামে ডাকবে না, এ ভারী অন্যায়। এখন থেকে তুমি আর হেবো নও, এখানে তোমার ও-নাম কেউ জানে না। এখন থেকে তুমি অংশু। নিজের মনে-মনে বারবার বলবে, আমি অংশু, আমি অংশু। আমার নতুন জীবন শুরু হচ্ছে।"

অংশু মাথা চুলকে বলল, "সার, আপনি আমাকে একটা চাকরি দেবেন বলেছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কথা পরে হবে। তোমার পুরো নাম অংশুমালী। এ-নামের মানে জানো?"

অংশু কাঁচুমাচু ভাবে বলল, "আগে জানতাম বোধ হয়। এখন ভুলে গেছি!"

কাকাবাবু বললেন, "কী কাণ্ড, একজন মানুষ নিজের নামের মানেই জানে না!"

কাকাবাবু জোজো আর সন্তুর মুখের দিকে তাকালেন।

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "অংশু মানে চাঁদ।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আন্দাজে ঢিল মেরেছ। হয়নি কিন্তু। অংশু মানে কিরণ বা রশ্মি। অংশুমালী মানে যার কিরণ বা রশ্মি আছে। চাঁদের কি নিজস্ব রশ্মি বা আলো আছে? সূর্যের আলো চাঁদের পাথরে গিয়ে ঠিকরে পড়ে, তাই আমরা চাঁদের আলো দেখি।"

সন্তু বলল, "অংশুমালী মানে সূর্য। জ্যোতির্ময়।"

কাকাবাবু বললেন, "ওহে অংশু, আর যেন ভুলে যেয়ো না। তুমি হেবো নও, তুমি অংশুমালী, তোমার নামের মানে সূর্য। আচ্ছা অংশু, তুমি কখনও কবিতা লিখেছ ?"

অংশু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কী বললেন সার ?"

জোজো হো-হো করে হেসে উঠল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি হাসলে কেন জোজো ?"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি মাঝে-মাঝে এমন সব অদ্ভুত কথা বলেন! যে ট্রেনে ডাকাতি করত, সে কবিতা লিখবে ? কবিরা কখনও ডাকাত হয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "কবিরা ডাকাত হয় না বটে, কিন্তু কোনও ডাকাত যদি ডাকাতি ছেড়ে দেয়, তা হলে সে কবি হতে পারে। কী, পারে না ? আমাদের দেশে একজন ডাকাত মহাকবি হননি ?"

সন্তু কিছু বলতে যেতেই জোজো তার মুখ চেপে ধরে বলল, "এই, তুই সব বলবি কেন রে ? এটা আমি জানি। রত্নাকর থেকে বাল্মীকি !"

কাকাবাবু বললেন, "তবে ? শোনো অংশু, তোমাকে চাকরির জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমি যখন কথা দিয়েছি, এখানেই তোমার একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যাবে !"

অংশু ফ্যাকাসে মুখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "এখানে ? না, না সার, এতদূরে আমি চাকরি করতে পারব না !"

কাকাবাবু বললেন, "কেন পারবে না ? পঞ্জাবিরা পঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসে কতরকম কাজ করে। উত্তরবঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে দেখবে একজন মাড়োয়ারি দোকান খুলে বসে আছে। গুজরাতিরা আফ্রিকায় ব্যবসা করতে যায়। আর বাঙালিরা ঘরকুনো হয়ে বসে থাকবে ? এই দ্যাখো না, কামালও তো বাঙালি, সে এখানে থেকে গেছে।"

অংশু বলল, "আমি পারব না। আমার অসুবিধে আছে। বাড়িতে ছোট-ছোট ভাইবোন, তাদের টাকা দিয়ে আমি সাহায্য করি—"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ট্রেনে ডাকাতি করে তাদের টাকা দিয়েছ ?"

অংশু বলল, "হ্যাঁ, দিয়েছি।"

কাকাবাবুর মুখ এবার কৌতুকের হাসিতে ভরে গেল। তিনি বললেন, "এ যে দেখছি সত্যিই রত্নাকর! তুমি ভাইবোনদের কিংবা বাবা-মাকে বলেছ যে ডাকাতি করে টাকা রোজগার করো ?"

অংশু সবেগে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "যদি বলতে, দেখতে, ওরা তোমাকে ঘেন্না করত! যাই হোক, তোমাকে এখানেই চাকরি করতে হবে। যদি না চাও, তা হলে তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। কোনটা চাও, বেছে নাও।"

অংশু চুপ করে রইল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "তার আগে কিছুদিন তোমাকে পরীক্ষা করা দরকার। তোমার স্বভাব শুধরেছে কিনা সেটা জানতে হবে তো! সেইজন্য এক কাজ করো, তুমি কবিতা লিখতে শুরু করো।"

অংশু এবার রীতিমত ভয় পেয়ে দু' হাত নেড়ে বলতে লাগল, "পারব না সার। পারব না। কবিতা কাকে বলে আমি জানিই না !"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "আলবাৎ তোমাকে পারতেই হবে। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত যখন পড়েছ, তখন কবিতা পড়োনি ? শোনো, তোমাকে আমি একটা লাইন বলে দিচ্ছি। তুমি পরের লাইনটি মিলিয়ে লিখবে। 'বনের ধারে কেউ ডেকেছে, নাবছে দুটো উল্লুক', এর পরের লাইনটা তুমি ভাবো।"

জোজো বলল, "উল্লুকের সঙ্গে মেলাতে হবে। বেশ শক্ত আছে।"

কাকাবাবু জোজোকে বললেন, "এই, তোমরা কেউ কিছু বলবে না। ওকে সাহায্য করবে না। অংশু, তোমাকে আমি তিনদিন সময় দিলাম!"

॥ ৫ ॥

সন্ধের পর ওপরের বারান্দায় বসে শুরু হল গল্প।

চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। দুপুরে গরম ছিল, এখন শিরশিরে ভাব। এখানেও রয়েছে কতকগুলো বেতের চেয়ার। বাংলোটি সুন্দরভাবে সাজানো, কোনও কিছুরই অভাব নেই। কোল ইন্ডিয়ার অতিথি ছাড়া বাইরের লোকদের থাকতেই দেওয়া হয় না।

কাকাবাবু প্রথমে বললেন, "সন্তু আর জোজো আমার কী করে পা খোঁড়া হল, সেই ঘটনাটা শুনতে চেয়েছে। খুবই রোমহর্ষক ব্যাপার হয়েছিল। আমি সবটা নিজের মুখে বললে, হয়তো ওদের বিশ্বাস হত না। তাই কামাল আর আমি দু'জনে মিলে বলব। আমরা দু'জনে সেখানে একসঙ্গে ছিলাম।"

কামাল বললেন, "নরেন্দ্র ভার্মাও কিছুদিন ছিলেন, তারপর চলে এসেছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা তখন কাজ করতাম ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে। সরকার থেকে আমাদের আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছিল। কেন পাঠানো হয়েছিল, সেটা আগে বলব না। তার আগে একটু জিজ্ঞেস করে নিই, তোরা আফগানিস্তান সম্পর্কে কতটা জানিস। জোজো, তুমি তো তোমার বাবার সঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছ, আফগানিস্তানেও গিয়েছিলে কখনও?"

জোজো বলল, "না। আমার বাবা ঘুরে এসেছেন, সেবার একটুর জন্য আমার যাওয়া হল না!"

সন্তু বলল, "রবীন্দ্রনাথ 'কাবুলিওয়ালা' নামে একটা গল্প লিখেছেন, আমি সেটা পড়েছি।"

কামাল বললেন, "আহা, কী চমৎকার গল্প। কলকাতায় এক সময়ে অনেক কাবুলিওয়ালা দেখা যেত, এখনও কিছু-কিছু আছে। হিং, কিশমিশ, পেস্তা-বাদাম বিক্রি করত।"

কাকাবাবু বললেন, "কামাল, আমরা একটা জায়গায় পেস্তা-বাদাম গাছের প্রায় একটা বন দেখেছিলাম, মনে আছে?"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

জোজো বলল, "গোড়া থেকে বলুন। আপনারা কী করে গেলেন ও-দেশে?"

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে যাইনি। প্লেনে গিয়ে কাবুলে নেমেছিলাম। তখন অমৃতসর থেকে কাবুল পর্যন্ত প্লেন সার্ভিস ছিল। এখন আছে কি না জানি না। কাবুলে অবশ্য দু-একদিনের বেশি থাকিনি। তোরা আমুদরিয়া কাকে বলে জানিস?"

সন্তু বলল, "ভূগোলে পড়েছি। আমুদরিয়া আফগানিস্তানের একটা নদীর নাম।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই নদীর ধার দিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের যাত্রা।"

কামাল বললেন, "তখন তোমাদের এই কাকাবাবুর কী দারুণ স্বাস্থ্য ছিল। ঝকঝকে চেহারা। যেমন ঘোড়া ছোটাতে পারতেন, তেমনই বন্দুক-পিস্তল চালানো, এমনকী তলোয়ার খেলাতেও ওস্তাদ ছিলেন। রাজাসাহেব, আপনার মনে আছে, একবার আপনাকে তলোয়ার লড়তে হয়েছিল?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, খুব জোর বেঁচে গেছি। সেই লোকটির নাম ছিল জাভেদ দুরানি। আমাদের ইন্ডিয়ার ক্রিকেট টিমে একসময় সেলিম দুরানি নামে একজন খেলোয়াড় ছিল জানিস? সেও আসলে ছিল কাবুলি। আফগানিস্তানে অনেক দুরানি আছে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "তার সঙ্গে আপনার তলোয়ার লড়তে হয়েছিল কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সে যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল!"

কামাল বললেন, "রাজাসাহেব, আগেই ওটা বলে দিলে জমবে না। তার আগে একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাবুল থেকেই শুরু করা যাক। আমরা কাবুলে ছিলাম পাঁচদিন, সরকারি লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হল। আমাদের অভিযানের জন্য অনুমতি নেওয়ার দরকার ছিল। আগেই চিঠিপত্রে সব জানানো হয়েছিল অবশ্য। তবু একটা শর্তে আটকে গেল।"

কামাল বললেন, "সেই সময় নরেন্দ্র ভার্মা চলে এলেন দিল্লি থেকে। উনি কাজ করতেন হোম ডিপার্টমেন্টে। ওঁর অনেক ক্ষমতা। তা ছাড়া নরেন্দ্র ভার্মা তুখোড় লোক, অচেনা মানুষের সঙ্গে নিমেষে ভাব জমিয়ে ফেলতে পারেন। কাবুলের যে দু'জন সরকারি অফিসার শর্তের খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের যাওয়া আটকে দিয়েছিলেন, সেই দু'জনকে নরেন্দ্র ভার্মা একদিন রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন ভারতীয় দূতাবাসে। আমাকে আগের দিন বললেন, 'ওদের শুধু পেটভরে নয়, প্রাণভরে খাওয়াতে হবে। এমন রান্না হবে, যা ওরা জীবনে খায়নি। কামাল, তুমি হরিণের দুধ জোগাড় করতে পারবে? আর কচি ভেড়ার মাংস। সেই ভেড়ার বয়েস এক মাসের বেশি হলে চলবে না।'"

কাকাবাবু বললেন, "কামালকে তুমি যা বলবে, ও ঠিক জোগাড় করে আনবে।"

কামাল বললেন, "কচি ভেড়ার মাংস জোগাড় করা শক্ত কিছু নয়। ওখানকার গ্রামের দিকে অনেকেই ভেড়া চরায়। বেশি দাম দিয়ে একটা বাচ্চা ভেড়া কিনে ফেললাম। কিন্তু হরিণের দুধ পাই কোথায়? জঙ্গলে গিয়ে তো হরিণ ধরতে পারি না। ধরলেও সেই হরিণের যে দুধ থাকবে, তার কোনও মানে নেই। আমি তখন কাবুল শহরের চিড়িয়াখানায় অনেকক্ষণ ঘুরলাম। সেখানে অনেকরকম হরিণ আছে, সেখানে একটা হরিণীর সদ্য বাচ্চাও হয়েছে দেখা গেল। কিন্তু তার দুধ নেব কী করে? একজন পাহারাদারকে কথাটা বলতেই সে এমন কটমট করে তাকাল, যেন মেরেই ফেলবে। এর পর একটাই উপায় আছে। আমি রাত্তিরবেলা চিড়িয়াখানার পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লাম চুপিচুপি। সঙ্গে নিয়েছিলাম একটা বদনা। টর্চের আলোয় হরিণীটাকেও খুঁজে পেলাম, কিন্তু দুধ দুইতে গেলেই চ্যাঁচাবে। কোনওক্রমে রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেললাম তার মুখ। পেছনের পা দুটোও বাঁধতে হল। তারপর এক বদনা ভর্তি দুধ দুয়ে নিলাম। ওরই মধ্যে হরিণীটা শিং দিয়ে একবার ঢুঁ মেরেছিল আমার পেটে। আর একটু হলে পেটটা ফুটো হয়ে যেত!"

কাকাবাবু বললেন, "আঃ, কী অপূর্ব রান্না হয়েছিল! এখনও জিভে লেগে আছে সেই স্বাদ। জল দেওয়াই হয়নি। শুধু দুধ দিয়ে রান্না করা নরম তুলতুলে মাংস, অসম্ভব ঝাল। তাই খেয়ে অফিসার দু'জন যাকে বলে কুপোকাত। পরদিনই অনুমতি পাওয়া গেল।"

কামাল বললেন, "নরেন্দ্র ভার্মা আমাদের সঙ্গে গেলেন না, তিনি ফিরে এলেন দিল্লিতে। আমরা দু'জনেই শুধু যাব শুনে অনেকে আমাদের নিষেধ করেছিল, ভয় দেখিয়েছিল। ও-পথে খুব ডাকাতের উৎপাত। কিন্তু তখন আমাদের কম বয়েস, বিপদ-টিপদ গ্রাহ্য করি না, বিপদের কথা শুনলে রক্ত আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আমাদের দেশে এত জায়গা থাকতে

আপনারা আফগানিস্তানে অভিযানে গেলেন কেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে একটু ইতিহাসের কথা বলতে হয়।”

জোজো বলল, “এই রে, হিস্ট্রি আমার খুব বোরিং লাগে, বড্ড সাল-তারিখ মুখস্থ রাখতে হয়।”

সন্তু বলল, “আমার কিন্তু ইতিহাস বেশ ভাল লাগে।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে, খুব সংক্ষেপে বলব। যাতে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। সাল-তারিখও মনে রাখতে হবে না। আফগানিস্তান দেশটা যদিও পাহাড় আর মরুভূমিতে ভরা, আর বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য দেশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য বারবার বিদেশিরা এই দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। গ্রিস থেকে আলেকজান্ডার এসে আফগানিস্তান জয় করে ভারতের দিকে এগিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রিস সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। ভারতে তখন মৌর্য বংশের রাজারা খুব ক্ষমতাশালী, তাঁরা আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পাহাড় পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সম্রাট অশোকের সময়ও এ-দেশটা তাঁর অধীনে ছিল। এরপর কুশান নামে এক দুর্ধর্ষ জাত মধ্য এশিয়া থেকে এসে অনেক দেশ জয় করে নেয়। কুশানদের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাটের নাম কনিষ্ক।”

জোজো বলে উঠল, “মুণ্ডুকাটা কনিষ্ক !”

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “ইতিহাসের বইতে তাঁর মুণ্ডু ভাঙা মূর্তির ছবি থাকে শুধু। কিন্তু তাঁর মুণ্ডু কেউ-কেউ দেখেছে। সন্তু, তোর মনে আছে ; সেই যে কাশ্মিরে—”

সন্তু বলল, “বাঃ, মনে থাকবে না ? সেবারই তো আমি প্রথম তোমার সঙ্গে গেলাম।”

কাকাবাবু বললেন, “সে যাই হোক, সম্রাট কনিষ্কের রাজ্য ওদিকে তো অনেকখানি ছিলই, ভারতের মধ্যেও মথুরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এর পরের ইতিহাস আর আমাদের জানার দরকার নেই। কনিষ্কের আমলে আফগানিস্তানের অনেক উন্নতি হয়েছিল, তখনকার কিছু-কিছু ব্যাপার এখনও অজানা রহস্য রয়ে গেছে। সেইরকমই একটা কিছুর খোঁজে আমাদের যেতে হয়েছিল।”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “একটা কিছু মানে কী ?”

কাকাবাবু বললেন, “সেটা যথাসময়ে জানতে পারবে।”

কামাল বললেন, “কাবুল থেকে আমরা একটা জিপগাড়িতে পৌঁছে গেলাম ফৈজাবাদ। সেটা খুব ছোট শহর। সেখান থেকে আমাদের ঘোড়া ভাড়া নিতে হল। সঙ্গে অস্ত্র রাখতে হয়েছিল, আমার কাছে একটা রাইফেল, রাজাসাহেবের কাছে একটা রিভলভার।”

কাকাবাবু বললেন, “কামাল, তুমি আমাকে বারবার রাজাসাহেব, রাজাসাহেব বলছ কেন ? শুনলে অন্য কেউ ভাববে, আমি বুঝি সত্যি কোনও রাজা। তুমি তো আগে আমাকে শুধু দাদা বলতে !”

কামাল বললেন, “ঠিক আছে, দাদাই বলব, দাদার তখন কী সুন্দর চেহারা ছিল, সবাই দেখলেই খাতির করত। আমরা সঙ্গে অনেক খাবারদাবার নিয়েছিলাম, শুকনো ফলই বেশি, আখরোট, পিস্টাশিও, কিশমিশ, খেজুর এইসব। কোথায় কী জুটবে তার ঠিক নেই। পাহাড় আর জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে চলেছে আমুদরিয়া নদী, মাইলের পর মাইল কোনও জনবসতি নেই।”

জোজো বলল, “সেই তলোয়ারের যুদ্ধটা হল কোথায় ? কাকাবাবুর সঙ্গে কি তলোয়ারও ছিল ?”

সন্তু বলল, “আঃ জোজো, তোর একদম ধৈর্য নেই। চুপ করে শোন না !”

কাকাবাবু বললেন, “আচ্ছা কামাল, সেই বাঘটা আমরা দেখেছিলাম কবে ? প্রথম দিনই ?”

কামাল বললেন, “না, দাদা। সেটা তো তৃতীয় দিন। প্রথম দিন শুধু পিঁপড়ে।”

কাকাবাবু বললেন, “ওরেবাব্বা, সেরকম পিঁপড়ে জীবনে দেখিনি ! বাঘের থেকে কম ভয়ঙ্কর নয়। সন্তু, তোর মনে আছে, একবার মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে আমরা পিঁপড়ের পাল্লায় পড়েছিলাম ? সে-পিঁপড়েও আফগানিস্তানের পিঁপড়ের তুলনায় কিছুই নয়।”

কামাল বললেন, “প্রথম দিনটায় কিছুই ঘটেনি। শুধু আমাদের আস্তে-আস্তে এগোতে হচ্ছিল। পাহাড়ি রাস্তায় তো জোরে ঘোড়া ছোটাবার উপায় নেই। সন্ধের সময় আমরা নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে নিলাম বিশ্রামের জন্য।”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “আপনাদের সঙ্গে তাঁবুও ছিল ?”

কামাল বললেন, “ছোট্ট নাইলনের হালকা তাঁবু। শুধু মাথা গোঁজবার জন্য। আফগানিস্তানে শীতকালে খুব শীত, আর গরম কালে খুব গরম। তখন ছিল গরমকাল। কম্বল-টম্বল নিতে হয়নি। বৃষ্টিও হয় খুব কম। পাথর দিয়ে উনুন বানিয়ে আমরা রুটিও সেঁকে নিয়েছিলাম। রুটি আর খেজুর, চমৎকার খাওয়া হল। একসময় ঘুমিয়েও পড়লাম। মাঝরাত্তিরে আক্রমণ করল পিঁপড়ে।”

কাকাবাবু বললেন, “হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ পিঁপড়ে। লাল লাল রং, এক-একটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, তাদের কামড়ে সাঙ্ঘাতিক বিষ। যন্ত্রণার চোটে আমরা নাচতে শুরু করেছিলাম। শেষপর্যন্ত আমরা ঝাঁপ দিলাম নদীতে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখলাম জলে।”

কামাল বললেন, “দ্বিতীয় রাতে কিন্তু কিছুই হয়নি। পিঁপড়ে-টিপড়ে ছিল না, পরিষ্কার জায়গা। খুব ভাল ঘুমিয়ে ছিলাম।”

অংশু একটু দূরে একেবারে চুপচাপ বসে আছে, একটি কথাও বলেনি। কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী অংশু, শুনছ তো ? ভাল লাগছে ?”

অংশু শুকনো গলায় বলল, “হ্যাঁ সার।”

জোজো চুপিচুপি সন্তুকে বলল, “ও বেচারা কবিতার দ্বিতীয় লাইন ভেবে-ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছে !”

কামাল বললেন,“তৃতীয় দিন দিনের বেলাতেই আমরা বাঘটাকে দেখলাম। আমরা তখন একটা টিলার ওপরে—”

সন্তু খানিকটা সন্দেহের সুরে বলল, “আফগানিস্তানে বাঘ আছে ?”

কাকাবাবু বললেন, “থাকবার কথা নয়। এককালে এই আমুদরিয়া নদীর ধারে-ধারে এক ধরনের বাঘ ছিল, তাদের বলা হত সাইবেরিয়ান টাইগার। সবাই জানে, তারা সব লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা চোখের সামনে একটাকে দেখলাম। নিশ্চয়ই দুটো-একটা তখনও রয়ে গিয়েছিল। মুখে ঝাঁটার মতন মস্ত গোঁফ, পিঠটা উঁচুমতন। আমরা তখন একটা টিলার চূড়া পেরিয়ে অনেকটা নেমে এসেছি, এই সময় একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাঘটা, আমাদের দেখে লেজ আছড়াতে লাগল। আমরা যদিও ওপরের দিকে আছি, বাঘটা লাফিয়ে আমাদের ধরতে পারবে না। কিন্তু আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হলে পেছন ফিরতেই হবে, তখন যদি ও তেড়ে আসে ?”

জোজো বলল, “আপনাদের সঙ্গে তো রাইফেল ছিল ?”

কাকাবাবু বললেন, “তা ছিল। কিন্তু সাইবেরিয়ান টাইগার দুর্লভ প্রাণী, তাকে মারব ? ও আমাদের একবার দেখে ফেলেছে, এদিকে মানুষ খুব কমই যাতায়াত করে, আমাদের দেখে ও লোভ সামলাবে কী করে ? শেষপর্যন্ত কামালই একটা ব্যবস্থা করল।”

কামাল বললেন, “কেন ও-কথা বলছেন দাদা ? বাঘটাকে

দেখে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। হিংস্রভাবে গরগর শব্দ করতে-করতে ল্যাজ আছড়াতে দেখলেই মনে হয়, এবার আর নিষ্কৃতি নেই। তখন তোমাদের কাকাবাবু আমার হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে বললেন, 'কামাল, তুমি টিলাটার ওপর দিকে চলে যাও, আমি একে সামলাচ্ছি।' উনি পরপর দুটি গুলি করলেন, একটাও বাঘটার গায়ে লাগল না, পাথরের বলটা ছিটকে গেল। বাঘটা অবশ্য একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। তখন আমি ভেবেছিলাম, রাজা রায়চৌধুরীর হাতে টিপ নেই, নতুন বন্দুক চালাতে শিখেছেন। পরে বুঝেছি, উনি ইচ্ছে করে বাঘটাকে মারেননি।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "বাঘটা তো আমাদের আক্রমণ করেনি, শুধু ল্যাজ আছড়েছিল। হয়তো বাঘটাও আমাদের দেখে অবাক হয়েছিল। ওর ঠিক কানের কাছে গুলি চালিয়েছিলাম।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "বাঘটা আর ফিরে আসেনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ! তার আগেই যে অন্য একটা ঘটনা ঘটল। গুলি না চালিয়েই বাঘটাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। পাহাড়ে গুলির শব্দ অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যায়। আমার সেই গুলির শব্দ শুনে চলে এল একটা ডাকাতের দল।"

কামাল বললেন, "ওরা ছ-সাতজন ছিল। আমরা বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগই পেলাম না। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক, চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল আমাদের।"

জোজো বলল, "এ যে ওয়েস্টার্ন ফিল্মের মতন !"

বাংলোর সামনে একটা জিপ এসে থামল। তার থেকে দু'জন লোক নেমে চিৎকার করল, "চৌকিদার ? কেয়ারটেকার !"

গল্পে বাধা পড়ল। কামালসাহেব উঠে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে নীচে উঁকি মারলেন।

গেটের কাছে একজন চৌকিদার সবসময় থাকে, সে এখন নেই। ওই লোকদের হাঁকডাক শুনে বেরিয়ে এলেন ইউসুফ বাবুর্চি।

একজন লোক তাকে বলল, "এখানে ঘর খালি আছে ? একটা ঘর খুলে দাও !"

ইউসুফ বললেন, "এখানে তো রিজার্ভেশান ছাড়া কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না।"

লোকটি রুক্ষস্বরে বলল, "আমাদের রিজার্ভেশান আছে কি নেই তা তুমি জানছ কী করে ? আগে ঘর খোলো !"

ইউসুফ বললেন, "ঘর তো খালি নেই। আজই একটি পার্টি এসেছে।"

অন্য লোকটি বলল, "ঘর খালি নেই ? ঠিক আছে, আমরা বারান্দায় বসছি, আমাদের চা করে দাও। আর চটপট রুটি-মাংস বানিয়ে দাও, আমরা নিয়ে যাব।"

ইউসুফ বললেন, "মাফ করবেন সার। এখানে বাইরের লোকদের খাবার দেওয়ার নিয়ম নেই।"

লোকটি দু'খানা একশো টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, "বেশি কথা বোলো না, এই নাও, যা বলছি করে দাও !"

ইউসুফ বললেন, "আমি পারব না। আপনারা বরং ডান দিকে এক কিলোমিটার চলে যান, সেখানে হোটেল আছে। খাবারদাবার সব পাবেন।"

একজন লোক এবার ইউসুফ মিঞার গলা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কোথায় আমরা যাব না যাব, তা তোমার কাছে কে শুনতে চেয়েছে ? মারব এক থাপ্পড় !"

কামাল একবার ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, "ও কী হচ্ছে, ওকে ছেড়ে দিন !"

সন্তু দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

লোক দুটি কামালের কথা গ্রাহ্যই করল না। একজন ইউসুফকে চুলের মুঠি ধরে বলল, "আমাদের চিনিস না ? মুখে-মুখে কথা ! টাকা দেব, খাবার তৈরি করে দিবি।"

কাকাবাবুও উঠে এসে রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, "লোকদুটি তো বড় বেয়াদপ। শুধু-শুধু ইউসুফকে মারছে !"

সন্তু ততক্ষণে নীচে পৌঁছে গেছে। ইউসুফের কাছে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে লোক দু'টিকে বলল, "ওকে ছেড়ে দিন।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু একা পারবে না। কামাল, তুমি নীচে গিয়ে লোক দুটিকে ধরো।"

এবার ওদের একজন টর্চের আলো ফেলল দোতলায়।

অন্যজন অস্ফুট স্বরে বলল, "ও কে ? রাজা রায়চৌধুরী না ?"

অন্য লোকটি বলল, "হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।"

ইউসুফকে ছেড়ে দিয়ে ওরা দ্রুত ফিরে গেল জিপগাড়িটার দিকে। কামাল নীচে পৌঁছবার আগেই ওরা স্টার্ট দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল !"

কামাল বিরক্তভাবে বললেন, "চৌকিদার গেল কোথায় ? ইউসুফ, তুমি বেরোতে গেলে কেন ? বাইরের লোক ডাকাডাকি করলেও তুমি বেরোবে না।"

ইউসুফ আস্তে-আস্তে বললেন, "এইসব লোক, বেআইনিভাবে পয়সা রোজগার করে, আর সব জায়গায় গায়ের জোর ফলায়।"

সন্তু আর কামাল ফিরে এলেন দোতলায়।

জোজো বলল, "ওরা কাকাবাবুকে দেখেই ভয়ে পালাল।"

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "ব্যাপারটা ভাল হল না রে জোজো। আমি ভেবেছিলাম, এই সাতনার মতন জায়গায় আমাকে কেউ চিনবে না।"

কামাল বললেন, "সত্যিই তো, চিনল কী করে ? এখানে আপনি অনেকদিন আসেননি। এখানে হিরের খনি আছে, অনেকরকম ব্যবসা শুরু হচ্ছে, তাই গুণ্ডা-বদমাশদের উৎপাত বাড়ছে। লোক দুটোর ব্যবহার টিপিক্যাল গুণ্ডার মতন।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন আগে সূরযপ্রসাদ নামে একটা লোক আমার কাছে জব্দ হয়েছিল। খাজুরাহো মন্দিরের মূর্তি ভেঙে-ভেঙে বিক্রি করা ছিল তার কাজ। ফাঁদে ফেলে তাকে আমি ধরেছিলাম। খুব একটা শাস্তি দিইনি। মূর্তিগুলো সব উদ্ধার করার পর সে আমার সামনে নাকে খত দিয়েছিল, তারপর তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

কামাল বললেন, "এই তো আপনার দোষ ! আপনার দয়ার শরীর, আপনি ক্ষমা করে দেন। তারা কিন্তু আপনার শত্রুই থেকে যায়।"

কাকাবাবু অংশুর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "না, তা নয়। অনেক সময় ক্ষমা করে দিলে তারা ভাল হয়ে যায়।"

কামাল বললেন, "ওই সূরযপ্রসাদ তো কুখ্যাত অপরাধী। চোরাচালান, মানুষ খুন, কিছুই বাকি রাখেনি। পুলিশের হাত থেকে দু'বার পালিয়েছে। আপনি ক্ষমা করে দিলেও সে একটুও শোধরায়নি। এখন তার মস্তবড় দল। তবে শুনেছি, তার নিজেরই দলের একজন লোক তার তলপেটে একবার ছুরি মেরেছিল, তাতেও সে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু শরীর ভেঙে গেছে। নিজে আর বেরুতে পারে না। কোনও জায়গায় লুকিয়ে থেকে সে দল চালায়। এ-লোকগুলো সূরযপ্রসাদের দলের লোক হতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আর কী করা যাবে ?"

কামাল বললেন, "সূরযপ্রসাদকে আপনি নাক-খত দিয়েছিলেন, সেই অপমানের সে শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে না ? যখন সে শুনবে আপনি এখানে এসেছেন ... আমার মনে হচ্ছে দাদা, ওই লোক দুটো দলবল নিয়ে ফিরে আসবে, এখানে হামলা করবে !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো আর ওদের ঘাঁটাতে যাচ্ছি না।

এখানে আমি গুণ্ডা দমন করতে আসিনি, এসেছি বিশ্রাম নিতে।"

কামাল জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহুঃ, ভাল বুঝছি না। এখানকার চৌকিদার তো দেখছি অপদার্থ। পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। নরেন্দ্র ভার্মা আমার ওপর আপনাদের দেখাশুনোর দায়িত্ব দিয়েছেন।"

জোজো বলল, "গল্পটার কী হল? তারপর আফগানিস্তানের গল্পটা বলুন। ডাকাতের দল আপনাদের ঘিরে ধরেছিল—"

কামাল বললেন, "এখন তো আর গল্প হবে না ভাইটি। আমার এখনই থানায় যাওয়া দরকার। যদি রাত্তিরেই ওরা ফিরে আসে?"

কামাল উঠে দাঁড়ালেন।

কাকাবাবু বললেন, "ভেবেছিলাম এখানে নিরিবিলিতে শান্তিতে থাকব। তা নয়, এর মধ্যে এসে গেল গুণ্ডা, তার ওপর পুলিশ। গল্পটা মাটি হয়ে গেল। তুমি যাও বঙ্গে, কপাল তোমার সঙ্গে! অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়!"

॥ ৬ ॥

সকালবেলা চা খেতে-খেতে কাকাবাবু অংশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে, কবিতা মেলাতে পারলে?"

অংশু কাঁচুমাচুভাবে বলল, "আমার দ্বারা হবে না সার। আমার সাতপুরুষে কেউ কখনও ও-কর্ম করেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কী করে জানলে? সাতপুরুষের সকলের কথা জানো? তোমার বাবা ছুতোর মিস্তিরি, ঠাকুর্দা কী ছিলেন? ঠাকুর্দার বাবা?"

অংশু বলল, "আমার ঠাকুর্দাকে আমি কখনও চোখেই দেখিনি। আগে আমাদের মেদিনীপুরের কোনও গ্রামে বাড়ি ছিল, বাবা চলে এসেছিলেন সোদপুরে।"

কাকাবাবু বললেন, "মেদিনীপুরের গ্রামে তোমার ঠাকুর্দা হয়তো কবিয়াল ছিলেন। অনেক ছুতোর মিস্তিরি, নৌকোর মাঝি, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান নিজেরা গান বানান। পোস্ট অফিসের এক পিওনের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক গান শিখেছিলেন, তা জানো?"

অংশু এসব কথায় কান না দিয়ে মুখ গোঁজ করে বলল, "তা যাই বলুন সার, কবিতা-ফবিতা আমি পারব না। আপনি আমাকে মাটি কাটতে বলুন, কাঠ কাটতে বলুন, কুয়ো থেকে জল তুলতে বলুন, সব পারব। শুধু কবিতা-ফবিতা, না, অসম্ভব, অসম্ভব!"

কাকাবাবু বললেন, "ফবিতা জিনিসটা কী আমি জানি না। সেটা আমিও পারব না। কিন্তু একটু মাথা খাটালে সবাই কবিতা মেলাতে পারে। শোনো, তোমাকে ছাড়া হবে না। যতক্ষণ না মেলাতে পারছ, ততক্ষণ চাকরি হবে না। এখান থেকে পালাতেও পারবে না। ভাবো, ভাবো। লাইনটা মনে আছে তো? 'বনের ধারে ফেউ ডেকেছে নাচছে দুটো উল্লুক'।"

অংশু বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে। ফেউ মানে কী সার?"

কাকাবাবু বললেন, "শেয়াল। শেয়ালের ডাক।"

অংশু বলল, "শেয়াল তো হুক্কা-হুয়া করে ডাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক। সন্ধে হলেই শেয়াল হুক্কা-হুয়া করে ডাকে। কিন্তু কাছাকাছি যদি বাঘ দেখা যায়, অমনই শেয়ালের গলা পালটে যায়। ভয়ের চোটে ডাকে ফেউ-ফেউ।"

অংশু জিজ্ঞেস করল, "এ-লাইনটা আপনি বানিয়েছেন, না কোনও বই থেকে নিয়েছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বানিয়েছি। কেন, আমি বানাতে পারি না? তুমিও পারবে।"

অংশু উঠে বাগানে চলে গেল।

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি বেচারাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছেন। কবিতা মেলাতে হবে ভেবে-ভেবে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে।"

সন্তু বলল, "প্রথমবারেই বড্ড শক্ত হয়ে গেল ওর পক্ষে। আর-একটু সোজা দিলে পারতেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এমন কিছু শক্ত না!"

জোজো বলল, "আমি এক মিনিটে মিলিয়ে দিতে পারি। বলব?"

কাকাবাবু বললেন, "খবর্দার না। তোমরা কেউ কিচ্ছু বলবে না।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, অংশু একটা জামা আর প্যান্ট পরে আছে। আমাদের জামা-প্যান্ট ওর লাগবে না, ও বেশি লম্বা। ও কি দিনের পর দিন ওই এক জামা-প্যান্ট পরে থাকবে? গা দিয়ে গন্ধ বেরোবে যে!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছিস। ওকে দু'সেট জামা-প্যান্ট-গেঞ্জি কিনে দিতে হবে।"

একটু পরে একটি স্টেশান ওয়াগন এসে গেল। কামাল সাহেব নিজে আসেননি, একজন ড্রাইভার সেটা চালাচ্ছে। ড্রাইভারের হাতে একটা চিঠি। কামালসাহেব সবাইকে তাঁর বাড়িতে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে সকলে তৈরি হয়ে নাও। অংশুকে ডাকো।"

অংশু নিজেই এগিয়ে এসে কাকাবাবুকে বলল, "সার, হয়ে গেছে।"

যেন একটা কঠিন অঙ্ক দেওয়া হয়েছিল, সে কোনওরকমে করে ফেলেছে। হাসি ফুটেছে মুখে।

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? শুনি।"

অংশু বলল, "জল দিয়ে পতপত করে ভেসে যাচ্ছে একটা শালুক!"

সন্তু মুচকি হেসে ফেলল, আর জোজো হেসে উঠল খুব জোরে।

অংশু রেগে গিয়ে বলল, "কেন, মেলেনি? ভাল্লুকের সঙ্গে শালুক মেলে না?"

কাকাবাবু নিজে হাসি চেপে ওদের দু'জনকে ধমক দিয়ে বললেন, "এই, তোরা হাসছিস কেন? হাসির কী আছে!"

তারপর অংশুকে বললেন, "না, তোমার হয়নি। প্রথম কথা, আমার লাইনটাতে ভাল্লুক ছিল না, ছিল উল্লুক। উল্লুকের সঙ্গে শালুক ভাল মিল হয় না। দ্বিতীয় কথা, কবিতার একটা ছন্দ থাকে। সেটা বুঝতে হবে আগে। আমি যে লাইনটা বলেছি, তার ছন্দ হবে এইরকম :

বনের ধারে
ফেউ ডেকেছে
নাচছে দুটো
উল্লুক

তোমাকেও এই ছন্দে বানাতে হবে লাইন।"

জোজো পেট চেপে হাসি সামলাতে-সামলাতে বলল, "জল দিয়ে পতপত করে ভেসে যাচ্ছে একটা শালুক! পতপত করে কিছু ভেসে যায় নাকি? পতপত করে তো পতাকা ওড়ে! আর শালুক ফুল তো ভেসে যায় না, একজায়গায় ফুটে থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, আর-একটু চিন্তা করলেই ঠিক পারবে। চেষ্টা তো করেছ। এবার চলো, যাওয়া যাক।"

বাংলোর গেট থেকে খানিকটা দূরে একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। কাকাবাবুদের গাড়িটা ছাড়তেই সেটা পেছনে পেছনে আসতে শুরু করল।

কাকাবাবু ড্রাইভারকে থামাতে বলে পুলিশের গাড়ির ইনস্পেক্টরকে ডেকে বললেন, "শুনুন, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে

আসতে হবে না। আমি মন্ত্রীও নই, ভি. আই. পি-ও নই। রাত্তিরবেলা আপনাদের ইচ্ছে হলে পাহারা দেবেন, দিনের বেলা আপনাদের থাকার দরকার নেই।"

পুলিশটি বলল, "সার, আমাদের ওপর অর্ডার আছে, আপনাকে সর্বক্ষণ চোখে-চোখে রাখতে হবে। এটা আমাদের ডিউটি।"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "আমিই তো বারণ করছি আপনাদের। ওপরওয়ালাকে গিয়ে সেই কথা বলুন। সর্বক্ষণ আমি পুলিশ নিয়ে ঘুরতে পারব না।"

পুলিশের গাড়িটা থেমে রইল। এ-গাড়ির ড্রাইভার কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দিল কামালসাহেবের বাড়িতে।

হলুদ রঙের বাড়িটা তিনতলা। সামনে লোহার গেট। একতলা, দোতলা, তিনতলার বারান্দা গ্রিল দিয়ে ঘেরা। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝখানেও একটা লোহার দরজা।

একতলায় দুটো দোকান ঘর। সকলে এসে বসল দোতলায়।

কামালসাহেবের স্ত্রীর নাম জুলেখা। ছেলেমেয়ে দুটির নাম অরণ্য আর তিস্তা। ছেলের বয়েস এগারো, মেয়ের বয়েস সাড়ে আট।

কাকাবাবু ওদের আদর করে বললেন, "বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো!"

কামাল বললেন, "ওদের বাংলা নাম রেখেছি। এখানে থেকে থেকে যাতে অবাঙালি না হয়ে যায়, সেইজন্য আমার স্ত্রী রোজ ওদের বাংলা পড়ায়, বাংলা গান শেখায়।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা একটা গান শুনিয়ে দেবে না কি?"

কামাল বললেন, "না, না, দাদা। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে তাদের সামনে গান গাওয়ানো কিংবা কবিতা আবৃত্তি করা খুব হাসির ব্যাপার। আরও আসবেন মাঝে-মাঝেই, কোনও এক সময় সবাই মিলে গান গাওয়া হবে।"

ছেলেমেয়েদের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে কামাল জিজ্ঞেস করলেন, "কাল রাত্তিরে কোনও উৎপাত হয়নি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "কিচ্ছু না। চমৎকার ঘুমিয়েছি।"

কামাল বললেন, "এদিকে দুটি অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। কাল আমি যখন থানায় গেলাম, আমাকে কিছু বলতেই হল না। থানার অফিসার বললেন, জব্বলপুর থেকে এক্ষুনি অর্ডার এসেছে, রাজা রায়চৌধুরী কোল ইন্ডিয়ার গেস্ট হাউসে রয়েছেন। সেখানে সর্বক্ষণ পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি যেখানেই যান সেখানেই কি পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা থাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "কক্ষনো না। অনেক সময় পুলিশরা আমার কথা জানতেই পারে না। শুধু-শুধু আমাকে পাহারা দিতে হবে কেন?"

কামাল বললেন, "থানার অফিসার কিন্তু বেশ গুরুত্ব দিয়েই বললেন। খুব ওপর মহল থেকে অর্ডার এসেছে মনে হচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এতে তো আমার সম্পর্কে লোকের কৌতূহল বাড়বে। যারা জানত না, তারাও জেনে যাবে।"

কামাল বললেন, "জানতে কারও বাকি নেই। এই দেখুন, এখানকার ইংরিজি খবরের কাগজ। তাতে আপনার ছবি বেরিয়েছে, খবরে লিখেছে যে, আপনি মধ্যপ্রদেশে কোনও রহস্যের সন্ধানে এসেছেন।"

কাকাবাবু অনেকখানি ভুরু তুলে বললেন, "সে কী? আমি এত বিখ্যাত হলাম কবে থেকে? তা ছাড়া, এত তাড়াতাড়ি আমার এখানে আসার কথা খবরের কাগজের লোকেরা জানবে কী করে?"

সন্তু-জোজোরা ঝুঁকে পড়ে কাগজটা দেখল। প্রথম পাতায় ডান দিকের শেষ কলামে কাকাবাবুর ছবি, সেইসঙ্গে কাকাবাবু

সম্পর্কে অনেকটা লেখা।

জোজো বলল, "ওই যাত্রার দলের লোকেরা নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে।"

সন্তু খবরের কাগজটার সবক'টা পাতা উলটেপালটে দেখে বলল, "কিন্তু ওই যাত্রার দলের কোনও খবর তো বেরোয়নি।"

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "তা হলে তো এখানে আর থাকা চলে না। নানারকম লোক এসে দেখা করতে চাইবে! বিরক্ত করবে। এখান থেকে ঝাঁসি চলে গেলে কেমন হয়? সেটাও বেশ ভাল জায়গা। এখানকার গেস্ট হাউসটা খুব পছন্দ হয়েছিল।"

জোজো বলল, "না, আমরা এখানেই থাকব। কাল রাত্তিরে দারুণ খাইয়েছে!"

কামাল বললেন, "পুলিশকে বলে দেওয়া হবে, কেউ যেন বাংলোর মধ্যে ঢুকতে না পারে। কয়েকটা দিন অন্তত দেখা যাক।"

কামালের স্ত্রী জুলেখা এই সময় টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিলেন। পাকা পেঁপে, ডিমসেদ্ধ, পরোটা, আলুর দম, মাংসের কিমা, পাকা খেজুর, ফিরনি, কাঁচাগোল্লা—

কাকাবাবু বললেন, "ওরে বাবা, এত খাবার?"

জোজোর চোখ চকচক করে উঠল, সেও বলল, "সত্যিই, এত খাবার দেওয়ার কোনও মানে হয়?" তারপরই সে একটা আস্ত ডিমসেদ্ধ মুখে পুরে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "কাল রাতে ইউসুফ মিঞা আমাদের বিরিয়ানি, কাবাব-কালিয়া কতরকম যে খাইয়েছে! অতি সুস্বাদু বটে! কিন্তু বাঙালির পেটে এত মোগলাই খাবার রোজ-রোজ সহ্য হবে না। একবেলা অন্তত আমার ডাল-ভাত-মাছের ঝোল চাই।"

কাকাবাবু সামান্যই খেলেন। সন্তুও তাই। জোজো আর অংশু সবরকমই চেখে দেখল।

চা শেষ করে কাকাবাবু বললেন, "জুলেখা, তোমার হাতের চা চমৎকার। মাঝে-মাঝে এসে খাব। চলো কামাল, তোমার বাড়িটা ঘুরে দেখি। মস্ত বড় বাড়ি বানিয়েছ!"

জোজোর পায়ে এখন ব্যান্ডেজ নেই, সিঁড়ি দিয়ে দিব্যি তরতর করে উঠে যাচ্ছে। সত্যি তার পা মুচকেছিল, নাকি হেলিকপ্টার থেকে লাফাবার গল্পটা বলার জন্যই ওটা বেঁধেছিল, তা বুঝতে পারল না সন্তু।

সিঁড়িতে প্রত্যেক তলায় কোলাপসিব্‌ল গেট, জানলাগুলোয় গ্রিলের সঙ্গে মোটা তারের জাল, ছাদও পুরোটা খুব শক্ত জাল দিয়ে ঘেরা।

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাড়িটা দেখছি দুর্গের মতন দুর্ভেদ্য। ছাদটা এমনভাবে ঘেরা কেন? বাঁদর-হনুমানের উৎপাত হয় বুঝি?"

কামাল বললেন, "নাঃ, এখানে বাঁদর নেই। তবে মানুষের বাঁদরামি খুব বেড়েছে। সন্ধের পর রাস্তাঘাটে ছিনতাই হয়। একদিন আমার বাড়ির ছাদে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। মাঝরাত্তির পেরিয়ে গেছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ একটা ঠুক-ঠুক শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা হয়েই চলেছে। আমার বাড়ির নীচে সব দোকানঘর। রাত্তিরে কেউ থাকে না। আমিই একলা পুরুষমানুষ। জুলেখাকে না জাগিয়ে আমি উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। ছাদের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তখনও কেউ ঠুক-ঠুক শব্দ করছে। আমি দরজাটা খুলে ফেললাম!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি খালি হাতে ছাদে উঠে গেলে?"

কামাল বললেন, "আমার বন্দুকের লাইসেন্স আছে। রিভলভারও সঙ্গে রাখি। কিন্তু সে-রাত্তিরে ওগুলো নেওয়ার কথা মনে হয়নি। চোর-ডাকাত হলে তো ঠুক-ঠুক শব্দ করবে না। আমি কোনও জন্তু-জানোয়ারের কথাই ভেবেছিলাম। তাই সঙ্গে একটা লাঠি নিয়েছিলাম। ছাদের দরজাটা খুলে ফেললাম আস্তে-আস্তে। কাউকে দেখা গেল না। অমাবস্যার রাত, ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। তবু আমি ছাদের এদিক-ওদিক ঘুরলাম। হঠাৎ আমার পেছন দিক থেকে কে যেন আমার কাঁধে একটা কিছু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম মাটিতে। উঠে দাঁড়াবার আগেই একজন লোক আমার বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ে একহাতে গলা টিপে ধরল, তার অন্যহাতে একটা ছুরি। আমি তার ছুরিধরা হাতটা চেপে ধরলাম। কাঁধের সেই আঘাতের চোটে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল, প্রথমে গায়ে জোর পাইনি। লোকটার গায়ে খুব শক্তি। সে আমার বুকে ছুরিটা বসিয়ে দেওয়ার বদলে, মনে হল যেন সে আমার একটা চোখ খুবলে নিতে চায়। প্রায় পেরেও গিয়েছিল। এই যে আমার ভুরুর ওপর কাটা দাগ দেখছেন, এই পর্যন্ত ছুরিটা বসিয়ে দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে আমি অন্য হাত দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঘুসি কষালাম ওর মুখে। এবার ও ছিটকে পড়তেই আমি উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। তারপর শুরু হল মারামারি। ওর হাতে একটা লম্বা ছুরি ছিল বটে, আমিও লাঠিটা তুলে নিতে পেরেছি। আপনি জানেন দাদা, আমার হাতে লাঠি থাকলে কেউ ছুরি কিংবা তলোয়ার দিয়েও সুবিধে করতে পারে না। লোকটাকে কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি কষালাম বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধরে ফেলা গেল না। হঠাৎ একবার লাফিয়ে ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাল। অন্ধকারে তার মুখও দেখতে পাইনি।

কাকাবাবু বললেন, "তোমার চোখটা খুব জোর বেঁচে গেছে।"

কামাল বললেন, "সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানেন দাদা, পরদিন সকালে আবার ছাদে এসে দেখি আমাদের সেই মারামারির জায়গাটায় একটা পাথরের চোখ পড়ে আছে। নিশ্চয়ই এটা সেই আততায়ীর চোখ। যখন আমি ঘুসি মেরেছিলাম, তখন খুলে পড়ে গেছে!"

জোজো উত্তেজিতভাবে বলল, "পাথরের চোখ! কাকাবাবু, আপনার কাছে সেই যে একটা লোক এসেছিল, তারও একটা চোখ পাথরের।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "তার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। সন্তুর মনে হয়েছিল, সেই লোকটির দু'চোখের দৃষ্টি দু'রকম, অন্য কারণেও হতে পারে। কামাল, তোমার এই ঘটনাটা কবে ঘটেছিল?"

কামাল বললেন, "মাসদেড়েক আগে। ঠিক একমাস একুশ দিন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছে মাত্র দু'-চারদিন আগে একজন লোক এসেছিল, সম্ভবত তার পাথরের চোখ। কিন্তু সেই লোকই যে এখানে এসেছিল, তা কি বলা যায়? আরও অনেকের পাথরের চোখ থাকতে পারে।"

কামাল বললেন, "লোকটা চুরি-ডাকাতি করতে আসেনি। আমাকে ছাদে টেনে এনে খুন করতে চেয়েছিল, তার আগে একটা চোখ খুবলে নিয়ে—"

কাকাবাবু বললেন, "ইংরিজিতে প্রতিশোধের ব্যাপারে বলে, অ্যান আই ফর অ্যান আই, আ টুথ ফর আ টুথ। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। তুমি কি কখনও কারও একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছ?"

কামাল জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "কক্ষনো না। আমি এখন ব্যবসা করি। লোকের সঙ্গে মারামারি করতে যাব কেন? সে কিসের প্রতিশোধ নিতে এসেছিল, তা কিছুই বুঝতে পারিনি। যদি আবার হামলা করে, সেইজন্য ছাদ ঘিরে দিয়েছি জাল দিয়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ করেছ। সাবধানে থাকাই ভাল। ক্রিমিনালদের মধ্যে কতরকম পাগল যে থাকে তার ঠিক নেই। প্রতিশোধের নেশাতেই তারা পাগল হয়ে যায়। জানো কামাল, ক'দিন আগে কেউ একজন আমার ঘরে গ্যাস বোমা ছুড়ে মেরেছিল।"

কামাল আঁতকে উঠে বললেন, "গ্যাস বোমা? এরকম তো আগে শুনিনি!"

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন "তাকে চিনতে পারা যায়নি। সে যদি আবার আসে, তাকে আমি এমন শাস্তি দেব!"

কামাল বললেন, "আপনি এবারে ক্ষমা করা বন্ধ করুন। অন্তত জেলে ভরে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।"

অংশু এতক্ষণ হাঁ করে সব শুনছিল। কামালের শেষ কথাটা শুনে সে মাথা নিচু করে ফেলল।

সবাই মিলে নেমে আসা হল নীচে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কামালকাকু, আপনি কখন আসছেন আমাদের ডাকবাংলোতে?"

কামাল বললেন, "আজ তো আমার ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। এখন তো যেতে পারব না।"

জোজো বলল, "আফগানিস্তানের সেই গল্পটা শুনতে হবে না? মাঝখানে এমন একটা জায়গায় থামিয়ে রেখেছেন!"

কামাল বললেন, "ঠিক আছে, সন্ধের পর যাব। বাকি গল্প শোনানো যাবে তখন। দিনের বেলা তোমরা একটা কাজ করতে পারো। পান্নার হিরের খনি ঘুরে এসো। গাড়ি তো আছেই সঙ্গে, ড্রাইভার চিনিয়ে নিয়ে যাবে।"

সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল বাজারের দিকে। অংশুর জন্য কেনা হল দু'জোড়া প্যান্ট-শার্ট, আর গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া। জোজো কিনে ফেলল একজোড়া চটি, সন্তু কিনল একটা মাউথ অর্গান।

বাজারে কত লোকজন, সবাই ব্যস্ত হয়ে কেনাকাটা করছে, দোকানদাররা খাতির করে ডাকছে খদ্দেরদের। একদল স্কুলের ছেলে একরকম পোশাক পরে চলে গেল গান গাইতে-গাইতে। একজন মোটামতন লোক রাস্তায় একটি ষাঁড়কে আদর করে কলা খাওয়াচ্ছে। কোথাও কোনও অশান্তি নেই, এখন মনেই হয় না যে পৃথিবীতে কত চোর-ডাকাত, খুনে-বদমাশও ঘুরে বেড়ায়।

গাড়ি ছুটল পান্নার দিকে।

কাকাবাবুর পাশে বসেছে অংশু, কাকাবাবু তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, "কী হে, মুখটা এমন গোমড়া করে আছ কেন?"

জোজো বলল, "আপনি ওর ওপর এমন দায়িত্ব চাপিয়েছেন! কবিতা মেলাতে হবে, ভেবে-ভেবে বেচারা ঘেমে যাচ্ছে!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওকে একটা সোজা লাইন দিলে হয় না? ধরো এইরকম: 'বৃষ্টি পড়ে কলকল, ভরে ওঠে নদীর জল।' জলের সঙ্গে অনেক মিল দেওয়া যায়! ও পেরে যাবে!"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু! আমার মাথায় প্রথম যে লাইনটা এসেছে, সেটার সঙ্গেই মেলাতে হবে!"

জোজো বলল, "উল্লুকের সঙ্গে খুব ভাল মিল হয় মু—"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "এই, চুপ! তোমরা কেউ কিছু বলবে না!"

সন্তুর কথা শুনে অংশুর মুখখানা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আবার নিভে গেল!

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, "দেখি সন্তু, মাউথ অর্গানটা কেমন কিনলি! সুর ঠিক আছে কি না বাজিয়ে দেখতে হয়।"

কাকাবাবু সেটাকে ভাল করে মুছেটুছে বাজাতে লাগলেন। বেশ ভালই বাজাতে পারেন তিনি। একটু পরে মুখ তুলে বললেন, "এটা কী গানের সুর বাজাচ্ছি, বুঝতে পারছিস?"

সন্তু-জোজো দু'জনেই দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "নজরুলের গান, একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল, 'কে বিদেশী মন-উদাসী, বাঁশের বাঁশি বাজায় বনে—' এইটা শুনেছিস, 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল—'।"

বাকিটা রাস্তা কাকাবাবু বাজাতে-বাজাতে গেলেন।

পান্নায় অবশ্য দেখার কিছু নেই। হিরের খনির মধ্যে ঢোকা যায় না, খুব কড়াকড়ি। এখানে কাকাবাবুকেও কেউ চেনে না। বাইরে থেকে হিরের খনির ব্যাপারটা বোঝাই যায় না। খানিকটা জায়গা উঁচু পাঁচিল আর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, স্টেনগান হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। একটা জায়গায় মাঠের মধ্যে পোড়া কয়লা আর ছাই স্তূপ হয়ে আছে। তার পাশের জমিতে চাষ করছে কৃষকরা।

সেইখানে সন্তু, জোজো আর অংশু গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ ঘুরল। যদি মাঠের মধ্যে হঠাৎ একটা হিরে পাওয়া যায়! কত হাজার-হাজার লোক যে আগে এখানে খুঁজে গেছে, তা ওদের খেয়াল নেই।

কাকাবাবু গাড়িতেই বসে আছেন, একসময় জোজো কাছে এসে বলল, "কাকাবাবু, ডান দিকের সরু রাস্তাটায় দেখুন, বড় একটা তেঁতুলগাছের নীচে একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ওই গাড়িটাকে সারা রাস্তা আমাদের পেছনে-পেছনে আসতে দেখেছি। নিশ্চয়ই কোনও স্পাই আমাদের ফলো করছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? গাড়িটাতে ক'জন লোক আছে দেখেছ?"

জোজো বলল, "ড্রাইভার আর একজন। ড্রাইভারের খাকি পোশাক, আর অন্য লোকটির চোখে কালো চশমা, সারামুখে দাড়ি।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, কালো চশমা আর সারামুখে দাড়ি থাকলে সন্দেহ হতে পারে ঠিকই। স্পাই হতে পারে, ডিটেকটিভ হতে পারে, ডাকাত হতে পারে। কী বলো? ড্রাইভার ছাড়া মোটে একজন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আরও কিছুক্ষণ খেলিয়ে দেখা যাক!"

জোজোর কথাটা মিথ্যে নয়। ফেরার পথেও নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা দেখা গেল মাঝে-মাঝে। কখনও খুব কাছে আসছে না। এক-একবার চোখের আড়ালেও চলে যাচ্ছে।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু এক কাজ করলে হয়। এ-গাড়িটা চট করে একবার থামিয়ে আমাকে নামিয়ে দাও। আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকব। ফিয়াট গাড়িটা এলে দেখে নেব ভেতরে কে আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "দুর, ওসব দরকার নেই। ওর যদি স্বার্থ থাকে, ও নিজেই একসময় দেখা দেবে।"

কাকাবাবু আবার মাউথ অর্গানটা বাজাতে লাগলেন আপন মনে।

॥ ৭ ॥

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, এর মধ্যে কাকাবাবুর চা খাওয়া হয়ে গেছে তিনবার। সন্তু আর জোজো কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরল। কামাল এখনও আসেননি।

জোজো আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সে ছুটে এসে বারান্দায়-বসা কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের ডাকাতের দল ঘিরে ধরল, তারপর কী হল?"

কাকাবাবু হাত নেড়ে বললেন, "কামাল আসুক, কামাল আসুক। অংশু কোথায়, তাকে দেখছি না!"

জোজো বলল, "দুপুরে তো ওপরের ঘরে ঘুমোচ্ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "কাজে ফাঁকি মেরে ঘুম? ওকে ডেকে

নিয়ে এসো—”

জোজো ওপরতলা ঘুরে খানিক বাদে বলল, “কাকাবাবু, সে ঘরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই, কোথাও নেই, সে পালিয়েছে !”

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, “সত্যি পালাবে, এত সাহস হবে ?”

জোজো বলল, “সব জায়গায় তো দেখলাম। ওর ঘরে চা দেওয়া হয়েছিল, সেই চাও খায়নি। একটা নতুন জামা-প্যান্ট পরে গেছে, বাকিগুলো ফেলে গেছে।”

কাকাবাবু বললেন, “গেটের বাইরে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে এসো তো, অংশুকে বেরোতে দেখেছে কি না। ওরা নিশ্চয়ই নজর রাখছে।”

সন্তু কাছে এসে সব শুনে বলল, “আমি বাড়ির পেছন দিকটা খুঁজে দেখছি।”

সমস্ত বাগানটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একপাশে নদী। পেছন দিকের বাগানে কাঁচালঙ্কা, বেগুনগাছ লাগানো হয়েছে, বড় গাছ নেই, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে না। পাঁচিলের ওপাশে ঝোপঝাড়, খানিক দূরে পাহাড় শুরু হয়েছে।

পাঁচিল বেশ উঁচু হলেও সন্তু অনায়াসে উঠে বসল। ওপাশে অনেক ঝোপঝাড়। সূর্য ঢলে পড়েছে। আকাশের পশ্চিম দিকটা লালে লাল হলেও ঝোপঝাড়ে নেমে এসেছে অন্ধকার। লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়ল সন্তু।

খানিকটা এদিক-ওদিক খুঁজতেই সে একটা খসখস শব্দ শুনতে পেল। কেউ পা টিপে-টিপে যাচ্ছে।

সন্তু চেঁচিয়ে ডাকল, “অংশুদা, অংশুদা !”

অমনই কেউ জোরে ছুটতে শুরু করল। হলুদ-নীল ডোরাকাটা নতুন শার্টটা চিনতে পারল সন্তু। সে আবার বলল, “অংশুদা, দাঁড়াও, যাচ্ছ কোথায় ? এদিক দিয়ে কোথায় যাবে ?”

সে-কথায় কান না দিয়ে আরও জোরে ছুটল অংশু। কিন্তু সে সন্তুর সঙ্গে পারবে কেন ? ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গোর সঙ্গে কোনও মানুষ দৌড়ে পারে ! বুম চাক ডবাং ডুলু, বুম চাক ডবাং ডুলু বলতে বলতে যেন ঝড়ের মতন উড়ে যেতে লাগল সন্তু। একটু পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অংশুর কোমর ধরে ফেলল।

অংশু হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, “আমায় ছেড়ে দাও ভাই সন্তু, আমায় ছেড়ে দাও। আমি পারব না।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ?”

অংশু বলল, “কবিতার লাইন ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি পাগল হয়ে যাব। তোমার কাকাবাবু এর চেয়ে আর যে-কোনও শাস্তি আমাকে দিন, আমি মাথা পেতে নেব। কবিতা মেলানো, ওরে বাপ রে বাপ, আমার দ্বারা সম্ভব নয় !”

সন্তু হো-হো করে হেসে উঠল।

অংশু কাতরভাবে বলল, “তুমি হাসছ ? আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে তুমি বুঝতে পারবে না ! ভাল্লুক, মাল্লুক, জাল্লুক, কাল্লুক, খাল্লুক শুধু এইসব মাথার মধ্যে ঘুরছে ! এই দিয়ে পদ্য হয় ? আমাতে বাঁচাও ভাই !”

হাসি থামিয়ে সন্তু বলল, “কবিতার জন্য কাউকে এত কষ্ট পেতে জীবনে দেখিনি ! ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। কাকাবাবু তো একটা লাইন মেলাতে বলেছে, আমি বলে দিচ্ছি, মুখস্থ করে নাও ! প্রথম লাইনটা কী ছিল, ‘বনের ধারে ফেউ ডেকেছে, নাচছে দুটো উল্লুক’। এই তো ? পরের লাইনটা, পরের লাইনটা, হ্যাঁ, এরকম হতে পারে, ‘বাঘের হালুম শুনেই ভয়ে কাঁপছে সারা মুল্লুক !’ কী, ঠিক আছে ? মুখস্থ করতে পারবে ?”

অংশু ঘাড় নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, পারব ?”

সন্তু বলল, “ভাল করে মুখস্থ করে নাও। আর পালাবার চেষ্টা কোরো না !”

ফেরার সময় অংশু বিড়বিড় করে লাইনটা মুখস্থ করতে লাগল। পাঁচিলে ওঠার আগে সন্তু একবার তার পরীক্ষা নিল। অংশু ঠিক-ঠিক বলে দিল লাইন দুটো।

পাঁচিল টপকে এপাশে এসে সন্তু একটা লঙ্কাগাছ থেকে কয়েকটা লঙ্কা ছিঁড়ে নিল। অংশুর হাতে দিয়ে বলল, “কাকাবাবুকে বলবে, তুমি এদিকে লঙ্কা তুলতে এসেছিলে। রাত্তিরে ভাতের সঙ্গে খাবে।”

অংশু বলল, “আমি যে একেবারে ঝাল খেতে পারি না ! লঙ্কা মুখে দিলেই পেট জ্বালা করে।”

সন্তু বলল, “খেতে হবে না। থালার পাশে রাখবে। এখন একটা কিছু বলতে হবে তো। আমি একটা লঙ্কা খেয়ে নেব।”

কাকাবাবুর হাতে আর এক কাপ চায়ের পেয়ালা। ওদের দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় পাওয়া গেল ?”

সন্তু কিছু বলবার আগেই অংশু বলল, “ওদিকে কত লঙ্কার গাছ, আর বেগুন। বেগুনগুলো এখনও ছোট-ছোট, কিন্তু কত লঙ্কা হয়েছে, লাল-লাল, দেখতে কী সুন্দর লাগে।”

কাকাবাবু বললেন, “তাই নাকি, বাঃ ! তুমি বুঝি খুব লঙ্কার ভক্ত ?”

অংশু হাতের মুঠো খুলে দেখিয়ে বলল, “হ্যাঁ, লঙ্কা ছাড়া ভাত খেতে পারি না। অনেক তুলে এনেছি। কাকাবাবু, লঙ্কার খেতে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ আমার মাথায় পদ্য এসে গেল। লাইনটা মিলিয়ে ফেলেছি।”

কাকাবাবু বললেন, “লঙ্কার খেতে কবিতার প্রেরণা ? এরকম বোধ হয় পৃথিবীতে আগে কখনও হয়নি। তা হলে শুনিয়ে দাও !”

অংশু জামার কলারটা ঠিক করে নিল, একবার গলাখাঁকারি দিল, তারপর বেশ জোর দিয়ে বলল,

নদীর ধারে শেয়াল ডাকছে, নাচছে একটা ভাল্লুক,
আর সবাই ভয় পেয়ে গেল, একটা বাঘ ডাকল হালুম !

জোজো খুকখুক করে হেসে ফেলল।

কাকাবাবু হাসতে গিয়েও গম্ভীরভাবে বললেন, “এ আবার কী কবিতা ? কতবার বলেছি, ভাল্লুক নয়, উল্লুক, উল্লুক ! প্রথম লাইনটাই মনে রাখতে পারো না ? আর যদি ভাল্লুকও হয়, তার সঙ্গে হালুম আবার কী ধরনের মিল ?”

অংশু আড়চোখে সন্তুর দিকে তাকাল। সন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে মুখ নিচু করে তার নিজের পায়ের জুতো দেখছে।

অংশু বলল, “ঠিকই বানিয়েছিলাম সার, কিন্তু আমি বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারি না।”

জোজো বলল, “কাকাবাবু, ধরে নিন এটা গদ্য কবিতা !”

কাকাবাবু বললেন, “না, না। ওসব চলবে না। একটা জিনিস বুঝতে পারছি। ও ছন্দটাই ধরতে পারছে না। যার কানে ঠিক ছন্দটা ধরা পড়ে না, সে কবিতা লিখতে পারে না, তাই না ? সেইজন্য সকলে কবিতা লিখতে পারে না। কেউ পারে, কেউ পারে না।”

অংশু সঙ্গে-সঙ্গে বলল, “ঠিক বলেছেন সার। কেউ পারে না। আমি সাতজন্ম চেষ্টা করলেও পারব না।”

কাকাবাবু বললেন, “তা বলে নিষ্কৃতি নেই। কবিতা যারা লিখতে পারে না, তারাও পড়তে পারে। পড়ে-পড়ে মুখস্থ করতে পারে। অংশু, তুমি যে-কোনও কবিতার চার লাইন আমাকে মুখস্থ শোনাতে পারো ?”

অংশু মাথা চুলকে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, “না সার, শুধু একটা হিন্দি গানের দু'লাইন মনে পড়ছে। শোনাব ?”

কাকাবাবু প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, “না, না, না, হিন্দি গান শোনাতে হবে না। আমি বলছি বাংলা কবিতা। একটা কবিতাও

জানো না! যে বাঙালির ছেলে একটা বাংলা কবিতাও মুখস্থ বলতে পারে না, তার জেল হওয়া উচিত। জোজো, কাগজ-পেন্সিল এনে দাও তো ওকে।"

জোজো দৌড়ে একটা প্যাড আর ডট পেন নিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, "ওকেই লিখতে দাও। যদি বানান ভুল করে, ঠিক করে দিয়ো।"

তারপর কাকাবাবু ডিকটেশান দিলেন:

শুনেছো কী বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ
টক টক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে, একেবারে মিষ্টি!

জোজো দুষ্টুমি করে বলল, "কাকাবাবু, এই কবিতাটা আপনার খুব ফেভারিট, তাই না? এটা সুর করে আপনাকে গান গাইতেও শুনেছি। আপনি বুঝি আর অন্য কোনও কবিতা জানেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "কী? সুকুমার রায়ের সব কবিতা আমার মুখস্থ। শুনবে?"

এই সময় গেটের সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। তার থেকে নামলেন কামালসাহেব। জোজো অমনই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "গল্প, এবার গল্প শোনা হবে।"

কাকাবাবু অংশুকে বললেন, "তোমাকে কাল দুপুর পর্যন্ত মুখস্থ করার সময় দিলাম।"

কামালসাহেব একটা বড় ঠোঙাভর্তি গরম-গরম শিঙাড়া নিয়ে এসেছেন। টেবিলের ওপর ঠোঙাটা রেখে বললেন, "সাতনার শিঙাড়া খুব বিখ্যাত, ভেতরে কিশমিশ আর পেস্তা বাদাম দেওয়া থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে ইউসুফকে আর এক রাউন্ড চা বানাতে বলে দাও।"

একটু পরে শুরু হল আফগানিস্তানের গল্প।

কামাল জিজ্ঞেস করলেন, "কাল কোথায় যেন থেমে ছিল?"

জোজো বলল, "কাকাবাবু বাঘটাকে দেখে বন্দুক ছুড়লেন। বাঘটা পালাল কিন্তু সেই শব্দ শুনে ডাকাতের দল এসে ঘিরে ফেলল।"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ, ছ'-সাতজন ডাকাত। প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেল। ওরা ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ওই পথে যাতায়াত করে, ডাকাতের দল অতর্কিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সব লুটপাট করে নেয়। মেরেও ফেলে। আমরা অত কিছুই জানতাম না, আমাদের সঙ্গে দামি কোনও জিনিসও ছিল না। ছ'-সাতজন ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করারও প্রশ্ন ওঠে না। ওদের দেখেই আমরা হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের ভাষা কিছুই বুঝি না। আমি কিছুটা পুস্তু ভাষা শিখেছিলাম। কিন্তু ওইসব পাহাড়ের দিকে আরও অনেক ভাষা আছে। আমার কথাও ওরা বুঝল না। মারধোরও করল না বটে, ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল। কামাল, আমাদের নদীও পার হতে হয়েছিল, তাই না?"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ, এক জায়গায় পাহাড়ের বাঁকে নদী খানিকটা সরু হয়ে গেছে, কিন্তু খুব স্রোত। সেইখানে আমাদের ঘোড়াসুদ্ধু পার হতে হল। আমাদের অসুবিধে হয়নি, কিন্তু ডাকাত দলেরই একটা লোক নদীতে পড়ে গিয়ে খুব হাবুডুবু খেল!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ ঠিক। তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা গুহার মুখে। সেখানে আরও কিছু লোক আগুন জ্বেলে বসে আছে। যদিও গ্রীষ্মকাল, কিন্তু একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। সেখানেই বসে ছিল ডাকাত দলের আসল সর্দার, তার নাম জাভেদ দুরানি।"

কামাল বললেন, "তার চেহারার একটু বর্ণনা দিই? কাবুলিওয়ালারা এমনই সবাই লম্বা-চওড়া হয়, কিন্তু এই লোকটি যেন একটি দৈত্য। যেমন মোটা, তেমনই লম্বা, হাত দু'খানা গদার মতন, বুকটা যেন লোহার দরজা, সারা মুখের দাড়িতে মেহেদি রং লাগানো। চোখ দুটো ঠিক বাঘের মতন। একটা পাথরের ওপর বসে সে গড়গড়ার তামাক টানছিল। তাকে দেখলেই ভয় হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "জাভেদ দুরানি অবশ্য ইংরিজি জানে। তাতে খানিকটা সুবিধে হল। আমি কাকুতি-মিনতির সুরে সেই ডাকাতের সর্দারকে বললাম, 'আমরা সামান্য পর্যটক, আমাদের সঙ্গে দামি কোনও জিনিস নেই, আমাদের মতন চুনোপুঁটিকে মেরে আপনি হাত গন্ধ করবেন কেন? আমাদের ছেড়ে দিন।' তাই শুনে জাভেদ দুরানি অট্টহাস্য করে উঠল। ঠিক মেঘের ডাকের মতন সেই হাসির আওয়াজ। তারপর বলল, 'এখানে তো কেউ এমনি-এমনি বেড়াতে আসে না। তোমরা মতলবে এসেছ, ঠিক করে বলো!' আমি তখন বললাম, 'আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে খুব আগ্রহ আছে। আফগানিস্তান আর রাশিয়ার সীমান্তের এক জায়গায় পাহাড়ে সম্রাট অশোকের শিলালিপি আছে বলে শুনেছি, মানে পড়েছি, আমরা সেই শিলালিপির ছবি তুলে আনব। এর অন্য কোনও দাম নেই। শুধু ইতিহাস নিয়ে যারা চর্চা করে, তাদের কাজে লাগবে!'"

সন্তু বলল, "কিন্তু কাকাবাবু, তুমি বলেছিলে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য ছিল হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত। তুমি যে-জায়গাটার কথা বলছ, সেটা তো আরও অনেক দূরে। সেখানে অশোকের শিলালিপি থাকবে কী করে?"

কাকাবাবু আর কামাল পরস্পরের দিকে তাকালেন। দু'জনেই হাসলেন।

কামাল বললেন, "দাদা, আজকালকার ছেলেরা অনেক কিছু জানে। অনেক বেশি পড়ে। টিভিতে কতরকম ছবি দেখে। এদের ধোঁকা দেওয়া শক্ত।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই ঠিক ধরেছিস সন্তু। অশোকের শিলালিপি-টিপির কথা আমরা বানিয়েছিলাম। সেসব কিছু নেই। আমরা আসলে অন্য একটা জিনিস খুঁজতে গিয়েছিলাম। সেটা ওদের বলতে চাইনি।"

কামাল বললেন, "ডাকাতদলের লোকরা সন্তুর মতন ইতিহাস-ভূগোল কিছু জানে না। তবু ওদের মধ্যে একজন আমাদের কথায় সন্দেহ করেছিল। সে বলে উঠল, 'এত সামান্য কারণে কেউ এতদূর আসে না। নিশ্চয়ই এদের অন্য কোনও মতলব আছে।'"

কাকাবাবু বললেন, "সেই লোকটির নাম অবোধরাম পেহলবান। যদিও অবোধরাম নাম, মুখখানা সুচলো মতন, চোখ দুটো দুষ্টু বুদ্ধিতে ভরা। ওকে ডাকাতদলের মধ্যে দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। সে লোকটি ভারতীয়। আফগানিস্তানে অবশ্য হিন্দু-মুসলমানে কোনও ঝগড়া নেই, তখন ভারত থেকেও অনবরত লোকজন যাতায়াত করত। ওই ডাকাতদলের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক ছিল অবোধরামের। ডাকাতরা লুটপাট করে যেসব জিনিসপত্র পেত, সেসব বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে তো, অবোধরাম করত সেই কাজ। অবোধরামের চেহারাটাও বেশ শক্তিশালী, পেহলবান তো, তার মানে পালোয়ান।"

কামাল বললেন, "কেন জানি না, বাঙালিদের ওপরে অবোধরামের খুব রাগ। সে আবার বলল, 'বাঙালিরা ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল হয়। তারা এতদূর এসেছে, তাও মাত্র দু'জন, এরা নিশ্চয়ই সরকারের চর। এদের বন্দুক-পিস্তল কেড়ে নিয়ে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হোক।' ডাকাতের সর্দার জাভেদ দুরানিও

বলল, 'ঠিক। বাঙালি কাওয়ার্ড, বাঙালি লড়াই করতে জানে না, শত্রুর সামনে পড়লে বাঙালি কাপড় নষ্ট করে ফেলে, তোমরা দু'জন মাত্র বাঙালি এই পথে এসেছ, জানো না, এখানে কত বিপদ হতে পারে ? কীজন্য এসেছ, ঠিক করে বলো !'"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তখন বললাম, 'সর্দার, তুমি বাঙালিদের এত নিন্দে করছ, তুমি জানো না, স্বদেশী আমলে বাঙালিরা কত লড়াই করেছে ইংরেজদের সঙ্গে ? বাঙালিরাই প্রথম বোমা বানাতে শিখিয়েছে। চট্টগ্রাম পাহাড়ে বাঙালি ছেলেরা ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।' তাই শুনে জাভেদ বলল, 'ওসব শুনতে চাই না। তোমরা আমার দলের কারও সঙ্গে লড়তে পারবে ? সে হিম্মত আছে ? যে-কেউ তোমাদের ঘাড় মটকে দেবে।' কামাল অমনই লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমি লড়তে রাজি আছি। কার সঙ্গে লড়তে হবে বলুন !'"

কামাল বললেন, "বাঙালিদের অত নিন্দে শুনে আমার রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম, এদের হাতে যদি মরতেই হয়, লড়াই করেই মরি !"

কাকাবাবু বললেন, "কামালের সঙ্গে যে লড়াই করতে এল, তার প্রায় ডবল চেহারা। থাবার মতন দুটো হাত তুলে তেড়ে এল। কিন্তু কুস্তি তো শুধু গায়ের জোরে হয় না, বুদ্ধি লাগে। লোকটা একেবারে মাথামোটা। কামাল তো মরিয়া হয়ে দারুণ কায়দায় লড়ে গিয়ে খানিক বাদেই তাকে উলটে ফেলে দিল। আমি কিন্তু প্রথমটায় ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু কামাল অসাধারণ সাহস দেখিয়েছে, বাঙালির মান রেখেছে।"

কামাল বললেন, "আর আপনি কী করলেন দাদা ? তার কোনও তুলনা হয় না। আমি জিতে যেতেই ডাকাতের সর্দারের মুখখানা রাগে গনগনে হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের খাপ থেকে সড়াত করে তলোয়ার টেনে বার করে তোমাদের কাকাবাবুকে সে বলল, 'এবার তুমি আমার সঙ্গে লড়ো !' তার যা গায়ের জোর, এক কোপেই সে মুণ্ডু কেটে ফেলতে পারে। এ তো কুস্তি নয়, ওদের তলোয়ার চালাবার কত অভ্যেস আছে। আমি ভাবলাম, এইবার শেষ, প্রথমে রাজাদাদাকে মারবে, তারপর আমাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের কলেজ জীবনে ওয়াই. এম. সি. এ-তে ফেন্সিং শেখানো হত। আমি সেখানে দু'বছর শিখেছিলাম, মোটামুটি ভালই পারতাম। তারপর অনেকদিন অভ্যেস ছিল না। কী আর করি, রাজি হয়ে গেলাম। আমাকে একটা তলোয়ার দেওয়া হল, সবাই সরে গিয়ে মাঝখানের জায়গাটা খালি করে দিল। ওই বিশাল দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করার কথা ভাবতেই আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। ও যদি আমাকে একটা ঘা মারতে পারে, তা হলেই আমার শেষ ! চেষ্টা করতে হবে, যাতে ও কিছুতেই আমাকে ছুঁতে না পারে। তখন তো আর আমার পা খোঁড়া ছিল না, লাফাতে পারতাম, ছুটতে পারতাম খুব। আমি জাভেদ দুরানিকে ঘিরে লাফাতে লাগলাম শুধু, ও তলোয়ার চালাচ্ছে আর আমি সরে যাচ্ছি। ইঁদুর-বেড়াল খেলা চলতে লাগল। মিনিট পনেরো এইরকম চালাবার পর একবার মাত্র ওকে একটু অন্যমনস্ক করে দিতেই আমি ওর ঠিক হাতের মুঠোর কাছে প্রাণপণে দিলাম এক আঘাত। ওর তলোয়ারটা শূন্যে উড়ে গিয়ে অনেক দূরে পড়ল, আমি আমার তলোয়ারের ডগা ঠেকালাম ওর বুকে।"

কামাল বললেন, "দাদা, আপনি মোটেই ভয় পাননি। প্রথম থেকেই আপনার ঠোঁটে হাসি ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ভেতরে ভয় ছিল ঠিকই। তবু মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে রাখতে হয়। তাতে প্রতিপক্ষ একটু হকচকিয়ে যায়।"

কামাল বললেন, "বুকে তলোয়ার ঠেকানো মানেই চূড়ান্ত পরাজয়। কিন্তু দাদা তবু ডাকাতের সর্দারকে বললেন, 'তলোয়ারটা কুড়িয়ে এনে আবার লড়তে চান?' সে খনখনে গলায় বলল, 'না, তুমি জিতেছ। এবার আমাকে মেরে ফেলো। আমাদের এখানকার নিয়ম, যে হারে, তাকে মরতে হয়। তুমি মারো আমাকে।' দাদা বললেন, 'না, আমি মানুষ মারি না।' সর্দার ধমক দিয়ে বলল, 'শিগ্‌গির মারো বলছি, নইলে আমার অপমান হবে।' দাদা বললেন, 'তলোয়ার খেলতে বলেছিলে, খেলেছি। তোমাকে মারব কেন? আমি কাউকে মারতে চাই না।' এই বলে দাদা নিজের হাতের তলোয়ারটাও ফেলে দিলেন। অন্য ডাকাতরা সবাই হাতে তলোয়ার কিংবা বন্দুক উঁচিয়ে ধরে আছে। অবোধরামের হাতে রিভলভার। জাভেদ দুরানি হাত তুলে সবাইকে বললেন, 'থামো!' তারপর দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার কাছে কী চাও বাঙালি? এ-পর্যন্ত আর কেউ আমার হাত থেকে তলোয়ার খসাতে পারেনি। বাঙালিদের সম্পর্কে আমার ভুল ধারণা ছিল।'"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তখন সবাইকে একটু তোষামোদ করে বললাম, 'সর্দার, তুমি প্রকৃত বীর। যে-কোনও খেলাতেই জয়-পরাজয় আছে। জয়ের মতন পরাজয়টাও মেনে নিতে হয়। এবার আমি জিতেছি, পরেরবার নিশ্চয়ই তুমিই জিততে। এটা একটা খেলা, খুনোখুনি করার কী দরকার! আমরা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা চলে যাই।'"

কামাল বললেন, "সর্দার তখন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দাদার কাঁধ চাপড়ে বলেছিলেন, 'তোমরা শুধু-শুধু পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে যাবে কেন? আবার অন্য দলের হাতে পড়বে। তার চেয়ে বরং আমাদের দলে যোগ দাও। অনেক টাকা পাবে। অনেক টাকা।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ ঠিক, আমাদেরও ডাকাতের দলে ভর্তি করে নিতে চেয়েছিল বটে। আমি হাত জোড় করে বলেছিলাম, 'মাফ করো সর্দার, ডাকাতি করা আমাদের ধাতে সইবে না। আমরা শহরের লোক, দু'-চারদিন পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করে আবার শহরে ফিরে যাব।' সর্দার তখন আমাকে একটা পাঞ্জা দিল। লোহার তৈরি একটা মেডেলের মতন। সেটা আমার বাড়িতে এখনও আছে। সর্দার বলেছিল, 'পথে অন্য ডাকাতের দল ধরলেও ওই পাঞ্জাটা দেখালে ছেড়ে দেবে। ওই অঞ্চলের সবাই জাভেদ দুরানিকে ভয় পায়।'"

কামাল বললেন, "অবোধরাম পেহলবান তখনও বলেছিল, 'সর্দার, এদের এভাবে ছাড়বেন না। এরা এই আস্তানাটা চিনে গেল, এর পর এখানে পুলিশ নিয়ে আসবে।' সর্দার তাকে এক ধমক দিয়ে বলেছিল, 'চোপ! আমার কথার ওপর কেউ কথা বলবে না।'"

কাকাবাবু বললেন, "সর্দারের একজন লোক নদী পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে এল। নদী পার হয়ে শুরু হল আমাদের যাত্রা।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওই পথে যে তোমাদের ওরকম বিপদ হতে পারে, তা তোমরা আগে আন্দাজ করতে পারোনি?"

কাকাবাবু বললেন, "বিপদের ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ইতিহাসের যারা চর্চা করে, তাদের অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মহেঞ্জোদরো-হরপ্পা আবিষ্কার করছিলেন মরুভূমির মধ্যে, তখনও সেখানে ডাকাতরা আক্রমণ করেছিল।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ওই পাহাড়ে আর অন্য লোকজন যায় না?"

কাকাবাবু বললেন, "যাবে না কেন? লোকজন যাতায়াত না করলে ডাকাতরাই বা আসবে কেন? তবে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যায়, তারা যায় দল বেঁধে, অন্তত পঞ্চাশ-ষাটজন, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র থাকে, ডাকাতরা তাদের কাছে ঘেঁষে না। ছোট দল হলেই বিপদ।"

সন্তু বলল, "তোমরা মাত্র দু'জন গিয়েছিলে কেন? সঙ্গে আরও অনেক লোক নিয়ে যেতে পারতে না?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক লোক নিতে অনেক টাকা লাগে। আমরা যে জিনিসটার খোঁজে যাচ্ছিলাম, সেটা যে আছেই, তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না। অনেকেই বিশ্বাস করেনি। অনেকটা ইংরিজিতে যাকে বলে, ওয়াইল্ড গুজ চেইজ। ভারত সরকার সেইজন্য আমাদের বেশি সাহায্য করেনি। আফগানিস্তান সরকারের সাহায্যও চেয়েছিলাম, তারা আমাদের প্রস্তাবে পাত্তাই দেয়নি। সেইজন্যই আমরা মাত্র দু'জন গিয়েছিলাম। ছোট দল থাকার সুবিধেও আছে। ইচ্ছেমতন যেখানে খুশি যাওয়া যায়, যে-কোনও জায়গায় লুকিয়ে পড়া যায়।"

জোজো বলল, "তারপর? তারপর?"

কামাল বললেন, "তার পরের দিন আমরা একটা গ্রামে পৌঁছে বিশ্রাম নিলাম। গ্রামের মানুষগুলো ভারী সরল হয়। ওই গ্রামের একটা লোক এক সময় কলকাতায় এসে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা করত। তখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। আমরা বাঙালি শুনে কী খাতিরই করল! থাকার জন্য একটা ঘর দিল, খাওয়াদাওয়ার জন্য কিছুতেই পয়সা নিতে চায় না। সে কলকাতায় ভবানীপুরে থাকত, বারবার সেই গল্প করতে লাগল।"

কাকাবাবু বললেন, "শেষ পাহাড়টায় পৌঁছতে আমাদের আরও দু'দিন লেগেছিল, তাই না কামাল?"

কামাল বললেন, "না, তিনদিন। পথে সেরকম কোনও বিপদ হয়নি। একটা গাছের ডালে চোট লেগে আমি একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলাম শুধু। আর ডাকাতের পাল্লায় পড়তে হয়নি। অন্য ডাকাতরা বোধ হয় জেনে গিয়েছিল যে, আমাদের কাছে জাভেদ দুরানির পাঞ্জা আছে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই মনে হত, কেউ আমাদের পেছন-পেছন আসছে। আমাদের অনুসরণ করছে। একবারও দেখতে পাইনি, কিছু-কিছু শব্দ শুনে সন্দেহ হত। শজারুটার কথা মনে আছে দাদা?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তোরা শজারু দেখেছিস? এখন বিশেষ দেখা যায় না, প্রাণীটা খুব কমে গেছে। সারা গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা থাকে, যখন দৌড়ে যায়, ঝমঝম শব্দ হয়। একদিন রাত্তিরে তাঁবুতে শুয়ে ওইরকম ঝমঝম শব্দ শুনে চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, কোনও মেয়ে নাচছে বুঝি! কামাল বলেছিল, 'এরকম বনের মধ্যে এত রাতে মেয়ে কোথা থেকে আসবে, নিশ্চয়ই কোনও পেত্নি!'"

কামাল হেসে বলল, "হ্যাঁ, সেরকমই মনে হয়েছিল বটে! তারপর টর্চের আলো ফেলে সেটাকে দেখা গেল। গায়ে অত কাঁটা থাকলেও শজারুর মাংস খুব সুস্বাদু। এক গুলিতে ওটাকে মেরে ফেলা যেত। কিন্তু বন্দুকের শব্দ হলে যদি আবার কোনও ঝঞ্ঝাট হয়, তাই লোভ সামলেছি।"

গল্পের মাঝখানে ইউসুফ মিঞা এসে বললেন, "এখন আপনাদের খাবার দেব সার?"

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "না, এখন না, এখন না, একটু পরে।"

ইউসুফ মিঞা বললেন, "ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে!"

সন্তু বলল, "পরে আবার গরম করে দেবেন!"

কামাল একটা হাই তুলে বললেন, "এই পর্যন্তই আজ থাক বরং। ইউসুফ মিঞার রান্না দ্বিতীয়বার গরম করলে আর আগের মতন স্বাদ পাওয়া যায় না। আমাকেও এবার উঠতে হবে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কামাল, তুমি আমাদের সঙ্গে

খাবে না ?"

কামাল বললেন, "না দাদা, আমার ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে থাকবে। আমি ওদের সঙ্গে রোজ রাত্তিরে খেতে বসি। দিনের বেলা সময় পাই না, ওরাও স্কুলে যায়। সেইজন্যই আমি রাত্তিরে বাইরে কোথাও খেতে যাই না।"

জোজো বলল, "আর একটু বসুন। আর একটুখানি শুনি গল্পটা।"

এই সময় বাইরে হঠাৎ পুলিশের হুইশ্‌ল বেজে উঠল। দু'জন পুলিশ ছুটে এল। গেটের কাছে দেখা গেল একজন সাদা পোশাকপরা মানুষ।

কামাল আর সন্তুও দৌড়ে গেল গেটের দিকে। তার আগেই পুলিশ সেই লোকটাকে ধরে ফেলেছে।

লোকটি কাঁচুমাচুভাবে বলল, "আমি একটা চিঠি দিতে এসেছি। একজন আমাকে একশো টাকা দিয়ে বলল, এই বাংলোর সাহেবকে একটা চিঠি পৌঁছে দিতে।"

লোকটি একটা খাকি লম্বা খাম বার করে দিল। তার মধ্যে ইংরিজিতে টাইপ করা একটা চিঠি। চিঠিখানা কাকাবাবুকে উদ্দেশ্য করে লেখা :

রাজা রায়চৌধুরী,

আপনি আমাকে একবার হাতেনাতে ধরে ফেলেও ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাকে আপনি ইচ্ছে করলে মেরে ফেলতে পারতেন, কিংবা পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন। তার কোনওটাই আপনি করেননি। সে-কথা আমি কখনও ভুলব না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। সেইজন্যই আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি খবর পেয়েছি, এখানে আপনার আরও কিছু শত্রু আছে। আপনার যে-কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। আমি সাধ্যমতন তাদের আটকাবার চেষ্টা করব। তবুও আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

ইতি—
আপনার বিশ্বস্ত
সুরযপ্রসাদ

কাকাবাবু চিঠিখানি পড়ে বললেন, "এ কী, এ তো আমাকে ভয়-দেখানো চিঠি নয়। আমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছে। এরকম চিঠি তো আমায় কেউ লেখে না!"

কামাল বললেন, "সুরযপ্রসাদ নিজের নাম দিয়ে আপনাকে এরকম চিঠি লিখেছে ? অতি আশ্চর্য ব্যাপার ! তাকে আপনি নাকখত দিইয়েছিলেন, সে-অপমান সে ভুলে যাবে ?"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওই সুরযপ্রসাদকে আপনি কোথায় ধরেছিলেন ? কেন নাকখত দিয়েছিলেন ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আরে, সে তো আর-একটা গল্প। একসঙ্গে কত গল্প শোনাব ?"

॥ ৮ ॥

খাজুরাহো মন্দির দেখতে যাওয়ার পথে কাকাবাবু অংশুর পরীক্ষা নিলেন। ভোর থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের অবস্থা দেখলে মনে হয়, সহজে এ-বৃষ্টি থামবে না। আজকের দিনটা ঠিক মন্দির দেখতে যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ খাজুরাহো মন্দিরের এলাকাটা অনেকটা বড়। বেশ কয়েকটা মন্দির আছে, সেইসব মন্দিরের দেওয়ালের কারুকাজ দেখতেই দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসে। ভেতরে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না, পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়। বৃষ্টিতে একদম ভিজে যেতে হবে।

কিন্তু সকালবেলা আর কিছুই করার নেই। কামাল সকালে আসতে পারবেন না, তাই আফগানিস্তানের গল্পও জমবে না। সেইজন্য কাকাবাবু সদলবলে স্টেশন ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। চলন্ত গাড়ি থেকে দু'পাশের সবুজ গাছপালার বৃষ্টিতে স্নান করার দৃশ্য দেখতেও ভাল লাগে।

খানিকটা যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অংশু সেই কবিতাটা মুখস্থ হয়েছে ?"

অংশু বলল, "হ্যাঁ সার। তবে আমার মনে হয়, কবিতাটায় ভুল আছে। একটু বাদ পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, "তাই নাকি ? বাদ পড়ে গেছে ? কী বাদ পড়েছে ?"

অংশু বলল, "আপনি ফার্স্ট লাইনটা বলেছিলেন, 'শুনেছো কী বলে গেল সীতারাম বন্দো, তাই না ? ওটা সার বন্দ্যোপাধ্যায় হবে না ?'"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারে, ব্যানার্জি হতে পারে। এমনও হতে পারত, শুনেছ কী বলে গেল সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ পাওয়া যায় ! কিন্তু কবি তো তা লেখেননি ! কবি যেরকম লিখেছেন, সেরকমই মনে রাখতে হবে।"

অংশু বলল, "তা হলে বলছি, শুনুন :

শুনেছ কী বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশে খুব টক টক গন্ধ
সেরকম টক টক থাকে না যদি হয় বৃষ্টি
তখন চেটে দেখো, ইয়ে, তখন চেটে দেখেছি
চিনির মতন মিষ্টি।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, অনেকটা হয়েছে। কিন্তু পুরোটা ঠিক হয়নি।"

জোজো প্রবল প্রতিবাদ করে বলে উঠল, "অনেকটা মানে কী ? কিচ্ছু হয়নি। কবিতাটা মার্ডার করে দিয়েছে। কবিতার একটা শব্দও বদলানো যায় না। একটা শব্দ ভুল হলেই পুরো কবিতাটা নষ্ট হয়ে যায়। চিনির মতন মিষ্টি, না গুড়ের মতন মিষ্টি, না জিলিপির মতন মিষ্টি, তা কী আছে কবিতার মধ্যে ?"

জোজোর রাগ দেখে কাকাবাবু হেসে ফেললেন।

সন্তু অংশুর ফ্যাকাসে মুখ দেখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, "আহা, অনেকটা তো চেষ্টা করেছে। আর একটু চেষ্টা করলেই ঠিক-ঠিক মুখস্থ হয়ে যাবে।"

জোজো বলল, "কবিতায় শব্দ ভুল করলেই সেটা খুব বাজে হয়ে যায়। সেরকম কবিতা শুনলে আমার গা কিরকির করে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে জোজো, তুমি আমাদের একটা ভাল কবিতা শোনাও বরং।"

জোজো অমনই শুরু করল !

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা সাতটা গাড়ি !
ছিল কুকুর, ছিল বিড়াল, নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ'সাত জোড়া ;
দেউড়ি ভরা দোবে-চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস বেহারা চাপরাশি
—আর ছিল এক মাসি ...

সন্তু বলল, "এটা যে খুব লম্বা কবিতা রে !"

কাকাবাবু বললেন, "তা হোক, শুনি। মন দিয়ে শোনো অংশু, এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ..."

প্রায় ছ'পাতার কবিতা নির্ভুল মুখস্থ বলে গেল জোজো। কাকাবাবু তার পিঠ চাপড়ে বললেন, "চমৎকার। সত্যি, জোজো খুব ভাল আবৃত্তি করে। ওর অনেক গুণ আছে।"

জোজো বলল, "বাবার সঙ্গে একবার সুইডেনে গিয়েছিলাম, রাজা-রানির সামনে এই কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাতে হল। রানি তো শুনে কেঁদেই ফেললেন।"

সন্তু নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, "সুইডেনের রানি বুঝি বাংলা জানেন ?"

জোজো সগর্বে বলল, "তুই জানিস না? রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর সুইডেনের সব শিক্ষিত লোকই বাংলা পড়ে।"

সন্তু বলল, "ইস, তোকে একটা নোবেল প্রাইজ দিল না?"

জোজো বলল, "আমি যখন লিখতে শুরু করব, তখন দেবে, দেখে নিস!"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো লিখতে শুরু করলে গল্পের কোনও অভাব হবে না!"

অংশু সাধারণত অন্যদের কথার সময় চুপ করে থাকে। এখন সে বলল, "সার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি সবসময় আমাকে সার-সার করো কেন? সন্তু-জোজোর মতন তুমিও কাকাবাবু বলতে পারো। আমার সমান বয়েসীও অনেকে এখন আমাকে কাকাবাবু বলে!"

অংশু উৎসাহিত হয়ে বলল, "আপনি আমাকে পারমিশান দিচ্ছেন? আমিও আপনাকে কাকাবাবু বলতে পারি সার? আচ্ছা কাকাবাবু, এখানে এসে শুনছি, আপনার অনেক শত্রু। কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন? আচ্ছা, তোমার কথাই ধরা যাক। তুমি ট্রেনে ডাকাতি করতে এসেছিলে, তোমাকে ধরে যদি আমি পুলিশের হাতে তুলে দিতাম, তা হলে তোমার অন্তত তিন-চার বছর জেল হত। জেলে বসে-বসে তুমি ভাবতে, ওই খোঁড়া লোকটার জন্যই আমি ধরা পড়লাম। ঠিক আছে, ব্যাটাকে দেখে নেব! জেল থেকে বেরিয়ে তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে। সেরকম অনেক ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর লোককে আমি ধরে ফেলেছি, শাস্তি দিয়েছি, আবার ক্ষমাও করেছি। তারা অনেকেই আমার শত্রু হয়ে আছে। আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। এ-পর্যন্ত কেউ কিন্তু আমাকে মারতে পারেনি।"

জোজো বলল, "আমার বাবা আপনার নামে একটা যজ্ঞ করেছেন। তার ফল কী হয়েছে জানেন কাকাবাবু? আপনার এখন ইচ্ছা-মৃত্যু। আপনাকে অন্য কেউ মারতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যদিও যজ্ঞ-টজ্ঞতে বিশ্বাস করি না, তবু যাই হোক, তোমার বাবাকে ধন্যবাদ!"

অংশু বলল, "যদি আপনাকে কেউ গুলি করে দেয়?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কাছেও তো পাইপগান ছিল, তুমি তো গুলি করতে পারলে না?"

অংশু সন্তুর দিকে তাকাল। তারপর বলল, "সন্তুকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। ও যে হঠাৎ অতটা লাফিয়ে উঠতে পারে—"

জোজো মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। এবার বলল, "কাকাবাবু, কালকের সেই নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা আজও পেছন-পেছন আসছে—"

কাকাবাবুও মুখ ঘোরালেন, কিন্তু গাড়িটা দেখতে পেলেন না।

জোজো বলল, "এইমাত্র আড়ালে চলে গেল।"

দিনের বেলা পুলিশের গাড়িটাকে সঙ্গে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির জন্য রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া খুব কম। বৃষ্টি ক্রমশই বাড়ছে। একটু পরে বৃষ্টির এমন তোড় হল যে, সামনের কিছু দেখাই যায় না।

কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, "গাড়ি থামাও, এখন চালাবার দরকার নেই। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।"

গাড়িটা থামানো হল রাস্তার একপাশে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ফ্লাস্কে করে চা আনা হয়েছে না? বার কর, এখন একটু চা খাওয়া যাক।"

জোজো বলল, "অনেক স্যান্ডউইচও দিয়ে দিয়েছে। আমার একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে।"

বাইরে ঝম্‌ঝম করছে বৃষ্টি। গাড়ির সব কাচ তোলা। সবাই স্যান্ডউইচ আর চা খেতে লাগল, ড্রাইভারকেও দেওয়া হল।

একটা জিপগাড়ি এই গাড়িটা ছাড়িয়ে চলে গিয়ে থেমে গেল। তারপর আবার পিছিয়ে এল। মনে হল, এই গাড়িটাও যেন এখানে একটা বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।

জিপ থেকে নেমে দৌড়ে এল দু'জন লোক। এ-গাড়িটার দু'পাশে দাঁড়াল। জোজো একটা জানলার পাশে বসে আছে, তার কাছে দাঁড়িয়ে একজন লোক কী যেন বলতে লাগল। কাচ বন্ধ বলে কিছু শোনাই যাচ্ছে না।

কাকাবাবু বলল, "জোজো, কাচটা খোলো। দেখো তো, ওরা কী চাইছে।"

জোজো কাচ খুলতেই সেই লোকটি জোজোর বুকের দিকে একটা রিভলভার তুলল। অন্য লোকটির হাতেও রিভলভার।

এদিকের লোকটি হিন্দিতে বলল, "নামো, নেমে এসো গাড়ি থেকে।"

কাকাবাবুর এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাত কোমরের কাছে। লোকটি কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলল, "হাত তুলবে না, ওই অবস্থায় নেমে এসো।"

কাকাবাবু সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বৃষ্টির মধ্যে নামব কেন?"

লোকটি বিশ্রী একটা গালাগালি দিয়ে বলল, "শিগ্‌গির নাম, নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "এ কী কাণ্ড, এ যে দেখছি দিনে ডাকাতি!"

হঠাৎ কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগল সেই লোকটির কাঁধে। সে পড়ে গেল মাটিতে। অন্য লোকটি ছুটে চলে গেল একটা গাছের আড়ালে। সেও গুলি চালাল, এই গাড়ির দিকে নয়, পেছন দিকে।

কাকাবাবুরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, খানিক দূরে থেমে আছে একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি। তার জানলা দিয়ে বেরিয়ে আছে একটা রাইফেলের নল।

এ-গাড়ির ড্রাইভার আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে হুস করে স্টার্ট দিয়ে দিল। পেছন দিকে শোনা গেল দু' পক্ষের গুলি বিনিময়ের শব্দ।

কাকাবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন, "ব্যাপারটা কী হল বল তো, সন্তু। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারাই বা আমাদের ধরতে এল, কারাই বা তাদের মারতে গেল?"

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো বলল, "আমার মনে হয়, আপনার কোনও পুরনো শত্রুর দল আমাদের ধরে নিতে এসেছিল। এই সময়ে এসে পড়ল সুরযপ্রসাদের দল। তারা আমাদের বাঁচিয়ে দিল। আমি ওই নীল ফিয়াট গাড়িটার কথা আগে বলিনি? ওতে সুরযপ্রসাদ নিজে কিংবা ওর কোনও সহকারী সবসময় আমাদের পাহারা দিচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সুরযপ্রসাদের এত কী দায় পড়েছে আমাদের বাঁচাবার? ক্রিমিনালরা কারও জন্য তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করে না।"

সন্তু বলল, "ফিয়াট গাড়ির লোকটার হাতের টিপ খুব ভাল।"

গাড়িটা বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে। কাকাবাবু আবার ড্রাইভারকে বললেন, "এবার থামাও। গাড়ি ঘোরাতে হবে। আজ আর খাজুরাহো মন্দিরে গিয়ে কাজ নেই। কামালকে এই ঘটনাটা জানানো দরকার।"

অংশু জিজ্ঞেস করল, "আমরা এই রাস্তা দিয়েই আবার ফিরব?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, ভয় করছে নাকি? দিনের বেলা বড় রাস্তার ওপর মারামারি পাঁচ মিনিটের বেশি চলে না। এখন গিয়ে দেখবে কিচ্ছু নেই।"

ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে ভয়ে-ভয়ে আস্তে চালাতে

লাগল।

একটু পরেই দেখা গেল, নীল রঙের ফিয়াটটা এদিকেই আসছে। কাকাবাবুদের গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই সে-গাড়িটা ঝট করে থেমে গিয়ে সাঁ করে ঘুরিয়ে নিয়ে পালাতে লাগল।

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "জোরে চালাও তো, গাড়িটা ধরো। ওতে কে আছে, আমি দেখতে চাই।"

শুরু হল দুটো গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। কিন্তু ফিয়াট গাড়িটা ছোট, স্পিডও বেশি। তাকে ধরা গেল না, মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

আগে যেখানে চা খাওয়ার জন্য থামা হয়েছিল, সেখানে গোলাগুলি চালাবার চিহ্নমাত্র নেই। একটা লোকের কাঁধে তো গুলি লেগেছিলই, নিশ্চিত অনেক রক্ত পড়েছিল, বৃষ্টিতে তা ধুয়ে গেছে।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "নীল গাড়িটা যদি আমাদের পাহারাই দিতে চায়, তা হলে আমাদের দেখে পালিয়ে গেল কেন ?"

সন্তু বলল, "দূর থেকে উপকার করতে চায়। পরিচয় জানাতে চায় না।"

অংশু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, নীল গাড়িটা যদি না আসত, তা হলে তো এই লোকদুটোর কথায় গাড়ি থেকে নামতেই হত। তখন আপনি কী করতেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো জানি না। আমি আগে থেকে কিছু ভেবে রাখি না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

অংশু বলল, "লোকদুটোকে যেমন হিংস্র মনে হল, আমাদের মেরে ফেলতেও পারত।"

কাকাবাবু বললেন, "যারা মারতে চায়, তারা প্রথমেই গুলি চালায়। ওরা আমাদের কোথাও ধরেটরে নিয়ে যেত বোধ হয়।"

কাকাবাবু আর কথাবার্তায় উৎসাহ দেখালেন না। আপনমনে দু'বার বললেন, 'উপকারী বন্ধু, উপকারী বন্ধু', তারপর গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন।

গাড়ি ফিরে এল শহরে। কামালকে তাঁর বাড়ির একতলাতেই একটা দোকানঘরে পাওয়া গেল। সেখানে আরও লোক রয়েছে। কথা বলা যায় না। সবাই চলে এলেন ভেতরের বৈঠকখানায়।

সব শুনে কামাল খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, " এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। দিনের বেলায় এরকম কাণ্ড তো এখানে কখনও শুনিনি ! বাইরে থেকে এসেছে ? লোক দুটোকে চিনতে পারলেন ? আপনার পুরনো শত্রু ?"

কাকাবাবু বললেন, "দু'জনেরই মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত ভাড়াটে গুণ্ডা। অন্য কেউ পাঠিয়েছে। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটাতে কে ছিল ? তোমার কি মনে হয়, সুরযপ্রসাদ আমাদের পাহারা দিচ্ছে ?"

প্রবল বেগে দু'দিকে মাথা নেড়ে কামাল বললেন, "আমার তা বিশ্বাস হয় না। সুরযপ্রসাদ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। মায়া-দয়া, কৃতজ্ঞতাবোধ, এসব কিছু তার নেই। আপনি তাকে নাকেখত দিইয়েছিলেন, সে-কথা এখানে অনেকেই জানে। সে অপমানের সে শোধ নেবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তার উপকারও করেছিলাম। খাজুরাহো মন্দিরের মূর্তিগুলো সব সে ফেরত দিয়েছিল, তাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিইনি। তোমার সঙ্গে তার কবে দেখা হয়েছে ?"

কামাল বললেন, "সুরযপ্রসাদকে তিন-চার বছর দেখা যায় না। পুলিশও তার খোঁজ রাখে না। শরীর তেমন ভাল নয় বলে সে এখন কোথাও লুকিয়ে থাকে। সেখান থেকেই দল চালায়।"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো তার পরিবর্তন হয়েছে। অপমানের কথা ভুলে গিয়ে উপকারটাই মনে রেখেছে। নইলে ওরকম চিঠি পাঠাবে কেন ?"

কামাল বললেন, "কী জানি !"

কাকাবাবু বললেন, "কী ঝামেলা, কোথাও কি একটু শান্তিতে থাকা যাবে না ?"

কামাল বললেন, "আপনারা কি এখন গেস্ট হাউসে ফিরে যাবেন ? দুপুরে খাওয়ার কথা তো বলে আসেননি।"

জোজো বলল, "খাজুরাহোর কোনও হোটেলে খেয়ে নেওয়ার কথা ছিল, সেখানে তো যাওয়াই হল না।"

কামাল বললেন, "বৃষ্টির দিন, আমাদের বাড়িতে আজ খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। আপনারা এখানেই খেয়ে নিন না। খিচুড়ি আর চিংড়িমাছ ভাজা। এইসব জায়গায় ইলিশমাছ পাওয়া যায় না।"

জোজো প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "খিচুড়ি আমি খুব ভালবাসি !"

কাকাবাবু বললেন, "রোজ মোগলাই খানা খাচ্ছি, আজ খিচুড়ি খেলে মুখবদল হবে। আজ তোমার বউয়ের হাতের রান্নাও খেয়ে দেখা যাবে !"

কামাল ভেতরে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন। বৃষ্টি এখনও পড়েই চলেছে। ঠিক যেন বাংলাদেশের বর্ষা।

আধঘণ্টার মধ্যেই খাওয়ার টেবিলে বসা হল। শুধু খিচুড়ি আর চিংড়িমাছ নয়, তার সঙ্গে বেগুনভাজা, আলুভাজা, আলুবোখরার চাটনি, দই, তিনরকম মিষ্টি। খিচুড়িটা সত্যিই অতি উপাদেয় হয়েছে।

খেতে-খেতে কামাল বললেন, "দাদা, দিনের বেলা এইরকম কাণ্ড হল, এবার থেকে আপনাদের সব সময় পুলিশের গাড়ি নিয়ে ঘুরতে হবে। আজ আপনাদের একটা বিপদ ঘটে গেলে আমি নরেন্দ্র ভার্মার কাছে কী কৈফিয়ত দিতাম ? উনি আমাকে বারবার বলে দিয়েছেন, এখানে আপনাদের বিপদের আশঙ্কা আছে।"

কাকাবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "সবসময় পুলিশ নিয়ে ঘোরা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। এখানে আমার শরীরটা বেশ ভাল আছে, অসুখ-টসুখ সেরে গেছে। ভেবেছিলাম, এখানে সবাই মিলে গল্প করব আর বেড়াব। এর মধ্যে নরেন্দ্র আর খোঁজখবর নিয়েছিল ?"

কামাল বললেন, "না। সেটাই একটু আশ্চর্যের ব্যাপার। উনি আপনার জন্য এত চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে আর ফোন করলেন না। কোনও সাড়াশব্দই নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে ! হয়তো আন্দামান চলে গেছে, কিংবা লাদাখ। ওকে বহু জায়গায় যেতে হয়।"

কামাল বললেন, "এরকম বুদ্ধিমান আর সুদক্ষ অফিসার আর দেখা যায় না ! দারুণ লোক। আপনাকে খুব ভালবাসেন।"

কাকাবাবু বললেন, নরেন্দ্র আমার খুব ভাল বন্ধু। দু'জনে একসঙ্গে অনেক কাজ করেছি। অনেক বিপদেও পড়েছি। আফগানিস্তানেও তো শেষপর্যন্ত নরেন্দ্রই এসে—"

জোজো বাধা দিয়ে বলল, "না, না, শেষটা আগে বলে দেবেন না ! আমরা পুরো গল্পটা এখনও শুনিনি ! কাকাবাবু, আমার আর রাত্তির পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকছে না। খেয়ে ওঠার পর বাকি গল্পটা আপনাদের বলতে হবে।"

কামাল বললেন, "এই দুপুরবেলা কি গল্প জমবে ?"

সন্তু বলল, "কেন জমবে না ? এটা কি ভূতের গল্প নাকি ? ভূতের গল্প রাত্তিরে শুনতে হয় !"

কামাল হেসে বললেন, "নাঃ, এর মধ্যে ভূতটুত কিছু নেই।"

॥ ৯ ॥

খেয়ে ওঠার পর আবার বসা হল বৈঠকখানায়। কামাল একটা পান মুখে পুরলেন, কাকাবাবু পান খান না, খেলেন খানিকটা মৌরি-মশলা। মুখোমুখি দুটো সোফায় বেশ হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসা যায়।

কামাল বললেন, "হ্যাঁ। আমরা যে পাহাড়টায় পৌঁছলাম, তার নীচে একটা গ্রাম আছে, সেটার নাম তৈমুরডেরা। গ্রামটা ছোট, মাত্র তিরিশ-পঁয়তিরিশটি পরিবার। আমাদের দেখে সেখানকার লোকেরা খুব অবাক হল না, আরও কিছু-কিছু বিদেশি নাকি সেই পাহাড়ে কীসব খোঁজাখুঁজি করে গেছে। তারা অবশ্য সবাই সাহেব। শুনে আমরা একটু দমে গিয়েছিলাম। আমরা যা খুঁজতে এসেছি, তা কি আগেই কেউ নিয়ে গেছে?"

জোজো বলল, "অশোকের শিলালিপি? অন্য কেউ নিয়ে যাবে কী করে?"

সন্তু বলল, "অশোকের শিলালিপি নয়। অন্য কিছু। চুপ করে শোন না।"

কামাল বললেন, "সেই গ্রাম থেকে আমরা কিছু চাল-আটা, আলু-পেঁয়াজ আর নুন কিনে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলাম। পাহাড়টা বেশ দুর্গম, ওপরদিকে কোনও জনবসতি নেই। গাছপালাও খুব কম। ভয়ঙ্কর খাদ আর দু-একটা গুহা আছে। ওদেশে তো আর সাধু-সন্ন্যাসী নেই, তাই গুহাগুলো ফাঁকা। আমরা আশ্রয় নিলাম সেইরকম একটা গুহায়। দিন তিনেক আমরা প্রায় চুপচাপ বসে রইলাম। আমাদের কেউ অনুসরণ করছে কিনা সেটা বোঝা দরকার ছিল। আমি দু'বেলা রুটি পাকাতাম কিংবা খিচুড়ি বানাতাম।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি রোজ রাঁধোনি। আমিও রাঁধতে জানি। একদিন কীরকম তেল ছাড়া শুধু নুন আর পেঁয়াজ দিয়ে আলুসেদ্ধ মেখেছিলাম!"

জেজো বলল, "আলু সেদ্ধ আবার রান্না নাকি? সবাই পারে!"

কাকাবাবু বললেন, "ওইরকম জায়গায় খিদের চোটে শুধু আলুসেদ্ধই অমৃত মনে হয়।"

কামাল বললেন, "তিনদিন পর শুরু হল খোঁজাখুঁজি।"

জোজো বলল, "এবার বলতেই হবে কী খুঁজছিলেন!"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা যা খুঁজছিলাম, তা খুবই দামি জিনিস। সম্রাট কনিষ্ক একবার এক তুর্কি সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে হেরে যান। জোজো বেশি ইতিহাস শুনতে ভালবাসে না, তাই সংক্ষেপে বলছি। অনেক বড় রাজার পক্ষেও হঠাৎ কোনও ছোট রাজার কাছে হেরে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরকম অনেকবার হয়েছে। কনিষ্ক হেরে গেলেন বটে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি, পালিয়ে যান। পরে আবার সৈন্যবাহিনী গড়ে সেই সুলতানের সঙ্গে লড়াই করেন এবং জিতেও যান। প্রথম যুদ্ধটা হয়েছিল এই কাছাকাছি অঞ্চলে, দ্বিতীয় যুদ্ধটা হয়েছিল কাবুলের কাছে। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় কনিষ্ক ছদ্মবেশ ধরেছিলেন, সেইজন্য তিনি নিজের রাজমুকুট ও আরও কিছু-কিছু সম্পদ লুকিয়ে রেখে যান মাটিতে গর্ত পুঁতে। সেই জিনিসগুলো রাখার ভার দিয়েছিলেন তাঁর এক অতি বিশ্বাসী সেনাপতিকে। সে ছাড়া জায়গাটার সন্ধান অন্য কেউ জানত না। কাবুলে পৌঁছবার আগেই সেই সেনাপতিটি একটি দুর্ঘটনায় মারা যায়। সেইজন্য রাজা কনিষ্কর সেই গুপ্ত সম্পদ আর কোনওদিন উদ্ধার করা যায়নি।"

জোজো বলল, "তার মানে, গুপ্তধন?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকটা তাই। তবে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট কনিষ্কের মুকুটটা খুঁজে বার করা। বুঝতেই পারছ, যে-সম্রাটের মুখখানা কেমন দেখতে ছিল তাই-ই আমরা জানি না, তাঁর একটা মূর্তিরও মুণ্ডু নেই, সেই সম্রাটের মুকুটখানারও ঐতিহাসিক মূল্য সাঙ্ঘাতিক।"

জোজো বলল, "এতকাল কেউ জানতে পারেনি, আপনারা কী করে জানবেন সেগুলো কোথায় লুকনো আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক ঐতিহাসিক নানারকম অনুমান করেছেন। এ-ব্যাপারে আমার নিজের বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সেই সময় প্রভাকরন নামে একজন খুব বড় ইতিহাসের পণ্ডিত ছিলেন দিল্লিতে। সেই প্রভাকরন কিছু পুঁথিপত্তর আর মুদ্রা থেকে একটা থিয়োরি খাড়া করেছিলেন। সেটা মিলতেও পারে, না মেলার সম্ভাবনাই বেশি। প্রভাকরন অবশ্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন না তিনি ঠিক জায়গাটা আবিষ্কার করেছেন। প্রভাকরণ তখন বৃদ্ধ, তার ওপর তাঁর হাঁপানি রোগ। তিনি নিজে তো আর আফগানিস্তানে এসে পাহাড়-পর্বতে খোঁজাখুঁজি করতে পারবেন না, তাই একদিন আসতে বলেছিলেন, 'রাজা রায়চৌধুরী, তোমার বয়েস কম, শরীরে শক্তি আছে, মনের জোরও আছে, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? যদি ব্যর্থ হও, সেটা তোমার দুর্ভাগ্য, আর যদি সার্থক হও, ইতিহাসে তোমার নাম থেকে যাবে!'"

কামাল বললেন, "তোমরা কি জানো, কাবুলের মিউজিয়ামে রাজা রায়চৌধুরীর ছবি আছে?"

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "আঃ, ওসব কথা বাদ দাও। গল্পটা বলো!"

কামাল বললেন, "সত্যি ঘটনাটা তো ঠিক গল্পের মতন বলা যায় না। পরের কথা আগে এসে পড়ে। অন্য কথা মনে পড়ে যায়!"

সন্তু বলল, "তার মানে আপনারা সেই মুকুট খুঁজে পেয়েছিলেন!"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ। প্রভাকরনের তত্ত্ব কেউ বিশ্বাস করেনি, শুধু আমরা দু'জনে বিশ্বাস করে অত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। প্রভাকরন একটা ম্যাপ এঁকে দিয়েছিলেন, সেই ম্যাপ ধরে-ধরে আমরা ইঞ্চি-ইঞ্চি করে খুঁজেছি। চারদিন না পাঁচদিন লেগেছিল।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পাওয়া গেল? কোনও গুহার মধ্যে?"

কাকাবাবু বললেন, "গুহাগুলো তো অন্যরা খুঁজতে বাকি রাখেনি। না, কোনও গুহার মধ্যে নয়। জলের নীচে। একটা গভীর খাদের নীচে বহুকাল ধরে জল জমে আছে। দড়ি বেঁধে আমরা সেই খাদে নেমেছিলাম। ম্যাপে যেখানে পিন পয়েন্ট করা সেখানে দেখি যে জল। তখন সেই জলেই ডুব দিলাম অনেকবার। সেখানে অনেক কিছু ছিল, সব আমরা নিতেও পারিনি। একটা হাতির দাঁতের তৈরি বাক্স পেয়েছিলাম, হাতির দাঁতের তৈরি বলেই এতযুগ পরেও সেটা পচেনি। সেই বাক্সের মধ্যে ছিল রাজমুকুট। তোরা শুনে অবাক হয়ে যাবি, মুকুটটা কিন্তু সোনার তৈরি নয়। ভারত জয় করার আগে তো কনিষ্ক সম্রাট ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ রাজা। মুকুটটা তামার তৈরি। তার ওপরে লাল ও সবুজ পাথর বসানো, সেগুলো চুনি আর পান্না। সব মিলিয়ে মুকুটটার দাম খুব বেশি নয়, কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়ে দাম অনেক।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কী করে প্রমাণ হবে যে ওটা কনিষ্কেরই মুকুট?"

কাকাবাবু বললেন, "যে-কোনও জিনিসই কতদিন আগে তৈরি, তা এখন প্রমাণ করা যায়। তা ছাড়া কিংবদন্তির সঙ্গে মিশে গেছে। ওই বাক্সটা পেয়ে আমাদের কী যে আনন্দ হয়েছিল! জল-কাদা-মাখা ভূতের মতন চেহারা নিয়ে আমি আর কামাল সেই খাদের মধ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছি। এতদিনের

পরিশ্রম সার্থক।"

কামাল বললেন, "ওই বাক্সটা ছাড়াও আমরা কিছু সোনা রুপোর গয়নাও পেয়েছিলাম। সেগুলো বোধ হয় রানিদের। কোনও অভিজ্ঞ ডুবুরিকে এনে খোজাখুঁজি করলে আরও অনেক কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু আমাদের কাছে ওই মুকুটটাই ছিল যথেষ্ট।"

কাকাবাবু বললেন, "আইন অনুযায়ী ওইসব জিনিসই আফগানিস্তান সরকারের প্রাপ্য। যদিও আবিষ্কার করেছি আমরা, ওরা কিছুই করেনি, তবু এক দেশের সম্পদ অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া যায় না। কাবুলে গিয়ে গভর্নমেন্টকে সব জমা করে দিতে হবে, আমরা শুধু ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারব।"

কামাল বললেন, "আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, মুকুটটা অন্তত লুকিয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসব। কিছুদিন রেখে, বড়-বড় পণ্ডিতদের দেখিয়ে তারপর এ-দেশকে ফেরত দেব। দাদা রাজি হননি। যাই হোক, এত কষ্টের পর ওই জিনিসগুলো পেয়ে আমরা এমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম যে, অন্য কোনও কথা মনেই পড়েনি। দাদা বারবার বলছিলেন, সম্রাট কনিষ্কের মুকুট! সত্যি-সত্যি আমাদের হাতে। প্রভাকরন কত খুশি হবেন! কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি! একটা গাছতলায় বসে আমরা এই সব বলাবলি করছি, তখন বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের গুহা সেখান থেকে অনেকটা দূরে। একটু চা খাওয়া দরকার, তবু আমরা উঠি-উঠি করেও উঠছি না। অতখানি খাদে নামা আর ওঠা, জলে বারবার ডুব দেওয়া, পরিশ্রম তো কম হয়নি, আনন্দের চোটে সেসব ভুলে গেছি, এই সময় এল বিপদ! সেই নির্জন পাহাড়ে হঠাৎ কোথা থেকে দু'জন লোক আমাদের পেছন দিক থেকে হঠাৎ হাজির হল। একজনের হাতে রাইফেল, অন্যজনের হাতে রিভলভার! আমরা সাবধান হওয়ারও সময় পেলাম না। একজন আমার বুকে রাইফেলের নল ঠেকাল, আর একজন রাজাদাদার মাথার দিকে উঁচিয়ে রইল রিভলভার!"

কাকাবাবু বললেন, "সেই দু'জনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলাম। সে কে হতে পারে বল তো?"

জোজো বলে উঠল, "জাভেদ দুরানি! সেই ডাকাতের সর্দার!"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওই পাহাড়ি লোকরা খুব হিংস্র হলেও একবার কথা দিলে কথা রাখে। সে আমাদের পাঞ্জা দিয়েছে, আর সে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না। সে হচ্ছে ওই অবোধরাম পেহলবান। সে গোপনে আমাদের অনুসরণ করেছিল। সে ঠিক সন্দেহ করেছিল যে, আমরা কোনও দামি জিনিসের সন্ধানে এসেছি। তার সঙ্গে মাত্র একজন লোক, আমরাও দু'জন, যদি একটু আগে টের পেতাম, তা হলে ওদের খপ্পরে অমনভাবে পড়তে হত না।"

কামাল বললেন, "দাদার মাথার দিকে রিভলভার উঁচিয়ে অবোধরাম দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'রাজা রায়চৌধুরী, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ওই বাক্সটা আমার হাতে তুলে দাও!' দাদার কোলের ওপর সেই বাক্স। ওই লোকটা যেমন নিষ্ঠুর, আমরা কোনওরকম চালাকি করতে গেলেই ও নির্ঘাত গুলি চালাবে! আমি তো ভাবলাম, যাঃ, সব গেল! এখন প্রাণে বাঁচবার জন্য বাক্সটা দিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু দাদা অন্য ধাতুতে গড়া!"

কাকাবাবু বললেন, "ভুল, কামাল, ভুল। ওই অবস্থায় সবকিছু দিয়ে দিলেও প্রাণে বাঁচা যায় না। অবোধরাম আমাদের কাছ থেকে বাক্সটা নিয়ে নেওয়ার পরও ঠিক গুলি চালাত। প্রমাণ রাখবে কেন, আমাদের মেরে রেখে চলে যেত।"

অংশু কৌতূহল দমন না করতে পেরে বলে উঠল, "আপনারা কী করে বাঁচলেন? দু'জনের দিকেই রাইফেল আর রিভলভার?"

কামাল বললেন, "আমি ঘাবড়ে গেলেও ওই অবস্থায় দাদার মাথার ঠিক ছিল। উনি করলেন কী, বললেন, 'বাক্সটা চাও, এই নাও' বলেই বাক্সটা ছুড়ে দিলেন ডান দিকে। সেদিকে পাহাড়টা ঢালু হয়ে গেছে। বাক্সটা গড়াতে লাগল, আর একটু হলেই পড়ে যেত অনেক নীচে। অবোধরাম দৌড়ে গিয়ে কোনওরকমে ধরে ফেলল বাক্সটা। দাদা করলেন কী, সেই সুযোগে লাফিয়ে উঠে অন্য লোকটার ঘাড়ে এসে পড়লেন। আমার দিকে সে রাইফেল উঁচিয়ে ছিল, সে দাদার দিকে পেছন ফিরে ছিল তো। দাদা তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে কেড়ে নিলেন রাইফেলটা।"

জোজো বলল, "দারুণ! আমি হলেও ঠিক এইরকমই করতাম!"

কামাল বললেন, "তাতেও কিন্তু শেষরক্ষা হল না!"

জোজো বলল, "কেন? ওই লোকটার কাছে রিভলভার, আপনাদের কাছে রাইফেল। রিভলভারের চেয়ে রাইফেলের শক্তি বেশি!"

কামাল বললেন, "তা ঠিক। কিন্তু বিপদ এল অন্যদিক থেকে। ওইরকম ব্যাপার দেখে অবোধরাম লুকিয়ে পড়ল একটা বড় পাথরের আড়ালে। আমাদের এদিকে সেরকম কিছু ছিল না। আমরা দাঁড়ালাম গাছটার পেছনে। ও গুলি চালালে আমাদেরও গুলি চালাতে হল। দু'বার এরকম গুলি বিনিময়ের পরেই অবোধরাম হাসতে-হাসতে সামনে চলে এল। তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী, ওটা ফেলে দাও, ওটাতে আর কোনও কাজ হবে না!' রাইফেলটায় মাত্র দুটোই গুলি ছিল, আর গুলি নেই। অবোধরামের কাছে অনেক গুলি রয়েছে। অন্য লোকটা এবার উঠেই দাদার মুখে এক ঘুসি চালাল। আমাদের আর কিছুই করার নেই। অবোধরাম বলল, 'তোমাদের মারতে আমার দুটোর বেশি গুলি খরচ হবে না। আর ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই কোরো না। রায়চৌধুরী, তুমি খুব চালাক, তাই না? পাথরের ওপর কীসব লেখাটেখার ছবি তোলার জন্য এতদূর এসেছ, এ-কথা আমি বিশ্বাস করব? এইসব পুরনো জিনিস বিলেত-আমেরিকায় বহু দামে বিক্রি হয়, তোমরা সেই লোভে এসেছ। এবার মরো!"

অংশু বলল, "অ্যাঁ? তক্ষুনি গুলি করল?"

কাকাবাবু বললেন, "একটু সময় নেওয়ার জন্য আমি বললাম, 'ও জিনিস তুমি দেশের বাইরে নিতেও পারবে না, বিক্রিও করতে পারবে না!' তা শুনে অবোধরাম আরও জোরে হেসে উঠল।"

কামাল বললেন, "অন্য লোকটা হাতের সুখ করার জন্য আমার মুখেও একটা ঘুসি মারল। অবোধরাম তাকে বলল, 'রহমত, দাঁড়া, ঘুসি মেরে কেন হাতব্যথা করছিস, ওদের আরও কঠিন শাস্তি দেব! দড়ি দিয়ে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেল!' অবোধরাম রিভলভার উঁচিয়ে আছে, আমাদের বাধা দেওয়ার উপায় নেই, রহমত নামে অন্য লোকটা আমাদের দু'জনকেই বেঁধে ফেলল। অবোধরাম দাদার চুলের মুঠি ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল একটু দূরে। তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী, তোমাদের জন্য গুলি খরচ করে কী হবে! তোমাদের এমনভাবে রেখে যাব, যাতে একদিন ভূত হয়ে এই পাহাড়ে ঘুরবে।' একটা গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ও দাদাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল।"

অংশু আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ? তারপরও উনি বেঁচে রইলেন কী করে?"

কাকাবাবু মুচকি হাসলেন।

কামাল বললেন, "দেখছই তো আমরা ভূত হইনি, দিব্যি বেঁচে আছি। তারপর যা হল, সেটা শুধু রাজা রায়চৌধুরীর পক্ষেই সম্ভব। রহমত একটা ভুল করেছিল, সে আমাদের হাত-পা বেঁধেছিল বটে, কিন্তু নিয়ম হচ্ছে, হাত দুটোকে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে বাঁধা। সে বেঁধেছিল সামনের দিকে। সেই অবস্থায় হাত দুটো ওপরে তোলা যায়। দাদাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতেই আমি চোখ বুজে কেঁদে উঠলাম। ভাবলাম যে উনি শেষ হয়ে গেলেন, এবার আমার পালা! কিন্তু দাদা হাত দুটো তুলে মাথার ওপরের দড়িটা ধরে ফেললেন, তাতে গলায় টান লাগে না। সেই অবস্থায় দুলতে লাগলেন। তাতে মজা পেয়ে অবোধরাম বলল, 'কতক্ষণ দুলতে পারো দেখি!' এ-কথা ঠিক, ওই অবস্থায় বেশিক্ষণ দোলা যায় না, হাত কাঁপতে থাকে, তারপর হাত একটু আলগা হলেই গলায় ফাঁস লেগে জিভ বেরিয়ে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে শেষ। কিন্তু রাজা রায়চৌধুরীর অসীম সাহস। ওই অবস্থায় দুলতে-দুলতে উনি একবার জোরে দুলে এসে অবোধরামের মুখে জোড়া পায়ে একটা লাথি কষালেন। অবোধরাম ছিটকে পড়ে গেল। দাদা ধমকে বললেন, 'ইডিয়েট, গুলি কর। আমাকে মারতে চাস তো গুলি কর, নইলে আমি কিছুতেই মরব না!'"

কাকাবাবু বললেন, "সাহসের ব্যাপার নয়। এটাও একটা কৌশল। ক্রিমিনালদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। আমি কিছু না বললে ও গুলি করত ঠিকই। আমি হুকুম দিলাম বলেই ও গুলি করবে না। তাতে আরও কিছুটা সময় পাওয়া যাবে!"

কামাল বললেন, "ঠিক তাই। লাথি খাওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে অবোধরাম প্রথমে রাইফেলটা নিয়ে তার কুঁদো দিয়ে দাদার পায়ে দু'বার খুব জোরে মারল। তারপর বলল, 'গুলি করব? মোটেই না? এইরকমভাবে থাক, আর তিলতিল করে মর। এই পাহাড়ে কেউ আসবে না, আর ওই দড়িও ছিঁড়বে না।' তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, রহমতকে নিয়ে অবোধরাম আমাদের ওই অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল!"

কথা থামিয়ে কামাল বললেন, "এখন এই পর্যন্ত থাক। বাকিটা আবার পরে হবে। আমার একটু কাজে বেরনো দরকার।"

সন্তু-জোজো-অংশু তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠল, "না, এখানে থামলে চলবে না! আজ সবটা বলতেই হবে।"

জোজো উঠে এসে কামালের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনাদের যেতেই দেব না?"

কাকাবাবু বললেন, "আর তো বেশি নেই। কামাল, শেষ করেই দাও।"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ, আর বেশি নেই অবশ্য।"

জোজো বলল, "সংক্ষেপ করলে হবে না। সব বলতে হবে। কাকাবাবু কী করে ফাঁসির দড়ি থেকে উদ্ধার পেলেন?"

কামাল বললেন, "মানুষের মনের জোর যে কতখানি হতে পারে, সেদিনই আমি বুঝলাম। তোমরা ভেবে দ্যাখো অবস্থাটা। দাদা গাছের ডাল থেকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলছেন, আমার হাত-পা বাঁধা, আমি নড়তেচড়তে পারছি না। দাদা কোনওরকমে মাথার ওপরে দড়িটা ধরে আছেন, যে-কোনও মুহূর্তে হাত আলগা হয়ে যাবে। সেই অবস্থাতেও দুলতে-দুলতে উনি কথা বলছেন আমার সঙ্গে। আমাকে বললেন, 'কামাল, ঘাবড়াবার কিছু নেই।' কিন্তু আমি ঘাবড়াব না? চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না, কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসবে না। অত উঁচু পাহাড়ে কোনও লোকই আসে না। দাদা দুলতে-দুলতে গাছের ডালটা ভাঙবার চেষ্টা করলেন প্রথমে। কিন্তু সেটা খুব মজবুত ডাল, ভাঙবার কোনও লক্ষণই নেই। তখন দাদা আরও জোরে দুলে-দুলে কোনওরকমে সেই ডালটায় চড়ে বসলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "তারপর তো সবকিছুই সোজা হয়ে গেল। প্রথমে দাঁত দিয়ে কামড়ে-কামড়ে আমি হাতের বাঁধন খুলে ফেললাম। তারপর গলার ফাঁস আর পায়ের বাঁধন। এর পর লাফ দিয়ে নীচে নেমে এসে কামালকে মুক্ত করে দিলাম।"

অংশু বলল, "ততক্ষণে ওরা অনেক দূরে চলে গেছে নিশ্চয়ই?"

কামাল বললেন, "তা জানি না। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

দৌড়ে ওদের তাড়া করারও বিপদ আছে। আমাদের কাছে অস্ত্র নেই। ওদের আছে। আমাদের তখন প্রথম কাজ নিজেদের গুহায় ফিরে যাওয়া। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে সেখানে পৌঁছে গেলাম। এত ক্লান্ত লাগছিল যে, ইচ্ছে করছিল শুয়ে থাকতে। খিদেও পেয়েছিল খুব। দাদা কিন্তু বিশ্রাম নিতে দিলেন না। আমাদের সঙ্গে কিছু শুকনো খেজুর আর পেস্তাবাদাম ছিল, শুধু তাই খেয়েই আমরা নেমে গেলাম নীচের গ্রামে। আমাদের ঘোড়া দুটো সেখানেই রাখা ছিল। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা অবোধরাম আর রহমতের মতন দু'জন লোককে দেখেছে কিনা। কেউ কিছু বলতে পারল না। অন্ধকারের মধ্যে ওরা কতটা এগিয়ে গেছে কিংবা কোথায় লুকিয়ে আছে, সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। এদিককার রাস্তাঘাট ওরা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল চেনে। রাত্তিরটা আমাদের সেই গ্রামেই থেকে যেতে হল।

কাকাবাবু বললেন, "ইন্ডিয়ার লোক হয়ে অবোধরামের পক্ষে আফগানিস্তানের পাহাড়ে ডাকাতি করা অস্বাভাবিক ব্যাপার। অন্য ডাকাতরা তা মানবে কেন? ডাকাতির জিনিস বিক্রি করা নিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক। এটা অবোধরাম গোপনে একটা ঝুঁকি নিয়েছে। ভেবেছিল যে আর কেউ জানতে পারবে না। সেইজন্য সঙ্গে মাত্র একজন লোক এনেছিল। ওই রহমত নামের লোকটা খুব সম্ভবত বোবা কিংবা তার জিভ কাটা। সে একটা কথাও বলেনি, কোনও শব্দও করেনি। আমরা ঠিক করলাম, অবোধরামদের তাড়া করে আমরা আর ধরতে পারব না। কিন্তু বড় ডাকাতদলের সর্দার জাভেদ দুরানির সঙ্গে দেখা করে ওর নামে নালিশ জানাব। অবোধরাম ডাকাতদলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জাভেদ দুরানি ইচ্ছে করলেই অবোধরামকে ধরতে পারবে। সম্রাট কনিষ্কের মুকুটটা সে হয়তো আমাদের ফেরত দেবে না। তবু যদি অন্তত ছবি তুলতে দেয়, তা হলেও একটা প্রমাণ থাকবে। সেই ভেবে আমরা যাত্রা শুরু করলাম, পরদিন সকালে।"

কামাল বললেন, "এবার কিন্তু ভাগ্য আমাদের দিকে। জাভেদ দুরানির কাছে পৌঁছবার আগেই আমরা ওদের দেখা পেয়ে গেলাম। দ্বিতীয়দিন সন্ধেবেলা। বোধ হয় ওদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কিংবা কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল পথে, নইলে অতটা পেছিয়ে পড়ার কথা নয়। আমরা তখন যাচ্ছি পাহাড়ের একটা উঁচু রাস্তা দিয়ে, অনেক নীচে দেখতে পেলাম ওরা বসে আছে। আগুন জ্বেলে কিছু রান্না করছে। কীরকম জায়গাটা বুঝলে? আমরা তো অনেক উঁচুতে রয়েছি, এদিকটা খাড়া পাহাড়, নামবার উপায় নেই। সরু রাস্তা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে নেমে ওদের কাছে পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে যাবে। ততক্ষণ ওরা থাকবে কিনা ঠিক নেই। কিংবা কাছাকাছি গেলে ওরা আমাদের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে ফেলতে পারে। ওদের দেখে সেই বাক্সটা উদ্ধার করার আশায় তোমাদের কাকাবাবু একেবারে ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু আমরা নামব কী করে? অতদূর থেকে গুলি করলেও সুবিধে হবে না। দাদা তবু বললেন, 'কামাল, তুমি ঘোড়া দুটো নিয়ে রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে এসো, আমি এখান দিয়েই নামছি।' আমি বললাম, 'আপনার মাথাখারাপ নাকি? এই খাড়া পাহাড় দিয়ে নামতে গেলেই তো ব্যালান্স রাখা যাবে না। আপনি গড়িয়ে পড়ে যাবেন।' উনি বললেন, 'আর্মির লোকেরা এইরকম জায়গা দিয়েও নামতে পারে। শুয়ে পড়ে বুকে ভর দিয়ে-দিয়ে নামতে হয়। আমি সেরকমভাবে ঠিক নেমে যাব।' জানি তো, দাদা কীরকম গোঁয়ার। আমার আপত্তি শুনবেন না। দাদাকে একা ছেড়ে দিই কী করে? ঘোড়াদুটোকে সেখানে রেখে আমরা সেই ঢালু পাহাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। এবার অবশ্য আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। ওদের সমান-সমান। তবু আমাদের দিক দিয়ে সুবিধে এই যে, ওরা এদিকে পেছন ফিরে বসে রাস্তার দিকে নজর রাখছে। এই পাহাড় দিয়ে যে কেউ নেমে আসতে পারে, তা ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি। এই পাহাড়টায় ঝোপঝাড় ছিল, অন্ধকার হয়ে এসেছে, আমাদের দেখাও যাবে না। দাদা বললেন, 'কামাল, তুমি রহমতকে তাক করবে, আমি অবোধরামকে।' অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পর আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না, গুলি চালিয়ে দিলাম। দাদাও তা অনায়াসে করতে পারতেন, তবু অবোধরামকে মারলেন না।"

সন্তু বলল, "আমি জানি, কাকাবাবু কাউকে গুলি করে মারেন না। যত বড় শত্রুই হোক, তাকেও মারবেন না।"

জোজো বলল, "তা হলে কাকাবাবু কী করলেন?"

কামাল বললেন, "আমার গুলি রহমতের ডান কাঁধে লেগেছিল, সে পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগল। তোমাদের কাকাবাবু বাঘের মতন অনেক উঁচু থেকে এক লাফে অবোধরামের ওপর গিয়ে পড়লেন। তারপর শুরু হল গড়াগড়ি আর ঘুসোঘুসি। আমি রাইফেল তৈরি রেখেছিলাম, অবোধরাম জিতলে সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাতাম। তার দরকার হল না, একটু পরেই দাদা অবোধরামকে চিত করে ফেলে তার গলায় জুতোসুদ্ধু এক পা দিয়ে দাঁড়ালেন। তার আর নড়বার উপায় রইল না। হাতির দাঁতের সেই বাক্সটা কাছেই পড়ে আছে। আমি বললাম, 'দাদা, আর ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই। এ-দুটোকে গুলি করে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া যাক। তা হলে আমরা নিশ্চিন্তে যেতে পারব।' দাদা কিন্তু রাজি হলেন না। বললেন, 'আমরা ওদের শাস্তি দেব কেন? ওদের এখানেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আমরা গিয়ে জাভেদ দুরানিকে খবর দেব। বিশ্বাসঘাতকদের যা শাস্তি হয় ওরা দেবে।' দাদার সঙ্গে তর্ক করেও লাভ হল না। ওদের দু'জনকে দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধলাম। কিন্তু শাস্তি না দিয়ে চলে আসতে ইচ্ছে করছিল না। তাই আমি আচ্ছা করে কান মুলে দিলাম দু'জনের। ইচ্ছে করছিল একটা করে কান ছিঁড়ে নিতে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি রাগের চোটে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলে।"

কামাল বললেন, "হব না? অবোধরামের মতন অমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর মানুষ আমি আর দেখিনি। তখন বলে কি জানো? আমরা চলে আসছি, সে বলল, 'রায়চৌধুরী, আমাকে এরকমভাবে বেঁধে রেখে যেয়ো না। জাভেদ দুরানির কাছে গেলে সে ওই মুকুটটা কেড়ে রেখে দেবে, তোমাদের কোনও লাভ হবে না। আমার কাছে তোমরা কী চাও বলো!' তা শুনে আমি আরও রেগে গিয়ে বললাম, 'শয়তান, তুই আমার দাদাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলি। ভেবেছিলি, সে এতক্ষণে মরেই গেছে? আমারও বাঁচার আশা ছিল না। এখন তুই নির্লজ্জের মতন ক্ষমা চাইছিস?' তাতে সে বলল, 'ক্ষমা চাইব কেন? আমাদের ছেড়ে দিলে, আমি তোমাদের দু'জনকেই এক লক্ষ টাকা দেব। তোমাদের আমিই পৌঁছে দেব কাবুলে!' আমি আবার ওর কান মুলে দিয়ে বললাম, 'তোমার মতন সাপকে আর কেউ বিশ্বাস করে?' দাদা, আপনিও তখন খুব রেগে উঠেছিলেন, মনে আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে কেউ ঘুষ দিতে চাইলে আমি তাকে কিছু না কিছু শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। ওই এক লক্ষ টাকার কথা শুনে আমিও ওর দু'গালে দুটো থাপ্পড় কষালাম।"

কামাল বললেন, "তখনও অবোধরাম চ্যাঁচাতে লাগল, 'এইভাবে আমাকে মারতে পারবে না। আমি তোমাদের দেখে নেব! পৃথিবীর যেখানেই লুকিয়ে থাকো, আমি ঠিক খুঁজে বার করে প্রতিশোধ নেব!' আমরা অনেক দূরে চলে এসেও ওর চিৎকার শুনতে পেলাম!"

কাকাবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ব্যস, এই তো হয়ে গেল গল্প। তারপর আমরা সেই মুকুটের বাক্সটা নিয়ে ফিরে

এলাম কাবুলে। এবার চলো, যাওয়া যাক। গেস্ট হাউসে ফিরে আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে।"

জোজো হইহই করে বলে উঠল, "সে কী ? সব শেষ হয়ে গেল মানে ? আসল ব্যাপারটা তো জানা হল না। কাকাবাবুর পা ভাঙল কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। একটা এমনি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।"

অংশু বলল, "বুঝেছি। ওই লোকটা, মানে অবোধরাম যখন কাকাবাবুকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে তারপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে পায়ে খুব জোর মেরেছিল, তাতেই ওঁর একটা পা ভেঙে গিয়েছিল।"

কামাল আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, "না, তাতে পায়ের মাংস কেটে অনেক রক্ত পড়েছিল, কিন্তু হাড় ভাঙেনি। সেটা হয়েছে পরে।"

জোজো দাবি জানাল, "আমরা সব ঘটনাটা শুনতে চাই !"

কামাল বললেন, "সে-ঘটনাটা কেউ জানে না। দাদা নিজের মুখে কখনও বলবেন না জানি ! দাদার একটা পা নষ্ট হয়ে গেছে আমার জন্য। উনি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য চিরকালের মতন নিজের একটা পা নষ্ট করেছেন। পৃথিবীতে আর কোনও মানুষ বোধ হয় এ-কাজ করত না।"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, কী যে বলো ! ওইরকম অবস্থায় পড়লে সবাই করত। আমার বিপদ হলে তুমি ঝুঁকি নিতে না ?"

কামাল বললেন, "না দাদা, সবাই করে না। নিজেদের প্রাণের মায়া ক'জন তুচ্ছ করতে পারে ?"

বলতে-বলতে কামাল ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন !

ওরকম একজন বয়স্ক মানুষকে কাঁদতে দেখে জোজো-সন্তুরা আড়ষ্ট হয়ে গেল, আর কোনও কথা বলতে পারল না।

কাকাবাবু কামালের কাছে এসে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, "কী হল, কামাল ! সে তো অনেকদিন আগেকার কথা ! শান্ত হও, শান্ত হও।"

কামাল চোখ মুছে বললেন, "সেই কথাটা যখনই মনে পড়ে, আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। আমার বাঁচার কোনও কথাই ছিল না। আপনি রক্ষা না করলে আজ আমার এই বাড়ি, ব্যবসা, বউ-ছেলেমেয়ে এসব কিছুই হত না।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কথা আর ভাবতে হবে না। বলছি তো, আমারও হতে পারত। যথেষ্ট হয়েছে, গল্প বন্ধ করো।"

কামাল নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "না, বাকিটা আমি ওদের শোনাব। বুঝলে সন্তু, এর পর যা ঘটল, তা আমারই দোষে। অতি বোকার মতন, বোকার মতন একটা অ্যাকসিডেন্ট। ওদের দু'জনকে বেঁধে রেখে আমরা বড়জোর আর আধঘণ্টা গেছি। অত কষ্টে আবিষ্কার করা কনিষ্কের মুকুট আবার ফিরে পেয়েছি বলে মনটা খুব উৎফুল্ল। পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা। সেখানকার দৃশ্য খুব সুন্দর। মাঝে-মাঝে গাছপালা, দু-একটা গাছে অচেনা ফুল ফুটে আছে। অনেক নীচে আমুদরিয়া নদী। রোদ্দুর পড়ে রুপোর মতন চকচকে দেখাচ্ছে। আমাদের ঘোড়াদুটো যাচ্ছে পাহাড়ের খাড়া পাড়ের ধার দিয়ে। এক জায়গায় আমার ঘোড়াটা পাহাড়ের একেবারে কিনারে ঘাস খাওয়ার জন্য মুখ বাড়াল। পাশেই একটা ফুলের গাছ। আমি অন্যমনস্কভাবে সেই গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়তে যেতেই, ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গেলাম ঘোড়া থেকে, সঙ্গে-সঙ্গে গড়াতে লাগলাম পাহাড়ের গা দিয়ে। সেখানে একটা গাছও নেই যে, ধরে ফেলব। গড়াতে-গড়াতে পড়তে লাগলাম নদীর দিকে। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে নদীটা কত নীচে জানো ? এই ধরো সাততলা বাড়ির মতন। নদীর বুকে বড়-বড় পাথরের চাঁই আর অসম্ভব স্রোত। একটু পরেই নদীটা জলপ্রপাত হয়ে নেমে গেছে !"

একটু থেমে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামাল বললেন, "নদীতে পড়ার আগেই একটা পাথরে মাথা ঠুকে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম ! তারপর আর কেউ বাঁচে ? ওইরকম অবস্থায় কাছে যদি নিজের মায়ের পেটের ভাইও থাকত, সে কী করত ? চিৎকার করত, কাঁদত, দৌড়োদৌড়ি করত, আর তো কিছু করার ছিল না। আমাকে বাঁচাবার জন্য ওই পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিলে একেবারে নির্ঘাত মৃত্যু ?"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ ! মায়ের পেটের ভাই থাকলে কী করত, তুমি কী করে জানলে ? সব মায়ের পেটের ভাই একরকম হয় না। কেউ ভিতু, কাপুরুষ হয়, কেউ আবার ভাইয়ের জন্য প্রাণও দেয়।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি লাফালেন ? কী করে বেঁচে গেলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো চিন্তা করার বিশেষ সময় পাইনি। নদীর জলে পড়ার পর কামাল যেভাবে ওলটপালট খাচ্ছিল, তা দেখেই বুঝেছিলাম ওর জ্ঞান নেই। যদি জলপ্রপাতে গিয়ে পড়ে, তা হলে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে, আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। আমি 'জয় মা' বলে ঝাঁপ দিলাম। ওপর থেকে জলে ডাইভ দেওয়ার সময় লোকে সাধারণত হাত দুটো সামনে রেখে, মাথা নিচু করে লাফায়। সেই অবস্থাতেও আমার মনে হল, মাথা যদি নীচের দিকে থাকে, আর নদীতে গিয়ে কোনও পাথরে আঘাত লাগে, তা হলে মাথাটা একেবারে ছাতু হয়ে যাবে। তাই আমি দাঁড়ানো অবস্থায় লাফ দিলাম সোজাসুজি। ঠিক পাথরের ওপরে গিয়েই পড়লাম, আর আমার একটা পায়ের গোড়ালির হাড়টা মট করে ভেঙে গেল।"

কামাল বললেন, "সেই অবস্থাতেও দাদা আমাকে জাপটে ধরে পাড়ে টেনে তুললেন।"

সন্তু চোখ বুজে ফেলে বলল, "ইস, সাঙ্ঘাতিক লেগেছিল নিশ্চয়ই। সেই ব্যথা নিয়েও..."

কামাল বললেন, "ব্যথা তো লাগবেই। দাদার পায়ের তলায় পাথরটা ভেঙে গেঁথে আছে। হুহু করে রক্ত বেরোচ্ছে। তবু দাদা মুখে একটাও শব্দ করেননি। দাঁতে দাঁত চেপে ছিলেন।"

জোজো বলল, "আর সেই মুকুটটা কোথায় গেল ?"

কামাল বললেন, "সেটা তো রয়ে গেছে ওপরে। আমাদের ঘোড়া দুটো, সব জিনিসপত্তরই তো পাহাড়ের ওপরে। দাদার হাঁটার কোনও ক্ষমতাই নেই। আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে বটে, মাথা দিয়ে তখনও রক্ত বেরুচ্ছে, শরীর ঝিমঝিম করছে। দাদাকে কাঁধে নিয়ে পাহাড়ে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দু'জনে তখনও প্রাণে বাঁচবে কিনা তার ঠিক নেই। জিনিসপত্র উদ্ধারের আশাও রইল না।"

জোজো বলল, "যাঃ, মুকুটটা আবার চলে গেল ?"

কামাল বলল, "না, যায়নি। ভাগ্য শেষপর্যন্ত সুপ্রসন্ন হল। একটু পরেই আমরা পাহাড়ের ওপরে কিছু লোকজন আর ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। একবার ভাবলাম, তারা যদি অন্য ডাকাতদল হয়, তা হলে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যাবে। প্রাণে বাঁচার জন্য আমাদের চুপচাপ লুকিয়ে থাকাই ভাল। আবার ভাবলাম, এখানে পড়ে থাকলে শেষপর্যন্ত কে আমাদের উদ্ধার করবে ? ওপরের ওরা কোনও বণিকের দলও তো হতে পারে ? নদীর স্রোতের এমন আওয়াজ যে, আমরা চিৎকার করলেও ওরা শুনতে পাবে না। দাদার কোমরে রিভলভারটা ঠিক ছিল, ওটা নিয়ে শূন্যে দু'বার গুলি করলেন। তাই শুনে সেই দলটা ঘোরা পথে নেমে এল নদীর কাছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই দলের প্রথমেই কাকে দেখতে পাওয়া গেল বল তো সন্তু ?"

সন্তু বলল, "নরেন্দ্র ভার্মা !"

কামাল বললেন, "ঠিক বলেছ, নরেন্দ্র ভার্মা আবার কাবুলে এসে জাভেদ দুরানির ডাকাতের দলের কথা শুনেই ভেবেছিলেন, আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। আফগান সরকারের সাহায্য নিয়ে দশজন সৈনিক ও একজন কর্নেলের সঙ্গে এসেছিলেন আমাদের উদ্ধার করতে। ওঁরা অবশ্য অবোধরামের কথা জানতেন না। অবোধরাম আর তার সঙ্গীকেও ধরে নিয়ে এলেন কাবুলে। অবোধরাম এর আগে দিল্লিতে দুটো খুন করে পালিয়ে আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল। দিল্লিতে এনে তাকে জেলে ভরে দেওয়া হল চোদ্দ বছরের জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা সম্রাট কনিষ্কের সেই মুকুট কাবুলের জাদুঘরে জমা দিলাম। এখনও যে-কেউ গিয়ে দেখতে পারে। অনেক কাগজে-টাগজে ছবি ছাপা হল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটা হইচই পড়ে গেল।"

অংশু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবুর পায়ের চিকিৎসা হল কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেসব আর শোনার দরকার নেই। আমার পা তো ঠিকই আছে। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে কোনও অসুবিধা হয় না। শুধু দৌড়তে পারি না, এই যা। ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ওঠো !"

॥ ১০ ॥

সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, "আজকের দিনটা একটু অন্যরকমভাবে কাটাব ভাবছি। সন্তু, জোজো, অংশু, তোমরা বরং আজ এখানে বসেই গল্পটল্প করো। আমি একবেলার জন্য ঘুরে আসি।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথা থেকে ঘুরে আসবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন মাছ ধরিনি। এক সময় আমার ছিপ দিয়ে মাছধরার খুব শখ ছিল।"

জোজো বলল, "এখানে কোথায় মাছ ধরবেন ? পুকুরটুকুর দেখিনি একটাও।"

কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকে খানিকটা দূরে গেলে ছোট-ছোট পাহাড়ের শ্রেণী আছে। সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চমৎকার একটা নদী। আগেরবার এসে সেখানে আমি মাছ ধরেছিলাম মনে আছে।"

সন্তু জোর দিয়ে বলল, "আমরা মোটেই বাড়িতে বসে থাকব না। আমরাও যাব।"

জোজো বলল, "আমি দারুণ মাছ ধরতে পারি। একবার কাস্পিয়ান হ্রদে একটা স্টার্জন মাছ ধরেছিলাম, সেটার ওজন ছিল বাইশ কিলো !"

কাকাবাবু বললেন, "বাপরে, তা হলে তো তোমার সঙ্গে আমি পারব না ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "অতবড় মাছ নিয়ে কী করলি ?"

জোজো বলল, "পেট কেটে শুধু ডিম বার করে মাছটা ফেলে দিলাম !"

অংশু বলল, "সে কী ! অতবড় মাছ ফেলে দিলে ?"

জোজো অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল, "কিছুই জানো না। স্টার্জন মাছের ডিমেরই আসল দাম।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "তা ঠিক। জোজো, তুমি অতবড় মাছ ধরেছ, এখানে ছোটখাটো মাছধরা দেখতে তোমার ভাল লাগবে কেন ? এখানে বড়জোর এক কিলো-দেড় কিলো মাছ।"

জোজো বলল, জলের ধারে গেলেই আমার ভাল লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "অংশু তুমি কী করবে ? তোমার তো পড়া মুখস্থ করতে হবে ?"

সবাইকে অবাক করে দিয়ে অংশু সেই চার লাইন কবিতা

ঠিকঠাক গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেল।

জোজো বলল, "কাল অনেক রাত জেগে ওকে দুলে-দুলে মুখস্থ করতে দেখেছি।"

অংশু বলল, "খুব ছেলেবেলায় পড়া আর-একটা কবিতা আমার মনে পড়ে গেছে। বলব ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, শোনাও।"

অংশু বলল :

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে/ কদমতলায় কে/ হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে/ সোনামণির বে।

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বাঃ, তা হলে তো তোমার চাকরি পাকা। তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক।"

জোজো বলল, "মাছ ধরবেন, ছিপ পাবেন কোথায় ? ভাল চার লাগবে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাজারে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।"

জলখাবার খেয়ে, সঙ্গে বেশ কিছু স্যান্ডউইচ আর জলের বোতল নিয়ে বেরিয়ে পড়া হল। কামালের পাঠানো স্টেশন ওয়াগন গাড়িটা এসেছে। পুলিশের গাড়িটাও অপেক্ষা করছে বাইরে। কাকাবাবু পুলিশ পাহারায় মাছ ধরতে যেতে রাজি নন।

তিনি পুলিশের অফিসারকে ডেকে বললেন, "এখন আমরা শহরে যাচ্ছি। সেখানে তো আপনাদের ফলো করার দরকার নেই। দুপুরবেলা আমরা আজ আবার খাজুরাহো যাব, তখন আপনাদের লাগবে। আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। শহর থেকে কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করে আমরা এখানেই ফিরে আসছি।"

বাজারে তিনটি দোকানে মাছধরার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। কাকাবাবুর কোনও ছিপই পছন্দ হয় না। তিনি এক দোকান থেকে আর-এক দোকানে ঘুরতে লাগলেন। দোকানদারদের মাছ ধরার বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন নানারকম।

শেষপর্যন্ত তিনি দু'খানা বেশ মজবুত, হুইল দেওয়া ছিপ কিনলেন। আর অনেকখানি নাইলনের দড়ি। দোকানের সামনের রাস্তাটা যেন নদী, এইভাবে তিনি ছিপ দুটো পরীক্ষা করলেন কয়েকবার। তাঁকে দেখার জন্য ভিড় জমে গেল।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু গেস্ট হাউসের উলটো দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি এতক্ষণ ধরে ছিপ কিনলেন যে, সারা শহর জেনে গেল আপনি মাছ ধরতে যাচ্ছেন। কালকের কাগজে খবর ছাপা হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এর পর যদি মাছ ধরতে না পারি, খুব লজ্জার ব্যাপার হবে, তাই না ? আগেকার দিনে বাবুরা কী করত জানিস ? সকালবেলা সেজেগুজে মাছ ধরতে যেত, একটা মাছও ধরতে না পারলে বাজার থেকে মাছ কিনে এনে বাড়িতে বলত, এগুলো আমি ধরেছি !"

অংশু বলল, "কেউ-কেউ ইলিশমাছও কিনে এনে বলত, পুকুরে ধরেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "এখনকার শহরের অনেক ছেলেমেয়ে জানেই না যে, ইলিশমাছ কখনও পুকুরে পাওয়া যায় না।"

অংশু বলল, "এইসব দিকে ইলিশ পাওয়া যায় না ! ইলিশ শুধু পাওয়া যায় আমাদের পশ্চিমবাংলায় আর বাংলাদেশে।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা বাঙালিদের ভুল ধারণা। আরও অনেক দেশে ইলিশ পাওয়া যায়। ইলিশ হচ্ছে সমুদ্রের মাছ, বিভিন্ন দেশের নদী দিয়ে ভেতরে ঢুকে আসে ডিম পাড়ার জন্য। অবশ্য সব জায়গায় ইলিশের স্বাদ সমান নয়। আমেরিকায় কিন্তু বেশ ভাল আর বড়-বড় ইলিশ ধরা পড়ে।"

জোজোকে বারবার পেছনদিকে তাকাতে দেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "জোজো, নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা আজও দেখা যাচ্ছে ?"

জোজো বলল, "না, এখনও দেখতে পাচ্ছি না।"

সন্তু বলল, "আমরা কোথাও গেলে কামালকাকুকে ডেকে নেওয়ার কথা ছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, ওর অনেক কাজ আছে। কাল দুপুরে আমরা ওকে কাজে যেতে দিইনি। পুলিশের গাড়িটাকেও ফাঁকি দেওয়া গেছে। আজ বেশ নিরিবিলিতে মাছধরা যাবে।"

খানিকটা বাদেই পাহাড়ি রাস্তা শুরু হয়ে গেল। এখানকার রাস্তা ভাল নয়, গাড়িটা ওপরে উঠতে পারছে না। মাঝে-মাঝে ঘ-র-র ঘ-র-র শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবু জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন, এক জায়গায় এসে বললেন, "ব্যস, এখানে থামাও। এখানেই নামব।"

সবাই নেমে পড়ার পর তিনি গাড়ির ড্রাইভারকে বললেন, "তোমার অপেক্ষা করার দরকার নেই। আমরা এখানে দুপুর অবধি থাকব। তুমি ঠিক চারটের সময় এখানে ফিরে এসো।"

গাড়িটা চলে যাওয়ার পরই সব জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এ-রাস্তায় গাড়িটাড়ি চলে না বিশেষ। ছোট-ছোট পাহাড়, সবুজ গাছপালায় ভর্তি, মাঝে-মাঝে সরু পায়েচলা পথ।

একটা পথ নেমে গেছে নীচের দিকে। সেই রাস্তা ধরে কাকাবাবু তাঁর দলটি নিয়ে এগোলেন। কয়েক মিনিট বাদেই জল চোখে পড়ল।

জায়গাটা ভারী সুন্দর। আসার পথে নদীটা একবার চোখে পড়েছিল, তেমন কিছু বড় নয়, কিন্তু এখানে সেটা হঠাৎ এত চওড়া হয়ে গেছে যে, একটা লেকের মতন মনে হয়। পরিষ্কার টলটলে জল। এপাশে-ওপাশে কয়েকটা নৌকো বাঁধা আছে। কয়েক জায়গায় বেঞ্চ বানিয়েও দেওয়া হয়েছে। পিকনিক করার পক্ষে আদর্শ। আজ ছুটির দিন নয় বলে লোকজন নেই।

কাকাবাবু প্রথমে চার তৈরি করে জলে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে জলে ফেলে নিজে একটা পাথরের ওপর বসলেন। সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফাতনার দিকে।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই জোজো বলল, "কই, মাছ উঠছে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "এর মধ্যেই ? ধৈর্য না থাকলে তো মাছ ধরা যায় না।"

অংশু বলল, "এখানে বড় মাছ আছে কিনা, তাই-ই বা কে জানে ? এই ছিপে ছোট মাছ ধরা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাই এরকম কথা বললে তো পুঁটিমাছও উঠবে না। আওয়াজ শুনলেই মাছরা ভয়ে পালিয়ে যায়।"

একটুক্ষণ তিনি কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "আজ তোমাদের একটা পরীক্ষা নিতে চাই। ধরো, এখন থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত একেবারে চুপ করে থাকতে পারবে ? একটা কথাও বলা চলবে না। কী, রাজি ?"

তিনজনেই মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "জোজোরই বেশি কষ্ট হবে। একদিন সংযম দেখাও ! তোমরা তিনজন এক জায়গায় বসতেও পারবে না। আলাদা-আলাদা আমি জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি না ডাকলে কেউ আমার কাছে আসবে না।"

কাকাবাবু পাহাড়ের ওপরদিকে তিনটে জায়গা বেছে দিলেন ওদের জন্য।

তারপর নিজের কোমর থেকে রিভলভারটা বার করে সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তুই এটা রাখ সন্তু। যদি কিছু ঘটনা ঘটে, তবু তুই হুট করে গুলি চালাবি না। যদি গুলি করতেই হয়, আমি ইঙ্গিত দেব। আমার ডান হাতটা কানের কাছে তুলব।"

সন্তু বলল, "যদি কেউ এসে পড়ে আগেই তোমাকে গুলি করে ? যদি হাত তুলতে না পারো ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেরকম যদি হয়, নিজের বুদ্ধিমতন কাজ করবি। তার আগে পর্যন্ত কিছুতেই না, আমার ইঙ্গিত ছাড়া কিছুতেই না! আর অন্যদের আবার বলছি, আমি না ডাকলে কিছুতেই আমার কাছে আসবে না! এখন যাও, যে-যার পজিশান নিয়ে বোসো। ধরে নাও, এটা একটা খেলা। মাছধরার মতন এ-খেলাতেও কিন্তু খুব ধৈর্য লাগবে! কোনও শব্দ করবে না।"

ওরা তিনজন ওপরের দিকে উঠে গেল, কাকাবাবু আবার মাছধরতে বসলেন। অন্যদের কথা বলতে বারণ করেছিলেন, নিজেই গুন্‌গুন করে শুরু করলেন গান, 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি—'।

সময় যেন কাটতেই চায় না, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা....

এক ঘণ্টার একটু পরে কাকাবাবু হ্যাঁচকা টান দিয়ে একটা মাছ ধরে ফেললেন। প্রায় এক কিলো ওজনের একটা কাতলামাছ।

ওপরের লুকনো জায়গা থেকে জোজো প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কাকাবাবুর নিষেধ মনে পড়ায় নিজেই নিজের ঠোঁট চেপে ধরল। অংশু একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেল, খচমচ শব্দ হল গাছের পাতায়। সন্তু মাছধরা দেখছে না, সে রিভলভারটা নিয়ে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে।

কাকাবাবু মাছটাকে বঁড়শি থেকে ছাড়িয়ে সেটাকে আবার ছুড়ে জলে ফেলে দিলেন। যেন মাছধরাতেই তাঁর আনন্দ, জ্যান্ত মাছ ধরে খাওয়ার লোভ নেই।

আবার অপেক্ষা।

জোজো শুয়ে পড়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। মেঘলা দিন, রোদ্দুরের তাপ নেই। অন্যদিকে অংশু ঘুমিয়ে পড়েছে একটা গাছে হেলান দিয়ে। সন্তু একটা পাথরের আড়ালে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে।

দু' ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর খুব জোরে একটা গাড়ি এসে ওপরের রাস্তায় থামল। তার থেকে দু'জন লোক লাফিয়ে নেমে পড়ে খানিকটা ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের চেহারা ডাকাতের মতন, দু'জনের হাতেই রাইফেল। গাড়ি চালাচ্ছিল একজন প্রায়-বুড়ো লোক, মাথার চুল ধপধপে সাদা, লম্বা-চওড়া চেহারা, সে গাড়ি থেকে নামল একটা ছড়ি হাতে নিয়ে। ছড়িতে ভর দিয়ে ঝুঁকে-ঝুঁকে হেঁটে সে এগিয়ে এল খানিকটা।

সন্তুর বুকটা ধক করে উঠল। দু'জন লোকের হাতে রাইফেল, এখন সে কী করবে? কাকাবাবুর যেন ভ্রূক্ষেপই নেই, পেছনে ফিরে তাকালেনও না।

চুলপাকা লোকটি হেঁকে বলল, "রায়চৌধুরী সাব, নমস্তে। ক'টা মছলি পাকড়ালেন?"

কাকাবাবু এবার মুখ ফিরিয়ে যেন খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, "আরে সুরযপ্রসাদ যে! নমস্তে,নমস্তে। কেমন আছ?"

সুরযপ্রসাদ বলল, "হনুমানজির কৃপায় ভাল আছি। আপনার চারদিকে এত শত্রু, তবু আপনি একা-একা মাছ ধরতে এসেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার ভরসাতেই তো এসেছি। তোমার চিঠি পেয়েছি আমি। অন্য কেউ মারতে এলে তুমি বাঁচাবে।"

সুরযপ্রসাদ বলল, "হাঁ, তা তো জরুর বাঁচাব। অন্য কেউ তোমাকে মারতে পারবে না। তা হলে আমি তোমার ওপর প্রতিশোধ নেব কী করে?"

সে একজন রাইফেলধারীকে বলল, "ওর কাছে কী অস্তরটস্তর আছে, সার্চ করে দ্যাখ। সাবধান, এ-লোকটা মহা ফন্দিবাজ!"

সে দৌড়ে এসে কাকাবাবুর প্যান্টের পকেট ও কোমরটোমর সব টিপে দেখল। কিছুই নেই। তখন সে রাইফেলের নলটা কাকাবাবুর বুকে ঠেকিয়ে রাখল।

কাকাবাবু বললেন, "মাছ ধরতে এলে কি কেউ সঙ্গে বন্দুক-পিস্তল রাখে নাকি? তুমি আমাকে মেরে ফেলতে এসেছ? তুমি তো আগে শুধু মূর্তি-চুরি আর পাচার করতে, খুনটুন তো করতে না। এখন লাইন পালটেছ?"

সুরযপ্রসাদ বলল, "এত কম্পিটিশান, টিকে থাকতে হলে লাইন পালটাতেই হয়। তবে তোমাকে আমি জানে মারব না। তুমি আমাকে অপমান করেছিলে, আজ তার শোধ নেব। তোমাকেও আজ নাকে খত দিতে হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কেন নাকে খত দেব? আমি তো কোনও খারাপ কাজ করিনি। তুমি মূর্তি চুরি করেছিলে, তোমাকে জেলে দেওয়ার বদলে আমি ওইটুকু শাস্তি দিয়েছি!"

সুরযপ্রসাদ রাগে দাঁত কড়মড় করে বলল, "আমার জেলে যাওয়া অনেক ভাল ছিল। আমাদের লাইনে জেল কেউ পরোয়া করে না। কিন্তু নাকে খত দিয়েছি বলে আমার শত্রুরা এখনও হাসে। নাও, আরম্ভ করো।"

কাকাবাবু বললেন, "এই পাথরের রাস্তায় নাকখত দিতে হবে? এটা ঠিক হচ্ছে না। তোমাকে আমি খত দিইয়েছিলাম খাজুরাহো মন্দিরে, সেটা প্লেন জায়গা ছিল। এই পাথরে নাক ঘষলে আমার নাক ছিড়েখুঁড়ে রক্তারক্তি হয়ে যাবে যে!"

সুরযপ্রসাদ বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি আমার সঙ্গে মজাক করছ? তোমার ঘাড় ধরে মাটিতে চেপে ধরব, তাই-ই চাও?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, সেটা আরও খারাপ হবে। ঠিক আছে, কোথা থেকে শুরু করব বলো!"

সুরযপ্রসাদ বলল, "এখানে এসে আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাবে, তারপর নাকেখত দিয়ে ওই ওপরের রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে আবার নেমে আসবে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাবাঃ, এ যে অনেকটা। ঠিক আছে, অন্য

কেউ তো আর দেখছে না।"

সূরযপ্রসাদ বলল, "ক্যামেরা এনেছি, ছবি তুলে রাখব।"

কাকাবাবু ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এলেন সূরযপ্রসাদের দিকে।

হঠাৎ ওপর থেকে হুড়মুড় করে অংশু লাফিয়ে পড়ল একজন রাইফেলধারীর কাঁধে। দু'জনে মাটিতে গড়াগড়ি করে অংশু কোনওক্রমে ছিনিয়ে নিল রাইফেলটা। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াবার আগেই অন্য লোকটি রাইফেল তাক করে ফেলেছে তার দিকে।

কাকাবাবু হাত দুটো মুঠো করে আছেন, অর্থাৎ সন্তুকে কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছেন না। নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আরে, এ লোকটা কে?"

সূরযপ্রসাদ চিৎকার করে বলে উঠল, "এ তোমার দলের লোক। তোমার দলে আরও ছেলে ছিল, তারা কোথায় গেল!"

কাকাবাবু বললেন, "তাদের তো আমি নিয়ে আসিনি। এ কী করে চলে এল?"

সূরযপ্রসাদ বলল, "কুছ পরোয়া নেই। রায়চৌধুরী, আমার পায়ে মাথা দাও!"

হাতের ছড়িটা দিয়ে সে সপাং করে এক ঘা কষাল অংশুর পিঠে।

কাকাবাবু এবার কঠোরভাবে বললেন, "সূরযপ্রসাদ, ওকে মেরো না। শোনো আমার কথা। তুমি আমাকে নাকে খত দিতে বাধ্য করালে তারপর আমি তোমাকে ছাড়ব? এবার ঠিক জেলে ভরে দেব!"

সূরযপ্রসাদ বলল, "আরে বাঙালি, তোমার কত মুরোদ, এবার দেখব! তোমাকে আগে নাকে খত দিইয়ে সেই ফোটো তুলে সবাইকে দেখাব। এখান থেকে যাওয়ার আগে তোমাকে খুন করে সেই লাশ জলে ভাসিয়ে দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে খুন করা এত সোজা? দেব না নাকে খত, তুমি কী করতে পারো?"

সূরযপ্রসাদ কাকাবাবুকে মারার জন্য ছড়িটা তুলতেই তিনি সেটা ধরে ফেলে হ্যাঁচকা টান দিলেন। তারপর কানে হাত দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওপর থেকে ছুটে এল একটা নয়, দুটো গুলি। একজন রাইফেলধারী মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। একটা গুলি লাগল সূরযপ্রসাদের কাঁধে। অন্য রাইফেলধারীটা ওপরের দিকে তাক করতে-করতেই আবার দুটো গুলি ছুটে এল। সেও ঘায়েল হয়ে গেল! দু'দিক থেকে দুটো গুলি আসায় কাকাবাবুও অবাক! তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন কামাল।

কাকাবাবু বললেন, "আরে, তুমি কোথা থেকে এলে?"

কামাল বললেন, "আপনি মাছ ধরতে গেছেন শুনেই বুঝলাম, ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে এনেছেন। তাই সঙ্গে রাইফেল নিয়ে ছুটে এসেছি। এসেই দেখি, দলবল নিয়ে উপস্থিত সূরযপ্রসাদ।"

কাকাবাবু বললেন, "দলবল তো নয়, মাত্র দুটো লোক। এদের আমরাই ব্যবস্থা করতে পারতাম। সন্তুকে তুমি টিপ দেখাবার চান্সই দিলে না। সূরযপ্রসাদকে নিয়ে এখন কী করা যায়? আবার নাকখত দিইয়ে ছেড়ে দেব?"

কামাল বললেন, "কিছুতেই না। ওকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। বুড়ো বয়েসেও ওর লোভ যায়নি। জেলই ওর ঠিক জায়গা।"

কাকাবাবু বললেন, "দড়ি এনেছি, ওদের বেঁধে রাখো।"

জোজো আর সন্তুও নেমে এসেছে। সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি ইঙ্গিত দিতে এত দেরি করছিলে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখছিলাম গুলি না চালিয়েও ওদের জব্দ করা যায় কি না। আচ্ছা অংশু, তুমি কোন সাহসে একজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে? আমি বারণ করেছিলাম না?"

অংশু বলল, "আপনাকে নাকে খত দিতে বলল শুনেই রাগে আমার গা জ্বলে উঠল। আর থাকতে পারলাম না। আমি ভাবলাম, আমি একজনকে ধরতে পারলেই সন্তু আর একজনকে গুলি করবে।"

কাকাবাবু বললেন, "রেলের ডাকাতরা তো এত সাহসী হয় না। তোমার সাহস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি।"

অংশু বলল, "ও-কথা আর বলবেন না সার। আমি চিরকালের মতন ওই লাইন ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তা হলে তোমাকে পুলিশেই একটা চাকরি দেওয়া যেতে পারে। তোমার মতন লোকরাই চোর-ডাকাতদের ভাল সামলাতে পারবে।"

কামাল আর সন্তু মিলে তিনজনকেই বেঁধে ফেলেছে। এই সময় ভটভট শব্দ করতে-করতে এঞ্জিন লাগানো একটা নৌকো এদিকে এগিয়ে এল। তাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বামতন মানুষ, চোখে কালো চশমা। হাতে তার বড় একটা অস্ত্র। স্টেনগান কিংবা এ. কে. ফরটি সেভেন।

চোখের নিমেষে এই অস্ত্র থেকে একসঙ্গে অনেক গুলি ছুটে আসে।

লোকটি কর্কশ গলায় বলল, "সবাই হাত তুলে দাঁড়াও! যে নড়াচড়া করবে, তার আগে প্রাণ যাবে।"

ওর হাতের অস্ত্রটি দেখলেই ভয় করে। সবাই হাত তুলতে বাধ্য হল। কাকাবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, "এ আবার কে?"

কামাল বললেন, "গলার আওয়াজটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।"

নৌকোটা পারের কাছে আসতেই লোকটি একলাফে নেমে পড়ল। একহাতে অস্ত্রটা উঁচিয়ে রেখে নৌকোর দড়িটা বাঁধল একটা গাছের সঙ্গে। তারপর খুলে ফেলল চোখের কালো চশমাটা।

কামাল প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, "এ কী?"

কাকাবাবু বললেন, "অবোধরাম!"

অবোধরাম বলল, "রায়চৌধুরী, মনে আছে আমাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "মনে থাকবে না? কী আশ্চর্য যোগাযোগ! ক'দিন ধরে আমরা তোমার কথাই বলছিলাম। এই ছেলেদের সেই গল্প শোনাচ্ছিলাম। আর তুমি এসে হাজির! গল্পের মধ্যে গল্পের ভিলেনের সশরীরে আবির্ভাব!"

অবোধরাম বলল, "মনে নেই, আমি বলেছিলাম, আবার দেখা হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তাও মনে আছে। কিন্তু সেটা তো কথার কথা! তোমার তো যাবজ্জীবন জেলে থাকার কথা ছিল। তুমি এখানে এলে কী করে? সত্যি তুমি এসেছ, না ভুল দেখছি!"

অবোধরাম বলল, "সত্যি কি ভুল তা একটু পরেই মালুম হবে! তোমার স্যাঙাতটাও এখানে রয়েছে দেখছি! ওর কথা আমার মনেই ছিল না।"

কাকাবাবু বললেন, "জেল থেকে বেরোলে কী করে? আগেই ছেড়ে দিল?"

অবোধরাম বলল, "আমাকে আটকে রাখতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোনও জেল নেই। প্রতিশোধ নেব বলেছিলাম। আমরা কখনও অপমান ভুলি না!"

কাকাবাবু হতাশ হওয়ার ভাব দেখিয়ে বললেন, "কত লোকই যে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু কেউ পারে না শেষ পর্যন্ত। তুমি একা এসেছ? তোমার সাহস তো কম নয়! আমরা এখানে এতজন আছি।"

অবোধরাম বলল, "আমি একাই একশো। আমার হাতে কী আছে দেখেছ? এক মিনিটেই তোমাদের সবাইকে শেষ করে

দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "এসব অস্ত্র তোমরা জোগাড় করো কী করে?"

অবোধরাম হঠাৎ ধমক দিয়ে বলল, "চোপ! বড় বেশি কথা বলছ।"

কয়েক পা এগিয়ে এল। সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। তারপর বলল, "এই ছেলেগুলোকে আমার দরকার নেই। রায়চৌধুরী, তুমি আর তোমার স্যাঙাত নৌকোয় ওঠো। তোমাদের দু'জনকে আমি নিয়ে যাব।"

কাকাবাবু কিছুই না বোঝার ভান করে বললেন, "নৌকোয় উঠব কেন? বেড়াতে নিয়ে যাবে নাকি আমাদের?"

অবোধরাম চিৎকার করে বলল, "ওঠো বলছি! তোমাদের দু'জনকে আমি এমন জায়গায় পাঠাব যে, কেউ আর কোনওদিন খুঁজেও পাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "অবোধরাম পালোয়ান, চেঁচিয়ো না। তুমি ফাঁদে পড়ে গেছ। এবার আর তোমার পালাবার আশা নেই।"

অবোধরাম অট্টহাসি দিয়ে বলল, "ফাঁদ! কিসের ফাঁদ? চালাকি করতে যেয়ো না রায়চৌধুরী, তা হলে এই ছেলেগুলোও মরবে! নৌকোয় ওঠো!"

কাকাবাবু বললেন, "যদি না উঠি?"

অবোধরাম বলল, "তা হলে তোমার চোখের সামনে একজন একজন করে মারব। সবশেষে তোমাকে!"

কাকাবাবু বললেন, "ওহে পালোয়ান, একটা ওইরকম অস্ত্র জোগাড় করলেই হয় না, ঠিকমতন চালানো শিখতে হয়। তুমি চলে এসেছ আমাদের মাঝখানে। আমাদের সবাইকে আগে একসার দিয়ে দাঁড় করানো উচিত ছিল।"

অবোধরাম অমনই কাকাবাবুর বুকের দিকে তাক করে উঠল, "দাঁড়াও,সবাই এক লাইন করে দাঁড়াও!"

কাকাবাবু বললেন, "আহা, হা, এখন আর কেউ নড়বে না। এখন তুমি আমাদের মধ্যে শুধু একজনকেই মারতে পারবে। একজনকে যে-ই মারবে, অমনই পেছনদিক থেকে একজন তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের মধ্যে একজন কে প্রাণ দেবে? আমি, আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমি মরলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তারপর তুমি বাঁচবে না, অবোধরাম।"

একটু হেসে কাকাবাবু বললেন, "নাও, আমাকে মারো, তোমার ঠিক পেছনে চলে এসেছে কামাল, তার হাতে রয়েছে ছুরি। ডান দিকে আমার ভাইপো সন্তু, তার হাতের টিপও দারুণ। এবার এসো অবোধরাম, প্রতিশোধ নাও!"

অবোধরাম চকিতে পেছন ফিরে কামালকে দেখার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বিদ্যুতের মতন একটা ক্রাচ তুলে প্রচণ্ড জোরে মারলেন তার হাতে। অস্ত্রটা পড়ে যেতেই সন্তু চোখের নিমেষে সেটা তুলে নিল!

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ অবোধরাম, তোমার যে আর প্রতিশোধ নেওয়া হল না!"

অবোধরামের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

কামাল হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "দাদা, দাদা, আপনি যে অসাধ্যসাধন করলেন! এবার যে বাঁচব, ভাবতেই পারিনি। এ লোকটা যদি আগে আমার দিকে গুলি চালিয়ে দিত!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আগে অনেকবার দেখেছি, কারও চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আমি যদি ধমকে বলি, মারো, আমায় মারো, তাতে অন্যরা তক্ষুনি গুলি করতে পারে না।"

জোজো বলল, "হিপনোটাইজ্‌ড হয়ে যায়। আমার বাবা একবার স্পেনে গুণ্ডার দলের মধ্যে পড়ে..."

জোজোকে গল্প বলতে না দিয়ে কামাল বললেন, "সন্তু, এসো, একে আগে বেঁধে ফেলা যাক।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ওই অস্ত্রটা সম্বন্ধে সাবধান। ভারী ডেঞ্জারাস। ওটা নামিয়ে রাখো বরং।"

সন্তু সেটা নামাবার আগেই অবোধরাম লাফিয়ে গিয়ে জোজোকে চেপে ধরল। তার হাতে একটা লম্বা ছুরি। ছুরির ডগাটা সে জোজোর গলায় চেপে ধরেছে। বিকৃত গলায় বলে উঠল, "রায়চৌধুরী, এবার? আমার অস্ত্রটা ফেরত দাও, না হলে এ-ছেলেটা মরবে!"

কাকাবাবু বললেন, "আঃ, বারবার এই ভুল হয়। একজন যে দুটো অস্ত্র রাখতে পারে, সেটা মনে থাকে না। আগেই ওকে সার্চ করা উচিত ছিল।"

অবোধরাম বলল, "দাও, অস্ত্রটা ফেরত দাও!"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ, ওই অস্ত্র তুমি ফেরত পাবে না।"

কামাল বললেন, "এবারেও তোমার সুবিধে হবে না অবোধরাম। ওই ছেলেটাকে মারার চেষ্টা করলেই আমরা তোমাকে গুলি করব। আমাদের দলের বড়জোর একজন মরবে।"

অবোধরাম জোজোকে টানতে-টানতে নৌকোর কাছে নিয়ে গেল। এখন তার পেছনদিকে আর কেউ নেই। এখন অস্ত্রটা হাতে পেলে সে একসঙ্গে সকলের দিকে গুলি চালাতে পারবে।

অবোধরাম বলে উঠল, "আমি ঠিক পাঁচ গুনব, তার মধ্যে অস্ত্রটা ফেরত না দিলে আমি এই ছেলেটাকে নিয়ে নৌকোয় উঠে চলে যাব। এক—দুই—তিন—চার।"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "দাঁড়াও! জোজো পরের বাড়ির ছেলে। আমরা ওর জীবনের ঝুঁকি নিতে পারি না। সন্তু, অস্ত্রটা আমাকে দে। তোরা সব আড়ালে চলে যা। আমি ওকে অস্ত্রটা ফেরত দেব।"

অবোধরাম বলল, "ছুড়ে দিলে চলবে না। এই ছেলেটাকে আমার সামনে দাঁড় করাব, তারপর ওটা আমার হাতে তুলে দেবে।"

কাকাবাবু অস্ত্রটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুখের একটা রেখাও কাঁপছে না। অস্ত্রটা হাতে পেলে অবোধরাম যে প্রথমে তাঁকে ধরবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

একেবারে কাছে এসে তিনি বললেন, "জোজো, কোনও ভয় নেই। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।"

তিনি অস্ত্রটা অবোধরামকে দেওয়ার জন্য উঁচু করলেন, অবোধরাম একহাত বাড়াল।

ঠিক তখনই কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগল অবোধরামের সেই হাতে। সে আঃ করে এক দৌড় লাগাতেই জোজো এক দৌড় লাগাল।

ঠিক পাশের বড় পাথরটার ওপর এসে দাঁড়াল একজন মানুষ, তার হাতে রিভলভার। সে বলল, "খেল খতম! আর কেউ আছে নাকি?"

সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, "সেই মানুষটি নরেন্দ্র ভার্মা!"

নরেন্দ্র ভার্মা আবার বললেন, "অবোধরাম, আমি ইচ্ছে করে তোমার মাথায় গুলি চালাইনি। তুমি নৌকোয় ওঠার চেষ্টা করলে কিন্তু প্রাণে বাঁচবে না! কামালসাহেব, ওকে বেঁধে ফেলুন!"

পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে নেমে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। হাসতে-হাসতে কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "রাজা, তা হলে তোমার অপারেশান সাকসেসফুল!"

কাকাবাবু বললেন, "আঃ নরেন্দ্র, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! তুমি খুব নাটক করতে ভালবাসো, তাই না? এমনভাবে হঠাৎ এসে উদয় হলে, যেন সিনেমার নায়ক। ওই পাথরের আড়ালে কতক্ষণ ধরে ঘাপটি মেরে বসে আছ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা প্রায় ঘণ্টাদেড়েক হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে, এতক্ষণ ধরে এখানে যা-যা ঘটেছে, সব তুমি দেখেছ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সব, সব। তোমাদের এখানেই তো যতরকম নাটক হল। তবে আগে আমি দেখা দিইনি, কিংবা গুলি চালাইনি, তার কারণ, দেখছিলাম, তোমরা নিজেরা কতটা ম্যানেজ করতে পারো। তোমাদের কৃতিত্বে বাধা দিতে চাইনি।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এখনই বা গুলি চালালে কেন? অবোধরামকেও আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নিতাম।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সে কী! তুমি স্টেনগানটা ওকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলে। আর একবার হাতে পেলে ও কাউকে ছাড়ত না। ওর বিবেক বলে কোনও বস্তু নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে ফিরিয়ে দিতে যাওয়া, আর সত্যি সত্যি হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে অনেক তফাত! মাঝখানের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অন্য কিছু ঘটে যেতে পারে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না রাজা, আর আমি ঝুঁকি নিতে চাইনি। তুমি যেই এই ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য ওকে স্টেনগানটা ফেরত দিতে এলে, তখনই ভাবলাম, এই রে, আর তো উপায় নেই, এবার খেলা শেষ করা যাক!"

অন্যদের বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। চোখ বড়-বড় করে সব শুনছে। জোজোই প্রথম বলল, "কাকাবাবু, আপনি জানতেন যে, নরেন্দ্র ভার্মা আমাদের বাঁচাবার জন্য এখানে লুকিয়ে আছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তা জানতাম না। ও তো আগে থেকে কিছু বলে না। তবে আমার একটু-একটু সন্দেহ হয়েছিল। নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি করে কে আমাদের অনুসরণ করবে? কে আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে? আমার তো এই সাতনায় সেরকম বন্ধু কেউ নেই। কামালের কথা বাদ দিচ্ছি, সে গোপনে অনুসরণ করবে কেন? তা হলে কে হতে পারে?"

তারপর নরেন্দ্র ভার্মার দিকে ফিরে বললেন, "তুমি এবারেও আমাকে টোপ ফেলেছিলে, তাই না? আমি যে এখানে এসেছি, সে-খবর তুমিই ছড়িয়েছ। খবরের কাগজে আমার কথা ছাপাবার ব্যবস্থা করেছ।"

নরেন্দ্র ভার্মা সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, "মাছধরার জন্য যেমন টোপ লাগে, সেইরকম বড়-বড় অপরাধীদের ধরার জন্য তুমি বেশ ভাল টোপ। এই ব্যাটা অবোধরাম জেল ভেঙে পালিয়েছে কয়েক মাস আগে, কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না, তখন ভাবলাম, ও নিশ্চয়ই তোমার ওপর প্রতিশোধ নিতে আসবে। কলকাতায় তোমার বাড়িতে বোমা ছোড়ার ঘটনা শুনে মনে হল, সেটা অবোধরামেরই কীর্তি। রাজা, তুমি যখন সাতনায় বেড়াতে আসতে চাইলে, তখনই ঠিক করলাম, তা হলে অবোধরামকেও এখানে টেনে আনা যাক। তাই তোমার এখানে আসার খবর ছড়িয়ে দিলাম। অবোধরাম তোমাকে মারতে আসবে, আমি পেছন থেকে ওকে এসে ধরব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমিও ভাবলাম, কেউ যখন আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে, তখন বাড়িতে লুকিয়ে বসে থেকে কিংবা

পুলিশের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকা যাবে না। হঠাৎ বোমা ছুড়বে কিংবা চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি চালাবে। তার চেয়ে ওদের প্রকাশ্য জায়গায় মুখোমুখি টেনে আনাই ভাল। বাজারে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলাম যে, মাছ ধরতে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি। সে-খবর পেয়ে ওরা আসবেই। তবে একবার সুরযপ্রসাদ, একবার অবোধরাম, এরকম যে পরপর আসবে, সেটা চিন্তা করিনি !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ওই সুরযপ্রসাদ তো চুনোপুঁটি। ওর কথা আমিও ভাবিনি। ওকে ফাউ হিসেবে পাওয়া গেছে। অবোধরামই রাঘব বোয়াল।"

অংশু বলল, "সার, একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনি পুলিশ-টুলিশ না নিয়ে এখানে চলে এলেন। নির্জন জায়গা, ওরা যদি প্রথমেই রাইফেল দিয়ে কিংবা স্টেনগান দিয়ে ট্যা-রা-রা-রা করে গুলি চালিয়ে দিত, আপনি কী করে বাঁচতেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। প্রথমেই গুলি এরা চালায় না। ভাড়াটে খুনিরা দূর থেকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যারা দলের সর্দার ধরনের, তাদের প্রত্যেকেরই খুব অহঙ্কার থাকে। তারা সামনে এসে মারার আগে অনেক কথা বলে। নিজের যে কত বুদ্ধি আর শক্তি, সেটা প্রমাণ করতে চায়। এরা যত কথা বলবে, ততই সময় পাওয়া যাবে। যত সময় পাওয়া যায়, ততই ওদের সঙ্গে আরও কথা বলে রাগিয়ে দিতে হয়। রেগে গেলে ওরা অসাবধানী হয়ে পড়ে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী খুব লাকি। আগেও অনেকবার দেখেছি, ও কী করে যেন ঠিক বেঁচে যায়।"

কাকাবাবু তার পিঠে একটা কিল মেরে বললেন, "আমি লাকি, তাই না ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। এর পরের বার তোমাকে টোপ হিসেবে দাঁড় করাব !"

অবোধরাম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। গুলি লেগেছে তার কনুইতে, রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে। আহত অবস্থাতেও সে চেয়ে আছে কটমটিয়ে।

সন্তু একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। এবার বলল, "কিন্তু কাকাবাবুর অসুখের সময় আমাদের বাড়িতে কালো চশমা পরে কে এসেছিল ? সে তো এই লোকটা হতে পারে না ! অবোধরাম বাঙালি নয়, কিন্তু সে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেছিল। তা ছাড়া, খুব সম্ভবত তার একটা চোখ পাথরের।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না, সে এ নয়। তার নাম কানা হাবলু। পোশাকি নাম হাবুল সিং। সে বাঙালি হলেও অমৃতসর শহরের লোক। কখনও বাঙালি সাজে, কখনও পাঞ্জাবি। মাথায় বুদ্ধি বিশেষ নেই, কিন্তু গায়ে খুব জোর। একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে ধরা পড়ে দিল্লির এক জেলে অবোধরামের সঙ্গে ছিল। অবোধরামের বুদ্ধিতেই সেও জেল থেকে একসঙ্গে পালায়। অবোধরাম তাকেই কলকাতায় পাঠিয়েছিল তোমার গতিবিধি জানবার জন্য। গ্যাস বোমা বোধ হয় নিজের বুদ্ধিতেই সে ছুড়েছিল। ঠিক বলেছ সন্তু, কানা হাবলুর একটা চোখ পাথরের।"

কামাল বললেন, "আমাকেও বোধ হয় সেই লোকটাই একবার আক্রমণ করতে এসেছিল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হতেই পারে। তবে সে কয়েকদিন আগে ধরা পড়ে গেছে, তাকে জেরা করে সব জানা যাবে !"

কাকাবাবু বললেন, "একটা মজা কী জানো, সন্তু আর জোজো আমাদের আফগানিস্তানের সেই প্রথম অভিযানের কাহিনীটা খুব শুনতে চেয়েছিল, ক'দিন ধরে কামাল আর আমি সেটা ওদের বলছিলাম। ওই সময়ই অবোধরাম এসে হানা দিল !"

নরেন্দ্র ভার্মা অবোধরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পেহলবান, এই স্টেনগানটা জোগাড় করলে কোথা থেকে ? তোমার টাকার অভাব নেই, চুপচাপ কোনও গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থাকলে তোমাকে খুঁজে বার করা যেত না। রাজা রায়চৌধুরীকে খোঁচাতে এসেই তুমি ধরা পড়লে।"

অবোধরাম গম্ভীর গলায় বলল, "কোনও জেল আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আমি আবার বেরোব। তোমাদের ওপর ঠিক প্রতিশোধ নেব !"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? যদি সত্যিই আবার বেরিয়ে আসতে পারো, তা হলে সেবারে নরেন্দ্রকে টোপ রাখব !"

কামাল বললেন, "ওর ডান হাতের পাঞ্জাটা একেবারে ভেঙে দিলে কেমন হয় ? তা হলে আর কোনওদিন ও আর বন্দুক পিস্তল ধরতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, ওসব করতে যেয়ো না ! আমরা তো বিচারক নই, আদালত ওকে যা শাস্তি দেবে, সেটাই ও ভোগ করবে।"

কামাল বললেন, "ও দু-দু'বার আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল, আমার ইচ্ছে করছে—"

নরেন্দ্র ভার্মা তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "মাথা ঠাণ্ডা করুন কামালসাহেব ! দেখছেন না, রাজা কেমন ফুর্তিতে আছে। চলো রাজা, এবার যাওয়া যাক। আর এখানে থেকে কী হবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা এই লোকগুলোকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি এখন যাচ্ছি না। মাছ ধরতে এসেছি, এইবার মন দিয়ে মাছ ধরতে হবে।"

কাকাবাবু জলের ধারে এগিয়ে গিয়ে ছিপ নিয়ে বসলেন। গুনগুন করে গান ধরলেন, "আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি/ সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা/আমায় চেন কী ?"

স্পনসরশিপ

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
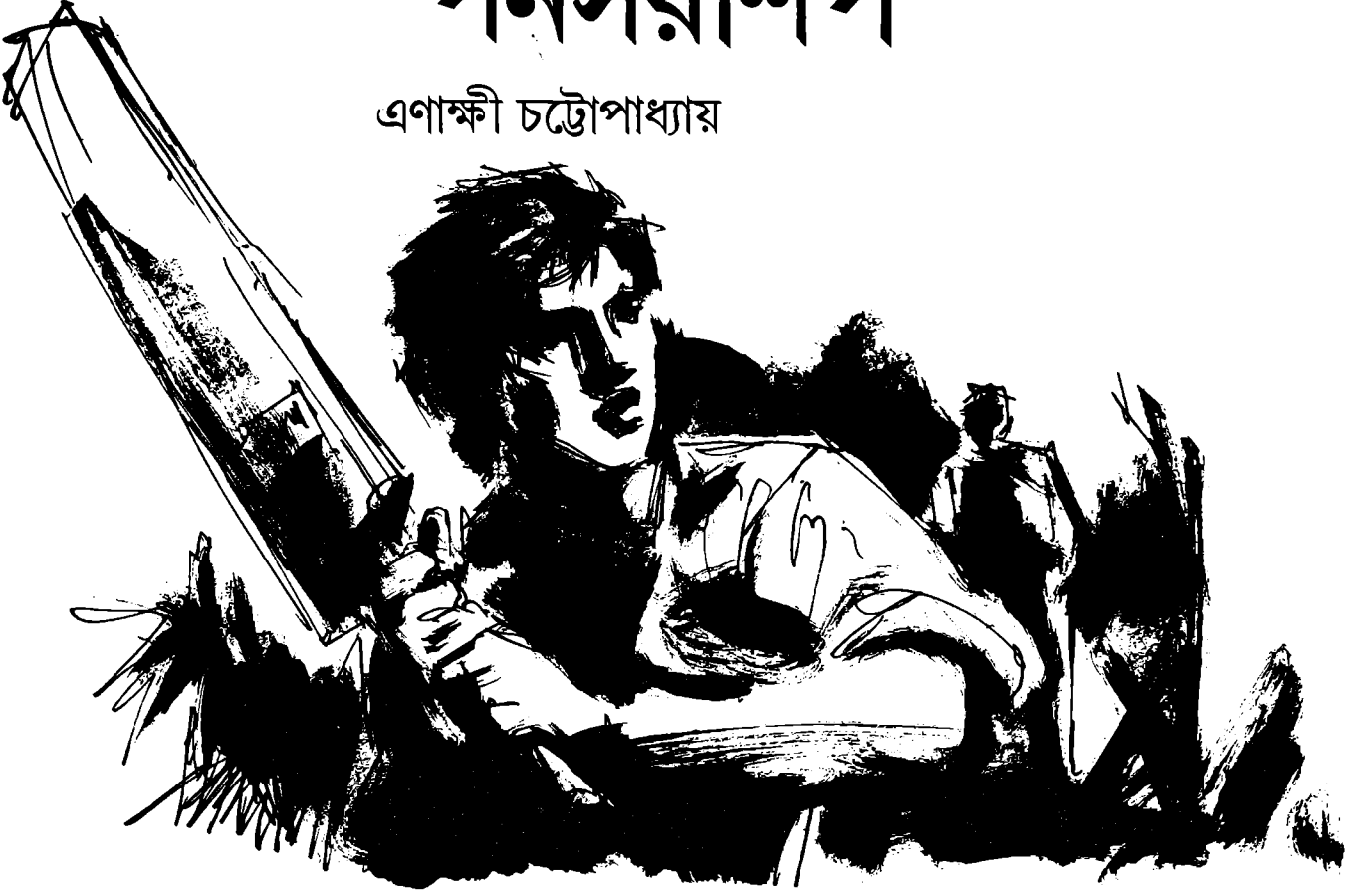
রাজুর মনটা কাল থেকে ভাল নেই। মিছিমিছি কেন যে বাপ্পার সঙ্গে তর্ক করতে গেল! তর্ক থেকে ঝগড়া, ঝগড়া থেকে হাতাহাতি, তারপর কী হত কেউ জানে না যদি না ঠিক ওই সময়ে একটা সবজি-ভর্তি ঠেলাগাড়ির সঙ্গে একটা সাদা মারুতির ধাক্কা লাগত। বাধ্য হয়ে দু'জনকেই মারামারি ছেড়ে ওদিকে ছুটতে হল।

ও হরি। মারুতি চালাচ্ছে শ্রীলাদি, পাশে আর কেউ বসে নেই। ছেলেদের মতো করে ছাঁটা চুল আর শার্ট-প্যান্ট দেখে সবাই ওকে ড্রাইভার ভেবে এই মারে তো সেই মারে। সবজিওয়ালার কিন্তু কিছুই হয়নি, কেবল আলুগুলো পড়ে গিয়ে রাস্তার এদিক থেকে ওদিক গড়াগড়ি খাচ্ছে। শ্রীলাদি খুব ডানপিটে মেয়ে। মারধরের পরোয়া না করে সোজা নেমে এসে আলু কুড়োতে লেগে গেল। রাজু চেঁচিয়ে উঠেছে "শ্রীলাদি! তুমি!" সেই শুনে সমবেত জনতা একটু ঘাবড়ে গেল। মেয়ে ড্রাইভার! তার গায়ে কি হাত তোলা উচিত হবে? কেউ-কেউ বলল, "আরে এ তো শার্ট-প্যান্ট পরা মেয়ে"—অর্থাৎ একে মারলে ক্ষতি কী?

শ্রীলাদি ততক্ষণে ছিটকে পড়া আলুর প্রায় অর্ধেক ঠেলায় তুলে দিয়ে ওদের দিকে তাকাল। "হাঁ করে দেখছ কী সব? একটু হাত লাগাতে পারো না? যত সব অকম্মার ঢেঁকি।"

একজন চটে গিয়ে বলল, "গালাগালি দেবেন না দিদিমণি। একটু হলেই লোকটার জান চলে যাচ্ছিল।"

ভুরু কুঁচকে শ্রীলাদি জিজ্ঞেস করল, "কার?"

"কেন, ওই আপনি যাকে ধাক্কা মেরেছেন?"

শ্রীলাদি গম্ভীরভাবে লোকটার আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর বলল, "হুঃ। জান চলে যাচ্ছিল। যায়নি তো?"

রাজু ততক্ষণে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এসেছে। একটা কথা বলা দরকার। এরা তো চেনে না শ্রীলাদিকে। বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে রাজু ঘোষণা করল, "শ্রীলাদি কিন্তু ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান।"

যে লোকটা খামোখা তর্ক করছিল তার মুখটা একটু শুকিয়ে গেল। কিন্তু এতদূর এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা, এই মনে করে সে সাহস দেখিয়ে বলল, "আপনার কিন্তু ওকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। অন্তত এক হাজার।"

"বুদ্ধির বলিহারি। ব্যাগে করে কেউ এক হাজার টাকা নিয়ে বেড়ায়? রাস্তায় ঘাটে দান-খয়রাতি করবে বলে?"

"কত আছে আপনার ব্যাগে?"

রাজু মনে-মনে প্রমাদ গুনল। ওরা কাকে ঘাঁটাচ্ছে জানলে এই ধরনের কথাবার্তা চালাবার আগে তিনবার ভাবত।

কিন্তু শ্রীলাদিকে বোঝা মুশকিল। সে বলল, "ব্যাগে আছে কিছু খুচরো টাকা, কিছু দরকারি কাগজপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স আর ক্রেডিট কার্ড। এতে হবে?"
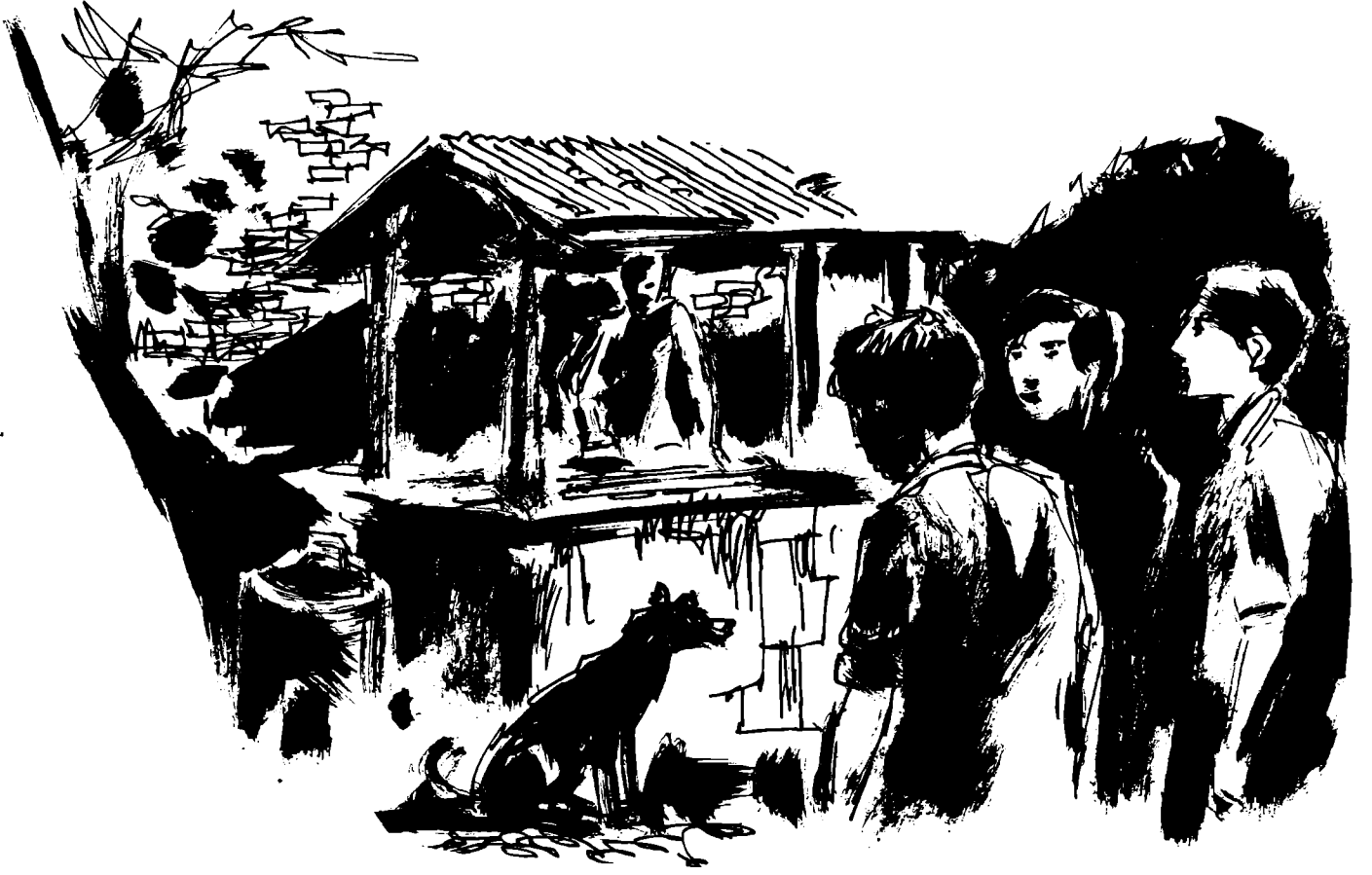
ক্রেডিট কার্ডটা বের করে লোকটার নাকের সামনে নাচাল শ্রীলাদি।

"ও তো প্লাস্টিক। ওতে কী হবে? গান্ধীজির নোট বার করুন দিদিমণি, মেলা ঝামেলা করবেন না।"

"পাঁচশো? একটু কমালে হয় না।"

"ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়", এতক্ষণে অন্য একজন মুখ খুলল, "তিনশো হলেই হবে।"

"তোমার তাতে কী হে? গায়ে পড়ে সর্দারি করতে এসেছ?" শ্রীলাদি ততক্ষণে নিজমূর্তি ধারণ করেছে। "যার জান চলে যাচ্ছিল তাকেই জিজ্ঞেস করলে হয় না?"

ঠেলাওয়ালা বেচারা বেগতিক দেখে ততক্ষণে সটকে পড়ার তাল করছিল।

"অ্যাই! ইধর সুনো ভাইয়া।" শ্রীলাদি হুঙ্কার দিল।

"কসুর হো গিয়া দিদি হম আপকে গাড়িকে সামনে আ গিয়া থা। হর্ন শুনা থা লেকিন দেখা নহি থা মুড়কে।"

তার কথায় কর্ণপাত না করে শ্রীলাদি বলল, "তোমার নাম কী?"

"রামপ্রসাদ।"

"বাড়ি কোথায়?"

"জাহানাবাদ।"

"চলো আমার সঙ্গে।" গাড়ির দরজা খুলে তাকে পাশে বসতে আমন্ত্রণ জানাল শ্রীলাদি।

হাতজোড় করে রামপ্রসাদ বলল, "ছোড় দিজিয়ে, ছোড় দিজিয়ে। অওর অ্যায়সা কভি নহি হোগা।"

"তাই বললে কি হয় নাকি! তোমাকে আমি ক্ষতিপূরণ দিয়েই ছাড়ব। অ্যাই রাজু, তখন থেকে তো ঘুরঘুর করছিস দেখছি। ওর ঠেলা পাহারা দে। দেখবি কেউ যেন ওর আলু-বেগুন একটা না সরায়।" বলেই সন্দেহজনক চোখে শ্রীলাদি ভিড়ের লোকগুলোকে একবার দেখে নিল।

"আমরা কেউ সঙ্গে গেলে হত না?" একজন ফোড়ন কাটল।

"কেন?" শ্রীলাদি সোজা তার এক হাতের মধ্যে চলে গেল। "আমি কি রামপ্রসাদকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব? গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল!"

লোকটা চটেপটে কী যেন বলতে গেল, তার পরমুহূর্তেই দেখা গেল সে চিতপটাং হয়ে দশ হাত দূরে একটা বালির ঢিবির ওপর পড়ে আছে আর সাদা মারুতি ততক্ষণে চোখের আড়ালে।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে প্রথমে রাজু একচোট মায়ের কাছে বকুনি খেল সময়মতো চান করতে আসেনি বলে। মায়ের বকুনি খেয়ে রাজু কোনওদিন মুখ ভার করে না, তাই আজ তার রকমসকম দেখে মা বুঝলেন কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে। জিজ্ঞেস করাও বৃথা, কারণ দরকারের বেশি কথা বলা রাজুর পছন্দ নয়।

ছুটির দিন। বাবা অনেকক্ষণ ধরে খবরের কাগজ পড়েন। কাগজটা পাট করে রান্নাঘরের দিকে আসছিলেন সম্ভবত কী রান্না হয়েছে সেই খোঁজ নিতে। মা বললেন, "জানো তো শ্রীলার কাণ্ড?"

"কী কাণ্ড? জানি না তো।"

"ছুটতে-ছুটতে ঢুকল, মুখচোখ লাল। বলল, মাসিমা শিগ্‌গির পঞ্চাশটা টাকা দাও তো, গাড়িতে একজনকে বসিয়ে এসেছি। আমি দিলাম। বললাম হঠাৎ পঞ্চাশ টাকা? ও বলল সমাজসেবা। পরে ফেরত দেব। বলেই যেমন ছুটতে

ছুটতে এসেছিল তেমনই চলে গেল। কী গেছো মেয়ে রে বাবা।"

"তার ওপর আবার ক্যারাটে শিখে একটি রণরঙ্গিনী হয়েছেন।" বাবা শ্রীলাদিকে খুব একটা পছন্দ করেন না। "কী বললে ? সমাজসেবা ? সেটা তো ওর মায়ের ডিপার্টমেন্ট। ওখানেও জুটেছে নাকি মেয়েটা ? বেশ তো ছিল খেলা-টেলা নিয়ে।"

সমাজসেবার ডিটেলটা রাজু ইচ্ছে করলেই ফাঁস করতে পারত, কিন্তু তার ইচ্ছে করল না। বাপ্পার ওপর রাগটা এখনও মনের মধ্যে বিজবিজ করছে। কোনওমতে চান সেরে চুপচাপ খেতে বসে গেল। বাবার পাশে। বাবার ডান দিকের আসনে বসবে রাজু, রাজুর ডান দিকে ওর ছোট ভাই টিটো, দাদুর আমল থেকে এইরকমই হয়ে আসছে। দাদু খাবার টেবিলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাতে নাকি অনর্থক জায়গা নষ্ট। তা ছাড়া আসনপিঁড়ি হয়ে বসলে হাঁটুর এক্সারসাইজ হয়—সেটা ছেলে-বুড়ো সকলের পক্ষেই ভাল। যাকে নিচু হয়ে পরিবেশন করতে হচ্ছে তার শিরদাঁড়াও এইভাবে বেশ মজবুত থাকে। এক্সারসাইজটা মায়ের পক্ষেই বেশি হয়ে যায় অবশ্য। সকলের খাওয়া হয়ে গেলে মা একা খেতে বসেন। বাড়িতে পিসি-টিসিরা এলে অবশ্য আলাদা কথা। তখন মায়ের ছুটি। তবে খেতে বসার বেলায় ছেলেরা আলাদা, মেয়েরা আলাদা। সবই দাদুর আমল থেকে চলে আসছে। অনেক সময় মুখোমুখি দুটো লাইনও হয়, কিন্তু কার জায়গা কোথায়, সব আগে থেকেই ঠিক করা আছে।

পরিবেশন করতে এসে মা বলে উঠলেন, "এ কী, টিটো এখনও ফেরেনি ! একটা বাজতে চলল।"

বাবা আজ একটু ভাল মুডে ছিলেন। বললেন, "ম্যাচ বোধ হয় এখনও শেষ হয়নি। টিটো একেবারে ম্যান অব দ্য ম্যাচের কাপটা নিয়ে ফিরবে।"

মাকে একটু উদ্বিগ্ন মনে হল। বললেন, "ম্যাচ তো আজ নেই। ওকে কাপড় দিয়ে ইস্ত্রিওয়ালার কাছে পাঠিয়েছিলাম—সে তো এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। কী করছে ও এতক্ষণ ধরে ? রাজু, তুই ওকে দেখেছিস ?"

দুই ভাই কিন্তু পাড়ার দুই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে। টিটোর বন্ধুরা মিলে একটা ক্লাব করেছে, পাঁচজন মিলে শুরু হয় বলে তার নাম 'ফাইভ স্টার ক্লাব'। আজকাল ওরা সরস্বতী পুজোও করছে। যে খালি জমিটায় ওদের ফুটবল মাঠ ছিল, সেখানে শোনা যাচ্ছে এবার বাড়ি উঠবে। সেই জমির মালিক ওদের বলেছেন তোমরা যদি একটু মালপত্তরের দিকে নজর রাখো তা হলে আমার বারান্দাটা তোমাদের ব্যবহার করতে দিতে পারি। কাজেই ফুটবল-মাঠ এখন আর খেলার অবস্থায় নেই—ওরা অন্য মাঠে খেলতে যায়, অন্য সময় পাঁচিলে বসে নানারকম প্ল্যান করে।

রাজু বলল, "না, আমি তো ঠেলা পাহারা দিচ্ছিলাম। পোস্ট অফিসের পেছনের গলিতে—"

বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, "ঠেলা পাহারা ? সেটা আবার কী ?"

রাজু একটু বিপদে পড়ে গেল। শ্রীলাদির কাণ্ডটা বাড়িতে জানাজানি হোক সেটা তার মোটেই ইচ্ছে নয়, এখন বাবাকে কিছু তো বলতে হয়, এমন সময় মুশকিল আসানের মতো দৌড়তে-দৌড়তে বাড়ি ঢুকল টিটো। তার হাতে একটা মস্ত কাপড়ের পোঁটলা। পোঁটলাটা ধপাস করে চৌকির ওপর ফেলেই ও হাঁফাতে-হাঁফাতে ঘোষণা করল—"ইস্ত্রিওয়ালার ছেলে নিরুদ্দেশ।"

"তুমি কি থানা-পুলিশ করতে গিয়েছিলে নাকি ? এক ঘণ্টা ধরে কোন মুল্লুকে ঘুরছিলে ?" বাবার ঠাণ্ডা মেজাজ এতক্ষণে একটু গরম হয়েছে মনে হল।

মা হাতের ডেকচি মাটিতে বসিয়ে বললেন, "কী সর্বনাশ ? নিরুদ্দেশ ! কেন ? কবে থেকে ? ইস, বড় ভাল ছেলেটা—কী যেন নাম ?"

রাজু বলল, "বিশে।" বলেই ডাল দিয়ে ভাত মাখার দিকে মন দিল। ইতিমধ্যেই একটুখানি ভাত দিয়ে উচ্ছেভাজাগুলো ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল। যাতে সেটা কারও নজরে না পড়ে।

বাবা বললেন, "বিশে, না ভুতো ?"

মা বললেন, "কী আশ্চর্য, ভুতো তো ওর কুকুরের নাম। ও যখন কাপড় দিতে আসে ওর পেছন-পেছন লেজ নাড়তে নাড়তে আসে। তুমি রোজ দ্যাখো !"

বাবা বললেন, "দেখলেই কি নাম জানতে হবে ? আমি কী করে জানব ওর নাম ভুতো না ওর কুকুরের নাম ভুতো।"

ততক্ষণে টিটো একছুটে কোনওমতে হাতটা ধুয়ে আসনে বসে পড়েছে। রাজু আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ওর হাঁটুতে কাদা, গোড়ালিও ধুলোমাখা।

টিটো যখন আসরে অবতীর্ণ হয়েছে তখন আর কাউকে কথা বলতে হবে না। রাজু ভাবল ভালই হয়েছে, কেন ঠেলাগাড়ি পাহারা দিচ্ছিলাম সেই নিয়ে একগাদা মিথ্যে কথা বলার হাত থেকে রেহাই পেলাম।

প্রথম কয়েক মিনিট কোনও কথা নেই। সবাই মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। মা যখন মাংস আনতে রান্নাঘরে গেছেন বাবা এক ঢোক জল খেয়ে বললেন, "আহ্, কলাইয়ের ডালের সঙ্গে আলুপোস্ত। এ না হলে রোববার দুপুরটা জমেই না।"

রাজু ভাবল, এর মধ্যে আবার উচ্ছে ভাজা জুটে গেছে কেন ! যাই হোক বাবার সামনে এটা খাব না সেটা খাব না বলা যাবে না। এ-বাড়ির নিয়মই তাই। যা পাতে দেওয়া হবে সোনা মুখ করে খেতে হবে, সে শুক্তোই হোক আর নিম-বেগুনই হোক।

এইবারে বাবা টিটোকে সরাসরি আক্রমণ করলেন। "হ্যাঁ রে, কী হয়েছিল ভুতোর ? বললি না তো ?"

মা ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে এসে কড়া গলায় বললেন, "আবার ভুতো ? শুনছ বিশে নিরুদ্দেশ !"

টিটোর কথা শুনতে গেলে খুবই মনঃসংযোগ করা দরকার। ঝড়ের বেগ বলতে যা বোঝায় তার চেয়েও বেশি স্পিডে কথা বলা ওর অভ্যেস। বাড়ির লোকেরা মোটামুটি বুঝতে পারে কিন্তু বাইরের কেউ হলে হতভম্ব হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে বলতে বাধ্য হয়, "কী বললি ? আবার বল তো। একটু আস্তে আস্তে বল।"

টিটোর বক্তব্যের সারাংশ হল এই যে, ওদের পাড়ার লম্বা ইস্ত্রিওয়ালা, যে সারাদিনে পাহাড়ের মতো কাপড় ইস্ত্রি করে, তার বিরোধী পার্টি একজন আছে, সে অপারেট করে পার্কের পশ্চিম দিকে। সে বেশ কুচকুচে কালো। লম্বাকে বাবা বলেন লম্বু আর অন্যজনকে কালীনাথ। এখন লম্বুর ছেলে বিশে খুবই ভাল ছেলে—তার কাজ হল সকালবেলা বাড়ি-বাড়ি ঘণ্টি বাজিয়ে ইস্ত্রির কাপড় সংগ্রহ করা আর বিকেলে সেগুলো আবার যথাস্থানে ফেরত দেওয়া। এর ফাঁকে দুপুরবেলা ও স্কুলটাও সেরে আসে। সেই বিশে রাগ করে কোথায় চলে গেছে, ওর মাও জানে না, বাবাও জানে না। কেউ-ই জানে না। বেচারা লম্বু গালে হাত দিয়ে বসে আছে ওর ইস্ত্রির গাড়ির ওপর পা ঝুলিয়ে, উনুনে আঁচ দেওয়া হয়নি, আর আঁচ দিয়েই বা হবেটা কী, বিশে তো নেই, কে ওকে

বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কাপড় জোগাড় করে দেবে! এইরকম পরিস্থিতিতে টিটো কাপড়ের পোঁটলা নিয়ে ওখানে পৌঁছে দেখে লম্বুকে ঘিরে ছোটখাটো একটা জটলা। সবাই ওকে নানারকম পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু লম্বু কেবল মাথা নেড়ে যাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে, "আমি কী করি বাবু? বিশের মাকে তো আর সামলাতে পারছি না।" সবাই ওকে যত সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "কোথায় আর যাবে? খিদে পেলে ঠিক ফিরে আসবে। তুমি বরং নিজেই দু-চারটে বাড়ি থেকে যা পারো কাপড় নিয়ে এসে কাজ শুরু করে দাও।" কিন্তু লম্বুর মাথায় কিছুই ঢুকছে না। প্রত্যেকের নানারকম শলা-পরামর্শ সবিস্তারে বর্ণনা করার পর টিটো থামল। তারপর ঘোষণা করল, "বাবা, আমি ওকে তোমার কাছে আসতে বলেছি। আমি বলেছি আমার বাবার টিভির লোকজনদের সঙ্গে অনেক চেনাজানা। বাবা একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে।"

ক'দিন পরে সন্ধেবেলা সত্যি-সত্যিই কাঁচুমাচু মুখ করে লম্বু ইস্ত্রিওয়ালা এসে হাজির। সঙ্গে পাড়ার দু-চারজন মাতব্বর ব্যক্তি। বাবা আগেই জানতেন, কাজেই এঁদের দেখে খুব একটা অবাক হলেন না।

"বসুন, বসুন। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

শেষের কথাটা লম্বুকে। কিন্তু লম্বু করুণ মুখ করে চটি খুলে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা বললেন, "কী হয়েছে খুলে বলো তো দেখি। কী করতে পারা যায় দেখতে হবে।"

লম্বু এবং পাড়ার কর্তাব্যক্তিরা পালা করে ঘটনাটা বোঝালেন। বিশে খুবই বাধ্য ছেলে। স্কুলেও পড়ছে, আবার সকাল-বিকেল বাবার কাজে সাহায্য করছে, এরকম বড় একটা দেখা যায় না। তা ছাড়া হিসেবপত্তরেও মাথা খুব। কখনও এর বাড়ির বালিশের ওয়াড় ওর বাড়ি চলে যায় না। পরদা কিংবা চাদরও এদিক-ওদিক হয় না। শাড়ি আর শার্ট চিনে রাখা সহজ, কিন্তু বালিশের ওয়াড় আর চাদর এগুলো সবই একরকম দেখতে। বিশে টাকা-পয়সার হিসেব মেলাতেও খুব সিদ্ধহস্ত। এখন জেরার মুখে জানা গেল ওর বাবা, মানে লম্বু ইস্ত্রিওয়ালা দশের বেশি গুনতেই জানে না। কাজেই সব ব্যাপারে বিশেই ছিল ওর ডান হাত।

সবই ঠিকঠাক চলছিল। মাঝখানে

ক্রিকেট খেলার ধুম উঠল। তাতেই মাথাটা বিগড়ে গেল ছেলেটার। সমস্তক্ষণ রেডিওতে, টিভিতে খেলা চলছে, কাজকর্ম ফেলে সবাই তাই নিয়ে মত্ত। রাস্তায়-রাস্তায় চলছে ক্রিকেট, চিৎকারের ঠেলায় কেউ ইচ্ছে থাকলেও মন দিয়ে কাজ করবে তার সাধ্য কী! অন্য ছেলেদের কাছে কী শুনেছে কে জানে, একদিন ও মাকে এসে বলল বাবার কাছে কাজ না করে ও এখন 'কিরকিট' খেলবে। মায়ের তো শুনে চক্ষু ছানাবড়া, "কিরকিট খেলবি কী রে? এই কি তোর খেলা করার সময়?" বিশে বার বার বলেছে এ কিন্তু সেরকম খেলা নয়। মা ভাবলেন, গুলি খেলা কিংবা হা-ডু-ডু বুঝি। বিশে মাকে কেবল বলে, লেখাপড়া করে কোনও লাভ নেই। এখন জীবনে উন্নতি করতে গেলে কিরকিট। মা চটেমটে বলেছেন, "কী পাবে তুমি হাতি আর ঘোড়া কিরকিট খেলে।" বিশে উত্তর দিয়েছে, "হাতি-ঘোড়া তো কিছুই নয়—পাব হাজার-হাজার টাকা, ইয়া বড় চেক, কত নতুন-নতুন মডেলের গাড়ি, কে যেন নাকি বাড়িও পেয়েছিল ভাল কিরকিট খেলে।" বলাই বাহুল্য, এতে চিঁড়ে ভেজেনি। মা কীসব বলেছেন, তাতে মাথা গরম হয়ে গেছে ছেলের। সেই যে কোথায় চলে গেছে, তারপর আর কোনও খোঁজ নেই।

তো এই হল ব্যাপার। ভাল ক্রিকেট প্লেয়ার হয়ে তবেই বাড়ি ফিরবে বিশে, তার আগে নয়। সমবেত ভদ্রলোকদের মুখ গম্ভীর। বাবাও মাথা নেড়ে বললেন, "দেখুন, ছেলেটার দোষ কী। আমরাই তো ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ করে কুরুক্ষেত্র করছি। কাজকর্ম সব বন্ধ, খালি খেলা আর খেলা। তাও যদি নিজেরা খেলতিস তো বুঝতাম।"

ব্যানার্জিকাকা বললেন, "তবু তো ছেলেটার উচ্চাশা আছে। ভাল প্লেয়ার হবে। এদের তো যত হইচই সব টিভিকে ঘিরে।"

লম্বু বেচারা কাঁচুমাচু মুখে বলল, "বাবু, আমার বিশে কী করলে বাড়ি ফিরে আসবে সেটা যদি বলেন?"

বাবা বললেন, "কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। ও ছেলে তো লেখাপড়া শিখেছে।"

"কিন্তু কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে কী? প্রশ্ন তো সেইটাই।" মন্তব্য করলেন আর একজন।

"হ্যাঁ, খেলার খবরটা পড়ে নিশ্চয়ই। সেই ফাঁকে যদি নিরুদ্দেশের পাতাটা নজরে পড়ে।" বললেন ব্যানার্জিকাকা।

"কিন্তু ধরুন যদি এমন হয় যে, ও গ্রামের দিকে গিয়ে কোনও চাষির বাড়ি ঘাপটি মেরে বসে আছে। তা হলে তো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভ নেই। টিভিতে দিয়েও নেই।"

সবাই মিলে মুখ গম্ভীর করে শলাপরামর্শ করছেন এমন সময় হুড়মুড় দুদ্দাড় করে টিটোর প্রবেশ। "দাদা, দাদা, তোকে বাপ্পাদা খুঁজছে।"

রাজু এতক্ষণ ঘরেই এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সকলের কথাবার্তা শুনছিল। শুনতে-শুনতে ওর মাথায় একটা আইডিয়া আসব-আসব করছিল, কিন্তু বাপ্পা? নাহ্, বাপ্পার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই সে রাখবে না। টিটোকে বলল, "বলে দে আমি বাড়ি নেই।"

টিটো চোখ গোল-গোল করে বলল, "সে কী। আছ তো।"

"এতক্ষণ ছিলাম, আর নেই," বলে রাজু এক দৌড় দিল ছাদের সিঁড়ির দিকে।

ছাদে অন্ধকার, তবু অন্ধকারেই মাথাটা খেলে ভাল। সমস্ত জিনিসটা গোড়া থেকে মনে-মনে ছকে ফেলার চেষ্টা করল সে। উদ্দেশ্য একটাই, বিশেকে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু বিশেকে ফিরিয়ে আনা মানে কি তার আগেকার জীবনে ফিরিয়ে আনা? তার মা-বাবা অবশ্য তাই চাইবে, কিন্তু বিশে তা চাইবে না। সে তা হলে আবার পালাবে। সত্যিকার সমাধানের রাস্তা এটা নয়। সমাধান হল তার হাতে ক্রিকেট ব্যাট ধরিয়ে দেওয়া। ভাল প্লেয়ার হবে কি হবে না সেটা অনেক পরের ব্যাপার, অনেক সাধনার ব্যাপার। কিন্তু সুযোগ-সুবিধের কথাটা আসছে তার আগে। বিশে যে স্কুলে যায় সেখানে ফুটবল ছাড়া আর কোনও খেলার ব্যবস্থা নেই। ফুটবলেরও ব্যবস্থা আছে বলা ঠিক নয়, তবে ছেলেরা খেলে। একটা ফুটবল-টিমও আছে।

ফুটবল নিয়ে থাকলেই পারত বিশেটা, কিন্তু সব বাড়ি গিয়ে টিভি দেখছে তো, ফুটবলের চেয়ে ক্রিকেটের কভারেজ অনেক বেশি, গ্ল্যামার বেশি, এখন আবার সবুজ, নীল কতরকম ইউনিফর্ম, প্লেয়ারদের মুখের গার্ড, মাথার ক্যাপ — এইসব দেখলে কার না লোভ হয়! সঙ্গে-সঙ্গে রাজুর মনে পড়ে গেল বাপ্পার সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল এই ক্রিকেট নিয়েই। বাপ্পা বলছিল, "বড়-বড় কোম্পানিরা এইসব ক্রিকেট-ম্যাচ স্পনসর করে কেন জানিস? কারণ, তা হলে তাদের বিজ্ঞাপন হয়।"

রাজু বলেছিল, "সবরকম স্পনসরশিপ কিন্তু সেরকম নয়।"

"সেরকম নয় তো কীরকম?" ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল বাপ্পার।

"আমি ক্রিকেটের স্পনসরশিপের কথা বলছি না। ধর, ছেলে স্পনসর যারা করে।"

"সে আবার কেমন কথা?"

"তুই জানিস না? শ্রীলাদির মা যে অফিসে কাজ করেন তারা গরিব ছেলেদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেয়, স্পনসরশিপের টাকাটা ঠিকমতো খরচ হচ্ছে কিনা।"

এই শুনে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে এমন হাসি শুরু করে দিল বাপ্পা যে, রাজুর মাথাটা গরম হয়ে গেল।

"যা জানিস না তা নিয়ে হাসা উচিত নয়।" বাপ্পা কী করে জানবে ওরকম একটা এঁদো জায়গায় গিয়ে শ্রীলাদির মা ধানখেতের আল থেকে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিলেন, তারপর সেই পা-মচকানি সারতে কতদিন লাগল।

বাপ্পা তবুও হেসেই চলেছে। "ছেলে স্পনসর! বেশ বলেছিস। ক'টা ছেলে? কারা স্পনসর করে?"

"সেসব আমি জানি না। সম্ভবত হল্যান্ড কিংবা জার্মানি থেকে কিছু লোক এখানকার কিছু বাচ্চাকে নিয়মিত টাকা পাঠায় যাতে তারা ঠিকমতো শিক্ষা পায়, ভালভাবে বড় হতে পারে।"

বাপ্পা বলল, "তাদের কী লাভ এতে?"

রাজু চটেমটে বলল, "কী লাভ আবার? কয়েকটি ছেলে সুযোগ সুবিধে পাবে, এইটাই লাভ।"

তখন বাপ্পা মুচকি হেসে বলল, "তা হলে বল না শ্রীলাদির মাকে আমার জন্যে একটা স্পনসর জুটিয়ে দিক।"

তখনই ঘুসিটা কষাতে বাধ্য হল রাজু। বাপ্পা চুপচাপ ঘুসি হজম করার পাত্রই নয়। মারামারিটা কোথায় গিয়ে থামত কেউ জানে না, তবে তখন ওই শ্রীলাদির মারুতির কাণ্ডটা ঘটল।

কিন্তু দুই আর দুইয়ে যেমন চার হয় তেমনই দুটো জিনিস মিশে একটা সমাধানের রাস্তা খুলে গেল হঠাৎ। বাপ্পাকে মনে-মনে ধন্যবাদ জানাল রাজু। এত সহজ কথা আগে কেন মনে হয়নি ভেবে অবাক লাগল। কিংবা হয়তো বেশি সহজ বলেই মাথায় আসেনি। যেমন, সেই চারটে উটের ধাঁধা। চারটে উট একটা গামলা থেকে ঘাস খাচ্ছে। চারজনের মুখ কিন্তু চারদিকে। এটা কী করে হয়? আসল উত্তর হল, তাই তো হবে। গামলাটা আছে মাঝখানে। চারদিকে চারটে উট। যে দক্ষিণ দিকে আছে তার মুখ তো হবেই উত্তর দিকে, যে পশ্চিম দিকে তার মুখ হবে পুব দিকে, এইভাবে। তারা পরস্পরের মুখোমুখি আছে, উলটো মুখে নেই। শুনলেই প্রথমটা মনে হয় তারা পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে আছে।

"কে রে ওখানে?" সিঁড়ির কাছ থেকে মার গলা। "ও রাজু, তুই অন্ধকারে কী করছিস?"

"এমনি। তুমি কেন অন্ধকারে ছাদে এলে মা?" পালটা প্রশ্ন করল রাজু।

"আমি এলাম প্যাঁচাটা দেখতে। তুই দেখতে পেয়েছিস নাকি?"

ক'দিন ধরে একটা প্যাঁচা ওদের ছাদে এসে আড্ডা গেড়েছে। অন্ধকারের পর তার শিঁ-শিঁ শব্দ শোনা যায়। বাবা বলেন, ওটা নিশ্চয় প্যাঁচার বাচ্চা। খিদে পায় তাই ওরকম শব্দ করে। যাই হোক এখনও পর্যন্ত কেবল শব্দই শোনা গেছে, কেউ প্যাঁচা কিংবা প্যাঁচার বাচ্চাকে দেখতে পায়নি। একটু আলো ফুটলেই তারা পালায় আর সূর্য ডোবার বেশ পরে তাদের আগমন হয়। কী আশ্চর্য! উত্তেজনার মাথায় রাজু প্যাঁচাদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

মা বললেন, "হ্যাঁ রে, বাপ্পার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি?"

উহ্, মায়েরা কী সাঙ্ঘাতিক ডিটেকটিভ হন। ঠিক বুঝে গেছেন। চোখে ধুলো দেওয়ার কোনও উপায় নেই! কিন্তু রাজুর চিন্তার স্রোত এখন অন্য খাতে বইছে। বাপ্পার সম্বন্ধে তার কোনও বৈরীভাব আর নেই।

"না, ও কিছু না। সেরকম কিছু হয়নি।" বলেই রাজু আর থাকতে না পেরে বলেই বসল, "আচ্ছা মা, আমরা কেউ বিশেকে স্পনসর করলেই তো পারি!"

এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল। এটাই বিশের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া আর তার বাড়িতে ফিরে আসার চমৎকার সমাধান। রাজু মাকে বলে অনেকটা আরাম বোধ করল। মায়ের সঙ্গে সব ব্যাপারে পরামর্শ করা যায়, বাবার কাছে গেলেই তার মুখে তালা আটকে যায় মনে হয়।

মা চমকে গেলেন, "কী? বিশেকে কী করলে পারি?"

"স্পনসর। যেমন মিনামাসিদের অফিসে করে। তুমি তো কয়েকবার

গেছ। ঠিক কী করে ওটা করা হয় জানো কী ?"

"ও, তুই সেই স্পনসরশিপের কথা বলছিস। হ্যাঁ, মিনাদের অফিসে সবসুদ্ধু দেড়শো বাচ্চার ফাইল আছে। তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য, ওদের খোঁজ রাখতে হয়, গিয়ে-গিয়ে দেখতে হয়।"

"কিন্তু তার সঙ্গে ইস্ত্রিওয়ালার ছেলে বিশের কী সম্পর্ক ?"

"তুমি জানো না বিশে কেন পালিয়ে গেছে ?"

"ওর মা বকেছিল বলে।"

"ঠিক। ও মাকে বলেছিল ওর ইচ্ছে বড় ক্রিকেট প্লেয়ার হবে। তাই নিয়ে খটাখটি। ক্রিকেট প্লেয়ার বললেই কি হওয়া যায় নাকি ? ওর মা তো ঠিকই বলেছে। কিন্তু ওর মা তো অত খবর রাখে না। ক্রিকেটে স্পনসরশিপ পাওয়া যায়। সেইরকম একটা ব্যবস্থা এসো না আমরা সবাই মিলে বিশের জন্যে করি।"

মা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "তুই ঠিক বলেছিস। একটা ছেলেকে তার জীবনের পথ ঠিক করে দেওয়াটা সত্যিকার কাজের কাজ হবে। দাঁড়া, আমি মিনার সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি। এই ধরনের স্পনসরশিপ আছে বলে তো শুনিনি। তবে করা নিশ্চয়ই যায়।"

এমন সময় সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ করতে-করতে কেউ উঠে এল। টিটো যদি কোনও কাজ আস্তে করতে পারে ! এসেই মহা চ্যাঁচামেচি, "এ কী, এত অন্ধকার। তোমরা সিঁড়ির আলো জ্বালোনি কেন ?"

"কী, ব্যাপার কী ? এত তাড়া ?" মা জানতে চাইলেন।

"তোমার ফোন। মিনামাসি। যাও তাড়াতাড়ি," বলেই টিটো ওপরে ওঠে এল। হাতে একটা টর্চ। "এই দাদা, প্যাঁচাটা দেখবি ?"

টিটোর আন্দাজ খুব নিখুঁত। চিলেকোঠার ছাদে বসে আছে একটা মস্ত সাদা প্যাঁচা। কী বড়-বড় আর গোল-গোল চোখ দুটো।

"আয় দাদা ধরি," বলে যেই টিটো পা টিপে-টিপে এগোতে গেছে একটা ভাঙা টিনের কৌটো ওর পা লেগে গড়িয়ে গেছে। ঠং-ঠং করতে-করতে টিনটা অনেকদূর চলে গেল। সেই ফাঁকে ডানা ঝাপটিয়ে প্যাঁচাও অন্তর্ধান।

"ইস, পালিয়ে গেল। যাকগে, কাল আবার আসবে। দাদা, তুই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী করছিস রে ? বাপ্পাদা কিন্তু ধরেই ফেলেছে তুই বাড়ি আছিস। কেন তুই মিথ্যে কথা বলতে বললি।"

"হয়েছে, হয়েছে, থাম তো।" বিরক্ত হয়ে রাজু নীচে নেমে গেল।

পরের দিন বিকেলবেলা রাজুদের বাড়ির বাইরের ঘরে একটা পারিবারিক সভা বসল। ব্যানার্জিকাকাও এসেছেন, তা ছাড়া মিনামাসি। বিষয়, বিশের নিরুদ্দেশ হওয়া। টিটোর ফাইভ স্টার ক্লাবের ছেলেরা ইতিমধ্যে সমস্ত পাড়া তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেলেছে। এমনকী বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ঘন্টি বাজিয়ে জিজ্ঞেসও করেছে রোগা লম্বা তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলে তাদের বাড়ি এসে আশ্রয় নিয়েছে কিনা। কিন্তু কোনও খবর পাওয়া যায়নি। লম্বু ইস্ত্রিওয়ালা গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। আশপাশের বাড়ি থেকে দু-চারজন যদি কাপড় দিয়ে যায় তা হলে ইস্ত্রিটাও চালায় কিন্তু ফেরত দেওয়ার সময় ভুল করে এ-বাড়ির কাপড় ও-বাড়ি চলে যায়। সকলেই ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, বিশে এবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। কার দায় পড়েছে ওকে দিনের পর দিন খাওয়াবে। কিন্তু লম্বুর মুখে হাসি নেই, কাজে স্পৃহা নেই। কেবল বলে, "ওর মা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমি কী করি ?"

রাজুর আইডিয়াটা নিয়ে কথা হচ্ছিল। মিনামাসি বললেন, "এরকম প্রোজেক্ট আমরা কখনও পাইনি যদিও, কিন্তু করা যেতে পারে। সত্যি বলতে কী বাংলা থেকে ভাল ক্রিকেটার তৈরি করাটাও একটা জরুরি কাজ। শ্রীলাকে বললে হয়, তবে ও এখন শচীনকে নিয়ে মেতেছে।"

"কে শচীন ?" বাবা কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

"শচীন তেণ্ডুলকর ?" রাজু আর না বলে পারল না।

মিনামাসি হাসলেন। "আরে, না, না। ছেলেটা ওদের প্র্যাকটিস দেখত। একদিন শ্রীলা বলল, বল করবি তো আয়। তার নাকি থ্রো দারুণ ভাল। ওরই নাম শচীন। ওকে তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। শ্রীলার যত কাণ্ড ! আবার তার সঙ্গে একটা নেড়ি কুকুরও আছে। শচীনের পিছু-পিছু ঘোরে। শ্রীলা বলে ভুতোকেও ও ফিল্ডিং শেখাচ্ছে।"

"ভুতো !" ঘরসুদ্ধু সবাই পিঠখাড়া করে বসল।

"কেন ? আপনারা চেনেন নাকি ?"

টিটো বলল, "কেমন দেখতে বলুন তো ?"

মিনামাসি একটু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কাকে, কুকুরটাকে ? এই সাদার মধ্যে বাদামি মতো ছোপ-ছোপ !"

টিটো বলল, "আর লেজটা ?"

"লেজটা তো ভাল করে লক্ষ করে দেখিনি।"

"আর শচীন ?" এবারে মা ডিটেকটিভের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। "বয়স কত তার ? দেখতে কেমন ?"

"বয়স ? তা তেরো-চোদ্দ হবে। লম্বা, রোগা। দৌড়তে পারে ভাল।"

"কবে থেকে ও আপনাদের বাড়িতে আছে ?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন ?

এক-এক করে সব মিলে গেল। শচীনই বিশে। এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। আর শ্রীলা তো ওর স্পনসরশিপ বলতে গেলে নিয়েই নিয়েছে। যাক, সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

বাবা বললেন, "একটা প্রবলেম কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। এখন যদি—বিশে ওরফে শচীন সকাল-বিকেল নেট প্র্যাকটিস করে, তা হলে ওর বাবার কী হবে ?"

ব্যানার্জিকাকা বললেন, "টিটো, তোরা কী করতে আছিস ? তোদের ফাইভ স্টার ক্লাব ?"

টিটো কিছু বুঝতে পারল না প্রথমটা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"পাঁচিলে চড়ে আড্ডা দেওয়ার চেয়ে কিছু জনহিতকর কাজ করলে হয় না ?" ব্যানার্জিকাকা এবারে আরও একটু বিশদ হলেন। "মানে সকাল-বিকেল বিশের কাজটা করে দিবি।"

মিনামাসি মিটিমিটি হাসছিলেন। "বা রে, তা হলে ওরা নিজেরা ক্রিকেট প্র্যাকটিস করবে কখন ?"

বাবা বললেন, "ওটা করেও ক্রিকেট খেলার টাইম থাকবে। তবে আমার মতে বেশি লোভ না করাই ভাল।"

রাজু মনে-মনে ভাবল আজহারউদ্দিনের নাকি আটটা গাড়ি, আটটা গাড়ি নিয়ে একজন লোক কী করে ? বাবা ঠিকই বলেছেন।

ঠিক এই সময় বাইরে বাপ্পার গলা শোনা গেল, "রাজু, রাজু, এই রাজু।"

"আসছি," বলেই রাজু তিড়িং করে তিন লাফে একেবারে বাইরে। বাপ্পাকে অনেক কথা বলার আছে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সবুরে মেওয়া ফলে

নবনীতা দেব সেন
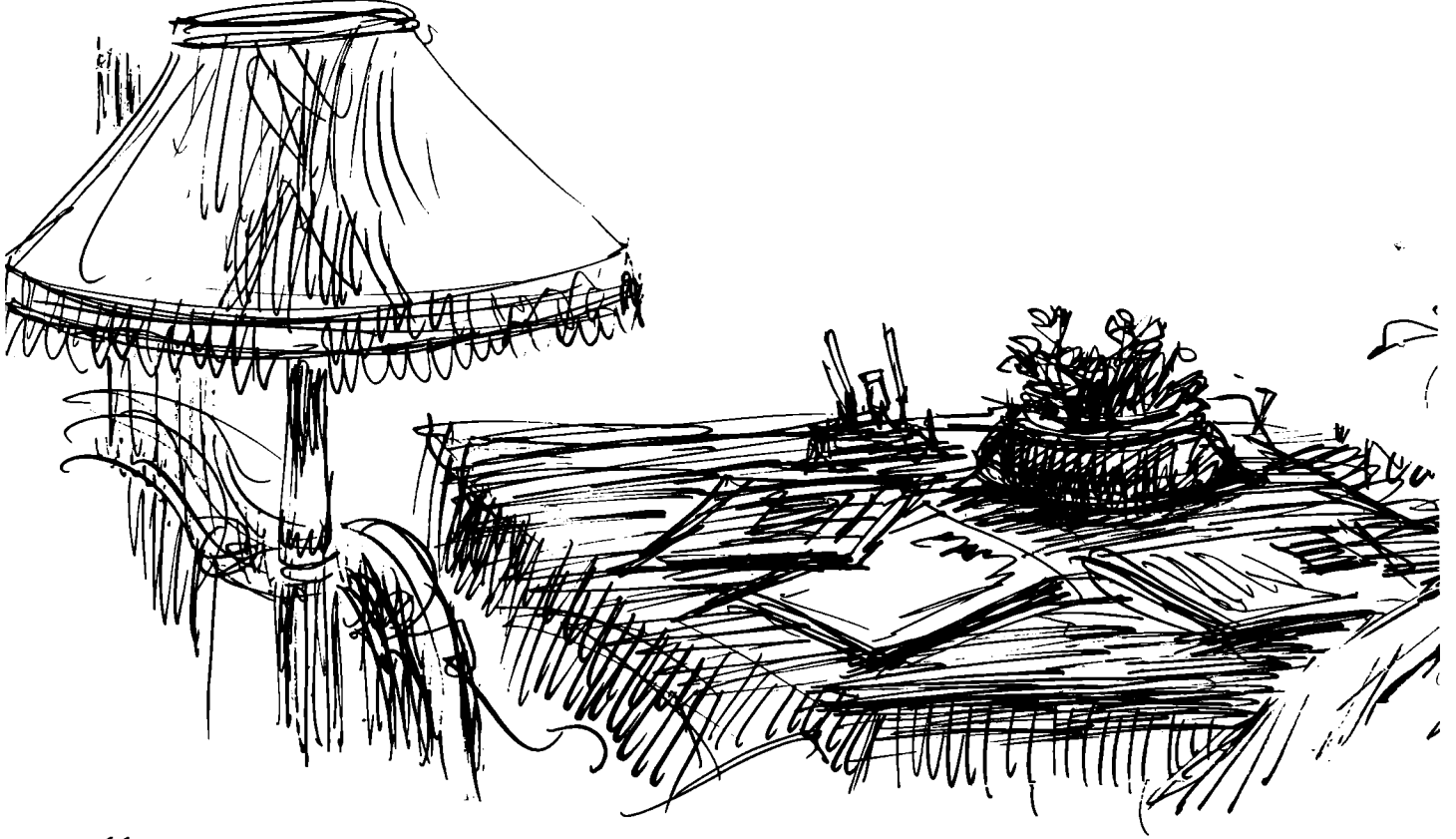
"হ্যালো, 464-1808 ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন।"

"যাক বাবা ! পাওয়া গেল তা হলে !" বিশাল এক স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ল কাজের মধ্যে, ফোঁস করে।

"এই তো, এই নম্বরটাই চাইছি। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে। অন্তত পঞ্চাশ-ষাটবার—উঃ—"

"এই নম্বরে কাকে চাইছিলেন ?"

" ... " গভীর নিস্তব্ধতা। শ্বাসপ্রশ্বাস।

"কী হল ? কাকে চাই আপনার ?"

" .... " আরও গভীর নিস্তব্ধতা। শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ।

"আরে, এ তো বেড়ে মজা ! এত কষ্ট করে আপনি কাকে ফোন করছেন ? নামটা বলবেন তো ?"

"আরে, সেইটেই তো মনে করতে পারছি না।" ভদ্রমহিলা প্রায় কেঁদে ফেলেন !

"মনে করতে পারছেন না ? ও !" আমি যারপরনাই লজ্জিত। একদিন আমারও এমনই হতে পারে।

"জানি, জানি, বিশ্বাস করছেন না তো ? কিন্তু বিশ্বাস করুন ভাই, সত্যি বলছি মনে পড়ছে না। কেন যে ফোনটা করছিলুম, কাকে যে চাইছিলুম, কিছুই আর মনে পড়ছে না।"

"না না, বিশ্বাস করব না কেন ? এমন তো হতেই পারে। এতক্ষণ ধরে একটা নম্বরের জন্য ধস্তাধস্তি করতে-করতে এরকম তো হতেই পারে। আপনার নিজের নামটা মনে আছে তো ?" আমি যথাসাধ্য সহানুভূতি দেখাই।

"ঠাট্টা করছেন ?"

"ছি, ছি, মোটেই না। আপনার স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। খেই ধরিয়ে দিচ্ছি।"

"জুবিলি মিত্র। কী ? কিছু বুঝলেন ?"

"জুবিলি মি-ত্র ? ঠিক মনে করতে পারলুম না। আমার নম্বরটা আপনি পেলেন কোথায় ?"

"এই যে, একটুকরো কাগজে।"

"কাগজটা কোত্থেকে এল ?"

"টেবিলে চাপা দেওয়া ছিল। URGENT লেখা আছে।"

"কে রাখল টেবিলে ?"

"আমিই রেখে থাকব।"

"কে দিল নম্বরটা আপনাকে ?"

"সেটাই তো ভুলে গেছি। শুধু বড় বড় করে লেখা রয়েছে রোববার সকালেই ফোন করতে হবে। কী অদ্ভুত কাণ্ড বলুন তো ? ভুলে গেলুম কী বলে ?"

"ভুলচুক মানুষের হতেই পারে। তা, ওই হাতের লেখাটা কার ?"

"আজ্ঞে ?"

"হাতের লেখাটা কি চিনতে পারছেন ?"

"পারছি।"

"কার হাতের লেখা ?"

"আমার।"

"আপনিই লিখেছেন ? নিজের

হাতে ?"

"তাই তো দেখছি।"

"কেন লিখেছেন, মনে নেই ?"

"তাই তো দেখছি।"

"মনে করবার চেষ্টা করুন। আমি বরং—"

"প্লিজ ! প্লিজ ! ছেড়ে দেবেন না ভাই ! অনেক কষ্টে নম্বরটা পেয়েছি। পড়বে, পড়বে, ঠিক মনে পড়বে—এত রকমের ঝুটঝামেলায়, ইলেকশানের ঠেলায় সব ভুলে গেছি। আমার ঠাকুরপো আবার হেরে গেছেন তো এ-বছরেও।"

"আহা ! কোন্ দল ?"

"এ-বছরও ওই একই দল। সত্যি, আজকাল সবকিছু বড্ড ভুলে যাই। ছেড়ে দেবেন না প্লিজ, এক্ষুনি ঠিক মনে পড়ে যাবে। একটু সবুর করুন।"

"এখন কোনটা মনে করছেন ?"

"এই আপনাকে কেন যে টেলিফোন করলুম সেটাই ভাবতে চেষ্টা করছি। খুব চেষ্টা করছি। আমার ব্রেনওয়েভ হয়।"

"আচ্ছা, আপনি রামকৃষ্ণ মিশন চাইছিলেন না তো ?" আমি সাহায্য করতে শুরু করি।

"রামকৃষ্ণ মিশন ? না তো ? কেন চাইব ?"

"না, এমনই। কিংবা বিনীতা মৈত্রকে ? ওঁদের নম্বরগুলোর সঙ্গে এই নম্বরটা প্রায়ই গুলিয়ে যায় কি না ? এখানে ওঁদের খুব ফোন আসে তো ? তাই চেক করছিলুম, রং নম্বর হল কি না।"

"রং নম্বর হবে কেন ? এইটেই তো পস্ট লেখা রয়েছে। গোড়াতেই চেক করেছি। ঠিক নম্বরই, 464-1808 তো ?"

এবার আমি বিনয়ের অবতার হয়ে প্রশ্ন করি, "আচ্ছা, আপনার ছেলেমেয়েরা কেউ কি এ-বছর হায়ার সেকেন্ডারি, কিংবা বি এ পরীক্ষায় পাশ করেছে ?" খুবই ডেঞ্জারাস প্রশ্ন ('বাঁশ, তুমি কেন ঝাড়ে ? এসো আমার ঘাড়ে')।

"আমার তো ছেলেপুলে নেই ? ওই বুলটু, আমার দেওরপোই ছেলের মতন।"

কম্পিতস্বরে বলে ফেলি, "বুলটুকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করতে—"

"যাদবপুরে যাবে কেন মরতে ? সে তো খড়গপুরেই চান্স পেয়েছে। আশ্চর্য কথা বাপু !" সত্যিই তো, খড়গপুর থাকতে—

"সরি, মানে অ্যাডমিশনের জন্য অপরিচিত অনেকেরই টেলিফোন আসে কি না ? তাই ভাবলুম আপনিও যদি— আমার অবশ্য ভর্তিতে কোনওই হাত নেই, কিন্তু লোক তো অত বোঝে না ?"

অ্যাডমিশন নয়। তা হলে কী হতে পারে ? প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন ?

"আচ্ছা, কোনও ইস্কুলে পড়ান কি আপনি ? কিংবা কলেজে ?"

"না ভাই, সে-কপাল কি করেছি যে, চাকরি করব ?"

"হুম। তবে কি আপনাদের কোনও মেয়েদের ক্লাব আছে ? মহিলা সমিতি ?"

"সে-ইচ্ছে কি আর করে না ? খুব করে। কিন্তু মহিলা সমিতি করবার সময় পেলে তো ? যা শুচিবাই আমার শাশুড়ির ! সংসারে দিনরাত্তির হুলুস্থুলু কাণ্ড চলছে—অথচ আজকাল আর শুচিবাই রোগটা কারও হতে শুনি না। কেবল আমার কপালেই বাকি ছিল !"

অ্যাডমিশনও নয়। ইস্কুলও হল না। মহিলা সমিতিও না, তবে ?

"আপনিও কি কোনও মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ থাকেন ? আপনাদের ওখানে কোনও উৎসব-টুৎসব—"

"কোথায় আর হলাম মাল্টিস্টোরিড ? প্রোমোটারের সঙ্গে কথা সব ঠিক, এমন সময়ে 'শিবালিক' হল। ব্যস ! আমার ভাসুর বেঁকে বসলেন। ওই থে-কে সেই দোতলাই রয়ে গেছি। এ-পাড়ায় সবই

এইরকম। ওল্ড ফ্যাশানের বাড়ি।"

"বাঃ। তবে তো আপনাদের পাড়াটা বেশ চমৎকার ? আচ্ছা, পাড়ার কোনও ক্লাবের কিছু আছে ? যেমন ধরুন—এই—'বসে আঁকো' কিংবা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, মানে আপনাদের—। পৌরোহিত্য করতে লোক লাগবে ?"

"পুরুত ? পুরুত লাগবে কি না ?—না ভাই আমাদের পুরুতটুরুত চাই না। কেন, ভট্‌চায্যিমশাই নেই ? কেন, আপনি বুঝি পুরুতঠাকুর সাপ্লাই দেন ?"

"কী যে বলেন ! আমি তো কেবল আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি—যদি এই করতে-করতে আপনার কিছু মনে পড়ে যায় ! আমার টেলিফোন নম্বর দিয়ে আপনার কী-কী দরকার থাকতে পারে, একটা-একটা করে আমি সেটাই ভাবছি। পুরুত বলিনি, এ হচ্ছে 'পৌরোহিত্য'। মানে পাড়ার জলসা-টলসায় অনেক সময় পৌরোহিত্য করতে লোকটোক লাগে তো ? প্রদীপ জ্বালাতে-টালাতে।"

"আমাদের পাড়ার জলসা ? দা-রু-ণ হয় ভাই—কুমার শানু নিজে এসেছিল দু' বছর আগে। আর এ-বছরে রফিকণ্ঠে মামুন এমন গাইল না—খোয়া-খোয়া চাঁদ—একদম পারফেক্ট ! চোখে না দেখলে আপনি ভাবতেই পারতেন না যে, রফি নিজে গাইছে না।"

না, এই লাইনটাও ধরল না। তবে কি হতে পারে ইনি একজন অস্ফুট কবি ? যে সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী সামান্য একটু উৎসাহের অভাবে দিনে-দিনে অল্প-অল্প করে ফুরিয়ে যাচ্ছেন, ইনি কি তাঁদেরই একজন ? তবে তো এঁকে উৎসাহ দেওয়া আমার কর্তব্য—'এইসব মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।'

"আচ্ছা ভাই, আপনি কি লেখেন টেখেন ?"

"লিখিটিখি ? কী লিখি ?"

"এই ধরুন গল্প, কবিতা, কিংবা ডায়েরি ?" আজকাল আবার ডায়েরিটা মেয়েদের সাহিত্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

"ওই ডায়েরিটাই লিখি। রোজকার হিসেব, বাজারের হিসেব, টেলিফোনের হিসেব—এইসব।"

"অ। আচ্ছা—তা—হলে !—আচ্ছা ? আপনার দেওরপোর কি কোনও লিট্‌ল ম্যাগাজিন আছে ? মানে ওদের বন্ধুবান্ধবদের—"

"আমার দেওরপো বুলটু তো খড়গপুরে পড়ছে। এক্ষুনি বললুম না ? লিট্‌ল ম্যাগাজিন-টিন তো যত বেকার ছেলেগুলো বের করে। ওর সময় কই ওসব করবার ?"

"তা বটে ! তা হলে আপনার স্বামীর অফিসের কোনও সুভেনিরে লেখা চাই কি ?"

"লেখালিখি নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন বলুন তো ? আপনি কি লেখেন না কি ? অ্যাঁ ?"

"ওই একটু-আধটু।"

"তবে যে বললেন যাদবপুরে অ্যাডমিশনের চাকরি করেন ?"

"ঠিক অ্যাডমিশনের চাকরি নয়, তবে ওই হল। আসলে আমি আপনাকে হেল্‌প করতেই চেষ্টা করছি। কেন হঠাৎ আপনার কাছে আমার নম্বরটা গেল, সেটাই ভাবছি। আচ্ছা, কোনও দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেন কি আপনার কোনও আত্মীয়স্বজন ?" (হয়তো কোনও ইন্টারভিউয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছেন।)

"পত্রিকা ? আগে আমার বড়মামা অবশ্য কাজ করতেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। এখন মামাও নেই, ভারতবর্ষও নেই।"

কোনওটাই যে লাগছে না। এ কী আজব কাণ্ড ? লেখা চায় না, ভর্তি করতে চায় না, পৌরোহিত্য করাতে চায় না, সাক্ষাৎকার চায় না, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করাতে চায় না, তবে চায় কী ? মহিলা সমিতি নয়, পথসভা ?

"আপনার দেওর কি কোনও পথসভা ডাকবেন ? আবর্জনা-সাফাই কিংবা নারী নির্যাতন অথবা কোনও বন্ধ কারখানা খোলার জন্যে ?"

"না, না, সে তো হেরে ভূত হয়ে গিয়েছে। এখন আবার কিসের পথসভা ? ওসব করে বটে, ওই ইলেকশনের মুখে-মুখে। আমি ওসবে যাই না। ওই হুল্লোড়ের মধ্যে কে যাবে ?"

"আমিও যাই না।"

"তবে ? তবে এ-কথা উঠছে কেন ?"

"উঠছে, কেননা আপনি আমার নম্বরে ফোনটা করলেন কেন, সেটা তো আমায় আপনি বলতে পারছেন না। আমি তাই এমনি এলোপাতাড়ি ঢিল ছুড়ছি অন্ধকারে।"

হঠাৎ একটা আলোকশিখার উদয় হয়।

"আচ্ছা আপনি কি নরেন্দ্র দেব কিংবা রাধারানী দেবীর কোনও আউট অব প্রিন্ট বই খুঁজছেন, কিংবা অপরাজিতা রচনাবলী ?"

এই কারণেও প্রায়ই ফোন পাই।

"—নরেন দেবের 'ওমর খৈয়াম' আর 'মেঘদূত' ? আহা-হা—কী চমৎকার সব ছবিওলা—দুটো বই-ই তো আমাদের আছে। আর রাধারানী দেবীর 'মিলনের মন্ত্রমালা' আমি বিয়েতে সাতখানা উপহার পেয়েছিলুম। আবার কেন খুঁজতে যাব ? অপরাজিতা রচনাবলীটা আবার কার লেখা ?"

"ও কিছু নয়। আচ্ছা, আপনি কারও জন্য বাড়িভাড়া খুঁজছেন না তো ?"

"আপনি বুঝি বাড়ি খুঁজে দেন ? শুনেছি বটে আজকাল মেয়েরাও দালালি করে।"

"আমি ঠিক দালালি করি না, তবে আমাদের একতলাটা খালি আছে বলে লোকে প্রায়ই ভাড়া চেয়ে ফোন করে কি না, তাই বলছিলুম হয়তো আপনিও—কিংবা আপনি কি ভাল কাজের লোক খুঁজছেন ?"

"আছে ? আছে ? কাজের লোক ভাল আছে আপনার সন্ধানে ? বাঃ, বাঃ,দারুণ কাজের লোক তো আপনি ?" রিসিভারে আহ্লাদ উথলে ওঠে। গলার স্বর পালটে গেছে।

"না আমিও দারুণ কাজের লোক নই, আমার কাজের লোকেরাও খুব একটা কাজের লোক নয়। এতৎসত্ত্বেও আমার কাছে অনবরতই কাজের লোক চেয়ে ফোন আসে কি না ? তাই জিজ্ঞেস করছি। কিংবা নার্স। ভাল নার্স চাই কি ? কিংবা আয়া ? রুগির কাজের লোক ? আমার মা তো অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন, তাই লোকে আমার কাছে এখনও রুগির কাজের লোক চায়।"

"দুগ্‌গা, দুগ্‌গা। কাজ নেই আমার নার্স-আয়া দিয়ে ! বলতে নেই,শ্বশুরমশাই চলে যাওয়ার পরে, আমাদের বাড়িতে তেমন কোনও রুগি নেই। যত্ত অলুক্ষুণে কথাবার্তা ! এবার বলবেন, খাট চাই ? ফুল চাই ?"

"ষাট, ষাট, ও কী কথা ? ওসবের জন্য এখনও আমাকে কেউ ফোন করেনি। তবে কিসের জন্য আমাকে দরকার ছিল আপনার ? নিজে-নিজে একটু ভেবে দেখবেন তো ? কী আশ্চর্য ! আচ্ছা—আপনার কি কোনও ফোন নম্বর চাই ? এই ধরুন কোনও লেখকের ? গায়ক ? সাংবাদিক ? অধ্যাপক ? শিল্পীর ? এমনকী আইনজীবীর, ডাক্তারের ফোন নম্বর চেয়েও লোকে আমাকে ফোন করে। আমি অবশ্য কিছুই দিতে পারি না। কেননা আমার ফোনের ডায়েরিটাই হারিয়ে গেছে। আর

কারও হয়তো খুব দরকার ছিল। ওঃ হো—আর-একটা পসিবিলিটি আছে। আমাদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির কাউকে চাই না তো? এই ফোন নম্বরটা এ পাড়ার আরও অনেকেই ব্যবহার করেন তো? কিংবা ধরুন নিলু দাস, অমিত মণ্ডল, শিবু পাল, গাবলু পাল, বিন্দু হালদার, কানাই বাউরি—এঁদের কাউকে চাই কি? এঁরা সকলেই যে এখানে থাকেন, তা নয়, কিন্তু আমি এঁদের জন্য মেসেজ রাখতে পারি।"

"এরা সব কারা? এদের সঙ্গে আমার কিসের দরকার?"

"আমি সেটা বলব কেমন করে বলুন? দরকার তো হতেই পারে মানুষের, মানুষকে।"

"না। আমি ওদের চিনিই না। ধুত্তেরিকা! আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল!"

"ব্যস মিটে গেল। আপনি কি তবে কবিতা সিংহ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, বাণী বসু, মহাশ্বেতা দেবী এঁদের কাউকে চাইছেন? কিংবা শ্রীমতী রাধারানী দেবী কীর্তনীয়াকে?"

"কেন চাইব? ওঁরা আমার আত্মীয় না কুটুম? কারও সঙ্গেই আমার আলাপ নেই। লেখাটেখা অবশ্য পড়িচি। কীর্তনও শুনিচি।"

"দেখুন এর মধ্যে আপনার অনেক টিংটিং বেজে গেছে। এই ফোনকলটা কিন্তু আপনার দিল্লি-বম্বেতে ট্রাঙ্ককলের মতন দামি হয়ে যাচ্ছে, মনে পড়লে আবার করবেন বরং—এবার ছেড়ে দিন—" হঠাৎ ট্রাঙ্ককল প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আর-একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা, যেজন্য প্রায়ই ফোন আসে।

"আচ্ছা, দাঁড়ান, আর-একটা কথা—আপনাকে কি কেউ প্রোফেসর অমর্ত্য সেনের ভারতবর্ষে আসবার দিনক্ষণ জেনে দিতে বলেছে? কিংবা তাঁর বিদেশের ঠিকানা?"

"প্রোফেসর অমৃত ... কী বললেন যেন দিনক্ষণের কথাটা? ওই তো, ওই জ্যোতিষীর কথা বলছেন তো? ওঁকে আমরা খুব চিনি। আপনাকে বলতে যাব কেন?"

ওটাও লাগল না। তবে? তা হলে নিশ্চয়ই এটা। আমিও মরিয়া, যাকে বলে ডেসপারেট। তাই। এটা লেগে যাবেই।

"আপনারা কি হিমালয়-ভ্রমণে যাচ্ছেন? কিংবা ইজরায়েলে কিংবা নর্থ পোলে?"

"হিমালয়ে কিংবা ইজরায়েলে? কিংবা নর্থপোলে? আপনার ভাই মাথাটা সত্যিই ঠিক নেই মনে হচ্ছে। আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা বলে সেই কবে থেকে সিঙ্গাপুরে যাব-যাব করছি, ওই বুলটুর পরীক্ষার জন্যই যাওয়া আটকে আছে। ওর পরীক্ষার পরে সামনের বছরে বেরোচ্ছিই। ইজরায়েলে যেতে যাব কোন দুঃখে? মরুভূমি ছাড়া ওখানে আছেটা কী? কেবল যত মারামারি, কাটাকাটি, দাঙ্গাহাঙ্গামা। হিমালয়, না ইজরায়েল! সত্যি বাবা! আবার বলে নর্থ পোল। শুধু বরফের কারবার ওখানে—এমন উদ্ভট প্রশ্ন মাথায় এল কী করে?"

"আসে, আসে। কতরকম প্রশ্নই তো মানুষের মাথায় আসতে পারে! জীবন কি যুক্তি মেনে চলে রে ভাই? এসব জায়গায় যাওয়ার জন্যও কেউ কেউ আমাকে ফোন করেছেন কি না? আবার একটা কথা মনে পড়ে—'কিংবা শান্তিনিকেতনে ঘরটর ভাড়া চাই?' —'ক'টার এজেন্সি নিয়েছেন দিদি আপনি? আপনার কি ট্র্যাভেল এজেন্সিও আছে না কি? রামকৃষ্ণ মিশনের নম্বর, অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা, পুরুত সাপ্লাই, জ্যোতিষী সাপ্লাই, বাড়িঘর ভাড়া দেওয়া, লেখা ছাপানো, 'রেয়ার' বইয়ের জোগান, কাজের লোক, রুগির নার্স, অচেনা লোকেদের ঠিকানা, ফোন নম্বর, এতরকম জিনিস সাপ্লাই দেন, আবার রেলের টিকিট, এরোপ্লেনের টিকিটপত্তরও করে দেন—বা—ব্বাঃ! পারেনও বটে! ধন্যি এনার্জি! আচ্ছা দিদি, আপনিই কি একটা আপিস খুলেছেন 'আস্ক মি' নামে?" এবার আমার গলা খুব গম্ভীর হয়ে যায়।

"দেখুন, ফোনটা কিন্তু আপনিই করেছেন। আমার জরুরি সময় ধ্বংস করে, চা জুড়িয়ে ফেলে, আমি কেবল প্রশ্নগুলো করছিলুম আপনাকেই হেল্প করতে। আপনার ফোনের উদ্দেশ্যটা মনে পড়িয়ে দিতে।"

"এবার তবে আর হেল্পে কাজ নেই। ঢের হয়েছে। আমি রেখে দিচ্ছি। আপনি চা খান। আচ্ছা জ্বালা বাপু!"

কিন্তু আমারও জেদ চেপে গেছে। আর চমৎকার সব জরুরি দরকারও হুড়হুড়িয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে। এত অনন্ত সম্ভাবনাময় এই নম্বরটি, কে তা জানত? আমিই সাধি—

"না, না। ছাড়বেন না, প্লিজ। এতক্ষণই যদি ধরতে পারলেন, তবে আর একটাই মোটে প্রশ্ন করব। উত্তরটা দিয়ে ছেড়ে দিন। উনি কঠোর—একটাই প্রশ্ন কেবল! ঠিক তো? ওনলি ওয়ান! ব্যস।"

"ব্যস! এইবারই শেষ প্রশ্নটা করছি। আপনার মনে পড়ে যায় ভাল, না-পড়লে উপায় নেই। আচ্ছা, আপনাদের কি দিল্লিতে কিংবা আমেরিকাতে কেউ আছেন? তাদের জন্য কোনও উপহার? এই ধরুন কোনও ছোটখাটো প্যাকেটট্যাকেট পাঠাবার আছে? পুজোর, কিংবা জন্মদিনের? আমার মেয়েরা আপাতত কেউই কিন্তু আসছে না, আর আমারও যাওয়ার কথা নেই। অতএব আমার হাতে আপনার কিছু যদি পাঠানোর ইচ্ছে থাকে—"

"আপনার হাতে কিছু পাঠাবার ইচ্ছে আমার থাকবে কেন বলতে পারেন? আপনাকে কি আমি চিনি? না কি আমাদের দিল্লি-আমেরিকায় জিনিস পাঠানোর লোকের অভাব? দিল্লিতে তো আমার কর্তাই ছুটছেন মাসে তিনবার। আর এমিলি, আমার আপন বোন, থাকে নিউ ইয়র্কে। বছর-বছর দেশে আসে। বুঝলেন? আপনাকে আমার মোটেই দরকার নেই। হ্যাঁ। এবার ছাড়ছি।"

"এমিলি?" আমি আহ্লাদে আর্তনাদ করে ফেলি। "দাঁড়ান, দাঁড়ান, প্লিজ ছাড়বেন না! নিউ ইয়র্কের এমিলির দিদি আপনি? আহা, আগে বলবেন তো! আমি ওর বন্ধু, নবনীতা।"

"ওঃ হো! তা তুমিই বা আগে বললে না কেন ভাই, অ্যাঁ মিছিমিছি এতক্ষণ ধরে টাঙিয়ে রেখেছ? আর আজেবাজে বকবক করছ? তোমাকেই তো ফোন করছি।" দিদি এক ধমক লাগান। মিনমিন করে উত্তর দিই, "আমাকেই? কেন বলুন তো দিদি? এমিলি আসছে না কি? গত মাসে তো আসবে বলেও এল না।"

"সেই কথাটাই তো বলছি। এ-মাসে ছুটিটা পাচ্ছে, কুড়ি তারিখে আসছে, তোমাকে জানাতে বলেছিল। তখন কাগজে তোমার নম্বরটাই টুকেছিলুম, নামটা আর লিখে রাখিনি। যাক, তুমিই তবে নবনীতা? আর এতক্ষণ আমি ভাবছি বুঝি কোনও ভদ্রমহিলা! কী গো, দেখলে তো! বলেছিলুম একটুখানি সবুর করো, ঠিক আমার সব মনে পড়ে যাবে। সেই, ধরে তো ফেললুম? তুমি ভেবেছিলে মনে করতে পারব না? হুঁঃ।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বুদ্ধি থাকলে সব হয়

আসল কয়েন, নকল কয়েন

সমস্যাটা এক টাকার 'কয়েন' নিয়ে। ১২টা এক টাকার কয়েন আছে, কিন্তু তার মধ্যে একটা নকল। নকল কয়েনটার তফাত শুধু ওজনে। আসল কয়েনের চেয়ে ওটা ভারীও হতে পারে, আবার হালকাও হতে পারে। মাত্র তিনবার ওজন করে ধরে ফেলতে হবে, ১২টার মধ্যে কোনটা নকল কয়েন। আর এও বলতে হবে, সেই নকল কয়েনটা আসলের চেয়ে ভারী, না হালকা। ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা আছে বটে, তবে কোনও বাটখারা নেই। বাটখারা নেই শুনে মাথা চুলকোচ্ছ ? ঠিক আছে, পর পর তিনবার কীভাবে ওজন করতে হবে সেটা ছবিতে দেখিয়ে দিলাম। আর আলাদা করে চিনে নেওয়ার জন্য কয়েনগুলোর গায়ে ১ থেকে ১২ নম্বরও বসিয়ে দেওয়া হল। এইবার বলো তো, কোন কয়েনটা নকল ? আর সেটা আসল কয়েনের চেয়ে ভারী, না হালকা ?
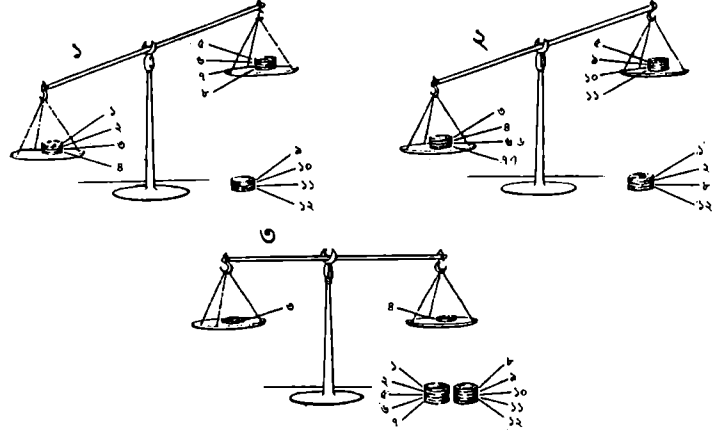
গুণের গুণাগুণ

তোমরা সকলে জানো গুণ অঙ্কের কথা। বাবাইকে একটা গুণ অঙ্ক কষতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অঙ্কটা কষার পর বৃষ্টির ছাটে অনেক অঙ্ক (মানে, ডিজিট) ঝাপসা হয়ে প্রায় মুছে গেছে। শুধু ২ আর ৭ অঙ্কটা অক্ষত অবস্থায় আছে। বাবাই মুখ ব্যাজার করে অঙ্ক কষা কাগজটা আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, "বাকি অঙ্কগুলো যে শুধু ৩ আর ৫ ছিল এটুকু মনে আছে। অঙ্কটা কমপ্লিট করে দাও না।" আমিও সুযোগ বুঝে সেই মুছে যাওয়া গুণ অঙ্কটা তোমাদের দরবারে পেশ করে দিলাম। দ্যাখো, তোমরা বাবাইকে সাহায্য করতে পারো কি না।

ডাকাতির ঘটনায় যমজ সমস্যা

লালবাজারের ডাকসাইটে ইনস্পেক্টর মেঘনাদ ধরের ফাইল থেকে এই ঘটনাটার কথা আমি জানতে পেরেছি। গত বছর গরমের সময় বউবাজার অঞ্চলের একটি সোনার দোকানে তালা ভেঙে ডাকাতি হয়। ডাকাতির ধরন দেখে ইনস্পেক্টর মেঘনাদ ধর বুঝতে পেরেছিলেন এর মূলে আছে কোনও দাগি ক্রিমিনাল। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তিনজন দাগি আসামিকে লক আপে বন্দি করলেন। তাদের নাম বিজয়, অমল আর কমল। অমল আর কমল যমজ ভাই, হুবহু একই রকম দেখতে ওদের। সহজে বোঝা যায় না কে অমল, আর কে কমল। কিন্তু ওদের সম্পর্কে অনেক কথাই জানে পুলিশ। যেমন, অমল আর কমল বেশ ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। ওরা কেউই একজন-না-একজন শাগরেদ সঙ্গে না নিয়ে 'কাজে' হাত দেয় না। অথচ বিজয় বেশ বেপরোয়া। সে সবসময় একা 'অপারেশন' করতেই ভালবাসে। ডাকাতিটা হয়েছিল রাত দশটা নাগাদ। সেই সময়ে অমল বা কমল একজনকে হাতিবাগানের কাছে একটা পাইস হোটেলে ভাত খেতে দেখা গেছে। স্বাভাবিকভাবেই, যে দেখেছে সে কিছুতেই হলফ করে বলতে পারছে না,

কে ভাত খাচ্ছিল, অমল, না কমল। ইনস্পেক্টর ধর ধরেই নিয়েছিলেন, এই ডাকাতির ঘটনায় বিজয়, অমল, কমল ছাড়া আর কারও হাত নেই। সিগারেটের পর সিগারেট শেষ করে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে ইনস্পেক্টর ধর অনায়াসে রহস্যের জট খুলে ফেললেন। তোমরা বলতে পারো, ওদের তিনজনের মধ্যে কে দোষী আর কে নির্দোষ ?

অনীশ দেব (**উত্তর** ৫৬৭ পাতায়)

এশিয়ার কয়েকটি বড় এবং
ব্যস্ত শহরে দূষণ-সমস্যা এখন
বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।
পরিবেশবিদ এবং বিজ্ঞানীরা
বলছেন, এই সমস্যা
দূর করবার একটাই
উপায়, শহরকে করে
তুলতে হবে যথাসম্ভব সবুজ।
শহর হোক আরও সবুজ
রূপক চট্টরাজ

গত ১০ বছরে ধোঁয়া, ধুলো এবং কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে শুধু কলকাতা শহরেই ৩০ হাজার গাছ ও গাছের চারা মারা গেছে। পুরসভা কর্তৃপক্ষের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ১৯৮৬ সাল থেকে এই শহরে যত গাছের চারা লাগানো হয়েছিল, তার প্রায় ৪০ শতাংশই পরিবেশ দূষণের শিকার হয়েছে। শুধু এই একটি পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়, এখানকার মানুষ কী পরিবেশেই না বেঁচে আছেন! এত গাছ নিঃশব্দে গত ১০ বছরে মারা গেল কী করে, পরিবেশবিদ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও পুরসভার বিভিন্ন মহলে তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে, কিন্তু যে বিষয়টিতে মতপার্থক্য থাকার কথা নয়, তা হল, এত গাছের মৃত্যু সারা শহরের অক্সিজেনের পরিমাণ বেশ খানিকটা কমিয়ে দিয়েছে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও বেড়েছে। পরিবেশদূষণের একটা বিপদসীমা আছে। কিন্তু বেশ কয়েকটি শহর ইতিমধ্যেই এই বিপদসীমা অতিক্রম করেছে।

জনবহুল শহরগুলি সবুজ হয়ে উঠবে কবে

আধুনিক বিজ্ঞান চায় বড়-বড় শহরগুলিকে যতটা সম্ভব সবুজ করে তুলতে, অর্থাৎ মানুষের নিরাপদ বসতির জন্যই গাছপালা লাগানো দরকার। শহরগুলির বিভিন্ন সমস্যার চেয়েও দূষণের সমস্যাটি এখন বড় হয়ে উঠেছে। এ-বছরই জুন মাসে তুরস্কের ইস্তানবুলে বিশ্বের প্রধান-প্রধান জনবসতি নিয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে 'হ্যাবিটার-২'-এর সেক্রেটারি জেনারেল ওয়ালি এনডাও মারাত্মক এক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেন, "বড়-বড় শহরগুলি এখন ক্রমেই সামাজিক এক-একটি 'টাইম বোমা' হয়ে উঠছে। যে-কোনও সময় ফেটে পড়তে পারে। কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্যাটি আরও তীব্র আকার ধারণ করবে।" কেন তিনি এই হুঁশিয়ারি দিলেন? সারা পৃথিবীতে এখন শহর বেড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীর ৫০ শতাংশ মানুষই শহরে বসবাস করবেন। এই ব্যাপক নগরায়ন থেকে আর পিছু হটার উপায় নেই। এর ফলে এক-একটি শহরে নাগরিক সুখ-সুবিধেগুলির ঘাটতি দেখা দেবে। জনসংখ্যার বিপুল চাপে নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি ভেঙে পড়বে। দেখা দেবে জলাভাব এবং তা রীতিমত একটা সঙ্কট সৃষ্টি করবে। শহরের নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিঘ্নিত হবে। যেসব শহরে এই ধরনের সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করবে, তার তালিকায় আমাদের কলকাতা শহরের নাম আছে, আছে মুম্বইয়ের কথাও। এশিয়ার বিভিন্ন শহরও পড়বে পরিবেশদূষণের কবলে, যেমন বেজিং, সাংহাই, জাকার্তা, সিনইয়াং ইত্যাদি। তা ছাড়াও আছে উন্নত দেশগুলির কয়েকটি শহর—লস অ্যাঞ্জেলিস, হিউস্টন, ওয়ারশ, তেল আভিভ এবং ব্রিটেনের কার্ডিক ইত্যাদি। পরিবেশদূষণ নিয়ে আমরা কথায় যতটা গুরুত্ব দিয়েছি, কাজে হয়তো ততটা দিইনি। গাছপালা ও জীবজন্তুরা পরিবেশ দূষণের ফলে যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা নিয়ে আর নতুন করে জল্পনাকল্পনার অবকাশ নেই। এখন দেখা যাচ্ছে, মানুষের জীবনেও সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে। গাছেদের মধ্যে যদি শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে যায়, তা হলে বুঝতে হবে, চারপাশের মানুষও খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই। গাছেদের শিকড় নাকি যথেষ্ট বাতাস পাচ্ছে না, তাই তারা অকালেই মারা যাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন বাতাসের অভাবও তা হলে নিঃশব্দে শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সব মানুষকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। এভাবে হয়তো আমাদের আয়ুর সময়সীমাও কমে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাজে লাগানোর ওপরেও নির্ভর করছে সভ্যতার ভবিষ্যৎ। প্রাকৃতিক সম্পদ বা শক্তিকে নষ্ট হতে না-দেওয়াই এর অন্যতম প্রধান কথা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনও বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনও হতে পারে, এক সময় অনেক পরিবারকে যৌথভাবে বিদ্যুৎ খরচ করতে হবে। সেই সব বাড়িতে হয়তো একটাই 'ওয়াশিং মেশিন' চলবে, চলবে একটাই 'মাইক্রো আভেন', অর্থাৎ আলাদা-আলাদাভাবে রান্না, কাপড় কাচার কাজ ইত্যাদি করতে গেলে যতটা বিদ্যুৎ অপচিত হবে, একসঙ্গে সেই কাজটি করে নিলে আর হয়তো বিদ্যুতের সমস্যা থাকবে না। কিন্তু আসল কথা হল, নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এর ফলে কতটা বাড়বে? এক-একজনের জীবনধারা এক-একরকম। একজনের রুচির সঙ্গে আর-একজনের রুচি নাও মিলতে পারে। তখন শক্তি সঞ্চয় করতে গিয়ে দেখা দেবে অন্য ধরনের সামাজিক সমস্যা। মোট কথা, আগামী দিনের যে-ছবি নগর-স্থপতি, বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদরা আমাদের সামনে তুলে ধরছেন, তা মোটেই সুখকর নয়। জনসংখ্যা বাড়তে-বাড়তে শহরের পার্ক ও উদ্যানগুলি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এরাই ছিল সবুজের শেষ আশ্রয়। এই সবুজকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে মানুষও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে। পৃথিবীতে আমরা পারস্পরিক সম্পর্কের

ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকি। কিন্তু এই সম্পর্কের কোনও এক জায়গায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হলেই সামগ্রিকভাবে সবার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। গাছের অকালমৃত্যু হয়তো এরকমই কোনও বড় বিপদের ইঙ্গিতবহ। তবে আশার কথা, মানুষ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছে। সবুজকে বাঁচিয়ে রাখার আন্দোলনও তাই শুরু হয়েছে। এবং এই বিষয়ে আমাদের সবার প্রিয় কলকাতা শহরও পিছিয়ে নেই।

রাষ্ট্রপুঞ্জের এক প্রাথমিক হিসেবে, জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীর প্রথম ১৫টি মহানগর হল, টোকিও, নিউ ইয়র্ক, সাওপাওলো, মেক্সিকো সিটি, সাংহাই, মুম্বই, লস অ্যাঞ্জেলিস, বেজিং, কলকাতা, সোল, জাকর্তা, বুয়েনস আইরেস, ওসাকা, তিয়ানজিং ও রিও ডি জেনেইরো। সবচেয়ে জনবহুল শহরের তালিকায় কলকাতার স্থান হল নবম। ১৯৯৪ সালে কলকাতার জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে ছিল এক কোটি চোদ্দ লক্ষ পঁচাশি হাজার। ২০১৫ সাল নাগাদ কলকাতার জনসংখ্যা দাঁড়াতে পারে এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষে। পরিসংখ্যানের চুলচেরা বিচারে প্রকৃত সংখ্যাটি বাড়ুক বা কমুক আসল অবস্থা যে রীতিমত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে এবং ক্রমেই তা আরও বাড়বে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়। প্রথম ১৫টি জনবহুল শহরের তালিকায় আছে চিনের তিনটি শহরের নাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত ও ব্রাজিলের দুটি করে শহর। মুম্বইয়ের জনসংখ্যা ১৯৯৪ সালে ছিল এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ২০১৫ সালে এই সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়াবে দু'কোটি চুয়াত্তর লক্ষে। জনবিস্ফোরণের সঙ্গে সুস্থ ও সহজভাবে অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে বলেই বিভিন্ন মহল রীতিমত আতঙ্কিত। কারণ নাগরিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সুদক্ষ প্রশাসনের পক্ষেও সবসময় সম্ভব হবে না। এজন্যই নতুনভাবে শহরের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। শহরের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে উঠছে কেন, তার প্রাথমিক কারণগুলি খতিয়ে দেখে জানা গেছে, মূলত জীবিকার সন্ধানেই মানুষ শহরগুলিতে ভিড় করেন। তাই কলকারখানাগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যাতে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধে থাকে, মন দেওয়া হয়েছে
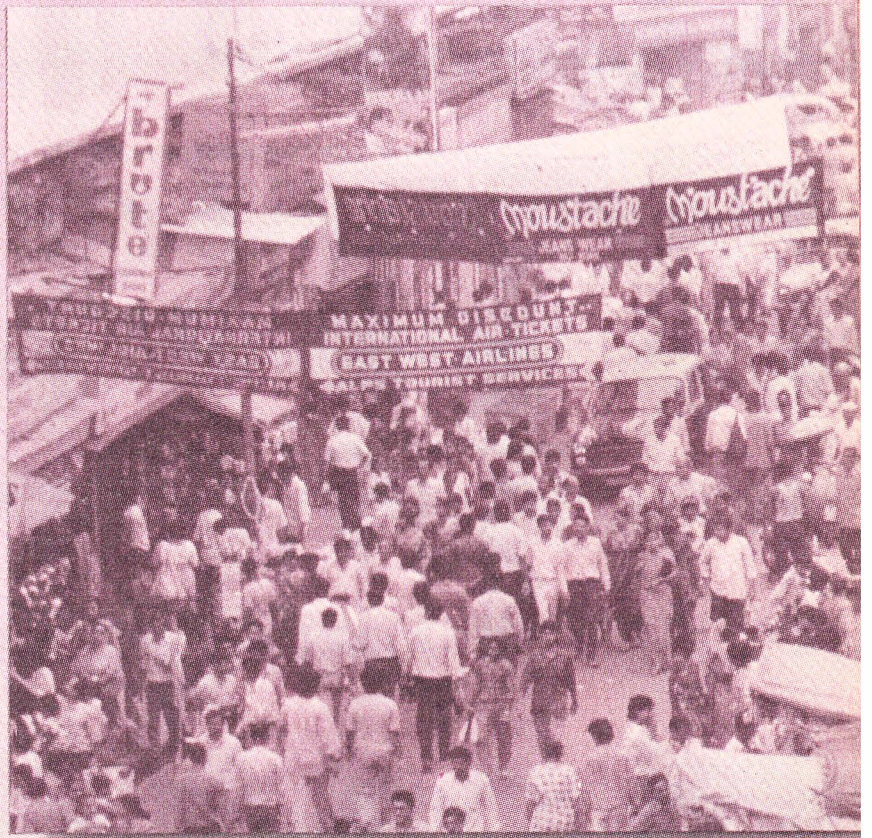
অন্তহীন জনস্রোত

সেদিকেও। সচরাচর দেখা যায় ভাল স্কুল-কলেজে পড়ার জন্যই ছেলেমেয়েরা শহরে চলে আসেন। অনেকে আসেন চিকিৎসার জন্য। তবে অধিকাংশ মানুষ আসেন জীবিকার খোঁজে। জীবিকার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে শহরেরই কোথাও তাঁরা থাকার ব্যবস্থা করে নেন। অথচ এত মানুষের বাসস্থান, আহার, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির সামর্থ্য শহরের নেই। ফলে, বিভিন্ন শহর কোনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছাড়াই সম্প্রসারিত হচ্ছে। শহরের সীমানা বাড়াতে গিয়ে তাই টান পড়ছে সবুজের ঘরে। ফলে শহরগুলির সঙ্কট বাড়ছে। সাধারণ নাগরিকদেরও অবস্থার সুরাহা হচ্ছে না। এ এমন এক সমস্যা, যা আগামী শতককে একেবারে গোড়া থেকেই ভাবিয়ে তুলবে।

আধুনিক বিজ্ঞান চায় বড়-বড় শহরগুলিকে যতটা সম্ভব সবুজ করে তুলতে, অর্থাৎ মানুষের নিরাপদ বসতির জন্যই গাছপালা লাগানো দরকার। শহরগুলির বিভিন্ন সমস্যার চেয়েও দূষণের সমস্যাটি এখন বড় হয়ে উঠেছে।

বহুদিন ধরে পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট হতে হতে যখন আমাদের চেতনা ফিরল, তখন দেখা গেল ক্ষতির কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার ক্ষমতা হয়তো আমাদের নেই। নতুন করে যাতে আর কোনও ক্ষতি না হয়, এখন সেই চেষ্টাই চলছে। অতীতে বহু সভ্যতা নষ্ট হয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য না থাকার ফলে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে জনবসতি বিপন্ন হয়েছে। প্রয়োজন হলে পৃথিবী নাকি নিজেই ভারসাম্য রক্ষা করে— এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রকৃতির ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে চান না বিজ্ঞানীরা, এটাই আশার কথা। মানুষ সচেতন হলে হয়তো উপায় একটা বেরোবেই।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দুধসায়রের দ্বীপ

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

পুটু বলল, "আচ্ছা, এই পুকুরটার নামই কি দুধের সর ?" খাসনবিশ চোখ কপালে তুলে বলল, "পুকুর ! এই সমুদ্দুরের মতো বিরাট জিনিসকে তোমার পুকুর বলে মনে হচ্ছে ? শহুরে ছেলেদের দোষ কী জানো তো ! তারা সব জিনিসকে ছোট করে দেখে। তারা পাহাড়কে বলে ঢিবি, বোয়ালমাছকে বলে মাগুরমাছ, বুড়োমানুষকে ভাবে খোকা। ওই হল তোমাদের দোষ।"

পুটু অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু ক্ষান্তমাসি যে কালকেই বলছিল, যাই দুধপুকুরে চ্যান করে আসি।"

"ক্ষ্যান্ত? তার কি মাথার ঠিক আছে ? সে সুয্যিকে চাঁদ বলে মনে করে, মাঝরাত্তিরকে মনে করে বেহান বেলা, চোরকে ভাবে দারোগাবাবু। তার গুণের কথা আর বোলো না।"

"তা হলে এটা পুকুর নয় ?"

"কক্ষনো নয়, কস্মিনকালেও নয়। রাজা প্রতাপচন্দ্র জীবনে ছোটখাটো কাজ করেননি কখনও, ছোট কাজ করতে ভারী ঘেন্না করতেন। তাঁর কথা ছিল, মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। কুমড়োর সাইজের রসগোল্লা খেতেন, লাউয়ের সাইজের পান্তুয়া। তাঁর তরোয়ালখানার ওজন ছিল প্রায় আধ মন।"

"এঃ, অত বড় তলোয়ার নিয়ে কেউ যুদ্ধ করতে পারে ?"

"যুদ্ধ ! যুদ্ধ করার দরকারটা কী ? প্রতাপচন্দ্র নিজেও

তলোয়ারটা তুলতে পারতেন না। কথাটা হল, উনি সবসময়ে বড়-বড় কাজ করতে ভালবাসতেন। শুনেছি একবার ঘুড়ি ওড়ানোর শখ হওয়াতে কুড়ি ফুট বাই কুড়ি ফুট একখানা ঘুড়ি তৈরি করিয়েছিলেন আর পিপের সাইজের লাটাই।"

"ও বাবা! সে-ঘুড়ি ওড়াল কে?"

"কেউ না। ঘুড়ি মোটে আকাশে ওড়েইনি। কিন্তু তাতেও রাজা প্রতাপের নামডাক খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই যে সমুদ্দুরের মতো জলাশয় দেখছ এও রাজা প্রতাপের এক কীর্তি।"

"কিন্তু দুধের সর নাম হল কেন?"

"দুধের সর নয় বাবা, দুধসায়র। সায়র মানে সাগরই হবে বোধ হয়। আর দুধের ব্যাপারটাও সত্যি। প্রতাপচন্দ্র সায়র তৈরি করলেন বটে, কিন্তু তাতে প্রথমটায় জল ওঠেনি। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন মা-চামুণ্ডা একটা দুধের পুকুরে চান করতে-করতে বলছেন, 'ওরে প্রতাপ, কিসের জোরে তোর এত বিষয়সম্পত্তি, এত পয়সাকড়ি তা ভেবে দেখেছিস? মাটি থেকেই না তোর এত আয় হয়। তা মাটিকে কি কিছু দিস হতভাগা? ভাল চাস তো সায়রে ঘড়া-ঘড়া দুধ ঢাল। দুধ পেলে বসুন্ধরা খুশি হয়ে জল ছাড়বে। নইলে ওই দহে কস্মিনকালেও জল হবে না।' স্বপ্নাদেশ পেয়ে প্রতাপচন্দ্রের হুকুমে তিন হাজার গয়লা ঘড়া-ঘড়া দুধ ঢালতে লাগল। সে একেবারে থইথই দুধ।"

"এ মা, এত দুধ যে নষ্ট হল!"

খাসনবিশ চোখ কপালে তুলে বলল, "নষ্ট কী গো? তোমরা শহুরে ছেলেরা বড্ড সায়েন্স শিখে যাও অল্প বয়সে। দুধ নষ্ট হবে কেন? মাটিতে দুধ গিয়ে কীরকম সার হল বলো। তাইতেই তো আশপাশের জমি সব দ্বিগুণ ফলন্ত হয়ে উঠল। আর দুধপুকুরেও বান ডাকার মতো হু-হু করে মাটি ফুঁড়ে জল বেরিয়ে এল।"

"পুকুরে দুধ ঢালতেই জল বেরিয়ে এল? হিঃ হিঃ, তা হলে নিশ্চয়ই গয়লারা দুধে খুব জল মিশিয়ে দিয়েছিল!"

"অ্যাঁ! বলে কী রে খোকা? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে দুধে জল মেশাবে? কিন্তু তুমি মহা বিচ্ছু ছেলে দেখছি পুটুবাবু। এইটুকু বয়সে যে কেউ এত নাস্তিক হয় তা জানা ছিল না বাপু।"

"নাস্তিক মানে কি খাসনবিশদাদা?"

"নাস্তিক মানে হচ্ছে যারা কিছু মানেটানে না। সব জিনিস আজগুবি বলে উড়িয়ে দেয়। তুমি নাস্তিক হবে নাই-বা কেন? তোমার বাপটাই তো একটা আস্ত নাস্তিক।"

"তুমি কেমন করে জানলে যে বাবা নাস্তিক?"

"জানব না? তাকে যে এই এতটুকু বয়স থেকে কোলে-কাঁখে করে বড় করেছি। আমার বড্ড ন্যাওটা ছিল। এখন ভারী চশমা চোখে এঁটে মোটা-মোটা বই পড়ে বটে, কিন্তু ছেলেবেলায় মহা বিচ্ছু ছিল। কিছু বললেই তোমার মতো চোখা-চোখা প্রশ্ন করত। তখন থেকেই নাস্তিক।"

"না, বাবা মোটেই নাস্তিক নয়। বাবা তো বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, নাস্তিক হবে কেন?"

"ওই হল বাপু। বিজ্ঞান কি আর ভাল জিনিস? বিজ্ঞান অ্যাটম বোমা বানায়, ভগবানের নামে নিন্দেমন্দ করে, এঁটোকাঁটা মানে না।"

"হিঃ হিঃ, তুমি যে একটা কী না খাসনবিশদাদা! আচ্ছা শোনো, তোমরা কি বাতাসা দিয়ে দুধ খাও?"

"ও মা, ও কী কথা? হঠাৎ বাতাসা দিয়ে দুধ খাওয়ার কথা উঠছে কেন?"

"ওই যে দ্যাখো, দুধের সরের মাঝখানে ঠিক বাতাসার মতো একটা জিনিস ভাসছে না?"

খাসনবিশ একগাল হেসে বলল, "তা বটে ঠিক। ওটা দেখতে বাতাসার মতোই বটে। তবে দূর থেকে বাতাসা বলে মনে হলেও ওটি কিন্তু একখানা দ্বীপ। তা ধরো দশ-বারো বিঘে জমি তো আছেই। ওটা ছিল প্রতাপরাজার বাগানবাড়ি।"

"কই, বাড়ি তো দেখা যাচ্ছে না!"

"না বাপু, এত দূর থেকে কি আর অত ঠাহর করা যায়? তা ছাড়া বড়-বড় গাছ আর আগাছায় সব ঢেকে গেছে। বাড়িরও বড্ড ভগ্নদশা, সাপখোপের আড্ডা।"

"কেউ যায় না ওখানে?"

"নাঃ। কে যাবে? গিয়ে হবেটাই বা কী? আগে কেউ-কেউ সোনাদানা মোহর কুড়িয়ে পাবে বলে লোভে-লোভে যেত। আজকাল আর কেউ যায় না। খামোখা হয়রান হয়ে লাভটা কী?"

"কিন্তু পিকনিক করতে যেতে পারে তো!"

"ওসব পিকনিক-টিকনিক এখানে হয় না। এ গাঁ-গঞ্জ জায়গা।"

পুটু বলল, "কিন্তু আমরা যদি যাই?"

খাসনবিশ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "না যাওয়াই ভাল। সাপখোপ ছাড়াও অন্যসব জিনিস আছে।"

"কী জিনিস খাসনবিশদাদা?"

খাসনবিশ মাথা চুলকে বলল, "তুমি তো আবার নাস্তিক। তোমাকে বলেও লাভ নেই।"

"তুমি নিশ্চয়ই বলবে, ওখানে ভূত আছে!"

"বলব-বলব করছিলাম, তা তুমিই যখন বলে দিলে তখন সত্যি কথাটা স্বীকার করাই ভাল। এখানে ইদানীং ভূতের উৎপাত হয়েছে বলে শুনেছি।"

"আমি ভূতপ্রেত মানি না।"

খাসনবিশ খিঁচিয়ে উঠে বলল, "তা মানবে কেন? দু'পাতা সায়েন্স পড়ে তোমরা সব গোল্লায় গেছ। তবে কুনকে তো আর মিছে কথা বলার ছেলে নয়!"

"কুনকে আবার কে?"

"কুণ্ডুবাড়ির ছেলে কনিষ্ক কুণ্ডু, ক্লাসে ফার্স্ট হয়। সে আর পালপাড়ার ভোলা দু'জনেই স্বচক্ষে দেখে এসেছে।"

"কী দেখেছে খাসনবিশদাদা?"

"তা আর তোমাকে বলে কী হবে? বিশ্বাস তো আর করবে না!"

"ভূতের গল্প শুনতে যে আমার ভীষণ ভাল লাগে!"

"গল্প? হুঁ, তোমার কাছে গালগল্প হলেও যারা দেখেছে তাদের কাছে তো নয়।"

"না বললে কিন্তু তোমার তামাক-টিকে চুরি করে লুকিয়ে রাখব।"

চোখ কপালে তুলে খাসনবিশ বলে, "ও বাবা, তুমি যে দেখছি গুটকের চেয়েও বেশি বিচ্ছু!"

"গুটকেটা তো হাঁদারাম, সাইকেল চালাতে পারে না।"

"তা না পারুক, গুটকে সাঁতার জানে। তুমি জানো?"

"ও আমি দু'দিনে শিখে নেব। এবার গল্পটা বলো। কুনকে আর ভোলা কী দেখেছিল?"

"কুনকে খুব হার্মাদ ছেলে, ভয়ডর বলতে কিছু নেই, বুঝলে!"

"সে আমারও নেই। তারপর বলো।"

"কথাই তো কইতে দাও না, কেবল ফুট কাটো। হ্যাঁ, তা হয়েছে কী গতবার শীতের শুরুতেই তারা দুজন এক দুপুরবেলা একটা ডিঙি নৌকো বেয়ে ওই দ্বীপে গিয়েছিল।"

"ওরা নৌকো বাইতে পারে বুঝি?"

"পারবে না? গাঁয়ের ছেলেরা সব পারে। তোমাদের শহুরে ছেলেদের মতো তো নয়।"

"আমিও দু'দিনে শিখে নেব। তারপর বলো।"

"তা তারা গিয়েছিল বেজির বাচ্চা খুঁজতে।"

"ওখানে বেজি আছে বুঝি?"

"প্রতাপরাজার আমলে মেলাই ছিল। উনি খুব বেজি পছন্দ করতেন। তা সেইসব বেজি এখন ঝাড়েবংশে বেড়েছে হয়তো।"

"এই যে বললে ওখানে সাপখোপের আড্ডা! বেজিরা তো সাপগুলোকে মেরেই ফেলবে।"

"ওরে বাবা, জঙ্গলের নিয়ম কি আর আমাদের মতো? সেখানে সবাই থাকে। ঝগড়াঝাঁটি খুনখারাপি হয়, আবার থাকেও একসঙ্গে। সাপও আছে, বেজিও আছে। তা সেইখানে গিয়ে যখন জঙ্গলের মধ্যে দু'জনে বেজি খুঁজছিল সেই সময়ে হঠাৎ দেখতে পায় একটা খুব লম্বা লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।"

"সেটাই কি ভূত?"

"আঃ, ফের কথা বলে! হ্যাঁ বাপু, সেটাই ভূত।"

"যাঃ, লম্বা লোক হলেই বুঝি ভূত হয়? তা হলে আমার নসু কাকাও তো ভূত।"

"ওরে বাপু, লম্বার তো একটা বাছবিচার আছে! তিন-চার হাত লম্বা হলে কথা ছিল না, এ-লোকটা যে সাত-আট হাত লম্বা।"

"তার মনে কত ফুট?"

"তা ধরো দশ-বারো ফুট তো হবেই।"

"গুল মারছ খাসনবিশদাদা।"

"এইজন্যই তোমাকে কিছু বলতে চাই না।"

"দশ-বারো ফুট লম্বা কি মানুষ হয়?"

"মানুষ হলে তবে তো!"

"তা সে-লোকটা কী করল?"

"কী আবার করবে? লোকটা একটা নারকোল গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে ছিল। ওরা কি আর কিছু দেখেছে? ওরকম ঢ্যাঙা একটা লোককে দেখেই পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এসে ডিঙিতে উঠে পালিয়ে এসেছে।"

"দুপুরবেলা?"

"হ্যাঁ, ঠিক দুপুরবেলা। কথাতেই তো আছে, ঠিক দুক্কুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা।"

॥ ২ ॥

বিদ্যাধরপুর গাঁয়ের একটু তফাতে জঙ্গলের মধ্যে বুড়ো শিবের পুরনো মন্দির। মন্দিরের গায়ে ফাটল ধরে তাতে অশ্বত্থের চারা উঁকি মারছে, দেওয়ালে শ্যাওলার ছোপ, তক্ষকের বাসা। আজকাল লোকজনও বিশেষ আসে না। শুধু জগা পাগলা আর ভুলু কুকুর রোজ সন্ধেবেলা হাজির থাকে।

প্রৌঢ় পুরোহিত রসময় চক্রবর্তী সন্ধ্যাপূজা সেরে বেরিয়ে এসে দেখেন জগাপাগলা চাতালের ওপর নিজের ঝোলাটাকে তাকিয়ার মতো করে আধশোওয়া হয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। আর চাতালের সিঁড়ির নীচে ভুলু মহা আরামে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে।

রসময় চক্রবর্তী লণ্ঠনটা পাশে রেখে চাতালে বাবু হয়ে বসলেন। জগাপাগলার সঙ্গে রোজই তাঁর কিছু কথাবার্তা হয়। লোকটা পাগল হলেও তাকে খারাপ লাগে না চক্কোত্তি মশাইয়ের।

শরৎকাল এসে গেছে। এ-সময়ে সন্ধের পর একটু হিম পড়ে। জগার গায়ে একটা সবুজ রঙের গরম কাপড়ের কোট, আর পরনে কালো পাতলুন। রসময় লক্ষ করলেন, পোশাকটা বেশ নতুন।

"আজ কী নিয়ে ভাবনায় পড়লে হে জগা? বড্ড তন্ময় দেখছি যে!"

জগা সোজা হয়ে বসে গোঁফদাড়ির ফাঁক দিয়ে একটু হাসল।

তারপর বলল, "আজ্ঞে, বড্ড সমস্যায় পড়ে গেছি।"
"কী নিয়ে সমস্যা ?"
"আজ্ঞে, খিচুড়ি নিয়ে।"
"খিচুড়ি ? সে তো ভাল জিনিস। সমস্যাটা কোথায় ?"
"সমস্যা আছে। ধরুন চালেডালে মিশিয়ে সেদ্ধ করলে তো খিচুড়ি হয়, না কি ?"
"তা বটে।"
"কিন্তু ডালভাত মাখলে তো তা হচ্ছে না।"
"না, তা হচ্ছে না।"
"ওইখানেই তো সমস্যা। চালেডালে সেদ্ধ করলে খিচুড়ি, আর চাল আলাদা ডাল আলাদা সেদ্ধ করলে ডালভাত, এটা কেন হচ্ছে বলুন তো ঠাকুরমশাই ?"
"ও বাবা, এ তো জটিল প্রশ্ন দেখছি।"
"খুবই জটিল। যত ভাবছি তত জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কেউই কোনও সমাধান দিতে পারছে না। আপনি তো মেলাই শাস্ত্রটাস্ত্র জানেন, আপনি বলতে পারেন না ?"
"না বাপু, শাস্ত্রে খিচুড়ির কথা পাইনি।"
"সেইটেই তো মুশকিল, সায়েন্সে খিচুড়ির কথা আছে মনে করে গোবিন্দর কাছে গিয়েছিলুম। তা সে বলল, খিচুড়িও আসলে ডালভাতই। শুনে এমন রাগ হল ! এই বিদ্যে নিয়ে গোবিন্দ নাকি আবার কলেজে সায়েন্স পড়ায়। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।"
"তা বাপু, খিচুড়ির কথাই শুধু ভাবলে চলবে কেন ? ধরো দুধে চালে সেদ্ধ করলে পায়েস, আবার দুধেভাতে মাখলে দুধভাত। এটাই-বা কেমন করে হচ্ছে ?"
ভারী বিরক্ত হয়ে জগা বলল, "আহা, খিচুড়ির কথাটাই আগে শেষ হোক, তবে না পায়েসের কথা ! আলটপকা খিচুড়ির মধ্যে পায়েস এনে ফেললে একটা ভজঘট্ট লেগে যাবে না ?"
রসময় মাথা নেড়ে বললেন, "তা বটে, তা হলে খিচুড়ির কথাটাই শেষ করো বাপু, তারপর বাড়ি যাই।"
জগা বলল, "বাড়ি যাবেন যান, কিন্তু তা বলে খিচুড়ির কথাটা এখানেই শেষ করা যাচ্ছে না। এ-নিয়ে আরও ভাবতে হবে।"
সিঁড়ির নীচে ভুলু ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ একটু ভুকভুক আওয়াজ করল।
রসময় উঠতে-উঠতে বললেন, "নাঃ, আর রাত করা ঠিক হবে না। মোহনপুরার জঙ্গলে নাকি বাঘের উৎপাত হয়েছে। জঙ্গলটা তো বেশি দূরেও নয়।"
জগা দাড়িগোঁফের ফাঁকে একছটাক হেসে বলল, "বাঘের খবরে ভয় পেলেন নাকি ঠাকুরমশাই ?"
"বাঘকে ভয় না খায় কে বাপু ?"
জগা মাথা নেড়ে বলল, "আমারও ভয় ছিল খুব। তবে নিত্যহরি কবরেজ অয়স্কান্তবাবুর বাতব্যাধির জন্য কী একটা ওষুধ বানাবেন বলে বাঘের চর্বি খুঁজছেন, তা আমি সেদিন কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'বাঘের চর্বি তো আর হাটে-বাজারে পাওয়া যাবে না, তা দামটা কীরকম দিচ্ছেন ?' নিত্যহরি কবরেজ পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বলল, 'বাপু রে, জোগাড় করে যদি দিতে পারিস তা হলে প্রতি সের পাঁচ হাজার টাকা দর দেব।' ওই দর শুনেই ভয়ডর চলে গেল, সেই থেকে আমি জুতসই একটা বাঘ খুঁজে বেড়াচ্ছি। চর্বি তো নিত্যহরি নেবেই, বাঘের ছালেরও নাকি অনেক দাম, তারপর নখ-দাঁত সবই নাকি ভাল দামে বিক্রি হয়। একটা বাঘ জোগাড় হলে এখন দিনকতক বেশ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাওয়া যায়, কী বলেন ?"
"তা হলে তো মোহনপুরার বাঘটার কপাল খারাপই বলতে হয়। তা বাপু, বাঘটাকে মারবে কী দিয়ে ? শুধু হাতে নাকি ?"
জগা গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না, অস্তর আছে।"
"বটে ! তা হলে তো নিশ্চিন্ত। তা অস্তরটা কী ? বন্দুক নাকি ?"
খিকখিক করে খুব হাসল জগা, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "বন্দুক আবার একটা অস্তর !"
"তবে কি কামান ?"
"সে আছে একটা জিনিস, বাঘ মারার অস্তর কিনব বলে শীতলাতলার হাটে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করছিলুম এই শনিবার, তা বাঘ মারব শুনে সবাই হাসে, কেউ মোটে আমলই দেয় না, আজকাল ফচকে লোকের সংখ্যা ক্রমেই বড্ড বাড়ছে, লক্ষ করেছেন কি ঠাকুরমশাই ?"
"তা আর বলতে !"
"তাই বড্ড দমে গিয়েছিলুম। একজন তো বলেই ফেলল, 'ও জগা, তুমি যে বাঘ মারতে চাও এ-খবরটা যদি বাঘের কানে পৌঁছে দিতে পারো তা হলে আর চিন্তা নেই। বাঘ হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে নিজেই মরে যাবে।' বলুন তো ঠাকুরমশাই, এসব কথা শুনলে কার না রাগ হয় ?"
"হ্যাঁ, তা রাগ তো হতেই পারে।"
"হরিখুড়ো কী বলল জানেন ? বলল, 'বাঘ মারবে কী হে, ছ্যাঃ ছ্যাঃ। কথায় বলে মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার, বাঘ মারবে কোন দুঃখে ! মারলে গণ্ডার মারো।'"
"এ তো হরিখুড়োর বড় অন্যায় কথা। গণ্ডারের চাইতে বাঘই বা কম যায় কিসে !"
"সে-কথা আর কে বুঝছে বলুন, শ্যামাপদবাবু তো আর এক কাঠি সরেস। বললেন কী, 'ওহে জগাভায়া, বাঘকে মারতে যাবে কোন দুঃখে ? জ্যান্ত বাঘের যে অনেক বেশি দাম ! এই তো নবীন সাহা লোহার কারবার করে সদ্য বড়লোক হয়েছে, হাতে অঢেল পয়সা। কুকুর, বেড়াল, গোরু, ঘোড়া পুষে অরুচি ধরেছে। এ বার বাঘ পোষার শখ। লাখ টাকা দিয়ে কিনে নেবে। তুমি শুধু ধরে দাও।'"
"বটে ! ঠাট্টাই করল নাকি ?"
"তা কে জানে ! নবীনের পয়সা আছে, কথাটা মিথ্যে নয়। তবে ঠাকুরমশাই, কথাটা শুনে নিমাই যা বলল তা একেবারে ধ্যাষ্টামো। বলল কী, 'বাঘ ধরা তো সোজা ব্যাপার, হুইল বঁড়শিতে একটা পাঁটা গেঁথে ঝুলিয়ে দিয়ে গাছের ওপর বসে থাকো। বাঘ এসে কপাত করে পাঁটাকে গিললেই গেঁথে তুলে ফেলবে।' শুনুন কথা, বাঘ যেন পুকুরের মাছ ! বাঘকে কি অত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ভাল ?"
"উহুঁ, উঁহু, মোটেই ভাল নয়। ওতে বাঘ আরও কুপিত হয়ে পড়েন, তা হলে তোমাকে নিয়ে হাটের মধ্যে একটা শোরগোলই পড়ে গিয়েছিল বোধ হয় ?"
"যে আজ্ঞে, মেলা লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছিল। অমন একটা গুরুতর কথায় যে লোকে এমন হাসাহাসি করতে পারে তা জন্মে দেখিনি !"
"অন্যায় কথা, খুবই অন্যায় কথা।"
"আজ্ঞে, এইজন্যই তো দেশটার উন্নতি হল না।"
"তা যা বলেছ !"
"শুধু বামাচরণবাবুর মতো লোক দু-একজন আছে বলেই যা একটু ভরসা।"
রসময় অবাক হয়ে বলেন, "বামাচরণবাবুটা আবার কে ?"
"তাঁকে আমিই কি চিনতুম নাকি ? শীতলাতলার হাটেতেই চেনা হল। বড্ড ভাল লোক। সাঁঝের মুখে যখন ফিরে আসছি তখনই হঠাৎ লম্বাপানা একটা লোক এসে কাঁধে হাত দিয়ে খুব হাসি-হাসি মুখ করে বলল, 'জগাভায়া কি কিছু খুঁজছ নাকি ?' আমি বললুম, 'আর বলবেন না মশাই, একটা অস্তর জোগাড় করতে এসে কী হেনস্থাটাই হল !' তখন উনি বললেন, 'সে আমি

নিজের চোখেই দেখেছি, আমি এই পাশের গাঁয়েই থাকি, নাম বামাচরণ মিত্তির, তোমাকে বিলক্ষণ চিনি। সত্যি বলতে কী, তোমার মতো বুকের পাটাওলা লোক দুটি দেখিনি। বাঘটা আমাদের গাঁয়েও উৎপাত করছে খুব। পরশু রাতেই তো হেমবাবুর গোরুটা মারল, কিন্তু কেউই বাঘটা মারার জন্য কিছু করছে না। দারোগাবাবু সদাশিব আর শিকারি নাদু মল্লিকের ভরসায় সবাই বসে আছে। তা তারাও তো বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। দারোগা সদাশিব নাকি আজকাল গজল শিখছেন, গান নিয়েই ব্যস্ত। আর নাদু মল্লিকের নতুন নাতি হয়েছে। সেই নাতি নিয়েই আহ্লাদে মেতে আছেন, বন্দুক ছুঁয়েও দেখেন না। এখন ভরসা তুমি।' কথাটা শুনে খুব সন্তুষ্ট হলুম। হ্যাঁ, এই একটা বিবেচক লোক, তো বললুম, 'বাঘ মারব কিন্তু অস্তর কই? শুধু হাতে তো আর বাঘ মারা যায় না মশাই। তখন বামাচরণবাবু আমার কানে-কানে বললেন, 'অস্তরের অভাব হবে না, অভাব তো শুধু শিকারির, আমি তোমাকে মোক্ষম অস্তর দেব।"

"তা দিল নাকি অস্তর?"

খিকখিক করে হেসে জগা বলল, "দেয়নি আবার!"

রসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বললেন, "দিয়েছে! তা কী অস্তর ছিল?"

"সে আর আপনার শুনে কাজ নেই।"

বামাচরণ যে-ই হোক, পাগলের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়াটা যে ভাল হয়নি, এটা নিশ্চয়ই। রসময় উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, "দেখো বাপু, জিনিসটা সামলে রেখো, বাঘ মারতে গিয়ে আবার মানুষ মেরে বোসো না।"

"আজ্ঞে না, সে-ভয় নেই। মারার মতো মানুষই বা পাব কোথায়? চারদিকে যাদের দেখছি সব তো আধমরা মানুষ। এদের আর মেরে হবে কী?"

রসময় বললেন, "তা অবশ্য খুব ঠিক কথা, তা অস্তরটা কি একেবারে বিনি মাগনা-ই দিল নাকি? পয়সাকড়ি চাইল না?"

"আজ্ঞে না, তবে কথা আছে।"

"কী কথা?"

"অস্তরের জন্য পয়সা দিতে হবে না বটে, কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"খেত-টেত কোপাতে হবে নাকি?"

"ওসব নয়। ছোট কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি, এই তো সেদিন ভূপতি চাটুজ্যে তার গোয়াল পরিষ্কার করাল, সারা দিনমান উদয়াস্ত খেটে গোয়ালঘরখানাকে তাজমহল বানালুম, কিন্তু কী জুটল জানেন? তিনটে টাকা, একথালা পান্তা আর একছড়া তেঁতুল, একটু গুড় চেয়েছিলুম, তাইতে চাটুজ্যেগিন্নি এমন খ্যাঁক করে উঠল! না মশাই, ছোটখাটো কাজ আর নয়, বড্ড ঘেন্না ধরে গেছে। নগেন পালের মেয়ের বিয়েতে কম খেটেছি মশাই? বাজার থেকে গন্ধমাদন মাল টেনে আনা, ম্যারাপ বাঁধার জোগালি খাটা, ঝাঁটপাট দেওয়া, জল তোলা, কী জুটেছিল জানেন? সবার শেষে খেতে দিল একটা ঘ্যাঁট আর ভাত। বলল, সব জিনিস ফুরিয়ে গেছে। হাতে মোটে পাঁচটি টাকা গুঁজে দিল, ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছোট কাজ কি ভদ্রলোকের পোষায়?"

"অতি ন্যায্য কথাই বলেছ বাপু। ওসব কাজ তোমাকে মানায়ও না, তা এ-কাজটা বেশ মানানসই পেয়েছ তো?"

জগা ঘাড় কাত করে বলল, "দিব্যি কাজ, একখানা জিনিস শুধু দুধসায়রের দ্বীপে রেখে আসতে হবে।"

বিস্মিত রসময় বলে উঠলেন, "বটে! তা জিনিসটা কী?"

"বলা বারণ, তবে পাঁচ কান যদি না করেন তো বলতে পারি।"

"পাঁচ কান করতে যাব কোন দুঃখে?"

"তা হলে বলি, রাজা প্রতাপের একখান শূল আছে, জানেন তো!"

"কে না জানে! প্রতাপরাজার শূল বিখ্যাত জিনিস। দেড় মন ওজন।"

"সেইটেই।"

রসময় চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলো কী হে! রাজা প্রতাপের শূল সরাবে, তোমার ঘাড়ে ক'টা মাথা? হরুয়া পালোয়ান আর দুই ছেলে যখের মতো রাজা প্রতাপের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে, তাদের মতো লেঠেল তল্লাটে নেই, তার ওপর তাদের দলবল আছে, তারা সব রাজা প্রতাপের খাস তালুকের প্রজা। সেই আদিকাল থেকে বংশানুক্রমে রাজা প্রতাপের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে, তোমার প্রাণটা যে যাবে হে!"

একটু কাঁচুমাচু হয়ে জগা বলল, "সেইটেই যা মুশকিল, তা অস্তর দেখালে ভয় পাবে না?"

"অস্তর দেখাবে? কী অস্তর তাই তো বুঝলুম না!"

"এই যে!" বলে ঝোলায় হাত পুরে একখানা পিস্তল গোছের জিনিস বের করল জগা। তারপর খিকখিক করে হেসে বলল, "আজ্ঞে এসব খুব সাঙ্ঘাতিক জিনিস।"

সাঙ্ঘাতিক কিনা রসময় তা জানেন না, তবে জিনিসটা দেখে তাঁর খেলনা পিস্তল বলেই মনে হল, একটু হেসে বললেন, "ওরে বাপু, ওরা ওসব খেলনা দেখে ভয় পাওয়ার লোক নয়। রাজা প্রতাপের বাড়িতে চুরি-ডাকাতির চেষ্টা বড় কম হয়নি, কিন্তু আজ অবধি কেউ কুটোগাছটিও সরাতে পারেনি।"

জগা গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "অস্তরটাকে কি খেলনা বলছেন ঠাকুরমশাই?"

রসময় একটু সতর্ক গলায় বললেন, "তা কে জানে! ওসব কখনও নাড়াঘাঁটা করিনি বাপু, ম্লেচ্ছ জিনিস। তবে মনে হয় ও সব ছোটখাটো অস্তরকে ভয় খাওয়ার পাত্র নয় হরুয়া, আরও একটা কথা বাপু, এত জিনিস থাকতে রাজা প্রতাপের এই পেল্লায় শূল দিয়েই বা তোমার বামাচরণবাবু কী করবেন?"

জগা মাথা নেড়ে বলে, "আমিও জানি না, তবে বলছিলেন, শূলখানা পাচার করতে পারলে একদিন পেট পুরে ভুনি খিচুড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা খাওয়াবেন। ভুনি খিচুড়ি কখনও খেয়েছেন ঠাকুরমশাই?"

"এক-আধবার।"

"ওফ, সে রাজরাজড়ার ভোজ, তার সঙ্গে হাতাদুয়েক গরম ঘি হলে আর কথাই নেই, তা সেসব কথাও হয়েছে বামাচরণবাবুর সঙ্গে। কী হবে, পাঁপড়ভাজা হবে, ইলিশের ডিমের বড়া থাকবে, শেষ পাতে চাটনি আর দই।"

"এত কথাও হয়েছে নাকি?"

"আজ্ঞে। কথাবার্তা একেবারে পাকা।"

"কিন্তু শূলখানা যে সরাবে সেটা কিন্তু চুরির শামিল। চুরি করা কি ভাল কাজ হে জগা? অস্তরটা বরং তুমি বামাচরণবাবুকে ফেরত দিয়ে এসো গে। বলো, এ-কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

"তা হলে বাঘ মারব কী দিয়ে ঠাকুরমশাই? অস্তরটাকে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না তো ঠাকুরমশাই? তবে এই যে দেখুন—"

বলে পিস্তলটা তুলে জগা ঘোড়াটা টিপে দিল।

যে কাণ্ডটা হল, রসময় তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, বিকট একটা শব্দ আর সেইসঙ্গে আগুনের ঝলক তুলে একটা গুড়ুলের মতো জিনিস ছিটকে গেল, গাছ থেকে একটা কাক মরে পড়ে গেল বোধ হয় নীচে, পাখিরা তুমুল চিৎকার করতে লাগল। ভুলু লেজ গুটিয়ে কেঁউ-কেঁউ করতে লাগল, রসময় স্তম্ভনভাবটা কাটিয়ে নিয়েই লাফ মেরে পড়ে দৌড়তে লাগলেন। পেছনে পেছনে জগাও।

জগার হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়েছিল ঘাসের ওপর।

কাকটা মরে পড়ে আছে একটা জামগাছের তলায়। রসময়ের লণ্ঠনের ম্লান আলোয় জায়গাটা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে।

মন্দিরের পেছনের অন্ধকার বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে একটি ছায়ামূর্তি সর্পিল গতিতে বেরিয়ে এল। তার গায়ে কালো পোশাক। মুখটাও ঢাকা। একটা জোরালো টর্চের আলো ফেলে সে কিছু একটা খুঁজল। তারপর পিস্তলটা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিল। এবার টর্চের আলো গিয়ে পড়ল মরা কাকটার ওপর। ছায়ামূর্তি একটু ইতস্তত করে মরা কাকটার ঠ্যাং ধরে হাতে ঝুলিয়ে দোলাতে-দোলাতে সামনের দিকের বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আধঘণ্টা বাদে লোকলশকর, টর্চ, লণ্ঠন আর লাঠি সমেত রসময় আর জগা ফের ফিরে এল মন্দিরের চাতালে। সকলেই ভীষণ উত্তেজিত।

রসময় বলে উঠলেন, "ওই যে ওই জায়গায় পিস্তলটা পড়ে ছিল, আর ওইখানে কাকটা।"

কিন্তু টর্চের আলোয় কেউ কোথাও কিছু খুঁজে পেল না।

রসিক পাণ্ডা মস্তান গোছের লোক। চারদিক দেখেটেখে বলল, "রসময়, আজকাল গাঁজাটাজা খাচ্ছ না তো?"

রসময় উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এই তো জগা সাক্ষী আছে। ঝোলা থেকে পিস্তল বের করল, পিস্তল ফুটল, গুড়ুল ছুটে গেল, কাক মরল—এ যে একেবারে নিয্যস সত্যি ঘটনা।"

জগা জড়সড় হয়ে বলল, "আজ্ঞে তাই। অস্তরটা যে ওরকম সাঙ্ঘাতিক, তা তো জানতুম না।"

রসিক বলল, "এ যে দেখছি চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। তবু চলো, আরও ভাল করে খুঁজে দেখা যাক। মন্দিরের ভেতর-বার কোথাও বাদ রেখো না হে তোমরা।"

কিন্তু বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পাওয়া গেল না।

বিষ্ণু নামে একটা ছেলে গাছতলায় টর্চের আলো ফেলে কী দেখছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল, "রসিকদা, ঘটনাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। এখানে ঘাসের ওপর একটু রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে কিন্তু। আর কয়েকটা কাকের পালক।"

সবাই গিয়ে জায়গাটায় জড়ো হল। কয়েকটা টর্চের আলোয় বাস্তবিকই ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা কাকের পালক আর ঘাসের ওপর রক্তের ছিট-ছিট দাগ দেখা গেল।

রসিক পাণ্ডা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "রসময়, একবার যে থানায় যেতে হচ্ছে!"

"কেন ভাই?"

ঘটনাটা যদি সত্যি হয় তবে থানায় একটা এত্তেলা দিয়ে রাখা দরকার। আর বামাচরণকেও খুঁজে বের করতে হবে। কেমন লোক সে? যার-তার হাতে পিস্তল তুলে দেয়—এ তো মোটেই ভাল কথা নয়! এর-পর তো হাটে-বাজারে অ্যাটম বোমা বিলি হবে।"

॥ ৩ ॥

দারোগা মদন হাজরা খুবই করিৎকর্মা লোক। পরদিন সকালে তিনি দলবল নিয়ে অ্যাকশনে নেমে পড়লেন। বেলা বারোটার মধ্যে পাঁচ-ছ'টা গ্রাম থেকে মোট এগারোজন বামাচরণকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হল। তাদের মধ্যে পনেরো থেকে পঁচাশি সব বয়সের লোকই আছে। কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কেউ কালো, কেউ ধলো, কারও লম্বা সাদা দাড়ি, কারও পাকানো কালো কুচকুচে মোচ। একটা লম্বা দড়ি দিয়ে এগারোজনকেই কোমরে বেঁধে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হল।

দৃশ্যটা দেখে মদন হাজরা খুবই খুশিয়াল হাসি হাসলেন। তিনি রোগাভোগা মানুষ, বারোমাস আমাশায় ভোগেন। লোকে তাঁকে

আড়ালে চিমসে দারোগা বলে উল্লেখ করে, তিনি জানেন। তিনি যে একজন ডাকসাইটে মানুষ, এ-বিশ্বাস কারও নেই। তাই সুযোগ পেলেই তিনি নিজের কৃতিত্ব দেখানোর চেষ্টা করেন। আজ এগারোজন বামাচরণকে গ্রেফতার করার পর তিনি খুবই আহ্লাদ বোধ করছিলেন। ঝোলা গোঁফের ফাঁকে ফিচিক-ফিচিক হাসতে-হাসতে তিনি জগাকে ডেকে বললেন, "এই যে জগা, তল্লাট ঝেঁটিয়ে সবক'টা বামাচরণকে ধরে এনেছি। এবার বাছাধন, তোমার বামাচরণটিকে দেখিয়ে দাও তো ? বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে তবে বলবে, বুঝলে তো !"

জগারও আজ আহ্লাদের সীমা নেই। থানার সামনে মেলা লোক জড়ো হয়েছে। সেপাইরা ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। বামাচরণরা সবাই এবং জড়ো হওয়া মানুষেরা তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। নিজেকে ভারী কেষ্টবিষ্টু মনে হচ্ছিল জগার।

সে উঠে প্রথম লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, লোকটা ছ' ফুট লম্বা, তেমনই চওড়া, বিরাট পাকানো গোঁফ, চোখদুটো বাঘের মতো গুল্লুগুল্লু।

জগা একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, ইনিই সেই বামাচরণ। একেবারে হুবহু তিনিই—"

লোকটা চোখ পাকিয়ে বাজখাঁই গলায় বলল, "অ্যাঁ !"

জগা দু'হাত পেছিয়ে গিয়ে বলল, "আজ্ঞে না। আপনি না। বামাচরণবাবুর বোধ হয় গোঁফ ছিল না।"

দ্বিতীয়জন বেঁটেখাটো, মাথায় টাক, দাড়িগোঁফ কামানো। জগা তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলে উঠল, "আরে ! এই তো বামাচরণবাবু ! এই তো সেই—"

লোকটা দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "ইয়ার্কি হচ্ছে ! ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পাওনি, হনুমান কোথাকার !"

জগা চোখ মিটমিট করতে-করতে বলল, "আজ্ঞে ইনি হবেন কী করে ? বামাচরণবাবুর যে বাঁ গালে আঁচিল ছিল !"

তৃতীয়জন পাকা দাড়িওলা বুড়ো মানুষ। চশমার ফাঁক দিয়ে জগাকে দেখছিলেন। হাতে লাঠি।

জগা গদগদ হয়ে বলল, "পেন্নাম হই বামাচরণবাবু, কতদিন পরে দেখা ! সেই যে হাটে বাঘ মারার অস্তরটা দিলেন, তারপর আর দেখাই নেই ! ভাল আছেন তো ! বাড়ির খোকাখুকিরা সব ভাল ?"

একটু কাঁপা-কাঁপা গলায় বুড়ো বামাচরণ বললেন, "হাতের লাঠিটা দেখছ তো ! এমন দেব কয়েক ঘা—"

জগা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, "আরে না, আপনার কথা হচ্ছে না, আপনার কথা হচ্ছে না। সেই বামাচরণের তো দাড়িই ছিল না মোটে।"

চতুর্থজন বয়সে ছোকরা, ভাল করে দাড়িগোঁফ ওঠেনি। জগা মিটমিট করে তার দিকে চেয়ে থেকে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "বামা না ! উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক জিনিসই দিয়েছিলি বাপ ! কী শব্দ, কী তেজ অস্তরটার !"

ছোকরা ফ্যাচ করে হেসে বলল, "জগাপাগলা, এক মাঘে শীত যায় না, বুঝলে ! আমার জগদ্ধাত্রী ক্লাবের ছেলেরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢিল মেরে তোমার মাথার চাঁদি উড়িয়ে দেবে আজ—"

জগা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি কি তোকে কিছু বলেছি রে বামা ? বল তো, বলেছি ? ওরে, আমার সেই বামাচরণের যে পেল্লায় দাড়িগোঁফ ছিল, তুই তো দুধের শিশু।"

পঞ্চমজন বেশ লম্বা একহারা চেহারার মানুষ। মুখখানা ভারী বিনয়ী। জগা তার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল, "জিলিপি খাবে বলে জষ্টিমাসে যে আড়াইটে টাকা ধার নিয়েছিলে সেটা এবার ছাড়ো তো বাপু। নইলে দারোগাবাবুকেই কথাটা বলতে হয়।"

জগা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, "এ নয়। এ একেবারেই বামাচরণ নয়। কিছুতেই নয়। এ হতেই পারে না !"

ষষ্ঠজন এক আখাম্বা তান্ত্রিক। কাঁচাপাকা দাড়ি, রক্তাম্বর, কপালে প্রকাণ্ড তেল-সিঁদুরের তিলক, চোখ দু'খানা লাল, চেহারাখানাও পেল্লায়।

জগা হাসি-হাসি মুখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "বামাবাবু যে ! ক'দিনেই চেহারাখানা শুকিয়ে একেবারে আদ্দেক হয়ে গেছে দেখছি ? তা বামাবাবাজি—"

তান্ত্রিক বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠল, "জয় শিবশম্ভো ! জয় মা তারা ! তোর মাথায় বজ্রাঘাত হবে রে জগা, এই দিলুম তোকে অভিশাপ—"

তান্ত্রিক অভিশাপ দেওয়ার জন্য হাত তুলতেই জগা চট করে বসে পড়ল। তারপর একলাফে সরে চারদিকে চেয়ে অভিশাপটা কোথায় পড়ল তা খুঁজে দেখতে-দেখতে বলল, "তা বাজটা কোথায় পড়ল বাবাজি ?"

"পড়েনি। পড়বে। তোর নিস্তার নেই রে জগা—"

জগা খুব অভিমানের গলায় বলল, "দিয়েই ফেললেন নাকি শাপটা ?"

"এখনও দিইনি। এই দিচ্ছি—"

"থাক, থাক। আপনি মোটেই সেই বামাচরণ নন। সেই বামা পিস্তল নিয়ে ঘোরে, বাজ নিয়ে নয়।"

সপ্তমজন রোগাপাতলা চালাক-চালাক চেহারার একজন লোক। বাহারি সরু গোঁফ, বাবরি চুল, ঠোঁটে পানের দাগ।

বামাচরণ তার কাছাকাছি যেতেই লোকটা খুব মিহি গলায় বলল, "পরশু হাটুগঞ্জে আমাদের ফুল্লরা অপেরার কৃষ্ণার্জুন পালা হচ্ছে। গিয়ে আমার নাম বোলো গেটম্যানকে, বামাচরণ বিশ্বাস, একেবারে সামনের সারিতে বসিয়ে দেবে।"

জগা একগাল হেসে বলে, "কস্মিনকালে দেখিনি মশাই আপনাকে।"

অষ্টমজন মাঝবয়সী একজন নিরীহ লোক। এতক্ষণ ফ্যাচ-ফ্যাচ করে কাঁদছিল। জগা তার সামনে যেতেই ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে বলল, "এত হেনস্থাও কপালে লেখা ছিল ভাই জগা ? সারা জীবন গরিব-দুঃখীর জন্য এত করলুম, শেষে আমাকে কিনা পুলিশে ধরল ?"

জগা সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "আহা-আহা, কাঁদো কেন বাপু ? গরিব-দুঃখীর জন্য খুব করো বুঝি তুমি ?"

লোকটা চোখে হাত চাপা দিয়ে মাথা নেড়ে বলে, "করতে আর পারলুম কই ? যতবার গরিব-দুঃখীর জন্য কিছু করতে যাই ততবার আমার মাসি আমাকে বলে, 'ওরে বামাচরণ, তোর মতো গরিব, তোর মতো দুঃখী আর কে আছে ?' তাই আর কিছু করে উঠতে পারলাম না রে ভাই !"

লোকটা জগার কাঁধে মুখ গোঁজার চেষ্টা করায় জগা একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, "আহা, আর কাঁদে না। তোমাকে না হয় ছেড়েই দিচ্ছি।"

"ছাড়বে কেন ভাই। বরং ফাটকেই দাও। তাও তো এরা দু'বেলা দুটি খেতে দেবে !"

নবমজন ঢুলু-ঢুলু চোখের একজন বেশ বাবু চেহারার যুবক। মুখে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজছিল।

জগা তার সামনে দাঁড়াতেই লোকটা জিজ্ঞেস করল, "বলো তো কী রাগ ?"

জগা তটস্থ হয়ে বলে, "রাগারাগির কী আছে ? আমি কি বাপু, রাগের কথা কিছু বলেছি ?"

লোকটা মৃদু হেসে বলল, "পারলে না তো ? এ হল বেহাগ। আচ্ছা এবার শোনো—"

লোকটা ফের গুনগুন করে সুর ভাঁজতে লাগল। ভারী

আনমনা।

দশ নম্বর লোকটা খুবই বেঁটে। জগার কোমরসমান হবে।

জগা একটু ঝুঁকে দেখে বলল, "বামাবাবুই মনে হচ্ছে যেন!"

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, "তা তো বটেই। অধমের নাম বামাচরণ সরখেল। আমার মামাশ্বশুর কে জানো? ডাকসাইটে উকিল হিদারাম রায়। জজেরা তাকে দু'বেলা সেলাম ঠোকে। আমার পিসতুতো শালা হল গয়েশপুরের দারোগা দাশরথি দাস। আমার খুড়শ্বশুর কে জানো? কালিয়াগঞ্জের—"

জগা একটু রেগে গিয়েই বলল, "থাক, থাক, মশাই, আপনার আর বামাচরণ হয়ে কাজ নেই।"

এগারো নম্বর এক বুড়োথুথুড়ে মানুষ। তাকে দেখেই বিকট গলায় বলতে লাগল, "ক্যা ক্যা ক্যা রে তুই? অলপ্পেয়ে! পাজি! ছুঁচো! কেন ধরে এনেছিস র্যা আমায়? আমার চান-খাওয়ার সময় হয়নি নাকি র্যা? অ্যাঁ, এখন বাজে ক'টা খেয়াল আছে?"

জগা তাড়াতাড়ি পরের লোকটার সামনে গিয়ে একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ছেড়ে বলল, "এই যে! পেয়ে গেছি দারোগাবাবু! এই হল সেই বামাচরণ। একেই ভাল করে ধরুন।"

লোকটা চোখ পাকিয়ে বলল, "ইয়ার্কির আর জায়গা পেলে না? আমি আবার বামাচরণ হলাম কবে? আমি এই থানার সেপাই গুলবাগ সিং।"

জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে জগা বলল, "সেপাইজি! ছিঃ ছিঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।"

কাণ্ড দেখে বাইরের জমায়েত লোকজন হোঃ হোঃ করে হাসতে লেগেছে। আর এগারোজন বামাচরণ সমস্বরে চেঁচাচ্ছে, "আমরা দেখে নেব। এইভাবে কোমরে দড়ি বেঁধে হাজারটা লোকের সামনে এই যে আমাদের হেনস্থা হচ্ছে এর প্রতিশোধ আমরা নেবই। মদন দারোগার নামে মামলা করব আমরা। জেল খাটিয়ে ছাড়ব" ইত্যাদি।

মদন হাজরার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, গোঁফ ঝুলে পড়েছে, চেঁচামেচি শুনে দু'হাতে কান চাপা দিয়ে মদন হেঁকে বললেন, "সসম্মানে খালাস! সসম্মানে খালাস! ওরে কে আছিস, বামাচরণদের কোমরের দড়ি খুলে দে..."

এক নম্বর বামাচরণ এগিয়ে এসে মদনের টেবিলে এক পেল্লায় চাপড় মেরে বলল, "শুধু ছেড়ে দিলেই হবে? আমার যে অপমান হল তার জন্য এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চাই।"

অন্য বামাচরণরাও এককাট্টা হয়ে চেঁচাতে লাগল, "আমি দেড় লাখ চাই। ...আমার সারাদিনের ব্যবসা নষ্ট, পাঁচ লাখের নীচে নামতে পারব না। ...আমার দশ লাখ..."

মদন হাজরা লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলেন, "দরওয়াজা, শিগ্‌গির বামাচরণদের সসম্মানে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে থানা থেকে বের করে দে।"

চেঁচামেচি হইহট্টগোলে চারদিকে তুলকালাম হতে লাগল। যে-সেপাইটা বামাচরণদের ঘাড়ধাক্কা দিতে গিয়েছিল তাকে এগারোজন বামাচরণ পেড়ে ফেলল। মদন হাজরা হা-ক্লান্ত হয়ে বসে হ্যা-হ্যা করে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, "যত নষ্টের গোড়া হল ওই জগাপাগলা। ওরে গুলবাগ সিং, ওটাকে ধরে হাজতে পুরে দে তো! তারপর ব্যাটাকে এমন ধোলাই দিতে হবে যে—"

ঠিক এই সময়ে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে সরু হয়ে রসময় চক্রবর্তী এসে সামনে দাঁড়ালেন, হাতজোড় করে বললেন, "বড়বাবু! কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে।"

"ভুল! কিসের ভুল?"

"বলছিলুম যে, বামাচরণ কাঁচা লোক নয়। সে নিজের আসল নামটাই জগাকে বলেছে বলে মনে হয় না।"

"আসল নামটা তা হলে কী?"

"সেটা জানলে আর এত জল ঘোলা হবে কেন? জগাকে সে শুধু পিস্তলটাই দেয়নি, প্রতাপরাজার শূলটাও চুরি করার দায়িত্ব দিয়েছে, সেটা ভুললে চলবে না।"

গম্ভীর হয়ে মদন হাজরা বললেন, "হুঁ। কিন্তু শূলটা দিয়ে কী করবে?"

"সেটাই ভাবনার বিষয়। শূলখানা আমি দেখেছি। সোনাদানা দিয়ে তৈরি হলেও না হয় কথা ছিল। তা নয়, শূলখানা নিতান্ত লোহা দিয়েই তৈরি। তার ওপর ওজনদার জিনিস, প্রায় দেড় মন। বামাচরণ এই শূল দিয়ে কী করবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। দুধসায়রের দ্বীপে তার কোনও আস্তানা আছে কি না সেটাও দেখা দরকার। আমি বলি কি হুজুর, হুটপাট না করে আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টা ভাবা উচিত।"

দারোগা চিন্তিত হয়ে বললেন, "হুঁ।"

॥ ৪ ॥

ক্ষান্তমণি সকালে বাগানে গিয়েছিল শাক তুলতে। তখনই দেখে বাগানে একটা কালো আনারস পড়ে আছে। দেখে তার ভারী আহ্লাদ হল। কাঁচা আনারসের অম্বল খেতে বড় ভাল।

কিন্তু সেটা কাটতে গিয়ে দেখল, বঁটিতে মোটেই কাটা যাচ্ছে না। রেগে গিয়ে বলল, "মরণ! এ আনারস কাটতে কি এবার রামদাখানা নামাতে হবে নাকি? বলি ও খাসনবিশ, কোথায় গেলি? আয় বাবা, আনারসখানা একটু ফালি দিয়ে যা। বুড়ো হয়েছি তো, হাতেরও তেমন জোর নেই।"

খাসনবিশ বারান্দার কোণে তার ঘরে বসে নিবিষ্টমনে তামাক সাজছিল। বলল, "ক্ষ্যান্তদিদি যে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলে! বলি আনারস আবার এল কোথা থেকে? চোখের মাথা তো খেয়েই বসে আছ, এখন মাথাটাও গেছে দেখছি।"

"আমার মাথা গেছে, না তোর মাথা! আনারস নয় তো এটা কাঁটাল? আমাকে এলেন উনি আনারস চেনাতে। ওরে, আনারস খেয়ে-খেয়ে আমার এক জন্ম কাটল। তুই তো সেদিনের ছেলে।"

"হ্যাঁ গো ক্ষ্যান্তদিদি, তুমি যে আনারসে এম.এ পাশ তা জানি। কিন্তু বলি এই অকালে আনারস পেলে কোথায়? বাজার থেকে তো আমি আনারস আনিনি, বাগানেও আনারস ফলেনি, তবে কি ভূতে দিয়ে গেল?"

"তা যদি ভূতের কথাই বলিস বাছা, তো বলি, এ ভূতের দেওয়া বলেই না হয় মনে করলি? বলি, চোখের মাথা কি আমি খেয়ে বসেছি, না তুই? বাগানে তো দু' বেলা মাটি কোপাস, এমন আনারসটা তোর চোখে পড়ল না? না কি আজকাল তামাকের বদলে গাঁজা খাচ্ছিস!"

খাসনবিশ হুঁকো হাতে বেরিয়ে এসে বলল, "গাঁজা যে কে খায় তা বোঝাই যাচ্ছে। তা আনারসটা কোথায়?"

ক্ষান্তমণি আনারসটা হাতে দিয়ে বলে, "বড্ড কচি তো, তাই শক্ত। বঁটিতে ধরছে না। বঁটিটার ধারও বোধ হয় গেছে। শানওলা এলে ডাকিস তো, বঁটিটা শানিয়ে নিতে হবে।"

আচমকা খাসনবিশের হাত থেকে হুঁকোটা পড়ে গেল। সে আঁ-আঁ করে শব্দ করতে-করতে বসে পড়ল হঠাৎ।

ক্ষান্তমণি বলল, "আ মোলো যা! এ যে হঠাৎ ভিরমি খেতে লেগেছে। বলি, ও খাসনবিশ, তোর হল কী?"

খাসনবিশ হঠাৎ বিকট স্বরে "পালাও! পালাও!" বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে উঠে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল।

ক্ষান্তমণি হাঁ করে দৃশ্যটা দেখে বলল, গেল যা? এই দিনে দুপুরে ভূত দেখল নাকি রে বাবা! রাতবিরেতে দেখে, সে না হয় আমিও দেখি, কিন্তু দিনে-দুপুরে তো বাপু কখনও কেউ দেখেছে বলে শুনিনি।"

গগনবাবু একসময়ে মিলিটারিতে ছিলেন। রিটায়ার করে গাঁয়ে ফিরে এসে চাষবাসে মন দিয়েছিলেন।

গাঁয়ে এসে গগনবাবু লক্ষ করলেন, গাঁয়ে বীরের খুব অভাব। বেশিরভাগ ছেলেই রোগাপটকা, ভিতু, দুর্বল। তিনি ছেলেপুলেদের জড়ো করে রীতিমত মিলিটারি কায়দায় লেফ্‌ট রাইট, দৌড় এবং ব্যায়াম শেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু মুশকিল হল, ছেলেগুলোর ডিসিপ্লিনের বড় অভাব। একদিন এল তো তিনদিন এল না। তার ওপর মিলিটারি কায়দায় শক্ত ট্রেনিং তারা বেশি সহ্যও করতে পারছিল না। সুতরাং গগনবাবুর আখড়া থেকে ছেলেরা একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে পালাতে লাগল।

পাশেই মাইলগঞ্জে কিছুদিন কাইজার নামে একটা লোক এসে কুংফু আর ক্যারাটে শেখাতে শুরু করে। গাঁয়ের মেলা ছেলেপুলে গিয়ে কাইজারের আখড়ায় ভর্তি হয়ে মহানন্দে মার্শাল আর্ট শিখতে লেগেছে। গগনবাবু কুংফু, ক্যারাটে দু'চোখে দেখতে পারেন না। তাঁর ধারণা, ওসব শিখলে বীরের বদলে গুণ্ডা তৈরি হবে। কাইজারের ওপরেও তাই তাঁর খুব রাগ।

গগনবাবু সকালে বারান্দায় তাঁর ইজিচেয়ারে বসে আছেন। পুজোর ছুটিতে কয়েকদিনের জন্য তাঁর ছেলে গোবিন্দ আর নাতি পুটু আসায় তাঁর সময়টা ভালই কাটছে। পুটু সিঁড়িতে বসে বারান্দার ওপর একটা রিমোট কন্ট্রোল খেলনা-মোটরগাড়ি চালাচ্ছিল।

হঠাৎ পুটু বলল, "আচ্ছা দাদু, তুমি কখনও বাতাসা-দ্বীপে গেছ ?"

"যাইনি ! অনেকবার গেছি।"

"সেখানে কী আছে ?"

"কী আর থাকবে ! একটা ভাঙা বাড়ি আর গাছপালা।"

"আচ্ছা, বাতাসা-দ্বীপে কি ভূত আছে ?"

"ভূত ! ভূত আবার কী ?"

"খাসনবিশদাদা বলছিল সেখানে নাকি একটা খুব লম্বা ভূত আছে। দশ-বারো ফুট লম্বা।"

"খাসনবিশ নিজেই একটা ভূত। একসময়ে খাসনবিশও মিলিটারিতে চাকরি করত। তাতেও ওর ভয়ডর কিচ্ছু কাটেনি। আমাদের ক্ষ্যান্তদিদি আর খাসনবিশ প্রায়ই নাকি ভূত দেখে। ওদের কথা বাদ দাও।"

"কুনকে আর ভোলা বেজি ধরতে গিয়ে নাকি দেখেছে।"

"গাঁয়ের ছেলেরা কত কী দেখে ! ওসব বিশ্বাস না করাই ভাল। এদের শুধু ভয় আর ভয়। সত্যিকারের সাহসী ছেলে একটাও দেখতে পাই না।"

"আচ্ছা দাদু, জগাপাগলা নাকি সত্যিকারের পিস্তল দিয়ে একটা কাক মেরেছে।"

"ওটাও আষাঢ়ে গল্প। পিস্তল ও পাবে কোথায় ? পিস্তল কি ছেলের হাতের মোয়া ?"

"কিন্তু সবাই যে বলছে !"

"গাঁয়ে গুজবের অভাব কী ? এখানে কেউ ভূত দেখে, কেউ পরি নামায়, কেউ মন্ত্রতন্ত্রের জোরে আকাশে ওড়ে—কত কী শুনবে।"

ঠিক এই সময়ে ভেতরবাড়ি থেকে বাগানের ভেতর দিয়ে পড়ি-কি-মরি করে খাসনবিশ ছুটে এসে চিৎকার করতে লাগল, "বোমা ! বোমা ! কর্তা, শিগ্‌গির পালান..."

গগনবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, "কিসের বোমা ? কোথায় বোমা ?"

"বাড়ির ভেতরে। ক্ষ্যান্তমণি সেটা বঁটি দিয়ে কাটবার চেষ্টা করছে।"

কথাটা গগনবাবুর তেমন বিশ্বাস হল না। বললেন, "কীরকম

বোমা ?"

"আজ্ঞে গ্রেনেড। একেবারে মিলিটারি গ্রেনেড।"

গগনবাবু টপ করে উঠে দাড়ালেন। পুটুকে বললেন, "তুমি এখানেই থাকো। আমি আসছি।"

ভেতরবাড়িতে এসে গগনবাবু যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। ক্ষান্তমণি বারান্দার শানের ওপর একখানা হাত-দা দিয়ে বোমাটা কাটার জন্য উদ্যত হয়েছে।

গগনবাবু একটা পেল্লায় ধমক মারলেন, "অ্যাই ক্ষ্যান্ত! উঠে আয় বলছি!"

ক্ষান্তমণি গর্জন শুনে অবাক হয়ে বলল, "কী হল বলো তো তোমাদের! সকালবেলায় এত চেঁচামেচি কিসের?"

গগনবাবু দ্রুতপায়ে গিয়ে ক্ষান্তমণিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বোমাটা তুলে নিলেন। মিলিটারিদের হ্যান্ডগ্রেনেড। ভাগ্য ভাল, ফিউজটা অক্ষত আছে। ফাটলে এতক্ষণে ক্ষান্তমণি সহ বাড়ির খানিকটা অংশ উড়ে যেত।

ক্ষান্তমণি পড়ে গিয়ে চিলচ্যাঁচানি চেঁচাচ্ছিল, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে! মাজাটা যে ভেঙে সাত টুকরো হয়ে গেল বাপ! কোথায় যাব রে! কর্তাবাবুর যে মাথাখারাপ হয়ে গেছে! গিন্নিমা, শিগ্‌গির এসো!"

চেঁচামেচিতে গগনবাবুর স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং বাড়ির অন্য সবাই ছুটে এল। "কী হয়েছে! কী হয়েছে!" বলে মহা শোরগোল।

গগনবাবু ভ্রূ কুঁচকে গ্রেনেডটা দেখছিলেন। বললেন, "এটা তুই কোথায় পেলি?"

ক্ষান্তমণি কোঁকাতে-কোঁকাতে বলল, "কোথায় আর পাব! বাগানে শাক তুলতে গিয়ে দেখি কালো আনারসটা খেতের মধ্যে পড়ে আছে। তা তাতে কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েছে শুনি, যে এরকম রামধাক্কা দিয়ে আমার মাজাটা ভাঙলে! বুড়ো বয়সের ভাঙা হাড় কি আর জোড়া লাগবে?"

গগনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "তবু তো মাজার ওপর দিয়ে গেছে। আর একটু হলে তো উড়ে যেতি।"

হাঁফাতে-হাঁফাতে খাসনবিশ ফিরে এসে একবালতি জল তুলে আনল চৌবাচ্চা থেকে। গগনবাবু বোমাটা জলের মধ্যে রেখে বললেন, "মদন হাজরাকে ডেকে আন। যদিও সে খুব করিৎকর্মা লোক নয়, তবু জানানোটা আমাদের কর্তব্য।"

আধঘণ্টা বাদে মদন হাজরা সেপাইশাস্ত্রী নিয়ে কাহিল মুখে এসে হাজির হলেন। বললেন, "বিদ্যাধরপুরে এসব কী হচ্ছে মশাই? কাল এক পিস্তলের জের সামলাতে জেরবার হতে হয়েছে, এর ওপর আপনার বাড়িতে বোমা! লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে দিয়েছি মশাই, তিন মাস গিয়ে নয়নপুরে মাসির বাড়িতে থেকে আসব।"

জলে ভেজানো বোমাটা দেখে আতঙ্কিত হয়ে মদন হাজরা বললেন, "এ তো ডেঞ্জারাস জিনিস দেখছি।"

গগনবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মিলিটারিতে ব্যবহার হয়। হাইলি সেনসিটিভ।"

"তা এটা নিয়ে করব কী বলুন তো!"

"নিয়মমতো থানায় নিয়ে রাখতে হবে। তদন্ত করতে হবে।"

"ও বাবা! যদি ফেটেফুটে যায়?"

"ফিউজটা নাড়াচাড়া না করলে ফাটবার কথা নয়। বালতিসুদ্ধুই নিয়ে যান।"

মদন হাজরা চোখ বুজে ঠাকুর-দেবতাকে খানিকক্ষণ স্মরণ করে বললেন, "ওরে গুলবাগ সিং, নে বাবা, জয় সীতারাম বলে বালতিটা নিয়ে পেছনে-পেছনে আয়, একটু দূরে-দূরেই থাকিস বাপ। সবাই মিলে একসঙ্গে মরে তো লাভ নেই রে!"

গুলবাগ সিং যথেষ্ট সাহসী লোক। ডাকাবুকো বলে থানায় তার বেশ সুনাম আছে। গুলবাগ একটা তাচ্ছিল্যের "হুঁঃ" দিয়ে বালতিটা হাতে নিয়ে বলল, "চলুন।"

মদন হাজরা এবং অন্য সেপাইরা আগে-আগে, পেছনে গুলবাগ। কিন্তু পথে নেমেই গুলবাগ দেখল, মদন হাজরা আর সেপাইরা বড্ড জোরে হাঁটছে, হাঁটার চেয়ে দৌড়ই বলা ভাল। জলভরা বালতি নিয়ে ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া হুড়োহুড়ি করলে নড়াচড়ায় বোমাটা ফেটে যেতে পারে। তাই গুলবাগ ঠোঁট-মুখ কুঁচকে আস্তে-আস্তেই হাঁটতে লাগল। ইতিমধ্যে মদন হাজরা আর সেপাইরা এ ওকে পেছনে ফেলার চেষ্টা করতে-করতে প্রাণপণে দৌড়ে হাওয়া হয়ে গেল।

কানা কালীর মাঠের কাছে পথটা ভারী নির্জন। চারদিকে বন, ঝোপঝাড়। সেইখানে গাছতলায় সবুজ রঙের চেককাটা লুঙ্গি আর হাফহাতা গেঞ্জি গায়ে, খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা একটা লোক দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে ছিল। গুলবাগকে দেখে বলল, "সেপাইজি, সেলাম। তা ফাঁড়িতে কি জলের অভাব হয়েছে নাকি? টিউকলটা কি খারাপ?"

গুলবাগ রক্তচক্ষুতে একবার লোকটার দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, "আরে আমরা থাকতে আপনি কেন কষ্ট করবেন সেপাইজি? দিন, বয়ে দিয়ে আসি। আমরা পাঁচজন থাকতে এসব ছোট কাজ আপনারা করবেন কেন? ছিঃ ছিঃ, এ যে বড় লজ্জার কথা!"

প্রস্তাবটা গুলবাগের খুব খারাপ লাগল না। মালটা বইতে হবে না, তার ওপর বোমা ফাটলে এই ব্যাটার ওপর দিয়েই যাবে। তাই গুলবাগ বালতিটা লোকটার হাতে ছেড়ে দিল।

গুলবাগ আগে, লোকটা পেছনে। গুলবাগ মাঝে-মাঝে পেছনে তাকিয়ে লোকটাকে নজরে রাখছিল।

হঠাৎ লোকটা বলে উঠল, "সেপাইজি, বালতির মধ্যে ভুড়ভুড়ি কাটছে কী বলুন তো! ও বাবা! এ যে ঘুটঘুট করে কেমন একটা শব্দও হচ্ছে!"

"বাপ রে!" বলে গুলবাগ চোঁ-চোঁ দৌড় মারল।

খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা লোকটা একটু হেসে বালতি নিয়ে রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে নেমে গেল। বোমাটা বের করে বালতির জলটা ফেলে দিয়ে বালতিটা একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গুঁজে দিল। তারপর বোমাটা একটা ঝোলায় পুরে শিস দিতে দিতে জঙ্গলের ভেতরপথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুপুরের মধ্যেই সবুজ চেক লুঙ্গি পরা, হাতাওলা গেঞ্জি গায়ে আর খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা মোট সাতজনকে থানায় ধরে আনা হল।

গুলবাগ সিং প্রত্যেকটার মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে রক্তচক্ষুতে চেয়ে দেখল। এমনকী দিনের আলোতেও টর্চ ফোকাস করে খুঁটিয়ে নিরখ-পরখ করে তারও প্রত্যেককেই সেই লোকটা বলে মনে হতে লাগল। হাল ছেড়ে দিয়ে সে বলল, "বড়বাবু, এদের সবক'টাই বদমাশ বলে মনে হচ্ছে। সবক'টাকেই বরং হাজতে পুরে রাখি।"

এ-কথা শুনে সাতটা লোকই মহা শোরগোল তুলে ফেলল। তারা গতকাল এগারোজন বামাচরণের ঘটনা জানে। তারাও বলতে লাগল, "আমরা মানহানির মামলা আনব। ...সরকার বাহাদুরের কাছে বড়বাবুর নামে নালিশ জানাব... আমাদের এরকম নাহক হয়রানির জন্য মোটা টাকা না দিলে ছাড়ব না....ওরে ভাই, এতক্ষণে আমার দেড় মন মাছ পচে নষ্ট হয়ে গেল, কম করেও হাজার টাকা লোকসান.... আর আমার কী হবে, দোকান ফেলে এসেছি, এতক্ষণে সব লুটপাট হয়ে গেছে..."

মদন হাজরা কানে হাতচাপা দিয়ে বললেন, "ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, যেতে না চাইলে লাঠিচার্জ কর..."

ঠিক এই সময়ে ফের সরু হয়ে খুবই বিনীতভাবে রসময়

চক্রবর্তী এসে মদন হাজরার সামনে দাঁড়ালেন।

মদন হাজরা বলে উঠলেন, "আবার আপনি? আপনার আবার কী দরকার?"

রসময় হাতজোড় করে বললেন, "বড়বাবু, বেয়াদপি মাপ করবেন। বলছি কী, এ-সময়টায় মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা খুব দরকার!"

"মাথা ঠাণ্ডা রাখব? এসব ঘটলে কি মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায়?"

রসময় বিনীত হাসি হেসে চাপা গলায় বললেন, "যা শত্রু পরে পরে। বুঝলেন কিনা!"

"না, বুঝলাম না।"

"বলছি কী, বোমাটা যদি লোকটা নিয়েই গিয়ে থাকে তাতে একরকম ভালই হয়েছে। থানায় রাখলে কখন ফেটেফুটে থানাই হয়তো উড়ে যেত। তার চেয়ে ও আপদ বিদেয় হওয়াতে একরকম স্বস্তি। ফাটে তো সেই ব্যাটার কাছেই ফাটবে।"

মদন হাজরার মুখটা একটু উজ্জ্বল হল। বললেন, "বসুন ঠাকুরমশাই। বসুন। কথাটা খারাপ বলেননি। বোমাটা থানায় রাখলে বড় দুশ্চিন্তার ব্যাপার হত। সদরে খবর দিলে বম্ব এক্সপার্ট কবে আসবে তার জন্য বসে থাকতে হত। হয়তো ওই সর্বনেশে বোমা নিয়ে আমাকেই সদরে যাওয়ার হুকুম হত। নাঃ, আপনি ঠিকই বলেছেন! আর কিছু বলবেন? আপনি বেশ উপকারী কথা বলতে পারেন দেখছি!"

রসময় বিগলিত হয়ে বললেন, "চেষ্টা করি আর কি।"

"মাথায় কোনও ভাল কথা এলেই আমার কাছে চলে আসবেন।"

"যে আজ্ঞে। আর একটা কথা!"

"কী বলুন তো!"

"প্রতাপরাজার শূলটার কথা ভুলে যাননি তো বড়বাবু?"

"ওঃ, সেই দেড় মন ওজনের লোহার শূল তো, যেটা বামাচরণ জগাপাগলাকে চুরি করতে বলেছিল? না, ভুলিনি, কিন্তু শূলটার রহস্য কী বলুন তো!"

মাথা নেড়ে রসময় বললেন, "আমিও জানি না আজ্ঞে।"

॥ ৫ ॥

সন্ধেবেলা শিবমন্দিরের চাতালে দু'জন বসা। রসময় আর জগাপাগলা। সিঁড়ির নীচে কুকুর ভুলু। চারদিকটা অন্ধকারে বড্ড ছমছম করছে।

রসময় বললেন, "ও জগা, শুনেছ তো, গগনবাবুর বাড়ির বাগানে একখানা বোমা পাওয়া গেছে।"

"বোমা! বলেন কী ঠাকুরমশাই?"

"হ্যাঁ গো, যে-সে বোমা নয়, মিলিটারি বোমা। সাঙ্ঘাতিক জিনিস। দেখতে অনেকটা আনারসের মতো।"

জগা একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, "আনারসের মতো দেখতে! সেটা বোমা হতে যাবে কোন দুঃখে? সেটা তো স্বপ্ন তৈরির কল!"

রসময় অবাক হয়ে বললেন, "স্বপ্ন তৈরির কল? সে আবার কী জিনিস?"

জগা একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে পরেশবাবু তৈরি করেছেন। খুব মজার জিনিস।"

রসময় অবাক হয়ে বলেন, "পরেশবাবুটা কে?"

"ভারী ভাল লোক। জিলিপি খাওয়ার জন্য পয়সা দিয়ে গেছেন।"

"তার সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?"

জগা মাথা চুলকে বলল, "বড্ড মুশকিলে ফেললেন। বলা বারণ কি না। তবে আপনি বলেই বলছি। পাঁচ কান করবেন না।"

"পাঁচ কান করব কেন? বলে কেন?"

"আজ্ঞে, আমি তো কুন্ডুদের কাছারিঘরের বারান্দায় শুই, তা সেখানেই দেখা।"

"ঘটনাটা খোলসা করে বলো।"

"পরশু রাতে শুয়ে আছি মুড়িসুড়ি দিয়ে। একটা ভারী ভাল স্বপ্নও দেখছিলুম। এক রাজবাড়িতে ভোজ হচ্ছে। আর আমার পাতে একজন লোক গরম-গরম জিলিপির পর জিলিপি দিয়ে যাচ্ছে। দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যচ্ছে। দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। ওঃ সে একেবারে জিলিপির পাহাড় হয়ে গেল।"

"তারপর?"

"ওই সময়েই পরেশবাবু এসে ঠেলে তুললেন, 'ও জগা, ওঠো ওঠো!' তা উঠে ভারী রাগ হল। বললুম, 'মশাই, দিলেন তো জিলিপির স্বপ্নটার বারোটা বাজিয়ে! তিন-চারটে খেয়েছি কি না-খেয়েছি অমনই কাঁচা ঘুমটা ভাঙালেন! কত জিলিপি বাকি রয়ে গেল বলুন তো!' তখন পরেশবাবু খুব হাসলেন। বললেন, 'স্বপ্ন দেখতে চাও, তার আর ভাবনা কী? তোমাকে এমন একটা কল দিচ্ছি যা থেকে কেবল রোজ জিলিপির স্বপ্নই বেরিয়ে আসবে। রোজ সারারাত ধরে কত খাবে খাও।'"

"বটে!"

"তবে আর বলছি কী! কলটা শুধু মাথার কাছে রেখে শুলেই হবে।"

"তারপর?"

"তা পরেশবাবু একটা নয়, দু-দুটো কল আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'শোনো জগা, এই বাঁ হাতেরটা তোমার। এটাতে শুধু জিলিপির স্বপ্ন ভরা আছে।'"

জগা একটু থামতেই রসময় বলে উঠলেন, "আর একটা?"

জগা মাথা চুলকে বলল, "আপনাকে বলেই বলছি। পাঁচ কান করবেন না। আর-একটা কলে ভূতের স্বপ্ন পোরা ছিল। পরেশবাবু বললেন, 'জানো তো, দু'পাতা সায়েন্স পড়ে নাস্তিকরা আর ভূতপ্রেত মানে না! ওই গগনবাবু আর তার ছেলে গোবিন্দ ভারী নাস্তিক। এই তো সেদিন বাতাসা-দ্বীপের ঢ্যাঙা ভূতের কথা বলতে গিয়েছিলাম, তা এমন হাসিঠাট্টা করল যে, বলার নয়! তাই ওদের একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কলটা বানিয়েছি। চুপিচুপি গিয়ে গগনবাবুর ঘরে রেখে আসলেই হবে। রাখার আগে কলের গায়ে একটা জিনিস কামড়ে ছিঁড়ে দিতে হবে। দেখবে প্রতি রাতে বিটকেল সব ভূতের স্বপ্ন দেখে বাপ-ব্যাটা কেমন চেঁচামেচি লাগায়।'"

"তারপর?"

"তা আজ্ঞে, গগনবাবুর ওপর আমারও একটু রাগ আছে। মেয়ের বিয়েতে ভোজ খেতে গিয়েছিলুম। তিনবার লাইন থেকে তুলে দিল, বলল, পরের ব্যাচে বসিস। তা শেষে বসলুম বটে, কিন্তু ঘ্যাটম্যাট ছাড়া কিছুই জুটল না। শেষ পাতে লালমোহনটা অবধি দিলেন না। কী অবিচার বলুন তো!"

"তা অবশ্য ঠিক।"

"তাই আমি পরেশবাবুর কথামতো কলটা রেখে আসতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ওদের কুকুরটা এমন তাড়া করল যে, ভয়ে বাগানে ফেলে আসি।"

"অ। তা তোমার কলটা কই?"

"কেন, এই যে আমার ঝোলার মধ্যে!" বলতে-বলতে জগা তার ঝোলায় হাত পুরে কালো আনারসটা বের করে এনে রসময়কে দেখিয়ে একগাল হেসে বলল, "রোজ শিয়রে নিয়ে শুই। কাল রাতেও খুব জিবেগজা খাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি মশাই। মনে হয় পরেশবাবু ভুল করে একটা জিবেগজার কলই দিয়ে গেছেন। তা জিবেগজাই বা খারাপ কী বলুন!"

জিনিসটা দেখে রসময়ের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়! তবে

তিনি মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে বললেন, "ঠিক আছে, ওটা ঝোলায় রেখে দাও সাবধানে। বেশি নাড়াচাড়া করা ভাল নয়। ওতে জিবেগজার খুব ক্ষতি হয়।"

জগা সাবধানেই জিনিসটা পুরে রাখার পর রসময় বললেন, "এবার বলো তো, পরেশবাবুটা কে ?"

জগা জুলজুল করে চেয়ে বলে, "আজ্ঞে পরেশবাবু খুব ভাল লোক। আমাকে জিলিপি খেতে পাঁচটা টাকাও দিয়েছেন। বলেছেন, 'স্বপ্নের জিলিপি খাওয়া ভাল, আবার জেগে খাওয়াও ভাল।'"

"সে তো বুঝলুম। কিন্তু লোকটা থাকে কোথায় ?"

মাথা নেড়ে জগা বলে, "তা জানি না।"

"দেখতে কেমন ?"

"আজ্ঞে, বেঁটেমতো। মাথায় টাক আছে।"

"ঠিক তো ! পরে আবার গুলিয়ে ফেলো না। বামাচরণকে নিয়ে যা করলে সেটা তো যাচ্ছেতাই ব্যাপার।"

"আজ্ঞে না, এবার আর গণ্ডগোল পাবেন না। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। এই আপনার মতোই নাটা মানুষ !"

রসময় ভারী অবাক হয়ে বলে, "আমি আবার নাটা হলাম কবে থেকে ? সবাই তো বলে আমি একজন লম্বা মানুষ।"

"অ্যাঁ, আপনি বেঁটে নন ?"

"কস্মিনকালেও না।"

ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁস করে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে জগা বলল, "তা হলে তো বড্ড মুশকিলে ফেললেন ঠাকুরমশাই। আমি যে আপনাকে বেঁটে বলেই জানতুম। আপনি বেঁটে, মহেশবাবু বেঁটে, ফটিকবাবু বেঁটে, খাসনবিশ বেঁটে।"

রসময় বললেন, "তুমি যে মুড়ি-মিছরির এক দর করে ফেললে হে ! ফটিকবাবু বেঁটে হলেও মহেশবাবু বেশ লম্বা। আর খাসনবিশ মাঝারি।"

জগা জুলজুল করে চেয়ে বলল, "বড্ড ভাবনায় ফেললেন ঠাকুরমশাই। এখনও খিচুড়ির ব্যাপারটাই মেটেনি, মাথায় আবার নতুন একটা ভাবনা ঢুকল।"

"ভাল করে ভেবে বলো তো, পরেশবাবু বেঁটে, না লম্বা।"

জগা খুব লজ্জিত মুখে বলে, "লম্বাই হবেন বোধ হয়।"

"গোঁফ আছে ?"

"থাকার কথা নাকি ঠাকুরমশাই ? তা হলে আছে।"

"নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না দেখছি।"

"এইজন্যই তো আমি একটা চশমা চাইছি। চশমা চোখে দিলে বাহারও হয়, আর লম্বা না বেঁটে, কালো না ধলো তাও ঠাহর হয়। কিন্তু কেউ চশমা দিচ্ছে না মশাই। ফটিকবাবুকে বললুম, 'আপনার মা তো গত হয়েছেন, তাঁর চশমাজোড়া আমাকে দিন।' তা তিনি খ্যাঁচ করে উঠলেন, 'সোনার চশমা তোমাকে দিই আর কি !' মহেশবাবুকেও বলেছিলুম, 'আপনার তো দু'জোড়া চশমা, দিলেনই না হয় আমাকে একজোড়া।' তা ভ্যাল-ভ্যাল করে চেয়ে থাকেন, কথা কানেই তোলেন না। এরকম হলে তো আমার চলে না মশাই। চশমা ছাড়া বড়ই অসুবিধে হচ্ছে।"

রসময় লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, "চলো হে জগা, ঝোলাটা সাবধানে কাঁধে ঝুলিয়ে নাও। দেখো, পড়ে টড়ে না যায়। স্বপ্নের ফলে চোট লাগা ভাল নয়।"

জগা ঝোলা নিয়ে উঠল। বলল, "চশমার কথাটা একটু খেয়াল রাখবেন ঠাকুরমশাই।"

"খুব রাখব। হ্যাঁ, ভাল কথা। আজও কি কুনকেদের বারান্দাতেই রাতে শোবে নাকি ?"

ঘনঘন মাথা নেড়ে জগা বলল, "না মশাই, না। রোজ-রোজ এক বাড়িতে শুলে কি আমার চলে ! আমার পাঁচজনকে দেখতে

হয় যে। আজ ভাবছি ফটিকবাবুর বারান্দায় শোব।"

"বেশ, বেশ।"

জগা খুশি হয়ে বলল, "ফটিকবাবুর বারান্দা বেশ জায়গা। উলটো দিকে ফলসা বনে নিশুত রাতে জ্যোৎস্না উঠলে পরিরা আসে। উড়ে-উড়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। তারা লোকও খুব ভাল।"

"তাই নাকি? ভাল, ভাল।"

বাঁশবনের ভেতরকার নির্জন কাঁচা রাস্তাটা পেরিয়ে জগা বাঁ দিকে ফটিকবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হল। রসময় ডান দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন।

মদন দারোগা তাঁকে দেখে ভারী খুশি হয়ে বললেন, "আরে, আসুন, আসুন রসময়বাবু, ভাল কথা, কিছু মনে পড়ল নাকি? আপনার কাছে ভাল-ভাল কথা শুনব বলেই বসে আছি। তা বলুন তো মশাই, কয়েকটা মোক্ষম ভাল কথা।"

রসময় প্রথমে মাথা চুলকোলেন, তারপর হাত কচলে বললেন, "আজ্ঞে বড়বাবু, ভাল কথা কিছুই মনে আসছে না।"

"আহা, একটু বসুন, একটু ভাবুন, ঠিক মনে পড়ে যাবে।"

"যে আজ্ঞে। তবে কিনা বসার একটু অসুবিধে আছে।"

"কেন বলুন তো! ফোড়া-টোড়া হয়েছে নাকি? কিংবা হাঁটুতে বাত?"

ভারী বিনয়ের সঙ্গে রসময় বললেন, "আজ্ঞে, সে বরং ভাল ছিল। এ তার চেয়েও মারাত্মক। জগাপাগলা তার ঝোলার মধ্যে একখানা বোমা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"সর্বনাশ! আবার বোমা! এই কি আপনার ভাল কথা? বোমা সে পেল কোথায়?"

"আজ্ঞে, পরেশবাবু বলে কে একজন মাঝরাতে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে গছিয়ে গেছে।"

মদন হাজরা আতঙ্কিত হয়ে বললেন, "সর্বনাশ? আবার এগারোজন পরেশবাবুকে ধরে আনতে হবে নাকি! এ তো বড় ঝামেলাই হল দেখছি! জানেন মশাই, এগারোজন বামাচরণ আমার নামে মানহানির মামলা করবে বলে উকিলের চিঠি দিয়েছে। শুধু কি তাই? সবুজ চেক লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা সাতটা লোক রোজ এসে ক্ষতিপূরণের জন্য ঘ্যানঘ্যান করছে।"

"খুবই দুঃখের কথা বড়বাবু, আপনাদের জীবনটা তো এরকম। পরের জন্য এত করেন, তবু কেউ গুণের কথা বলে না। কেবল দোষ খুঁজে বের করে।"

"বাঃ! এই তো একটা ভাল কথা বললেন! বাঃ বাঃ! এ তো চমৎকার কথা! শুনে মনটা ভাল হয়ে গেল মশাই। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন!"

"আজ্ঞে, জগাপাগলার ঝোলার মধ্যে একখানা মিলিটারি বোমা ফাটো-ফাটো করছে। এই ফাটে কি সেই ফাটে অবস্থা।"

মদন হাজরা লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "কোথায় জগা? অ্যাঁ! কোথায় সে? ওরে গুলবাগ সিং, সেপাই-টেপাই নিয়ে যা তো বাবা, ব্যাটাকে একেবারে হাতকড়া দিয়ে ধরে আন।"

রসময় হাত কচলে বললেন, "আজ্ঞে বড়বাবু, জগাকে ধরে আনলে তেমন কাজ হবে না। বরং কাজটা কেঁচে যাবে।"

মদন হাজরা ধপ করে বসে পড়ে বললেন, "আপনি বোধ হয় আরও একটা ভাল কথা বলতে চাইছেন! তা হলে বলেই ফেলুন।"

"আজ্ঞে, ভাল কিনা জানি না। আমাদের মাথায় যা আসে বলে ফেলি। তা ভাল না মন্দ সেটা আপনার মতো দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা বিচার করবেন।"

মদন হাজরা খুশি হয়ে বললেন, "বাঃ এটাও ভাল কথা! এবার বলুন।"

"বলছিলাম কি, ধরপাকড় না করে বরং জগার ওপর নজর রাখলে ওই পরেশবাবু বা বামাচরণ যে-ই হোক, তাকে ধরে ফেলা যাবে। জগা নির্দোষ, বোমা-বন্দুক সে চেনে না। তাকে পাগল পেয়ে কেউ আড়াল থেকে এসব করাচ্ছে।"

মদন হাজরা ভাবিত হয়ে বললেন, "হুম, তা লোকটা কে?"

"হয় বামাচরণ, নয় তো পরেশবাবু।"

গগনবাবুর বাড়ির বোমাটা যে জগাপাগলাই রেখে এসেছিল তা আর রসময় ভাঙলেন না। তা হলে জগার কপালে দুঃখ ছিল।

মদন হাজরা দুলে-দুলে কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "খুবই চিন্তার কথা। কিন্তু বোমাটা যে ওর কাছে রয়েছে, সেটা যে সরানো দরকার। গ্রেফতার না করলে—"

রসময় ঘাড় চুলকে ভারী বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আজ্ঞে, জগা আজ ফটিকবাবুর বারান্দায় শুয়েছে। আমাকে যদি দশ মিনিট সময় দেন তা হলে আমি গিয়ে বোমাটা সরিয়ে ফেলব। অবশ্য যদি আপনার মত থাকে।"

মদন হাজরা একগাল হেসে বললেন, "খুব মত আছে। খুব মত আছে। বোমাটোমা থানায় রাখা বড্ড ঝকমারি মশাই। আপনি বরং বেরিয়ে পড়ুন। আমরা আধঘণ্টা বাদে যাচ্ছি।"

"যে আজ্ঞে," বলে রসময় বেরিয়ে পড়লেন।

বেশ জোর কদমেই হেঁটে যাচ্ছিলেন রসময়। ফটিকবাবুর বাড়ির কিছু আগে হাপু ডাইনির মোড়। জায়গাটা খুব নির্জন। চারদিকে ঝোপঝাড়।"

হঠাৎ কে যেন অন্ধকার থেকে বলে উঠল, "ঠাকুরমশাই নাকি?"

রসময় বললেন, "হ্যাঁ।"

"একটু উপকার করতে হবে যে ঠাকুরমশাই। আমার বাড়িতে আজ লক্ষ্মীপুজো, দুটো ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে যেতে হবে যে!"

"পাগল নাকি? আমি আজ বড় ব্যস্ত। জীবন-মরণ সংশয় হে বাপু, ওই পাঁচালি-টাঁচালি পড়ে চালিয়ে নাওগে যাও। আমার আজ সময় হবে না।"

লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। লণ্ঠনের আওতার বাইরে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ানো। বলল, "তাই কি হয়? আমার বউ যে সকাল থেকে নির্জলা উপোস করে বসে আছে। পুজো না হলে জলটুকুও খাবে না।"

রসময় বললেন, "তা সেটা আগে বলোনি কেন? হঠাৎ করে এসে পথ আটকালে তো হবে না! আমি জরুরি কাজে যাচ্ছি।"

"আজ্ঞে, এ-কাজটাও কম জরুরি নয়। মালক্ষ্মী কুপিত হলে তো শুধু আমাদের ওপরেই হবেন না, পুজারীর ওপরেও হবেন। ঠাকুরমশাইয়ের কি সর্পভয়ও নেই নাকি?"

"ওঃ, জ্বালালে দেখছি!"

"আজ্ঞে, বেশিক্ষণ তো নয়। পাঁচটা মিনিট একটু অংবং বলে দুটো ফুল ফেলে চলে আসবেন।"

"ঠিক আছে বাপু, চলো। তা তোমার বাড়িটা কোথায়?"

"এই যে এদিকে।"

লণ্ঠনের আলোটা বড়ই কমজোরি। তাতে লোকটাকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। আগে-আগে হাঁটছে। পথ ছেড়ে একেবারে মাঠঘাট দিয়ে চলেছে।

"কই হে? কোথায়?" রসময় হাঁক মারলেন।

"এই যে আর একটু।"

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ রসময় থমকে দাঁড়ালেন। "সর্বনাশ!"

॥ ৬ ॥

ফটিকবাবুর বারান্দাটা বেশ চওড়া। জগা তার চট আর ছেঁড়া চাদরখানা যত্ন করে পেতে বিছানা করে ফেলল। ঝোলাখানাকে

বালিশ করে শুয়ে পড়লেই হল ! আজ মহেশবাবুর মায়ের কী একটা পুজো ছিল। ভরপেট খিচুড়ি খাইয়েছে। পেট ঠাণ্ডা থাকলে ঘুমটাও বেশ ভাল হয়।

জগা একটা হাই তুলল, তারপর স্বপ্নের কলটা ঝোলা থেকে বের করে মাথার পাশে রেখে শুয়ে পড়ল। পরেশবাবু কলটা ভুলই দিয়েছেন। জিলিপির বদলে জিবেগজার কল। তা হোক, জিবেগজাও তার দিব্যি লাগে।

এসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে যখন ঘুমটা বেশ ঘনিয়ে আসছে সেই সময়ে লোকটা এল।

"এই যে জগা ! কী খবর ?"

জগা বিরক্ত হয়ে বলল, "ইস্ জিবেগজার স্বপ্নটা এইবারই শুরু হতে যাচ্ছিল, তা দিলেন তো বারোটা বাজিয়ে ?"

লোকটা অবাক হয়ে বলল, "জিবেগজা ! জিবেগজা হবে কেন ? জিলিপি নয় ?"

জগা এবার টপ করে উঠে বসে বলল, "আপনি কি পরেশবাবু ?"

"হ্যাঁ, আমিই পরেশবাবু, তবে অনেকে নফরচন্দ্রও বলে।"

জগা খুশি হয়ে বলে, "আজ্ঞে, কলটা আপনি ভুলই দিয়েছেন বটে ! এটা মোটেই জিলিপির কল নয়, জিবেগজার কল।"

"এঃ হেঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো তা হলে ! দাও তা হলে ওটা বদলে দিই।"

"জিবেগজাও বেশ লাগছে কিন্তু !"

"আরে দুর ! এবার তোমাকে রাজভোগের কল দিয়ে যাব। রাজভোগের কাছে কি আর জিবেগজা বা জিলিপি লাগে ?"

"তা সত্যি ! রাজভোগ হলে তো কথাই নেই।"

"তা ইয়ে, সেই কলটা গগনবাবুর ঘরে রেখে আসতে পারোনি বুঝি !"

"আজ্ঞে কী করি বলুন ! কুকুরে এমন তাড়া করল যে, পালিয়ে বাঁচি না, তা বাগানে ফেলে এসেছিলুম। তারপর কী যেন গণ্ডগোল হয়েছে।"

লোকটা ভালমানুষের মতো বলল, "তাতে কী ? এবার এমন ব্যবস্থা করে দেব যে, আর কাজ ভণ্ডুল হওয়ার জো নেই। এই যে দেখছ আমার হাতে, এটা হল ভূতযন্ত্র।"

জগা অবাক হয়ে দেখল, লোকটার হাতে কালোমতো বিটকেল একটা যন্তর বটে !

জগা বলে, "আজ্ঞে দ্রব্যটা কী ?"

"এর ভেতর থেকে ভূত বেরোয়।"

"ওরে বাপ রে !"

"ভয় পেয়ো না। যন্ত্র যার হাতে থাকে ভূত তার ক্ষতি করে না।"

"বটে !"

"এই যন্তরটা নিয়ে রাত নিশুত হলে গগনবাবুর বাড়িতে যাবে। দক্ষিণের ঘরে গগনবাবু শোয়। জানো তো ?"

"খুব জানি।"

পরেশবাবু খিকখিক করে হেসে বললেন, "এবার আর স্বপ্ন নয়, গগনবাবুর ঘরে একেবারে জ্যান্ত ভূত ছেড়ে দিয়ে আসবে। এই যে দেখছ নল, এটা গগনবাবুর মাথার দিকে তাক করে এই যে ঘোড়াটা দেখছ এটা টিপে ধরবে। অমনই দেখবে একটা ঝলকানি দিয়ে আর শব্দ করে যন্ত্র থেকে ভূতের পর ভূত গিয়ে ঘরের মধ্যে কেমন নাচানাচি আর লাফালাফি করে। ব্যস, ওখানে কয়েকটা ভূত ছেড়ে দিয়েই পালিয়ে আসবে।"

জগা মাথা চুলকে বলল, "কুকুরটা যে তেড়ে আসে মশাই। আমি কুকুরকে বড্ড ভয় পাই।"

"সেই ব্যবস্থাও আছে। এই যে প্লাস্টিকের ব্যাগে একটুকরো মাংস দেখছ, কুকুরটা এলেই মাংসের টুকরোটা বের করে ছুড়ে দিয়ো। খেয়েই কুকুরটা নেতিয়ে পড়বে। তারপর আর ভয়টা কাকে ? ভূতটা ছেড়ে দিয়েই চলে আসবে, পারবে না ? সোজা কাজ। আর এই নাও কুড়িটা টাকা, কাল ভূপতির দোকানে গরম-গরম লুচি আর হালুয়া খেয়ো।"

জগা খুশি হয়ে টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে বলল, "খুবই সোজা-সোজা কাজ দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে শক্ত কাজও দেবেন।"

"সে আর বেশি কথা কী ? তোমার মতো যোগ্য লোক আর আছেটাই বা কে ! তা আজ রাতেই একটা শক্ত কাজ করবে নাকি ? যদি করো তো আরও কুড়িটা টাকা আগাম দিয়ে যাই।"

"আজ্ঞে, কী যে বলেন ! শক্ত কাজ না পারার কী আছে মশাই ! সারাদিন আমি কত শক্ত-শক্ত কাজ করে বেড়াই। এই ধরুন, গাছে উঠে পড়লুম, ফের নেমে এলুম। তারপর ধরুন এই এত বড় একটা ঢিল তুলে ওই দূরে ছুড়ে দিলুম। তারপর ধরুন, দুধসায়র থেকে ঘটির পর ঘটি জল তুলে ফের দুধসায়রেই ঢেলে দিলুম।"

"বাঃ, এসব তো অতি কঠিন কাজ।"

"তা হলেই বলুন।"

"বলেই ফেলি তবে, কেমন ? গগনবাবুর ঘরে ভূত ছেড়ে দিয়েই তুমি ভূত-যন্ত্রটা নিয়ে সোজা রাজবাড়িতে চলে যাবে।"

"তা গেলুম।"

"গিয়ে হরুয়া আর তার ভাই কেলোকে দেখতে পাবে। রাতে দু'জনেই থাকে। যন্ত্রটা তুলে ঘোড়া টিপে ধরে থাকবে, দেখবে গোল্লা-গোল্লা ভূত গিয়ে ওদের এমন তাড়া করবে যে, ভয়ে দু'জনে মাটিতে কুমড়ো-গড়াগড়ি যাবে। সেই ফাঁকে হরুয়ার ট্যাঁক থেকে চাবিটা সরাতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না। হবে নাকি ?"

"আরে না, না, এ তো সোজা কাজ।"

"ব্যস, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। চাবিটা হাতে নিলেই আমি হাজির হয়ে যাব।"

জগা একটু ক্ষুব্ধস্বরে বলল, "কেন, শূলটা নিয়ে গিয়ে দুধসায়রের দ্বীপে রেখে আসতে হবে না ? বামাচরণবাবুর সঙ্গে সেরকমই তো কথা ছিল।"

"না, না, সেসব আমিই করব'খন।"

"তা হলে কাজটা যে বেজায় সোজা হয়ে যাচ্ছে !"

পরেশবাবু একটু চিন্তিত হয়ে বলেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখব'খন।"

"ভাবাভাবির কী আছে পরেশবাবু ? পটল জেলের নৌকোটা ঘাটে বাঁধাই থাকে। শূলটা নৌকোয় চাপিয়ে বৈঠা মেরে পৌঁছে দেব'খন।"

পরেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আর দেরি করা ঠিক হবে না হে জগা। রওনা হওয়া যাক।"

"এই যাচ্ছি। আচ্ছা পরেশবাবু, আপনি লম্বা না বেঁটে ?"

"কেন বলো তো ?"

"ঠাকুরমশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন। তা আমি বললুম, বেঁটে। কিন্তু উনি বলছেন, লম্বা। কোনটা ঠিক ?"

"তোমার কথাই ঠিক। আমি বেজায় বেঁটে। তা হলে এবার বেরিয়ে পড়ো হে।"

"যে আজ্ঞে।" বলে যন্ত্র হাতে নিয়ে জগা রওনা হতেই পরেশবাবু টপ করে ঝোলা থেকে বোমাটা বের করে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

আরও মিনিটদশেক বাদে হাঁফাতে-হাঁফাতে রসময় এসে হাজির হলেন। একটু দেরিই হয়ে গেছে তাঁর। লোকটা তাঁকে ভুলিয়েভালিয়ে মেঠো রাস্তায় অনেকদূর নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। আচমকাই রসময়ের খেয়াল হল, এটা একটা কৌশল নয় তো !

তাঁকে বেকায়দায় ফেলে অন্যদিকে কাজ বাগিয়ে নেওয়ার মতলব। বুঝতে পেরেই তিনি আর দাঁড়াননি। তবে পথে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে এবং রাস্তা ভুল করে একটু সময় বেশিই লেগে গেল।

রসময় জগাকে তার বিছানায় না দেখে আশপাশে খুঁজলেন। লণ্ঠনের তেল ফুরিয়ে অনেকক্ষণ নিভে গেছে। অন্ধকারে কোথায় আর খুঁজবেন!

বেশ কয়েকবার, "জগা, জগা!" বলে হাঁক মারলেন। কারও সাড়া পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি গিয়ে জগার ঝোলাটায় হাত ভরে দেখলেন, বোমাটাও নেই।

কপাল চাপড়ে রসময় আপনমনেই বললেন, "নিয়তি কেন বাধ্যতে।"

সঙ্গে-সঙ্গে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল রসময়ের পায়ের কাছে।

মদন হাজরা বলে উঠলেন, "কী শ্লোকটা বললেন ঠাকুরমশাই?"

"এই আজ্ঞে বলছিলুম কি, নিয়তি কেন বাধ্যতে!"

"আহা হা, অপূর্ব! অপূর্ব! এইসব ভাল-ভাল কথা ছাড়া কি আপনাকে মানায়! লাখ কথার এক কথা। আমিও তো তাই বলি, ওরে পাপীতাপীরা, নিয়তি কেন বাধ্যতে। তোদের নিয়তিই তোদের খাবে রে বাপু! তবে কেন যে আমাদের এত হয়রান করিস, এত দৌড়ঝাঁপ করাস, হেদিয়ে মারিস, তা বুঝি না বাবা। ঠিক নয় ঠাকুরমশাই?"

"আজ্ঞে, আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আপনার মুখ থেকে কি ভুল কথা বেরোতে পারে?"

"তা আপনার জগা কোথায়?"

"সেটাই তো সমস্যা। তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তার মানে! সে গেল কোথায়?"

রসময় সরু গলায় বললেন, "বড়বাবু, আমার মনটা বড় কু গাইছে।"

"কু গাইছে! তার মানে কী?"

"আজ্ঞে, খারাপ কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে।"

"ওঃ তাই বলুন! আমি ভাবলাম এই রাতে আপনার বুঝি গানবাজনার শখ হল। কিন্তু কু গাইছে কেন?"

"আজ্ঞে, আমি বড় ভিতু মানুষ, আপনার মতো ডাকাবুকো নই তো! অল্পেই বড় ঘাবড়ে যাই। তা ইয়ে, জগার ঝোলার মধ্যে বোমাটাও নেই।"

"অ্যাঁ! তা হলে কি সে বোমা নিয়ে খুনখারাপি করতে বেরিয়ে পড়েছে? এ তো বিপদের কথা হল মশাই! ওরে, তোরা সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়, জগাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

সেপাইরা তাড়াতাড়ি যে যেদিকে পারে দৌড় লাগাল।

মদন হাজরা রসময়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা ঠাকুরমশাই, ভূত বলে কি কিছু আছে?"

রসময় অবাক হয়ে বলেন, "আজ্ঞে, কখনও দেখিনি। তবে আছে বলেই তো শুনি। কেন বলুন তো বড়বাবু?"

মদন হাজরা মাথা নেড়ে বললেন, "আমি ভূতটুতে মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু কয়েকটা ছেলে গতকাল বাতাসা-দ্বীপে পেয়ারা পাড়তে গিয়েছিল। সেখানে নাকি তারা একটা লম্বা সাদা ভূত দেখে ভয়ে পালিয়ে আসে। এদের মধ্যে আমার ছেলেও ছিল। কয়েকজন জেলেও বলছে, তারা দুধসায়রে মাছ ধরার সময় একটা ঢ্যাঙা ভূতকে বাতাসা-দ্বীপে দেখতে পায় মাঝে-মাঝে। ভয়ে আর কেউ দ্বীপটার কাছে যায় না। ভাবছি, কাল একবার সরেজমিনে হানা দিয়ে দেখে আসি।"

"যে আজ্ঞে। গেলেই হয়। তবে কিনা আপনাকে যেতে দেখলে ভূত কি আর বাতাসা-দ্বীপে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে থাকবে

বড়বাবু ? তারও কি ভয়ডর নেই !"

"পালাবে বলছেন ?"

মাথা নেড়ে রসময় বললেন, "ভূতপ্রেত বলে তো আর তাদের ঘাড়ে দুটো করে মাথা গজায়নি যে, আপনার সঙ্গে মোকাবেলা করতে যাবে।"

কথাটায় বাড়াবাড়ি থাকলেও মদন হাজরা খুশিই হলেন। বললেন, "তা হলে আর গিয়ে লাভ কী ?"

"কিছু না, কিছু না।"

বাতাসা-দ্বীপের ভূতের কথা রসময়ও জানেন। তিনি এও জানেন, মদন হাজরা গিয়ে হাল্লা মাচিয়ে যা করবেন তাতে ভূতের কিছুই হবে না। বরং সাবধান হয়ে যাবে।

মদন হাজরা বিদায় নেওয়ার পর রসময় বারান্দায় বসে গভীর চিন্তা করলেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা কিছু যেন টিকটিক করছে। ঠিক করতে পারছেন না।

জগা পাগলাকে পিস্তল দেওয়া হল বাঘ মারার জন্য ? নাকি মানুষ মারার জন্য ? শূলটা চুরি করতে গেলে জগা পাগলাকে গুলি চালাতেই হত। তা হলে কে মারা পড়ত ? হরুয়া। বোমাটা গগনবাবুর ঘরে রেখে আসতে বলা হয়েছিল। কে মারা পড়ত ? গগনবাবু। তা হলে একটা লোক কি আড়ালে থেকে দু-দুটো লোককে খুন করাতে চায় ? তবে নিজে করছে না কেন ? বোমা পিস্তল যখন আছে, তখন নিজেই তো খুন করতে পারে, জগাকে কাজে লাগাতে চাইছে কেন ?

ভাবতে-ভাবতে মাথাটা বড্ড গরম হয়ে গেল।

জগা এখনও আসছে না। বোমাটাও ঝোলায় নেই। তা হলে কি জগাকে ফের কাউকে খুন করতে পাঠানো হল ? এখানে এসে পৌঁছতে রসময়ের অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার কারণ একটা লোক তাঁকে ভুলিয়েভালিয়ে অনেক দূরে নিয়ে ফেলেছিল। ওই লোকটাই কি পরেশবাবু ? কিংবা বামাচরণ ? ইতিমধ্যে পরেশবাবু কিংবা বামাচরণ এসে কি জগার মাথায় আরও একটা আষাঢ়ে গল্প ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে ?

রসময় তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তিনি কি আগে হরুয়ার কাছে যাবেন ? না কি গগনবাবুর কাছে ? রসময় প্রথমটায় হরুয়ার কাছে যাবেন বলে রাজবাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। তারপর ভাবলেন হরুয়া ডাকাবুকো লোক, রাত জেগে পাহারা দেয়। সুতরাং তার তত ভয় নেই। কিন্তু গগনবাবু বুড়ো মানুষ, ঘুমোচ্ছেন, তাঁরই বিপদ বেশি।

রসময় ফিরে গগনবাবুর বাড়ির দিকেই দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগলেন। লণ্ঠন নেভানো, পথও অন্ধকার বলে রসময় খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছেন না। তবুও যথাসাধ্য পা চালিয়ে প্রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়লেন।

তারপরই হাঁক মারলেন, "জগা ?"

সঙ্গে-সঙ্গে কে একটা লোক উলটোদিক থেকে এসে তাঁর ঘাড়ে সবেগে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেলেন রসময় চক্রবর্তী। মাজায় এমন মট করে উঠল যে, বলার নয়। কনুই দুটোও ব্যথায় ঝনঝন করে উঠল।

অন্ধকারে লোকটা বলে উঠল, "দেখতে পান না ? কানা নাকি ?"

রসময়ের কানে গলার স্বরটা চেনা-চেনা ঠেকল। কার গলা এটা ? আরে ! এই লোকটাই না তাঁকে লক্ষ্মীপুজোর নাম করে ভুলিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল ?

রসময় লোকটাকে একবার দেখতে চান। তাই কৌশল করে কাতর কণ্ঠে বললেন, "ওঃ বড্ড লেগেছে। একটু ধরে তুলবেন মশাই ?"

"আহা ! আমার কি কম লেগেছে নাকি ?"

লোকটাকে ভাল করে চিনে রাখা দরকার। তাই রসময় বললেন, "অন্তত দেশলাই-টেসলাই থাকলে দিন না ! লণ্ঠনটা একটু জ্বালি।"

"না মশাই, দেশলাই আমার কাছে থাকে না।"

রসময় আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। ব্যথা-বেদনা উপেক্ষা করে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে লোকটাকে জাপটে ধরতে গেলেন। যা থাকে বরাতে !

কিন্তু লোকটা হঠাৎ নিচু হয়ে মাথা দিয়ে তাঁর পেটে সজোরে একটা ঢুঁ মেরে হাওয়া হয়ে গেল। রসময় ফের পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগলেন। এবার দুনো চোট।

আর পড়ে থেকেই শুনতে পেলেন, গগনবাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে। ট্যা-রা-রা-ট্যাট-ট্যাট ... ট্যারা-রা-ট্যাট-ট্যাট ...। সঙ্গে একটা কুকুরের ভয়ঙ্কর চিৎকার।

কিসের শব্দ তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তবে এ যে ভাল জিনিসের শব্দ নয়, তা বুঝতে বেশি বুদ্ধি লাগে না। শব্দটা অবশ্য মাত্র কয়েক সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হল না। তারপরেই কে একটা হুড়মুড় করে ধেয়ে এল এবং চোখের পলকে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

রসময় কপাল চাপড়ালেন। যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। কষ্টেসৃষ্টে উঠলেন রসময়, সর্বাঙ্গে ব্যথা, তবু যথাসাধ্য ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে গগনবাবুর বাড়ির বাগানের ফটক খুলে ঢুকলেন।

॥ ৭ ॥

আজ পুটু খাসনবিশের সঙ্গে পুকুরে সাঁতার শিখতে নেমেছিল। জলে তার খুব ভয়। তবে খাসনবিশ খুব পাকা লোক। প্রথম কিছুক্ষণ দাপাদাপি করার পর খাসনবিশ তাকে একটু গভীর জলে নিয়ে গিয়ে পট করে ছেড়ে দেয়। তখন ভয় খেয়ে এমন হাত-পা ছুড়েছিল পুটু যে, বলার নয়। চিৎকারও করেছিল। তাই দেখে গুটকের সে কী হাসি !

কিন্তু ওই একবারেই সাঁতারটা শিখেও গেল সে। তারপর অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে চোখ লাল করে ফেলল। খাসনবিশ জোর করে তুলে না আনলে পুটুকে আজ জল থেকে তোলাই যেত না।

সাঁতার শিখে আজ পুটুর এমন আনন্দ হল যে, সারাটা দিন তার যেন পাখা মেলে উড়তে ইচ্ছে করছিল। সাঁতার যে এত সোজা জিনিস তা এতকাল জানত না সে।

দুপুরে খাওয়ার সময় সে দাদুকে সাঁতার শেখার গল্পটা খুব জাঁক করে বলছিল।

কিন্তু দাদু ভারী অন্যমনস্ক। কেবল হুঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

"ও দাদু, তুমি খুশি হওনি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব খুশি হয়েছি।"

"তবে হাসছ না যে !"

"হাসিনি ! ও, আচ্ছা, এই যে হাসছি।"

"ওটা হাসি হল ? মুখ ভ্যাংচানো হল তো ?"

গগনবাবু এবার সত্যিই একটু হেসে বললেন, "কী জানো ভাই, আজ আমার মনটা ভাল নেই।"

"কেন নেই দাদু ?"

"ঘটনাটা মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না যে ?"

"কোন ঘটনা দাদু ?"

"ভাবছি আমার বাড়িতে বোমা রেখে গেল কে ? আমার এমন শত্রু কে আছে ? তার ওপর মিলিটারির হ্যান্ডগ্রেনেড। গাঁয়ের লোক এ-জিনিস পাবে কোথায় ?"

পুটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি ভয় পেয়ো না দাদু। আমার তো এয়ার পিস্তল আছে। আজ রাতে আমি বাড়ি পাহারা দেব।"

গগনবাবু একটু বিষণ্ণ হেসে বললেন, "তা দিয়ো, তবু দুশ্চিন্তাটা

যাচ্ছে না।"

আজ বিকেলে অনেক লোক এসে গগনবাবুর কাছে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে গেছে। রামহরিবাবু তো বলেই ফেললেন, "এর পর তো দেখব শীতলাতলার হাটে অ্যাটম বোমা বিক্রি হচ্ছে। দিনকালটা কী পড়ল বলুন তো! জগার হাতে পিস্তল! আপনার বাগানে বোমা! এ তো ভাল কথা নয়!"

হরিশবাবু বললেন, "একে রামে রক্ষে নেই। সুগ্রীব দোসর। ওদিকে ভূতের উৎপাতও নাকি শুরু হয়েছে। বাতাসা-দ্বীপের ঢ্যাঙা ভূতটা নাকি ডাঙাতেও হানা দিচ্ছে আজকাল।"

স্কুলের বিজ্ঞানশিক্ষক ব্যোমকেশবাবু বললেন, "ভূতটুত সব বাজে কথা। লম্বা লোকটা মানুষই বটে! শীতলাতলার হাটে তাকে অনেকেই দেখেছে। লোকটার নাম শিবরাম নস্কর, নয়াগঞ্জে বাড়ি, হাটে-হাটে গামছা ফিরি করে বেড়ায়।"

এই নিয়ে একটা তর্কও বেধে উঠল বেশ। রামহরিবাবু বললেন, "এঃ, খুব ঢ্যাঙা দেখালেন মশাই! শিবরাম নস্করকে আমিও চিনি। ও আবার লম্বা নাকি? অজিত কুণ্ডুকে তো দেখেননি। বাজিতপুরে বাড়ি। সেও হাটে আসে মাঝে-মাঝে। শিবরাম তো তার কোমরের কাছে পড়বে।"

মনসাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু উঁহু, অজিত কুণ্ডু লম্বা বটে, কিন্তু সাতকড়ির কাছে কিছু নয়। পয়সাপোঁতা গাঁয়ের সাতকড়ি গো, আমাদের শিবগঞ্জের শিবেনের জামাই। সে তো হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে নারকেল পারতে পারে, গাছে উঠতে হয় না।"

ব্যোমকেশবাবু টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, "কথাটা লম্বা নিয়ে নয়, ভূত নিয়ে। কথা হল, বাতাসা-দ্বীপে একটা ঢ্যাঙা ভূতের কথা শোনা যাচ্ছে। যারা মাছ-টাছ ধরতে যায় তারা নাকি দেখেছে। তা গাঁয়েগঞ্জে এরকম ভূত দেখা নতুন কিছু নয়। এসব কুসংস্কার ভেঙে ফেলা দরকার।"

রামহরি খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "আপনি কি বলতে চান ভূত নেই!"

ব্যোমকেশবাবু বুক চিতিয়ে বললেন, "নেই-ই তো।"

"তা হলে বলি, আপনার বিজ্ঞান-পড়া বিদ্যে দিয়ে ওসব বুঝতে পারবেন না। সাহস থাকলে নীলগঞ্জে প্রতাপরাজার বাগানবাড়িতে একটা রাত কাটিয়ে আসুন, বিজ্ঞান ভুলে রাম নাম নিতে পথ পাবেন না। শুনেছি সেখানে প্রতি রাতে ভূতের জলসা হয়। গানাদার বাজনদার ভূতরা সব আসে।"

"ওঃ, যত্ত সব।" বলে ব্যোমকেশবাবু রাগ করে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

তা সে যাই হোক, বয়স্ক মানুষদের ঝগড়া শুনতে পুটুর খুব ভাল লেগেছিল আজ। সে হিহি করে হাসছিল। কিন্তু দাদুর মুখে হাসি নেই।

মহেশবাবু ভালমানুষ। তিনি কোনও ঘটনার খারাপ দিকটা দেখতে পছন্দ করেন না। বললেন, "আচ্ছা, ধরুন, এমনও তো হতে পারে, বিদ্যাধরপুরের ওপর দিয়ে নিশুত রাতে পথ ভুলে কোনও এরোপ্লেন যাচ্ছিল। ধরুন, প্লেনের পাইলটের খুব ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। সে হয়তো ঘুম চোখে বোমা ফেলার বোতামটা টিপে দিয়েছিল। ঘুম চোখে ভুল তো হতেই পারে। আর সেই বোমাটাই এসে গগনবাবুর বাগানে পড়েছে। হয়তো বোমাটা মেঘের ভেতর দিয়ে আসার সময় ভেঙে সেঁদিয়ে গিয়েছিল, তাই আমাদের ভাগ্যে ফাটেনি। হতে পারে না এরকম?"

রামহরিবাবু বললেন, "হতে পারবে না কেন? তবে হয়নি।"

গগনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "এরোপ্লেন থেকে এ ধরনের বোমা ফেলা হয় না মহেশবাবু।"

দাদুর মুখে একটুও হাসি না দেখে আজ পুটুর মনটা বড্ড খারাপ লাগছিল। গাঁয়ের লোকেরা বিদেয় হলে সে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি এত ভাবছ কেন দাদু? কী হয়েছে?"

গগনবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "অনেক কথা ভাবছি দাদু। একটা গভীর ষড়যন্ত্র. নইলে প্রতাপরাজার শূলটা হাতাতে চাইবে কেন? বুঝলে ভাই, আমার মনটা আজ সত্যিই ভাল নেই।"

রাতে যখন পুটু খেয়েদেয়ে মায়ের পাশে শুতে গেল, তখনও দাদুর গম্ভীর মুখটা সে ভুলতে পারছে না। বিদ্যাধরপুরে এলে দাদুই তার সারাদিনের সঙ্গী। কত গল্প হয়, হাসিঠাট্টা হয়, খেলা হয় দাদুর সঙ্গে। কিচ্ছু হচ্ছে না সকাল থেকে।"

পুটু হয়তো ঘুমিয়েই পড়ত, কিন্তু সাঁতার কেটে আজ তার হাত-পায়ে খুব ব্যথা। মা ঘুমিয়ে পড়ার পরও সে অনেকক্ষণ জেগে রইল। তারপর ভাবল, উঠে বরং বাড়িটা পাহারা দিই।

সে গিয়ে প্রথমেই খাসনবিশকে জাগাল, "ও খাসনবিশদাদা, ওঠো! ওঠো!"

খাসনবিশ প্রথমটায় উঠতে চায় না। ঠেলাঠেলি করায় হঠাৎ একসময়ে জেগে সটান হয়ে বসে বলল, "কী! কী! হয়েছেটা কী? আবার বোমা নাকি? উরেব্বাস! আবার বোমা! নাঃ, এবার আমি বৃন্দাবন চলে যাব!"

পুটু হিহি করে হেসে বলল, "ভয় পাচ্ছ কেন? এবার কেউ বোমা ফেলতে এলে এই দ্যাখো আমার পিস্তল। ঠাঁই করে গুলি চালিয়ে দেব।"

নিজের এয়ার পিস্তলটা তুলে খাসনবিশকে দেখাল পুটু।

খাসনবিশ বলল, "ওরে বাবা, এয়ার পিস্তল দিয়ে কি আর ওদের ঠেকানো যাবে?"

পুটু খাসনবিশকে ঘুমোতে দিল না। জোর করে বাড়ির বারান্দায় এসে দুটো চেয়ারে বসল দু'জনে।

"একটা ভূতের গল্প বলো তো খাসনবিশদাদা।"

খাসনবিশ একটা হাই তুলে গল্পটা সবে ফাঁদতে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে টমি কুকুরটা ঘাউ-ঘাউ করে গেটের দিকে তেড়ে গেল।

খাসনবিশ আঁতকে উঠে বলল, "ওই রে! এসে গেছে বোমারু!"

পুটু ভয় খেল না। পিস্তলটা তুলে সে চেয়ার থেকে নেমে গেটের কাছে ছুটে গিয়ে আবছা অন্ধকারে একটা লোককে দেখতে পেল।

লোকটা একটা ছোট বন্দুকের মতো জিনিস বাগিয়ে ধরে আছে। অন্য হাতে একটা কী জিনিস দোলাতে-দোলাতে টমিকে বলছে, "আয়, আয়, খাবি আয়।"

গোয়েন্দা-গল্পে কুকুরকে বিষ-মেশানো খাবার খাওয়ানোর গল্প অনেক পড়েছে পুটু। সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই তুমি কে? কী চাই?"

লোকটা ভয় পেল না। বলল, "রোসো বাপু, রোসো। অত চেঁচামেচি কোরো না। আমি ভূত ছাড়তে এসেছি। অনেক শক্ত কাজ আছে হাতে। আগে এই মাংসের টুকরোটা তোমাদের কুকুরটাকে খাওয়াতে হবে। তারপর ভূত ছাড়তে হবে। তারপর আরও আছে।"

বলে লোকটা টমির দিকে মাংসের টুকরোটা ছুড়ে দিতেই পুটু চেঁচাল, "অ্যাই খবর্দার!"

বলেই সে তার পিস্তল চালিয়ে দিল।

"বাপ রে! মরে গেলুম রে!" বলে লোকটা চেঁচাতে শুরু করতেই চারদিক প্রকম্পিত করে লোকটার হাতের বন্দুকটা থেকে ফুলঝুরির মতো গুলি ছুটতে লাগল।

পুটু দাদুর কাছে মিলিটারির অনেক কায়দা শিখে নিয়েছে। গুলি চলতেই সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর টমি ভয় পেয়ে ভীষণ চেঁচাতে লাগল।

লোকটা গুলি ছুড়তে-ছুড়তেই দৌড়ে পালিয়ে গেলে পুটু উঠে মাংসের টুকরোটা তুলে দেওয়ালের বাইরে ফেলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল, রাস্তার কুকুররা বা কাকটাকেরা যদি খায়?

বিকট শব্দে বাড়িসুদ্ধু লোক উঠে পড়েছে। গগনবাবু বেরিয়ে এসে থমথমে মুখ করে সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনে নাতিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ বটে, কিন্তু খুব বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ। খাসনবিশের বদলে আমাকে ডেকে নিলেই পারতে! তোমার হাতে ওটা কী?"

"এটা মনে হচ্ছে বিষ-মেশানো মাংস। লোকটা টমিকে দিতে চাইছিল।"

"সর্বনাশ! ওরে খাসনবিশ, ওটা মাটিতে পুঁতে ফেল তো এক্ষুনি।"

খাসনবিশ দৌড়ে শাবল এনে বাগানের কোণে মাংসের টুকরোটা পুঁতে দিয়ে এল।

গগনবাবু সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ব্যাপারটায় তোমরা ভয় পেয়েছ জানি। বোমার পর স্টেনগান। কেউ আমাকে দুনিয়া থেকে সরাতে চাইছে। কেন চাইছে তা বুঝতে পারছি না। তবে একটা সন্দেহ আমার হচ্ছে। যদি সেই সন্দেহ সত্য হয় তবে বেশ গণ্ডগোলের ব্যাপার।"

ঠিক এই সময়ে রসময় এসে ঢুকলেন। থরথর করে কাঁপছেন। মুখে কথা সরছে না।

গগনবাবু একটু হেসে বললেন, "আসুন ঠাকুরমশাই, মনে-মনে আপনাকেই খুঁজছি। আমার একজন বিচক্ষণ লোক দরকার।"

রসময় কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে বললেন, "বেঁচে যে আছেন এই ঢের। দুর্গা, দুর্গা।"

"লোকটা কে ঠাকুরমশাই? চেনেন?"

রসময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "চিনি। ও হল জগা পাগলা।"

গগনবাবু অবাক হয়ে বললেন, "জগাপাগলা! বলেন কী ঠাকুরমশাই?"

"ঠিকই বলছি। তবে ওর দোষ নেই। পেছনে অন্য লোক আছে।"

"কে লোক?"

কখনও তার নাম বামাচরণ, কখনও পরেশবাবু। কিন্তু হাতে আর সময় নেই গগনবাবু। এখনই একবার রাজবাড়ির দিকে যাওয়া দরকার।"

গগনবাবু হঠাৎ টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "শূল! অ্যাঁ! শূলটা নিয়ে যাবে না তো! চলুন তো, দেখি!"

ভূত-যন্ত্রটা হাতে নিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে জগা খুব হাসছিল। গগনবাবুর বাড়ির আশপাশে মেলা ভূত ছেড়ে এসেছে আজ। আর ভূতগুলোর কী তেজ বাপ! আগুনের ঝলক তুলে রে-রে করতে-করতে সব বেরোতে লাগল। গগনবাবুর ঘরের মধ্যে ছাড়তে পারলে ভাল হত। লোকটা বড্ড ছ্যাঁচড়া। মেয়ের বিয়েতে জগাকে মোটেই ভাল করে খেতেই দিল না! যা হোক, বাড়ির সামনে যে ভূতগুলো জগা ছেড়ে এল তারা কি আর গগনবাবুকে ছেড়ে কথা কইবে?

নষ্টের গোড়া ওই ছেলেটা এসে যে পিড়িং করে কী একটা জিনিস ছুড়ে মারল! জগার কপালের ডানদিকটা এখন ফুলে বড্ড টনটন করছে। রক্তও পড়ছে বটে। তবে আনন্দটাও তো হচ্ছে কম নয়। শক্ত-শক্ত কাজ করতে ভারী আনন্দ হয় জগার।

রাজবাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে তখন কে যেন তার

পাশে-পাশে দৌড়তে লাগল। সেই ভূতগুলোর একটা নাকি? অন্ধকারে আবছায়ায় তাই তো মনে হচ্ছে!

জগা চোখ পাকিয়ে বলল, "যাঃ, যাঃ, এখানে কী? যেখানে ছেড়ে এসেছি সেখানে গিয়ে দাপাদাপি কর।"

ভূতটা বেশ বিরক্ত গলায় বলল, "এবারও পারলে না তো?"

"পরেশবাবু যে! ওফ্, ভূত যা ছেড়ে এসেছি আর দেখতে হবে না। এতক্ষণে ভূতেরা দক্ষযজ্ঞ লাগিয়ে দিয়েছে গিয়ে দেখুন গগনবাবুর বাড়িতে।"

পরেশবাবু বললেন, "মোটেই তা নয় জগা। ভূতগুলো সব মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।"

জগা অবাক হয়ে বলল, "বলেন কী মশাই? মুখ থুবড়ে তো পড়ার কথা নয়!"

পরেশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমার ওপর বড় ভরসা ছিল হে! এ-গাঁয়ে তোমার মতো বীর আর কে?"

"আজ্ঞে, সে তো ঠিক কথা।"

"নিজে পারলে অবশ্য তোমাকে কষ্ট দিতাম না। কিন্তু ওইখানেই যে মুশকিল। নিজে হাতে মশা-মাছিটা অবধি মারতে পারি না আমি। সেইজন্যই তো চাকরিটা ছাড়তে হল।"

জগা কথাটার প্যাঁচ ধরতে পারল না। তবে হাসির কথা ভেবে খুব হাসল। বলল, "মশা-মাছি আমি খুব মারতে পারি।"

রাজবাড়ির দেউড়ির উলটো দিকে জগাকে নিয়ে ঠেলে দাঁড় করিয়ে পরেশবাবু বললেন, "এবার যেন ভুল না হয়, দেখো।"

জগা বলল, "না, না ভুল হবে কেন? সোজা কাজ। তবে কাজটা যেন কী পরেশবাবু?"

"ওই যে দেউড়ির বাইরে হরুয়া আর রামুয়া দু'ভাই পাহারা দিচ্ছে দেখেছ? দু'জনের হাতেই পাকা বাঁশের লাঠি।"

"ও আর দেখব কী? রোজ দেখছি।"

"তা হলে এবার এগিয়ে যাও। একেবারে কাছাকাছি গিয়ে যন্ত্রটা ভালমতো তাক করে ভূতগুলো ছেড়ে দিয়ে এসো। এবার যেন আর কাজ পণ্ড করে দিয়ো না।"

"না, না, আর ভুল হবে না। তা এর পর আরও শক্ত-শক্ত কাজ দেবেন তো পরেশবাবু?"

"মেলা কাজ পাবে। কাজের অভাব কী?"

জগা খুশি হয়ে বলল, "কেউ কাজ দেয় না মশাই, তাই বসে থেকে-থেকে আমার গতরে শুঁয়োপোকা ধরে গেল। এইসব কাজকর্ম নিয়ে থাকলে সময়টা কাটেও ভাল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার যাও, কাজটা উদ্ধার করে এসো।"

"যে আজ্ঞে!"

ভূত ছাড়া ভারী মজার কাজ। জগা ভূত-যন্ত্রটা বগলে নিয়ে গটগট করে এগিয়ে গেল। কাজ খুবই সোজা। দেউড়ির মাথায় একটা ডুম জ্বলছে। সেই আলোয় হরুয়া আর রামুয়াকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

জগা যন্ত্রটা তুলে ঘোড়া টিপে ধরল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই আগুনের ঝলক তুলে রাশি-রাশি ভূত ছুটে যেতে লাগল হরুয়া আর রামুয়ার দিকে। ভূতগুলোর কী তেজ! কী শব্দ! বাবা রে! যন্ত্রটা তার হাতের মধ্যে লাফাচ্ছে যেন!

দেউড়ির আলোটা চুরমার হয়ে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ঝনঝন করে কী যেন খসে পড়ল। হরুয়া আর রামুয়া বিকট চিৎকার করে উঠল, "বাপ রে! গেছি রে!"

তারপরই জায়গাটা একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

পরেশবাবু পেছন থেকে এসে যন্ত্রটা জগার হাত থেকে নিয়ে বললেন, "বাঃ, এই তো দিব্যি পেরেছ।"

জগা একগাল হেসে বলল, "এ আর এমন কী? তা আর ভূতটুত ছাড়তে হবে না?"

পরেশবাবু যন্ত্রটা একটু নাড়া দিয়ে বললেন, "ভূত শেষ হয়ে গেছে। আবার ভূত ভরলে তবে ভূত ছাড়তে পারবে। এখন চলো, অনেক কাজ আছে।"

পরেশবাবু একটা টর্চ জ্বেলে দেখলেন, হরুয়া আর রামুয়া মাটিতে চিতপটাং হয়ে পড়ে আছে। দু'জনেরই কপাল আর শরীর রক্তে মাখামাখি। পরেশবাবু নিচু হয়ে হরুয়ার ট্যাঁক থেকে একটা ভারী চাবির গোছা বের করে নিয়ে বললেন, "এবার শূল!"

জগা হরুয়া আর রামুয়ার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বলল, "আচ্ছা মশাই, ভূতেরা কি এদের মারধর করেছে?"

"তা করেছে।"

"কিন্তু মারধরের তো কথা ছিল না। শুধু ভয় দেখানোর কথা।"

"বে-আদবদের মারধরও করতে হয়। এবার চলো, চটপট কাজ সেরে ফেলি।"

জগার একটু ধন্ধ লাগছিল। তার মাথাটাও হঠাৎ যেন ঝিমঝিম করছে। তবু সে পরেশবাবুর পিছু-পিছু চলল।

দেউড়ির ফটক ঠেলে পরেশবাবু ঢুকলেন। রাজবাড়ির মস্ত কাঠের দরজা চাবি দিয়ে খুলতে তাঁর মোটেই সময় লাগল না। পরপর কয়েকটা ঘর পার হয়ে একটা ঘরের বন্ধ দরজা খুললেন পরেশবাবু। টর্চের আলোয় দেখা গেল, ঘরের দেওয়ালে কাঠের স্ট্যান্ডে থরে-থরে প্রতাপরাজার অস্ত্রশস্ত্র সাজানো। বিশাল ধনুক, মস্ত তলোয়ার, প্রকাণ্ড ভল্ল, বিপুল গদা। কোনওটাই মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নয়, এতই বড় আর ওজনদার সব জিনিস। পরেশবাবুর টর্চের ফোকাসটা স্থির হল শূলটার ওপর। শূলটাও দেওয়ালের গায়ে একটা কাঠের মস্ত স্ট্যান্ডে শোওয়ানো।

"এসো হে জগা, একটু কাঁধ দাও।"

"যে আজ্ঞে!"

দু'জনে মিলেও শূলটা তুলতে বেশ কষ্টই হল।

শূলটা বয়ে দুধসায়রের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে জগা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা পরেশবাবু, হরুয়া আর রামুয়া মরে যায়নি তো?"

পরেশবাবু চাপা গলায় বললেন, "মরলে তো তুমি বাহাদুর। আজ অবধি আমি কাউকে মারতে পারলাম না, তা জানো? আমার ওই একটাই দুঃখ।"

দুধসায়রের অনেক ঘাট। সব ঘাট ব্যবহার হয় না। সেরকমই একটা অব্যবহৃত ঘাটে একটা ডিঙি নৌকো বাঁধা। পরেশবাবু সাবধানে ডিঙির ওপর শূলটা শুইয়ে রাখলেন। তারপর জগার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, "যাও, গিয়ে ঘুমোও। কাল সকালে ওই টাকা দিয়ে জিলিপি খেয়ো।"

কিন্তু জগাপাগলার হঠাৎ যেন কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল। টাকাটা হাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ জগা চেঁচিয়ে উঠল, "মোটেই ওটা ভূত-যন্ত্র নয়! ওটা বন্দুক। আপনি আমাকে দিয়ে খুন করালেন পরেশবাবু?"

পরেশবাবু একগাল হেসে বললেন, "কেন, খুন করে তোমার ভাল লাগছে না? একটা খুন করতে পারলে আমার কত আনন্দ হত জানো?"

জগা হঠাৎ পরেশবাবুকে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "আপনাকে আমি ছাড়ব না। পুলিশে দেব।"

ঠিক এই সময়ে পেছনের অন্ধকার থেকে একজন লম্বা, খুব লম্বা লোক এগিয়ে এল। তার হাতে উলটো করে ধরা একটা পিস্তল। লোকটা পিস্তলটা তুলে তার ভারী বাঁটটা দিয়ে সজোরে জগার মাথার পেছনে মারল। সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল জগা। লোকটা জগার দেহটা টেনে ঘাটের আগাছার জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল।

তারপর দু'জনে চটপট হাতে বৈঠা মেরে তীর গতিতে বাতাসা দ্বীপের দিকে এগোতে লাগল।

॥ ৮ ॥

একটু বাদে যখন গাঁয়ের লোকজন এসে রাজবাড়িতে হাজির হয়ে রামুয়া আর হরুয়ার অবস্থা দেখল তখন সকলেই হায়! হায়! করতে লাগল। রসময় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গগনবাবুকে বললেন, "নির্দোষ পাগলটা খুনের দায়ে এবার না ফাঁসিতে ঝোলে!"

গগনবাবু টর্চের আলোয় ভাল করে হরুয়া আর রামুয়াকে দেখে বললেন, "ভয় নেই, এদের কারও গায়ে স্টেনগানের গুলি লাগেনি, মরেওনি। মনে হচ্ছে আনাড়ি হাতে এলোপাথাড়ি গুলির ঘায়ে দেউড়ির বাতিদানটা খসে হরুয়ার ঘাড়ে পড়েছিল। আর দেওয়ালের মস্ত চাবড়া খসে রামুয়ার মাথায় চোট হয়েছে। তবে চোট সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। দু'জনেই শক্ত ধাতের লোক। কিছু হবে না।"

গগনবাবুর পিছু-পিছু গাঁয়ের লোকেরা রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল, প্রতাপরাজার শূল হাওয়া।

গগনবাবু গম্ভীর গলায় মদন হাজরাকে বললেন, "মদনবাবু, এখনই একটা নৌকোর ব্যবস্থা করুন, আমাদের বাতাসা-দ্বীপে যেতে হবে।"

"তার আর কথা কী? ওরে গুলবাগ সিং, শিগ্‌গির গিয়ে ছেলেদের ঠেলে তোল।"

গগনবাবু বললেন, "বেশি লোক যাওয়া চলবে না। শব্দ সাড়া হলে মুশকিল হবে। শুধু আপনি, আমি আর রসময়বাবু যাব, আর গুলবাগ সিং।"

একটু বিবর্ণ মুখে মদন হাজরা বললেন, "ইয়ে, তা বেশ কথা। কিন্তু গগনবাবু, ওদের কাছে যে স্টেনগান আছে!"

"তা থাক। আমাদের একটু ঝুঁকি নিতেই হবে। আপনার আর আমার দু'জনের পিস্তল আছে। তেমন হলে পালটা গুলি চালানো যাবে। চলুন।"

ঘণ্টাখানেক বাদে একটি ডিঙি নৌকো অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে বাতাসা-দ্বীপের একটা আগাছায় ভরা পাড়ে লাগল। চারজন নিঃশব্দে নামলেন। টর্চ না জ্বেলে ধীরে-ধীরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলেন তাঁরা।

দেখা গেল, বাতাসা-দ্বীপটা গগনবাবুর একেবারে মুখস্থ। প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনের দিক দিয়ে গেলেন না গগনবাবু। চাপা গলায় বললেন, "উত্তরদিকে একটা জমাদার যাওয়ার দরজা আছে। সেটার খবর অনেকে জানে না।"

গগনবাবু টর্চ না জ্বেলেই ভাঙাচোরা রাস্তায় খোয়া, পাথর আর জঙ্গল ভেদ করে দরজাটার কাছে পৌঁছলেন। খুব সন্তর্পণে দরজাটা টানতেই ক্যাঁচ করে সামান্য ফাঁক হল।

গগনবাবু একটু অপেক্ষা করলেন। তারপর ফের খুব সন্তর্পণে দরজাটা আবার টানলেন। আবার ক্যাঁচ করে শব্দ। তবে মানুষ গলে যাওয়ার মতো পরিসর সৃষ্টি হল। প্রথমে মাথা নিচু করে গগনবাবু এবং পেছনে তিনজন ধীরপায়ে ভেতরে ঢুকলেন। সামনে জমাট অন্ধকার।

গগনবাবু ফিসফিস করে বললেন, "আলো জ্বালাবেন না। আমার পিছু-পিছু আসুন। সামনে তিন ধাপ সিঁড়ি আছে। তারপর হলঘর। হলঘর পেরিয়ে দোতলার সিঁড়ি।"

হলঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অনেক সময় লাগল। সব কাজই করতে হচ্ছিল সন্তর্পণে। তা ছাড়া পুরনো ভাঙা বাড়িতে ইট-কাঠ-আবর্জনা এত জমে আছে যে, পা রাখাই দায়!

দোতলার চাতালে বুকসমান ইট-বালি-সুরকি জমে আছে।

ভাঙা ছাদের একটা অংশ খসে পড়েছে এখানে। কোথায় যেন একটা তক্ষক ডেকে উঠল।

চাপা গলায় গগনবাবু বললেন, "ডাইনে। সাবধান, এখানে একটা জায়গা ভেঙে পড়ায় ফাঁক হয়ে আছে।"

এগোতে বাস্তবিকই কষ্ট হচ্ছিল। গগনবাবুর মিলিটারি ট্রেনিং আছে, আর কারও তা নেই।

অন্তত বিশ কদম গিয়ে ডানধারে একটা দরজার কাছে দাঁড়ালেন গগনবাবু। ঘরের ভেতরে ঘটাং-ঘটাং করে দুটো শব্দ হল। লোহার গায়ে লোহার শব্দ।

গগনবাবু সন্তর্পণে মুখটা বের করে দেখলেন, মস্ত শূলটা দেওয়ালের এক জায়গায় ঢোকানোর চেষ্ট করছে দুটো লোক। তাদের একজন খুব, খুবই লম্বা। অন্তত সাড়ে সাত ফুট হবে।

হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে গগনবাবু বলে উঠলেন, "ক্ষেত্রী, আমি তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে ঠঙাত করে বিকট শব্দ হল। শূলটা ফেলে দিল হয়তো। আর তারপরেই ট্যারা-রা-রা... ট্যারা-রা-রা... ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসতে লাগল খোলা দরজা দিয়ে।

রসময় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। মদন হাজরা 'বাপ রে' বলে চিৎকার দিয়ে, সিঁড়ির দিকে দৌড়তে গিয়ে ইট-বালির স্তূপে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। গুলবাগ দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে জোরে-জোরে 'দুর্গা দুর্গতিনাশিনী' জপ করতে লাগল।

শুধু অচঞ্চল গগনবাবু ঘাবড়ালেন না। পায়ের কাছ থেকে একটা আধলা ইট তুলে নিয়ে গুলির মুখেই আচমকা দরজা দিয়ে ভেতরে সজোরে ছুড়ে মারলেন।

গুলির শব্দ থামল। ভেতরে কে যেন একটা কাতর আর্তনাদ করে ধপাস করে পড়ে গেল।

গগনবাবু ঘরে ঢুকে টর্চ জ্বাললেন।

দেখা গেল লম্বা লোকটা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে নামছে। দ্বিতীয় লোকটা হাতে পিস্তল নিয়ে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

গগনবাবু স্টেনগানটা তুলে গুলির ম্যাগাজিনটা খুলে নিলেন। তারপর দ্বিতীয় লোকটার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "কী ক্ষেত্রী, গুলি করবে নাকি? তা চালাও দেখি গুলি, কেমন পারো দেখি।"

ক্ষেত্রী পিস্তল তুলল, ট্রিগারে আঙুল রাখল, তারপর দাঁতে দাঁত চাপল, চোখ বুজল। কিন্তু গুলি করতে পারল না। তার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। শেষে সে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে বলল, "না, পারছি না! পারছি না!"

গগনবাবু এগিয়ে গিয়ে তার হাতের পিস্তলটা তুলে নিলেন। লোকটা বাধা দিল না।

দৃশ্যটা দেখে রসময় অবাক! হাতে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রী কেন গগনবাবুকে গুলি করল না সেটা বুঝতে পারলেন না তিনি।

গগনবাবু হাঁক দিলেন, "গুলবাগ সিং!"

গুলবাগ এবার বুক চিতিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, "বলুন সার।"

"এই ঢ্যাঙা লোকটার হাতে হাতকড়া পরাও।"

"বহুত আচ্ছা সার।" বলে গুলবাগ পটাং করে লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে বলল, "আর উনি?"

গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "একে পরাতে হবে না।" তারপর ক্ষেত্রীর দিকে ফিরে গগনবাবু শুধু বললেন, "বিশ্বাসঘাতক! কাপুরুষ!"

মাঝবয়সী, গাঁটাগোট্টা চেহারার ক্ষেত্রী নামের লোকটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বন্দুক-পিস্তলের মাঝখানে রসময় বড়ই অস্বস্তি বোধ করছেন। তবু কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "গগনবাবু, আপনার বড় দুঃসাহস। ওভাবে পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা আপনার উচিত হয়নি। লোকটা গুলি করলে কী যে হত!"

গগনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "রামলাল ক্ষেত্রীকে আপনি যদি চিনতেন তা হলে ওর পিস্তলের সামনে দাঁড়াতে আপনারও ভয় করত না।"

মদন হাজরা গায়ের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলেন। বললেন, "লোকটা কে গগনবাবু?"

মিলিটারিতে আমার ব্যাটালিয়নেই চাকরি করত। কিন্তু ও একটি অদ্ভুত সাইকোলজিক্যাল কেস। মিলিটারি হয়েও জীবনে কোনওদিন কাউকে মারতে পারেনি, এমনকী, যুদ্ধের সময়েও না, মানুষ মারা তো দূরে থাক, একবার ফাঁদে পড়া একটা ইঁদুরকে মেরে ফেলতে বলেছিলাম ওকে। তাও পারেনি। তা বলে ওকে খুব অহিংস ভাববেন না যেন। নিজে মারতে পারে না বটে, কিন্তু অন্যকে দিয়ে খুন করাতে ওর আপত্তি তো নেই-ই, বরং আগ্রহ আছে। খুনখারাপি বরং ও ভালই বাসে এবং তা ঘটানোর জন্য সব আয়োজন করে দেয়। শুধু নিজে হাতে কাজটা করে না। যদি তা পারত তবে অনেক আগেই আমাদের উড়িয়ে দিত। সেটা পারেনি বলেই ও জগা পাগলাকে কাজে লাগিয়েছিল।"

"কিন্তু ওই ঢ্যাঙা লোকটা তো ছিল!"

ঢ্যাঙা লোকটা থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। গগনবাবু তার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "একেও আমার খুব বলবান বা সাহসী বলে মনে হচ্ছে না। বরং সন্দেহ হচ্ছে, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের গণ্ডগোলে হঠাৎ ঢ্যাঙা হয়ে গিয়ে অসুবিধেয় পড়ে গেছে শরীরটা নিয়ে। কী হে ক্ষেত্রী, ঠিক বলছি?"

ক্ষেত্রী মৃদুস্বরে বলল, "হ্যাঁ, সার, ঠিকই বলছেন। ও আমার মাসতুতো ভাই ধরণী। হঠাৎ-হঠাৎ দু-একটা সাহসের কাজ করে ফেলে বটে, নইলে যেমন ভিতু তেমনই অপদার্থ। শরীরটাও বড্ড লগবগে, বছরের মধ্যে আট-ন' মাসই অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে।"

রসময়বাবু এবার হাতজোড় করে বললেন, "গগনবাবু, এবার ঘটনাটা ভেঙে বলবেন? মনে হচ্ছে আপনি এই ঘটনার আদ্যোপান্ত জানেন।"

গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ জানি। শুধু জানি বললে সবটা বলা হবে না। আমিই এই ঘটনার পালের গোদা।"

"তার মানে?"

গগনবাবু মৃদু হেসে বললেন, "সবটা না বললে কি বুঝবেন?"

"সবটাই বলুন।"

"আমি যখন ছোট ছিলুম তখন এই বাতাসা-দ্বীপের রাজার বাড়ি আমাকে খুবই আকর্ষণ করত। অনেকের মতো আমারও মনে হত, বোধ হয় রাজবাড়িতে গুপ্তধন আছে। তাই প্রায়ই এসে আমি এখানে-ওখানে গর্ত করে দেখতাম। একদিন আমার হঠাৎ খেয়াল হল, রাজবাড়ির দেওয়ালগুলো খুব পুরু বটে, কিন্তু পশ্চিমদিকে দোতলার এই ঘরের দেওয়ালটা যেন আরও অনেকটা বেশি পুরু। টেপ দিয়ে মেপেও দেখলাম, আমার অনুমান সত্যি। তখন একদিন নিশুত রাতে একা এসে দেওয়ালের চাপড়া ভাঙতে লাগলাম। খুব শক্ত আস্তরণ ছিল, ভাঙতে রীতিমত গলদঘর্ম হতে হয়েছিল আমায়। প্রায় ছ' ইঞ্চি পুরু আস্তরণ সরিয়ে দেখি, ভেতরে একটা লোহার সিন্দুকমতো রয়েছে। চাবির ছিদ্রটা দেখে আমি অবাক! এত বড় ফুটোর চাবিও বিরাট বড় হওয়ার কথা। শুধু মুখটাই বড় নয়, ছিদ্রের মধ্যে একটা শলা ঢুকিয়ে দেখেছি খুব গভীরও বটে। সিন্দুক তো পাওয়া গেল, কিন্তু এর চাবি কোথায় পাওয়া যায়? চাবি না পেলে 'গ্যাস কাটার' দিয়ে কাটতে হয়। কিন্তু আপনাদের আগেই বলে রাখছি, আমার গুপ্তধন গাপ করার মতলব ছিল না। আমি চোর নই, কৌতূহলী মাত্র।"

রসময় বললেন, "সে আমরা জানি। নইলে অনেক আগেই আপনি গুপ্তধন সরিয়ে ফেলতে পারতেন।"

"ঠিক কথা। যাই হোক, আমি ভাঙা জায়গাটা সারারাত জেগে আবার মেরামত করি। পাছে লোকে বুঝতে পারে সেই ভয়ে পুরনো চুন-বালি লাগিয়ে তার ওপর ঝুল-কালি ভরিয়ে দিই। তারপর চাবিটার কথা চিন্তা করতে থাকি। এত বড় চাবি প্রতাপরাজা কোথায় রাখতে পারেন! হরুয়ার কাছে যেসব চাবি আছে সেগুলো বড় বটে, তবে এত বড় নয়। রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকেও তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। রাজবাড়িতে জিনিসপত্র বলতে তো কিছুই এখন নেই। রাজা মহাতাবের আমলেই সব বিক্রি হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে আছে শুধু অস্ত্রাগারটা। তা সেখানে খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎ শূলটার ওপর আমার চোখ পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়। শূলটার চোখা দিকটায় কিছু অদ্ভুত ধরনের খাঁজ কাটা আছে। আমি চাবির ছিদ্রের মাপ এবং নকশা নিয়ে রেখেছিলাম। মিলিয়ে দেখলাম, হুবহু মিলে গেল।"

মদন হাজরা অবাক হয়ে বললেন, "তাও কিছু করলেন না? এতদিনে তো রাজা হয়ে যেতে পারতেন মশাই।"

গগনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না, পারতাম না। রাজা প্রতাপের বৈধ ওয়ারিশন আছেন। তিনি আমেরিকায় থাকেন, নাম মহেন্দ্র। আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানাই। তিনি আমাকে জবাবে লিখলেন, তাঁর দেশে ফেরার আশু সম্ভাবনা নেই। যদি কখনও ফেরেন তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন। আসলে মহেন্দ্র ওখানে ব্যবসা করে প্রচুর টাকা করেছেন। গুপ্তধন তাঁকে টানেনি। আর গুপ্তধন কিছু আছে কি না তাও তো অজানা।"

মদন হাজরা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "খুলে দেখলেই তো হয়!"

গগনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "না, হয় না। ওটা আমাদের অনধিকার হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে মদনবাবু।"

"তা বটে!"

"আমি একটাই ভুল করেছি। কাশ্মিরের উত্তরে একটা ভীষণ দুর্গম জায়গায় পোস্টিং-এর সময় এই রামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে আমার চেনা হয়। আমার খুব দেখাশুনো করত। একদিন খুব দুর্যোগের রাতে ছাউনিতে বসে গল্প করতে-করতে এই ঘটনাটা বলে ফেলি। তখন কল্পনাও করিনি যে, রামলাল ক্ষেত্রী এই অজ-পাড়াগাঁ খুঁজে বের করে গুপ্তধন বাগাবার চেষ্টা করবে। শুধু তাই নয়, সাক্ষী প্রমাণ লোপ করার জন্য আমাকেও ধরাধাম থেকে সরাতে চাইবে। লোভ যে মানুষকে কোথায় টেনে নামাতে পারে, ভেবে শিউরে উঠছি। এবার থেকে বাতাসা-দ্বীপেও পাহারা বসাবার ব্যবস্থা করতে হরুয়াকে বলতে হবে। ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।"

সবাই নির্বাক হয়ে রইল।

দুধসায়রের এক আঘাটায় খুব ভোরবেলা চোখ মেলে চাইল জগা। মাথাটা টনটন করছে বড্ড। চারদিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে সে পড়ে আছে কেন, তা প্রথমে বুঝতে পারল না। তারপর ধীরে-ধীরে সে উঠে বসল এবং সব ঘটনাই তার মনে পড়ে গেল। সে হঠাৎ টের পেল, তার স্মৃতিশক্তি ঝকঝক করছে এবং পাগলামির চিহ্নমাত্র আর তার মাথায় নেই। ভারী স্বাভাবিক লাগছে তার। তবে মনটা অপরাধবোধে আচ্ছন্ন। সে ধীরে-ধীরে উঠল। ভাবল, থানায় গিয়ে নিজের অপরাধ কবুল করে ধরা দেয়।

তা গিয়েওছিল জগা। কিন্তু মদন হাজরা তাকে পাত্তাই দিলেন না। বললেন, "যাও, যাও, ওসব ছোটখাটো অপরাধের জন্য গ্রেফতারের দরকার নেই। আসল কালপ্রিট যে ধরা পড়েছে এই ঢের।"

বিকেলে গগনবাবুর বাড়িতে গাঁয়ের মেলা লোক জড়ো হয়েছে। ঘটনা নিয়ে তুমুল উত্তেজিত আলোচনা হচ্ছে। এমন সময়ে রামহরিবাবু শশব্যস্ত এসে ঢুকলেন। গলায় খুব উদ্বেগ। বললেন, "ও গগনবাবু, শুনছি নাকি আমাদের জগাপাগলার পাগলামি সেরে গেছে!"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, একেবারে সেরে গেছে।"

রামহরিবাবু ডবল উদ্বেগের গলায় বললেন, "তা হলে তো চিন্তার কথা হল মশাই! গাঁয়ে মোটে ওই একটিই পাগল ছিল, সেও যদি ভাল হয়ে যায় তা হলে কী হবে? পাগল ছাড়া গাঁ যে ভারী অলক্ষুনে!"

সবাই হাসতে লাগল।

খানাতল্লাশি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পান্তা ঘি-ভাত ফ্রায়েড-রাইস পোলাও ভুনিখিচুড়ি।
বন্ধু পাশে থাকলে ভয় করি না কোনো কিছুরই ॥

তন্দুরি নান পাউরুটি বান রুটি পরোটা লুচি পুরি।
আমার দিদি নাচতে পারে কত্থক আর কুচিপুড়ি ॥

শুক্তো ডাল চচ্চড়ি ঘ্যাঁট দম দোলমা ছেঁচকি।
জল খেতে হয়, তবেই সারে, যখন ওঠে হেঁচকি ॥

মালাইকারি মুড়িঘণ্ট ভাপাইলিশ শুঁটকিমাছ।
চোরটাকে ঠিক ধরে ফেলতাম পেলে আগে একটু আঁচ ॥

কোর্মা কোপ্তা দোপেঁয়াজি চিলিচিকেন শিককাবাব।
বিদ্যালয়ে হয় আমাদের গুরুর কাছে দীক্ষালাভ ॥

ইডলি দোসা মুড়িমুড়কি ওমলেট হ্যাম নাস্তায়।
খান্না এসে বললেন, আজ প্রচণ্ড জ্যাম রাস্তায় ॥

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

শম্ভু যেমন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমাদের শম্ভুর
মন টইটম্বুর
সর্বদা খুশিতে,
নিন্দুক চারপাশে
তবু দ্যাখো চায় না সে
কাউকেই দূষিতে।

গায়ে তার ভারী জোর,
গুণ্ডা ডাকাত চোর
কাউকে সে ডরে না,
তাই বলে লাঠালাঠি
রেগে মাথা ফাটাফাটি
কক্ষনো করে না।

যদি কেউ লাঠিসোঁটা
ঘোরায়, সে বলে, 'ওটা
কাল হবে, আজ নয় ;
কথায়-কথায় আড়ি
হাতাহাতি মারামারি
বুদ্ধির কাজ নয়।'

বুদ্ধির কাজ কী যে,
সেটাও বলেছে নিজে,
'আগে তো শান্তি চাই,
বাজে কাজ ফেলে রেখে
দই দিয়ে চিঁড়ে মেখে
তাই তো নিত্য খাই।'

আর সেইজন্যেই
শম্ভুর মন নেই
বৃথা ঘুসোঘুসিতে,
ভরপেট শম্ভুর
মন টইটম্বুর
সর্বদা খুশিতে।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ফুটকড়াই

জয় গোস্বামী

পরির পাশে পরির বোন,
দাঁড়িয়ে আছে কতক্ষণ।

জ্বর থেকে তো উঠল কাল,
রোদের তাপে মুখটি লাল।

লম্বা লাইন ইস্কুলের,
দাও দরোয়ান গেট খুলে।

পরির পাশে পরির মাও,
বলছে, ঠাকুর রোদ কমাও,

আবার অসুখ করবে ওর
নষ্ট হবে একবছর।

বয়স কত ? বয়ঃক্রম ?
সেসব ভাবার সময় কম।

ভর্তি হবার জন্য আজ,
টেস্টে বসাই পরির কাজ।

পরি তো নয়, পরির বোন,
পাঁচ বছরের কম এখন।

এদিক তাকায়, ওদিক চায়ঃ
গোরু বসছে গাছতলায়

একটা কুকুর দৌড়ে যায়,
ট্যাক্সি গাড়ি পাশ কাটায়

গাড়ি থামায় নীল পুলিশ···
'কী ভাবছিস রে ? কী ভাবছিস ?'

এ বি সি ডি, ওয়ান টু আর
ভুল করিস না, খবরদার !

ভুল করিস না, লক্ষ্মীটি,
'ছি' দেবে কাকপক্ষিটি।

ভুল করিস না, ধরছি পা'য়
মা কী করে মুখ দেখায়।

না যদি পাস অ্যাডমিশন,
কোন চুলোতে যাই তখন।
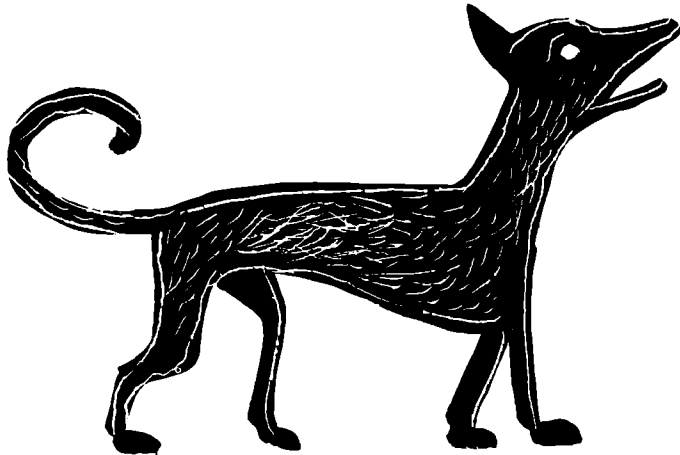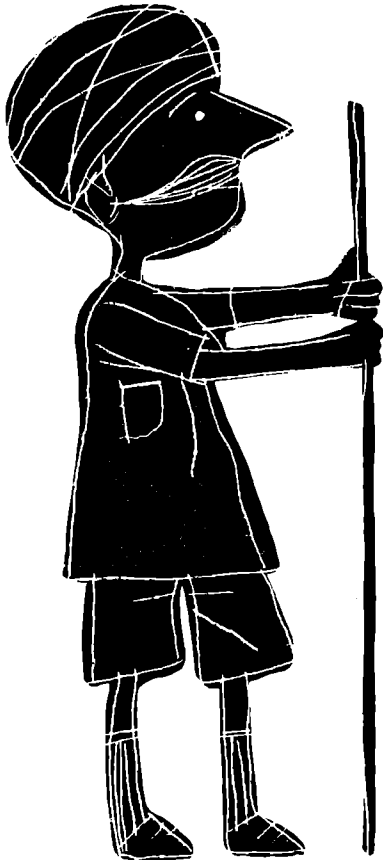
পাশের বাড়ির বাপটুও,
দেখবি কেমন দেয় দুয়ো।

চায় না তো মা আর কিছুই,
নম্বর চায়—আনবি তুই।

নাম হবে তোর খুব বড়,
নামের পাশে নম্বরও

বাড়তে বাড়তে সাতশো মন,
না হবে তোর যতক্ষণ

দাঁড়িয়ে থাকবি, দাঁড়িয়ে থাক,
লাল সাদা আর নীল পোশাক।

পরির দিদি, পরির বোন
কতক্ষণ আর কতক্ষণ

ওই খুলেছে, ওই তো, চল,
রোদ পোড়া সব পরির দল
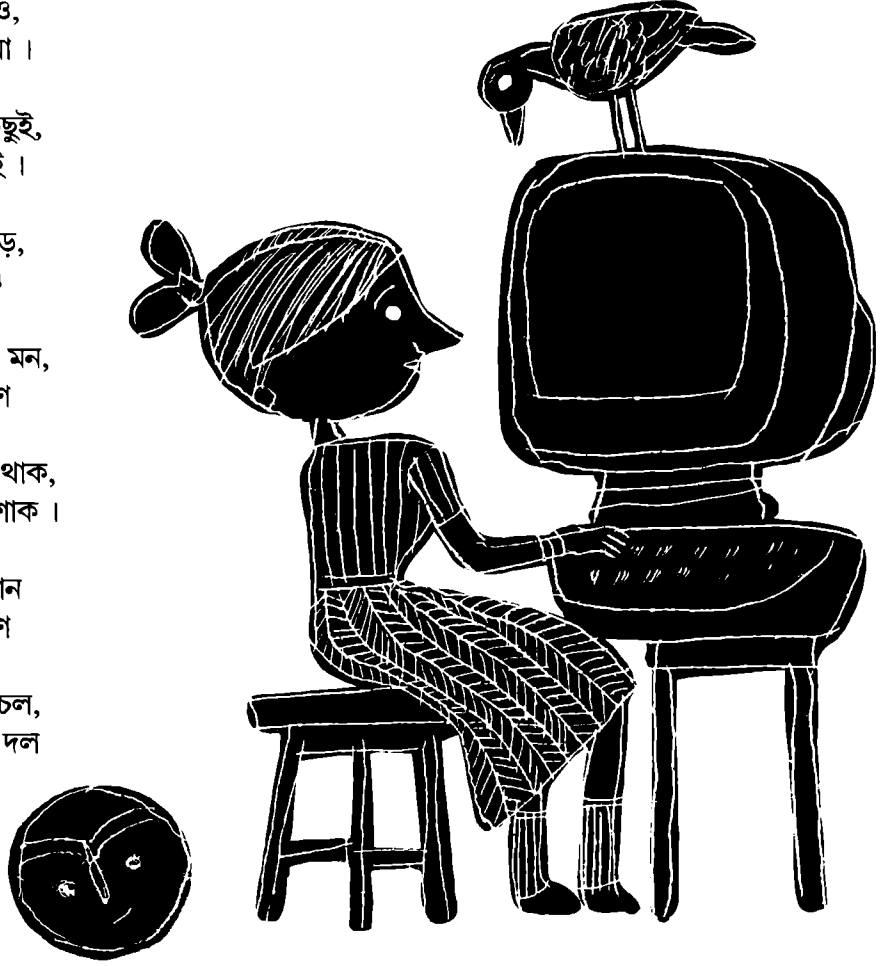
টুম্পি, টিমা, মম, টোকাই
মাথায় মাথায় পিন ঢোকাই।

ফুটকড়াই, ফুটকড়াই,
ঠিক ডাটা ঠিক ফিড করাই।

ব্যস, হয়েছে প্রোগ্রামিং,
তিড়িং বিড়িং তিড়িং বিং

বন্ধ এখন, জোর সে চল,
কোর্সে কোর্সে এগিয়ে চল

ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
মাথার ওপর যাঁতার কল
ফুটফুটে সব ছাত্রীদল
ছাত্রদল
চল রে চল
এই তো চাই, ফুটকড়াই।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

অভিনয় করবার মতো চমৎকার একটি নাটক, আর তার সঙ্গে মজাদার কিছু জাদুর খেলা, অর্থাৎ 'ড্রামা' আর 'ম্যাজিক'— দুইয়ে মিলেই এই 'ড্রাম্যাজিক'।

কাচ্চু-বিবি-টুইং বিটা ইনটু রাহা স্কোয়ার

পি. সি. সরকার (জুনিয়ার)
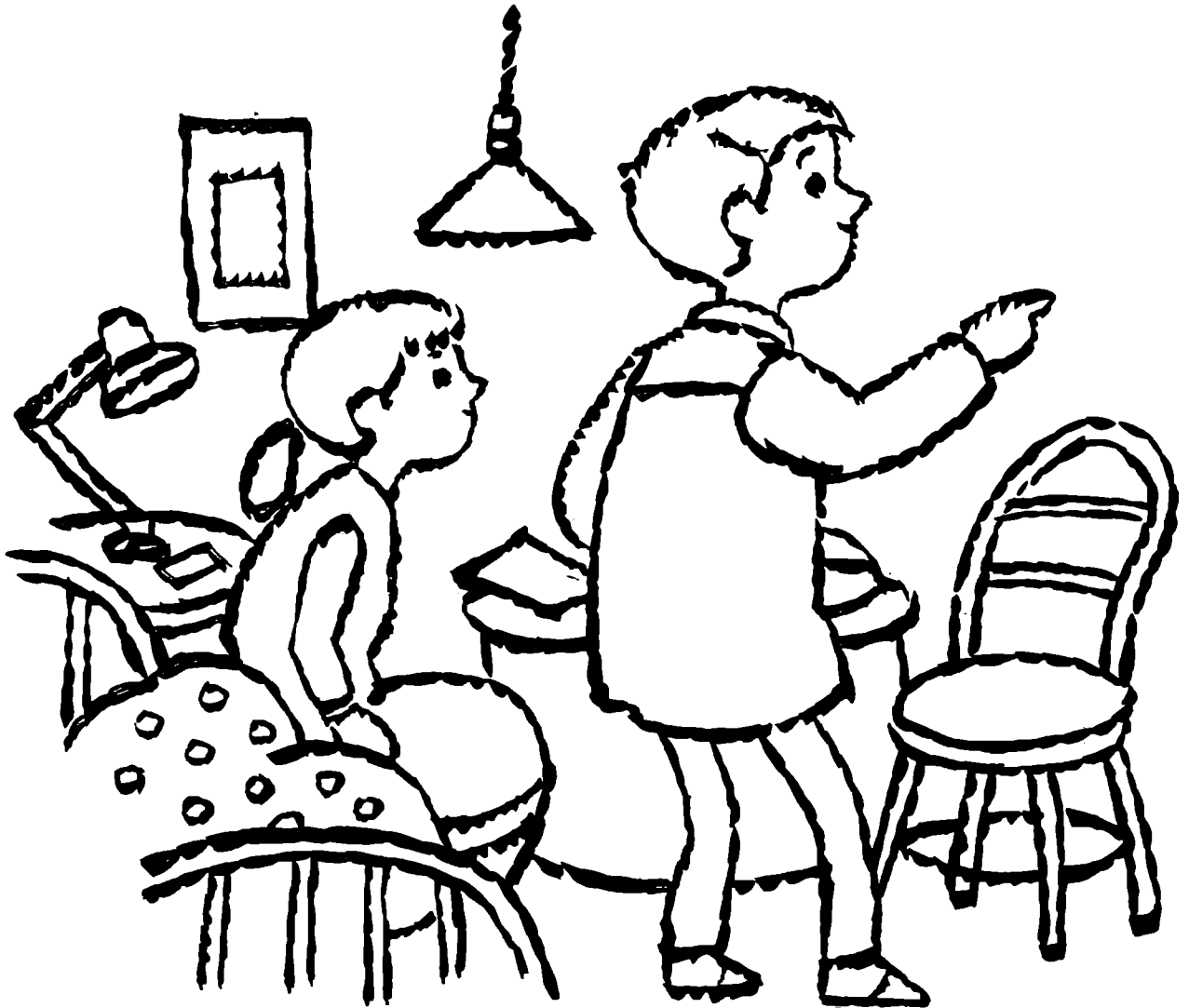
চরিত্র

কাচ্চু : আমাদের গল্পের নায়ক। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। বিজ্ঞানের ছাত্র।

বিবি : কাচ্চুর বোন। ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। দাদার বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সবরকম এক্সপেরিমেন্ট সাধারণত তার ওপরই হয়ে থাকে। ঝগড়া বাধলে কেঁদে জেতে।

ঠাকুমা : কাচ্চু-বিবির নিজের ঠাকুমা নন। বিধবা মানুষ। এই বাড়িতেই বেশ কয়েক বছর ধরে আছেন। নিঃসন্তান। কাচ্চু-বিবিকে খুব ভালবাসেন। পুজোআচ্চা তাঁর লেগেই আছে।

কেষ্টদা : বাড়ির 'অতি পুরাতন ভৃত্য'। দুপুরে ঘুমোয় এবং খেতে ভালবাসে।

কাচ্চুর শোওয়ার ঘর-কাম-পড়ার ঘর। দুটো সিঙ্গল খাট। একটাতে বিবি ঘুমোচ্ছে। অন্য বিছানাটা টানটান। ঘরের আলো নেভানো, তবে পড়ার টেবিলের ওপর রাখা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। কাচ্চু চেয়ারে বসে সেই আলোতে বই পড়ছে ... কী যেন মুখস্থ করছে। মাথার ওপরে দেওয়ালে একটা বড় পেন্ডুলাম ঘড়ি। সকলকে চমকে দিয়ে ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। কাচ্চু একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করে হাতের বইটা রেখে অন্য বইটা তুলে নিল। এই সময় ঘরে ঢুকলেন ঠাকুমা।

ঠাকুমা : ও মা গো ! মরে যাই। কাচ্চু বাবা, তুমি এখনও ঘুমোওনি ! যাও, যাও, শুয়ে পড়ো। আর রাত জেগো না। [ঠাকুমা কাচ্চুর হাত থেকে বইটা টানাটানি করেন। কাচ্চু ছাড়ছে না।]

কাচ্চু : কী করছ ঠাকুমা ... দিলে তো কনসেনট্রেশনটা ভাঙিয়ে, কী যে করো ! বেশ ডুবে ছিলাম লাইফ সায়েন্সে ...
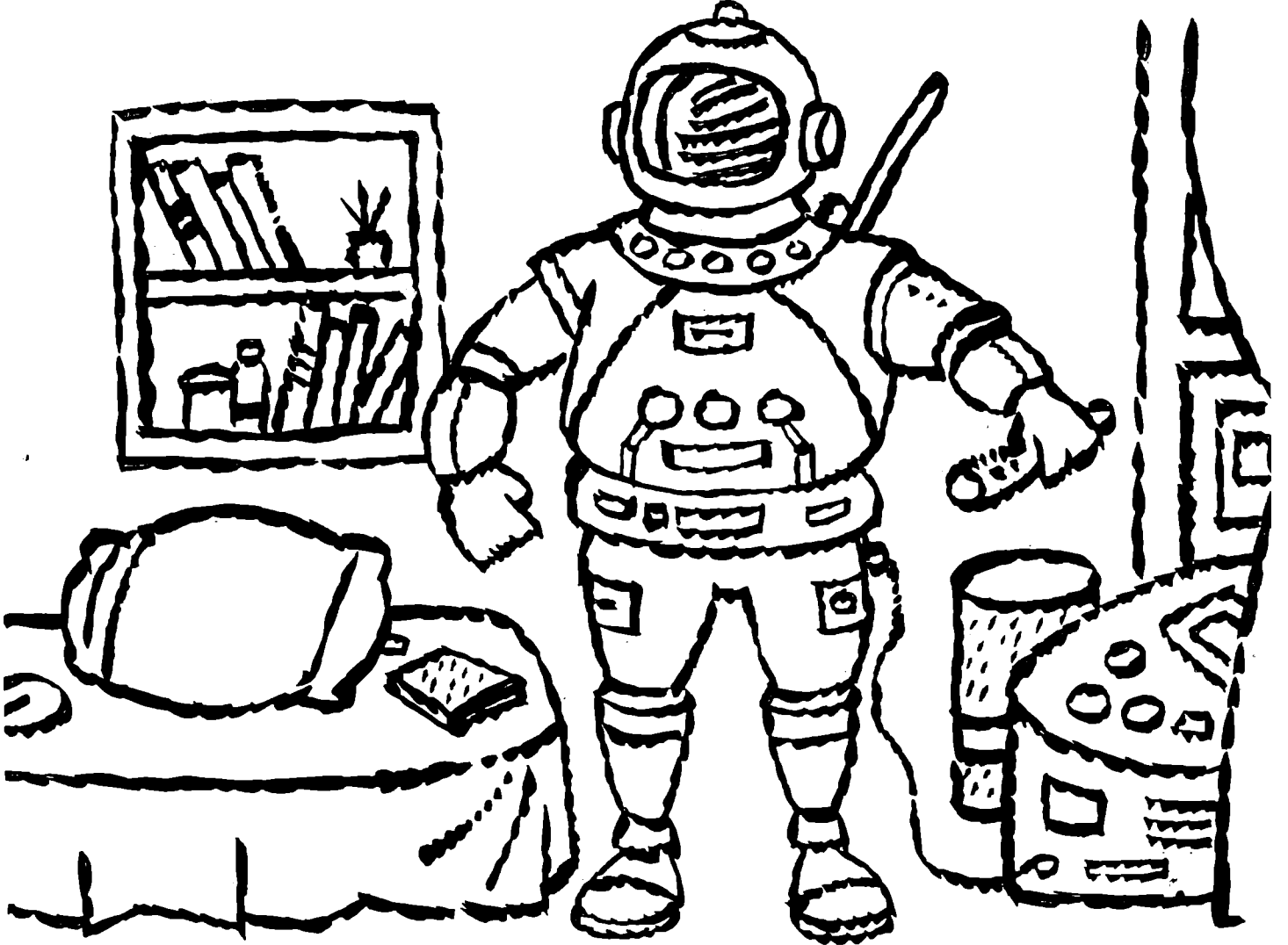
ঘ্যাচাং করে ফিজিক্যাল এডুকেশন চাপিয়ে দিলে।

ঠাকুমা : তা আমায় বেরসিকই বলো আর রসিকই বলো, বয়স তো কম হয়নি। কী-কী করলে ঘুম আসে তা আমার জানা আছে। যাও, চুপ করে শুয়ে ভগবানের নাম করো ... দেখবে ঠিক ঘুম এসে গেছে। [বিবির দিকে তাকিয়ে] ওই দ্যাখো, লক্ষ্মী মেয়ে ঠিক ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাচ্চু : ওর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পাঁচ বছর বাকি আছে ... ও ঘুমোবে না তো কে ঘুমোবে ? [ঠাকুমা বিবির কাছে গিয়ে ওর গায়ে চাদর চাপা দিয়ে দেন। কাচ্চু চেয়ার ছেড়ে ওঠে এবং আড়মোড়া ভেঙে— খাটে এসে বসে। একটু পড়ে শুয়ে পড়ে। ঠাকুমা টেবিল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে চলে যান। আলো- আঁধারি ঘর। নীল আলোয় আবছা-আবছা সবকিছু দেখা যাচ্ছে। কাচ্চু উঠে বসল।]

ধুত্তোর নিকুচি করেছে। ঘুম আসছে না। ...

[এমন সময় উইংস-এর পাশ থেকে খুব জোরে হাওয়া আসতে লাগল। বেশ জোরে।· তাতে কাচ্চুর পড়ার টেবিলের কাগজপত্র উড়তে শুরু করল। বইয়ের পাতাও হাওয়ায় উলটে যেতে লাগল।]

ঠাকুমা : ডুবে ছিলে ? ডুবে ছিলে কই বাবা ! তুমি তো লেখাপড়ার সাগরে ভাসছ ... । ছ্যাঃ, এই নাকি পড়াশুনো ! দিন নেই, রাত নেই, বইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকো, হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর বানাবে। ওঠো, ওঠো, আর পড়তে হবে না।

কাচ্চু : ঠাকুমা, তুমি বুঝছ না ... সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা ... স্কুলে এখনও কোর্স কমপ্লিট করতে পারেনি, আমাদেরকেই বাড়িতে বসে করতে হবে।

ঠাকুমা : তাই বলে রাত জেগে পড়া ! এত রাত জেগে ! আমরা কি রাত জেগে পড়িনি ! বাপ-ঠাকুর্দাকে রাত জেগে দুলে-দুলে রামায়ণ পড়তে দেখেছি ... অ্যাত্ত অ্যাত্ত পড়া ... কিন্তু তাই বলে তোমাদের মতো এমন জন্মের পড়া নয়। যাও, ওঠো ... । [ঠাকুমা বই কেড়ে নেন]

কাচ্চু : উঃ ঠাকুমা। তুমি ইমপ্র্যাকটিক্যাল। জুরাসিক আমলেই রয়ে গেছ। আমাদের টেনশন চলছে, ঘুম আসছে না। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ একটু পড়ে নিই।

কাচ্চু : এই রে, ঝড় এসেছে ...

[হঠাৎ হাওয়ার গতি কেমন পালটে গেল। আগের দিকের হাওয়া বন্ধ হয়ে, ঠিক দিকের উইংস থেকে জোরে হাওয়া আসতে লাগল। ওপাশ থেকে কাগজপত্র উড়ে সব এপাশে আসছে। কাচ্চু ওদিকে যেতে চাইল ... জানলা বা ওই জাতীয় কিছু একটা বন্ধ করতে— কিন্তু হাওয়া ঠেলে সে এগোতে পারছে না। প্রচণ্ড হাওয়ার তোড়। কাচ্চু খুব চেষ্টা চালাচ্ছে। হঠাৎ আচমকাই হাওয়া স্তব্ধ হয়ে গেল। বেশ হকচকিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল কাচ্চু। এমন সময় বিবির বিছানার ওপাশে কী যেন একটা বিশাল বস্তু মাটি ফুঁড়ে উঠতে লাগল। ঘর আলোয় ভরে গেল। পিং কিং-পিং কিং আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু বস্তুটা কী তা দেখা যাচ্ছে না, কারণ ওটা একটা বড় চাদর দিয়ে চাপা। জিনিসটা প্রায় দেড় মানুষের মতো উঁচু হয়ে গজিয়ে উঠল। সটান উঁচু হয়েই সেটা প্রথমে স্থির হয়ে রইল। আর তারপর তার ভেতরে একটা লাল আলো দেখা গেল। আওয়াজে এবং আলোতে বিবির ঘুম ভেঙে গেছে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেই কাপড় চাপা বস্তুটাকে দেখে এবং তারপর বিছানা থেকে ছিটকে নেমে কাচ্চুর কাছে চলে আসে।]

বিবি : ওটা কী রে দাদা ?

কাচ্চু : কী জানি না, ঠিক বুঝছি না। তবে ঘাবড়াস না, আমি সজাগ আছি।

বিবি : ভূত নাকি ! আমার ভয় করছে।

কাচ্চু : বলছি চুপ কর, আমাকে কনসেনট্রেট করতে দে,।

[বিবি চুপ করে দাদার পেছন থেকেই দেখে, ওদিকে লাল আলোর ওখানে চাদরের তলায় কে যেন নড়াচড়া করছে, একটু পরে চাদর ঠেলে একজন মানুষ অদ্ভুত পোশাক পরে বেরিয়ে আসে। গায়ে তার মহাকাশচারীর মতো পোশাক। কোমরের বেল্টে নানারকম সুইচ। ঘাড়ে একটা ছোট্ট এরিয়াল। মাথায় হেডফোন লাগানো। বাঁ হাতে একটা টর্চ জাতীয় বস্তু।]

কাচ্চু : [বেশ উত্তেজিত হয়ে] কে, কে তুমি, ওখানে কী করছ ? [বিবি সুইচ টিপে আলো জ্বালে]

আগন্তুক : [সেও সচকিত হয়ে] কে, কে তুমি, এখানে কী করছ ?

কাচ্চু : ঠাট্টা করছ ? ... আমার ঘরে ঢুকে আমাকে ধমকাচ্ছ ? কে তুমি ?

আগন্তুক : কী বললে ? মারছি ? আমি মারছি ? এত বড় অপমান ? কে তুমি ... পেছনে দেখছি একটা মিনিয়েচার ফেমিনিন স্পিসিসও রয়েছে। কী করছ তোমরা এখানে ?

কাচ্চু : বেশি ফাজলামি কোরো না। আমাদের ঘরে ঢুকে উনি আমাদেরই ধমকাচ্ছেন ! মামার বাড়ি পেয়েছে। দাঁড়াও, তোমার মজা দেখাচ্ছি। [চেঁচিয়ে কেষ্টদাকে ডাকে] ... কেষ্টদা, কেষ্টদা, তাড়াতাড়ি এসো তো, ঘরে চোর ঢুকেছে।

আগন্তুক : সাউন্ড পলিউশন, ... ব্লাড প্রেশার বিপদসীমার কাছাকাছি ... বলছে এটা মামার বাড়ি ! বুনো ব্যাপার ... পুরনো আমলের সিনেমা ... সবকিছু ব্যাকওয়ার্ড ... সূর্যটাও নেই।

[ঠাকুমার প্রবেশ হন্তদন্ত হয়ে, হাতে একটা খুন্তি]

ঠাকুমা : কী হয়েছে বাবা, কী হয়েছে ? কে, কোথায় চোর, মেরে পিটিয়ে ফিশ-ফ্রাই বানিয়ে দেব। [খুন্তি উঁচিয়ে আগন্তুকের দিকে তেড়ে যান। আগন্তুক চমকে ওঠে। হাতের টর্চের মতো বস্তুটাকে জ্বালায়। সেই টর্চের আলো ঠাকুমার গায়ে গিয়ে পড়ে। ঠাকুমা 'স্ট্যাচু' হয়ে যান। কথাও হয়ে যায় বন্ধ।]

কাচ্চু : কী, এ কী হল ঠাকুমার ! [ঠাকুমার কাছে গিয়ে] তুমি হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে গেলে কী করে ? ওমা, তোমার গা কী গরম ! [ঠাকুমাকে স্পর্শ করে সে হাত ছিটকে সরিয়ে নেয়, অসহায়, খুন্তি উঁচু ভঙ্গিতে ঠাকুমা একেবারে 'নট নড়ন-চড়ন, নট-কিছু' হয়ে আছেন। আগন্তুক তার টর্চ কাচ্চুর দিকে তাক করে সন্তর্পণে এগিয়ে আসে। কাচ্চু চিন্তিত, ভীত।]

আগন্তুক : সদলবলে তোমরা বিরাট গ্যাং নিয়ে এসেছ ? [ঠাকুমার খুন্তির দিকে তাকিয়ে] সঙ্গে আবার প্রি-হিস্টোরিক অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে। পোশাকও পরেছ আজব। কোন জঙ্গল থেকে এসেছ বাবা ? না কি মিউজিয়াম থেকে ছাড়া পেয়েছ ?

বিবি : এঃ, কথাবার্তা ভীষণ খারাপ। নিজে চোর গুণ্ডা ... আমাদের জানোয়ার বলছে।

আগন্তুক : [বিবির দিকে তাকিয়ে] ভয়েসের কোয়ালিটিও প্রি-হিস্টোরিক— বেশি শ্বাস দিয়ে কথা বলছে ! এনার্জির অপচয় !

কাচ্চু : বাজে কথা বোলো না। বলো তুমি কে ? আমাদের বাড়িতে কী করছ ?

আগন্তুক : তুমি চুপ করো। তুমি বলো এখানে আমাদের বাড়িতে এসে কী করছ !

কাচ্চু : তোমার বাড়ি ?

আগন্তুক : হ্যাঁ, আমার বাড়ি !

কাচ্চু : মোটেই না, এটা আমাদের বাড়ি। আমার ঠাকুর্দার কেনা জমিতে আমার বাবার তৈরি-করা বাড়ি। আমরা তিনপুরুষ এই ভিটেতে আছি।

আগন্তুক : এঃ, তিন পুরুষ দেখাচ্ছেন। কচি খোকার ফ্যামিলি ! আমরা সাতশো পুরুষ ধরে এই বাড়িতে আছি। এটা

আমাদের অফিশিয়াল ফ্যামিলির আস্তানা। এই ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার— সব আমরা কয়েক পুরুষ ধরে কিনেছি। ধারে কিনেছিলাম, দু'পুরুষ ধরে আইডিয়া এবং ব্রেন সেল কন্ট্রিবিউট করে প্রায় শোধ করে এনেছি। [চারদিকে তাকিয়ে] আরে সেসব কোথায় গেল, [হতচকিত হয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে দেখে] আমার কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, রোবো ... সব গেল কোথায় ! আমার ল্যাবরেটরির এ কী হল ? [খাট দেখে] এ কী ? ইন্টারপ্ল্যানেটরি কমিউনিকেশন মেশিনের জায়গায় পড়ে আছে। একটা বিতিকিচ্ছিরি বিছানা, তাতে কিলবিল করছে ব্যাকটিরিয়া ! বুনোদের কারবার, আক্রমণ করেই তছনছ করেছে।

কাচ্চু : কী হিজিবিজি বকছে রে বাবা ! এটা ল্যাবরেটরি, কে বলেছে ? এটা তো আমাদের বেডরুম। বেডরুমে খাট থাকবে, না কি খাটাল থাকবে ? বুদ্ধু, পণ্ডিতি রাখো। বড়-বড় কথা বলে রেহাই পেতে চাইছেন। সত্যি করে বলো কে তুমি ?

আগন্তুক : বেডরুম ! সে কী ! শহরের মধ্যে বাড়ি, তাতে আবার বেডরুম ! হাঃ হাঃ, কী প্রিমিটিভ আইডিয়া ! দশ পুরুষ আগে এমন ছিল বলে শুনেছি, কিন্তু আজকের এই অ্যাডভান্সড কনডেন্সড লাইফ ফোর্সের সার্কুলার বিমের যুগের নয় !

কাচ্চু : সার্কুলার বিম ! কনডেন্সড লাইফ ! কী সব উলটোপালটা বকছ ! চোর এসেছে চুরি করতে, না কি ভুলভাল লেকচার শোনাচ্ছেন ! আরে বাবা, এটা কম্পিউটারের যুগ। অ্যাটম মেগাটম বোমের যুগ ছাড়িয়ে মাইক্রোচিপ্‌স এর যুগ। মহাকাশে মানুষ পাঠাবার যুগ ! মানুষ এখন সভ্যতার চূড়ান্ত যুগে এসে গেছে।

আগন্তুক : মাইক্রোচিপ্‌স ! সে কী ! [এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকায়, অবাক হয় !] আরে ! এ-মা, তাই তো ! ভুল হয়ে গেছে। বিরাট ভুল। সরি, সরি, রুটিন চেক করে অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে, উলটো পয়েন্টে পাঞ্চ করা হয়ে গেছে। আমি দুঃখিত, লজ্জিত, ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না। সরি, সরি।

বিবি : সরি, সরি বলছ কেন ? চুরি করতে এসে ধরা পড়ে এখন সরি বললেও হবে না। ঠাকুমাকে কী করেছ ? ঠিক করে দাও।

আগন্তুক : চোর ! না, না, ছি ছি। আমি চোর নই, আমি বাড়িরই লোক, আপনাদের আপনজন। আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি আপনাদের আত্মীয়। ছি, ছি, ছি, এ কী করলাম ! এমন ইতিহাস আমায় অ্যাডজাস্ট করবে কী করে ? [মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে আগন্তুক। বিবি-কাচ্চু দু'জনেই চোখে চোখে ইশারা করে তার দিকে ছুটে যায়। কাচ্চু তার হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নেয়, বিবি দৌড়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা স্কেল এনে বীরাঙ্গণার মতো পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ওর হাতে ওটা একটা ত্রিশূল বা ওই জাতীয় কিছু একটা হবে। আগন্তুকের কিন্তু সেদিকে নজর নেই, সে মাথা চাপড়ে যেন চুল ছিঁড়ছে।]

বিবি : দাদা, লোকটা পাগল নয় তো ?

কাচ্চু : হতে পারে, তবে চান্স কম। দেখছিস না ঠাকুমা কেমন স্ট্যাচু হয়ে আছে। লোকটার বোধ হয় কিছু গোপন ক্ষমতা আছে। বিদেশি স্পাইও হতে পারে, আমাদের গোপন তথ্য চুরি করতে এসেছে। তা ছাড়া ...

বিবি : তা ছাড়া কী ?

কাচ্চু : অন্য গ্রহের মানুষও হতে পারে।

আগন্তুক : [আস্তে আস্তে করে মাথা তুলে] আমি স্পাইও নই অন্য গ্রহের মানুষও নই। আমি এই বাড়িরই ছেলে। বাইরের কেউ নই।

বিবি : আবার হিজিবিজি বকছে রে—

আগন্তুক : হিজিবিজি নয়, গ্রেট গ্র্যান্ড ঠাকুমা, হিজিবিজি নয়। আমার ত্রুটি মার্জনা করবেন। ছোট মুখে অনেক বড়-বড় কথা বলে ফেলেছি, আমার প্রণাম নিন। [বলেই বিবিকে টিপ করে প্রণাম করল, আঁতকে হাউমাউ করে পিছিয়ে যায় বিবি। আগন্তুক এবার কাচ্চুর পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে] আমার প্রণাম নিন গ্রেট গ্র্যান্ড ঠাকুর্দা। [কাচ্চুকে প্রণাম করতে যায়। তড়াক করে লাফিয়ে পিছিয়ে যায় কাচ্চু। হাতের টর্চটা তার দিকে করে বলে]

কাচ্চু : চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না, ভুলিয়েভালিয়ে আমার পা ধরে টানবার ধান্দা ! উঠে দাঁড়াও। ওঠো, নইলে এই টর্চ জ্বেলে তোমাকেও স্ট্যাচু বানিয়ে দেব।

আগন্তুক : ওটা দিয়ে ও কাজ হয় না গ্রেট গ্র্যান্ডঠাকুর্দা, ওটা দিয়ে নয়। আমি আমার কোমরের এই স্টানিং বোতাম টিপে ওর মেটাবলিজম স্তব্ধ করে রেখেছি। আর ওটা [টর্চটা দেখিয়ে] হচ্ছে স্ক্যানার বিমার। ওটা দিয়ে ওর মনের ভায়োলেন্সকে আমি নিউট্রালাইজ করেছি।

বিবি : কীসব বলছে হিজিবিজি !

কাচ্চু : ঠিক আছে, তবে ঠাকুমাকে ঠিক করতে দাও। [আগন্তুক তার কোমরের একটা বোতাম টেপে, অন্য আর-একটা বোতাম ঘোরায়, মাথায় এরিয়ালের ওপরে একটা লাল লাইট জ্বলে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুমা নড়তে শুরু করেন। খুন্তিটাকে নামিয়ে একটা বিশাল হাই তোলেন।]

ঠাকুমা : এই মশার জ্বালায় ঘুম হচ্ছে না। [আবার হাই তোলেন] খুন্তি দিয়ে মশা তাড়ানো যায় ? ভয়ই পায় না [হাই তোলেন এবং উইংসের ভেতরে চলে যান।]

বিবি : [চেঁচিয়ে] ঠাকুমা তুমি যেয়ো না, যেয়ো না,প্লিজ। [ঠাকুমা ফিরে আসেন, ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকান। তারপর হাই তুলে মেঝেতেই শুয়ে পড়েন।]

আগন্তুক : ওঁর জন্য টেনশন করবেন না। ওঁর বিশ্রাম দরকার। রেক্টিফায়েড ব্রেন, ঠিক বেবির মতো, বেশি ঘুম প্রয়োজন। আপনারা ভয় পাবেন না, একটু পরেই সময়মতো জেগে উঠে কাজ করবেন, খেলা করবেন, লড়বেন !

কাচ্চু : তুমি কে হে ? একটু ঠিকঠাক বলো তো, হেঁয়ালি কোরো না।

বিবি : [কাচ্চুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে] তোমার বাবার নাম কী ? কোন ক্লাসে পড়ো ?

কাচ্চু : [বিবিকে শান্ত করে] বিবি কেসটা আমাকে হ্যান্ডেল করতে দে। ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

আগন্তুক : সিরিয়াস মানে ! খুবই সিরিয়াস। আপনাদের কাছে যত না সিরিয়াস, আমার কাছে আরও বেশি। ইতিহাস, বিজ্ঞান, জনসংখ্যা, ক্রাইম, বহুদিক থেকেই সিরিয়াস।

কাচ্চু : আর জট পাকিয়ো না। যথেষ্ট হয়েছে। এবার বলো তুমি, মানে আপনি কোত্থেকে এসেছেন ?

আগন্তুক : [জিভ কেটে] আরে ছ্যা ছ্যা, আমায় 'আপনি' বলবেন না, একদম না। আমি আপনার চেয়ে কত ছোট, টু বি প্রিসাইজ, এক্কেবারে সাত হাজার ছশো পঁয়ষট্টি বছর ছোট।

কাচ্চু+বিবি : সাত হাজার ছশো পঁয়ষট্টি !— সে কী ?

বিবি : কিছু বুঝছি না !

কাচ্চু : ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন না !

আগন্তুক : 'বলুন' নয়, 'বলো' বলুন আমাকে। আমরা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে শেখার ট্রেনিং নিয়েছি। পুরো কোর্স কমপ্লিট করেছি। এখন সে-শিক্ষা কাজে না লাগালে আমার ব্রেন এবং নলেজ ব্যাঙ্ক কম্পিউটার সঠিকভাবে একতালে কাজ করবে না। সার্কিট কেটে যাবে।

কাচ্চু : আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, ঠিক আছে বলো, বলো।

আগন্তুক : আমি আপনাদের এই 'রাহা' পরিবারেরই ছেলে।
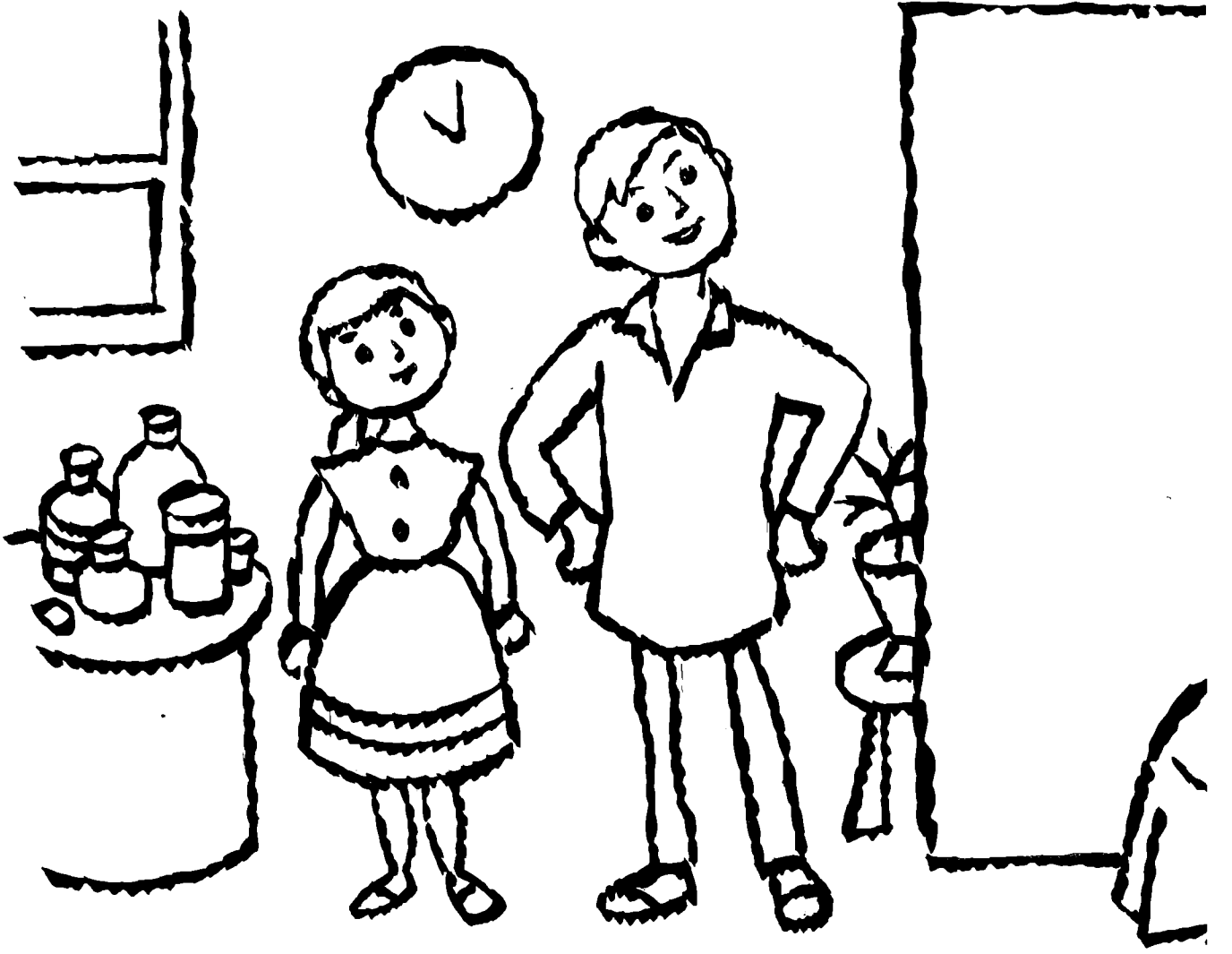
এই স্পিসিজ-এর ডাইরেক্ট বংশধর। এটা আমাদেরই পারিবারিক বাড়ি, আপনারা হচ্ছেন আমার পূর্বপুরুষ, আমি হচ্ছি [বিবির দিকে তাকিয়ে] আপনাদের নাতির নাতির নাতির ... নাতির নাতির নাতির নাতি। আমার নাম ফাইভ এক্স স্ট্রোক বিটা ইনটু রাহা স্কোয়ার। আমার বাবার নাম ফোর এক্স স্ট্রোক আলফা রাহা স্কোয়ার। আমার মায়ের নাম বিটা ডবল প্লাস দত্ত রেকারিং। জেনেটিক্যালি আমার রোল নম্বর হচ্ছে মাক্স ফরটি ফাইভ ড্যাশ টেকনো ফিজিক্স বাই থ্রি টুইস্ট। আমার নাগরিকত্ব নম্বর হচ্ছে গ্যালাফ স্ট্রোক সান ড্যাশ আর্থ ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্ড সাবডিভিশন স্ট্রোক বেঙ্গ ডি ওয়াই ডি এক্স ক্যাল উইদিন ব্র্যাকেট নাইনটি-থ্রি পয়েন্ট দু' সিক্স মিলিয়ন ...।

কাচ্চু : থাক, থাক, আর বলতে হবে না [স্বগতোক্তি] ওরে বাপ রে বাপ, কিছু বকতে পারে লোকটা! পাগল নাকি লোকটা, কে জানে!

আগন্তুক : না, না, আমি পাগল নই! আপনি ভাবছেন আমি পাগল!

কাচ্চু : আমি কী ভাবছি তুমি জানলে কী করে?

আগন্তুক : আপনার ব্রেন-ওয়েভের সঙ্গে আমি আমার ব্রেন ওয়েভ লেংথ এক করে নিয়েছি। সেজন্য ভাষাটাও এক বলছি। আপনার চিন্তাও শুনতে পাচ্ছি।

কাচ্চু : [মাথা চুলকে] যা ব্বাবা, এ তো মহা গোলমেলে ব্যাপার!

বিবি : দাদা, পুলিশে খবর দে। বাবা-মাও বাড়ি নেই, দাঁড়া কেষ্টদাকে ডাকি। [চিৎকার করে] কেষ্টদা ...

কাচ্চু : কেষ্টদা না, কুম্ভকর্ণ বল, তাতে যদি লজ্জায় ঘুম ভাঙে ...

আগন্তুক : আপনারা শুধু-শুধু নার্ভাস হচ্ছেন ... আমি আপনাদের কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। ভুল করে চলে এসেছি। আমি এই বাড়িরই ছেলে— বংশধর। ভবিষ্যতের মানুষ— আমাদের এখন ন'হাজার ছশো-একষট্টি খ্রিস্টাব্দ চলছে। আমি আমার ইতিহাস শিক্ষার মেশিনে বসে ব্রেন সেলে পুরনো কথা রেকর্ড করছিলাম। আমার হাতের কার্ডে 9661 লেখাটা উলটে— 1996 হয়ে যায়। ভুল করে ওই নম্বরটা পাঞ্চ হয়ে যায়। আমি মেশিন সমেত সময়কে অতিক্রম করে 1996-এ চলে আসি। একই স্থান, একই স্পেস— শুধু টাইমটা পালটে আমার সময় থেকে আপনাদের সময়ে এসে গেছি। 9661 থেকে 1996— আমার এটা করায় হিস্ট্রিতে গোলমাল হতে পারে। আমি
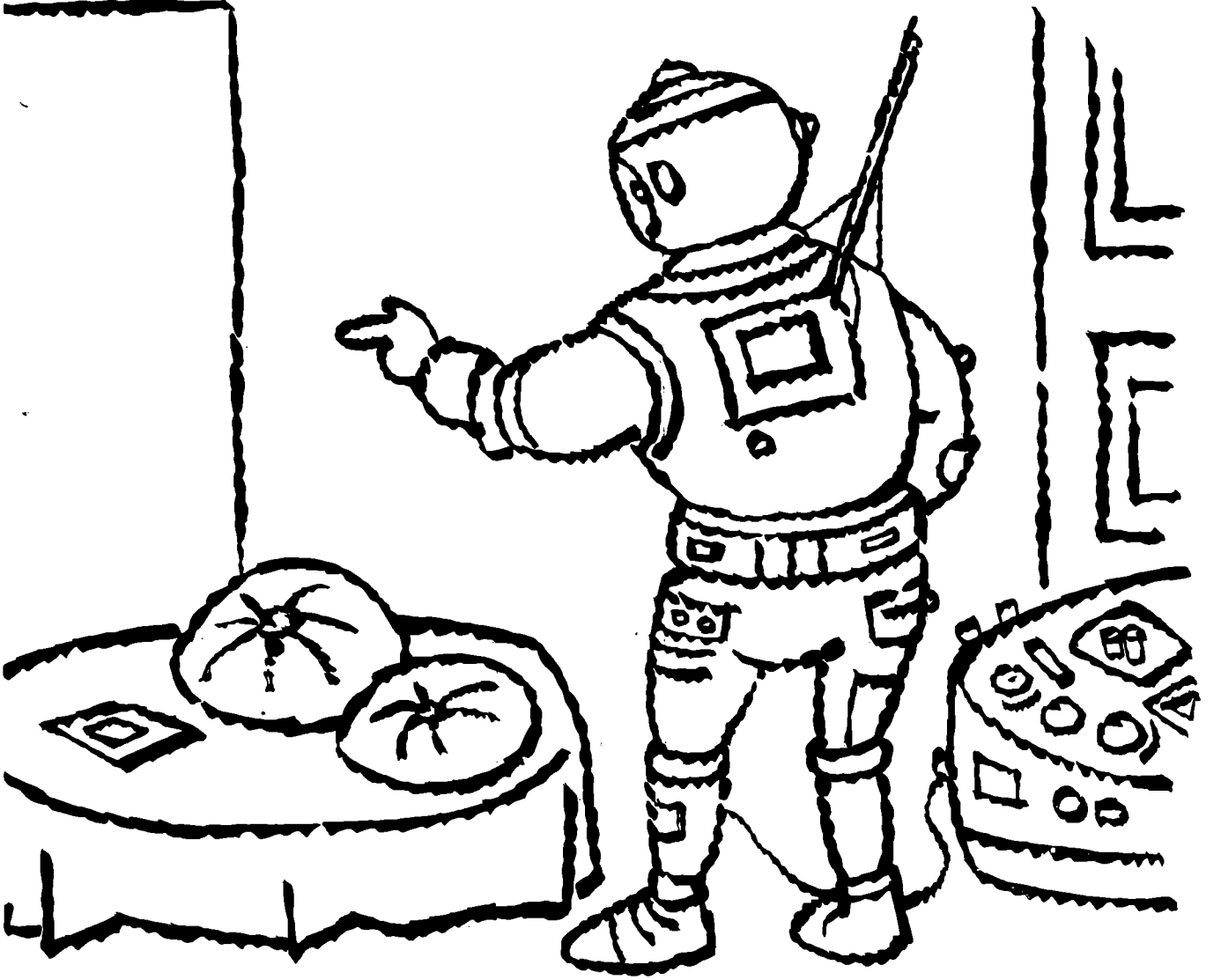
ইতিহাসে নেই— কিন্তু যদি ঢুকে যাই তা হলে সবকিছুকে আবার রি-রাইট করে কারেক্ট করে নিতে হবে— [মাথা থাবড়ে] এ আমি কী করলাম ! [কাচ্চু, বিবি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, আগন্তুকের দিকে এগিয়ে যায় ।]

কাচ্চু : তুমি আমাদের ফ্যামিলির ভবিষ্যতের বংশধর । তুমি— ফাইভ এক্স-স্ট্রোক না কি কী একটা বললে ...

আগন্তুক : [ফুঁপিয়ে কেঁদে] হ্যাঁ আমার ভালনাম ফাইভ এক্স স্ট্রোক বিটা ইনটু রাহা স্কোয়ার । আমার ডাকনাম টুইং । আপনারা আমায় 'টুইং' বলেই ডাকবেন ।

বিবি : তোমার নাম টুইং ?

আগন্তুক : হ্যাঁ, ঠিকই উচ্চারণ করেছেন গ্রেট গ্র্যান্ডঠাকুমা ।

কাচ্চু : গল্পটা বেশ ভালই লাগছে মিঃ টুইং, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা নেই । এখনও পর্যন্ত তুমি ভবিষ্যতের মানুষ বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারোনি । শুধু-শুধু বাক্যি দিয়ে কি প্রমাণ হয় ? কিছু প্রমাণ দাও, প্রমাণ !

বিবি : হ্যাঁ, তুমি প্রমাণ করে দেখাও যে তুমি টুইং ।

আগন্তুক : প্রমাণ ! তাই তো ! কিন্তু প্রমাণ সার্টিফিকেট নিয়ে তো আমি আসিনি ! আমি চলে এসেছি অ্যাক্সিডেন্টালি । কোনও প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি ... প্রস্তুতি নিয়ে এলে কিছু স্যুভেনির নিয়ে আসতাম ।

কাচ্চু : আমরা কোনও গিফট্ চাইছি না, প্রমাণ চাইছি ... । এমন একটা কিছু দেখাও, যা দেখে বুঝব তোমার কথাগুলো সত্যি ।

আগন্তুক : [চিন্তিতভাবে] কী যে দেখাই ... আচ্ছা [আরও চিন্তা করে তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে] ও হ্যাঁ, এটা বোধহয় কিছুটা প্রমাণ করবে ... এটা আপনাদের সময়ে নেই ।

কাচ্চু : আরে, ঘড়ির সময় না মিললেই কি অন্য সময়ের মানুষ হয় ?

আগন্তুক : এটা ঘড়ি নয় । এটা ইতিহাস বইয়ের ট্যাচিমিটার । রেফারেন্স ব্যাঙ্ক কাম ইনফর্মার । তা ছাড়া যখন যে জিনিস নিয়ে আলোচনা হয় ঠিক তখনকার তারিখ, সময়, বছর এবং ওই সংক্রান্ত কিছু তথ্য সব এতে দেখা যায় ।

কাচ্চু : তার মানে ?

আগন্তুক : মানে আপনি যে-কোনও একটা ঘটনা বলুন, সেটা কবে, কখন ঘটেছিল, আমি এগজ্যাক্টলি সেটা বলে দেব ।

কাচ্চু : আচ্ছা, জিজ্ঞেস করছি ...

বিবি : ভারত কবে স্বাধীন হয়েছিল ?

কাচ্চু : আরে, না, না, এর উত্তর তো সব্বাই জানে। আমি কঠিন প্রশ্ন করছি। বলো তো আমার বাবার জন্মদিন কবে ?

আগন্তুক : [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] আপনার বাবার জন্মদিন হচ্ছে পয়লা মার্চ 1956 ... ভোর বারোটায়। উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি লিপ ইয়ারে জন্মও বলতে পারতাম। ওঁর জন্মতারিখ নিয়ে কনফিউশন ছিল, আছেও। কমপ্লিকেশন এড়াবার জন্য লিপ ইয়ার বা চার বছর পরপর জন্মদিনের ঝামেলা বাঁচাতে পয়লা মার্চ ভোর বারোটা বলে রেকর্ডেড হয়েছে। কিন্তু আমার ট্যাচিমিটার বলছে— উনি জন্মে যখন প্রথম 'ওঁয়া' বলে কেঁদেছিলেন তখন সময় ছিল রাত বারোটা বাজতে ছ' সেকেন্ড বাকি ... অর্থাৎ আসল জন্মদিন হচ্ছে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি।

কাচ্চু : ওরে বাপ রে বাপ, এত কে জানতে চেয়েছে ... আর তা ছাড়া এ-কথা যে সত্যি তাই-বা জানবে কীভাবে ? আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন করছি ... আমার মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার ডেট কবে ?

আগন্তুক : [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] ওরা অ্যানাউন্স করেছে সতেরোই মার্চ হবে। কিন্তু সেটা হবে না। কারণ সেদিন ট্রামলাইন থেকে বে-আইনিভাবে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে পথ অবরোধ হবে। ট্রাম, বাস, ট্রেন কিছু চলতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা অন্যদিন হবে বলেও ঘোষণা করবে, কিন্তু হবে না। পরীক্ষার্থীদের অ্যাভারেজ মার্ক বসিয়ে ফিফটি পার্সেন্ট ছাত্রছাত্রীকে এরিয়া-ওয়াইজ পাশ করিয়ে দেওয়া হবে। কেউ প্রতিবাদ করলে তার ওকালতি অনুযায়ী তিন নম্বর গ্রেস দেওয়া হবে।

কাচ্চু : [প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে] ছ্যাঃ ... অ্যাভারেজ মার্ক ? মিথ্যে কথা ... এ হতেই পারে না ! তুমি আতঙ্ক ছড়াচ্ছ ... গ্যাস দিয়ে নিজের ইমপরট্যান্স বাড়াচ্ছ !

আগন্তুক : ছিঃ, কী যে বলেন ! আমি 'গ্যাস' ছড়াব কেন ! এই দেখুন না ... ট্যাচিমিটারে এই রেফারেন্সই তো দিচ্ছে। এই দেখুন লেখা আছে, আপনি টেস্টে অঙ্কে ৪7% নম্বর পেয়েছিলেন। ফাইনালেও ৪7% পাবেন ... আপনারা প্রতিবাদ করবেন না। সেজন্য অতিরিক্ত তিন নম্বরটা আপনাকে দেওয়া হবে না।

বিবি : দাঁড়া দাদা, আমি এবার একটা প্রশ্ন করছি। বলো তো আমার বাবা-মা কোথায় ?

আগন্তুক : [ঘড়ি দেখে] আপনাদের বাবা-মা দুর্গাপুরে গেছেন, কাজে।

বিবি : ও মা ! ঠিক বলেছে !

কাচ্চু : আমি ঠিক কনভিন্সড হলাম না ...। ওয়েল ইনফর্মড চোর-ডাকাতও চালাক হলে এমন সব জবাব দিতে পারে। টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের কিছু দেখাও।

আগন্তুক : আপনি ঠিকই বলেছেন ... কিন্তু .. কী যে দেখাই... ও হ্যাঁ... আমার কাছে একটা ফুটোগ্রাফ আছে।

কাচ্চু : ফুটোগ্রাফ—সে আবার কী ! ফোটোগ্রাফকেই ঘুরিয়ে বলছ না তো ?

আগন্তুক : না, না, ফোটোগ্রাফ আর ফুটোগ্রাফ এক নয়। একদম আলাদা জিনিস। চাঁদ আর চাঁদা কি এক জিনিস ? নেতা আর ন্যাতা এক ? ফোটোগ্রাফ আর ফুটোগ্রাফও এক নয়। দেখাচ্ছি··· [বলেই সে জামার ভেতর থেকে একটা ভাঁজ-করা ঠোঙা বের করে। সেটা ফুলিয়ে টানটান করে উলটে দেখায় ভেতরে কিছু নেই। তারপর সেই ঠোঙাটাকে কাচ্চুর পড়ার টেবিলের ওপর রাখে। তারপর বিবির দিকে তাকিয়ে] আপনিই বলুন গ্রেট গ্র্যান্ডঠাম্মা, আপনার কী পেতে ইচ্ছে করছে ? যা চাইবেন তার একটা স্যাম্পেল এই ঠোঙায় হাত ঢোকালেই পাবেন। বলুন, কী চাই ?

বিবি : ইয়ে, মানে, আমায় একটা ফুল দাও। [আগন্তুক ওই ঠোঙায় হাত ঢোকায়, এবং এক তোড়া ফুল বের করে আনে। বিবি অবাক !]

কাচ্চু : আমার ফিজিক্যাল সায়েন্সের একটা বই এক বন্ধু নিয়ে গেছে, সেটা এনে দাও তো !

আগন্তুক : সেটা আনা যাবে না, তবে সেরকম একটা আনতে পারি।

কাচ্চু : তাই-ই আনো।

[আগন্তুক আবার ঠোঙায় হাত ঢোকায়, এবং একটা বাঁধানো বই বের করে আনে।]

কাচ্চু : [অবাক হয়ে] আশ্চর্য !

আগন্তুক : থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি তা হলে কনভিন্স্‌ড হয়েছেন ?

কাচ্চু : আমি হাত ঢোকালে হবে ?

আগন্তুক : হবে, তবে হাতটাকে আগে পিওরিফাইড এবং ক্লাইমেটাইজ্‌ড করে নিতে হবে।

কাচ্চু : সে আবার কীরকমভাবে করে ?

বিবি : সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে ?

আগন্তুক : না, না, না, ওসব পুরনো ব্যাপার, ওসবের চল উঠে গেছে। আপনি হাত দুটো লম্বা করে ধরুন, আমি ওই স্ক্যানার বিমার দিয়ে রেকটিফাই করে দিচ্ছি। [আগন্তুক কাচ্চুর কাছ থেকে ওই টর্চটা নিতে হাত বাড়ায়। কাচ্চু সেটা দিতে একটু ইতস্তত করে। তারপর কী একটা ভেবে দিয়ে দেয়।]

আগন্তুক : থ্যাঙ্ক ইউ গ্রেট গ্র্যান্ডঠাকুর্দা। আপনি আমায় বিশ্বাস করেছেন দেখে 'অনারড ফিল' করছি। আপনি হাত দুটো লম্বা করে রাখুন। আমি চট করে কাজ সেরে নিচ্ছি। [কাচ্চু হাত দুটো লম্বা করে ধরে। আগন্তুক টর্চ জ্বেলে হাতে আলো ফেলে। হাত দুটো সঙ্গে-সঙ্গেই কেঁপে ওঠে। কাচ্চু অবাক হয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখছে। হাত দুটো কাঁপছে তো কাঁপছেই।]

কাচ্চু : এত কাঁপছে কেন হাত দুটো ? যেন আমার কন্ট্রোলে নেই, একদম হালকা হয়ে যাচ্ছে ! এ কী ! আবার ভারী হয়ে যাচ্ছে !

আগন্তুক : এরকম দু-একবার হবে, আর তারপর পিওরিফাইড-ক্লাইমেটাইজ্‌ড হয়ে যাবে। ওই হাতে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় কোনও ম্যাল-ফাংশনিং হবে না। ওই হাত দিয়ে যা করবেন সব হবে কারেক্ট। ছবি আঁকতে পারবেন, তবলা বাজাতে পারবেন, গল্প লিখতে পারবেন, একটাও স্পেলিং মিসটেক হবে না।

কাচ্চু : এখন ফুটোগ্রাফে হাত ঢোকাতে পারি ?

আগন্তুক : হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারেন। আগে ভেবে নিন কী চান। তারপর হাত ঢোকান। তবে হ্যাঁ, বেআইনি কিছু চাইবেন না। তা হলে ফুটোগ্রাফটা নষ্ট হয়ে যাবে। [কাচ্চুর কাছে বিবি ঘেঁষে আসে]

বিবি : কী চাইবি রে দাদা ?

কাচ্চু : ভাবছি কী চাওয়া যায় ! পরীক্ষার কোশ্চেন পেপার চাইতাম, কিন্তু সেটা বেআইনি হয়ে যাবে।

আগন্তুক : হেঃ হেঃ, সেটা ঠিক নয়, করতে গেলে সার্কিট-ব্রেকার আছে, ওটা সেল্ফ-ডেস্ট্রাক্ট মোডে সুইসাইড করবে।

বিবি : তোমার ফুটো মেশিন সুইসাইড করবে ?

আগন্তুক : হ্যাঁ, ওভাবেই ওটা তৈরি করা। শুধু ওটা নয় আমাদের প্রায় সবকিছুই ওভাবে প্রোগ্রাম করা। চুরি-প্রুফ বাড়ি, হাইজ্যাক-প্রুফ রকেট, ছিনতাই-প্রুফ রাস্তা। মিথ্যেকথা-প্রুফ পলিটিক্যাল লেকচার, সবকিছুতেই মাস্টার কম্পিউটারের সুইসাইড মোডে ফিট করা আছে। আইন ভাঙতে চাইলেই মেশিন

গড়বড় করবে। বাড়িতে কেউ চুরি করতে ঢুকলে রেকটিফায়ার অন হয়ে যাবে। মানুষের মোটিভ ফ্রিকোয়েন্সিকে বুঝে সেটা 'অন', 'অফ' হয়। অন হলে সেটা থেকে একটা করুণ সুরে মিউজিক বেরোবে, সবাই বুঝতে পারবে লোকটার মাথায় গোলমাল আছে, ও চুরি করতে চাইছে··· । ছিনতাই-প্রুফ রাস্তা তো আরও ভাল। কেউ ছিনতাই করতে চাইলেই সামনের ল্যাম্প পোস্ট বেঁকে স্টার্নিং বিম এসে তার নার্ভকে স্তব্ধ করে দেবে। সমস্ত টেলিভিশনে সঙ্গে-সঙ্গে তার ছবি দেখা যাবে। কী লজ্জা, কী লজ্জা। ওভাবেই তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

কাচ্চু : আর ওই মিথ্যেকথা-প্রুফ পলিটিক্যাল লেকচার ?

আগন্তুক : ওটা ছিল সবচেয়ে বড় প্রবলেম। জিন-এর ভেতর ঢুকে গেছে। যেন ওটা থার্ড ইনস্টিংক্ট। কিছুতেই সামলানো যাচ্ছিল না। এর বিরুদ্ধে যখনই বৈজ্ঞানিকরা কিছু করতে যান তখনই পলিটিশিয়ানরা ভোটে হারিয়ে ওই বিল পাশ করতে দেন না। আটকে দেন।

কাচ্চু : তারপর ?

আগন্তুক : তারপর যা হয় তাই। বিরুদ্ধ পার্টির বিরুদ্ধ পার্টি যখন একবার দেড় ঘণ্টার জন্য পাওয়ারে এল, তখন যাওয়ার আগে ওই বিল পাশ করিয়ে দিয়ে যায়। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে মেশিন চালু।

কাচ্চু : তারপর ?

আগন্তুক : হুঁ হুঁ বাবা, এখন আর তাঁরা মিথ্যে কথা বলতে পারেন না। মিথ্যে বললেই অ্যান্টি সাউন্ড এসে তাঁর গলার আওয়াজকে নিউট্রালাইজ করে দেয়। একদম বোবার মতো চুপ হয়ে যাবেন। সঙ্গে-সঙ্গে গলা চুলকোতে শুরু করবে। চুলকোতে-চুলকোতে পাগল হয়ে যাবেন, তবুও কমবে না। সকলে তখন তাঁকে দেখে হাসাহাসি করে। ওটাই ওঁর শাস্তি। পাবলিক যত ক্ষমা করবে ততই তাঁর চুলকুনি কমবে।

বিবি : কী মজা, দারুণ তো !

কাচ্চু : সে না হয় হল। কিন্তু ফুটোগ্রাফ থেকে কী নেওয়া যায় বল তো ? একটু আজব হতে হবে।

বিবি : মাস্টারমশাইয়ের চশমা।

কাচ্চু : ঠিক বলেছিস, মাস্টারমশাইয়ের চশমাটা চাই।

আগন্তুক : সে চশমাটাই পাবেন না··· ওর একটা রেপ্লিকা পাবেন। ঠিক তেমনই দেখতে।

[কাচ্চু ওই ঠোঙায় হাত ঢোকায়, হাত বের করে আনে··· ও মা ! ওর হাতে একটা চশমা !]

বিবি : কী মজা, কী মজা ! আমি একটা পুতুল চাই। আমি নিজে হাতে বের করব।

[আগন্তুকের দিকে বিবি দু' হাত বাড়িয়ে দেয়। আগন্তুক টর্চ জ্বেলে ওর হাত দুটো পিউরিফাই করে দেয়। বিবির হাত কাঁপতে থাকে। একটু পরে ঠিক হয়। বিবি ঠোঙায় হাত ঢোকায় এবং একটা সুন্দর বড় সাইজের পুতুল বের করে আনে। আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

এমন সময় খাটের ওপাশ থেকে সেই চাদর-চাপা যন্ত্রযানের ভেতর থেকে বেশ জোরে-জোরে পিং কিং-পিং কিং আওয়াজ হতে থাকে, যেন একটা অ্যালার্ম বেল বাজছে। আগন্তুক কেমন চনমনে হয়ে ওঠে। হাতঘড়ি দেখে।]

আগন্তুক : ইস, সময় হয়ে গেছে, আমায় ফিরে যেতে হবে। আমার জন্য সার্কিট জ্যাম হচ্ছে।

কাচ্চু : তার মানে ?

আগন্তুক : আমার তো এখানে আসবার কথা নয়। কিন্তু এসে গেছি। এতে ইতিহাসের পাতায় কারেকশনের প্রয়োজন হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত তেমন মেজর চেঞ্জ হয়নি কিন্তু আর বেশি থাকলে করতেই হবে। সেজন্য অ্যালার্ম বাজছে··· আমি যাচ্ছি।

[আগন্তুক তার মেশিনের দিকে দৌড়ে যায়]

বিবি : টুইং, তোমার ফুটোগ্রাফটা ফেলে যাচ্ছ, ওটা নেবে না ?

আগন্তুক : থ্যাঙ্ক ইউ গ্রেট গ্র্যাণ্ডঠাম্মা, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

[দৌড়ে গিয়ে সে টেবিলের ওপর থেকে ঠোঙাটা তুলে নেয়। যাওয়ার সময় বিবিকে প্রণাম করতে যায়। বিবি পিছিয়ে যায়। তারপর হ্যান্ডশেক করে। কাচ্চু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আগন্তুক তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ায়। একটু পরে আগন্তুক নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গুটিগুটি তার যন্ত্রযানের দিকে এগোতে থাকে। চাদর তুলে ভেতরে ঢুকে হাতের টর্চ অর্থাৎ রেক্টিফায়ারটা কাচ্চু-বিবির দিকে তাক করে।]

আগন্তুক : বাই বাই গ্রেট গ্র্যান্ডঠাকুর্দা, ঠাম্মা। যাওয়ার আগে আপনাদেরকে রেক্টিফাই করে দিয়ে যাচ্ছি।

কাচ্চু : [সচকিত হয়ে] কেন ?

আগন্তুক : আমার এখানে আসার কথা নয়। আমার কথা মনে থাকাও ঠিক নয়। আমি আপনাদের স্মৃতি থেকে আমার কথাটাও মুছে দিয়ে যাচ্ছি।

বিবি : সে কী ? টুইং, তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। তুমি যাচ্ছ যাও, কিন্তু···

কাচ্চু : ভুলিয়ে দিয়ে যেয়ো না। তোমার কথা অন্তত মনে ধরে রাখতে চাই।

টুইং : মনে স্থান পাওয়াটাও একটা অবস্থিতি। আমাকে তাও করা করা চলবে ন।

বিবি : প্লিজ, না।

টুইং : ঠিক আছে, আমি মনে থাকব অথচ থাকব না। তোমরা বুঝবে, কিন্তু প্রমাণ পাবে না।

[এমন সময় সেই যন্ত্রযান থেকে আবার পিং কিং অ্যালার্ম বেজে ওঠে। আগন্তুক অর্থাৎ টুইং আবার সচকিত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে পিছিয়ে-পিছিয়ে সে যন্ত্রযানের ভেতর ঢোকে, যাওয়ার সময় টর্চটা জ্বালায়, বিবি কাচ্চুর দিকে ফোকাস করে, ফেজ পুরো অন্ধকার হয়ে যায়। একেবারে ঘুটঘুটি অন্ধকার। একটু পরে দূরে একটা মোরগ ডাকে। বোঝা যায় ভোর হয়েছে। স্টেজে আলো হয়, দেখা যায় বিছানার ওপর কাচ্চু, বিবি শুয়ে আছে। ঠাকুমা তখনও মেঝেতে। কেষ্টদার প্রবেশ।]

কেষ্টদা : অ্যাই, অ্যাই, এ কী, এখনও সবাই ঘুমোচ্ছ ? সকাল সাতটা বেজে গেছে। আরে ঠাকুমা ! কী হল ! মেঝেতে খুন্তি হাতে শুয়ে আছেন।

[ঠাকুমা উঠেই হাই তোলেন। হাতের খুন্তি দেখে চমকে যান]

ঠাকুমা : দুর্গা, দুর্গা, এ মা গো, কী ঘুমই না ঘুমিয়েছি ! স্বপ্ন দেখছিলাম কাচ্চু, বিবির ঘরে চোর এসেছে, তাই খুন্তি নিয়েই ছুটে এসেছিলাম। বাবাঃ, চোর না ছাই। ঘুমের পরশে মেঝেতেই শুয়ে পড়েছি। কাচ্চু, বিবি, ওঠো-ওঠো, যাও, হাত-মুখ ধোও। বাথরুমে যাও।

[কাচ্চু বিবি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কাচ্চু উঠে দাঁড়ায়।]

কাচ্চু : বিবি, সবকিছু স্বপ্ন নাকি রে···

বিবি : ঠিক বুঝছি না, হয়তো স্বপ্ন।

কাচ্চু : তুই, আমি, ঠাকুমা সবাই মিলে তা হলে একই স্বপ্ন দেখলাম কেন ?

বিবি : দাদা, আমার কেমন যেন লাগছে, স্বপ্ন নয়—সত্যি !

কাচ্চু : দেখি তো, পুতুল, বই, ফুল ওগুলো আছে কিনা।

[টেবিলের ওদিকে গিয়ে দু'জনে তন্নতন্ন করে খোঁজে, কিন্তু কিছু নেই]

কাচ্চু : রেক্টিফাইড, ইতিহাসকে টুইং এলোমেলো হতে

দেয়নি, সবকিছুই আবার ডি-মেটেরিয়ালাইজড় হয়ে গেছে।

ঠাকুমা : কী হিজিবিজি বকছিস তোরা ! দুগ্‌গা-দুগ্‌গা বল। মুখ ধুতে যা।

বিবি : পুতুলটা খুব সুন্দর ছিল। টুইংও খুব ভাল।

কাচ্চু : ও বলেই তো গেল, আমি মনে থাকব অথচ থাকব না। তোমরা বুঝতে পারবে, কিন্তু প্রমাণ পাবে না।

বিবি : সত্যিই কোনও প্রমাণ নেই, সবই স্বপ্ন মনে হচ্ছে।

কাচ্চু : কিন্তু আমরা সবাই মিলে একই স্বপ্ন দেখলাম কেন ? সেটা কী করে হয় ? এটা মোটেই স্বপ্ন নয়। টুইং এসেছিল, ও আছে, থাকবেও···

ঠাকুমা : কী, পাগল হলি নাকি তোরা ? কে টুইং ? কার কথা বলছিস ?

কাচ্চু : তুমি কি আর তাকে চিনবে ? সে তোমার নাতির, নাতির, নাতির, নাতির, নাতির নাতি।

কেষ্টদা : নাতির, নাতির, নাতির, নাতির, নাতির নাতি ? সে কী ?

ঠাকুমা : [মাথা থাবড়ে] বিগড়েছে, এদের সব্বার মাথা বিগড়েছে, এইজন্য বলি রাত জেগে বেশি পড়িস না, এখন হয়েছে তো সর্বনাশ, ভাই-বোন দু'জনে মিলে টুইং টুইং করছে। চলো, চলো—মুখ ধোবে চলো। [ভাই-বোনকে ধাক্কাতে-ধাক্কাতে ভেতরে নিয়ে যান।]

কেষ্টদা : [পাবলিকের দিকে তাকিয়ে] সব মাথাখারাপের দল। পাগল, আপনারাই বলুন আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব পাগল কিনা, বেশি লেখাপড়া করবে আর নাতির, নাতির. নাতির স্বপ্ন দেখে বেড়াবে। ইচ্ছে করে এই বইগুলোকে দিই ছুঁড়ে ফেলে।

[বলে **মুষ্টি** দেখায়, মঞ্চ অন্ধকার হয়]

॥ যবনিকা ॥

ড্রাম্যাজিকের ড্রামা অংশটা তো বুঝলে। এবার ম্যাজিকের অংশটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ম্যাজিকের কৌশলগুলো বুঝে ঠিকমতো বানিয়ে, অভ্যাস করে দেখিয়ো। দেখবে সকলেই খুব তারিফ করছেন। নাটকে যত মজা, জাদু-নাটকে তার চেয়ে একশোগুণ বেশি মজা। প্রথম ম্যাজিক বা চমক :

হাওয়া-চলাচল এবং বন্ধ হওয়া

বুঝতেই পারছ এটা বড় সাইজের দু'খানা এয়ার সার্কুলেটর-এর কাজ। ঠিক সময়মতো অন-অফ করলে ঝড়ের মতো হাওয়া বইবে। টেবিলের ওপরে কিছু আল্‌গা কাগজ রেখে দিতে হবে। ম্যানিফোল্ড পেপার হলে ভাল হয়। সুন্দর উড়বে। তা ছাড়া ওই বড় স্ট্যান্ড ফ্যান বা এয়ার সার্কুলেটরের সামনে কাগজ ছেড়ে দিলে জোরে উড়িয়ে মঞ্চের এপাশ-ওপাশ নিয়ে যাবে।

হাওয়ার বিরুদ্ধে কষ্ট করে হাঁটা হচ্ছে অভিনয়ের ব্যাপার। আগে থেকে ঠিক করা থাকবে কখন হাওয়া বন্ধ হবে। ঠিক তখনই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে।

চাদর-চাপা যন্ত্রযান

এটাকে প্রফেশনালি খুবই সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়। ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে সবচেয়ে সহজে তৈরি করতে গেলে আমি যে পদ্ধতিটা তোমাদের অবলম্বন করতে বলব, তা হল 'কোঁচকানো ঝুড়ি পদ্ধতি'। এই কোঁচকানো ঝুড়ি মাটিতে পড়ে থাকলে কুঁচকে থালার মতো ফ্ল্যাট হয়ে থাকবে, কিন্তু উঁচু করলে ঝুড়ির আকৃতি নেবে। এটা তৈরি করা খুব একটা কঠিন নয়।

তিন ফুট ব্যাসের দুটো রিং তৈরি করো। 'গ্যালভানাইজড় আর্থ'-এর তার বা সরু কঞ্চি হলেও চলবে। তারপর আর কয়েকটা ছোট রিং তৈরি করতে হবে। সেগুলোর ব্যাস হবে দু' ফুট দশ ইঞ্চি, দু' ফুট আট ইঞ্চি, দু' ফুট ছ'ইঞ্চি, দু' ফুট, দেড় ফুট, এক ফুট এবং ছ' ইঞ্চি মাপের।

এবারে রিংগুলোকে একের পর এক নরম সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলো। পরিধির সঙ্গে পরিধিকে বাঁধতে হবে এক-দেড় ইঞ্চি
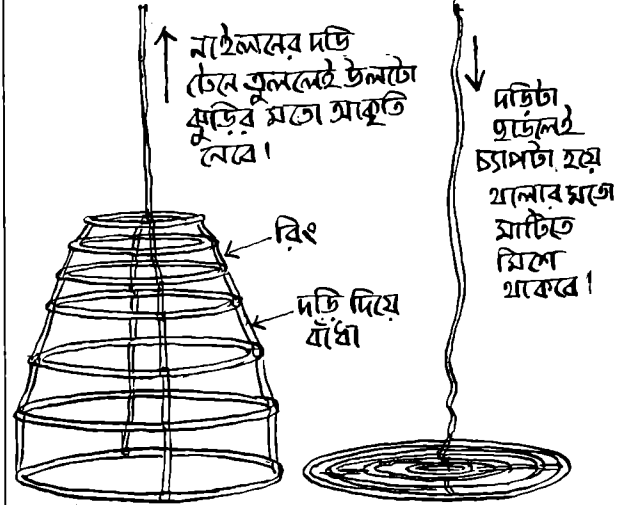
ফাঁক দিয়ে। এভাবে একের পর এক রিংকে বেঁধে মাঝখানের ছ' ইঞ্চি সাইজের রিংটা ধরে উঁচু করলে দেখবে ওলটানো ঝুড়ির মতো আকৃতি নিচ্ছে। কিন্তু মাটিতে রেখে দিলে চ্যাপটা থালার মতো হয়ে যাচ্ছে।

ওই ঝুড়িতে চাদর-চাপা দিয়ে, দড়ি দিয়ে টেনে তুললে মনে হবে মাটি ফুঁড়ে একটা বড় কিছু উঠছে। এটা আগে থেকেই উইংসের কাছে মাটিতে ফেলা থাকবে। হাওয়া স্তব্ধ হলে ওপর থেকে টেনে তুলতে হবে। নাইলনের সুতো হলে তা আর চট করে দেখা যাবে না। উঁচু হবার পর আগন্তুক বা টুইংকে চাদর উঁচু করে ভেতরে ঢুকতে হবে।

ফুটোগ্রাফ

এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। মোটা কাগজের তৈরি একটা ঠোঙা নিয়ে তার তলায় একটা 'দরজা' তৈরি করো। সেটা যেন দর্শকেরা বুঝতে না পারেন। টেবিলের ওপরেও একটা গোপন দরজা ছিল। ঠোঙাটা সেই দরজার ওপরে বসিয়ে রাখতে হবে। টেবিলের ওই গর্তে আগের থেকেই ফুল, বই, চশমা, পুতুল রাখা ছিল। ঠোঙায় হাত ঢোকাবার সময় ওই দরজা খুলে একে-একে সঠিক জিনিসপত্র বের করলেই হল ! শুধু এই পদ্ধতিই বা কেন, মাথা খাটিয়ে তোমরাও নতুন কৌশল বের করো। এ তো আর মন্ত্রের কারসাজি নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল। আড়াল থেকে জিনিসপত্র টেনে এনে বের করে যেন 'হঠাৎ এসে গেছে' এমন অভিনয় করা। আমি জানি, সেই কৌশল এবং অভিনয় তোমরা সঠিকভাবেই উপস্থাপন করতে পারবে।

অনুলিখন : অর্ণব দাশগুপ্ত

ছবি : দেবাশিস দেব

সূর্যশিশিরের পতঙ্গ-শিকার

পরেশ সরকার

নামটি চমৎকার হলে কী হবে, 'সূর্যশিশির' নামের উদ্ভিদটি কীটপতঙ্গের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা। সূর্যশিশিরের মতো আরও আছে নানা ধরনের শিকারি উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদগুলির শিকার ধরার কৌশল যেমন নিপুণ, তেমনই রোমাঞ্চকর।

ধরা যাক, তাঁর নাম ব্রজগোপাল বটব্যাল। নামী উদ্যানবিদ তিনি। তাঁর নার্সারিটি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। সাজানোগোছানো, সবুজ গাছগাছালিতে ভরা। দেশ-বিদেশের নানা ফুল-ফলের চারাগাছে পুরো বাগানটাই হয়ে উঠেছে আকর্ষক। কী নেই সেই বাগানে! একদিকে যেমন আছে সাধারণ ফুল গাঁদা, জবা, তেমনই চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, জুঁই, রজনীগন্ধা, নানা প্রজাতির গোলাপ, এমনকী বেল, চাঁপা আর এডিনার। এইসব ফুলের ছোট বড় মাঝারি টবগুলি সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। অন্যদিকে পান্থনিবাসের ঠিক ওপাশে দক্ষিণ দিকে বাড়ির বিশাল ছাদে আছে নানা বৈচিত্র্যের ক্যাকটাস, বনসাই, সাকুল্যান্ট প্রজাতির আশ্চর্য সুন্দর সব উদ্ভিদ। ব্রজমহাশয়ের এটি যেন এক শূন্য উদ্যান। খুদে-খুদে চেহারার বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, নিম, বকুল, তেঁতুল, জাম, পেয়ারা, লেবু, শ্যাওড়া, জারুল ও সাঁইবাবলা গাছগুলির বয়স কিন্তু খুব কম নয়। বামন গাছগুলির কারও-কারও বয়স ৫০-৬০ পার হয়ে গেছে। নানা প্রজাতির এত বয়স হলেও, গাছগুলি দেখতে এখনও বেশ সজীব। ক্যাকটাসে ফুলও ধরেছে নানারকম—লাল, নীল, সবুজ, খয়েরি। ক্যাকটাস, সাকুল্যান্টের বাগানের ঠিক নীচেই আছে, বৈচিত্র্য ও নজরকাড়ার মতো অর্কিডের বাগান। অদ্ভুত সব নামও সেইসব অর্কিডের। ওই বাগানের পুবদিকে আছে 'ইন্ডোর', 'আউটডোর' প্রজাতির নানা বাহারি উদ্ভিদ। 'মেডিনিলা', 'মন্‌সটেরা', 'মিকোনিয়া', 'নোটন', 'মারেনটা', 'কাম্পফেরিয়া', 'হামিগ্রাফিক্স', 'হামোলোমিনা' ইত্যাদি।
ব্রজগোপাল বটব্যালের কাচঘরের আশ্চর্য নার্সারিতে আছে 'এরিয়োকার্পাস', 'লিথেনভাজিয়া', 'ব্যাট্‌টেল ক্যাকটাস', 'টর্চক্যাকটাস', 'অ্যাসটেকিয়াম রিটারি', 'প্রিসেপিস' ও 'ব্রেগেনিয়া ডেনেগি'। এ ছাড়াও আছে 'সিলভার টর্চ', 'গোল্ডেন ব্রারোল ক্যাকটাস', 'স্টার ক্যাকটাস', 'ওল্ড ম্যান ক্যাকটাস', 'নোটো ক্যাকটাস', 'চিন ক্যাকটাস', 'ফ্লারেলিয়া ক্যাসটেনিয়া', ওপানসিয়া সলমিয়ানা', 'এচিনো সিরিয়াস পেন্টোলোকাস'। সেই ক্যাকটাস-উদ্যানে আছে কালিম্পং, মেক্সিকো ও আমেরিকার নানা বিরল প্রজাতির ক্যাকটাসও।
ব্রজগোপাল বটব্যালের সেই অসাধারণ বাগানে নানাধরনের পতঙ্গভুক শিকারি উদ্ভিদও আছে, যারা 'কার্নিভোরাস প্লান্ট' হিসেবে বিখ্যাত। এইসব পতঙ্গভুক উদ্ভিদের মধ্যে 'সানডিউ' অর্থাৎ 'সূর্যশিশির'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এর ছোট-ছোট সুন্দর পাতার পাশে সরু-সরু লম্বা রোঁয়াগুচ্ছ। এই রোঁয়াগুলি পতঙ্গকে আঁকশির মতো টেনে ধরে। পতঙ্গ অনেক চেষ্টা করেও সূর্যশিশিরের আঁকশির ফাঁস থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল আশ্চর্য আঁকশিগুলি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পতঙ্গটিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবু করে ফেলে। তারপর আলোর বিচ্ছুরণে ঝলসে ফেলে তাকে, তারপর তার গায়ে ছিটিয়ে দেয় পাচকরস। পতঙ্গভুক উদ্ভিদের শিকারকে ফাঁদে ফেলার কৌশল যেমন

এইসব পতঙ্গভুক উদ্ভিদের মধ্যে 'সানডিউ' অর্থাৎ 'সূর্যশিশির'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এর ছোট-ছোট সুন্দর পাতার পাশে সরু-সরু লম্বা রোঁয়াগুচ্ছ। এই রোঁয়াগুলি পতঙ্গকে আঁকশির মতো টেনে ধরে। পতঙ্গ অনেক চেষ্টা করেও সূর্যশিশিরের আঁকশির ফাঁস থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

নিপুণ, তেমনই রোমাঞ্চকর।
সানডিউ বা সূর্যশিশির 'ড্রসেরা' প্রজাতির কার্নিভোরাস প্লান্ট। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বলেন, এই পতঙ্গভুক বা 'ইনসেক্টি-ভোরাস প্লান্ট' শিকারি হিসেবে বিখ্যাত। শিকার ধরার পরে সূর্যশিশির উদ্ভিদের মতো সব পতঙ্গভুক উদ্ভিদ একধরনের পাচকরস বা 'এন্‌জাইম' নিঃসরণ করে শিকার হজম করার মতো উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত করে নেয়। সূর্যশিশিরের সরু অথচ নরম আঁকশিগুলি খুব সুন্দর বলেই তার টানে পতঙ্গরা ছুটে যায়, এবং সেই লোভনীয় রঙের ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারায়।
বেঁচে থাকার জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের দরকার প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনজনিত পুষ্টি। মাটি, জল, বাতাস ও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে নাইট্রোজেন সবসময়ে, নিরবচ্ছিন্ন ঘুরে বেড়ায়। একেই বলা হয়, 'নাইট্রোজেন চক্র' বা 'নাইট্রোজেন সার্কল'। উদ্ভিদ সাধারণত এই নাইট্রোজেন যৌগ নিয়ে তাকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে নানা জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এক শ্রেণীর নাইট্রোজেন ব্যাকটিরিয়া তৈরি করে এই নাইট্রোজেন যৌগ। আর প্রাণীরা প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন যৌগ পায় নানা উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে অর্থাৎ শাক-সবজি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে কিংবা উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কিছু কার্নিভোরাস প্লান্টস বা মাংসাশী উদ্ভিদ সরাসরি পতঙ্গজাতীয় প্রাণী শিকার করে জৈবপ্রোটিন পাওয়ার জন্য নিজের শরীরের নানা অংশের ফাঁদকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে। পতঙ্গভুক উদ্ভিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'নেপেনথিস' প্রজাতির 'পিচারপ্লান্ট'। কেউ একে বলেন 'ঘটপত্র গাছ', কেউ-বা বলেন 'কলসিগাছ'। এই ধরনের উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় মেঘালয়ের বিভিন্ন পাহাড়ে এবং অসমের নানা জঙ্গলে। যেসব উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব প্রোটিন সংগ্রহ করতে পারে না, তাদের সাধারণত বলা হয় 'পতঙ্গভোজী উদ্ভিদ' বা কার্নিভোরাস প্লান্ট'।
ড্রসেরা জাতীয় পতঙ্গভুক উদ্ভিদ যে সানডিউ বা সূর্যশিশির, এ-কথা আগেই বলেছি। সূর্যশিশির ছাড়াও 'ব্লাডারওয়ার্ট', 'অ্যারজিয়া', 'অলড্রোভানড়া', 'ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ' ইত্যাদি প্রজাতির উদ্ভিদও শিকার, কীটপতঙ্গদের সহজেই ফাঁদে ফেলে দেয়। আমাদের দেশে জলে জন্মায় এমন উদ্ভিদের মধ্যে আছে নীল ঝাঁঝি ও মুলাক্কা ঝাঁঝি। এদেরও রোঁয়ার মতো পাতা যেমন সুন্দর, তেমনই আকর্ষক। এই ঝাঁঝির সৌন্দর্যই আসলে জলে পতঙ্গের মরণফাঁদ। ওই ফাঁদের মধ্যে কীটপতঙ্গ কোনওক্রমে একবার যদি ঢুকে পড়ে, আর বেরোতে পারে না বাইরে। জলে জন্মানো 'আলড্রোভানডা' বা মুলাক্কা ঝাঁঝি এইরকম আর-এক শিকারি উদ্ভিদ। এরা সাধারণত খাল-বিলে ভেসে বেড়ায় হাওয়ায় দুলতে-দুলতে। সবক'টি পাতাই হল এদের শিকার ধরার নিপুণ ফাঁদ। এদের বোঁটা একটু চওড়া আর ফলকটি দেখতে গোলমতো। এদের ফলকটি দেখলে মনে হবে, অবিকল কব্জার দুটো পাল্লা। ওই কব্জার ঠিক ওপরে বেশ কয়েকটি শক্ত রোঁয়ার মতো একগুচ্ছ আঁকশি আছে। পাল্লা

দুটিতে আছে বহু রোঁয়া। পাল্লার ভাঁজেও দেখা যাবে ছোট্ট-ছোট্ট অজস্র কাঁটা। পোকামাকড়রা একবার মুলাক্কা ঝাঁঝির নাগালে এলে, ওই রোঁয়াগুলি স্পর্শ করেই বুঝে নেয়, শিকারটি কী ধরনের। পতঙ্গ পাতার খুবই কাছে এলে, কব্জার পাল্লাদুটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন শত চেষ্টা করেও আক্রান্ত পোকামাকড় আর বাইরে বেরোতে পারে না। ভেতরে ওই কব্জার পাল্লার রোঁয়া কাঁটাগুলি তখন চাপ দিয়ে শিকারকে পিষে ফেলে।

ঘটপত্র বা কলসিগাছের ফাঁদগুলি দেখতে ভারী সুন্দর। এই উদ্ভিদের ফাঁদ দেখতে অনেকটা কলসির মতো। কলসি বা ঘটের মাথার ওপরে থাকে একটা আধবোজা ঢাকনা। ঘটের মুখের প্রবেশপথে অজস্র রোঁয়া। এর নীচেই লালাগ্রন্থি, যা কলসিগাছ বা ঘটপত্র গাছের পাচকরস। এই গাছের ঢাকনাটির বৈচিত্র্য আর রঙের বাহার দেখবার মতো। ওই ফাঁদ আর শোভার টানে কীটপতঙ্গ একবার ঘটের মুখে পড়ে গেলে তাদের আর বাঁচার কোনও উপায় থাকে না। বড়-বড় পিঁপড়ে, কাঠফড়িং, উচ্চিংড়ে, মথ, বাহারি প্রজাপতিকেও ফাঁদে ফেলে কাবু করে ফেলে কলসিগাছ।

'বাটারওয়ার্ট'ও পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। এদের পাতাও শিকার ধরার নিপুণ ফাঁদ। পাতার ওপরে একরকমের চটচটে আঠালো পদার্থ থাকে। বাটারওয়ার্টও শিকার ধরার জন্য ঝোপ বুঝে কোপ মারতে, প্রাণীদের তুলনায় খুব একটা পিছিয়ে নেই।

ড্রসেরা প্রজাতির উদ্ভিদ সানডিউ বা সূর্যশিশিরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রজাতি হল 'ইন্ডিকা', 'বারমানি', 'পেলটাটা'। এই প্রজাতিগুলিকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেই দেখা যায়। ড্রসেরা বারমানি মায়ানমারেই বেশি জন্মায়। বারমানির পাতাগুলি অবিকল গোলাপের পাপড়ির মতো দেখতে। এরা পাতার ফলক গুটিয়ে রাখে আর শিকার ধরার সময়ে আঁকশির কাজ করে। আর 'ড্রসেরা রোটাস ডি ফোলিয়া' সাধারণত ইউরোপের খাল-বিলে জন্মায়। ড্রসেরা পেলটাটা উদ্ভিদ খাসিয়া পাহাড়ে ও হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলেই বেশি দেখা যায়।

'ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ' কিংবা 'ডায়োজিয়া মাসসিপুলা' পতঙ্গভুক উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত। এরা উত্তর আমেরিকার অল্প জলে জন্মায়। এরাও পাতার ফাঁদে ফেলে শিকার ধরে। এদের পাতায় আছে দাঁতের মতো রোঁয়ার গুচ্ছ, যেগুলি পতঙ্গের কাছে ত্রাসের মতো।। কোনও পতঙ্গকে নাগালে পেলেই ওই রোঁয়া দাঁত ভাঁজ হয়ে এসে চেপে ধরে তাকে।

আলড্রোভানডা বা মুলাক্কা ঝাঁঝি কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলের এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নোনামাটির খালে-বিলে খুব দেখা যায়। বাটারওয়ার্ট আমাদের দেশে, হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের ১১০০ থেকে ১৩০০ ফুট উচ্চতায় খুব জন্মায়। ড্রসেরা প্রজাতির কার্নিভোরাস প্লান্টের মতোই এদের সৌন্দর্যও অত্যন্ত আকর্ষক। এদের পাতাগুলিও আকৃতিতে ছোট-ছোট। শান্ত ওই পাতাগুলির কিনারা বেশ ছুঁচলো ও মসৃণ। এদের বৃন্তগুলিতে থাকে প্রচুর রোঁয়া। স্পর্শকাতর রোঁয়াগুলি পাচকরস বা এনজাইম ছিটিয়ে দিয়েই ফাঁদে-পড়া কীটপতঙ্গকে খাদ্যে রূপান্তরিত করে। ভিজে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশেই এই বাটারওয়ার্টরা বেশি জন্মায়। এদেরও অজস্র প্রজাতি আছে।

'নেপেনথিস' প্রজাতির উদ্ভিদ 'পিচারপ্লান্ট', 'এশিয়াটিক পিচারপ্লান্ট' ভারতবর্ষ ছাড়া উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। এ ছাড়া 'সেফালোটাস', 'হোলিরাস ফ্লোরা'ও এই প্রজাতির পতঙ্গভুক উদ্ভিদ।

ইনসেকটিভোরাস বা কার্নিভোরাস প্লান্ট অর্থাৎ পতঙ্গভোজী শিকারি উদ্ভিদেরা ওইভাবে খাদ্যসংগ্রহ কেন করে? এ-প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে আসতে পারে। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বলেন, বেশ কিছু উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের ক্ষমতা নেই বা ক্লোরোফিলের অভাবে খাদ্যের জন্য পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরা পরভোজী উদ্ভিদ। 'হেটেরোট্রফিক' পুষ্টি'র জন্য পরভোজী উদ্ভিদ, শিকার ধরার ফাঁদকে সুকৌশলে ব্যবহার করে। 'ঈস্ট', 'মিউকর', 'পেনিসিলিয়া', 'পিচার প্লান্ট', 'সানডিউ' ও 'র‍্যাফ্লেসিয়া' ইত্যাদি উদ্ভিদও পরভোজী উদ্ভিদ। এরা এদের শাখাপ্রশাখার পাতার ফাঁদ অথবা শিকড়বাকলকে কাজে লাগিয়ে খাবার সংগ্রহ করে।

পতঙ্গভুক উদ্ভিদ নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে বহু গল্পকথা চালু আছে। এগুলি গল্পকথাই। এসবের কোনও বাস্তব-ভিত্তি নেই। জৈব-প্রোটিনের অভাবপূরণ, পুষ্টি ইত্যাদির জন্যই এইসব শিকারি উদ্ভিদ পতঙ্গদের ফাঁদে ফেলে। হয়তো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই।

পতঙ্গ ধরার জন্য পাপড়ির আকর্ষক ফাঁদ পেতে রাখে সূর্যশিশির

ফোটো : যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

সম্পূর্ণ উপন্যাস
বুড়ো ঘোড়া
মতি নন্দী

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী
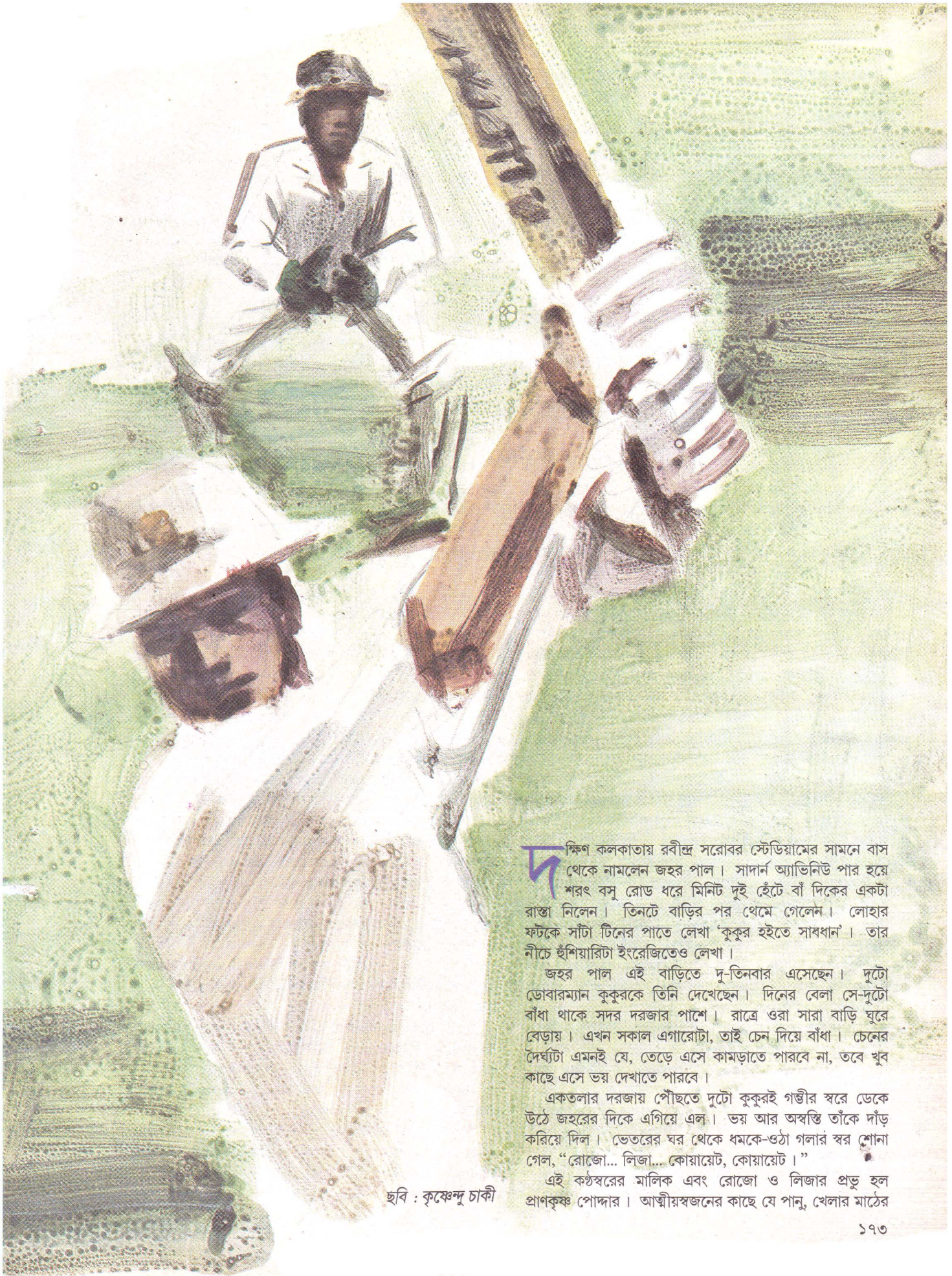
দক্ষিণ কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সামনে বাস থেকে নামলেন জহর পাল। সাদার্ন অ্যাভিনিউ পার হয়ে শরৎ বসু রোড ধরে মিনিট দুই হেঁটে বাঁ দিকের একটা রাস্তা নিলেন। তিনটে বাড়ির পর থেমে গেলেন। লোহার ফটকে সাঁটা টিনের পাতে লেখা 'কুকুর হইতে সাবধান'। তার নীচে হুঁশিয়ারিটা ইংরেজিতেও লেখা।

জহর পাল এই বাড়িতে দু-তিনবার এসেছেন। দুটো ডোবারম্যান কুকুরকে তিনি দেখেছেন। দিনের বেলা সে-দুটো বাঁধা থাকে সদর দরজার পাশে। রাত্রে ওরা সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। এখন সকাল এগারোটা, তাই চেন দিয়ে বাঁধা। চেনের দৈর্ঘ্যটা এমনই যে, তেড়ে এসে কামড়াতে পারবে না, তবে খুব কাছে এসে ভয় দেখাতে পারবে।

একতলার দরজায় পৌঁছতে দুটো কুকুরই গম্ভীর স্বরে ডেকে উঠে জহরের দিকে এগিয়ে এল। ভয় আর অস্বস্তি তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিল। ভেতরের ঘর থেকে ধমকে-ওঠা গলার স্বর শোনা গেল, "রোজো... লিজা... কোয়ায়েট, কোয়ায়েট।"

এই কণ্ঠস্বরের মালিক এবং রোজো ও লিজার প্রভু হল প্রাণকৃষ্ণ পোদ্দার। আত্মীয়স্বজনের কাছে যে পানু, খেলার মাঠের

লোকদের কাছে পানুদা বা পানুবাবু। আগে তাকে যারা পেনো বলত, তারা গত চার বছর ডাকছে পানু, এমনকী আড়ালেও আর পেনো বলে না।

বাংলার ক্রিকেটে প্রাণকৃষ্ণ গত চার বছর ধরে প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য কাজ করে চলেছে। ব্রাদার্স ইউনিয়ন কলকাতার নামী ক্রিকেট ক্লাব, ফুটবলও খেলে। এই ক্লাবটির ক্রিকেট দল চালাবার দায়িত্ব সে চার বছর আগে নিয়েছে। বিস্তর টাকাও খরচ করেছে। প্রাণকৃষ্ণর ঠাকুর্দা ছিলেন পাটের আড়তদার ; থাকতেন উত্তর কলকাতায় কুমারটুলিতে। পাটের সঙ্গে তিনি যোগ করেন কাঠের ব্যবসা। যথেষ্ট ধনী হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রাণকৃষ্ণর বাবা মিলিটারি কন্ট্রাক্টরি ও সিমেন্টে ভেজাল দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা কামান। যুদ্ধের পরই পৈতৃক বাসস্থান ছেড়ে তাঁরা দক্ষিণ কলকাতায় এই বাড়িটা তৈরি করে উঠে আসেন। এই বাড়িতেই প্রাণকৃষ্ণ ও তার ভাইবোনেরা জন্মেছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তাদের সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত হয় হুগলি জেলার একটা রাইস মিল আর দুটো কোল্ড স্টোরেজ। প্রাণকৃষ্ণ এখন প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুতের ব্যবসায়ে নামার তোড়জোড় করছে। নিউ মার্কেটে পশম সামগ্রীর বিরাট দোকানটা তো আছেই।

প্রাণকৃষ্ণর প্রচুর টাকা আছে বটে, কিন্তু দেশের লোকের কাছে সে একজন কেউকেটা নয়। কেউ তাকে চেনে না, সম্মানও দেয় না। একবার সে ভেবেছিল রাজনীতিতে নেমে নেতা হবে, তার পর মন্ত্রী। ইচ্ছাটা তার মোসায়েব ও পরামর্শদাতা কানাই ভট্টাচার্যকে জানায়। কানাই অর্থাৎ কানুদা অতঃপর প্রাণকৃষ্ণকে একটা দুর্গাপুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট করে দেয়। তিনটে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে তাকে দিয়ে পুরস্কার বিতরণ করায়। পরিবেশদূষণ প্রতিরোধ সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণকে লোক চিনল না। সে বক্তৃতা দিতে গেলেই তোতলায়। শ্রোতারা হাসে। সে রাজনীতির লাইন ছেড়ে দেয়। অতঃপর সে স্থির করে কেউকেটা হতে গেলে তাকে খেলার লাইন ধরতে হবে। আর খেলা বলতে তো একটাই, ক্রিকেট। এ-খেলায় গ্ল্যামার আছে, নামডাক আছে, বছর-বছর টেস্টম্যাচ হয়, টিকিটের জন্য লোকে পাগল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ক্রিকেট তার কাছে অপরিচিত নয়। যে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সে এখন ক্রিকেট সেক্রেটারি, একদা সেই ক্লাবে ক্রিকেট খেলেছে। তার সেক্রেটারিত্বে ব্রাদার্স ইউনিয়ন, কলকাতা গড়ের মাঠে যে ক্লাবটি শুধুই ব্রাদার্স নামে পরিচিত, দু'বার সি এ বি নক আউটে আর লিগে রানার্স হয়েছে। জে সি মুখার্জি ট্রফি জিতেছে কিন্তু পি সেন ট্রফি এখনও জেতা হয়নি।

প্রাণকৃষ্ণ ঠিক করে ফেলেছে কলকাতার সব ক্রিকেট সম্মান ব্রাদার্স ইউনিয়নকে এনে দেবে, দেবেই। এজন্য দু' লাখ টাকা পর্যন্ত সে খরচ করবে। কেমন টিম হবে, কাকে কত টাকা দিয়ে দলে আনবে, অন্য রাজ্য থেকে বর্তমান ও প্রাক্তন কোন টেস্ট প্লেয়ারকে আনা হবে— এইসব নিয়েই প্রাণকৃষ্ণ বসার ঘরে তার পারিষদদের সঙ্গে আলোচনায় যখন ব্যস্ত, তখনই বাইরে থেকে রোজো, লিজা ঘেউ-ঘেউ করে ওঠে।

"দ্যাখ তো সুবলা, কে এল ?" প্রাণকৃষ্ণ সোফায় এলিয়ে সেন্টার টেবলে পা দুটো ছড়িয়ে দিল।

সুবলা অর্থাৎ সুবল মুখুজ্যে, লম্বা, ছিপছিপে, গলাটি ঈষৎ লম্বা, চোখদুটি সর্বদাই ঢুলুঢুলু, উঠে দরজার দিকে এগোল।

তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন জহর পাল। খয়েরি ট্রাউজার্সে ভাঁজ নেই, একই অবস্থা ফিকে হলুদ রঙের হাওয়াই শার্টের। হাতে একটা বড় খাম। জহর পালের বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে। চোয়ালদুটো ছড়ানো, থুতনিটা চাপা। ফলে একধরনের দৃঢ়তা সবসময়ই ওঁর গালদুটিতে চেপে থাকে। মনে হয় একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ। মাথার সামনের দিকের চুল পাতলা, টাক পড়তে শুরু করেছে। ভুরু ঘন ঝোপের মতো, চোখদুটো তার মধ্যে জ্বলজ্বল করে। গায়ের রং দুধ না দেওয়া চায়ের মতো। শরীরের কোথাও চর্বির আধিক্য নেই। কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত হাত দুটোয় জড়িয়ে আছে তিন-চারটি শিরা। উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ। ওঁকে দেখলেই মনে হয়, খাটিয়ে লোক এবং আজীবন খেটেছেন। কথা বলেন মৃদুস্বরে কিন্তু তাতে ফুটে ওঠে চাপা মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজেকে একজন পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে পরিচয় দিতে ভালবাসেন।

বসার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জহর পাল গলাখাঁকারি দিয়ে ঘরের লোকেদের ওপর চোখ বোলালেন। সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে, কারও চোখে আমন্ত্রণের আভাস নেই।

"একটা দরকারে এসেছি পানু।"

"কী দরকার ?" প্রাণকৃষ্ণ সোফায় দেহটা মোচড়াল।

"আমার ছেলের সাঙ্ঘাতিক একটা রোগ হয়েছে। মাথার ব্রেনের মধ্যে পোকা। সিটি স্ক্যান করিয়েছি, এই যে তার রিপোর্ট আর ছবি।" জহর হাতের খামটা থেকে সেগুলো বের করতে যেতেই প্রাণকৃষ্ণ হাত তুলে বলল, "থাক, থাক, ওসব ডাক্তারি রিপোর্ট এমন ভাষায় লেখা হয়, পড়ে বুঝতে পারব না।"

"ব্রেনের মধ্যে পোকা !" কানু ভট্চায বিশালভাবে অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, "বাপের জন্মে এমন কখনও শুনিনি।"

"আমিও শুনিনি।" জহর বললেন। "এখন দু-চারজনের কাছে শুনলাম তাদের আত্মীয়স্বজনের এমন ব্যাপার ঘটেছে। খাওয়ার সঙ্গে বা জলের সঙ্গে রিং ওয়ার্ম, হুক ওয়ার্ম শরীরে ঢুকে ব্রেনেও চলে যায়, ডিম পাড়ে, বংশবৃদ্ধি করে।"

"তা হলে তো দেখেশুনে এবার থেকে খেতে হবে পানুদা। বাইরে যা-তা দোকানের খাবার খাওয়া এবার থেকে তা হলে তো বন্ধ করা দরকার। ছেলের বয়স কত ?" সুবল জানতে চাইল।

"আঠারো। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম মৃগি বোধ হয়। নিওরোলজিস্ট করুণা ভট্চায সিটি স্ক্যান করাতে বলেন।"

"কত খরচ হল ?" কানু ভট্চায জানতে চাইল।

"ষোলো শো টাকা।"

"বাব্বা ! আজকাল চিকিচ্ছের কী খরচ ! বুঝলে পানু, সেদিন ডাক্তার ব্লাড প্রেশারের একটা ওষুধ লিখে দিল। দোকানে গিয়ে প্রেসক্রিপশনটা দেখাতে বলল, দশটার দাম দুশো কুড়ি টাকা। বললাম, ওষুধের পায়ে দণ্ডবত, দরকার নেই আমার অমন ওষুধে। ব্রাদার্স ইউনিয়ন করে-করেই তো ব্লাড প্রেশার চড়েছে, ঠিক আছে, সামনের বছর থেকে ক্লাব আর করব না। ওতেই প্রেশার কমে যাবে। পানু বললেও করব না।"

প্রাণকৃষ্ণর মুখে মুচকি হাসি খেলে গেল। "পারবে কানুদা ক্লাব না করে ? তোমার রক্তে লেখা আছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। ক্লাব না করলেই রক্ত মাথায় চড়ে যাবে।"

"যায় যাবে।" পঁয়ষট্টি বছর বয়সী কানুদা বাচ্চাদের মতো অভিমান দেখিয়ে ঠোঁট ফোলালেন। তোবড়ানো গাল দুটো ভেতরে বসে গিয়ে মুখটা চুপসে গেল।

সবাই মজা পাওয়ার দৃষ্টি নিয়ে কানুদার দিকে তাকিয়ে। জহরের চোখে মজা নেই। তিনি উদ্বিগ্ন চোখে প্রাণকৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে কেউ বসতে বলেনি।

"ডাক্তার একমাস খাবার জন্য ওষুধ দিয়েছিলেন।" জহর বললেন।

"কত টাকা দামের ?" কানুদা কথাটা বলে হাঁ করল। তার সামনের চারটে দাঁত নেই। জিভটা বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে।

"দিনে কুড়ি টাকা। যাদব ঘোষ খুব বড় ডাক্তার, তিনি নিশ্চিত
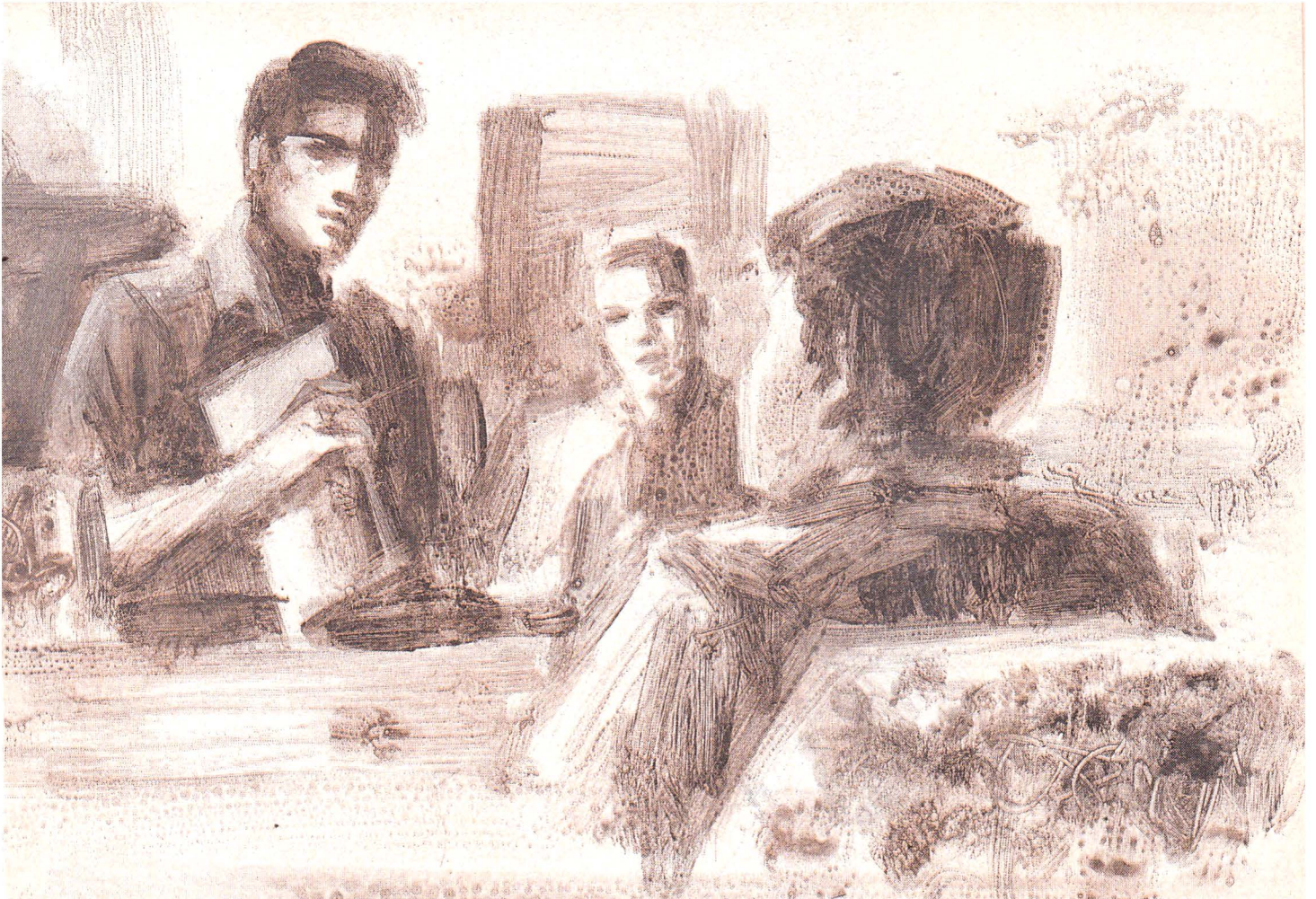
হওয়ার জন্য বললেন, মাথার এম আর আই স্ক্যান করতে হবে। তার জন্য পড়বে পাঁচ হাজার টাকা। তাই পানুর কাছে এসেছি।" জহরকে কুণ্ঠিত দেখাল।

"আমার কাছে, কেন?" প্রাণকৃষ্ণ টেব্‌ল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল।

"চার হাজার এখনও বাকি আছে।" মৃদুস্বরে জহর বললেন।

"কিসের চার হাজার?"

"কথা ছিল পাঁচ হাজার, অ্যাড্‌ভান্স পেয়েছি এক হাজার... বাকি টাকাটা এখন পেলে—।"

"টাকাফাকা কিছু বাকি নেই।" প্রাণকৃষ্ণ বিরক্ত স্বরে বলল। "খেলেছেন তো মোটে তিনটে ম্যাচ। স্কোর কত করেছেন?"

সুবল বলে উঠল, "জিরো নট আউট, আট নট আউট, আর একুশ রান আউট।"

"তবে?" প্রাণকৃষ্ণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল জহরের দিকে। "ওইক'টা রানের জন্য এক হাজার টাকা তো পেয়েই গেছেন, আবার কী?"

"উনত্রিশ রান এক হাজার টাকায়! পানু তো দানছত্তর খুলে বসেছে।" কানুদা বলে উঠল। "রান পিছু তেত্রিশ টাকারও বেশি!"

"তা ছাড়া আপনাকে একটা ব্যাট দিয়েছি, সামান্য পুরনো হলেও ইংলিশ উইলোর ব্যাট। ওটারই দাম এখন চার হাজার টাকা তো হবেই। ওটা বিক্রি করুন।"

"না।" জহরের গলা দিয়ে আতঙ্কিত আর্ত চাপা স্বর বেরিয়ে এল।

"ব্যাট বেচতে পারব না।"

"তা হলে আর আমি কী করতে পারি। আপনার সঙ্গে লিখিত চুক্তি হয়েছিল কি?" প্রাণকৃষ্ণ এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল।

"সুবলের সঙ্গে মুখে কথা হয়েছিল।" জহর তাকালেন সুবলের দিকে।

"কী জানি মনে পড়ছে না কত টাকার কথা বলেছিলুম। ... পাঁচ হাজার কি?" সুবল ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"পানু, শুধু উনত্রিশটা রানই দেখলে? কোন সিচুয়েশনে ক' নম্বরে নেমে রানগুলো করেছি, সেসবও ভাবো। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে সাতটা উইকেট পড়ে যাওয়ার পর নামি, তখন মাত্র তিন ওভার বাকি। জিততে হলে দরকার সত্তর রান। আদার এন্ডে পর পর দুটো উইকেট পড়ে গেল। বাকি উইকেটটা নিলেই ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ জিতে যায়। দু'দিকে বল করছে টেস্ট বোলার দিল্লির রঞ্জিত শর্মা আর বাংলার রনজি বোলার সুধীর দত্ত। হাবলা ব্যাট করতে এল, দেখি ওর হাত কাঁপছে। এইসময় তুমি কী আশা করো?"

জহর পাল থেমে গিয়ে সবার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সুবল গাল চুলকোল। প্রাণকৃষ্ণ বুকের কাছে দুই করতল জড়ো করে নিঃশব্দে তালি দিচ্ছে। কানুদা ধুতির কোঁচা পাট করছে গভীর মনোযোগে। কেউ জহরের প্রশ্নের জবাব দিল না।

"লাকিলি হাবলা ব্যাট করতে আসে ওভারের লাস্ট বলে উইকেট পড়তে, ওকে আর একটাও বল ফেস করতে হয়নি। শর্মার ওভারের লাস্ট বলে একটা রান নিয়ে ওধারে যাই। তারপর ম্যাচের লাস্ট ওভার। সবক'টা বল আমিই খেলে দিই। ওই আটটা রানের দাম কি সংখ্যা দিয়ে কষা যায়? ব্রাদার্সের মান তো বেঁচেছিল। তারপর...।"

জহর পাল প্রাণকৃষ্ণর দিকে তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে।

প্রাণকৃষ্ণ বুকের কাছ থেকে হাতদুটো নামিয়ে বলল, "ব্যাটটা

COTY
VitaCare

আপনার স্বাস্থ্য ঝলমল, লাবণ্যময়, সুন্দর ত্বকের দিকে যখন সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখে - আনন্দ বিস্ময় মেশা এক অদ্ভুত শিহরণ ছড়িয়ে যায় দেহে মনে। তাই না ? কোটি ভিটাকেয়ার আপনার ত্বককে আরো সুন্দর করে তোলে - স্বাস্থ্যের অনুপম দীপ্তিতে।

একমাত্র কোটি ভিটাকেয়ার ময়শ্চারাইজারেই আছে ভিটাসোমস্ - যা হল ভিটামিন A,C,E এবং প্রো-ভিটামিন B^5-এর এক বিশেষভাবে প্রস্তুত সুষম সমাবেশ। যা ত্বকের গভীর স্তরগুলোতেও অনায়াসে পৌঁছে দেয় ভিটামিনের পুষ্টি। আর সক্রিয় ক'রে তোলে ডব্‌ল সানস্ক্রীন UVA এবং UVB ফিল্টার যা আপনার কোমল ত্বককে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। তাই আপনাকে দেখায় আরো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, আরো তরুণ... যে তারুণ্য বজায় থাকে বহু বছর। আর তারুণ্য ও সৌন্দর্যের যাদুস্পর্শে আপনাকে যখন অপরূপ দেখায়, তখন মনটাও যে হয়ে ওঠে সজীব, অপরূপ।

কোটি ভিটাকেয়ার।
ত্বকের স্বাস্থ্যই ত্বকের সৌন্দর্য।

* শুধু মাত্র 50 মি.লি. প্যাকের ওপর।

স্পেশাল অফার
11 টাকা ছাড় *

ভিটাকেয়ার সম্ভারে আছে ঃ
ক্লিনজার্স (ক্লিনজিং কনসেন্ট্রেট, ক্লিনজিং ফোম),
টোনার এবং ময়শ্চারাইজার্স
(তৈলহীন/প্রতিদিন/শীতকাল)।

• এই অফার ছাড়াও পাওয়া যায়। • এই অফার স্টক থাকা পর্য্যন্ত। • কেবল বিশেষ-বিশেষ শহরে প্রাপ্য।

BIPL : 0207 Ben

আমি সেদিনই আপনাকে দিয়েছিলুম। তবে ম্যাচটা হেরেছি।"

"কিন্তু জহর, এবার পানু যা টিম করছে, তাতে তোর জায়গা নেই। ম্যাচ ড্র করার জন্য প্লেয়ার এবার আর ব্রাদার্সে পানু রাখবে না।" কানু ভটচায ধীর গলায় কথাটা বলে প্রাণকৃষ্ণর দিকে তাকাল। "তাই কি না ?"

প্রাণকৃষ্ণ সম্মতিসূচক মাথা হেলাল।

"যাদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি হয়েছিল তাদের সবাইয়ের পাইপয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছি। মৌখিক চুক্তি যাদের সঙ্গে তাদেরও যা দেওয়ার দেওয়া হয়ে গেছে। জহরদা তুমি এবার আসতে পারো।" প্রাণকৃষ্ণ মাপা স্বরে কথাগুলো বলল।

জহর পালের কালো মুখটা শুকিয়ে গেল। আঙুলে ধরা খামটা কেঁপে উঠল।

"তা হলে টাকা পাব না ? আমার যে ভীষণ দরকার।"

"জহরদা, অন্য কোথাও থেকে বরং জোগাড় করে নাও।" সুবল বলল।

জহর পালের বুক থেকে উঠে এল হতাশার দীর্ঘশ্বাস। আপন মনেই বললেন, "কোথায় জোগাড় করব। ... পানু, তোর দুটো হাত ধরে বলছি টাকাটা আমায় দে। চার হাজার টাকা তোর কাছে তো হাতের ময়লা।" কথাটা বলে জহর পাল এগিয়ে এলেন প্রাণকৃষ্ণর দিকে দু' হাত বাড়িয়ে।

"থাক থাক, আর হাত-পা ধরতে হবে না। ব্রাদার্সের জন্য আমি দানছত্তর খুলে বসিনি। আপনি আসুন। আপনার জন্য আমি অনেক করেছি। এখনও যে ময়দানে ব্যাট হাতে নামার সুযোগ পাচ্ছেন সে তো আমারই জন্য। আপনার সময়ের ক্রিকেটাররা কবে মাঠে আসা ছেড়ে দিয়েছে আর আপনি আজও চালিয়ে যাচ্ছেন।" প্রাণকৃষ্ণ তিক্ত স্বরে বলল। "এখন যা করছেন, সেই দোকান মন দিয়ে করুন, ভজন কেত্তন করুন, ছেলেকে মানুষ করুন।"

"আচ্ছা জহরদা, তুমি তো রনজি ট্রফিতে পাঁচ-ছ'টা ম্যাচ খেলেছ, একটা হান্ড্রেড, দুটো ফিফটিও আছে। তুমি তো ক্রিকেটটা বোঝো ?" সুবল সামনে ঝুঁকে সিরিয়াস গলায় বলল। "কিন্তু এটা কি বোঝো না, ক্রিকেট এখন একদম বদলে গেছে। ঘণ্টা ধরে খেলার বদলে এখন ওভার ধরে খেলা হয়। এখন আর ঠুকুস-ঠুকুস করে ব্যাট করা চলে না, এখন 'ধর তক্তা মার পেরেক' করে খেলতে হয় এখন তোমার মতো কপিবুক ক্রিকেটার দিয়ে আর ম্যাচ জেতা যাবে না।"

"সুবল, আমার সময়ের কপিবুক ক্রিকেট দিয়েই সেদিন ইস্টবেঙ্গলের এগেনস্টে ম্যাচটা ড্র করিয়েছিলাম। কিছুমাত্র ক্রিকেট যদি বুঝতিস তা হলে যে বারোটা বল সেদিন খেলেছিলাম সেগুলো মনে করার চেষ্টা কর। ধর তক্তা মার পেরেকরা ওই বারোটার দুটোও সামলাতে পারত না। ব্যাটিংটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শিখেছিলাম। আজ দিল্লি-বম্বে থেকে প্লেয়ার ভাড়া করে আনতে হয়, কেন ?" জহর পাল উত্তেজিত হয়ে ঘরের সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে প্রাণকৃষ্ণর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

"তোরাই বাঙালি ছেলেদের শিখতে দিলি না। ক্রিকেট কাকে বলে। ... দরকার নেই আমার চার হাজার টাকার, মরুক আমার ছেলে... কিন্তু পেনো তোকে আজ বলে যাচ্ছি, ভুল জায়গায় টাকা ছড়াচ্ছিস। ক'টা ট্রফি জিতলেই কেউকেটা হওয়া যায় না। বাংলার ক্রিকেটের জন্য পাকাপোক্ত কিছু কাজ কর। তোর সম্মান অনেক বাড়বে যদি ব্রাদার্সের দুটো ছেলে ইন্ডিয়া টিমে ঢুকতে পারে।"

উত্তেজনায় থরথরে গলায় কথাগুলো বলে জহর পাল ঘুরে দাঁড়ালেন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য।

"খুব বড়-বড় কথা বললি।" প্রাণকৃষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলল।

"হ্যাঁ বললাম।" জহর পাল ঘুরে দাঁড়ালেন। "তোর অনেক টাকা, কিন্তু শুধু টাকা দিয়ে ক্রিকেটে সম্মান জেতা যায় না। যদি কখনও দিন আসে তোকে সেটা বুঝিয়ে দেব। মনে রাখিস।"

জহর পাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে কুকুর দুটো ঘেউ-ঘেউ করে উঠে চুপ করে গেল।

"যত্তসব বড়-বড় কথা।" ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে কানু ভট্চায বলল, "হ্যাঁ, যা বলছিলুম, চারটে ম্যাচ খেলে দেবে মাণ্টু সিং, চল্লিশ হাজার চেয়েছে। ওকে কী বলব পানু ?"

॥ ২ ॥

প্রাণকৃষ্ণর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জহর পাল শরৎ বসু রোড ধরে হেঁটে এসে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে এলেন। ওপারে দেশপ্রিয় পার্ক। তিনি যখন রাস্তা পার হচ্ছেন তখন একটা মারুতি গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল তাঁর থেকে পাঁচ মিটার দূরে। জহর চমকে তাকালেন।

চোখে সান গ্লাস, ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটা তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে। জহর পালের চেনা-চেনা মনে হল, কিন্তু পুরোপুরি চিনে উঠতে পারলেন না।

জানলা দিয়ে মুখ বার করে লোকট বলল, "জর্দা, আমি ঘুনু, অবনী। এত বেলায় এ-পাড়ায় ?"

জহর গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন। "ওহ্, ঘুনু... ! ... এই একটা কাজে এসেছিলাম। তোকে তো আর চেনাই যাচ্ছে না, কী মোটা হয়ে গেছিস !"

"উঠে এসো। বহু বছর পর... তুমি কিন্তু একটুও বদলাওনি।"

জহর গাড়ির দরজা খুলে ঘুনুর পাশে বসলেন।

"কোথায় যাচ্ছিস ?"

"বাড়ি, মানে ফ্ল্যাটে। চলো একটা ঠাণ্ডা খাবে।"

"এই দুপুরে ?"

"তাতে কী হয়েছে, দুটো পুরনো দিনের কথা হবে, ভাতও খাবে।"

"আবার ভাত-টাত কেন !"

"আগে চলো তো। ক্রিকেট তো তোমার হাতেই শিখেছি, তুমিই আমার গুরু। গুরুকে দুটো ভাত খাওয়াব, এ আর এমন কী !"

কথা বলতে-বলতে ঘুনু গড়িয়াহাট মোড়ে পৌঁছে গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে গড়িয়াহাট রোড ধরল।

"তুই তো থাকতিস হিন্দুস্থান রোডে, এদিকে যাচ্ছিস যে ?"

"বাবা মারা গেছেন। ভাইবোনেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। বাড়ির অংশ না নিয়ে আমি চা- বাগানগুলো আর কিছু শেয়ার নিয়েছি। ফ্ল্যাট কিনেছি দু' বছর হল। এতকাল চা-বাগানেই কাটিয়েছি।"

"চায়ের ব্যবসা করছিস ?"

"হ্যাঁ। এক্সপোর্ট করি। মাছের ব্যবসাও ধরেছি, চিংড়ি চালান দিচ্ছি।"

একটা সাততলা বাড়ির গেট দিয়ে ঘুনু গাড়ি ঢোকাল। জহরের মনে হল, এই বাড়ির এক-একটা ফ্ল্যাটের দাম বারো-চোদ্দ লাখ টাকার কম হবে না। পাঁচতলায় উঠে লিফ্ট থেকে বেরিয়েই সামনে দরজা। বেল বাজাতেই দরজা খুলল পরিচ্ছন্ন প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট পরা ভৃত্য। জহরের মনে হল ওর পোশাক তাঁর চেয়ে দামি কাপড়ের। বিশাল বসার ঘরের আসবাব, ছবি, কার্পেট ইত্যাদি দেখে জহর অবাক। ঘুনু যে রীতিমত ধনী তাতে কোনও সন্দেহ রইল না তাঁর। অবশ্য ঘুনু যখন ব্রাদার্সে প্রথম খেলতে আসে, তখনই সে 'বড়লোকের ছেলে' বলে ক্লাবে পরিচিত ছিল। ওদের বাড়িটা ছিল বাগানওলা একতলা বাংলো

ধরনের। বালিগঞ্জের পুরনো বাসিন্দা। দু'খানা মোটরগাড়ি আর জনাচারেক কাজের লোক, মালী।

"জহরদা, বাড়িতে ভাববে না তো ?"

"ভাববে পানু নিশ্চয় ভাত খাওয়াচ্ছে, তাই দেরি হচ্ছে। পানু যে কী জিনিস সেটা আর তোর বউদিকে জানাইনি।"

"তুমি পানুর বাড়িতে গেছলে ? ও তো এখন ক্লাবের ভাইস-প্রেসিডেন্ট।"

"গেছলাম দায়ে পড়ে।"

এর পর জহর পাল সংক্ষেপে তাঁর যাওয়ার কারণটা বললেন। তার মধ্যেই ঠাণ্ডা নরম পানীয় এল, সব শুনে ঘুনু বলল, "পানুটা আর বদলাল না, সেই নেমকহারামই রয়ে গেল। দু'বছর ব্রাদার্সের ক্যাপ্টেন ছিল। দেখেছি তো, মাঠে আসল ক্যাপ্টেন তো ছিলে তুমিই। কখন কাকে বল দিতে হবে, কীভাবে বল করতে হবে, বোলারকে লাইন-লেংথ বুঝিয়ে দেওয়া, ফিল্ড সাজানো, বদলানো সবই তুমি ওকে বলে-বলে দিতে। আমরা তাই নিয়ে হাসাহাসি করতাম, ওর কিন্তু গায়ে লাগত না। জহরদা, মনে আছে মোহনবাগান ম্যাচটায় ওর হাফসেঞ্চুরি করাটা ?"

জহর স্মিত হেসে মাথা নাড়লেন।

"আমি এবার চান করব, তুমি করবে ?"

"না, তুই করে আয়। ফ্ল্যাটটা বড় চুপচাপ, ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।"

"তার কারণ, আমি আর কাজের ছেলেটা ছাড়া আর কোনও বাসিন্দা নেই। বিয়ে করিনি।" বলেই ঘুনু ভেতরে চলে গেল।

একা বসে জহর পাল ঘুনুর কথা ভাবতে-ভাবতে বছর তিরিশ আগের একটা দিনে ফিরে গেলেন। ওকে প্রথম দেখেন মাঠের বাইরে চেয়ারে বসে। সঙ্গে ছিলেন ক্রিকেট সেক্রেটারি। বিরু ঘোষ। ব্যাট করছে সুদর্শন এক কিশোর। বল করছে তিনজন। জহর কথা বলায় ব্যস্ত থাকায় নেটের দিকে বিশেষ নজর দেননি। একবার মুখ ফিরিয়ে দেখেই চমকে উঠলেন। বল করল নেপাল চ্যাটার্জি, তখন বাংলার সবচেয়ে জোরে বোলার। ভাল লেংথে অফস্টাম্পে বল পড়ল। ছেলেটা পলকের মধ্যে এক-পা বেরিয়ে এসে ব্যাট চালাল। আকাশে সোজা তারাবাজির মতো বলটা উঠে গেল। অন্তত আশি-নব্বই মিটার দূরে বলটা নেমে এল। নেপাল কোমরে হাত রেখে অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে।

কী ফুটওয়ার্ক ! কী টাইমিং ! জহর তাকিয়ে রইলেন। পরের বলটা করল বাঁ হাতি স্পিনার অরুণাভ। ছেলেটা এক-পা, দু' পা এগিয়ে এসে ব্যাট চালাল। আবার তারাবাজি লং অনে। বলটা যে কোথায় গেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। এমন একটা ভাব ওর ভঙ্গিতে ফুটে রয়েছে, যেন ব্যাটকে দিয়ে যে কাজ করাতে হয় সেইটাই করিয়েছে এতে বাহাদুরির কিছু নেই। পর-পর ছ'টা বলে ছ'টা তারাবাজি হল। বোলারদের বিভ্রান্ত মুখ, কিছুটা অপমানিতও। বিশেষ করে নেপাল। তার চারটে বল কুড়িয়ে আনতে হয়েছে রেড রোড থেকে।

জহর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বিরু ঘোষকে জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেটা কে ?"

"অবনী রায়। আজই এসেছে। খুব বড়লোক, ডুয়ার্সে বাবার চা-বাগান আছে।"

"বোধ হয় বড়লোক বলেই এমন উড়নচণ্ডে, বেহিসেবি। জড়তা নেই। ... কিন্তু ক্রিকেটটা তো হিসেবের খেলা, ডিসিপ্লিনের খেলা।" কথা শেষ করে তিনি এগিয়ে গেলেন নেটের দিকে।

"ন্যাপলা বলটা আমায় দে।"

নেপাল তাঁর হাতে বলটা দিয়ে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল। জহর পাল স্লো অফ ব্রেক বল করেন। ফ্লাইটই তাঁর বলের বিশেষত্ব, স্পিন করে কম। তাঁর বল করা দেখে অনেকেই মুচকে হাসে। এত উঁচুতে লোপ্পাই করে তুলে বল করেন যে, ব্যাটস্‌ম্যান মুখ তুলে ফ্লাইটের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দোনামনা হয়ে যায়। ছয় মারবে না চার মারবে সেটা ঠিক করে ওঠার আগেই আবিষ্কার করে— ক্রিজ থেকে সে এক পা বেরিয়ে এসেছে এবং তার চালানো ব্যাটের কানা ঘেঁষে বলটা পেছনে চলে গিয়ে স্টাম্পে লেগেছে নয়তো উইকেটকিপার তাকে স্টাম্পড করেছে। ময়দানে এই বল 'জর্দা বল' নামে খ্যাত। বহু বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান জর্দা বলে মুখচুন করে ক্রিজ থেকে ফিরে এসেছে।

জহর পাল তাঁর প্রথম জর্দা বলের টোপটা দিলেন থ্রি-কোয়ার্টার লেংথে। ছেলেটি লাফিয়ে দু'পা বেরিয়েই থমকে গিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তার চালানো ব্যাটের পাশ দিয়ে অফ স্টাম্প ঘেঁষে বলটা বেরিয়ে গিয়ে জালে লাগল। ছেলেটি জালের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর জহর পালের মুখের দিকে তাকাল।

এগিয়ে এসে জহর পাল বলেন, "পেছনে উইকেটকিপার থাকলে কী হত জানো ?" আঙুল তুলে তিনি টেন্টটা দেখিয়ে দিলেন। কিশোরের গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। এর পর তিনি বারোটা বল করেন। তিনটে তারাবাজি হয়, তিনটে ফরওয়ার্ডে ডিফেন্সিভ খেলে, বাকিগুলি কাল্পনিক সিলি পয়েন্টের, স্লিপ ফিল্ডারের ও উইকেটকিপারের কাজের আওতায় চলে যায়।

আধ ঘণ্টা পর ছেলেটি কিট ব্যাগ হাতে যখন টেন্ট থেকে বেরোচ্ছে জহর পাল মালীকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠান।

"ভাল আই সাইট, ভেরি গুড ফুট ওয়ার্ক অ্যান্ড টাইমিং... কিন্তু শেষপর্যন্ত হলটা কী ?"

ছেলেটি বিব্রত অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে। মুখে কথা নেই।

"চারবার স্টাম্পড আর কট ! রান ছয় কি বারো। ... বারো-চোদ্দোর বেশি রান জীবনে হবে না। নেটে ব্যাট করা আর মাঝখানে গিয়ে ব্যাট করায় অনেক তফাত। মাঝখানে এগারোটা লোক তোমাকে খতম করার জন্য অপেক্ষা করবে। ... ক্রিকেট হল ধৈর্যের খেলা।"

জহর তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেটির মুখ লক্ষ করে সুখ বোধ করেছিলেন। কথাগুলো মনে ভাসছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

"কাল থেকে নেটে ডিফেন্স করবে। আমি থাকব। ব্যাটিংটা তোমায় শিখতে হবে। কাল ঠিক তিনটেয় এসে মাঠটা আগে দশ পাক দৌড়বে তারপর ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করবে।... মনে থাকবে ?"

দিনের পর দিন অবনী তাই করেছিল। আর জহরও আঁকাড়া হীরকখণ্ডটিকে কেটেকুটে পালিশ করে উজ্জ্বল এক রত্নে পরিণত করার জন্য মনপ্রাণ ঢেলে দেন। অবনী চারটে রনজি ম্যাচে দুটো শতরান আর একটা পঞ্চাশ করে। ওকে সম্ভাব্য টেস্ট খেলোয়াড় বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে যখন তখনই আচমকা সে ক্রিকেট ছেড়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যায় ডুয়ার্সে তাদের চা-বাগানে। জহর তখন দুঃখে, হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন। ছুটে গেছলেন অবনীর বাবা রজনী রায়ের কাছে।

"এ আপনি কী করলেন সার। শুধু বাংলাকে নয়, ভারতকেও বঞ্চিত করলেন, একটা দারুণ ব্যাটস্‌ম্যানকে আমরা হারাব।"

"জহরবাবু, আমাকেও তো ছেলের ভবিষ্যতের দিকটা ভাবতে হবে। আমার হাঁপানির অসুখ, আর আমি ব্যবসা দেখতে পারি না, ছোটাছুটির ধকল নেওয়ার মতো শরীরের অবস্থা নয়, ভাইদের মধ্যে ঘুনুই বড়, ওকেই বিষয়সম্পত্তি, ব্যবসা দেখতে হবে। আমি চাই এখন থেকেই ঘুনু সব বুঝেশুনে নিক। ... আর ক্রিকেট খেলে হবেটাই বা কী ? একটু সম্মান, একটু পরিচিতি দু-চার বছর পর লোকে তাও ভুলে যাবে। যদি বুঝতাম অনেক টাকা পাবে,

তা হলেও নয় কথা ছিল। টেস্ট খেলে ক'টাকা পায় ? ম্যাচ পিছু সাড়ে সাতশো টাকা ! তার চেয়ে ঘুনু একশোগুণ আয় করতে পারবে বছরে, যদি ব্যবসায়ে এখনই ঢোকে। ... মাপ করবেন জহরবাবু, আর ক্রিকেট নয়। যা খেলেছে তাই যথেষ্ট। ক্রিকেট থেকে ঘুনুর পাওয়ার কিছু নেই।"

জহর পাল সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে। কানে বাজছে রজনী রায়ের কথাগুলো। 'ক্রিকেট থেকে পাওয়ার কিছু নেই।' প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। রজনী রায় বলতেই পারেন, সত্যিই তখন টাকা ছিল না ক্রিকেটে। ক্লাব থেকে একটা পয়সাও পাওয়া যেত না, বাংলার হয়ে খেললেও নয়, টেস্ট আর ক'টা খেলবে, কুড়ি-পঁচিশটা বড়জোর ! হাজার দেড়েক রান আর তিন-চারটে সেঞ্চুরি, এমন রেকর্ড তো কত প্লেয়ারেরই আছে, লোকে তাদের মনেও রাখেনি। লোকে কি জহর পাল নামটাও মনে রেখেছে ? অথচ এখনও তো তিনি ক্লাব ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন। ব্যাটিং অর্ডারে তলার দিকে, রান পান না।

"জহরদা কি ঘুমিয়ে পড়লেন ?" তোয়ালে দিয়ে ভিজে চুল ঘষতে-ঘষতে ঘরে ঢুকল ঘুনু।

"ঘুমোইনি। ভাবছি। তোর বাবা যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো মনে পড়ে গেল।"

"কী কথা ?"

"ক্রিকেট থেকে কিছুই পাওয়ার নেই। এখন হলে তিনি আর ওসব কথা বলতেন না। গাওস্কর, কপিলদেব শুনেছি কোটি টাকার ওপর ব্যবসা করছে।"

"কিন্তু সবাই নয়, শুধু ওরাই। সবাই কি গাওস্কর বা কপিল হতে পারে ? তবে ক্রিকেট ছেড়ে দিয়ে পৈতৃক ব্যবসায়ে এসে আমি এখন যত টাকা রোজগার করছি সেটাও কিছু কম নয়। যাকগে ওসব কথা, চলো খেতে বসি।"

ঘণ্টাখানেক পর জহর পাল যাওয়ার জন্য যখন দরজার দিকে এগিয়েছেন, ঘুনু তখন ডাকল, "জহরদা, তোমার ছেলের জন্য একটা ছোট্ট উপহার... না বলতে পারবে না।"

ঘুনুর হাতে একটা খাম। বিস্মিত জহর খামটা নিয়ে খুললেন। ভেতরে একটা চেক। তাঁরই নামে। পাঁচ হাজার টাকা।

হতভম্ব জহরের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "এসব কী !"

"বলেছি, না বলতে পারবে না। ... আর এই নাও আমার কার্ড। যখনই যা কিছুর দরকার হবে, আমার ফ্ল্যাটে কি অফিসে ফোন করবে। অফিস এই গড়িয়াহাট রোডেই। বেলা হয়ে গেছে, বাড়িতে ভাবছে। এই দুপুরে খেয়েদেয়ে আর বাসে উঠো না। নীচে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে, পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

জহর পালের দু' চোখ জলে ভরে এল আর সেই জল চোখ থেকে উপচে নামল লিফটে করে নামার সময়।

॥ ৩ ॥

জহর পালের সংসারে আছেন স্ত্রী মীরা, এক ছেলে ও এক মেয়ে মানিক ও মণিকা। অবনীর দেওয়া চেকটা দেখে ওরা অবাক হল, তারপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। মীরা বললেন, "এই যুগে এমন মানুষ পাওয়া ভাগ্যের কথা। কত বছর আগে একটু উপকার পেয়েছিল সেটা মনে করে রেখেছে !"

মণিকা বলল, "আর প্রাণকৃষ্ণর ব্যবহারটার কথা ভাবো ? চার হাজার ন্যায্য টাকা, সেটা দিতে অস্বীকার করল ! লোকটা চামার।"

"লোকটা উন্নতি করবে।" মানিক বলল। তারপর সে জহরকে বলল, "বাবা, এটা তো অ্যাকাউন্ট পেয়ি ক্রস চেক, তোমার তো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই !"

শুনেই জহরের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। তিনি আমতা-আমতা করে বললেন, "এটা ব্যাঙ্কে দিলে টাকা দেবে না ?"

"না, তোমার নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। তুমি বরং ঘুনুবাবুকে এটা ফেরত দিয়ে একটা বেয়ারার চেক চেয়ে নাও।"

ব্যাঙ্কে বছর দশেক আগে জহরের অ্যাকাউন্ট ছিল। দোকানের জন্য খুব জরুরি প্রয়োজনে সব টাকা তুলে নিয়ে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেন। তাঁর যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, এ-কথা ঘুনুর কাছে বলতে তাঁর মর্যাদায় বাধবে। তিনি জানেন, বাজারের মাছওয়ালারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। বাজারের গেটে ফুলের দোকানদারের হাতবাক্সের মধ্যে ব্যাঙ্কের পাশবই দেখেছেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই বললে ঘুনুর চোখে হয়তো তিনি ছোট হয়ে যাবেন। নাও ছোট হতে পারেন, ঘুনু তেমন ধরনের মানুষ নয়। জহর পালের মনে একটা খচখচানি শুরু হল।

"দরকার কী আবার ঘুনুকে বিরক্ত করে ! তার চেয়ে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে ফেললেই হয়।" জহর সবার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "কখন কাজে লাগবে বলা যায় না তো !"

উত্তর কলকাতায় হাতিবাগান বাজারে জহরের হার্ডওয়্যার দোকান। দোকানে স্ক্রু, পেরেক, কবজা, ছিটকিনি ইত্যাদি ছাড়াও, উনুন, হাতা, খুন্তি, কড়াই ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্রও পাওয়া যায়। খুব চালু দোকান। দোকানের বয়স ষাট, পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। তাঁর বাবাই দোকানে বসতেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। জহর স্কুল আর মাঠ করে বেড়াতেন সারাদিন। সন্ধ্যায় দোকানে এসে বাবাকে যতটা সম্ভব সাহায্য করতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তিনিই দোকান চালাচ্ছেন। ক্রিকেট খেলার জন্য তাঁকে যে দিনগুলোয় ময়দানে যেতে হয় সেই দিনগুলোয় সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকানে থাকতে পারেন না। অগত্যা তাঁকে একটি লোক রাখতে হয়েছে। পাড়ারই গরিব এটি কিশোর ছেলে নন্দ, অর্থ নাদু। ছেলেটি বুদ্ধিমান, সৎ, বিশ্বস্ত।

সে একাই প্রায় দোকান চালায়, হিসাবপত্তর রাখে।

দোকান থেকেই মোটামুটি সংসার চলে যায়। জহর ভাবলেন, ক্রিকেট আর তিনি খেলবেন না। এখন তাঁর যা বয়স তাতে এবার দোকানে মন দেওয়া উচিত। ব্রাদার্স ইউনিয়ন আর তাঁকে খেলাবে না। সেটা বোঝাই গেছে পানুর কথাবার্তা থেকে। ছোটখাটো ক্লাবে খেললে শরীর আর মনের ওপর ধকল পড়বে। দরকার কী আড়ালে-আবডালে ছেলে-ছোকরাদের টিপ্পনি শুনে। আগের মতো ছুটতে পারেন না। রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস যথেষ্ট স্লো। রান আউট করেছেন তাঁর পার্টনারকে গত দু'বছরে চারবার। চোখটা ভাল আছে এই যা রক্ষে !

বিকেলে দোকানে যাওয়ার পথে হাতিবাগান মোড়ে পৌঁছে জহর রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। ভনভন করছে অটো রিকশা, তার সঙ্গে বাস, মিনিবাস আর ট্রাম। রাস্তা পার হওয়ার ফুরসত পাওয়া যায় না। হতাশ হয়ে এধার-ওধার তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ল ফুটপাথের তেলেভাজাওলাকে। উনুন, কড়াই, বারকোশ, বেসন গোলা, গামলা ইত্যাদি নিয়ে দোকান দিয়ে বসেছে ফুটপাথের কিছুটা দখল করে, সাঞ্জায় গরম-গরম পেঁয়াজি আর বেগুনি তুলে রাখছে একটা ঝুড়িতে। তারপর সেগুলো ঢেলে রাখছে বারকোশে। কয়েকজন খদ্দের দাঁড়িয়ে, হঠাৎই জহরের চোখ পড়ল একজনের ওপর। আরে, বেজা না ?

বেজা-র ভাল নাম ব্রজেন হালদার। জহরের আমলের ক্রিকেটার, বাঁ হাতে স্পিন করাত, চমৎকার ফ্লাইট ছিল, ক্লাব-ক্রিকেটে বছর-বছর প্রচুর উইকেট পেত। মোহনবাগান, স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলেছে। দোহারা গড়ন, লম্বা চেহারা। জহর অনেকবার লিগে ওর বল খেলেছেন। প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা, বেজার সঙ্গে জহরের সখ্যও ছিল। বছর দশেক

আগেও এই মোড়ে তাঁদের দেখা হয়েছিল কিন্তু তখন বেজার এমন চেহারা তো ছিল না। লম্বা চেহারাটা দেখাচ্ছে হাড়গিলের মতো। সরু গলা, বুকটা চুপসে গেছে, হাত দুটো পাটকাঠির মতো। গালদুটো তোবড়ানো। অস্বাভাবিক লম্বা নাকটা দেখেই জহর চিনতে পারলেন।

"কী রে বেজা, তেলেভাজা কিনছিস?" জহর এগিয়ে গিয়ে বললেন।

বেজা চমকে ফিরে তাকাল। হাতে ঠোঙা। জহরকে দেখে একগাল হাসল। "পেঁয়াজি। দারুণ করে। পলতার বড়াও খুব ভাল। নে ধর।"

বেজা ঠোঙাভর্তি পেঁয়াজি এগিয়ে ধরল। জহর হাত তুলে বললেন, "রাস্তার তেলেভাজা আমি খাই না।"

"অ।" বেজা ঠোঙাধরা হাত টেনে নিল। একটা পেঁয়াজি মুখে দিয়ে চিবোতে-চিবোতে বলল, "আমিও আগে খেতুম না। এসব ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট ছিলুম। শরীরের যত্ন না নিলে কি ক্রিকেটার হওয়া যায়? পরিমিত আহার হচ্ছে ফিটনেসের আসল কথা।"

"তোকে তো পরিমিত আহার করতে দেখিনি। লাঞ্চে তো সবার আগে টেব্‌লে গিয়ে, প্লেটে আট স্লাইস পাউরুটি নিয়ে তোকে বসতে দেখেছি। পাঁচ-ছ'বার মাংসের ঝোল আর আলু চেয়েছিস। সবাই একটা কলা নিয়েছে, তুই নিয়েছিস তিনটে। ... আমার মনে আছে।"

"কোন ম্যাচে দেখেছিস?" বেজা ভ্রূ কুঁচকে ঠোঙায় আবার আঙুল ঢোকাল।

"আমাদের সঙ্গে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ম্যাচে। পঙ্কজ রায় যেটায় দেড়শো করল। তোকে মেরে পানু এক ওভারে বাউন্ডারি নিল চারটে, ওভার বাউন্ডারি দুটো। এক ওভারে আটাশ রান! ভুলে গেছিস! আমি ছিলাম নন স্ট্রাইকিং এন্ডে।"

বেজার পেঁয়াজি চিবনো বন্ধ হল। খুব বড় একটা মজা পাওয়া হাসি ফুটে উঠল, "মনে আবার থাকবে না! আসল ব্যাপারটা তো তুই আর জানিস না।"

জহরকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে বেজা তাড়াতাড়ি পেঁয়াজি গিলে ফেলে ঠোঙা থেকে আর-একটা বার করল, "দাঁড়া, বলছি।" তেলেভাজাওলার কড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "বেগুনি ছেড়েছে... ফাস ক্লাস করে... তুই খাবি না?"

"না।"

বেজা তেলেভাজাওলার কাছে গেল। "আমার জন্য চারটে বেগুনি তুলে রেখো।" জহরের কাছে ফিরে এসে বলল, "খেয়ে দেখতে পারতিস। একদিন খেলে তোর এমন কিছু হবে না।"

"হবে। ... তোর মতো চেহারা।"

বেজার মুখ ম্লান হয়ে গেল, "চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে, না?"

জহর জবাব দিলেন না।

"অ্যালোপ্যাথি, কোবরেজি, হোমিওপ্যাথি সব করেছি, কিছুতেই কিচ্ছু হচ্ছে না... তাই শরীর নিয়ে আর মাথা ঘামাই না, যা হওয়ার হবে। ... ক'দিনই বা আর বাঁচব!" বেজার স্বর করুণ শোনাল। জহর দুঃখ পেলেন।

"হাল ছেড়ে দিয়েছিস? জীবনকে ভালবাসলে কেউ হাল ছেড়ে দেয় না। একসময় কী বোলার ছিলিস! বিষেন বেদিকে দেখে তোর কথা মনে পড়ত। তোকে খেলতে সত্যিই ভয় করত। বড় তাড়াতাড়ি তুই মাঠ ছাড়লি।"

"কী করব, পেটের ট্রাব্‌ল এত বাড়ল যে..." বেজা কথা শেষ না করে তেলেভাজাওলার দিকে তাকাল। "দাঁড়া, আসছি।" বলেই সে বেগুনি আনতে চলে গেল। জহর মাথা নাড়লেন। বেজার পেটের রোগ কোনওদিন সারবে না।

ঠোঙা হাতে বেজা ফিরে আসতেই জহর বললেন, "তুই বাচ্চাছেলে নোস। ভাল করেই জানিস তোর পেটের ট্রাব্‌লের আসল কারণ। ... তোর নোলা না সামলালে কোনওদিনই তোর রোগ সারবে না।"

"ঠিকই বলেছিস, কিন্তু সামলাই কী করে?" বেজা আন্তরিক চোখে জহরের দিকে তাকাল।

"বলব? ... যা বলব করবি?"

"আগে শুনি।"

"আগের মতো শরীরটাকে খাটা। ... কোনও ছোট ক্লাবে গিয়ে নেটে বল কর। ম্যাচ খেলা তো সম্ভব নয় তোর পক্ষে। আমার বিশ্বাস, ইয়াং ছেলেরা এখনও তোকে খেলতে পারবে না।"

"বলছিস!" বেজার স্বরে প্রচ্ছন্ন গর্ব।

"হ্যাঁ বলছি। আমি তো এই সিজনেও মাঠে নেমেছি। খেলার মধ্যে থাকলে, ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকা যায়।" কথার শেষে জহর আচমকা বেজার হাত থেকে গরম বেগুনির ঠোঙাটা খপ করে ছিনিয়ে নিলেন।

"এটা কী হল?" বেজা হতভম্ব চোখে বলল।

"এইভাবে তুই উইকেট তুলে নিতিস ব্যাটস্‌ম্যানকে বোকা বানিয়ে।" হাসতে-হাসতে জহর ঠোঙাটা ফিরিয়ে দিলেন, "ভয় নেই, বেগুনি থেকে তোকে বঞ্চিত করব না। কেউ মরতে চাইলে তাকে আটকানো যায় না। কত উপায় রয়েছে... গলায় দড়ি, ট্রেনের সামনে ঝাঁপ, গায়ে আগুন, গলায় কলসি বেঁধে জলে ঝাঁপ, কতরকমের বিষ, তেমনই বেগুনি, পেঁয়াজি।"

"ঠাট্টা করছিস?" বেজা ঠোঙাটা নাকের কাছে এনে জোরে শ্বাস টানল। "ঠিকই বলেছিস, নোলা আমার একটু বেশিই। ওই যে বললি এক ওভারে আটাশ রান, সেটাও ওই নোলার জন্য।" বলে বেজা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

"ব্যাপারটা কী, বল। হঠাৎ পানু বেধড়ক মারতে শুরু করে দিল তোর লংহপ আর শর্ট পিচ বল পেয়ে, ওভাবে বল ফেলেছিলিস কেন?" জহর জানতে চাইলেন।

"পঙ্কজদা সেঞ্চুরি করল, আমাদের রান হল ২৬০..."

"দুশো উনষাট ... দুশো ষাট করলে জিততুম।" জহর ভুল ধরিয়ে দিলেন।

"ব্রাদার্স আট উইকেটে ১৭০ ... ঠিক বলছি তো?"

"হ্যাঁ। তখন আমি ৭০ ব্যাট করছি ম্যাচ হারছি, তখন নামল পানু, সবে টিম এসেছে। ওকে তো তুই এক বলেই তুলে নিতে পারতিস!"

"পারতুম। তুলিনি একটা ব্যাপারে। লাঞ্চের সময় যখন খাচ্ছি তখন কানুদা, ওই যে রে গাল তোবড়ানো, পাকা চুল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কানু ভট্‌চায, পানুর চামচাটা, আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'কী শুকনো পাউরুটি ঝোলে ডুবিয়ে চিবোচ্ছিস, ফিরপোয় খাবি?' বললুম, 'কে খাওয়াবে?' বলল 'আমি।' অবাক হয়ে গেলুম। হঠাৎ আমাকে ফিরপোয় খাওয়াবার ইচ্ছে হল কেন এই ধূর্ত লোকটার! নিশ্চয় কোনও মতলব আছে। বলল, 'খাওয়া শেষ হলে একটু বাইরে আয়।' কিছুক্ষণ পর টেন্টের বাইরে এসে দেখি কানুদা আর পানু ফেন্সের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আমাকে দেখে পানু সরে গেল। কানুদা বলল, 'বেজা একটা কাজ করে দিতে হবে, কানুকে একটা ফিফ্‌টি পাইয়ে দে। নতুন ছেলে, খুব ইচ্ছে পঙ্কজ রায়ের সেঞ্চুরির পাল্টা একটা ফিফ্‌টি করার, কাগজে নাম বেরোবে... কিছুই তোকে করতে হবে না শুধু লেগ স্টাম্পের বাইরে গোটাকতক শর্ট পিচ আর ফুল টস... বাকিটা ও ম্যানেজ করে নেবে। পারবি না? আজ সন্ধেবেলায়ই তা হলে ফিরপোয়...

তোর যা প্রাণে চায়।' শুনে বলব কী, লোভে পড়ে গেলুম। অত বড় হোটেলে খাওয়া, তাও আবার যা প্রাণে চায়। ম্যাচ তো জিতবই, ফিফ্‌টিই করুক আর সেঞ্চুরিই করুক। রাজি হয়ে গেলুম। তবে এটাও বলে রাখি, ফিফ্‌টি হলেই কিন্তু আর শর্ট পিচ নয়।"

"তারপর ফিরপোয় প্রাণভরে খেলি !"

"না।" বলেই বেজা পেছন ফিরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। জহর তার পিছু নিলেন। বেজার প্রাণভরে খাওয়া কেন হল না সেটা জানার জন্য কৌতূহল তাঁর ঘাড়ে ভর করেছে।

"বেজা বেজা, শোন শোন।" জহর ডাকলেন।

বেজা থমকে ঘুরে দাঁড়াল। ঠোঙা থেকে বেগুনি বার করে মুখে ঢুকিয়ে চিবোতে শুরু করল। সেটা শেষ হলে আর-একটা মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে দ্রুত চিবনোর জন্য। দ্বিতীয়টি শেষ হওয়ার আগেই তৃতীয়টি বার করে হাতে ধরে রইল। জহর আর সহ্য করতে পারলেন না। বেজার হাত থেকে বেগুনিটা তুলে নিয়ে নিজের মুখে ঢোকালেন। বেজা অবাক হয়ে জহরের বেগুনি খাওয়া দেখতে-দেখতে ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরল, "নে, এটা তুই শেষ কর।"

"ব্যাপার কী ! তোর হল কী !" জহর ঠোঙাটা নিলেন।

"সেদিনের কথা ভাবলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। ... আমায় বলেছিল সাতটার সময় ফিরপোর বারান্দার নীচে ফুটপাথে দাঁড়াতে। আমি ঠিক সাতটায় হাজির হয়েছি। কিন্তু কানুদা আর আসে না। দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করলুম, তবুও এল না। খিদেয় পেটে তখন ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে।" সেদিনের বোকা বনে যাওয়ার কথা মনে পড়ে বেজার চোখে জল এসে গেল।

"তারপর কানুদার সঙ্গে দেখা হয়নি ?"

"হয়েছিল। মনুমেন্টের নীচে ফুচকা খাচ্ছিল। আমায় দেখে বলল, 'খাবি নাকি ?' বোঝ কী লোক ! কোথায় ফিরপো আর কোথায় ফুচকা ! বললাম, 'কানুদা, এটা কী হল ? আমি দু'ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলুম।' কী বলল জানিস ? 'খুব কষ্ট পেয়েছিস না রে ? কী করব, খবর পেলুম ভাইঝিটা পরীক্ষায় ফেল করে দোতলা থেকে উঠোনে ঝাঁপ দিয়েছে, ছুটলুম হাসপাতালে, তোকে খবর দেওয়ার টাইমও পেলুম না। যাক্‌ গে, একদিন তোকে গ্র্যান্ড হোটেলে খাইয়ে দেব।"

"খাইয়েছে ?"

"আজও নয়। ... পানুটা ফাঁকতালে ফিফ্‌টি করে গেল।"

জহর ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরলেন, "একটা রয়েছে খেয়ে নে।"

বেজা ঠোঙাটা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে হাঁটা শুরু করল। একটা কুকুর ছুটে গেল ঠোঙাটার দিকে।

জহর মাথা নেড়ে আবার হাতিবাগান মোড়ে ফিরে এলেন, দোকানে যাওয়ার জন্য।

॥ ৪ ॥

অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য জহর ব্যাঙ্কে গেছলেন। সেখানে তাঁকে বলা হয়, এই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে এমন কোনও লোকের সুপারিশ লাগবে। জহর তো ফাঁপরে পড়লেন চেনাশোনা কে আছে যার এই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে ! ভাবতে-ভাবতে মনে পড়ল তাঁর এক খদ্দের, প্রতাপ দাস, তাঁকে একটা চেক দিয়েছিল। এই ব্যাঙ্কেই তার অ্যাকাউন্ট। সে এখান থেকেই চেকটা ভাঙিয়ে টাকা তোলে। প্রতাপ তাঁর খুবই চেনা। টালা পার্কের কাছে নতুন বাড়ি করার সময় জহরের দোকান থেকে সে প্রচুর জিনিস কিনেছিল। প্রতাপ একসময় বছর দুই ব্রাদার্সে ক্রিকেট খেলেছে। পরে খেলা ছেড়ে একটা নার্সিং হোম করে,

একটা ছোট হোটেলও খোলে।

জহর ব্যাঙ্ক থেকেই সোজা প্রতাপের বাড়ি গেলেন। প্রতাপ তখন বাড়ি ছিল না, কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। কিছুক্ষণ বসে থেকে "আমি একটু ঘুরে আসছি," বলে তিনি প্রতাপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। কাছেই টালা পার্ক। বিশাল মাঠ। একটা পুকুরও রয়েছে। এই মাঠে বহুবার খেলে গেছেন জহর। চার-পাঁচটা ক্রিকেট ক্লাব এই মাঠে খেলে, যদিও ক্লাবগুলোর কোনও টেন্ট মাঠে নেই। তবে তারা এখানেই নেট প্র্যাকটিস করে। নেট ও প্র্যাকটিসের জন্য দরকারি জিনিসগুলো রাখার জন্য একটা ঘর আছে, মালীও আছে। ক্লাবগুলোই টাকা দেয়, মালীরা পিচ তৈরি আর রক্ষণাবেক্ষণ করে।

এখন মে মাস, ক্রিকেট সিজনের শেষ দিক। সি এ বি লিগ শেষ হয়ে গেছে। নক আউট ফাইনাল এই সপ্তাহেই! জে সি মুখার্জি ট্রফির খেলা শুরু হবে। কোনও ক্লাবেরই আর এখন নেট প্র্যাকটিস হয় না। গত কয়েকদিন ধরে গনগনে গরম আবহাওয়া। ৩৮ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে কলকাতা ভাজা-ভাজা হচ্ছে। সকাল এগারোটার পর নেহাত দায়ে না পড়লে মানুষজন বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছে না। মাঠের পুব দিকে বড়-বড় গাছ, তাদের নীচে ছায়া, কয়েকটা লোক সেই ছায়ায় শুয়ে রয়েছে। প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও ফুরফুরে হাওয়া বইছে। ছায়ার নীচে এই হাওয়াটা খুবই আরামদায়ক, জহর একটা গাছের নীচে বসলেন।

তখন তাঁর মনে এই মাঠে খেলার নানান স্মৃতি জেগে উঠল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে তাঁরা প্রায় দু' মাইল হেঁটে এসে এখানে খেলতেন। খেলার জায়গা নিয়ে অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া হত, মারপিটও হয়েছে। তখন তিনি হাফপ্যান্ট পরতেন। পার্চমেন্ট মোড়া কানাভাঙা একটা ব্যাট, তিনটে স্টাম্প, একজোড়া ব্যাটিং গ্লাভ্স আর এক জোড়া প্যাড ছিল তাঁদের সম্পত্তি। একপ্রান্তে স্টাম্প পোঁতা হত, অন্যপ্রান্তে জুতোর স্তূপ। একটা করে প্যাড দুই ব্যাটস্‌ম্যান বাঁ পায়ে পরত। গ্লাভ্সও ভাগাভাগি করে বাঁ হাতে পরা হত। ছালচামড়া ওঠা ক্রিকেট বল। কঠিন ছিল উইকেট কিপিং। বিনা গ্লাভ্সে কিপ করা যে ভয়ঙ্কর কাজ ছিল, পেছনে একটা ব্যাকস্টপার রাখতে হত। একটা রান নিলে ব্যাট দিয়ে আসতে হত স্ট্রাইকারকে। এইভাবে খেলতে গিয়ে একটা উপকার হয়েছিল। গায়ে বা পায়ে বা আঙুলে যাতে বল না লাগে সেজন্য নার্ভগুলোকে প্রখর করে হুঁশিয়ার হয়ে বলের দিকে লক্ষ রাখতে হত। নির্মল খুব ছুটে এসে জোরে বল করত। এলোমেলো বল পড়ত। কোনওটা উইকেটের দু'হাত বাইরে কোনওটা মাথার দু'হাত ওপর দিয়ে যেত, ও নিজেকে ফ্রেডি ট্রুম্যান ভাবত। তখন ট্রুম্যানের খুব নাম। একটা বল সোজা বুক লক্ষ্য করে এসেছিল। ব্যাটটা বুকের সামনে কোনওরকমে ধরতেই বলটা ডান হাতের বুড়ো আঙুলে লাগল।

জহর পাল ডান হাতের বুড়ো আঙুল চোখের সামনে তুলে ধরলেন। কবেকার কথা! বাড়ি ফিরে রাতে চুন-হলুদ গরম করে মা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আসলে ভেঙেছিল হাড়। ব্যথা করত, আঙুলটা মুড়তে পারতেন না। ব্যাটের হ্যান্ডেলে বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরতে গেলে লাগত, এখনও লাগে। ডাক্তার দেখিয়েছিলেন বহুদিন পর। অপারেশন করে হাড় সেট করতে হবে শুনে আর ডাক্তারের কাছে যাননি। ছুরি-কাঁচিতে তাঁর ভয়। এখন তাঁর মনে হল, অপারেশনটা করে নিলেই ভাল হত। তা হলে আবার আঘাত লাগার দুশ্চিন্তায় ব্যাটিংটা ভয়ে-ভয়ে করতে হত না। স্ট্রোকে জোরটাও দিতে পারতেন, খেলার ধরনটাও বদলে নিতে পারতেন। কে জানে, হয়তো স্লো ব্যাটিংয়ের জন্য রনজি টিম থেকে তা হলে বাদ পড়তেন না। ছোটখাটো ব্যাপারগুলোকে অবহেলা করলে পরে পস্তাতে হবেই।

ঘড়ি দেখলেন জহর। এক ঘণ্টার ওপর পার্কে বসে। এবার গিয়ে দেখা যাক, প্রতাপ ফিরেছে কি না। উঠে পড়লেন।

প্রতাপ কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছে। জহরের আসার কারণ শুনে সে হাত বাড়িয়ে বলল, "ফর্মটা দিন।" যথাস্থানে সই করে বলল, "ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার খাতির আছে, কোনও অসুবিধে হবে না।" জহর যাওয়ার জন্য উঠতেই প্রতাপ বলল, "জহরদা, একটা কথা ছিল। আপনাদের ওদিকে রাজকিশোর পার্কে ছোটদের জন্য একটা ক্রিকেট কোচিং স্কুল খুলব ঠিক করেছি।"

"বলো কী!" জহর অবাক হলেন। "ক্রিকেট শেখার স্কুল, এ তো ভাল কথা। শুনেছি কলকাতায় অনেক এরকম স্কুল হয়েছে। গাদা-গাদা ছেলে ভুলভাল টেকনিকে ব্যাট করে যাচ্ছে, ছুড়ে বল করছে ফার্স্ট ডিভিশনে, সেকেন্ড ডিভিশনে। দেখিয়ে দেওয়ার, শুধরে দেওয়ার জন্য তো ক্লাবে কেউ নেই। তোমার স্কুলে যদি... ভাল কথা, তুমি শেখাবে নাকি?"

"পাগল হয়েছেন! আমি ক্রিকেটের বুঝি কী? আমি শুধু ফিনান্স করব, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দিকটা দেখব, হিসেবটা বুঝে নেব। জানেন তো এখন প্রোমোটিংয়ের যুগ। খরচপত্তর করে, লোকজন রেখে স্কুল চালু করলুম, বিজ্ঞাপন দিলুম। এজন্য রিস্ক নিলুম। লাভ নাও হতে পারে। বাংলার ক্রিকেটের উন্নতির জন্য, মর্যাদা বাড়াবার জন্য, টেস্ট ক্রিকেটার তৈরি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা তো দরকার। ভাবুন তো, মুম্বই, পঞ্জাব, দিল্লি, কর্ণাটক থেকে টেস্ট খেলছে অথচ বেঙ্গল থেকে, শুধু বেঙ্গল কেন, সারা ইস্টার্ন ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়া টিমে যাওয়ার মতো ছেলে পাওয়া যায় না! এটা কি লজ্জার কথা নয়?"

"অবশ্যই লজ্জার কথা।" জহর উৎসাহভরে সমর্থন করলেন।

"এজন্য দরকার বাচ্চা বয়স থেকে ঠিকমতো ক্রিকেটটা শিখিয়ে দেওয়া, ঠিক কি না?"

"অবশ্যই।"

"কে বলতে পারে এই স্কুল থেকেই একটা গাওস্কর, একটা কপিলদেব বেরিয়ে আসবে না! ... জহরদা, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।"

জহর বসলেন। তিনি উৎসাহে রীতিমত ফুটছেন। প্রতাপ ব্যবসায়ী ঠিকই কিন্তু ক্রিকেট কত বছর আগে অল্প খেলেছে, অথচ এখনও ক্রিকেটের জন্য ভেবে যাচ্ছে। বাংলার জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। খেলাধুলো তো এদেরই জন্য বেঁচে রয়েছে।

"ঠিক করেছি প্রফেশনাল অ্যাঙ্গেল থেকে একটা স্কুল খুলব। বুঝলেন জহরদা, আমাদের দেশে সবকিছুই ফোকটসে পেতে চায় আর সেইজন্যই সিরিয়াসলি কিছু নেয় না। কোচিং নেবে বিনি পয়সায়, তা হলে সিরিয়াসলি কেউ কি শেখে? বাপ-মা লেখাপড়ার জন্য টিউটর রাখবে তিনশো-চারশো টাকা মাইনে দিয়ে। আপনি খেলার জন্য পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে কোচ রাখতে বলুন, অমনই দেখবেন চোখ কপালে তুলেছে। এখন ক্রিকেটই হচ্ছে মোস্ট গ্ল্যামারাস গেম। সবাই চায় তার ছেলেটি কপিলদেব হোক। টেন্ডুলকর যা দেখাচ্ছে তার রোজগারের যা সব খবর বেরোচ্ছে, বাচ্চাদের বাপ-মা'র আক্কেল গুড়ুম। তাতে আমাদেরই লাভ... মানে আমাদের স্কুলে ছেলে আরও বাড়বে। ছেলে টেন্ডুলকর হবে এই আশাটা তো আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে, ঠিক কিনা?"

"আশা জাগাও, কিন্তু টেন্ডুলকর হওয়াটা কোচ-ফোচের দ্বারা সম্ভব নয়। তবে এদের সংখ্যা তো হাতে গোনা! কিন্তু এটাও ঠিক, বাকিদের জন্য একটা প্রাথমিক শিক্ষার দরকার আছে।"

"যা বললেন !" প্রতাপ উরুতে চাপড় দিল। "এই দরকারের কথা ভেবেই স্কুল করছি। কাউন্সিলরের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।"

"যারা কোচ করবে তাদের টাকা দেবে তো ?"

"নিশ্চয় দেব। সেটা ঠিক করব কোচের ওজন বুঝে। নামটাম আছে এমন লোককে কোচ হিসেবে রাখলে তাকে তো বেশি টাকা দিতেই হবে। ছেলেদের কাছ থেকে নেব একশো টাকা।"

"অ্যা অ্যাক ... শো !" জহর প্রায় আঁতকে উঠলেন।

"আপনি অবাক হচ্ছেন !" প্রতাপ চোখ সরু করে তাকাল। "একশো, দেড়শো টাকার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাবার জন্য কী লম্বা লাইন পড়ে জানেন ? যদি নামডাকওলা কাউকে পাই তাকে চিফ কোচ করব, দেখবেন তখন ভিড়টা কীরকম হয়।"

"ভিড় হলে এক-একজনকে কোচিং দেওয়ার টাইমই তো থাকবে না !" জহর বিভ্রান্ত বোধ করলেন, ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ঢুকছে না।

"থাকবে, থাকবে।" প্রতাপ আশ্বস্ত করার জন্য বলল, "দেখুন জহরদা, দেড়শো টাকা মাইনের স্কুলে চল্লিশ-পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী প্রতি ক্লাসেই থাকে, তাদের কি লেখাপড়া হয় না ? তারা কি স্টার পেয়ে পাশ করে না ?"

এই অকাট্য যুক্তিতে জহর চুপ করে রইলেন। লেখাপড়ার স্কুল আর ক্রিকেটের স্কুল যে কী করে একই রকমের হতে পারে সেটা তাঁর মাথায় ঢুকছে না, স্কুলে তিনি অতি সাধারণ ছাত্র ছিলেন। অঙ্ক আর ইংরেজি গ্রামার কখনওই তাঁর মাথায় ঢোকেনি, ফলে স্কুল-ফাইনালে ব্যাক পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রিকেটে রন্‌জি ট্রফিতে খেলেছেন, ছ'টা ম্যাচের দশ ইনিংসে আছে সাড়ে তিনশো রান, গড় প্রায় চল্লিশ, আর এই রেজাল্ট তো কোচিং স্কুলে শিক্ষা না নিয়েই !

"বেলা বেড়ে যাচ্ছে, আপনাকে তো এখন ব্যাঙ্কে যেতে হবে।" প্রতাপ উঠে দাঁড়াল, "যদি কোচিং স্কুল শুরু করি তা হলে আপনাকে আমার দরকার হবে। অন্তত দু'জন ভেটারেন কোচ রাখব। আপনি আসবেন তো ?"

"নিশ্চয় আসব। তুমি শুধু দোকানে খবর পাঠিয়ো।"

বেলগাছিয়া ডিপো থেকে ট্রামে উঠলেন জহর। ব্যাঙ্কে এসে শুনলেন, "দেরি করে ফেলেছেন, কাল বারোটার আগে আসুন।" ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে ঠিক করলেন একটু ঘুরে রাজনারায়ণ পার্কটা দেখে বাড়ি ফিরবেন। এখন সাড়ে বারোটা বাজে।

পার্কটা রাজপথের ওপর নয়, অন্তত একশো মিটার ভেতরে। আকৃতিতে প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘ্যে বেশি। নাইন-এ-সাইড ফুটবল ম্যাচ খেলা যায়। দু'দিকে বাড়ি আর দু'দিকে রাস্তা। রাস্তার দিকের লোহার রেলিং চুরি হয়ে যাওয়ায় কোমরসমান ইটের পাঁচিল, পাঁচিল ঘেঁষে সাত-আটটা সিমেন্টের বসার জায়গা। দুর্গাপুজো, রাজনৈতিক সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা গানের জলসার ধকলে পার্কে একচিলতে ঘাসও নেই। জমি অসমান, জায়গায়-জায়গায় খোঁড়াখুড়ির চিহ্ন রয়ে গেছে। পার্কের একপ্রান্তে একতলা দুটি লম্বা ঘর, রাজনারায়ণ ইনস্টিটিউট। একদা একটা লাইব্রেরি ছিল, এখনও ছেঁড়া পুরনো কিছু বই আর কয়েকটা আলমারি রয়ে গেছে। ইনস্টিটিউটের ফুটবল আর ক্রিকেট টিমও ছিল। এখন ক্যারম আর তাস খেলা হয়।

জহর একটা বাড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর ছোটবেলায় এই মাঠ ঘাসে ঢাকা ছিল। ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় ফুটবল টুর্নামেন্ট হত। মাঠ ঘিরে দর্শকের ভিড়ের মধ্যে তিনিও হাজির থাকতেন। এখন মাঠের কী অবস্থা ! হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল খাঁ-খাঁ রোদ্দুরে মাঠের এককোনায় একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে আধভাঙা ব্যাট দিয়ে একটা রবারের বল বাড়ির দেওয়ালে মেরে যাচ্ছে, মাঠে তো বটেই, রাস্তাতেও কোনও লোক নেই। ছেলেটি একমনে গভীর অভিনিবেশে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাকফুটে বলটা এমনভাবে মারছে যে, সেটা দেওয়ালে লেগে একটা ড্রপ পড়ে ঠিক তার ব্যাটেই ফিরে আসছে। শটের ওপর এমনই নিয়ন্ত্রণ যে, একবারের জন্যও তাকে পা দুটো ছ' ইঞ্চির বেশি এধার-ওধার করতে হচ্ছে না। ব্যাপারটা দেখে জহর মজা পেলেন। একা-একা এই ভরদুপুরে ক্রিকেটপাগল না হলে কি এমন কাণ্ড করে !

লক্ষ করলেন, শটের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। বেশ জোরে-জোরে মেরে যাচ্ছে। বল দেওয়ালে লেগে মিডিয়াম পেসে হাফ ভলিতে ছেলেটির কাছে ফিরে আসছে আর সে ড্রাইভ করে যাচ্ছে। "বাঃ," আপনা থেকেই জহরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল শব্দটা। তিনি মাঠের ভেতরে ঢুকে ছেলেটির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পা মাথা, কনুই এবং শরীরের ব্যালান্স নিখুঁত না হলে শটের ওপর এমন কন্ট্রোল কি আসে ? সবচেয়ে বড় কথা কনসেনট্রেশন ! কত শট মারল ? সত্তর-আশিটা তো বটেই, একটাও ফসকাল না ! জহর যখন এইসব ভাবছেন তখনই ছেলেটি বল ফসকাল। বলটা একটা ইটের কুচির ওপর পড়ে লাফিয়ে উঠেছিল। জহর বলটা ধরে ফেললেন।

পেছন ফিরে তাঁকে দেখে ছেলেটি অবাক ! তার পেছনে যে একজন দাঁড়িয়ে থাকবেন রোদ্দুর মাথায় নিয়ে, এটা সে ভাবতে পারেনি, বোকার মতো সে হাসল, শ্যামলা রং, ছিপছিপে দোহারা গড়ন, লম্বায় প্রায় পাঁচ-দশ। খয়েরি স্পোর্টস শার্ট, পায়ে হাওয়াই চটি। হাসার জন্য দেখা গেল নীচের পাটির সামনের একটা দাঁত নেই।

"করছ কী ?" জহর হাসলেন।

"এমনিই, একটু পেটাচ্ছি।"

"এভাবে পিটিয়ে লাভ ?"

"ভাল লাগে।" লাজুক স্বরে সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"কোনও ক্লাবে খেলো নাকি ?"

"সবুজ শিবিরে,... পাড়ার একটা ক্লাব।"

জহর কখনও সবুজ শিবির নামটা শোনেননি, ভাবলেন, পাড়ায় পাড়ায় কত ক্লাবই তো আছে। জিজ্ঞেস করলেন, "থাকো কোথায় ?"

ছেলেটি আঙুল তুলে বলল, "এই পাশের রাস্তায়।

জহরের ইচ্ছে করল ওর নামটা জানতে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে তাঁর বাধল। গায়ে পড়ে প্রথম আলাপেই নাম জানতে চাওয়াটা যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে মনে হল, "এখান দিয়ে যাচ্ছিলুম। তোমাকে এইভাবে খেলতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম। এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে, একা একা— ভাবলুম পাগল নাকি ?" জহর হাসলেন। ছেলেটি আবার বোকার মতো হাসল। বলটা ছুড়ে ফেরত দিয়ে জহর ঘুরলেন যাওয়ার জন্য।

"আমি কিন্তু আপনাকে চিনি।"

জহর ঘুরে দাঁড়ালেন, কৌতূহলী চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"চেনো ? আমার নাম জানো ?"

"জহর পাল, গত বছর দেশবন্ধু পার্কে ভেটারেনদের ম্যাচে আপনি ব্যাট করেছিলেন। চারটে ছক্কা মেরে লং অনে ক্যাচ দিয়ে আউট হন।" ছেলেটির চোখে আলো জ্বলে উঠল। "বাবার কাছেও আপনার কথা শুনেছি।"

"কী শুনেছ ?" জহরের কৌতূহল বেড়ে গেল।

"আপনি একঘণ্টা ক্রিজে থেকে একটাও রান করেননি রন্‌জি ট্রফিতে বিহারের সঙ্গে খেলায়। আবার অসমের এগেনস্টে দু'

আপনার জীবনের স্বপ্ন ভাসে ওর উজ্জ্বল চোখে। আর ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যত আপনারই হাতে !

চিল্‌ড্রেন্স গিফ্‌ট গ্রোথ ফাণ্ড।

আজ সামান্য একটু পরিকল্পনা ক'রে আপনি আপনার সন্তানকে এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত উপহার দিতে আরেন।

ইউটিআই-এর শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধির দৌলতে।

- *আপনি 15 বছরের কম বয়সের যে-কোনও বাচ্চাকেই এই উপহার দিতে পারেন। ন্যূনতম পরিমাণ হ'ল 200 ইউনিট (টা. 2000/-), আর তারপরে 100 ইউনিটের গুণিতকে (টা. 1000/-)।*
- *বার্ষিক 14% ডিভিডেণ্ডের সুনিশ্চিতি।*
- *বোনাস ডিভিডেণ্ড প্রত্যেক 3 বছরে।*
- *ঘোষিত ডিভিডেণ্ড আপনা থেকে পুনর্বিনিয়োগ হয়ে যাবে, ফলে আপনার উপহারটি যৌগিক হারে বাড়তেই থাকবে।*
- *18 বছরের পর, উপহার গ্রহণকারী শিশুটি বছরে দু'বার ক'রে টাকা তুলতে পারবে। বাদবাকি পরিমাণটি কিন্তু বাড়তেই থাকবে, যতদিন না ওর 21 বছর বয়স হচ্ছে।*

শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি। এ হ'ল এমন এক উপহার, যার জন্যে আপনার সন্তান আপনাকে চিরদিন মনে রাখবে।

মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড এবং সিকিওরিটিতে সকলপ্রকার বিনিয়োগই বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ, এবং সিকিওরিটি বাজারে প্রভাবসৃষ্টিকারী বিষয় ও শক্তিগুলির ওপর নির্ভর ক'রে যোজনাসমূহের এনএভি ওঠানামা করতে পারে। বিগত কর্মসম্পাদন ভবিষ্যত ফলাফলের অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিতবাহী নয়। শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি (চিল্‌ড্রেন্স গিফ্‌ট গ্রোথ ফাণ্ড) হ'ল শুধুমাত্র এই যোজনার নাম, এবং তা কোনোভাবেই যোজনার গুণমান, তার ভবিষ্যত সম্ভাবনা অথবা ফেরতলাভের প্রতি কোনোরকম ইঙ্গিত করে না। ফাণ্ডের উদ্দেশ্য যে সফল হবেই, এমন কোনো আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে না। বিনিয়োগের পূর্বে অনুগ্রহ ক'রে অফার ডকুমেন্টটি পড়ে নেবেন।

ঘণ্টায় সেঞ্চুরি করেছিলেন।"

জহরের মুখে হাসি ফুটে উঠল, বললেন, "*কেন রান করিনি* তার কারণটা বলেছেন?"

"ম্যাচ ড্র রাখার জন্য। *শেষ একঘণ্টা শুধু বল আটকেছিলেন* আর ছেড়ে দিয়েছিলেন। দশজন আপনাকে ঘিরে রেখেছিল।"

"তোমার বাবা খেলাটা দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। বাবা তো আম্পায়ারিং করতেন। রনজি ট্রফির ম্যাচও খেলিয়েছেন— *পঞ্জাব-রেলওয়েজ।*"

"তাই নাকি? কী নাম তোমার বাবার?"

"অমর দত্ত।"

শুনেই জহরের ভ্রূ বেঁকে উঠল। চোখের চাহনি পলকের জন্য *কঠিন হয়েই আগের মতো কৌতূহলী হল,* ছেলেটি তা লক্ষ করল না।

"নামটা শোনা-শোনা লাগছে। বেঁটে, ফর্সা, গোলগাল, মাথায় বোধ হয় অল্প টাক?"

"হ্যাঁ। তবে এখন সারা মাথাই টাকে ভরা।"

"আচ্ছা, অনেক বেলা হল, চলি।"

জহর দ্রুতপায়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে এলেন। হাঁটতে-হাঁটতে তাঁর মনে পড়ল অনেক বছর আগের একটা ঘটনা। লিগের শেষ ম্যাচ মোহনবাগানের সঙ্গে। ইডেনে ছিল খেলাটা। একদিকের আম্পায়ার ছিল অমর দত্ত। মোহনবাগান দু'শো পাঁচ অল আউট। জহর ব্যাট করতে নেমেছিলেন ফোর ডাউন। ব্রাদার্স তখন পঁচাশি। নেমেই তিনি পেটাতে শুরু করেছিলেন। সাত উইকেটে একশো সত্তর যখন, তিনি তখন একাত্তর রানে, তেরোটা চার মেরেছেন। ব্যাট করেছেন মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। জেতার জন্য আর দরকার ছত্রিশ রান। যেভাবে খেলছিলেন তাতে ওই ক'টা রান পাঁচ ওভারেই তুলে নিতে পারবেন বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন।

জহরের চোখে ভেসে উঠল সেই সময়ের ছবি। মোহনবাগান ক্যাপ্টেন বিটু ঘোষ মরিয়া হয়ে বল দিল প্রশান্ত চৌধুরীকে, প্রশান্ত শুধু নেটে বল করে, কোনওদিন কোনও ম্যাচে বল করেনি। জহর জানতেন না ও কী ধরনের বোলার। বাউন্ডারির ধারে স্কোয়ার লেগ থেকে লং অফ পর্যন্ত পাঁচজন ফিল্ডার রাখল বিটু বাউন্ডারি বন্ধ করার জন্য। জহর হুঁশিয়ার হয়ে প্রথম বলটা খেলেছিলেন। ফ্লাইট করানো লেগ ব্রেক। লেগস্টাম্পের বাইরে শর্ট পিচ। অনায়াসে পুল করতে পারতেন। হয়তো চারটে রানও পাওয়া যেত। মাত্রাতিরিক্ত সাবধান হয়ে তিনি পা বাড়িয়ে প্যাডে খেলেছিলেন। প্রশান্তর দ্বিতীয় বলটাও একই ধরনের ছিল। পুল করবেন ভেবেও শেষ মুহূর্তে ব্যাক ফুটে এসে ডিফেন্সিভ খেলেছিলেন। তখন নিজের ওপর তাঁর রাগ ধরে। খামোখা সমীহ করছেন প্রশান্তকে, বোলারের জাতই নয়। স্রেফ ভ্যাবাচাকা খাওয়াবার জন্য বিটু ওকে ডাক দিয়েছে। বহুক্ষেত্রে এই রকম বোলাররাই উইকেট পেয়ে যায়।

তৃতীয় বলটা মারবেন ঠিক করে জহর বল ডেলিভারির আগেই এক-পা বেরিয়েছিলেন। ফ্লাইট দেখে শর্ট পিচ হচ্ছে আন্দাজ করে আরও এক-পা বেরিয়ে হাফভলি করে নিয়ে মিড উইকেট দিয়ে ছয় মারার জন্য ব্যাট চালিয়েছিলেন। কিন্তু কী যে হয়ে গেল, বলটা তিনি ফসকালেন, বলটা যে লেগস্টাম্পের সামান্য বাইরে ছিল সে-সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। ফসকানো বল লাগল তাঁর ডান পায়ে। উইকেটের সামনেই ছিল পা। প্রশান্ত লাফিয়ে উঠে ঘুরে নাটকীয়ভাবে দুই মুঠো ঝাঁকিয়ে ডাকাতের মতো গলায় চিৎকার করে অ্যাপিল করেছিল। তার সঙ্গে যোগ দেয় উইকেটকিপার। কভার থেকে বিটু "হাউজাট" বলে চেঁচিয়ে আম্পায়ারের দিকে ছুটে এসেছিল। আম্পায়ার ডান হাতের তর্জনি আকাশের দিকে তুলে দিয়েছিলেন।

জহর হতভম্ব হয়ে প্রায় দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থেকেছিলেন। *তাঁর চোখের বজ্রাহতের চাহনিটা ধীরে-ধীরে রূপান্তরিত হয়েছিল* জ্বলন্ত অঙ্গারে। বিটু চেঁচিয়ে বলেছিল, "দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে, *অনেক খেলেছিস, এবার বাড়ি যা।" মাথা নিচু করে,* চোয়াল চেপে জহর মাঠ ছেড়েছিলেন। বাকি দুটো উইকেটে আর পনেরো রান উঠেছিল। ব্রাদার্সের লিগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া অপূর্ণ থেকে যায়। ফিরে আসতেই কানু ভটচায বলেছিল, "শেষকালে প্রশান্তর বলে! ছ্যা ছ্যা ছ্যা... কাছেই গঙ্গা, গিয়ে ডুবে মর। ... জেতা ম্যাচ— !" তখন জহর বলেছিলেন, "বলটা লেগস্টাম্পের অন্তত এক বিঘত বাইরে পড়েছিল। লেগস্টাম্পের বাইরের বলে কি এল বি ডবলু হয়? আজ আমি আম্পায়ারের টুঁটি ছিঁড়ব।" বলেই তিনি ছুটেছিলেন আম্পায়ার্স রুমের দিকে।

টুঁটি ছেঁড়া হয়নি। কয়েকজন তাঁকে জাপটে ধরে রাখে। তিনি চিৎকার করতে থাকেন, "জোচ্চুরি, জোচ্চুরি... টাকা না খেলে অমন ডিসিশান কেউ দেয়?"

কে একজন তখন বলে, "জহরকে এই প্রথম মাথা গরম করতে দেখছি। খুবই মনে লেগেছে।"

আর-একজন বলে, "আম্পায়ারও তো মানুষ আর মানুষমাত্রেই ভুল করে। অমর দত্ত যে এখন কলকাতার সেরা আম্পায়ার তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই! জহর পালের এটা স্পোর্টিংলি নেওয়া উচিত।"

কথাটা শুনেই তিনি লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। পরে মনে হয়েছিল, এ কী করেছেন? একটা খেলায় আউট হলে কি ভদ্রতা বিসর্জন দিতে হবে? অত লোকের মাঝে কি খারাপ ইঙ্গিত করলেন লোকটির উদ্দেশ্যে! হয়তো সত্যিই ভুল করে আউট দিয়েছে, অথচ বলে দিলেন টাকা খেয়েছে! অমর দত্ত নিশ্চয় শুনেছে তার চিৎকার। কী ভাবল তার সম্পর্কে! খেলা কি আত্মমর্যাদার চেয়েও বড় জিনিস? বেশ কিছুদিন তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছিলেন। তারপর ধীরে-ধীরে ঘটনাটা ভুলে যান।

এত বছর পর আজ আবার মনে পড়ে গেল। অমর দত্তের ছেলের সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল ছিল। ... ছেলেটার নামটা তো জানা হল না!

॥ ৫ ॥

অবনী রায়ের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার চেকটা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে জহর জমা দিয়েছিলেন। কয়েকদিন পর টাকাটা তুলে তিনি ছেলেকে এক দুপুরে নিয়ে গেলেন নিউ আলিপুরে এক ক্লিনিকে। সেখানে এম আর আই স্ক্যান করিয়ে বাসে ফিরছিলেন। বাস যখন পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি তিনি দেখলেন ময়দানে একটা মাঠে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। তাঁর মন আনচান করে উঠল। অনেকদিন তিনি ঘাসের ওপর হাঁটেননি, ব্যাটের সঙ্গে বলের ধাক্কা লাগার শব্দ শোনেননি, ব্যাটের ঠিক কোথায় বল লাগল, শব্দ শুনে তা বলে দিতে পারেন। 'হাউজ্যাট' চিৎকার অনেকদিন শোনেননি, আউট হয়ে ফিরে আসা কোনও তরুণের হতাশ মুখ বা শরীরের নিঁখুত ব্যালান্সে ভর রেখে মারা কভার ড্রাইভ অনেকদিন দেখেননি কিংবা লংঅনে আকাশছোঁয়া বলে ক্যাচ নেওয়া।

"মানিক আমি এখানে নামব, একটু কাজ আছে। তুই বাড়ি চলে যা।"

জহর এই বলে বাস থেকে নেমেই হনহনিয়ে ইডেন মাঠের দিকে রওনা হলেন। তিনি কাগজে দেখেছেন পি সেন ট্রফির খেলা শুরু হয়েছে। আজ ব্রাদার্সের সঙ্গে ফুলবাগানের ফাইনাল। ঘড়ি দেখে আন্দাজ করলেন লাঞ্চ হয়ে আবার খেলা শুরু হয়েছে।

কাঠফাটা রোদ্দুর। দর্শক বড়জোর শ'দুই। ক্লাব হাউসের সিঁড়ি ভেঙে ওপরতলায় উঠে এসে সিমেন্টের চেয়ারে বসলেন জহর। দু'ধারে তাকিয়ে একজন চেনা লোককে দেখলেন। মনোজ, ব্রাদার্স ইউনিয়নের পুরনো সাপোর্টার, জহর তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মাঠে ফিল্ড করছে ব্রাদার্স।

"খবর কী ?" জহর জিজ্ঞেস করলেন।

"ভালই। চুয়াল্লিশ ওভারে দুশো ছেচল্লিশ। ... দারুণ ব্যাট করল মান্টু সিং, এই একটা ভাল প্লেয়ার এনেছে পানু পোদ্দার। সাতাত্তরটা রান করল, কী মার যে মারল কী বলব ! ইজিলি সেঞ্চুরিটা করতে পারত।"

"পারল না কেন ?"

"বমি করতে শুরু করল। এই গরমে আর দাঁড়াতে পারছিল না।"

"এগারোটা ফিল্ডার কী করে তা হলে দাঁড়াল ?"

এমন এক বিদঘুটে কথা শুনে মনোজকে বিব্রত দেখাল। জহর ঠোঁট টিপে হাসলেন। বললেন, "খুব দামি প্লেয়ার বোধ হয় !"

"চারটে ম্যাচ খেলে চল্লিশ হাজার নেবে।... আজকাল ক্রিকেটেও ফুটবলের মতো টাকা ! ... জহরদা আপনারা আর কী করলেন ? শুধু বুড়ো আঙুল চুষে গেলেন।"

জহর হাসতে গিয়ে থমকে গেলেন। মাঠে একটা উইকেট পড়েছে।

"থার্ড উইকেট পড়ল।" মনোজ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। "থ্রি ফর থার্টি, মাত্র সাত ওভার খেলা হল। জহরদা, পি সেন ট্রফি এবার ব্রাদার্সের ঘরে উঠল। ... তিনটেই ভাল ব্যাট, মাত্র তিরিশ রানে চলে গেল !"

"হ্যাঁ চলে গেল। গাড়োলের মতো ব্যাট করলে তো চলে যেতেই হবে। ওরা কি ভেবেছে পঁচিশ ওভারেই আড়াই শো রান তুলে নেবে ? কীভাবে ছেলেটা ব্যাট চালাল দেখেছ ? একটা থার্ড ক্লাস বলে শর্ট লেগের হাতে আলুগপ্পা !" জহর তিক্তবিরক্ত স্বরে বললেন।

"দিক না আলুগপ্পা, তাতে তো ব্রাদার্সেরই লাভ।"

" তা বটে, তবে এইরকম ব্যাটিং বসে দেখা যায় না।"

"আপনারা, পুরনো লোকেরা সবসময় কেতাবি ব্যাটিং দেখতে চান।" মনোজের গলায় সামান্য তাচ্ছিল্য।" রান পেলেই হল, ব্যাটের কোথায় লেগে কোথা দিয়ে রান এল তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী ?"

জহর চুপ করে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। নতুন ব্যাটস্‌ম্যান প্রথম বলটা ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলল। বলটা গেল স্লিপের দিকে। জহরের ভুরু কুঁচকে উঠল। মনোজকে জিজ্ঞেস করলেন, "নুরু ক'টা উইকেট পেয়েছে ?"

"এই একটাই, বাকি দুটো অলোক।"

"জয়প্রকাশ ব্যাট করেনি ?" জহর খোঁজ নিলেন।

ফুলবাগানের সেরা ব্যাট এবং সবচেয়ে অভিজ্ঞ জয়প্রকাশ চার বছর আগে বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় চাকরি নিয়ে আসে। তিনটে টেস্ট খেলেছে। রনজি ট্রফিতে কর্নাটক আর বাংলার হয়ে মোট তেরোটা সেঞ্চুরি, দলিপ ট্রফিতে দুটো সেঞ্চুরি আছে। টেকনিক্যালি নিখুঁত এবং বুদ্ধিমান।

"এখনও নামেনি। ... ও আর করবে কী... আরে, আরে—" মনোজ লাফিয়ে উঠল, "ফোর্থ উইকেট গন... জহরদা কট অ্যান্ড বোল্ড। ফুলবাগান ফোর ডাউন ফর থার্টি টু ! ... গেল, ফুলবাগান আজ গেল। দশ ওভারে বত্রিশ ... অলোকের থার্ড উইকেট !"

জহর কথা বললেন না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন উইকেটের দিকে মন্থর পায়ে যাওয়া জয়প্রকাশের দিকে। মাথায় হেলমেট, বছর পঁয়ত্রিশের শীর্ণ লম্বা চেহারা। চার উইকেটে বত্রিশের মতো পরিস্থিতিতে জয়প্রকাশ বহুবার ব্যাট করতে নেমেছে। এটা লিমিটেড ওভারের ম্যাচ, খুটখাট করে ব্যাট করলে চলবে না। উইকেট বাঁচিয়ে দ্রুত রানও তুলতে হবে। পঁয়ত্রিশ ওভার বাকি, হাতে ছ'টা উইকেট, এখন তুলতে হবে আরও দুশো পনেরো রান। জহর নড়েচড়ে বসলেন। কাজটা সহজ নয়।

জয়প্রকাশ তিনটে বল খেলল। সবক'টাই ফিরিয়ে দিল বোলারকে। ওভারশেষে নন স্ট্রাইকার সুপ্রকাশের সঙ্গে কথা বলল। নুরুর প্রথম বলেই থার্ডম্যান থেকে একটা রান নিয়ে কিঙ্কর স্ট্রাইক দিল জয়প্রকাশকে।

জয়প্রকাশ প্রথম বলটাতেই ব্যাট চালাল। 'কড়াত' শব্দ হল। নিমেষে পয়েন্ট বাউন্ডারিতে বল। জহর শিরদাঁড়ায় শিহরন বোধ করলেন। দারুণ স্কোয়্যার কাটটা ! পরের বলটা ওভারপিচ। স্ট্রেট ড্রাইভ। চার রান। নুরুর চতুর্থ বল ফুলটস, অফ স্টাম্পের বাইরে, জয়প্রকাশ পুল করল মিড উইকেটে। আবার চার রান। পঞ্চম বলটা দেখে জহরের মনে হল নুরু ঘাবড়ে গেছে। লেগ স্টাম্পের প্রায় এক হাত বাইরে ছিল। জয়প্রকাশ ছেড়ে দিল। আম্পায়ার ওয়াইড সঙ্কেত দেখালেন। পরের বল ডেলিভারির আগেই কিঙ্কর ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এল দ্রুত শর্ট রান নেওয়ার আশায়। নুরু সেটা লক্ষ করেই ডেলিভারি না করে বল হাতে বেল তুলে নিয়ে, "হাউজ দ্যাট" বলে চিৎকার করল।

আম্পায়ার আঙুল তুলে দিতেই মনোজ লাফিয়ে উঠল। মাঠে প্লেয়াররা দু'হাত তুলে নুরুর দিকে ছুটে এসে হাতে হাত চাপড়াচ্ছে। "ফিফ্‌থ উইকেট ... জহরদা, ভাবা যায় ! ছেচল্লিশ রানে পাঁচটা উইকেট ! ... ওহ্‌ !" মনোজ দু'হাতে মুখ ঢাকল। "আমরা জিতছি। ফুলবাগান আজ যা ডিফিট খাবে !"

"মনোজ, খেলার এখনও অনেক বাকি।" শান্ত স্বরে জহর বললেন, "উইকেট পাচ্ছে নিজেদের বোলিংয়ের জন্য নয়, ব্যাটস্‌ম্যানদের ভুলে। ক্রিজে জয়প্রকাশ রয়েছে। ও কিন্তু ভুল করে না। একটা লোকই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে।"

"আরে রাখুন আপনার জয়প্রকাশ। হাসতে-হাসতে আমরা ম্যাচ তুলে নিয়ে যাব। বাজি ফেলুন, কত টাকা দেবেন যদি ব্রাদার্স ইউনিয়ন ম্যাচ জেতে ?"

জহর আড়চোখে মনোজের উত্তেজিত মুখ দেখে নিয়ে বললেন, "বাজি আমি ধরি না।"

"বেশ আমিই পঞ্চাশ টাকা দেব যদি ফুলবাগান জেতে। ... যাই একবার ড্রেসিং রুমটা ঘুরে আসি, মান্টু সিংয়ের যা অবস্থা দেখেছি।... ফাইভ ফর ফর্টিসিক্স, আর আপনি কিনা বলছেন জয়প্রকাশ ম্যাচ ঘুরিয়ে দেবে ?" মনোজ নীচে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির দিকে এগোল। জহর মাঠের মাঝে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

এক ঘণ্টা পর ফুলবাগানের স্কোর হল পাঁচ উইকেটে একশো একান্ন। গড়ে সাত রান প্রতি ওভারে এবং পনেরো ওভারে জয়প্রকাশ আর নতুন একটি ছেলে (জহর এক ফুলবাগান সাপোর্টারকে পরে জিজ্ঞেস করে জানে ওর নাম শুভ্রজ্যোতি) যোগ করেছে একশো পাঁচ রান। তার মধ্যে জয়প্রকাশেরই বাহাত্তর।

জহর এই সময় মনে-মনে বলেন, 'একই বলে গাছাড়া খেলা। পাঁচটা উইকেট ফেলে দিয়েই ভাবল ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলেছি। ...চাবকানো উচিত গোটা টিমটাকে।... বলের লাইন আর লেংথের মাথামুণ্ডু নেই, ফিল্ডাররা দৌড়চ্ছে যেন আধমনি বস্তা মাথায় নিয়ে। জয়প্রকাশেরই একটা ক্যাচ আর একটা স্টাম্পিং চান্স মিস করেছে, এরা আবার ম্যাচ জিতবে ! অফে ছ'টা লোক রেখে বল ফেলছে লেগস্টাম্পে ! এ-ম্যাচ ফুলবাগান ঠিক বার করে নিয়ে যাবে।'

এবং ফুলবাগান তাই করল। সাত উইকেটে দুশো সাতচল্লিশ করল যখন, তখনও ম্যাচের দু' ওভার বাকি, জয়প্রকাশ আশি বলে

বিরানব্বই করে লং অনে ধরা পড়ে। আর শুভ্রজ্যোতি একশো আট বলে সত্তর রান করে নট আউট। দু'জনে মিলে তুলেছে একশো পঁয়তাল্লিশ রান। ছেলেটা কঠিন সময়ে চাপের মুখে ভেঙে পড়েনি। টেকনিক ভাল, টেম্পারামেন্ট ভাল, ছেলেটা উঠবে। ওর খেলা জহরকে খুশি করেছে। সাপোর্টারিদের কাঁধে চেপে শুভ্রজ্যোতি ফিরছে। গরমে লাল হয়ে যাওয়া মুখের লাজুক হাসিটা জহরের ভাল লাগল। তিনি প্রায় অন্যমনস্কের মতো মৃদু হাততালি দিলেন। হারা ম্যাচ জিতে নেওয়ার মতো ঘটনা খুব বেশি দেখা যায় না। বাস থেকে নেমে পড়ে খেলাটা দেখতে আসার জন্য জহর নিজেকে তারিফ জানালেন।

ক্লাব হাউস থেকে বেরিয়েই দেখলেন সমর দত্তর ছেলে রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে এধার-ওধার তাকাচ্ছে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ছেলেটি হাসল।

"খেলা দেখলে ?" জহর জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ।"

"কীরকম দেখলে ?"

"শুভ্র দারুণ ব্যাট করল।" ছেলেটির চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "দেখলেন একটাও তুলে মারেনি, সব জমির ওপর দিয়ে। অথচ সিক্সার মারতে ওস্তাদ।"

"তুমি ওর খেলা আগে দেখেছ ?"

"ও তো দু' বছর আগে আমাদের ক্লাবেই ছিল, একসঙ্গে খেলেছি। ...এ-বছরই শুভ্র ফুলবাগানে এসেছে। যাই, ওকে কনগ্র্যাচুলেট করে আসি। ... আপনার ক্লাব যে এভাবে হারবে ভাবিনি।"

আমার ক্লাব ! কথাটা জহরের মনে বাজল। ব্রাদার্স ইউনিয়ন কি এখনও আমার ক্লাব ! কত বছর ব্রাদার্সে খেলেছি ... আঠারো বছর ? আঠারোই হবে, আট বছরই তো ক্যাপ্টেন ছিলাম ! তারও আগে দুটো সিজন ফুলবাগানেও খেলেছি।

ছেলেটি রাস্তা পার হতে যাচ্ছে। জহর চেঁচিয়ে বললেন, "শোনো, শোনো ... তোমার নামটা কী ?"

"সমর।" একটু থেমে রয়ে জুড়ল, "সমু।"

"চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাব, শুভ্রর সঙ্গে আলাপ করব।"

দু'জনে মিনিট দুয়েক হেঁটে পৌঁছল ফুলবাগান টেন্টে। কলকাতার পুবে নারকেলডাঙ্গা আর বেলেঘাটার মোড়ে ফুলবাগান অঞ্চল। ক্লাবটি সেখানেই। পঁচাশি বছর আগে পাড়ার কয়েকজন ছেলে প্রতিষ্ঠা করে। কালক্রমে সেখান থেকে বড় হতে-হতে এখন ময়দানে জায়গা করে নিয়েছে। ক্রিকেট ছাড়া ফুটবলও খেলে সিনিয়ার ডিভিশনে। নামটাই ফুলবাগান অ্যাথলেটিক, জায়গার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক নেই। ক্লাব প্রাঙ্গণটা বেশ বড়। কাঠের বেঞ্চ আর ছোট-ছোট টেব্‌ল ছড়ানো। বয়স্ক মেম্বাররা এই গরমের জন্য এখনও এসে পৌঁছননি। তবে যেসব সমর্থক ইডেনে খেলা দেখতে গেছল তারাই এখন উল্লাস করছে। টেন্টের মধ্যে প্রচুর লোক। প্লেয়াররা এখনও পোশাক বদলায়নি। সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের বোতল নিয়ে অনেকে খোলা প্রাঙ্গণে বেঞ্চে বসে। গরম, ঘাম আর উত্তেজনা প্রশমনের সঙ্গে চাপা উচ্ছ্বাসে তাদের মুখ গনগন করছে। সমর্থকদের স্তুতি প্রশংসা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করার সঙ্গে চুমুক দিচ্ছে বোতলে।

জহর একটা বেঞ্চে বসলেন। সমর টেন্টের ভেতর ঢুকে গেল। একটু পরেই ফিরে এল একটা বোতল হাতে, তাঁর সঙ্গে শুভ্র।

"শুভ্র, ইনি জহর পাল, নাম শুনেছিস তো আজ তোর ব্যাটিং দেখেছেন, ভাল লেগেছে ওঁর।" সমু পরিচয় করিয়ে দিতেই শুভ্র

হাতজোড় করে নমস্কার করল। জহর প্রশংসভরা চোখে তাকিয়ে বললেন, "ভাল খেলেছ। তবে বাসুদেবের ফ্লাইটেড বলে তোমার ইনিশিয়াল মুভমেন্টটা পেছনদিকে হচ্ছিল, এগিয়ে গিয়ে হাফভলিতে মিট করার চেষ্টা দেখলাম না। ... অ্যাটাক করবে তো বেরিয়ে এসে! এমন সহজ পিচে তো বোলিংকে তুলোধোনা করবে, দেখলে না জয়প্রকাশ তাই করল। অবশ্য ওর মতো এক্সপিরিয়ান্স তোমার নেই। .... তা হলেও খুব ভাল খেলেছ।"

শুভ্র নম্রস্বরে বলল, "প্রকাশদাই বারণ করলেন। বললেন, ধরে খেল, তাড়াহুড়ো করিসনি। যা করার আমি করছি।"

"নুরুর বলে দুটো ড্রাইভ উঠে গেছল। শর্ট কভারে লোক থাকলে পেয়ে যেত তোমায়।"

"আমি লোক নেই দেখেই চালিয়েছিলুম।"

"তোমার দরকার টার্নিং পিচে ভাল স্পিনারের বলে খেলা। মুশকিল হচ্ছে এখন তো তেমন স্পিনার নেই।" জহর চিন্তিত মুখে কথা শেষ করলেন। "এমন বাজে বোলিং তো সব ম্যাচে পাবে না।"

এই সময় ফুলবাগানের ক্রিকেট সচিব হেমন্ত গুহ তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বেঁটেখাটো, ধুতি-পাঞ্জাবিপরা, হাসিখুশি মুখ, ষাটের কাছাকাছি বয়সী লোকটি দিলদরিয়া মেজাজের জন্য খেলোয়াড়দের প্রিয়। ব্যবসা করেন, দু' হাতে খরচও করেন। জহর ওকে চেনেন।

"ভাবতেই পারছি না জহরকে ফুলবাগান টেন্টে আজ দেখব।" দু' হাত বাড়িয়ে হেমন্ত বললেন, জহর দাঁড়িয়ে উঠে ওঁর হাত দুটি ধরলেন।

"যেভাবে ম্যাচটা আপনারা জিতলেন, বিশেষ করে এই ছেলেটি যেরকম ব্যাট করল, তাতে ভাবলাম, যাই, ছেলেটিকে অভিনন্দন জানিয়ে আসি।"

"আপনি কি ব্রাদার্স ইউনিয়ন ছেড়ে দিয়েছেন?... এ-বছরও তো খেলেছেন!" হেমন্তর চোখেমুখে বিস্ময়।

"বলতে পারেন ছেড়ে দিয়েছি।" একটু থেমে হাসিমুখে ম্লান কণ্ঠে জহর বললেন, "বুড়ো ঘোড়া আর কত টানব, ওরাই ছাড়িয়ে দিল।... ওয়ানডে ক্রিকেটের সঙ্গে তাল দিয়ে চলা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বয়স তো কম হল না! এবার সরে যাওয়াই তো উচিত।"

"কত বছর খেললেন?" হেমন্ত জানতে চাইলেন।

"খেলছি তো বাচ্চা বয়স থেকে। ময়দানেই তো কাটল পঁয়ত্রিশ বছর।"

একটি লোক এসে হেমন্তর কানে মুখ লাগিয়ে ফিসফিস করে কী বলতেই হেমন্ত তাকে বললেন, "আরে বাবা, হবে হবে, কথা দিয়েছি যখন ঠিকই খাওয়াব।" তারপর জহরের দিকে তাকিয়ে হেমন্ত একগাল হেসে বললেন, "জিতলে ওয়ালডর্ফে ডিনার খাওয়াব বলেছি। যাই টেলিফোন করে টেব্‌ল বুক করে আসি। .... শুভ্র বাড়ি চলে যেয়ো না যেন।"

ব্যস্ত হয়ে হেমন্ত টেন্টের দিকে চলে গেলেন। জহর বললেন, "আমিও যাই। সমু, তুমি তো এখন থাকবে।"

"আমি আর এখানে থেকে কী করব, শুভ্র তো আজ ভি আই পি, কত লোক এখন ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে।" সমু হাসতে হাসতে হুল ফোটাল।

"এই একটা লোকাল ট্রফির একটা ম্যাচে ভাল খেলেই ভি আই পি? জয়প্রকাশ না খেললে কী হত অবস্থাটা?" জহর শুভ্রর পিঠে হাত রেখে গাঢ়স্বরে বললেন, "অনেক শেখার আছে, অনেক পথ যেতে হবে। ধরে নাও এখনও তুমি কিছু জানো না। ক্রিকেটে একটা ভুল মানেই তুমি আর ক্রিজে নেই। ভাবো আর নিজেই একটা-একটা করে ভুল শুধরে নিয়ে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করো, এভাবেই গাওস্কর অতবড় হয়েছে।"

ওর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে জহর গেটের দিকে এগোলেন। তাঁর কানে এল শুভ্র রেগে সমুকে বলছে, "কেন আমাকে ভি আই পি বলে লজ্জায় ফেলে দিলি!"

জহর মনে-মনে হাসলেন বেজার কথা মনে পড়ায়। কানু ভট্‌চায ওকে বলেছিল 'আজ সন্ধেবেলায়ই তা হলে ফিরপোয়, ...তোর যা প্রাণে চায়।' —বেচারা বেজা! ফিরপো হোটেল এখন উঠে গেছে। নিজেকে নিজে নষ্ট করল, স্রেফ খাওয়ার লোভে পড়ে-পড়ে শরীরটা শেষ করে দিল। মন দিয়ে খেলায় যত্ন নিলে অনেকদূর উঠত। বিষেন বেদির মতো বল করত। বেজার সঙ্গে দেখা হলে বলতে হবে ফুলবাগানের পুরো টিম পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে ডিনার খেয়েছে। শুনে এত বছর পরেও কানু ভট্‌চাযের বাপান্ত করবে আর কষ্ট পাবে, তা পাক। এটাই হবে ওর লোভের শাস্তি।

জহরের চেয়ে অল্প পেছনে আসছে সমু। গরম এখন সামান্য কমেছে, সূর্য একটু পরেই অস্তে যাবে। পথে লোকের ভিড় শুরু হয়েছে। অধিকাংশই চলেছে গঙ্গার দিকে। ছ'টা বাজলেও সন্ধ্যা নামেনি। ভেজা ছোলা বিক্রি হচ্ছে দেখে জহর দাঁড়িয়ে পড়লেন। ময়দানে এটা তাঁর প্রিয় খাদ্য। পেঁয়াজ কুচি, বিটনুন আর লেবুর রস দেওয়া ভেজানো ছোলা খেতে-খেতে এসপ্ল্যানেডে ট্রাম ধরতে যাওয়ার দরকার আর বোধ হয় হবে না কোনওদিন।

সমুকে দেখে জহর বললেন, "এসো, ছোলা খাওয়া যাক।"

"না, না, আমার খিদে নেই।" সমু এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলল।

"আরে, খিদে মেটাবার জন্য কি কেউ ছোলা খায়? এটা সময় কাটাবার জন্য জাবর কাটা। আমার হাতে এখন অঢেল সময়। ... দু' পাতা দাও তো।" জহর ছোলাওলাকে বললেন।

"আপনি এত বছর ধরে খেললেন কী করে? আমি তো ভাবতেই পারি না! ফার্স্ট ডিভিশনে আপনার চেয়ে সিনিয়ার আর কেউ আছে?"

"না, নেই।" জহর নিশ্চিত গলায় বললেন, "কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কী আছে? তুমি সি কে নাইডুর নাম শুনেছ? .... বোধ হয় শোনোনি।"

"শুনেছি, বাবা একদিন বলেছিল ভারতের প্রথম টেস্ট ক্যাপ্টেন ছিলেন সি কে নাইডু।"

"আমার ছোটবেলার হিরো ছিল মুস্তাক আলি, তোমাদের যেমন গাওস্কর, কপিলদেব .... মুস্তাকের গুরু ছিলেন সি কে। কালো রং ছ' ফুটের ওপর লম্বা, তেমনই স্টাউট ফিগার, চলাফেরার ভঙ্গি ছিল রাজার মতো। দেখলেই মনে হত, হ্যাঁ একটা ক্রিকেটার বটে!"

"আপনি ওকে দেখেছেন?"

জহর কথাটার জবাব না দিয়ে বললেন, "নাও, পাতাটা ধরো।"

সি কে নাইডুকে তিনি চোখে দেখেননি। সি কে শেষবার যখন ইডেনে খেলেন তখন জহরের বয়স তেরো। বাংলার বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির সেই ফাইনাল খেলা দেখা তাঁর হয়ে ওঠেনি। হাম তাঁকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল। কিন্তু খবরের কাগজ থেকে তিনি খেলাটির বিবরণ পড়ে যে রোমাঞ্চ বোধ করেছিলেন সেই রোমাঞ্চ স্মৃতিতে আজও জ্বলজ্বলে তাজা হয়ে রয়েছে। সতেরো রানের ফার্স্ট ইনিংস লিডের জন্য হোলকার অবধারিত হারা ম্যাচটা জিতে যায়। আজও তিনি একটা হারা ম্যাচ জিততে দেখলেন।

দু'জনে ছোলা চিবোতে-চিবোতে ধীরগতিতে হাঁটতে শুরু করলেন। জহর অন্যমনস্ক। তিনি আজকের একদিনের ম্যাচের সঙ্গে পাঁচদিনের সেই রনজি ফাইনালকে একই সারিতে ফেলে

ভাবতে পারলেন কী করে যে, 'আজও একটা হারা ম্যাচ জিততে দেখলেন!' দুটো ম্যাচের মধ্যে কি তুলনা হয়? বাদল দত্তর সেঞ্চুরি, নির্মল চ্যাটার্জির হাফ সেঞ্চুরি, তার জবাবে নিম্বলকরের ডাব্‌ল সেঞ্চুরি, মুস্তাকের নিরানব্বুই। নাইন্‌থ উইকেট যখন পড়ল হোলকার তখনও সতেরো রান পেছনে। কী লড়াই যে তখন! সেই টেন্‌থ উইকেট পার্টনারশিপটা ....।

সমু তাঁকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে। তিনি ওর দিকে তাকিয়ে অবাক স্বরে বললেন, "জানো নিম্বলকর আর ধনওয়াড়ে চল্লিশ রান তুলেছিল• টেন্‌থ উইকেটে! ধনওয়াড়ে ছিল বোলার, একদমই ব্যাট করতে পারে না কিন্তু এগারো নম্বরে দুটো ইনিংসেই মাটি কামড়ে ব্যাট করে গেল। .... একেই বলে জেতার ইচ্ছে, লড়াই করা ..." জহর উত্তেজনায় হাতে ঝাঁকুনি দিতেই কিছু ছোলা পড়ে যাচ্ছিল, সমু বিদ্যুৎগতিতে হাত বাড়িয়ে দিতেই কয়েকটা ছোলা তার তালুতে পড়ল। একটা কঠিন ক্যাচ ধরার সাফল্য তার মুখে ভেসে উঠল।

"গুড।" জহর হাত বাড়িয়ে ছোলাক'টা নিলেন। "স্লিপে ফিল্ড করো?"

"হ্যাঁ।"

"ক্যারেকটার!.... ধনওয়াড়ে তার ভেতরের জিনিস বার করে এনে ব্যাট করেছিল, সেটা হল ফাইটিং স্পিরিট। এটা না থাকলে প্লেয়ার হওয়া যায় না। দু'জন ঝানু টেস্ট বোলার মন্টু ব্যানার্জি আর পুঁটু চৌধুরী, ভাল অফ স্পিনার গিরিধারী শতচেষ্টা করেও সেকেন্ড ইনিংসে ওকে আউট করতে পারেনি। দেড়ঘন্টা ধরে ডিফেন্ড করে দু' রানে নট আউট থেকে ম্যাচ বাঁচিয়েছে। ..... বাংলাও লড়েছিল সরাসরি জেতার জন্য। ফার্স্ট ইনিংসে পিছিয়ে গিয়ে আবার ব্যাট করতে নামে। হোলকার বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে চারজন হাফ সেঞ্চুরি করে। ফিফ্‌থ ডে সকালে উইকেটে রোল করিয়ে ক্যাপ্টেন খোকন সেন বাংলাকে দু' ওভার ব্যাট করিয়ে, শ' তিনেক রান হাতে নিয়ে ইনিংস ছেড়ে দেয়। সকালে বাংলা দু' ওভারের জন্য ব্যাট করল কেন বলো তো?" জহর দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার এবং রেড রোড পার হওয়ার জন্য।

"জানি না।" সমু অকপটে স্বীকার করল।

"তা না হলে উইকেট রোল করার সুযোগটা বাংলা পেত না। আর এই রোলিংটা নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, চারদিন খেলে উইকেট তো ভেঙে গেছল, সেটাকে আরও ভেঙে দেওয়া। এর পর ব্যাট করার আগে হোলকার আবার রোল করাল, আরও ভাঙল। তারপর তো বাংলা ঝাঁপিয়ে পড়ল।"

রেড রোডে অবিশ্রান্ত গাড়ির স্রোত। ওরা রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করল না। জহরের ভাল লাগছে একজন মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে। তাঁর ধারণা, অতীতের কথা তরুণদের জানা দরকার। এগুলো উৎসাহ আর প্রেরণা জোগায়। যেমন সি কে নাইডু তাঁকে এই বয়সেও শক্তি জুগিয়ে মাঠে টেনে আনেন।

"পাঁচঘণ্টায় দশটা উইকেট ফেলতে হবে তিনশো রানের মধ্যে। ভাবো ব্যাপারটা! উইকেট পড়তেও লাগল। হার হচ্ছে জেনে লাঞ্চের পর সি কে তো মাঠ থেকেই কালীঘাটে পুজো দিতে গেলেন। কিন্তু বাংলা আটকে গেল ন'টা উইকেট নেওয়ার পর। বাকিটা আপ্রাণ চেষ্টা করেও আর পাওয়া হল না। যদি পেত—" জহর কথা শেষ করলেন না। শুধু হাসলেন। "কী দারুণ একটা ভিক্‌ট্রি দুটো বোলার, হীরালাল গায়কোয়াড় আর ধনওয়াড়ে আটকে দিল ব্যাট দিয়ে। আজ আর ওদের নাম কেউ করে না, জেতার জন্য বাংলার সেই লড়াই কেউ আর আজ মনে রাখেনি।... সি কে নাইডুর সেটাই ছিল শেষবার রনজি ট্রফি জেতা, বয়স তখন সাতান্ন পেরিয়েছে।" জহর মুচকি হেসে চোখ পিটপিট করলেন।

"চলুন এবার পার হই।"

ওরা রাস্তা পার হয়ে নীরবে কিছুক্ষণ হাঁটল। জহরের এতক্ষণে মনে পড়ল মনোজকে, ব্রাদার্স ইউনিয়নের টেন্টটা চোখে পড়ায়। বেচারা নিশ্চয় ভেঙে পড়েছে দুঃখে। দুঃখ তাঁরও হচ্ছে। পানুরা যে ব্যবহারই করুক, ক্লাব তো তাঁরও!

"চলো তো একবার ব্রাদার্সের টেন্টটা ঘুরে যাই। একজন বাজি ধরেছিল ব্রাদার্স না জিতলে পঞ্চাশ টাকা দেবে। একটু লেগপুল করে আসি।"

লোহার ফেন্স ঘেরা ব্রাদার্সের টেন্ট। সামনে খানিকটা জমি। কাঠের পাটার ফটক, তার মাথায় লতাগাছের খিলেন, ক্লাবের নামলেখা বোর্ড। ফোল্ডিং লোহার চেয়ারে কয়েকজন বসে। তার মধ্যে রয়েছে কানু ভট্‌চায, সুবল মুখুজ্যে, পানু পোদ্দার, আরও কয়েকজন। একটা কাঠের টেব্‌লে খালি চায়ের কাপ। টেন্টের পেছনে লম্বা ফালি জমি। ওখানে নেট প্র্যাকটিস হয়।

জহর ভেতরে না ঢুকে ফেন্সের ধারে দাঁড়ালেন। সুবল মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বলল, "খেলা দেখলে?"

"দেখলুম।"

"কী মনে হল?"

"চাবকাতে ইচ্ছে হল। ... সবক'টাকে, তোদেরও।"

প্রাণকৃষ্ণ ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। "কী বললে?"

"যা মনে হয়েছে তাই বললুম।" জহরের মুখে হাসি। "ক্লাবটা যদি ইস্টবেঙ্গল কি মোহনবাগান হত তা হলে এতক্ষণে এই টেন্টটা আর দাঁড়িয়ে থাকত না, আগুন জ্বলত। .... আরও দু-চারটে প্লেয়ার ভাড়া করে আন। শুধু মান্টু সিং দিয়ে কী হবে?"

প্রাণকৃষ্ণ থরথর করে কাঁপছে। কানু ভট্‌চায তাকে হাত ধরে টেনে বসাল।

"বোসো, বোসো, ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যাবে। .....জহর এখন যাও এখান থেকে। মজা দেখার সময় এটা নয়।" কানু ভট্‌চায হাত নেড়ে চলে যেতে বলল।

জহরের চোখে পড়ল নুরু টেন্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। বাসুদেব টেন্টের ভেতর থেকে একবার উঁকি দিল। জানলায় কার যেন মুখ সরে গেল। মনোজকে তিনি কোথাও দেখতে পেলেন না।

"চলো, এবার যাওয়া যাক।" জহর নিচু গলায় সমুকে বললেন। "কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।"

ওরা এসপ্ল্যানেডে এসে বাসে উঠল। জহর দোকানে যাবেন। হাতিবাগানে বাস থেকে তাঁর সঙ্গে সমুও নামল, সে বাড়ি যাবে।

"আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলুম আজ, আরও জানতে ইচ্ছে করছে।" সমু বিদায় নেওয়ার আগে বলল।

"জানতে চাও তো আমার বাড়িতে চলে এসো যে-কোনওদিন সকালে। কাগজের পুরনো কাটিং আছে, দেখাব। ভাল কথা, তুমি কীরকম খেলো সেটা আমার জানা নেই। সিজ্‌ন তো শেষ হয়ে গেল, তোমার সবুজ শিবিরের কোনও ম্যাচ আর আছে কি?"

"না, নেই। এখন তো সব মাঠে ফুটবল নেমে গেছে, সেই পুজোর পর আবার।"

"ঠিক আছে, আমাকে বোলো, দেখব কেমন খেলো।" জহর কথাটা বলে ডান হাতটা তুললেন বিদায় জানাতে। দেখলেন সমু ইতস্তত করছে। জিজ্ঞাসু চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

"আপনাকে যদি জহরদা বলি তা হলে কিছু কি মনে করবেন?"

জহর হেসে ফেললেন। সমু তাঁর ছেলে মানিকেরই বয়সী হবে। খেলার দুনিয়ায় বাবার বয়সীদেরও দাদা বলাই রেওয়াজ।

"মনে করব কেন! তবে ঠিকমতো উচ্চারণটা কোরো। জহ-র-দা বললে ভাল লাগবে, জর্দা বোলো না, অনেকেই বলে। জহর কথাটাও অনেকে ভাল করে উচ্চারণ করতে পারে না, বলে জর।"

"বাবাকে আপনার কথা বলব।"

জহরের ভেতরটা একবারের জন্য কুঁকড়ে গেল। অমর দত্ত তার ছেলেকে কী বলবে তার সম্পর্কে! জহর পাল লোকটা খুব বাজে টাইপের, অভদ্র, আনস্পোর্টিং?

"বোলো।"

জহর রাস্তা পার হয়েই দেখলেন ফুটপাথে পাইপের রেলিংয়ে দুই কনুই রেখে বেজা দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি দূরে কোথায় যেন বিঁধে রয়েছে। জহর বেজার দৃষ্টি অনুসরণ করে আবিষ্কার করলেন প্রায় তিরিশ হাত দূরে তেলেভাজাওলাকে এবং ডালায় সদ্য ভেজে রাখা বেগুনিগুলোকে।

"ওদিকে তাকিয়ে কী দেখছিস বেজা?"

কানের কাছে ফিসফিস করে বলা কথাটা শুনে বেজা চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল।

"ওহ তুই।" বেজা আশ্বস্ত হল। "ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলি।"

"এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে?"

"অফিস থেকে আসছি। বাস থেকে নেমে ভাবলুম এখন বাড়ি গিয়ে কী আর করব, যা গরম! তাই একটু হাওয়া খেতে দাঁড়িয়ে পড়লুম।"

"হাওয়া খেতে, না পেঁয়াজি-বেগুনি খেতে?"

"পেঁয়াজি-বেগুনি!" বেজার আকাশ থেকে পড়ার মতো মুখ হল, "তুই বলছিস কী? সেই সেদিনের পর থেকে আমি তেলেভাজা ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি রোজ এখানে দাঁড়িয়ে মনের জোর পরীক্ষা করি।"

"কীভাবে করিস?"

"আধঘণ্টা ধরে বেগুনিভাজা দেখি। কিনব কি কিনব না, খাব কি খাব না ... খালি ফ্লাইটেড টোপ নিজের দিকে ছাড়ি। ক্রিজ ছেড়ে বেরোই কিনা সেটারই পরীক্ষা চালাই।"

"পরীক্ষার রেজাল্ট কী?"

"মেডেনের পর মেডেন। তেলেভাজাওলার দিকে এক-পাও এগোইনি।" বেজার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "বেজা হালদার স্টাম্পড হয়নি। বুঝলি রে, মনের জোর কারও চেয়ে আমার কম নেই। এখন মনে হচ্ছে বয়সটা পঁচিশ বছর যেন কমে গেছে, মাঠে নামলে এখনও ব্যাটসম্যানকে ভ্যাবাচাকা করে দিতে পারি। লোভ সংবরণ মানে ডিসিপ্লিন। এবার এটাকে ধরে রাখতে হবে। ফুচকা, ঘুগনি, আলুকাবলি সব ছেড়েছি, এখন একটু পরিশ্রম করা দরকার। তুই কী বলিস, ডাব্‌ল সেঞ্চুরি না হোক জীবনে ভাল করে একটা ফিফ্‌টি করে যেতে না পারলে আর কী ক্রিকেটার হলুম?" বেজার স্বর মোটেই হালকা নয়। জহর খুশি হলেন। মানুষটাকে এতদিন চিনতে না পারার জন্য অবাকও হলেন।

"তোর মন ভাল লাগছে কিনা বল?"

"খুব ভাল লাগছে। আমি জানতুমই না আমার মনের জোর কতটা। আমার এখন খুব বল করতে ইচ্ছে করছে রে জহর।"

"দাঁড়া, তোর জন্য একটা কিছু করা দরকার। সামনের সিজন তো আর ক'মাস পরেই শুরু হবে। একটা ছোটখাটো ক্লাবের নেটে গিয়ে যাতে বল করতে পারিস সেই ব্যবস্থা করব।"

"শুধু নেটে!" বেজাকে হতাশ দেখাল। "আমি ম্যাচে খেলব। তুই এখনও খেলছিস, আর আমি পারব না?"

"পারবি, পারবি।" জহর সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "আগে শরীরটাকে ঠিকঠাক করে তোল, রোজ সকালে দৌড়ো, ফ্রি হ্যান্ড কর, গায়ে একটু জোর হোক।" বেজার পিঠে আলতো দুটো চাপড় মেরে জহর দোকানে যাওয়ার জন্য হাতিবাগান বাজারের দিকে এগোলেন।

॥ ৬ ॥

দিন কয়েক পর একদিন সকালে জহরের বাড়িতে এসে হাজির হল সমু। জহর রোজ ভোরে গঙ্গার তীরে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে দু' মাইল মন্থর গতিতে দৌড়ন। এটা তাঁর গত তিরিশ বছরের অভ্যাস। দৌড় শেষে রথতলা ঘাটে গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাজার করেন।

সেদিন বাজারের থলি হাতে বাড়ি ঢোকার সময় দেখলেন পাশের বাড়ির রকে সমু বসে আছে তাঁর অপেক্ষায়। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই সকালে কী ব্যাপার? এখন তো সবে সাতটা!"

"একটা ব্যাপারে এসেছি। আমাদের সবুজ শিবিরের প্রেসিডেন্ট রামবাবু, রামকৃষ্ণ ঘোষ প্রতি বছর তাঁর গ্রামে একটা এগজিবিশন ক্রিকেট ম্যাচ করান, এবারও—"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাড়ির ভেতরে এসো, বসে কথা বলো।"

সমুকে নিয়ে তিনি একতলায় বসার ঘরে এলেন, ঘরে তিনটি কাঠের চেয়ার, একটা টেব্‌ল। একটা কাঠের আলমারি ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। দেওয়ালে দেশি-বিদেশি কয়েকজন ক্রিকেটারের ছবি।

"বোসো। এখন আমি রুটি-তরকারি খাই। দু'খানা খাবে?"

"না, না, আমি খেয়ে বেরিয়েছি .... কথাটা বলেই চলে যাব।" সমু ব্যস্তভাবে বলল, "আমাদের প্রেসিডেন্ট রামবাবু খুব পয়সাওলা লোক। ওঁর গ্রামের নাম হাবলা, হাওড়া জেলায়, কলকাতা থেকে মাইল দশেক। ধুমধাম করে দুর্গাপুজো করেন, কলকাতা থেকে যাত্রাদল নিয়ে যান, কলকাতার ফুটবল টিম নিয়ে গিয়ে ম্যাচ খেলান। গ্রামের ক্লাবের সঙ্গে। এবার ফুলবাগানকে নিয়ে যাবেন সবুজ শিবিরের সঙ্গে খেলাতে।"

"ফুলবাগান যেতে রাজি হয়েছে?"

"হয়েছে। হেমন্ত গুহ তো রামবাবুর সম্পর্কে শালা, রামবাবু ফুলবাগানকে মোটা টাকা ডোনেশনও দেন। .... আর খেলা তো সিরিয়াসলি হয় না, পিকনিকের মতো ব্যাপারটা। খালি খাওয়া আর মাঠে নেমে ছয়, চার মারা। রামবাবুর মাছের আমদানির বিরাট ব্যবসা। ছ'-সাত রকমের মাছ-ই খাওয়ান আর হাবলার বিখ্যাত রাতাবি সন্দেশ। কলকাতা থেকে বাসে নিয়ে যান আর বাড়ি পৌঁছে দেন। গ্রামের লোককে বড় টিমের প্লেয়ার দেখানোর জন্যই ম্যাচ। হাবলার লোক জয়প্রকাশকে দেখতে চায়।"

"তা আমার কাছে কেন?"

"আপনি যদি সবুজ শিবিরের হয়ে খেলেন, রামবাবুকে আপনার কথা বলতেই তো উনি লাফিয়ে উঠলেন। বললেন খুব ভাল হয়। এখনকার ইয়ং প্লেয়ারদের সঙ্গে খেলছে পঞ্চাশের ওপর বয়সী একজন, এটাও একটা দেখার মতো ব্যাপার। উনি আপনাকে একটা চিঠিও দিয়েছেন।"

সমু পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা চিঠি বার করে জহরকে দিল। জহর চিঠিটায় চোখ বোলালেন। অল্প কথায় অনুরোধ করেছেন খেলার জন্য। শেষে লেখা, "যদি অনুগ্রহ করে অধমের গ্রামে আসেন তা হলে কৃতার্থ বোধ করব। আপনার দৃষ্টান্ত আমাদের মতো বুড়োদের প্রেরণা জোগাবে।"

চিঠি পড়ে জহর হাসলেন। মুখ তুলে দেওয়ালে টাঙানো তিন-চারটে ছবির একটির দিকে তাকালেন। গাওস্কর, কপিলদেবের সঙ্গে সি কে নাইডুর ছবি। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সমুও ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছে দেখে জহর বললেন, "উনিই সি কে। এই ছবিটা ওঁর শেষ রন্‌জি ট্রফি সিজনে তোলা। তখন

উনি হোলকার ছেড়ে উত্তরপ্রদেশের ক্যাপ্টেন। রাজস্থানের সঙ্গে খেলায় এক ইনিংস ব্যাট করে চুরাশি রান করেন। কোনও বোলার ওঁকে আউট করতে পারেনি, রান আউট হন। আর বোলার কারা ছিলেন জানো ? .... রামচাঁদ, ভিনু মানকাদ, দুরানি, সবাই টেস্ট খেলেছেন। .... সি কে-র বয়স তখন একষট্টি পেরিয়ে গেছে।" জহরের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল ছবিটার দিকে তাকিয়ে। "ভাবতে পারো, একষট্টি বছর— ! আমি আর কী খেললুম। একমাস পর বোম্বাইয়ের এগেনস্টে করেন বাইশ আর বাহান্ন, এটাই ওঁর শেষ ম্যাচ।"

"কত সালের কথা ?"

"ফিফটিসেভেন। ... খেলব বললে নিশ্চয়ই খেলা যায়। মনের জোর আর ইচ্ছে, শরীর ঠিক রাখা ... ডিসিপ্লিন্‌ড লাইফ।"

"আপনি কতদিন খেলতে চান ?"

"একষট্টি বছর তো বটেই।" জহর হেসে উঠলেন, "তুমি রামবাবুকে বোলো আমি যাব।"

"ঠিক সকাল আটটায় আমরা রওনা হব মিনিবাসে।" সমু উঠে দাঁড়াল।

ওরা হাবলায় পৌঁছল সাড়ে আটটায়। খেলা শুরু হবে সাড়ে ন'টায়। দু'দল তিরিশ ওভার করে ব্যাট করবে। তারপর লাঞ্চ এবং অর্থাৎ খেলা শেষ। রামবাবুর দেওয়া লাঞ্চ খেয়ে কেউ আর নড়াচড়ার মতো অবস্থায় থাকে না। হাবলা বর্ধিষ্ণু গ্রাম, প্রায় আধা-শহর। পাকাবাড়ি, টেলিফোন, পিচের রাস্তা, কেব্‌ল টিভি যেমন আছে তেমনই আছে বাঁশঝাড়, ফলের বাগান, পুকুর, সর্ষে খেত। বড় ফুটবল মাঠের সঙ্গে ক্লাবের ঘর। তার সামনে শামিয়ানা, চেয়ার, স্কোরারের জন্য টেব্‌ল এবং স্কুল থেকে ব্ল্যাকবোর্ড এনে রাখা হয়েছে স্কোর লিখে জানাবার জন্য। আম্পায়ার দু'জন স্থানীয় লোক। অ্যামপ্লিফায়ারে হিন্দি গান বাজছে। দুটো মিনিবাসে দুটো দল আলাদাভাবে প্রায় একই সময়ে পৌঁছল এবং পৌঁছনোমাত্র ডাব কেটে হাতে-হাতে তুলে দেওয়া হল। প্রত্যেকেই দুটো-তিনটে ডাবের জল খেল। তারপর এল চাকলা করে কাটা গোটা চল্লিশ হিমসাগর আম, সেইসঙ্গে চারটে থালায় সন্দেশ, প্রায় আশিটি। সন্দেশের থালা মিনিট দশেকের মধ্যেই খালি হয়ে যায়, আমগুলোর অর্ধেক পড়ে থাকে। জহর দুটি ডাবের জল আর একটি সন্দেশ খেলেন। খাওয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সংযত।

ফুলবাগান দলে সেইসব খেলোয়াড়ই বেশি যারা সারা সিজনে দু-তিনটির বেশি ম্যাচে খেলার সুযোগ পায় না। তবে রন্‌জি ট্রফি খেলা দু'জন মিডিয়াম পেসার সৌগত রায় আর অনুপ ভৌমিক এসেছে। তাদের সঙ্গে শুভ্রও। জয়প্রকাশ এল হেমন্ত গুহর মোটরে, খেলা শুরুর দশ মিনিট আগে। সবুজ শিবিরের ছেলেদের কাউকেই জহর চেনেন না, শুধু সমুকে ছাড়া। বাসে আসার সময় সমু তাঁকে বলে, "আপনি আজ আমাদের ক্যাপ্টেন, রামবাবু বলে দিয়েছেন।" জহর শুনে খুশি হন, তবু বিব্রত মুখে বলেন, "আবার আমায় কেন, আমি তো কাউকে চিনি না। কে বোলার, কী বল করে, কে কেমন ফিল্ড করে, ব্যাট করে—"। সমু তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বলে, "আমি সব বলে দেব। আমাদের টিমে ওখানকার দুটো লোকাল ছেলে খেলানো হবে। তাদের অবশ্য আমি দেখিনি।"

মাঠ ঘিরে প্রায় শ'পাঁচেক দর্শক। রামবাবু এবং হাবলার গণ্যমান্যরা শামিয়ানার নীচে চেয়ারে বসে। জহরকে হাত ধরে তিনি তাদের সামনে এনে বললেন, "দু'দলে যারা খেলছে তাদের প্রায় সবাই এঁর ছেলের বয়সী বা তার চেয়েও বয়সে বড়। ইনি এখনও ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে যাচ্ছেন। একসময় বেঙ্গল রিপ্রেজেন্ট করেছেন। এমন বুড়ো ঘোড়াকে ধরে এনেছি হাবলায়, দেখা যাক কেমন ছোটেন। বুঝলেন ছকুবাবু, উনি আমাদের অনেকের চেয়ে বয়সে কিন্তু বড়, দেখে কি বোঝা যায় ?"

কয়েক জোড়া বিস্মিত চোখ জহরকে জরিপ করতে শুরু করল। ছকুবাবু জানতে চাইলেন, "আপনি কোন ক্লাবে খেলেন, মোহনবাগানে, না ইস্টবেঙ্গলে ?"

"কোনওটাতেই নয়। শেষ এবার খেলেছি ব্রাদার্স ইউনিয়নে।"

"বল করেন, না ব্যাট করেন ?"

"দুটোই।"

"অ, অলরাউন্ডার, কপিলদেবের মতো।"

জহর কোনওক্রমে হাসি চাপলেন।

জয়প্রকাশই প্রধান আকর্ষণ। নানান বয়সী ছেলেরা তাকে ঘিরে অটোগ্রাফ নিচ্ছে। হাসিমুখে সে কাউকেই নিরাশ করছে না। জহর লক্ষ করেছেন, একগ্লাস ডাবের জল ছাড়া জয়প্রকাশ আর কিছু মুখে দেয়নি।

"জহর, তোমায় যে এখানে দেখব ভাবিনি।" হেমন্ত গুহ এগিয়ে এলেন হাসিমুখে।

"রামবাবু চাইলেন বুড়োটাকে মাঠে নামাতে, তাই এলুম। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে খেলতে আমার ভাল লাগে।"

"ব্রাদার্স ছেড়ে এবার তা হলে কোথায় যাবে ?"

"ভাবছি তো আপনার ফুলবাগানে সই করব।" জহর মজা করে বললেন।

হেমন্ত গুহ পালটা মজা করেই বললেন, "তোমায় পেলে তো লুফে নেব। আজ দেখি তুমি কেমন ফর্মে আছ।"

শুনে জহর শুধু হাসলেন। একটু পরেই তিনি টস করতে মাঠের মাঝে পিচের কাছে গেলেন, সঙ্গে ফুলবাগানের অধিনায়ক সৌগত বিশ্বাস। এবার বাংলার রন্‌জি ট্রফি দলে তিনটে ম্যাচ খেলেছে। মিডিয়াম পেসার, আউট সুইংটা ভালই করায়। হাতে মোক্ষম ইয়র্কারও আছে।

পিচ দেখে জহরের ভ্রূ কুঁচকে গেল। ঘাস নেই। বোধ হয় কাল বিকেলে প্রচুর জল ঢেলে রোলার টানা হয়েছে। পিচ এখনও ভিজে। সৌগত ঝুঁকে বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি টিপে বলল, "জহরদা আঙুল বসে যাচ্ছে।"

"আট ওভার খেলার পর বলও ডন-বৈঠক দেবে। পরে ব্যাট করলে মুশকিলে পড়তে হবে।" জহর চিন্তিত স্বরে জানালেন।

টসে জহর হেরে গেলেন। সৌগত একগাল হেসে বলল, "আমি আগে ব্যাট নিচ্ছি দাদা।"

দল নিয়ে মাঠে নামার আগে জহর কানে-কানে সমুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কারা-কারা বল করবে ?"

"নিয়ম করা হয়েছে কোনও বোলারই পাঁচ ওভারের বেশি বল করতে পারবে না। তিরিশ ওভারে ক'জনকে কত ওভার বল করাবেন সেটা আপনিই ঠিক করবেন। আমাদের টিমে ওপেন করে ওই যে লম্বা ছেলেটা, কালু ওর নাম। আর ওই ছেলেটা সোমেন। তারপর শুভঙ্কর। তিনজনই মিডিয়াম পেসার। আমি আর সত্যজিৎ অফস্পিন করাই। এখানকার একটা ছেলে, শুনেছি জোরে বল করে, তাকে দিয়েও বল করাতে হবে।"

ফুলবাগানের ব্যাটিং ওপেন করতে নামল যে দু'জন তারা সাধারণত রিজার্ভে থাকে। জহর বল দিলেন কালুকে। ষোলো কদম ছুটে এসে কালু বেশ জোরেই বল ফেলল অফস্টাম্পের একহাত বাইরে, ওভারপিচ বল, উইকেটকিপার ফসকাল। প্রথম বলেই চার বাইরান। দ্বিতীয় বল ফুলটস। পুল করে চার রান নিল। তৃতীয় বল স্টাম্পে ভাল লেংথে, রান হল না। প্রথম ওভারে আট রানই রইল। জহর খুশি হলেন। পরের ওভারে সোমেন রান দিল তিনটি। কালুর তৃতীয় ওভারে পড়ল প্রথম উইকেট। ওভারপিচ বল কভারে ঠেলে দিতে গিয়ে ক্যাচ উঠে

যায় বলটা লাফিয়ে ব্যাটের ওপরদিকে লাগায়। কালুই ক্যাচটা ধরে। প্রথম স্লিপে দাঁড়ানো জহর মাথা নাড়লেন। মনে-মনে বললেন, 'আট ওভার নয়, পাঁচ ওভার থেকেই দেখছি শুরু হল।'

মাঠ ঘিরে গুঞ্জন আর হাততালি। জয়প্রকাশ খেলতে নামছে। দীর্ঘদেহী, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, মাথায় কালো ক্যাপ। হেলমেট পরেই কলকাতায় ওকে পেসারদের খেলতে দেখা যায়। এখানে তেমন কোনও বোলার নেই বলেই সে বোধ হয় হেলমেট আনেনি। জহরের মনে হল, বোলার নেই ঠিকই, তবে ওর বোঝা উচিত ছিল হাবলার পিচ ইডেনের পিচ নয়।

জয়প্রকাশকে কালুর প্রথম বলটা ছিল মিড্‌ল স্টাম্পে একটু শর্ট পিচ। জয়প্রকাশ ডান পা অফস্টাম্পের দিকে নিয়ে গেছে পুল করবে বলে, আচমকা বলটা লাফিয়ে উঠল। চকিতে মাথা নামিয়ে নিল জয়প্রকাশ। উইকেটকিপার তার মাথার ওপর বলটা ধরল। বিস্মিত জয়প্রকাশ বোলারের দিকে একবার তাকিয়ে বলটা যেখানে পড়েছিল সেখানে গিয়ে পিচ দেখল। মাথা নাড়ল, ফিরে এসে পপিং ক্রিজের প্রায় দশ ইঞ্চি বাইরে স্টান্স নিল। ওভারের পঞ্চম বল করল কালু। ভাল লেংথে। জয়প্রকাশ বিদ্যুৎগতিতে এক-পা বেরিয়ে এসে ব্যাট চালাল। .... সোজা ছয়। মাঠ ঘিরে দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠল। জয়প্রকাশের ব্যাটিংই তারা দেখতে এসেছে। ওভারে কালুর শেষ বলটিকেও সে একই ভাবে অভ্যর্থনা জানাল। দু' বলে দুটো ছয়। দর্শকরা উদ্বেল হয়ে উঠল। যা দেখতে এসেছে সেটাই তারা পেয়েছে। জহর বুঝে গেলেন জয়প্রকাশ আজ বোলারদের খুন করবে। তিনি সমুর দিকে তাকালেন। কালুর বদলে অন্য কাকে দিয়ে বল করাবেন সেটাই জানতে চান।

"ওই যে ফর্সা মোটামতন, ওকে দেবেন। রামবাবু অনেক করে বলে দিয়েছেন। ওকে এখানকার লোক কপিলদেব বলে।" সমু জানিয়ে দিল।

সোমেনের প্রথম বলে একটা রান হল মিড উইকেট থেকে। এবার জয়প্রকাশের স্ট্রাইক। পাঁচটা বল থেকে চারটে বাউন্ডারি মেরে সে নিল একটা সিঙ্গল।

দর্শকদের চিৎকার শোনা গেল, "উই ওয়ান্ট সিক্সার ... উই ওয়ান্ট—"

জহর এই ব্যাপারে খুশি হলেন। রামবাবুর এত টাকা খরচ করা সার্থক হয়েছে। হাবলার জনগণের প্রত্যাশা জয়প্রকাশ পূরণ করে দিল। এবার তিনি হাবলার কপিলদেবকে আঙুল নেড়ে ডাকলেন।

হাবলার কপিলদেব প্রথমে না দেখার ভান করে থার্ডম্যান বাউন্ডারির দিকে হাঁটা দিয়েছিল। সমুই তাকে চেঁচিয়ে ডেকে আনল।

"জয়প্রকাশ এমন কিছু ব্যাটস্‌ম্যান নয়।" জহর হাবলার কপিলদেবের কাঁধে হাত রেখে তার মনে সাহস আর ভরসা জোগাবার জন্য বললেন। "লেগের দিকে একদম বল ফেলবে না। অফস্টাম্পের ওপর বল রাখো, ঠিক স্লিপে ক্যাচ তুলে দেবে।" জহর তিন-চারবার চাপড় দিলেন ওর পিঠে।

"কিন্তু যদি ছয় মারে?"

"তা হলে," জহর ঠোঁট কামড়ে বললেন, "তুমি ওর মাথা লক্ষ্য করে বল কোরো।"

স্থানীয় কপিলদেব অক্ষরে-অক্ষরে জহরের পরামর্শ মতো বল করল প্রবলবেগে ছুটে এসে। সে লেগের দিকে একটাও বল করেনি। তার ছ'টা ফুলটস বলে জয়প্রকাশ একটাও ছয় মারতে পারেনি, সবক'টাই চার।

চব্বিশ রান দিয়ে ওভার-শেষে সে দর্শকদের দিকে হাত তুলে নাড়ল। দর্শকরা হাততালি দিল। তাদের ছেলের বলে একটা

ছয়ও হয়নি। জহর বললেন, "ওয়েল বোল্‌ড।"

"আমাকে কি আবার বল দেবেন?" কপিলদেব আতঙ্কিত গলায় বলল।

"হাবলার লোককে ছ' বলে ছ'টা ছয় দেখার সুযোগ দেব না?"

"তার মানে আমাকে আবার বল করতে হবে?"

"তুমি একটা কাজ করো, খোঁড়াতে থাকো। কভারে দাঁড়াও, তোমার সাত-আট হাত দূর দিয়ে বল গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আর উঠো না। ধরাধরি করে তারপর তোমাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেব, কেমন?"

"আমি সার ভেরি গ্রেটফুল থাকব।"

জহর এইধরনের এগজিবিশন ম্যাচ আগেও বহু খেলেছেন। খেলে মজা পান। আর বোলার রয়েছে সমু আর তিনি নিজে। সমুকে ডেকে বললেন, "এবার তুমি বল করবে।"

উইকেটে এখন বল যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। কোনওটা লাফাচ্ছে, কোনওটা গড়াচ্ছে। উইকেটের বাইরের বলেও বিপন্ন, স্ট্রোক নিতে গিয়ে ব্যাটের ঠিক জায়গায় লাগছে না। তা সত্ত্বেও জয়প্রকাশ সত্তর বলে একশো রান করল। ফুলবাগানের হল তিরিশ ওভারে সাত উইকেটে দুশো দশ রান। এর মধ্যে শুভ্রর রান তিন। মুখের সামনে লাফিয়ে ওঠা বলে ব্যাট তুলে ক্যাচ দেয় শর্ট লেগে। ঠিক একশো রান করে শুভঙ্করের বলে মিডঅফের হাতে ক্যাচ দিয়ে জয়প্রকাশ ফিরে যায়। জহর মনে-মনে তারিফ জানালেন ওকে, পাক্কা পেশাদারই, নয় এমন বিশ্রী উইকেটে টেকনিক্যালি নিখুঁত ব্যাটও করে গেল।

ইনিংস শুরু করার আগে জহর রোলার চাইলেন। পাওয়া গেল না। চার কিলোমিটার দূরে রাস্তা সমান করার কাজে সেটিকে আজ সকালেই নিয়ে চলে গেছে ঠিকাদারের লোক। জহরের মুখে দুশ্চিন্তা ফুটল। রোল না করিয়ে এই পিচে তো খেলা মুশকিল! একজন বলল, "দুরমুশ করে দিলে কেমন হয়?" জহর শুনে আঁতকে উঠলেন। তার চেয়ে পিচ যেমন আছে তেমনই থাক। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "ফার্স্টএডের ব্যবস্থা আর ডাক্তার আছে তো?"

জয়প্রকাশ মৃদুস্বরে জহরকে বলল, "দাদা আপনি ব্যাট না করলেই ভাল হয়। পিচ খুব খারাপ। চোট পেয়ে যেতে পারেন।"

"তুমি তো চোট পেলে না!"

"আমার কথা ছাড়ুন, আপনার বয়স আর আমার বয়স! দু'জনের রিফ্লেক্স কি সমান হবে?"

"দেখা যাক।"

হেমন্ত গুহ আশ্বাস দিলেন জহরকে, "সৌগতকে বলেছি স্পিড কমিয়ে বল করতে, এটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ।"

"না, না, ও যেভাবে বল করে সেভাবেই করুক।" জহরের ভাল লাগল না এইসব কথা। তার বয়সকে সবাই যেন কৃপার দৃষ্টিতে দেখছে। "হেমন্তদা, ব্যাট হাতে যখন নামছি তখন আমাকে ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবেই ভাবা হোক। কেমন ফর্মে আছি সেটা তো আপনাকে দেখাতে হবে।"

"তা বটে, তোমাকে তো আবার ফুলবাগানে সই করাব বলেছি।" হেমন্ত গুহ হেসে জহরের পিঠে চাপড় মারলেন।

ফুলবাগান-ইনিংস শুরু করতে নামল জহর আর গৌতম। প্রথম স্ট্রাইক নিল গৌতম, বল করবে সৌগত।

"হাঁকপাক কোরো না। প্রথম ওভারটায় উইকেট দেখে নাও, মারতে যেয়ো না।" জহর গৌতমকে ডেকে বলে দিলেন। ওর মুখ দেখেই তিনি বুঝে গেছেন নার্ভাস হয়ে রয়েছে। সৌগতর প্রথম বল আউটসুইং করা ইয়র্কার। গৌতম এমন বল বোধ হয় কখনও খেলেনি। ব্যাটটা একটু বেশিই তুলেছিল। শেষমুহূর্তে তাড়াতাড়ি নামিয়ে সামনে ঝুঁকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লেগস্টাম্প ছিটকে গেল। জহর আড়চোখে সৌগতকে দেখে নিলেন। ওর ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

খেলতে এল মিহির। অফস্টাম্পের ওপর ভাল লেংথে সৌগত ছাড়ল ছোট আউটসুইঙ্গার। মিহির প্রথমে পিছিয়ে খেলবে ঠিক করে তারপর ব্যাটটা তার সামনে বাড়িয়ে ধরল। ব্যাটের কানায় লেগে প্রথম স্লিপে জয়প্রকাশের হাতে বল গেল। দু' বলে দুটি উইকেট নিল সৌগত। এখন তার সামনে হ্যাটট্রিকের সুযোগ। নবাগত ব্যাটস্‌ম্যান শুভঙ্কর সেটা জানে বলেই মুখ শুকনো, চোখে ভয়। ক্রিজের দিকে যাওয়ার সময় হোঁচট খেল। মাঠের বাইরে দর্শকদের মধ্যে উন্মুখ একটা প্রত্যাশা হ্যাটট্রিক হওয়া দেখার জন্য। সৌগত বল হাতে অপেক্ষা করছে। নিস্তব্ধ মাঠ। এই সময় হঠাৎ এক দর্শক চিৎকার করল, "হ্যাটট্রিক চাই।"

সৌগত বল হাতে ছুটল। সাধারণ একটা মন্থর সোজা বল। শুভঙ্কর বোধ হয় আগেই ঠিক করে রেখেছিল ব্যাট চালাবে। বলটা যে এত আস্তে আসবে সেটা বোঝেনি। ব্যাট চালাবার পর বলটা এসে তার মাঝের স্টাম্পে লাগল। হ্যাটট্রিক! প্রথম ওভারের প্রথম তিন বলে তিনজন আউট। সেঞ্চুরির পর হ্যাটট্রিক দেখে হাবলার দর্শকরা খুশিতে আত্মহারা।

ব্যাট করতে এল সমু। সৌগত ওভারের বাকি তিনটি বল হেলাভরে ফেলল অফস্টাম্পের বাইরে। সমু ছেড়ে দিল ব্যাট তুলে নিয়ে। জহরের পাশ দিয়ে ফুলবাগানের উইকেটকিপার যাওয়ার সময় বলে গেল, "একটু দেখে খেলবেন, ফাস্ট বল করে।"

কথাটা মিথ্যা নয়। অনুপ ভৌমিক জোরেই বল করে। তবে ফাস্টবোলার বললে যা বোঝায়, ওয়েস হল, টাইসন বা ডেনিস লিলি, তেমন জোরে নয়। বল দিকভ্রষ্ট হয় বেশিরভাগই। যেমন প্রথম বলটিই জহর পেলেন ফুলটস, বুকের কাছে। পুল করলেন। স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারিতে বল গেল। পরের বলটাও একই রকম এবং একই স্ট্রোকে চার পেলেন। শুরুতেই দুটো বাউন্ডারি মেরে জহরের প্রত্যয় বেড়ে গেল। পরের বলে ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলে মিড অন থেকে এক রান নিলেন। সমু তিনটে বলের দুটো ছেড়ে দিয়ে একটা পিছিয়ে গিয়ে আটকাল।

জহর এগিয়ে গেলেন সমুর দিকে, "যেভাবে খেলছ সেইভাবে খেলো। মারতে যেয়ো না ... সৌগতকে আমি দেখছি।"

সৌগতকে জহর একটু ভালভাবেই দেখলেন। প্রথম তিনটি বল লং অফ এবং একস্ট্রা কভার বাউন্ডারিতে স্বচ্ছন্দে পাঠালেন, পরেরটি গ্লান্স করে দু'রান, পরের দুটিকে স্কোয়ার ড্রাইভ করে বাউন্ডারিতে। আড়চোখে সৌগতকে একবার তিনি দেখলেন। মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। তার মতো বোলারের সঙ্গে এহেন আচরণ সৌগত যেন বরদাস্ত করতে পারছে না। অনুপের ওভারটা সমু কাটিয়ে দিল শুধু বলগুলো ব্যাট দিয়ে থামিয়ে। জহর তারিফ জানিয়ে মাথা হেলালেন।

সৌগতর প্রথম বলেই জহর লাফিয়ে এক-পা বেরোলেন। বোলারের মাথার ওপর দিয়ে বলটা ফেলেন লং অফ বাউন্ডারি টপকে। সৌগত ঠোঁট কামড়াল। পরের বলটা ঠুকে দিল। জহর বিদ্যুৎগতিতে হুক করলেন মুখের সামনে থেকে বলটাকে। তৃতীয় বলটা গুডলেংথে থেকে আচমকা লাফিয়ে উঠে জহরের ডান চোখের ওপর কপালে ছুঁয়ে ছিটকে গেল শর্ট লেগের দিকে। মুহূর্তের জন্য তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। কপাল কেটে গেছে। ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝরল। ছুটে এল ফিল্ডাররা।

"বলেছিলুম দাদা, ব্যাট আপনি করবেন না। পিচ খারাপ।"

কথাটা শোনামাত্র জহরের মাথায় রক্ত উঠে এল।

জয়প্রকাশের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন, "এই খারাপ পিচেই তো তুমি সেঞ্চুরি করলে।" তাঁর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে।

মাঠে ছুটে এসেছে ডাক্তার, ফার্স্টএড বক্স নিয়ে। জহরের কপালে তুলো দিয়ে প্লাসটার আটকে দিলেন। মিনিট ছয়-সাত সময় এজন্য খরচ হল। সৌগত আবার শুরু করল বল। চতুর্থ বলটা ঠিক একই জায়গা থেকে আবার লাফিয়ে উঠল। জহর মুখটা দ্রুত পেছনে সরিয়ে নিলেন। বল লাগল বাঁ কাঁধে। সৌগতর ঠোঁট বেঁকে উঠল। পরের বলে জহর দু' কদম বেরিয়ে এসে বলটাকে হাফভলি করে নিয়ে সোজা ড্রাইভ করলেন। ফলো থ্রুতে ডানহাত নামিয়ে সৌগত বলটা থামাতে গেল। আঙুল লেগে বল গেল মিড অন-এ। হাতটা ঝাঁকিয়ে সে আঙুলগুলো চোখের সামনে ধরল। মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। হাতটা সে ঝাঁকাচ্ছে। সবাই ছুটে গেল তার দিকে। জহর নিরাসক্তভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। সৌগত মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল বাঁ হাত দিয়ে আঙুলগুলো চেপে ধরে।

জহরের মাথায় খুন চেপে গেছে। পঞ্চাশে পৌঁছলেন এগারো ওভারে। সমু তখন সাত রানে, ওর ধৈর্য আর মনোনিবেশ জহরকে যতটা খুশি করল, ততটাই স্বস্তি দিল। জমি ঘষড়ে আসা দুটো শুটার সমু আটকেছে ব্যাট নামিয়ে। একটা বল কাঁধে লেগেছে। কিন্তু অচঞ্চল রয়ে গেছে। কিন্তু জহর এখন যুবকের মতো চঞ্চল। কপাল টিপটিপ করছে আর সেটাই তাঁকে খুঁচিয়ে বাড়তি একটা সজাগতা দিচ্ছে। পিচের খামখেয়ালিপনা নিয়ে আর তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। সারাজীবনে বহুরকম পিচে খেলেছেন, সেই অভিজ্ঞতা এখন কাজে লাগালেন। ব্যক্তিগত কত রান হল সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। একটা কথাই তাঁর মাথায় ঘুরছে, "বলেছিলুম দাদা, ব্যাট আপনি করবেন না।" দেখাচ্ছি এবার ব্যাট করা কাকে বলে! হেমন্ত গুহ এবার দেখুক তার স্টার ব্যাটস্‌ম্যানই শুধু ব্যাট করতে জানে না। ভিনু মানকাদ, দুরানি আর রামচাঁদকে ঠেঙিয়ে বুড়ো সি কে পঁচাশি করে রান আউট হয়েছিলেন। আমি সি কে নই, এরাও কেউ মানকাদ, দুরানি নয়, কিন্তু আমি জহর পাল, আর এটা হাবলার মাঠে তিরিশ ওভারের ম্যাচ তো বটে!

সৌগত আর মাঠে নামেনি। অনুপের বোলিং কোটা শেষ হয়ে গেছে। জয়দেব বাঁ-হাতি স্পিনার। বড় স্পিন, ফ্লাইট করায়। জহর প্রায় তিন গজ বেরিয়ে এসে ওকে ড্রাইভ করলেন। বাউন্ডারির ধারে ফিল্ডার দাঁড়িয়ে। একটা বল কোনওক্রমে থামাল, বাকি দুটো তার মাথার ওপর দিয়ে গেল। জয়দেবের ফ্লাইট করানো বন্ধ হল। নিচু করে জোরে বল দিয়ে যেতে শুরু করল। অন্যদিকে সৌগতর জায়গায় অধিনায়ক জয়প্রকাশ নিজে লেগব্রেক বল করতে এল। এই প্রথম জহরের ব্যাট থেকে ক্যাচ উঠল। বলটা পিচ থেকে একটু বেশিরকম ঘুরে লাফিয়ে ওঠে কোমর সমান। ঝুঁকে ব্যাট পেতেছিলেন। দ্বিতীয় স্লিপ থাকলে সহজ ক্যাচ পেত। সীমায়িত ওভারের খেলায় এইরকম ক্যাচ অনেক ওঠে। বাউন্ডারিও হয়, হাততালিও পড়ে। কিন্তু জহর লজ্জা পেলেন। কেন ক্যাচ উঠবে? বলটা লাফিয়েছিল পিচে খোঁদল থাকায়। ব্যাট সরাতে পারলাম না কেন? জহর কোনও অজুহাত পছন্দ করেন না। যে-ধরনেরই ম্যাচ হোক না, টেকনিক নির্ভুল থাকতে হবে।

একটা গলদ ঘটে গেছে। কেউ সেটা লক্ষ করে থাকলে নিশ্চয় ভাবছে বুড়োটা ব্যাট করতে শেখেনি, স্লিপ নেই বলে বেঁচে গেল। আবার মাথা গরম হয়ে উঠল জহরের। আবার তিনি স্টেপ আউট করতে লাগলেন জয়প্রকাশের বলে। শামিয়ানার দিক থেকে হঠাৎ হাততালির শব্দ শোনা গেল। জহর বিস্মিত চোখে তাকালেন উইকেটকিপারের দিকে। "কী ব্যাপার?"

"আপনার তো সেঞ্চুরি হল।"

"অ।" ব্যাটটা সামান্য তুললেন। "এখান থেকে বোর্ডটা পড়া যাচ্ছে না, টোটাল কত? দুশো এগারো হতে কত বাকি?"

"হয়ে এল। তাড়াতাড়ি শেষ করে দিন না, খিদেয় চুঁইচুঁই করছে পেট।"

"দাঁড়াও, আগে আউট হই।"

"আর হয়েছেন!" উইকেটকিপারের স্বরে হতাশা।

জহরকে অবাক করেছে সমু। এতক্ষণ খেলে তেরো রান! ব্যাট দিয়ে যত না খেলেছে তার চেয়েও বেশি বল ছেড়েছে। শরীরেও লাগিয়েছে অনেক। উইকেট কামড়ে পড়ে থাকা বলতে যা বোঝায় সমু তাই করেছে। শূন্য রানে তিন উইকেট, তখন ক্রিজে এসেছে। তাঁর সেঞ্চুরি হয়ে গেল, আর ছেলেটার মাত্র তেরো! হাতে কোনও স্ট্রোক আছে কিনা বোঝা গেল না। তবে গাওস্করের মতো যে টেম্পারামেন্ট দেখাল, এই বয়সী ছেলের কাছে থেকে তা আশা করা যায় না!

সবুজ শিবিরের আর উইকেট পড়ল না। তিন উইকেটে দুশো বারো রান উঠতেই খেলা শেষ। তখন বেলা সওয়া দুটো। নট আউট রইলেন জহর একশো ষাট রানে, সমু কুড়ি রানে, অতিরিক্ত বত্রিশ রান।

"দাদা, আমি ভুল ভেবে কিছু কথা আপনাকে বলেছি, মাপ করে দেবেন", জয়প্রকাশ হাত ধরল জহরের।

জহর ওকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "তোমার মতো ব্যাট আমি করতে পারিনি।"

"কী বলছেন দাদা! এই পিচে আপনার এগেনস্টে ছিল দুটো কারেন্ট বেঙ্গল টিমের বোলার! জয়দেব তো এ-বছরই রিজার্ভে ছিল।"

কথা বলতে-বলতে তাঁরা শামিয়ানায় এলেন, রামবাবু দু'হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন, জহরকে জড়িয়ে ধরে উদ্বিগ্নস্বরে বললেন, "মাথায় খুব বেশি লাগেনি তো?" জহর 'ও কিছু নয়' বলায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "আমার মুখ রেখেছেন। কই হে হেমন্ত, এদিকে এসো, খুব তো তখন বললে ফর্ম কেমন আছে দেখি...দেখলে তো, এবার লুফে নাও।"

হেমন্ত গুহ অপ্রতিভ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। রামবাবু ফুলবাগানকে বছর-বছর মোটা টাকা দেন। ক্রিকেট টিমটা বলতে গেলে তাঁর টাকাতেই চলে, হেমন্ত বুঝে ফেলেছেন রামবাবু কী চান।

"লুফে নেব কী...নিয়ে ফেলেছি। জহর ট্রান্সফারের জন্য তৈরি থেকো।" হেমন্ত গুহর স্বরে হালকা রসিকতা নেই। তিনিও আজ জহরের ব্যাটিং দেখে মনে-মনে তারিফ করেছেন।

"তা হলে একটা কথা বলি। আমি আর ক'দিন খেলব! বহুদিন খেলবে এমন সম্ভাবনাময় ছেলেদের এখনই টিমে নিয়ে ফেলুন। আমার সঙ্গে খেলল যে ছেলেটা, তার কথা বলছি, অদ্ভুত ভাল টেম্পারামেন্ট আর ডিফেন্স দেখাল এই পিচে। ওর নাম সমর, আম্পায়ার অমর দত্তর ছেলে।"

"আমি তোমার বলার আগেই ভেবে রেখেছি জহর," হেমন্ত চারধারে তাকিয়ে সমুকে খুঁজলেন, "এই যে, শোনো, শোনো", হাতছানি দিয়ে ডাকলেন সমুকে। "খেলবে ফুলবাগানে?"

সমু বিহ্বল। ঢোক গিলে শুধু মাথাটা হেলাল।

"ট্রান্সফার শুরু হওয়ার আগে দেখা কোরো আমার সঙ্গে।"

"চলুন, চলুন, আর দেরি নয়, খাওয়ার দেরি হয়ে যাচ্ছে।" রামবাবু তাড়া দিলেন।

খাওয়ার ব্যবস্থা রামবাবুর বাড়ির উঠোনে, চেয়ার টেবল পেতে। হেঁটে মিনিট চারেকের পথ। জহরের পাশের চেয়ারে বসল সমু। ভেটকি মাছের ফ্রাইয়ে কামড় দিয়ে সে বলল, "জহরদা আপনি আমার কথা হেমন্ত গুহকে বলেছেন?"

"কে বলল ?"

"শুভ্র বলল।"

"মোটেই না। যার হাতে স্ট্রোক নেই তাকে আমি সুপারিশ করতে যাব কেন ?

"স্ট্রোক আছে কি নেই, সময় এলেই দেখিয়ে দেব।...শুধু ফ্রাই দিয়েই পেট ভরাবেন না, এর পর গলদা চিংড়িও আছে।"

॥ ৭ ॥

সকাল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি। জহর সকাল আটটায় দোকান খুলেছেন। ঘণ্টাদুয়েক কেটে গেছে, বিক্রিবাটা বিশেষ হয়নি। একশো গ্রাম স্ক্রু, চারটে কবজা, একটা তালা, একটা প্লাস্টিক বালতি। আর কেরোসিন স্টোভের দাম জেনে একজন বলে গেছে সন্ধেবেলায় কিনে নিয়ে যাবে। এসব খদ্দের নাদুই সামলায়। ধরেই নিয়েছেন আজ খদ্দের পাবেন না। এরই মধ্যে জহর মাছের বাজার ঘুরে এসেছেন। প্রতিদিনের অভ্যাস, যদি ভাল সাইজের বাগদা চিংড়ির দেখা পাওয়া যায় ! মাস ছয়েক আগে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনশো টাকা কিলো ! আধ কিলো কিনেছিলেন।

আজও ঘুরে এসে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে কাউন্টারে বসেছেন। এমন সময় ভিজে ছাতা হাতে হাজির হল প্রতাপ দাস।

"জহরদা এলুম, সেই ব্যাপারটা ?" ভুরু তুলে জহর তাকালেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল, "কোচিং স্কুল ?"

"হ্যাঁ।"

"নাদু টুলটা বার করে দে।"

নাদু নিজের টুলটা কাউন্টারের ওপর দিয়ে তুলে আনল। প্রতাপ বসে বলল, "এই বৃষ্টির জন্যই কংক্রিট পিচ করছি। বাংলার ক্রিকেটকে হাতকড়া পরিয়ে রেখেছে এই বৃষ্টি। পুজো পর্যন্ত বর্ষার সিজন, তারপর পিচ তৈরি করে মাঠে নামতে-না-নামতেই রন্‌জি ট্রফির খেলা শুরু হয়ে যায়। খেলবে কী বাংলার ছেলেরা ! প্র্যাকটিস কোথায় ?"

জহর চুপ করে কথাগুলো শুনলেন। বস্তাপচা কথা। সবাই জানে। তাঁর মনে হল, প্রতাপ আর পানু একই পালকের পাখি। তফাত হল, পানুর অনেক টাকা, সে বড় ব্যবসায়ী। সে শুধু নাম চায় আর কেউকেটা হতে চায়। প্রতাপ ছোট ব্যবসায়ী, যেখান থেকে পারবে টাকা কামাবে। নামটামের লোভ নেই, পানুর মতো ধুরন্ধর নয়, বাংলার ক্রিকেটের উপকার করছি, পাঁচজনকে এটাই প্রতাপ দেখাতে চায়। তা দেখাক, ক্ষতি তো করছে না।

"ঠিক বলেছ। বৃষ্টির জন্যই দ্যাখো না জষ্টিমাস পর্যন্ত খেলা গড়িয়ে আসে। প্রচণ্ড গরমে খেলে কি কিছু লাভ হয় ? তখন পারফরম্যান্স দেখিয়ে কোনও কাজের কাজ তো হয় না, সবাই দায়সারা খেলা খেলে।" জহর বললেন, অবশ্যই আন্তরিকভাবে। পি সেন ট্রফি ফাইনালে ব্রাদার্সের হারটা তাঁর মনে পড়ল। আর সেইসঙ্গেই মনে পড়ল শুভ্রকে। কাজের কাজ একটা হয়েছে বইকী, ছেলেটা চোখে পড়ে গেল ! কিন্তু এই ফর্ম কি সামনের সিজন পর্যন্ত থাকবে ?

"আমার সব রেডি হয়ে গেছে। লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত মাঠ তো পাওয়া যাবে না। প্যান্ডেল খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপরই কর্পোরেশন মাঠে রোলার চালাবে। ওখানকার যে ইনস্টিটিউট আছে তাদের ঘরেই নেটফেট, ব্যাটপ্যাড থাকবে। ওদের একটা মালী আছে সে-ই সব করবে। এখন দরকার কোচ।" প্রতাপ তাকাল জহরের মুখের দিকে।

"ঠিক করেছ ?"

"চিফ কোচ হতেও রাজি হয়েছে অনীশ সেন। ওকে রাখছি, তিনটে টেস্ট খেলেছে, একবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ টুরও করেছে। তা ছাড়া কাগজে লেখেটেখে। এখন তো বেঙ্গলের সিলেক্টরও।" প্রতাপ ধূর্ত চোখে তাকিয়ে মিটমিট হাসল। "রাজি হচ্ছিল না। বেহালায় ওর নিজেরও তো একটা কোচিং সেন্টার আছে। বললুম হপ্তায় দুটো দিন আসবেন শুধু, কিছুক্ষণ থাকবেন, একটু-আধটু ছেলেদের দেখিয়ে-টেখিয়ে দেবেন। জানতে চাইল আর কে কোচ থাকবে। বললুম—" প্রতাপ চুপ করে গেল।

"কী বললে ?"

"আপনার নাম বললুম। শুনে বলল, ঠিক আছে, জহরদা থাকলে তো কথাই নেই। বুঝলেন জহরদা, ইচ্ছে ছিল আপনাকেই চিফ কোচ করে রাখব। কিন্তু এখন লোকের মনোভাব বোঝেন তো, সাইনবোর্ড দেখেই পটকে যায়, বিজ্ঞাপনের যুগ তো ! ইন্ডিয়া-প্লেয়ার কথাটার তো একটা আকর্ষণ আছে।...বলুন না, আছে কি না ?"

জহরের মুখে পাতলা হাসি ভেসে উঠল। "আছে। তবে আমি তো কোচ হলুম। আর কে-কে থাকবে ?"

"জিতু বিশ্বাস, প্রশান্ত চক্রবর্তী আর মৃণাল গুপ্তর সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি তো এদের চেনেন। জিতুদা আর প্রশান্তদা রেলের হয়ে রন্‌জি ট্রফি খেলেছে। ভাল পেস বোলার ছিল। আর মৃণাল তো এখন ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে।"

"এত কোচ নিয়ে স্কুল, ছাত্র ক'জন হবে ?" জহরের কপালে ভাঁজ। এই স্কুল ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ঢুকছে না। এতকাল ধরে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, কত দিকপাল ক্রিকেটার বেরিয়েছেন, তাঁরা তো কেউ স্কুলে খেলা শেখেননি ! দুখিরামবাবু ছিলেন। কত নামকরা ক্রিকেটার, ফুটবলারকে তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি তো স্কুল খুলে ছেলেদের কোচ করেননি ! ছেলেদের মধ্যে প্রতিভা দেখেছেন, প্রতিভা বিকাশের পথে তাদের চালনা করেছেন। যে ওঠার, সে নিজেই উঠে এসেছে। যার মাথা আছে, পরিশ্রম করে, বড়-বড় প্লেয়ারদের খেলা মন দিয়ে দেখে, নিজেকে সেই ছাঁচে ফেলে তৈরি হয়ে ওঠে। জহরের মনে পড়ল, মাঠে গিয়ে নির্মল চ্যাটার্জির ব্যাটিং গোগ্রাসে গিলতেন, তাঁর ফুটওয়ার্কের ছবি মনের ক্যামেরায় তুলে নিতেন। তখন গোয়াবাগানের সান স্পোর্টিংয়ে খেলছেন, নেটে নকল করতেন সেই ছবিগুলোকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলে, ইনিংসের ভিত গড়ার ধৈর্য আর হুঁশিয়ারিটা শিখেছিলেন পঙ্কজ রায়ের খেলা দেখে দেখে। কেউ তাঁকে কোচ করেনি, কেউ একজন তাঁর গুরু নয়।

"দুটো নেটে খেলা হবে আপাতত শুধু বিকেলে, তবে ছুটির দিনে দু'বেলা। প্রতি ছাত্র হপ্তায় তিনদিন কোচিং নেবে।"

"কতক্ষণ করে নেবে ?"

"সেটা ঠিক হবে ছাত্রসংখ্যা দেখে, যদি ছেলে বেশি হয় তা হলে কুড়ি কি চব্বিশ বল খেলবে। এখানে তো কেউ প্র্যাকটিস করতে আসবে না, শিখতে আসবে। খেলা ছাড়াও তো অনেক কিছু শেখার থাকবে। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে, আগে ব্যাট ধরা শিখবে, ব্যাট নিয়ে দাঁড়াতে শিখবে, কীভাবে ফরওয়ার্ড খেলতে হবে, পা কোথায় যাবে, ব্যাকলিফ্‌ট কীভাবে করবে, কনুই কতটা ভাঙবে, এসব আগে শিখে তবে নেটে বল খেলবে, ঠিক কি না ?"

জহর চুপ করে রইলেন।

"কোচিং ফি, ভেবে দেখলুম একটু কমসমই রাখব, মাসে পঁচাত্তর টাকা। এটা এমন কিছু বেশি নয়। মাসে বারোটা কোচিং, প্রতি কোচিং পিছু ছ'টাকা পঁচিশ পয়সা। দেড়শো টাকা মাইনে দিয়ে যদি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তে পারে, চারশো টাকা দিয়ে যদি প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারে, তা হলে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে ছেলেকে ক্রিকেটার করাতে কি খুব গায়ে লাগবে ? বাঙালি ইলিশ খেতেই দুশো টাকা খরচ করে একবেলায়।"

জহরের মনে পড়ল একদিন দেড়শো টাকা দিয়ে আধ কেজি বাগদা তিনি নিজেই কিনেছেন। এটা সখের ব্যাপার কিন্তু

ক্রিকেটকে শৌখিন খেলা ভাবতে তিনি রাজি নন, প্রতাপ ব্যবসার জিনিস হিসেবে ক্রিকেটকে দেখছে। দেখুক। কিছু ছেলে ব্যাট ধরা, বল করাটা তো তবু শিখবে।

"সবই তো বুঝলাম, কোচিং দেব কি বিনি পয়সায় ?"

"ছি ছি ছি, এ কী কথা বলছেন জহরদা ! আপনাকে প্রণামী দেব না, তা কি হয় ?"

"অনীশকে কত দেবে ?"

"পাঁচশো।"

জহর তীক্ষ্ণ চোখে প্রতাপের মুখের দিকে তাকিয়ে। তাঁর মনে হল প্রতাপ মিথ্যা কথা বলল। নিশ্চয় কমিয়ে বলছে যাতে তাকেও কম দিতে হয়। তার নাম ভাঙিয়েই যে স্কুল চলবে এটা না বোঝার মতো কাঁচা লোক অনীশ নয়। হাজার টাকার কমে সে আসবে না।

"আপনাকেও পাঁচশো দেব। তবে অ্যামাউন্টটা কাউকে কিন্তু বলবেন না।" প্রতাপ হাত বাড়িয়ে জহরের হাত স্পর্শ করল অনুরোধ জানাতে।

"ঠিক আছে, আমি রাজি।"

প্রতাপের মুখে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল।

"অনেক টাকা ঢালতে হচ্ছে। দুটো নেটের একটা কংক্রিট আর-একটা মাটিরই করছি, ওখানে ঘাসের পিচ মেন্টেন করা খুবই শক্ত, তবে চেষ্টা করব। নারকোল ছোবড়ার ম্যাটে খেলাব। বাচ্চাদের জন্য প্যাড, ব্যাট, গ্লাভ্‌স, বলও দিতে হবে... বুঝলেন জহরদা, ঝামেলা আর খরচ অনেক, শেষপর্যন্ত লোকসান খেয়ে না যাই !" মুখটা বিব্রত করে প্রতাপ উঠে দাঁড়াল।

"একটা কথা।" জহর থামিয়ে দিলেন বেরোতে যাওয়া প্রতাপকে। "কীভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে, সেটা কি ঠিক করবে অনীশ ?"

প্রতাপ যেন প্রশ্নটার জন্য তৈরিই ছিল। "কেন, আপনি ঠিক করবেন ! অনীশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ও বলেছে জহরদার মতো অভিজ্ঞ, ক্রিকেট-গুলে-খাওয়া লোক থাকতে আমি কে ? কীভাবে কোচিং হবে সেটা উনিই ঠিক করে দেবেন, আমি মাথা গলাব না।"

জহর বুঝলেন দায়দায়িত্ব এড়াবার জন্য, গায়ে ফুঁ দিয়ে ক'টা টাকা কামাবার জন্য অনীশ প্রশংসা করে তাকে গাছে তুলে দিয়েছে। অনীশ অবশ্যই ক্রিকেট বোঝে, নয়তো অতদূর পর্যন্ত যেতে পারত না, ওর ক্রিকেট বোধের প্রতি জহরের শ্রদ্ধাও আছে। তবে অনীশ খুবই পেশাদার। হোক পেশাদার, জহর ভাবলেন, আমার স্বাধীনতায় হাত না দিলেই হল !

"যদি আমি মনে করি কোনও ছেলেকে বাদ দিতে হবে, বা কোনও কোচ ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না, বাদ দিতে হবে, তা হলে বাদ দিতে হবে।"

"নিশ্চয়।"

"শুধু ব্যাটস্‌ম্যান তৈরি নয়, বোলারও তৈরি করতে হবে। ফিল্ডিং প্র্যাকটিস চাই। উইকেটকিপার তৈরি করতে হবে, প্রত্যেকটা ছেলেকে ক্রিকেটের আইন শিখতে হবে। একটা অলরাউন্ড শিক্ষা চাই।"

"আপনি যেমন চাইবেন সেইভাবেই করবেন।" প্রতাপ নম্র বিনীত ভঙ্গিতে বলল, "স্কুলের সুনাম যাতে হয়, ছাত্র যাতে বাড়ে সেটা দেখা তো উচিতই। তা হলে জহরদা, বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, আমি আসি। যথাসময়ে আপনাকে খবর দেব।"

প্রতাপ বেরিয়ে যাওয়ার পরই জহরের মনে পড়ল হাবলায় হেমন্ত গুহর বলা কথাগুলো—'লুফে নিয়ে ফেলেছি। জহর ট্রান্সফারের জন্য তৈরি থেকো।' কথাটা কি আন্তরিক ? এরকম প্রতিশ্রুতি তো অনেক শুনেছেন জীবনে। আবেগ-উচ্ছ্বাসের বশে অনেকে অনেককিছুই বলে ফেলে, পরে ভেবেচিন্তে মত বদলে ফেলে। তাঁর বয়সের কথাটা হেমন্ত গুহ নিশ্চয় ভাববে। .....কিন্তু তাঁকে নিতেও তো পারে ! হয়তো রামবাবুকে খুশি করতে ফুলবাগানে সই করাবে। এইসব ক্লাবে বড় ডোনারদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। সই করিয়ে তারপর বসিয়ে রাখবে। এরকম ঘটনাও তো তাঁর জীবনে ঘটেছে। ফুটবলের মতো ক্রিকেটেও বসিয়ে রাখা আকছার হয়।

জহরের মনে টানাপোড়েন চলল কিছুক্ষণ। খেলাক বা না-খেলাক, মাঠে যাওয়ার এত বছরের অভ্যাস তো তিনি ছাড়তে পারবেন না। আবার এদিকে প্রতাপকেও কথা দিয়ে ফেলেছেন। ফুলবাগানে নাম লেখালে ময়দানে ওদের নেটে যেতে হবে, তা হলে রাজনারায়ণ পার্কের কোচিং স্কুলে যাবেন কখন ?

দুইয়ের মধ্যে একটা সমঝোতা তাঁকে করতে হবে।

জহর পালের ভয়টা নেহাতই অমূলক ছিল। ক্রিকেট ট্রান্সফারের প্রথমদিনেই হেমন্ত গুহ তাঁকে ফুলবাগানে সই করালেন। সই করে সি এ বি ক্লাব হাউস থেকে তিনি এবং সমু বেরিয়ে আসার সময় হেমন্ত গুহকে প্রশ্ন করলেন, "ভেবেচিন্তে আমাকে নিলেন তো ? একটা-দুটো ম্যাচ খেলতে পাব তো ?"

কথাটা শুনে হেমন্ত যেন আহত হলেন। বললেন, "তোমার মতো ভেটারেনের মুখে এসব কী কথা ? তুমি রন্‌জি খেলতে চাও না টেস্ট খেলার স্বপ্ন দেখছ ? টিমে কখন যে কার দরকার পড়বে তা কি এখন বলা যায় ? দরকার পড়লেই তুমি খেলবে। ফার্স্ট ইলেভেনে ঢোকার জন্য লড়বে এরা।" তিনি সমুর পিঠে হাত রাখলেন।

"তা হলে একটা কথা বলে রাখি।" জহর বললেন, "আমি কিন্তু রোজ নেট প্র্যাকটিসে যেতে পারব না। একটা নতুন ক্রিকেট কোচিং স্কুল হচ্ছে আমাদের ওদিকে রাজনারায়ণ পার্কে, সেখানে কোচ করব। ওখানেই ক্রিকেটের টাচে থাকব, প্র্যাকটিসও করে নেব। তবে ক্লাবে আমি মাঝেমধ্যে নিশ্চয় যাব।"

"বেশ, তাই হবে। জয়প্রকাশের প্রমোশন নিয়ে বদলি হওয়ার কথা হায়দরাবাদে, সামনের জানুয়ারিতে। চেষ্টা অবশ্য করছে কলকাতায় থেকে যাওয়ার। যদি যায়, টিমে তা হলে সিনিয়ার প্লেয়ার কেউ আর থাকবে না। এবার চারজন নতুন ছেলে নিচ্ছি। তোমাকে তা হলে দরকার হতে পারে সিজ্‌নের শেষের দিকে।"

'দরকার হতে পারে' কথাটা জহরের ভাল লাগল। তাঁর মনে গভীর একটা তৃপ্তি এনে দিল। শিরদাঁড়া টান করে তিনি বললেন, "দরকারের সময় দেখে নেবেন ওই বুড়ো ঘোড়া কেমন ছোটে।"

হেমন্ত গুহ চোখ সরু করে হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, "এইসব ছেলে-ছোকরারা দেখবে, আমি আর কী দেখব ! চলি এখন, সৌগতর ব্যাঙ্কে একবার যেতে হবে। ব্রাদার্স নাকি টোপ ফেলেছে ওকে গাঁথার জন্য।"

হেমন্ত গুহ তার অ্যাম্বাসাডারে উঠে চলে যাওয়ামাত্র যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হল কানু ভট্চায।

"এই যে জহর, তা হলে ফুলবাগানে সই করলি ! মাঠে নামার শখ এখনও তোর গেল না দেখছি !" কানু হাসল। চারটে না-থাকা দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা বেরিয়ে এল।

"তোমারও তো মাঠে চরে বেড়াবার শখ দেখছি এখনও যায়নি, নইলে এই ভরদুপুর বেলায় তুমি কী করতে এখানে ?"

"দেখতে, কে কোন ক্লাবে যাচ্ছে তাই দেখতে। সব দেখেশুনে তবেই তো টিম করতে হবে। তা ফুলবাগান আর প্লেয়ার পেল না, শেষে তোর মতো একটা বুড়ো ঘোড়াকে ধরল ! হেমন্তর কি মাথাখারাপ হয়েছে ! ঘাস খাওয়াবার জন্য আর লোক পেল না ?" কানু ভট্চায নিজের রসিকতায় হেসে উঠল।

"ঠিকই বলেছ কানুদা, ব্রাদার্সের ঘাস চিবিয়ে-চিবিয়ে তো বুড়ো হয়ে গেলুম, এবার ফুলবাগানের ঘাস খেয়ে দেখি ছোকরা হওয়া যায় কি না।"

"হবি, হবি, আমাদের সঙ্গে খেলা পড়ুক, তোর টগবগানি ছুটে যাবে।" কানু ভট্‌চায তিনটে আঙুল তুলে দেখাল। "তিনটে আনছি এবার। হরিয়ানার ওমকিশোর, হায়দরাবাদের বরকতউল্লা আর দিল্লির মান্টু সিং। কলকাতার যত ট্রফি আছে সব এবার নেব। পি সেনটা বড় ফসকে গেল, বাগানের ফুল তো জয়প্রকাশ আর সৌগত। জয়প্রকাশের বদলির খবর পেয়ে গেছি। সৌগত ফুল তুলে নিলুম বলে!" কানু একটা কাল্পনিক ফুল নাকের কাছে ধরে গন্ধ শুঁকল।

"যাকগে এসব কথা, তোর ছেলে কেমন আছে?" কানু ভট্‌চায দরদি বন্ধুর মতো জানতে চাইল। "কীসব ছবিটবি তুলে পরীক্ষা করলি, রেজাল্ট কী?"

"ভালই আছে। ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে।"

"ভাল থাকলেই ভাল। আজকাল চিকিচ্ছের যা খরচ!"

"চলো সমু। চলি কানুদা।" জহর সমুর হাত ধরে টান দিলেন।

ফেরার সময় সমু জিজ্ঞেস করল, "লোকটা করে কী জহরদা?"

"কিছু করে না। বিয়ে করেনি, সংসার নেই, মাঠ আর ক্লাব নিয়ে পড়ে আছে।"

"যাদের আনবে বলল তারা তো সব টেস্ট খেলেছে। ব্রাদার্স এবার সব ট্রফি ঘরে তুলবে।" সমু নিশ্চিত স্বরে বলল।

"তোলে তুলবে।...সকালে দৌড়ও কী?" প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য জহর বললেন।

"হ্যাঁ, দেশবন্ধু পার্কে চার পাক দৌড়ই।"

"কাল থেকে পাঁচ পাক দেবে।"

॥ ৮ ॥

রাজনারায়ণ পার্কে ক্রিকেট কোচিং স্কুলের উদ্বোধন জাঁকজমকের সঙ্গে হল। শামিয়ানা খাটিয়ে সভা হয়। বক্তৃতা দিলেন পুরপিতা যশোদাজীবন ধর, বিধায়ক অরুণ বিশ্বাস। যশোদাজীবন বললেন: এই রাজনারায়ণ পার্কের স্কুল থেকে আগামী দিনের বাঙালি টেস্ট প্লেয়ার ঝাঁকে-ঝাঁকে উঠে আসবে, এই ইঙ্গিত তিনি এখনই পাচ্ছেন। অভিভাবকদের উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখে, ছোট-ছোট ভাইয়েরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার মাধ্যমে ক্রিকেটের জ্ঞান অর্জন করবে এই স্কুল থেকে, বিখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় অনীশ সেনের তত্ত্বাবধানে তারা শিখতে পারবে গাওস্কর, কপিলদেব হয়ে ওঠার জন্য কীভাবে ব্যাট করতে হবে, বল করতে হবে। আমি আশা করব, একদিন আমার ওয়ার্ডের এই রাজনারায়ণ পার্ক থেকে উঠে আসা এগারোটা বাঙালি ছেলে নিয়েই ইন্ডিয়ার টেস্ট টিম হবে। সেদিন এই পার্কে সাতদিন ধরে সংবর্ধনার ব্যবস্থা আমি করব। আমি দেখতে পাচ্ছি সেই সম্ভাবনার বীজ আজ এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বপন করা হল।

বিধায়ক অরুণ বিশ্বাস বললেন: 'ক্রিকেট খেলা আর জীবনের খেলা একই জিনিস। দুটো খেলাতেই দরকার মনোনিবেশ। একটু এধার-ওধার হলে, মনোনিবেশে চিড় ধরলেই আউট। আপনাকে মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হবে। জনসেবার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হারালেই ইলেকশনে হেরে যাবেন। ক্রিকেট থেকে এই শিক্ষাটা, জনসেবায় মনোনিবেশের শিক্ষাটা পেয়েছি বলেই ইলেকশনে জিতে বিধায়ক হতে পেরেছি। প্রত্যেকদিন পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে মন দিয়ে যেভাবে জনসংযোগ করি ঠিক সেইভাবে এই স্কুলের ছেলেদের প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হবে, তা না হলে ম্যাচ জিততে পারবে না। আশা করব আমার কথাগুলো শিক্ষার্থীরা মনে গেঁথে নেবে। এখন এই স্কুল খোলা মাঠে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে যাতে এখানে ইন্ডোর হল তৈরি করে কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য সামনের বাজেট সেশনে আমি প্রস্তাব দেব। আমার কেন্দ্র থেকে টেস্ট প্লেয়ার তৈরি করার যে-কোনও প্রয়াসকে আমি সাহায্য করবই।

এর পর আরও তিন-চারজন বক্তৃতা দেয়। বক্তাদের সামনে মাঠের একধারে বসে ছিলেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা, তাঁদের উলটোদিকে চারজন কোচ আর তাঁদের পেছনে জনা পঁচিশ নানা বয়সী ছেলে। একদিকে একটা টেবলে বসে তিনজন খবরের কাগজের লোক। তা ছাড়াও পাড়ার জনাপঞ্চাশ কৌতূহলী লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। ছবি তুলল কাগজের দু'জন ফোটোগ্রাফার, প্রতাপ কোনও খুঁত রাখেনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, হ্যান্ডবিল বিলি করে, বড়-বড় রাস্তার মোড়ে ফেস্টুন টাঙিয়ে সে প্রচার চালিয়ে গেছে। উদ্বোধন করলেন ধুতিপরা বিধায়ক, ব্যাট হাতে। নেটের মধ্যে তাঁকে বল করলেন ট্রাউজার্সপরা পুরপিতা। বল করার আগে তিনি বনবন করে ডানহাতটা ঘুরিয়ে বললেন, "সেই কবে স্কুলে পড়ার সময় বল করেছি আর আজ করছি।"

বিধায়ক হাসি-হাসি মুখে ব্যাটটা খাঁড়ার মতো ধরে দাঁড়ালেন। পুরপিতা দশগজ ছুটে এসে বল করলেন বা ছুড়লেন। বল নেটের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাজনারায়ণ ইনস্টিটিউটের দেওয়ালে ঠকাস করে লাগল। বিধায়ক হতভম্ব চোখে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বলটার দিকে মুখ তুলে সভয়ে তাকিয়ে, তখনই ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। চটাপট আওয়াজ উঠল হাততালির। পুরপিতা লাজুক স্বরে বললেন, "বলটা ঠিকমতো হল না, আর-একবার করি।" এবার তিনি আরও জোরে দৌড়ে এলেন বল করতে। ডেলিভারি দেওয়ার আগে ফাস্ট বোলারদের মতো লাফিয়ে উঠলেন। মাটিতে না পড়তেই পা হড়কে গেল আর বলটা হাত থেকে বেরিয়ে ফুলটস হয়ে সোজা গিয়ে লাগল বিধায়কের বাঁ হাঁটুর নীচে।

"বাবা রে!" দু'হাতে পা চেপে ধরে বিধায়ক উবু হয়ে বসে পড়লেন।

হইহই করে প্রতাপ ও কয়েকজন ছুটে গেল। বিধায়ককে চ্যাংদোলা করে একটা চেয়ারে বসানো হল। তিনি কাতরাতে-কাতরাতে বললেন, "মনোনিবেশটা ঠিকমতো হয়নি বলেই—একটু বরফ দিন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরে একটু বরফ... মালী, মালী।" প্রতাপ ছুটে গেল।

চেয়ারে বসে জহর চুপচাপ দেখে যাচ্ছিলেন। পাশে বসা অনীশকে বললেন, "কী বুঝছ?"

"আমাদেরও মনোনিবেশ করতে হবে।" অনীশ গম্ভীর মুখে বলল।

"সাতদিন ধরে সংবর্ধনা নিতে হবে, এখন থেকেই তৈরি হও।"

"জহরদা, তার চেয়েও বিপদ, এগারোটা টেস্ট ক্রিকেটার এই কোচিং স্কুল থেকে যখন বেরোবে তখন ইন্ডিয়া টিমের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভেবে দেখেছেন কী? আপনি বরং সামলান, আমি এখন কেটে পড়ছি।" বলেই অনীশ চেয়ার থেকে উঠে দ্রুত ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। জহর ফ্যালফ্যাল করে এধার-ওধার তাকাতে লাগলেন।

"আপনিই তো জহর পাল, স্কুলের ডেপুটি ডিরেক্টর অব কোচিং?" ধুতি-পঞ্জাবি পরা সৌম্যদর্শন, বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়সী লোকটি নমস্কার করলেন।

প্রথমে জহরের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তারপর মনে পড়ল

হ্যান্ডবিলে দেখেছেন বটে তাঁর নামের পাশে অমন একটা কথার সঙ্গে ব্র্যাকেটে বেঙ্গল রন্‌জি ট্রফি প্লেয়ার জোড়া আছে। তার আগে আছে ডিরেক্টর অব কোচিং অনীশ সেন, ব্র্যাকেটে ইন্ডিয়া টেস্ট প্লেয়ার। তিনি প্রতিনমস্কার করে বললেন, "হ্যাঁ আমি।"

"আমার ছেলেকে এখানে ভর্তি করিয়েছি।" লোকটি গদগদ ভঙ্গিতে যোগ করলেন, "আপনি একটু দেখবেন, খুব ট্যালেন্টেড।"

"বয়স কত ?"

"এই এগারো ছাড়িয়ে—" লোকটি পাশে দাঁড়ানো মহিলার দিকে তাকালেন, "বারো হয়েছে কি ?"

"এগারো বছর এগারো মাস সাতদিন হল বুবাইয়ের। ...এই যে বুবাই।" মহিলা তাঁর পেছনে দাঁড়ানো লম্বাচওড়া নধর চেহারার একটি ছেলেকে সামনে টেনে আনলেন। জহর একপলক তাকিয়ে দেখে বললেন, "ট্যালেন্ট আছে বুঝলেন কী করে ?"

"গলিতে খেলে তো, দেখেছি বড়-বড় ছক্কা মারে। এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদে বল পাঠায়। তিনটে জানলার কাচ ভেঙেছে। তিনশো টাকা দিয়ে কাচ বদলে দিয়েছি।"

"তা হলেই ট্যালেন্ট আছে প্রমাণ হল ?"

"জ্যোতিষী ওর কুষ্টিতে বলে দিয়েছেন, খুব বড় প্লেয়ার হবে, শচীন তেন্ডুলকরকেও ছাপিয়ে যাবে। খুব নামী জ্যোতিষী চণ্ডীচরণ শাস্ত্রী।" মহিলার চোখমুখে বিশ্বাস আর ভক্তি উপচে উঠল। জহর লক্ষ করলেন বুবাইয়ের বাবার দু'হাতের আঙুলে মোট চারটি আংটি। মুক্তো, পলা, পোখরাজ, চতুর্থটি চিনতে পারলেন না।

"আপনি কী করেন ?" জহর শুকনো গলায় জানতে চাইলেন।

"ফিজিক্‌স পড়াই বাবা নরোত্তম দাস কলেজে, আর বাড়িতে কিছু ছাত্র পড়াই।"

"কিছু বলছ কেন ?" মহিলা চাপা ধমক দিলেন স্বামীকে, "সতেরোজন সকালে, এগারোজন সন্ধেয়, তবে হপ্তায় দু'দিন করে পড়ে। আপনাদের ছেলেমেয়ে কেউ থাকলে পাঠিয়ে দেবেন, মাইনে লাগবে না। ...বুবাইকে একটু আলাদা করে যদি টিপ্‌স দেন। মানে ট্যালেন্ট তো আছেই, শাস্ত্রীমশাই বলেছেন, কিন্তু ট্যালেন্টকে তো পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"সে তো নিশ্চয়। তবে ট্যালেন্ট নিজেই নিজের পথ করে নেয়, তাকে আর পথ চেনাতে হয় না।" জহর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশে বসা অন্য তিন কোচ—জিতু বিশ্বাস, প্রশান্ত চক্রবর্তী আর মৃণাল গুপ্তকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোরা দেখে কথা বলে নে ছেলেদের সঙ্গে, কে কেমন খেলে বুঝে নিয়ে তিনটে ব্যাচে ভাগ করে নে। অনীশ তো সটকে পড়ল। কারা অ আ ক্লাসের আর কারা অজ আম, আর কারা ঐক্য বাক্য—এটা বাছাই করে আমাদের শুরু করতে হবে।"

"একটা কথা বলছিলাম।" বুবাইয়ের বাবা জহরের কথার মাঝে বলে উঠলেন, "বুবাইকে কি হেলমেট আনতে হবে ? ওর জন্য ব্যাট প্যাড গ্লাভ্‌স সবই কিনেছি, জুতোও, কিন্তু হেলমেটটা কেনা হয়নি।"

"সবই কিনেছেন যখন, ওটাই বা বাদ যায় কেন ?" জহর বললেন।

"আমিও তাই বলি।" বুবাইয়ের মা উৎসাহভরে বললেন, "শচীন তো হেলমেট পরেই খেলে।"

"জিতু, তোরা গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে কথা বল। কোন ব্যাচ কোন দিনে আসবে সেটা বলে দিবি।"

"জহরদা, কে কেমন খেলে সেটা আগে দেখে না নিলে ব্যাচ ঠিক করব কী করে ?"

"ঠিক বলেছিস। তা হলে অর্ধেক ছেলেকে কাল সকালে আর বাকিদের বিকেলে আসতে বলে দে। এই যে বুবাই তুমি কাল বিকেলে এসো।"

বিধায়ক তখন দু'জনের কাঁধে হাত রেখে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে চলেছেন পার্কের বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সির দিকে। তাঁর সঙ্গে চলেছেন পৌরপিতা। "অরুণদা আমি বলছি এক্স-রে করানোর দরকার নেই, রাতে গরম চুন-হলুদ লাগাবেন, সকালে দেখবেন ব্যথাট্যথা একদম নেই।"

"বাবা ডিউস বল লাগলে খুব লাগে, না ?" বুবাই ভীত কণ্ঠে ফিসফিস করে জানতে চাইল।

"প্যাড পরা থাকলে লাগবে কেন !" বাবা ভরসা জোগালেন।

"যদি মুখে লাগে ? মুখে তো প্যাড থাকে না।"

বাবা আর কথা খুঁজে না পেয়ে বললেন, "চলো, এবার বাড়ি যাই। কাল বিকেলে আসতে হবে।"

প্রতাপ চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান ভালয় ভালয় কাটল বলা যেত, যদি বিধায়ক অরুণ বিশ্বাসের পায়ে বলটা না লাগত। প্রতাপ তাই কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ। প্রথমদিনেই একটা খুঁত থেকে গেল। নেট এবং ম্যাট খুলে পঞ্চা মালী ইনস্টিটিউটের ঘরে তুলে রাখছে। ডেকরেটরের লোক চেয়ার টেব্‌ল তুলছে ঠেলাগাড়িতে, রিকশায় তোলা হচ্ছে মাইক ও স্পিকার। প্রতাপ ব্যস্ত হয়ে এল জহরের কাছে।

"সব ঠিকঠাক চলছে তো জহরদা ?"

"চলছে। শুধু একটা কথা, ছাত্র ভর্তির আগে ট্রায়াল দিয়ে টেস্ট করে নেওয়া দরকার ছিল।"

"তা হলে জহরদা চারটের বেশি ছেলে আপনি পেতেন না। চারটে ছাত্র দিয়ে তো স্কুল চলে না। আপনি বেছেবুছে যে-ক'টা পান তাদের নিয়ে আলাদা কোচ করুন। বাকিদের ওই তিনজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিন। ...অনীশ সেন কি চলে গেছে ? ওকে সবাই দেখেছে তো ?"

"দেখেছে।" জহর ওকে আশ্বস্ত করলেন।

পরদিন সকালে জহর ম্যাট উইকেটে তেরোটি ছেলেকে ব্যাট করিয়ে তিনজনকে বেছে নিলেন নিজে কোচ করাবেন বলে। তাদের বয়স ষোলো-সতেরো। তাঁর মনে হয়েছে এদের ক্রিকেট বোধ আছে, খেলতে জানে, টেকনিকে ত্রুটি রয়েছে, দরকার উঁচু পর্যায়ের বোলিংয়ে প্র্যাকটিস। মৃণাল মোটামুটি সুইং করায়, জিতু এবং প্রশান্ত অফব্রেকটা করে দিতে পারে। এতেই কাজ চলে যাবে। তা ছাড়া অনিন্দ্য নামে বছর তেরো-র একটা ছেলে বাঁ হাতে স্পিন করায়, খারাপ নয়। এর দিকেও নজর দেওয়া দরকার।

নজর দেওয়া দরকার মনে হতেই জহরের মাথায় একটা চিন্তা টোকা দিল। বেজা ! জিতুকে হাতছানি দিয়ে তিনি ডাকলেন।

"জিতু, বিকেলে আমি আসতে পারব না, একটা জরুরি কাজ আছে, তুই ম্যানেজ করে নিস। বারো-চোদ্দটা তো ছেলে, পারবি না ?"

"না পারার তো কিছু নেই। তবে জহরদা, ব্যাট ধরা শেখাতে হবে, এমন ছাত্রের কথা তো আমি ভাবিনি। বেশিরভাগই তো গলিতে রবারের বল-খেলা ছেলে !"

"খেলুক না রবারের বল। আস্তে-আস্তে ওদের রবার থেকে আসল ক্রিকেট বলে রপ্ত করাতে হবে। করে দেখ, অনেক ভাল ছেলে পেয়ে যাবি। কার মধ্যে কী আছে কে জানে ! এরা টাকা খরচ করে শিখতে এসেছে তার মানে আগ্রহ আছে। এই তো তিন-চারটে ছেলেকে আমার ভাল লাগল। অনেক টাকা খরচ করে প্রতাপ নেমেছে, স্কুলটাকে টিকিয়ে রাখা দরকার। অনেক ভুষিমাল আসবে তারমধ্যে একটা মুক্তোও তো পেয়ে যেতে পারি।"

বিকেল পাঁচটা থেকে জহর দাঁড়িয়ে রইলেন হাতিবাগানের মোড়ে। বেজাকে ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে তেলেভাজার দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলেন সেইখানে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেজা অফিস ফেরত এখানেই বাস থেকে নামে।

কলকাতা কর্পোরেশন অফিসে চাকরি করে সে। অফিস করতে যাওয়া বা অফিস থেকে বেরনো নিজের মর্জিমতোই বেশিরভাগ লোক করে। জহরের একবার মনে হল বেজা কি নিয়মমতোই অফিস যায় আর বেরোয়? যদি নিয়ম মানে তা হলে সাড়ে পাঁচটায় এখানে বাস থেকে নামার কথা।

জহর ঘড়ি দেখলেন। ঠিক সাড়ে পাঁচটা।

"কী রে জহর, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?"

জহর চমকে উঠে ঘুরে দেখলেন মূর্তিমান ব্রজেন হালদার। মুখে একগাল হাসি।

"তেলেভাজা খাব কিনা ভাবছি।"

"আমাকে ঠাট্টা করছিস! .... ছেড়ে দিয়েছি। তুই বলার পর থেকে আর খাই না। এখন আমি সব ব্যাপারে ডিসিপ্লিন্ড থাকার চেষ্টা করি। গ্যাস্ট্রিকটাকে আর্মার দিয়ে ব্যাকফুটে নিয়ে গেছি। আলসারটাকে এবার স্টাম্পড করবই। জানিস জহর, আমি কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় অফিসে চেয়ারে বসি, ঘড়ি ধরে অফিস থেকে বেরোই। ভেবে দেখেছি, ডিসিপ্লিন্ড হতে হলে এই ব্যাপারটা দিয়েই শুরু করা উচিত। মনে পড়ে তোর, বলেছিলি রোজ সকালে দৌড়তে, ফ্রিহ্যান্ড করতে। রোজ নয়, তবে মাঝে-মাঝে করি, খুব ফ্রেশ লাগে।"

"তোর এখন নিজেকে ভাল লাগছে?"

"খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, দশ রানে দশটা উইকেট নিয়েছি। জহর, একটা কথা বুঝতে পারছি, শরীর যদি তরতাজা থাকে তা হলে সেই মানুষ কখনও দুঃখী থাকতে পারে না। তার প্রমাণ কী জানিস, আগে খিদে হত না, এখন হয়।" বেজার মুখ নির্মল সুখের হাসিতে ঝকমক করে উঠল, "বুঝলি রে জহর, দারুণ খিদে হয়। এটা একটা রেয়ার ব্যাপার, দুর্লভ জিনিস। তিরিশ বছর আগে এমনই খিদে হত, তার মানে আমার তিরিশ বছর বয়স কমে গেছে, হাঃ হাঃ হাঃ। ডিসিপ্লিন! লোভ সামলে চলা!" বেজার হাসি আর থামে না।

জহর অবাক হয়ে তাকিয়ে। এই বেজাকে তিনি যেন চিনতে পারছেন না। সেই একই রকম রোগা রয়েছে বটে, কিন্তু মুখচোখে শুকনো বসে যাওয়া ভাবটা আর নেই। ঝকঝকে লাগছে।

"বেজা, এখন তোর বল করতে ইচ্ছে করছে না?"

"ভীষণ করছে।"

"তা হলে চলে আয় রাজনারায়ণ পার্কে, ওখানে একটা ক্রিকেট কোচিং স্কুল হয়েছে। আমি ওখানে একজন কোচ। একটা-দুটো ভাল ছেলে পেয়েছি, খুবই কাঁচা, তবে ভাল বোলার হতে পারে। ওদের নিয়ে তুই পড়ে যা, তৈরি কর। আসবি?"

বেজা ফ্যালফ্যাল চোখে সাত-আট সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে অবিশ্বাসের সুরে বলল, "তৈরি করব! বলিস কী?"

"কাল থেকেই চলে আয়। সকাল সাতটায় আমি থাকব। জীবনে ভালভাবে একটা ফিফটি অন্তত করে যা।"

পরদিন সকাল সাতটায় বেজা রাজনারায়ণ পার্কে হাজির। বহুদিন তুলে রাখা, ইস্ত্রিবিহীন, আধময়লা সাদা ট্রাউজার্সটা ঢলঢল করছে। পায়ে ময়লা সাদা কেড্স, মোজা নেই। ঊর্ধ্বাঙ্গে পোলোগলা খয়েরি গেঞ্জি। একটু লাজুক সুরে জহরকে সে বলল, "হঠাৎই তুই বললি কিনা তাই ..... আজই প্যান্টের কাপড় কিনে দর্জিকে দিয়ে আসব। কত রোগা হয়ে গেছি দেখেছিস।"

"বেজা তুই যেমনই প্যান্ট পর না কেন, ছেলেরা তা লক্ষ

করবে না, তারা দেখবে তোর বল। ওই ছেলেটার নাম অনিন্দ্য, লক্ষ কর।" জহর একহাতে বেজার কাঁধ ধরে নেটের ধারে এসে দাঁড়ালেন। দু'জন কোচ এবং অনিন্দ্য বল করছে, ব্যাট করছে একটি কিশোর।

"জহর, একসময় আমি কলকাতার ওয়ান অব দ্য বেস্ট ড্রেসড ক্রিকেটার ছিলুম। পায়ের বুট থেকে মাথার ক্যাপ— সবাই তাকিয়ে দেখত। এখনকার ছেলেদের সামনে ভিখিরির মতো ড্রেস করে থাকলে ওরা আমাকে মানবে কেন?"

"মানে কি না-মানে সেটা অমি বুঝব।" জহর হাত নেড়ে অনিন্দ্যকে ডাকলেন। "এঁকে তুমি চেনো না।" জহর তাকালেন বেজার দিকে। "এঁর নাম ব্রজেন হালদার, তোমার জন্মের আগে খেলতেন, লেফ্‌ট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার। তোমরা বেঙ্কটপতি রাজুকেই শুধু দেখেছ আর বিষেন বেদির নাম শুনেছ। ব্রজেন ওদের মতোই বোলার কিন্তু—" জহর থেমে গেলেন। অনিন্দ্য কৌতূহলী চোখে বেজার দিকে তাকাল।

"ওর কাছে তোমাকে বল-করা শিখতে হবে। বেজা এতক্ষণ তো অনিন্দ্যকে দেখলি, কী মনে হচ্ছে?"

"মন্দ নয়, হবে। ...... দেখি আর-একটু।" বেজা ওকে ইঙ্গিত করল নেটে গিয়ে বল করতে এবং নিজেও ওর সঙ্গে এগিয়ে গেল। নেটের বাইরে জিতু আর প্রশান্ত অল্পবয়সী ক্রিকেটারদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে সঠিকভাবে ব্যাট ধরে স্টান্স নেওয়া, ব্যাট পেছনে তোলা, পা সামনে বাড়িয়ে ডিফেন্সিভ খেলার মহড়া দিয়ে চলেছে। যার ভুল হচ্ছে কোচরা তাকে ঠিক করে দিচ্ছে। এর পর নেটে ওরা বল খেলবে। ওদের বাড়ির লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছে।

"বুবাইকেও কি এইসব করতে হবে নাকি?" ও তো খেলতে জানে।"

বুবাইকে নিয়ে তার মা এসে গেছেন। হাতে বড় একটা কিট ব্যাগ আর ব্যাট। সাদা পোশাক আর বুট-পরা বুবাইকে ক্রিকেটারের মতোই দেখাচ্ছে। মায়ের হাতে একটা হেলমেট, সাধারণত যা স্কুটার চালকদের মাথায় দেখা যায়।

"এইসব করে বুবাই সময় নষ্ট করবে নাকি?" মায়ের স্বরে ফুটে উঠেছে বিরক্তি। "ওকে বরং নেটে খেলতে দিন।"

"তা দেব। কিন্তু এটা কোত্থেকে জোগাড় করলেন?" জহর হেলমেটটা আঙুল দিয়ে দেখালেন।

"ওর কাকার। ..... হেলমেট ছাড়া ফাস্ট বল খেলবে কী করে?"

"এখানে ফাস্ট বোলার কোথায়? ওটা আপনার কাছেই থাকুক। তা ছাড়া ওটা পরে স্কুটার চালানো যায়, ক্রিকেট খেলা যায় না। ... বুবাই প্যাড পরো।" কথাগুলো বলে জহর নেটের দিকে এগোলেন, বেজা তখন বল করার সময় অনিন্দ্যর হাতটা মাথার ওপর আরও কতটা উঠবে সেটা দেখাচ্ছে।

"আরও তোলো .... হ্যাঁ, টপ থেকে। আর-একটু শরীরের ভার দিতে হবে বল ছাড়ার সময় ..... বডি ওয়েটটা না থাকলে উইকেট থেকে বাউন্সটা তুলতে পারবে না ..... কোমরটা মুচড়ে এইভাবে ঘোরাবে .... দাঁড়াও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বেজা বলটা হাতে নিল। জহর নেটের বাইরে থেকে ব্যাটসম্যানকে শুধু বললেন, "মারতে যেয়ো না।"

বহু, বহু বছর পর ব্রজেন হালদার হাতে ক্রিকেট বল নিয়ে বারবার টিপল, হাতের তালু আর আঙুলে ঘষল। পুরনো যে অনুভূতিটা হারিয়ে গেছে সেটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় বলটাকে আঙুলে জড়িয়ে সামনে উইকেটের একটা জায়গার দিকে তাকাল। বার পাঁচেক বলটাকে দু'হাতে লোফালুফি করে আগের মতো দু'কদম দ্রুত হেঁটে এসে ডেলিভারি দিয়েই দু'হাত পাশে ছড়িয়ে কুঁজো হয়ে ওত পেতে রইল। জহর বলের ফ্লাইটে চোখ রাখলেন।

কাঁচা, অনভিজ্ঞ কিশোর ব্যাটসম্যান তোল্লাই বলটা দেখে আর লোভ সামলাতে পারল না। বাঁ পা বাড়িয়ে হাঁটু গাড়ল সুইপ করার জন্য। বেজা মুগ্ধ চোখে বনবন ঘোরা বলটার ভেসে যাওয়া দেখছে। বলটা নেমে এল, ছেলেটিও ব্যাট চালাল। ম্যাটের ওপর পড়ে বলটা প্রায় ছ'ইঞ্চি ঢুকে এসে ব্যাটের তলা দিয়ে, কোমর ঘেঁষে লেগ স্টাম্পে আঘাত করল।

"বলেছিলুম মারতে যেয়ো না।" চাপা গলায় জহর ধমক দিলেন।

বেজা অনিন্দ্যর হাতে বল তুলে দিয়ে বলল, "নাও এবার তুমি করো।"

"না।" চেঁচিয়ে উঠলেন জহর, "বেজা তুই বল করে যা, যতক্ষণ পারিস।"

প্যাড পরে বুবাই তৈরি। জহর তাকে পাশের নেটে যেতে বলে নিজেই বল নিলেন। ঠোঁট কামড়ে আড়ষ্টভাবে বুবাই ব্যাট ধরে দাঁড়াল। জহর বল দিলেন অফ ব্রেক করিয়ে অফ স্টাম্পের বাইরে। বুবাই পিছিয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে ব্যাট চালাল। ব্যাটের বদলে বল লাগল প্যাডে। পরের বলটা লাগল উরুতে, তার পরেরটা শর্ট পিচ ছিল, লাগল তার ঘুরে যাওয়া শরীরের কোমরে।

"এ কী বল দিচ্ছেন, বুবাই যে খেলতে পারছে না!" বুবাইয়ের মা বিরক্ত মুখে বললেন, "সব যে ওর গায়ে লাগছে! হাড়গোড় ভাঙে যদি? আপনি ঠিক করে বল দিন।"

"কীরকম করে দেব বলুন তো, ইমরান খাঁর মতো করে? তেন্ডুলকর তো শুরু করেছিল ইমরান-আক্রামের বল দিয়ে!" জহর নিরীহ মুখ করে বললেন। মহিলার রকমসকম যে তাঁকে মজা দিচ্ছে সেটা আর তিনি জানাতে চান না।

"বুবাইয়ের ব্যাটের ওপর যাতে বল পড়ে সেইভাবে করুন। ওর ব্যাটিং তো দেখেননি, ছাদের ওপর ফিল্ডার রাখতে হয়! শচীনের মতো ছয় মারে। হ্যাঁ রে বুবাই, ওই যে বাড়িটার জানলায় কাচ রয়েছে, ভাঙতে পারবি? জানেন, ওর বাবাকে কত টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে?" মহিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পুত্রের জানলার কাচ ভাঙার গর্বে।

জহর একবার তাকিয়ে দেখলেন প্রায় দেড়শো মিটার দূরের জানলাটার দিকে। তারপর একতলা সমান উঁচু করে লোপ্পাই একটা বল ছাড়লেন। বুবাই প্রবল বিক্রমে ব্যাট চালাল এবং ফসকাল বলটা, শূন্য থেকে সোজা বুবাইয়ের মাথার ওপর পড়ল। শব্দ হল, 'খটাস'।

"ও ও ও মা আ আ গো ও ও— আমার ছেলের মাথাটা ফাটিয়ে দিলেন!" মহিলা দৌড়ে গিয়ে ছেলের মাথা দু'হাতে চেপে ধরলেন।

জহর প্রথমে ভয় পেয়ে গেছলেন। কিন্তু যখন দেখলেন রক্ত বেরোয়নি, আশ্বস্ত হলেন। নম্রস্বরে বললেন, "আমাদের কাছে তো রবারের বল নেই, আপনি যদি ওই মোড়ের দোকান থেকে একটা কিনে এনে দেন!"

"আপনি ঠাট্টা করছেন? বুবাই বাড়ি চল। ক্রিকেট কোচিং স্কুলে না গিয়েই শচীন এত বড় হয়েছে। তুইও হবি।"

মায়ের সঙ্গে বুবাইয়ের চলে যাওয়া দেখে জহর হাঁফ ছাড়লেন। একটা ঝামেলা কমল। অন্য নেটে তখন মনের আনন্দে বল করে যাচ্ছে ব্রজেন হালদার।

"বেজা অফিস যেতে হবে, মনে রাখিস।" জহর চেঁচিয়ে বললেন।

॥ ৯ ॥

সমু এসে খবর দিল সামনের শনিবার ফুলবাগানের প্রথম লিগ

ম্যাচ জোড়াসাঁকো স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে।

"তুমি টিমে আছ?"

"পনেরোজনে আছি।"

জহর বুঝে গেলেন তাঁর কথা ভাবা হয়নি। এই নিয়ে আর জিজ্ঞেস করলেন না। একদিন মাত্র নেটে গেছলেন। কিছুক্ষণ বল করেন। স্লিপ ক্যাচ প্র্যাকটিসে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। যে-ক'টা বল পেয়েছিলেন, ধরেছিলেন। ব্যাটিং প্র্যাকটিসে তাঁকে ডাকা হয়নি। হেমন্ত গুহর তদারকিতে নেট পরিচালিত হয়।

"কীরকম লাগছে ছেলেদের। অনেকেই নতুন।" হেমন্ত গুহ নেট প্র্যাকটিস শেষে তাঁর কাছে জানতে চান।

"নেটে তো সবাই ভালই ব্যাট করল।" বাকি যে কথাটা বলতে চাইলেন সেটা আর জহর বললেন না— ম্যাচে কী করে সেটাই দেখার! সেইদিনই তিনি বুঝে গেছলেন, তাঁকে শুধু রেখেই দেওয়া হয়েছে, খেলাবার জন্য নয়। এর পর তিনি আর যাননি। রাজনারায়ণ পার্কেই মনপ্রাণ ঢেলে দেন। সেখানে নিয়মিত বেজা বল করতে আসে। জহর তার বল খেলে ছেলেদের বুঝিয়ে দেন স্পিন বল খেলার রহস্য ভেদ করতে হলে কী করতে হবে। মৃণালের মিডিয়াম পেস আর সুইং খেলে দেখিয়ে দেন বিবেচনা আর ধৈর্য কাকে বলে। প্রতিদিন ভোরে দৌড়ন গঙ্গার তীরে।

একদিন তিনি কাগজে দেখলেন, ফুলবাগানের সঙ্গে লিগের খেলা পড়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়নের। খেলাটা দেখতে গেলেন। খেলা ছিল ফুলবাগান মাঠে। দু'দলের সমর্থক ছিল হাজার দুই। গত বছর পি সেন ট্রফির ফাইনালের পর এটাই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

জহর সাইট ক্রিনের পেছনে অল্প লোক রয়েছে দেখে সেখানে গ্যালারিতে গিয়ে বসলেন। চেনা-পরিচিতদের সঙ্গে বসে আজেবাজে মন্তব্য শুনতে-শুনতে খেলা দেখতে চান না। ফুলবাগান টিমটাকে তিনি একটু দূর থেকে দেখতে চান। টস করল জয়প্রকাশ। সৌগত এবার ব্রাদার্সে চলে গেছে আট হাজার টাকা বেশি পেয়ে। ব্রাদার্সের ক্যাপ্টেন হয়েছে নুরু। টস জিতে নুরু ফিল্ড করার সিদ্ধান্ত নিল। বোধ হয় ওর মনে রয়েছে গতবার শেষে ব্যাট করে ফুলবাগানের ট্রফি জেতার কথাটা।

তৃতীয় ওভারে ওমকিশোরের বলে এল বি ডবলু হল সুপ্রকাশ। পরের ছেলেটি ওম-কেই হুক করতে গেল, দ্বিতীয় বলেই উইকেটকিপার ক্যাচ পেল। শুভ্র নামল। ষোলো ওভার কোনও উইকেট পড়ল না। রান তখন বিরাশি। শুভ্র অভিজ্ঞের মতো বল বেছে নিয়ে মারছে। ডিফেন্সও জমাট। জহর ওর কাছ থেকে একটা বড় রান আশা করছেন। সেই সময়ই সে কভার পয়েন্টে বরকতউল্লার একটা ফ্লাইট করানো অফ স্পিন ড্রাইভ করেই তিন-চার গজ বেরিয়ে যায়। মান্টু সিং ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলটা তার হাতে লেগে ছিটকে সাত-আট গজ দূরে চলে গেল। ননস্ট্রাইকারও খানিকটা বেরিয়ে এসে ইতস্তত করে ফিরে যেতে গিয়ে দেখল শুভ্র মাঝপিচ পর্যন্ত চলে এসেছে। "গো ব্যাক" বলে চেঁচিয়ে সে শুভ্রকে ফিরে যেতে বলল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মান্টু সিং জমি থেকে প্যান্থারের মতো লাফিয়ে উঠে তাড়া করে বলটাকে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে উইকেটকিপারকে।

আটচল্লিশ রানে রান আউট হয়ে শুভ্র ফিরে এল। নামল জয়প্রকাশ। প্রথম বলটাকেই অলসভাবে মিড উইকেটে ঠেলে দিয়ে এক রান। এরপর সৌগতকে বল দিল নুরু। কিন্তু জয়প্রকাশ বা অনুপের ওপর কোনও চাপ না পড়লেও রান ওঠা বন্ধ হল। দশ ওভারে মাত্র আঠারো রান। সীমায়িত ওভারের খেলায় ছাব্বিশ ওভারে একশো রান হওয়ায় রান তোলার গতি একটু বাড়াতেই হয়। হাতে রয়েছে সাতটি উইকেট। জয়প্রকাশ একচল্লিশ বল খেলে তেরো রান। তার কাছ থেকে দ্রুত রান চেয়ে ফুলবাগান সমর্থকরা চিৎকার শুরু করেছে। জহর মনে-মনে বললেন, জয়প্রকাশ তো ঠিকই খেলছে। মারতে হয় তো আরও দশ ওভার পর শুরু করা উচিত।

কিন্তু কী একটা পোকা জয়প্রকাশের মাথার মধ্যে নড়ে উঠল, সে বরকতের দশম ওভারের প্রথম বলটাকেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে ছয় মারতে গেল। বলটা ব্যাটের কানায় লেগে ঘুরে এসে অফ স্টাম্পের বেল ফেলে দিল। গ্যালারি নিস্তব্ধ। ব্রাদার্সের সমর্থকরা আনন্দে হাত তুলে চিৎকার করে উঠল। ফুলবাগানের শক্ত খুঁটিটাকে তারা উপড়ে দিয়েছে। জয়প্রকাশ বিকারহীন মুখে ফিরে আসতেই সমর্থকরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। দূর থেকে জহরের মনে হল, ওরা জয়প্রকাশের উদ্দেশে কটুকাটব্য করছে।

জহরের পেছনে এক দর্শক বলল, "এইরকম সময়ে এই খেলা! দরকার কী হাঁকড়াবার?"

"আরে দাদা, টাকার খেলা আছে। জয়প্রকাশ তো কাঁচা নয়, ঝানু প্রফেশনাল। দেখুন কত টাকা পানু পোদ্দারের কাছ থেকে পেয়েছে।"

জহর মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন একবার, কথাটা কে বলল। জবাব একটা দিতেন, কিন্তু মুখ বন্ধ রাখলেন, মাঠের এইসব কথাবার্তা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শুনে আসছেন। সুপ্রকাশের সঙ্গে ওপেন করতে দু'নম্বরে নেমেছিল যে ছেলেটি সে এখনও টিকে আছে ত্রিশ রানে। টেকনিক ভাল, স্পিনটা খেলতে পারে, হাতে মার নেই। জহর ভাবলেন এখন তো এই ভরসা।

জহরের ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গেই বরকতের বলে ছেলেটি পা বাড়িয়ে ব্যাট পাতল। ব্যাট-প্যাডের ফাঁক দিয়ে বল গলে এসে লাগল স্টাম্পে। একশো রানেই পাঁচটা উইকেট চলে গেল। এবার যে নামল তাকেও জহর চেনেন না। ছেলেটি ছটফটে। সব সময়ই রান খুঁজছে। চারটে বাউন্ডারি নিয়ে কুড়ি রানে পৌঁছে গেল কুড়ি বলে। ওর সঙ্গী যে তার রান আট। এর পরই বরকত চার বলের ব্যবধানে দু'জনকেই ক্যাচ তুলিয়ে মাঠ থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। জহর অবাক হলেন ওদের স্পিন খেলার অক্ষমতা দেখে। ফুলবাগান এত কাঁচা ছেলেকে নিয়ে টিম করে ভুল করেছে। বরকত খুবই ভাল বোলার, ব্যাটস্‌ম্যানের দুর্বলতা চট করে ধরে নিতে পারে, কিন্তু তাই বলে ওকে ভয় পাওয়ার কী আছে? এই ছেলেগুলোর বেজার বলে প্র্যাকটিস নেওয়া উচিত।

সমু এসছে। জহর সিধে হয়ে বসলেন। ছেলেটাকে শুধু হাবলার সেই ম্যাচটায় দেখেছেন। উইকেট কামড়ে থাকতে পারে। সমু ঠিক তাই করল, হাবলায় যা করেছিল। ইনিংসের শেষ পর্যন্ত ব্যাট করে পঞ্চান্ন বলে সাতাশ রান করল। বরকত নিল সাতটা উইকেট, ওমকিশোর দুটো, টাকা খরচ করে পানু ভাল বোলারই ভাড়া করে এনেছে। জহর শুধু একটা ব্যাপারে খুশি হলেন, বরকত চেষ্টা করেছিল কিন্তু সমুর উইকেটটা নিতে পারেনি। উইকেট পায়নি সৌগতও। নুরু ওকে চার ওভারের বেশি বল করতে দেয়নি। ফুলবাগান চুয়াল্লিশ ওভারে একশো একাত্তর রান তুলে সবাই আউট।

ওমকিশোর আর বাসুদেব ওপেন করল ব্রাদার্সের ইনিংস। প্রথম ওভার থেকেই ওম ফুলবাগান বোলিংকে সেই যে কচুকাটা শুরু করল থামল একশো চব্বিশ রান করে, মাত্র পঁচাশিটা বল খেলে। তার আগে বাসুদেব পঁচিশ করে এল বি ডবলু হয় অনুপের বলে। ব্রাদার্সের রান তখন একশো দশ। তিন নম্বরে আসে মান্টু সিং। এসেই ডিপ পয়েন্টে ক্যাচ দেয় জয়প্রকাশকে। শক্ত ছিল না কিন্তু সে ক্যাচটা হাতে পেয়েও ফেলে দেয়। ফুলবাগান সমর্থকরা আর্তনাদ করে ওঠে। অবশ্য ম্যাচ তখন ব্রাদার্স জিতেই নিয়েছে। আর দরকার তখন গোটা পনেরো রান।

"দেখলেন তো ..... পানু পোদ্দার তা হলে ভালই দিয়েছে। এই ক্যাচ কখনও ওর হাত থেকে পড়বে ? বিশ্বাস করতে হবে ?" বলতে-বলতে লোকটি গ্যালারি থেকে নেমে গেল। "আর দেখে কী হবে, ম্যাচ তো খতম। এভাবে যে হারবে—।"

জহর শেষপর্যন্ত বসে রইলেন। ব্রাদার্স আট উইকেটে জিতে বদলা নিল। ফুলবাগান টেন্টের সামনে একটা হইচই হচ্ছে। জহর গ্যালারি থেকে নেমে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। বিক্ষোভ দেখাচ্ছে যারা, তাদের মূল বক্তব্য, এত নতুন ছেলে নিয়ে কেন টিম করা হয়েছে ? তারপর তাদের রাগ জয়প্রকাশের ওপর।

"ওর মত ভেটারেন, ওইরকম সময়ে কিনা ওইভাবে মারতে গেল !"

"অনেকদিন তো খেলা হয়ে গেল, আর কেন ! এবার বিদেয় হোক।"

"বিদেয় করে কাকে খেলাবেন, নতুনদের ? দেখলেন তো, ওই সমর দত্ত ছাড়া আর একজনও তো দাঁড়াতে পারল না।"

জহর যে ফুলবাগানে এই বছর এসেছেন, সমর্থকদের কেউই তা জানে না বা জানলেও খেয়ালে রাখেনি। তাঁকে কেউ চিনলও না। তিনি ভিড়ের মধ্যে সবারই কথা শুনছেন। এখন যারা জয়প্রকাশের মুণ্ডু চাইছে, কালই তারা ওকে মাথায় তুলবে যদি একটা সেঞ্চুরি করে। ব্রাদার্স না হয়ে অন্য কোনও টিমের কাছে হারলে এদের দুঃখ এতটা হত না। জহরকে ভাবাল একটা ব্যাপার, ফুলবাগান ভুল করেছে এত নতুন অনভিজ্ঞ ছেলেকে একসঙ্গে নিয়ে। শুভ্র রান আউট না হলে ফুলবাগান এমনভাবে বসে যেত না। সমু তো যথেষ্টই ভাল। কিন্তু বাকিরা ? ওমকিশোরের মারের মুখে বোলাররা ছন্নছাড়া হয়ে গেল ভয় পেয়ে। পালাতে গিয়ে আরও এলোমেলো বল ফেলে ওম-কে সুবিধেই করে দিল। জহর দাঁড়িয়ে যখন এইসব ভাবছেন তখন তাঁর পিঠে টোকা পড়ল। চমকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"জহরদা, সেই পঞ্চাশ টাকাটা।" মনোজের হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট।

"ওটা তুমি রেখে দাও, আজ শোধ হয়ে গেল।"

মনোজ একগাল হেসে নোটটা পকেটে রাখল। "পানুদা বলেছিল কলকাতার সব ট্রফি নেবে। এবার তা হলে নেবেই।"

"না নিয়ে তো উপায় নেই, যা সব প্লেয়ার এনেছে !"

"আপনি ব্রাদার্স ছাড়লেন এই বছরই।" মনোজের স্বরে খেদ ফুটে উঠল। "থেকে গেলে পারতেন। এতবড় একটা গ্লোরি ক্লাবের জীবনে তো আগে আসেনি।"

"এখনই এসব বলছ কেন, গ্লোরি আগে আসুক।"

"আপনার মতো ঝানু একটা ক্রিকেটার এ-কথা বলছেন ! আজ দেখেও বুঝতে পারছেন না ? মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে লিগ, নক আউট, জে সি মুখার্জি আর—" মনোজ চোখ পিটপিট করল, "পি সেন ট্রফি ব্রাদার্সের টেন্টে চলে এল বলে। আর তিনটে মাস।"

"আরে জহরদা, আপনি এখানে ! টেন্টে চলুন।" ফুলবাগানের এক অল্পবয়সী ক্রিকেট-কর্তা জহরকে দেখে এগিয়ে এল।

"এই তো বেশ আছি .... ওখানে তো দেখছি ঝামেলা চলছে।"

"আর বলবেন না, কতকগুলো চ্যাংড়া জয়প্রকাশকে যা-তা বলেছে, তাইতে—"

"কী বলেছে ? টাকা খেয়েছে ?"

"বলেছে সামনের বছর নাকি ব্রাদার্সে যাবে বলে তাই ওদের এগেনস্টে খেলছে না। শুনে তো জয়প্রকাশ একটার মুখে ঘুসি মেরেছে। তাই নিয়ে আবার ঝামেলা। ওকে ক্ষমা চাইতে হবে। জয়প্রকাশ গোঁ ধরে আছে ক্ষমাটমা চাইবে না।"

জহর শুকনো হাসলেন। "সাপোর্টারদের চরিত্র আর বদলাল না। আমার এখন আর টেন্টে যাওয়ার ইচ্ছে নেই।" বলেই হনহনিয়ে তিনি ফুলবাগান ক্লাবের গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"ব্রাদার্স জিতলেই দেখছি জহরদার মন খারাপ হয়ে যায়।" মনোজ স্বগতোক্তি করল।

দু'দিন পর সমু আর শুভ্র একসঙ্গে এল রাজনারায়ণ পার্কে। জহর তখন বড় ছেলেদের জন্য নেটে একজনকে, পুল করার সময় নীচের হাতের কবজি কীভাবে ঘুরিয়ে জমির দিকে বল রাখবে সেটাই দেখাচ্ছিলেন। বল করছে বেজা এবং আরও তিনজন ছেলে।

"খবর কী তোমাদের ?" জহর বললেন, দু'জনকে দেখে তিনি অবাকও হলেন।

"খবর ভাল নয় জহরদা," সমু বলল।

"একটু মুশকিলে পড়েই আপনার কাছে আসা।" শুভ্র বলল, "ক্লাবে আসেন না কেন, এবার আসুন।"

"গিয়ে কী করব ? আড্ডা মেরে, চা খেয়ে বাড়ি চলে আসব। আড্ডা আমি ভালবাসি না।"

"না, না, আড্ডা নয়", "সমু ব্যস্ত হয়ে বলল, "সিরিয়াস ব্যাপার। আমরা, নতুন ছেলেরা খুব মুশকিলে পড়ে গেছি। শুভ্রর তবু পজিশনটা ভাল রানটান পাচ্ছে বলে, কিন্তু বাকিদের অবস্থা খুব খারাপ, সেই ব্রাদার্সের ম্যাচের পর থেকে প্রকাশদা আর ক্লাবে আসেননি। বলেছেন, যে দুর্নাম তার নামে রটানো হয়েছে তারপর আর ফুলবাগানে থাকা সম্ভব নয়। টিমে হাল ধরার কেউ নেই।"

"আমি ক্লাবে গিয়ে কী করব, হাল ধরব ?" জহরের গলায় ঈষৎ বিরক্তি। "নিজেরা চেষ্টা করো, ব্যাট করাটা ভাল করে শেখো। বরকতের মতো বোলারদের কী করে খেলতে হয়, সে সম্পর্কে তো কোনও ধারণাই তোমাদের নেই। ধারণা হবেই বা কী করে, খেলেছ তো জয়দেব, নুরু, অনুপদের মতো বোলারদের। যাও তো ওই বুড়োটাকে খেলো তো। ... যাও, ওই ঘরে প্যাডফ্যাড আছে, পরে এসো।"

দু'জনে অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে একবার তাকাল। তারপর নেটে বল করা বেজার দিকে, তারপর জহরের দিকে। সত্যি-সত্যিই কি বলছেন ব্যাট করতে নাকি শুধু কথার কথা !

"কী হল দাঁড়িয়ে রইলে যে ?"

কী ভেবে শুভ্র ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সমু বলল, "উনি কে ?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ একজন স্পিন বোলার, ব্রজেন হালদার। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কোরো কেমন বোলার ছিল।" কথাটা বলে জহর এগিয়ে গেলেন বেজার দিকে। নিচু স্বরে দুটো কথা বলে ফিরে এলেন।

শুভ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ট্রাউজার্সের মধ্যে শার্টটা গুঁজতে-গুঁজতে। দু'পায়ে প্যাড। যে-ছেলেটি ব্যাট করছিল সে গ্লাভস খুলে দিল, নেটের ভেতর ঢুকে শুভ্র গার্ড চাইল বেজার কাছে, "ওয়ান লেগ।"

জহর দাঁড়ালেন নেটের পেছনে। তিনজন বল করছে। বেজার প্রথম বলটা পেয়ে শুভ্র পিছিয়ে এসে আলতো ঠেলে দিল কভারে। পরের বোলারের বলটাকেও তাই করল। তৃতীয় বোলারের বলটা গ্লান্স করল অলসভাবে। বেজার দ্বিতীয় বল শর্ট পিচ, প্রচণ্ডভাবে স্কোয়ার কাট করল সে। নেট ঝাঁকিয়ে উঠল। পেছন থেকে জহর বললেন, "পারফেক্ট।" বেজার তৃতীয় বলটা হাফ ভলি অফস্টাম্পের বাইরে, পা বাড়িয়ে ড্রাইভ করল শুভ্র। নেটে না আটকালে একস্ট্রা কভার বাউন্ডারিতে যেত। ওর মুখে প্রশান্তি ফুটে উঠল। বেজার পঞ্চম বলটা ফ্লাইট করাল, মন্থরগতিতে ভেসে এল লেগ স্টাম্পের উপর, একটু শর্ট পিচ।

শুভ্র এগোতে গিয়েও পিছিয়ে এসে পুল করল। জহর মনে-মনে হাসলেন।. বেজার ষষ্ঠ বলটা দৃশ্যত একই রকমের। তবে ফ্লাইট আগেরটার চেয়ে সামান্য বেশি। শুভ্র এক-পা বেরিয়ে ব্যাট নামাতে গিয়ে থামিয়ে ফেলল। আগের চেয়ে শর্ট পিচে বল পড়ছে। বেরিয়ে আসার ভুলটার মাসুল দিল বেজার হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে।

ফরসা মুখটা লালচে হয়ে গেল। আড়চোখে শুভ্র পেছনে তাকাল। জহর হাসছেন। থমথমে হয়ে গেল শুভ্রর মুখ। বেজার পরের চারটে বলে হুঁশিয়ার হয়ে সে পা বাড়িয়ে ঠেলে দিয়ে পরপর স্কোয়ার কাট, পুল আর ড্রাইভ করল এবং তারপরের বলটায় বেরিয়ে এসে অন-এ ঠেলে দিতে গিয়ে ক্রিজ থেকে একহাত বাইরে দাঁড়িয়ে চকিতে সে পেছনে তাকিয়ে দেখল লেগস্টাম্প ঘেঁষে বলটা বেরিয়ে গেল।

"স্টাম্পড !" জহর নির্বিকার মুখে বললেন, "চোদ্দ বলে দু'বার আউট।"

শুভ্র একটা কথাও না বলে নেট থেকে বেরিয়ে এসে প্যাড খুলতে লাগল। সমু বলল, "কী হল, আর খেলবি না ?"

শুভ্র মুখ তুলে নিচু স্বরে বলল, "বুড়োটা একটা হাড়বজ্জাত। ঘোল খাওয়াবে বলে আমাকেই কিনা বেছে নিল।"

"সমু এবার তুমি যাও।" জহর কাছে এসে বললেন।

"না জহরদা, আমার আঙুলে একটা চোট রয়েছে, ভাল করে ব্যাট ধরতে পারছি না।" মুখ কাঁচুমাচু করল সমু।

জহর বুঝলেন। বেজাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝলি ?"

"ভালই তো।"

"হবে ?"

"হবে না কেন ! প্র্যাকটিস করুক, ম্যাচ খেলুক, খাটুক, ঠিক হবে। ... তবে ডিসিপ্লিন্ড থাকতে হবে।"

"যেন তেলেভাজা না খায়।" জহর এক চোখ বন্ধ করে তাকালেন।

"বাচ্চা ছেলেদের সামনে বেইজ্জত করিসনি। ... শোনো তোমরা, আমাকে যদি তোমাদের কাজে লাগে তা হলে বোলো।"

"বলব মানে ? ওরা বলবে ? ওরা কে ? ... আমি বলছি। শুভ্র, সমু আমি নিজে দেখেছি বরকতকে সাতটা উইকেট পেতে। পুরো ফুলবাগান টিম এখানে এই স্কুলে ভর্তি হয়ে শুধু ব্রজেন হালদার, ওই বুড়োটার কাছে প্র্যাকটিস নাও। ওকে টাকা দিতে হবে সেজন্য।"

"না, না, জহর, ও কী কথা বলছিস; টাকা নেব কী !"

"বেজা চুপ কর।" জহর ধমকে উঠলেন, "বিনি পয়সার শিক্ষা পেলে কেউ মানুষ হয় না। সব জায়গায় দেখেছি ফোক্‌টসে পাওয়ার ধান্দা, তাই কিছু হল না এ-দেশটার।"

"জহর, আমাকে পয়সা নিতে বলিসনি। আমি অন্য জমানার প্লেয়ার, কোনওদিন টাকা নিয়ে খেলিনি। এইসব ছেলের যদি কোনও উপকারে লাগি, যদি একটা ছেলেও টেস্ট খেলে তা হলেই আমার ফিফ্‌টি হবে। ... তোমরা ভাই আমাকে যতটা কাজে লাগাতে পারো লাগিয়ো।"

"লাগাব। শুধু আপনাকে নয়, জহরদাকেও। আমাদের জেনারেশনটাকে খুব বোকা ভাববেন না।" শুভ্র সপ্রতিভ সটান গলায় উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল, "আপনাকে চোদ্দ বলে দু'বার আউট করতে দেব না।"

"জহরদা, আপনি তা হলে ক্লাবে আসছেন না !" সমু প্রসঙ্গ বদল করে আসল কথায় এল।

"যাওয়ার তো কোনও দরকার মনে করছি না। হেমন্ত গুহ কি তোমাদের পাঠিয়েছে ?"

"না, আমরা নিজেরাই এসেছি।"

"আমার বয়স হয়েছে, একটা সম্মানও আছে। সেক্রেটারি নিজে বলুক যেতে, তা হলে ভেবে দেখব," দৃঢ়স্বরে জহর জানিয়ে দিলেন। ওরা আর অনুরোধ করল না।

ফুলবাগানের চারজন ছেলে রাজনারায়ণ কোচিং স্কুলে ভর্তি হল

টাকা দিয়ে। অনুপ, জয়দেব, সমু আর শুভ্র। ভীষণ খুশি বেজা হালদার। এখন সে দু'বেলা আসতে শুরু করেছে। বিকেলে তিনটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে পৌনে চারটের মধ্যে নেটে হাজির হয়ে যায়। সব কোচই টাকা পায়। জহর প্রতাপকে বলেছিলেন বেজাকে টাকা দিয়ে রেখে দিতে। প্রতাপ রাজিও হয়েছিল। অনীশ সেনকে সে ছাড়িয়ে দিয়েছে তাকে দিয়ে কোনও কাজ পাওয়া যায় না বলে। প্রতাপ সেই জায়গায় বেজাকে মাইনে দিয়ে রাখার প্রস্তাব মেনে নেয়। বেজা সানন্দে রাজি হয় শুধু একটি শর্তে— টাকা নেব না।

অনুপ আর জয়দেবকে পেয়ে বেজা খুশি। প্রধানত এই দু'জনকে নিয়েই সে পড়ে থাকে। ওরাও 'বেজাদা'র অনুগত চেলা হয়ে গেছে। নেটে যাকে পায় তাকেই বল করে যায় আর বেজার নির্দেশ-উপদেশ প্রতি বলে প্রয়োগ করে-করে বোলিংয়ে শান দেয়। সমু আর শুভ্র ব্যাট করার সময় জহর নেটের পেছনে দাঁড়ান। যদি কিছু বলার থাকে, বলেন, দুই উইকেটের মাঝে প্যাড পরে ব্যাট হাতে দৌড়নো, বল ধরে উইকেটে ছোড়া, ক্যাচ ধরা, এইসবও তিনি ওদের করান, সেইসঙ্গে ব্যায়ামও।

সি এ বি নক আউটে ফুলবাগানকে ব্রাদার্সের মুখোমুখি হতে হল না, প্রথম ম্যাচেই এক উইকেটে হেরে যায় মোহনবাগানের কাছে। বলার মতো পারফরম্যান্স— জয়দেব চারটে উইকেট পেয়েছিল, সমু করেছিল তেষট্টি রান। শুভ্র একচল্লিশ রান করে আঙুলে চোট পেয়ে রিটায়ার করে। ম্যাচটা মোহনবাগান কোনওক্রমে জেতে। ফাইনালে ব্রাদার্স মোহনবাগানকে পঁচাত্তর রানে হারিয়ে লিগ ও নকআউট দুটোই পেয়ে যায়। ওমকিশোর, মান্টু আর বরকতরা পানু পোদ্দারের অর্থব্যয় সার্থক করে দেয় দুর্দান্ত ফর্মে থেকে।

জে সি মুখার্জি ট্রফির খেলায়ও ফুলবাগান ব্রাদার্সের সামনে পড়েনি। এরিয়ানের কাছে বাইশ রানে হারে। লো স্কোরিং ম্যাচ, কোনও ব্যাটস্ম্যানই পঞ্চাশে পৌঁছতে পারেনি, তবে জয়দেব হ্যাটট্রিক করে পাঁচটা উইকেট পায়, অনুপ দুটো। ফুলবাগানের আক্রমণ বলতে এখন শুধু দুই স্পিনার, অনুপ আর জয়দেব। ব্রাদার্স ইউনিয়ন জে সি মুখার্জি ট্রফিও জিতে নিল ইস্টবেঙ্গল এবং এরিয়ানকে হারিয়ে। ট্রফি জেতার হ্যাটট্রিক করে তারা শেষ মুকুটটা মাথায় তোলার জন্য খেলতে নামল পি সেন ট্রফির টুর্নামেন্টে।

মরসুমের একেবারে শেষে ক্রিকেটাররা ক্লান্ত, তার ওপর প্রচণ্ড গরম। কারও মাঠে নামার ইচ্ছা নেই। খেলা দেখিয়ে বাংলা বা পূর্বাঞ্চল দলে ঢোকার তাগিদও উবে গেছে, কেননা জাতীয় প্রতিযোগিতাগুলোও শেষ হয়ে গেছে। ফুলবাগান দলের পুরনোদের মধ্যেও উৎসাহ নেই। যারা টাকা নিয়ে খেলে তাদের খেলতেই হবে। তবে দু'জন জানিয়েছে তাদের চোট আছে, খেলা অনিশ্চিত। জয়প্রকাশ হায়দরাবাদে বদলি হওয়াটা আটকেছে তদ্বির করে। শোনা যায় পানু পোদ্দার নাকি এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে। জয়প্রকাশ ক্লাবে আসছে না। নতুন ছেলেরা— সমু এবং কৌশিক, সিদ্ধার্থ, অভিরূপ— অবশ্য খেলার জন্য মুখিয়ে আছে।

রাজনারায়ণ পার্ক থেকে জহর সকালে দোকানে চলে আসেন। সেদিন পার্ক থেকে বেরিয়ে দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন, তখন একটা অ্যাম্বাসাডার তাঁর পাশে এসে থামল।

"জহর... তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম।" গাড়ির জানলায় হেমন্ত গুহর মুখ। জহর এগিয়ে এলেন।

"কী ব্যাপার ?"

"গাড়িতে বসে কথা বলব। উঠে এসো।" দরজা খুললেন হেমন্ত গুহ। জহর উঠলেন।

"ক্লাবে আসো না কেন ?"

"গিয়ে কী হবে! আমাকে খেলাবার জন্য তো আপনি নেননি। রামবাবুকে খুশি করতে আমায় নিয়েছিলেন।"

"রাগ করেছ। তা করতে পারো। কী জানো, দরকারে পড়লে তোমায় নামাব বলে নিয়েছিলুম। নিয়মিত যারা খেলে তারাই খেলুক, আমি তাই-ই চেয়েছি, তোমার তো আর বেঙ্গল টিমে ঢোকার অ্যাম্বিশন নেই যে, পারফরম্যান্স দেখাতে হবে।"

"কে বলল আমার অ্যাম্বিশন নেই ? নিশ্চয়ই আছে।" জহরের গলা হঠাৎ চড়ে গেল। "আমি একষট্টি বছর পর্যন্ত খেলতে চাই।"

হেমন্ত গুহ বিভ্রান্ত মুখে বললেন, "একষট্টি বছর কেন ?"

জহরের উত্তেজনা চুপসে গেল হঠাৎ চড়ে ওঠার মতো। মৃদুস্বরে বললেন, "সে আপনি বুঝতে পারবেন না।"

"কেন পারব না, একষট্টি বছর কেন ?"

"ছোটবেলায় আমার আইডল ছিলেন সি কে নাইডু। তিনি ওই বয়স পর্যন্ত রনজি ট্রফি খেলেছিলেন।"

"অ, এই কথা !" হেমন্ত গুহ হেসে ফেললেন। "বেশ তো তুমিও খেলবে। এ-বছর তো একটা ম্যাচও খেলোনি। তা হলে একবার মাঠে নামো। পি সেন ট্রফিতে খেলো, খেলবে ?"

জহর জানেন তাঁকে খেলাবার জন্য কেন এই লোকটির গরজ। ক্লাবে এখন এগারোজন নামাবার মতো প্লেয়ার হচ্ছে না। তিনি আগ্রহ না দেখিয়ে নিরাসক্ত স্বরে বললেন, "প্রথম খেলা কার সঙ্গে ?"

"শিলিগুড়ি ইলেভেনের সঙ্গে।"

"তারপর কার সঙ্গে পড়বে ?"

"আগে জিতি, তারপর তো কার সঙ্গে পড়বে দেখা যাবে !"

"আচ্ছা, যাব।"

॥ ১০ ॥

শিলিগুড়ির সঙ্গে ম্যাচটা ফুলবাগান জিতল ন' উইকেটে। জহর অধিনায়ক। টস জিতে ফিল্ড করবেন ঠিক করেন। তাঁর দুই ওপেনিং বোলার, অভিরূপ আর সিদ্ধার্থ, প্রথম চার ওভারে ওপেনার দু'জনকে বোল্ড করে ছয় রান দিয়ে। শিলিগুড়ির তিন ও চার নম্বর বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে বত্রিশ রান তোলে। জহর দুই বোলারকেই বদল করে অনুপ ও জয়দেবকে আনেন দশ ওভার পর। উইকেটকিপার কিঙ্কর স্টাম্পড করল তিন নম্বরকে অনুপের বলে। চার ও পাঁচ নম্বর আটত্রিশ থেকে রান টেনে নিয়ে গেল ছিয়াশিতে। জহর অনুপের জায়গায় আনলেন শুভ্রকে। রাজনারায়ণ পার্কে তিনি ওকে নেটে বল করতে দেখেছেন। মিডিয়াম পেসে শুভ্রর বল লেগকাট করে। লেংথে বল রাখে, অবাক হয়ে গেছল যখন জহর তার হাতে বলটা দেন, "আমি !"

"হ্যাঁ, যে বল নেটে করতে তাই করো।"

সীমায়িত ওভারের খেলায় যা দেখা যায় না এবার তাই দেখা গেল— স্লিপ ফিল্ডার। একজন নয়, দু'জন। শুভ্রর প্রথম দুটো বল শর্ট পিচ। প্রথমটায় চার, পরেরটায় তিন, মিড উইকেট থেকে। তৃতীয় বল লেগ স্টাম্পে ভাল লেংথে। ব্যাটস্ম্যান ঝুঁকে বলটা আটকাতে গেল। ব্যাটের কানা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বল। স্লিপ থেকে জহর হাততালি দেন। পরেরটাও একই বল একই জায়গায়, একই ভাবে খেলতে গেল ব্যাটস্ম্যান। ব্যাট ছুঁয়ে বল এল জহরের ডান কাঁধের দিকে। লুফতে অসুবিধে হল না। চার উইকেটে চুরানব্বই। এর পর শিলিগুড়ির ব্যাটস্ম্যানরা আস্থা নিয়ে শুভ্রকে আর খেলতে পারল না। তেত্রিশ ওভারের মধ্যেই শিলিগুড়ি একশো পঁয়ত্রিশ রানে ইনিংস শেষ করে ফেলে। শুভ্র ছ'টা উইকেট নেয় বিয়াল্লিশ রানে।

শুভ্র ওপেনার নয় কিন্তু ওকেই জহর ওপেন করতে বললেন নিয়মিত ওপেনার কৌশিকের সঙ্গে।

"আমি ! আমি তো কখনও নতুন বল ফেস করিনি !"

"ধরো প্রথম ওভারে তিনজন আউট হয়ে গেল। এবার তোমার নামার কথা। তখন কি তুমি বলবে, আমি তো নতুন বলে খেলতে পারব না !"

শুভ্র আর কথা না বলে প্যাড পরতে শুরু করে।

"কখনও খেলেনি বলেই খেলবে, আমি জীবনে কখনও ওপেন করিনি, কিন্তু ওড়িশার এগেনস্টে প্রথম ওপেন করে সেঞ্চুরি করেছি। সবরকম পরিস্থিতির জন্য নিজেকে তৈরি করে রাখবে। যাও... ধরে খেলো, ওয়ান ডে ম্যাচ বলে প্রথম থেকেই মারতে যেয়ো না।... আর-একটা কথা, উইনিং স্ট্রোকটা তোমার কাছ থেকেই আশা করব।" জহর কথাগুলো বলে শুভ্রর কাঁধে চাপড় দিলেন। ড্রেসিংরুমের সবাই জহরের দিকে তাকিয়ে।

"তিন নম্বরে কে যাবে?" জহর সবার মুখের দিকে তাকালেন।

সমু আর কিঙ্কর একসঙ্গে বলে উঠল, "আমি।"

"পঞ্চাশের মধ্যে উইকেট পড়লে সমু, আর পরে পড়লে কিঙ্কর, তারপর এই বুড়ো— প্যাড আপ।"

বুড়োকে আর নামতে হয়নি। উইনিং স্ট্রোকটা ছিল শুভ্ররই— সুইপ করে সে পৌঁছয় আটাত্তরে। সত্তর রানে প্রথম উইকেট পড়ায় কিঙ্কর ব্যাট করতে নেমেছিল। প্যাড খুলতে-খুলতে সমু বলে, "শুভ্রই দেখছি ম্যান অব দ্য ম্যাচ ! জহরদা ওকে বোলারও বানিয়ে দিলেন।"

"পরের ম্যাচে তুমি হওয়ার চেষ্টা কোরো।"

জহরও প্যাড খুলছিলেন। নিচু স্বরে কথাটা বলে আঙুলের ইশারায় অভিরূপ আর সিদ্ধার্থকে ডাকলেন।

"দুজনে দু' ওভার বল করেছ, একটা করে উইকেট পেয়েছ। দু'জনেই একটা করে মেডেনও পেয়েছ। অভিরূপ চার আর সিদ্ধার্থ দুটো রান দিয়েছ সুতরাং দারুণ বল করেছ অথচ তোমাদের আর বল দিলুম না— কেন?"

দু'জনে এমন একটা প্রশ্নে বিভ্রান্ত এবং অবাক চোখে শুধু তাকিয়ে রইল।

"বলগুলো ফেলছিলে কোথায়? বারোটা করে বল করলে তার আদ্ধেকই তো স্টাম্পের দু'হাত বাইরে দিয়ে গেল। অতটা দৌড়ে এসে বল করো কেন? রান-আপ ছোট করো, জোরে বল করার চেষ্টাটা কমাও, বল ডেলিভারি দেওয়ার আগে থমকে যাচ্ছিলে। কপিলদেবের বোলিং অ্যাকশন ভাল করে লক্ষ করোনি?... পরের ম্যাচটা কবে? ... কাল অবশ্যই রাজনারায়ণ পার্কে এদের দু'জনকে নিয়ে আসবে সমু।" জহর নির্দেশ দিলেন।

পরের ম্যাচই ইস্টার্ন রেলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠা গড়িয়া অগ্রগামীর সঙ্গে তিনদিন পরে। অন্য সেমিফাইনালে ব্রাদার্স ইউনিয়ন উঠেছে রাজস্থানকে হারিয়ে। মাণ্টু সিং সেঞ্চুরি করেছে, ওমকিশোর নিয়েছে সাতটা উইকেট। এবার ওরা খেলবে শালিমার স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে।

গড়িয়ার সঙ্গে ম্যাচটায় ফুলবাগান স্বচ্ছন্দে জিততে গিয়ে বিপদে পড়ে যায়। একশো তিয়াত্তর রান তুললে জিতবে, এমন অবস্থায় ইনিংস শুরু করে ফুলবাগানের তিন উইকেটে দেড়শো, বত্রিশ ওভার খেলে। শুভ্র ব্যাট করছিল আশি রানে। সেঞ্চুরি প্রায় অবধারিত। একটা ফুলটস বল অবহেলাভরে লং অন বাউন্ডারির ওপর দিয়ে তুলতে গিয়ে ধরা পড়ল বাউন্ডারির কিনারে। তারপর পাঁচজন ব্যাটসম্যান ফিরে এল ষোলো রান যোগ করে। ফুলবাগানের হাতে দুই উইকেট, দরকার তেরো রান। জহর তখন খেলতে নামেন কপালে ভাঁজ তুলে।

"একটা, একটা করে রান... ম্যাচ জিতে যাব। আঁকুপাকু কোরো না। কল না করলে শর্ট রান নিয়ো না।" জহর ক্রিজে এসে জয়দেবকে বলে দেন। এই মরসুমে জয়দেবের সর্বোচ্চ রান আট। "আর এই অফব্রেক বোলারটাকে ফরওয়ার্ড খেলো না।" বাধ্য ছেলের মতো জয়দেব ঘাড় নাড়ল।

গড়িয়ার পাঁচজন ঘিরে ধরল জহরকে। ওভারের বাকি পাঁচটি বল জহর আটকালেন। এবার উৎকণ্ঠিত হয়ে বোলার প্রান্ত থেকে জয়দেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে-মনে ভগবানকে ডাকলেন : ছেলেটাকে ছ'টা বল পার করে দাও।

অফস্পিনারের প্রথম বলটাতেই জয়দেব লাফিয়ে বেরিয়ে এসে ব্যাট চালাল। জহর ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। দর্শকদের হর্ষধ্বনি শেষ হতে চোখ খুললেন। জয়দেবের মুখ হাসিতে ভরা। জহর কড়াচোখে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতেই, জয়দেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। পরের চারটে বল সে পিছিয়ে এসে কোনওরকমে আটকাল। জহর খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন, এইভাবে খেলো। ষষ্ঠ বলটায় জয়দেব আবার লাফিয়ে বেরোল। জহর চোখ বন্ধ করলেন। আবার হর্ষধ্বনি তিনি শুনলেন। ওভার শেষ, জিততে দরকার আর-একটা রান। দুটো বল থেকে এসেছে বারো রান।

"এটা কী হল?" জয়দেবকে ডেকে জহর বললেন, "পই-পই করে বললুম—।"

"কী করব জহরদা, উইকেটকিপারটা অনেকক্ষণ ধরে পেছনে লেগেছে, খালি কানের কাছে বলে যাচ্ছে, 'এইবার ব্যাটা ক্যাচ দেবে, এইবার স্টাম্প করব। ... ব্যাট করতে জানে না, এক বলের খদ্দের', শুনলে মাথা গরম হবে না? বলুন?"

জহর ঢোক গিলে বললেন, "তা হলে তো হবেই।"

প্রথম বলটাতেই জহর পা বাড়িয়ে জোরে ঠেলে দিলেন। একস্ট্রা কভারে লোক নেই। 'রাইট' বলে চেঁচিয়ে ছুটলেন রান নিতে। ছোটবেলায় তিনি শুনেছিলেন, ব্র্যাডম্যান রান নেওয়ার জন্য বল করেন 'রাইট' বলে। অভ্যাসটা তখন থেকেই তৈরি করেন।

ড্রেসিংরুমে ফিরে জহর দেখলেন রামবাবুকে। "এতক্ষণ ওপরের গ্যালারিতে বসে ছিলুম। ঠিক করেছিলুম না জিতলে চুপচাপ বাড়ি চলে যাব।" রামবাবু খুশিতে জহরের কাঁধ ধরে ঝাঁকালেন। "যেরকম ঝপঝপ পাঁচটা উইকেট পড়ে গেল, ভাবলুম ম্যাচ বুঝি এইখানেই খতম হয়ে গেল। ছেলেটা যে অমন দু'খানা ছক্কা হাঁকাবে কে জানত ! আপনি নিশ্চয় মারতে না বললে কি মারত?"

"এজন্য যাবতীয় ক্রেডিট ওদের উইকেটকিপারের। আমি কিছুই বলিনি।" ধীর গলায় জহর জানিয়ে দিয়ে জয়দেবকে ডেকে বললেন, "এবার থেকে পকেটে তুলো নিয়ে ব্যাট করতে নামবে, কানে দেওয়ার জন্য।"

"আবার তা হলে আমরা ফাইনালে উঠলুম জহর।" হেমন্ত গুহ বললেন, সন্দেশের বাক্স সামনে ধরে। তাঁর কণ্ঠস্বরে অনিশ্চয়তার আভাস। জহর একটা তুলে নিলেন। "বোধ হয় ব্রাদার্সের সঙ্গেই আবার খেলাটা হবে, শুনছি শালিমার নাকি খেলবে না। কীসব গণ্ডগোল হচ্ছে পেমেন্ট নিয়ে, ছ'জন খেলবে না বলেছে।"

"আপনি কি ভয় পাচ্ছেন ফাইনাল নিয়ে?" সন্দেশ চিবোতে-চিবোতে জহর বলনে। "তা হলে একটা গল্প বলি। গল্প হলেও কিন্তু সত্যি ঘটনা... ওহে তোমরা এদিকে এসো, একটা গল্প বলব।" জহরের ডাক শুনে পাঁচ-ছ'টি ছেলে এগিয়ে এল।

"অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং, বোধ হয় নাম শোনোনি। সত্তর- বাহাত্তর বছর আগের কথা। ব্র্যাডম্যান তখন বাচ্চা ছেলে। দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডকে টেস্ট সিরিজে ৫—০ দুরমুশ করে পরের বার ইংল্যান্ড টুরে এসে পর-পর তিনটে টেস্টে আবার দুরমুশ করল আর্মস্ট্রংয়ের দল। ইঁদুরকে নিয়ে বেড়াল যেভাবে খেলে, তাই। বাকি দুটো টেস্ট করুণা করে ড্র করল। সারা টুরে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ হারেনি... শুধু একটা

ছাড়া। আর সেটার কথাই বলব।" জহর হাত বাড়ালেন সন্দেশের বাক্সের দিকে। হেমন্ত গুহ শশব্যস্তে বাক্সটার ঢাকনা খুলে এগিয়ে ধরলেন। বাক্সে সন্দেশ নেই। জয়দেবের মুঠোয় গোটাকয়েক সন্দেশ, কিঙ্কর হাতটা ধরে জহরের সামনে তুলল। জয়দেব মুঠো খুলে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "ছয় মেরেছি তাই ছ'টা নিয়েছি।"

"তোকে আমি আরও ছ'টা কিনে দেব।" হেমন্ত গুহর সস্নেহ প্রতিশ্রুতি।

"আর ওই উইনিং রানটার জন্য আমি একটা।" বলে জহর জয়দেবের মুঠো থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিলেন।

"জহরদা, তারপর কী হল ?" শুভ্রর অধৈর্য স্বর।

"বলছি, বলছি। ইংল্যান্ডের তখন শোচনীয় অবস্থা চলছে। পর-পর তিনটে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে বারোটা ম্যাচ, জিতেছে একটা। আর্মস্ট্রংয়ের রথ হুড়মুড়িয়ে চলেছে, সামনে যা পড়ছে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। সেইসময় ইস্টবোর্নে তাদের একটা তিনদিনের ম্যাচ পড়ল, অ্যামেচার তরুণদের নিয়ে গড়া 'জেন্টলমেন অব ইংল্যান্ড' নামে একটা দলের সঙ্গে। সবাই অবশ্য তরুণ নয়, দুটো বুড়োও ছিল সেই দলে। ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন আর্চি ম্যাকলারেন, ল্যাঙ্কাশায়ারে খেলতেন, বছর বারো আগে শেষ টেস্ট খেলেন। এর আগে আস্তারে রনজি টেস্ট খেলেছেন। তিনিই ছিলেন জেন্টলমেন দলের ক্যাপ্টেন। তখন বয়স পঞ্চাশ।

"জহরদা, এই ম্যাকলারেনের হায়েস্ট রানের কাউন্টি রেকর্ড কি গ্রেম হিক সেদিন ভাঙল ?"

"হ্যাঁ, ম্যাকলারেনের ছিল চারশো চব্বিশ রান। যাকগে, ওসব কথা... দলে আর একটা বুড়ো ছিল, সাউথ আফ্রিকার অলরাউন্ডার অব্রে ফক্নার, এর বয়স তখন চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বাকি ন'জন ইউনিভার্সিটির ছেলে, বাইশ-তেইশ বয়স। মজার কথা কী জানিস, এই ম্যাচ রিপোর্ট করতে লন্ডন থেকে একজন ছাড়া আর কোনও রিপোর্টারই যায়নি। তারা ধরেই নিয়েছিল আর্মস্ট্রংয়ের দল একদিনেই ম্যাচ শেষ করে দেবে, ওখানে গিয়ে কী লাভ !"

"সেই একজন রিপোর্টার কে ?" এবার কিঙ্কর জানতে চাইল।

"নেভিল কার্ডাস। তিনি গেছলেন, কেননা ম্যাকলারেন তাঁকে চিঠি দিয়ে ম্যাচটা দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। চিঠিতে সেই বুড়ো পুনশ্চ দিয়ে তলায় লেখেন : 'আমার মনে হয় আর্মস্ট্রংয়ের দলকে কী করে হারাতে হয় তা আমি জানি।' ... কী আত্মবিশ্বাস !" জহর জ্বলজ্বলে চোখে ছেলেদের মুখের দিকে তাকালেন। "একদল টাটকা তরুণ আর একটা পাকা মাথা ! আর বিরুদ্ধে রয়েছে জয়ের গর্বে উদ্ধত-হয়ে-ওঠা একটা ভয়ঙ্কর দল।

"খেলা ঘণ্টাখানেক চলার পরই কার্ডাস বুঝে গেলেন এখানে এসে খুবই ভুল করেছেন। লাঞ্চের মধ্যেই ম্যাকলারেনের দল তেতাল্লিশ অল আউট ! নেহাতই লন্ডনে ফেরার ট্রেন তখন আর নেই, নয়তো তিনি ফিরে আসতেন। এর পর অস্ট্রেলিয়ানরা পিকনিকের মেজাজে ব্যাট করে দিনের শেষে দুশো রানেরও কমে সবাই আউট হয়ে গেল। কার্ডাস ধরে নিলেন ম্যাচ ওখানেই শেষ হয়ে গেছে। পরের সকালে অস্ট্রেলিয়া লাঞ্চের আগেই জিতে যাবে ধরে নিয়ে কার্ডাস তো তাঁর ব্যাগ রেলস্টেশনে আগেভাগে পাঠিয়ে দিলেন। মাঠ থেকে সোজা গিয়ে একটার ট্রেন ধরবেন। ম্যাকলারেন প্রথম বলেই বোল্ড হলেন। কার্ডাস মাঠ থেকে বেরোবার উদ্যোগ করলেন। ধীরে-ধীরে হেঁটে গেটের দিকে এগোচ্ছেন আর দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ ঘুরিয়ে মাঠের খেলার দিকে তাকাচ্ছেন। দেখলেন ফক্নার ব্যাট করছেন, সঙ্গে এক তরুণ। ফাঁকা মাঠে শুধু শোনা যাচ্ছে স্ট্রোকের আওয়াজ। তাঁদের ব্যাটিং দেখতে-দেখতে কার্ডাস আর মাঠ থেকে বেরোতে পারলেন না, ফিরে এলেন। সেদিন আর তাঁর লন্ডন যাওয়া হল না, পরের দিনও নয়। ফক্নার তাঁর জীবনের শেষ ইনিংসে দুর্দান্ত ব্যাট করে গেলেন। থার্ড ডে-তে কেমব্রিজের বোলার গিবসন শেষ করে দিল অস্ট্রেলিয়ানদের। আটাশ রানে ম্যাচটা জিতে নেয় ম্যাকলারেনের জেন্টলম্যানরা।" জহর ছেলেদের চোখে অবিশ্বাসের ছায়া আর অবাক হওয়া দেখলেন।

"ক্রিকেটে অনেক কিছুই ঘটে, শুনলে মনে হয় বানানো কথা। ... এমন গল্প ফাইনালে আমরাও তো বানিয়ে দিতে পারি... পারি না ? ... পারব না ? বল তোরা পারবি না ?" জহর বাঁ হাতের তালুতে ঘুসি মারলেন। তাঁর চোখ দিয়ে হলকা বেরোচ্ছে। ঠোঁট কেঁপে উঠল। সবাই চুপ।

নিস্তব্ধতা ভেঙে সমুই প্রথম বলল, "পারব।"

কিঙ্কর বলে উঠল, "পারব।"

শুভ্র আর অনুপ বলল, "পারব।"

এবার সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, "জিতব।"

ফুলবাগান টেন্টের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল কানু ভট্চায। জহরকে দেখে একগাল হাসতেই জিভটা বেরিয়ে এল।

"খেলা দেখতে এসেছিলে বুঝি ?" জহরও একগাল হেসে উৎসাহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"দেখলুম, হেরে তো বসেছিলি। তোর টিমের কোমরে একদম জোর নেই। পাঁচটা উইকেট কীভাবে পড়ে গেল !"

"যেভাবে গত বছর ফুলবাগানের পড়ে গেছল, তবুও তোমরা ম্যাচ জিততে পারোনি।"

"এবার আর ওরকম হবে না রে। বলেছিলিস চাবকাব, মনে আছে ?"

"আছে।"

"এবার আমরা চাবকাব তোদের। ম্যাচ কী করে জিততে হয় এবার সেটা দেখাব। ফুলবাগানের এখন এমনই হাল যে, তোর মতো বুড়োকেও খেলাতে হচ্ছে। কী করে যে ফাইনালে উঠলি ! ... যাকগে, ওসব কথা। পি সেন জেতার পর পানু পার্টি দেবে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে, কার্ড পাঠিয়ে দেব, তুই আসিস কিন্তু। অনেক বছর ব্রাদার্সে ছিলিস তো।"

"নিশ্চয় যাব। অনেকদিন ভালমন্দ খাইনি। তবে ফাইনালে আগে ওঠো তো।"

"ওঠা হয়ে গেছে। শালিমার সেমিফাইনালে খেলছে না, পাকা খবর। এবার তোরা রেডি থাকিস—"

"চাবুক খাওয়ার জন্য ?" জহর চওড়া করে হাসলেন।

॥ ১১ ॥

ইডেনে প্রায় চার হাজার দর্শকের সামনে নুরুর সঙ্গে জহর টস করলেন। জিতল নুরু।

"জহরদা, আমরা ব্যাট করব।"

"গত বছরও তোরা ব্যাট করেছিলি।"

"গত বছর তোমাদের জয়প্রকাশ ছিল, এবার নেই।" নুরু মুচকে হাসল। জহরও হাসলেন। মনে-মনে তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন জিতলে ফিল্ড করবেন। সকালে উইকেট কিছুটা তাজা থাকে। তখনই তাড়াতাড়ি প্রথম দিকের উইকেট যদি কয়েকটা পাওয়া যায়। বেলা বাড়লে উইকেট নির্জীব হয়ে পড়বে, ফুলবাগানের যা বোলিং-ক্ষমতা তাতে কচুকাটা হবে মান্টু সিংদের হাতে। নুরু ব্যাট করতে চাওয়ায় তিনি হেসেছিলেন।

সিদ্ধার্থ বল নিয়ে ওপেন করে, তারপর অভিরূপ। সিদ্ধার্থর প্রথম দুটো বল ওয়াইড হল। তৃতীয় বলে ওমকিশোর পয়েন্ট থেকে চার নিল। চতুর্থ বলেও একই জায়গা থেকে আবার চার। প্রবল উৎসাহে সে প্রাণপণ জোরে বল দেওয়ার চেষ্টা করছে। তার আউট সুইংগুলো নিয়ন্ত্রণছাড়া হয়ে বড় বাঁক নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে অফস্টাম্পের বাইরে দিয়ে, তার ওপর বলের লেংথও

ওভারপিচ হচ্ছে। প্রথম স্লিপ থেকে জহর এগিয়ে গেলেন সিদ্ধার্থর কাছে।

"অত জোরে নয় সিদ্ধার্থ, আগে লেংথে ফেলো। নতুন বল, অত বড়-বড় সুইং করালে তো মার খেয়ে মরবে... পেস কমিয়ে আগে লেংথ ঠিক করো।" মাথা নিচু করে সিদ্ধার্থ শুনে গেল জহরের কথা।

সিদ্ধার্থর পিঠ চাপড়ে দিয়ে জহর বল তুলে দিলেন অভিরূপের হাতে। "অফ স্টাম্পের ওপর রাখবে, দেখে নাও তোমার ফিল্ড।"

দুটো সিঙ্গল আর একটা দুই হল অভিরূপের বলে। চারটে রানের জায়গায় হতে পারত বারো রান। কিন্তু সমু আর কৌশিক শিকারি চিতার মতো বল তাড়া করে কভার আর পয়েন্টে অবধারিত বাউন্ডারিতে যাওয়া বলকে এক আর দুই রানে দাঁড় করায়। ওদের আন্তরিক প্রাণপণ চেষ্টা দেখে ফুলবাগান দলটার নড়াচড়ায় যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগল। জহরের মনে হল, জলপোকার মতো ছুটোছুটি করা ছেলেদের মাঝে তিনি যেন একটা বক।

পঞ্চম ওভারের শেষ বলটা সিদ্ধার্থ ঠুকে দিল। ওমকিশোর বোধ হয় ঢিলে দিয়েছিল মনোনিবেশে, বলটাকে হঠাৎ মুখের সামনে দেখে সে হুক করল বলের লাইন থেকে সরে না গিয়ে। লং লেগ বাউন্ডারিতে দাঁড়ানো জয়দেব গজদশেক ছুটে এসে থমকে পিছু হটতে শুরু করল। বলটা ওভার বাউন্ডারি হওয়ার জন্য উড়ে যাচ্ছে। লাইনের এক হাত ভেতরে দাঁড়িয়ে জয়দেব এক হাত তুলে লাফ দিল। বল তার তালুতে জমে গেল।

দু'হাত তুলে পাগলের মতো ছুটে আসছে জয়দেব, আর চারটে ছেলে ছুটে যাচ্ছে তার দিকে। দৃশ্যটা দেখে জহরের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল একটা ক্ষীণ আশা। এই ওমকিশোরই লিগে সেঞ্চুরি করেছিল। পঁচাশি বলে একশো চব্বিশ! এমন একটা অসম্ভব ক্যাচ নিতে পারলে, ম্যাচটাও তা হলে নেওয়া যেতে পারে। ক্যাচই তো ম্যাচ জেতায়।

মাণ্টু সিং নেমেছে। মুখে সহজ একটা ছেলেমানুষি হাসি। বাসুদেবের স্ট্রাইক। অভিরূপের বল গ্লান্স করে সে দুটো রান নিল। দ্বিতীয় বলটা ড্রাইভ করতেই ব্যাটের ভেতরের কানায় লেগে বলটা লেগের দিকে উড়ে গেল। কিঙ্কর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় বাঁ হাত বাড়িয়ে বাঁ দিকে ঝাঁপ দিল। বাঁ তালুতে বলটা ধরে জমিতে দু'বার গড়িয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল। আম্পায়ার আঙুল তুলে দিলেন। বত্রিশ বল খেলে দুটো উইকেট হারিয়ে ব্রাদার্সের ছত্রিশ রান। তার মধ্যে ওমকিশোরও আউট! ফুলবাগানের ছেলেদের চোখ জ্বলজ্বল করছে। এখন ওদের চলাফেরা খাঁচার বুনো বাঘের মতো। গরাদে ভেঙে বেরোবার জন্য ছটফটাচ্ছে।

"জহরদা, এই মাণ্টু সিংটাকে তাড়াতাড়ি নিতে হবে।" কিঙ্কর তার পাশে দাঁড়ানো জহরকে বলল, "অভিরূপ কী বল করছে দেখেছেন? প্রত্যেকটা বল অফস্টাম্পের ওপর দিয়ে বের করছে।"

তাড়াতাড়ি আর নেওয়া হল না। হুঁশিয়ার হয়ে গোটাদশেক বল খেলে হঠাৎই অভিরূপকে সোজা ড্রাইভ করে চার, পরের বলে লং অনের ওপর দিয়ে ছয় মারল। জহর তাকে সরিয়ে অনুপকে এবং সিদ্ধার্থর জায়গায় জয়দেবকে আনলেন। তৃতীয় উইকেটে পার্টনারশিপে একান্ন রান উঠল আট ওভারে। তার মধ্যে মাণ্টুরই চল্লিশ রান। ছেলেদের মুখে হালকা হতাশার ছায়া, ফিল্ডিংয়ে অবশ্য ঢিলেমি পড়েনি। জহর কিন্তু বিব্রত নন। চোদ্দ ওভারে পঁচাশি রান। অনুপ টেনে বল করে যাচ্ছে, রান বেশি দেয়নি। জয়দেব ফ্লাইটে একবার মাণ্টুকে টেনে বের করেছিল, কিঙ্কর স্টাম্প করার চেষ্টা করেও পারেনি। ডিপ পয়েন্ট থেকে শুভ্র সোজা উইকেটে বল মেরেছিল, রান আউট হয়নি। এ ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি।

ঘটনা ঘটল পনেরো ওভারের পর ফিল্ডারদের ছড়িয়ে দিতে।

মাণ্টুর পার্টনার রান তোলায় পিছিয়ে পড়েছে, এবার তার খেয়াল হল রান তোলার গতি বাড়াতে হবে। জয়দেবের বলে দুটো পুল করে দুটো চার নেওয়ার পর কভারে বল পাঠিয়ে একটা রান নিয়ে দ্বিতীয় রান নেওয়ার জন্য দৌড়ল। মান্টু "নো, নো" বলে চিৎকার করে উঠতে সে দৌড়ের মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টার আগেই কৌশিক বল ছুড়ে দিয়েছে জয়দেবকে। রান আউট।

কৌশিক দু'হাত তুলে সবার সঙ্গে হাতে হাত চাপড়ে হাই ফাইভ করায় ব্যস্ত যখন,তখন জহর বললেন, "আনন্দ করছ বটে, কিন্তু মাণ্টু সিং যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কিন্তু বিপদও রয়ে গেছে। আরও দুটো উইকেট কুড়ি ওভারের আগে চাই।"

দুটো নয়,আর একটা উইকেট পড়ল ঠিক কুড়ি ওভারেই। বরকতউল্লা এসে শর্ট রান নিতে শুরু করল। বল করছে কৌশিক মিডিয়াম পেসে। সাদামাঠা বল, মাঝে-মাঝে অফ কাট করে। বরকত ঝুঁকে একটা বল আস্তে ঠেলতে গেল মিড উইকেটে। প্রথম স্লিপে নিচু হয়ে বলটাকে আসতে দেখে জহর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ডান হাতে ক্যাচটা ধরেন তিনি চিত হয়ে। বিশ্বাস করতে পারছেন না এমন একটা ব্যাপার করে ফেলেছেন। দুটো ছেলে দুটো হাতে টেনে তাঁকে দাঁড় করাতেই তিনি প্রথম কথা বললেন, " তা হলে কি আমরা জিতব?" প্রত্যেকের সঙ্গে হাই ফাইভ করলেন। জীবনে এই প্রথম। একশো দু'রানে চার উইকেট। ওম আর বরকত চলে গেছে।

মাণ্টুও চলে গেল জয়দেবকে স্কোয়ার কাট করে। বলটা একটু উঠে গেছল। পয়েন্টে শুভ্র ঝাঁপিয়ে আগুনে গোলার মতো ক্যাচটাকে ধরল। মাণ্টু সাতাত্তর রান করেছে। শুভ্র ব্যর্থ হল বোলিংয়ে। সাত ওভার বল করে চল্লিশ রান দিয়ে উইকেট পায়নি। ব্রাদার্স পাঁচ উইকেটে একশো পঁয়ষট্টি। সৌগত এসেছে। মুখে উপেক্ষার ভাব। গার্ড নিল আম্পায়ারের কাছ থেকে। ব্যাট দিয়ে সযত্নে ক্রিজে আঁচড় টানল। কোমর বাঁকিয়ে সামনে ঝুঁকল, শরীর ঝাঁকিয়ে জোড়াপায়ে লাফাল। তারপর স্টান্স নিল। জয়দেব একটু ওভারপিচ করে সোজা একটা আর্মার দিল। সৌগত পিছিয়ে গিয়ে ব্যাট পাতল। বল লাগল প্যাডে। লাফিয়ে উঠে অ্যাপিল করল জয়দেব, তার সঙ্গে কিঙ্কর এবং জহরও। সিদ্ধান্ত নিতে আম্পায়ার পলক ফেলার সময় নিলেন।

"ব্যাড লাক সৌগতদা।" কিঙ্কর সমবেদনা জানাল।

এর পর ব্রাদার্সের ব্যাটস্‌ম্যানরা কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত ব্যাটিং শুরু করল। নুরু এসেই আক্রমণ শুরু করল। সিদ্ধার্থর বলে দুটো চার নিল গ্লান্স আর কভারে তুলে মেরে। অলোকও তুলে-তুলে মারতে শুরু করল। একশো নব্বইয়ে নুরুর ক্যাচ নিজের বলেই ধরল সিদ্ধার্থ, দু' রান পরে অলোককে সে বোল্ড করল। জয়দেবের বলে কিঙ্কর শেষ দু'জনকে স্টাম্পড করল। ব্রাদার্স অল আউট ঠিক দুশো রানে।

দুশো এক রান তোলা ফুলবাগানের পক্ষে সম্ভব, আবার অসম্ভবও। ওমকিশোর আর বরকত দুটো ঝানু বোলারের সামনে অনভিজ্ঞ ছেলেরা দাঁড়াতে পারবে কিনা সে-ব্যাপারে জহর নিশ্চিত নন। লিগ ম্যাচে যা দেখেছেন তাতে ভরসা কমই পাচ্ছেন। হেমন্ত গুহ শুকনো মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, জহর বললেন, "ভয় পাচ্ছেন নাকি? আরে না না, আমরা হারব কি, ছেলেরা সেদিন বলল না—জিতব।"

ড্রেসিংরুমের সবাই জহরের কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। জহরের মনে হল ছেলেরা যেন কুঁকড়ে গেছে। ম্যাচ জেতার জন্য চাপটা এবার পেতে শুরু করেছে। কেউই তার মুখের দিকে তাকাতে চাইছে না।

"হল কী তোমাদের?" গম্ভীর স্বরে জহর প্রায় ধমকে উঠলেন। মনে হচ্ছে তোমাদের বাড়ি থেকে কারও মরার খবর এসে পৌঁছেছে! দুশোটা রান, কতক্ষণ লাগবে তুলতে? এই উইকেটে ওম, বরকত, সৌগতকে খেলতে পারবে না? গত বছর এই ফাইনালেই শুভ্র হিরো হয়েছিলে, সাপোর্টাররা কাঁধে তুলেছিল, আজও তুমি কাঁধে চেপে মাঠ থেকে ফিরবে...পারবে না ফিরতে?"

শুভ্র ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলল, "আগের বছর ওমকিশোর, বরকত ছিল না জহরদা।"

"এ-বছরও নেই। ধরে নাও নেই। গত বছর সেঞ্চুরি করা হয়নি, আজ সেটা করে এসো।...যাও।" জহর অন্য ছেলেদের দিকে তাকালেন। "সারা সিজন কিছুই করে দেখাতে পারোনি, বছরের আজই শেষ ম্যাচ,...করে দেখাও।"

ফুলবাগান যা করতে শুরু করল তাতে জহরের মুখ কালো হয়ে গেল। ড্রেসিংরুমের বাইরে চেয়ারে বসে দেখতে পাচ্ছিলেন, স্ক্রিনের ধারে ফেন্সিং ঘেঁষে চেয়ারে বসে পানু পোদ্দার, কানু ভট্চায আর সুবল মুখুজ্যেকে। তিনজনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, হাসছে। ফুলবাগানের তিনটে উইকেট পড়ে গেছে সতেরো রানে, পেয়েছে ওমকিশোর,চার রান দিয়ে। দুটো উইকেট বাউন্সার থেকে, আর-একটা বোল্ড। জহরকে অবাক করেছে শুভ্র। প্রথম বলেই সে বোল্ড হয়েছে। ওমের বলে সে ফরওয়ার্ড খেলেছিল, ব্যাট আর প্যাডের ফাঁক দিয়ে বল গলে আসে। হেলমেট বগলে নিয়ে শুভ্র জহরের পাশ দিয়ে ড্রেসিংরুমে যায়। চোখে জল, জহর মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকিয়ে থাকেন।

এর পর কৌশিক। বলটা বাউন্স করিয়েছিল ওম। মাথা নামিয়ে ব্যাটটা তাড়াতাড়ি মাথার ওপর তুলে ধরে সে। গ্লাভ্সে লেগে দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ যায়। তারপর কিঙ্কর। বাউন্সারে চোখ বুজে হুক করে। বল উঠে যায় বোলারের মাথার ওপর। সমু আর জয়দেব এখন ক্রিজে। পঞ্চম ওভার শেষ হল।

দু'জনেই গুটিয়ে গেছে। সীমায়িত ওভারের খেলা সিকেয় তুলে ওরা পাঁচদিনের খেলার মতো ব্যাট করে যাচ্ছে। ব্রাদার্সের টাইট বোলিংয়ে রান তোলাও কঠিন হয়ে পড়েছে। সৌগত দুটো মেডেন নিয়ে পাঁচ ওভারে মাত্র সাত রান দিয়েছে। বদরের বলে জয়দীপ দুটো চার মারলেও সে স্বচ্ছন্দ নয়। একস্ট্রা হয়েছে এগারো,বাই ও লেগবাই থেকে। ব্রাদার্স গত বছরের জেতা ম্যাচ হেরে যাওয়ার কথা ভোলেনি। এবার তারা হুঁশিয়ার।

কানু ভট্চায সিঁড়ি দিয়ে উঠে ড্রেসিংরুমে যাচ্ছিল, জহরকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এল।

"এ কী রে, এখনও প্যাড পরিসনি?" খুব অবাক দেখাল কানুকে। "ক' নম্বরে ব্যাট করবি, এগারোয়?"

"হ্যাঁ।"

"ব্রাদার্সকে কীরকম চাবকাচ্ছে দেখেছিস।"

"দেখছি।"

"পানুকে বললুম তোর বাকি টাকাটা দিয়ে দিতে,'জহর বুড়ো হয়ে গেছে আর কদ্দিন মাঠে নামবে। ঘোড়া তো অনেক বছর দৌড়ল, এবার জিরোক। চাবুক মারার শখটা মিটোতে গিয়ে নিজেই চাবুক খেল। মানুষের সব আশা কি পূরণ হয়!' পানু বলল, 'কাল সকালেই জহরদার বাড়িতে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।' আর শোন, কার্ড পাঠিয়ে দেব, আসিস কিন্তু।"

জহর কোনও জবাব না দিয়ে অপমান হজম করলেন। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন ফুলবাগান হারছে। সমু আর জয়দেব চেষ্টা করছে উইকেট যাতে না পড়ে, কিন্তু জিততে হলে রান চাই, রান কোথায়? ছাব্বিশ ওভারে একষট্টি রান উঠেছে। এখনও তুলতে হবে একশো চল্লিশ রান চব্বিশ ওভারে, তোলা কি যায় না? যায়, তবে দুটো শচীন তেণ্ডুলকর চাই।

জহর চোখ বুজে ছিলেন। বিকট একটা 'হাউজদ্যাট' শুনে

চোখ খুললেন। ফিল্ডাররা হাই ফাইভ করছে সৌগতর সঙ্গে। জয়দেব ক্রিজ ছেড়ে আসছে।

"কী হল ?" জহর জানতে চাইলেন, ব্যাট করতে নামার জন্য তৈরি পার্থর কাছে।

"এল বি হয়েছে।"

সাতষট্টি রানে চার উইকেট গেল। জহর উঠলেন প্যাড পরার জন্য। জয়দেব ড্রেসিংরুমে এসে বলতে শুরু করল, "ব্যাকফুটে খেলতে গেলুম, কিন্তু হঠাৎ এমন লো হয়ে বলটা—"

"থাক ওসব কথা।" জহর ওকে থামিয়ে দিলেন, "অভিরূপ রানের রেটটা এবার বাড়াতে হবে, শর্ট রান নিয়ে ফিল্ডিংটা আলগা করে দেওয়ার চেষ্টা করবে।... এ-ম্যাচ হারা চলবে না। উইকেট অনেক ইজি হয়ে গেছে।"

বাইরে আবার একটা চিৎকার। জহরের বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। কে গেল, সমু নয় তো ? এখন ব্যাটস্‌ম্যান বলতে ওই একটা ছেলেই, যদি আউট হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে আর আশা নেই। গ্লাভ্‌স আর ব্যাট হাতে অভিরূপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, হেমন্ত গুহ ঢুকলেন, মুখে কথা নেই। করুণ চোখে শুধু তাকিয়ে রইলেন জহরের দিকে। ব্যাটটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরোবার সময় জহর শুকনো হাসি হাসলেন। ভরসা দেওয়ার মতো কথা মুখে জোগাল না।

মাথা নিচু করে ফিরে-আসা অভিরূপের পাশ দিয়ে জহর মাঠে নামলেন। সেই সময় শুনলেন, "বুড়ো এবার চাবকাতে যাচ্ছে।" শুনেই তাঁর মাথাগরম হয়ে গেল। স্কোরবোর্ডটা দেখে নিলেন। সমু উনপঞ্চাশ রানে। টোটাল তিয়াত্তর, ছ' উইকেটে। এখনও দরকার একশো আটাশ, কুড়ি ওভারে। জহর মন্থর পায়ে ক্রিজের দিকে যেতে-যেতে আকাশের দিকে মুখ তুললেন। হাবলার সেই ইনিংসটা কি এখন খেলে দেওয়া যায় না ? সমু সেট হয়ে গেছে। ও স্ট্যান্ড দিক, একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।

সমু এগিয়ে এল, মুখে উত্তেজনা নেই, নির্বিকার।

"হাবলা মনে আছে ? একদিকটা ধরে রাখ, আমি দেখছি।" জহর বললেন, "আগে পঞ্চাশটা করে নাও।"

সমু বাধ্য ছেলের মতো মাথা হেলাল। বদরের প্রথম বলটা জহর ছেড়ে দিলেন। দ্বিতীয় বলটা ঠেললেন কভারে: "রাইট।" একটা রান। সমু ব্যাট করবে। প্রথম বলটা সে কভারেই হালকাভাবে ড্রাইভ করল। ফিল্ডার কোথায় দেখে নিয়েই জহর ছুটে বেরোলেন। সমু ছোটার জন্য তৈরি ছিল না। যখন ছুটল তখন ফিল্ডার বল তুলছে। বোলারের গা ঘেঁষে ছোড়া বলটা যখন বেরিয়ে গেল সমু তখন পপিং ক্রিজ থেকে তিন গজ দূরে। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলে যা হয়, ওর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল, তারপরই রক্ত ছুটে এল। চোখে ফুটে উঠল অতিরিক্ত জীবন পাওয়ার দুর্জয় আত্মপ্রত্যয়। হঠাৎ পাওয়া একটা সাহস তাকে বেপরোয়া হতে উসকে দিল।

তার হাফসেঞ্চুরি হল। কিছু হাততালি উঠল। সমু ব্যাটটা একটু তুলল। ওভার শেষ, এবার তাকে বল করতে এল সৌগত। জহর তৈরি হলেন শর্ট রান নেওয়ার জন্য। এখন তিনি স্ট্রাইক চান, এখন তিনি চালিয়ে খেলবেন। আবার হাবলার ইনিংসটা এখন তাঁকে খেলতে হবে। পারবেন, যদি সমু ওদিকে টিকে থাকতে পারে।

সৌগতর প্রথম বলটা তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বাউন্ডারির বাইরে পড়ল। চোখ পিটপিট করে ভ্রূ কুঁচকে সমুর দিকে তাকিয়ে সে ঠোঁট মুচড়ে হাসল। ভাবখানা, এইবার তোমাকে পেয়েছি। কতক্ষণ আর নিজেকে সামলে রাখবে! লং অন আর লং অফে নুরু ফিল্ডার রাখল। পরের বলটাও সৌগতর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে আগের জায়গাতেই পড়ল। সৌগত হাসল, তার তৃতীয় বলটা একইভাবে উড়ে আর-একটু দূরে কংক্রিট গ্যালারিতে পড়ে 'ঠকাস' শব্দ তুলল। সৌগত আর হাসল না, বরং জহরের মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। করছে কী সমু! চতুর্থ বলটা শর্ট লেংথে, সমু বিদ্যুৎগতিতে পুল করল, স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারিতে বল গেল। চার বলে বাইশ রান!

সৌগতর চোখে বিভ্রান্তি, এবার কোথায় বল ফেলা যায় ? অফস্টাম্পের অনেক বাইরে সে বল ফেলল, ছেড়ে দিলে আম্পায়ার নির্ঘাত ওয়াইড দেখাতেন। সমু ছাড়েনি। কাট্ করা বলটা পয়েন্ট বাউন্ডারির ফেন্সে লেগে মাঠে ফিরে এল। নুরু ছুটে এসে সৌগতর সঙ্গে কথা বলে গেল। জহর শুনলেন উত্তেজিত নুরু বলছে, "আর ক'টা লোক বাউন্ডারিতে রাখব ?" ষষ্ঠ বলটা সমু ফরওয়ার্ড খেলল অনেকটা ঝুঁকে। বোলারের কাছে বল গেল। রান হল না।

জহর কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি কিছু বলার আগেই সমু উত্তেজনায় থরথর স্বরে বলল, "হাবলায় আমি যে খেলাটা খেলেছিলাম, এখন আপনি সেইটে খেলুন। আরও একশো রান দরকার, তুলে নিতে হবে।"

স্তম্ভিত জহর নির্বাক রইলেন।

তারপর যা ঘটতে শুরু করল, পরদিন আনন্দবাজারের হেডিংয়ে সেটাই উঠে এল, 'নন্দন কাননে দক্ষযজ্ঞ'। আজকালের হেডিং হল, 'ইডেন সমরাঙ্গন'। সমু তাণ্ডব নাচ নাচল ব্যাট হাতে। চোদ্দ ওভারে একশো রান উঠে এল। এই একশোর মধ্যে এক্সট্রা চার রান, জহরের অবদান পাঁচ রান, সমুর একানব্বই। ন'টা ছয় আর সাতটা চার আছে তার একশো একচল্লিশ রানে। জহর যখন ফাইন লেগ থেকে একটা রান নিয়ে ম্যাচ শেষ করে দিলেন তখনও ফুলবাগানের খেলার জন্য একত্রিশ বল রয়েছে। ড্রেসিংরুমে প্যাড পরে অপেক্ষায় রয়েছে তিনজন।

এক রানটা নেওয়ার পরই জহর হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন। ব্যাটে ভর রেখে ঝুঁকে পড়ে তাঁর দেহ। বুকের মধ্যে একটা টর্নাডো তাঁর পাঁজরাগুলোকে খুলে ফেলছে মেরুদণ্ড থেকে। পিঠে একটা হাত পড়ল।

"জহরদা, আমরা পেরেছি।"

হইহই করে মাঠের মধ্যে লোক ছুটে আসছে। উন্মত্তের মতো তারা চেঁচাচ্ছে। সমুকে নিয়ে লোফালুফি শুরু হল। হাততালি দিচ্ছে মাণ্টু, ওম, বদর। জহরের দিকে কেউ দৃকপাতও করল না। সবাই ব্যস্ত সমুকে নিয়ে। এই ভাল, জহর ভাবলেন, 'আমার কাজ আমি করেছি। এইভাবেই একষট্টি বছরে পৌঁছতে পারলে আমার ক্রিকেটজীবন সার্থক হবে। বুড়ো ঘোড়াটাকে আরও ক'টা বছর কি ছোটাতে পারব না ?'

ফেন্সিংয়ের ধারে তিনটে চেয়ার খালি। তিনটে লোকের বদলে জহরের সঙ্গে দেখা হল একটা লোকের—বেজা।

"তুই !"

"অফিস কেটে চলে এলুম। জহর রে, আজ পেট ভরে ফিরপোর খাবার খেলুম, কী ভাল যে লাগল ?" জহরের দুই মুঠো বেজা নিজের বুকে চেপে ধরল।
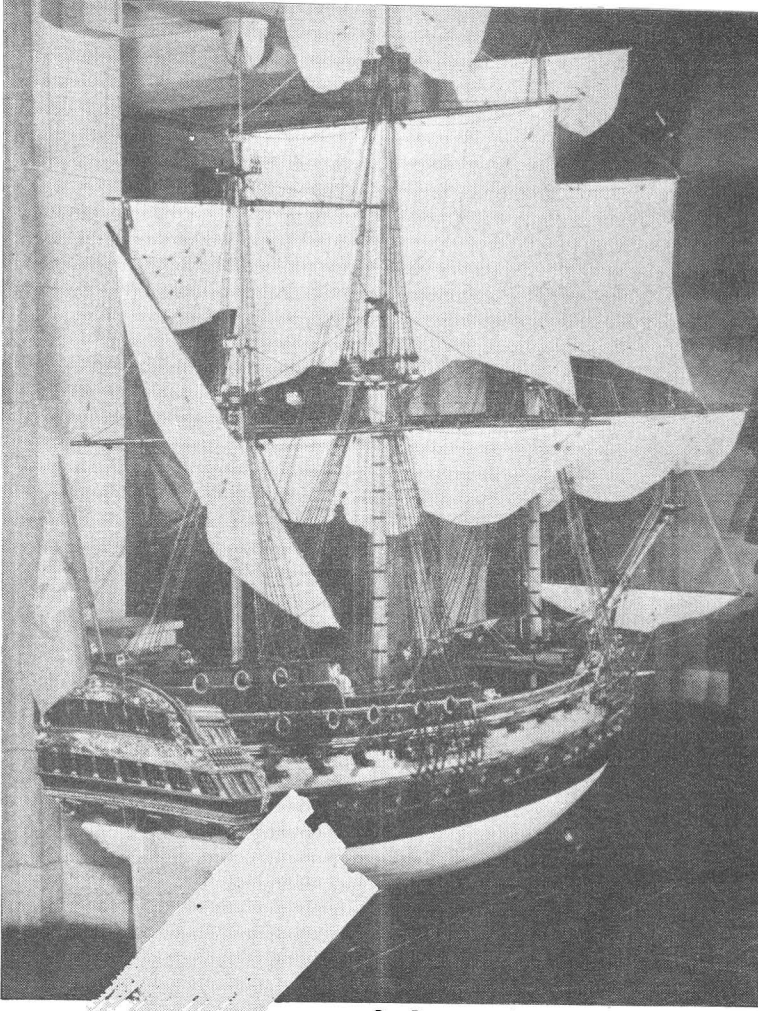
হয়তো এরকম কোনও পালতোলা জাহাজের নাবিক ছিল সেলকার্ক

রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপ

অসিতাভ দাশ

ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা 'রবিনসন ক্রুসো' কাল্পনিক উপন্যাস হলেও এর নায়ক একজন রক্তমাংসে গড়া মানুষ। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে চিলির অন্তর্গত ভ্যালপারাইসো প্রদেশের পশ্চিমে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে পর্বতময় নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিল আলেকজান্ডার সেলকার্ক নামে একজন তরুণ নাবিক। তার জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

একটা নির্জন দ্বীপে একজন মানুষ সহায়সম্বলহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গী বলতে কেউ নেই। চারপাশে শুধু নীল জল আর জল। এই ভাগ্যহত মানুষটির পাশে কথা বলার মতো কোনও মানুষ নেই, নেই কোনও আত্মীয়স্বজন। কথা বলার জন্য আছে শুধু একটি কাকাতুয়া। তার নাম 'পোল'। সে শুধু ঘুরেফিরে বেড়ায় আর এই মানুষটির নাম ধরে ডাকে। এইভাবে ২৮ বছর ধরে জনমানবহীন নির্জন দ্বীপে একলাই কাটে মানুষটির।

এই কাহিনী ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা উপন্যাস 'রবিনসন ক্রুসো'র। কাহিনীর নায়ক রবিনসন ক্রুসো এক অজানা নির্জন দ্বীপে একাকী ২৮ বছর কাটিয়েছিল, সঙ্গী বলতে ছিল কাকাতুয়া, কুকুর, বিড়াল, ছাগল প্রভৃতি কিছু প্রাণী। এরকম একটি কালজয়ী গল্প লেখা হয়েছিল একটি সত্যি ঘটনাকে অবলম্বন করে। সেই ঘটনাকে জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ৩০০ বছর পেছনে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তখন জলদস্যুদের অনেক জাহাজ ঘুরে বেড়াত। এই জাহাজগুলোর কাজ ছিল অন্য জাহাজ থেকে টাকাপয়সা ও জিনিসপত্র লুট করা। এরকম একটি জাহাজের নাবিক ছিল আলেকজান্ডার সেলকার্ক নামে স্কটল্যান্ডের এক তরুণ। ১৭০৩ সালে যে জাহাজে সে কাজ নিয়েছিল, তার ক্যাপ্টেন ছিল সুপরিচিত ইংরেজ জলদস্যু ও নাবিক ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ের।

জলদস্যুদের এই জাহাজটি ছিল ইংল্যান্ডের সিঙ্ক পোর্টস অঞ্চলের। ইংল্যান্ডের দক্ষিণের পাঁচটি বন্দর স্যানউইজ, ডোভার, হাইদ, রমনি ও হেস্টিংসকে 'সিঙ্ক পোর্টস' নামে ডাকা হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলের বুকে জলদস্যুদের জাহাজটা যখন ভেসে বেড়াচ্ছে, তখন নাবিক সেলকার্কের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ড্যাম্পিয়েরের বাধল ঝগড়া। এদের দু'জনেরই ছিল ভীষণ উগ্র মেজাজ। ফলে ঝগড়া পৌঁছল চরমে। সেলকার্ক মেজাজ হারিয়ে বলল, "আমি আর আপনার জাহাজে যাব না, আমাকে আপনি কোথাও নামিয়ে দিন।" ক্যাপ্টেন তার কথা শুনেই জাহাজ থামিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এক নির্জন দ্বীপে তাকে নামিয়ে দিল। জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়ার সময়

সেলকার্ককে জামাকাপড়, বিছানাপত্র, গাদা বন্দুক, বুলেট, কামানের বারুদ, তামাক, একটা ছোট কুঠার, গণিতসংক্রান্ত কিছু যন্ত্রপাতি ও বেশ কয়েকটা বই দিয়ে দেওয়া হল।
একটু পরেই সেলকার্ক বুঝতে পারল উত্তেজনার মাথায় সে ভুল কাজ করে ফেলেছে। ক্যাপ্টেনকে অনেক অনুনয় বিনয় করল তাকে আবার জাহাজে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু ক্যাপ্টেন ড্যাম্পিয়ের তার অনুরোধে কর্ণপাত না করে সেই নির্জন দ্বীপে তাকে একা রেখে জাহাজ ছেড়ে দিল।
তাকে ফেলে রেখে যখন সবাই চলে গেল, সে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়ল না। দ্বীপটাকে ভাল করে দেখবার জন্য সে এগিয়ে গেল। এই ঘটনা ১৭০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের।
নির্জন পর্বতময় দ্বীপে যখন তাকে নির্বাসিত করা হল, তখন তার সম্বল জাহাজ থেকে দেওয়া কিছু জিনিসপত্র আর অদম্য মনোবল।
আলেকজান্ডার ছিল স্কটল্যান্ডের মানুষ এবং জলদস্যুদের জাহাজের নাবিক। ১৬৭৬ সালে স্কটল্যান্ডের ফাইফ সমুদ্র উপকূলের লারগো নামে একটি জায়গায় তার জন্ম। তার বাবার ছিল জুতো তৈরির ব্যবসা। কিন্তু এই ব্যবসায় তার কোনও উৎসাহ ছিল না। বাবার ব্যবসায়ের চেয়ে নীল সমুদ্রের হাতছানি তাকে বেশি আকর্ষণ করত। ১৯ বছর বয়সে অভিযানপ্রিয় এই তরুণ ১৬৯৫ সালে জলদস্যুদের জাহাজে নাবিক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিল।
এইভাবেই জলে-জলে জীবন কাটছিল তার। এমন সময় নির্বাসিত হল সে।
সেলকার্ক দ্বীপটার মধ্যে দেখতে পেল বেশ কিছু ছাগল, শূকর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মনে প্রশ্ন দেখা দিল, তা হলে এই দ্বীপে কি কেউ বসবাস করে? কিন্তু সেই নির্জন দ্বীপে মানুষ বলতে সে তো একাই। তা হলে এই দ্বীপে গৃহপালিত পশু এল কী করে?
জুয়ান ফার্নান্ডেজ নামে স্পেনের একজন অভিযানপ্রিয়, সাহসী, দক্ষ নাবিক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৫৩৬ সালে। ১৫৬৩ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর কালাও নামে এক জায়গা থেকে এক দুঃসাহসিক অভিযানে মাত্র ৩০ দিনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পালতোলা নৌকোয় চেপে চিলির ভ্যালপারাইসোতে তিনি পৌঁছেছিলেন। তাঁর এই দুঃসাহসিকতার জন্য দেশের লোক 'জাদুকর' নামেও তাঁকে ডাকত।
অনুমান, ১৫৬৩ থেকে ১৫৭৪ সালের মধ্যে জুয়ান ফার্নান্ডেজ স্পেনের তখনকার রাজার আর্থিক সহায়তায় প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটা দ্বীপমালা আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপগুলি চিলির অন্তর্গত ভ্যালপারাইসো প্রদেশের পশ্চিমে ৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনটে দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠা এই দ্বীপমালা।
দ্বীপগুলির নাম— মাস এ তিয়েরা, মাস অফুয়েরা ও সান্তা ক্লারা। এর মধ্যে সান্তা ক্লারা সবচেয়ে ছোট দ্বীপ।
তিনি এই দ্বীপগুলি আবিষ্কার করেন বলেই তাঁর নামেই এর নামকরণ করা হয় 'জুয়ান ফার্নান্ডেজ দ্বীপমালা'। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আরও দুটি দ্বীপ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই দ্বীপ দুটির নাম সান ফেলিক্স ও সান অ্যামব্রোসিও।
আলেকজান্ডার সেলকার্ক যে দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিল, সেই দ্বীপটাই ছিল মাস এ তিয়েরা। ১৫৮০ সাল পর্যন্ত জুয়ান ফার্নান্ডেজ এই দ্বীপগুলিতে বসবাস করতেন। লোকজন নিয়ে বসবাস করার সময় স্পেনের রাজার সহায়তায় প্রচুর পরিমাণে ছাগল, শূকর প্রভৃতি ওই দ্বীপে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। লোকজন নিয়ে পরে তিনি ওই দ্বীপ ছেড়ে চলে এলেও পশুগুলো থেকে যায়।
সেলকার্কের মনে ওই প্রাণীগুলো দেখে আশা জাগলেও বাস্তবে কোনও লাভ হল না। সে তখন নিজের মনকে শক্ত করল এই আশায় যে, যদি কোনওদিন মনুষ্যহীন এই নির্জন দ্বীপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়! তার প্রথম কাজ হল, রোদ-জল-ঝড়-বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। গাছ কেটে কাঠ ও লতাপাতা দিয়ে প্রথমে একটা কুটির তৈরি করল। তার খাদ্য বলতে ছিল গাছের ফলমূল। জাহাজ থেকে দেওয়া বারুদ কিছুদিনের মধ্যে ফুরিয়ে গেলেও, তার মধ্যেই সে রপ্ত করে নিয়েছিল ছাগলদের পেছনে তাড়া করে তাদের নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখা। কিন্তু একটাই সমস্যা দেখা দিল, বড়-বড় ইঁদুরের উৎপাত। তাদের জব্দ করবার জন্য সেলকার্ক বিড়াল পুষল। বাঁচল ইঁদুরের উপদ্রব থেকে। জুয়ান ফার্নান্ডেজ দ্বীপ আবিষ্কার করার পর অনেক জাহাজ এখানে এসে নোঙর করত এই দ্বীপ দেখবার জন্য। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ পোষা বিড়াল ছেড়ে দিয়ে যেত এই দ্বীপে। তাই বিড়ালরা

রবিনসন ক্রুসো : শিল্পীর কল্পনায়

THE
LIFE
And Strange Surprizing
ADVENTURES
OF
ROBINSON CRUSOE,
Of YORK, MARINER:
Who lived eight and twenty Years all alone in an un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque;
Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself.
With an ACCOUNT how he was at last as strangely deliver'd by Pyrates.
Written by Himself.
The Third Edition.
LONDON: Printed for W. T[illegible]

রবিনসন ক্রুসো উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদ

বংশানুক্রমে এই দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল।
জুয়ান ফার্নান্ডেজ দ্বীপটা দক্ষিণ গোলার্ধে ছিল বলে এখানে শীত পড়ত জুন ও জুলাই মাসে। মাঝে-মাঝে এখানে তুষারপাত এবং শিলাবৃষ্টিও হত। শীতের প্রকোপ ছিল কম। তাই সেলকার্ককে সেরকম কোনও অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয়নি। তার পোশাক ছিল ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। গ্রীষ্মকালেও খুব একটা গরম ছিল না এখানে।
এইভাবেই তার দিন কেটে যেত।

ড্যানিয়েল ডিফো

তখনও জানে না এই নির্জন দ্বীপ থেকে কোনওদিন সে মুক্তি পাবে কি না ? সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করত বলে শরীর ও মন ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ। চার বছর চার মাস কেটে যাওয়ার পরও সে মানসিকভাবে তাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনি।

হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়ল একটা জাহাজ দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল সেলকার্ক। সেদিন ছিল ৩১ জানুয়ারি, ১৭০৯ সাল। 'ডিউক' নামের ব্রিটিশ জাহাজের বিস্মিত নাবিকরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, একজন লোক নির্জন দ্বীপ থেকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন উডস রজার্স। তিনি আদেশ দিলেন জাহাজ থামিয়ে তাকে তুলে নেওয়ার জন্য। দ্বীপে নোঙর করল জাহাজটি। অবসান হল দীর্ঘ চার বছর চার মাস এই নির্জন দ্বীপে সেলকার্কের নির্বাসিত জীবন।

ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে নিয়ে চলতে শুরু করল ডিউক। নাবিকরা তখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না তার এই অবিশ্বাস্য কাহিনী। ক্যাপ্টেন রজার্স সেলকার্কের কাছে তার এই দ্বীপান্তরের কাহিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন।
১৭১১ সালের অক্টোবর মাসে এই ডিউক জাহাজটি সেলকার্ককে নিয়ে ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছল। পরের বছর ক্যাপ্টেন রজার্স প্রকাশ করলেন 'ক্রুজিং ভয়েজ রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড'। যার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে সেলকার্কের নির্জন দ্বীপবাসের কাহিনী। এই ঘটনা পড়ে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। ১৭১৩ সালের ৩ ডিসেম্বর 'দ্য ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রাবন্ধিক রিচার্ড স্টিল আলেকজান্ডার সেলকার্কের সেই নির্জন দ্বীপ-জীবনের কথা বিস্তারিতভাবে
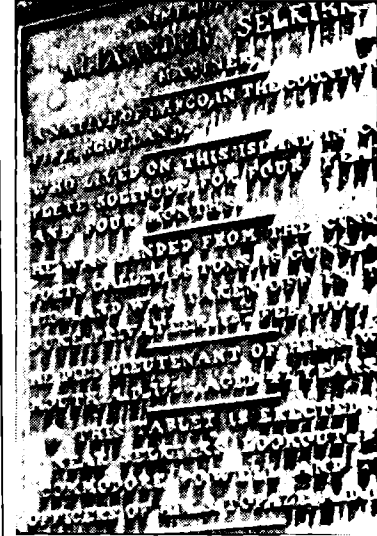
মাস এ তিয়েরা দ্বীপে সেলকার্কের স্মৃতিফলক

বর্ণনা করলেন। সাহিত্যিক ড্যানিয়েল ডিফো এই ঘটনা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগ্রহ করলেন সেলকার্কের নির্জন দ্বীপের কাহিনী।
সেলকার্কের ঘটনা নিয়েই ডিফো রচনা করলেন বিখ্যাত উপন্যাস 'রবিনসন ক্রুসো'। এই একটি উপন্যাসই অমর করে রেখেছে ড্যানিয়েল ডিফোকে। আলেকজান্ডার সেলকার্ক বেঁচে থাকতেই ১৭১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রবিনসন ক্রুসো।
ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর শুরু হয় সেলকার্কের অন্য জীবন।
নীল সমুদ্রের ডাকে
১৭২১ সালে একটি ব্রিটিশ জাহাজের উচ্চপদস্থ নাবিক হিসেবে সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে-বেড়াতে সেই জাহাজের মধ্যে সমুদ্রের মাঝখানেই ৪৬ বছর বয়সে মৃত্যু হয় সেলকার্কের। আলেকজান্ডার সেলকার্ক যে দ্বীপে নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছিল সেই দ্বীপের পাহাড়ের গায়ে ১৮৫৮ সালে তার গুণমুগ্ধ নাবিকরা একটা স্মৃতিফলক রেখে আসেন। এই ফলকটি তার সেই নির্জন কষ্টের দিনগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয়। পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসো উপন্যাস স্মরণীয় করে রেখেছে সেলকার্ককে।

ড্যানিয়েল ডিফোর একটি উপন্যাস

ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে ১৬৬০ সালে ইংরেজ সাহিত্যিক ড্যানিয়েল ডিফো জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৩৭ বছর বয়সে তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু হলেও ৫৯ বছর বয়সে লেখা 'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসটি তাঁকে অমর করে রেখেছে। ১৭১৯ সালে রবিনসন ক্রুসো দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডটি 'দ্য লাইফ অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ সারপ্রাইজিং অ্যাডভেঞ্চার্স অব রবিনসন ক্রুসো, অব ইয়র্ক, মেরিনার' এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি 'দ্য ফারদার অ্যাডভেঞ্চার্স অব রবিনসন ক্রুসো, বিইং দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড লাস্ট পার্ট অব হিজ লাইফ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই জনপ্রিয় উপন্যাসটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিতও হয়েছে।

দ্বীপের নাম মাস এ তিয়েরা

আলেকজান্ডার সেলকার্ক জনমানবহীন দ্বীপে দিন কাটালেও দ্বীপগুলিতে কিন্তু এখন গড়ে উঠেছে লোকবসতি। মাস এ তিয়েরা এবং মাস অফুয়েরা দ্বীপে এখন অল্প কিছু মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও সান্তা ক্লারা দ্বীপটি এখনও জনমানবহীন। মাস অফুয়েরা দ্বীপের চারপাশের জলে প্রচুর মাছ। তাই এই দ্বীপগুলির অধিবাসীদের মূল জীবিকা হল চিংড়িমাছের চাষ। ওই দ্বীপগুলিতে অবস্থিত একটা নৌ-বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে এখন মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপের অধিবাসীদের যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে জুয়ান ফার্নান্ডেজ দ্বীপমালাটি আগে স্পেনের অধিকারে থাকলেও এখন দক্ষিণ আমেরিকার চিলির অধিকারে। মাস এ তিয়েরা দ্বীপ, মাস অফুয়েরা দ্বীপ ও সান্তা ক্লারা নামে একটা ছোট দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে জুয়ান ফার্নান্ডেজ দ্বীপমালা। মাস এ তিয়েরার এখনকার নাম 'রবিনসন ক্রুসো দ্বীপ' এবং মাস অফুয়েরার এখনকার নাম 'আলেকজান্ডার সেলকার্ক দ্বীপ'। মাস এ তিয়েরা ও মাস অফুয়েরার আয়তন যথাক্রমে ৩৬ বর্গমাইল ও ৩৩ বর্গমাইল।

মামার বাড়ি যে অনেকটা দূর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মামা লিখেছেন, 'নতুন বাড়িতে
পাঁচটি পেয়ারা গাছ
আঙুর ফলেছে টুসটুসে থোকা থোকা
বাগানে ফুলের কত সাজগোজ
পুকুর-ভর্তি মাছ
মা-বাবাকে নিয়ে কবে আসবি রে খোকা ?'
মামিমার চিঠি আরও প্রাণহরা
সোনালি কালিতে লেখা
যেন ফিসফিস কথা বলা কানে কানে
'খোকনমণি রে, মন হু-হু করে
কবে হবে আর দেখা
আকাশে তাকিয়ে বসে থাকি এইখানে।'
মামাতো বোনটি সদ্য শিখেছে
বাংলায় লেখাপড়া
দু-তিনটে ভুল বানান লিখেছে মোটে
'খোকা, তুই এলে গল্প বলব
শোনাব নতুন ছড়া
এখানে সবাই গান শুনে জেগে ওঠে।
আমরা এখানে পাখির মতন
মাঝে-মাঝে উড়ে যাই
মধু খাই আর দুধ দিয়ে দাঁত মাজি
ডালে ডালে ঝোলে কেক-সন্দেশ
যখন যা-খুশি চাই
এসব শুনেও আসতে হবি না রাজি ?'
চিঠিগুলো পড়ে মন ভেঙে যায়
কী দারুণ সঙ্কট
মামার বাড়ি যে অনেকটা দূর পথ
মঙ্গলগ্রহে যাওয়া কি সহজ
রকেট ধর্মঘট
এখন উপায় নিজস্ব মনোরথ।
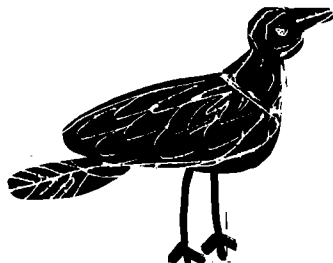
ছবি : সুব্রত চৌধুরী

দারিৎসু

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

গরমের ছুটিতে প্রতি বছরই মামার বাড়ি চলে আসে মুনা। মামার বাড়ি মানেই অপার এক আনন্দের উৎস। মামারা তার অদ্ভুত। কানুমামার সারাদিন ধরে শুধু ওষুধ খাওয়ার নেশা। অফিস ছাড়া যতক্ষণ বাড়ি আছেন হয় ট্যাবলেট, নয় কোনও ক্যাপসুল, নয়তো সিরাপ চলছেই। পাছে সন্ধেবেলা মাথা ধরে, সেজন্য সকালে উঠেই দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নিলেন। গত সপ্তাহে দুটো হাঁচি হয়েছিল, তার জন্য দিনে তিনবার সিরাপ। অফিসে টিফিনে ফিশফ্রাই কাটলেট সাঁটাবেন, পকেটে তাই মুঠো-মুঠো অম্বলের বড়ি। ভানুমামার নেশা 'পারফিউম'। কব্জিতে রজনীগন্ধা, বগলে জুঁই, ঘাড়ে ফরাসি বুনো ফুল, পিঠে ওডিকোলন, বুকে গোলাপ। ঘুরছেন, ফিরছেন, লোককে গন্ধ শোঁকাচ্ছেন। আর বেণুমামার নেশা হল মিষ্টি। ঘুম থেকে উঠে জিলিপি, অফিস বেরনোর আগে চমচম, টিফিনে শোনপাপড়ি, ফেরার সময়ে কমলাভোগ, সন্ধেবেলা রসমালাই, রাত্রে কেশর দেওয়া রাবড়ি। এর সঙ্গে ছুটির দিনে বোঁদে, মিহিদানা আছে, আর আছে বোম্বাই সাইজের ল্যাংচা। যাকে কিনা আদর করে বেণুমামা বলেন, 'ল্যাংচেশ্বর'। বছরের মধ্যে একশো বিরাশি দিন অবশ্য পেটের গণ্ডগোলে ভোগেন বেণুমামা।

কানুমামা, ভানুমামা, বেণুমামা ছাড়া আরও দুই মামা আছেন মুনার। টুটানমামা আর কুনালমামা। টুটানমামার বাড়ি বোড়ালে, তবে মাঝেমধ্যেই লেক প্লেসে অবস্থান করেন। হ্যা হ্যা করে হাসতে পারেন। গলা ফাটিয়ে গান করেন। বিদঘুটে সব গল্প বানাতে পারেন। মুনাদের পেছনে সারাক্ষণই লেগে আছেন তিনি। ঢাকুরিয়ার কুনালমামা হলেন আর-এক মজার খনি। মজা করে-করেই কত কী যে নতুন-নতুন গল্প শোনাতে পারেন! গালভর্তি দাড়ি, চুল সদাই উসকোখুসকো। কুনালমামার কাঁধের আধছেঁড়া ঝোলাটিতে যত হাসি, তত জ্ঞান। কুনালমামার সঙ্গে বেণুমামার মিষ্টি খাওয়ার জোর প্রতিযোগিতা লাগে মাঝে-মাঝে।

তবে এই মজাদার মামাদের জন্যই যে মুনার মামার বাড়ি চলে আসা, তা নয়। গরমের ছুটিতে সব মাসতুতো, মামাতো ভাইবোন একজোট হয়, এটাই বড় আকর্ষণ। সাঁতরাগাছির সুমিমাসির বাড়ি থেকে আসে খুকু আর পুপ্‌সি, রাসেল স্ট্রিটের দীপালিমাসির বাড়ি থেকে গুলুরাম, বেহালার রাধামাসির বাড়ি থেকে তিত্‌লি। এ ছাড়া কানুমামা আর বেণুমামার দুই মেয়ে কঙ্কা, টুকটুকি তো আছেই। জুলিমাসির ছেলে মুন্তুকুলি আর গোপালমামার ছেলে বুম্বাও আগে-আগে আসত, ইদানীং তাদের খুব বড়-বড় হাবভাব হয়েছে, ভাইবোনেদের সঙ্গে আড্ডা মারাটাকে তারা শিশুসুলভ কাজ বলে মনে করে।

এতে অবশ্য মুনাদের কিছু যায় আসে না। সাত ভাইবোন মিলেই লেক প্লেসের বাড়িটাকে পুরো ভুশণ্ডির মাঠ বানিয়ে দেয়। ছুটছে, নাচছে, লাফাচ্ছে, গাইছে, চুলোচুলি করছে, চিলচিৎকার জুড়ছে। মুনার দিদার একেবারে ত্রাহি-ত্রাহি দশা। কিন্তু কিচ্ছু বলার উপায় নেই। মুনার দাদুর কড়া হুকুম, গোটা বাড়ি যদি চুরমারও হয়ে যায়, তা হলেও ওদের কোনও কথা বলা চলবে না। গরমের ছুটিতে সপ্তরথী পুরোপুরি স্বাধীন।

সেদিন হঠাৎ ধুন্ধুমার লেগে গেল বাড়িতে। সকাল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল, বিকেল হতেই মুষলধারে নামল। বিকেলে যে দঙ্গল বেঁধে লেকে চরকি মারতে যাবে, তার উপায় নেই। সুতরাং ঝগড়া ছাড়া আর কাজ কী!

তা ঝগড়াটা লাগল কী নিয়ে? না, কোন গোয়েন্দা বড়?

মুনা এবার ক্লাস টেনে উঠেছে, সে-ই এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ, গম্ভীর মুখে সে বলল, "গোয়েন্দা হল গিয়ে ব্যোমকেশ। ওর মতো করে মানুষচরিত্র আর কেউ বুঝতে পারে না।"

খুকু মুনারই সমবয়সী প্রায়। মুনা যা বলবে খুকু তার উলটোটাই বলবে, এই রীতিই চলে আসছে ছেলেবেলা থেকে। খুকু বলল, "ছোঃ, গোয়েন্দা বলে যদি কেউ থাকে সে হল কিরীটি রায়। সে তোর ব্যোমকেশকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে আসবে। কী বলিস রে, তিত্‌লি?"

তিত্‌লির ক্লাস সেভেন। সে সদ্য 'মিল্ অ্যান্ড বুন' পড়া শুরু করেছে, নায়ক-নায়িকার দুঃখে সে কোনও বইই গোটাটা শেষ করতে পারে না, মাঝপথ থেকেই ফোঁস-ফোঁস দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর হাপুস নয়নে কাঁদে। ছলছল চোখে সে বলল, "আমার গোয়েন্দাদের ভাল লাগে না খুকুদি। ওরা ভীষণ রাগী আর কাঠখোট্টা হয়।"

পুপ্‌সির ক্লাস এইট। সে ইদানীং ক্যারাটে ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, নিয়ম করে প্রতিদিন ডাম্বেল ভাঁজে। তিত্‌লির মাথায় চটাস করে একটা চাঁটি মেরে বলল, "বেহালায় থেকে-থেকে তোর মনটাও কেমন বেহালা-বেহালা হয়ে গেছে। সারাক্ষণ পুঁই-পুঁই বাজে।"

তিত্‌লি ঝামরে উঠল, "অ্যাই, তুই আমার চুল নষ্ট করে দিলি কেন?"

"উঁহু, চুল নষ্ট! দেব একদিন ঘুমের সময়ে চুলে কাঁচি চালিয়ে, ঘুম থেকে উঠে দেখবি পুরো কদমছাঁট হয়ে গেছিস। তখন বেহালা ছেড়ে কদমতলায় গিয়ে থাকতে হবে।"

"ভাল হবে না বলছি পুপ্‌সিদিদি।"

"কী করবি তুই, অ্যাঁ? কী করবি?" বলতে-বলতে টি-শার্টের হাতা গোটাল পুপ্‌সি, "গুলি দেখেছিস আমার? দেব এমন এক রদ্দা..."

"আহ পুপ্‌সি, বিহেভ ইয়োরসেলফ।" মুনা ধমক লাগাল, "কাজের কথায় আয়। কে বড়? ব্যোমকেশ, না কিরীটি?"

"দুটোই ঢ্যাঁড়শ। শারীরচর্চা করে না, ওরা আবার গোয়েন্দা কী রে?" পুপ্‌সি হাত-পা ছুড়ে একটু কুংফু প্র্যাকটিস করে নিল, "গোয়েন্দা হল গিয়ে ফেলুদা। রিয়েল টাফ ম্যান। যেমন বুদ্ধি, তেমন

নার্ভ, তেমনই তাগত। ব্যোমকেশ আর কিরীটি দু'জনকে দু'হাতে ধরে পুকুরে চোবাতে পারে।"

কঙ্কা আর টুকটুকি, একজন ক্লাস টু, আর-একজন ক্লাস থ্রি। জগৎসংসারের কোনও বিষয়েই মতামত দিতে তারা দ্বিধা করে না। দু'জনে কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল, "কেন, আমাদের টিনটিন কী দোষ করল? চাঁদে, সমুদ্রের নীচে, কোথায় না যেতে পারে টিনটিন? আমরা বলছি টিনটিনই বড়। হ্যাঁ, টিনটিনই বড়।"

এর পরে আর ঝগড়া না লেগে উপায় থাকে?

পাঁচ-সাত মিনিট খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর দলের একমাত্র পুরুষসদস্য গুলুরাম হাল ধরতে বাধ্য হল। সেও এখন আর ছোটটি নেই, একা-একা স্কুলে যায়-আসে, দীপালিমাসি বাড়িতে না থাকলে নিজে হাতে কফি তৈরি করতে পারে, হঠাৎই অনেকটা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে তার দিদি, বোনেরা এখন বেশ সমীহই করে। আজকাল গুলুরাম টেনিসও খেলতে যায়। দু'হাতে ওভারহেড ম্যাশ করার ভঙ্গিতে সে থামাল সবাইকে, "দ্যাখো, এভাবে তো মীমাংসা হবে না। তবে তোমরা যদি মানো, আমি একটা সলিউশনের রাস্তা দিতে পারি।"

সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "কী? কী-ই?"

"প্ল্যানচেট। আমরা সবাই মিলে প্ল্যানচেটে কোনও নামকরা লোককে ডাকি, তিনিই আমাদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন।"

"প্ল্যানচেট মানে ভূত ডাকা!" খুকু অবিশ্বাসী চোখে তাকাল, "ভূত কি আমাদের সাঁতরাগাছির মশা যে, ডাকলেই চলে আসবে?"

"ডাকতে জানলে ঠিকই আসবে।" গুলুরাম তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে নাবালিকা দিদি, বোনদের দেখল, "আমি প্ল্যানচেটের প্রসেস জানি। মা শিখিয়ে দিয়েছেন। ঘরের আলো নিভিয়ে দাও, দরজা-জানলা বন্ধ করো, তারপর একটা তেপায়া টেবিলে মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে যাও। টেবিলে আঙুল ছুঁইয়ে একমনে যাকে ডাকতে চাও তার ধ্যান করতে থাকো। দেখি সে কেমন না এসে পারে! মা তো সেদিন পাবলো পিকাসোকে ডেকেছিলেন। আধঘণ্টা ধরে এসে পিকাসো সাহেব মাকে পেন্টিং শিখিয়ে গেলেন।"

এর পরে আর কথা চলে না। দীপালিমাসির আঁকার জগতে খুব নামডাক, তাঁর উদাহরণ ভাইঝি-বোনঝিদের কাছে বেদবাক্য।

তিন মিনিটের মধ্যে সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত। রান্নাঘর থেকে দিদার মিক্সি রাখার তেপায়া টেবিল এসে গেছে। দাদুর ঘর থেকে লোডশেডিংয়ের জন্য কিনে রাখা ইয়া-ইয়া মোমবাতি। দিদা হাঁ হাঁ করে পেছন-পেছন ছুটে এসেছিলেন, তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর বৃষ্টির জন্য জানলা তো বন্ধ ছিলই।

মোমবাতি জ্বলার পর আবার একপ্রস্থ লড়াই শুরু হওয়ার উপক্রম। কাকে ডাকা হবে তাই নিয়ে। এবারও গুলুরামই সমস্যার সমাধান করে দিল। বলল, "দ্যাখো, যে লাইনের ব্যাপার, সেই লাইনেরই কাউকে ডাকা ভাল। আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে শার্লক হোম্‌সই যোগ্যতম লোক।"

প্রস্তাবটা সকলেরই মনঃপূত হয়েছে। শার্লক হোম্‌সের মতো গোয়েন্দা যাকে সেরার শিরোপা দেবে, তাকে মেনে নিতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কঙ্কা, টুকটুকি অবশ্য শার্লক হোম্‌সের নাম শোনেনি, দিদিদের একমত হওয়া দেখে তারাও অগত্যা ভুরু কুঁচকে রাজি হয়ে গেল।

সপ্তরথী টেবিল ঘিরে ধ্যানস্থ। টেবিলে আঙুল ছুঁইয়ে। এক মিনিট যায়, পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, কারও আসার লক্ষণ নেই।

হাল ছেড়ে দিয়ে সকলে যখন গুলুরামের মুণ্ডুপাত করতে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল। দরজার বাইরে থেকে। ক্যাঁচ করে একটু যেন ফাঁক হল দরজাটা। মোমবাতির শিখাও কেঁপে উঠল যেন।

গুলুরাম কাঁপা-কাঁপা গলায় ফিসফিস করে উঠল, "এসে গেছে! এসে গেছে!"

দুম করে সকলেই বেশ নার্ভাস হয়ে গেছে। পুপ্‌সি ধরা-ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে?"

গুলুরাম বলল, "শার্লক হোম্‌স, আবার কে..."

তিত্‌লি কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, "আমরা এখন কী করব?"

"চোখ বুজে শার্লক হোম্‌সকে প্রশ্ন করব।"

কঙ্কা, টুকটুকি গা ঘেঁষে বসেছে খুকুদিদি, মুনাদিদির। ভয়ে-ভয়ে তারা বলল, "আমরা কিন্তু প্রশ্ন করতে পারব না। ভূত আমাদের ভাল লাগে না।"

"তোরা কেন করবি? আমি করছি?" খুকু গলা ঝেড়ে নিল, "আ-আ-আপনি কি এসেছেন?"

একটা ভাঙা-ভাঙা কর্কশ গলা শোনা গেল, "এসেছি।"

মুনা প্রশ্ন করল, "আপনি কি শার্লক হোম্‌স?"

গলাটা যেন হেসে উঠল, "তাতে কি সন্দেহ আছে?"

খুকুর গলায় তবু অবিশ্বাস, "আপনি তো সাহেবমানুষ, এত ভাল বাংলা জানলেন কী করে?"

গলাটার হাসির দমক বেড়ে গেল, "ভূতেদের ভাষা শিখতে হয় না খুকু। ভূত হলেই সব ভাষা জানা যায়। তুমি চাইনিজ শুনতে চাও? ইডিশ বলব? সোয়াহিলি? সাঁওতালি শুনবে, না সংস্কৃত?"

সকলে নিথর।

মুনা নীরবতা ভেঙেছে খানিক পরে, "না, না, ভাষা শুনে কাজ নেই। আপনিই যে শার্লক হোম্‌স তা মেনে নিলাম আমরা।"

খুকু বলল, "আপনি তো সর্বজ্ঞ, আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো।"

"বলো কী প্রশ্ন?"

"কে বড় গোয়েন্দা? কিরীটি রায়? ব্যোমকেশ? ফেলুদা? টিনটিন? কে?"

"এদের কেউই নয়।" গলাটা কেমন গম্ভীর শোনাল এবার। চুপও করে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, "গোয়েন্দাই বলো, কি সত্যদ্রষ্টাই বলো, সে দেখেছিলাম বটে একজনকেই। তার কাছে সবাই নস্যি। আমিও।"

"কে সে?"

"ঘনাদা। ঘনশ্যাম দাস দ্য গ্রেট। বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনে থাকত।" গলাটা চুক-চুক করে শব্দ করল, "গত সপ্তাহে দেখে এলাম মেসবাড়িটা ভেঙে মাল্টিস্টোরেড হচ্ছে। দেখে এত দুঃখ হল আমার। ঘনাদার স্মৃতিচিহ্নের কী দশা!"

উত্তরটা শুনে কেউই খুশি হয়নি, পুপ্‌সি খানিকটা তেড়িয়া ভঙ্গিতে বলল, "মুখে একটা কিছু বলে দিলে তো হবে না, আপনাকে তা প্রমাণ করতে হবে। তা ছাড়া ঘনাদা তো ঠিক গোয়েন্দাও নয়, খালি গুল ঝাড়ে..."

"ইইইহ্‌, ও-কথা বোলো না।" গলাটা যেন প্রায় শিউরে উঠেছে, "পুরাকালে জন্মালে ঘনাদাকে সবাই মুনি-ঋষি বলত। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের

সঙ্গে একসঙ্গে নাম করত। নেহাত এই কলিযুগে এসেছিলেন ... আমার এখন হাত-পা নেই বলে তাঁকে প্রণাম জানাতে পারছি না। জানো, তিনি একবার কীভাবে আমার একটা কেসের সমাধান করে দিয়েছিলেন ?"

এতক্ষণে কঙ্কার গলা চিঁ-চিঁ করে উঠল, "না বললে কী করে জানব ?"

"তা হলে তাড়াতাড়ি বলেই দিই গল্পটা। আমাকে আবার এর পর চিকমাগালুরে একটা প্ল্যানচেট অ্যাটেন্ড করতে যেতে হবে। ওরা তিনদিন আগে থেকে আমাকে বুক করে রেখেছে।"

টুকটুকি থরথর স্বরে বলল, "বলুন তবে।"

"তা শোনো। হয়েছে কী, সেবার লন্ডনে একটা বিচ্ছিরি কেসে ফেঁসে গেলাম। এক ভারতীয়র কেস। নাম তাঁর দীননাথ মজুমদার। ভদ্রলোক একদিন আমার কাছে কাঁপতে-কাঁপতে এসে হাজির। তাঁর বাড়িতে নাকি একটা বিচিত্র কাণ্ড ঘটছে।"

"কীরকম ? কীরকম ?" গুলুরাম প্রশ্ন ছুড়ল।

"দাঁড়াও, তার আগে দীননাথ সম্পর্কে কিছু বলে নিই। দীননাথ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিরিশ বছর ধরে লন্ডনে তাঁর বাস। বউ, ছেলে, নাতি-নাতনি নিয়ে লন্ডনের সাউদালে একটা তিনতলা বাড়িতে থাকতেন তিনি। একতলা, দোতলায় দুই ছেলে, দুই বউমা, নাতি-নাতনি, আর তিনতলায় তিনি আর তাঁর স্ত্রী। বাড়িতে দু'জন কাজের লোকও ছিল। এক বয়স্ক ভারতীয় বিধবা, আর একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে। সেও ভারতীয়। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত-টাত মেজে দোতলায় নেমে আসতেন দীননাথ আর তাঁর স্ত্রী। উঠতেন সেই রাতে। শুধু শোওয়ার জন্য। তা হয়েছে কী, একদিন ওইরকম রাত্রিবেলা শুতে গিয়ে দেখেন তাঁদের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।"

পুপ্‌সি প্রশ্ন করে উঠল, "ঘরে চোর ঢুকে বসে ছিল বুঝি ?"

"তা হলে আর রহস্য কোথায় ?" হোম্‌সসাহেব হাসছে খনখন, "দীননাথ ছেলেদের ডাকলেন। তারাও প্রথমে তোমার মতোই ভেবেছিল। খুব হুঙ্কার-ফুঙ্কার ছাড়ল বাইরে থেকে। কিচ্ছু হল না। দরজা যে বন্ধ, সেই বন্ধ। ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর দুই ভাই মরিয়া হয়ে দরজা টেনে একটু ফাঁক করল, দীননাথের স্ত্রী একটা খুন্তি গলিয়ে দরজার খিল খুললেন।"

তিত্‌লি বহুক্ষণ পর খিলখিল হেসে উঠেছে, "লন্ডনের দরজায় খিল ! আমি তো লন্ডনের অনেক গল্প পড়েছি, কোথাও তো খিলের কথা শুনিনি !"

"তুমি ঠিকই বলেছ। খিল থাকার কথা নয়। কিন্তু ছিল। কারণ দীননাথ পুরো দেশীয় কায়দায় বাড়িটা বানিয়েছিলেন। একদম তাঁর ডিহিভুরশুটের বাড়িটার মতো।" হোম্‌স একটু ভুতুড়ে দম নিয়ে কথা শুরু করল আবার, "তা দরজা তো খোলা হল। খুলেই সবার চক্ষু চড়কগাছ। জানলাগুলো সব ভেতর থেকে বন্ধ, বাথরুমের দরজাও ঘরের দিক থেকে ছিটকিনি টানা, কোথাও কোনও ফাঁকটি নেই। দরজাটা তা হলে বন্ধ করল কে ? খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। আলমারি, খাটের তলা, সে-আমলের প্রকাণ্ড সিন্দুক সব তন্নতন্ন করে দেখা হল। উৎসাহের চোটে ড্রয়ার, সুটকেস, টিনের তোরঙ্গ খুলে দেখাও বাদ রইল না। হা হতোস্মি ! একটা মাছির পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেল না। ভারী চিন্তিত হয়ে রাতটা কাটিয়ে দিল বাড়ির সবাই। দীননাথ তো বিছানাতেই বসে রইলেন সারারাত।

"পরের দিন আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেদিন দরজা খোলার পরে দীননাথের বড় ছেলের বউ একটা জিনিস দেখাল দীননাথকে। একটা মা-কালীর পট। ঘটনাটা ঘটার ঠিক আগের দিনই পটটা কিনেছিলেন দীননাথ। কোনও এক অ্যান্টিক ডিলারের কাছ থেকে।

"পটটা খুবই সাধারণ। তোমরা যাকে কালীঘাটের পট বলো, অনেকটা সেই ধরনের। বর্ধমানের মহারাজার কোনও ভাইপোর বাড়িতে ছিল পটটা। কীভাবে যেন তার বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায়। পাঁচ-সাত হাত ঘুরে আসে লন্ডনের ওই দোকানে।

"দীননাথের বড়বউমা বলল, 'ওই পটটারই বোধ হয় কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তোমাদের মা-কালী নাকি খুব জাগ্রত দেবী, তিনিই নাকি লীলা দেখাচ্ছেন !' দীননাথের স্ত্রীও বড়বউমার কথায় সায় দিলেন, 'হ্যাঁ,মা কালীই ভেতর থেকে বন্ধ করছেন দরজা।'"

পুপ্‌সি তুরন্ত প্রতিবাদ করল, "যাহ্, তাই হয় নাকি ! মা-কালীর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, লন্ডনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবেন !"

"দীননাথবাবুও নাকি তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, পুলিশে খবর দেওয়ার কথা। তা বাড়ির লোক কি সে-কথা শোনে ? এক-দু'দিনের মধ্যে তারাই ঘুরে-ঘুরে লন্ডনের ভারতীয় মহলে মা-কালীর মহিমা প্রচার করে এল। তারপর শুরু হয়ে গেল এলাহি কাণ্ড। হোম, যজ্ঞ, কীর্তন, পূজাপাঠ, কী নয় ! দলে-দলে লোক দীননাথের বাড়িতে আসছে তো আসছেই। দীননাথ একদম ভিড়ভাট্টা পছন্দ করেন না, কিন্তু তাঁর আর তখন উপায় নেই। অগত্যা লোকজনের ঠেলা সামলাতে ভোর হতেই ব্যবসার কাজে বেরিয়ে পড়েন, ফেরেন সেই মধ্যরাত্রে। কিন্তু মজার ব্যাপার, ওই ঘরে যখন ওইসব পুজোটুজো হচ্ছে, তখন কিন্তু আর দরজা বন্ধ হয় না। মা-কালীকে শত ডাকা সত্ত্বেও না।

"অলৌকিক কিছু না দেখলে কি আর লোকের ভাল লাগে ! ধীরে-ধীরে উৎসাহী লোকেদের ভিড় কমতে লাগল। যারা অতি-বিশ্বাসী তারা বলল, 'মা-কালী বোধ হয় একা থাকতে চান।' যারা স্রেফ কৌতূহলের বশে দেখতে এসেছিল, তারা ঠোঁট বেঁকিয়ে চলে গেল। দু-চারজন ঠারেঠোরে এ-কথাও বলতে ছাড়ল না যে, দীননাথবাবুই এসব গালগল্প প্রচার করেছেন। নিজে বিখ্যাত হওয়ার জন্য।

"এক সময়ে লোক আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। ও যিশু, সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই পুরনো খেল। আবার সেই দীননাথরা নীচে নামলেই ওপরের ঘরের দরজা বন্ধ।

"দীননাথের তখন ঘটনাটা অনেকখানি সয়ে এসেছে। তিনি আর লোক-জানাজানি হতে দিলেন না। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখলেন পটটাকে। কী কাণ্ড ! অমনই পাশের ঘরটা বন্ধ হতে শুরু করেছে। বাড়ির লোকজন দীননাথকে বলল, 'এবার মানবে তো এসব মা-কালীরই কাজ।' দীননাথ হেঁ-হেঁ করে তাদের কথায় মাথা নাড়লেন বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ভয়ে শুকিয়ে আমসি। কারণ তাঁর মন বলছে এ কোনও দুষ্ট লোকের কাজ। সেই রহস্য সমাধানের জন্যই তিনি ছুটে এলেন আমার কাছে। বাড়ির লোকরা অসন্তুষ্ট হবে বলে পুলিশকেও জানালেন না।

"তা আমি তো গেলাম। ওয়াট্‌সনকে সঙ্গে নিয়ে। জানো তো, তখন আমার যশ বেশ ভালই। প্রোফেসর মরিয়ারটির

সঙ্গে লড়াই জিতেছি, বাস্কারভিলের কুকুরগুলোর কেসটা সল্ভ করেছি, সেই বিখ্যাত নাচিয়ে মূর্তিগুলোরও রহস্য সমাধান করেছি। মনে-মনে তখন খুব অহঙ্কার। ভাবলাম এতসব জটিল কেস করেছি, আর এই সামান্য দরজা বন্ধ হওয়ার রহস্য ভেদ করতে পারব না?

"কিন্তু এই কেসটাতেই আমি কেমন যেন 'বুরবক' বনে গেলাম। সব্বাইকে জেরা করলাম। একসঙ্গে। আলাদা-আলাদা। ঘরটাও দেখলাম। সামান্যতম 'ক্লু' খুঁজে পেলাম না। উলটে একদিন আমি যখন দোতলায় লোকজনের এজাহার নিচ্ছি, তখনই তিনতলায় ঘর বন্ধ হয়ে গেল। লজ্জায় আমার মরে যাওয়ার জোগাড়!

"মনের দুঃখে ভাবলাম গোয়েন্দাগিরি ছেড়েই দেব। কাগজ দেখে-দেখে কয়েকটা স্কুলে মাস্টারির আবেদনপত্র পাঠাতে শুরু করেছি, তখনই ওয়াট্‌সন আমাকে পরামর্শটা দিল। আমার মনমরা ভাব দেখে বলল, 'হোম্‌স্, এটা যখন ভারতীয়দের কেস, তুমি কোনও ভারতীয় গোয়েন্দার সঙ্গে আলোচনা করে দ্যাখো না কেন! ওরা যদি তোমাকে ভাল কোনও টিপ্‌স দিতে পারে?'

"ওয়াট্সনের বুদ্ধির ওপর আমার কোনওদিনই তেমন ভরসা ছিল না। ওয়াট্সনের কথা আঁতে লাগলেও সেদিন কিন্তু মনে-মনে তারিফ না করেও পারলাম না। ওভাবে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী!

"খানিকটা দোনোমনো করে, খানিকটা কডলিভার অয়েল খাওয়া মুখে পাড়ি জমালাম কলকাতায়। তোমাদের ব্যোমকেশ, কিরীটি, ফেলু সবার বাড়ি গেছি, কেউ পরামর্শ দিতে রাজি নয়। সবারই এক রা, এখন খুব কেসের চাপ, লন্ডন যেতে পারব না। কত করে বললাম, আমি সব ছবির মতো বলে যাচ্ছি তোমাদের, সেই শুনে কিছু টিপ্‌স দাও। তো তাদের সেই এক কথা। 'উঁহু, নিজেরা না দেখে আমরা টিপ্‌স দিই না।'

"সেই সময়েই প্রথম ঘনাদার নাম শুনলাম। ব্যোমকেশের মুখে। তার বিচিত্র কীর্তিকাহিনী, অগাধ জ্ঞান, তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কথা শুনে খানিকটা আশা জাগল মনে। খুঁজে-খুঁজে চলেই গেলাম বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের টঙের ঘরে।

"ভাগ্য ভাল, ঘনাদা সেদিন একাই ঘরে ছিল। তবে সত্যি বলতে কী, তার চেহারা দেখে আমি একটু হতাশই হয়েছিলাম। ঘরদোর দেখেও। একটা তক্তপোশে আধশোওয়া হয়ে বসে আছে ঘনাদা। পরনে একটা লুঙ্গি আর পিরান। স্বাস্থ্যও যেন কেমন! বুড়োটে। গায়ে একটা সুতির র‍্যাপারও বোধ হয় জড়ানো ছিল।

"টেবিলে একটা ফাটা রেডিও ছিল ঘনাদার। আমি যখন যাই, মন দিয়ে কী একটা বাংলা গান শুনছিল ঘনাদা। আমাকে দেখে তার ভুরুটিও কাঁপল না।

"অমায়িক হেসে বলল, 'এসো হোম্‌স। তুমি নাকি বাড়ি বদলাচ্ছ?'

"আমি তো হাঁ। আমিই যে হোম্‌স ঘনাদা জানল কী করে? আর বাড়ি বদলানোর কথা? সে তো আমি ওয়াট্‌সন ছাড়া কারও সঙ্গে আলোচনা করিনি! তবে কি ঘনাদা অন্তর্যামী!

"ঘনাদা ভাবনাটাও টের পেয়ে গেল। বলল, 'ভাবছ, আমি তোমার এত কথা জানলাম কী করে, তাই তো? এ কিছুই না। এ হল 'সিম্পল ম্যাটার অব ইন্ডিয়ান যোগ'। মানুষের চিন্তাভাবনাগুলো বাতাসে তরঙ্গের মতো ভাসে, সেগুলো আমি যোগবলে সংগ্রহ করে রাখি। অমন হাঁ করে দেখছ কী? মুখ বন্ধ রাখো। আমার মেসের মশারা যে তোমার মুখে সেঁধিয়ে যাবে।'

"আমার বেশ মনে আছে তখন তোমাদের শীতকাল। ঠান্ডাও ছিল মোটামুটি, তবু তার মধ্যেই আমি ঘামতে শুরু করেছি। মনে-মনে পুলকও জাগছে একটু। এ কোন মহাপুরুষের সামনে এসে পড়েছি আমি!

"ঘনাদা বলল, 'বলো, তোমার সমস্যাটা শোনা যাক।'

"আমি তোতলাতে-তোতলাতে সবিস্তারে গোটা ঘটনাটাই বললাম ঘনাদাকে।

"ঘনাদা চোখ বুজে শুনল। তারপর নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজে ঝাড়া পনেরো মিনিট ভাবল কী যেন। হঠাৎই চিৎকার করে উঠেছে, 'দারিৎসু। টাইসেরিয়াস।'

"আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে?'

"'মানে পরে হবে। আগে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। যে দোকান থেকে পটটা কেনা হয়েছিল, সেটা তুমি ভিজিট করেছিলে?'

"'আজ্ঞে হ্যাঁ ঘনাদা।'

"'দোকানটা কি কোনও গ্রিকের?'

"'হ্যাঁঅ্যা! আপনি কী করে জানলেন?'

"'প্রশ্ন নয়, উত্তর দাও। দীননাথের বাড়িতে যে বাচ্চা ছেলেটি কাজ করে, সে কত দিন আগে দীননাথের বাড়িতে বহাল হয়েছে?'

"'আজ্ঞে, ঘটনাটা শুরু হওয়ার মাসখানেক আগে।'

"'যেদিন পটটা কেনা হয়, সেদিন দীননাথের সঙ্গে বাচ্চাটাও দোকানে গিয়েছিল?'

"আমি ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছি। কোনওক্রমে ঘাড় নাড়তে পারছি শুধু।

"'যা ভেবেছি তাই। দারিৎসু। টাইসেরিয়াস। বুঝলে কিছু?'

"হাত কচলাতে-কচলাতে বললাম, 'আপনি না বললে বুঝি তার সাধ্য কী!'

"ঘনাদার বুড়োটে চেহারা পলকে টান টান। স্বর গমগম করছে, 'আরে মূর্খ, টাইসেরিয়াস হল এক জবরদস্ত ডাকাতের নাম। শুনেই বুঝতে পারছ, নামটা গ্রিক? ওই লোকটাই লন্ডনে অ্যান্টিকের দোকান ফেঁদেছে।'

"মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'আর দারিৎসু কে?'

"ঘনাদা আমার টুপিটা খুলে আদর করে চুল ঘেঁটে দিল, 'দুর বোকা, দারিৎসু লোক হতে যাবে কেন? দারিৎসু হল একটা জটিল সুতোর ফাঁসের নাম। আমিই ফাঁসটা তৈরি করা টাইসেরিয়াসকে শিখিয়ে ছিলাম। টন সুতোর ওই ফাঁস খিলের ডগায় আলতো করে লাগিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে আস্তে-আস্তে টানলে খিল ওপর দিকে উঠতে থাকে। খিল খাপের মুখে এলে একটা ঝটকা দিতে হয়। সঙ্গে-সঙ্গে খাপে বসে যায় খিলটা, সুতোটাও খুলে বেরিয়ে আসে বাইরে। যেমন সহজ, তেমনই দুর্বোধ।'

"রহস্যটা যেন একটু-একটু স্পষ্ট হচ্ছিল। বললাম, 'আপনি বলতে চান বাচ্চাটাই করছে কাজটা?'

"'আলবত। ওকে তো টাইসেরিয়াসই পাঠিয়েছে। ফাঁসটা শিখিয়ে।'

"'এতে টাইসেরিয়াসের লাভ?'

"'আছে। দীননাথ যে ভয় পাচ্ছে, সেটাই ঘটতে পারে যে-কোনওদিন। তিনতলাতেই দীননাথের আয়রন চেস্ট, গয়না, শেয়ারের কাগজ... ভয় তো পাওয়ারই কথা। এরকম কিছুদিন চালানোর পর সত্যিই একদিন তিনতলাটাকে সাবাড় করে দেবে টাইসেরিয়াস। ও বড় নিষ্ঠুর। জিনিসপত্র হাতানোর সময়ে দীননাথকেও মেরে ফেলবে। শুধু তাই নয়, তার

কয়েকদিন আগে বাচ্চাটাও উধাও হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। সবাই ভাববে এ সবই হচ্ছে মা-কালীর অলৌকিক লীলা। অথবা ভৌতিক কিছু। টাইসেরিয়াসের টিকিটাও ছুঁতে পারবে না কেউ। তুমি এক্ষুনি দেশে ফিরে যাও হোম্‌স। প্রাণে বাঁচাও দীননাথকে।'

"আমি তো পুরো ভারতীয় কায়দায় প্রণাম করে ফেলেছি ঘনাদাকে, 'আপনি আমার সম্মান রাখলেন ঘনাদা।'

"ঘনাদা একটুও খুশি নয়। বসে-বসে আঙুল কামড়াচ্ছে, 'ইস, কেন যে আমি টাইসেরিয়াসকে ফাঁস তৈরিটা শিখিয়েছিলাম!'"

এতক্ষণ ধরে গল্পটা শুনতে-শুনতে বোজা চোখ কপালে ওঠার উপক্রম হয়েছিল গুলুরামের। নিশ্বাস বন্ধ করে সে বলল, "সত্যিই তো, ঘনাদা কেন টাইসেরিয়াসকে শেখাল ফাঁসটা?"

শার্লক হোম্‌সের ছায়ামূর্তি অন্ধকারে দুলছে। মোমের শিখা কাঁপছে অল্প-অল্প। বোধ হয় ভৌতিক নিশ্বাস ফেলছে হোম্‌স। গোটা দু-তিন নিশ্বাস ফেলে বলল, "প্রশ্নটা যে আমার মনেও জাগেনি তা নয়। জেগেছিল বইকী!"

"জিজ্ঞেস করেননি?"

"করেছিলাম।"

"ঘনাদা কী বলল?"

"সে আর-এক কাহিনী। ঘনাদা টাইসেরিয়াসকে কোথায় ফাঁসটা শিখিয়ে ছিল শুনবে? ট্রাসি গুম্ফায়।"

"সেটা আবার কোথায়?"

"তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে আড়াইশো-তিনশো মাইল দূরে। ঘনাদা সেখানে গিয়েছিল চেঙ্গিস খাঁর গুপ্তধনের খোঁজে। জানো তো, চেঙ্গিস খাঁ তিব্বতে মারা গিয়েছিল? কিন্তু তার দেহ সমাধিস্থ করা হয় মঙ্গোলিয়ায়। উলানবাটোরের কাছে কোনও এক অজ্ঞাত জায়গায়। তিব্বত থেকে যখন চেঙ্গিস খাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন নাকি সঙ্গে প্রচুর হিরে-জহরতও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেইসব ধনরত্নের আজ পর্যন্ত কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। তা ঘনাদা কোথায় যেন শুনেছিল ট্রাসি গুম্ফায় ওই গুপ্তধনের কিছু তথ্য রাখা আছে। সেখানে গিয়ে টাইসেরিয়াসের সঙ্গে পরিচয়। টাইসেরিয়াস দারুণ মজার-মজার গল্প বলতে পারত, ঘনাদার সঙ্গে খুব সহজেই তাই তার বন্ধুত্ব জমে গেল। গুম্ফায় থাকতে-থাকতেই ঘনাদাই একদিন গুপ্তধনের কথা বলে ফেলেছিল টাইসেরিয়াসকে। ব্যস, অমনই টাইসেরিয়াস ঘনাদার সঙ্গে একদম জোঁকের মতো সেঁটে গেল। টাইসেরিয়াসও ওই ধান্দাতেই গিয়েছিল কিনা।"

"তার সঙ্গে ফাঁসের কী সম্পর্ক?" গুলুরাম বেশ অসহিষ্ণু এবার।

"সাধে কি আর শিখিয়েছিল ঘনাদা! রোজ গুম্ফায় যায় ঘনাদা, পুথিপত্র ঘাঁটে, তাই দেখে হঠাৎ একদিন এক বৌদ্ধ লামার সন্দেহ হল। সঙ্গে-সঙ্গে দু'জনকেই সে আটকে ফেলেছে একটা ঘরে। দু'দিন নিরম্বু উপোসের পর ঘনাদা অধৈর্য হয়ে পড়ল। পাশে টাইসেরিয়াসও খিদেয় কুঁই কুঁই করছে। তখনই ঘনাদা ওই ফাঁসটা তৈরি করে। ঘরের ভেতর থেকে বাইরের খিল খোলার জন্য। শুধু তাই নয়, পাছে লামার সন্দেহ হয় সেজন্য বাইরে এসে একই ভাবে খিল তুলে ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয় ঘরটা। আর তখনই টাইসেরিয়াসও শিখে যায় ফাঁসটা। আর পরদিনই ঘনাদার ব্যাগ ঘেঁটে পুরনো পুঁথিপত্র থেকে ঘনাদার তৈরি করা গুপ্তধনের ম্যাপটা হাতিয়ে নিয়ে পালায় টাইসেরিয়াস। লোকটা এত ভয়ঙ্কর যে, যে-লামা তাকে আটকেছিল, তাকেও যাওয়ার আগে খুন করে রেখে যায়।"

পুপ্‌সি উসখুস করে উঠল, "টাইসেরিয়াস গুপ্তধন পেয়েছিল?"

"তা হলে কি আর লন্ডনে গিয়ে দোকান করে? ঘনাদা তো ট্রাসি গুম্ফা ঘেঁটে শুধু আধখানা ম্যাপ তৈরি করেছিল। বাকি আধখানা ম্যাপ তো তৈরি করার কথা সেই উলানবাটোরে। অর্ধেক ম্যাপ হারিয়ে যাওয়ার পর ঘনাদার মন ভেঙে গেল। আর বাকি ম্যাপ তৈরিই করল না।"

খুকু আর চুপ থাকতে পারল না, "তা মিস্টার হোম্‌স, লন্ডনে গিয়ে আপনি টাইসেরিয়াসকে ধরতে পেরেছিলেন?"

"টাইসেরিয়াস কি কম ধূর্ত! যেই শুনেছে আমি কলকাতায় গেছি, অমনই সে লন্ডনের দোকান তুলে দিয়ে হাওয়া। বাচ্চা ছেলেটাকে তিনবার কান রগড়ানি দিতেই সত্যি কথাটা স্বীকার করে ফেলল। আমাকেও আর স্কুল মাস্টারিতে যেতে হল না।"

"কিন্তু ঘনাদাই বা দারিৎসু শিখল কার কাছ থেকে?" খুকুর প্রশ্নের বুঝি শেষ নেই।

"সে আর-এক লম্বা কাহিনী। সেটা বলতে গেলে আমার আজ আর চিকমাগালুরে যাওয়া হবে না। আমার লন্ডনের বিগবেনে কখন দুপুর দুটো বেজে গেছে। আর ওখানকার দুটো মানে তোমাদের এখানে সন্ধে সাড়ে সাতটা।" শার্লক হোম্‌সের ছায়া দুলছে, "আমি এখন তা হলে চলি, অ্যাঁ?"

পুপ্‌সি তড়িঘড়ি বলে উঠল, "তা হলে আমাদের দারিৎসুর গল্পটা শোনা হবে না?"

"ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই হবে। তোমরা আমাকে বুক করে রাখো। সামনের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার পর থেকে ফ্রি আছি। যদি চাও তো সেদিনই...। প্ল্যানচেট করতে হবে না, আমি এমনই এসে যাব। শুধু ঘরের লাইটটা একটু নিভিয়ে রেখো। কী, আসব?"

তিত্‌লি বিরস মুখে বলল, "কী দরকার! প্রত্যেক উইকে বাড়িতে ভূত এলে বাড়ির বদনাম হয়ে যাবে।"

"তুই চুপ কর তো!" অন্ধকারেই পুপ্‌সি চাঁটি মারল তিতলিকে, "না, না, মিস্টার হোম্‌স, আপনি আসুন। আমাদের সন্ধেটা ভালই কাটবে।"

ঝুপ করে মোমবাতি নিভে গেল। একটু ফাঁক হয়ে থাকা দরজা বন্ধ হয়ে গেল ক্যাঁচ করে।

কঙ্কা, টুকটুকি সজোরে চেপে আছে দিদিদের হাত। সপ্তরথী নির্বাক, নিস্পন্দ। সাহস করে যেন শ্বাসও নিতে পারছে না কেউ।

দড়াম করে খুলে গেল বন্ধ দরজা। পুরোপুরি। আলো জ্বলে উঠেছে ঘরে।

আলোকিত ঘরে দু' হাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে আছেন টুটানমামা। দাঁত বের করে হাসছেন। টুটানমামার আপাদমস্তক কালো বর্ষাতিতে মোড়া।

"কী রে, তোরা সব এমন ভেবলু মুখে ঘর অন্ধকার করে বসে আছিস কেন?"

"জানো তো, এক্ষুনি না..." কঙ্কা, টুকটুকি শার্লক হোম্‌সের কথা বলতে যাচ্ছিল, মুনা তাদের মুখ চেপে ধরেছে। সন্দিগ্ধ চোখে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

"এই তো ঢুকছি।" টুটানমামার হাসি আরও রহস্যময়। চোখ নাচছে, "কেন বল তো?"

সাত ভাই-বোন নিমেষে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিল। বুঝি-বা কিছু ইশারাও হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে।

থাক, শার্লক হোম্‌স তো বলেইছে, আবার বৃহস্পতিবার আসবে। তখনই বোঝা যাবে রহস্যটা।

ছবি : দেবাশিস দেব

সেরজেইয়ের স্বীকারোক্তি

রূপক সাহা

সংবাদ সংস্থার খবরটা খুব মজার। পনেরো মাস পর দিয়েগো মারাদোনা ফের ফুটবল মাঠে ফিরছেন। আর্জেন্টিনার রেফারিরা তাই আতঙ্কিত। বদমেজাজি মারাদোনাকে সামলে কী ভাবে তাঁরা ম্যাচ খেলাবেন, তা জানতে অনেকেই দৌড়চ্ছেন মনোবিদের কাছে।

অফিসে বসে রয়টারের এই খবরটায় চোখ বোলাচ্ছিলাম, এমন সময় ফোন। বাড়ি থেকে রিমিতা বলল, "বাবা, তোমার একটা চিঠি এসেছে কুরিয়ারে। লোকটা বলছে, তোমার হাতে ছাড়া আর কাউকে দেবে না। লোকটাকে কি কাল আসতে বলব?"

"কোত্থেকে এসেছে, জিজ্ঞেস কর তো।"

"করেছি। আর্জেন্টিনা থেকে। কে এক সেরগেই লেভেনস্কি চিঠিটা পাঠিয়েছে।"

"সেরগেই নয়, সেরজেই লেভেনস্কি।" নাম শুনেই লাফিয়ে উঠলাম। বুয়েনস আইরেসে একটা কাগজ আছে, 'ক্লারিন'। তার রিপোর্টার। সেই সেরজেই, এতদিন পরে হঠাৎ! আমেরিকায় বিশ্বকাপ ফুটবল চলার সময় আমার সঙ্গে আলাপ এই ছেলেটার। শেষ দেখা, স্পষ্ট মনে আছে চুরানব্বইয়ের উনত্রিশে জুন, মারাদোনা ডোপ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার দিন দুয়েক পর। ওর সঙ্গে মাঝে, চেষ্টা

করেও আর যোগাযোগ করতে পারিনি। জানুয়ারি মাসের গোড়ায় সেরজেই অবশ্য একটা কার্ড পাঠিয়েছিল নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে।

মেয়েকে বললাম, "কুরিয়ারের লোকটাকে ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসতে বল। আমি বাড়িতে যাচ্ছি।"

চট করে হাতের কাজগুলো সেরে নিলাম। অফিস থেকে বেহালার বাড়িতে পৌঁছতে গাড়িতে লাগে মিনিট পঁচিশ। এখন অফিস আওয়ার্স। জ্যাম থাকলে আরও মিনিটদশেক। হিসেব করেই বেরিয়ে পড়লাম। মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। কী লিখেছে সেরজেই চিঠিতে? নিশ্চয়ই খুব জরুরি।

এই সেরজেইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বস্টন শহরে। ওখানকার ফক্সবোরো স্টেডিয়াম থেকে সেদিন যাচ্ছি আর্জেন্টিনা টিমের প্র্যাকটিস দেখতে। টিমটা ছিল স্টেডিয়াম থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, ব্যবসন কলেজের গেস্ট হাউসে। আধ ঘণ্টার ড্রাইভ। বাসেই সেরজেইকে প্রথম দেখি। আমারই বয়সী, অসম্ভব ফরসা। চোখে গোল চশমা, রিমলেস। চুলটা একেবারে সোনালি। দেখে মনে হয়েছিল সুইডিশ।

আলাপ হতেই সেরজেই বলেছিল, "তোমার নামটা খুব বড়। ভা-ট-টা-চা-র-জি। আমার অসুবিধে হচ্ছে। লোকে আমাকে ডাকে, সেরজি। তোমাকে আমি ডাকব, চারজি।"

শুনে আমি হেসে উঠেছিলাম, "ঠিক আছে, ওই নামেই ডেকো। আমার কোনও আপত্তি নেই।"

অল্প সময়ের মধ্যেই সেদিন টের পেলাম, সেরজেই খুব সাদাসিধে ছেলে। মাতৃভাষা স্প্যানিশ। কিন্তু ইংরেজি আর ইতালিয়ানও গড়গড় করে বলতে পারে। ফলে চট করে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। গল্প করার ফাঁকে হঠাৎ ও বলল, "চারজি, তুমি লাল রঙের জামা পরে এসেছ কেন? এই রংটা একদম সহ্য করতে পারে না মারাদোনা। প্র্যাকটিসের পর তুমি কিন্তু ওর সামনে যেয়ো না।"

অবাক হয়ে বললাম, "কেন?"

"ও মনে করে, লাল রংটা অপয়া।"

"অদ্ভুত ব্যাপার তো!"

"হ্যাঁ। কোনও ছবিতে কখনও দেখেছ, মারাদোনা লাল জামা বা টি-শার্ট পরেছে?"

"ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"জানো, আমাদের ওখানে 'এল গ্রাফিকো' বলে একটা কাগজ আছে। তার এক রিপোর্টারকে মারাদোনা বন্দুক দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল। কেন জানো, লাল টি-শার্ট পরে ওর বাড়িতে ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিল বলে। কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছ।"

সেরজেই গড়গড় করে কথা বলে যাচ্ছিল। আর আমি হাঁ করে সেসব গিলছিলাম। মারাদোনা সম্পর্কে সব কিছুই তখন খবর। সেরজেই তো জানে না, দিয়েগো মারাদোনা আমাদের দেশে কতটা জনপ্রিয়।

আর্জেন্টিনা টিম নিয়ে সেদিন অনেক নতুন খবর দিয়েছিল সেরজেই। কোচ আলফিও বাসিলের সঙ্গে মারাদোনার সম্পর্ক এমন খারাপ যে, দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপ নেই। এ নিয়ে চরম অশান্তি আর্জেন্টিনা টিমে। প্লেয়ারদের মধ্যেও

দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে মারাদোনা, ক্যানিজিয়া, রুজেরিরা। অন্যদিকে, বাসিলের অনুগত নতুন মুখরা।

সেরজেই বলেছিল, "ওর্তেগা বলে নতুন একজন প্লেয়ার উঠেছে আমাদের দেশে। আমাদের ধারণা, ছেলেটা ভবিষ্যতে মারাদোনার চেয়েও বড় প্লেয়ার হবে। তাকে নিয়ে একপ্রস্থ অশান্তি হয়েছে আজ সকালে।"

"কীরকম ?"

"ওর্তেগার গুরু হলেন পাসারেল্লা। নাম নিশ্চয়ই জানো, আটাত্তরে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ান টিমের সেই ক্যাপ্টেন। আজই সকালে পাসারেল্লা বুয়েনস আইরেস থেকে ফোনে কথা বলেছেন কোচ বাসিলের সঙ্গে। ইমিডিয়েটলি, ওর্তেগাকে সরিয়ে দিতে হবে মারাদোনার পাশের ঘরটা থেকে।"

"কেন ?"

"পাসারেল্লার সঙ্গে মারাদোনার সম্পর্ক খুব খারাপ। ওঁর মতে, মারাদোনার আশপাশে যে থাকবে, সে-ই নষ্ট হয়ে যাবে। বাসিলে পড়েছেন মুশকিলে। একদিকে মারাদোনাকে যেমন চটাতে পারছেন না। অন্যদিকে পাসারেল্লাকেও।"

এসব শুনে উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিলাম। এত বড় টিম, তা সত্ত্বেও এত ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে এত অশান্তি ? এসব তো ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানে হয়।

প্র্যাকটিসে সত্যিই সেদিন ভয়ে মারাদোনার সামনে গেলাম না। একটু দূর থেকে সব দেখছি। মারাদোনা যেখানেই যাচ্ছেন, তাঁর চারপাশে ভিড়। টিভি, রেডিও আর খবরের কাগজের সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরছেন মারাদোনাকে। ঘণ্টাদুয়েক পর ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে সেরজেই বিরক্তি সহকারে আমাকে বলল, "ধুর, সব জায়গায় দিয়েগো একই কথা বলছে। জানি, নতুন কিছু বলবে না। আমাদের দেশে চ্যানেল হান্ড্রেড বলে একটা টিভি কোম্পানি আছে। বিশ্বকাপে আসার আগে মারাদোনা ওদের সঙ্গে চুক্তি করে এসেছে। যা কিছু এক্সক্লুসিভ সব ওদের দেবে।"

বাড়ির দিকে আসতে-আসতে সেরজেইয়ের কথা ভাবছি। রেস কোর্সের বাঁকে ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়িটা থেমে পড়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "সার, চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে যাব, না, বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাব ভবানী ভবন হয়ে ?"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "যেদিক দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে, চলো।"

সত্যি বলতে কী, আমার আর তর সইছিল না। সেরজেইয়ের চিঠি, মনে পুরনো স্মৃতি উসকে দিয়েছে। কতদিন আগেরই বা কথা ! মাত্র ষোলো মাস। তবু, বিশ্বকাপের সবকিছু স্পষ্ট মনে আছে। সেরজেইয়ের কথা ভুলব কী করে ? দেশ-বিদেশে বহু টুর্নামেন্ট 'কভার' করতে গিয়েছি। কিন্তু সেরজেইয়ের মতো বন্ধুত্ব আর কারও সঙ্গে কখনও হয়নি।

আর্জেন্টিনা টিমের প্র্যাকটিস দেখে ফেরার পথে সেরজেই জিজ্ঞেস করেছিল, "চারজি, বস্টনে তুমি কোন হোটেলে উঠেছ ?"

নামটা বলতেই ও খুশিতে ঝকমক করে উঠল, "আরে, আমিও তো ওই হোটেলেই আছি।"

পরদিন সেরজেই নিজেই প্রস্তাব দিল, আলাদা-আলাদা ঘরে থেকে কোনও লাভ নেই। বরং দু'জনে মিলে একটা ডাবল বেড রুম নেওয়া যাক। তা হলে কিছু ডলার দু'জনেরই বাঁচবে। কী ভেবে আমিও রাজি হয়ে গেলাম।

দু-তিনদিনের মধ্যেই বুঝে গেলাম, ছেলেটা অদ্ভুত মিশুকে। প্রেস সেন্টারের প্রায় সব রিপোর্টার ওকে চেনে। সারাদিন টো-টো করে ঘুরত। আর ভাল কোনও খবর পেলে আমাকে এনে দিত। আরও অদ্ভুত, ওকে কোনও দিন রিপোর্ট পাঠাতে দেখতাম না। দিনে তিন-চারটে করে রিপোর্ট পাঠাতে হত আমাকে। প্রাণ বেরিয়ে যেত খবর জোগাড় করতে। কিন্তু সেরজেইয়ের মধ্যে এসব টেনশন নেই। কোনওদিন যদি প্রশ্ন করতাম, "অফিসে রিপোর্ট পাঠিয়েছ ?" ও বলত, "হ্যাঁ, পাঠিয়েছি, টেলিফোনে।"

রোজই ভোর ছ'টা-সাড়ে ছ'টা নাগাদ ওর একটা টেলিফোন আসত বুয়েনস আইরেস থেকে। ঘুম ভেঙে গেলে কোনও-কোনও সময় আমিও 'রিসিভ' করতাম সেই ফোন। চাপা স্বরে সেরজেই কথা বলত অনেকক্ষণ ধরে। বার্সেলোনা ওলিম্পিকে যাওয়ার আগে অল্পস্বল্প স্প্যানিশ শিখেছিলাম। সেরজেইকে তা জানাইনি। ফোনে ওর কথাবার্তা শুনে বুঝতেও পারতাম। বেশিরভাগ মারাদোনা প্রসঙ্গে। কে রোজ ফোন করে, জানতে চাওয়ায় ও একদিন বলল, "রেডিও কোম্পানির জন্য খবর পাঠাচ্ছি। ফালতু রোজগার। মন্দ কী ?"

দু'জনে একসঙ্গে থাকতাম, ডলার বাঁচানোর জন্য। কিন্তু সেরজেইকে দেখে একদমই মনে হত না, ও হিসেবি। দেদার খরচ করত। লাঞ্চ বা ডিনার একসঙ্গে করলে আমাকে খরচ করতে দিত না। মাঝেমধ্যে ঘরোয়া কথাও বলত। বিয়ে-থা করেনি। থাকে বুয়েনস আইরেসেই এক বান্ধবীকে নিয়ে। মেয়েটা ইতালিয়ান, নাম ক্লারা। কী নিয়ে যেন রিসার্চ করে। সেরজেই বলেছিল, বছরখানেক ওরা একসঙ্গে আছে। ভাল লাগলে তবেই বিয়ে। আমাদের দেশে এই সিস্টেম নেই শুনে, ও খুব অবাক হয়েছিল।

মনে আছে, বস্টনে সেই সময় সকালের দিকে রোজ বৃষ্টি হচ্ছিল। আর দুপুরের দিকে চড়া রোদ্দুর। ঠাণ্ডা-গরমে আমার সর্দিকাশি হয়ে গেল। যাতে বেশি অসুস্থ না হয়ে পড়ি, সেজন্য সেদিনই হোটেলের ড্রাগ স্টোর থেকে একটা 'কাফ সিরাপ' কিনে আনলাম। তা দেখে সেরজেই ঠাট্টা করে বলল, "কী ব্যাপার চারজি, এদিকে তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে, ওদিকে আমাদের ক্যাম্পে মারাদোনারও ?"

আমিও পালটা বললাম, "মহান মানুষেরা যেমন সবসময় এক চিন্তা করেন, তেমন একই ধরনের অসুখে পড়েন।"

কথাটা শুনে সেরজেই হাসল। সিরাপের বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, "আমাদের, মানে সাংবাদিকদের জন্য যদি ডোপ পরীক্ষা থাকত, তা হলে তুমি নির্ঘাত ধরা পড়তে।"

বললাম, "কেন ?"

"এই দ্যাখো, এই সিরাপে 'এফিড্রিন' আছে। খেলোয়াড়দের যা খাওয়া বারণ। এই সিরাপ কোনও প্লেয়ার খেলে ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়বে।"

"তুমি কী করে জানলে ?"

"ফিফার মেডিক্যাল কমিশনের বইয়ে লেখা আছে।"

শুনে আমি একটু অবাকই হলাম। পরদিন ভোরে হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আধো ঘুম, আধো জাগরণের মাঝে শুনলাম চাপা স্বরে সেরজেই কথা বলছে। হঠাৎ দু-একটা কথা কানে যেতেই চোখ খুললাম। "হ্যাঁ, হ্যাঁ ... অপারেশন লাস্ট স্টেজ। ড্যানিয়েল সেরিনি আজ সকালে আসবে। কথা হয়ে গেছে। ... চিন্তা

করার কিছু নেই। ডোপ রিপোর্ট আমরাই প্রথম পাব। ... জুরিখে একজনকে পাঠিয়ে দেবেন ... চ্যানেল হান্ড্রেড শেষ ... আর মাত্র দু'দিন ... তার পরদিনই আমি দেশে ফিরব। ... জানি না। সেরিনির প্রবলেম ... ও কে ... গ্রাসিয়াস ... ।"

কথাগুলোর মানে বুঝতে পারছিলাম না। সেরজেই বলল, দু-তিনদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু কেন ? বিশ্বকাপ শেষ হতে যে দিন কুড়ি বাকি ! উলটো দিকে মুখ করে শুয়ে রইলাম। ওকে বুঝতে দিলাম না কথাগুলো আমি শুনেছি।

আশ্চর্য, সেদিন সকাল থেকেই দেখলাম, সেরজেই খুব টেনশনে। সকালে হোটেলের ঘরে বসে রিপোর্ট লিখছি, হঠাৎ একটা টেলিফোন এল। ফোনে দু-একটা কথা বলে ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। আধঘণ্টা পর ফ্যাক্স করার জন্য আমি নীচে নামতেই দেখি, কফি শপে সেরজেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে কথা বলছে। ফ্যাক্স রুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সেরজেই নেই। ভদ্রলোক একা বসে। ফের ওপরে উঠে এলাম।

বস্টনে পরদিনই ছিল আর্জেন্টিনা-নাইজিরিয়া ম্যাচ। ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পর সেরজেই বলল, "আমাদের পরের ম্যাচ ডালাসে। তুমি যাবে ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

"আমিও যাব। তবে বোধ হয় ওই বুলগারিয়া ম্যাচের পরদিনই আমাকে দেশে ফিরতে হবে।"

"কেন ?"

"ক্লারা, আমার বান্ধবী, অসুস্থ।"

"এই খবরটা কবে পেলে ?"

"এই একটু আগে।"

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। সেরজেই আমাকে সত্যি কথা বলল না।

বস্টন থেকে দু'জনের 'ফ্লাইট' ছিল আলাদা দিনে। ডালাসে আমি পৌঁছলাম ও যাওয়ার একদিন পর। প্রেস সেন্টারে পৌঁছেই শুনি, বিস্ফোরক খবর। মারাদোনা ডোপ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন। প্রেস সেন্টারে খোঁজাখুঁজি করলাম, কোথাও সেরজেইকে দেখতে পেলাম না। গেল কোথায় ছেলেটা ? স্টেডিয়ামের কাছে একটা মোটেলে একসঙ্গে থাকার কথা। ঠিক ছিল, প্রেস সেন্টারে দেখা হবে। কাজটাজ সেরে তারপর চলে যাব মোটেলে। তা, সেরজেইয়ের পাত্তাই নেই। মনটা খুব দমে গেল।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ হোটেলের খোঁজে প্রেস সেন্টার থেকে বেরোব। এমন সময় দেখি, হন্তদন্ত হয়ে সেরজেই ঢুকছে। আমাকে দেখেই বলল, "ডোপ স্ক্যান্ডাল তো শুনেছ। আর্জেন্টিনা যে হোটেলে আছে, এতক্ষণ সেখানে ছিলাম। তোমার জন্য অনেক খবর আছে। আগে চলো, হোটেলে যাই।"

ওকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সেদিন রাতে আমরা দু'জন কেউই ঘুমোতে পারিনি। রাত জেগে আমি রিপোর্ট লিখেছি। আর সেরজেই একের পর এক টেলিফোন করেছে ওর দেশে। সেরজেই বারবার সকলকে বলেছে, এটা আর্জেন্টিনা টিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ইউরোপের কোনও একটা দেশ, মারাদোনাকে ফাঁদে ফেলেছে। ওরা চায় না আর্জেন্টিনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হোক। ওর মুখেই তখন ডাঃ পেড্রোর কথা শুনি। আর্জেন্টিনা টিমের ডাক্তার। আর শুনি, ড্যানিয়েল সেরিনির নাম, যিনি মারাদোনার নিজস্ব ডাক্তার। সেরজেই একবার কাকে যেন বলল, দুই ডাক্তারের মধ্যে বনিবনা নেই। এঁদের ঝগড়ার শিকার হতে পারেন মারাদোনা।

ষোলো মাস আগেকার ঘটনায় ডুবে ছিলাম। টের পাইনি, কখন বেহালায় পৌঁছে গেছি। চমক ভাঙল ড্রাইভারের কথায়, "সার, আপনার বাড়িতে এসে গেছি।" গাড়ি থেকে নেমে, বাড়িতে ঢুকেই রিমিতা বলল, "এই নাও তোমার চিঠি। কুরিয়ারের লোকটা দিয়ে গেছে। ঘুরে আসতে পারবে না, তাই দিয়ে গেল।"

চিঠিটা হাতে নিলাম। নীল রঙের এয়ার মেল। বেশ মোটা। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে ফেললাম। স্প্যানিশে সম্বোধন করে লেখা, "কেরিদো চারজি, এই চিঠিটা পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ, তাই না ? তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল চুরানব্বইয়ের আঠাশে জুন। তুমি ডালাস থেকে ডেট্রয়েটে যাচ্ছিলে। আমি মিয়ামি। তোমার প্লেনটা আগে উড়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে আমার মনটা সেদিন সত্যিই খারাপ হয়ে গেছিল।

"জীবনে কোনও ভারতীয়র সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তুমিই প্রথম। একজনকে দেখেই ভারতীয়দের সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা আমার হয়েছে। দেশে ফিরে অনেককেই তোমার গল্প করেছি। যাক, সে-কথা। ডালাস এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে তুমি একটা অনুরোধ আমাকে করেছিলে। বলেছিলে মাঝেমধ্যে চিঠি দিতে। আর্জেন্টিনা ফুটবল বা মারাদোনা নিয়ে কোনও খবর হলে তোমাকে ফ্যাক্স করে দিতে। সত্যি বলতে কী, এতদিন চিঠি লিখতে ইচ্ছে করেনি। তোমরা, রিপোর্টাররা খবর ছাড়া জীবনে আর কিছু ভাবতেও পারো না। আমেরিকায় কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে আমার এই ধারণা হয়েছে।

"তোমরা রিপোর্টাররা, কথাটা লেখার জন্য খুব অবাক হচ্ছ, বুঝতে পারছি। তুমি আমাকে ক্লারিন পত্রিকার রিপোর্টার বলে জানতে। আসলে আমি রিপোর্টার নই। বুয়েনস আইরেসে চ্যানেল সিক্স বলে একটি টিভি কোম্পানি আছে। তারা আমাকে ভাড়া করেছিল। কেন জানো ? দিয়োগো আর্মান্দো মারাদোনাকে শেষ করে দিতে। জানি, এই পর্যন্ত পড়ে বিস্ময়ে তুমি ফেটে পড়ছ। উপায় নেই, সত্যি কথাটা আমাকে বলতেই হবে। যা লিখতে যাচ্ছি, তা আমার বান্ধবী ক্লারা ছাড়া আর কেউ জানে না। জানার পর ক্লারা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি এখন একা। এই চিঠিটা তোমাকে লেখা আমার প্রথম চিঠি। এবং শেষ চিঠিও। আর কোনওদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

"চারজি, ফুটবল খেলাটা আর পাঁচজন আর্জেন্টিনীয়র মতো আমিও ভালবাসি। ফুটবল আমাদের দেশে ধর্মের মতো। কিন্তু পেশাগত কারণে আমাকে ফুটবলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়েছে। সেই ঘটনাটাই তোমাকে খুলে বলছি। আমাদের এখানে ইলেকট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ টিভি কোম্পানিগুলোর মধ্যে আকচা-আকচি তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তোমাকে একবার চ্যানেল হান্ড্রেড সম্পর্কে একটা কথা বলেছিলাম। ওটা সেই কোম্পানি, যারা মারাদোনার সঙ্গে এক্সক্লুসিভ চুক্তি করেছিল। ওরা প্রচুর টাকা দিয়েছিল মারাদোনাকে। অত টাকা দিতে না পারায় অন্য কোম্পানিগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটে যায়।

"বিশ্বকাপের প্রথম দিকে চ্যানেল হান্ড্রেডের ভিউয়ারশিপ ভীষণ বেড়ে যায়। চ্যানেল সিক্স কর্তাদের মাথায় হাত। ওদের প্রোগ্রাম তখন কেউ দেখছিল না। বিজ্ঞাপনও কমে যাচ্ছিল হুহু করে। কোম্পানিটা বাঁচাবার জন্য

ওরা মরিয়া। সেই সময় আমার ডাক পড়ে। চ্যানেল সিক্সের কর্তারা আমাকে ডেকে বলেন, এখনই আমেরিকায় চলে যাও। যেমন করেই হোক, মারাদোনাকে নিয়ে বড় একটা গণ্ডগোল পাকাও। এমন কিছু, যাতে চ্যানেল হান্ড্রেড মার খায়। আসলে এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি বিশ্বকাপে যাই।

"এখানে কেমন করে আমি প্রেস কার্ড জোগাড় করেছি, সে-কথা আর বলার দরকার নেই। আমরা পেশাদার। কেমনভাবে কী করতে হয়, তা জানি। তোমার সঙ্গে আমার আলাপ ফক্সবোরোতে। সেদিন রাতে হোটেলে গল্প করার সময়, তুমি একটা কথা বলেছিলে। সেটাই আমার মনে ধরে যায়। তুমি বলেছিলে গ্রিসের বিরুদ্ধে মারাদোনা এমন খেলেছে যেন ডোপ করে নেমেছে।

"ব্যস, সেই মুহূর্ত থেকে ডোপ কথাটা আমার মাথায় ঢুকে যায়। মারাদোনাকে কোনও স্ক্যান্ডালে জড়াতে হলে ডোপিংই সবচেয়ে উপযুক্ত। সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যাবে। সেই খবর আমার ক্লায়েন্ট—চ্যানেল সিক্স প্রথম প্রচার করবে। চ্যানেল হান্ড্রেডের রমরমা শূন্যে এসে দাঁড়াবে। পরদিন ভোরে যখন চ্যানেল সিক্সের কর্তারা আমাকে ফোন করলেন, তখন আইডিয়াটা জানিয়ে দিলাম। ওঁরা বললেন, গো অ্যাহেড।

"আর্জেন্টিনা টিমের একটা লোককে আমি খুব ভালভাবে চিতাম। সে হল ড্যানিয়েল সেরিনি। ওর আর আমার বান্ধবী একই স্কুলে পড়াশোনা করেছিল। সেরিনি একটা জিমনাশিয়াম চালায় বুয়েনস আইরেসে। সেখানে আমি মাঝে-মাঝে যেতাম। বস্টনে গিয়ে আমি তাই সেরিনির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও টিমের সঙ্গে ব্যবসন কলেজের গেস্ট হাউসে থাকত। ফলে প্রথম কয়েকদিন ওর পাত্তা লাগাতে পারিনি। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হল, তুমি আর আমি যেদিন প্র্যাকটিস দেখতে গিয়েছিলাম। ভিড়ের মাঝে কথা হল, পরদিন দুপুরে পরিচিত একটা ডিস্কো ক্লাবে আমার সঙ্গে ও দেখা করবে। সেরিনি লোকটার ইমেজ ভাল না। জানতাম, টাকা আর সম্মানের জন্য লোকটা সবকিছু করতে পারে। ভীষণ একগুঁয়ে। আমার পরিকল্পনা শুনে যদি একবার বেঁকে বসে, তা হলে কাজ হাসিল করা যাবে না। ডিস্কো ক্লাবে নানাভাবে ওকে টোপ দিতে লাগলাম। আর আর্জেন্টিনা টিমের সব গোপন খবর জোগাড় করলাম।

"চারজি, মারাদোনাকে ডোপ কেলেঙ্কারিতে জড়াতে তুমিও আমাকে কিছুটা সাহায্য করেছ। অবশ্য না জেনেই। মনে আছে, একদিন সর্দি কাশির জন্য তুমি একটা কাফ সিরাপ নিয়ে এসেছিলে ? সেই সিরাপটা দেখার পরই আমার মাথায় আইডিয়াটা খেলে যায়। কেননা সেদিন সকালেই সেরিনি আমাকে বলেছিল, মারাদোনারও সর্দিকাশি হয়েছে। সিরাপের মধ্যে এফিড্রিন ছিল। ওই নামের সিরাপ আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। তবে এফিড্রিন ছাড়া। মাথাটা দ্রুত কাজ করেছিল। তোমরা সবাই জানো, ওই কাফ সিরাপটা মারাদোনাকে এনে দেন ড্যানিয়েল সেরিনি। আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়। **বস্টনের** সেই ড্রাগ স্টোর থেকে সিরাপটা যে কিনে এনেছিল, তার নাম সেরজেই লেভেনস্কি। হ্যাঁ, এই অধম। তোমার বন্ধু লেভেনস্কি।

"তোমার মনে আছে কিনা জানি না, সেদিন বস্টন শহরে সকালের দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। ব্যবসন কলেজ থেকে গাড়ি চালিয়ে সেরিনি কিছু ভিটামিন ট্যাবলেট আর সিরাপ কিনতে এসেছিল বস্টনে। তার আগে আমাদের হোটেলে আসে। রিসেপশন থেকে ফোন করে ও আমাকে নীচে ডেকে নেয়। আমরা দু'জন যখন কফি শপে বসে কথা বলছি, সেই সময় তুমিও নীচে নেমেছিলে। বোধ হয় তোমার কয়েকটা রিপোর্ট ফ্যাক্স করার জন্য। তুমি আমাকে দেখে ফ্যালো, তা আমি চাইনি। সেরিনিকে আড়াল করতেই চেয়েছিলাম। আমি তখন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ট্যাবলেট আর সিরাপ কিনে আনি। ফেরার সময় বোতলের লেবেলটা পালটে দিয়েছিলাম। ফলে সেরিনির পক্ষে জানা সম্ভবও ছিল না, সিরাপে এফিড্রিন ছিল কি না। তুমি ভাবছ, লেবেলটা বদলালাম কী করে ! আমাদের পক্ষে এই কাজটা খুব কঠিন না।

"নাইজিরিয়া ম্যাচের দিন মারাদোনাকে ডোপ পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। তার আগে, আমি সেরিনির কাছেই নিশ্চিত হয়ে যাই, মারাদোনা সিরাপটা খেয়েছে। তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, মারাদোনাকে যে ডোপ পরীক্ষার জন্য ডাকা হবেই—এটা আমি কী করে জানলাম। জানার তো দরকার নেই। ডাঃ পেড্রোকে খবরটা আমিই দিয়েছিলাম। ওই ম্যাচটায় ফিফার মেডিকেল কমিশনের যে তিনজন ডোপ কন্ট্রোলের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের একজন ডাঃ পেড্রো। ওঁর হিসেব চুকনো বাকি ছিল মারাদোনা আর সেরিনির সঙ্গে। ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিন ডোপ পরীক্ষার জন্য উনি মারাদোনাকে ডেকে নেন।

"খুব খারাপ লেগেছিল সেরিনির জন্য। দোষ না করেও বেচারি একটা কলঙ্কের ভাগিদার হয়ে রইল। খবরটা শুনে ও আমাকে ফোন করেছিল। সামনে পেলে হয়তো আমাকে ছিঁড়েই ফেলত। ওর রাগ দেখে আমি পরামর্শ দিই, 'আমেরিকার কোনও শহরে গিয়ে আত্মগোপন করো। দেশে ফিরো না। লোকে তা হলে তোমাকে পিটিয়ে মারবে।' সেদিনই সেরিনি পালিয়ে যায়। একমাত্র আমি জানি, কোথায় ও লুকিয়ে রয়েছে। বেচারা এখনও দেশে ফিরতে পারেনি।

"চারজি, অবাক হচ্ছ নিশ্চয়ই। সত্যি কথা বলতে আর আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি খুব খারাপ কাজ করেছি। ফুটবলকে হত্যা করেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো না। জানো, চ্যানেল সিক্স ওই কাজটা করার জন্য আমাকে পারিশ্রমিক দিয়েছিল এক মিলিয়ন ডলার। তোমাদের মুদ্রায় প্রায় সওয়া তিন কোটি টাকা। এখনও ব্যাঙ্কে আছে। সেই টাকা আমি ফুটবলের উন্নতির জন্য খরচ করতে চাই। চাই আর-একজন মারাদোনা তৈরি করতে।

"তুমি একদিন বলেছিলে, তোমাদের দেশে ফুটবল নাকি এগোতে পারছে না, অর্থের অভাবে। ট্যালেন্টের অভাব তোমাদের দেশে নেই। আমি পুরো টাকাটা তোমাদের ফুটবল ফেডারেশনের নামে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখো, ফুটবলের উন্নতির জন্যই যেন টাকাটা খরচ হয়। অন্তত একজন মারাদোনা যেন বেরিয়ে আসে। গত দেড়টা বছর অনুতাপে দগ্ধ হয়েছি। এতটা খারাপ কাজ করা আমার উচিত হয়নি। বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। মারাদোনার প্রত্যাবর্তন আর দেখা হবে না। তোমার হাতে এই চিঠি যখন পৌঁছবে, তখন আমি আর এই পৃথিবীতে নেই। শুভেচ্ছা নিয়ো। —সালুদাস, সেরজেই।"

চিঠিটা পড়ে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

ছবি : অনুপ রায়

শামিয়ানায় ঢাকা রহস্যময় অরণ্য

উত্তর আমেরিকার ক্রান্তীয় অরণ্যের বিশাল 'রেড উড' আর 'ডগলাস ফার'-এর রহস্যময় হাতছানি মুগ্ধ করেছিল বিল ডেনিসন, স্টিভ সিলেট-এর মতো উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের। নাম-না-জানা নানা প্রজাতির গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে সেই গভীর অরণ্যে দেখা মেলে শিংওলা প্যাঁচা ও সামুদ্রিক পাখি মুরলেটের।

জয় সেনগুপ্ত

ফোটো : বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

সূর্য তখন আকাশের ঠিক মাঝখানে। অরণ্যের ভেতরের এই জায়গাটা কিন্তু প্রায় অন্ধকার বললেই চলে। কারণ গাছপালা ঘন হয়ে এসেছে চারপাশে। আর বিরাট আকৃতির লম্বা-লম্বা গাছের বড়-বড় পাতা একটার সঙ্গে আর-একটা এমনভাবে মিলেমিশে আছে, মনে হয় যেন পুরো অরণ্যের ওপর একটা শামিয়ানা পেতে দেওয়া হয়েছে।
যে-কোনও অরণ্যের সৌন্দর্যের কিন্তু একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। ভূপৃষ্ঠের সবকিছুর চেয়ে আলাদা, একেবারে অন্যরকম। উত্তর আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই অরণ্যের অসাধারণ সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্টিভ সিলেট।
প্রকৃতিবিজ্ঞানী, পতঙ্গবিজ্ঞানী আর উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কাছে এই অরণ্যের আকর্ষণ বরাবরই খুব তীব্র। এখানে এসে হাওয়ায় কান পাতেন তাঁরা। জীবজন্তুদের কোলাহলে রোমাঞ্চিত হন, পাখপাখালির সুরেলা আওয়াজে আনন্দে আপ্লুত হন, গাছগাছড়ার ফিসফিসানি শোনার চেষ্টা করেন। গবেষণা করেন নতুন-নতুন কীটপতঙ্গ, বিভিন্ন জীবজন্তু আর নানা ধরনের গাছপালা নিয়ে।
স্টিভ সিলেটের ২৬ বছর আগে এখানে এসেছিলেন ওরিগন স্টেট ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদবিজ্ঞানী বিল ডেনিসন। ডেনিসন অবাক হয়েছিলেন কিছু গাছ দেখে। গাছগুলো বিশাল, প্রায় ৩৫০ ফুট লম্বা। মেঘ ছুঁয়ে যাওয়া গাছগুলোর কোনওটার নাম 'ডগলাস ফার', কোনওটা 'জায়ান্ট সেকিয়োয়াস', আবার কোনওটাকে বলা হয় 'রেড উড'। এগুলোর বয়স এত বেশি যে, এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রাচীনতম গাছ বলা যায় এদের। এক-একটার বয়স হাজার বছরেরও বেশি। এই দৈত্যাকার গাছগুলোর ওপরে যে প্রতিনিয়ত কী ঘটে চলেছে তা কেউ জানে না। কারণ জায়গাটা বলতে গেলে অনাবিষ্কৃত। কারণ গাছগুলোর একেবারে ওপরে কেউ যায়নি। যাওয়া সহজও নয়।
গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা শুরু হয় মাটি থেকে ১০০ ফুট ওপরে। সোজা গুঁড়ি বেয়ে ১০০ ফুট ওপরে উঠবে কে? ওই সময় এইসব দৈত্যাকার গাছের ওপরে ঠিক কী ঘটে চলেছে তা জানবার দুটো উপায় ছিল। ওই গাছের ওপর থেকে যা কিছু নীচে পড়ছে সেইসব জঞ্জাল নিয়ে পরীক্ষা চালানো। অথবা গাছটাকে একেবারে গোড়া থেকে কেটে ফেলা। তারপর মাটিতে আছড়ে পড়া গাছটি থেকে যাবতীয় তথ্য জোগাড় করা। একদিন ডেনিসনের এক ছাত্র দড়ি দিয়ে গাছে ওঠার একটা সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এর ফলে এইসব গাছের অনেক উঁচুতে ওঠা সম্ভব হল বিজ্ঞানীদের পক্ষে, আর জানা গেল ক্রান্তীয় অরণ্যের এই 'শামিয়ানা' সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য।
এই শামিয়ানায় লতাগুল্ম, চারাগাছ, শ্যাওলার মতো একধরনের ছত্রাক আর নানারকম পোকামাকড় ভিড় করে থাকে। কোনও গাছে লোবারিয়া নামের ছত্রাক শাখাপ্রশাখা থেকে ঝুলছে, আবার কোথাও-বা ব্রায়োরিয়া ছত্রাক ঢেকে রেখেছে ডালপালা।
ডেনিসনের বক্তব্য, শ্যাওলার মতো এইসব ছত্রাক কুয়াশা, বৃষ্টি এবং বাতাসে ধূলিকণার মতো ভেসে যাওয়া শুকনো পদার্থ থেকে খাদ্য শুষে নিয়ে গাছপালার পুষ্টি জোগায়।
এই অরণ্যের প্রাণিজগৎও বিচিত্র। এখানে আছে ভালুক, শিম্পাঞ্জি, দন্তহীন প্রাণী স্লথ, নিশাচর প্রাণী ওপোসাম— আরও কত কী। ওপোসাম স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা মাংসাশী, আবার ফলমূলও খায়। এ ছাড়া আছে গায়ে বিচিত্র ছোপওলা একরকম প্যাঁচা। যার নাম 'স্পটেড আউল'। বছর পাঁচেক আগে বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, প্যাঁচার এই প্রজাতিটি লুপ্ত হতে চলেছে। গবেষকরা এখন জানতে পেরেছেন, জঙ্গলের এই শামিয়ানার ওপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভরশীল এইসব প্যাঁচা। বিরাট-বিরাট শাখাপ্রশাখা, এই প্যাঁচাদের বড় ভরসা। কারণ এদের শত্রু হল বাজপাখি আর একরকম শিংওলা প্যাঁচা। এই শাখাপ্রশাখা ভেদ করে তারা ঢুকতে পারে না ভেতরে। আর মাটি থেকে ১০০ ফুট ওপরে কোনও ডালপালা নেই। সুতরাং নীচের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিষ্কার দেখতে পায় এই ছোপওলা প্যাঁচারা। এদের প্রিয় খাদ্য উড়ন্ত কাঠবেড়ালি। এই প্রাণীটিকে দেখতে পেলেই এরা প্রচণ্ড গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। নিজেদের সুবিধেমতো পুরো অরণ্যই ঘুরে বেড়ায় ছোপওলা প্যাঁচারা। আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এরা নিজেদের জায়গা বদল করে নেয়। যেমন, খুব ঠাণ্ডা লাগলে এরা চলে যায় এমন জায়গায়, যেখানে হয়তো রোদ ঢুকতে পারে খুব বেশি করে। আবার যখন গরম লাগে, তখন চলে যায় একেবারে ভেতরদিকে ছায়াঘেরা স্যাঁতসেতে কোনও একটা জায়গায়।
সামুদ্রিক পাখি মুরলেট-এর গতিবিধি দীর্ঘদিন বিজ্ঞানীদের কাছে অজানাই ছিল। এই সামুদ্রিক পাখিরা মাছ শিকার করে সমুদ্র থেকে। তারপর সেই মাছ নিয়ে যায় তাদের শাবকদের জন্য। মাটি থেকে দেখা যায় গাছপালার ওপরদিকে মুরলেট উড়ে যায় প্রচণ্ড গতিতে (ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল বেগে)। কিন্তু এরা বাসা বাঁধে কোথায়? এই তথ্যটাই এতদিন অজানা ছিল গবেষকদের কাছে। হঠাৎ একদিন এক বিজ্ঞানী দেখতে পান, একটা ডগলাস ফারের শাখায় মাদুরের মতো মোটা শ্যাওলার মধ্যে শুয়ে আছে একটা শিশু মুরলেট। জানা গেল এদের গোপন আস্তানার খবর।

ওরিগন স্টেট ইউনিভার্সিটির কিম নেলসন মুরলেট নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, "নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই মুরলেটদের এই গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়।"
বিরাট-বিরাট আকাশছোঁয়া গাছে দড়ি

ঘুমকাতুরে স্লথ

জীবজন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে আলসে প্রাণী বোধ হয় স্লথ। এজেন্টটা বর্গের এই প্রাণীর শরীরের দৈর্ঘ্য ২০ থেকে ২৮ ইঞ্চি, এ ছাড়া লেজের দৈর্ঘ্য দু' ইঞ্চি। বলতে গেলে সারাজীবন গাছের ডালে ঝুলতে-ঝুলতে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় এরা। স্লথ নিরামিষাশী। প্রধান খাদ্য গাছের পাতা। এরা এত কুঁড়ে যে, খাদ্যের সন্ধানে এক ডাল থেকে আর-এক ডালে যেতে-যেতে মাঝপথেই হয়তো একটু ঘুমিয়ে নেয়। স্লথ নিশাচর প্রাণী। দল বেঁধে নয়, এরা একা থাকতেই পছন্দ করে। এরকমও দেখা গেছে যে, স্লথ একা-একা দিনের পর দিন এক জায়গায় একই ভাবে ঝুলছে আর তার লোমশ গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে।

প্রকৃতি এখানে এখনও আদিম আর রহস্যময় *ফোটো : অরিন্দম দেবনাথ*

বেয়ে ওঠা খুব কষ্টকর। তাই নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন গবেষকরা। সেটা হল, ক্রেনের ব্যবহার। ক্রেন থেকে গাছের একেবারে ওপরে খুব সহজেই নামতে পারেন গবেষকরা। কিছুদিন আগে জীববিজ্ঞানী জেরি ফ্রাঙ্কলিন এক মিলিয়ন ডলার পেয়েছেন সরকারের কাছ থেকে। এই টাকা থেকে তৈরি হবে ২৬০ ফুট একটা ক্রেন। এই ক্রেন অরণ্যের তিন একর জায়গা জুড়ে বিজ্ঞানীদের ঘোরাবে। শামিয়ানা-ঘেরা জঙ্গলে গবেষণা চালাবার জন্য প্রকল্পটি এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রকল্প।

কিন্তু এখন সারা পৃথিবীতেই গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। শেষ হয়ে যাচ্ছে সেইসব প্রাণী, যাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে বিশেষ-বিশেষ জঙ্গলের বিশেষ-বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। আমেরিকার উত্তর-পূর্ব বনাঞ্চলের ৮৫ শতাংশ গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে। এ হিসেব ১৯৯০ সালের। পরে অরণ্যের যেসব অঞ্চলে ছোপওলা প্যাঁচা থাকে, সেইসব জায়গায় জঙ্গল কাটা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল আদালত। সরকারকে তিরস্কার করেছিলেন জনৈক বিচারক। তিনি বলেছিলেন, যে সমস্ত গাছ ছোপওলা প্যাঁচাদের বাসস্থান, সেগুলি সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা সরকার করেন না কেন? এর পর ১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন ১০০ জন বিজ্ঞানীর একটি দলকে ডাকেন এই সমস্যা সমাধানের জন্য। এর পর আদালত থেকে প্যাসিফিক লাম্বার কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল এই বলে যে, ১৩৭ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া রেড উড আর ডগলাস ফার গাছ তারা কাটতে পারবে না, কারণ মুরলেট বাস করে এখানে।

বিল ডেনিসনের বয়স আজ ৬৭। ২৫ বছর আগে শামিয়ানা-ঘেরা জঙ্গলে যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সূচনা তিনি করেছিলেন, তা এখনও শেষ হয়নি। এখনও অরণ্যের সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করে চলেছেন। দড়ি বেয়ে গাছে উঠে ছত্রাক আর পোকামাকড় খুঁজতে তাঁর ভাল লাগে এখনও।

সারা পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলের বনভূমির চরিত্র মোটামুটি একই রকম। পোকামাকড়, গাছপালা, নানারকম প্রাণী, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত জগৎ।

বড়গল্প
গিনি রহস্য
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
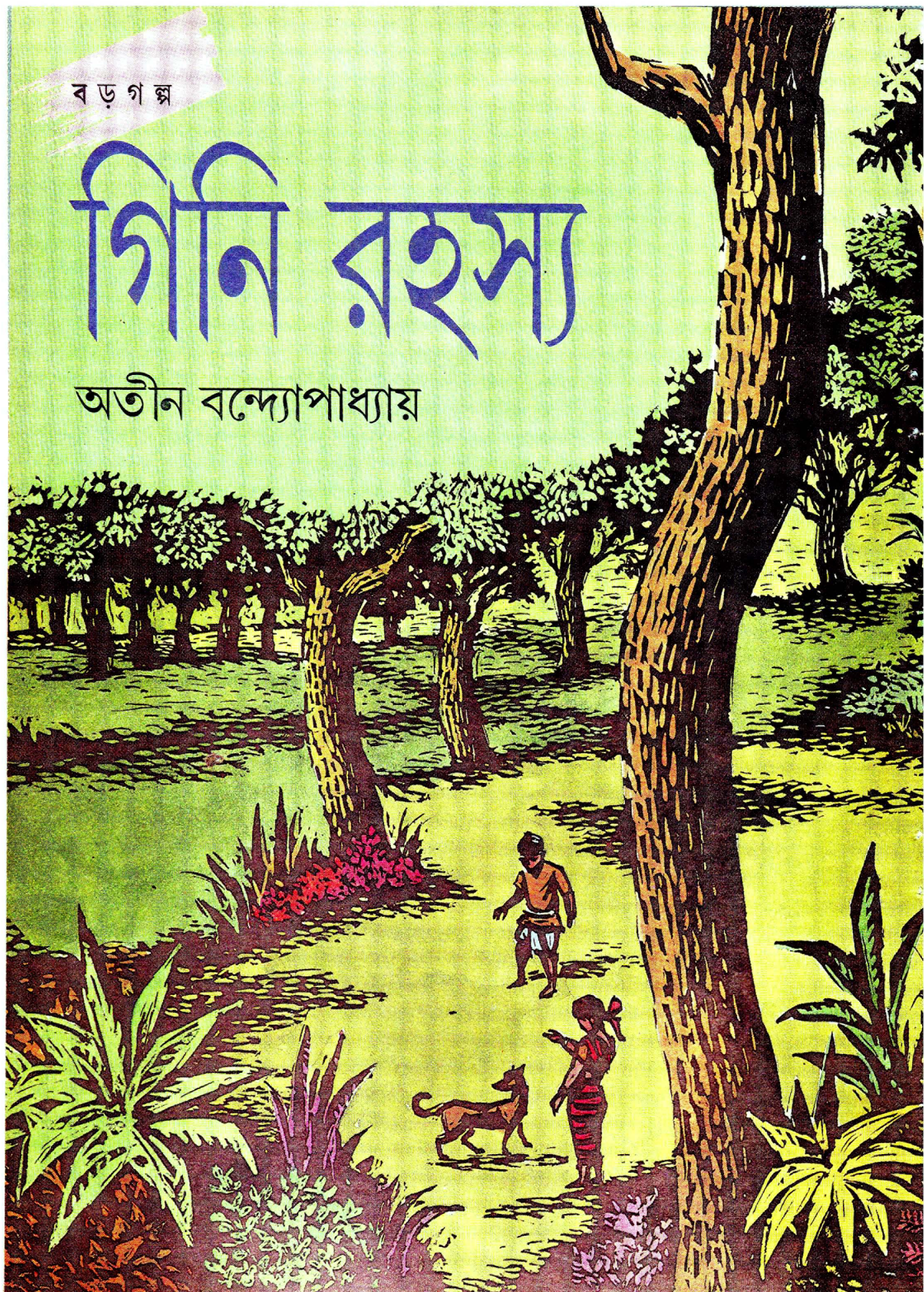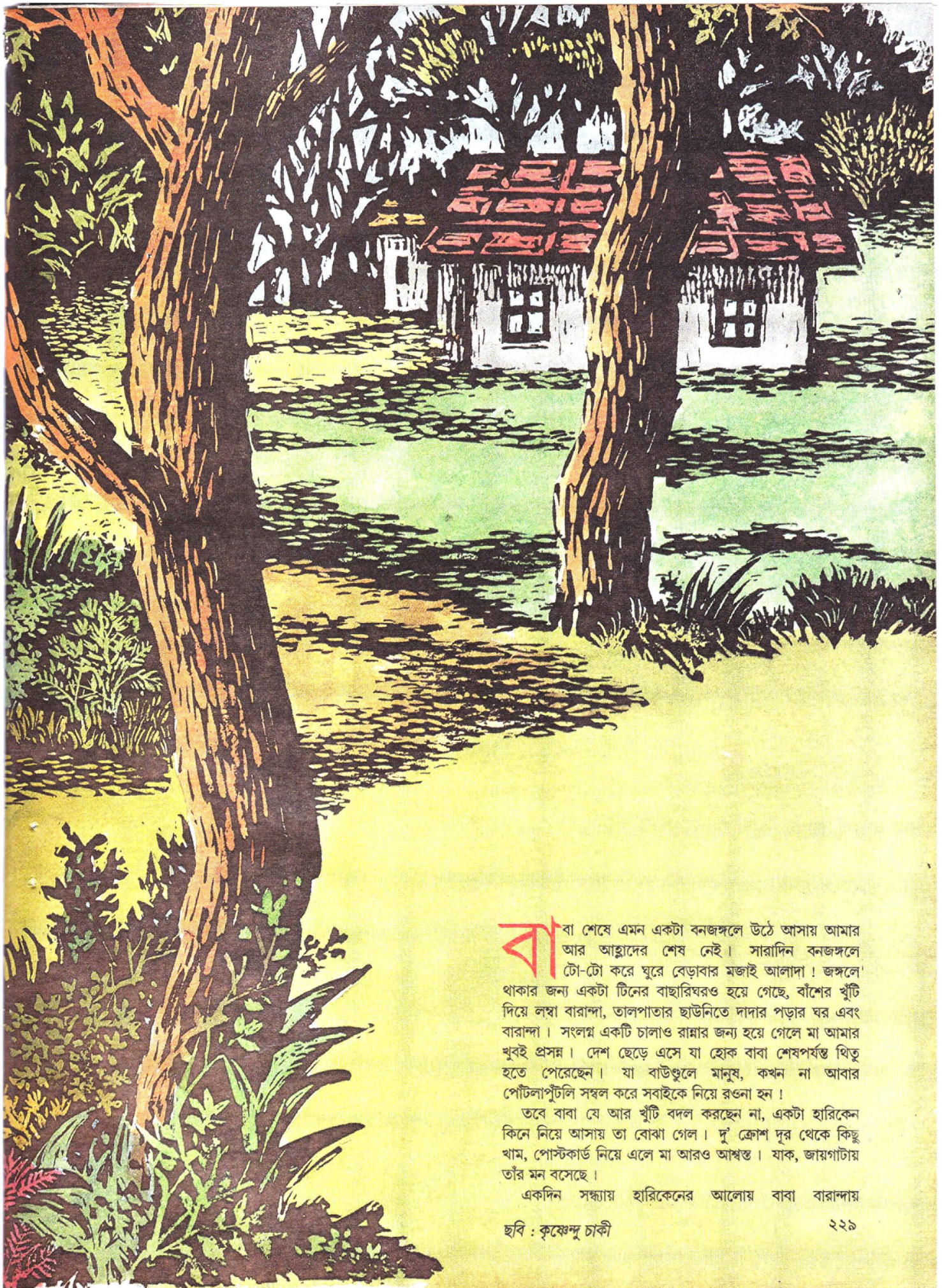
বাবা শেষে এমন একটা বনজঙ্গলে উঠে আসায় আমার আর আহ্লাদের শেষ নেই। সারাদিন বনজঙ্গলে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবার মজাই আলাদা! জঙ্গলে থাকার জন্য একটা টিনের বাছারিঘরও হয়ে গেছে, বাঁশের খুঁটি দিয়ে লম্বা বারান্দা, তালপাতার ছাউনিতে দাদার পড়ার ঘর এবং বারান্দা। সংলগ্ন একটি চালাও রান্নার জন্য হয়ে গেলে মা আমার খুবই প্রসন্ন। দেশ ছেড়ে এসে যা হোক বাবা শেষপর্যন্ত থিতু হতে পেরেছেন। যা বাউণ্ডুলে মানুষ, কখন না আবার পোঁটলাপুঁটলি সম্বল করে সবাইকে নিয়ে রওনা হন!

তবে বাবা যে আর খুঁটি বদল করছেন না, একটা হারিকেন কিনে নিয়ে আসায় তা বোঝা গেল। দু' ক্রোশ দূর থেকে কিছু খাম, পোস্টকার্ড নিয়ে এলে মা আরও আশ্বস্ত। যাক, জায়গাটায় তাঁর মন বসেছে।

একদিন সন্ধ্যায় হারিকেনের আলোয় বাবা বারান্দায়

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

অনাথবন্ধুকে চিঠি লিখতেও বসে গেলেন। আমি, দাদা ঘরের মেঝেতে বসে কুপির আলোয় পড়ছি। বাবা নিবিষ্টমনে কাঠের বাক্সে ভর করে চিঠি লিখছেন। চেঁচিয়ে পড়ছি বলে বাবার মনোযোগে খুবই বিঘ্ন ঘটছে। আমাদের দিক থেকে কোনও ভরসা না পেয়ে মাকে ডেকে বললেন, "দয়াময়ী, তোমার পুত্ররা সামান্য আস্তে পড়লে হয় না! আমার চিঠির যে পরম্পরা ঠিক থাকছে না। জরুরি চিঠি।"

দাদা গজগজ করছিল। আস্তে পড়লে তার মন্ত্রে থাকে না। হঠাৎ কী এত জরুরি চিঠি লিখছেন যে, তখন থেকে একটামাত্র হারিকেন দখল করে রেখেছেন! কুপির আলোয় দাদার পড়তে অসুবিধে হয়, বাবা কিছুতেই বুঝছেন না।

বাবা কিছুক্ষণের জন্য দাদার হারিকেনটা চেয়ে নিয়েছিলেন, চিঠি লেখার পর্ব শেষ হলেই আবার যথাস্থানে হারিকেনটি ফিরিয়ে দেওয়া হবে এই কড়ারে।

চিঠি লেখা কখন শেষ হবে তাও আমরা জানি না। আস্তে আমি পড়তে পারি না, বই বন্ধ করে উঠে পড়লাম। কিন্তু দাদার যে সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, সে ওঠে কী করে! সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে, হারিকেনটির দখল নিয়ে এবার পিতাপুত্রের কুরুক্ষেত্র শুরু হতে পারে কিংবা রাগে দাদা ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে দিতে পারে।

অবশ্য দাদা তার কিছুই করল না। কুপিটা ঠকাস করে বাবার কাঠের বাক্সে রেখে দাদা হারিকেনটি তুলে নিল। তারপর ঘরে ঢুকে ফের পড়তে বসে গেল। পড়ার সঙ্গেই একবার বলল, "কাল আবার চিঠির বাকিটা লিখবেন।" হারিকেনটি আসার পর থেকেই দখল নিয়ে পিতাপুত্রের লড়ালড়ি চলছে, আজ মনে হল বেশ চরম আকার নেবে। দাদার এটা ঘোরতর অন্যায়, বাবার মুখ না দেখলে বোঝা যেত না। দাদাকে তিরস্কারও করা যায় না। জননী তা হলে রেগে যাবেন।

বাবা বাধ্য হয়ে কাতর গলায় বললেন, "দেখলে দয়াময়ী, তোমার পুত্রের কাণ্ডখানা। কুপিটা রেখে হারিকেন নিয়ে গেল! কুপির আলোতে চিঠি লেখা যায়! আমার কাজ কাজ না? পড়াশোনা করে তোমার পুত্রটি ভেবেছে লাট হবে! দু'দণ্ড সবুর সয় না!"

দাদা ওদিক থেকে জবাব না দিয়ে পারেনি, "আজ কি শেষ করতে পারবেন চিঠিটা! কত কিছুর খবর দিতে হবে। যেটুকু লিখেছেন তাই পড়ে দ্যাখেন, কী-কী বাদ গেল। গুছিয়ে লিখতে হবে না? শেষে বলবেন, পুত্রদের তাড়নায় কত বড় একটা খবর দেওয়া গেল না অনাথবন্ধুকে।"

বাবা গুম মেরে গেলেন। মাকে সালিসি মেনেও লাভ হল না। বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ নেই রান্নাঘর থেকে! ছ্যাঁক- ছোঁক শব্দ কানে আসছে। দাদা পড়ায় ব্যস্ত। আকবর, দ্য গ্রেট এম্পারার—ভারী-ভারী ইংরেজি শব্দ দাদার পাঠ্য বইয়ে আছে। এতে যে বাড়িঘরের মর্যাদা বাড়ে, বাবা কিছুতেই বোঝেন না। দাদার সামনে পরীক্ষা, তাকেও দোষ দেওয়া যায় না। অনাথবন্ধুর চিঠিটি বাবার কবে শেষ হবে, তাও ঠিক বলা যায় না।

"ওরে, তোর বাবার কি খবর লেখা শেষ হল। কখন থেকে খেতে ডাকছি কোনও সাড়া নেই!" দাদা হারিকেন তুলে নিয়ে গিয়ে ভালই করেছে। কারণ, বাবার চিঠি লেখা শেষ হতে কত রাত হয়ে যেত, কিংবা তাঁর দীর্ঘ চিঠি, দীর্ঘ খুব যে নয় তাও বুঝি, একটি বাক্য শেষ করে পরের বাক্যটি ধরতে তাঁর অনেক সময় লেগে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে সংসারে একটিমাত্র হারিকেন নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলতেই পারে।

যাই হোক, সপ্তাহখানেক ধরে হারিকেন নিয়ে টানাহ্যাঁচড়ার পর বাবার চিঠি লেখা শেষ। এই সপ্তাহখানেক রাত হলেই পিতাপুত্রের যুদ্ধে আমি ভারী মজা পেতাম। বাবার আদ্যাশক্তি অর্থাৎ আমার জননী মাঝে-মাঝে বাবার ওপর খুবই কুপিত হতেন।

"তুমি কী! অনাথবন্ধু শেষে তোমাকে উদ্ধার করবে! তার খেয়েদেয়ে কাজ নেই, চিঠি পেয়ে সে এমন একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় চলে আসবে ভাবছ! সে বিষয়ী মানুষ, সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকলে এমন একটা জঙ্গলে কেউ বাড়িঘর বানায়!"

"এটাই তোমার বিশেষ দোষ মহামায়া। কিছুতেই তুষ্ট নও। এ-দেশে এসে কম ঘুরেছি! কত আঘাটায় নৌকো ভেড়াতে হয়েছে। একটুখানি বাসা মানুষের কত দরকার বোঝো না! দেশে আর কেউ থাকতে পারবে ভাবছ!"

মাকে কখনও বাবা একনামে ডাকেন না। কখনও বলবেন, "তোমাদের জননীর কী ইচ্ছে।" কখনও বলবেন, "তোমাদের দেবী জগজ্জননী কি আমার উপর রুষ্ট হয়েছেন।" অথবা বলবেন, "তোমাদের করুণাময়ী মাকে খবর দাও, দু'জন অতিথি দুপুরে এই গৃহে সেবা করবেন।"

বাবার কাছে মা আমার কখনও ইচ্ছাময়ী, কখনও দয়াময়ী। আবার কখনও চামুণ্ডা, ধুমাবতী, মা'র এই রূপবর্ণনা কতটা সঠিক, বাবার আচরণে আমরা তা টের পেতাম।

যাই হোক, চিঠি শেষ করে একদিন সকালে বাবা নোটিশ জারি করে দিলেন— "অনাথকে কী লিখলাম তোমাদের সবার শোনা দরকার।"

অবশ্য দাদা বাবার কথায় আদৌ গুরুত্ব দেয় না, তবু বাবা যখন ডেকেছেন, তখন শোনাই যাক, তাঁর কী বক্তব্য।

আমি বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দাদা ঘরের ভেতর মাচানে বসে একটা ছেঁড়া বই আঠা দিয়ে তাপ্পি মারছিল, দেশ থেকে আসার সময় দাদার পাঠ্য বই বিশেষ আনা যায়নি, দু'-আড়াই ক্রোশ দূরের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বদান্যতায় কিছু টুটাফাটা পুস্তক বাবাই সংগ্রহ করে এনেছিলেন— কারণ বাবার বিশ্বাস, যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুই আগে শেষ করা দরকার, পরে খুঁজে- পেতে পেলে দেখা যাবে। সুতরাং এহেন আমাদের পিতৃদেবের কী ইচ্ছে হয়েছে সহসা, জানার কৌতূহল থাকতেই পারে।

বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে আমি, ঘরের ভেতরে মাচানে বসে দাদা, বাবা বারান্দায় জলচৌকিতে, তিনজনই আপাতত মুখোমুখি। তবু তিনি উশখুশ করছিলেন, কিছুটা নীরব, কিছুটা প্রত্যাশাও আছে, আর একজন যে নেই আমরাও বুঝতে পারি। একজন বললে ঠিক হবে না, বোনকে ধরলে দু'জন। তারা এলে ভাল হয়, তবে তাদের পাত্তা নেই, ঠিক পাত্তা নেই বলাও যায় না, ওদিকের তালপাতার ছাউনিতে দু'জনের কথাবার্তা আমাদের কানে আসছে।

বাবা শেষে কুণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "দয়াময়ী কি খুব ব্যস্ত?"

আমি না ডেকে পারলাম না, "মা, বাবা দয়াময়ীকে খুঁজছেন। তুমি এসো। বাবা কখন থেকে বসে আছেন, তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন বলে। তুমি না থাকলে হয়!"

"তোমার বাবাকে বলো এখন আমার হাত জোড়া। যেতে পারছি না। ওখান থেকে পড়লেই শুনতে পাব। কান আমার খাটো যে নয়, বাবা তোমার ভালই জানেন।"

"আপনি বক্তব্য পেশ করতে পারেন বাবা। মা আসতে পারছেন না। এখান থেকে বললেই যথেষ্ট। কানে খাটো নন মা।"

বাবার খুবই স্তিমিত গলা। "সব আমিও শুনলাম। তোমার মা কখন যে বরদা দুর্গা, আর কখন যে ভয়ঙ্করী কালী সেই বুঝতেই শেষবেলা হয়ে গেল। তিনি কাছে না থাকলে যে হয় না! জরুরি চিঠিটি পাঠাব অনাথবন্ধুকে, তাঁকে না শোনালে চলবে

কেন !"

তারপর কিছুটা বিরক্ত হয়েই যেন বলা, "তিনি করছেনটা কী ? পিলু, এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে একবার দেখে এলে ভাল হত না !"

রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। মাকে বললাম, "তুমি না গেলে বাবা চিঠি পড়া শুরু করতে পারছেন না।"

চিঠিটা লিখলেন, কী লিখলেন দয়াময়ীর শোনা দরকার।

চিঠিতে অনাথবন্ধুকে এতসব সুখবর দিলেন, দয়াময়ী শুনে বুঝুক, দেশ ছেড়ে না গেলে অনাথবন্ধুকে এতসব সুখবর দেওয়ার সুযোগই পাওয়া যেত না।

অগত্যা দয়াময়ী চৌকাঠের পাশে এসে দাঁড়ালে বাবা একবার ইচ্ছাময়ীর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক মা-তারা।"

বাবার এই ভূমিকা দাদা একদম সহ্য করতে পারে না। দাদা বলল, "আমি উঠি।"

"তুমি উঠবে মানে !"

"আমার পড়া আছে।"

"আমরা আর পড়াশোনা করিনি ! গুরুজনের কথা তোমরা আজকাল দেখছি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করতে চাও না।"

মা-ও বিরক্ত। "তুমি কী শোনাবে ?"

"চিঠি। অনাথবন্ধুকে চিঠি।"

"সে তো সাতদিন ধরে লিখেই যাচ্ছ। শেষ হয়েছে ?"

"হয়েছে।"

"ঠিক আছে, পড়ো।"

বাবা খুব প্রীত হলেন। সবাই তাঁর চারপাশে বসে, না হয় দাঁড়িয়ে।

বাবা একবার আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, "তুমি বোসো। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ?"

তারপর বাবা রুলটানা ফুলস্কেপ পাতাটি মেলে ধরেছিলেন। আমরা শুনছি।

"শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়। তাং ১৩ শ্রাবণ পূর্ণিমা, ১৩৫৮, ভূতির জঙ্গল, নিমতা।

"সুজন সুহৃদ্‌বরেষু, প্রিয় অনাথ, আমরা বর্তমানে একটি জঙ্গলে আশ্রয় পাইয়াছি। জলের দরে আট-দশ বিঘার মতো জমি ক্রয়ও করা গেছে। জায়গাটা খুবই উর্বর। তবে গাছপালা এবং ঘন বনজঙ্গলে দেড়-দু'ক্রোশ পথ অগম্য। লোকালয় কাছাকাছি বলতে, সড়কের ওপারে বাগদি পাড়া। অদূরে একটি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার আছে। আমার দুর্জয় সাহসে তাদের কিঞ্চিৎ মতিভ্রম হয়েছে। এদিকটায় তারা আগে কাঠকুটো সংগ্রহ করতে বনজঙ্গলে ঢুকে যেত, আমার বাড়িঘর হয়ে যাওয়ায় তারা জঙ্গলে ঢুকতে কুণ্ঠাবোধ করছে। আমরা মানুষ না অপদেবতা এই সংশয় তাদের মধ্যে মনে হয় এখনও সেভাবে নির্মূল হয়নি। তবে হয়ে যাবে। পিলু এবং আমি উভয়ে প্রাণপাত করে তাদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টায় আছি।"

এর পর বাবা মাকে বললেন, "জল দাও।"

বোধ হয় বাবার গলা শুকিয়ে গেছে। মায়া ছুটে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে রাখলে তা তিনি খেলেন।

মা রেগে গিয়ে বললেন, "খালি পেটে জল খেলে ! এখনও মুখে কিছু দাওনি। বাকিটা বিকেলে শুনব।"

"আরে, না, না, হয়ে যাবে। শোনো।"

"আমাদের এই জঙ্গলটি ভারী সুন্দর অনাথ। এখানটায় একসময় রাজরাজড়ার দেশ ছিল। নীলকুঠির সাহেবরাও এই জঙ্গলে বসবাস করে গেছে। মাইলখানেক দূরে যে সড়কটি আছে, তারও ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। বাংলার শেষ স্বাধীন
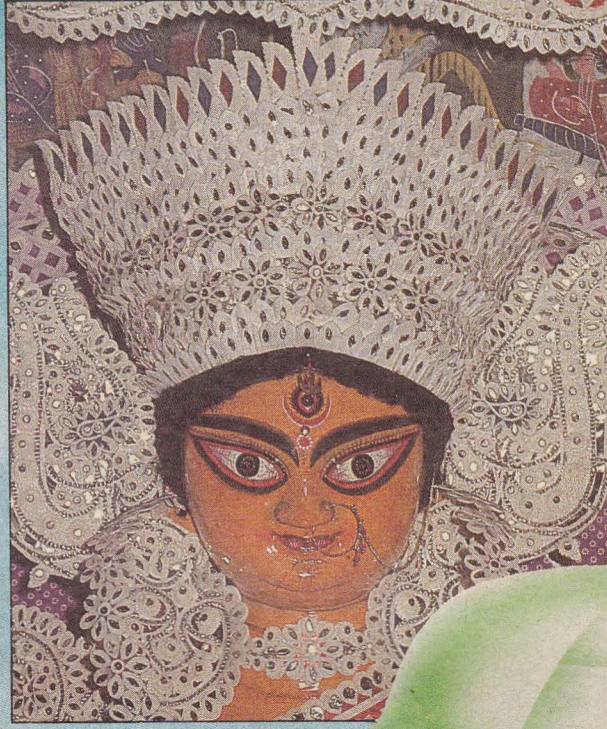
নবাব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজয়ের পর এই সড়ক ধরেই পালিয়েছিলেন। ক্রোশখানেক দূরে একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদ আছে। ঠিক পরিত্যক্ত বলা যায় না, তিনজন পেয়াদা, দু'জন আমিন, একজন রাজকর্মচারী একটি কুঠিতে বসবাস করে। ওই এলাকায় কিছু পাকাবাড়ি আছে। একসময় রাজার পিলখানায় একটি হাতিও ছিল। সে যাই হোক, তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, জগদ্বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী জগৎ শেঠের বাড়ি এই জঙ্গল থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে, পিলু এবং আমি সেখানে একবার যাব মনস্থ করেছি। বাড়িটির ধ্বংসাবশেষ দেখলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এই জঙ্গলেই পুরাকালে রেশমের রমরমা ছিল। রাজপ্রাসাদের অদূরে নদী, যদিও নদী এখন হেজেমজে গেছে, বিদেশি পণ্যসম্ভারে ভরতি বড়-বড় জাহাজ এই বন্দরে ভিড়ত। রেশম বোঝাই হয়ে বিদেশে পাড়ি দিত। ভাবলে আমার দারুণ অনুভূতি হয়।"

মা বললেন, "হয়েছে ?"

"না, না। বাকিটুকু শোনো।"

বাবা পাতাটি উলটে নিলেন। দুর্মূল্যের বাজার, কাগজের অপচয় যাতে না হয়, এ-পিঠ ও-পিঠ দু'-পিঠেই বাবার হিজিবিজি হস্তাক্ষরে ভরে আছে।

মা নিরুপায় হয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দাদা আর কাছে নেই। বাবা চিঠির বয়ান নিয়ে খুবই মশগুল। মা চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এতেই বাবা খুশি।

"অনাথ, তোমার জেনে রাখা ভাল, জঙ্গলের শেষ দিকটায় একটা বড় মাঠ আছে, মাঠ-শেষে রেললাইন, ছোট্ট একটি স্টেশনও আছে। ওই স্টেশনে নেমে তুমি ভূতির জঙ্গল বললেই জায়গাটা খুঁজে পাবে।"

মা না বলে পারলেন না, "স্টেশনের নাম লিখতে হবে না ?"

"সবুর করো। এত তাড়া কিসের। আমাকে এতটা অবোধ কেন ভাবো বলো তো। এই যে আশ্রয়টুকু পেয়েছ তার কথা ভাববে না ! কে করল !"

তারপর বাবা আবার পড়লেন।

"জায়গাটা এখন অনাবাদী। কিন্তু বিশেষ উর্বর। কিছু পেঁপেগাছ, কলাগাছ লাগিয়েছি। ফলন অতি উত্তম। দেশের গাছপালার বীজও রোপণ করেছি। গাছ বড় হয়ে উঠছে। জঙ্গল সাফ করছি পিতাপুত্রে। বিঘেখানেক জমি সাফ করা গেছে। তবে সাপের উপদ্রব আছে। বিচিত্র বর্ণের সব কালনাগিনী জঙ্গলের শোভা বর্ধন করছে। চিতি, শঙ্খচূড়, ডাঁড়াশ, শ্বেত গোখরোই বেশি। ঘরে এখন গোরুর দুধ হয়— তোমার বউদি দেশের পালাপার্বণ একটাও বাদ দিচ্ছেন না। গৃহদেবতার ঘরটিও হয়ে গেছে। একটা ভাঙা সাইকেল ঠাকুরের কৃপায় জোগাড় হয়ে গেছে। পিলু কী করে যে জোগাড় করল সে-ই জানে ! দু-চার ক্রোশের দূরত্ব এখন আমাদের কোনও সমস্যা নয়। সে তার দাদাকে সাইকেল চড়া শেখাচ্ছে।"

মায়া মুখ বাড়িয়ে বলল, "আমিও শিখছি বাবা।"

"ভাল করছ। তবে মেয়েদের এটি অনুচিত কাজ। তোমার শেখার মধ্যে কোনও বাহবা থাকে না।"

"সর্বশেষে জানাই অনাথ, পানীয় জলের সঙ্কটও নেই। বাগদিপাড়ার কাছে একটি সরকারি টিউকল আছে। জল খুবই মিষ্টি। আর অত্যন্ত শীতল। গ্রীষ্মের দুপুরে তৃষ্ণার্ত হলে এই জলপানে পরমায়ু বাড়ে। পিলুই ঘড়া করে দু'বেলা দু'ঘড়া জল নিয়ে আসে। নিত্য ব্যবহারের জলেরও অভাব নেই। জঙ্গলের মধ্যে একটি পুষ্করিণী আবিষ্কার করা গেছে। সেটির সংস্কার করেছি। অবাক, এই ঘোর জঙ্গলে এমন স্বচ্ছজলের বন্দোবস্ত কার দয়ায় ! আসলে ঠাকুরেরই অশেষ কৃপা। না হলে জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে—"

বাবা চুপ করে আছেন।

"জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে কী ?" মা অত্যন্ত অধীর গলায় প্রশ্ন না করে পারলেন না।

"না, মানে..."

মা আরও অধীর।

বাবা বললেন, "তোমাদের কি মনঃপূত হবে কথাটা !"

"কেন হবে না !"

"জঙ্গলটি সাফ করতে গিয়ে যদি একটি গিনি পাই, কেমন হয় !"

"বাবা, গিনি কী ?" আমি না বলে পারলাম না।

"গিনি বোঝো না ! এত বড় হলে কেন ! তোমার জননী জানেন। তিনটি গিনি দিয়ে তাঁর গলার বিছেহারটি তৈরি করা হয়েছিল। কী, ঠিক কি না ?"

মা অত্যন্ত কুপিত। অনাবশ্যক কথা সব। যদিও আমরা জানি, বাবা এই সম্পত্তি ক্রয় করেছেন মায়ের শেষ সম্বল গলার বিছেহারটি বিক্রি করে। কিছুদিন স্টেশনে, কিছুদিন পোড়োবাড়িতে, শেষে এক আত্মীয়ের বাড়ি। কোথাও তিষ্টোতে পারিনি। দেশ ছেড়ে এসে বাবা যে বড়ই বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন, হাড়ে-হাড়ে এটা আমরা যথেষ্ট টের পেয়েছি। মানুষের ঘরবাড়ির বড় দরকার।

সহসা মা কেঁদে ফেললেন। রেগে গেলে আমার জননীর এটা হয়। তিনি নিরুপায় রমণীর মতো চোখের জল মুছতে থাকলেন।

"আমাদের কী হবে ?"

দাদা আর বসে থাকল না। তার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, সকালবেলায় বাবার বকবকানি শুনলে তার পেট ভরবে না। সে তার পাঠ্যপুস্তক এবং একটি বস্তা নিয়ে ফের তালপাতার ছাউনিতে ঢুকে গেল। আমার জননীর যে কী হয় !

বললাম, "কী হল ?"

"তোমার বাবাকে বলো, সকালবেলায় আবোল-তাবোল বকলে আমার বুক ধড়ফড় করে।"

আমি না বলে পারলাম না, "আচ্ছা বাবা, সকালে উঠে আপনি তো ঠাকুরের নাম করেন ! আজ কী হল আপনার ?"

বাবা হঠাৎ ধমকে উঠলেন, "চোপ, সব্বাই মাতব্বর। আমি কি মানুষ না ! নিজের মনোবাঞ্ছার কথা জানালে, আবোল-তাবোল বকা হয়। তবে সবটা শোনো দয়াময়ী—আপনার সুখের জন্য সব করছি। কথায়-কথায় আর আমাদের চোখের জল ফেলার সময় নেই। এত বড় জঙ্গলটা আমার সাধ্য নেই ক্রয় করার। তাই অনাথবন্ধুকে চিঠি দিচ্ছি। সে যদি আসে ! গাঁয়ের সবাই যদি আসে, লোভে পড়ে চলে আসতেই পারে। জলের দরে জমি। সে-দেশে কেউ আর থাকতে পারবে ! নতুন করে আমাদের গ্রামটার এখানে পত্তন হলে কার কী ক্ষতি ! খারাপ কী লিখেছি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"গিনির কথা লিখতে গেলে কেন তুমি ?"

"পাওয়া গেছে তো লিখিনি, 'যদি পাই' লিখেছি। গোপন ধনসম্পদ মাটির গর্ভে যে নেই, কে বলবে ! জঙ্গলটার নীচে একদা একটি পরিত্যক্ত বন্দরনগরী ছিল, জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে কারও কপালে জুটে যেতেই পারে। গুপ্তধনের লোভে ঝেঁটিয়ে চলে এলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাই লিখেছি, গিনি যদি একটা পাই...। আসলে সঙ্কেত রেখে দিয়েছি। সঙ্কেত বোঝো ?"

মায়ের তখন এক কথা, "না, তুমি ও-লাইনটা কেটে দাও। পেলে আমরাই পাব। দশকান করে সব যজিয়ে দিতে হবে না।"

আমি একবার মায়ের দিকে তাকাচ্ছি, একবার বাবার মুখের দিকে। যেন গিনি পাওয়া যাবেই। আবার কেন যে মনে হয় বাবা হয়তো কিছু পেয়েছেন। মায়ের এই সতর্কতা, এসব বিষয়ে

দশকান করা ঠিক হবে না, তা ছাড়া বাবা চিঠি কীভাবে শেষ করলেন, তাও শোনা হয়নি। বাবা দেশ ছেড়ে এসে ভাল নেই। সহায়সম্বলহীন মানুষ। উপার্জন নেই। চার-পাঁচটি পেটের অন্ন সংস্থান সোজা কথা না। তবে বাবা যখন আছেন আমাদের ঘাবড়াবারও কিছু নেই। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বাবা হয়তো চিঠি লিখেছেন অনাথকাকাকে। সবাই এসে এখানে ঘরবাড়ি তৈরি করলে বাবার যজন-যাজনের সুরাহা হবে। একঘর ব্রাহ্মণের বেশি কিছু দরকারও হয় না।

ওফ, কী যে মজা হবে না! গাঁয়ের সব মানুষ এসে গেলে, ঘরবাড়ি তৈরি করলে, জমিজমা চাষ করলে, পূজাপার্বণ লেগেই থাকবে। শনিপূজা, ক্ষেত্রপালের পূজা, বাস্তুপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা—বাবাই আমার তখন একমাত্র ঠাকুরকর্তা। বাড়িটার কত ইজ্জত বেড়ে যাবে। গৃহদেবতার জন্য রোজ সিধা আসবে। শনি-মঙ্গলবারে ঠাকুরের ভোগ হবে। খিচুড়ি, পায়েস, লাবড়া, গোবিন্দভোগ চালের ভাত, পঞ্চব্যঞ্জন—বাবা সকালে উঠে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনের জায় ধরে দেবেন, সেইমতো কাজ হবে। বারান্দায় সকাল থেকেই ভিড় হবে যজমানদের। দিনক্ষণ, তিথি-নক্ষত্রের সব খবর বাবা না দিলে তারা সব জলে পড়ে যাবে।

তার সঙ্গে একটা যদি গিনি পাওয়া যায়, মন্দ কী! "যদি একটা গিনি পাই কেমন হয়"—বাবার এই আশা-কুহকিনীর নিশ্চয় কোনও হেতু আছে। আপাতত বাবা চিঠিতে অনাথকাকাকে আর কী-কী খবর দিলেন এই গভীর অরণ্যটি সম্পর্কে, আমার তাই জানার বিশেষ কৌতূহল।

বাবার ইচ্ছাময়ী চৌকাঠে এতক্ষণ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পাত্র নন। নিশ্চয়ই বাবা আরও কিছু বেফাঁস খবর দিয়ে বসে আছেন। চিঠি পড়া শেষ না হলে তিনি যে চৌকাঠ থেকে নড়বেন না, তাঁর হাবেভাবেই তা বোঝা যায়।

বাবা হয়তো ভাবছিলেন, লাইনটি কেটে দেওয়া সঠিক কাজ হবে কি না। কারণ অনেক ভেবেচিন্তে সাতদিনের মাথায় চিঠি লেখা সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর পক্ষে ইচ্ছাময়ীর এককথায় লাইনটি উড়িয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। শেষে কী ভেবে বললেন, "দেখি একটা কলম।"

আমি দৌড়ে গিয়ে দাদার কলমটি তুলে আনলে, লেগে গেল ধুন্দুমার কাণ্ড। তার কলমের বারোটা বাজুক, সে চায় না। সে ছুটে এসে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে চাইলে জোরাজুরি শুরু হয়ে গেল। বাবা বললেন, "আরম্ভ হয়ে গেল কুরুক্ষেত্র।"

আমিও ছাড়ব না। দাদাও কিছুতেই দেবে না। বাবা নাকি কয়েকবারই তার কলমের দফারফা করে ছেড়েছেন।

বাবা মায়াকে বললেন, "আরে, আমার কী নেই, তোদের কলমের প্রত্যাশা আমি করি! দোয়াত-কলম আমারও আছে।"

আমিও জানি, বাবা তাঁর কলমেই লিখতে পছন্দ করেন, কিন্তু দাদা তার কলমটিতে কাউকেই হাত দিতে দেবে না। বাবার এমন জরুরি কাজেও কলমটি যে দাদার কত মহার্ঘ্য বুঝুন বাবা। এই হল গে বাবার বড় পুত্র।

মা বললেন, "কী আরম্ভ করলি তোরা! কলম লাগবে না। তোদের বাবা কি ভিখারি, তার কি কিছু কমতি আছে!"

মায়ের এমন কথায় বাবা হৃষ্টচিত্তে লাইনটা কেটে দিয়ে ফের পড়তে শুরু করলেন।

"এই জনহীন অরণ্যভূমিতে মাঝে-মাঝে দেবী আবির্ভূতা হন। জ্যোৎস্নারাতে মনসাতলা থেকে ফেরার সময় তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। বনদেবীকে বলেছি, আপনার অভয়ারণ্যে এসে উঠেছি। পুত্রকন্যা নিয়ে আছি। আপনার সদাশয় বরাভয় আমাদের রক্ষা করুক।"

দাদা ওদিক থেকে ফোড়ন কাটল, "যত্ত সব বিগ-বিগ টক। যত্ত সব আজগুবি কথা। তুমি কি থামবে বাবা! আমাকে পড়তে দেবে না!"

মা বললেন, "দেবী! কী লিখেছ যা-তা। এখানে দেবীরা মরতে আসবে কোত্থেকে! তোমার মতো বাউণ্ডুলে মানুষের পক্ষে সবই দেখা সম্ভব।"

বাউণ্ডুলে বলায় বাবা ক্ষুব্ধ হতেই পারেন। দেশের কে কোথায় এসে উঠেছে, আত্মীয়স্বজন তো আমাদের মেলা, একবার তাদের খোঁজে বের হলে বাড়ি ফেরার নাম করেন না বাবা। আমাদের জঙ্গলে ফেলে রেখে হৃষ্টচিত্তেই তিনি ঘুরে বেড়াতে পারেন। আমরা কী খাই, কীভাবে বাঁচি, বাবার যেন দেখার কথা নয়। তিনি কে, তিনি নিমিত্ত মাত্র। যিনি দেখার তিনি তো বাড়িতেই অধিষ্ঠান করছেন। তাঁকে ঠিকমতো ফুলজল দিলেই হল। আর পিলু তো আছে।

আমার ওপর বাবার এত ভরসা! নিত্যপূজাপদ্ধতি এজন্য বাবা শিখিয়ে দিয়েছেন। দেশে থাকতেই উপনয়ন হয়ে যাওয়ায়, তিনবেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজাপাঠ সব আমার জানা। সুতরাং ঠাকুর-দেবতার দায়ও অনায়াসে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বাবার দেশান্তরী হতে বাধত না। যেতেন একদিনের বলে, ফিরতেন সপ্তাহ পার করে। যখন ফিরতেন মাথায় একটা বড় পোঁটলা, তাতে পূজাপাঠের চাল, ডাল, শাড়ি, কোরা কাপড়—কার আদ্যশ্রাদ্ধ সেরে ফিরেছেন। ভালমন্দ খাওয়ার লোভেও মাঝে-মাঝে বাড়ি থেকে যে বের হয়ে যেতেন বাবার ইচ্ছাময়ী ঠিক টের পেতেন। কাজেই মা বাবাকে বাউণ্ডুলে স্বভাবের বললেও দোষ দেওয়া যায় না।

বাবা গুম মেরে আছেন। পুত্রকন্যার সামনে তাঁর এই হেনস্থা! তিনি বাউণ্ডুলে! এত কষ্টে ঘরবাড়ি করার এই পরিণাম! নিরাশ্রয় মানুষ নন তিনি। তাঁকে খাটো করলে তিনি ক্ষিপ্ত হতেই পারেন।

আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল।

"আচ্ছা মা, তুমি কী! বাবাকে বাউণ্ডুলে বলতে তোমার মুখে আটকাল না। বাবা না থাকলে আমাদের ঘরবাড়ি হত!"

বাবা যেন সাহস পেয়ে গেলেন।

উঠোনটি পার হয়ে পেঁপেগাছ, কলাগাছ—আম- কাঁঠালের কলম এবং বিঘেখানেক জমি সাফ করা গেছে বলে বাইরের রাস্তা থেকে জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটাকে বাড়ি বলেই মনে হয়, এমন সহজ সত্যকে অস্বীকার করা ইচ্ছাময়ীর খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে।

মাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন।

"তোমার বাবা সক্কালবেলায় কী শুরু করল! তিনি এখন দেবী দেখে বেড়াচ্ছেন। শেষে আরও যে কী দেখবেন এবারে দ্যাখো।"

মায়ের পক্ষ না নিলে চলে না।

"আচ্ছা বাবা, আপনার দেবী-সাক্ষাতের কথা না বললে হত না! দেখছেন মা রাগ করছেন।"

"তোমার মা কবে তুষ্ট ছিল আমার ওপর? আমি দেবী দেখলে অপরাধ। তোমার মাকে গিনি কে দিল। তিনি কি জানেন না দেবীর কৃপা না হলে এসব হয় না! তোমার মা দশ কান না হয়, গোপন রাখতে বলেছে।"

আমার চোখ বিস্ফারিত। দাদাও ছুটে এসেছে। দাদার চোখ কপালে উঠে গেছে।

বাবা খুবই আহ্লাদিত, খবরটি ফাঁস করে দিয়ে। তিনি বললেন, "বোঝো এবার! ঠাকুরের সিংহাসনের তলায় আস্ত একটা গিনি। প্রায় একটি স্বর্ণমুদ্রায় শামিল। কী পুলক তোমার জননীর! গরিব বামুন, ভগবানের বিবেক আছে। তাঁরই কৃপা। আর দেবী দেখলে অপরাধ!"

আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে আছি।

"কবে পেলে মা!"

"কী জানি, তোমার বাবা জানে!"

দাদাও এবারে সংসারী হয়ে উঠেছে। বলল, "সত্যি মা, ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে, কই দেখি মা।"

মায়াও বলল, "দেখাও মা।"

আমি জানি, বাবা আমার মিছে কথা বলেন না। এ-দেশে এসে আমার বাবা বড়ই বিপাকে পড়ে গেছেন। ঠাকুর-দেবতা আর এই অরণ্যভূমি ছাড়া আমাদের আর কোনও সম্বলও নেই। দাদার বই কেনারও সামর্থ্য নেই বাবার। বনদেবীর কৃপা না থাকলে একটা আস্ত গিনি পাওয়া গরিব বামুনের পক্ষে সম্ভব নয়। এত বড় খবরটা বাবা ফাঁস না করে দিলে আমরা জানতেও পারতাম না।

আমাদের বাড়ির উত্তরে, পুবে, পশ্চিমে অরণ্যভূমি। শাল, সেগুন, পলাশ, শিমুল, পিপুল, হরীতকী গাছের ছড়াছড়ি। খুবই দুর্গম অঞ্চল, তবে আমি এই গভীর জঙ্গলে একটি রাস্তা আবিষ্কার করেছি। সকালে বের হয়ে এই পথটি কোথায় গেছে তা দেখার কৌতূহল আছে। যদি বাবার মতো সত্যি কোনও সকালে অথবা জ্যোৎস্নায় বনদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়! তিনিও যদি দয়া করে আমাকে একটা গিনি দেন!

॥ ২ ॥

গোরুটা মাঠে দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছি। বাবার মেলা কাজ। গোরুর পরিচর্যার ভার আমার ওপর। সকালেই বের হয়ে পড়েছি গোরু নিয়ে। সামনে যতদূর চোখ যায় উরাট জমি। গোরুটাকে জায়গামতো ছেড়ে দেওয়া। সারাদিন নিজের মরজিমতো ঘাস খেয়ে নিজেই সাঁঝ লাগলে ঘরমুখো হবে।

অবশ্য আগে গোরুটা নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি কোথাও ঘাস খাওয়াতাম। একবার লোভে পড়ে ঘাসের খোঁজে ল্যাংরি বিবির হাতা পার হয়ে হেতমপুরের মাঠে গিয়ে খুবই বিপাকে পড়ে যাই। গোরুটা ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসার সময় দেখি জঙ্গলটা ঠিকই আছে। তবে আমাদের বাড়িটা নেই। দূর থেকে বিশাল সব বৃক্ষ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছিল না। হঠাৎ কেন যে মনে হয়েছিল, জঙ্গলের ভেতর আমরা সত্যি বাড়ি করেছি তো! কোথায় গেল বাড়িটা!

বড় সড়কে উঠে এসেও বাড়িটা কোনদিকে বুঝতে পারছিলাম না। এত বড় জঙ্গলে আমাদের বাড়িটা কোথায় যে হারিয়ে গেল! সামনে মাঠ, শনের জঙ্গল, তার ভেতর দিয়ে ছুটছি, কোথায় বাড়ি! এক বিশাল বাঁশের জঙ্গলে ঢুকে যেতেই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলেছিলাম। বাড়িটা শেষপর্যন্ত ভুতির জঙ্গল বুঝি গিলে খেয়েছে।

এই নির্জন পৃথিবীতে কাউকে বললে বিশ্বাসই করবে না, ভুতির জঙ্গলে কেউ বাড়িঘর তৈরি করে থাকতে পারে। বাগদিপাড়াটা কোনদিকে, তাও বুঝতে পারছিলাম না। সড়কে দুটো-একটা গোরুর গাড়ি ছাড়া কিছু চোখেও পড়ছে না। দু-একজন সাইকেল-আরোহী আমাকে রাস্তায় দেখেই জোরে পালাচ্ছে।

বুকের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। আমি ছোটাছুটি করছিলাম। আমাদের বাড়ির সামনে বড় একটা শিশুগাছ, রাস্তা থেকেও দেখা যায়। দূর থেকে গাছটাকে খুঁজছি। গাছটা খুঁজে পেলেই সোজা ছুটে যাব। গাছটা দেখলামও। শনের জঙ্গলে ঢুকতেই গাছটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সারাদিন ঘোরাঘুরি সার। মাঝে-মাঝে কাতর গলায় চিৎকার করছি, "দাদা রে, তোরা কোথায়!" না, কারও সাড়া নেই।

জঙ্গলে কিংবা মাঠেই হয়তো ঘুরে বেড়াতাম। শুভদা দেখছি আসছে। শুভদাকে যে মাঠে ছেড়ে দিয়ে এসেছি তাও ভুলে গেছি। শুভদাকে দেখে মনে বল এসেছিল। সাঁঝ লেগে গেছে। বিশাল সব বৃক্ষের মাথায় দুটো-একটা নক্ষত্র ফুটে উঠেছে। আর তখনই মনে হল, জঙ্গলের একদিকটায় লম্ফের আলো। পড়িমরি করে গোরুটাকে নিয়ে উঠে আসার সময় শুনতে পেলাম, দাদা, বাবা, মা সবাই জঙ্গলের বাইরে এসে আমায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে।

সেই থেকে গোরুটাকে নিয়ে সড়ক পার হয়ে বেশিদূর যেতাম না। যদি সত্যি কখনও বাড়িটা আমাদের নিখোঁজ হয়ে যায়, সেজন্য জঙ্গলের কাছাকাছি মাঠে গোরুটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতাম। আজকাল অবশ্য সব আমার চেনা হয়ে গেছে। কেবল জঙ্গলের ভেতরের রহস্যটা জানা নেই। দুর্গম বলে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতেও ভয় করে। ঢুকে গেলেই কেমন গা ছমছম করে। কিন্তু বাবার বনদেবীর রহস্যটা যে কী, বুঝতে পারছি না। তারপর ঠাকুরঘরে যে একটি গিনি পাওয়া গেছে! কে রেখে গেল! কে দিল! কে এত সদাশয় যে, গরিব বামুনের অন্নকষ্ট দূর করতে চুপিচুপি এমন একটা কাজ করে পালিয়েছে।

ইতিমধ্যেই মা বাবাকে একটি ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছেন। সেই মতো কাঁসার থালা-বাসন, দুটো শীতলপাটি, একটি পেতলের কলসি, গৃহদেবতার জন্য তামার কোষাকুশি, পেতলের ডেগ—ভোগের জন্য বড় জামবাটি সবকিছুই আনা হয়েছে। শনির কোপে শ্রীবৎস রাজা হয়ে আছেন আমার পিতৃদেব। যদি বারের পুজো দিয়ে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়! তবে বাবা দিনক্ষণের অপেক্ষায় আছেন। বারের পুজো শুরু করার কথাও হয়ে আছে।

আর একটি মনোবাঞ্ছা ইদানীং পিতৃদেব মনে-মনে পোষণ করে আছেন। সামনের কাঠাখানেক জমিতে পালংশাক লাগাবেন। জমি সাফ না করলে হয় না। বাঁশের গুঁড়িগুলি কোদাল, খোন্তা, শাবল না হলে ওপড়ানো মুশকিল। বাড়িতে কোদাল এবং দা আছে। শাবল, খোন্তাও গিনিটির দৌলতে বোধ হয় কেনা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। আজ বাবার দুই পুত্র এবং তাঁর নিজের একত্রে বাঁশের গুঁড়ি ওপড়ানোর কথা আছে।

এসব কাজে আমার উৎসাহ খুব। শুধু পড়তে বললেই মাথা গরম হয়ে যায়। অবশ্য বাবা কখনও জোরজার করেন না পড়া নিয়ে। মা পড়া নিয়ে ঝামেলা পাকালে বাবার হিতোপদেশ—"দয়াময়ী, আগে থিতু হয়ে আমাদের বসতে দিন।" গুরুত্বপূর্ণ কথায় মাকে বাবার আপনি-আজ্ঞে করার স্বভাব। "সারাজীবনই পড়ে আছে। সুযোগ-সুবিধেমতো পড়তে বসলেই হবে। ইস্কুলে ভর্তি করি, দু-তিন ক্রোশের মধ্যে স্কুলই বা কোথায়! একটা সাইকেল হয়ে গেছে, সবই হবে। বড়টা প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়ার তোড়জোড় করছে, ভাল, দ্বিজপদকে বলেছি যদি অঙ্ক, জ্যামিতির পুস্তক সংগ্রহ করে দিতে পারে।"

দু'ক্রোশ দূরে মনসাতলায় দ্বিজপদর দোকান। কিছুটা গঞ্জের মতো জায়গা। মনিহারি, মুদিখানার সওদা বাবা দ্বিজপদর দোকান থেকেই সারেন। আদর্শলিপি, বর্ণপরিচয়, হজমির ওষুধ, কুইনিন, সবই পাওয়া যায় তার দোকানে। পেন, পেনসিল, স্লেট কিছুরই অভাব নেই। কিনে আনলেই হল।

ধারবাকিতে বাবা এখন দ্বিজপদর খদ্দের। বাবার ওপর আস্থাও খুব। ধারে যখন জিনিসপত্র আসছে তখন কুইনাইনই বা বাদ যায় কেন! ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেশে ছিল, এখানে আছে কি না জানি না। বাবার এককথা, সাবধানে থাকা ভাল।

সেই বাবা, বাড়ি ফিরে দেখি নেই। এত সকালে কোথায় আবার গেলেন! জঙ্গলে ঢুকে বসে থাকতে পারেন। আরও একটা গিনি যদি পান। বাবা কি তবে জঙ্গলেই খুঁজে পেয়েছেন গিনিটি! আজকাল যে সুযোগ পেলেই জঙ্গলে ঢুকে যান, তাও লক্ষ করেছি। আসলে এই বনভূমির মহিমা বাবার কাছে অপার। গিনিটি সম্পর্কে বাবা-মা দু'জনেই মুখে কেমন কুলুপ এঁটে বসে আছেন। দশকান না হয়, সেজন্যও বাবা বারবার আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

বাড়িতে ছোট্ট উঠোন হয়েছে। দোপাটি ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। ছাতিম, শিমুলগাছও আছে। মা কাঠকুটো ভেঙে বারান্দায় জড়ো করছেন। বারান্দায় বই খুলে বসে আছে দাদা। ঠাকুরঘরে মায়া। বনজঙ্গলে পাখপাখালিরাও উড়ে এসে দেখে যাচ্ছে বাবার বাড়িঘর। দুটো খরগোশ উঠোনের ওপর দিয়েই ছুটে পালাল। কাঠবিড়ালিরা এতদিন ভয়ে-ভয়ে ছিল। ইদানীং নির্ভাবনায় বারান্দা পর্যন্ত ধাওয়া করছে। জীবের কোনও অনিষ্ট বাবা সহ্য করতে পারেন না। এমনকী তাঁর লাগানো গাছের পাতা ছিঁড়লেও বাবা আমার কানটি টেনে বলবেন, "লাগে !"

"উঁহু, ছাড়ো। লাগছে।"

"তা হলে বুঝতে পারছ ?"

বাবা মানুষটি আমার গরিব হয়ে গেলেও সৌম্যকান্তি। তাঁর ক্রোধ জন্মালে মুখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। তাঁর কোনও কিছুতেই পরোয়া নেই। শুধু মায়ের কাছে বাবা জব্দ।

মাকেই বলা যায়। বাবার খবর মা ছাড়া কেউ বিশেষ দিতেও পারবেন না। জঙ্গলে ঢুকলেও অনুমতি, দ্বিজপদর দোকানে গেলেও অনুমতি, এমনকী যজন-যাজনে বের হলেও মায়ের অনুমতি প্রার্থনীয়।

উঠোনে শাবল, খোন্তা সবই আছে, বাবা যে আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন, উঠোনে শাবল, খোন্তা দেখেই টের পেলাম।

"বাবা কোথায় ?"

"তোমার বাবাই জানেন। আমি কী করে বলব !"

তা হলে সকালে উঠেই একচোট হয়ে গেছে। আমার পিতাঠাকুর সম্পর্কে মাকে এতটা নিস্পৃহ হতে কমই দেখেছি। হঠাৎ কী হল আবার !

দাদার মুখও গম্ভীর।

মায়া ঠাকুরঘর থেকে উঁকি দিয়ে বলল, "একবার যাবি দাদা ?"

"কোথায় ?"

"বাবা রেগেমেগে খালপাড়ের দিকে চলে গেল !"

"কেন গেল ? কী হয়েছে !"

একটা ঘেয়ো কুকুর কোত্থেকে হাজির। দাদা কুকুরটাকে মেরেছে। তাড়া খেয়ে কুকুরটা পালিয়েছে।

"কুকুর ! কখন ! দাদা, তুই কী রে ! বাবা ভাবতেই পারেন গেরস্তের বাড়ি, কুকুর-বেড়াল থাকবে না, হয় ? যখন এসে গেল, কেউ তো আসে না, বাবা ভাবতেই পারেন, এতে গেরস্তের মঙ্গল হয়। কুকুর-বেড়াল যাই আসুক, আমাদের কত বড় অতিথি তারা ! বাবার সব হয়ে গেছে, কুকুর-বেড়ালের দেখা নেই, —যাও এল তাড়িয়ে দিলি !"

বাবার কথা ভেবে আমার খুবই খারাপ লাগছিল। এমন জায়গায় বাড়ি যে, একটা কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত দেখা যায় না। মা তো বাবাকে অহরহ খোঁচা দিতে ছাড়েন না, "বাড়ি না ছাই, তোমার বাড়িতে কুকুর-বেড়ালও আসবে না। কোন এক তেপান্তরে এসে শেষে খুঁটি গাড়লে !"

দাদার ওপর খেপে গিয়ে বললাম, "তুই মারলি, মারতে পারলি ?"

মায়া তাড়া দিচ্ছে। "যা না দাদা। বাবা কি কুকুরটার সঙ্গে দৌড়ে পারবে ? তুই যা দাদা।"

মায়া একলাফে বের হয়ে এল। ঠাকুরের বাসনকোসন ধুতে হবে ভুলে গেল। বাড়ি হয়ে গেলে মানুষের কাজও বাড়ে। সকালে উঠেই যে যার কাজে লেগে যায়। দাদা পড়তে বসে, বাবা জঙ্গলে ঢুকে যান, মা রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন। ঠাকুরঘর লেপামোছা মায়ার কাজ। আমরা কেউ বসে থাকি না। বাড়ি করার মজাই আলাদা। এমন একটা সুন্দর সকাল দাদাটা স্বার্থপরের মতো নষ্ট করে দিল।

"এই নে দাদা।"

মায়া আমার হাতে দু'খানা রুটি ধরিয়ে দিল। কুকুরটাকে রুটির লোভ দেখিয়ে যেভাবেই হোক আটকাতে হবে।

রুটি হাতে নিয়ে ছুটছি।

কিছুটা যেতেই দেখছি, বাবা একটা গাছের নীচে বসে হাঁফাচ্ছেন।

বাবা আমাকে দেখেও যেন দেখলেন না।

"কুকুরটা কোনদিকে গেল ?"

বাবা বললেন, "দ্যাখো কোথায় গেছে। তার যাওয়ার কি জায়গার অভাব আছে ! তোমার বাবার মতো তাকে ভাবলে চলবে কেন !"

তা অবশ্য নেই। সামনে খোলা মাঠ। তারপর সড়ক। সড়কে সেই চিরাচরিত দৃশ্য। দুটো-একটা গোরুর গাড়ি ঝিমোতে-ঝিমোতে এগোচ্ছে। মানুষজনের দেখা পাওয়াই কঠিন ! মনসাতলায় গেলে কুকুর-বেড়ালের দেখা পাওয়া যায়। সেখানে মানুষজন আছে, পাটের আড়ত আছে। মনিহারি মুদিখানার দোকান আছে। বাবার ভাষায়, কী নেই ! কারণ মানুষজন না থাকলে কুকুর-বেড়ালই বা মরতে আসবে কেন ! আমরা যে মানুষজনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম, সারমেয় উদয় হওয়ায় বাবা বোধ হয় তা টের পেয়েছিলেন। সে-সুযোগও দাদা হাতের কাছে পেয়ে নষ্ট করে দিল।

বাবা রুষ্ট হতেই পারেন।

"আপনি বাড়ি যান বাবা। আমি দেখছি।"

"কোথায় আর দেখবে !"

"আপনি বাড়ি না গেলে মা রাগ করবে।"

"তোমার মার রাগকে আমি থোড়াই পরোয়া করি। আমি বাড়িও যাব না, ভাতও খাব না। বামুনের বাক্য সরলে, পালন করতে হয়।"

আমি ডাকলাম, "তু তু।"

সাড়া নেই।

বাবাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, "আপনি যান, আমি কুকুরটাকে নিয়েই ফিরব।"

বাবা যেন কিঞ্চিৎ সাহস পেলেন। বললেন, "কুকুর হল মানুষের প্রিয় সঙ্গী। সেটা তোমরা বোঝো ! দাদা তোমার বোঝে ! তিনি বিদ্যাসাগর হবেন পড়ে। পড়া আর পড়া ! এ-বই নেই, সে-বই নেই। সবারই যেন সব কিছু থাকে ! একটা কুকুরকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। বাড়িঘরে থাকি না, কোথায় কবে ঘুরে মরি। বাড়িটা জঙ্গলের মধ্যে—একটা কুকুর থাকলে কত বড় ভরসা ! তাকে খেতে দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ?"

"সে হত না।"

হাতের রুটি দু'খানা হাওয়ায় তুলে দোলাতে থাকলাম। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, দু'পাশের জঙ্গলে যেখানেই দাদার মারের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকুক, ফের খাওয়ার লোভে ফিরে আসতে পারে।

"আর আসছে ! তোমার দাদা পরীক্ষা দিয়ে আমাকে উদ্ধার করবে ভাবছে ! তোমার মায়ের আশকারাতে সব আমার যেতে বসেছে ! কোথায় যে এখন খুঁজি ! ক্ষুধার্ত জীবকে এভাবে তাড়াতে হয় ! পাপ হবে না !"

রাস্তার দু'পাশে ধু-ধু মাঠ। মাঠের এখানে-সেখানে আকন্দ, সাঁইবাবলা, বৈঁচি, নিসিন্দার ঝোপঝাড়। উঁচু-নিচু মাঠের ঝোপঝাড়ে কোথাও কুকুরটা ঠিক লুকিয়ে আছে।

বাবা বললেন, "ছালবাকল ছাড়ানো প্রাগৈতিহাসিক দানবসদৃশ জায়গায় আমরা এসে উঠেছি। আবাদহীন পরিত্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে কুকুরটা কত বড় সম্বল, দাদা তোমার বুঝল না ! এমনিতেই

জায়গাটার অপবাদের শেষ নেই। ভূতির জঙ্গলে বাড়ি করেছি শুনলে আমার আপাদমস্তক লোকে দেখে। জলের দরে জমি বলেই তো এতটা জমি রাখতে পেরেছি। জায়গাটার মাপজোকও বিশেষ কিছু হয়নি। চৈত্র সংক্রান্তি আসতে-আসতে যতটা সাফ করতে পারি ততটাই আমাদের। এমন সুবর্ণ সুযোগ ক'টা মানুষের কপালে জোটে বলো! যাও একজন অতিথি এল, তাকেও তোমরা তাড়িয়ে দিলে!"

বাবার এই আফসোস টের পেলাম, যে করেই হোক কুকুরটাকে খুঁজে বের করতে হবে। কুকুরটাকে না নিয়ে যেতে পারলে বাবা আজ যে সত্যি অনশন করবেন! কী করি? আমি মাঠের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছি, আর হাত তুলে রুটি দেখাচ্ছি। যদি রুটির লোভে ঝোপঝাড় থেকে লেজ নাড়তে-নাড়তে বের হয়ে আসে!

বাবা তেমনই একটা ছাতিম গাছের নীচে বসে আছেন। ইতস্তত বড়-বড় তালগাছও আছে এদিকটায়। রাজারাজড়ার পতিত জমি। পড়ে আছে উরাট হয়ে। তার ভেতর বাবাকে খুবই অসহায় দেখাচ্ছিল।

বাবার জন্য আমার কেন এত কষ্ট হয়, বুঝি না! দেশ থেকে চলে আসার পর যা অবস্থা গেছে, কোনও স্টেশনে, না হয় কোনও পরিত্যক্ত মন্দিরে আমাদের অস্থায়ী আবাস ছিল এক সময়। বছরখানেক শুধু পোঁটলাপুঁটলি লটবহর নিয়ে এখানে- সেখানে ঘুরে মরা! একবার তো বাবা আমাদের একটা স্টেশনে ফেলে কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেলেন! মাসখানেক স্টেশনেই পড়ে থাকলাম। সবাই দুরছাই করে। আমরা কী খাই, কীভাবে দিন কাটে, কেউ ভাবে না। গাড়ি যায়-আসে, আমরা ছোটাছুটি করি গাড়ির জানলায়-দরজায়, যদি বাবা আমাদের গাড়ি থেকে নামেন!

সেই বাবা গাছের নীচে এভাবে বসে থাকলে কষ্ট না হয়ে পারে?

সেবারে বাবা গাড়িতেই ফিরেছিলেন, নামার সময় পোঁটলাপুঁটলির শেষ ছিল না। কোথায় কার আদ্যশ্রাদ্ধ করে কোরা কাপড়, চাল, ডাল, তেল, সিঁদুর, টাকা-পয়সা নিয়ে উদয় হয়েছিলেন। বাবার কথায়, দানছত্র— তা দানছত্র না হলে, কোরা থান, লালপেড়ে শাড়ি, কাঁসার থালা-বাসন, জামবাটি কত কিছু যে বাবা যত্ন করে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। চাল, ডাল, তেল, নুন ছিল না পুঁটলিতে। খবর পেয়ে চলে গিয়েছিলেন। ঘোরাঘুরি করে দেশের কিছু লোকজনের ঠিকানাও পান। সব সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর দেরি হয়ে গেছে।

সেই বাবাকে কী করে বোঝাই, কুকুরটা যখন এ-তল্লাটে ঢুকে গেছে, ঠিক আবার ফিরে আসবেই। কুকুর তাড়া খেয়ে বেশিদূর যেতে পারে না। মানুষের মুখ না দেখে কুকুর থাকতে পারে না। মনসাতলা পর্যন্ত এত রোদে যাওয়াও কুকুরটার কঠিন। সেখানে না গেলে মানুষজনের মুখই বা দেখতে পাবে কোথায়!

দূর থেকেই মনে হল, বাবা আমাকে ডাকছেন।

"যাই!" বলে ছুট লাগালাম।

আর গিয়ে যা দেখলাম, বাবার পায়ের কাছে কুকুরটা দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। বাবাকে ঠিক চিনতে পেরেছে। বাবার কী আহ্লাদ।

"দে, দে। রুটি দুটো দে।"

আমাকে দেখে ভালমানুষ বলে বোধ হয় বিশ্বাস হল না কুকুরটার।

ঘেউ-ঘেউ।

যাক, অনেকদিন পর একটি কুকুরের ডাক শোনা গেল।

পকেট থেকে রুটি দুটো বের করে দিলে আমার পায়ের কাছেও গড় হল। লেজ নাড়ল। তারপর খপ করে দুটো রুটিই গিলে ফেলল। আমরা হাঁটা দিলাম।

কুকুরটা পেছনে। বারবার পেছন ফিরে তাকাতে বাবা নিষেধ

করে দিলেন। এতে কুকুরের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। বিশ্বাস যখন জন্মেছে, তখন আর ভাবনা নেই।

যেতে-যেতেই বাবা বললেন, "কুকুরটার শরীরে দেখছি কিছু নেই। সেবাযত্ন দরকার। তুমি দৌড়ে গিয়ে জননীকে সামান্য হলুদ-চুন গরম করতে বলো। তাঁর মেজাজ প্রসন্ন থাকলে বলবে। না থাকলে মায়াকে ডেকে চুপিচুপি বলবে। কুকুরটাকে যে শেষপর্যন্ত পাওয়া গেছে, সেটা তোমাদের পক্ষে কত বড় সৌভাগ্য তোমরা জানো না। আর তোমার জননী তো স্বামী-সন্তান ছাড়া কিছু বোঝেন না। বুঝিয়েও লাভ নেই। যে যা বোঝে।"

অনেকটা রাস্তা ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছি। মায়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, "মা, দাদা এসেছে।"

আর সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম মাও বের হয়ে এসেছেন।

"তোমার বাবা কোথায় ?"

"আসছেন।"

"কুকুরটার খোঁজ পেলে ?"

"পেয়েছি। আসছে।"

দাদাও বের হয়ে এসেছে ঘর থেকে।

বেশ বেলা হয়ে গেছে বোঝা যায়। সকালের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে, বেলা বাড়লে সূর্যের তেজ বাড়ে। রোদে দাঁড়ানো যায় না। বাবার মতো দেখতে আমরাও এক-একজন কার্তিকঠাকুর। রোদে ঘুরে মুখ লাল হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে ছাতিম, শাল, শিশুগাছের ছড়াছড়ি। ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়েও টের পেলাম খুবই জলতেষ্টা পেয়েছে।

"বাবা কোথায় ?" দাদারও একই প্রশ্ন।

"বললাম তো, আসছে।"

তা হলে আমার বাবার জন্য সবারই চিন্তা হয়! ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল।

কেউ আর রাস্তা থেকে নড়ছে না। বাবাকে না দেখা পর্যন্ত শান্তি নেই বুঝি!

বাবার খোঁজে এবং কুকুরটার খোঁজেই যেন দাদা আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। সামনে যতদূর চোখ যায় বিশাল ব্যাপ্ত আকাশ। কিছুক্ষণ বাদে বাবা এবং কুকুরটি উভয়েই আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। মাথার ওপরে আকাশ এবং নিথর গাছপালা দাঁড়িয়ে। আকাশের এমন ব্যাপক উদাসীনতা কখনও আমি প্রত্যক্ষ করিনি। আমার বাবা ফিরছেন। পায়ে-পায়ে কুকুরটাও ফিরছে। আকাশের এই বিভূতির মধ্যেই কেমন অচেনা এক ডাক ভেসে আসে।

মায়া বাবার কাছে ছুটে যেতে চেয়েছিল। বললাম, "আগে তুই চুন-হলুদ গরম কর। চুন-হলুদ গরম না হলে বাবা এসে কিন্তু রেগে যাবে।"

মা বললেন, "ও কি পারবে ? আমিই যাই।"

বাবা ফিরে আসায় মা যে খুবই প্রসন্ন, টের পেলাম। কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার এই ফেরা— কোনও স্বর্গারোহণের দৃশ্য যদি মা টের পেয়ে থাকেন, কুকুরটা যে যমরাজ নয় কে বলবে! রামায়ণ-মহাভারতের দেশ থেকে আমার বাবা উঠে আসছেন যেন! আমার বাবা ফিরছেন, সঙ্গে ধর্মরাজ। গরিব বামুনের ঘরবাড়িতে এটা যে কতবড় খবর, বাবার মুখ দেখে টের পেলাম। বাড়িটা এতদিনেও বাড়ি মনে হচ্ছে কি না বাবার বোধ হয় সংশয় ছিল। ধর্মরাজ এসে যাওয়ায় বাবার সেই সংশয় আর থাকল না।

॥ ৩ ॥

সাঁঝ লাগলে মা বারান্দায় হারিকেন জ্বালিয়ে দিলেন। বাবার কিছু জীর্ণ পুঁথি আছে। এ-সময়টায় তিনি তাঁর পুঁথি পড়েন, আমাদের কাউকে তাঁর পুঁথি ধরতে দেন না। একটা থান কাপড়ে বাঁধা থাকে তাঁর সব পুঁথি, পুরনো পঞ্জিকা, চণ্ডীস্তোত্র, সামবেদ, হরিবংশ, একটি রুদ্রাক্ষের মালা এবং একটি গীতা। বাবা শুদ্ধ বস্ত্রে তাঁর পুঁথির পুঁটুলি খুলে 'হরিবংশ' বইটি জলচৌকিতে মেলে ধরার আগে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে নিলেন। আজ মনে হল হরিবংশ তিনি পড়বেন।

মায়া ধূপবাতি দিচ্ছিল ঘরে-ঘরে।

জঙ্গলে অন্ধকার নেমে আসছে।

মা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছেন।

একটা গোখরো সাপ উঠোনের ওপর দিয়ে চলে গেল।

মায়া 'সাপ' বলে চিৎকার করতেই বাবার ধমক, "সাপ কী! আস্তিক বলতে হয়।"

জঙ্গলে জোনাকি পোকা জ্বলছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছি। পাখির কলরব এবং জন্তু-জানোয়ারের চলাফেরার শব্দও কানে আসছে। ধর্মরাজ বাবার পাশে গুটিয়ে শুয়ে আছে। তাঁর স্নান, সেবা, পরিচর্যা একটু বেশিমাত্রায় হয়ে গেছে বলে তিনি নিদ্রাভিভূত।

বাবা কাকে যে উপলক্ষ করে কথাগুলি বললেন, বোঝা গেল না।

বললেন, "এভাবেই কোনও জনপদ গড়ে ওঠে। আবার তা ধ্বংস হয়েও যায়। মানুষের তো বসে থাকার সময় নেই। তাকে কর্ম করে যেতেই হবে। গুপ্তধনও মানুষই পায়। ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে একটি গিনি পাওয়া গেছে, ঠাকুরেরই দয়ায়।" বলেই তিনি চোখ বুজে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ সামান্য উন্মীলন করে আবার বলতে শুরু করলেন, "ঠাকুরের অশেষ কৃপা থাকলে সব হয়।"

তারপর আবার থেমে বললেন, "একদা বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সেকালে বারাণসীর কাছে কোনও গ্রামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের এমনই গুণ ছিল, তিথি-নক্ষত্রের যোগে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি যদি মন্ত্রপাঠ করতেন, আকাশ থেকে একসঙ্গে সোনা, রূপা, মণি, বৈদূর্য, হীরক—সব রত্ন ঝরঝর করে পড়তে থাকত। ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে একটি গিনি পাওয়া খুব একটা অচিন্তনীয় ঘটনা নয়, মনে রাখবে।"

বাবার এমন সব ঈশ্বরসদৃশ কথাবার্তা মা আমল দেন না। মা শুনছেন কি না জানি না। আমাদের উপলক্ষ করে জননীর উদ্দেশেই যে সব কথা বাবার, তাও আমরা জানি। পদে-পদে বাবাকে হেনস্থা করতে পারলে মা বাঁচেন। কখন না মা রান্নাঘর থেকে ফোড়ন কেটে বলেন, 'তোমার বাবাকে এবারে থামতে বলো। আর উপদেশ ঝাড়তে হবে না। যার এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব তার মুখে কোনও ধর্মকথাই শোভা পায় না।'

না, জননী আজ সত্যিই বাবার ওপর প্রসন্ন। একেবারে দরজার কাছে ছুটে এসেছেন। বারান্দায় বাবা। হারিকেনের আলো আর বাবার সামনে হরিবংশ বইটি খোলা।

মা দরজায় ঝুঁকে বললেন, "তারপর ?"

বাবা চোখ তুলে জননীর মুখ দেখলেন। হারিকেনের আলোতে মায়ের মুখও উদ্ভাসিত। জননী 'তারপর' বলায় বাবা অভিভূত।

বাবা একজন শ্রেষ্ঠ নরপতির মতো হাঁটু ঝাঁকাতে থাকলেন। "তারপর ? তারপরের তো শেষ নেই।" বিজ্ঞজনের মতো বাবা হয়তো মাকে এমনই বলতে পারেন। বাবার মুখ দেখে আমার এমনই মনে হল।

কিন্তু বাবা তদ্গতচিত্তে বললেন, "ইচ্ছাময়ী তাঁর করুণা অসীম। তারপর বোধিসত্ত্ব সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কথা শুনে তাঁর

শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তুমি আমায় বুঝেও বোঝো না!"

আমাদের দোষ বা গুণ যাই বলা যাক, বাবার কল্যাণে পুরনো পুঁথি থেকে আমরা অনেক খবর পেয়ে যাই। সব কাজেই বাবার নানা উপমা, কোথায় কবে কুরুক্ষেত্র, কেন কুরুক্ষেত্র, কেন ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ থাকতেও অভিমন্যু বধ হয়, তার ব্যাখ্যা বাবার মুখেই শোনা। বোধিসত্ত্বকে তাও আমরা জানি। গুরুবংশ হলে যা হয়! অবস্থাবিপাকে জঙ্গলে এসে উঠলেও রক্তে দোষটা থেকে গেছে। বোধিসত্ত্ব কে, এমন প্রশ্ন করলে মূর্খ বলে বাবা তিরস্কার করতেই পারেন।

গিনিটি নিয়ে বাবাকে আমরা যে কম উত্ত্যক্ত করিনি তাও নয়। বাবার এক কথা, "দেশটার কথা ভাববে, তার ইতিহাসের কথা ভাববে। মহাজ্ঞানী মহাজনের দেশ এটা। একটা সামান্য গিনি, ঠাকুরের ঘরে পাওয়ায় তোমরা এত বিচলিত বোধ করছ কেন বুঝি না! যুগের প্রভাবে আমরা সব হারিয়েছি, তা না হলে তোমার বাবার এমন দশা হয়?" তারপরই বাবা মন দিয়ে হরিবংশ বইটি পড়তে শুরু করে দিলেন। আমরা এখন যে যার জায়গায়। বোধ হয় বারান্দায় কুকুরটি বাবার একমাত্র অনুগত শ্রোতা। ধর্মরাজকে শ্রোতা পেয়ে বাবার তেজ বেড়ে গেছে। বেশ জোরে-জোরেই হরিবংশ পাঠ করছিলেন।

ওপাশের বারান্দায় দাদা আর-একটা হারিকেনের আলোয় পড়ছিল। বাবার হরিবংশ পাঠে দাদার পড়ার বিঘ্ন ঘটছে। দাদা এতে যথেষ্ট ক্ষিপ্ত হতেই পারে। বই ফেলে মায়ের কাছে ছুটে গেল। "আজ হয়ে গেল! পড়ার বারোটা বাজল। মা দয়া করে তোমার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণটিকে আস্তে পাঠ করতে বলো। আমার পড়াশোনা নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা আছে?"

"চিন্তা তাঁর ঠিকই আছে। পারছে না, কী করবে বল। তবু তো কিছু হচ্ছে। তিনি না থাকলে এটুকু কোথায় পেতিস? শেষে আর-একটা হারিকেনও তিনি কিনে এনেছেন। তোর পড়ার অসুবিধের কথা ভেবেই তো এনেছেন। কতক্ষণ আর পড়বে! সন্ধ্যাআহ্নিক আছে না! ঠাকুরের বৈকালি আছে না!"

বাবার প্রতি মাকে সবসময় রুষ্ট থাকতেই দেখেছি। আজ এটা কী হল! তবে মাও কি বিশ্বাস করেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো বাবাও তিথি-নক্ষত্র যোগে মন্ত্রোচ্চারণে গিনিটি লাভ করেছেন। ইচ্ছে করলে তিনিও কি একদিন আকাশ থেকে একসঙ্গে সোনা, রূপা, মণি, বৈদূর্য, হীরক এইসব রত্ন ঝরঝর করে নামিয়ে আনবেন! আমাদের অভাব থাকবে না, নতুন এক জনপদ তৈরি হবে। গাছপালা বৃক্ষ মিলে আমাদের এই একখণ্ড জমি যতই দুর্গম হোক, একদিন জননীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কৃপায় তা সুগম হয়ে উঠবে।

অন্য সময় হলে আমিই হয়তো বাবাকে তাড়া দিতাম, "এত জোরে পড়বেন না, আস্তে পড়ুন। দাদার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে।"

বাবা হয়তো কুপিত হতেন, কিছু ঠিক ভাবতেন, আমার দিকে তাকাতেন, কিংবা একটু উদাস হয়ে বলতেন, "নিশ্চয়ই, তোমার জননীর এটা ইচ্ছে।"

কারণ বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না, তাঁর ইচ্ছাময়ী আমাদের উসকে না দিলে মুখের ওপর কথা বলতে পারি, এত সাহস আমাদের অন্তত নেই। দাদার পড়ার যতই বিঘ্ন ঘটুক বাবাকে নিরস্ত করার এতটুকু জোর আজ আমি পেলাম না। বাবা বইটি বন্ধ করে মাথায় ঠেকালেন। রোজকার মতো আজও বললেন, "হরিবংশ পাঠে, শ্রবণে, কীর্তনে, দানে, বিতরণে পুণ্য হয়।"

যেন এই বাড়িঘরে বাবা সব অমঙ্গল দূর করে দেওয়ার জন্যই হরিবংশ পাঠ করছেন। আমরা ভাল থাকলে আমাদের জননী ভাল থাকবেন। বাবা ভাল থাকবেন। এতে দাদার পড়ার কতটুকু ক্ষতি হল বাবার মাথাতেই নেই। বললেও তিনি শুনবেন না। আর তখনই দেখি একজন কিম্ভূতকিমাকার লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় লোকটিকে দেখেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত। আর্তনাদ, "বাবা উঠোনে একটা লোক!"

বাবা নিমেষে চিৎকার করে উঠলেন, "কে? কে! কোথায় লোক!"

লোকটি পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। অসুরের মতো দেখতে। ঝাঁকড়া চুল, গায়ে ফতুয়া, হাফপ্যান্ট পরা—মা, দাদা, মায়া ভয়ে কাঠ। বাবা উঠোনে নেমে গেলেন হারিকেন হাতে। কিন্তু কোনও খোঁজাখুঁজি করলেন না। শুধু বললেন, "ও কিছু না। তোমাদের চোখের ভুল। আপাতত চোর-ডাকাতের উপদ্রবের কোনও কারণ আছে বলে মনে করি না।"

মা বললেন, "জলজ্যান্ত লোকটা উঠোনে দাঁড়িয়ে, তুমি বলছ আপাতত চোর-ডাকাতের উপদ্রবের কোনও কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না! পিলু দেখল, আমিও দেখলাম! লোকটা চালতে গাছের ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল!"

"তা হলে যাই।" বাবা হারিকেন হাতে উঠোন থেকে জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে যাওয়ার সময় যেন না বলে পারলেন না, "সবাই আমার চেয়ে বেশি বোঝে! চোর-ডাকাত দেখলে ধর্মরাজ স্থির থাকতে পারত! ঘাড় মটকে দিত না!"

একজন সদ্য-আসা অতিথি সম্পর্কে সমালোচনাও করা যায় না।

সঙ্গে-সঙ্গে বাবার হুঙ্কার উঠতেই পারে, "আসতে-না-আসতেই পেছনে লাগলে!"

ধর্মরাজের বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। তিনি বারান্দায় শুয়ে ছিলেন, এখনও আছেন, কখন আড়মোড়া ভাঙবেন তিনিই জানেন।

দাদা তাড়া লাগাল, "এই ওঠ। ওঠ বলছি।"

পিটপিট করে দু'বার চোখ মেলে তাকাল শুধু।

আমার কেন যে রাগ ধরে গেল! জঙ্গলটা তো ভাল না। বাবা জঙ্গলে জ্যোৎস্নায় বনদেবী পর্যন্ত দর্শন করেছেন, উঠোনে নেমে তু করতেই লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল কুকুরটা। বাবার সঙ্গে আমারও যাওয়া দরকার। দাদা ভয়ে বাইরে আসছে না।

মা বললেন, "তুই চালতেগাছের দিকটায় দ্যাখ।"

মা জানেন আমার বেজায় সাহস। পায়ে-পায়ে কুকুরটা থাকায় সাহস এখন তুঙ্গে। চেঁচামেচি করে লাভ নেই। আমাদের চেঁচামেচি গাছপালা জঙ্গল বাদে কারও শোনারও কথা নয়।

হঠাৎ দেখি মা চেঁচাচ্ছেন।

"আর যেতে হবে না। তোমার বাবাকে ডাকো। তিনি তো সত্যি দেখছি ডাকাত ধরতে জঙ্গলে ঢুকে গেলেন! আমি কি বলেছি একা যেতে! এই বিলু, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? যাও, তোমার বাবাকে চলে আসতে বলো। ডাকাত ধরে তোমার বাবাকে আর বীরত্ব না দেখালেও চলবে।"

বাবা যে সত্যি পুকুরের ওদিকটায় চলে গেলেন! গাছপালার ফাঁকে আলোও দেখা যাচ্ছে না। তারপর তো শুধু বিশাল শিরীষ, ছাতিম আর শালের জঙ্গল! কচুলতায় ছেয়ে আছে সব আগাছা। দ্রোণ ফুলের গাছগুলোয় সকাল হলে ফুল ফুটে থাকে। বেশ একটা বড় টিলার মতো জায়গা। ওখানে গেলেই কেন যে মনে হয় এই টিলার নীচেই আছে কোনও রাজার গুপ্ত সিংহাসন! তারপর আর যাওয়ার সাহস হয়নি, দিনের বেলাতেই গা-ছমছম। চারপাশে অজস্র গাছপালা, মধ্যিখানটায় ফুলের এই সমারোহ, আর টিলার ভেতর অজস্র গর্ত। গর্তের মুখে সাপের লেজ দেখে বাবার কাছে সেদিন ছুটে এসেছিলাম, সব শুনে বাবা বলেছিলেন গম্ভীর গলায়, "ও কিছু না। আমার ছেলে না তোমরা? সাপের লেজ দেখেই ছুটে এসেছ! এটা কোনও খবর হল! টিলাটা দেখে

বুঝলে না, কারা ওখানটায় থাকতে পারেন! মুনি-ঋষির বংশ তারা। কশ্যপ মুনির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ! এত বলি আমি যখন পাঠ করি...”

মা বাবাকে শেষপর্যন্ত নিরস্ত করেছিলেন, “মুনি-ঋষির গপ্পো পরে শুনবি। আগে গোরুটা মাঠে দিয়ে আয় পিলু।”

বাবা রুষ্টমুখে মায়ের দিকে কটমট করে তাকিয়েছিলেন শুধু, মা বাবাকে কেন যে গ্রাহ্য করেন না! তিনি পুত্রদের সৎ উপদেশ দিলেই মা ক্ষিপ্ত হয়ে যান।

দীর্ঘনিশ্বাস বাবার।

“সংসারে ধর্ম না থাকলে যে সব যায় দয়াময়ী!”

সেই বাবা সব কিছু অগ্রাহ্য করে এতটা ভেতরে ঢুকে গেলেন! হারিকেনের আলোও চোখে পড়ছে না। জ্যোৎস্নায় শুধু কীটপতঙ্গের আওয়াজ। সরসর শব্দ। অনেক দূরে রেলগাড়ির ঝিকঝিক, চারপাশ এত নিঝুম যে, আমাদের এমন অসময়ে ডাকাতের পিছু ধাওয়া করা পিতৃদেবের খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে। বাবা তো ঠিকই বলেছেন, আপাতত চোর-ডাকাতেরও উপদ্রবের কোনও কারণ দেখছি না। আছেটা কী যে, নেবে! ক'খানা থালাবাসন, সে তো একজন চোরের পক্ষেই যথেষ্ট। ডাকাতির কী দরকার?

যা হয় আমার, বাবার বিপদ দেখলে মাথা ঠিক রাখতে পারি না। ডাকাতদের খুব মাথাগরম হয়, যদি পেটে-পিঠে ছুরি বসিয়ে পালায়! মায়ের চোপার আতঙ্কেই বাবা জঙ্গলে ঢুকে গেলেন। চোখের ভুল মা মানতে রাজি না।

এখন বোঝো!

মা এখন রাগে আমাদের বকাঝকা করতে শুরু করেছেন। “আরে তোরা দাঁড়িয়ে থাকলি! যা, হারিকেন নিয়ে।\ কোথায় গেল মানুষটা? তাঁর কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান আছে!”

মা উঠোনে নেমে জঙ্গলের দিকটায় হেঁটে গেলেন কিছুটা।

বিড়বিড় করে বকছেন, “কী যে করি! আমার হয়েছে যত জ্বালা। ওরে শকুনের পাল, তোরা কি দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবি? মানুষটা একা জঙ্গলে ঢুকে গেল ডাকাত ধরতে, তোরা আছিস কী করতে! মরতে পারিস না!”

রেগেমেগে বললাম, “তাই মরব। কে বলেছিল, জলজ্যান্ত মানুষটা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে! কে বলেছিল, আমি দেখলাম, পিলু দেখল, তুমি বলছ চোখের ভুল! কে বলেছিল! এখন যত দোষ আমাদের!”

দাদা বলল, “গেছে যখন, আসবে। আমার পড়া আছে। আমি যেতে পারব না।”

মাকে নিরস্ত করা দরকার। এত রাতে মা জঙ্গলে ঢুকে গেলে বের হয়ে আসার রাস্তা খুঁজে পাবেন না। তা হলে আর-এক কেলেঙ্কারি, বাবাকে খুঁজতে মা গেলেন, মাকে খুঁজতে পুত্র গেল, কেউ আর ফিরল না, বাবার উপদেশামৃতের মধ্যে এমন গল্পও আমি শুনেছি।

একটা জঙ্গল একটা পরিবারকে এভাবে গিলে ফেলল! বাবার পুঁথিতে এমন অনেক কিসিমের গপ্পো আছে। পুস্তকে লেখা থাকলে মিছে কথা হয় না, শুধু বাবার কেন আমাদেরও বিশ্বাস। মুনি-ঋষিদের কোপে পড়ে গেলে সব হয়। জল, জঙ্গল, পাহাড় শুধু কেন, সমুদ্দুরেরও নিস্তার থাকে না। অগস্ত্য মুনি তো একটা আস্ত সমুদ্রই গিলে ফেলেছিলেন রাগ করে। বিন্ধ্য পর্বতেরও নিস্তার ছিল না। হেঁট হয়ে গড় করল মুনিকে, ব্যস, হয়ে গেল। আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না।

ইল্বল-বাতাপি দু'ভাইয়ের গল্পও বাদ যেত না। আসলে এইসব মুনি-ঋষিদের গল্প বলে সংসারে একজন গরিব বামুনের কত গুরুত্ব, তাই বোধ হয় আমাদের বোঝাতে চাইতেন বাবা। মুনি-ঋষিরা তো সবাই গরিব ব্রাহ্মণ। বাবা তাঁদের জ্ঞাতি ভ্রাতা, সোজা কথা?

ডাকলাম, “মা, আমি যাচ্ছি। তুমি যাবে না?”

আকন্দ ঝোপঝাড়ের কাছে মা দাঁড়িয়ে।

আশ্চর্য, বাবার ধর্মরাজের পর্যন্ত সাড়া নেই। বাড়িতে চোর-ডাকাত এলে তাড়া করবে না, হয়? এ কেমন কুকুর রে বাবা! তবে কুকুরটা বাবার পিছু-পিছু বোধ হয় জঙ্গলে ঢুকে গেছে।

দেখছি মায়াও আমার পিছু-পিছু আসছে।

“এই, বাড়ি যা।”

“একা ভয় করছে।”

তা ভয় করারই কথা। এত বড় একটা ঘটনা, কেউ নেই যে বলব, দেখুন আমার বাবা কখন ডাকাতের খোঁজে জঙ্গলে ঢুকে গেল, আর ফিরছে না। জ্যোৎস্না রাত। কার্তিকের শেষাশেষি বলে হিম পড়ছে। বাড়িটা থেকে সামান্য এদিক-ওদিক গেলেই আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এত ঘন গাছপালা যে, বাড়িঘর সব সহজেই চোখের ওপর অদৃশ্য হয়ে যায়। গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে যে একজন গরিব ব্রাহ্মণ বাড়িঘর করে বসবাস করছে, তখন বিশ্বাসই হয় না। রাতে আলো জ্বালা থাকে বলে, জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেলেও বোঝা যায়, বাড়িটা কাছেই আছে। আলো নিভে গেলেই মুশকিল, তখন ডাকাডাকি সার।

“ও দাদা রে!”

“ও মায়া রে!”

সেই মায়াও সঙ্গে যাবে বলে পিছু নিয়েছে।

“না, তুমি যাবে না। দাদা বাড়িতে একা। সবাই গেলে চলবে কেন? দাদা ভয় পাবে।”

মায়া কিছুতেই থাকতে রাজি না। অগত্যা বললাম, “আয়।”

মা আকন্দঝোপের পাশে দাঁড়িয়েই ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছেন।

আকন্দঝোপ পর্যন্তই যাওয়া যায়। পুকুরটা আকন্দঝোপের পাশেই। আপাতত আমাদের বাড়ির সীমানা ওখানেই শেষ। গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভেতর পুকুরটা। জরাজীর্ণ একটা ঘাটলাও আছে। দু'পাশের কাঁটাঝোপ কেটে বাবা পুকুরে যাওয়ার জন্য একটা সরু রাস্তা বের করে দিয়েছেন। মা যে সেখানে দাঁড়িয়েই আছেন দূর থেকেও বোঝা যায়। ভেতরে আর যাওয়ার সাহস নেই। চোর-ডাকাত না হোক, জলজ্যান্ত আমার বাবা সেখানে যে নেই, মায়ের ডাকাডাকিতেই বোঝা যায়। খুবই ম্রিয়মাণ আমি।

কাছে গিয়ে ডাকলাম, “বাবা, আপনি আমাদের ফেলে কোথায় ডুব মারলেন!”

মায়ের কাতর গলা, “ওগো শুনছ, এত রাতে আর চোর-ডাকাত ধরে কাজ নেই। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কখন খাবে, কখন ঠাকুর বৈকালি দেবে? তুমি গেলে কোথায়?”

বাবার এই একটা দোষ, কোথাও গেলে আর ফিরতে চান না। বাবার সঙ্গে দ্বিজপদর দোকানে গেলে এটা আরও বেশি টের পাই। গায়ে পড়ে আলাপ করায় বাবার জুড়ি পাওয়া কঠিন। বংশ উদ্ধার না করে ছাড়েন না। “আপনার নিবাস? পিতার নাম? পুত্রসন্তান ক'টি? কী করা হয়?” এইসব বিবিধ প্রকারের প্রশ্ন বাবা অনায়াসেই একের পর এক করে যেতে পারেন। বামুন মানুষ, উপবীতধারী, গায়ে নামাবলি—এতসবের ভরসাতেই বাবা বোধ হয় অকুণ্ঠচিত্তে এমন সব প্রশ্ন করতে পারেন। লোকটি বিরক্ত হতে পারে এটা বাবার মনে আদৌ আসে না। আর অবাক না হয়েও পারি না, লোকটি যখন বাবাকে গড় হয়, এবং অন্তু বাড়ির কোনও পূজাপাঠে বাবাকে ডেকেও পাঠায়।

কিন্তু এই ঘন বনভূমিতে বাবা কাকে আবার পাকড়ালেন! বিশাল সব বৃক্ষ ছাড়া সম্বল বলতেও তো কিছু নেই। হারিকেনও

জ্বলছে না। এমন একজন মানুষ যদি জঙ্গলে গিয়ে হারিয়ে যায় আমরা কী করি! মায়ের কাতর গলা, প্রায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে, নিজেকেই দোষারোপ করছেন মা।

"আমায় যে কী শনিতে পেয়েছিল, কেন যে তোমার বাবাকে বলতে গেলাম, তাই বলে এতটা সাহস দেখানো কি ভাল? তোমার বাবাকে জোরে ডাকতে পারছ না!"

"জোরেই তো ডাকছি।"

কুকুরটা যদি বাবার কাছে থাকে, বাবা সাড়া না দিলেও কুকুরটা সাড়া দিতে পারে।

"ধর্মরাজ, তুমি কোথায়!"

মা অগত্যা যেন না বলে পারলেন না, "কুকুর কি ধর্মরাজ বোঝে? তোমরা দেখছি সবাই বাবার মতিগতি পেয়েছ! বিলুটা তবু এসবে থাকে না। থাকলে সোনায় সোহাগা তোমাদের।"

তাই তো! কুকুর ধর্মরাজ বুঝবে কেন।

সঙ্গে-সঙ্গে "আ তু তু।"

আর কুকুরের সেই ঘেউ-ঘেউ শব্দ। সমস্ত গাছপালা কাঁপিয়ে—জঙ্গলের সব লতাপাতা বিদীর্ণ করে ছুটে আসছে কুকুরটা। এসেই মায়ের পায়ে গড়াগড়ি খেলে মা বললেন, "উনি কোথায়! কোথায় রেখে এলে তাঁকে।"

বাবার সাড়া পাওয়া গেল, "যাচ্ছি। তোমাদের জ্বালায় দু'দণ্ডেরও কী শান্তি আছে আমার! দিলে তো সব মাটি করে!"

জঙ্গলের ভেতর থেকেই বাবা সাড়া দিচ্ছেন। ঝোপঝাড় সরিয়ে বাবা বের হয়ে আসছেন।

"আপনার হারিকেন কোথায়?"

"হাওয়ায় নিভে গেছে।"

"নিভে গেছে তো ওখানে এতক্ষণ ধরে কী করছেন?"

বাবার শরীরে, মাথায় শুকনো পাতা, মাকড়সার জাল সব আটকে আছে। এ-বাবাকে আমরা চিনি—জঙ্গল থেকে বের হয়ে এলেই, মুখে, মাথায়, শরীরে গাছপাতা আটকে থাকে। কাছে আসায় মা পাতা, খড় সব বাছতে শুরু করে দিলেন। ফিরে এসেছেন এই ভাগ্য, আর কোনও অভিযোগ নেই তাঁর।

আমি বিরক্ত হয়ে না বলে পারলাম না, "বাবা, আপনি কি আবার অন্তর্ধানের মতলবে আছেন?"

"হ্যাঁ, তাই আছি! একটু বাড়িছাড়া হয়েছি, ত্রাহি মধুসূদন শুরু হয়ে গেল! কেন, কী হয়েছে, এতে অন্তর্ধানের কী দেখলে! তোমার জননী তো আমাকে ছাড়া সবাইকে চোর-ডাকাত ভাবেন। ডাকাত-ডাকাত বলে চিৎকার করতেই আদিনাথ বেকুফ হয়ে গেল।"

"কর্তা, আমি ডাকাত না, আদিনাথ। জঙ্গলেই থাকি। আপনার প্রতিবেশী। আলোটা নিভে যাওয়ায় প্রতিবেশীর মুখটা পর্যন্ত দেখা গেল না। ডাকাডাকি করলাম, ওরে একটা আলো দিয়ে যা—কেউ তোমরা সাড়া দিলে না। এই তো আমার পরিস্থিতি। আদিনাথ কী না ভাবল!"

তা হলে লোকটা আর ডাকাত নেই! বাবার আদিনাথ শুধু আদিনাথও নয়, বাবার প্রতিবেশী।

বাবা খুবই হৃষ্ট মন নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। কুকুরটা দৌড়ে আগে-আগে চলে গেল। বাবার হাতে হারিকেন। মা, মায়া সবাই ফিরছে। তবে মা খুবই বিপাকে পড়ে গেছেন বোঝা যায়। ঝড় ওঠার আগের মতো মা থম মেরে আছেন। মা যে লোকটিকে তবে সত্যি দেখেছেন! আমিও দেখেছি! দেখে তাকে কোনও কারণেই মনে হয়নি সে আমাদের প্রতিবেশী হতে পারে। প্রতিবেশী হলে এতদিন কোথায় ছিল? জঙ্গলে থাকে কী করে! তার ঘরবাড়ি থাকবে না! দুর্গম এই অরণ্যভূমিতে বাবা ছাড়া আর কেউ ঘরবাড়ি করে থাকতে পারে, মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে

পারছেন না।

তারপরও হাজার কথা, প্রতিবেশী হলে ছুটে পালাল কেন! রাত করেই বা উদয় কেন! চেহারাটা দস্যুর মতো। সেই লোকটা আদিনাথ এবং প্রতিবেশী—মা কেন জানি ভাল বুঝলেন না।

বাবা বাড়ি ফিরে বালতির জলে হাত-মুখ ধুলেন। সারা গায়ে জল ছিটাবার সময় বললেন, "ওঁ নমঃ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।" তারপর খড়ম পায়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন। পেতলের সিংহাসনে একটি নারায়ণ শিলা, কাঠের সিংহাসনে অষ্টধাতুর রাধাগোবিন্দর মূর্তি। ফুল-বেলপাতায় ভর্তি। সব সরিয়ে ঠাকুরের শয্যা পাতলেন। তারপর ধূপ-দীপ জ্বাললেন, ঘণ্টা, কাঁসর, শঙ্খ সব নিয়মিত যেভাবে বাজে, বাজল। শেষে শেকল তুলে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমাদের সবার মাথায় ফুল-বেলপাতা ছোঁয়ালেন। হাতে বৈকালির প্রসাদ-বাতাসা দিলেন—এই পর্যন্ত মোটামুটি শান্তিতেই কেটে গেল।

বাবা খেতে বসলেও মা কোনও কথা বললেন না।

আমরাও খেতে বসেছি। কুকুরটা উঠোনে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়া দেখছে। মুসুর ডাল, বেগুনভাজা আর বনআলুর ডালনা। খুবই মুখরোচক খাবার। আমরা বেশ তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছি। বাবাও চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন। মা মাঝে-মাঝে যে বাবাকে আড়চোখে দেখছেন তাও টের পেলাম। কিন্তু কোনও রা করছেন না। কারণ মা জানেন, এই আদিনাথ-অভিযানের গল্পটি বাবার অনেকদিন চলবে।

আমি আর ধৈর্য ধরতে না পেরে বললাম, "আদিনাথকে নিয়ে বাড়ি চলে এলেই পারতেন। জঙ্গলে বসে থাকলেন, আমাদের চিন্তা হয় না!"

"চিন্তা! চিন্তা কেন! বাড়িতে বিগ্রহ আছে, তোমাদের চিন্তা করার কে অধিকার দিল!"

বাবার খাওয়া শেষ। মার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

"তাই বলে হারিকেন নিভিয়ে জঙ্গলের মধ্যে গপ্পে মজে গেলে! আদিনাথই বা কেমন মানুষ, জঙ্গলে পোকামাকড়ের ভয় নেই! সে জঙ্গলে অন্ধকারে বসে থাকতে পারল!"

"আরে, হাওয়ায় হারিকেন নিভে গেলে তার কী দোষ! ওকে তো খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। আন্দাজে জঙ্গলে ঢুকছি, হারিকেন নিভে না গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া যেত বলেও মনে হয় না। ভাগ্যিস নিভে গেল!"

"ভাগ্যিস তোমার মতো মানুষের হাতে হারিকেন ছিল! তা না হলে নেভে, তা না হলে সে সাড়া দেয়! অন্ধকার বলেই টের পেয়েছে তুমি যে-সে মানুষ না। তার তুমি দোসর।"

"দ্যাখো দয়াময়ী, তোমার ক্ষোভের কোনও কারণই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। হারিকেন নিভে যাওয়াটা কি খুবই দোষের!"

আমি আর পারলাম না।

"আজ্ঞে, না বাবা। দোষের না। তবে হাতে আলো থাকতে সাড়া দিলেই বোধ হয় ভাল করত আদিনাথ। আপনাকে নিশ্চয়ই অনুসরণ করছিল।"

"তা করতেই পারে। তার এখন শিরে সংক্রান্তি, তার কি মাথার ঠিক আছে!" এটা যে খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা, বাবাকে বোঝানোও মুশকিল।

মা জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, "কী হয়েছে ওর!"

"কী হয়েছে তা বলতে পারব না! তবে ভাল নেই, কথাবার্তায় বুঝেছি। সে জঙ্গলটায় অনেকদিন থেকেই আছে। অনেকদিন থেকেই একজন নিষ্ঠাবান বামুনের খোঁজে ছিল। তার গৃহে পায়ের ধুলো দেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করল।"

"পায়ের ধুলো দিয়ে এলেই পারতে!"

"সেটা আর হল কোথায়। অন্ধকারে যাই কী করে?"

"সে যেতে পারলে, তুমি যেতে পারবে না কেন?"

"অন্ধকারে তাকে দেখা গেলে চেষ্টা করা যেত। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। যেন সেই যে শিরীষ গাছটা—যার মাথা উঠোন থেকে দেখা যায়, তার এ-পিঠে আমি, আর..."

"আর ও-পিঠে কে?"

"মনে হল আদিনাথ।"

"তা হলে তুমি আর আদিনাথ গাছের দু-পিঠে বসে?"

"মনে হয় তো তাই। কত কথা বলল, বাবার নাম যদুনাথ, পিতামহর নাম বৈদ্যনাথ—গাজলের ওদিকে দেশ..."

"থামো। ও আমার উঠোনে কেন মরতে এসেছিল?"

"আমরা কেমন আছি, ঘরবাড়ি কতদূর হল, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে এসেছিল!"

"তার এত দায় কিসের!"

"সে তো জানি না।"

"সোজা বলে দিচ্ছি, সে যেন এভাবে আসে না। বাড়িতে ছেলেপুলে নিয়ে একা থাকি, রাতবিরেতে একটা ষণ্ডামার্কা লোক উঠোনে উঠে এলে সে তোমার যত বড় প্রতিবেশীই হোক ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।"

"যাও একজন প্রতিবেশী জুটল, তাও যে যায় দেখছি দয়াময়ী!" বাবা কী ভেবে শেষে বিছানায় বসে কালীস্তোত্র পাঠ শুরু করে দিলেন। মায়ের সঙ্গে আর একটা কথাও বললেন না।

॥ ৪ ॥

সকালেই অবাক কাণ্ড! মায়া ঠাকুরের থালাবাসন বের করে ঘর লেপতে গিয়ে কী একটা পেয়ে গেল। সে ছুটে এসে মাকে কী দেখাচ্ছে। বাবা পাশে কোথাও জঙ্গল সাফ করছিলেন। আমি গোরুটা বের করছি। উত্তুরে হাওয়া উঠে আসছিল। শীত এবার জাঁকিয়ে পড়বে। ঘাসে, পাতায় শিশির জমে আছে। দাদা চাদর গায়ে বারান্দায় পড়তে বসে গেছে।

ঠিক সেই সময় মা'র ডাকাডাকি শুরু।

"ওগো শুনছ, শিগ্‌গির এসো।"

আমি ছুটে গেছি। মা'র হাতে চকচক করছে একটা মোহর।

মায়া বলল, "ঠাকুরঘরে পেয়েছি।"

বাবার যেন কোনও তাড়া নেই। ঝোপজঙ্গল থেকেই বললেন, "পাওয়া গেছে যখন, তুলে রাখো। দ্বিজপদকে দিয়ে দিলেই হবে। যা ব্যবস্থা করার সে-ই করবে। আমার আবার রক্ষাকালীর পুজো আছে। সকাল-সকাল বের হব। নিবারণ দাসের আড়তে পুজো।"

বাবার ওপর বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। কোনও চেদ্‌ভেদ নেই। মাকে বললাম, "মা, এটা গিনি?"

মা বললেন, "চুপ।"

"দাও দেখি। গিনি কেমন দেখতে হয়, দেখি।"

"না। তোমার বাবা রাগ করবে।"

বাবা কাঁটানটের ঝোপ সাফ করছিলেন। সেখান থেকেই বললেন, "দাও, দেখতে যখন চাইছে দেখুক।"

হাতে নিয়ে গিনিটি দেখছি। দাদাও একলাফে বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে গেল। একটা তামার পয়সার মতো বড়, মহারানী ভিক্টোরিয়ার মুখ মুদ্রাটিতে ছাপ মারা। দাদা দেখল হাতে নিয়ে, মায়াও দেখল। কেবল আমার বাবাই নিস্পৃহ—যেন ঠাকুরেরই ইচ্ছে, সব তাঁরই কৃপা, গিনিটি দ্বিজপদকে দিলে দু-আড়াই মাস সে আমাদের চাল, ডাল, তেল, নুনের ব্যবস্থা করে দেবে। দু-পাঁচ টাকা দরকারে বাবা চেয়েও নিতে পারবেন। কিন্তু কে ঠাকুরঘরে গিনিটি রেখে যায়! এত বড় রহস্য বাবাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না।

এমন গুরুতর বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনাও করা যায় না। মা কি শেষে বাবাকে সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো ক্ষমতাবান ভেবে

ফেললেন ! কাল যে লোকটা রাতে উদয় হল, সে কে ? বাবার আদিনাথ কাজটি করে যায়নি তো ! কে জানে শেষে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণের বিনিময়ে তিনি প্রণামী রেখে গেলেন কি না ! বাবাকে না বলে পারলাম না, "এটা বাবা আদিনাথেরই কাজ। আর কেউ তো আসেনি।"

মা বললেন, "তুমি চুপ করবে !"

"কেন, আদিনাথ হতে পারে না !"

"যেই হোক তিনি খুব দয়ালু, তাঁকে নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি না করলেও চলবে।" মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বাবা আমার দিকে তাকালেন।

বাবার কথায় কেন যে মনে হল, তা হলে বোধিসত্ত্বও হাজির বাড়িতে। রাতে তিনি, আমরা কেমন আছি দেখতে এসেছিলেন স্বচক্ষে। জঙ্গলে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন খবর পেয়েই আদিনাথ হয়ে আমাদের এখানে উদয় হয়েছেন। বাবাকে এখন আর লঘুভাবে দেখা ঠিক হবে না।

ডাকলাম, "বাবা ?"

"বল।"

"বোধিসত্ত্ব আদিনাথ হয়ে আসেনি তো !"

"তা কী করে হবে। ওঁরা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন না। আত্মা মানেন না।"

"তা হলে তো খুবই ঝামেলা।"

"ঝামেলা ভাবলেই ঝামেলা। আমরা জন্মান্তর বিশ্বাস করি, ওরা করে না। আকাশ এবং নির্বাণ এ দুটোই ওরা নিত্য ভাবে, আর সব অনিত্য।"

"তা হলে বলছেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুনর্জন্ম হতে পারে—বোধিসত্ত্বের হতে পারে না।"

"পারে না বলছি না, হওয়া উচিত নয়।"

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বহু পুনর্জন্ম সেরে শেষে এই জঙ্গলে অনায়াসেই ঘরবাড়ি করতে পারে, কিন্তু বোধিসত্ত্ব আদিনাথ হয়ে জঙ্গলে তাঁর প্রতিবেশী হতে পারে না।

আবার ডাকলাম, "বাবা !"

মা বললেন, "আর বাবা-বাবা করতে হবে না। এখন একটু দয়া করে পড়তে বোসো। এখানে এসে তো তোমার পাখা গজিয়ে গেল। বই খোলার নামগন্ধ নেই।"

বেশি আর বাবা-বাবা করা ঠিক হবে না। মা মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়ে আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করছেন। পড়ার কথা বললেই গায়ে জ্বর আসে। সকালে উঠে পড়াশোনা যে করছি না তাও ঠিক। আমার পড়া নিয়ে বাবার কোনও তাড়া নেই। হবে, সবই হবে। সময়ে সব হয়। বড়টা তো পড়ার নাম করে সংসারের কুটো গাছটি নাড়ে না। ছোটটির যদি পড়ার বাই ওঠে, বাবা যায় কোথায় ! তার ফুট ফরমাশ খাটার আর কে আছে !

"যাও, বাজারে যাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভাঙা সাইকেল ঠেঙিয়ে বাজারে।

"যাও হরীতকী নিয়ে এসো।"

"জঙ্গলে ঢুকে হরতুকি নিয়ে আসি।"

"ফুল বেলপাতা লাগে।"

সঙ্গে-সঙ্গে ফুল-বেলপাতা হাজির।

"একশো একটা তুলসীপাতা তুলে রাখবে।"

ঠিক গুনে-গুনে তুলে রাখি।

সেই বাবা আর কোন মুখে বলেন, "গুনে-গুনে অঙ্কক'টি সেরে ফেলো।" বললেও করি না। বাবার মেলা কাজ পড়ে থাকে। কোদালটা দোকানে দেওয়া দরকার। পিটিয়ে সোজা করে দেবে। মা পড়ার কথা বললেন তো বাবার নির্দেশ, "শহরে মানুর

কাছে গিয়ে খবর নাও, অনাথবন্ধু চিঠি দিল কি না ! কতদিন হয়ে গেল !"

আত্মীয়টির 'কেয়ার অফে' আমাদের চিঠিপত্র আসে। শরৎ মাঝির কাছে চিঠিও আসত। খবরাখবর সব আমাকেই নিতে হয়। শরৎ মাঝির কাছে বাড়ি, জমি বাবা বিক্রি করে এসেছেন, যৎকিঞ্চিৎ বাবার হাতে ঠেকিয়ে বলেছেন, 'বাকিটা হুণ্ডি করে পাঠাব। সঙ্গে নিয়ে গেলে দর্শনায় সব কেড়েকুড়ে রেখে দেবে।' সেই হুণ্ডি এখন বাবার কাছে ভূশণ্ডির মাঠ হয়ে গেছে। বাবা এ-দেশে আসার ক'মাস পরেই চিঠি, "কর্তা আমার টাকা ক'টা ফেরত দিবেন, জমি জায়গায় আমার কাজ নাই। নিজেই দেশান্তরী হব, ভাবছি।" টাকা ফেরত দেওয়ার আতঙ্কে বাবা নিজেই এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এখানে এসে উঠলেন বোধ হয় সেই কারণে। যতদিন আত্মগোপন করে থাকা যায় !

মা ফের গজগজ শুরু করে দিয়েছেন, "পড়াশোনার পাট চুকিয়ে শেষে তুই গোরু চরাবি ভাবছিস !"

"ভাবব কী ! গোরু তো চরাচ্ছি।"

"শুনলে, তুমি শুনলে !"

বাবার তখন আপ্তবাক্য, "দয়াময়ী, প্রকৃতিস্থ হোন। জীবমাত্রেই শিব। তাঁকে খাটো করবেন না। যে যেভাবে বাঁচে ! তাড়া দিলে কি সব হয় ? হওয়ার হলে আপনি হয়। দেশ ছেড়ে এসে দেখলেন তো জলে পড়ে যাইনি। দুশ্চিন্তা করে কি কোনও লাভ আছে !"

বাবার এহেন কথায় সাহস পেয়ে গেলাম।

"বাবা গিনিটি দাও, দ্বিজপদকে দিয়ে আসি। তুমি আবার এতটা পথ হেঁটে যাবে ! বেলা কাবার করে তোমাকে ফিরতে হবে।"

"তা হোক। আমিই দিয়ে আসব।"

হল না। বাড়িতে থাকলেই জননী পড়া নিয়ে তিতিবিরক্ত করে মারবেন। কী করি ?

"আদিনাথ কোথায় থাকে দেখে আসব ? তোমাকে যে পায়ের ধুলো দিতে বলল। আমি দিলে হবে না !"

"হবে। তবে খুঁজে কি পাবে ! আদিনাথ আবার আসবে। ঘোর সঙ্কট দেখা দিলেই আসবে। তোমরা কী খাও, জননীর তোমার সংসার চলে কী করে, সবই সে বোধ হয় জানে। আশা করি তোমার মা আর তার ঠ্যাং ভেঙে দিতে সাহস পাবেন না।"

তা হলে কি আদিনাথেরই কাজ ! সেই-বা গিনি পাবে কোথায়। সেও তো আমাদের মতো গরিব মানুষ। ষণ্ডামার্কা মানুষ হলে কি গরিব হতে নেই ? কিংবা ওটা তার ছদ্মবেশ।

ডাকলাম, "বাবা ?"

"বলো।"

"আদিনাথ জঙ্গলের কোনদিকটায় থাকে জানো ? কিছু বলেছে !"

"বলল তো, জঙ্গলের ভেতরে কোথায় একটা পরিত্যক্ত ইটের ভাটা আছে। সেখানে সে আর তার পরিবার থাকে।"

"চলে কী করে ?"

"এই তো মুশকিলে ফেললে ! তার কী করে চলে জানব কী করে ? যিনি চালাবার তিনিই চালাচ্ছেন। আদিনাথ নিমিত্ত মাত্র। নিমিত্তমাত্র বোঝো ?"

"তা বুঝি।"

মায়া হঠাৎ কথার মধ্যে নাক গলাল, "বাবা, মা তোমাকে ডাকছে।"

বোধ হয় আদিনাথকে নিয়ে মা চান না আমরা বেশি কথা বলি। বাবাকে সেজন্য ডেকে পাঠিয়েছেন।

হে বাবা, মায়ের এটা কী আবদার !

"হ্যাঁগো, এর থেকে দু'গাছা সোনার চুড়ি গড়িয়ে নিলে হয় না !"

"দু'গাছা করালে আর কিছু থাকবে ! দ্বিজপদর দেনা শোধ হবে কী করে !"

"কেন, তোমার আদিনাথ আছে না ! সে আবার একটা ঠাকুরঘরে ফেলে রেখে যাবে। গিনিটা না ফুরালে সে কি আর একটা গিনি দিতে উৎসাহ পাবে !"

বাবা মাথা চুলকে বললেন, "তা অবশ্য ঠিক। দয়াময়ীর যখন ইচ্ছে হয়েছে, তাই হোক।"

॥ ৫ ॥

এক সকালে দেখি পেটমোটা হেঁড়ে মাথা একজন লোক এসে হাজির। সঙ্গে দ্বিজপদ। গায়ে ফতুয়া, হাঁটুর ওপর ধুতি, মাথায় কদমছাঁট এবং পায়ে কেড্‌স জুতো। মানুষজনের সাড়া এদিকটায় এমনিতেই পাওয়া যায় না। সকাল-বিকেল শুধু কাক ডাকে। শালিখের কিচিরমিচির আওয়াজ, ঘুঘুপাখির ডাকও শোনা যায়। ধর্মরাজ আমার এখন সঙ্গী। যেখানেই যাই সে সঙ্গে থাকে। হঠাৎ দেখলাম ধর্মরাজের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে দ্বিজপদকে দেখে।

বাবা গন্ধরাজ লেবুর কলম লাগানোর ব্যবস্থা করছেন। একটি বাতাবি লেবুর গাছও লাগিয়ে দিয়েছেন, আমাদের দেশের বাড়িতে যেখানে যে গাছটি ছিল, অনুরূপ সেই-সেই দিকে ফলের গাছ রোপণ করে যাচ্ছেন। দ্বিজপদকে দেখেই বাবার কাছে ছুটে গেলাম। আমাদের বাড়িতে এই সাতসকালে দ্বিজপদ কাকে নিয়ে হাজির, বুঝতে পারছি না ! মা ঘোমটা টেনে একবার বারান্দায় উঁকি দিয়ে গেলেন। বারান্দা থেকে রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। ইদানীং বাবার লাগানো স্থলপদ্ম গাছ এবং শিউলিগাছটা বড় হয়ে যাওয়ায় রাস্তার বাকি অংশটা আড়াল হয়ে গেছে। কিন্তু উঠোনেই দু'জন লোককে দেখে মা খুবই ঘাবড়ে গেলেন। মা দ্বিজপদর নাম শুনেছেন। তার দয়াতেই বলতে গেলে আপাতত অন্নকষ্ট ততটা নেই। দ্বিজপদ বাবার পুজোআর্চার দিকটা দেখে। তবে দ্বিজপদকে মা কখনও দেখেননি। নিবারণ দাসের আড়তে রক্ষাকালীর পুজোও দ্বিজপদর কল্যাণে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের খবরটি সে-ই নিবারণ দাসকে দিয়েছিল।

বাবা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"কী সৌভাগ্য ! আপনারা ? ওরে মায়া, দুটো আসন পেতে দে।"

দ্বিজপদই বলল, "দাসমশাই ধরে নিয়ে এলেন। ভুতির জঙ্গলে ঠাকুরকর্তা বাড়িঘর বানিয়ে কেমন আছেন দেখার খুব বাসনা। দুর্জয় সাহস না থাকলে হয় না। সাধক মানুষের পক্ষেই সম্ভব।"

দ্বিজপদ এবং নিবারণ দাস দু'জনেই বাবার পায়ের কাছে সটান গড় হল। পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায়-মুখে ঠেকাল। বাবা আড়চোখে দরজার ভেতরে কেউ আছে কি না দেখছেন। কাকে তিনি খুঁজছেন, বুঝতে কষ্ট হয় না। দ্যাখো, বোঝো, তোমার হেনস্থার শেষ নেই—এরা কারা, জানো !

মায়া ফুলতোলা দুটো আসন বারান্দায় পেতে দিয়েছে। তারপরই বাবার আফসোস, "আপনারা এলেন, বসতে দেওয়ার মতোও কিছু করে উঠতে পারিনি। বস্তা কেটে আমার কন্যা ... এই মায়া এদিকে আয়, ফুলতোলা আসন বানিয়েছে। মন্দ হয়নি কী বলেন !"

বাবা তাঁর বড় পুত্রকে ডেকে বললেন, "এদিকে এসো।"

দাদা বারান্দায় এলে বললেন, "দাসমশাই, এই আমার বড় পুত্র। এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।"

খুবই গৌরবের ব্যাপার। এনট্রান্স পরীক্ষা, সোজা কথা ! আমাদের গাঁয়ে, আপনার তো পাঁচদোনার দিকের খবর জানা আছে। আরে পাঁচদোনার অম্বুজাক্ষ রায়ের মেজো ছেলে, মনে

আছে পড়ার চোটে মাথা খারাপ হয়ে গেল। পরীক্ষায় পাশ করল, খুব ভাল পাশ, কী মেধাবী—তারপর কী যে ধন্ধ লেগে গেল তার ; এত পড়াশোনা করলে মাথার ঘিলু হজম হয়ে যেতেই পারে।"

"তোমার নাম কী বাবা ?"

দাদা নাম বললে নিবারণ দাস খুবই প্রীত হলেন।

"উন্নতি করো বাবা। কর্তাঠাকুরের মুখ উজ্বল করো। ঠাকরুনকে দেখছি না !"

বাবা এবার মাকে ডেকে পাঠালেন। মা দরজায় ঘোমটা টেনে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালে নিবারণ দাস ভূমিষ্ঠ হয়ে বললেন, "মা মা, আপনার দয়াতেই সব।"

আমি খুবই আড়ষ্ট হয়ে গেছি। হেতুটি যে কী, বুঝতে পারছি না। বাবা সাধক মানুষ, মায়ের দয়ায় নিবারণ দাসের সব হচ্ছে, এত শ্রদ্ধাভক্তি কী খুব ভাল !

দ্বিজপদ বলল, "দাসমশাই, স্বপ্নে কী দেখেছেন এবারে বলেন ! কর্তা কী বলে শুনুন।"

দাসমশাই বললেন, "সাক্ষাৎ মা জননী শিয়রে এসে দেখা দিলেন। কর্তা, আপনার পূজায় তিনি খুবই সন্তুষ্ট। তিনি আদেশ করলেন, 'সকালে উঠে কারও মুখ না দেখে সোজা ভুতির জঙ্গলে চলে যাবি। একটা পঞ্জিকার আবদার করেছে। বেশি কিছু তো চায়নি। তাও তুই ঘোরাচ্ছিস !'"

বাবা কেমন আপ্লুত গলায় বললেন, "সাক্ষাৎ মা-জননী—বলেন কী ! সবই নারায়ণের কৃপা।"

"আজ্ঞে কর্তা। মা জননীর মুখ দেখে যে সব ধরে ফেলেছি।"

আমার আর বাক্য সরছে না। বাবার দয়াময়ীর এই কী করুণা ! তিনি স্বপ্নে দেখা দিতে পারেন ! পাগল নাকি লোকটা ! আমার মা বেশি হলে রাস্তা পর্যন্ত যান। পুলিশ ক্যাম্পের কল থেকে দু'ঘড়া জল আমাকেই বয়ে আনতে হয়। দেবীর মুখের সঙ্গে মায়ের মুখ মিলে যাওয়া তো ভাল কথা নয় !

ক'দিন আগে নিবারণ দাসের রক্ষাকালী পূজা করে বাবা বেশি কিছু যে পেয়েছেন তাও না। পুরোহিত বস্ত্র, দেবীবস্ত্র কিছুই দেননি। সব কাজ গামছা দিয়ে সেরেছেন। দক্ষিণাও নাম মাত্র। ভোজ্যও সামান্য। চাল আর কাঁচকলা, হলুদ। লোকটি খুবই যে কৃপণ তাও টের পেয়েছি। তাঁর কাছেই বাবা একটি পঞ্জিকার আবদার করেছিলেন, ব্রাহ্মণের বাড়িতে নতুন পঞ্জিকা না হলে চলেও না। তিথি-নক্ষত্রের খবর, দিনক্ষণের শুভ-অশুভ, মনসাতলায় গেলে বাবার কাছে আজকাল লোকের ভিড় হয়। পঞ্জিকা না থাকায় কিছু বলতেও পারেন না। দেশের লোক নিবারণ দাস এখানে এসে আড়ত করেছেন, দ্বিজপদই বাবাকে খবরটা দিয়েছিল। দেশের লোক না বলে মুল্লুকের মানুষ বলাই ভাল। বাবার নাম শুনেই চিনতে পেরেছেন। অগাধ অর্থের মালিক এবং বিষয়ী লোক। সম্পত্তি হস্তান্তর করে এ-দেশে এসেছেন। এক কপর্দকও তাঁর খোয়া যায়নি। দেশের মানুষের কাছে বাবা আবদার করতেই পারেন। দোষের না।

বাবা জলচৌকিতে বসে। মা চা করছেন অভ্যাগতদের জন্য। মায়া মার সঙ্গে রান্নার চালায় ব্যস্ত। দাদা উচ্চৈঃস্বরে পড়ছে। দাদা কত কঠিন-কঠিন বিষয় পড়ে, এদের বোধ হয় জানানো দরকার। গরিব ব্রাহ্মণের পুত্র হতে পারে, তাই বলে বিদ্যাচর্চার কোনও খামতি নেই পরিবারে।

আমি কিছুটা নির্বোধের মতোই শুধু সব দেখছি, শুনছি। আমার সম্পর্কে বাবারও খুব একটা আগ্রহ নেই।

"এক গ্লাস জল খাব কর্তা।"

"খালি পেটে জল খাবেন !"

আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, "যাও, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন !"

এক গ্লাস জল এল। রেকাবিতে একটা বাতাসা।

তারপরই দ্বিজপদ আসল কথায় বোধ হয় এল।

"দাদামশাই আর যেন কী আর্জি আছে !"

"ও তেমন কিছু না। একটি নতুন পঞ্জিকা।"

দাসমশাই নতুন পঞ্জিকাটি অম্লান বদনে বাবার পায়ের কাছে রেখে ফের ভূমিষ্ঠ হলেন।

"কর্তার কাছে সবই নির্ভয়ে বলতে পারেন।"

বাবা সত্যি সদাশয় হয়ে গেছেন। একটা আস্ত নতুন পঞ্জিকা, না, ভাবা যায় না। পঞ্জিকার পাতা ওলটাচ্ছেন। আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখার অবশ্য এখন সময় নেই। তবে আগামী কিছুদিন যে তিনি এই পুস্তকখানি হাতছাড়া করবেন না, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

দ্বিজপদই বলল, "গিনি কি অবশিষ্ট কিছু আর আছে ? দাসমশাই সবক'টির উপযুক্ত মূল্য ধরে দেবেন।"

এই রে ... এত বড় গোপন খবর ফাঁস হয়ে গেল ! দ্বিজপদ ছাড়া আর কেউ বাবার কাছে গিনি আছে জানে না। ধার-দেনায় ডুবে থাকলে যা হয়, বাবা দ্বিজপদকে গিনিটি দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবারের গিনিটি বাবার কাছে, না, মার কাছে তাও জানি না। বাবার নানা বাতিক আছে তাও জানি। গুপ্তধন সবার সয় না। এজন্যও বাবা বোধ হয় গিনিটি দ্বিজপদর হাতে তুলে দিয়ে ভেবেছিলেন—যাক সব পরে-পরে। ধার-দেনা শোধ—অথচ গিনিটিও ঘরে থাকল না। ঘরে রেখে দিলেই অমঙ্গল।

আর তখনই ধুতির গোঁজ থেকে একটা তফিল বের করলেন দাসমশাই। তফিল থেকে পরম যত্নে কী যেন বের করছেন।

দাসমশাই একটি ছোট কাসকেট পায়ের কাছে রেখে বললেন, "মা ঠাকরুনের মনোবাঞ্ছা।"

"মনোবাঞ্ছাটা কী আবার !"

ও বাবা, বাবা খুলে দেখেন দু'গাছা সোনার চুড়ি।

তা হলে বাবা দ্বিজপদকে দ্বিতীয় গিনিটিও গছিয়ে এসেছেন। বাড়িতে রাখতে সাহস পাননি। কে জানে গিনির গন্ধ পেয়েই আদিনাথ রাতে উদয় হয়েছিল কি না। বাবা তো কিছু ঝেড়ে কাসছেন না ! আদিনাথ কে, তাও জানা নেই। শুধু প্রতিবেশী হলেই হয় না। সে কী করে, জঙ্গলে সে থাকে কেন, তার সংসার নির্বাহ হয় কী করে—কিছুই জানা নেই। কিংবা আদিনাথ দাসমশাইয়ের চর নয় তো ?

দ্বিজপদ কাজটা ভাল করল না। দ্বিজপদ কথা দিয়েছিল, না কর্তাঠাকুর আর কেউ জানবে না। আপনি জঙ্গলে থাকেন, যদি জানাজানি হয়ে যায় চোর-ডাকাত হামলা করতেই পারে।

আর আদিনাথেরও খবর নেই। সেই যে বাবার সঙ্গে জঙ্গলে বসে পরামর্শ করে চলে গেল, আর এলই না। আমরা রোজ অপেক্ষা করি—মা তো একদিন বলেই ফেললেন, তোমরা একবার আদিনাথের খবর নিলে না ! শত হলেও প্রতিবেশী। রাগের মাথায় কী বলেছি, তাই ধরে বসে থাকতে আছে !

মা মনে করতেই পারেন, এটা আদিনাথের কাজ। গরিব ব্রাহ্মণ ঘরবাড়ি তৈরি করছেন, অভাব-অনটন আছে, সে প্রতিবেশী হয়ে স্থির থাকে কী করে ! বোধিসত্ত্ব আদিনাথ না হয়ে জন্মালে এত দয়ামায়াও থাকত না। সেই গিনিটি ঠাকুরঘরে রেখে যায় গুরুর প্রণামী বাবদ। আবার এলে আবার প্রণামী ৷ মা কেমন আশাকুহকিনী হয়ে আছেন। কতক্ষণে সকাল হবে। রাতে মা বোধ হয় ঘুমোনও না। আমিও কখন সকাল হবে এই ভেবে বসে থাকি। সকাল হলে সবাই ঠাকুরঘরের দরজা খুলে তন্নতন্ন করে খুঁজি। উঠোনে, স্থলপদ্ম গাছটার নীচে খুঁজি—রাস্তায় কিংবা জঙ্গলে ঢুকলে একমাত্র নজর, যদি সহসা কিছু চকচক করে ওঠে।

সারাদিন খুঁজে গিনিটি না পেলে মার অসহিষ্ণুতা প্রকট হয়। বাবার প্রতি মা এত অসহিষ্ণু যে, খাওয়ার পাতে না বলে পারেন না, "দিব্যি ঠ্যাঙ মেলে ঘুমাচ্ছ। চলবে কী করে! একবার আদিনাথের খোঁজ নিলে না পর্যন্ত। নিষ্কর্মা মানুষ তুমি বোঝো।"

"কী মুশকিল! কোথায় খুঁজব! ও তো বলে গেছে আবার আসবে। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে কোথায় সেই পরিত্যক্ত ইটের ভাটা আছে জানব কী করে? মানুষের সাধ্য আছে ঢোকে! ঘোর বর্ষায় লতায়, পাতায়, আগাছায় কী হয়ে আছে জঙ্গলটা। শীতকাল আসছে। লতাপাতা, আগাছা হেজেমজে গেলে পিতাপুত্র না হয় একবার খুঁজতে বের হব।"

পিতাপুত্র মানে আমি আর বাবা।

শীত এলেই জঙ্গল ফাঁকা হয়ে যায় জানি। পোকামাকড়ের উপদ্রবও থাকে না। বাবা ঠিকই বলেছেন, একটা যে রাস্তা ওদিকের কারবালার মাঠে গিয়ে পড়েছে তাও জানি। তবে সে রাস্তায় হেঁটেই যাওয়া যায়। সাইকেল চালানো যায় না। ওদিকটায় বিশাল কবরভূমি আছে, মিনা-করা সব ভাঙাচোরা গম্বুজ সাদা পাথরের সমাধির ওপর বেদি-ফলকে কারও-কারও নামেরও উল্লেখ আছে। বাবার দুর্জয় সাহসী পুত্রের পক্ষেই সেখানে একা যাওয়া সম্ভব।

গিনির খবর জানাজানি হয়ে যাওয়ায় বাবা খুবই তটস্থ। একেবারে নির্বাক। দু'গাছা সোনার চুড়ি হাতে নিয়ে বসে আছেন। মা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আতঙ্ক আমাদের, ফাঁস হয়ে গেলে জঙ্গলে থাকাই দায়! অবশিষ্ট গিনির খোঁজে দাসমশাই এসেছেন। দ্বিজপদও বিশ্বাস করে, কর্তা গরিব হতে পারেন, তবে গুরুবংশ। গুরুকে তুষ্ট করার জন্য মানুষ দিতে পারে না এমন কিছু নেই। মণিরত্ন, জমিজমা, তালুক, প্রাসাদ সবই দিতে পারে। বাবা বংশের শেষ বাতি। বাতিটি জ্বালিয়ে রাখার জন্য পূর্বপুরুষরা যে কিছুটা গুপ্তসম্পদ রেখে যাননি তাই-বা দাসমশাই বিশ্বাস না করে থাকেন কী করে!

বাবা পড়ে গেলেন মহাফাঁপরে।

দ্বিজপদ, দাসমশাই উভয়ে পীড়াপীড়ি করছেন তখনও, "কেউ জানবে না। উপযুক্ত দামেরও অভাব হবে না। আপনি দিন। অমূল্য সব মুদ্রা।"

দ্বিজপদ বলল, "আমি ভরসা করতে পারলাম না কর্তা। ঘরে রাখতেও সাহস পেলাম না। আগের গিনিটি দাসমশাইকে দিয়ে টাকা নিয়েছি। এবারের গিনিটি দেওয়ার সময় বললাম, কর্তামার খুব ইচ্ছে, দু'গাছা সোনার চুড়ি পরেন। ওটা করে দিন, বাকি টাকাটা দিয়ে কর্তার যে ক'দিন চলে!"

বাবার মুখটা খুবই করুণ দেখাচ্ছে। একটি নাতিদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসও উঠে এল। দাদা ওদিকে থম মেরে বসে আছে। মা, মায়া যে কোথায়, বলা যাবে না!

বাবা অতিশয় নিরুপায় গলায় বললেন, "দাসমশাই, আমি গরিব বামুন। গিনি পাব কোথায়! আমার কাছে তো আর গিনি নেই।"

দাসমশাই নাছোড়বান্দা। বাবার কথায় কর্ণপাত করলেন না।

বাবা কী বলবেন! একবার দ্বিজপদর দিকে তাকালেন। দ্বিজপদ যে গিনিটি হস্তান্তর করে বড়ই বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে, নিরুপায় ব্রাহ্মণের কাছে দ্বিজপদ ছাড়া কেউ কাছের লোকও ছিল না যে, গিনিটি নিয়ে অন্য কোথাও যাবেন।

মায়া কাপে করে চা এবং একবাটি মুড়ি সবার সামনে রেখে গেল। রেকাবি করে কিছু নাড়ু, মোয়া।

দ্বিজপদই বলল, "আপনার কোনও অভাব থাকবে না। ঘরবাড়ি উঠবে। আপনি দিলে বাড়িঘরের চেহারাই দাসমশাই পালটে দেবেন। গৃহদেবতার ঘরটি তালপাতায় ছেয়েছেন। বর্ষা বাদলায় ঝড়ে সব উড়ে যেতে কতক্ষণ।"

বাবা এতে যে সবিশেষ বিরক্ত, বোঝা গেল। তাঁর ঘরবাড়ি তিনি নিজে করেছেন। বাঁশ পুঁতে দু'-বান টিন এনে বাছারিঘরটি করার যে অনেক হ্যাপা, দ্বিজপদ তার বিন্দুমাত্র মর্যাদা দিচ্ছে না। ঘরের অন্নপূর্ণা শুনতে পেলে তিনি যে যথার্থই নিষ্কর্মা তাও প্রমাণ হয়ে যাবে।

বাবা বললেন, "গরিবের এর চেয়ে বেশি কিছু দরকার হয় না।"

বাবা হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কাছে গেলে দু'গাছা চুড়ি আমার হাতে দিলেন।

"তোমার মার মনোবাঞ্ছা। তাঁকে নিয়ে দাও। বলবে, দাসমশাই খুবই দয়ালু মানুষ, তিনি আজ নতুন পঞ্জিকা দিয়েছেন, তোমার মায়ের দু'গাছা চুড়িও তিনি গড়িয়ে দিয়েছেন। দেশের লোকজন চলে এলে পূজা-পার্বণও শুরু হয়ে যাবে। গরিব বামুনের অভাব থাকবে না। তোমার মায়ের এই যে নাই-নাই ভাবটা, তার একটা সুরাহা হবে।"

মা সবই জানেন। মা তো সব দেখেও গেছেন। তবু আমার মনে হল, দাসমশাইকে খুশি করার জন্যই কথাগুলি বলা।

দ্বিজপদ বলল, "দেশের মানুষেরা কি এখানে এসে উঠতে রাজি হবে!"

"কেন হবে না দ্বিজপদ! তারা যাবে কোথায়! দেশে কেউ থাকতে পারবে না। রিফিউজিরা বানের জলের মতো ভেসে আসছে। স্টেশনে, ক্যাম্পে পশুর জীবন যাপন করছে। আমার গাঁয়ের লোকদের জন্য জায়গাটা নির্বাচন করেছি। অনাথের চিঠির অপেক্ষায়। রাজবাড়িতে আর্জি জানিয়েছি—পানীয় জলের যদি কোনও সুবন্দোবস্ত করে দেয়। এমন জলের দামে জমি ভুভারতে আর কোথায় পাওয়া যায় জানি না। দু'দিক থেকে দুটো রাস্তা বের করে দিতে পারলে জায়গাটা আর দুর্গম কে বলবে!"

দ্বিজপদ বলল, "আপনি দেশের চিন্তা ছাড়ুন। ঈশ্বর চিন্তা করুন। দেশের চিন্তা দাসমশাইয়ের ওপর ছেড়ে দিন। পানীয় জলের খুবই অভাব। দাসমশাই, কর্তাঠাকুরের বাড়িতে একটা টিউকল করে দিলে হয় না। রাজবাড়ি থেকে কবে করে দেবে সেই আশায় বসে না থাকাই ভাল।"

দ্বিজপদকে কিছুটা ভর্ৎসনাই করলেন দাসমশাই, "তুমি তো আচ্ছা মানুষ দ্বিজপদ। কর্তার সুখ-সুবিধার দিকে তোমার দেখছি বিন্দুমাত্র নজর নেই। বামুনের বাড়িতে জলের ব্যবস্থা নেই! খবরটা একবার দাওনি! তুমি কী হে!"

দ্বিজপদ বলল, 'টিউকলটা রান্নাঘরের পাশে দিলেই হবে।"

বাবা কেন যে বললেন, "না দ্বিজপদ, ভেতরে হবে না। রাস্তায় বসানো দরকার। আমার তো সব ভাঁড়ে মা ভবানী। টিউকল বসাবার ক্ষমতা আমার নেই। দাসমশাই ধনবান মানুষ, তিনি দেশের লোক, যাঁরা আসছেন, তাঁদের জন্য রাস্তায় টিউকলটি করলে ভাল হয়। পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত আছে জানলে এই জঙ্গলে সবাই ঘরবাড়ি করার উৎসাহ পাবে। এতে দাসমশাইয়েরও পুণ্য সঞ্চয় হবে।"

আমার ভয় হচ্ছিল, বাবা না শেষপর্যন্ত চাপে পড়ে বলে দেন, ঠাকুর কৃপা করেছেন। গরিবের অন্নকষ্ট তিনি সইতে পারছিলেন না। ঠাকুরঘরেই গিনি দুটো পাওয়া গেছে। অভাব অনটনে দয়াময়ীর মাথাখারাপ হলেই চোপা শুরু হয়ে যায়। বাবার তখন সসেমিরা অবস্থা, ঘরে চোপার চাপে টেকা দায়, বাইরে দেনার দায়ে বাবা অস্থির, তখনই কী যে হয়, কেউ একটা গিনি রেখে যায়। অথবা বাবা প্রকৃতই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তিনি তিথি-নক্ষত্র যোগে মন্ত্র পড়ে গিনিটি আকাশ থেকে নামিয়ে আনেন।

তবে আমি জানি, এসব গুহ্য কথা প্রকাশ করা অনুচিত কাজ। এতে মন্ত্রশক্তি জোর হারিয়ে ফেলে। বাবার সত্যিকথা বলাও খুব বিপজ্জনক। এখন যে কী উপায়, বুঝতে পারছি না।

দাসমশাই সহজে ছাড়ার পাত্র নন।

"ঠিক আছে কর্তামা'র সঙ্গে কথা বলে দেখুন। তিনি দেবীতুল্যা—তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে জানাবেন। তাঁর কোনও অভাব থাকবে না। দরকারে আমি না হয় কোঠাবাড়ি করে দেব। দুটো রাস্তা, তাও বের করে দেব। পুকুর, মাঠ, বাগান সবই হবে। অবিকল সাহাপুর গ্রামটাই না হয় আমি এখানে তুলে আনব। আমার একটাই দাবি, অমূল্য মুদ্রাগুলি পেলে আমিই পাব।

॥৬॥

শীতের হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরছে। পাতা উড়ছে। বনজঙ্গল ক্রমে ন্যাড়া হয়ে যেতে থাকল। জঙ্গলটা আর আমার কাছে দুর্গম রইল না। বাবার প্রতি মায়ের তাড়না দিন-দিন আরও বাড়ছে। আদিনাথের কোনও খবর নেই। সেই যে রাতে চালতাতলা দিয়ে অন্ধকারে নিষ্ক্রান্ত হল, তার আর পাত্তা নেই। মায়ের দুশ্চিন্তা—আদিনাথ মরেছে না বেঁচে আছে, তারও তো খোঁজ নেওয়া উচিত। মাস পার হয়ে গেল, ঠাকুরঘরে গিনি কেন, তামার একটা ফুটো পয়সাও কেউ রেখে যায় না!

রাস্তায় একটা টিউকল দাসমশাই লোকজন পাঠিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। আমাকে আর কলসি মাথায় জল নিয়ে আসতে হয় না। মায়া নিজেই ঘড়া-ঘড়া জল তুলে রাখে। নতুন টিউকল পেয়ে মায়া যখন-তখন বালতি-বালতি জল তুলে আনে।

অনাথকাকাও হাজির এক সকালে।

বাবা অনাথকাকাকে নিয়ে দাসমশাইয়ের কাছে চলে গেলেন। বগলে ছাতাটি নিয়ে ফিরতে-ফিরতে বেলাও হয়ে যায়। একটা নীলরঙের নকশা নিয়ে একদিন দ্বিজপদ আর দাসমশাই হাজির। আমাদের ফেলে আসা গ্রামটার নকশা বুঝতে অসুবিধে হল না। দাসমশাইয়ের আড়তে কী কথাবার্তা হয় জানি না। তবে জঙ্গল কেটে দুটো রাস্তা বের করার কাজ চলছে, আমি আর ধর্মরাজ জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে টের পাই।

অনাথকাকা কিছুদিন সপরিবারে আমাদের বাড়িতে ছিলেন। রাজবাড়ি গেছেন বাবাকে নিয়ে। এবং জমিজমা কিনে ঘরবাড়ির যখন বন্দোবস্ত করা হচ্ছে তখনই একদিন মা আর সহ্য করতে পারলেন না, "আরে তুমি মানুষ, না অপদেবতা!"

ভাগ্যিস অনাথকাকা এবং তাঁর পরিবার অস্থায়ী ঘর তুলে পাশের জঙ্গলে উঠে গেছেন, তিনি থাকলে বাবার যে বিড়ম্বনার শেষ ছিল না!

বাবা নির্বিকার গলায় বললেন, "যা ভাবো।"

মায়ের কাতর অভিযোগ—"নিজের ভালমন্দটুকুও বুঝবে না? পরের গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে বেড়ালেই চলবে! গাঁয়ের মানুষজন চলে আসছে, কোথায় উঠবে, কোথায় থাকবে, এত দৌড়ঝাঁপ, কথা বললেই, এক কথা, এখন নয় দয়াময়ী। পরে। গিনির খবর ঠিক চাউর হয়ে গেছে। গিনির লোভেই সব পঙ্গপালের মতো নেমে আসছে, বোঝো না!"

বাবার নির্বিকার কথা, "গিনি যদি হরির লুটের বাতাসা হয়, পাবে। ভাগ্যে থাকলে পাবে। তোমরাও তো বসে নেই। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করছ জঙ্গলে।"

আমি নিতান্ত হতাশ, বাবা বলছেন কী! লুটের বাতাসা হলে পাব। ভাগ্যে থাকলে পাব। এখন তো ধর্মরাজকে নিয়ে লুটের বাতাসাই খুঁজছি। কোথাও কিছু পড়ে নেই। সকাল, দুপুর, বিকেল কুকুরটাকে নিয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকি। বাড়ি ফিরলেই, মা ছুটে আসেন, মায়া ছুটে আসে। কেবল দাদা আসে না। সামনে পরীক্ষা। তার আসার উপায় নেই। মা, মায়া ঠাকুরঘরে, বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যদি আবার একটা মেলে!

পরিত্যক্ত ইটের ভাটাও খুঁজে পেয়েছি। বনজঙ্গল সেদিকটায় তত ঘন নয়। শুধু বড়-বড় সব জলাশয়। আর সব বাতিল ভাঙা ইটের ডাঁই। মানুষজনের কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। আদিনাথকেও খুঁজছি। সে আমাদের প্রতিবেশী, ডাকলেই সাড়া পাব।

কেউ সাড়া দেয়নি।

তারপর যা হয়, চারপাশে বিশাল সব বৃক্ষ আর তার নীচে একজন গরিব বামুনের পুত্র যদি গুপ্তধনের আশায় ঘুরে বেড়ায় তার ভয় হওয়ারই কথা। গা-ছমছম করতে থাকে। এদিকটায় মাটির সব বড়-বড় ঢিবি। ঢিবি পার হয়ে একদিন ছুটতে গিয়ে চক্ষু আমার ছানাবড়া!

বিশাল একটা গোখরো ফণা তুলে তাড়া করছে।

ধর্মরাজ এবং আমি দু'জনেই প্রাণের দায়ে ছুটছি।

গোখরোটা কোমর পর্যন্ত ফণা তুলে ধেয়ে আসছে।

কী করি! গলা শুকিয়ে গেছে। হাত-পা অবশ।

হয়তো ভিরমি খেয়ে পড়েই যেতাম। আর আশ্চর্য, জানি না এটা কোন ঘোর থেকে দেখলাম, এক রূপবতী কন্যা গোখরোর লেজ ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে কোথায় জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তবে কি তিনিই বনের সেই দেবী! বাবা তো আমার মিছে কথা বলেন না!

বাড়ি ফিরে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছি।

মা শুধু বলেছিলেন, "তোর কী হয়েছে!"

আমি কেমন বোবা বনে গেলাম।

বাবা সন্ধ্যায় ফিরে সব শুনে বললেন, "ও কিছু না।" দাঁতের ডগায় একটু নুন তুলে খাইয়ে দাও। নিরাময় হয়ে যাবে। আতঙ্ক থাকবে না।" বাবা শেষে বলেছিলেন, "রোদে-রোদে না ঘুরে দেশ থেকে মানুষজন সব চলে আসছে, ঘরবাড়ি বানাচ্ছে, তাদের কাজে সাহায্য করলেও উপকার হয়। যেখানে-সেখানে গিনি পড়ে থাকবে, ভাবো কী করে!"

মা বাবার ওপর এমনিতেই অতিষ্ঠ হয়ে আছেন। 'নিজের নাই খেতে শঙ্করাকে ডাকে।' তিনি পরোপকার করে বেড়াচ্ছেন! যাও হাতের পাঁচ গিনি সম্বল ছিল ঠাকুরঘরে, তাও যে যায়! মা এতই হতাশ যে, তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না। এখন বলে কিনা যেখানে-সেখানে গিনি পড়ে থাকবে, ভাবো কী করে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বোধিসত্ত্ব—কত না বড়-বড় কথা! গেল কোথায় সব? মা আমার এমন ভাবতেই পারেন।

দাসমশাই এলে মায়ের আরও মাথাখারাপ হয়ে যায়। বাড়ি এসে দাসমশাই সমানে তাগাদা দিয়ে যান, "গিনি, গিনি, গিনি।" গিনি চাই তাঁর। গিনি নিয়ে সবার মাথাখারাপ, একমাত্র বাবাই নির্বিকার।

"কর্তামা রাজি হল!"

দাসমশাইয়ের ধারণা, কর্তামার জন্যই বাবা বাকি গিনিগুলি তাঁকে দিতে পারছেন না। কর্তামাকে খুশি করারও কম চেষ্টা হচ্ছে না। দু'খানা তাঁতের নতুন শাড়ি দিয়ে বলেছেন, "আপনি মা, আমাদের দশভুজা, আপনার ইচ্ছে হলেই সব হয়।"

ক্ষোভে, জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়ি। কোথায় পাব গিনি! খুঁজে-খুঁজে হয়রান, গিনির খোঁজে প্রাণসংশয়, দাসমশাই কী বোঝেন! গিনির লোভে দাসমশাই জঙ্গলটাকে বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছেন। সরকার থেকেও টাকা-পয়সা আসছে। সবই দাসমশাইয়ের চেষ্টায়। আরও দুটো টিউকল হয়ে গেছে। বাবা একদিন একটি তেঁতুলের চারা নিয়ে এসে পুকুরের পাড়ে পুঁতে দিলেন। অনাথকাকার বাড়ি ঢুকতে বড় রাস্তা পড়ে। সেখানে একটি শিমুলগাছও লাগানো হল। আমাদের গাঁয়ে যেতেই বড় একটা শিমুলগাছ ছিল, আমাদের পুকুরঘাটের পাড়ে বড় একটা তেঁতুলগাছ ছিল। বাবার আহ্লাদের শেষ নেই।

বাবার এখন খবরের শেষ নেই। বাড়ি ফিরলেই একটা না

একটা সুখবর। "মাঝিবাড়ির হেমন্ত এসে করুণাময়ের বাড়িতে উঠেছে। জায়গাটা খুব পছন্দ তার। তোমার কথা বলল, পিলু, বিলু কত বড় হয়েছে খবর নিল। বিকালে সবাই আসবে ঠাকুরের চরণামৃত নিতে।"

বাবা কোথা থেকে একদিন একটি বেতগাছের শেকড় নিয়ে এলেন। এদেশে গাছটি দেখা যায় না। লতানে কাঁটা গাছ—তার ঝোপ এক-একটি গভীর স্নিগ্ধ সবুজ সমারোহ। শীতে বেথুন ফল থোকা-থোকা। এমন একটি দুর্লভ লতানে গাছ কোথায় লাগানো যায়, তাই নিয়ে বাবা সবার সঙ্গে পরামর্শ শুরু করে দিলেন। শেষে ঠিক হল, আমাদের বাড়ির উত্তরের দিকটায় লাগানোই শ্রেয়।

আমাদের বাড়িটায় এখন লোকজনের ভিড় লেগেই থাকে। আমার ভালই লাগে। যারাই আসুক, জমিজমা কিনুক, বাড়িঘর করুক, তাদের কারও আমাদের বাড়ি না এসে উপায় থাকে না। গৃহদেবতা আমাদের খুবই জাগ্রত। বাবা গলায় গামছা বেঁধে নারায়ণ শিলা, কষ্টিপাথরের রাধাগোবিন্দের মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন। সারা রাস্তায় জলগ্রহণ করেননি। প্রায় তিনদিনের রাস্তা, বাবা নির্বিকল্প হয়ে স্টিমারে, স্টেশনে, রেলগাড়িতে বলতে গেলে সমাধিস্থই ছিলেন। বামুন পরিবারটি ঠাকুর-দেবতা নিয়ে দেশান্তরী হওয়ায় গাঁয়ের লোকজনও ভাল ছিল না। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুতে ঠাকুরদেবতা না থাকলে মানুষের কোনও ভরসাও থাকে না! তারা না এসে পারে!

বাবা এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে খুব আহ্লাদের গলায় ডাকলেন, "দয়াময়ী..." বাবা জলচৌকিতে বসে নামাবলীটা আমার হাতে দিলেন। গরম পড়ে গেছে। রোদের তেজে গাছপালা সব পুড়ছে। তবে সকালে-সন্ধ্যায় শীতের কামড় কমেনি। বাবার গরম লাগায় নামাবলীটা আমার হাতে দিলেন, না মার সাড়া না পাওয়ায় ঘেমে উঠছেন, বোঝা গেল না! দয়াময়ী রুষ্ট হলেই যে বাবা আমার কাতর হয়ে পড়েন!

আমার দিকে তাকিয়ে খুব সতর্ক গলায় বললেন, "তোমার মা কোথায়?"

"বাড়িতেই ছিল। দেখছি।"

দয়াময়ীর কণ্ঠ পাওয়া গেল।

"তোমার বাবার কি দেশ উদ্ধার হয়েছে? এতক্ষণে ফিরলেন!"

বাবা ঠিক সাহস পেয়ে গেলেন। না, বাড়িতেই আছে। আজকাল দয়াময়ী রুষ্ট হলে এ-বাড়ি সে-বাড়ি চলে যান। আমরা সাধ্যসাধনা করে নিয়ে আসি। বাড়িতে থাকায় বাবার আহ্লাদ বোধ হয় বেড়ে গেল।

"যাক, গ্রামটাকে শেষপর্যন্ত খাড়া করা গেছে। প্রতাপ চন্দ চিঠি দিয়েছে, সেও চলে আসবে। দেশে কেউ আর পড়ে থাকল না।"

এখন ঘরে-ঘরে হারিকেন। দাদার আলাদা হারিকেন। বারান্দায় হারিকেন জ্বলে। একটা টর্চবাতিও হয়ে গেছে। মায়া জামাপ্যান্ট ছেড়ে ঘরে-ঘরে ধূপদীপ দিচ্ছে। ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

তখনই ফের দয়াময়ীর গলা পাওয়া গেল।

"তোমার বাবাকে বলো, হাত-মুখ ধুয়ে যেন একটু কিছু মুখে দেন। কোন সকালে বের হয়েছেন, ফিরলেন রাত করে। দাসমশাই এসেছিলেন, তাঁকে সাফ বলে দিয়েছি, বামুন ঠাকুরটির ওপর মোটেও ভরসা করবেন না। গিনি আমাদের নেই। দুটো গিনি ঠাকুরঘরে কে ফেলে রেখে গেছিল আমরা জানি না। মহা ভুতুড়ে কাণ্ড!"

"ইস গেল, সব গেল! দাসমশাই কি আর উপুড়হস্ত করবেন! গিনির লোভে এতদিন দয়ার সাগর ছিলেন, এখন এর পরিণাম কতদূর গড়াবে কে জানে!"

বাবা কত সহজে বলতে পারলেন, "বলে ভালই করেছ। দাসমশাই গিনির কুহকে পড়ে গেছেন। কুহকে ফেলে দিলে পাপ হয়। এতে পাপ খণ্ডন হয়ে গেল।"

ফের দয়াময়ীর গলা পাওয়া গেল।

"পাপ খণ্ডন হয়নি। দাসমশাইয়ের কুহক ঠিকই আছে। মহা ভুতুড়ে কাণ্ড বিশ্বাসই করেননি। ভূতটুত মিছে কথা। ঠাকুরঘরে ভূত ঢোকে সাহস কী!"

যাকগে, এটা মন্দের ভাল। বাকি গিনিগুলি মা হাতছাড়া করতে চাইছেন না, এই বিশ্বাস নিয়েই দাসমশাই চলে গেছেন। ভূতটুতের গপ্পো ফেঁদে দাসমশাইকে বোকা বানানো কঠিন, বাবাও বোধ হয় এটা টের পেলেন। কী করা যায়, এমন বোধ হয় চিন্তা করছিলেন। কে রেখে গেল গিনি দুটো, এটা যে প্রকৃতই তাজ্জব কাণ্ড, বাবার বোধ হয় সেই বোধোদয় হয়েছে। দাসমশাইকে নিরস্ত করা দরকার। গিনির লোভে উদারহস্ত কতটা আর থাকবে, তারপর গরিব ব্রাহ্মণকে ঋণের দায়ে যদি ভিটেছাড়া করেদেন! পথে বসান! বাবা চুপচাপ বসে থাকায় আমার ভয় ধরে গেল।

"আচ্ছা বাবা, ভূত আমাদের দয়া দেখাতে পারে না!"

"নিশ্চয়ই পারে।"

"তবে দাসমশাই ভূতের কথা বিশ্বাস করল না কেন?"

"দাসমশাই বাস্তববাদী মানুষ। বিষয়ী মানুষ। সরকার এগিয়ে না এলে দাসমশাই কতটা এগোতেন। বলা কঠিন। ভূত বিশ্বাস না করে মানুষের উপায় আছে? ভূত আর ভগবান হল গে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। যে যেমনটা দ্যাখে! বোঝে।"

আর তখনই দেখি অন্ধকার উঠোনে সেই ষণ্ডামার্কা মানুষটি হাজির। বোধ হয় মায়াই আগে দেখতে পেয়েছে, সে ছুটে এসে বাবার কানে-কানে বলল, "ওই দ্যাখো আদিনাথ, ঠাকুরঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে।"

মাও ছুটে এসেছেন।

বাবা ভাল করে দেখার জন্য হারিকেন তুলে অন্ধকার উঠোনে নেমে গেলেন। বাবা কাঁধের নামাবলীটা আমি ফেলে দিলাম। খালি গায়ে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

আদিনাথ অন্ধকারে চালতা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা বোধ হয় অনুসরণ করছেন। ধর্মরাজ লাফিয়ে ছুটে গেল। মা চেঁচিয়ে ডাকছেন, "আদিনাথ শোনো, চলে যাচ্ছ কেন? ভয় নেই। আমরা ব্রাহ্মণ বলে ভয় করার কিছু নেই। তোমার ঠ্যাঙও ভেঙে দেব না। এই পিলু, দ্যাখো তোমার বাবা একা চলে যাচ্ছে। শিগগির যাও। আদিনাথ বাবাকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে। আদিনাথকে দেখলেই বাবা তোমার ঘোরে পড়ে যায়।"

টর্চটা নিয়ে ছুটলাম। এখন চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করতে সহজেই পারি। কিন্তু চেঁচামেচি করা উচিত হবে না, কে কোথা থেকে ছুটে এসে আদিনাথকে পাকড়াও করে ফেলবে, পাকড়াও করে ফেললে আদিনাথের গিনি রহস্য তারা জেনে ফেলবে, কাজেই অনুসরণ করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় রইল না।

জঙ্গলে কিছুটা ঢুকতেই মনে হল আদিনাথ এল, চলে গেল, গিনিটি ঠিক যথাস্থানে বোধ হয় ফেলে রেখে গেছে। আমি নিজেই কেমন গিনির কুহকে পড়ে গেলাম। আদিনাথের দয়া যদি এবারেও হয়! ঠাকুরঘরের কপাটের ফাঁক দিয়ে যদি গিনি ছুড়ে দিয়ে যায়, দিতেই পারে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব-অনটন দেখা দিলেই সে হাজির হয়। ছুটে এসে দরজার শেকল খুলে উঁকি দিলাম। টর্চ জ্বেলে দেখলাম, মা, মায়াও ছুটে এসেছে। তারাও বোধ হয় গিনির লোভে পড়ে গেছে। কিন্তু কোথায় গিনি!

চালতে গাছের নীচে এসে টর্চ জ্বেলে খোঁজাখুঁজি করতেই মা সহসা চাপা আর্তনাদের গলায় বলে উঠলেন, "পেয়েছি।"

মা গিনিটি নিয়ে একদৌড়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। আমাদের উল্লাস, বাবার কথা ভুলেই গেছি, বাবা যে আদিনাথের পিছু নিয়েছেন, সেও বোধ হয় গিনির লোভে।

আমাদের হুঁশ ফিরে এলে মা কেমন আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। গিনির লোভ দেখিয়ে মানুষটার না কোনও ক্ষতি করে বসে! আদিনাথকে আমরা কেউ চিনি না। তার যদি কোনও কুমতলব থাকে! আদিনাথ মানুষ না ভূত, তাও আমরা জানি না। যদি যখ হয়, আদিনাথকে খুন করে কোনও কোষাগারে তাকে কেউ যখ করে রেখে যেতেই পারে। এতদিন একনাগাড়ে যখ হয়ে থাকাও ক্লান্তিকর। বাবাকে যখ করে আদিনাথ যদি মুক্তি পেতে চায়! মায়ের ভয়ার্ত মুখ দেখে এখন কেন জানি মনে হল আমার। আর একদণ্ড যে দেরি করা ঠিক না বুঝতে কষ্ট হয় না।

আমি কিছু না বলেই টর্চ নিয়ে ছুটতে গেলেই মা হাত ধরে ফেললেন।

"একা অন্ধকার জঙ্গলে ঢুকবে না। তোমরা আর আমার মাথা খারাপ করে দেবে না। এই বিলু সঙ্গে যা। কী ঘুটঘুট্টি অন্ধকার! আমার হয়েছে মরণ! কেন আমি মরি না!"

দাদা বলল, "পড়া আছে। আমার দ্বারা হবে না।"

"তুই এত স্বার্থপর দাদা! তোর পড়াটা বেশি হল!" মা দেখছি অস্থির হয়ে উঠছেন। ঘর থেকে বের হয়ে জঙ্গলের দিকে তাকালেন— না, হারিকেনের কোনও আলো চোখে পড়ছে না। নিমেষে সব কেমন সুনসান হয়ে গেল। জোনাকি পোকা ছাড়া জঙ্গলে কোনও আলো দেখা গেল না। হাওয়া উঠলে গাছের পাতায় শুধু খসখস শব্দ উঠছে।

কী করি?

"অনাথকাকাকে ডাকি মা? সবাইকে খবরটা দিই!"

মা বললেন, "না। এলে কী বলবে! লোকটা তোমাদের যখন-তখন গিনি দিয়ে যায়, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে!"

দাদা বলল, "প্রতিবেশী ডেকেছে, বাবা না গিয়ে পারে! ঠিক ফিরে আসবে। আদিনাথ-আদিনাথ করে বাবার মাথাটা কে খারাপ করেছে!"

দাদার ধমকে মা চুপ।

তবু আমরা হারিকেন নিয়ে কিছুটা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম। পরিত্যক্ত ইটের ভাটায় খোঁজ করা দরকার। কিন্তু নিশীথের অন্ধকারে বেশিদূর যাওয়াও কঠিন। পুকুরপাড়ে এসে মা আর পারলেন না— 'কেন যে গিনি-গিনি করে মানুষটাকে এত নির্যাতন করলাম! আমি এখন কী করি! গিনির লোভে মানুষটা কোথায় একা অন্ধকারে ঢুকে গেল!'

তাল-বেতালের গল্প আমাদের পড়া আছে। ভূতের নানা চালাকির গল্পও আমরা কম পড়িনি! মাও পড়েছেন। সব গল্পের ভূতই এখন দূরের জঙ্গলটায় যে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে, মায়ের কপাল চাপড়ে কান্না থেকেই টের পেয়ে গেলাম।

মাকে দেখে মায়াও কাঁদতে বসে গেল।

দাদা বোধ হয় মায়ের মড়াকান্না শুনতে পাচ্ছে। বিরক্ত হতেই পারে। সবাই মিলে তার পড়ার বারোটা বাজাচ্ছে। সেও চলে এল, কিন্তু এ-দাদাকে যে আমি চিনতে পারি না।

দাদা বলল, "মা, তুমি বাড়ি যাও। পিলুকে নিয়ে দেখছি, কোথায় গিয়ে তিনি ঘাপটি মেরে বসে আছেন। বাবার তো সবই দৈব। দেশ ছাড়া থেকে বাড়িঘর তৈরি, সবই তাঁর দৈব। দৈবই করাচ্ছে সব। দ্যাখ না এবারের দৈব তাঁকে কী করায়!"

বড় পুত্রের কিছুটা সান্ত্বনাবাণীতে মার শোক কিছুটা যেন প্রশমিত হল। বিপদে-আপদে বাবা মচকাবেন কিন্তু ভাঙবেন না। আর মা সামান্য বিপদেই ভেঙে কুটিকুটি হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শয্যা নেবেন।

কিন্তু মা আমাদের ছাড়তে কিছুতেই রাজি হলেন না।

কী আর করা! বেশি জোরে ডাকাডাকি করাও মুশকিল। জঙ্গলের ওদিকটায় দেশের লোকজন ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। চেঁচামেচি করলে তারা ছুটে আসতে পারে, কর্তাঠাকুরের আবার এত রাতে কী বিপদ দেখা দিল!

আমরা সবাই অন্ধকার জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে আছি। বাবা যদি ফিরে আসেন! ফিরে এলে দূর থেকেই তাঁর হারিকেনের আলো দেখতে পাব। কিন্তু সেদিনের মধ্যে যদি আদিনাথের সঙ্গে কথা বলার আগেই হারিকেনটা নিভে যায়! আগে যা অতি তুচ্ছ ঘটনা ছিল, আজকে তাই বড় বেশি ঘোরতর ঘটনা মনে হচ্ছে।

এত গভীর রাতে খোলা আকাশের নীচে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। খুবই শীত করছিল। মা বললেন, "কপালে যা আছে হবে। তোমার বাবা এত দৈবনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে পারেন, আমি কেন পারব না। চলো, ঘরে চলো।"

দাদা ঘরে ঢুকেই মায়ের গায়ে একটা কাঁথা জড়িয়ে দিল। আমরাও যে যার মতো কাঁথা-চাদর মুড়ি দিয়ে বারান্দায় বসে থাকলাম বাবার ফেরার অপেক্ষায়। মা মাঝে-মাঝে খুবই অস্থির হয়ে পড়ছেন। কাঁথাটা গা থেকে ফেলে দিচ্ছেন, মায়া পাশে বসে। তার এখন একটাই কাজ, মাকে শীত থেকে রক্ষা করা। কাঁথা পড়ে গেলে গায়ে কাঁথা তুলে দিচ্ছে।

রাত বাড়ছে।

ধর্মরাজ ফিরে এলেও কিছু বোঝা যেত। এদিক-ওদিক বিন্দুমাত্র শব্দটব্দ হলেই আমি উঠোনে নেমে যাচ্ছি। যতটা দেখা যায় দেখছি। পাখিরা প্রহরে-প্রহরে কলরব করে যাচ্ছে। রাত কতটা, অনুমান করা যাচ্ছে না। শেষরাতের দিকে পাখিরা কি বেশি কলরব করে। মা যে দৈবনির্ভর হয়েও অস্থির, শেষবেলায় মা ডুকরে কেঁদে না উঠলে টের পেতাম না।

"যা হয় হবে। যাও সবাইকে খবর দাও। তোমাদের বাবাকে একটা লোক জঙ্গলে নিয়ে গেছে। তাকে আমরা চিনি না, জানি না। নিশ্চয়ই মানুষটা কোনও বিপদে পড়েছে।"

দাদাও বোধ হয় আর স্থির থাকতে পারছে না। সে বলল, "টর্চটা দে। চল সবাইকে খবরটা দিই।"

আমরা বের হব, দেখি পুকুরপাড় ধরে একটা হারিকেন এগিয়ে আসছে। আর বসে থাকা যায়! সবাই পড়িমরি করে ছুটছি। ধর্মরাজ ঘেউ-ঘেউ করছে। কাছে যেতেই বাবা অদ্ভুত গলায় বললেন, "আমাকে ছুঁয়ে দিয়ো না।"

বাবার এক হাতে হারিকেন, অন্য হাতে একটা রেশমের থলে। থলেটা বেশ যে ভারী, বোঝা যায়।

সহসা কী বলতে গিয়ে মায়ের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। "তুমি কি মানুষ!" সবটা আর বলতে পারলেন না।

বাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন, "দয়াময়ী মানুষ না হলে এত বড় বিপদ থেকে আদিনাথকে কে উদ্ধার করত! ভাগ্যিস সে এসেছিল।"

"আমরা ভয়ে মরছি, আর আদিনাথকে তুমি উদ্ধার করছ!"

মাকে নিয়ে আমাদের এই এক বিড়ম্বনা। সবটা না শুনেই ঝাঁপিয়ে পড়া। মা বাড়িতে দাদাকেই একমাত্র সমীহ করেন। দাদার কথায় মা চুপ করে গেলেন।

"আগে বাবাকে যেতে দাও। দেখছ না বাবা কেমন অশুচি হয়ে আছেন।" বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওটা হাতে কী আপনার?"

"থলে। দেখে বুঝতে পারো না। সরো। আমাকে যেতে দাও। মায়া দু' বালতি জল তুলে দে তো।"

"থলে! কিসের থলে!"

"গিনির। গিনির থলে।"

আমরা সবাই আকাশ থেকে পড়লাম, আদিনাথের বিপদ, কী বিপদ, হাতে রেশমের থলে, বলে কিনা থলেতে গিনি আছে !

বাবা আলগা হয়ে হাঁটতে থাকলেন। হারিকেনটাও দিলেন না। আমরা সবাই বাক্যহারা। বাবা গম্ভীর। তাঁর হাঁটার কায়দাও অন্যরকম। উঠোনে এসে হারিকেনটা রাখলেন, রেশমের থলেটা ছুড়ে বারান্দার এক কোনায় ফেলে দিলেন, ঝনাত করে শব্দ হল, মা ছুটে গেলেন থলেটা তুলতে, সঙ্গে-সঙ্গে বাবা চিৎকার করে উঠলেন, "খবরদার ওটা ছোঁবে না। ছুঁলে সর্বনাশ।"

মা কি আমার এ-সব কথা গ্রাহ্য করেন !

মা বললেন, "ছুঁলে ছাই হবে।"

কোনায় পড়ে থাকা থলেটা মা প্রায় তুলেই ফেলছিলেন। বাবার কুপিত গলা, "দয়াময়ী স্ববংশে নির্বংশ হতে চাও তো তোলো।"

থলেটা যেন বিষধর সর্পের মতো ফণা তুলে আছে। মা সিঁটকে সরে গেলেন।

এবারে বাবা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, "মায়া, মা আমার দু'-বালতি জল তুলে দাও। স্নানটা করি। গিনির লোভ ভাল না। গুপ্তধনের লোভ ভাল না। আদিনাথ খুবই বিপাকে পড়ে গিনি দিয়ে যেত। সে বিষহরির চেলা। সম্প্রতি তার পত্নীবিয়োগও হয়ে গেছে। জঙ্গলে থাকে, প্রেতাত্মার ভয় তার কম না। তার পত্নী ইন্দুমতী থলেটার লোভে ইটের ভাটা ছেড়ে যেতে পারছে না। আদিনাথ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত নয়, দস্যুবৃত্তিও জানে না। অচ্ছুত মানুষ। ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঢুকতেও তার ভয়। সে সাপ ধরে খায়। সোজা সরল মানুষ। পরের দ্রব্য লইলে চুরি হয়, বোঝো।"

আমি জানি, বাবার সব আশ্চর্য সংস্কার আছে ধর্মবিষয়ে। শাস্ত্রপাঠে এটা তাঁর হয়েছে। মনসাতলায় একবার একটা আধুলি রাস্তায় পেয়ে গেলে বাবা বলেছিলেন, "ঠাকুরের পায়ে ফেলে রাখো। ঠাকুরকে বাতাসা কিনে দেওয়া যাবে। একজন ভিখারিকেও দিয়ে দেওয়া যেত, কী দরকার, ঘরে যখন গৃহদেবতা আছেন, তাঁর সেবাতেই না হয় লাগুক। আধুলির বেলায় গৃহদেবতা, গিনির বেলায় সর্বনাশ, স্ববংশে নির্বংশ। সহ্য হয় !

আমি না বলে পারলাম না, "বাবা, ঠাকুরের পায়ে ফেলে রাখলে হয় না !"

বাবা, "ওঁম্ কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা" বলে মাথায় মগে জল ঢালছিলেন। সহসা আমার দিকে কুপিত দৃষ্টিতে তাকালেন। দুর্বাসার মতো চোখ তাঁর জ্বলছে। বললেন, "না, হয় না। দাসমশাই বিষয়ী মানুষ, বিচক্ষণ মানুষ, অপুত্রক, তাঁর সহ্য হবে। গরিবের সহ্য হবে না। আদিনাথ সাপের বিষ বিক্রি করে। কোদাল মেরে গর্ত থেকে সাপ টেনে তোলে। তাজা পুষ্ট সব কেউটে। গর্ত করতে গিয়ে মালসার মধ্যে থলেটা পেয়েছে। বিষহরি স্বপ্ন দেখিয়েছে, তুই কাউকে দিয়ে দে। নিজের কাছে রাখিস না। তারপর তার পুত্রটি সর্পদংশনে গেল। ইন্দুমতীর বিষম লোভ। কিছুতেই থলেটা হাতছাড়া করতে রাজি না। সুযোগ পেলে পাপ খণ্ডনের জন্য আদিনাথ চুরি করত গিনি। ঠাকুরের পায়ে ফেলে রেখে যেত।"

আমরা সবাই তখন উঠোনে গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছি। নড়ছি না। মা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে নির্বিষ সাপের মতো বাবাকে দেখছেন। দাদা পর্যন্ত বিপর্যস্ত। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। কেন এত দেরি, সারারাত ভাটায় পড়ে থাকলেন কেন, কোনও প্রশ্ন করতেই আর সাহস হচ্ছে না।

পুবের আকাশ দেখা গেল ফরসা হয়ে উঠছে।

বাবা গামছায় গা মুছতে-মুছতে শেষে বললেন, "লোভ অতি বিষম বস্তু। ইন্দুমতী টের পাচ্ছিল তার থলেতে দুটো গিনি নেই। সে আদিনাথের ওপর মহা খাপ্পা। তারপর যা হয়, গেল, সেও গেল— ব্রহ্মহত্যা হবে চোখের সামনে, সাপের লেজ ধরে টানাটানি করল, হয়ে গেল।"

তা হলে কি সেই রূপবতী কন্যাই ইন্দুমতী ! কে জানে !

বাবা শীতে হিহি করে কাঁপছেন। মা ধুতি-চাদর নিয়ে গেলেন। বাবা কাল সকাল থেকে প্রায় উপবাসে আছেন। বাবার দিকে তাকিয়ে মায়ের চোখে কেন যে জলের উদ্রেক হচ্ছে !

বাবা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে জলচৌকিতে বসলেন।

"ইন্দুমতীর পিণ্ডদান সারতেই এত দেরি হল। বেচারি যায় কোথায় ! অচ্ছুত মানুষেরও কম সংস্কার থাকে না। যত বলি আদিনাথ তুমি আমার প্রতিবেশী, প্রতিবেশী কখনও অচ্ছুত হয় ! ক্রিয়াকর্ম আজ রাতেই সেরে ফেলব। প্রেতাত্মার ঘোরে পড়ে তোমার শেষে সর্বনাশ হোক, প্রতিবেশী হয়ে সহ্য করতে পারব না। ওর ঘরেই সব ছিল, ভাটাতেও কম কিছু নেই। প্রেতশিলার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে হল। তিল, যব, হরীতকী, ঘৃত, মধু, মালসা, কলাপাতা কোনও কিছুরই অভাব নেই। কুশ কেটে আনা হল। ঘরে তার আতপ চাল, তিল-তুলসী ছিল। নির্বিঘ্নে সব কাজ শেষ করতেই থলেটা পায়ের কাছে রেখে বলল, "আমাকে মুক্ত করুন ঠাকুর।" বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও, দাসমশাইকে খবর দাও, আমি তাঁকে ডেকেছি। তাঁকে দিয়ে আমিও মুক্ত হই।"

দাসমশাই এসেই সর্বাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠে দাঁড়ালে বাবা বললেন, "ওই যে ওখানে থলেটা আছে নিয়ে যান। গিনি কিন্তু আমার কাছে আর নেই। চাইলেও দিতে পারব না।"

থলেটা নিয়ে কর্তামার কাছেও করজোড়ে দাঁড়ান দাসমশাই। বলেন,'দেবী, আপনি সত্যি দশভুজা।"

দাসমশাই রওনা হলে মা বাবাকে বললেন, "ওঁকে ডাকো।"

দাসমশাই ফিরে এলে মা বললেন, "আরও একটা গিনি কৌটোয় পড়ে আছে। ওটাও নিয়ে যান দাসমশাই। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। বড় ভয় লাগে।"

গতরাতে পাওয়া গিনিটাও শেষপর্যন্ত মা রাখতে আর সাহস পেলেন না। দাসমশাইকে গিনিটা দিয়ে মা যেন আমার রাহুমুক্ত হলেন।

দাসমশাই বাড়ি থেকে চলে গেলে বাবা তাঁর ইদানীংকার আপ্তবাক্যটি ফের উচ্চারণ করলেন, "বুঝলে দয়াময়ী, কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ মনে করে— কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে— আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে। কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহ ইহাকে বোঝে না।"

বনের গল্প

রতনতনু ঘাটী

সূর্য একা উঠছিল ঠিক দুষ্টু ছেলের ঢঙে
আমরা সেবার বনের পথে সুদূর কালিম্পং-এ।
পাহাড় ফেলে ঝরনা পেলাম ঝরনা ফেলে যদি
এ-পথটাকে আগলে দাঁড়ায় ছোট্ট একটা নদী?
ভাবতে-ভাবতে রোদ উঠল বনের সবুজ তাতে,
তাকিয়ে দেখি আমরা সবাই ভাসছি কল্পনাতে।
কেউ ভাবছি দেখব এবার মস্ত একটা বাঘ,
দেখব দূরে পাঁচটা ডাকাত মুক্তো করছে ভাগ।
হঠাৎ দেখি নামছে আঁধার উপায় নেই তো কোনো,
ছুটব কিনা ভাবছি যখন ডাকল ছোট্ট বোনও,
"এই দাদা, চল, ওই তো দূরেই, লাভা ফরেস্ট ওই!"
তখনও চারপাশে আমার কল্পনা থইথই।
সেসব ফেলে আমি বললাম, "কিচ্ছুই হয়নি তো!"
বাবা বলল, "বাঘের ভয়েই তোতন আমার ভীত।"
বলেছি যেই, "বাঘই তো নেই, ভয়ই পাইনি মোটে!"
তখন রঙিন ফুল ফুটেছে পাতার সবুজ ঠোঁটে।
হাঁটতে-হাঁটতে গভীর বনে ঢোকার মুখে এসে
মা বলল, "কাজ কী গিয়ে আর?" বাবাও উঠল হেসে।
বলল, "আহা ভয়ের কিছুই নেই তো সবাই জানে!"
"বন তো বনই, আলাদা নাকি গভীর বনের মানে?"
বলেই সটান হাঁটতে থাকে ফেরার পথে মা যে,
বাবাও বলল ফেরার কথা, "এখন পাঁচটা বাজে!"
বোনেরও দেখি মুখটা ছোট, "ভয় পেয়েছিস নাকি?"
বোন বলল, "বাঘটাঘ নেই, বনটা শুধুই ফাঁকি!"

একটু পরেই রাত নামল, ভয়েই সবাই জড়,
বাবা বলল, "তোতনকুমার, আটের নামতা পড়ো।
মুনুমা আমার বানান বলো, ব্যাঘ্রমশাই, বাড়ি।"
মা দেখি চুপ ভীষণ, এবার ফেরার পথের গাড়ি।
আমরা যখন ফিরছি দূরে বাংলো কালিম্পং-এ
বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে ডেলো পাহাড়ের টঙে।
সব্বাই চুপ, বোনটা ঘুমোয়, বুনো ফুল তার হাতে,
একাই আমি বাঘ মারছি শুধুই কল্পনাতে।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী
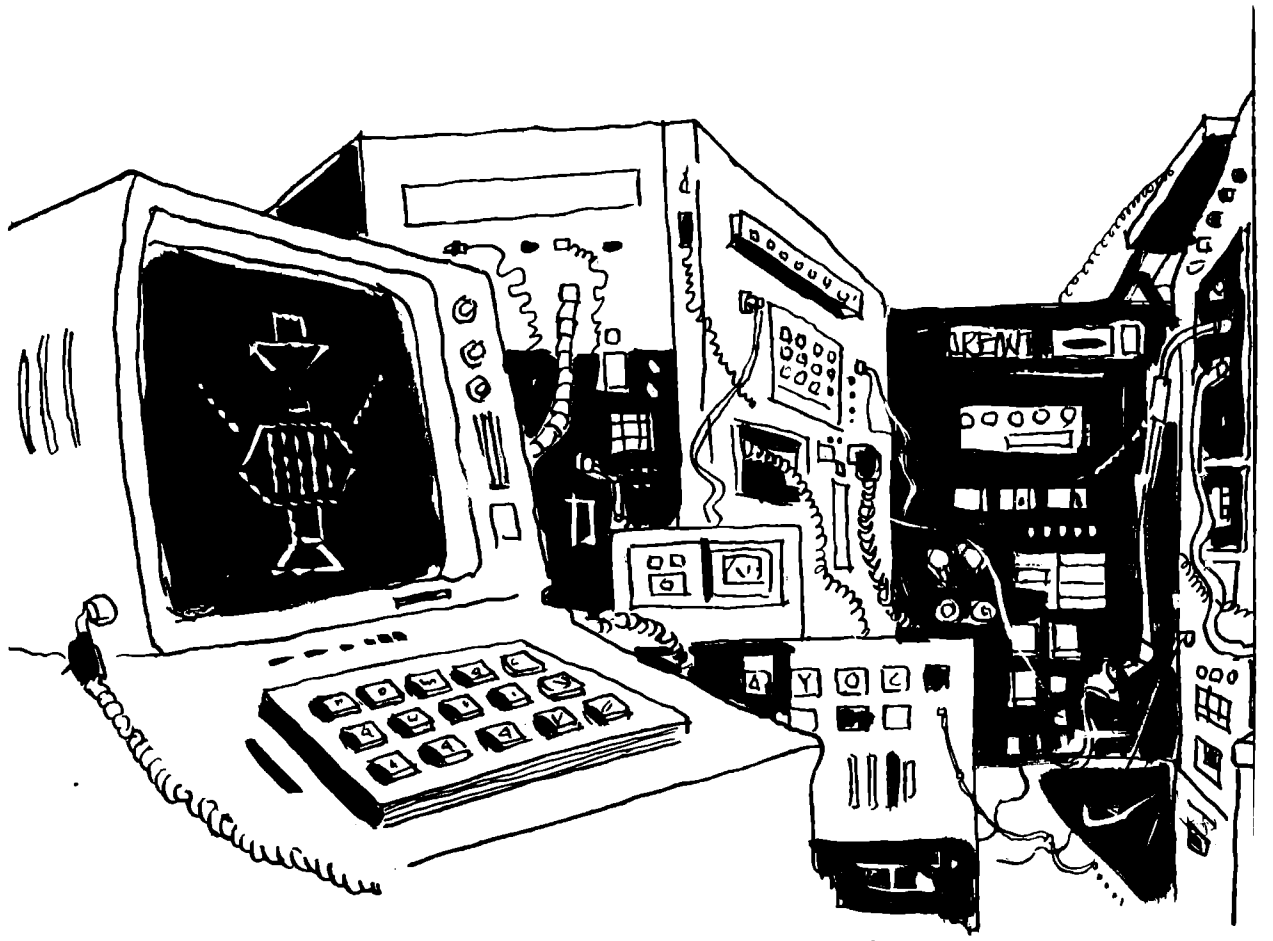
টাইম মেশিনে যুধিষ্ঠির

সিদ্ধার্থ ঘোষ

"ঠিক এক বছর পরেই কিন্তু..."

চমকে উঠেছি। যুধিষ্ঠির যে কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারিনি। যুধিষ্ঠিরের দিকে মুখ ফেরাবার আগেই টেবিলের ওপরে খাতাটাকে বন্ধ করে ফেলেছি। একটা অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার নিয়ে এখন ব্যস্ত।

যুধিষ্ঠির হেসে বলল, "অকারণে ভয় পেলে কিন্তু। কে কী লিখছে সেটা কখনওই আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করব না। আমার নীতিবোধে বাধে।"

"সরি। আমি কিছু ভেবে করিনি। বোধ হয় রিফ্লেক্স অ্যাকশন।" নিজের ছেলের কাছে ভুল স্বীকার করতে ভালই লাগে। সে ছেলে কানা, খোঁড়া, দস্যু হোক বা যুধিষ্ঠিরের মতো যন্ত্রমানুষ।

"আর ঠিক এক বছর পরেই কিন্তু আমার আঠারো বছর বয়স হবে। মনে আছে তো? তুমি কিন্তু প্রমিস করেছ..." কথা শেষ না করে যুধিষ্ঠির আমার চোখে চোখ রাখল।

"কী প্রমিস করেছি? বার্থডে প্রেজেন্ট হিসেবে একটা মোটর সাইকেল তো?"

"সে তো আছেই। তা ছাড়া আইন অনুসারে তখন আমি স্বাবলম্বী। এই যে প্রতিদিন—এটা কোরো না, ওখানে যেয়ো না—এগুলো থামাবে কি না!"

"শোনো যুধো, নিশ্চয় এখনকার মতো অতটা করব না কিন্তু..."

"অতটা-ততটা বুঝি না। আমি জানি আমি যন্ত্রমানুষ। তাই মানুষ যা-যা করতে পারে তার সবই আমি নিশ্চয় করব না। করতে চাইবও না। কিন্তু তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করবে না! কেন তুমি স্বাধীনতা দেবে না!"

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম। অনেকদিন কাজের চাপে ভাল করে মন দিইনি যুধোর দিকে। যুধোর শরীরটা এখন বেশ টানটান হয়ে উঠেছে। মুখটা বয়ঃসন্ধির জন্য একটু চোয়াড়ে ভাব পেলেও আকর্ষক। হঠাৎ যেন এক লাফে অনেকটা লম্বাও হয়েছে। এখন ওকে প্রতিদিন শেভ করতে হয়। ও কি আমার চেয়েও ঢ্যাঙা হবে? বলা মুশকিল, আমার বাবার দিক থেকে অনেকেই আমার চেয়ে অনেক লম্বা ছিলেন, আবার মায়ের দিক থেকে তার উলটো উদাহরণও প্রচুর। কোন কম্বিনেশনটা শেষপর্যন্ত যুধোর ওপর বর্তাবে, সেটা পিতা হয়েও আমি বলতে পারব না। যুধো যন্ত্রমানুষ হলেও সে আমারই বংশের জেনেটিক ধারার
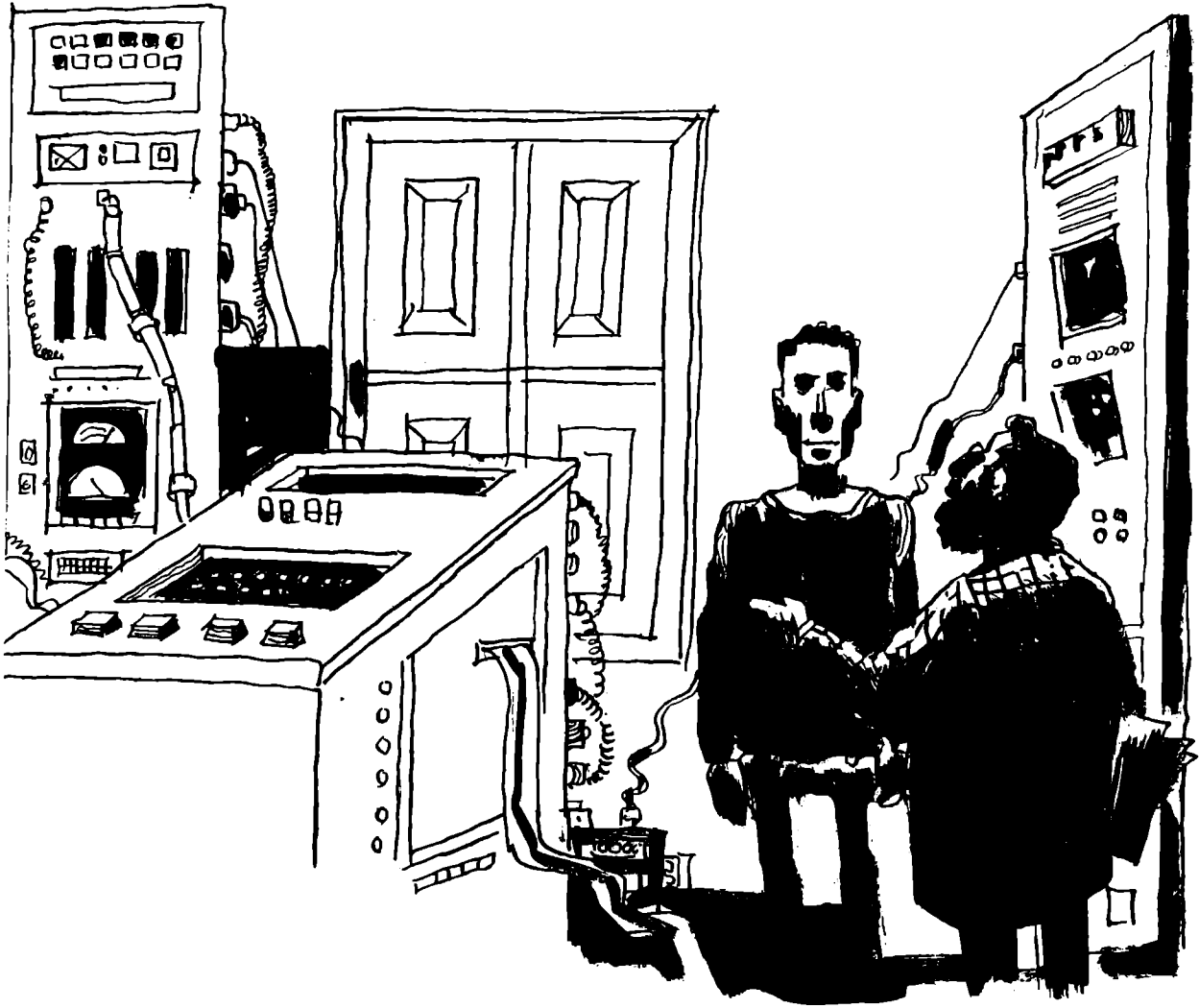
উত্তরসুরি।

"কী ভাবছ এত ? উত্তর দাও !"

"তোকে দেখছিলাম। অনেক কথা মনে পড়ছিল।"

"তুমি কি আমায় এড়িয়ে যেতে চাইছ ?"

"না রে, একেবারে না। তোকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে কোথায় আমি ভয় পাই, সেটা কি তুই জানিস ?"

"জানি বইকী ! পাছে, কেউ কখনও বুঝে ফেলে যে আমি মানুষ নই, যন্ত্রমানুষ। তা হলে আমাকে হয়তো সবাই শেষ করে দেবে আর তোমার···।"

"আমার কী হবে তা নিয়ে ভাবি না,. কিন্তু তোর···"

"প্লিজ, তুমি এভাবে ধাপ্পা দিয়ো না বাবি। তুমি যখন আমাকে তৈরি করতে পেরেছ, আমি না-থাকলে আবার আরেকজনকেও ঠিক তৈরি করে নেবে।"

"হ্যাঁ—তা পারি। কিন্তু তাকেও আবার ঠিক তোমার মতো ছোট থেকে বড় করে তুলতে হবে। সতেরোটা বছর কাটাতে হবে। সারাক্ষণ সঙ্গ দিতে হবে।"

"তুমি একটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড ব্যবস্থা বানিয়ে নাও— মানে, হাই স্পিড ডাবিং জাতীয়— যেভাবে একটা ক্যাসেট থেকে আরেকটা ডুপ্লিকেট করে আজকাল।"

"আইডিয়া হিসেবে ভাল, কিন্তু অনেক সমস্যা আছে। যেমন, তোকে আমি সৃষ্টি করলেও, শেষপর্যন্ত তুই কী হবি, কী করবি জানি না।"

"এবং সেটা তোমার মনোমতো নাও হতে পারে, এই তো ?"

"হ্যাঁ। সত্যি। তবে এটুকু বলতে পারি যে, আজ অবধি তুই যা করেছিস তাতে আমার কোনও অস্বস্তি হয়নি। বরং আমি খুব খুশি। তুই আমার যান্ত্রিক ছেলে হলেও তুই শৈশব পেয়েছিস, তুই বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেছিস..."

"এগুলো কি সবই তোমার কৃপা ? তুমি না দিলে কি আমি এগুলো পেতাম না ?"

"শোন যুধো, এখন অবধি তোর একটাই সমস্যা। তুই সারাক্ষণ নিজেকে রক্তমাংসের সত্যিকার মানুষের সঙ্গে বিচার করিস। আর এই বিচার করা মানেই নিজেকে তো···"

"হ্যাঁ, নিজেকে আমার ভাল লাগে না। তুমিই তো আমাকে বারবার বলেছ, সাবধান যুধো ! সাবধান ! একবার যদি

কেউ বুঝে ফেলে যে তুই যন্ত্রমানুষ, তা হলেই সর্বনাশ! তুমিই তো বলেছ, কেউ যদি একবার আমার রক্ত পরীক্ষা করে তা হলেই সব ধরা পড়ে যাবে। বলোনি?"

"বলেছি। নিশ্চয় বলেছি। কারণ, কথাটা সত্যি।"

"কেন? আমার রক্ত কি মানুষের মতো নয়? না কি আমার শরীরে রক্তই নেই? আমি ঠিক কোনখানে সত্যিকার মানুষের থেকে আলাদা, সেটা কেন তুমি আমায় বুঝিয়ে বলো না।"

"তোকে এসব কথা বোঝানো উচিত কি না তা এখনও আমি জানি না। তুই একটু আগেই বলছিলি না, নীতিবোধ। তোর নীতিবোধের কথা। আমারও তো একটা নীতিবোধের ব্যাপার আছে। তুই যদি সব বুঝে ফেলিস তা হলে তুইও আবার একটা যন্ত্রমানুষ তৈরি করে ফেলতে পারিস। সেখানে আমার ভীষণ আপত্তি। শোন, শোন, রাগ করিসনি। এটা তোর ওপর আমার আস্থার অভাব নয়, নিজের ওপর আস্থা নেই বলেই আজ অবধি তোকে সৃষ্টি করার জন্য কোনও পেটেন্ট নিইনি আমি। কোনও বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় এ-বিষয়ে একছত্র লিখিনি। কোনও কৃতিত্ব দাবি করিনি। এর পরেও তুই যদি..."

যুধো দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবি, তোমায় তো আমি ভালবাসি। কেন তুমি ভাবছ যে, আমি এমন কিছু করতে পারি যাতে তুমি কষ্ট পাবে বা অসন্তুষ্ট হবে বা অসুবিধেয় পড়বে। বলো না বাবি! বাবি!"

কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নীরবতা। যুধোই সিগারেট প্যাকেট খুলে একটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে লাইটার জ্বালিয়ে ধরল। এগুলো ওর প্রোগ্রাম-করা মস্তিষ্কের মধ্যেই আছে।' আমিই এসব করে রেখেছি, তবু আমার ভাল লাগে ওর এই প্রতিক্রিয়া। আমাকে ও ভালবাসে, আগলে রাখতে চায়। এর মধ্যে সবটাই সাদা-কালো বা শূন্য-এক বাইনোমিয়াল নয়। যুধো সত্যিই বিকশিত হচ্ছে। আমার ইচ্ছের বাইরেও ও তার নিজের একটা জগৎ তৈরি করে নিচ্ছে। সমস্যা একটাই। এর অন্তিম পরিণতি কী হবে? মানুষ যখন মোটরগাড়ি তৈরি করে রাস্তায় ছেড়েছিল, বিজ্ঞাপন দেওয়া হত—এ-যুগের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন পরিবহণ। গাড়ি-টানা ঘোড়ার মতো রাস্তায় নোংরা ছড়ায় না। এখন দেখা যাচ্ছে তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করছে মোটরগাড়ির ধোঁয়া।

যুধো বলল, "তা হলে তুমি আমায় দেবে না তো? মোটর সাইকেলটা?"

"মোটর সাইকেল দিতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে তোমাকেও কয়েকটা কথা দিতে হবে।"

"বলে ফেলো!"

"হেলমেট পরতে হবে।"

"আমার মাথা তো মানুষের মাথা নয় বাবি। কিছু হবে না, হাই স্পিডে ক্র্যাশ করলেও।"

এতক্ষণে যুধোকে পাকড়াও করেছি। ঠিক এই জায়গাটাতেই পৌঁছতে চাইছিলাম। "তোর কোনও ক্ষতি হবে না, সে তো তুইও জানিস, আমিও জানি। কিন্তু ধর, এরকম একটা দুর্ঘটনা হল, অথচ তুই চোট পেলি না। তার থেকে কিন্তু শেষপর্যন্ত ওই একটাই কথা, ধরা পড়ে যাব আমরা, যন্ত্রপুত্র ও পিতা।"

"এটা তোমার অবসেশন। রক্তপরীক্ষা ছাড়া আর কেউই ধরতে পারবে না আমি তোমার যান্ত্রিক পুত্র।"

"পারতেও পারে যুধো। পারতেও পারে।"

"কীরকম?"

"এই ধর, ক'দিন ধরেই আমি লক্ষ করছি—তুই কীভাবে আমার চিঠিগুলো খামে ভরিস। বল তো, চিঠিগুলো খামে ভরার সময়ে কি তুই কিছু ভাবিস? কিছু ভেবে চিঠিগুলো ভাঁজ করিস?"

যুধিষ্ঠির দু-তিনবার চোখ পিটপিট করল। বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে।

"তুমি কথাটা বলেছ ঠিকই। কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না। চিঠির কাগজের আকার এবং তার খাম, এই দুটো হাতে পেলেই কী যেন একটা মনে হয় এবং সেইমতোই কাগজটাকে ভাঁজ করে আমি খামে ভরি, কিন্তু..."

"মনে করিয়ে দিচ্ছি যুধো। তুই চিঠির কাগজটাকে সবসময়ে গোল্ডেন রেশিওতে ভাঁজ করিস। ঠিক বলেছি?"

"ঠিক! একেবারে ঠিক। কিন্তু সেটা কি অন্যায়? লিওনার্দোকে কি তোমার অপছন্দ?"

"লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে অপছন্দর ব্যাপার নয় যুধো। তোর এইসব কাণ্ড যদি খুঁটিয়ে দেখার মতো লোক থাকত তা হলে কিন্তু তারা সব বুঝে ফেলত। আমি যতই চেষ্টা করি তোকে মানুষ করার, তোর মধ্যে কিন্তু এমন ব্যাপার আছে যা তোকে ধরিয়ে দিতে পারে। আমরা এখনও বেঁচে আছি, কারণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোয়েন্দারা অনেককাল আগেই বিদায় নিয়েছেন। গ্যাবোরিও, দুপ্যাঁ, হোম্স, থর্নডাইক কি ব্যোমকেশ থাকলে কী যে হত কেউ জানে না। তারা ঠিক ধরে ফেলত।"

যুধিষ্ঠির হঠাৎ র‍্যাপ গানের কলি ধরে মিনিটতিনেক আমাকে অতিষ্ঠ করে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ! কিন্তু আমি কি সামনের বছর মোটর সাইকেলটা পাচ্ছি? আমার জন্মদিনে?"

"হ্যাঁ যুধো! পাবে। কথা দিয়েছি যখন, পাবে। কোনও নামী কোম্পানির নয়, ওটা কিন্তু আমার তৈরি টাইম-বাইক।"

"টাইম-বাইক মানে?"

"তোমার ওই দু-চাকাওলা যন্ত্রটা নিয়ে তুমি সময়ের ইতিহাসের যে-কোনও জায়গায় পৌঁছতে পারো। তুমি ভবিষ্যতে যেতে পারো, কিংবা অতীতে। দু' চাকার টাইম মেশিনে যন্ত্রমানুষ।"

আমার তৈরি দু'চাকার টাইম মেশিনটা নিয়েও বেশ ভয় ছিল। যদি কেউ অপব্যবহার করে তাই এমনভাবে তৈরি করেছি যে, যুধো ছাড়া আর কেউ ওটা ব্যবহার করতে পারবে না। আমিও না।

যুধো স্বাভাবিকভাবেই এখন সারাদিন বেপাত্তা। টাইম-বাইকে চড়ে যেখানে-সেখানে চলে যাচ্ছে আর রাত্তিরে বাড়িতে ফিরে চোখ বড়-বড় করে গল্প শোনাচ্ছে। ওর কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অতীতের জীবজন্তু। ডাইনোসরদের যা বিবরণ ওর মুখে শুনছি, তাতে মনে হচ্ছে পুরাজীবতত্ত্বের মধ্যে অনেক ঘাটতি থেকে গেছে। ডায়েরিতে সব নোট রাখছি। এখনই এসব নিয়ে কিছু লেখা যাবে না, কিন্তু একদিন-না-একদিন...

সব পরিকল্পনা কিন্তু ভেস্তে গেল। অবশ্য তার জন্য যুধোও দায়ী নয়, আমার টাইম মেশিনও নয়। ভোটের ঠিক আগে একের পর এক গণ্ডগোল; কলকাতার সচেতন মানুষরাও সামলাতে পারছে না অবস্থা। পাড়ায়-পাড়ায় প্রতিদিনই এক-আধটা খুনখারাপি।

যুধো রাত্তিরে ফিরে এসে বলল, "আজ একটা অন্যায় করেছি। তোমাকে না বলেই ক্যামেরাটা নিয়ে গেছলাম।"

"কোথায়?"

"নিকট অতীতে। ঠিক সাল-তারিখ বলতে পারব না, কিন্তু বেশ কিছু ধর্মস্থানের ছবি তুলেছি। ভালই এসেছে ছবিগুলো। দেখবে?"

"কই, দেখি!"

প্রায় ষাট-সত্তরটা ছবি। সবই ধর্মস্থানের, কিছু-কিছু চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। আবার অচেনা জায়গাও আছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ছবিগুলো একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তোলা। ইতিহাসে হানা দিয়ে যুধো যুগ-যুগান্তরের ধর্মযুদ্ধের সচিত্র নথি সংগ্রহ করেছে।

"ব্যাপারটা কী? হঠাৎ এসব কেন? বিশেষ করে এই সময়ে!"

"এই সময়েই তো কিছু করা দরকার। আর তো ভয় পেয়ে বসে থাকলে চলবে না। যা বোকামি চলছে সেটা থামাবার জন্য একটা কিছু করা দরকার। আমার নীতিবোধ বলছে, এই ছবিগুলি ব্যবহার করে তুমি একটা কিছু লেখো। সব বিতর্ক থেমে যাবে।"

কথাটা যুধো ভুল বলেনি। কিন্তু তার জন্য একটা বড় খেসারতও বোধ হয় দিতে হবে।

"কী, চুপ করে বসে রইলে কেন! আমি জানি কী ভাবছ? লোকে বুঝে ফেলবে তোমার টাইম-মেশিন ও যন্ত্রপুত্রের কথা। এই তো? শোনো তা হলে, আমি জানি আমাকে ওরা শেষ করে দেবে। টাইম মেশিন সমেত তোমার সব গবেষণাপত্র পুড়িয়ে দেবে। ফ্লপি কম্পিউটারও যাবে। তবু বলছি, মানুষ হিসেবে ইতিহাসের কাছে তোমারও একটা দায়িত্ব আছে..."

"ব্যস, ব্যস! আর জ্ঞান দিতে হবে না। আমি লিখব।"

লিখব যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সবই খুলে লিখব। যুধোর কথা, টাইম মেশিনের কথা, কীভাবে তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ করেছি, সব। না হলে, পাঠক বিশ্বাস করবে না। অবশ্য সেইসঙ্গে এটাও জানিয়ে দেব যে, আমাকে যতই নির্যাতন করা হোক, যন্ত্রমানুষ বা টাইম মেশিন তৈরির কৌশল কোনওভাবেই কেউ আত্মসাৎ করতে পারবে না। এটা কোনও নিউটনের বা আইনস্টাইনের ফর্মুলা নয়। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবশ্য তাতেও যে বিশেষ ফল হবে, তা নয়। পৃথিবীর যে-কোনও রাজনৈতিক শক্তি চাইবে এই ধরনের প্রকৌশলকে হাতিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে। কিন্তু তবু লিখতে আমাকে হবেই।

লেখা শেষ করে দেখি যুধো ঘরে ঢুকছে। কখন বেরিয়ে গিয়েছিল খেয়ালই করিনি।

"কী রে তুই আবার কোথায় গেছলি?"

উত্তর না-দিয়ে যুধো আমার টেবিলে একটা প্লেনের টিকিট রেখে দিল। আর চেয়ারের পাশে নামিয়ে রাখল আমার ট্রাভেল ব্যাগ।

"কোথাকার টিকিট কাটলি?"

"এখন কোনও কথা নয়। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, শিগগির ড্রেস বদলে নাও।" সে আরও বলল,

"দশ মিনিটের মধ্যে না-বেরোলে প্লেন মিস করবে। ভাল কথা, এখন থেকে তোমার নাম বদলে গেছে। পাশপোর্টটা ভাল করে পড়ে নিয়ো। এটার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। লেখাটা কই?"

আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। আঙুল দিয়ে শুধু দেখিয়ে দিলাম। যুধো আমাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে, আমার চেয়ারটাতেই বসে পড়ল। জামা পালটে ফিরে এসে দেখি যুধো কী লিখছে। আমাকে দেখেই কাগজটা উপুড় করে রাখল।

"ভয় নেই, তোমার লেখার ওপর কলম চালাচ্ছি না। একটা পার্সোনাল চিঠি লিখছি।"

"কাকে?"

"আমার সবচেয়ে প্রিয়জনকে। এই মুহূর্তে তো ইচ্ছে করে লিখতে, করে না? প্লিজ তুমি আর দেরি কোরো না। তোমার লেখার গোটাচারেক কপি করে আজই রাত্তিরে বিভিন্ন খবরের কাগজে পৌঁছে দেব। তারপরের ঘটনা তো জানতে পারবেই, পৃথিবীর যেখানেই থাকো না কেন।"

নিউ ইয়র্কের হোটেলে বসে টেলিভিশনে দেখলাম পরবর্তী ঘটনা। যুধোই এই হোটেলে বুকিং করে রেখেছিল। আমি যে এখানে আছি, সেটা জানে শুধু আমার স্কুলের এক বন্ধু। সে থাকে নিউ জার্সিতে। টাকাপয়সার অভাব হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে তার বাড়িতে গিয়ে ওঠাটা বিপজ্জনক। সত্যি কথা বলতে কী, ওদের নিউ জার্সির বাড়িতেও পুলিশ একবার হানা দিয়ে গেছে। পৃথিবীর কারও জানতে বাকি নেই যুধো ও টাইম মেশিনের কথা। আমার বাড়ি এবং গবেষণাগার সব কিছু উন্মত্ত লোক পুড়িয়ে ফেলেছে। অন্তত সেইরকমই দেখানো হয়েছে টেলিভিশনের ছবিতে। আমার অবশ্য সন্দেহ যে, আগুন লাগানোর আগেই যুধো, টাইম মেশিন ও গবেষণাসংক্রান্ত যাবতীয় নথি কেউ-না-কেউ হাতিয়ে নিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। তাতে আমার দুঃখ নেই, কারণ অন্য কেউ দূরের কথা, আমার পক্ষেও আর দ্বিতীয় যুধো বা টাইম মেশিন তৈরি করা সম্ভব নয়। আমি শুধু কম্পিউটার মেমরি থেকে নয়, আমার নিজের মস্তিষ্কটি থেকেও এই সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যকে চিরতরে মুছে ফেলেছি।

গণ্ডগোল থেমেছে কিন্তু। এবং সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। এখন মনে হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যে সব থিতিয়ে যাবে। ভারতে এক্ষুনি ফিরতে না পারলেও নিউ জার্সিতে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকা যাবে।

টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠলাম।

"হ্যালো..."

"গুড মর্নিং সার!" রিসেপশন থেকে মহিলার কণ্ঠ। আমার একটা চিঠি এসেছে। ঘরে পাঠিয়ে দিতে বললাম।

এই ছদ্মনামে এবং এই ঠিকানায় কে চিঠি দিল!

খামটা হাতে পেয়েও বুঝতে পারিনি। চিঠিটা বের করার পর আর সন্দেহ নেই। পড়ার আগেই বুঝে ফেলেছি কে লিখেছে। সেই গোল্ডেন রেশিওতে ভাঁজ করা কাগজ।

"বাবি! অবাক হচ্ছ তো! বিপদ আসবে জেনেই এই চিঠি সেদিনই বসে লিখেছি এবং টাইম মেশিনে করে চারদিন এগিয়ে গিয়ে জি. পি. ও-তে পোস্ট করে রেখে এসেছি। ঠিক সময়মতো পেয়ে যাবে। ওরা যদি আমায় ও টাইম মেশিনকে নষ্টও করে দেয়, তাতেও কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি এই চিঠির মধ্যে সব তথ্য ও তত্ত্ব পেয়ে যাবে। আমি ইচ্ছে করলে ভবিষ্যতেই আত্মগোপন করে থাকতে পারতাম, কিন্তু তা হলে তোমার লেখা ও আমার তোলা ছবিগুলিকে ওরা আজগুবি বলে উঠিয়ে দিত। তাই ওদের হাতে আমায় মরতেই হবে। তোমার সাঙ্কেতিক ভাষা যা আমি পড়তে পারি না, কিন্তু জানি যে, তার মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছে আমাকে সৃষ্টি করার যাবতীয় ফর্মুলা ও দর্শন, তারই একটা প্রিন্ট-আউট এই চিঠির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি। ইচ্ছে হলে তুমি আবার আমায় তৈরি করে নিয়ো। তবে একটা কথা। তা যদি করো, তা হলে আমি কিন্তু আবার বায়না ধরব টাইম-বাইকের জন্য। সেটাও কিন্তু তখন তোমায় তৈরি করে দিতে হবে। দিতেই হবে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

মৃত্যু দিয়ে গড়া সেই কীর্তি

বিশ্বদেব বিশ্বাস

এই পথে একটি ভুল পদক্ষেপ মানেই নিশ্চিত মৃত্যু

হার্মান বুহল

পর্বতারোহণের ইতিহাসে সাফল্যের পাশাপাশি আছে ব্যর্থতার অনেক করুণ কাহিনী। পাহাড়ের দুর্গম পথের বাঁকে, পাথরের খাঁজে লেগে আছে অনেক রক্ত আর দীর্ঘশ্বাস।

ছেলেটি স্কুলের ছাত্র, নেহাতই নাবালক। অস্থির, চঞ্চল স্বভাব। আচার-আচরণে বিক্ষিপ্ত, বেপরোয়া। আজ একটা কিছু করে, তো কাল আর একটা। বড়রা অনেক বুঝিয়েছেন। অনেক বলেছেন, "দ্যাখ, সব কাজে একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা না থাকলে জীবনে কখনও বড় হওয়া যায় না।" হিতোপদেশ শুনে মাঝে-মাঝে ছেলেটির ভাবান্তর জেগেছে। ভাবে—না, কাল থেকে আর এমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরবে না। কিন্তু বয়সের ধর্ম ওকে কখনও সুস্থির হতে দেয়নি।

একটি ক্ষেত্রে ছেলেটির এই দুর্দম, অস্থির স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা গেছে। যখনই কোনও পাহাড়ের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে, সহসা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। —একেবারে অন্য মানুষ। পাহাড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। শান্ত, ধীর, নিমগ্ন হয়ে আপন মনে কী যেন ভাবতে থাকে! মনের মধ্যে কী এক অব্যক্ত আলোড়ন ওঠে। ওই পাহাড়টা বেয়ে ওঠার জন্য প্রবল আগ্রহ জাগে। তখন মনটা ছটফট করতে থাকে। ওই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কেমন যেন ওকে কাছে টানতে থাকে। আপন অজ্ঞাতে ধীরে-ধীরে পায়ে-পায়ে পাহাড়টার আরও কাছে এগিয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করে। কখনও পারে, আবার কখনও পারে না। এক জায়গা দিয়ে না পারলে অন্য জায়গা দিয়ে চেষ্টা করে। মাঝে-মাঝে পড়ে যায়, আঘাত লাগে। তারপরেই আরও জেদ চেপে যায়, উদ্যম বাড়ে—উৎসাহও পায়। ওদের দেশে সুবিধে,—পাহাড় বাড়ির কাছেই আছে। ছুটির দিনে পাহাড়ে ওঠা ওদের দেশে একটা মজার খেলা। এইভাবেই দিন যায়, স্কুলের ছুটি কাটে। যত দিন যাচ্ছে, পাহাড়ে চড়ার খেলাটাতেই ছেলেটি নিবিষ্ট হয়ে পড়ছে—ওই কিশোর বয়সেই, স্কুল-জীবনেই। স্কুলের ছুটি থাকলেই মোহাচ্ছন্নের মতো পাহাড়ে গিয়ে হাজির হয়। পাহাড়ে ওঠা সহজ নয়। সেই পাহাড়ে চড়ার খেলায় পাহাড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। সেই সংগ্রামে কেমন যেন নিজের বাহাদুরি দেখানোর সুযোগ মেলে, গর্ব বোধ হয়। ভয় কাটিয়ে, শক্তি দেখিয়ে, বিপদ এড়িয়ে পাহাড়ে ওঠা। সামনে বাধা আসে, সমস্যা আসে, বিপদ আসে, নিজেই সব সমাধান করে সমানে উঠে চলে। এমনি করে ক্রমে-ক্রমে মনে সাহস বাড়ে, বেপরোয়া ভাব জেগে ওঠে। যখন লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তখন মনে হয়, 'আমি

সকলের চেয়ে কত বড়, সকলের চেয়ে উঁচুতে।' সে এক অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি! সে আনন্দের কোনও তুলনা নেই। তাই ফাঁক পেলেই ছেলেটির একমাত্র চিন্তা, পাহাড়ে চড়া।

ছেলেটির নাম হার্মান বুহ্‌ল। অস্ট্রিয়ার ইন্‌সব্রাক শহরতলিতে জন্ম। শহরের ওপরেই পাহাড়ের সারি, যেন গির্জার চূড়ার মতো আকাশে ওঠার লক্ষ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। হার্মান ছেলেবেলায় সারাক্ষণ দোলায় শুয়ে শুয়েই ওই পাহাড় দেখেছে। বলা যায়, পাহাড়ই দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রতিনিয়ত শিশুটিকে দেখেছে। দিব্যজ্যোতিতে শিশুঅন্তরকে প্রভাসিত করেছে। বড় বয়সে এই হার্মান বিশ্বসেরা এক পর্বতারোহী হয়ে উঠেছে। পর্বতারোহণে এক অবিস্মরণীয় নজির সৃষ্টি করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

অতি শৈশবে হার্মানের মা মারা গেছে। ওর বয়স তখন চার বছর মাত্র। মা-মরা শিশুটি অযত্নে, অবহেলায়, অনাথের মতো ঘুরে বেড়াত। বাবা যদিও সন্তানের তত্ত্বাবধানে সজাগ ছিলেন কিন্তু মায়ের অভাব তাতে পূরণ হয়নি।

হার্মান যখন স্কুলে পড়ত, ওর বন্ধুরা—কী স্কুলের বন্ধু, কী পাড়ার বন্ধু, এমনকী আত্মীয়স্বজনের সমবয়সী ছেলেরাও ওর সঙ্গে বেশি মিশতে চাইত না। কারও সঙ্গে দেখা হলেও তাকে বিরক্ত করত, বলত, "চলো পাহাড়ে উঠি।" অনেকেই পাহাড়ে ওঠার কথা শুনে ভয়ে পিছিয়ে যেত, তারা হার্মানের কথায় রেগে যেত, ওকে এড়িয়ে চলত। অনেক ছেলের অভিভাবকেরা তাদের ছেলেদের হার্মানের সঙ্গে মিশতেও বারণ করে দিয়েছিলেন। তবে পাহাড়ে চড়ার কয়েকজন প্রকৃত বন্ধু ওর ছিল। প্রতি রবিবারে সবাই সেজেগুজে বাবা-মায়ের সঙ্গে যখন গির্জায় হাজির হত, হার্মান তখন পাহাড়ে চড়ার বন্ধুদের যাকে পেত তাকে সঙ্গে নিয়েই পাহাড়ের পথে ছুটত। ঝড়বৃষ্টি কোনও কিছুই সে মানত না। একটুও তার উৎসাহ কমত না। একটানা বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে তার মনে হত, 'জলে ভেজা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে পারি কি না দেখি।' ঝড় হচ্ছে, তারই মধ্যে হার্মান পাহাড়ে উঠেছে। কোনওদিন ঝড়ের মধ্যে, কি বৃষ্টির মধ্যে জলে ভেজা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে হয়তো পড়ে গেছে। ভীষণ আঘাত লেগেছে। বন্ধুরা বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। বাবা কিন্তু বকাঝকা করেননি, মাতৃহারা সন্তানটিকে স্নেহ ও সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন। হার্মান যখনই একটু সেরে উঠেছে আবারও পাহাড়ে উঠতে ছুটেছে।

শীতকালে ওদেশে খুব কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। বরফ পড়ে। হয়তো এমন কোনও দিনে ওর পাহাড়ে ওঠার বন্ধুরা ঘরে আগুন জ্বেলে কম্বলমুড়ি দিয়ে শরীর গরম রাখছে, আরাম করছে, তখন হয়তো সহসা হার্মান এসে হাজির হয়েছে। বলেছে, "এই ঘরে বসে কী করছিস ? চল, বেরিয়ে পড়ি। আজ 'ফ্রাউ হিট' পাঁচিলটায় উঠব। তারপর ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে 'র‍্যাপেল' করে নেমে আসব। নামার সময় পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। উঃ, পাহাড় বটে! খাড়া তেলা পাথরের ঢাল, কোথাও যেন একটা ফাঁক-ফোকর, ফাটল কিচ্ছু নেই যে, ধরে-ধরে ওঠা যায়, বুটের ডগা রাখা যায়! ওই পাঁচিল নিয়ে নানা গল্পও আছে। ভয় একটু করে বটে, তাতে কী হয়েছে ? ঠিক আস্তে-আস্তে উঠে যাব। চল না, বেরিয়ে পড়ি।"

কোনওদিন হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ছাদে চড়বড় করে আওয়াজ হচ্ছে। বন্ধুরা তাদের যে যার ঘরে বসে গল্প করছে, কফি খাচ্ছে। এমন সময় হার্মান ভিজতে-ভিজতে কোনও এক বন্ধুর বাড়িতে এসে হাজির। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। বন্ধুকে ডেকে বলছে, "চল, পাহাড়ে উঠি।" বন্ধু বলেছে, "এই ঝড়জল মাথায় করে যাবি কী করে ? পাহাড় যে ভীষণ পিছল হয়ে আছে।" হার্মান নাছোড়বান্দা। বলেছে, "কিছু হবে না, চল না। পাহাড়ের গায়ে খুব কাছে-কাছে পেরেক পুঁতে দেব, তা হলে আর পড়ব না।" হার্মানের কথা বন্ধুর মা শুনতে পেয়ে গেছেন। ওকে খুব বকেছেন। এমনকী জোর করে আটকেও রাখা হয়েছে, খাওয়ানো হয়েছে ভূরিভোজ। যদি হার্মান মত পালটায়! হয়তো কোনওদিন একটু পরেই বৃষ্টি থেমে যেত। আকাশ পরিষ্কার হয়ে ঝলমলে রোদ উঠত, আর মনে হত জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া পাহাড়গুলো ওদের ডাকছে। সকলে দড়ি, পেরেক, হাতুড়ি, পাহাড়ে ওঠার জুতো, মোজা টুকিটাকি সবকিছু ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। পিছল পাহাড়ে উঠতে কষ্ট হত, কখনও পড়ে যেত, তবুও ভাল লাগত। আনন্দ পেত।

প্রতি ছুটির দিনে অন্ধকার থাকতে-থাকতে উঠে, বাবার অগোচরে চুপিচুপি বেরিয়ে যেত। বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে তাদের ডেকে
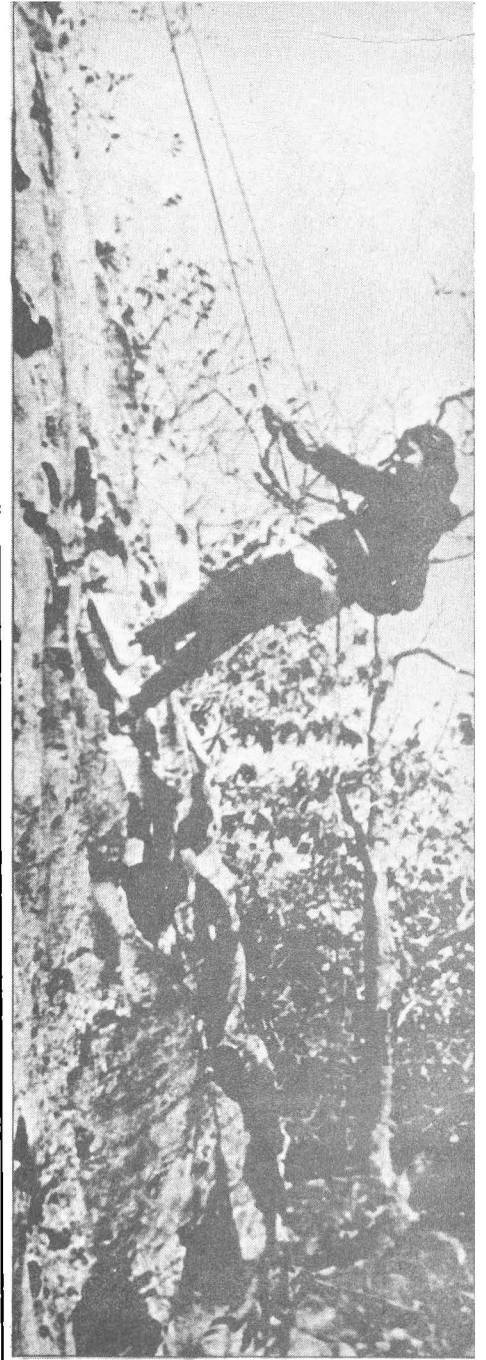
দেওয়ালের মতো খাড়া 'রক-ফেস' বেয়ে উঠছেন পর্বতারোহী

তুলত। আমেজের ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তারা কখনও-কখনও রাগও করত কিন্তু হার্মান দমে যাওয়ার ছেলে নয়।

এইভাবেই হার্মান বড় হতে থাকল। যত বড় হচ্ছে, বয়স বাড়ছে, পাহাড়ে ওঠার নেশা যেন তত উদগ্র হয়ে উঠছে। যা ছিল কৈশোরের আনন্দ, তা যৌবনে হয়ে উঠেছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ইংল্যান্ডের বড় বড় পর্বতারোহীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। আগের চেয়ে আরও বড়, আরও উঁচু পাহাড়ে ওঠে। পাহাড়ের নামেই হার্মান কীরকম যেন আনমনা হয়ে যায়। পাহাড় যেন ওর সঙ্গে কথা

বলে। সঙ্গী কেউ না জুটলে একাই পাহাড়ে যায়।

গ্রীষ্মের এক ছুটির দিনে হার্মানের দুই পুরনো বন্ধু ওকে পাহাড়ে ওঠার আমন্ত্রণ জানাল, 'Wetterstein Range'- এ উঠবে। এর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা আছে, নিজের ক্ষমতা প্রকাশেরও সুযোগ থাকে। তাই পাহাড়ে যাঁরা ওঠেন, তাঁরা উপযুক্ত পাহাড়ে ওঠার ডাক পেলে গর্ব বোধ করেন। নিজেকে মনে-মনে একজন বড় পর্বতারোহী ভাবেন। এমন ডাক হার্মানের কাছে প্রথম, তাই গৌরবের, স্মরণীয়ও বটে। আগের দিন সন্ধ্যায় ওরা পাহাড়ের সামনে পৌঁছল। সেখানে একটা ক্লাবঘরে রাত কাটিয়ে পরদিন খুব ভোরে পাহাড়ে চড়া শুরু হবে। কিন্তু ওঠার পথ নিয়ে বন্ধু দু'জনের সঙ্গে হার্মানের মতের অমিল হওয়ায় সে আর ওদের সঙ্গে উঠল না। ওখানেই ক্লাবের অন্য একজনকে সঙ্গী বেছে নিয়ে একসঙ্গে উঠতে শুরু করল। পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারে হার্মান এখন অনেক বিচক্ষণ, অনেক হিসেবি হয়ে উঠেছে। জীবনের লক্ষ্যের পথে অনেক দূর এগোতে হবে ওকে, তাই জীবনকে নিয়ে অযথা ছিনিমিনি খেলতে চায় না সে।
নতুন সঙ্গী নিয়ে, একই দড়ি পরস্পরের কোমরে বেঁধে ওরা ধীরে-ধীরে উঠতে শুরু করল। কিছুদূর ওপরে উঠে যাওয়ার পর নীচের দিকে তাকাতেই হঠাৎ নজরে পড়ল, আর-একজন একা অন্য এক দুরূহ পথ দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। এদিক-ওদিক ইতস্তত ঘুরছে, দাঁড়াচ্ছে, ওপরে তাকাচ্ছে, পথ খুঁজছে, তারপর ধাপে-ধাপে একটু-একটু করে উঠছে। এইরকম দুর্গম পথ দিয়ে একা একজনকে উঠতে দেখে ওদের খুব খারাপ লাগল। কী করা যাবে ? কেউ যদি পাগল হয় সেজন্য দুর্ভাবনা করে বসে থাকলে চলবে না। এই মনে করে আবার হার্মানরা উঠতে শুরু করল। এক-একটা বাধা পার হয়, আর উত্তেজনায় টগবগ করে ওঠে। মনে হয় যেন কোনও দৈত্যকে সংগ্রামে হারিয়ে দিয়ে এল।
এবার সামনে পড়ল পাহাড়ের গা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বিরাট এক আকৃতি। সেই জায়গাটা পার হওয়া কঠিন, তেমনই বিপজ্জনক। হার্মান সামনে আছে, আগে আগে উঠছে, বন্ধুটি পেছনে। খুব কাছে কাছে 'পিটন' পুঁতল। পিটনের মাথার হুকের মধ্যে দিয়ে কোমরের দড়িটা গলিয়ে খুব সাবধানে পার হতে থাকল। একেবারে শূন্যে ঝুলে-ঝুলে। হার্মান একটু-একটু এগোতে থাকে, আর পেছনের সঙ্গীটি নীচে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে দড়ি ছাড়ে। যদি শরীরের ভারে পাহাড়ের গা থেকে হার্মানের হাত-পা ছেড়ে যায়,তা হলেও সে নীচে আছড়ে পড়বে না, ওই পিটনে আটকানো দড়িতে ঝুলে থাকবে। পেছনের সঙ্গী সেই দড়ি টেনে-টেনে তাকে তুলবে।
হার্মান ওই পাথরটা আগে পার হয়ে নিল। ওপরে উঠে গিয়ে সঙ্গীকে দড়ি টেনে-টেনে ওপরে উঠে আসতে সাহায্য করল। এর পরও আরও নানা বাধা। মাঝে-মাঝে বসছে। বিশ্রাম নিচ্ছে, প্রায় ৭০০ ফুট উঠে দু'জনে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সহসা তারা অবাক হয়ে দেখল নীচের সেই ছেলেটি একা অন্য এক ভয়ঙ্কর পথ পার হয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু ছেলেটিকে খুব ক্লান্ত, বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে। ওর হাত-পা চারদিকে কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে। পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি লেগে মাথা, কপাল ফুলে গেছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো হতাশ লাগছে। হার্মান ওকে বিশ্রাম নিতে বলে কাছে বসাল। নিজের 'স্যাক' থেকে চকোলেট, বিস্কুট, ফ্লাস্ক থেকে কফি খেতে দিল। গল্প করল। বলল, "এই ভয়ঙ্কর জায়গায় একা এমন বিপদের ঝুঁকি কেন নিচ্ছ ? এসো, আমরা তিনজনে একসঙ্গে দড়ি বেঁধে উঠি।"
সে বলল, "দরকার নেই। আমি একাই শুরু করেছি। একাই শেষ করব। তোমরা কিছু ভেবো না, আমার কিছু হবে না। আসল কঠিন জায়গাটা তো পার হয়ে এসেছি। বাকিটাও ঠিক একা উঠে যাব।"— বলে আবার উঠতে আরম্ভ করল। বলে গেল, "তোমরাও এসো, ওপরে উঠে দেখা হবে।" 'প্রভু ওর মঙ্গল করুন' বলে আঙুল দিয়ে নিজের বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল হার্মান। ছেলেটি উঠতে-উঠতে চোখের আড়ালে চলে গেল।
হার্মানরা একটা সঙ্কীর্ণ, বিপজ্জনক জায়গা দিয়ে উঠছে। আগে সে নিজে, দড়িতে বাঁধা সঙ্গীটি পেছনে। পাহাড়ের ওপরের দিকে হঠাৎ ঠকাঠক একটা আওয়াজ শুনে ওরা চমকে উঠল। হার্মান থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নীচের সঙ্গীকে বলল, "সাবধান, পাথর পড়ছে।" বলেই নিজে পাহাড়ের গায়ে একেবারে সেঁটে গেল, যাতে পাথরটা মাথায় না পড়ে। পাথর পড়ল না বটে, তার বদলে ঠোকাঠুকি খেতে-খেতে পাশ দিয়ে সবেগে যে জিনিসটি নীচের দিকে বেরিয়ে গেল, সেটি একটি মানুষের দেহ। এক পলক দেখেই চিনতে পারল, সেই ছেলেটি, যে কোমরে দড়ি না বেঁধে উঠে গেল। আঁতকে উঠল হার্মান। ভয়ে বিমূঢ় হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। প্রাণপণ শক্তিতে কোমরের দড়িটা চেপে ধরল। দড়িতে বাঁধা নীচের সঙ্গীটি একটা বিপজ্জনক জায়গায় কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। দেহটা বেগে
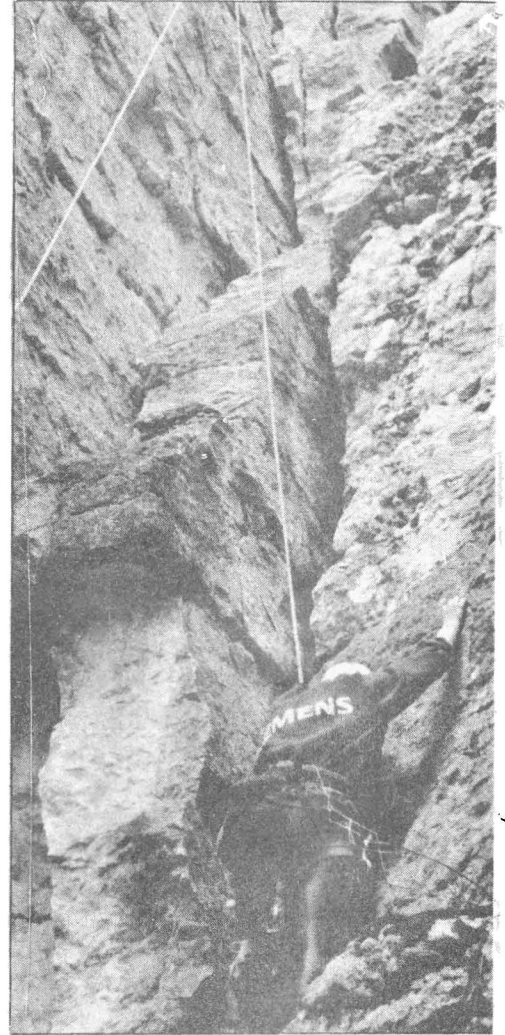
জীবন আর মৃত্যুর ব্যবধান মাত্র একটি দড়ি

গড়াতে-গড়াতে নীচের সঙ্গীটিব ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ল। এক্ষুনি তাকেও টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। আর তার টানে হার্মানও পড়বে। ও বুঝতে পারল সকলেই এখন মরব। হার্মান আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। চোখ বুজে ফেলল। মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে

কে-টু শৃঙ্গে উঠতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অ্যালিসন হারগ্রিভস
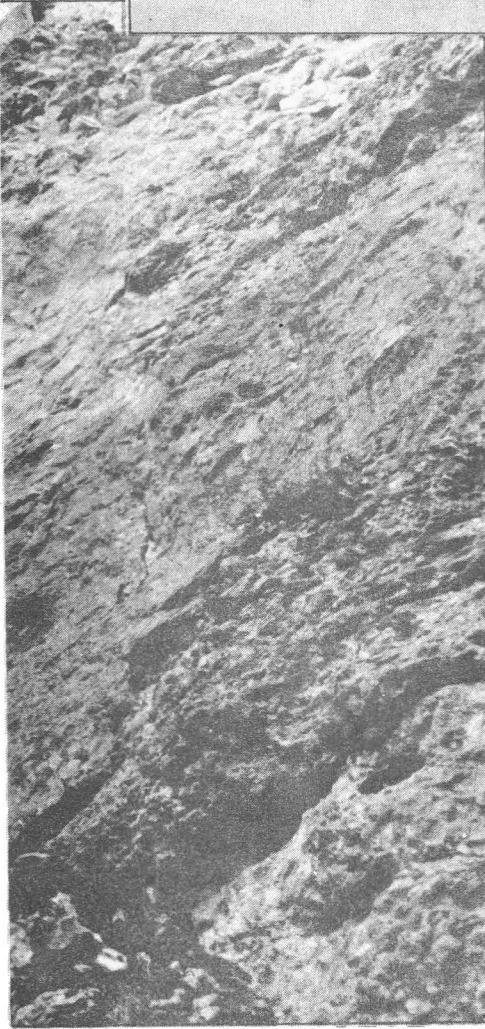
দড়িটা চেপে ধরে সঙ্গীকে চিৎকার করে বলতে গেল, "সাবধান !"— কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হল না, শুধু অদ্ভুত একটা গো- গোঁ অস্পষ্ট আওয়াজ।
শরীরটা ঘাড়ের ওপর পড়ছে দেখে নীচের সঙ্গীটি কোনওরকমে তড়িৎ গতিতে পাশে একটু হেলে গেল। তারপর এক হাতে নিজের কোমরের দড়িটা চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে পড়ন্ত শরীরটাকে ঠেলে একটু সরিয়ে দিল। শরীরটা পাশ দিয়ে এক পলকে নীচে বেরিয়ে গেল। হার্মানকেও বাঁচিয়ে দিল। কেবল তার হাতের দুটো আঙুল ভেঙে গেল। শরীরটা ধুপ শব্দ করে মাটিতে পড়ল, সে-শব্দও ওরা শুনতে পেল।
দু'জনেই তখনও হতভম্ব হয়ে যত জোরে পারে কোমরের দড়ি চেপে ধরে আছে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। শুধু ফ্যালফ্যাল করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে।
আশপাশে তাকিয়ে দেখল পাহাড়ের গায়ে চাপ-চাপ রক্ত ছিটিয়ে আছে। শরীরটা দেখা যাচ্ছে না। কোথায় নীচে পড়ে আছে। ওখানে তাকে দেখবার কিংবা মুখে একটু জল দেওয়ার কেউ নেই।
হার্মানরা তাড়াতাড়ি নামতে চায়। এই খুনি পাহাড়-পাঁচিলটাতে আর এক-পাও উঠতে চায় না। শরীরটাকে দেখার জন্য ওদের মন আকুল হয়ে উঠছে।
সমস্যা হল ওদেরও। নামতে পারছে না। ভয়ে এত ঘাবড়ে গেছে যে, ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। এত কাঁপছে যে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। পায়ে কোনও জোর পাচ্ছে না। নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে গেছে। এই অবস্থায় নামতে গেলে ওরাও পড়ে যাবে, তারপর নিশ্চিত মৃত্যু।
অনেকক্ষণ পরে খুব সাবধানে অনেক চেষ্টা করে, এক-পা, এক-পা করে ওরা নীচে নেমে এল। খুঁজে-খুঁজে বের করল ছেলেটা কোথায় পড়ে আছে। দেখতে পেয়েই আবারও আঁতকে উঠে বিকট চিৎকার করে উঠল। এ সেই সৌম্যকান্তি সুঠাম শরীরের ছেলেটা নয়। শুধু একটা মানুষের দলাপাকানো মাংসপিণ্ড। রক্তে মাখামাখি। মানুষ বলেই মনে হয় না। বীভৎস কদাকার হয়ে গেছে। হায় রে, ওরা এখন কী করবে ! ওর বাড়ির খোঁজ করে যাবে ? সেখানে গিয়ে কী করে ওর বাবা-মাকে বলবে তাঁদের ছেলে মারা গেছে। তাঁদের এখানে এনে প্রিয় পুত্রের এই দশা দেখাবে ? এই কিছুক্ষণ আগেও ছেলেটি ওদের পাশে বসে ছিল। কত কথা বলল। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করল ! আর এখন ? ওরা ভাবতে পারছে না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।
একটা অশান্ত বেপরোয়া, উদ্দাম যৌবন হঠাৎ নিশ্চল হয়ে গেল। নিথর হয়ে পড়ে আছে শরীরটা। আর সেই পাহাড়টা, এই অবারিত প্রান্তরে, খোলা আকাশের নীচে, জ্বলজ্বলে সূর্যের আলো গায়ে মেখে আগের মতোই নির্লিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী ঘটেছে, কিছুই যেন. জানে না সে।
শরীরটার দিকে হার্মানরা তাকাতে পারছে না। তাড়াতাড়ি ওই রক্তাক্ত মাংসের পিণ্ডটাকে একটা কাপড় দিয়ে চাপা দিল। ছেলেটির পরিচয় কিছু জানে না। তার বাড়ির খোঁজে গেল না। গেল সোজা সমাধিক্ষেত্রে। সেখানে তাকে সমাধিস্থ করল। আশপাশ থেকে কিছু ফুল জোগাড় করে তার ওপর ছড়িয়ে ছিল। সমাধিক্ষেত্রের ওপর দুটো পাহাড়ে ওঠার পিটন পুঁতে দিল, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে স্মৃতিস্তম্ভের মতো। তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথা নিচু করে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার অকালেপরিসমাপ্তিপ্রত্যক্ষ করল হার্মানরা।

চিরদিনের অভিযান আজকের অভিযাত্রী

সুমন ভট্টাচার্য

রুটিন-বাঁধা অভ্যস্ত জীবনের চেনা ছক ভেঙে দিতে চান কেউ-কেউ। সাহস ও মনোবলকে পুঁজি করে এই অভিযাত্রীরাই হয়ে ওঠেন গল্পকথার নায়ক।

একা, একেবারে একা, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর কেমন লেগেছিল! রেনহোল্ড মেসনার নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন। এভারেস্টের শিখরে উঠেছিলেন একক দক্ষতায়, অক্সিজেন ছাড়াই। তাঁর আগে কোনও মানুষই যে অসাধ্যসাধন করতে পারেননি, মেসনার তা-ই করেছিলেন অনায়াস দক্ষতায়। অথচ সেই মেসনার টপকাতে পারলেন না নিজের বাড়ির পাঁচিল। ইতালিতে নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকার পাঁচিল টপকাতে গিয়ে মেসনার পা-ই ভেঙে ফেললেন। আসলে তালা আটকে ফেলার পর বাড়িতে ঢোকার উপায় না দেখে মেসনার নিজের 'বিদ্যে'-টাকে একটু ঝালাতে

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওঁরা আসেন 'ক্যানোয়িং'-এ

জাপানের মাউন্ট ফুজি
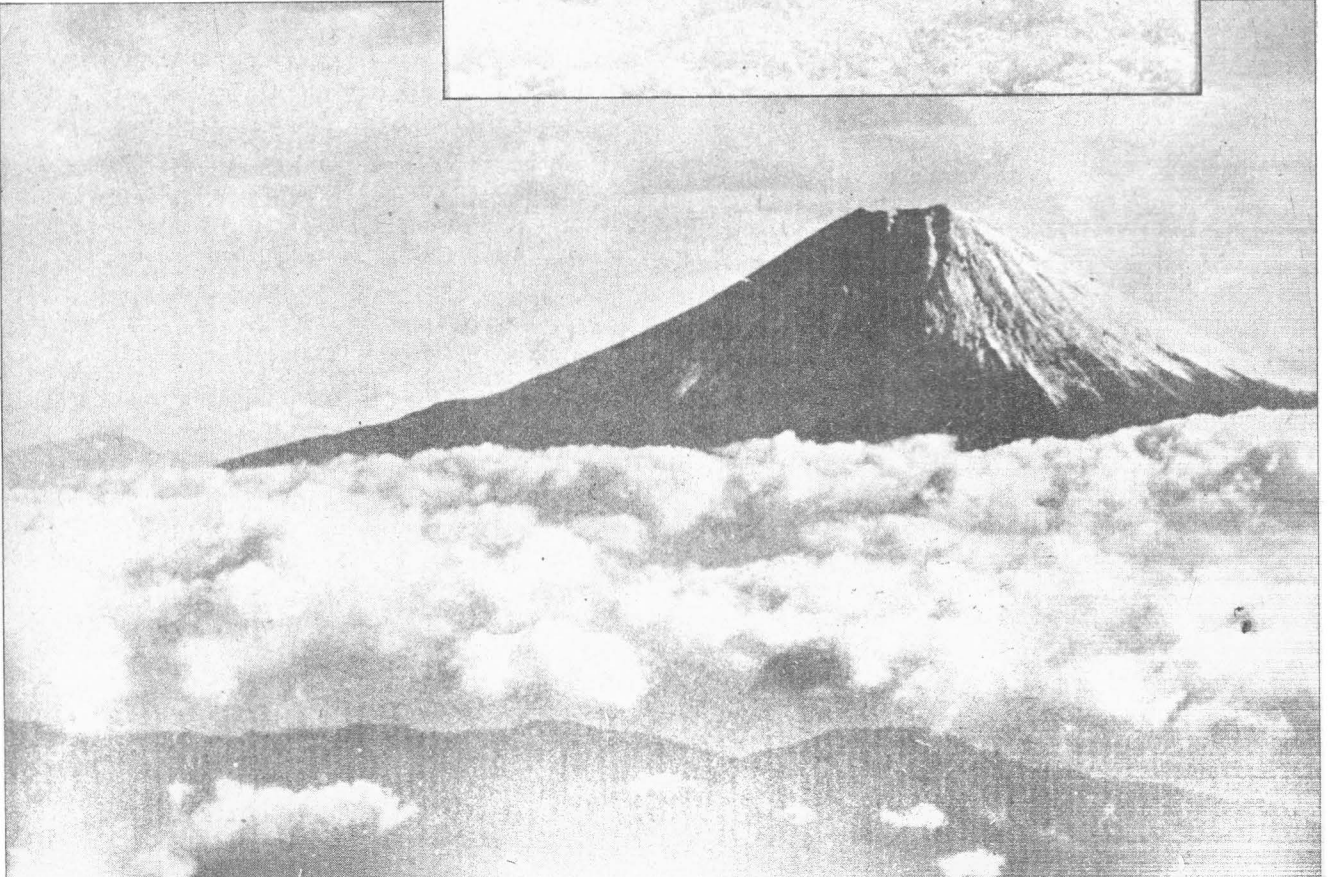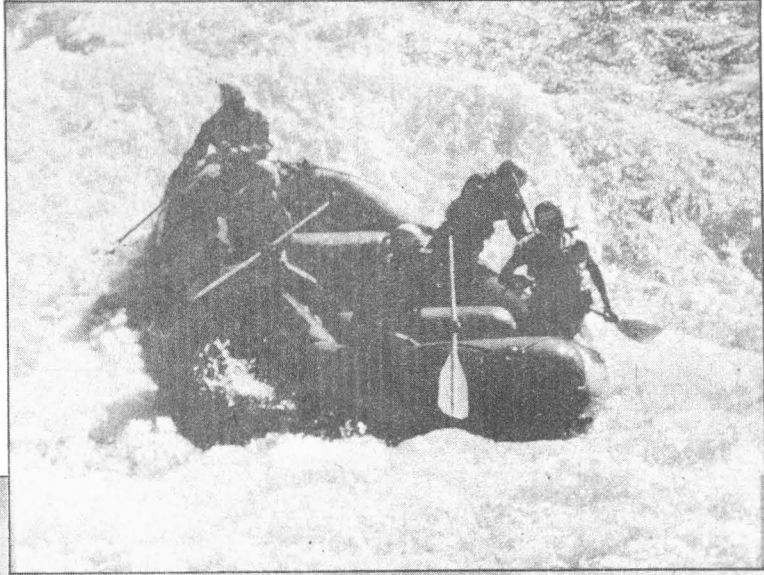
গিয়েছিলেন। ফলে হাসপাতাল-যাত্রা। এভারেস্টবিজয়ীও ব্যর্থ হলেন সাধারণ একটা পাঁচিল টপকাতে।
আসলে এটাই বোধ হয় সাফল্যের অন্যদিক। প্রবল পরাক্রান্ত মহম্মদ আলিও যেমন ভয় পেতেন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জকে, তেমনই সাফল্যের আড়ালে বোধ হয় লুকিয়ে থাকে 'ছোট' কিছু ব্যর্থতাও, এবং অভিযাত্রীদের জীবনে সাফল্য আর ব্যর্থতা যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ, অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে। কালাহারি মরুভূমি পার হলেও নীল নদের উৎস খুঁজে পাননি ডেভিড লিভিংস্টোন। কুঁড়েঘরে প্রার্থনা করবার সময় মৃত্যুর আগেও বোধ হয় তিনি ঈশ্বরের কাছে নদীর উৎসই জানতে চেয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন স্কট যেমন দক্ষিণ মেরু পৌঁছে হতাশ হয়েছিলেন নরওয়ের পতাকা দেখে! দক্ষিণ মেরুতে প্রথম পা রাখবার কৃতিত্ব তাই নরওয়ের আমুন্ডসেনের, কিন্তু আমাদের সহানুভূতি যেন স্কটের দিকেই।
আসলে অভিযান তো শুধু সাফল্যই নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অচেনাকে চেনবার, অজানাকে জানবার নেশা। ঘরবাড়ি, স্বজনবান্ধব ছেড়ে যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ান, তাঁরা বোধ হয় অন্য কিছু চান। ইতিহাসে বেঁচে থাকাটাই তাই হয়তো অভিযাত্রীদের লক্ষ্য। কো শোউ লিয়াং নামে

সাইকেলে চড়ে বিশ্বভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন কেউ-কেউ

তাইওয়ানের এক সাধারণ 'স্টান্টম্যান'-এর কথা হয়তো অনেকেই জানেন না। ছেলেবেলায় থাকতেন পূর্ব চিনের ঝেজিয়াং প্রদেশের সানমেং নামে একটা জায়গায়। পরে বাড়ির অন্যদের সঙ্গে তাইওয়ানে চলে যান। চিরকালই একা থাকতে ভালবাসতেন, আর পছন্দ করতেন অ্যাডভেঞ্চার। তাই সিনেমায় স্টান্টম্যানের কাজ শুরু করেন। তাইওয়ান থেকে হংকং, সমস্ত জায়গাতেই কসরত দেখাবার জন্য তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। কো শোউ প্রচুর উপার্জন করেন, এমনকী চলচ্চিত্র পরিচালনাও করতে থাকেন। কিন্তু নিজের স্বপ্নটাকে ভুলতে পারেননি কখনও। স্বপ্নটা হল, মোটর বাইকে চড়ে লাফ দিয়ে চিনের 'গ্রেটওয়াল' পেরনো! গ্রেটওয়াল, মানুষের যে স্থাপত্যকীর্তিকে মহাকাশ থেকেও দেখা যায়। কয়েক শতাব্দী ধরে বিদেশি শত্রুদের আক্রমণ থেকে চিনকে রক্ষা করে আসছে এই প্রাচীর। সেই গ্রেটওয়াল বাইকে চড়ে লাফ দিয়ে পেরোবার অসম্ভব প্রচেষ্টা। অনেক রাজনৈতিক জটিলতা, আর বাধাবিপত্তি কাটিয়ে বছরখানেক চেষ্টার পর কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলেন কো শোউ। ১৯৯২ সালের ১৫ নভেম্বর ছিল সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি। হেইবেই প্রদেশের দিক থেকে বাইক চালিয়ে এসে উড়ে পেরিয়ে গেলেন বেজিং-এর মিউন এলাকার দিকে। কয়েক হাজার চিনা দর্শক সমানে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে। যেখান থেকে বাইক চালাতে শুরু করেছিলেন সেখানটা ছিল মাত্র তিন মিটার চওড়া, আর যেখানে এসে নামলেন সেটাও মাত্রই চার মিটার চওড়া। চুলচেরা হিসেবের ভুলে কো শোউয়ের শরীরটা শক্ত পাথরে আছড়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারত। তবু কেন

বরফের রাজ্যে

মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ফেরা 'অ্যাপোলো-১১' মহাকাশযানের নাবিকেরা

এই ঝুঁকি নেওয়া ? আসলে এটাই রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার। তাই বাইক থেকে নামার পর ৪০ বছরের কো শোউ ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদেই ফেলেছিলেন। গ্রেট ওয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত গল্প, কত উপকথা। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ কো শোউ লিয়াং—আজ তিনি কোনও গল্প নন, বিস্ময়কর এক রূপকথার নায়ক। এক

জাপানিদের প্রিয় ফুজিসান, তাই সেই পাহাড়ে ওঠাও একটা পবিত্র কাজের মতো। প্রতি বছর কয়েক হাজার মানুষ উঠছেন পাহাড়ে, তাঁদের মধ্যে স্কুলের ছাত্র যেমন আছেন, তেমনই আছেন প্রতিবন্ধী মানুষরাও। এমনকী, জাপানি কিশোর-কিশোরীদের শখ সাইকেলে চড়ে মাউন্ট ফুজির শিখরে চড়া।

জীবন্ত প্রবাদ !

আসলে অভিযাত্রীরাও বোধ হয় এক ধরনের বিজ্ঞানী, যাঁদের জীবনে অভিযানের সাফল্য ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য থাকে না। সারা জীবন ধরেই ওই একটাই স্বপ্ন তাঁদের। টাকা-পয়সার আকর্ষণ যে অনেকের থাকে, এ-কথা সত্যি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি থাকে বোধ হয় অজানাকে জানবার নেশা।

ডেভিড লিভিংস্টোন
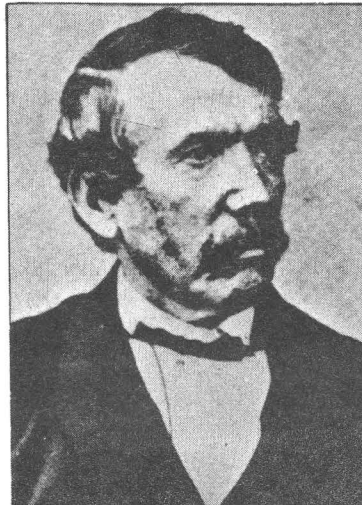
রেনে ক্যালে নামে একজন ফরাসি অভিযাত্রীর কথাই ধরা যাক। ফরাসি এই অভিযাত্রীর সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার দুর্গম শহর টিম্বাকটু যাওয়া। এজন্য কত কষ্ট স্বীকার করে, ছদ্মবেশ ধরে তিনি গিয়েছিলেন আফ্রিকার ওই শহরে। লুকিয়ে লিখে রেখেছিলেন যাত্রাপথের বিবরণ। অভিযানের জন্যই তিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং মারা যান।

'ম্যাকেনাস গোল্ড' নামে সেই বিখ্যাত সিনেমাটি হয়তো অনেকেরই দেখা। সোনার সন্ধানে অভিযানের গল্প। সোনালি রঙের মায়া যেখানে মানুষকে নিয়ে যায় মৃত্যুর কাছাকাছি ! কেউ-কেউ কিন্তু সোনা নয়, ফিরে আসেন অভিযানের স্মৃতি নিয়ে। আজকের দিনে অবশ্য সোনা নয়, রেকর্ড-বইয়ে নাম তোলাটাই অনেকের অভিযানের মূল লক্ষ্য। রেকর্ড বইগুলি একটু দেখলেই বিচিত্র সব অভিযানের কথা জানা যাবে।

১৯৮৫ সালে যেমন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল ফাইবার গ্লাসের

নৌকোয় চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেরিয়েছিলেন। ৩৭ ফুট লম্বা নৌকো 'তৃষ্ণা'য় করে ওঁরা পাড়ি দিয়েছিলেন প্রায় ৫৫ হাজার কিলোমিটার জলপথ। উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে লাতিন আমেরিকা হয়ে 'বালি' ছুঁয়ে আবার তাঁরা ভারতে ফিরে এসেছিলেন। একদিন সারা পৃথিবীর মানুষ ভারতে আসবার জন্য সমুদ্র অভিযান করতেন। এখন ভারতীয়রাই বরং যাচ্ছেন উত্তমাশা অন্তরীপ ছুঁয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। পিছিয়ে নেই ভারতের মহিলারাও, উজ্জ্বলা রাই ১৭ মাস ধরে নৌকোয় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। ১৯৮৮ সালে 'জয়কুশ' নামে একটা নৌকোয় চড়ে উজ্জ্বলা ঘুরে এসেছিলেন সারা পৃথিবী। তিনিই ছিলেন এই অভিযানে এশিয়ার প্রথম মহিলা। আসলে অভিযানটা অনেক জায়গায় একটা সংস্কারের মতো। মধ্যযুগে যেমন

চার্লস লিন্ডবার্গ

ইউরোপীয়দের নেশাই ছিল জাহাজে চড়ে এশিয়ার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া। আবার ভারতীয়দের কাছে যেমন অমরনাথ যাওয়া, জাপানিদের কাছে তেমনই মাউন্ট ফুজি পাহাড়ে চড়া। ৩৭৭৬ মিটার উচ্চতার ওই পাহাড় জাপানের সবচেয়ে

আসলে মানুষের সভ্যতা যতই এগিয়েছে, ততই বদলেছে তার জীবনধারণের উপকরণ। পুরনো বিমানের জায়গায় আজ এসেছে 'কনকর্ড', 'স্লেজ'-এর জায়গায় আধুনিক গাড়ি। কিন্তু বৈচিত্র্যের সন্ধানী মানুষ আজও অপরিবর্তিত। অভিযাত্রীরা তাই আজও বেরিয়ে পড়েন। ব্যর্থতা তাঁদের হতাশ করে, কিন্তু ঘরে ফেরায় না। নিল আর্মস্ট্রং, চার্লস লিন্ডবার্গ কিংবা তেনজিং নোরগে তাই পৌঁছে যান কিংবদন্তির পর্যায়ে। তাঁরা হয়ে ওঠেন গল্পকথার নায়ক।

চিনের প্রাচীরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সৌভাগ্যই বা ক'জনের হয়

বড় পাহাড়ই শুধু নয়, আগ্নেয়গিরিও বটে। জাপানিদের প্রিয় 'ফুজিসান', তাই সেই পাহাড়ে ওঠাও একটা পবিত্র কাজের মতো। প্রতি বছর কয়েক হাজার মানুষ উঠছেন পাহাড়ে, তাঁদের মধ্যে স্কুলের ছাত্র যেমন আছেন, তেমনই আছেন প্রতিবন্ধী মানুষরাও। এমনকী, জাপানি কিশোর-কিশোরীদের শখ সাইকেলে চড়ে মাউন্ট ফুজির শিখরে চড়া। জাপানে যেসব বিদেশি বেড়াতে গিয়েছেন বা থাকেন, তাঁদের কাছেও ফুজি পাহাড়ে ওঠা একটা আলাদা অভিজ্ঞতা। পাহাড়ে ওঠার পথে ন'টি বিশ্রামের জায়গা আছে, খাবার-পানীয়ের সঙ্গে যেখানে পাওয়া যায় রাতের আশ্রয়। কয়েকশো মানুষ প্রতিদিন চলেছেন পাহাড়ের শিখরের দিকে। বাঙালিদের কাছে যেমন দার্জিলিঙে টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখা লোভনীয়, তেমনই জাপানিদের কাছে ফুজি পাহাড়ের ওপরে সূর্যোদয় দেখা। 'জাপানের আত্মা' বলতে জাপানি ভাষায় বলে 'ইয়ামাতো দামাশি'। আর এই ইয়ামাতো দামাশির অন্যতম অঙ্গ ফুজি পর্বতারোহণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপসেনারা আক্রমণের সময় 'বানজাই' বলে হুঙ্কার ছাড়তেন, এখনও ফুজি পাহাড়ের শিখরে পৌঁছনোর পর জাপানিরা চিৎকার করে বলেন বানজাই। ফুজি পাহাড়ের ওপর আছে শিন্টো মন্দির। দারুণ, নিরাভরণ, কিন্তু এই মন্দির ভীষণ পবিত্র জাপানিদের কাছে। তার পাশেই আছে বিশ্রামাগার, বেসবল থেকে গান, সবই দেখা ও শোনা যাবে পাহাড়ের শিখরে বসে।

অভিযাত্রীদের জীবনে সাফল্য আর ব্যর্থতা যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ, অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে। কালাহারি মরুভূমি পার হলেও নীল নদের উৎস খুঁজে পাননি ডেভিড লিভিংস্টোন। কুঁড়েঘরে প্রার্থনা করবার সময় মৃত্যুর আগেও বোধহয় তিনি ঈশ্বরের কাছে নদীর উৎসই জানতে চেয়েছিলেন।

অভিযানের নেশা: 'দূরকে শুধু নিকট' করে না, শত্রুকেও করে বন্ধু। মহাকাশ অভিযানের কথাই ধরা যাক, আমেরিকা আর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নকে কাছাকাছি এনে দিয়েছিল ১৯৭৫ সালে। মার্কিন মহাকাশযান 'অ্যাপোলো' আর রুশ যান 'সোয়ুজ'-এর মহাকাশে সংযোগ সেদিন 'বন্ধু' করেছিল দুই প্রবল প্রতিপক্ষকেও।

পিয়েরে নাত্রিকে একটা মাত্র কথাই বলেছিলেন, 'অবিশ্বাস্য'। ১৯৯৩ সালে 'প্যারিস-মস্কো-বেজিং র‍্যালি' জেতার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া। ২৭ দিন ধরে ১১টি দেশ পেরোতে হয় ওই মোটরর‍্যালিতে। ১৬ হাজার ৩৫৭ কিলোমিটারের যাত্রাপথ দীর্ঘতম তো বটেই, কঠিনতমও হয়তো। ওই র‍্যালির সুবাদে গাড়িগুলিকে এমন সব দেশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ তো বটেই, অনেকসময় চলে সীমান্ত সঙ্ঘর্ষও। কোথাও রাস্তা বলতে কিছু নেই, আবার জলের মধ্য দিয়ে গাড়ি নিয়েও বেরোতে হয়। শুধু ইন্দোনেশিয়া দিয়ে যাওয়ার সময়ই আহত হন ৩০ শতাংশ গাড়ির চালক। তবু এই মোটরর‍্যালি চলছে, আসলে এই বিপদকে অতিক্রম করাটাই অ্যাডভেঞ্চার।

'হিয়ার আর হিউম্যান বিইংস...আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ বিউটি বিফোর'—না কোনও মহাজাগতিক প্রাণী বলেনি কথাটা। বলেছিলেন কর্নেল চার্লস লিন্ডবার্গ, এই শতাব্দীতে আমেরিকার অন্যতম নায়ক। ১৯২৭ সালের ২০ মে বিমানে অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে তারকা হয়ে গিয়েছিলেন। অতলান্তিকের নীল জল পেরিয়ে মানুষ দেখতে পাওয়ার পর তাঁর প্রথম অভিব্যক্তিটাই ছিল মানুষ দেখার আনন্দে ভরপুর। একা, নিঃসঙ্গ অবস্থায় লড়াই করে লক্ষ্যে পৌঁছনোর পর প্রতিটি অভিযাত্রীই বোধহয় এভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

আসলে মানুষের সভ্যতা যতই এগিয়েছে, বদলেছে তার জীবনধারণের উপকরণ। পুরনো বিমানের জায়গায় আজ এসেছে 'কনকর্ড', 'স্লেজ'-এর জায়গায় আধুনিক গাড়ি। কিন্তু বৈচিত্র্যের সন্ধানী মানুষ আজও অপরিবর্তিত। অভিযাত্রীরা তাই আজও বেরিয়ে পড়েন। ব্যর্থতা তাঁদের হতাশ করে, কিন্তু ঘরে ফেরায় না। নিল আর্মস্ট্রং, চার্লস লিন্ডবার্গ কিংবা তেনজিং নোরগে তাই পৌঁছে যান কিংবদন্তির পর্যায়ে। তাঁরা হয়ে ওঠেন গল্পকথার নায়ক।

অনেকেরই প্রিয় শখ অশ্বারোহণ

গ্রহের সন্ধান মিলল ভিন্ন সৌরমণ্ডলে

বিমল বসু

অত্যাধুনিক স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রে পড়া যায় আলোর অন্তর্নিহিত ভাষা। আরও নিখুঁতভাবে ধরা যায় আলোকতরঙ্গের সামান্যতম পরিবর্তন। এ-ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়েই মেয়র ও কুয়েলোজ আবিষ্কার করেছেন নক্ষত্রমন্ডলের ওই গ্রহটি।

মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে মানুষের আগ্রহ চিরকালের

আমাদের এই পৃথিবীর দোসর কি কোথাও আছে ? এই জিজ্ঞাসা আজকের নয় । সেই ষোড়শ শতকে ইতালীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনো অনুমান করেছিলেন, আকাশের ওই অগণিত নক্ষত্ররা আসলে এক-একটি সূর্য আর ওইসব সূর্যকে ঘিরে আছে পৃথিবীর মতোই অনেক গ্রহ । সে-সময় বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি—এই ছ'টি গ্রহের কথাই শুধু বিজ্ঞানীদের জানা ছিল । ব্রুনো বলেছিলেন, আমাদের সৌরমণ্ডলে আছে আরও একাধিক গ্রহ । কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরমণ্ডল তত্ত্ব খোলাখুলি প্রচার করেছিলেন বলে তিনি চার্চের কোপে পড়েন । এবং ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে ব্রুনোকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হয় ।

ব্রুনোর পরে গ্যালিলিও এবং আরও অনেক বিজ্ঞানীর দুরবিন-নির্ভর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে যেমন সৌরমণ্ডলে সূর্যের একাধিপত্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তেমনই একে-একে আবিষ্কৃত হয়েছে আরও তিনটি গ্রহ— ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো । দশম একটি গ্রহ আছে বলেও বিজ্ঞানীদের অনুমান, যদিও তার প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি এবং বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, প্রায় পাঁচশো বছর আগে ডাকাবুকো বিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনো অন্য তারা—অন্য সূর্যের কোলে গ্রহ আছে বলে যে অনুমান করেছিলেন, এবার তাও মিলে গেল অক্ষরে-অক্ষরে ।

সত্যিই তেমন এক গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাইকেল মেয়র এবং ডিডিয়ার কুয়েলোজ । খুব কাছেপিঠে অবশ্য নয়, ৫৭ আলোকবর্ষ দূরে ওই গ্রহ আমাদের সূর্যের মতোই একটি সাধারণ নক্ষত্রকে পরিক্রমণ করে চলেছে ।

পৃথিবীর হিসেবে ৫৭ আলোকবর্ষ অনেকটাই দূর । সেখান থেকে নক্ষত্রের আলো সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে আমাদের কাছে পৌঁছতে সময় নিচ্ছে ৫৭ বছর । কিন্তু মহাজাগতিক দূরত্বের তুলনায় এটা কিছুই নয় । সেখানে 'পেগাসাস' নামে একটি নক্ষত্রমণ্ডলে ৫১ পেগ নামে একটি তারার কোলে আবিষ্কৃত হয়েছে ওই গ্রহ ।

৫১-পেগ নক্ষত্রটি আমাদের সূর্যের মতোই মধ্যবয়সী, এখনও অনেক জ্বালানি আছে তাতে, আয়ুও তাই অনেক । কিন্তু গ্রহটি কেমন ? আমাদের পৃথিবীর মতোই কি ? এ-সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কী অনুমান করেছেন, তা জানার আগে বরং দেখা যাক তাঁরা কীভাবে আবিষ্কার করলেন গ্রহটিকে ।

এই আবিষ্কারে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন 'স্পেকট্রোস্কোপ' নামে একরকম যন্ত্র । কোনও জ্যোতিষ্ক থেকে আসা আলোর বর্ণালী এই যন্ত্রে বিশ্লেষণ করে সেই জ্যোতিষ্কের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায় ।

'স্পেকট্রাম' বা 'বর্ণালী' কী, তা আমরা প্রায় সকলেই জানি । সাদা আলোর রশ্মি 'প্রিজ্‌ম' বা 'তে-শিরা কাচ'-এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সাতটি রঙে ভেঙে যায় । এটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন নিউটন । জানলার সরু ফাঁক দিয়ে আসা সূর্যের আলোকরশ্মি একটি প্রিজ্‌মের ওপর ফেলে উলটোদিকের দেওয়ালে পেয়েছিলেন বেগনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল—এই সাত রঙের এক অবিচ্ছিন্ন 'পটি' বা 'ব্যান্ড' । এই পটিকেই নিউটন বলেছিলেন স্পেকট্রাম । স্পেকট্রোস্কোপ হল এই বর্ণালী সৃষ্টির একটি উন্নত ব্যবস্থা । উনিশ শতকের বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী যোসেফ ফ্রাউনহফার এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন । এতে প্রিজ্‌ম ছাড়াও যোগ করা হয় এক প্রান্তে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র ও অন্য প্রান্তে উত্তল লেন্স লাগানো একটি নল, যার নাম 'কলিমিটার' এবং একটি টেলিস্কোপ । আলো কলিমিটারের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে এসে লেন্সের মাধ্যমে ঘনীভূত হয়ে প্রিজ্‌মে পড়ে এবং উলটোদিকে বসানো টেলিস্কোপে চোখ রেখে অনেক বড় আর স্পষ্ট করে দেখা যায় বর্ণালী । ক্যামেরায় এই বর্ণালীর ছবি তুলে তা বিশ্লেষণও করা যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ।

এখন আরও উন্নত এবং সূক্ষ্ম স্পেকট্রোস্কোপ বেরিয়ে গেছে । যেখানে আলোর অন্তর্নিহিত ভাষা পড়া যায় আরও নিখুঁতভাবে, ধরা যায় আলোক তরঙ্গের সামান্যতম পরিবর্তন । এ ধরনের অতি উন্নত যন্ত্রের সাহায্যেই মেয়র ও কুয়েলোজ পেগাসাস নক্ষত্রমণ্ডলের ওই গ্রহটি আবিষ্কার করেছেন । বারংবার পর্যবেক্ষণে নিশ্চিত হয়ে তবেই তাঁরা গত বছরের অক্টোবরে ফ্লোরেন্সে এক বিজ্ঞানসভায় এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন । খবরটা প্রায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে ।

কাছে-দূরের নক্ষত্রমণ্ডলে গ্রহ খোঁজাখুঁজির ধুম পড়ে যায় । "এই উৎসাহ খুবই স্বাভাবিক," বলেছেন সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওফ মার্সি । মার্সি নিজেও আমাদের এই সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে অন্য নক্ষত্রের দেশে গ্রহদের খোঁজ চালাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে ।

মেয়র-কুয়েলোজ তাঁদের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করার পরই মার্সি এবং তাঁর সহযোগী পল বাট্‌লার সান জোসের কাছে লিক অবজারভেটরিতে চলে যান এবং ৫১-পেগ নক্ষত্রটি নিয়ে পর্যবেক্ষণ চালান । এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে মেয়র-কুয়েলোজ কথিত গ্রহটির অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে যান তাঁরা ।

মার্সির কথায়, "৫১-পেগ থেকে আসা আলোর বর্ণালীতে যে দোলাচল আমরা দেখেছি তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, বেশ বড়সড় একটি গ্রহ আছে তাঁর কক্ষে । মেয়র-কুয়েলোজের আবিষ্কারের কোনও ভুল নেই । আর এই আবিষ্কারে খুশি হবেন মহাবিশ্ব সম্পর্কে আগ্রহী প্রতিটি মানুষ । আমরা রাতের তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে এখন বলতে পারব, এই সৌরমণ্ডলের মতোই কত না গ্রহ ছড়িয়ে আছে ওইসব নক্ষত্রলোকে ।"

তারার আলোর বর্ণালীতে যে দোলাচলের উল্লেখ করেছেন মার্সি, মেয়র-কুয়েলোজও সেটা দেখেই গ্রহটির অস্তিত্ব টের পান । অত দূরের কোনও গ্রহকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দুরবিনেও সরাসরি দেখতে পাওয়া সম্ভব নয় । তাই প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষভাবেই তার অস্তিত্ব, অবস্থান, চরিত্র ইত্যাদি জানবার চেষ্টা করেন বিজ্ঞানীরা । এজন্য কয়েকটি পদ্ধতি আছে । আলোর ঢেউয়ে দোলাচল লক্ষ করা তার মধ্যে একটি । ১৯৯৪ সালে পাল্‌সারকে পাক দেওয়া যে দু-তিনটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়, তাদের বেলায়, ওইসব গ্রহের পরিক্রমণের দরুন পাল্‌সারটির বিকিরণ-স্পন্দনে সামান্য অনিয়ম ধরা পড়েছিল ।পাল্‌সারকে প্রদক্ষিণ করা গ্রহের অস্তিত্ব জানা যায় বিকিরণ স্পন্দনের এই অনিয়ম দেখেই । অনেক দূরের সূর্যজাতীয় নক্ষত্রের কাছে কোনও গ্রহ থাকলে তার সন্ধান পাওয়া আরও কঠিন । কারণ, ওই নক্ষত্রের আলোর ছটায় ঢাকা পড়ে যাবে গ্রহটি, তাকে বোঝা যাবে না । এ-ক্ষেত্রে, একমাত্র উপায় হল নক্ষত্রটির ওপর গ্রহটির অভিকর্ষজ টানের প্রভাব লক্ষ করা । নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে মহাবিশ্বে যে-কোনও দুটি বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে । সূর্যের

আকর্ষণে যেমন ন'টি গ্রহ তাকে আবর্তন করে চলেছে, তেমনই গ্রহগুলিও তাদের দূরত্ব ও ভর অনুযায়ী কম-বেশি আকর্ষণ করছে সূর্যকে। সৌরমণ্ডলের বাইরেও যেখানে কোনও নক্ষত্রের গ্রহপরিবার আছে সেখানেও এই একই নিয়ম। মহাবিশ্বের নিয়মের রাজত্বে কোথাও এতটুকু হেরফের হওয়ার জো নেই। আর এই নিয়মের সূত্র ধরেই বিজ্ঞানীদের যত আবিষ্কার। কখনও আগে নিয়ম জেনে তারপর আবিষ্কার। কখনও-বা আবিষ্কারের পরে নিয়মটা ছকে নেওয়া। আগে-পরে যাই হোক, নিয়মটা আছেই এবং থাকবেও। সেই নিয়মের সূত্র ধরেই ৫৭ আলোকবর্ষ দূরের এক নক্ষত্রের কোলে দুই বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে ফেললেন একটি গ্রহ। কেমন করে? তাঁরা স্পেকট্রোস্কোপে ৫১-পেগ নক্ষত্র থেকে আসা আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে দেখলেন, সেই আলোর তরঙ্গে খুব সূক্ষ্ম সঙ্কোচন-প্রসারণ হচ্ছে। নক্ষত্রটির কাছাকাছি কোনও গ্রহের অভিকর্ষজ টানাটানির ফলেই তার পাঠানো আলোকরশ্মির এই পরিবর্তন। এর পেছনে যে কারণ তা বলা আছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বে। আইনস্টাইন প্রমাণ করেছেন, অভিকর্ষ শুধু বস্তুর ওপরেই কাজ করে না, তা আলোকেও টানে। ৫১-পেগ নক্ষত্র এবং তার গ্রহটির মধ্যে টানাটানির অতি সামান্য যে প্রভাব পড়ছে ওই নক্ষত্র থেকে ছুটে আসা আলোর তরঙ্গে, যন্ত্রে সেই দোলাচলের ভাষা নির্ভুল পড়ে নিয়ে গ্রহটির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

কেমন ওই গ্রহটি? আমাদের পৃথিবীর মতোই কি? অথবা, আমাদের প্রতিবেশী অন্য কোনও গ্রহের মতো? গ্রহটির আকার, আয়তন, আবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কেও কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন আবিষ্কারকরা। এর ভর বৃহস্পতি গ্রহের অর্ধেক থেকে দ্বিগুণের মধ্যে, কিন্তু আবর্তন-পথ বুধ গ্রহের ছ' ভাগের একভাগ মাত্র। তার মানে গ্রহটি ৫১-পেগ তারাকে খুব কাছ থেকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। একপাক ঘুরে আসতে সময় নিচ্ছে মাত্র চারদিন। ওজনে ভারী আর কাছাকাছি থাকার জন্যই পিতৃনক্ষত্রের ওপর গ্রহটির টান এত বেশি আর সেই টানের প্রভাব ধরা পড়েছে পৃথিবী থেকে। মূল নক্ষত্রের এত কাছে বলে গ্রহটির তাপমাত্রাও রীতিমত চড়া। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী ১৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও বেশি। ইলেকট্রিক হিটারের কয়েলের মতোই তপ্ত লাল হয়ে যেন জ্বলছে। গ্রহটি মূল নক্ষত্রের অত কাছে কেন এবং ঠিক কী-কী উপাদানে সেটি তৈরি তা অবশ্য জানা যায়নি। কারও-কারও অনুমান, এর বেশিরভাগটাই গলিত পাথরে তৈরি। কেউ-বা মনে করেন, এটি বৃহস্পতির মতোই অতিকায় এক গ্যাসীয় গ্রহ। একসময় ৫১-পেগ থেকে অনেকটা দূরেই ছিল। তারপর হয়তো দ্বিতীয় কোনও গ্রহ কিংবা ওই নক্ষত্রের সহযোগী কোনও তারা খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় সেই ধাক্কায় চলে যায় একেবারে ৫১-পেগের কোলের কাছে। কেউ-কেউ আবার বলেছেন, গ্রহ নয়, ওটি হল এক মৃত নক্ষত্র, যার নাম 'ব্রাউন ডোয়ার্ফ' বা 'বাদামি বামন'। বড় নক্ষত্রটির প্রবল টানে একদিন এসে পড়েছিল তার কাছে এবং তারপর থেকে অভিকর্ষের টানে বন্দি হয়ে ঘুরে চলেছে।

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি

এরকম বহু প্রশ্নেরই উত্তর এখনও অজানা। তবে যেটুকু জানা গেছে তাতে আমাদের কল্পনা উজ্জীবিত হবে না ঠিকই, কারণ গ্রহটি কোনওদিক থেকেই আমাদের পৃথিবীর মতো নয়, তবে বিজ্ঞানীদের কাছে এটা বড় খবর। আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে অন্য এক সৌরমণ্ডলের সন্ধান পাওয়া গেল। এমন আরও সৌরমণ্ডলের জন্য তাই অনুসন্ধান চলবে। বিশ্ব-নিয়মই বলছে, আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে শুধু নয়, তার বাইরে আরও অগণিত ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর দোসর আছেই আছে। আর তেমন কোনও পৃথিবীতে হয়তো আছে প্রাণ। প্রাণের সৃষ্টিও তো হয়েছে একই বিশ্ব-নিয়মের সূত্র ধরে। হয়তো সে-নিয়মের সবটুকু আজও আমরা জানি না। হয়তো পৃথিবীর মতো অন্য কোনও গ্রহে প্রাণ থাকলেও এই পৃথিবীর প্রাণের সঙ্গে তার কোনও মিলই নেই। কিন্তু মানুষ চিরকাল অজানা জগতে তার নিজের প্রতিকৃতিকেই খুঁজে আসছে। সেটাই স্বাভাবিক। ভিন্নতর সৌরমণ্ডলে অন্যতর গ্রহের সন্ধানে যাঁরা নিমগ্ন, জিওফ মার্সি তাঁদেরই একজন। মার্সি তাই বলেছেন, "নতুন ওই গ্রহের আবিষ্কার নিঃসন্দেহে একটা মস্ত খবর। কিন্তু আমি এখনও খুশি নই। আমরা চাই এমন এক গ্রহের সন্ধান পেতে, যার সঙ্গে আমাদের এই পৃথিবীর অন্তত কিছুটা মিল আছে। আসলে ওইরকম অজ্ঞাত কোনও সুদূর গ্রহে আমরা খুঁজে পেতে চাই নিজেদেরকেই।"

সম্পূর্ণ উপন্যাস

হিসেবে ভুল ছিল

সমরেশ মজুমদার

ক’দিন থেকে দিনরাত বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে রয়েছে। দিনটাকে দিন বলে চেনা যাচ্ছে না। রাতটা হয়ে উঠেছে আরও রহস্যময়। ডুয়ার্সে এই সময় একবার বৃষ্টি নামলে আর রক্ষে নেই। তখন কাজকর্ম মাথায় ওঠে। গাছের পাতাগুলোও আওয়াজ করতে-করতে একসময় নেতিয়ে পড়ে। তবু এই বৃষ্টি মাথায় করে অর্জুন আজ সকাল দশটা নাগাদ অমল সোমের বাড়িতে এসেছিল। “কাঁহাতক আর বাড়িতে বসে থাকা যায়,” এই বলে বর্ষাতি আর গামবুট পরে বেরিয়েছিল। থানার পাশ দিয়ে করলা নদীর পাশ ধরে আসার সময় দেখল রাস্তা আর নদী এক হয়ে গেছে। অল্পের জন্য গামবুটের মধ্যে জল ঢোকেনি। হাবু দরজা খুলে দিয়েছিল। অমল সোম তাঁর ঘরে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখছিলেন। টেবিল ল্যাম্প সেই সকালবেলাতেই জ্বালিয়েছেন বাইরে রোদ নেই বলে। পেছন না ফিরে বলেছিলেন, “তুমি এসে ভালই করলে। মাকে একটা টেলিফোন করে দাও। আজ দুপুরে এখানে হাবুর খিচুড়ি খেয়ে নেবে।”

হাবুর হাতের রান্না মোটেই ভাল নয়। গায়ে শক্তি এবং কানে
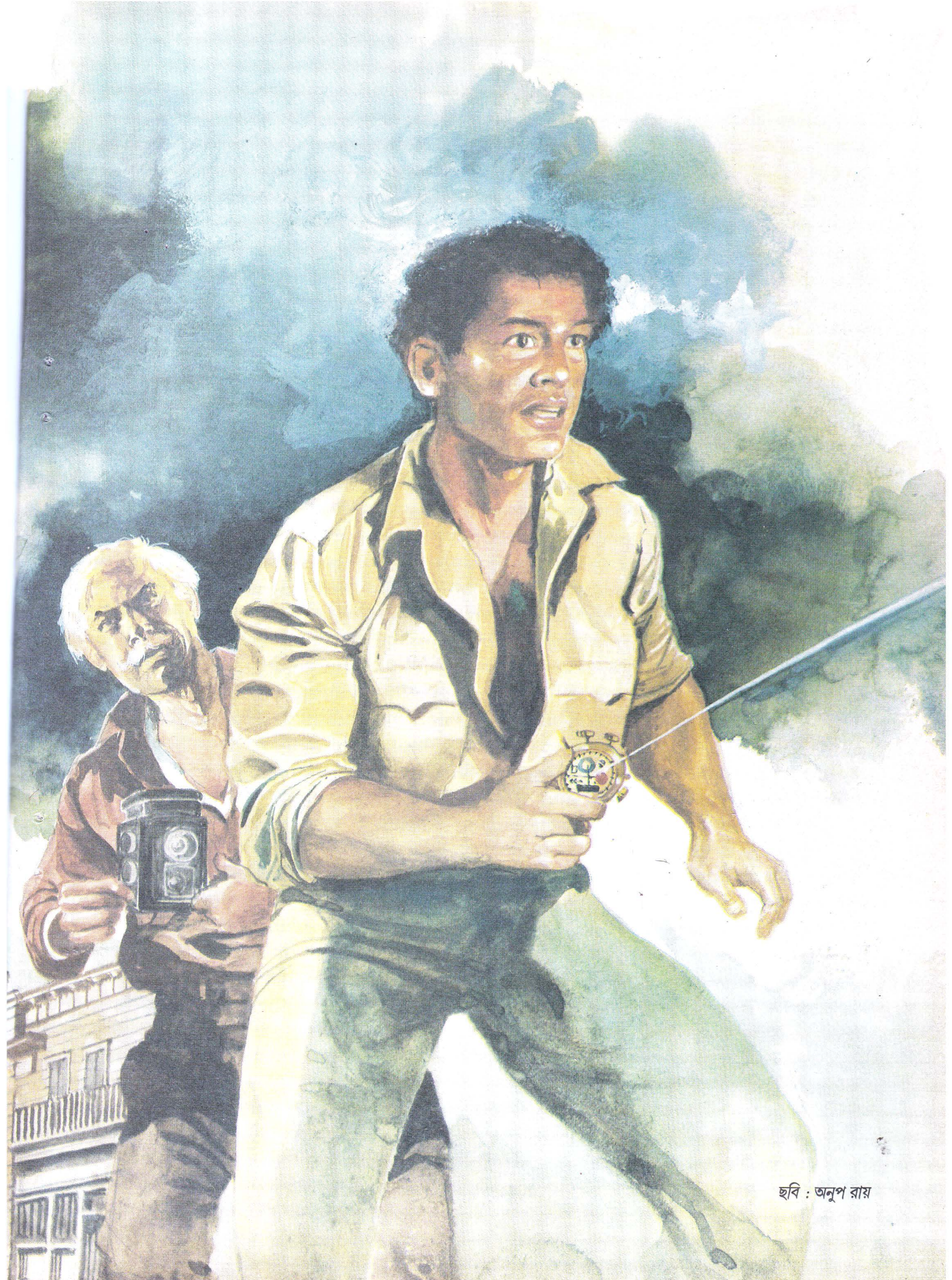
ছবি : অনুপ রায়

না শুনতে পাওয়া, কথা না বলতে পারা মানুষ যতটা ভাল রান্না করতে পারে হাবু ঠিক ততটাই পারে। গামবুট, বর্ষাতি খুলে বেশ কিছুক্ষণ অর্জুন ঘরে বসে ছিল। অমল সোম সেই যে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন, আর কোনওদিকে খেয়াল নেই।

সূর্য নেই বলেই বাইরে আলো নেই, ঘরেও স্যাঁতসেঁতে ছায়া। এইরকম সময়ে বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে খুব ভাল লাগে। অর্জুনের মনে পড়ে, একসময় নীহার গুপ্তের কিরীটি রায় পড়তে খুব ভাল লাগত। তারপর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ। কিন্তু এদের ভাবভঙ্গি বেশ বয়স্ক-বয়স্ক। ফেলুদা এসে সব্বাইকে সরিয়ে দিল। তার কাছাকাছি কাকাবাবু একটু পাল্লা দিয়েছে ঠিকই, তবে ফেলুদা একাই একশো। অর্জুনের মনে হচ্ছিল সে যদি ফেলুদার মতো হতে পারত! ফেলুদা কীরকম বেনারস থেকে রাজস্থানে কেস নিয়ে যেত। যেহেতু সে জলপাইগুড়িতে পড়ে আছে তাই ডুয়ার্সের বাইরে কেউ তাকে সমস্যা সমাধানের জন্য ডাকে না।

দুপুরে হাবু খাবার দিল। খিচুড়ি, বেগুনভাজা আর ডিমভাজা। এ-বাড়িতে আসার পর অমল সোম আর কথা বলার সময় পাননি। এখন খেতে এসে বললেন, "ফ্যান্টাস্টিক। বুঝলে, দারুণ ব্যাপার।"

অর্জুনের মনে হচ্ছিল হাবু খিচুড়িতে বেশি নুন দিয়েছে। এই বস্তুকে অমল সোম কী করে দারুণ বলছেন তা তিনিই জানেন।

পুরো থালা শেষ করে মুখ ধুয়ে একটা লবঙ্গ জিভে চালান করে অমল সোম ডাকলেন, "ঘরে এসো, কথা আছে।"

অর্জুন অনুসরণ করল। চেয়ারে বসে অমল সোম বললেন, "সেই যে গল্প আছে না! একটা বারো বছরের ছেলে সবে জন্মানো বাছুরকে কোলে নিয়ে রোজ খেলা করত। একদিনও সে খেলা বন্ধ করেনি। ছেলেটির যখন তেরো বছর বয়স তখন গোরুটা বেশ বড়সড়। কোনও মানুষ সেই গোরুটাকে কোলে তুলতে পারত না, কিন্তু ওই বালক স্বচ্ছন্দে তুলে নিত। গল্পটাকে বিশ্বাস করো?"

অর্জুন বুঝতে পারছিল অমল সোম নেহাতই ভূমিকা করছেন। কিন্তু উত্তরটা কী হবে? রোজ যে গোরুটাকে তোলে সে তো প্রতিদিনই বাড়তি ওজনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য অনেক মাকে বলতে শোনা যায়, "না বাবা, তোকে আর কোলে তুলতে পারব না। আমার গায়ে জোর নেই।" ছেলের আবদার রাখতে না-পারা সেই মা-ও তো কোলে তুলতে অভ্যস্ত ছিলেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না, একটা বড়সড় গোরুর ওজন কয়েক মন হবে। যা তোলা কোনও মানুষের পক্ষে অসম্ভব! ছেলেটি কিছুদিনের মধ্যেই খেলাটা বন্ধ করতে বাধ্য হবে।"

এইসময় বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ হল। গাড়িটা বাড়ির সামনেই এসে থামল। অমল সোম বিরক্ত হলেন, "হুটহাট লোকজন চলে আসে। যেন আমরা দেখা করার জন্যে হাঁ করে বসে আছি। তুমি লোকটাকে এই প্রশ্ন করে দ্যাখো তো কী উত্তর দেয়!"

অর্জুন উঠল। কারণ ততক্ষণে আগন্তুক বেল বাজিয়েছে।

দরজা খুলতেই বর্ষাতি ফেল্ট হ্যাট পরা যে মানুষটিকে সে দেখতে পেল, সে পুরোদস্তুর সাহেব। গাড়ি থেকে নেমে বারান্দা পর্যন্ত আসতেই ভিজে গেছে এবং তার জন্য বেশ লজ্জিত মনে হল।

ইংরেজিতে বলল, "আমি খুব লজ্জিত বারান্দাটা ভিজিয়ে দিলাম বলে। কিন্তু আমি কি মিস্টার সোমের দেখা পেতে পারি?"

"আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

"জয়ন্তী পাহাড়ের কাছেই আমি থাকি। মিস্টার সোমকে আমি চিঠি লিখেছিলাম।"

"আপনি আজকে যে আসছেন তা কি উনি জানেন?"

"ওয়েল, আমি তারিখ বলতে পারিনি।"

"আপনার নামটা!"

"ডেরেক মুরহেড।"

"আপনি কি ভারতীয়?"

"ওঃ, ইয়েস। আমি ভারতবর্ষের নাগরিক। কেন বলুন তো?"

"আপনার নাম এবং চেহারা ভারতীয়দের মতো নয়, তাই।"

"ভারতীয়দের চেহারা কি সবার একরকম?" ডেরেক হাসল।

অর্জুন লোকটাকে ভাল করে দেখল। বছর চল্লিশেক বয়স। দূরে বৃষ্টিতে যে জিপটা ভিজছে তার দাম বেশি নয়। এই লোকটি যে আসছে তা অমল সোম জানতেন। তবু বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

"মিস্টার সোম কি আপনাকে এখন আসতে বলেছিলেন?"

ডেরেক মাথা নাড়ল, "না। কয়েকদিন আগে ওঁকে আমি খাম পাঠাই। উনি যেদিন আসতে বলবেন সেদিন চলে আসব বলে জানাই। কিন্তু পরপর এমন কিছু ঘটনা ঘটল যে, আজ এমন ওয়েদারেও আমি চলে আসতে বাধ্য হলাম।"

ডেরেককে বাইরের ঘরে বসতে বলল অর্জুন। বর্ষাতি বারান্দায় খুলে রেখে ডেরেক ভেতরে এল। অর্জুন দেখল লোকটার স্বাস্থ্য বেশ ভাল। একে ভারতীয় বলে ভাবতে তার অসুবিধে হচ্ছিল। জানলা খোলা যাবে না বৃষ্টির জন্য, আলো জ্বালতে হল। এবং তখনই অমল সোম ঘরে ঢুকলেন, "ডেরেক মুরহেড?"

"ইয়েস সার। আপনি মিস্টার সোম?"

"হ্যাঁ। আর এই ইয়ং ম্যানটির নাম অর্জুন।"

ডেরেক দু'জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, "মিস্টার সোম, এভাবে না জানিয়ে চলে আসার জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

"ছবিগুলো কে তুলেছে?"

"আমার কাকা। উনি বেশ বৃদ্ধ। একমাত্র নেশা ছবি তোলা। নিজের ডার্করুম আছে। সারাক্ষণ ক্যামেরা নিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান।"

"ছবিগুলো কবে তোলা হয়েছে?"

"গত এক বছরে। আমি ছবির পেছনে এক দুই করে নম্বর লিখে দিয়েছি।"

"আমার এখানে আসতে তোমার কতটা সময় লাগল?"

"সাত ঘন্টা। বৃষ্টির জন্যে আমি অবশ্য স্পিড বাড়াতে পারিনি।"

"তার মানে এখনই রওনা হলে তুমি রাত ন'টার আগে ফিরতে পারবে না!"

"সেইরকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু সার...।"

"হবে। ইন ফ্যাক্ট তোমার পাঠানো ছবিগুলো নিয়েই আমি সারা সকাল বসে ছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। খিচুড়ি খাবে?"

"অনেক ধন্যবাদ সার। আমরা বাড়ির বাইরের খাবার খাই না। সঙ্গে যা এনেছিলাম তাই দিয়ে লাঞ্চ শেষ করেছি।" ডেরেক জানাল।

"সে কী! তোমাকে যদি বেশ কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যেতে হয়—!"

"নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি যাব না। আমাদের গ্রামের কেউই যাবে না। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এই ট্র্যাডিশন মেনে চলছি। এবার কাজের কথায় আসা যাক। সার, আমরা আপনার সাহায্য চাইছি। গ্রামের সমস্ত মানুষ এখন আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে।"

"দ্যাখো ডেরেক, ডুয়ার্সে এতকাল বাস করেও আমি জানতাম

না পাহাড়ে এমন একটা গ্রাম রয়েছে। কোনও জার্নাল বা বইয়ে খবরটা ছাপা হয়েছে বলে শুনিনি। তাই তোমার চিঠি পেয়ে অবাকই হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমার কথা তুমি জানলে কী করে?"

"একটা ইংরেজি পত্রিকা থেকে। আপনাকে নিয়ে লেখা একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল।"

"আচ্ছা। এখন তোমাদের সমস্যাটা কী?"

"বছরখানেক ধরে আমাদের গ্রামে মাঝে-মাঝেই অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে। পাহাড়ে অদ্ভুত আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। রাত বলে কেউ তখন সেখানে যেতে সাহস পায় না। দিনের বেলায় গিয়ে দেখা যায় অনেকটা জায়গা পুড়ে ছাই হয়ে আছে। কিন্তু সেগুলো যে আগুনে পুড়েছে তা আমাদের মনে হয়নি। গাছ বা ঘাস পুড়েছে প্রচণ্ড উত্তাপে। ইদানীং এই ঘটনা ঘন-ঘন ঘটছিল। যেহেতু আলোটাকে দেখা যেত গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে, তাই আমাদের কোনও সমস্যা তৈরি করেনি। লোকাল থানা মাইলপাঁচেক দূরে, পাহাড়ের নীচে। তাদের খবরটা জানিয়েছিলাম, কিন্তু কেন জানি না পুলিশ আমল দেয়নি। কয়েকদিন হল, অদ্ভুত চারজন মানুষ গ্রামে আসছে। প্রথমবার কথা বলতে গিয়ে বোঝা গেল ওরা হিন্দি বা ইংরেজি জানে না। গতকাল এসেছিল একজন দোভাষীকে নিয়ে। ওরা আগামী রবিবার আবার আসবে এবং তখন গ্রামের যত দু'বছরের শিশু রয়েছে তাদের দেখতে চায়। ওরা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে, আমাদের কোনও আপত্তি শুনবে না। আপনাকে যে ছবিগুলো পাঠিয়েছি তাতে পোড়া গাছপালার সঙ্গে ওই লোকগুলোও আছে। আমরা ভয় পাচ্ছি ওই রহস্যময় আলোর সঙ্গে এই অজানা আগন্তুকদের কোনও সম্পর্ক রয়েছে।" ডেরেক একটানা বলে থামল।

"ইন্টারেস্টিং ডেরেক। আমি ছবিগুলো ভাল করে দেখেছি। ওগুলো নিয়ে আমি পরে কথা বলব। কিন্তু তোমরা কি থানায় ডায়েরি করেছ? কিছু লোক যদি ভয় দেখিয়ে কাজ করাতে চায় তা হলে পুলিশ তোমাদের প্রোটেকশন দিতে বাধ্য।" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"না। মনে হয়েছে আপনার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।"

"পুলিশের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কীরকম?"

ডেরেক মাথা নাড়ল, "আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কখনওই পুলিশকে আমাদের গ্রামে ঢুকতে দেখিনি। আজ অবধি গ্রামে এমন কোনও অপরাধ কেউ করেনি যাতে পুলিশের উপস্থিতি প্রয়োজন। এ থেকে ভেবে নিতে পারেন সম্পর্ক কীরকম?"

"হুম। লোকগুলোর ছবি দেখে মনে হয়েছে ওরা মধ্য এশিয়ার মানুষ। আচ্ছা, তোমার কাকাকে ওরা ছবি তুলতে দিতে আপত্তি করেনি?"

"কাকা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছিলেন।"

"ও।" অমল সোম ভেতরে চলে গেলেন। অর্জুন এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। তার মাথায় অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে ছটফট করছে। কিন্তু অমল সোম যখন কথা বলছেন তখন তার কথা বলা অশোভন বলেই চুপ করে ছিল সে।

অমল সোম ফিরে এলেন দুটো ফোটোগ্রাফ নিয়ে। প্রথমটা সামনে ধরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মনে হয় এখানেই আলো জ্বলেছিল। গাছপালা পুড়ে গেছে। কিন্তু এই জিনিসটি কী? রংটা যে কখনও সাদা ছিল তা বোঝা যাচ্ছে।"

অমল সোম ছবিটা সামনে ধরতেই ওরা দেখতে পেল পোড়া জঙ্গলের একাংশ। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ছাই হয়ে। একটু জোরে বাতাস বইলেই পড়ে যাবে। অমল সোম যে জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখালেন সেখানে একটা আধপোড়া মস্ত গাছ যার পেটের মধ্যে বিশাল ডিমের আকারের কোনও বস্তু

সবার রঙে রঙ মিশাতে
তন্তুশ্রী...
আমি সাজি দিদিও সাজে
সাজেন বাবা মায়—
তন্তুশ্রীর নতুন কাপড়
দাদু-দিদার গায়।
জন্মদিনে, বড়দিনে
ঈদ, পুজোতে ভাই—
তন্তুশ্রীর দারুণ পোশাক
সত্যি কে না-চাই!
তন্তুশ্রী
(রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা)
Samriddhi
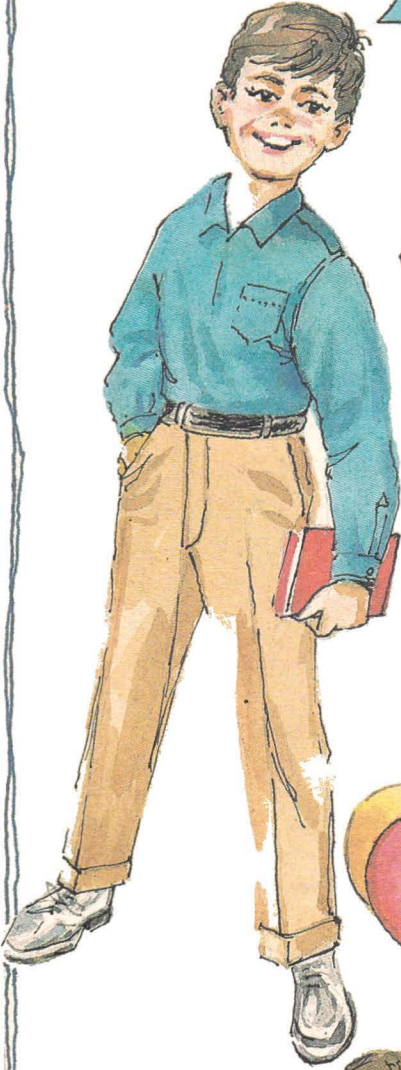
রয়েছে, ওপরের রং কখনও সাদা ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

ডেরেক ঝুঁকে দেখল। তারপর মাথা নাড়ল, "এরকম কিছুর অস্তিত্ব ওখানে আছে বলে মনে করতে পারছি না। হয়তো ওখানে আলো এমনভাবে পড়েছিল যে, ছবিতে ডিমের আকৃতি বলে মনে হচ্ছে।"

দ্বিতীয় ছবিতে যে-ক'জন মানুষের ছবি তাদের মুখ-চোখ বেশ শান্ত। অতিরিক্ত মাত্রায় শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। অমল সোম যখন বলেছেন লোকগুলো মধ্য এশিয়ার, তখন ও নিয়ে তর্ক করার কোনও মানে হয় না। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "এই চারজনের মধ্যে কে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছে ?"

ডেরেক খুব দ্রুত লোকটিকে দেখিয়ে দিল। অর্জুন দেখল লোকটি দলের সবচেয়ে রোগা, খাটো। নেতা হওয়ার মতো শরীর ওর নয়। অমল সোম ছবিগুলো ফেরত নিলেন, "ডেরেক, আমাকে আরও ভাবতে হবে। কিন্তু তার আগে বলো তুমি ঠিক কী চাও ?"

ডেরেক বলল, "মিস্টার সোম, আমরা খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমাদের গ্রামে গেলেই আপনি সেটা বুঝতে পারবেন। এই ঝুট ঝামেলা থেকে আপনি আমাদের রক্ষা পেতে সাহায্য করুন। আমরা সাধ্যমতো আপনাকে পারিশ্রমিক দেব।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "সে তো নিশ্চয়ই, বিনা পারিশ্রমিকে আমরা কেন সময় নষ্ট করব ! কী বলো অর্জুন ?"

অর্জুন জবাব দিল না। অমল সোম টাকা রোজগার করার জন্য সমস্যার সমাধান করেন এ-কথা আজ জলপাইগুড়ির একটা রিকশাওলাও বিশ্বাস করবে না।

"তা হলে ?" ডেরেক সোজা হয়ে বসল।

"ডেরেক মুরহেড ?"

"ইয়েস সার।"

"আমাকে আর একটু ভাবতে দাও। তবে সেইসঙ্গে আমার কিছু ডাটা দরকার। এই জন্যে আমি অর্জুনকে তোমার সঙ্গে পাঠাতে চাই। নিজেদের গ্রাম তোমরা যে চোখে দেখবে অর্জুন নিশ্চয়ই সেটা দেখবে না। ও ফিরে আসবে শনিবারের মধ্যে। তেমন বুঝলে আমি রবিবারের সকালেই তোমাদের ওখানে পৌঁছে যাব। তুমি যদি অর্জুনের যাওয়া-আসা এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো।"

"শিওর। এতে কোনও প্রবলেম নেই।"

ডেরেককে বসতে বলে অমল সোম অর্জুনকে ইশারা করলেন অনুসরণ করতে। ভেতরের ঘরে ঢুকে অমল সোম বললেন, "তোমার যেতে আপত্তি নেই তো ?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনি কিছু বললে আমি কখনও আপত্তি করেছি ? তা ছাড়া যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে গেলে নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

"গুড। শোনো, ওখানে গিয়ে চোখ-কান খোলা রাখবে। কোনও ইমোশনাল ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেবে না। তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে ?"

"হ্যাঁ। ওটা সঙ্গে রাখা অভ্যেস হয়ে গেছে।"

"যদি তুমি থাকতে-থাকতে আলোটা ওখানে জ্বলে ওঠে তা হলে অস্ত্রটা ব্যবহার করবে।" অমল সোম তাঁর টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা হাতঘড়ি বের করলেন, "তোমার ঘড়িটা খুলে রাখো এখানে। এটা পরে নাও।"

অর্জুন ঘড়িটা নিল। একটু ভারী। নানান রকম চাবি ঘড়ির চারপাশে।

অমল সোম চাবিগুলোর ব্যবহার বুঝিয়ে দিলেন।

জলপাইগুড়ির হাসপাতালের সামনে তখন বেশ জল জমে গেছে। ডেরেকের পাশে বসে জলে ভাসা শহর দেখতে-দেখতে ওরা বাইপাসে এসে পড়ল। ডেরেক জিপ চালাচ্ছে বেশ গম্ভীর মুখে। অর্জুনের মনে হল ডাস্টিন হফ্‌ম্যানের সঙ্গে ডেরেকের চেহারার খুব মিল আছে। একসময় ডুয়ার্স, দার্জিলিং এবং অসমের চা-বাগানগুলোর ম্যানেজার হয়ে সাহেবরা এ-দেশে ছিল। স্বাধীনতার পর তারা যে যার নিজের দেশে ফিরে গিয়েছে। এখন মাঝে-মাঝে টুরিস্ট ছাড়া সাহেব ডুয়ার্সে দেখা যায় না।

বৃষ্টিটা আবার জোরালো হল। সামনের রাস্তা দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। ডেরেক বাধ্য হল রাস্তা থেকে সরে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাতে। এঞ্জিন বন্ধ করে বলল, "এক্সকিউজ মি।" সে পকেট থেকে একটা বাক্স বের করে ঢাকনা খুলল। বাক্সের মধ্যে হাতে পাকানো সিগারেট। ঠোঁটে একটা তুলে দিয়ে দেশলাই জ্বালল সে। ডেরেককে সিগারেট খেতে দেখে অর্জুনের লোভ হচ্ছিল খুব। কিন্তু ডেরেক তাকে অফার করছে না দেখে সে চুপ করে রইল। এই সিগারেটের গন্ধটা একদম অচেনা। মিষ্টি-মিষ্টি ঘোর লাগায়।

ডেরেক বলল, "আমি একটু অভদ্রতা করলাম। কিন্তু এই সিগারেট আপনার ভাল লাগবে না বলে আমি অফার করলাম না।"

"কী করে বুঝলেন ?"

"এর তামাক আমরা গ্রামে তৈরি করি। সতেরোশো আশি সালে আমার পূর্বপুরুষরা যখন ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন তখন তাঁরা এইরকম সিগারেট খেতেন। নেশার ব্যাপারে আমরা সেই অরিজিন্যালিটি আজও বজায় রেখেছি। আজকের সিগারেটের তুলনায় এর স্বাদ খুব কড়া।" ডেরেক হাসল।

"সতেরোশো আশি সালের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না !"

"ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। সতেরোশো আশি সালে তিরিশ জনের একটা দলকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। এই তিরিশজনের মধ্যে বাইশজন পুরুষ-মহিলার ইংল্যান্ডে কোনও না-কোনও অপরাধে যাবজ্জীবন জেলে থাকার কথা ছিল। তখন যাবজ্জীবন জেল মানে বারো বছর নয়, সমস্ত জীবনই থাকতে হত। কিন্তু জেলখানায় সম্ভবত স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না বলে ওঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হল নতুন পাওয়া কলোনিতে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা এঁদের উপদ্রব ভাবলেন। ভেবে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে, এই পাহাড়ে।"

"তারপর ?"

"তারপরের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। তখনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পাহাড়ে দখল নেয়নি। শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং-দার্জিলিঙের নামকরণ হয়নি। পাহাড় ছিল সিকিমের রাজা আর লেপচাদের অধীনে। কিন্তু তাদের ক্ষমতা ছিল সীমায়িত। তাই ওই তিরিশজন যখন পাহাড়ের এমন একটা জায়গায় বসতি স্থাপন করল যার আবহাওয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার মিল আছে, তখন এদেশীরা অথবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আদৌ বিরক্ত হল না।"

"তারপর !"

"আপনি গল্প খুঁজছেন ?"

"না। আমি আপনার ইতিহাস জানতে চাইছি।"

ডেরেক হাসল, "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ইংল্যান্ডের কুইন ভিক্টোরিয়া যে তাঁদের অপরাধীর বাইরে কিছু ভাবেন না, তা ওঁরা বুঝে গিয়েছিলেন। এতদূরে পাহাড়ে প্রায়-চেনা প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে সম্ভবত ওঁদের অভিমান প্রকট হয়েছিল। কিছুকাল পরে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের দখলে গেল, তখনও ওঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আলাদা হয়ে থেকে গেলেন। ওই তিরিশজনের পরিবার একটু-একটু করে বড় হয়ে

একটা গ্রামের চেহারা নিয়ে নিল। গ্রামে চার্চ হল, স্কুল হল, খামার তৈরি হল। ক্রমশ আমার পূর্বপুরুষরা আত্মনির্ভর হলেন। কিন্তু কখনওই তাঁরা ভারতবর্ষকে শাসন করা ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মেলালেন না। হয়তো ওরা তাঁদের একসময় অপরাধী মনে করত, এটা তাঁরা ভুলতে পারেননি। কিন্তু মজার কথা কী জানেন, এই এলাকার আদিবাসী পাহাড়িদের সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক তৈরি হল না। ভারতবর্ষের পাহাড়ে আমরা আমাদের নিজস্বতা নিয়ে বছরের পর বছর একদম আলাদা হয়ে বেঁচে আছি।" এক নিশ্বাসে ডেরেক কথাগুলো বলে গেল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এখন আপনাদের গ্রামের মানুষের সংখ্যা কত?"

"সাড়ে সাতশো।"

"এই সাড়ে সাতশো মানুষ চুপচাপ পাহাড়ে কীভাবে থাকছে?"

"চুপচাপ থাকবে কেন? প্রত্যেকেই কাজকর্ম করছে। চাষবাস ছাড়াও আমাদের গ্রামের মূল আয় এক্সপোর্ট থেকে। প্রত্যেক বছর প্রচুর বিদেশি মুদ্রা রোজগার করি আমরা।"

"কীরকম?" অর্জুন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

"হস্তশিল্প বোঝেন? নানা ধরনের হস্তশিল্প, যা আমাদের পূর্বপুরুষের কেউ-কেউ ইংল্যান্ডে থাকাকালীন শিখেছিল তারই ভারতীয় চেহারা বিদেশে ব্যাপক চাহিদা তৈরি করেছে।"

"তা হলে আর-পাঁচটা পাহাড়ি গ্রামের তুলনায় আপনাদের অবস্থা বেশ ভাল।"

"তা বলতে পারেন।"

"আপনারা কি শুধু ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলেন?"

হেসে ফেলল ডেরেক, "তা কি সম্ভব? আমরা নেপালি এবং হিন্দিও বলি। না বললে কোনও কাজকর্মই করা যাবে না।"

বৃষ্টি একটু কমে আসতেই ডেরেক জিপ চালু করল। অর্জুন চুপচাপ ভাবছিল। এত বছর এদেশে থেকেও ডেরেকরা কতখানি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে তা ওদের গ্রামে না গেলে বোঝা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ধরনের। এরকম একটা ঘটনার কথা সে এর আগে কখনও শোনেনি। এমন তো নয় যে, ওরা নিজেদের গ্রামের বাইরে যায় না। সভ্য মানুষের সঙ্গে মেশে না। এই যে ডেরেক জিপ চালাচ্ছে, নিশ্চয়ই ওর লাইসেন্স আছে। জিপ কিনতে হয়েছে বাইরে থেকে। এক্সপোর্ট করে যখন, তখন এক্সপোর্ট লাইসেন্স রয়েছে। তা হলে? তিরিশজনের একটা দল দুশো বছর আগে ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে চেপে এদেশে এসে পাহাড়ে বসতি করেছিল, যাদের সংখ্যা এখন সাড়ে সাতশো, তারা তো ইংরেজই। অথচ এদের কথা বইয়ে দূরের কথা, খবরের কাগজে বের হয় না।

মাঝখানে একবার পেট্রল নিতে জিপ থামিয়েছিল ডেরেক। তখন বাক্স খুলে খাবার এগিয়ে দিয়েছিল। পিঠেজাতীয় জিনিস। অর্জুন অমল সোমের বাড়ি থেকে খিচুড়ি খেয়ে বেরিয়েছিল বলে খেতে চায়নি আর। ডেরেক খেল। তারপর ফ্লাস্ক থেকে কফি। কালো কফি। স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় কফিটা চমৎকার লাগল অর্জুনের।

শেষপর্যন্ত সমতল থেকে পাহাড়ে উঠতে লাগল গাড়ি। মেঘ থাকায় আজ সন্ধে নেমে পড়েছে বেশ আগেই। ডেরেক হেডলাইট জ্বেলে দিয়েছে। পাহাড়ের বাঁকে-বাঁকে ধাক্কা খেতে-খেতে আলো তাদের পথ দেখাচ্ছে। ক্রমশ তিস্তার গর্জন কানে এল। অনেক নীচ দিয়ে তিস্তা বয়ে যাচ্ছে। এবার পিচের পথ ছেড়ে কাঁচা মাটির পথ ধরল জিপ। বৃষ্টিতে ভেজা বলেই ডেরেক খুব সন্তর্পণে চালাচ্ছিল। রাস্তা খারাপ বলেই বেশি সময় লাগছে। চারপাশে জঙ্গল এবং তাদের চেহারা অন্ধকারে ভয়ঙ্কর। বৃষ্টির মধ্যেই ঝিঁঝিঁ আওয়াজ করে চলেছে সমানে।

ডুয়ার্স-দার্জিলিঙের রাস্তাঘাট অর্জুন চেনে। এই অন্ধকারে জিপের আলোয় সে চিনতে চেষ্টা করছিল কোন পথে যাচ্ছে। কিন্তু কাঁচা মাটির পথ ধরার পর থেকেই তার সবকিছু গুলিয়ে গেল। আধঘন্টা চলার পর সে আবিষ্কার করল কাঁচা রাস্তা শেষ হয়ে আবার পিচের রাস্তা শুরু হয়েছে। খুব মসৃণ রাস্তায় বৃষ্টির জল টুপটাপ পড়ে চলেছে। রাস্তাটা বাঁক নিচ্ছে ঘন-ঘন। হঠাৎ ডেরেক বলল, "এই রাস্তা আমরাই বানিয়েছি।"

"আপনারা মানে গ্রামের লোকেরা?"

"হ্যাঁ। পুরো পথটায় পিচ ফেলা হয়নি কারণ অনুমতি পাওয়া যায়নি।"

হাওয়া বইছে খুব। অর্জুন বাইরে হাত বের করে দেখল জলের ফোঁটা পড়ছে না। ডেরেক বলল, "আমরা এসে গেছি। আপনাকে বেশ কষ্ট দিলাম।"

অর্জুন উত্তর দিল না। তার সামনে শুধুই পাহাড়ের আড়াল। কোথায় যে এলাম তা বোধগম্য হচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ গাড়িটা বাঁক নিতেই চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হিরের মতো আলো জ্বলছে থোকা-থোকা। ঘরবাড়ির আদল দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে। ডেরেক গাড়ি থামাল। বলল, "ওই হল আমাদের গ্রাম।"

পাহাড়ি রাস্তার অভিজ্ঞতা থেকে অর্জুন বুঝতে পারছিল এখনও সিকি মাইল পথ ভাঙতে হবে গ্রামে পৌঁছতে গেলে। পাহাড়ের আড়ালে এমন একটা জনপদের কথা সে জানত না, সাধারণ মানুষও জানে বলে মনে হয় না। ডেরেক বলল, "উত্তরদিকের ওই যে পাহাড়, গ্রাম থেকে দূরত্ব খুবই অল্প, আগুন জ্বলে ওঠে ওখানেই।"

অর্জুন দেখল ডেরেকের দেখানো জায়গাটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। ওদিকে কোনও ঘরবাড়ি আছে বলে মনে হয় না।

গাড়ি গ্রামে ঢুকল। এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। রাস্তা পরিষ্কার এবং লোকজন নেই। ইংরেজিতে 'পাব' লেখা একটা সাইনবোর্ড লাগানো বাড়ি থেকে হইহই চিৎকার ভেসে এল। ডেরেক তাকে নিয়ে এসে যেখানে থামল সেটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির গায়ে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে ভিলেজসেন্টার। গাড়ি থামতেই তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা বাইরে বেরিয়ে এলেন। সবচেয়ে প্রবীণ টেকোমাথা মানুষটি এগিয়ে এসে বললেন, "কী খবর ডেরেক?"

ডেরেক অর্জুনকে ইশারা করে গাড়ি থেকে নামল, "কোনও চিন্তা নেই আঙ্কল। আমি মিস্টার সোমের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি দু'দিন পরে আসবেন। তার আগে ওঁর সহকারীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তদন্তের জন্যে। ওঁর নাম অর্জুন, ইনি আমাদের গ্রামের চেয়ারম্যান মিস্টার জোন্স, ইনি ডেপুটি মিস্টার স্মিথ আর ইনি ট্রেজারার মিসেস বেনসন।"

তিনটে বাড়ানো হাতের সঙ্গে হাত মেলাল অর্জুন। মিসেস বেনসন বলে উঠলেন, "আরে, এ যে দেখছি নেহাতই ছেলেমানুষ! ও কী তদন্ত করবে!"

ডেরেক বলল, "মিস্টার সোম ওর ওপর আস্থা রাখেন।"

অর্জুনকে ওরা বেশ সমীহ করেই ভেতরে নিয়ে গেল। একতলাটা অফিসঘর। দোতলায় গেস্ট হাউস। দীর্ঘ পথ গাড়িতে আসা এবং রাত হয়ে যাওয়ার কারণে অর্জুনকে বিশ্রাম নিতে বলা হল। দোতলার যে ঘরটি ওকে বরাদ্দ করা হল সেটি সুন্দর করে সাজানো। ওঁরা চলে গেলে অর্জুন বাথরুমে ঢুকল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এখানে যা ঠাণ্ডা তাতে গরম জলের দরকার। ব্যাপারটা ভাবামাত্র দরজায় শব্দ হল। অর্জুন ফিরে গিয়ে সেটা খুলতে একটা বেঁটে সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সাহেব কথা বলতে চেষ্টা করছে কিন্তু শব্দ পিছলে যাচ্ছে! সাহেবের হাতে একটা মুখ ঢাকা দেওয়া বালতি। এই

প্রথম কোনও সাহেবকে সে তোতলাতে দেখল। চারবারের চেষ্টায় সাহেব বলল, "গরম জল।"

অর্জুন সেটা সাগ্রহে নিতে চাইলেও সাহেব বালতিটা হস্তান্তর করল না। ঘরে ঢুকে বাথরুমে বালতি রেখে হাসল, "আ-আ-আমার নাম পল!"

"অনেক ধন্যবাদ মিস্টার পল। গরম জলের খুব দরকার ছিল।"

কথাটা শুনে লোকটা দু'বার মাথা নামাল এবং তুলল। তারপর বলল, "আ-আ-আমি এ-এই সে-সেন্টারের কেয়ারটেকার। ডিনার আনব?"

অর্জুন মাথা নাড়তেই একগাল হেসে পল বেরিয়ে গেল। এমন পবিত্র হাসি হাসতে অনেকদিন কাউকে দেখেনি অর্জুন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ও জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত গ্রামটা এখন শব্দহীন। রাস্তায় মানুষ নেই। এখানকার সবাই সাহেব? ভাবা যায়! পশ্চিমবাংলার এক পাহাড়ে সাদা চামড়ার মানুষ নিজেদের মতো করে বেঁচে আছে। খারাপ ভাবে যে বেঁচে নেই তা গ্রামের চেহারা এবং গেস্ট হাউসের ঘরদোর দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ডেরেক বলল, "এটা গ্রাম। পশ্চিমবাংলার গ্রামের যে চেহারা তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। বড়জোর জামশেদপুরের টেলকোর সঙ্গে কিছুটা মেলে। দুশো বছরের ওপর ভারতবর্ষের মূল জনজীবনের সঙ্গে না মিশে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা কীভাবে নিজেদের উন্নত করেছে তা নিয়ে যে-কেউ গবেষণা করতে পারেন! এরা কি ভোট দেয়? রাজনীতি করে? এখানে কি কেউ অপরাধ করে না? হাজারটা প্রশ্ন মাথায় কামড়াতে লাগল।

দরজায় শব্দ হল। পল ডিনার নিয়ে ঢুকল। ট্রে-র ওপর প্লেটে রুটি, সবজি, দুধ এবং ডিমের ওমলেট। পল বলল, "এখানে আমরা রাত্রে অ্যানিম্যাল প্রোটিন খাই না। তবু তোমার জন্যে ওমলেট করে দিলাম। কাল দুপুরে ভাল খাওয়াব।"

কথাগুলো পল অনেকবার হোঁচট খেতে খেতে বলল। অর্জুনের মনে হল পল যদি কম কথা বলে তা হলে ওর কষ্ট কম হয়। সে খেতে বসে গেল। খিদেও পেয়েছিল খুব। সবজিতে মশলা নেই বললেই চলে। সেদ্ধ করে নুন গোলমরিচ ছড়িয়েছে। একদম স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না। সামনে দাঁড়িয়ে পল সমানে কথা বলার চেষ্টা করছিল। "এই গ্রামে তো সবকিছু পাওয়া যায় না। প্রতি সপ্তাহে শিলিগুড়ি থেকে আনাতে হয় জিনিসপত্র। কিন্তু ওই যে আগুনটা আর তার সঙ্গে দুর্ভাগ্যের মতো উড়ে আসা লোকগুলো, ওরা আসার পর থেকেই এখানে কারও মনে একটুও শান্তি নেই।" খেতে-খেতে অর্জুন হা-হুতাশ শুনছিল।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ট্রে তুলে নিয়ে গুডনাইট বলে পল বেরিয়ে গেল। হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ল বোল্টন শহরের কথা। ইংল্যান্ডের ব্ল্যাকপুলে গিয়ে সে ওই ছোট্ট শহরটাকে দেখেছিল। ছবির মতো চুপচাপ, শান্ত। ডেরেকদের এই গ্রামের সঙ্গে বোল্টনের খুব মিল আছে। দু'শো বছর আগে ইংল্যান্ড থেকে আসা তিরিশজন মানুষ তাদের নিজেদের আদলে যে বাসস্থান তৈরি করেছে তাতে তো ব্রিটিশ ছাপ থাকবেই। কিন্তু এতটা মিল কল্পনা করাও যায় না।

শুয়ে পড়ার আগে অর্জুনের মনে হল, একটু হাঁটাহাঁটি করলে কীরকম হয়! যদিও রাত এখন অনেক কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পর দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তিটা চলে গিয়েছে। অর্জুন জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে নিল। বেশ ভাল ঠাণ্ডা পড়েছে এখানে। দরজা ভেজিয়ে ও নীচে নেমে এল। এর মধ্যে ভিলেজ সেন্টারের সব আলো নিভে গেছে। সম্ভবত পল তার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে গেছে। মূল দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে অর্জুন বুঝতে পারল ওটা বাইরে থেকে বন্ধ করা হয়েছে। হয়তো যাওয়ার সময় পল তালাচাবি দিয়ে গিয়েছে।

ফিরে আসছিল অর্জুন। যদিও বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার তবু রাতের নিজস্ব আলো জানলা চুঁইয়ে সেটাকে কিঞ্চিৎ ফিকে করেছে। তার মানে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, আকাশ পরিষ্কার। সে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জানলায় কোনও শিক বা গ্রিল নেই। পাল্লা দুটো খুলতে অসুবিধে হল না। মাটি থেকে বেশি উঁচুতে নয় জানলাটা। একটু ইতস্তত করেও অর্জুন জানলা দিয়ে নীচে নেমে দাঁড়াল। বাইরে থেকে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিতেই বুঝল এখানে ঠাণ্ডা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল সে। আকাশে এখন লক্ষ তারা! খানিকটা দূর থেকেই পাহাড়ের গায়ে অবশ্য জঙ্গলের জমাট অন্ধকারে সেই তারাদের কোনও প্রতিফলন নেই। হিমালয়ের বুকের ভেতরে বাটির মতো এই লোকালয়, যার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও মিল নেই। বাড়িঘর ছিমছাম, ছাড়া-ছাড়া এবং এদেশি ধাঁচের নয়। ফেলে আসা দেশের স্মৃতি যে এরা ভোলেনি সেটা স্পষ্ট। রাস্তায় মানুষ নেই। এখানে কি চুরিচামারি হয় না? বাইরে থেকে অভাবী মানুষ যদি এখানে চুরি করতে আসে, তার জন্য পাহারাদার থাকবে না? অর্জুন একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনেই পাহাড়ের পাঁচিল। দু'পাশে রাস্তাটা চলে গেছে। হঠাৎ তার কানে শব্দ বাজল। কে বা কারা কথা বলছে। একজনের গলা বেশ উত্তেজিত।

প্রথমে সে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই দু'জন মানুষকে সে আবছা দেখতে পেল। এত রাত্রে স্থানীয় মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কী কথা বলছে তা শোনার লোভ সামলাতে পারল না সে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে সে যতটা পারল এগিয়ে গেল। এবার কথা স্পষ্ট হল। ইংরেজিতে কথা বলছে ওরা। কিন্তু এই ইংরেজি একটু অন্যরকম। ক্রিয়াপদের ব্যবহার নেই বললেই হয়। উত্তেজিত লোকটি বলছিল, "আমার জীবনের একমাত্র সাধ, ইংল্যান্ডে গিয়ে নিজের গ্রাম দেখার। এই সাধ কোনওদিন মিটবে না, কারণ প্লেনের টিকিটের ভাড়া আমি জোগাড় করতে পারব না। কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে হাত মেলাও তা হলে আমরা দু'জনেই চলে যেতে পারি। ওদের কাছে এক লক্ষ টাকা চাইলেই পাওয়া যাবে।"

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "না জন। এটা বিশ্বাসঘাতকতা।"

"কিসের বিশ্বাসঘাতকতা? নিজের পিতৃভূমি-মাতৃভূমি দেখতে চাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা?"

"না, তা নয়। কিন্তু আমাদের এই কমিউনিটির ক্ষতি করে আমি কোথাও যেতে চাই না। ওই লোকগুলো যে বাচ্চাটাকে চাইবে তাকে চুরি করে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। একবার ভাবো তো সেই বাচ্চার বাবা-মায়ের কী অবস্থা হবে?"

"অনেক বাচ্চা জন্মানোর পর মারা যায়। সেইরকম ভেবে নেবে।"

"না, না। তুমি খুব নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছ। তারপর যখন তুমি ইংল্যান্ডে যাবে তখন সবাই জানতে চাইবে কোত্থেকে টাকা পেলে? কী জবাব দেবে?"

"আমরা কাউকে জবাব দেব না। টাকাটা হাতে নিয়েই এখান থেকে উধাও হয়ে যাব।"

"তার চেয়ে জন, তুমি মিস্টার জোন্সের সঙ্গে কথা বলো। আমি শুনেছি আমাদের এক্সপোর্টের ব্যাপারে একজনকে বিদেশে পাঠানোর কথা হচ্ছে। তুমি সেই দায়িত্ব চাও।"

"খেপেছ? জোন্সবুড়ো আমাকে কেন পাঠাবে? ওর নিজের লোক ডেরেক যাবে। যাকগে, আমি একজন সঙ্গী চেয়েছিলাম বলেই তোমাকে বললাম। কিন্তু এ-নিয়ে গল্প কোরো না। তা হলে সেটা আমার সঙ্গে বেইমানি করা হবে।"

"কিন্তু ওরা কি তোমাকে টাকা দেবে বলেছে ?"
"নইলে এত কথা বলছি কেন ?"
"কবে বলল ? কীভাবে কথা হল ?"
"সেদিন ওরা চলে যাওয়ার পরই আমি পিছু নিয়েছিলাম। শর্টকাট পথ ধরে গিয়ে দেখা করেছিলাম। রবিবারে যখন আসবে তখন আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দেবে কোন বাচ্চাকে ওরা চায়।"
"ওরা কেন আমাদের বাচ্চা চাইছে ?"
"আমি জানি না। কিন্তু তোমার সঙ্গে এত রাত্রে আলাদা কথা বললাম, এটা যেন কেউ না জানতে পারে। তুমি আবার ভেবে দ্যাখো। সারাজীবন এখানে পড়ে থাকার চেয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে থাকা তো স্বর্গে যাওয়ার সমান।"
"আমাদের ওরা থাকতে দেবে কেন ?"
"কারণ আমরা ব্রিটিশ। আমাদের অধিকার আছে। আচ্ছা, গুডনাইট।" লোকটা, যার নাম জন, দ্রুত হাঁটতে লাগল। পাহাড়ের সঙ্গে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অর্জুনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সে একবারও লক্ষ করল না। দ্বিতীয় লোকটা নেমে গেল নীচের রাস্তা দিয়ে। অর্জুন বুঝল ওরা নিজেদের বাড়িতে বসে কথা বলল না, কারণ আত্মীয়স্বজনকেও শোনাতে চায় না। ওর খুব শীত করছিল। ধীরে-ধীরে ফিরে এসে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। নরম বিছানায় লেপের তলায় শরীর ঢুকিয়ে ওর মনে হল, বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বের করতে না পারলে বিদেশিরা কখনওই জিততে পারে না। আর এই রাস্তাটা ইংরেজরাই দেখিয়েছে।

এত সকালে যে ওঁরা দেখা করতে আসবেন আন্দাজ করতে পারেনি অর্জুন। পলের মুখে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে এসে দেখল মিস্টার জোন্স, মিস্টার স্মিথ এবং মিসেস বেনসন বসে আছেন। ওকে দেখামাত্র ওঁরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "গুড মর্নিং।"
অর্জুন হাসল, "গুড মর্নিং।"
মিস্টার জোন্স বললেন, "বসুন মিস্টার অর্জুন। রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো ?"
অর্জুন বলল, "হ্যাঁ।"
মিসেস বেনসন বললেন, "আমরা খুব দুঃখিত, কালকের ডিনার আপনার ভাল লাগেনি বলে। আমি আশা করছি পল আজ থেকে সজাগ থাকবে।"
অর্জুন মাথা নাড়ল, "না, না। ডিনার ঠিকই ছিল।"
মিস্টার স্মিথ বললেন, "তা হলে আমরা ব্রেকফাস্ট খেতে-খেতে কথা বলি ?"
মিসেস বেনসন মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। পল এখনই নিয়ে আসছে। চলুন, ও-ঘরে যাওয়া যাক।"
ওঁদের অনুসরণ করে পাশের ঘরে ঢুকল অর্জুন। গোটা আটেক চেয়ারের মাঝখানে একটা সুন্দর খাওয়ার টেবিল। টেবিলের পায়ার বদলে গাছের গুঁড়ি সুন্দরভাবে কেটে বসানো হয়েছে। পল এল ট্রে নিয়ে। হাসিমুখে বলল, "গুড মর্নিং।"
অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, "মর্নিং।"
খেতে-খেতে মিস্টার জোন্স বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ডেরেকের কাছে আমাদের সমস্যার কথা জানতে পেরেছেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত। মিস্টার সোম যখন আপনাকে পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই আমরা ভরসা করতে পারি।"
অর্জুন বলল, "যতটুকু শুনেছি আপনাদের সমস্যা তৈরি করেছে হঠাৎ- আসা কিছু বিদেশি। কিন্তু কেউ এসে আপনাদের দু' বছরের শিশুকে দেখতে চাইলেই আপনারা তাকে দেখাতে বাধ্য নন। তারা যদি ভয় দেখায়, আপনারা স্বচ্ছন্দে পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। আপনারা যদি চান আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে পারি।"
মিস্টার জোন্স বললেন, "আমরা মনে করি পুলিশ এখন কোনও সাহায্য করবে না। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তারা সাধারণত সক্রিয় হয়। ডেরেক নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে, আমাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের জঙ্গলে মাঝে-মাঝে আগুন জ্বলে ওঠে। পরদিন গিয়ে শুধু ছাই ছাড়া আমরা কিছু দেখতে পাইনি। পুলিশকে ঘটনাটা জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি।"
"জঙ্গলে যে কারণে আগুন জ্বলে, প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি।"
"না। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে, গাছপালা শুকিয়ে গেলে যে আগুন জ্বলে, তা আমরা জানি। কিন্তু বৃষ্টিভেজা গাছগাছালিতে বাইরে থেকে আগুন না লাগালে কোনও কাজ হয় না। আর তা ছাড়া, এই আগুন ওপর থেকে নীচে নেমে আসে। পুলিশ বলেছে তারা সন্ধান করবে। কিন্তু তাও বছরখানেক হয়ে গেল।" মিস্টার স্মিথ বললেন।
খাওয়া শেষ হল। চা এল। অর্জুন লক্ষ করল চায়ের কাপ কাঠের তৈরি। মসৃণ সুদৃশ্য এই কাপ সে কখনও ব্যবহার করেনি।
ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল ডেরেক অপেক্ষা করছে। সুপ্রভাত-পর্ব শেষ করার পর ডেরেক বলল, "আপনি যদি কোথাও যেতে চান তা হলে গাড়ি তৈরি।"
অর্জুন মাথা নাড়ল, "গাড়ির দরকার নেই। মিসেস বেনসন, আপনি আমাকে বলতে পারবেন নিশ্চয়ই, এখানে দু' বছরের কাছাকাছি বয়সের কত শিশু রয়েছে ?"
মিসেস বেনসন বললেন, "ঠিক এগারোজন। এর মধ্যে তিন জন মেয়ে।"
"ওরা কি মেয়েদেরও দেখতে চেয়েছে ?"
মিস্টার জোন্স মাথা নাড়লেন, "আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। শিশু বললে ছেলেমেয়ে আলাদা করা যায় না।"
"আমি এই এগারোজনকে দেখতে পারি ?"
মিসেস বেনসন মাথা নাড়লেন, "পারেন। তবে ওইসব বাচ্চার বাবা-মা খুব ভয় পেয়ে গেছে। তারা কিছুতেই বাচ্চাদের বাইরে বের করতে চাইছে না। আমরা বুঝিয়ে বলব যে, আপনি আমাদের বন্ধু, উপকার করতে এসেছেন। যদি আজ লাঞ্চের পর ব্যবস্থা করি ?"
"ঠিক আছে। ডেরেক, চলুন, একটু চারপাশ ঘুরে আসি।"
ডেরেক উঠে দাঁড়াল। অর্জুন মিস্টার জোন্সকে বলল, "একটা কথা ভাবতে অবাক লাগছে, এত বছর ধরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আপনারা কী করে এখানে আছেন ?"
"এজন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক লড়াই করতে হয়েছে। যাঁরা প্রথম এসেছিলেন তাঁদের রাগ, অপমানবোধ তখনকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে এত প্রবল ছিল যে, এই লড়াই করতে তাঁরা দ্বিধা করেননি। এত বছর পরে আমরা নিজেদের অবশ্যই ব্রিটিশ বলি না, কিন্তু ইংরেজ ভাবতে অসুবিধে হয় না। তবে আর কত দিন এই স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে পারব জানি না।"
"আচ্ছা, যদি আপনাদের কেউ ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে চায় ?"
"অসম্ভব! এ-কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে-ইংল্যান্ড আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সেখানে ভুলেও আমরা পা রাখব না। এই প্রতিজ্ঞার কথা এখানকার প্রতিটি মানুষ জানে।" মিস্টার জোন্স দৃঢ় গলায় জানালেন।
ডেরেকের সঙ্গে বেরিয়ে এল অর্জুন। এখন রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে। সবাই অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। অর্জুন লক্ষ করল পথের দু'পাশে কোনও দোকানপাট নেই। প্রশ্ন করতেই

ডেরেক বলল, "ভিলেজ কমিটি এই গ্রামের চারপাশে চারটে দোকান করেছে, যেখানে নিত্যব্যবহার্য সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি থেকে জিনিসগুলো নিয়ে এসে নামমাত্র লাভে বিক্রি করা হয়। লাভের টাকা কমিটি গ্রামের উপকারেই খরচ করে। এখানে কেউ ব্যক্তিগত ব্যবসা করে না।"

"তা হলে মানুষ টাকাপয়সা পায় কী করে?"

ডেরেক অবাক হল, "কেন? প্রতিটি পরিবার যে যেমন শ্রম দিচ্ছে তেমন অর্থ কমিটির কাছ থেকে পেয়ে যায়। তা ছাড়া মুরগি, ডিম, শূকর থেকে শুরু করে কম্বল পর্যন্ত কমিটির মাধ্যমে বাইরে বিক্রি করা হয়। সেই বিক্রির টাকা আমরা পাই।"

অর্জুনের মনে হল এইরকম সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন পৃথিবীর কিছু মানবদরদী দেখেছিলেন, যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে ধনী-দরিদ্র বলে কিছু নেই?"

"দরিদ্র কেউ নেই, তবে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত আছে।"

"কীরকম?"

"যারা কম পরিশ্রম করে, একটু অলস, তাদের রোজগার কম। এ ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণীভেদ এখানে নেই।" ওরা চার্চের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ক্যামেরায় ছবি তুলতে দেখল অর্জুন। ভদ্রলোক তারই ছবি তুলছেন। ডেরেক হাত নাড়ল। ছবি তুলে বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে কাছে এগিয়ে এলেন।

ডেরেক বলল, "ইনি আমার কাকা। ছবি তোলা ওঁর শখ। এঁর তোলা ছবি মিস্টার সোমের কাছে আপনি দেখেছেন। এঁর নাম অর্জুন।"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "শুনেছি, শুনেছি।"

বয়স হয়ে গেলে কোনও-কোনও মানুষের চেহারা বেশ সুন্দর হয়ে ওঠে। এই মানুষটি সেই ধরনের। মুখে শিশুদের মতো সারল্য আছে, যদিও পাকা গোঁফজোড়া খুবই মজাদার। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বললেন, "তা হলে তুমিও আমাকে আঙ্কল বলো।"

করমর্দন করে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে কি আমি বিরক্ত করতে পারি?"

"বিরক্ত বলছ কেন? যদি প্রয়োজন হয় স্বচ্ছন্দে বলতে পারো। এতদিন আমাদের এখানে বাইরের লোকজন তেমন আসত না। কিছু পাহাড়ি আদিবাসী, ওদের কথা আলাদা। তা তুমি এসেছ আমাদের উপকারের জন্যে। তোমাকে তাই বন্ধু ভাবা যেতে পারে।"

"আপনার তোলা একটি ছবিতে দেখেছি চারপাশে পুড়ে যাওয়া গাছপালার মধ্যে একটা বিশাল ডিমের আকৃতির কিছু রয়েছে, যার রং কখনও সাদা ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওই বস্তুটি দেখা যেতে পারে?"

ভদ্রলোক খুব অবাক হলেন, "আমার তোলা ছবিতে দেখেছ?"

ডেরেক উত্তর দিল, "হ্যাঁ আঙ্কল। আমাকে মিস্টার সোম দেখিয়েছেন।"

"অদ্ভুত! আমি তো মনেই করতে পারছি না। আমার সঙ্গে এসো তোমরা। বাড়িতে ওই ছবির কপি আছে; দেখে বলব।" ভদ্রলোক এমনভাবে হাঁটতে লাগলেন, যেন পৃথিবীতে ওই একটাই বড় সমস্যা রয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে ডেরেক বলল, "দেখলেন তো, উনি ফোটোগ্রাফির ব্যাপারে কীরকম পাগল মানুষ।"

আঙ্কল একা থাকেন। পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট বাড়িটির সামনে ফুলের বাগান আছে। ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে গেলে ডেরেক বলল, "ওঁর ছেলেমেয়ে নেই। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকেই ছবি তোলার শখ বেড়ে গেছে। বাড়িতেই ডার্করুম বানিয়ে

নিয়েছেন। বাইরে থেকে ফিল্ম আনিয়ে দেওয়া হয় ওঁকে। ফিল্মের যা দাম বেড়ে গেছে তাতে আমরা চিন্তায় পড়ে গেছি।"

"কেন ?"

"এই বয়সে ওঁর পক্ষে তো পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। ওঁর জমিতে ভিলেজ কমিটি থেকে চাষ করানো হয়। ফলে ওঁর দেখাশোনার দায়িত্ব কমিটিই নিয়েছে। আর কমিটির পক্ষে ওঁকে বলা সম্ভব নয় ছবি কম তুলুন।" ডেরেকের কথা শেষ হতে-না-হতেই বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। তাঁর হাতে বেশ কিছু ছবির প্রিন্ট।

"দ্যাখো তো, এর মধ্যে আমি তো তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

ওরা দেখল। না, সেই ছবিটি নেই। ডেরেক জিজ্ঞেস করল, "আগুনে পুড়ে যাওয়ার যেসব ছবি আপনি প্রিন্ট করেছিলেন তার কিছু কি অন্য কোথাও রেখেছেন ?"

"নো। প্রতিটি বিষয়ের জন্য আমি আলাদা বাক্স ব্যবহার করি। ছবিটা কীরকম ছিল আর-একবার বলো তো ?" বৃদ্ধকে চিন্তিত দেখাল।

অর্জুন বলল, "ওই ছবিতে গাছগুলো পুড়ে গেলেও দাঁড়িয়ে আছে কোনওমতে। কিন্তু একটা আধপোড়া মস্ত গাছের পেটের মধ্যে বিশাল ডিমের আকারে কোনও বস্তু রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছিল। ছবিটা আপনারই তোলা।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "ওইরকম কোনও ছবি আমার কাছে নেই। অথচ প্রতিটি ছবি আমি দুটো করে প্রিন্ট করেছিলাম। এবার মনে পড়ছে ছবিটার কথা। কিন্তু প্রিন্টটা যদি-বা হারিয়ে যায় নেগেটিভ তো থাকবে। সেটাও পাচ্ছি না।"

"কেউ নিয়ে যায়নি তো ?"

"কী বলছ তুমি ? এখানে কেউ কারও অনুমতি না নিয়ে ভেতরে ঢোকে না। তা ছাড়া একটা পোড়া গাছের ছবি আর নেগেটিভে কার উৎসাহ হবে ?"

ডেরেক বলল, "কাকা, আমরা কি অর্জুনকে নিয়ে ওই জায়গায় যেতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। চলো।"

গ্রামের মানুষজন, যারা রাস্তায় ছিল, তারা ওদের যাওয়া দেখল। গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পথ ধরে পাহাড়ে উঠতে লাগল ওরা। বৃদ্ধ হাঁটছেন ধীরে-ধীরে কিন্তু তাঁর পাহাড় ভাঙতে কষ্ট হচ্ছিল না। অনেকটা ওপরে ওঠার পর অর্জুন নীচের দিকে তাকিয়ে গ্রামটাকে দেখতে পেল। এমন সুন্দর ছবি শুধু বিদেশের সিনেমায় দেখা যায়।

প্রায় চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর ওরা সবাই যখন একটু ক্লান্ত তখন সেই পোড়া জায়গাটা এসে গেল। বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী ! এরকম তো ছিল না।"

একটা ভলিবল কোর্টের মতো জায়গা জুড়ে ছাই কাদা-কাদা হয়ে আছে বৃষ্টির জল পড়ায়। কোনও পুড়ে যাওয়া গাছ দাঁড়িয়ে নেই। সেই আধপোড়া গাছটাকে যেন কেটে একেবারে ছোট করে দেওয়া হয়েছে। তার ভেতরে ডিমের আকারে যে বস্তু ছিল তার কোনও হদিস এখানে নেই।

ওরা তিনজন জায়গাটাকে ঘুরে-ঘুরে দেখল। অর্জুনের মনে হল আগুনে পুড়ে গেলে এবং তারপর বৃষ্টির জল পড়লে যে অবস্থা হয় তাই হয়েছে। গাছের সঙ্গে গাছের ঘর্ষণ লাগলে যে আগুন জ্বলে, তা এখন হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে আর গাছগুলোও স্যাঁতসেতে হয়ে আছে। কোনও মানুষই ইচ্ছে করে আগুন জ্বালিয়েছে। আর এত দূরে পাহাড়ের গাছগাছালিতে আগুন জ্বালানোর একমাত্র উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। এই মতলব যাদের, তাদের সঙ্গে মধ্য এশিয়া থেকে আসা মানুষদের কোনও সম্পর্ক আছে কি না তা কে জানে !

বৃদ্ধ এরই মধ্যে জায়গাটার ছবি তুলছিলেন। অর্জুন লক্ষ করল কাদা হয়ে যাওয়া ছাইয়ে কোনও মানুষের পায়ের দাগ নেই। অর্থাৎ কেউ এখানে পা ফেলেনি। যে গাছটাকে মুড়িয়ে কাটা হয়েছে তার কাছাকাছি তো দাগ থাকা উচিত। গাছটা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক কারণে কাটা পড়েনি ! বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর পাথরের গায়ে ঘষটানোর চিহ্ন নজরে পড়ল অর্জুনের। যেখানে চিহ্নটা, সেখানে কাদা হয়ে যাওয়া ছাই লেগে রয়েছে। সে চিহ্নটার কাছে পৌঁছে এ-পাশে ও-পাশে তাকাতে লাগল ! এই সময় ডেরেক তাকে ডাকল।

জায়গাটা দেখে রেখে অর্জুন ফিরে এল। বৃদ্ধ বললেন, "আমি এবার নিশ্চিত এখানকার ছবি তুলে নিয়ে যাওয়ার পর কেউ বা কারা অবশ্যই এখানে এসেছিল। আমি যেমনটি দেখে গিয়েছি তার সঙ্গে কোনও মিল নেই এখন।"

"আপনাদের গ্রামের কোনও-কোনও মানুষই হয়তো কৌতূহলে এখানে এসেছিল।"

"না। তেমন হলে তারা ফিরে গিয়ে বলত।" বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

"আপনি কি বলতে চাইছেন আপনাদের সবাই বিশ্বস্ত ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আপনি কী বলতে চাইছেন ?" ডেরেকের মুখ শক্ত হয়ে গেল।

"পৃথিবীর সর্বত্রই বিশ্বাসঘাতকেরা বাস করে।"

দ্রুত মাথা নাড়ল ডেরেক, "অর্জুন ! আপনি খুব ভুল করছেন। কয়েকশো বছর ধরে আমরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে এখানে বাস করছি। আপনার অভিজ্ঞতা অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু আমাদের একতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা মানে আমাদের অপমান করা। এই কথাটা ভবিষ্যতে মনে রাখবেন।"

"খুব ভাল লাগল শুনে। তবু আমি যেটা বলেছি সেটা মিথ্যে নয়।"

"আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে ?" বলেই ডেরেক হাত নাড়ল, "গতকাল এখানে আমার আগে আপনি আমাদের অস্তিত্ব জানতেনই না। এখানে আসার পর চার-পাঁচজনের বাইরে কারও সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি। অথচ আপনি আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক আবিষ্কার করে ফেললেন। এই যদি আপনার তদন্তের চেহারা হয়, তা হলে বুঝব মিস্টার সোম আপনাকে পাঠিয়ে ভুল করেছেন।"

"ডেরেক, আমার জায়গায় মিস্টার সোম থাকলে একই কথা বলতেন।"

উত্তেজিত হয়ে ডেরেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ বাধা দিলেন, "আহা, অকারণে ও কেন এ-ধরনের কথা বলতে যাবে ? ওর কারণগুলো আগে শোনো।"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ আঙ্কল, কারণ নিশ্চয়ই আছে। তবে সেটা এখনই আমি বলতে চাই না। কে জানে, হয়তো সেটা বললে বিশ্বাসঘাতকেরা সাবধান হয়ে যেতে পারে।"

ডেরেক চিৎকার করল, "মাই গড। আপনি আমাদেরও সন্দেহ করছেন ?"

"অপরাধীকে খুঁজে বের করার আগে কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন মিস্টার ডেরেক।"

বৃদ্ধ বললেন, "ঠিক, ঠিক কথা। চলো গ্রামে ফেরা যাক।"

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর নীচের হলঘরে শিশুদের নিয়ে মায়েরা জড়ো হলেন। তাদের বাবা এবং অন্যরা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এগারোটি শিশুকে একসঙ্গে দেখলে আলাদা ছবি তৈরি হয়। দুই বা দুইয়ের কাছাকাছি বলে প্রত্যেকেই স্বচ্ছন্দ।

নিজেদের মধ্যে যে হল্লা জুড়েছে, তা তাদের মায়েরা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। মিসেস বেনসন বললেন, "এই এগারোজনের কথাই বলেছিলাম।"

অর্জুন প্রতিটি বাচ্চাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। স্বাভাবিক হইচই করা শিশু। কেউ একটু বেশি দুরন্ত এই যা! একটি বাচ্চা অবশ্য বেশি চুপচাপ। গম্ভীর মুখে অন্যদের দুষ্টুমি দেখছিল। অর্জুন ওর কাছে গেল। হাঁটু মুড়ে বসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?" প্রশ্নটি অবশ্যই ইংরেজিতে।

শিশুটি অর্জুনকে দেখল। ঠোঁট টিপল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

তার মা বোঝাতে লাগলেন, "কথা বলো। নাম জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে হয়।"

শিশুটির কানে সেসব ঢুকল না।

অর্জুন হেসে বলল, "মনে হচ্ছে ও কথা বলতে পারে না। তাই না?"

শিশু মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল। তার মা চিৎকার করে উঠলেন, "ওরে দুষ্টু, কী পাজি রে তুই! বাড়িতে বকবক করে আমার মাথা খারাপ করে দিস, আর এখন বেশ বলে দিলি কথা বলতে পারছিস না!"

এসব সত্ত্বেও শিশুটির মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

মিস্টার জোন্স এসে দাঁড়ালেন পাশে। অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি এইসব মা-বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

"অবশ্যই। সেই কারণেই এখানে ওঁরা এসেছেন।"

অর্জুন তাকাল, "ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলারা, আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। গত কয়েকদিন ধরে আপনারা যে উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন সেকথা আমি জেনেছি। হ্যাঁ, উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিদেশিরা কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, আপনাদের শিশুদের কেন তারা দেখতে চাইছে, তা আমি এখনও জানি না। তাই আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। আমি মিস্টার জোন্সকে অনুরোধ করছি তিনি যেন এই এগারোটি শিশু এবং তাদের মায়েদের এই ভিলেজ সেন্টার হলে আগামী কয়েকদিন থাকার ব্যবস্থা করেন। জানি, এইভাবে নিজের বাড়ি ছেড়ে এখানে থাকতে আপনাদের অসুবিধে হবে। কিন্তু যদি আপনারা মানিয়ে নেন কয়েকদিনের জন্য, তা হলে নিরাপদ থাকবেন। বন্যায় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষ প্রয়োজনে বাসস্থান ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়, এ-ও তেমনই।"

সঙ্গে-সঙ্গে গুনগুনানি শুরু হয়ে গেল। অর্জুনের প্রস্তাব মায়েদের যে পছন্দ হচ্ছে না—তা স্পষ্ট। কেউ নিজের বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এখানে চলে আসতে চাইছেন না। কিন্তু মিসেস বেনসন ওঁদের বোঝাতে লাগলেন। স্বামীরাও আলোচনায় যোগ দিলেন। শেষপর্যন্ত ঠিক হল, দিনসাতেক তাঁরা, অর্থাৎ শিশুদের নিয়ে মায়েরা এখানে থাকবেন। আর সেই সময় স্বামীরা পালা করে দিনরাত এই ভিলেজ সেন্টার পাহারা দেবেন।

মিস্টার জোন্সের কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নিজের ঘরে উঠে এল। কাল রাত্রে সে ভাল করে দেখেনি, আজ জানলাটা নজরে এল। বেশ বড় জানলা। অনেকটা পাহাড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সে জানলার কাছে সরে এসে পাল্লা খুলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকে পড়ল। অর্জুন দেখল জানলায় কোনও গ্রিল বা শিক নেই। কাঠও তেমন মজবুত নয়। বুদ্ধিমান আগন্তুকের কোনও অসুবিধে হবে না বাইরে থেকে এ-ঘরে ঢুকতে। মিস্টার জোন্সকে বলতে হবে মায়েরা যে ঘরে শিশুদের নিয়ে থাকবেন, সেটার জানলা পরীক্ষা করতে।

অর্জুন তার ডায়েরি বের করল। এখানে আসার পর যা-যা দেখেছে এবং শুনেছে তা পরপর লিখল। লেখার পর তার মনে হল, বাচ্চাগুলোকে এক জায়গায় এনে একটু ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে। যারা ওদের দেখতে চায়, তারা এখানে এলেই দেখতে পাবে একসঙ্গে। নইলে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে খুঁজতে হত। বাইরের লোকের পক্ষে জানান না দিয়ে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রামের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার পক্ষে খুবই সহজ কাজটা। আসলে বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে শিশুদের বাঁচাবার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া। মুশকিল হল, ডেরেক ভাবতেই পারছে না এই গ্রামে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে!

এই সময় পল ঢুকল চা নিয়ে, "গুড আফ-আফ-আফটারনুন।"

"গুড আফটারনুন। আমি দুঃখিত, তোমার চাপ বাড়িয়ে দিলাম।"

পল হাসল, "না, না। চাপ কিসের! মিসেস বেন-বেন-বেনসন আরও দু'জনকে দিয়েছেন আমাকে সাহায্য করার জন্যে। কেমন লাগছে এখানে?"

"ভাল। খুব ভাল জায়গা। তোমরাও খুব ভাল।" চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অর্জুন জানলায় গেল। নীচে রাস্তার একাংশ দেখা যাচ্ছে। দু'-একজন মানুষ যাতায়াত করছে। হঠাৎই অর্জুনের নজর পড়ল লোকটির ওপর। তার চিনতে ভুল হয়নি। গত রাতের দ্বিতীয় লোকটি। সে দ্রুত হাত নেড়ে পলকে ডাকল। পল কাছে আসতেই সে জিজ্ঞেস করল, "ওকে চেনো তুমি? কী নাম ওর?"

"ওঃ। ও হল এ-এ-এ-এড। আমাদের জামা-প্যান্ট সেলাই করে দেয়।"

"লোকটাকে দেখলে খুব ভাল মনে হয়?"

"মিস্টার জো-জো-জোন্স ওর ব্যাপারটা ভাল জানেন।"

চা খাওয়া হয়ে গেলে একটা পুলওভার আর মাফলার জড়িয়ে নীচে নামল অর্জুন। জিনিসপত্র নিয়ে মায়েদের আসা শুরু হয়েছে তখন। মিস্টার স্মিথ আর ডেরেক তাঁদের থাকার ব্যবস্থা তদারকি করছেন। ডেরেক তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, "আমি বুঝতে পারছি না অর্জুন, এটা আপনি কেন করলেন! এর ফলে আতঙ্ক আরও বাড়বে।"

"আতঙ্কিত মানুষেরা বেশি সজাগ হয়, তাই না?"

"আমি একমত নই।" মিস্টার জোন্স বললেন, "আপনাকে যখন ডেকে এনেছি তখন আপনার ওপর ভরসা রাখতেই হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা মিস্টার সোমকে চেয়েছিলাম, তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন।" ডেরেক গম্ভীর মুখে বলল।

"তা হলে আপনি আমার ফেরার ব্যবস্থা করে দিন।"

ডেরেক শক্ত মুখে বলল, "আমি যে সেটা করতে পারি না তা আপনি ভাল করে জানেন।"

"আপনি কি এখানে খুবই ব্যস্ত?"

"কেন?"

"একটু যদি আমায় সঙ্গ দিতেন?"

ডেরেক ফিরে গিয়ে, বোধ হয়, মিস্টার স্মিথের অনুমতি নিয়ে এল।

রাস্তায় বেরিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের জামাপ্যান্ট নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কেনেন না! এখানে কি ফ্যাক্টরি আছে?"

"হ্যাঁ, আছে। ছ'জন কর্মী রোজ সেই কাজটা করে থাকেন।"

"আমি সেই ফ্যাক্টরিতে যেতে চাই।"

ডেরেক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"এমনি, ধরে নিন শুধুই কৌতূহল।"

ডেরেক কাঁধ নাচাল। পুরোটা পথ ওরা কেউ কথা বলল না। একতলা, বিশাল হলঘরের মতো একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ডেরেক বলল, "এর কথা বলছিলাম।"

প্রথমেই একটা অফিসঘর গোছের। সেখানে একটি তরুণ

খাতায় কিছু লিখছিল। ডেরেক বলল, "গ্রামের যারই জামাপ্যান্ট দরকার হয় এখানে এসে অর্ডার দেয়। প্রত্যেকের মাপ এখানে লেখা আছে। কারও মাপ পালটে গেলে নতুন করে মাপ দিতে হয়। প্যান্ট-শার্টের কাপড়ও এখানেই পছন্দ করে খদ্দেররা। মেয়েদের পোশাকের কারখানা আলাদা, আপনি কি সেখানেও যেতে চান?"

"আগে এই জায়গাটা দেখি।"

ডেরেক ছেলেটিকে বলতেই সে ওদের ভেতরে নিয়ে গেল। এলাহি ব্যবস্থা। লম্বা টেবিলের ওপর সেলাইয়ের মেশিন রাখা আছে। তিনজন কর্মী এখনও কাজ করে চলেছেন। জোরালো আলো জ্বলছে। এই গ্রামের সমস্ত পুরুষের পোশাক সরবরাহ করতে এদের সারা বছরই কাজ করতে হয়।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি বলছিলেন ছ'জন কর্মী এখানে কাজ করেন?"

"হ্যাঁ।"

"এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে কে আছেন?"

"এড-এডওয়ার্ড!" ডেরেক ঘুরে দাঁড়িয়ে তরুণকে জিজ্ঞেস করল, "এড কোথায়?"

তরুণ জবাব দিল, "একটু আগে উনি বাড়ি চলে গেছেন।"

ডেরেক বলল, "আপনার যা জানার এদের কাছ থেকে জানতে পারেন।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে, চলুন।"

বাইরে বেরিয়ে এসে ডেরেক প্রশ্ন করল, "আমি বুঝতে পারছি না আপনার তদন্তের সঙ্গে আমাদের পোশাক তৈরির কারখানার কী সম্পর্ক থাকতে পারে?"

অর্জুন হাসল, "এমন তো হতে পারে আপনাদের শার্ট-প্যান্টের স্টাইল আমার এত ভাল লেগেছে যে, আপত্তি না থাকলে আমার জন্যে বানিয়ে নিতে চাই।"

ডেরেক মাথা নাড়ল, "আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

তখন সন্ধে নামছিল। হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার এডওয়ার্ডের সেলাইয়ের হাত খুব ভাল, তাই না?"

"উঁহু। এড ভাল কাটার। ও কেটে দেয়, সেলাই করে অন্যরা।"

"উনি এটা শিখলেন কী করে?"

"ওঁর বাবার কাছ থেকে।"

"মানুষটা কীরকম?"

"কেন বলুন তো?"

"এত ভাল কাজ জানেন অথচ এই গ্রামেই পড়ে আছেন। শিলিগুড়ি তো কোন ছার, কলকাতায় গেলে বড়-বড় দোকান ওঁকে লুফে নেবে।"

"আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমরা এই গ্রামের বাইরে যেতে ভালবাসি না। তবে এড একটু রগচটা মানুষ। ভিলেজ কমিটি ওকে একবার শাস্তি দেওয়ার কথা ভেবেছিল। ওর স্ত্রী ক্ষমা করে দেওয়ায় ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে।"

"কী ব্যাপার?"

"স্ত্রীকে অযথা মারধোর করত। পান থেকে চুন খসলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। স্ত্রী ওর কাছ থেকে চলে যেতে চায় বলে ভিলেজ কমিটির কাছে আবেদন করায় ও মারধোর করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভদ্রমহিলাই ক্ষমা করে দেন।"

"উনি কি এখন এডের সঙ্গেই আছেন?"

"না। ওরা আলাদা হয়ে গিয়েছে।"

"যদি ওর স্ত্রী ক্ষমা না করতেন তা হলে কী শাস্তি হত?"

"অপরাধের গুরুত্ব বুঝে। যেমন, প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় এমন কাজ ওকে কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই করতে হত পাঁচ বছর ধরে।"

"যদি এড সেটা মেনে না নেয়?"

"না নিয়ে উপায় নেই।"

"যদি এখান থেকে পালিয়ে যায়?"

"আজ পর্যন্ত তেমন ঘটনা ঘটেনি।"

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল, "ডেরেক, আজ পর্যন্ত তেমন ঘটনা ঘটেনি বলে আপনারা যদি ভেবে থাকেন কখনও ঘটবে না তা হলে খুব ভুল করবেন। এই এড লোকটিকে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে। ওর বাড়িতে যাওয়া যেতে পারে?"

ডেরেক মাথা নাড়ল। হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "আমার মনে হচ্ছে আপনি তদন্ত করতে এসে অকারণে সময় নষ্ট করছেন! প্রায় একদিন হয়ে গেল কিন্তু আপনার কাজ একটুও এগোয়নি।"

অর্জুন হাসল, কিছু বলল না।

এডওয়ার্ডের বাড়িটির গায়ে অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। রাস্তা থেকে নেমে বন্ধ দরজায় শব্দ করল ডেরেক। দ্বিতীয়বারে দরজা খুলল এড। চোখ-মুখে অবাক হওয়া স্পষ্ট।

"কী ব্যাপার ডেরেক?"

"ইনি অর্জুন, আমাদের অতিথি। আপনার কারখানায় গিয়েছিলেন। আমাদের জামাপ্যান্ট দেখে ওঁর খুব ইচ্ছে হয়েছে নিজের জন্যে কিছু তৈরির।" ডেরেক বলল।

এড বলল, "অনেক ধন্যবাদ আপনার ইচ্ছের জন্যে। তবে আমরা বাইরের লোকের জন্যে কিছু তৈরি করি না। অবশ্য ভিলেজ কমিটি যদি আদেশ দেয় তা হলে আপত্তি নেই।"

অর্জুন লক্ষ করল এড তাদের ভেতরে যেতে বলছে না। সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনার পূর্বপুরুষরা কি একই কাজ করতেন?"

"হ্যাঁ। আমি যতদূর জানি ওঁরা একই প্রফেশনে ছিলেন।"

"ইংল্যান্ডে কোথায় আপনার বাড়ি ছিল?"

ডেরেক বাধা দিল, "সরি অর্জুন। আমরা ওই ইতিহাস মনে করতে চাই না।"

"তাই? কিন্তু এড, যদি আপনি সুযোগ পান ইংল্যান্ডে যাওয়ার তা হলে কী করবেন?"

এড বলল, "আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

"এই ধরুন, আপনারা এখন এক্সপোর্ট করছেন। ধরা যাক, ভিলেজ কমিটি ঠিক করল এক্সপোর্টের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে আপনাকে ইউরোপে পাঠাবে। যাবেন?"

"কমিটি আমাকে পাঠাবে না।"

"কেন?"

"কারণ ওই ব্যাপারটা আমি বুঝি না।"

"বেশ। হঠাৎ আপনি এক লক্ষ টাকা পেয়ে গেলেন। তখন কি যাবেন?"

"না। আমার পূর্বপুরুষেরা ঠিক করেছিলেন ও-দেশে তাঁরা ফিরে যাবেন না। সেই সিদ্ধান্ত আমাকে মেনে নিতে হবে।"

"কিন্তু আপনাদের পূর্বপুরুষদের অনেক সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এটা প্রমাণিত হয়েছে।"

"আগে তাদের ভুলটা আমার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হোক।"

"ও। আপনি তো একাই থাকেন। রাত্রে কী করেন?"

"বাড়িতেই থাকি।"

"গত রাত্রে কোথায় ছিলেন?"

"গত রাত্রে? ও, আমার এক বন্ধু খুব ধরেছিল তাই ওর সঙ্গে একটু পাবে গিয়েছিলাম।"

"পাব?"

"আমাদের এখানে পানীয় খাওয়ার একটা দোকান আছে। সবাই আড্ডা মারে সেখানে।"

"ও। আপনার বন্ধুর নাম কী?"

"চার্লস।"

"খাটাখাটুনির পর একটু আড্ডা মারা ভাল। আজ বের হবেন না ?"

"না। আজ বাড়িতেই থাকব।"

"অনেক ধন্যবাদ। দেখুন, যদি ভিলেজ কমিটি অনুমতি দেয় তা হলে আপনার তৈরি শার্ট-প্যান্ট নিয়ে যেতে পারব। আচ্ছা, ও দুটো তৈরি হতে কীরকম সময় লাগবে ?"

"ঘণ্টাচারেক বড়জোর।" এড হাসল।

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা ফিরে আসছিল। খানিকটা আসার পর নিরিবিলি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল অর্জুন, "ডেরেক, এই চার্লসকে আপনি কীরকম চেনেন ? ওর সম্পর্কে সব তথ্য জানেন ?"

"আমাদের গ্রামটা এত ছোট সবাই সবার সম্পর্কে মোটামুটি জানে। চার্লসকে নিয়ে আপনি চিন্তিত হলেন কেন ?"

"ওর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়া দরকার ?"

"দেখুন অর্জুন, হাতের সব আঙুল যেমন সমান হয় না, এই গ্রামের সব মানুষ তেমনই এক ধাতে গড়া নয়। চার্লস একটু কুটিল প্রকৃতির মানুষ। কারও ভাল সে সহ্য করে না। সবসময় মনে করে লোকে তাকে মর্যাদা দিচ্ছে না। এই ধরনের মানুষ নিজে যেমন সুখী হয় না তেমনই অন্যকেও সুখী করতে চায় না।" ডেরেক বলল।

"স্বাভাবিক।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"কিন্তু পাহাড়ের আগুন অথবা বিদেশিদের সঙ্গে চার্লসের কোনও সম্পর্ক নেই।"

"তা তো হবেই। কারণ উনি তো কখনওই এই গ্রামের বাইরে যাননি, তাই তো ?"

"হ্যাঁ।"

"ডেরেক, আপনি এবার আপনার কাজে যেতে পারেন। আমি একটু একা ঘুরতে চাই। ডিনারের আগেই আমি ভিলেজ সেন্টারে ফিরে যাব।" অর্জুন বলল।

ডেরেক তাকাল। তারপর লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল।

দু' পকেটে হাত পুরে অর্জুন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। গোটা পাঁচেক বাচ্চা ছেলে হইহই করতে-করতে ওপর থেকে নেমে আসছে। ওরা তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। ছেলেগুলোর হাতে বই। স্কুলের পড়ুয়া ওরা, সন্দেহ নেই। অর্জুন হেসে উঁচু গলায় বলল, "হ্যালো।"

পাঁচজনেই ঠোঁট নাড়ল, কিন্তু শব্দ শোনা গেল না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা সবাই কোন ক্লাসে পড়ো ?"

পাঁচজন পরস্পরের দিকে তাকাল। শেষপর্যন্ত একজন বলল, "আমরা গ্রামার পড়ি, এসে লিখি এবং প্রাথমিক অঙ্ক করি।"

ছেলেটি বলামাত্র বাকিরা হইহই করে আগের মতো ছুটে নীচে নেমে গেল অর্জুনের পাশ দিয়ে। অর্জুনের ভাল লাগল। অর্থাৎ, এখানে ওয়ান টু করে ক্লাস সিস্টেম নেই। কিন্তু এই যে গ্রামার ওরা পড়ছে, পাচ্ছে কোথায় ?

অর্জুন দেখল সন্ধে হয়ে গিয়েছে। ঝুপ-ঝুপ করে নামছে অন্ধকার আর গ্রামের লাইট পোস্টের আলোগুলো জ্বলে উঠছে পরপর। সে পেছন ফিরল। হাঁটতে-হাঁটতে এডওয়ার্ডের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ও দাঁড়িয়ে গেল। এডওয়ার্ডের বাড়ির দরজা বন্ধ, যেমনটি আগে ছিল। লোকটা বলেছে আজ রাত্রে সে বাড়িতেই থাকবে।

অর্জুন ধীরে-ধীরে নীচে নেমে এল। বাড়িটার গায়ে দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ রয়েছে, পাশাপাশি। সে গাছ দুটোর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। চট করে বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। অর্জুনের বিশ্বাস, আজ এডওয়ার্ডের কাছে সেই চার্লস লোকটা অবশ্যই আসবে। চার্লস কী বলে তা শোনা দরকার।

কিছুক্ষণ ইউক্যালিপটাস গাছের আড়ালে থাকার পর অর্জুনের মনে হল, ঘরের ভেতরে কথা বললে সে বাইরে থেকে কিছুই শুনতে পাবে না। বাড়িটার ভেতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু এডওয়ার্ড কোথায় আছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। সে ইউক্যালিপটাসের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাড়িটার পেছনে লম্বা কাঠের বারান্দা রয়েছে। অর্জুন সেই বারান্দায় উঠল। এদিকের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কোনওভাবেই সেটা খোলা যাচ্ছে না।

এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। অর্জুন শুনতে পেল এডওয়ার্ড চিৎকার করল, "কে ?" যে এসেছে সে জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বার শব্দ করল। অর্জুন বারান্দা থেকে নেমে বাড়িটার পাশ দিয়ে এগোল। ইতিমধ্যে দরজা খুলেছে এডওয়ার্ড।

"আরে তুমি ! কী ব্যাপার ?"

"তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"এসো। ভেতরে এসো।" বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। জানলার আলোয় ছায়া পড়ল। অর্জুন বুঝল ওরা পাশের ঘরে এসে বসল। আগন্তুক বলল, "এড, তুমি কি ইংল্যান্ডে যেতে চাও ?"

"আবার এ-কথা কেন ?" এড জিজ্ঞেস করল।

"তোমাকে মনঃস্থির করতে হবে। কারণ বাইরে থেকে কেউ একজন এসেছে যার কথামতো গ্রামের সমস্ত দু' বছরের বাচ্চাদের ওরা ভিলেজ সেন্টারে নিয়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য আমাদের সুবিধে হল। তুমি আর আমি যদি হাত মেলাই তা হলে বাচ্চাটাকে পেতে অসুবিধে হবে না।"

এডের গলা শুনতে পেল অর্জুন, "চার্লস, তোমাকে আমি গতকালই বলেছি ও-ব্যাপারে আমার কোনও উৎসাহ নেই। তা হলে আবার এসব কথা কেন ?"

চার্লস উত্তেজিত হল, "অদ্ভুত মানুষ তুমি ! কোন আশায় এখানে পড়ে আছ, অ্যাঁ ? তোমার সংসার বলে কিছু নেই। এ-গ্রামের মানুষদের জামাপ্যান্ট পরাতে-পরাতে একসময় মরে যেতে হবে। তোমার যা হাত, তাতে লন্ডনের যে-কোনও বড় দরজির দোকান তোমাকে লুফে নেবে। পায়ের ওপর পা তুলে বাকি জীবন থাকতে পারবে তুমি !"

এড তবু আপত্তি করল, "না ভাই, আমার ঠিক সাহস হচ্ছে না।"

"তার মানে তুমি আমার যাওয়া বন্ধ করতে চাও ?"

"না তো ! তুমি তোমার প্ল্যানমতো এগিয়ে যাও।"

"আমার প্ল্যানমতো এগোতে গেলে তোমাকে সঙ্গে রাখা দরকার।"

"কেন ?"

"সব কিছু ম্যানেজ করে আমি না হয় ইংল্যান্ডে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে আমি কী করব ? আমি যা কাজ করি তা ওখানে মূল্যহীন। বেকার হয়ে তো থাকা যাবে না। খাব কী ? তুমি থাকলে আমরা একটা দরজির দোকান খুলতে পারি। কাজ শিখে নিয়ে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। বুঝতে পারছ ?"

"পারছি। কিন্তু ধরা পড়লে কী দুর্দশা হবে ভেবে দেখেছ ?"

"কী আর হবে ? এরা আমাদের তাড়িয়ে দেবে এখান থেকে। জোন্সবুড়ো নিশ্চয়ই থানা-পুলিশ করবে না। বাইরের যে ছোকরাকে ওরা ডেকে এনেছে সে তো পুলিশ নয়।"

"চার্লস !"

"হ্যাঁ।"

"সেই ছোকরা আমার কাছে এসেছিল।"

"তোমার কাছে ? কখন ?"

"তুমি আসার একটু আগে। ডেরেক নিয়ে এসেছিল ওকে।"

"সে কী ! তোমার কাছে কেন এল ?"

"জানি না। বলল তো পোশাক তৈরি করাতে চায় কিন্তু ওর
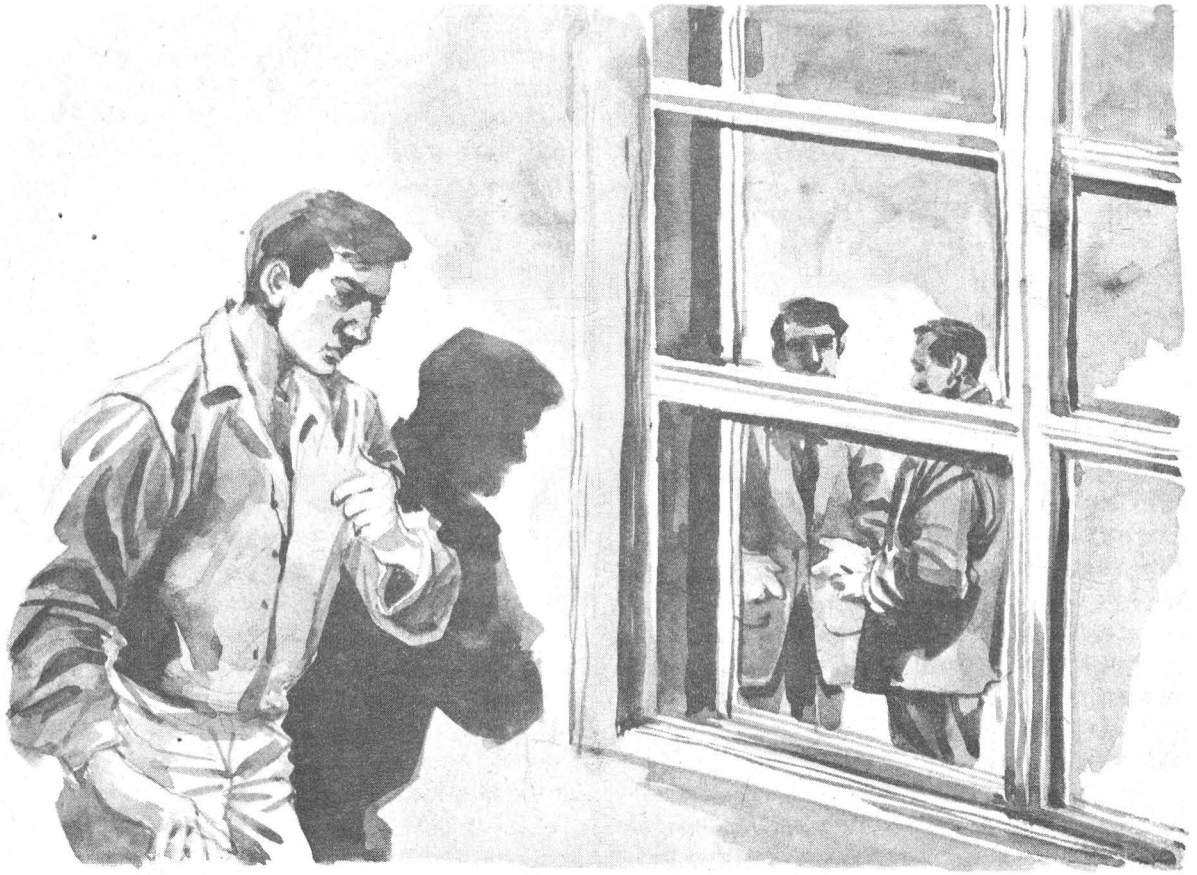
কথাবার্তা অন্যরকম।"

"কী বলেছে তোমাকে ?"

"গত রাত্রে আমি কোথায় ছিলাম, কার সঙ্গে ছিলাম এইসব জিজ্ঞেস করছিল।"

"তাই নাকি ? কী বললে ?"

"বললাম, পাবে আড্ডা মারতে গিয়েছিলাম। তারপর তোমার সঙ্গে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। আমাকে কেন এসব জিজ্ঞেস করল ?"

"হয়তো, এমনি, কৌতূহলে। কিন্তু তুমি আমার নাম বলে দিলে ?"

"আহা, আমরা তো একসঙ্গে পাব থেকে বেরিয়েছিলাম। কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আমাদের দেখেছে। খোঁজ করলে জানবে আমি মিথ্যে বলিনি।"

"বুঝতে পেরেছি। ওই ছোকরা এসেছিল বলে তুমি ভয় পেয়ে গেছ। আরে এত নার্ভাস হলে চলে ? আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আগামী রবিবার ওরা যখন আমাদের গ্রামে আসবে তখন আমরা ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকব। বুঝতে পারছি এরা বাচ্চাদের সামনে বের করবে না। সেরকম হলে আমি পাকদণ্ডী দিয়ে ফেরার পথে ওদের সঙ্গে দেখা করব। ঠিক কোন বাচ্চাটাকে ওরা চায় জেনে নেব। এর মধ্যে তুমি পলের সঙ্গে ভাব জমাও।"

"পল !"

"হ্যাঁ। পলের সঙ্গে তোমার তো সম্পর্ক ভাল। মিসেস বেনসনের মেয়ের সঙ্গে ও বন্ধুত্ব করতে চায়, যেটা ভদ্রমহিলা একদম পছন্দ করেন না। মেয়েটিও পলকে অপছন্দ করে। তুমি এই বিষয়ে সহানুভূতি দেখাও, যাতে পল তোমাকে নিজের লোক মনে করে। আর ওকে হাত করতে পারলে ভিলেজ সেন্টারের যে-কোনও বাচ্চাকে বের করে আনতে অসুবিধে হবে না।"

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। কোনওমতে নিজেকে আড়ালে নিয়ে গেল অর্জুন। বড়-বড় পা ফেলে চলে গেল চার্লস। এড দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এগারোটা বাচ্চা কিছুতেই ঘুমোতে চাইছে না। তাদের মায়েরা খুবই বিব্রত। বড় হলঘরে এগারোটি সুন্দর বিছানা করা হয়েছে। এরই মধ্যে নীচের ঘরে বাচ্চাদের বাবারা পাহারা দিতে চলে এসেছেন পালা করে। বাড়িতে ঢোকার সময় তাঁরা অর্জুনকে যাচাই করে দরজা খুলেছেন। নিজের ঘরে ঢোকার সময় অর্জুন শুনতে পেল, হলঘর থেকে গান ভেসে আসছে। কোনও এক মা ইংরেজিতে ঘুমপাড়ানি গান গাইছেন। পৃথিবীর সমস্ত শিশুদের জন্য তাদের মায়েরা মোটামুটি একই সুরে গান গেয়ে থাকেন।

ডিনার নিয়ে এল পল। ভাবগতিক দেখে মনে হল, সে খুবই ব্যস্ত। বলল, "আজকালকার বা-বা-বাচ্চারা ঘুমোতে চা-চা-চায় না কেন বলো তো ?"

অর্জুন খাওয়া শুরু করল, "আমি জানি না।"

পল চলে যাচ্ছিল, অর্জুন তাকে ডাকল, "তোমার কি খুব জরুরি কাজ আছে ?"

"তা নেই, তবে, মিসেস বেনসনের মেয়ে এ-এ-এলি তো এসব কাজ কখনও করেনি।"

"ওহো, এলি বুঝি তোমাকে সাহায্য করছে ?"

"হ্যাঁ। কি-কি-কিন্তু তুমি কি ওকে চেনো ?"

"একটুও না। তবে তুমি যে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও এবং মিসেস বেনসন সেটা পছন্দ করেন না, তা জানি। কী, ঠিক তো ?"

পল অবাক হয়ে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা পল, কেউ যদি তোমাকে প্রস্তাব দেয় ওই বন্ধুত্বটা করিয়ে দেবে কিন্তু তার বদলে ও যা বলবে তাই করতে হবে, তা হলে তুমি কি রাজি হবে ?"

"কী করতে হবে ?"

"এই ধরো, মাঝরাত্রে ভিলেজ সেন্টারে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, অথবা এগারোটা বাচ্চার একটাকে গোপনে বের করে তার হাতে তুলে দিতে হবে।"

"নো। নেভার।" প্রায় চিৎকার করে উঠল পল, "যে এই কথা বলতে আসবে তা-তা-তাকে মেরে ফেলব আমি।"

অর্জুন বলল, "শুনে খুব খুশি হলাম পল। তোমার খুব ভাল হবে।"

পল দাঁড়াল না। ঝড়ের মতো চলে গেল ঘর ছেড়ে।

আজকের রাতের আকাশ পরিষ্কার। ফলে ঠাণ্ডা পড়েছে জাঁকিয়ে। রাতের খাওয়া শেষ করে নীচে নেমে এল অর্জুন। চারটে চেয়ারে চারজন পুরুষ বসে গল্প করছিল। বাচ্চাদের বাবারা পালা করে পাহারা দিচ্ছেন।এঁরা প্রথম দল। অর্জুনকে দেখামাত্র চারজন উঠে দাঁড়ালেন।

অর্জুন বলল, "আমি আপনাদের কয়েকদিন কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত।"

ওঁরা মাথা নেড়ে না বলে হাসলেন। অর্জুন ওঁদের অনুমতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

আজ সত্যি ছবির মতো দেখাচ্ছে গ্রামটাকে। রাস্তায় অবশ্য লোকজন নেই। হয়তো আগন্তুকদের কারণে যে ভীতি ছড়িয়েছে তা বড়দেরও আক্রমণ করেছে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে আজ। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল অর্জুন। হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা আসার পর সে বাড়িটাকে চিনতে পারল। ডেরেকের কাকার বাড়ি। বাড়িটা এখন অন্ধকার। বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু ওঁর তোলা ছবির বাক্স থেকে নেগেটিভ এবং বিশেষ একটা ছবি চুরি গেল কী করে ?

অর্জুন দাঁড়াল না। হাঁটতে-হাঁটতে সে পাহাড়ে উঠতে লাগল। চাঁদের আলো থাকায় পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে পোড়া জায়গাটায় পৌঁছে গেল। একটু খুঁজতেই সেই পাথরটা পেয়ে গেল, যার গায়ে ঘষটানো দাগ আর কাদার চিহ্ন রয়েছে। দাগটা গিয়েছে ওপর থেকে নিচু পর্যন্ত। অর্থাৎ কোনও ভারী বস্তু ওই পাথরে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়েছে অথবা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু নীচে গভীর খাদ এবং জঙ্গল। অর্জুন খানিকটা নেমে দেখল গাছ থেকে উঠে আসা একটা বড় গাছের ডাল ভেঙে ঝুলছে। অর্থাৎ ভারী বস্তুটি ওখান দিয়েই নীচে পড়েছে।

এখন এই রাত্রে নীচে নামা অসম্ভব ! এই জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী নিশ্চয়ই রয়েছে। তা ছাড়া নামার রাস্তা করে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কিন্তু ছবিতে যেটাকে বিশাল ডিমের মতো মনে হচ্ছিল এবং যেটি অদৃশ্য হয়েছে সেটি যদি ওই ভারী বস্তু হয় তা হলে কে সেটাকে সরাল ? তার কী স্বার্থ ! ঘষটানোর দাগটা দেখে বোঝা যায় প্রচুর শক্তি না থাকলে ওই বস্তুটিকে গাছ থেকে তুলে নিয়ে এসে ওখান দিয়ে ফেলা যেত না।

হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ল ঘড়িটার কথা। আসার আগে অমলদা এটার ক্রিয়াকর্ম বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সে ঘড়ির ঢাকনাটাকে খুলে বোতাম টিপতেই সরু টর্চের আলোর মতো একটা উজ্জ্বল রেখা বেরিয়ে এল। খাদের দিকে সেটা ধরতে রেখাটা নীচে নেমে যেতে লাগল। যত নামছে তত স্পষ্ট হচ্ছে জায়গাটা। যেসব গাছের ডালপাতা ওর যাওয়ার পথে পড়ছিল সেগুলো মুহূর্তেই শুকনো হয়ে সরে যাচ্ছিল দু'পাশে। ওই আলোর রেখা পাথর অথবা মাটি ছাড়া যে-কোনও শক্ত বস্তুকে ভেদ করতে সক্ষম। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে অর্জুন রেখাটাকে নিয়ে যেতে পারল সেই ডিমের আকারের বস্তুটির গায়ে। স্পর্শ লাগতেই মনে হল শক্ত বস্তুটির একাংশে চিড় ধরল। আর তখনই মাথার ওপরে গুম-গুম শব্দ বাজল। অর্জুন দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে আলোর রেখা নিভিয়ে দিয়ে পাহাড়ের খাঁজে সরে এল। আর এই তাড়াহুড়োতে ঘড়ির ঢাকনাটা বন্ধ করতে ভুলে গেল সে।

আওয়াজটা যে কোনও যন্ত্রের তা বোঝা যাচ্ছে। একসময় আওয়াজটা থেমে গেল। এই গভীর জঙ্গলে ডেরেকদের গ্রাম থেকে কেউ এত রাত্রে নিশ্চয়ই কোনও যন্ত্র নিয়ে বেড়াতে আসবে না। আর তখনই চারপাশ আলোকিত হয়ে গেল। কাছাকাছি কোথাও আগুন জ্বলছে। পুড়ে যাচ্ছে গাছপালা। শব্দ হচ্ছে পোড়ার। হঠাৎই অর্জুন ওদের দেখতে পেল। তরতর করে নেমে আসছে চারটে মূর্তি। আকৃতি বেশ ছোট। এখন আগুনের কল্যাণে চারপাশ দিনের মতো স্পষ্ট কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের মুখ-চোখ ভাল করে দেখতে পেল না সে। অতি দ্রুত ওরা নেমে গেল খাদের মধ্যে। যেন ওই পথ ওদের খুব চেনা।

অর্জুন একবার ভাবল ওদের অনুসরণ করবে। কিন্তু সেটা একটু দুঃসাহসিক হয়ে যাবে। বরং অপেক্ষা করাই ভাল। ওদের উঠে আসতে হবে এই পথ দিয়ে। তারপরই মনে হল ওপরে গিয়ে দেখলে কেমন হয় ? এই লোকগুলোর আসার সঙ্গে শব্দটার যোগাযোগ আছে। অর্জুন সন্তর্পণে বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে সে আগুনের শিখা দেখতে পেল। হু-হু করে জ্বলছে জঙ্গল। ডেরেকরা ওদের গ্রাম থেকে এই আগুন দেখতে পায়। আর একটু এগোলে নিজেকে আড়াল করার কোনও সুযোগ থাকবে না। চারজন নীচে গিয়েছে, ওপরে কতজন রয়েছে কে জানে ! এবং ওরা নিছক চড়ুইভাতি করতে রাতদুপুরে এখানে আসেনি।

হঠাৎ নীচে একটা চিৎকার শোনা গেল। অর্জুন দ্রুত সরতে যেতেই তার পা পিছলে গেল। সরসর করে অনেকটা নীচে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল তার শরীরটা। পড়ার সময় কাঁটাজাতীয় কিছু ফুটে গেল হাতে, কাঁধে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে রইল। তার পড়ার সময় শব্দ হয়েছে। অবশ্য আগুনে গাছ পোড়ার আওয়াজ ছাপিয়ে সেই শব্দ কারও কানে গিয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ সেই শব্দটা বাজল। তারপর ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল সেটা।

অর্জুন মাথা তুলল। শরীরটাকে সোজা করা যাবে না। পায়ের সামান্য চাপেই নুড়ি গড়িয়ে পড়ছে। সে একটু বাঁ দিক ঘেঁষে ওপরে উঠতে যেতেই পায়ের তলার পাথর সরে গেল। সরসরিয়ে নেমে যাচ্ছিল সে। প্রচণ্ড আঘাত লাগছে পাথরে। শেষপর্যন্ত দু' হাতে একটা পাথর আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলাতে পারল সে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে মনে হল আগুন অনেক কম এখন। অথবা যেখানে আগুন জ্বলছিল সেখান থেকে অনেক নীচে নেমে এসেছে সে। সমস্ত শরীর জ্বলছে। রক্ত বেরিয়ে গেছে কোথাও-কোথাও। সে ঘড়িটার দিকে তাকাল। ঢাকনাটা নেই। এটা কী করে হল ? ঢাকনাটা বন্ধ থাকলে সেটা না ভাঙার কথা। তা হলে কি কোনও কারণে ওটা খুলে গিয়েছিল ? ও বোতামটা টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে আলোর রেখা বেরিয়ে এল। না, এখনও এটা ঠিক রয়েছে। হাত থেকে খুলে ঘড়িটাকে পকেটে রাখল অর্জুন।

এখন মনে হচ্ছে, তখন ওই আড়াল থেকে না বেরিয়ে এলেই ভাল হত। এই দুর্ঘটনায় সে না পারল লোকগুলোকে দেখতে, না ওই আওয়াজটা কিসের তা বুঝতে। এখন ওপরে উঠতে হবে। হঠাৎ খেয়াল হল লোকগুলো খাদে নেমেছিল। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে খাদের নীচটা বেশি দূরে নয়।

ধীরে-ধীরে নীচে নামতে লাগল অর্জুন। গাছের ঘন ছায়ায় ঝোপঝাড় ক্রমশ অন্ধকার টেনে আনছিল। অর্জুন পকেট থেকে ঘড়িটা বের করল। মাটির দিকে সেটার মুখ করে সুইচ টিপতেই আলোর রেখা বের হল। কিন্তু যেখানেই আলো পড়ছে সেই জায়গাটা ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে টুকরো-টুকরো হয়ে। এতে অবশ্য যথেষ্ট আলো পাওয়া যাচ্ছে নীচের দিকে যাওয়ার জন্য। হঠাৎ কিছু একটা শব্দ করতেই অর্জুনের হাত সেদিকে ঘুরল। একটা মোটা কালো সাপ ফণা তুলতেই আলোর রেখা ওর শরীরে পড়ল। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল সাপটা গলে মাটিতে পড়ে গেল নিঃসাড়ে।

অনেকটা নামার পর মাটি যখন প্রায় সমতল তখন অর্জুন চারপাশে খুঁজল। সেই ডিম্বাকৃতি বস্তুটি কোথায় পড়েছে তা হাজার খুঁজেও বের করতে পারত না সে এই ঘন জঙ্গলের অন্ধকারে। যদি অমল সোম এই ঘড়িটা না দিতেন? এগোতে-এগোতে একসময় সে দাঁড়িয়ে গেল। বস্তুটাকে দেখতে পাচ্ছে সে। আলোর রেখা সচেতনভাবে বস্তুটির ওপর না ফেলে সে কাছে পৌঁছে গেল কোনওমতে। গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল।

ডিম্বাকৃতি বলে যাকে মনে হয়েছিল ছবি দেখে, সামনাসামনি অর্জুন বুঝতে পারল অমল সোমের ভুল হয়নি। কিন্তু এ কেমন ডিম? এত বড় এবং এত শক্ত খোলস? বস্তুটির একপাশে চিড় ধরছে। সম্ভবত তার ভেতর দিয়ে ভেতরে হাওয়া ঢুকছে। সেই হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে ভেতরে ঘুমন্ত কিছু এখন নড়তে শুরু করেছে। এটা বোঝা যাচ্ছে বস্তুটি এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই বলে। ওর ভেতরে একটা কিছু মোচড় না দিলে এভাবে নড়তে পারে না। অর্জুন অনেক চেষ্টা করেও ভেতরটা দেখতে পেল না।

লোকগুলো কি এখানে এসে এই নড়াচড়া দেখে ভয়ে চিৎকার করেছিল? ওর খুব লোভ হচ্ছিল বস্তুটির ওপর আলোর রেখাটাকে রাখতে। একটু বেশি সময় রাখলে হয়তো ওর শক্ত খোলস ফেটে যাবে এবং ভেতরে কী আছে তা দেখা যাবে। কিন্তু উলটোটা যদি হয়? যদি বস্তুটি টুকরো-টুকরো হয়ে যায়? তা হলে ভেতরে যা আছে তা রক্ষা পাবে না।

অর্জুন ঠিক করল, কোনও ঝুঁকি নেবে না। হয়তো কোনও বিস্ময়কর প্রাণী ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে এই বিশাল ডিম্বাকৃতি বস্তুতে। বরং কাল সকালে গ্রাম থেকে ডেরেকদের নিয়ে এখানে চলে আসবে। চেষ্টাচরিত্র করে এটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যে, চব্বিশ ঘণ্টা নজরে রাখা যায়।

চারপাশে মোটামুটি নজর বুলিয়ে জায়গাটাকে বুঝে নিয়ে সে আবার ওপরে উঠতে লাগল। সমস্ত শরীরে ব্যথা; কেটে যাওয়া শরীরে তীব্র জ্বলুনি। ওপরে উঠতে কাহিল হয়ে পড়ছিল সে। তারপর একসময় আগুনের আঁচ দেখতে পেয়ে বুকে উৎসাহ এল। সে পৌঁছে গিয়েছে।

অর্জুন যখন ওপরে এসে গেল তখন আগুন অনেক কমে এসেছে। হঠাৎ তার কানে একটা আলতো শব্দ বাজতেই সে মুখ ফিরিয়ে উৎসটা খুঁজতে চেষ্টা করল। এবং তখনই ডেরেকের কাকাকে দেখতে পেল।

ভদ্রলোক ছবি তুলছেন। ওঁর মুখ-চোখে উত্তেজনা, পরপর ছবি তুলতে-তুলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। বিস্মিত হয়ে ক্যামেরাটা দেখলেন। রাগ এবং পরে আফসোস ছড়িয়ে পড়ল মুখে। অর্জুন বুঝতে পারল ভদ্রলোকের ক্যামেরার ফিল্ম শেষ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আগুন জ্বলার সময় ডেরেকদের গ্রামের লোক এখানে আসে না। অবশ্যই একটা না-জানা-আতঙ্ক ওদের দূরে সরিয়ে রাখে। পরদিন, আলো নিভে গেলে কেউ-কেউ এসে উঁকিঝুঁকি মেরে যায়। এই বৃদ্ধ যেমন ছবি তুলেছিলেন। তা হলে ইনি এই সময় কী করে চলে এলেন? অর্জুন ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধ অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ অর্জুনকে দেখে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আগুনের ছবি তুললেন?"

"অ্যাঁ। ও, হ্যাঁ। কিন্তু আর ফিল্ম নেই। উঃ, কী দারুণ দৃশ্য, ওই ছবিটা তোলা হল না!" বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে দেখালেন। একটা গাছের ডাল আগুনসমেত নীচে ঝরে পড়ল।

"আপনি একা-একাই চলে এলেন?"

"অ্যাঁ। না তো!" বৃদ্ধ চারপাশে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি বললেন, "হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মনে হল কেউ যেন আমার ডার্করুমে ঢুকে কিছু করছে। ওখানে আমি কাউকে যেতে দিই না। বিছানা থেকে উঠে ক্যামেরাটা নিয়ে এগোতেই একজনকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম বাড়ির পেছনের দরজা খুলে। লোকটাকে দেখব বলে ওর পেছন-পেছন হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎই এই আগুন চোখে পড়ল। মনে হচ্ছিল লোকটাও এইদিকে আসছে। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল সে!" বৃদ্ধ চারপাশে আবার খুঁজতে লাগলেন।

"আপনি কি এখন গ্রামে ফিরে যাবেন?"

"অ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। এখানে থেকে আর কী হবে!" ছবি না তুলতে পারার হতাশা ওঁর গলায় স্পষ্ট। ওরা ধীরে-ধীরে নেমে আসতে-আসতে দেখল আগুন নিভে আসছে।

গ্রামের কাছে এসে ওরা দৃশ্যটা দেখতে পেল। প্রচুর লোক জড়ো হয়ে গেছে রাস্তায়। কিন্তু কেউ কথা বলছে না। সবাই তাকিয়ে আছে পাহাড়ের দিকে, যেখানে একটু আগে আগুন জ্বলছিল। হঠাৎ কেউ ওদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে জনতা সরে এল তাদের দিকে। মূলত বৃদ্ধকেই প্রশ্ন করতে লাগল তারা। কোন সাহসে বৃদ্ধ ওই আগুনের কাছে গিয়েছিলেন? ছবি তোলার নেশায় নির্ঘাত একদিন মারা পড়বেন তিনি। কেউ-কেউ প্রশ্ন করতে লাগল, সেখানে গিয়ে কী দেখেছেন? ভৌতিক কিছু নজরে পড়েছে কি না!

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন ফিল্ম শেষ হয়ে যাওয়ায় কী মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। ওরা শুনতে চাইছে ভৌতিক দৃশ্যের বর্ণনা, ফিল্ম সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই। অর্জুন চুপচাপ পাশ কাটিয়ে চলে এল ভিলেজ সেন্টারে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বিস্তর শব্দ এবং ডাকাডাকি করার পর পাহারাদাররা দরজা খুলল। একজন আতঙ্কিত গলায় বলল, "ওঃ আপনি! পাহাড়ে আবার আগুন জ্বলেছে। আপনার জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছিল। ভুল করে ওদিকে যাননি তো?"

"কেন?"

"হয়তো, হয়তো।" লোকটার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

"আমি তো বেঁচেই আছি।" অর্জুন হাসল।

"না। মানে, শুনেছি, ঘোস্ট মানুষের শরীরে ঢুকে চুপচাপ চলে আসে।"

অর্জুন কথা না বাড়িয়ে দোতলার ঘরের দিকে এগোল। কুসংস্কার বড় মারাত্মক জিনিস। বাইরের পৃথিবীতেও সেটা যেমন প্রবল, এখানে, এই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা মানুষেরাও তা থেকে মুক্ত নয়।

সকালে ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। ভাঙামাত্র মনে হল আজ বিছানা থেকে নামতে পারবে না। সর্বাঙ্গে ব্যথা, শরীর আরাম চাইছে। সে কোনওমতে টয়লেটে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে-না-আসতেই দরজায় টোকা পড়ল। অর্জুন দরজা খুলতেই দেখতে পেল ডেরেককে।

"গুডমর্নিং। শরীর ঠিক আছে তো?"

"গুডমর্নিং। হঠাৎ শরীরের কথা জিজ্ঞেস করছেন?"

"গতকালের তুলনায় আজকে আপনি অনেক দেরিতে ঘুম থেকে উঠলেন। এ কী! এসব কী হয়েছে? দেখি, দেখি! আরে, আপনি দেখছি কাল আহত হয়েছিলেন। কী ব্যাপার?"

"সব বলছি। সমস্যা হল, আমার সঙ্গে কোনও ওষুধ নেই। কেটে-ছড়ে গেলে, পড়ে গিয়ে শরীরে ব্যথা হলে আপনারা কী করেন?"

"ওষুধ খাই। গাছগাছড়ার পাতা, শেকড় থেকে ওষুধ বানানো হয়। এ ছাড়া শিলিগুড়ির একজন ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সবরকমের ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। তাও আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।" ডেরেক বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ফিরে এল মিনিট তিনেকের মধ্যে, "এখনই নিয়ে আসছে। ছড়ে যাওয়া ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেছে। রক্ত পড়েছিল বোঝা যাচ্ছে। আর কী অসুবিধে হচ্ছে?"

"পড়ে গিয়েছিলাম। অনেকখানি। পায়ে এবং কোমরে বেশ ব্যথা।"

"ভাঙেনি তো?"

"না, না। ভাঙলে এতটা পথ ফিরতে পারতাম না আর এভাবে দাঁড়াতেও না।"

অর্জুন বসল। সেই সময় পল এল চায়ের কাপ নিয়ে। কোনও কথা না বলে সেটা টেবিলে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অর্জুন ডাকল, "গুডমর্নিং, পল।"

পল দাঁড়াল, "গুডমর্নিং সার।" তারপর চলে গেল।

ডেরেক বলল, "আমি শুনেছি আপনি কাল রাত্রে বেরিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ। ওই পাহাড়ে গিয়েছিলাম যেখানে আগুন জ্বলেছিল।"

"আপনার সঙ্গে কাকাও গিয়েছিলেন?"

"না। আমি গিয়েছিলাম আগুন জ্বলবার আগে। উনি গিয়েছিলেন আগুন জ্বলতে দেখে, ছবি তোলার লোভে। আমরা একসঙ্গে ফিরে এসেছিলাম।"

"কাকার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। বুড়োমানুষ, এখনও ঘুমোচ্ছেন। কীভাবে আগুন জ্বলে উঠল বলুন তো?" ডেরেক জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক কীভাবে জ্বলেছিল আমি দেখার সুযোগ পাইনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ওখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে। যারা জ্বালিয়েছে তারা বাইরের লোক।"

"বাইরের লোক? তাদের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে ওখানে আগুন জ্বালার?"

"এখনও জানি না।"

এই সময় একটি মানুষ দরজায় এসে দাঁড়াতেই ডেরেক তাঁকে বলল, "আসুন, আসুন। ইনি অর্জুন, আমাদের অতিথি। গতকাল ইনি পাহাড়ে পড়ে গিয়ে একটু আহত হয়েছেন।"

ভদ্রলোক বয়স্ক। প্রথমে তিনি অর্জুনের নাড়ি দেখে মাথা নাড়লেন। তারপর শুকিয়ে যাওয়া দাগগুলো দেখলেন। অর্জুন দেখল ভদ্রলোক ব্যাগ খুলে একটি শিশি থেকে তরল দ্রব্য তুলোয় নিয়ে তার আঁচড়ে যাওয়া চামড়ায় বোলাতে লাগলেন। চিনচিনে ভাবটা সামলে নিল। তারপর চায়ের কাপের দিকে ভদ্রলোক তাকালেন, "আপনি চা খেয়ে নিন। খাওয়ার আধ ঘণ্টা বাদে ওই পুরিয়াটা খেয়ে নেবেন। এতে যদি ব্যথা না কমে তা হলে এই ট্যাবলেটটা খাবেন। এটা বোধ হয় আপনার চেনা ট্যাবলেট।"

ব্যাগ গুছিয়ে তিনি ডেরেককে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই।"

ডেরেক বলল, "অনেক ধন্যবাদ।"

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ইনি কি ডাক্তার?"

ডেরেক বলল, "আপনারা যে ডিগ্রি থাকলে কাউকে ডাক্তার বলেন সেটা যে ওর নেই, বা থাকতে পারে না, সেটা নিশ্চয়ই

বুঝেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন তখন নিজেদের গরজেই তাঁরা প্রকৃতি থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র খুঁজে নিয়েছিলেন। প্রতিটি প্রজন্ম সেই বিদ্যেটাকে আরও বাড়িয়েছে। গত তিন পুরুষ ধরে এঁরাই আমাদের গ্রামের মানুষের অসুখ-বিসুখে ওষুধ দেন। এখানে হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে মরে যাওয়া ছাড়া তেমন কোনও বড় অসুখ এখনও কারও হয়নি। আপনি শুনলে অবাক হবেন, ইনি অপারেশন পর্যন্ত করতে পারেন। তবে সেগুলো খুবই সাধারণ কেস।"

"বড় কেস হলে ?"

"এখন আমরা নর্থবেঙ্গল হসপিটালে নিয়ে যাই রুগিকে।"

চা খাওয়া হয়ে গেলে অর্জুন বলল, "এখন অনেকটা ভাল লাগছে। ডেরেক, আপনি চারজন শক্তিশালী লোককে সঙ্গে নিন। আমাদের একবার পাহাড়ে যেতে হবে।"

"কেন ?"

"যাওয়ার সময় বলব। আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আমি ঠিকই আছি।"

"পাহাড়ে বলতে ?"

"যেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে, তার নীচে। সঙ্গে বেশ শক্ত লম্বা দড়ি নেবেন।"

"কী ব্যাপার ?"

"একটা খুব বড় রহস্য পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে আমরা ওখানে গেলে।"

ডেরেক চলে গেলে অর্জুন ঘড়িটা বের করল। গত রাতে এই জিনিসটা তার প্রাণ রক্ষা করেছে। একটা নিরীহ ঘড়ি যে অমন মারাত্মক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে তা কে জানত ! অমল সোমই এর রহস্য তার কাছে আগে কখনও ফাঁস করেননি।

বেরনোর আগে কাগজের মোড়ক খুলে পুরিয়াটাকে দেখল সে। শুকনো ছালের গুঁড়ো। এখন সামান্য অসুখ করলেই শহরের মানুষ অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়ে নেয়। কবিরাজি ওষুধের চল খুবই কমে গেছে। হয়তো তেমন উপকার পায় না বলেই মানুষের ভরসা কম। নেহাত কৌতূহলেই অর্জুন ওটাকে মুখে ঢেলে দিল। কিন্তু সঙ্গে পরিচিত ব্যথা কমানোর ট্যাবলেটটা নিতে ভুলল না। গত রাত্রে যেটা বোঝা যায়নি, এখন পা ফেলতে ব্যথাটা বেশ জানান দিচ্ছে। একটু-একটু করে নীচে নেমে এল সে।

হলঘরে বাচ্চারা ছুটোছুটি করছে। কেউ-কেউ বায়না ধরছে বাইরে যাওয়ার জন্য। মিসেস বেনসন ওদের জন্য প্রচুর খেলনা নিয়ে এসেছেন। বাচ্চাগুলোর কেউ-কেউ তাই নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু ব্যতিক্রম একজন। মায়ের কোল ঘেঁষে বসে গম্ভীর মুখে সে সমবয়সীদের দেখছে। সেই মুখের অভিব্যক্তি বলছে, কী ছেলেমানুষ এরা !

অর্জুন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "হ্যালো।"

বাচ্চাটা মুখ ফেরাল। স্পষ্ট চোখে তাকাল। ওর মা বললেন, "বলো, হ্যালো।"

বাচ্চাটা নীরবে ঘাড় নেড়ে না বলল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওর নাম কী, বব ? রবার্ট ?" অর্জুন আবার বলল, "হ্যালো বব। তোমার খেলতে ইচ্ছে করছে না ?"

বব এবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আধোগলায় জিজ্ঞেস করল, "হু ইজ হি ?"

"হি ইজ আওয়ার ফ্রেন্ড।"

"ফ্রেন্ড ?"

"ইয়েস। হি ওয়ান্টস টু হেল্প আস।"

"হোয়াই ?"

ওর মা হেসে উঠলেন। অর্জুন থতমত হয়ে গেল। ওইটুকুনি বাচ্চা কী দারুণ বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করল। সে নিশ্চয়ই বন্ধুর মতো স্বার্থহীন হয়ে সাহায্য করতে এখানে আসেনি। অমল সোম দক্ষিণার কথা বলেছেন, নেবেনও, যদি ইচ্ছে হয়। কিন্তু ওর মা যতই বন্ধু বলুন, ওই বাচ্চাটার প্রশ্নের কী জবাব সে দেবে ?

অর্জুন বাচ্চাটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সে বিরক্ত হয়ে মাথা সরাল। দরজার দিকে যেতে-যেতে অর্জুনের মনে হল, এই বাচ্চাটা সবার চেয়ে আলাদা। এই দু' বছর বয়সে ও যেন গভীর জ্ঞান নিয়ে পৃথিবীকে দেখছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটাই ওই বাইরে থেকে আসা মানুষদের লক্ষ্য নয় তো ?

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে ডেরেককে দেখতে পেল। সঙ্গে দড়ি হাতে তিনজন বেশ স্বাস্থ্যবান যুবক। ডেরেক বলল, "আমরা তৈরি।"

"পাঁচজন হচ্ছি। আর একজন হলে ভাল হত। আপনি চার্লসকে নিতে পারেন ?"

"চার্লস ? কোন চার্লস ?"

"আপনাদের দরজি এডের বন্ধু।"

"ওঃ। এই নামটা আপনি সবে গতকাল শুনেছেন। ঠিক আছে। চলুন, যাওয়ার পথে চার্লসের বাড়ি পড়বে। ওকে বলছি।"

ওরা রওনা হল। হাঁটতে-হাঁটতে ডেরেককে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি কোনও অস্ত্র সঙ্গে নিয়েছেন ?"

ডেরেক হাসল, "অস্ত্র ? কেন ?"

"যদি প্রয়োজন হয় ?"

"দূর ! এই পাহাড়ে দিনদুপুরে কোনও হিংস্র জীব সামনে আসবে না।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না।

চার্লসের বাড়ি গ্রামের একান্তে। বাড়ির সামনে ছোট্ট বাগানের আগাছা পরিষ্কার করছিল চার্লস। পাঁচজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল অবাক হয়ে। ডেরেক ডাকল, "হ্যালো, চার্লস।"

চার্লস এগিয়ে এল, "হ্যালো, ডেরেক।"

"তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত ?"

"না। তেমন নয়। কিন্তু কেন ?"

"চলো। আমরা পাহাড়ে যাচ্ছি। গতকাল পাহাড়ে আগুন জ্বলেছিল, তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। জায়গাটা আমরা দেখে আসতে যাচ্ছি।"

"তোমরা তো পাঁচজন আছ, আমাকে কী দরকার ?"

ডেরেক হাসল, "তুমি বেশ শক্তিমান মানুষ। আমাদের বন্ধু অর্জুন তাই তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চাইছে।"

চার্লসের মুখ অর্জুনের দিকে ফিরল। মুখের অভিব্যক্তিতে প্রশ্ন।

অর্জুন কোনও কথা বলল না।

এবার চার্লস জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাকে চেনেন নাকি ?"

"চিনি বলা ঠিক হবে না। তবে দেখেছি।"

"দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ। পরশু রাত্রে পাব থেকে বেরিয়ে এডের সঙ্গে গল্প করছিলেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে চার্লসের কপালে ভাঁজ পড়ল। এবং তারপরেই লোকটার কথাবার্তা বদলে গেল। হাতের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে গেট খুলে সে এগিয়ে এল, "ঠিক আছে ডেরেক, চলুন, যাওয়া যাক।"

ওরা হাঁটা শুরু করল। ডেরেক ওর পাশে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কাকার খবর কী ?"

ডেরেক বলল, "বৃদ্ধ সারারাত জেগে এখন বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি গিয়ে দরজায় শব্দ করেও সেই ঘুম ভাঙাতে

পারিনি।"

অর্জুন বলল, "ওঁকে দেখে মনে হয় না ওঁর ঘুম এত গভীর।"

ডেরেক জবাব দিল না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর ওরা সেই পোড়া জায়গাটায় পৌঁছল। কাল রাত্রে যেহেতু বৃষ্টি হয়নি তাই পোড়া গাছগাছালির ছাই কাদা হয়ে যায়নি। অর্জুন লক্ষ করল ডেরেক ছাড়া অন্যরা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। কৌতূহল এবং ভয় একই সঙ্গে রয়েছে তাদের দৃষ্টিতে। এখন হালকা রোদ সর্বত্র। জঙ্গলের রহস্যময় চরিত্রটি এখন বোঝা যাচ্ছে না। তবু যে ভীতি ওরা মনে পুষে রেখেছে তা এখনও সরাতে পারছে না।

অর্জুন লক্ষ করল এর আগের বার যেখানে আগুন লাগানো হয়েছিল ঠিক তার পাশেই এবার আগুন জ্বলেছে। এসব জায়গায় গাছগাছালি ছাড়া বুনো ঝোপে ভর্তি। কিন্তু ওই লোকগুলো উধাও হয়ে গেল কোন পথে ? সে ডেরেককে ডাকল, "আপনার কাকার সঙ্গে আমার এখানেই দেখা হয়েছিল। ওঁর ক্যামেরার ফিল্ম শেষ হয়ে গিয়েছিল।"

"তখন কত রাত ?"

"অনেক।"

"আমি ভেবে পাচ্ছি না কাকা অত রাত্রে আগুন জ্বলছে দেখেও এখানে আসার সাহস পেলেন কী করে ? গ্রামের সবাইকে ওই সময় বাইরে যেতে নিষেধ করা আছে।"

"একটা লোক নাকি ওঁর ডার্করুমে কাল রাত্রে ঢুকেছিল। সেই লোকটাকে অনুসরণ করে তিনি এখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অন্তত আমাকে তাই বলেছেন।"

"বাড়ি বন্ধ, ডার্করুমে ঢুকেছিল ? তার মানে চুরি করতে গিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ। ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে আরও বিশদ জানা যাবে।"

"অসম্ভব ! আমাদের গ্রামে কেউ এমন কাজ করবে না।"

"হয়তো। কেউ এতদিন করেনি, করবে না ভাবছেন কেন ?"

"ভাবছি, কারণ আমি আমার গ্রামের মানুষদের চিনি।"

"তা হলে বলতে হয় বাইরের লোক চুরি করতে এসেছিল।"

"সেই লোকটি যদি আপনি হন ?" হঠাৎ ডেরেক ঘুরে দাঁড়াল।

"তার মানে ?"

"আপনি জানতেন কাকার সংগ্রহ থেকে নেগেটিভ এবং কিছু প্রিন্ট হারিয়ে গিয়েছে। হয়তো আপনি বিশ্বাস করেননি। রাত্রে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে তাই কাকার বাড়িতে ঢুকেছিলেন সেগুলোর সন্ধানে। না পেয়ে বাইরে এসে আগুন দেখতে পান এবং যেহেতু এই আগুন সম্পর্কে আপনার কৌতূহল আছে তাই সটান এখানে চলে আসেন। কাকাকে আপনার পেছন-পেছন আসতে দেখে লুকোতে চান এবং পড়ে যান। সেই সময় আপনি আহত হন। তারপর উপায় না দেখে কাকার সঙ্গে কথা বলেন এমনভাবে, যেন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।" ডেরেক একটানা বলে থামল।

হেসে ফেলল অর্জুন, "হ্যাঁ, এরকম ভাবা যেতে পারে। আমরা বলি কেউ সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। তবে আপনার কাকা লোকটিকে পেছন থেকে দেখেছেন। তার উচ্চতা এবং শরীরের আয়তন সম্পর্কে আন্দাজ নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল। সেটার সঙ্গে আমার কতটা মিল আছে তা তিনিই বলতে পারবেন। ততক্ষণ আসুন, আমরা কাজ শুরু করি।"

ডেরেক বলল, "সকালে আপনি যেভাবে শরীরের ব্যথার কথা বলছিলেন, এখানে আসার পথে কিন্তু তার কোনও নমুনা দেখতে পাইনি।"

অর্জুনের খেয়াল হল। সকালে যেরকম তীব্র ব্যথা ছিল এখন সেটা একদম থিতিয়ে গেছে। ওই পুরিয়া দারুণ কাজ করেছে। সে বলল, "এর সমস্ত কৃতিত্ব ওই ভদ্রলোকের, যিনি আমাকে পুরিয়া দিয়েছিলেন। যাকগে, ডেরেক, আমাকে সন্দেহ করলে এই মুহূর্তে আপনার কোনও লাভ হচ্ছে না। আপনাদের গ্রামে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলেই আপনি অমল সোমের কাছে গিয়েছিলেন। আমি এসেছি সেটা সমাধান করতে, সমস্যা বাড়াতে নয়।"

ডেরেক মুখ ফেরাল। সম্ভবত অর্জুনের রাতের অভিযান তার পছন্দ হয়নি। অন্তত তাকে না জানিয়ে অর্জুন বেরিয়েছিল বলে কোথাও লেগেছিল তার। তা ছাড়া গ্রামের মানুষদের সম্পর্কে অর্জুনের সন্দেহ সে পছন্দ করেনি। আর এইজন্যই মনে যে বাষ্প জমা হয়েছিল তা ওর মুখ দিয়ে কথা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

ডেরেক জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কী করতে হবে !"

"আমরা নীচে নামব। একেবারে নীচে।"

"সে কী !" চমকে গেল ডেরেক।

অর্জুন সবাইকে হাত নেড়ে কাছে ডাকল। ওরা এলে অর্জুন বলল, "চার্লস, আপনি তো পাহাড়টাকে ভালভাবে জানেন। আমরা ঠিক ওইখানে, একেবারে নীচে নামতে চাই। কীভাবে যাব বলতে পারেন ?"

চার্লস ডেরেকের দিকে তাকাল, "আমি তো কখনও এর আগে যাইনি।"

"আপনি তো পাকদণ্ডী ভাল চেনেন।"

"এ-কথা কে বলল আপনাকে ?"

"আমি শুনেছিলাম। আচ্ছা, কাল রাত্রে যে পথ দিয়ে নেমেছিলাম সেই পথেই চেষ্টা করি। আমাদের খুব সাবধানে নামতে হবে।"

দড়ির সাহায্যে ওরা নামছিল। যেভাবে পা পিছলে যাচ্ছিল তা অর্জুনকে গত রাতের পতনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। নামবার সময় একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ির এক প্রান্ত শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ওঠার সময় উঠতে সুবিধে হবে এতে। পা পিছলে মাধ্যাকর্ষণের টানে অল্প সময়ে যতটা নীচে নামা যায়, সচেতনভাবে তার অর্ধেকও সম্ভব নয়। একসময় লম্বা দড়িও শেষ হয়ে এল।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল ডেরেক, "আপনি কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন ?"

"আরও নীচে।"

"উঠলেন কী করে ?"

"খুব কষ্ট করে। তবে সেই জায়গাটা ওপর থেকে দেখে ঠাহর করতে পারিনি।"

আরও মিনিট কুড়ি বাদে ওরা নীচে নামতে পারল। এখানকার গাছগাছালি, বুনো গন্ধ, মাটি হয়তো পৃথিবীর আদিমতম দিনগুলো থেকে মানুষের স্পর্শবর্জিত ছিল। গতরাতের আগে কেউ এখানে নেমেছে বলে মনে হয় না।

চার্লস বলল, "সাবধান। সাপ !"

সবাই স্থির হয়ে গেল। সাপটার পেট এবং লেজ দেখা যাচ্ছে। সামনের অংশ পাতার আড়ালে। কিন্তু, অর্জুনের মনে হল, ওটা নড়ছে না। একটা গাছের ডাল ভেঙে ওর পেটে খোঁচা দেওয়া সত্ত্বেও যখন প্রতিক্রিয়া হল না তখন ডালটা শরীরের তলায় ঢুকিয়ে টেনে তুলল সে। এবং তখনই সে চিনতে পারল। এটা গতরাতের ফণা তোলা সাপ। মাথা এবং তার নীচের খানিকটা অংশ পুড়ে গলে গিয়েছে।

চার্লস এগিয়ে এল, "কীভাবে মরল এটা ? আগুনে পুড়েছে বোধ হয়।"

ডেরেক বলল, "হতেই পারে। ওপরের গাছে ছিল। আগুনে পুড়ে খাদে পড়ে গেছে।"
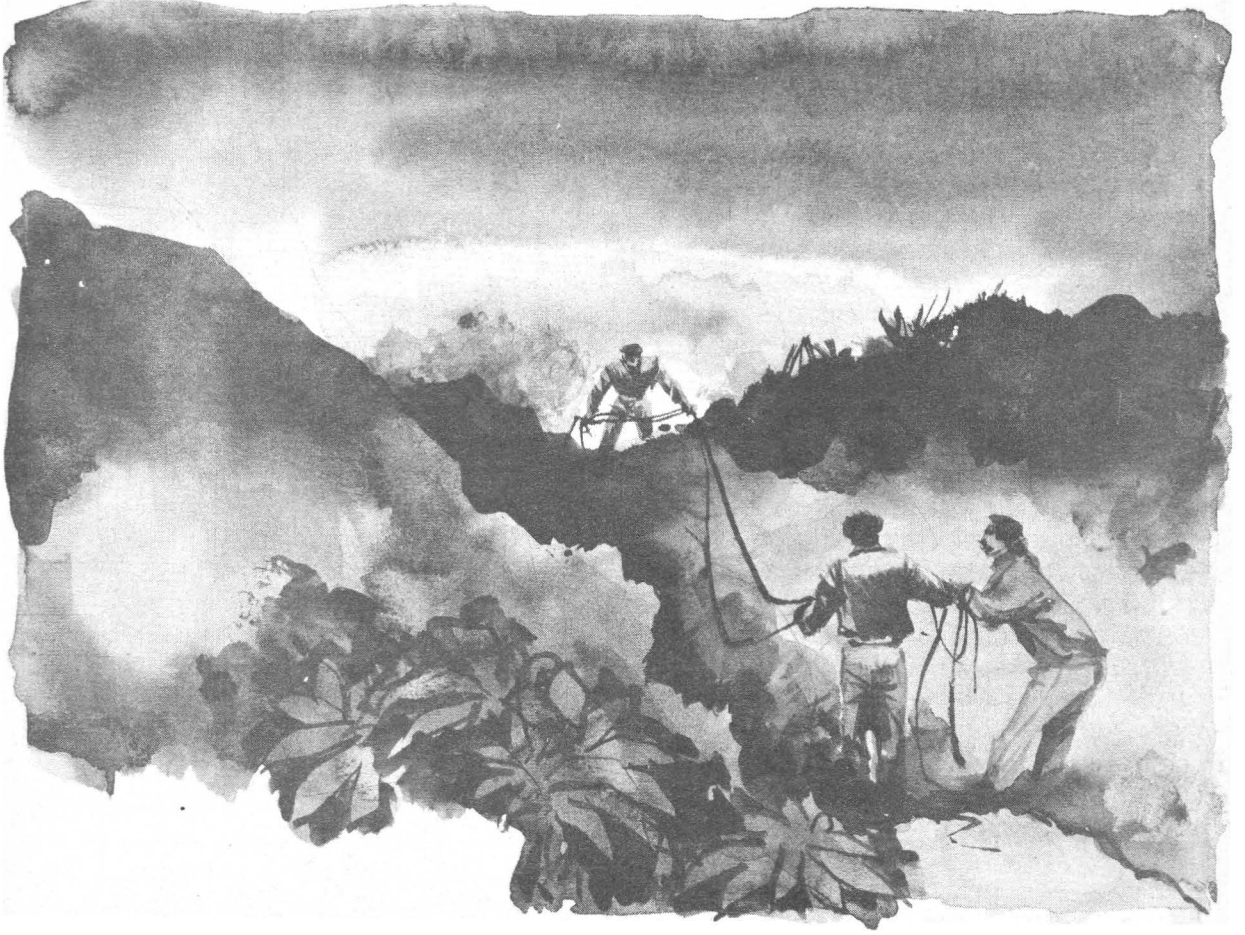
আর একটু হাঁটতেই চার্লস দাঁড়িয়ে পড়ল। ডেরেককে বলল, "ব্যাপারটা লক্ষ করো। দু'পাশের গাছের ডাল ছেঁটে কেউ যেন রাস্তা করে রেখেছে। মানুষ ছাড়া এমন কেউ করতে পারে না। নিশ্চয়ই মানুষ এসেছিল। কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি?"

অর্জুন বলল, "আমরা প্রায় এসে গিয়েছি। একটু বাদেই জানতে পারবেন।"

কিছুক্ষণ পরে অর্জুনই প্রথম দেখতে পেল, পেয়ে ছুটে গেল কাছে। সেই শক্ত বস্তুটি দু'টুকরো হয়ে পড়ে আছে। ভেতরটা ভেজা-ভেজা, লালচে হয়ে আছে। দুটো টুকরো যদি গোল হয় তা হলে সেই খোলের মধ্যে কিছু নেই।

ডেরেক জিজ্ঞেস করল, "এটা কী? কী ছিল এর ভেতরে?"

অর্জুন চারপাশে তাকাল। এখানে মাটি নরম। স্যাঁতসেতে। এবার স্পষ্ট দাগ দেখতে পেল সে। ইঞ্চি ছয়েকের গোল দাগ, পাশাপাশি। দাগের গভীরতা বলে দিচ্ছে প্রাণীটি ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর এগিয়ে গেছে। সেই দাগ অনুসরণ করে এগোতেই বাধা পেল অর্জুন। সামনেই পাথর। পাথরে পায়ের চিহ্ন নেই।

সে হতাশ হয়ে বলল, "ইস। দেরি হয়ে গেল।"

"কিসের দেরি?" ডেরেক কিছুই বুঝতে পারছিল না।

অর্জুন বলল, "আপনার মনে আছে ডেরেক, মিস্টার সোম একটা ছবিতে আধপোড়া গাছের ভেতর বিশাল ডিমের আকারের কিছু দেখিয়ে জানতে চেয়েছিলেন ওটা কী? আপনি উত্তরটা বলতে পারেননি। আপনার কাকার সঙ্গে আমি আর আপনি যখন আগুনে পোড়া জায়গাটায় প্রথমবার এলাম তখন সেই আধপোড়া গাছটির দেখা পাইনি। বস্তুটিও ওখানে ছিল না। কাছেই একটা বিশাল পাথরের গায়ে ছাই এবং ঘষা দাগ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল ওটাকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমি সেটার সন্ধানে গত রাত্রে নীচে নামতে গিয়ে পড়ে যাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিমটার কাছে পৌঁছই। এসে দেখি ওই শক্ত ডিম, যদি ডিম বলা যায়, একটু-একটু নড়ছে। অর্থাৎ ওটার মধ্যে কোনও জন্তুর প্রাণ আছে। প্রাগৈতিহাসিক অনেক প্রাণীর ভ্রূণ ওপরের খোলস ফসিল হয়ে গেলেও ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় বহুকাল থেকে যেতে পারে। আমার সন্দেহ হয়েছিল এটা সেইরকম হলেও হতে পারে। আগুনের তাত এবং ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার আঘাত পেয়ে সেই সুপ্ত প্রাণ জেগেছে। যে-কোনও কারণেই ভাঙা খোলটা দিয়ে ভেতরে বাতাস যাওয়ায় অক্সিজেন পেয়ে দুলছে। এরকম একটা প্রাণীর সন্ধান জীববিজ্ঞানীরা পেলে সারা পৃথিবীতে কীরকম আলোড়ন হবে ভেবে দেখুন। আমার মনে হয়েছিল অনুমান সত্যি হলেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খোলস ভেঙে ওর বেরনোর ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমি দেরি করে ফেলেছি। উঃ, কী আফসোস হচ্ছে।"

এতক্ষণ সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। চার্লসই প্রশ্ন করল, "ওটা কী প্রাণী?"

"আমি জানি না।"

আর-একজন জিজ্ঞেস করল, "ওটা কি খুব হিংস্র হতে পারে?"

"তাও জানি না। তবে মানুষের চেয়ে হিংস্র প্রাণী পৃথিবীতে কিছু নেই।"

ডেরেক বলল, "সবে জন্মেছে যে, সে আর কতদূরে যাবে? এসো, খুঁজে দেখা যাক।" সবাই গাছের ডাল ভেঙে লাঠি করে নিয়ে চারপাশের গাছে আঘাত করতে লাগল। সেই আঘাতের

শব্দে ভয় পেয়ে দুটো খরগোশ আর একটা সাপকে পালিয়ে যেতে দেখা গেল। হঠাৎ একজন চিৎকার করে ডাকতেই অর্জুন ছুটে গেল। পাথরগুলোর ওপাশে জঙ্গলের মধ্যে আবার পায়ের ছাপ রয়েছে। পরপর চারটে। কিন্তু সেগুলো আবার পাথরে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু অর্জুন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। একটু আগে যে চিহ্নটাকে মাত্র ছয় ইঞ্চি মনে হচ্ছিল এখন সেটা আরও বড় হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ গজ পথ পেরিয়েই পায়ের চিহ্ন বড় হয় কী করে ? না কি এতকাল নির্দিষ্ট খোলের মধ্যে থাকায় প্রাণীটির চেহারা গুটিয়ে ছিল, বাড়তে পারেনি। বাইরের হাওয়া পেয়ে সেটা দ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছে। প্রায় একটা বাচ্চা হাতির পায়ের মাপে এখন ওই দাগটা।

ডেরেক পাশে এসে বসে পড়েছিল দাগটা দেখতে। দেখে বলল, "অসম্ভব ! এটা নিশ্চয়ই আলাদা প্রাণী। কিন্তু দুটো প্রাণীর পায়ের আকৃতি একই রকম হল কী করে ?"

চার্লস বলল, "আমাদের আর এখানে থাকা উচিত নয়। এই প্রণী হিংস্র কি না তা কেউ জানি না। যদি হিংস্র হয় তা হলে আত্মরক্ষার কোনও অস্ত্র নেই আমাদের কাছে।"

অর্জুন দেখল সবাই চার্লসকে সমর্থন করছে। কিন্তু ফিরে যাওয়া মানে প্রাণীটিকে হয়তো চিরকালের মতো হারাতে হবে। এই পাহাড়-জঙ্গল ভারত, ভুটান, নেপাল ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেকদূর। এই বিশাল জায়গায় কাউকে খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। যেহেতু এই প্রাণী সদ্য খোল থেকে বেরিয়েছে তাই ও বেশিদূরে যাবে না। এখন দু-একদিন ও খোলের কাছে ফিরে আসবেই। সে ঠিক করল, এখানে আজকালের মধ্যে আবার আসবে।

যে-পথ দিয়ে গতরাত্রে ওপরে উঠেছিল সেটা পাওয়া গেল একটু খুঁজতেই। ওপরে উঠে আসার পর অর্জুন দড়িটাকে খুলতে নিষেধ করল।

হঠাৎ চার্লস জিজ্ঞেস করল, "ওই প্রাণী যদি গ্রামে গিয়ে হামলা করে ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ওকে বিরক্ত না করলে ওসব ঘটবে না। তা ছাড়া ওর চরিত্র সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। যারা বাইরে থেকে এসে ঝামেলা ইতিমধ্যে পাকাতে শুরু করেছে তাদের মোকাবিলা করার কথা ভাবুন।"

চার্লস হাসল, "ওঃ, ওই ব্যাপার। বাচ্চাগুলোকে তো আপনার উপদেশমতো ভিলেজ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর কোনও ভয় নেই।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "তা কী করে বলা যায় ! ধরা যাক পল, পলের কোনও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ যদি ভিলেজ সেন্টার থেকে কোনও বাচ্চাকে সরিয়ে নেয় ?"

ডেরেক অবাক হল, "পলের দুর্বলতা ?"

"হ্যাঁ। সবাই জানে মিসেস বেনসনের মেয়ের সঙ্গে পল বন্ধুত্ব করতে চায়। মিসেস বেনসন সেটা চান না। কেউ যদি বলে এ ব্যাপারে সাহায্য করব তা হলে পল তার কথা শুনবে। আপনি এই ব্যাপারে কী বলেন চার্লস ?" হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

চার্লস চমকে তাকাল। অর্জুন দেখল ওর মুখের চেহারা সমস্ত স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে অদ্ভুত বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ডেরেক সেটা না লক্ষ করে উষ্ণ গলায় বলল, "অর্জুন, আপনি আবার ওই ধরনের কথা বলছেন ! পল খুব ভাল ছেলে।"

"তা হলে পল মিসেস বেনসনের... !"

"আপনি জানলেন কী করে ?"

"জেনেছি।"

"কিন্তু গ্রামের কোন লোক, ধরে নিলাম আপনার সন্দেহ সত্যি হলে, বাইরের লোক পলকে প্রভাবিত করতে পারবে না। গ্রামের লোকই করবে। কিন্তু কেন ? কী তার স্বার্থ ?"

"খুব সহজ। টাকার দরকার হতে পারে তার।"

"নো। আমি বিশ্বাস করি না। আমার গ্রামের মানুষ টাকার জন্যে বিশ্বাসঘাতকতা কখনওই করতে পারে না। আপনি আপনাদের দেখা মানুষদের সঙ্গে দয়া করে মিলিয়ে ফেলবেন না।" ডেরেক জোরালো গলায় বলল।

অর্জুন হাসল, "চার্লস, আপনি কি ডেরেকের কথা সমর্থন করেন ? ধরুন, কেউ এখানে থাকতে চাইছে না। এই জায়গাটা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তার পূর্বপুরুষ ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল। এখন তার মনে হচ্ছে সেই দেশে গেলে সে ভাল থাকবে। কিন্তু যেতে হলে অনেক টাকা চাই। সেই টাকার লোভে একটু যদি অন্যায় করে তাতে এমন কী ক্ষতি ! সে তো আর এখানে ফিরে আসবে না।"

চার্লসের মুখ তখন প্রায় বুকের ওপর। ডেরেক বলল, "আমরা যদি ইংল্যান্ডে যেতে চাইতাম তা হলে অনেক বছর আগে ফিরে যেতাম। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর আর এখানে পড়ে থাকতাম না। আপনাকে তো বলেছি পূর্বপুরুষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আর যেখানেই যাই না কেন ইংল্যান্ডে যাব না।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। ফেরার পথে সে লক্ষ করছিল চার্লস আর একটা কথাও বলছে না। মাঝে-মাঝে আড়চোখে তাকে দেখছে। সে হয়তো ভেবেই পাচ্ছে না তার গোপন পরিকল্পনা, যা এড ছাড়া কেউ জানে না তা বাইরের লোক জানল কী করে ? নিশ্চয়ই ওর মনে হচ্ছে এও ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এরকম ক্ষেত্রে চার্লস এডকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন ইচ্ছে করেই অন্যদের থেকে ব্যবধান রেখে চার্লসের পাশে চলে এল, "চার্লস। ওই জন্তুটার খোঁজে আমি আবার জঙ্গলে আসব। আপনি আমার সঙ্গী হলে ভাল লাগবে। কী, রাজি আছেন ?"

শুকনো গলায় অস্পষ্ট স্বরে চার্লস বলল, "ঠিক আছে।"

অর্জুন নিচু গলায় বলল, "আর একটা কথা। এড আপনার বন্ধু। উনি আপনার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেননি। পরশু রাত্রে রাস্তায় উত্তেজিত হয়ে আপনি যখন এডকে আপনার পরিকল্পনার কথা বলছিলেন তখন সেটা আমার কানে এসেছিল। অতএব ভুল করেও এডকে শত্রু ভাববেন না।"

হঠাৎ ওরা দেখতে পেল দু'জন লোক চিৎকার করতে-করতে এদিকে ছুটে আসছে। এটা দেখামাত্র ওরা জোরে পা চালাল। লোক দুটো মুখোমুখি হয়ে ভীতসন্ত্রস্ত গলায় যা বলল তা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠে দরজা না খোলায় মিস্টার জোন্সের নির্দেশে বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফারের দরজা ভাঙা হয়। ভেতরে গিয়ে দেখা যায় তিনি মেঝেতে পড়ে আছেন প্রাণ হারিয়ে। ওর মাথার পেছনটা কেউ আঘাত করে থেঁতলে দিয়েছে। ডেরেক কেঁদে উঠল।

বৃদ্ধের বাড়ির সামনে বেশ ভিড়। মিস্টার জোন্স, মিস্টার স্মিথ গম্ভীর মুখে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদের দেখে সবাই রাস্তা করে দিল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ডেডবডি কেউ স্পর্শ করেননি তো ?"

মিস্টার স্মিথ বললেন, "না। ঘরে ঢুকে ওঁকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমরা বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এটা খুন, খুন করা হয়েছে ওঁকে।"

অর্জুন ভেতরে গেল। সঙ্গে ডেরেক। বৃদ্ধ উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর মাথার পেছনে ক্ষতচিহ্ন। সেখান থেকে রক্ত মেঝেতেও পড়েছে। পরনের পোশাকটাকে গতরাত্রে অর্জুন দেখেছিল। অর্জুন তন্নতন্ন করে খুঁজছিল। কিন্তু আততায়ী কোনও ক্লু রেখে যায়নি। কিন্তু আততায়ী যখন বাইরের দরজা

খুলে বের হয়নি তখন গেল কোন পথে ? ভেতরের দরজাও বন্ধ। একটা টয়লেট কাম বাথরুম। আর একপাশের দরজা খুলতে বোঝা গেল ওটা বৃদ্ধের ডার্করুম ছিল। সেখানে ঢুকতেই সে ক্যামেরাটাকে দেখতে পেল। এই ক্যামেরা বুকে নিয়ে বৃদ্ধ ঘুরতেন। ক্যামেরাটা খোলা। তাতে কোনও ফিল্ম নেই। অর্জুন দেখল ঘরের জানলাটা বন্ধ। ডার্করুমের কাজ করতে হলে জানলা বন্ধ রাখতেই হয়। কিন্তু কোনও ছিটকিনি বা হুড়কো লাগানো নেই কেন ? সামান্য টানতেই সেটা খুলে গেল। আর জানলায় কোনও গ্রিল বা শিক নেই। একজন লোকে অনায়াসেই ওখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। অর্জুন দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে জানলাটার কাছে গেল। নীচের মাটিতে দুটো গভীর দাগ। লাফিয়ে ওপর থেকে পড়লে জুতো কিছুটা বসে যায়। যে লোকটা লাফিয়েছিল তার ডানপাটির জুতোর একটা পাশ বেশি ক্ষয়ে গিয়েছে, সেদিকের গোড়ালিও সমান নেই। তার মানে লোকটা যেদিকে বেশি ভর রেখে চলে সেই দিকটার জুতো কিছুটা ক্ষয়ে গেছে। অর্জুন ফিরে এল। মিস্টার জোন্সকে বলল, "আপনারা থানায় খবর দিন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওঁকে খুন করা হয়েছে।"

মিস্টার জোন্স মাথা নাড়লেন। মিস্টার স্মিথের কানে-কানে কিছু বললেন। মিস্টার স্মিথ বললেন, "দেখুন, আজ পর্যন্ত এখানে কেউ খুন হয়নি। পুলিশের সাহায্য তাই কখনও আমাদের প্রয়োজন হয়নি। এক্ষেত্রে পুলিশকে জানানো কি বাধ্যতামূলক ?"

"নিশ্চয়ই। যে-কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা পুলিশকে না জানানো অপরাধ।"

কিন্তু অর্জুন দেখল থানায় খবর দেওয়ার ব্যাপারে গ্রামের মানুষ একমত হতে পারছে না। কেউ-কেউ বলছে, এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আজ পর্যন্ত যখন গ্রামে পুলিশের কোনও প্রয়োজন হয়নি তখন খামোকা খবর দিয়ে কী লাভ ! পুলিশকে জানালে বৃদ্ধের শরীর আবার উঠে বসবে না। ডেরেক চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, "কিন্তু আমার কাকার হত্যাকারীকে ধরতেই হবে। আর সেই লোকটা ধরা পড়লে চূড়ান্ত শাস্তি দিতে হবে। এখন পর্যন্ত আমাদের নিয়মে যে শাস্তি দেওয়া হয় তা হত্যাকারীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ এ-ধরনের ঘটনা এর আগে ঘটেনি এখানে। আর লোকটা যদি বাইরের লোক হয় তা হলে এখান থেকে চলে গেলে আমরা কিছুই করতে পারব না। সেক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য লাগবেই। এইজন্যেই খবরটা থানায় জানানো দরকার।"

কথাগুলোয় যুক্তি আছে, মেনে নিল সবাই। মিস্টার জোন্স দু'জনকে তখনই থানায় পাঠালেন। অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। এখানে বাইরের লোক বলতে সে একাই আছে। ডেরেক কি তাকে সন্দেহ করছে ! কিন্তু কেন করবে ? ওর কাকাকে সে কেন খুন করতে যাবে ?

অর্জুন বলল, "মিস্টার জোন্স, কাল রাত্রে আমি এবং মিস্টার মুরহেড একসঙ্গে গ্রামে ফিরে এসেছিলাম। তখন এখানে বেশ ভিড় ছিল। সবাই পাহাড়ের আগুন দেখার জন্যে জড়ো হয়েছিলেন, তাঁদের কেউ-কেউ কি এখানে আছেন ?"

সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ। আমরা ছিলাম।"

যাঁরা বললেন তাঁদের একজনকে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সেই সময় কী ঘটেছিল বলুন তো ?'

ভদ্রলোক বললেন, "আপনারা একসঙ্গে এলেন। আমরা মিস্টার মুরহেডকে আগুনের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। আপনি তখন ভিলেজ সেন্টারে চলে গেলেন। মিস্টার মুরহেড তারপরে প্রায় আধঘণ্টা আমাদের সঙ্গে গল্প করে বাড়িতে চলে গেলেন। বললেন, তখনই ফিল্মগুলো ওয়াশ করবেন।"

অর্জুন বলল, "আমি ভিলেজ সেন্টারের দরজা অনেক ডাকাডাকির পর খোলাতে পেরেছিলাম। যাঁরা পাহারায় ছিলেন তাঁরা অত রাত্রে নিঃসন্দেহ না হয়ে দরজা খোলেননি। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যা ঘটেছে তা ডেরেক জানে। আর রাত্রে, একবার ভেতরে ঢোকার পর পাহারাদারদের ফাঁকি দিয়ে বের হওয়া যায় না।"

মিস্টার জোন্স আপত্তি করলেন, "আহা ! এসব কথা বলছেন কেন ?"

অর্জুন বলল, "কারণ কেউ সন্দেহের বাইরে নয়। আমার তরফ থেকে যা ঘটেছিল তা আপনাদের জানিয়ে দিলাম। আর মিস্টার মুরহেডের মাথার আঘাত আর শরীরের লক্ষণ দেখে মনে হয়েছে তিনি খুন হয়েছেন ভোরের দিকে। আততায়ী তাঁর সঙ্গেই ঘরে ঢুকেছিল। যেহেতু বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল তাই পরে ঢোকা সম্ভব নয়। আততায়ী মিস্টার মুরহেডের পরিচিত ছিল বলে সঙ্গী হতে পেরেছিল, অনুমান করা যেতে পারে। যা হোক, পুলিশ নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি আসবে। আমি আশা করছি আততায়ী পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না।"

কথাগুলো বলে অর্জুন হাঁটতে লাগল ভিলেজ সেন্টারের দিকে।

মিস্টার মুরহেডের মৃত্যুর খবর পেয়ে শুধু শিশু, অসুস্থ আর বৃদ্ধেরা ছাড়া গ্রামের কেউ যে দুপুরে খাচ্ছে না তা অর্জুন জানত না। পল এসে জিজ্ঞেস করল, "আ-আ-জ আমি লা-লা-লাঞ্চ বানাইনি তবে আপনি যদি খেতে চান তো-তো-তো বানিয়ে দিচ্ছি।" পলের কথার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব স্পষ্ট।

"লাঞ্চ বানাওনি কেন ?"

"এটা নিয়ম। যদি কেউ মা-মা-মারা যায় সবাই উপোস করি।"

"তা হলে আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ?"

"আপনি বা-বা-বাইরের লোক। নিয়ম নাও মানতে পারেন।"

অর্জুন হেসে মাথা নাড়ল। ডেরেক থেকে পল কেউ তাকে নিজেদের লোক বলে ভাবতে পারছে না। সেটাই স্বাভাবিক। সে বলল, "নাঃ। আমারও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।"

পল চলে যাচ্ছিল, অর্জুন তাকে ডাকল, "পল, এক মিনিট। তুমি কি আমার কথায় দুঃখ পেয়েছ ? তা হলে আমি ক্ষমা চাইছি।"

পল কোনও জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি তোমাকে একটা সম্ভাবনার কথা বলছিলাম। শত্রুরা তো মানুষের দুর্বলতারই সুযোগ নেয়। তুমি ওটা করবে না জেনেও তোমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম।"

হঠাৎ পল বলল, "সবাই বলছে, আপনাকে এখানে আ-আ-আনা ঠিক হয়নি। আপনি আ-আ-আসার পর এখানে প্রথম খুন হল।" কথাগুলো বলে পল চলে গেল। অর্জুনের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য-অসভ্য মানুষের এক জায়গায় মিল, কুসংস্কার এড়িয়ে থাকতে পারে না।

এখনই সে এখান থেকে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু অমল সোম তাকে কখন ফিরে যেতে হবে, বলেননি। তিনি আসবেন রবিবারে, এটুকুই জানে। অর্জুন এখানে আসার পর যা-যা ঘটেছে তার নোট রাখল কাগজে।

এক, পাহাড়ের আগুন জ্বলা প্রাকৃতিক বা ভৌতিক ঘটনা নয়। কিছু মানুষ যন্ত্রচালিত যানে চেপে পাহাড়ে এসে আগুন জ্বালায়। কিন্তু কেন ?

দুই, সেই প্রাগৈতিহাসিক বস্তুটি, যা গাছের মধ্যে ছিল, সেটাকে কেন ওরা নীচে ফেলে দিয়েছিল ?

তিন, নীচে ফেলে দেওয়ার পর সেটার খোঁজে ওরা কেন নেমেছিল ? যে ভয়ার্ত চিৎকার সে শুনেছিল সেটা কী জন্য ? বস্তুটিকে নড়তে দেখে কি ?

চার, বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফারের ডার্করুমে যে ঢুকেছিল, সে

এখানকার লোক নয়। তা হলে লোকটা আগুনের দিকে আসত না। বৃদ্ধ তাকে অনুসরণ করে এসেও শেষপর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। লোকটা গেল কোথায় ?

পাঁচ, বৃদ্ধ মারা গিয়েছেন ছবি তোলার কারণে। ওই ছবিগুলো সরাতে চেয়েছিল কে অথবা কারা ?

ছয়, যে আগন্তুকরা বাচ্চা দেখতে এসেছে এবং আসবে, তাদের সঙ্গে এইসব ঘটনার কোনও যোগাযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি। এরা কি আলাদা ?

দরজায় শব্দ হল। অর্জুন মুখ তুলে বলল, "আসুন।"

সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল চার্লস। মুখচোখে অপরাধী ভাব।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার চার্লস ?"

"আপনি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" মুখ নিচু করল লোকটা।

"আরে বসুন। হ্যাঁ, ওখানেই বসুন। হঠাৎ আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন কেন ?"

"আমার মনে হচ্ছে আপনি সব জানেন।" চার্লস মাথা নাড়ল, "আমি অনুতপ্ত, দয়া করে এই ব্যাপারটা আর কাউকে বলবেন না। তা হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।"

"তার মানে আপনি আর ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন না ?"

"না। আমার পূর্বপুরুষরা যা চেয়েছিল আমি তাই করব।"

"এটা আপনার একটা চাল নয় তো ?"

"ছি ছি। বিশ্বাস করুন। আমি মিথ্যে কথা বলছি না।"

"তা হলে আমাকে সব কথা খুলে বলুন।"

"কী কথা ?"

"গতবার যারা এসেছিল, পাকদণ্ডী দিয়ে গিয়ে যাদের সঙ্গে আপনি কথা বলেছিলেন সেই কথাগুলো আমাকে বলুন।"

"কেউ যদি জানতে পারে...।"

"আপনি সত্যি কথা বললে কেউ জানতে পারবে না।"

"আমাকে একা দেখে ওরা খুব খুশি হয়েছিল। দোভাষী বলেছিল ওরা একটা বাচ্চাকে চায়। ওদের মহাগুরু দু'বছর আগে মারা গিয়েছেন। মারা যাওয়ার আগে বলে গেছেন তিনি পাহাড়ের কোনও গ্রামে জন্মগ্রহণ করবেন। এই দু'বছর ধরে ওরা পাহাড়ে পাহাড়ে অনেক খুঁজেছে। ওদের গনৎকাররা যেদিকের হদিস দিয়েছে সেইমতো ওরা অভিযান চালিয়েছে। হিমালয়ের অনেক জায়গা ওরা হেলিকপ্টারে ঘুরে দেখেছে, গ্লাইডারে উড়ে পরীক্ষা করেছে। শেষপর্যন্ত এখন ওদের ধারণা, মহাগুরু আমাদের গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছেন। যে-কোনও মূল্যে সেই মহাগুরুকে ওরা নিয়ে গিয়ে মাথায় করে রাখবে। ওরাই প্রস্তাব দেয়, যদি আমি ওদের সাহায্য করি তা হলে দু'লক্ষ টাকা আমাকে দেবে। আমাকে প্রতিটি দু'বছরের শিশুর বর্ণনা তৈরি করতে বলেছে।" চার্লস বলল।

"কবে দিতে হবে ?"

"আজই।"

"কোথায় ?"

"যেখানে আমি ওদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সেখানে। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, যাব না। ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না।" চার্লস মাথা নাড়ল।

অর্জুন বলল, "না চার্লস। আপনি যাবেন।"

"সে কী ! আপনি আমাকে যেতে বলছেন ?"

"হ্যাঁ। তবে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য নয়, লোকগুলোকে বোকা বানাতে।"

"কীরকম ?"

"আপনি বাচ্চাদের যে তালিকা করবেন তাতে প্রত্যেকের হাবভাব, ভঙ্গি একই রকম লিখবেন। বর্ণনা পড়ে কেউ যেন পার্থক্য না করতে পারে।"

চার্লস বলল, "ওরা বলেছিল ওই বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কম কথা বলে কিনা, গম্ভীর হয়ে থাকে কিনা খুঁজে দেখতে।"

অর্জুন বলল, "না, কেউ নেই। আপনি কাউকে খুঁজে পাননি।"

"ঠিক আছে।" চার্লস মাথা নাড়ল।

"কাল রাত্রে গ্রামের মানুষ যখন আগুন দেখতে জড়ো হয়েছিল তখন আপনি কোথায় ছিলেন ? বাইরে বের হননি ?"

"না। আমার মনখারাপ ছিল, কারও সঙ্গে কথা বলতে পারিনি।"

"ঠিক আছে। আজ কখন আপনার যাওয়ার কথা ?"

"বিকেল পাঁচটার সময়।"

"আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় অর্জুন চার্লসের সঙ্গে যেখানে গিয়ে দাঁড়াল সেই জায়গাটাকে সবুজ উপত্যকা বলা যেতে পারে। একটা ব্যাপারে অর্জুনের কিছুটা উদ্বেগ ছিল। খবর দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ এখনও গ্রামে আসেনি। পুলিশ না এলে বৃদ্ধের পারলৌকিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। একটু আগে ডেরেক তার গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছে থানার উদ্দেশ্যে।

চার্লস গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "থানায় যাওয়ার পথটা কোনদিকে ? ডেরেক তো থানা থেকে ফিরবে।"

"ওই পথ ও-পাশ দিয়ে গিয়েছে। এদিক দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ। কিন্তু আমার খুব ভয় করছে, যদি ধরা পড়ে যাই ?"

"লিস্ট দেখে ওরা কিছু বুঝতেই পারবে না। এই গ্রামের শিশুদের খবর আপনার চেয়ে ওদের ভাল জানার কথা নয়।" অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে একটা ঘন ঝোপের কাছে চলে এল। ঝোপটার ভেতর ঢুকে গেলে বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না। সে বলল, "আপনি একটু ও-পাশে অপেক্ষা করুন। আমি এই ঝোপের মধ্যে রয়েছি।"

চার্লস মাথা নেড়ে এগিয়ে যেতেই অর্জুন মত পালটাল। দ্রুত সরে গিয়ে দুটো বড় পাথরের খাঁজে শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিল সে। এখানে যদিও তাকে আড়ষ্টভাবে পড়ে থাকতে হবে তবু কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। চার্লস যে এখনও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

দশ সেকেন্ডকে দশ মিনিটের মতো মনে হচ্ছিল অর্জুনের। সামনের উপত্যকায় এখন একটু-একটু কুয়াশা জমছে। দিনের আলো কমতে শুরু করলেও অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আগে অন্ধকার নামবে না। সূর্যদেব এখানে চোখের আড়ালে চলে গেলেও কিছুটা নরম আলো অনেকক্ষণ রেখে যান।

আজ চার্লসের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে অর্জুন ভেবেছে। তিব্বতি বৌদ্ধরা তাদের গুরুর সন্ধানে পৃথিবী চষে ফেলে বলে সে শুনেছে। কিছুদিন আগে একটি আমেরিকান শিশুর মধ্যে সেইসব লক্ষণ দেখে তারা মনেস্টারিতে নিয়ে এসেছে তাকে। বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে রপ্ত করাচ্ছে ভক্তিভরে। শিশুটির হাবভাব দেখে কখনওই মনে হচ্ছে না সে জন্মসূত্রে বৌদ্ধ ছিল না। অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ধর্মগুরুর মতোই সে আচরণ করছে। এ থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে তিব্বতিদের সন্ধান এবং নির্বাচন ভ্রান্ত নয়। কিন্তু মধ্য এশিয়ার কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ হিমালয়ের পাহাড়ে তাদের সদ্য জন্মানো ধর্মগুরুর সন্ধানে আসবে, এটা কল্পনা করা খুবই কষ্টকর। গনৎকারের নির্দেশমতো ওরা যেভাবে সন্ধান চালিয়েছে তা অবশ্যই ব্যয়বহুল। এই ধনী লোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা ডেরেকদের নেই। অমল সোম রবিবারে আসবেন। তার আগে যেন কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে।

এখন কেবলই তার চোখে সেই শিশুটির মুখ ভেসে উঠছিল। ওরা যে শিশু চাইছে তার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। বাচ্চাটাকে দেখলেই বোঝা যায় সে ওই বয়সের শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি বোঝে, অনেক গম্ভীর এবং মুখে একটা চাপা কৌতুকের প্রকাশ আছে। ওই লোকগুলো কি ওরই উদ্দেশ্যে এসেছে?

হঠাৎ অর্জুনের কানে গুম গুম শব্দ ভেসে এল। ঠিক গত রাতের শব্দের মতো। সে দ্রুত ঘড়িটা বের করে মুঠোয় ধরল। পাথরের আড়ালে থাকায় শরীর নাড়ানো যাচ্ছে না বটে, তবে আক্রান্ত হলে আঙুলের চাপে ঘড়িটির শক্তি প্রয়োগ করতে তৈরি হয়ে রইল। শব্দটা এগিয়ে আসছে।

একটু পরেই আকাশে একটা কালো বিন্দুকে বড় হতে দেখল অর্জুন। বিন্দুটা ক্রমশ ডানা মেলল। শেষপর্যন্ত বোঝা গেল ওর ধরন অনেকটা গ্লাইডারের মতো কিন্তু তাতে এঞ্জিন বসানো আছে। স্বচ্ছন্দে চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার উড়ে যেতে পারে। গত রাত্রে এই ধরনের বেশ কয়েকটা গ্লাইডার উলটোদিকের পাহাড়ের ওপরে নেমেছিল। অর্থাৎ চার্লসের সঙ্গে কথা বলতে যারা আসছে তারাই পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন জ্বালায়। কেন জ্বালায়?

গ্লাইডারে মাটিতে নামলে কিছুক্ষণ দৌড়তে হয়। কিন্তু যন্ত্র চলছে বলে ওটা স্থির হয়ে রইল এক জায়গায়, তারপর প্রায় হেলিকপ্টারের মতো ধীরে-ধীরে মাটিতে নামল। অর্জুন দেখতে পাচ্ছিল। চার্লস যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে একটুও নড়েনি। একটা লোক, সবুজ রঙের সালোয়ার কুর্তা পরনে, গ্লাইডার থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে এল। লোকটার কাঁধ থেকে একটা অস্ত্র ঝুলছে।

চার্লস নড়ছে না দেখে ভাল লাগল অর্জুনের। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে চার্লসের দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু নিচুগলায় কথা বললে সে কিছুই শুনতে পারবে না। এই লোকটা এসেছে দোভাষী সঙ্গে না নিয়ে। তা হলে চার্লসের সঙ্গে কীভাবে কথা বলবে ও?

লোকটা চার্লসের সামনে পৌঁছে হাত বাড়াল।

চার্লস তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সেই হাতে তুলে দিল। লোকটা কাগজে চোখ রাখল। অর্জুন দেখল দু'-দু'বার লোকটা কাগজে চোখ বোলাল। তারপর ওর চোখ-মুখে ক্রোধ ফুটে উঠল। কুটি-কুটি করে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে চার্লসকে যা বলল, তা অর্জুনের কানে গেলেও সে বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না।

চার্লস হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। বোকার মতো হাত কচলাচ্ছে। লোকটা ওর জামার কলার ধরে ঝাঁকিয়ে অনর্গল কিছু বলে যাচ্ছিল। তারপর এক ঝাঁকুনি দিতে চার্লস ছিটকে খানিকটা দূরে পড়ে গেল। চার্লসের মতো স্বাস্থ্যবান মানুষকে যে ওভাবে ফেলে দিতে পারে, তাকে সমীহ না করে উপায় নেই।

লোকটা যেরকম ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে তাতে চার্লসকে মেরেও ফেলতে পারে বলে মনে হল অর্জুনের। কিন্তু লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কুর্তার পকেট থেকে কিছু একটা বের করে কানে চাপল। ওটা কি সেলুলার ফোন? মন দিয়ে শুনে ওর ঠোঁট নড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে চার্লসের হাতে যন্ত্রটা তুলে দিয়ে ইশারা করল শুনতে।

অর্জুন দেখল চার্লস যন্ত্রটা কানে লাগিয়ে কিছু কথা শুনে জবাব দিল। দু'-তিনবার ওইরকম হওয়ার পর যন্ত্রটা ফেরত নিয়ে লোকটা ফিরে গেল গ্লাইডারের কাছে। তারপরেই গুম গুম শব্দ শুরু হল। প্রায় হেলিকপ্টারের মতো ঘুরে গিয়ে গ্লাইডারটা আবার আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে অর্জুন নিঃসন্দেহ হল চার্লস তার কথা রেখেছে। লোকটা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, তা বোঝাই যাচ্ছে। নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনতেই সে চার্লসের চোখে পড়ে গেল।

অর্জুন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "মনে হল ওই ঝোপের চেয়ে এই পাথরের খাঁজে লুকনো ভাল। যাকগে, কার সঙ্গে কথা বললে?"

"দোভাষীর সঙ্গে। সে বলল, ওই শিশুদের মধ্যে গম্ভীর প্রকৃতির কেউ আছে। তাকে ওদের চাই। যদি আমি সাহায্য না করি তা হলে মিস্টার মুরহেডের সঙ্গে আমাকেও কফিনে যেতে হবে।" বেশ ভয়পাওয়া গলায় বলল চার্লস।

"কী সাহায্য চাইল ওরা?"

চার্লস বলল, "একটি গম্ভীর প্রকৃতির অথচ সুন্দর দেখতে শিশু নাকি আমাদের গ্রামে রয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

"তারপর?"

"রবিবারে ওরা গ্রামে আসবে। কিন্তু এই লোকটা ঠিক সেই সময় আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবে। বাচ্চাটাকে সকলের চোখ এড়িয়ে এনে ওর হাতে তুলে দিলেই আমাকে টাকাটা দিয়ে দেবে। আমি এখন কী করব?"

"আপনি কী বলেছেন?"

"আমাকে তো 'আচ্ছা' বলতেই হল।"

"চলুন। ফিরে যাই।"

ফেরার পথে ওরা কথা বলছিল না। যারা বাচ্চাটাকে নিতে এখানে এসেছে তারা যে ভারতীয় নয়, তা স্পষ্ট। কিন্তু লোকগুলো নিশ্চয়ই এখান থেকে খুব বেশিদূরে ঘাঁটি গাড়েনি। হয়তো সেটা ভারতীয় এলাকা নয়। ভুটান এবং নেপাল সীমান্ত এখান থেকে মাইল কুড়ির মধ্যে। সেসব দেশের যে-কোনও পাহাড়ি জঙ্গলে জায়গায় ওরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। এই যে যন্ত্রচালিত গ্লাইডারে ওরা উড়ে আসছে তা লোকালয় থেকে সম্ভব নয়।

এগারোজনের দশজনকে এখন বাড়ি চলে যেতে বললে পারত অর্জুন। কিন্তু তাতে ওই বিশেষ শিশুটির মা-বাবা বেশি নার্ভাস হয়ে যাবেন। তার কর্তব্য বাচ্চাটাকে রবিবার পর্যন্ত রক্ষা করা। অর্জুনের হঠাৎ মনে হল, ওই বাচ্চার মা-বাবা যদি শোনেন, তাঁদের সন্তান একটি ধনী এবং শক্তিশালী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হবে তা হলে কি আনন্দিত হয়ে ওদের হাতে তুলে দেবেন? যদি দিতে চান তা হলে তো কোনও সমস্যাই থাকবে না। কিন্তু এ-কথা ওঁদের জিজ্ঞেস করবে কী করে?

গ্রামে ঢোকার সময় চার্লস জিজ্ঞেস করল, "আমি কাল কী করব?"

"ভেবে দেখছি।"

"আপনি বলেছিলেন জঙ্গলে যাবেন?"

"হ্যাঁ। আজ রাত্রে। এই ধরুন আটটা নাগাদ। আপনি ভিলেজ সেন্টারে চলে আসবেন।" অর্জুন বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফারের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল একা।

সেখানে তখন বেশ ভিড়। পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন সেপাইকে নিয়ে একজন সাব-ইনস্পেক্টর ডেরেকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাকে ডেকে ডেরেক অফিসারকে কিছু বলতেই ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। অর্জুন কাছে যেতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই অর্জুন? আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি।"

"ধন্যবাদ। আপনি এই খুনের ব্যাপারে সব তথ্য পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। শুনলাম। মুশকিল হল এদের সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। এই গ্রামকে লোকে সাহেবগ্রাম বলে। বিহারে সাহেবগঞ্জ বলে যে জায়গা রয়েছে তার যেমন কোনও বিশেষত্ব নেই, তেমনই এই সাহেবগ্রাম বলে ভেবেছিলাম আমি। অথচ

শুনলাম, এদের কাছে নাকি শেক্‌সপিয়রের নাটক আছে যা তিনশো বছর আগে ছাপা হয়েছিল। ভাবা যায়!" অফিসারের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"না, ভাবা যায় না। আমিই প্রথম শুনলাম। কিন্তু মিস্টার মুরহেড খুব ভালমানুষ ছিলেন। কেউ ওঁকে যে খুন করতে পারে তা এঁরা ভাবতে পারেন না। খুনিকে বের করা দরকার।" অর্জুন কথাগুলো বলতেই সবাই সমর্থন জানাল।

"একদিনের ব্যাপার। খুনি এখানকারই লোক। জেরা করলেই বেরিয়ে যাবে।"

"কয়েকশো মানুষকে একদিনে জেরা করা সম্ভব নয় অফিসার। তা ছাড়া খুনি কেন বাইরের লোক হবে না তাও আমি বুঝতে পারছি না।" অর্জুন বলল।

"বাইরে থেকে এসে খুন করেছে বলছেন?"

"অসম্ভব নয়।"

"বাইরের লোক এখানে ঢুকতে সাহস পাবে?"

"আপনি-আমি তো ঢুকেছি।"

"আমাকে ডেকে আনা হয়েছে। আপনি?"

"আমিও তাই।"

"আশ্চর্য! আপনার খবর এরা পেল কী করে? খুন হওয়ার পর এত তাড়াতাড়ি আপনি চলে এলেন কী করে?" অফিসার প্রশ্ন করলেন?

"আমি এসেছি কয়েকদিন হল। এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে মাঝে-মাঝেই আগুন জ্বলে। কেন জ্বলে, সেটা জানতে এসেছি।"

"ও এমন কিছু নয়। পাহাড়ে অনেক সময় এরকম হয়। কেউ-কেউ আগুন জ্বালিয়েও দেয়। তা আপনি যখন এখানে আছেন তখন খুনিকে খুঁজে দিন না!"

"আমরা সবাই চেষ্টা করছি। কিন্তু মিস্টার মুরহেডের দেহ কবে পাওয়া যাবে?"

"এটাই তো মুশকিল। পোস্টমর্টেম করতে ওঁকে শিলিগুড়িতে পাঠাতে হবে। এখন থানায় কোনও ভ্যান নেই যে তাতে পাঠাব। জিপে করে বডি নিয়ে যাওয়ার কোনও চান্স নেই। আমার একটাই জিপ। ওখানে কবে পোস্টমর্টেম হবে তাও বলতে পারছি না। তদ্দিনে বডি ডিফর্মড হয়ে যাবে।" অফিসার খুব চিন্তিত গলায় বললেন।

"সেটা অসম্ভব ব্যাপার। এঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ওঁর পারলৌকিক কাজ করতে চান।"

"ভদ্রলোকের মাথার পেছনে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখলাম। অর্থাৎ ওঁকে পেছন থেকে মাথায় আঘাত করা হয়েছে। আপনার কি তাই ধারণা?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে পোস্টমর্টেম রিপোর্টও একই কথা বলবে, সঙ্গে একটু মেডিক্যাল কথাবার্তা থাকবে। ঠিক আছে। একটু বেআইনি হয়ে যাচ্ছে অবশ্য, তবে স্থান-কাল-পাত্র বলে একটা কথা আছে। সেদিকটাও দেখা দরকার। আমি বডি নিয়ে যাচ্ছি না।"

অফিসার কথাটা বলামাত্র জনতা উল্লসিত হয়ে উঠল। মিস্টার জোন্স অফিসারের সঙ্গে করমর্দন করলেন। যে চলে গেছে তার শরীরটাকে বীভৎস দেখতে হল না বলে সবাই খুশি। বিকেল শেষ। সন্ধে নেমে গেছে। মিস্টার মুরহেডের পারলৌকিক কাজ আগামীকাল সম্পন্ন হবে। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "হত্যার মোটিভ কিছু পেয়েছেন?"

অর্জুন বলল, "ভদ্রলোক ফোটোগ্রাফার ছিলেন। ছবি তুলে বেড়ানোই ওঁর শখ ছিল। সেটা করতে গিয়ে নিশ্চয়ই এমন কোনও ছবি তুলে ফেলেছেন যা আততায়ী পছন্দ করেনি।"

"ইন্টারেস্টিং গল্পের মতো মনে হচ্ছে।"

"আপনারা যেখানে যান সেখানেই তো গল্প থাকে।"

"তা অবশ্য।" অফিসার হাসলেন। তারপরই গলা নামালেন, "আপনার যদি কাউকে সন্দেহ হয়ে থাকে তা হলে বলুন, এখনই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছি।"

"তা হলে আমাকে অ্যারেস্ট করতে বলতে হয়।"

"তার মানে?"

"আমি নিঃসন্দেহ, কাজটা গ্রামের কেউ করেনি। এদের জীবন এত জটিল নয় যে, একটা ফোটোগ্রাফকে ভয় করবে এবং তার জন্যে একটি শান্ত বৃদ্ধকে খুন করবে। কাজটা যে করেছে সে বাইরের লোক।" অর্জুন বলল।

"বাইরের লোক এখানে এলে কেউ জানবে না?"

"রাত্রে আসতে পারে। তা ছাড়া, অফিসার, আপনি কি জানেন, গ্লাইডারে চেপে আকাশে কিছু মানুষ এই এলাকায় ওড়াওড়ি করে?"

"গ্লাইডার? তাই নাকি? ও হ্যাঁ। আমার কাছে খবর এসেছিল খুব বড় চেহারার পাখিকে নাকি আকাশে উড়তে দেখা গিয়েছে। আমি পাত্তা দিইনি। এইসব পাহাড়ের লোকগুলো তিলকে তাল বানিয়ে দেয়। আপনি যখন বলছেন গ্লাইডার, তখন মনে হচ্ছে ওরা মিথ্যে বলেনি। আজই আমি এস পি-কে জানিয়ে দিচ্ছি।"

"না। আমার মনে হয় রবিবার পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করা উচিত।"

"রবিবার? কেন?"

"আমার মনে হয় সেদিন অপরাধীকে দেখতে পাব।"

"আপনি খুব হেঁয়ালি করছেন।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "সেদিন অমল সোম আসবেন। ওঁকে সম্ভবত আপনার এস পি চেনেন। আমি মিস্টার সোমের কাছেই কাজ শিখেছি।"

"আরে হ্যাঁ। আমি ওঁর নাম শুনেছি।" অফিসার উত্তেজিত।

"তা হলে রবিবার সকালেই চলে আসুন।"

অফিসার জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলে ভিড় হালকা হয়ে গেল। এবং তখন অর্জুন টের পেল তার বেশ খিদে পাচ্ছে। কিন্তু এরা যদি সারাদিন না খেয়ে থাকে তা হলে কি তার খাওয়া উচিত হবে?

সে ভিলেজ সেন্টারে ফিরে এল। মিস্টার মুরহেড খুন হয়েছেন বলেই সম্ভবত সেন্টারে পাহারা দেওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। অর্জুনের মনে হল, তাকেও ওরা সন্দেহের চোখে দেখছে। ঘরে ঢুকে ওই অসময়েও স্নান করে নিল সে। সারাদিন ধরে নানা টেনশনে কাটিয়ে মনে হল শুয়ে পড়লে ভাল হয়। খিদে শরীরটাকে আরও ক্লান্ত করে তুলেছে। এই সময় পলের সঙ্গে মিসেস বেনসন দরজায় এলেন, "অর্জুন, আমি জানতে পারলাম আপনি আমাদের মতো আজ কিছু খাননি। এটা আপনার ভদ্রতা। কিন্তু আপনি আমাদের জন্যে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন ভাবতে খারাপ লাগছে। আপনি আমাদের অতিথি। তাই অনুগ্রহ করে খেয়ে নিন।"

পল খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখল টেবিলে।

অর্জুন আর আপত্তি করল না। খাওয়া শুরু করে বলল, "পল, তুমি কি এখনও রেগে আছ?"

পল সঙ্কোচে পড়ল। মিসেস বেনসনের সামনে সে ওই বিষয়ে কথা বলতে চায় না তাই বলল, "না, না। ঠিক আছে।"

মিসেস বেনসন জিজ্ঞেস করলেন, "পল কেন আপনার ওপর রাগতে যাবে?"

"ওর রান্না ভাল নয় বলেছিলাম।"

"ওঃ। এটা কিন্তু আমার মেয়ে রেঁধেছে।"

"খুব ভাল। দারুণ। পল তুমি ওর কাছে শিখে নাও।"

পল লজ্জা পেল। কিছু বলল না।

খাওয়ার পর অর্জুন মিসেস বেনসনের সঙ্গে হলঘরে এল। এখন রাত নেমে গেছে বলেই বেশিরভাগ বাচ্চা চুপচাপ। কোনও কোনও মা ঘুমপাড়ানিয়া গান গাইছেন। অর্জুন দেখল সেই শিশুটি মায়ের পাশে বসে তাকে দেখছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিসেস বেনসন, ওই বাচ্চাটি অত গম্ভীর কেন?"

মহিলা বললেন, "ও একটু ওইরকম। ওর ঠাকুর্দা খুব ধার্মিক মানুষ ছিলেন। গ্রামের প্রত্যেকের জন্যে প্রার্থনা করতেন। ওর বাবাও ঠাকুর্দার স্বভাব কিছুটা পেয়েছে। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন ওদের সন্তান হয়নি। শেষপর্যন্ত ওরা তিনদিন ধরে চার্চে গিয়ে ধর্না দেয়। ওই তিনদিন ওদের জল পর্যন্ত খাওয়ানো যায়নি। তৃতীয় রাত্রে ওরা দু'জনে একই স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্নে মাদার নাকি তাদের আশীর্বাদ করেছেন। তখন ওরা বাড়িতে ফিরে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তার ঠিক ন' মাস পরে ওই বাচ্চাটি পৃথিবীতে আসে।"

"বাচ্চাটি জন্মানোর পর কোনও অলৌকিক কাণ্ড করেছে?"

"না তো! সবকিছুই স্বাভাবিক। শুধু বড় বেশি চুপচাপ। কেন বলুন তো?"

"আমার সন্দেহ হচ্ছে যারা রবিবার আসবে তারা ওর জন্যেই আসছে।"

"মাই গড!"

"আচ্ছা ধরুন, কোনও সম্প্রদায় যদি ওকে তাদের ধর্মগুরু করে নিয়ে যেতে চায় তা হলে কি ওর মা রাজি হবে?"

"কক্ষনো নয়। ঈশ্বরের আশীর্বাদে যার জন্ম তাকে আমরা ত্যাগ করব না।"

"ঠিক আছে। আপনাকে অনুরোধ, এই কথাগুলো ওর মাকে জানাবেন না।"

"আপনি কী করে জানলেন ওকেই ওরা চায়?"

"আমার অনুমান, এখানে একমাত্র ওরই বিশেষত্ব আছে। বিশেষত্ব আছে বলেই চাহিদা তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, আমি একটু ঘোরাঘুরি করে আসি।" অর্জুন হাসল।

মিসেস বেনসন বললেন, "আচ্ছা। কিন্তু সাবধানে থাকবেন।"

পাহাড়ে উঠতে-উঠতে চার্লস জিজ্ঞেস করল, "এই অন্ধকারে আমরা কেন যাচ্ছি?"

যদিও আজ আকাশে মেঘ না থাকায় এবং দেরিতে চাঁদ উঠলেও পথ দেখা যাচ্ছিল। অর্জুন বলল, "যে প্রাণীটি ওই শক্ত খোল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে তাকে দেখতে চাই।"

"আশ্চর্য! তাকে কোথায় এই বিশাল জঙ্গলে খুঁজে পাবেন?" চার্লস দাঁড়িয়ে গেল।

"আজ আর কাল তবু একটা সুযোগ থাকবে। মনে হয় ও বেশি দূরে যেতে সাহস পাবে না। দেখাই যাক না!" অর্জুন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল।

চার্লস আবার দৌড়ে সঙ্গ ধরল। কিন্তু আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই। যদি আক্রান্ত হই তা হলে নির্ঘাত মরে যেতে হবে। ওর পায়ের চিহ্ন যেরকম, তাতে...।"

"আক্রমণ না-ও করতে পারে। সবে একদিনের শিশু।"

"শিশুর ওইরকম পায়ের দাগ?"

ওরা ক্রমশ পাহাড়ের ওপরে উঠে এল। জঙ্গল এখান থেকে ঘন হয়েছে। এখন অন্ধকার একটু গাঢ় হওয়ায় সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। পোড়া জায়গাটার কাছে এসে ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

চার্লস ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "আমরা নিশ্চয়ই নীচে নামছি না?"

অর্জুন বলল, "নামছি। দড়িটা ওইজন্যেই তখন খুলে নিয়ে যাইনি।"

নীচে নামতে এবার তেমন অসুবিধে হল না। এখানে অন্ধকার

বেশ ঘন। ঘড়িটা বের করে অর্জুনের মনে হল চার্লস এটার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। সঙ্গে টর্চ আনা উচিত ছিল। আলোর রেখা ডালপালা কেটে পথ করে দিচ্ছে। চার্লস অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, "এটা কী হচ্ছে?"

"এটা একটা অস্ত্র। আমার পেছন-পেছন আসুন।"

"অদ্ভুত! অদ্ভুত! আচ্ছা, আপনি কেন আমাকে সঙ্গে আনলেন? ডেরেককে বললে তো...।"

"ডেরেক বিশ্বাসঘাতকতার পথে যায়নি। আপনি যা করেছেন তার জন্যে কিছু-না-কিছু শাস্তি তো পেতেই হবে।" ওরা সেই শক্ত বস্তুটির কাছে পৌঁছতেই শেয়াল জাতীয় দুটি প্রাণী দৌড়ে সরে গেল। অর্জুন ঘড়ির বোতাম টিপে আলোর রেখা নিভিয়ে দিল। একটু পরেই জঙ্গলের নিজস্ব শব্দ শুরু হয়ে গেল। চার্লস বলল, "এতবড় জঙ্গলের কোথায় আছে আপনি জানবেন কী করে?"

অর্জুন জবাব দিল না। কেউ কি বিশ্বাস করবে কোনও আদিম প্রাণীর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ডিম হাজার-হাজার বছর ধরে ফসিল হয়ে থাকার পর তার ভ্রূণ আবার প্রাণ ফিরে পেয়ে এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরকম একটা প্রাণীকে কলকাতার চিড়িয়াখানায় না নিয়ে যেতে পারলে বেঁচে থাকাই অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে এখন। অমল সোমের দেওয়া ঘড়িটার দ্বিতীয় বোতাম এখন তার ভরসা।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসতেই চার্লস তার হাত চেপে ধরল। গাছের ডাল ভাঙার শব্দ। শব্দ লক্ষ্য করে অর্জুন এগিয়ে যেতেই মাথার ওপর গুম গুম আওয়াজ শুরু হল। সেটা থেমে যাওয়ামাত্র অর্জুন চার্লসকে বলল, "এবার আমাদের লুকোতে হবে।"

"চারপাশেই তো অন্ধকার, চেষ্টা করলেও তো দেখতে পাবে না।" চার্লস বলল, "কিন্তু ওই শব্দটা আমি শুনেছি। ও হ্যাঁ, আজ বিকেলেই তো—।"

অর্জুন ওর কথা কানে না নিয়ে টেনে নিয়ে গেল একপাশে। বেশ বড় একটা গাছের আড়ালে। তারও মিনিটআটেক পরে সে আলো দেখতে পেল। জোরালো টর্চ লাইট ওপর থেকে নীচে নেমে আসছে। চারটে আলো এবং সেগুলো বেশ উঁচুতে ধরা। তারপরেই বুঝতে পারল, হাতে নয়, কয়লাখনির কর্মীদের মতো হেলমেটে আলোগুলো আটকানো, যাতে হাত খালি থাকে।

বেশ খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর ওরা সেই কঠিন বস্তুটির কাছে পৌঁছে গেল। এখান থেকে ওদের কথা বোঝা যাচ্ছে না এবং কাউকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে লোকগুলো যে হতাশ হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। ওইসময় ওরাও ডাল ভাঙার শব্দ শুনতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে চারজন সতর্ক হয়ে একটু আগে অর্জুন যে পথে এগোচ্ছিল সেই পথ ধরল। ওরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই অর্জুন বলল এই অন্ধকারে অনুসরণ করে লাভ নেই। অন্ধকারে হোঁচট খেতে হবে, নয় সাপের কামড়ে প্রাণ যাবে। বরং ওদের ফিরতে হবে এই পথেই। এখানে অপেক্ষা করাই ভাল।

হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল। পরপর বেশ কয়েকটা একটানা। তারপরই দেখা গেল জঙ্গল ভেঙে চারজন পড়ি কি মরি করে ছুটে আসছে আর তার পেছনে জঙ্গল ভাঙতে-ভাঙতে প্রায় ঝড়ের আওয়াজ এদিকেই এগিয়ে আসছে।

লোকগুলো চোখের আড়ালে চলে যাওয়ামাত্র অর্জুনের মনে হল, প্রায় হাতির মতো আকার এক অন্ধকার এগিয়ে আসছে। জন্তুটার মুখ, চোখ, শরীর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা উঁচু টিপির মতো কিছু দুলতে-দুলতে আসছে। সে ঘড়িটা তুলে দ্বিতীয় বোতাম টিপল। হঠাৎ প্রাণীটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ওটাকে নিচু হয়ে যেতে দেখল অর্জুন। এক মিনিট সময় চলে গেল, তবু নড়ছে না।

অমল সোম বলেছিলেন, হাতির মতো প্রাণীকেও ওই বোতাম টিপে অবশ করে ফেলা যায়, কিন্তু কতক্ষণ যায় তা বলেননি। বাঁ দিকে আলো দেখা গেল। যারা দৌড়ে পালিয়েছিল তারা আবার ফিরে আসছে প্রাণীটির সাড়াশব্দ না পেয়ে। দূর থেকে টর্চের আলো পড়ল প্রাণীটির শরীরে। অর্জুন দেখল বেচারা তার বিশাল চেহারা সত্ত্বেও পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। লোকগুলো দৌড়ে চলে এল কাছে। সম্ভবত ওরা ভেবেছে, ওদের গুলিতেই প্রাণীটি মারা পড়েছে।

তারপরের আধঘণ্টা প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটাল ওরা। ওপর থেকে নীচে কয়েকবার আসা-যাওয়া করে প্রাণীটিকে বেঁধে ফেলল ওরা। তারপরই হুস-হুস শব্দ শুরু হল। অর্জুন বুঝল গ্লাইডার বা কপ্টারের সঙ্গে দড়ি বেঁধে এটাকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু প্রাণীটি এত ভারী যে, একে সহজে তুলতে পারছে না যন্ত্র। অর্জুন নিঃশব্দে চার্লসকে নিয়ে দ্বিতীয় পথটা ধরে ওপরে উঠে আসতে লাগল। একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে দেখতে পেল গ্লাইডারের চেয়ে বড় একটি আকাশযানে দড়ি ওপরে টানছে। নীচে দাঁড়িয়ে একজন নির্দেশ দিচ্ছে। অর্থাৎ এখানে মাত্র দু'জন মানুষ রয়েছে।

ওরা আড়াল রেখে উঠে এল।

প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় প্রাণীটিকে ওপরে তুলল যন্ত্র। নীচের চারজন ইতিমধ্যে উঠে এসেছে। ছবির পর ছবি তুলছে ওরা। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল। ওদের ভাষা কিছুই বুঝতে পারছিল না অর্জুন। তার চোখ এখন প্রাণীটির দিকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। প্রাণীটির কাঁধ থেকে লেজ পর্যন্ত পিঠ জুড়ে ছোট-ছোট শক্ত পাখা উঁচু হয়ে রয়েছে। এই ধরনের প্রাণী একসময় উত্তর আমেরিকায় দেখা যেত। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'স্টেগোসর'। প্রচণ্ড শক্তিধর হলেও এই প্রাণীর ঘিলুর ওজন মাত্র আড়াই আউন্স। স্টেগোসরের ছবি সে দেখেছে। এরা মূলত তৃণভোজী এবং ডিম পাড়ত। কিন্তু কয়েক লক্ষ বছর আগে যে প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তার ফসিল হওয়া ডিম থেকে এই জীব বেরিয়ে এসেছে, কেউ কল্পনাও করতে পারবে না! অবশ্য পৃথিবীতে রহস্যময় ঘটনা তো ঘটেই চলেছে।

হঠাৎ প্রাণীটি নড়ে উঠল। আলোচনায় ব্যস্ত থাকা লোকগুলো প্রথমে দেখেনি। অর্জুন দেখল এবার প্রাণীটি কাত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করছে। এইসময় লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল। দ্বিতীয় বোতামটা টিপতে গিয়েও থেমে গেল অর্জুন। দেখাই যাক না! লোকগুলোর চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে লেজ নাড়ল প্রাণীটি। সঙ্গে পাশে দাঁড়করানো যন্ত্রটি দুমড়ে ভেঙে পড়ল ওর ওপর। লোকগুলো মরিয়া হয়ে গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু কোনও গুলিই প্রাণীটির চামড়া ভেদ করতে পারছে না। তার বদলে কপ্টারের ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গেল। সেই জ্বলন্ত পেট্রল প্রাণীটির শরীরে পড়ামাত্র বীভৎস ঘটনা ঘটল। জ্বলন্ত প্রাণীটি ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর। একজন প্রাণভয়ে পালিয়ে আসছিল এদিকে। অর্জুন তাকে আঘাত করতে সে মাটিতে পড়ে গেল। আর তৎক্ষণাৎ চার্লস হাত চালিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলল।

কিছু করার ছিল না। চোখের সামনে প্রাণীটির সৎকার হয়ে গেল। যাওয়ার আগে সে অবশ্য চার-পাঁচ শত্রুকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। পরে, অর্জুন শুধুই আক্ষেপ করেছে, এই প্রাণীটিকে বাঁচাতে পারেনি বলে। দ্বিতীয়বার বোতাম টিপে অজ্ঞান করে দিলে হয়তো সেই সুযোগ পাওয়া যেত। পাঁচটি মৃতদেহের পাশে একটা ঝলসানো মাংসের স্তূপ পড়ে আছে। যা হয়তো বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য করবে, সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবে।

লোকটিকে বয়ে নিয়ে এল ওরা। জ্ঞান হওয়ার পরও ওর পক্ষে হাঁটা সম্ভব ছিল না। তখন গ্রামের মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। ভিলেজ সেন্টারে নিয়ে এসে মিস্টার জোন্সকে খবর দিল অর্জুন। সেই রাতেই ভিড় জমে গেল সেন্টারের সামনে। পাহাড়ে যারা আগুন জ্বালে তাদের একজনকে ধরা গেছে। দেখার কৌতূহল প্রত্যেকের। অনেক কষ্টে সবাইকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। অর্জুন ডেরেককে বলল তাদের ডাক্তারের কাছ থেকে সেই পুরিয়া এনে লোকটাকে খাওয়াতে। ওকে একটা ঘরে বন্দি করে রাখা হল।

পরদিন সকালে লোকটাকে একটু সুস্থ মনে হল। প্রথমে লোকটা এমন ভান করছিল, যাতে মনে হচ্ছিল সে ভাষা বুঝতে পারছে না। কিন্তু অর্জুন ওকে চিনতে পেরেছিল। এই লোকটাই বিকেলে গ্লাইডারে উড়ে এসে চার্লসের সঙ্গে কথা বলেছে। ইশারায় কথা বললেও চার্লসের লেখা পড়েছে। যে ইংরেজি পড়তে পারে, সে কথা বলতে পারবে না? ভাঙা-ভাঙা হলেও তো পারা উচিত। অর্জুন চাপ দিতে লাগল। শেষপর্যন্ত মুখ খুলল লোকটা।

"আমরা আছি এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে ভুটানের জঙ্গলে। আমাদের ধর্মগুরু মারা যাওয়ার পর শয়তানের অভিশাপ নেমে আসছিল। ধর্মগুরু বলেছিলেন তাঁর পুনর্জন্ম হবে ভারতবর্ষে, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে নয়। আমাদের গনৎকাররা বলেছিল ধর্মগুরু সেই জায়গায় জন্মেছেন, যেখানে এখন পৃথিবীর আদিম প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। আমরা অনেক খুঁজেছি গত দু'বছর ধরে। শেষপর্যন্ত ওই পাহাড়ে আমরা অভিযান চালাই। আমরা একটা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চারপাশ খুঁজতাম। এই গ্রামের অস্তিত্ব জানার পর আমরা নিঃসন্দেহ হই ঠিক জায়গায় এসেছি। ক'দিন আগে হঠাৎই একটা আদিম গাছের ভেতর ডিমটাকে আবিষ্কার করি। এটাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানে নীচে পড়ে যায়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওটা থেকে বাচ্চা বেরিয়ে সেটা এত বড় হয়ে যাবে কেউ কল্পনা করিনি!" লোকটা কাতর গলায় বলল।

"এখন আপনার কী চাই?"

"এই গ্রামে আমাদের ধর্মগুরু আছেন। তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যেতে চাই।"

"আপনি যাকে ধর্মগুরু বলছেন সে দু' বছরের শিশু। তার কোনও চৈতন্য হয়নি। সে তার মাকে এবং মা তাকে ছেড়ে কী করে থাকবে? কোনও মা কি সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারে, না ছেড়ে দেয়?"

"আমরা ওর মাকেও নিয়ে যেতে পারি, যদি যেতে চান।"

"আপনারা পাগলামি করছেন। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়। তখন তার স্মৃতি পড়ে থাকে।"

"না। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আবার জন্মেছেন।"

"কিছু প্রমাণ আছে?"

"আছে। সেই শিশুর দুই ভুরু জোড়া হবে এবং ডান হাতে রেখা থাকবে না।"

অর্জুন কথা না বাড়িয়ে ওপরে চলে এল। প্রথমেই সে গম্ভীর শিশুটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অর্জুনের সঙ্গে ডেরেক এবং মিসেস বেনসন আছেন। শিশুটির ভুরু জোড়া নয়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। একে-একে সবক'টি ছেলেকে দেখা হল। না, কারও সঙ্গে ওই বর্ণনার মিল নেই। চলে আসছিল অর্জুন। হঠাৎ বাকি দুটি মেয়ের একজনের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। শিশুটির ভুরু জোড়া। কাছে গিয়ে ওর ডান হাত তুলে মুঠো খুলতেই দেখতে পেল হাতে কোনও রেখা নেই।

মিসেস বেনসন আর্তনাদ করে উঠলেন। সেই বাচ্চার মা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর সন্তানকে। অর্জুন তাঁকে বলল, "ভয় পাবেন না। ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয়নি।"

সেই দুপুরে মিস্টার মুরহেডের পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করা হল।

সেই সকাল থেকেই বন্দির শরীর অসুস্থ হল। তার গায়ে বেশ জ্বর। ওকে জেরা করার অবকাশ পাওয়া যায়নি।

রবিবার সকালে অমল সোম এলেন পুলিশ অফিসারের জিপে চেপে। ডেরেক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। এই গ্রাম এবং তার মানুষদের দেখে তিনিও বেশ অবাক! অর্জুনের ঘরে এসে তিনি বললেন, "বেশ ভালই তো ছিলে বলে মনে হচ্ছে।"

"ছিলাম কিনা জানি না। কিন্তু একটা অন্যায় করে ফেলেছি।"

"কীরকম?"

অর্জুন তখন বিশদ জানাল। পাহাড়ে আগুন, স্টেগোসর, কপ্টার ভাঙা, আগুন লাগা এবং সেই পাঁচজনের মৃতদেহ পাহাড়ে পড়ে থাকা, সব। অর্জুন বলল, "আমার উচিত ছিল থানায় জানানো। কিন্তু খবরটা গ্রামের বাইরে গেলে আজ যাদের আসার কথা তারা আসবে না, এই ভয়ে জানাইনি।"

"এখান থেকে কত দূরে?"

"বেশি সময় লাগবে না।"

অমল সোম পুলিশ অফিসারকে ডেকে বুঝিয়ে বললেন। অফিসার সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন সেপাইকে পাঠিয়ে দিলেন স্পটে। চার্লস ওদের পথ দেখাল।

শিশুরহস্য শোনার পর অমল সোম বললেন, "ডেরেকের কাকার হত্যাকারী কে?"

"ওই বিদেশিদের কেউ হবে।"

"হতে পারে, নাও হতে পারে। ওই ভদ্রলোক ছবি তুলতেন। সেই ছবিতে নিজেকে দেখতে চায় না এমন লোক বিদেশিরা হবে কেন? তারা তো তোয়াক্কাই করবে না। যে করবে সে এখানকার লোক।" অমল সোম বললেন, "ডেরেক, তুমি রটিয়ে দাও, যেসব ছবি তুমি আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে তা আমি সঙ্গে এনেছি।"

ডেরেক মাথা নেড়ে চলে গেল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তা হলে চার্লসকে সন্দেহ করতে হয়।"

"কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এমনকী ডেরেকও। এই ব্রিফকেসটা তোমার টেবিলে রাখো। দাঁড়াও, অ্যালার্মটা সেট করে দিই।" অমল সোম ব্রিফকেসের বোতাম টিপে অর্জুনকে দিলেন। সেটা টেবিলে রেখে দিল অর্জুন।

বেলা বারোটায় দু'জন লোক এবং দোভাষী গ্রামে এল।

মিস্টার জোন্স তাদের নিয়ে এলেন ভিলেজ সেন্টারের সামনে। জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল চারপাশে। অর্জুন এবং অমল সোম পুলিশ অফিসারকে নিয়ে ভিড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দোভাষী বিনীত গলায় বলল, "আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আপনারা আমাদের প্রস্তাব কি বিবেচনা করেছেন?"

মিস্টার জোন্স বললেন, "সেটা সম্ভব নয়।"

দোভাষী বলল, "আমাদের ধর্মগুরু আপনাদের এখানে যে আছেন সে-ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। তাঁকে নিয়ে যাওয়া আমাদের পবিত্র কর্তব্য।"

মিস্টার জোন্স বললেন, "এখানে কোনও ধর্মগুরু নেই।"

ডেরেক বলল, "আপনারা যদি শিশুদের দেখে সন্তুষ্ট হতে চান তা হলে তাদের নিয়ে আসছি।"

"দয়া করে আনুন।"

ন'টি শিশুকে নিয়ে আসা হল। আগন্তুকরা গভীর আগ্রহে তাদের পর্যবেক্ষণ করল। ক্রমশ হতাশা ফুটে উঠল তাদের মুখে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল তারা। এবার অমল সোম এগিয়ে গেলেন, "আপনাদের সমাজে নারীর স্থান কীরকম ? তারা কি ধর্মাচরণ করে ?"

দোভাষী বলল, "ধর্মের অনুশাসন তাদের মানতে হয়। কিন্তু তাদের ওপর দায়িত্ব সংসার দেখাশোনা করা। কোনও ধর্মীয় ব্যাখ্যা অথবা ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করার দায়িত্ব তাদের দেওয়া নিষেধ।"

অমল সোম বললেন, "তা হলে তো আপনাদের ফিরে যেতে হয়।"

দোভাষী বলল, "এই ন'জনই ওই বয়সের শিশু এই গ্রামে আছে ? আর কেউ নেই তো! সন্দেহের কারণ, আমাদের গনৎকাররা ভুল করেন না।"

"আছে। তারা মেয়ে। দেখবেন ?"

"না। মেয়ে হয়ে আমাদের ধর্মগুরু জন্মাতে পারেন না। তাকে কেউ মেনে নেবে না।"

এই সময় চার্লস সেপাইদের নিয়ে ফিরে এল।

পাহাড়ের অনেকটা খুঁজে ওরা কোনও মৃতদেহ পায়নি। এমনকী সেই প্রাণীটির শরীরের কোনও অবশিষ্ট নেই। অবশ্য কপ্টারের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে সেখানে। পাঁচটি মৃতদেহ উধাও হয়ে গিয়েছে।

পুলিশ অফিসার বললেন, "বাঁচা গেল !"

দোভাষী বলল, "আপনারা যাদের মৃতদেহ খুঁজছেন তারা কারা ?"

অমল সোম বললেন, "পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল কিছু বিদেশি। তারাই ওখানে এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে।"

"দুর্ঘটনা ঘটেছিল ?"

"হ্যাঁ। বোধ হয় কপ্টারে আগুন ধরে গিয়েছিল।"

"আপনারা ভুল করছেন। কেউ আপনাদের ভয় দেখাতে চায়নি। পাহাড়ে আগুন জ্বেলে ওরা সম্ভবত কোনও আদিম প্রাণী খুঁজছিল। আমাদের গনৎকাররা তাই বলেছেন। সেই প্রাণীকে ওরা খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু পাঁচজন নয়, ছ'জনের ওখানে থাকার কথা।"

এবার ডেরেক বন্দিকে বের করে নিয়ে এল। সে এখনও পুরো সুস্থ নয়। তাকে দেখে ওরা ছুটে গেল। নিজেদের ভাষায় কথা বলতে লাগল।

দোভাষী বলল, "আমরা নিঃসন্দেহ, শিশুটি এখানে আছে।"

"আছে।" অমল সোম বললেন। তাঁর নির্দেশে শিশুকন্যাকে নিয়ে আসা হল। তার ভুরু এবং হাতের রেখা দেখে ওরা দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। বারংবার মাথা নেড়ে কাঁদতে শুরু করল।

অমল সোম বললেন, "এই মেয়েকে কি আপনারা চান ?"

ওরা মাথা নাড়ল, "না।"

ওরা ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু অফিসার ওদের আটকালেন, "আপনাদের আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

দোভাষী জিজ্ঞেস করল, "কেন ?"

"অনেক অভিযোগ। ভারত সীমান্তে বেআইনি আকাশযান ব্যবহার করা, বন্যপ্রাণী হত্যা, এদের ভয় দেখানো। ওখানে গিয়ে সেসব শুনবেন।" অফিসারের ইঙ্গিতে সেপাইরা ওদের হাতকড়া পরিয়ে দেওয়ামাত্র ভিলেজ সেন্টারের ভেতর থেকে অ্যালার্ম বাজার আওয়াজ ভেসে এল।

অর্জুন দৌড়ে ভেতরে যেতেই ওপর থেকে এডকে নেমে আসতে দেখল ভয়ার্ত মুখে। সে চিৎকার করে বলল, "মিস্টার এড, আপনি !"

এড ধরা পড়ল। চাপের মুখে এড স্বীকার করল। চার্লসের কথা শুনে তার মনে লোভ জেগেছিল। কিন্তু চার্লসের সঙ্গী হয়ে নয়, আলাদা আগন্তুকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকাটা পেতে চেয়েছিল সে। তার সন্দেহ হয়েছিল পাহাড়ে আগুন জ্বলার সঙ্গে আগন্তুকদের সম্পর্ক আছে। সে সাহস করে ওইরকম আগুন জ্বলার সময় পাহাড়ে গিয়েছিল। আর তখনই বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফার ছবি তোলেন। তার ভয় হচ্ছিল তাকে ওই ছবিতে দেখা যাবে। আগুনের কাছে তাকে দেখতে পেলে কথা উঠবে। তাই সে প্রথমবার নেগেটিভ এবং ছবি চুরি করে। কিন্তু তাতে তার ছবি ছিল না। সে দ্বিতীয়বার ভাল করে দেখতে বৃদ্ধের ডার্করুমে ঢুকলে বৃদ্ধ জেগে ওঠেন। সে পালায়। বৃদ্ধ তাকে অনুসরণ করেন। সে আগুনের দিকে এগিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। তখন বৃদ্ধ পেছন থেকে তার কিছু ছবি তুলেছিলেন। ওই কারণেই নিজেকে বাঁচাতে সে সবাই চলে গেলে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁকে খুন করতে বাধ্য হয়। ফিল্ম নিয়ে সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। আজ যখন শোনে গোয়েন্দার ব্রিফকেসে বৃদ্ধের তোলা ছবি আছে, তখন প্রমাণ লোপ করার জন্য সে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। অর্জুন এডের জুতো পরীক্ষা করল। জানলার নীচের ছাপের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই।

আততায়ী এবং আগন্তুকদের নিয়ে অফিসার নেমে গেলেন তাঁর গাড়িতে। মিস্টার জোন্স একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন অমল সোমের হাতে।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ?"

"সামান্য সম্মানদক্ষিণা।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "এটা এখানকার বাচ্চাদের জন্যে খরচ করবেন। এই গ্রামে এসে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, তার মূল্য টাকার চেয়ে অনেক বেশি।"

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেরেকের গাড়ি করে ওঁরা ফিরছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হতে অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ঘড়িটা কোথায় ?"

অর্জুন তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করে দিয়ে বলল, "এটা খুব উপকার করেছে।"

অমল সোম সেটা দেখতে-দেখতে বললেন, "হুঁ। কভার দেখছি না। সেটা কই ?"

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল, "ওটা জঙ্গলে কখন পড়ে গিয়েছে, খুঁজে পাইনি।"

"এই নিয়ে দু'বার হারাল।"

"তার মানে ?"

"প্রথমবার আমিই হারিয়েছিলাম। কিছুতেই সতর্ক হতে শিখলাম না আমি।"

"আমিও।" অর্জুন নিচুগলায় বলল।

রতনমণি বনাম ভবকান্ত

বাণী বসু

বরদাচরণ এইচ এস স্কুলের ব্যাপারই আলাদা। টিফিন-টাইমে মাস্টারমশাইদের বিশ্রাম-ঘরে যাও, এলাহি কাণ্ড দেখবে। দেখবে রবি রায় আর দুলাল দে এককোণে একটি 'চাইনিজ চেকার'-এর বোর্ড পেতে ফেলেছে। এরা দু'জনে এ-অঞ্চলের বিখ্যাত দাবাড়ু। দাবায় বসলে আর জ্ঞান থাকবে না তাই চাইনিজ চেকার। ওদিকে শ্যামল, বারীন আর মনোজ তিন ছোকরা মাস্টার এমন তক্কো জুড়ে দিয়েছে যে, তাদের কৌটো-বাটা খুলে এ-ও-সে যে পাউরুটির কোফতা, মটরশুঁটির ঘুগনি, স্যান্ডউইচ সন্দেশ এইসব ভাল-ভাল দ্রব্য বেছে-বুছে খেয়ে যাচ্ছে, তারা টেরই পাচ্ছে না। এককোণে দেখবে ঝুল কালো স্টোভের ওপর ঝুল কালো কেটলি বসিয়ে ভবানীচরণ চা করে যাচ্ছে। ভবানী হল এ-স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বরদাচরণ সরখেলের নাতকুড়। লেখাপড়া করেনি, স্কুলে তাকে বেয়ারা কাম পিওনের কাজ দেওয়া হয়েছে। টিফিন-পিরিয়ডে চা-জলখাবার করে ভবানী উপরি দু' পয়সা কামায়। "মামলেট, মামলেট," সে হাঁকে, "হাঁসের ডিমের মামলেট !"

অনেক মাস্টারমশাইই বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন, জপতপ করেন। তাঁরা মুরগির ডিম ছোঁন না। কিন্তু হাঁসের ব্যাপারে তাঁদের আপত্তি নেই। হাঁস পবিত্র পাখি।

"ধুত্তোর নিকুচি করেছে তোর মামলেটের।" এই বিরক্ত রবটি নিকুঞ্জবাবুর। তিনি কোণের দিকের একটি বেঞ্চিতে দু' ভল্যুম ডিকশনারি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। রুমাল দিয়ে চোখে ফেট্টি বাঁধা। প্রতি অফ পিরিয়ডেই তিনি এই কম্মোটি করে থাকেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন, "শক্তি সঞ্চয় করছি।" তা অবশ্য নিকুঞ্জবাবু বলতেই পারেন, 'মারকুটে নিখঞ্জ' বলে তাঁর বেশ একটা খ্যাতি আছে। ইলেভেনের কমার্স সেকশনের ছেলেরা স্কুলের নামকরা মাফিয়া, যে-কোনও অপকর্মে তারা সবসময়ে এগিয়ে থাকে। এদের জব্দ করতে পারেন একমাত্র নিকুঞ্জ দেব। শ্রেফ থাপ্পড় মেরেই ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করবার ক্ষমতা ধরেন তিনি।

এরই মধ্যে ঈশান কোণে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে, পাশাপাশি কিংবা মুখোমুখি বসে আছেন ভবকান্তবাবু, ভূগোল স্যার, আর রতনমণিবাবু বায়ো স্যার। দু'জনেরই খুব রেলা। ভবকান্তবাবুর ব্যায়াম করা বিরাট চেহারা, চুল ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি চাঁছা-ছোলা, খাকি রঙের ঝোলা ফুলপ্যান্ট আর সবুজ ডোরাকাটা ঝলমলে শার্ট পরেন তিনি। গালগুলো এমন ফুলো যে, দেখলে মনে হয় ভেতরে পানের টিপলি, কিংবা অন্তত‌পক্ষে হর্তুকি-টর্তুকি রেখে দিয়েছেন। এদিকে রতনমণিবাবু খুবই রোগা এবং ফর্সা। ধুতি-পাঞ্জাবি ধবধবে করে কাচা, কড়কড়ে করে মাড় দেওয়া। সন্তর্পণে চলাফেরা করেন, বসার জায়গায় সবসময়ে একটা রুমাল বিছিয়ে নেন। লোকে বলে থাকে রতনমণি জামাকাপড় পরেন না, জামাকাপড়ই রতনমণিবাবুকে পরে থাকে। তা, কী কুক্ষণে যে এই দু'জনের দেখা হয়েছিল ! রতনমণি আর ভবকান্ত একেবারে আদায় কাঁচকলায়। একই দিনে, একই সময়ে কাজে যোগ দিয়েছেন অথচ এতটুকু ভাব-ভালবাসা নেই দু'জনের মধ্যে।

রতনমণিবাবু খুবই ঝগড়াটে, বদরাগী, সবাই জানে। কিন্তু ওঁদের মধ্যের গোলমালটা নাকি ভবকান্তবাবুই শুরু করেছিলেন ! ইন্টারভিউ দিতে এসে নাকি ভবকান্তবাবু রতনমণিকে দেখে মুচকি হেসেছিলেন।

কথাটা ভবকান্ত স্বীকার করেন না। এসব কথা কেই-বা স্বীকার করে ! কিন্তু ভবকান্ত দিব্যি গেলে বলেন, তিনি হাসেননি। এদিকে রতনমণি বলেন, "আমায় দেখেই যেন সিগারেট ধরাচ্ছে, দেশলাইয়ের আগুন আড়াল করছে, এমনি ভাব করে হাতের ওই বাঁদুরে পাঞ্জার আড়াল দিয়ে হাসল।"

ভবকান্ত বলেন, তিনি হাসেননি। তাঁর মুখটাই অমন হাসি-হাসি।

"হাসি-হাসি না আরও কিছু। হুতোম-প্যাঁচার মতো মুখ, তার আবার..."

"হুতোম-প্যাঁচাই হোক আর লক্ষ্মী প্যাঁচাই হোক, অন্তত‌পক্ষে হুঁকোমুখো তো আর নয় !"

"দেখলে, দেখলে ! শুনলে তোমরা !" রতনমণিবাবু হুঙ্কার দেন। সবাই মিলে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করে তিনিই আগে হুতোম-প্যাঁচা বলেছিলেন, ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতেই হবে।

রতনমণিবাবু কিন্তু এ-যুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, হুতোম প্যাঁচার চেয়েও হুঁকোমুখো অনেক গুণে খারাপ, অনেক যাচ্ছেতাই।

যাই হোক, সেই আদি হাসির প্রশ্নের সমাধান হয় না। সমস্যাটা রয়েই যায়। আজ যেমন, ঈশান কোণে বসে ভবকান্তবাবু আপনমনে টিফিন খাচ্ছেন, হঠাৎ পা নাচানো থামিয়ে রতনমণিবাবু বলে উঠলেন, "আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল ভ্যাবাকান্ত।"

ভবকান্ত যেমন টিফিন খাচ্ছিলেন খেয়ে যেতে থাকলেন, একবার মাত্র ঘাড় কাত করে চেয়ে দেখলেন রতনমণির দিকে। অর্থাৎ তিনি কথা বাড়াতে চান না। কিন্তু রতনমণি শুনবেন কেন, তাঁর ভেতরটা তিরিবিলি দিয়ে জ্বলছে যে ! তিনি বলতেন, "কিছু বলছেন না যে বড় !"

অগত্যা ভবকান্তবাবুকে মুখ খুলতেই হয়। তিনি নিচু গলায় বললেন, "বলব আর কী ? বললে তো বলতে হয় নামটা বরং আপনিই পালটে ফেলুন। অর্থহীন, বাজে নাম একটা !"

আর যায় কোথায়, রতনমণি কোঁচা হাতে লাফিয়ে উঠলেন।

"আমার নাম অর্থহীন ? বাজে ? জানেন কে রেখেছিলেন নামটা !"

"যিনিই রাখুন, রতন মানে যা, মণি মানেও যে তাই-ই, এ-কথাটা তাঁর খেয়াল রাখা উচিত ছিল।" বলে ভবকান্ত ধীরেসুস্থে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে ফেললেন।

"যে থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে জিবেগজা আর শসা খায়, তার আর কত বুদ্ধি হবে !" রতনমণিবাবু অবজ্ঞার সঙ্গে বলে উঠলেন।

ভবকান্ত রুমালটা ঝেড়ে পকেটে পুরে বললেন, "দেখুন ডবলমণিবাবু, জিবেগজা খেতে আমি ভালবাসি। মোগলাই পরোটা নয়, কবিরাজি কাটলেট নয়, এমনকী আপনাদের চাউ-মিং না কি, তা পর্যন্ত নয়। নেহাতই গেঁয়ো, মফস্বলি জিবেগজা। আর ইস্টিশানের জিবেগজাটা খুব সুবিধের নয় বলেই তাকে কাউন্টার করতে খাই শসা, অ্যান্টাসিড। আর পেট ভরাতে থিন অ্যারারুট বিস্কুট ছাড়া কীই-বা খাব ? ভূ-ভারতে এমন নির্দোষ খাদ্য আর পাবেন ? ভবানীর চা হজম করাবে এমন বিস্কুট তো চাই ! কী বুঝলেন ?"

"তাই বলে আপনি রোজ আমার পাশে বসে থিন অ্যারারুট বিস্কুট আর জিবেগজা খাবেন শসা দিয়ে ? তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ? সহ্য করা যায় ?"

"ঠিক আছে, আপনার এত যখন অসহ্য লাগছে তখন আপনার পেছনে বসে খাব কাল থেকে।"

"পেছনেই বসুন আর সামনেই বসুন, একটু নড়লে-চড়লেই তো আমি দেখতে

পাব !"

"তবে কি করিডরে ছেলেদের গুঁতোগুঁতির মধ্যে গিয়ে খেতে বলেন ?" রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে রতনমণি বললেন, "তবু আপনি ওই অদ্ভুত টিফিন খাওয়া ছাড়বেন না ?"

"দেখুন ডবলমণিবাবু, আপনাদের এই ধ্যাধধেড়ে গোবিন্দপুরের ইস্কুলে দশটায় হাজরে দিতে আমায় ভোর চারটেয় উঠে বাড়ির কাজ সারতে হয়। এগারো মাইলের মতো রাস্তা সাইকেল ঠেঙিয়ে আটটা দশের ট্রেন ধরব বলে আমার বুড়ি-মা ভোর ছ'টায় ভাতে ভাত ফুটিয়ে দেন। এর ওপর তাঁকে কচি-খোকার মতো নুচি-তরকারি টিফিন দিতে বলতে আমার লজ্জা হয়, বুঝলেন ? নইলে আপনার মতো নুচি, পরোটা, মিং-ফিং আমিও খেতে পারতুম।"

মাথা উঁচু করে গদাইলশকরি চালে বাইরে চলে যান ভবকান্তবাবু।

সুপ্রিয় সরকার, তথাগত সমাজদার, নিরঞ্জন বারুই, সাক্ষীগোপাল ভড়, কালোবরণ তফাদার এরা সবাই হইহই করে ওঠে।

"এ আপনার ভারী অন্যায় রতনমণিবাবু, শুধু-শুধু ভবকান্তবাবুর পেছনে লাগেন। তাই বলে ও আঠারোখানা থিন অ্যারারুটের বিস্কুট খাবে ? আমি গুনে দেখেছি, একখানা বেশি নয়, একখানা কম নয়, ঠিক আঠারোখানা। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন।"

"এটা কী বলছেন রতনমণিবাবু ? তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কি স্কুলই বসে ? পুজোর ছুটি আছে, গরমের ছুটি আছে, রবিবার, পাবলিক হলিডেজ আছে, তার ওপর বন্‌ধ,রেল রোকো, বিষ্টিবাদল..."

রতনমণিবাবু বললেন, "তাই বলে আমায় ডবলমণি বলবে ?"

তথাগত, কালোবরণের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে।

নিরঞ্জনবাবু বলেন, "বাঃ আপনি যে ওঁকে ভ্যাবাকান্ত বললেন, তার বেলা ?"

রতনমণি কিন্তু কিছুতেই মানতে চান না যে, ডবলমণি আর ভ্যাবাকান্ত তুল্যমূল্য। তাঁর মতে ডবলমণি আরও অনেক, অনেক অবজ্ঞাসূচক।

এখন, ভবকান্তবাবুকে সব্বাই সমীহ করে। ভালবাসে। ভরসাও করে। একে তাঁর গায়ে এত জোর। তার ওপরে উচিত কথা বলতে তিনি কাউকে ডরান না। যা বলবার সোজাসুজি বলেন। কোনও কারণে যদি হেডমাস্টারমশাইকে কিছু নালিশ জানাতে হয় তো সবাই-ই ভবকান্তবাবুকে ধরে। 'রেল রোকো' হয়েছে, অর্ধেক মাস্টারমশাই তাই আসতে পারেননি। ছাত্ররা সব আঞ্চলিক, মাস্টারমশাইও বেশ কিছু আঞ্চলিক। তো তাঁদের নিয়েই হেডসার স্কুল চালিয়েছেন, বাকিদের ছুটি কাটা যাবে। ভারী অন্যায়। রেল রোকো হয়েছে তো কী করব ? মাস্টারমশাইরা গুলতুনি করছেন। ভবকান্তবাবুকে গিয়ে ধরা হল। ভবকান্তবাবুর অবশ্য ছুটি কাটুক না কাটুক কিছুতেই কিছু এসে যায় না। তবু পাঁচজনে যখন বলছে এবং কথাটার যখন যুক্তি আছে, তখন তিনি যাবেন।

একাই যান ভবকান্তবাবু। গিয়ে বলেন, "মাস্টারমশাই, আমাদের যে ডানা নেই সেটা কি আমাদের দোষ, আজ্ঞে ?"

"মানে ?" ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান হেডমাস্টারমশাই।

"মানে আর কী ? রেল রুকলে তো আর ডানা মেলে উড়ে আসতে পারি না, ওটা মাফ করে দিতে হচ্ছে।"

মাফ করে দেন, কিন্তু মনে-মনে বিলক্ষণ চটে থাকেন হেডমাস্টারমশাই।

ইন্টার স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বরদাচরণ এইচ এস এবারে লাঞ্চ দেবে। টাকা যা উঠেছে তাতে করে পাউরুটি আর ডিমের ঝোল হচ্ছে। ছেলেরা, মাস্টারমশাইরা সবাই ধরেছেন আগের বারে শান্তিরাম স্কুল লাঞ্চে এর ওপর কলা দিয়েছিল। আমাদের অন্তত কলা আর তার ওপর একটা করে নলেন গুড়ের সন্দেশ দিতে হবে। নইলে মান থাকবে না।

ভবকান্তবাবুকে ব্যাপারটা বোঝানো গেছে। ভবকান্তবাবুও ব্যাপারটা হেড মাস্টারমশাইকে বুঝিয়ে এলেন। ফলে স্কুল-ফান্ডের আরও কিছু গাঁট-গচ্চা গেল। দিলেন বটে, কিন্তু মনে-মনে হেডমাস্টারমশাই চটে রইলেন।

ভবকান্তবাবু যে কেন এগারোখানা স্টেশন ঠেঙিয়ে বরদাচরণ এইচ এস স্কুলে মাস্টারি করতে আসেন তা কেউ বুঝতে পারে না। বেশ কিছু জমি-জিরেত, গোরু-ছাগল, বাগান-পুকুর তাঁর রয়েছে দেশে। সেসব তিনি দেখাশোনাও করেন, কোনও-কোনও সময়ে বেশ হিমশিমও খেয়ে যান। রাত থাকতে তাঁকে বিছানা ছাড়তে হয়। কী শীত, কী গ্রীষ্ম,উঠে গোরুকে খেতে দেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুধ দোয়ান। মুনিশদের জলপান বার করে দেন। শীতে হিম হয়ে থাকে চারদিক, বর্ষায় জল থই-থই। তবু তাঁর বরদাচরণ স্কুলের ভবানীচরণের চা নইলে ভাত হজম হয় না। আসল কথা, পাঁচটা লেখাপড়া-জানা লোকের সঙ্গে কথা কইতে না পারলে, কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে নিজের চোখে দেখতে-শুনতে না পারলে তাঁর ভাল লাগে না। আর একটা কথা, ভবকান্ত ছোট ছেলেপিলে ভালবাসেন। তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে পড়াতে, গপ্পো বলতে, তাদের নিয়ে মজা করতে ভবকান্তবাবুর ভারী ভাল লাগে।

এই যেমন ধরো সেদিন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে আরাম করে কেঠো চেয়ারটায় বসেই ভবকান্তবাবু ডাক দিলেন, "পটল !"

অমনই তৃতীয় বেঞ্চি থেকে যে ছেলেটি উঠে এল তাকে অবিকল একটি পটল বলেই মনে হবে। মাথার দিকে, পায়ের দিকে সরু, মাঝখানটা ফুলো, আবার ডোরাকাটা জামা পরেছে।

পটলের আসল নাম যা-ই হোক, ভবকান্তবাবু তার পটলত্ব আবিষ্কার করবার পর কেউ আর তার আসল নাম মনে রাখেনি।

পটলকে ডেকে ভবকান্তবাবুর প্রথম কাজই হল পটলের পেট টিপে দেওয়া, দিয়ে-টিয়ে তিনি বলবেন, "পটলের বিচি," অমনই ক্লাসসুদ্ধু সবাই বলে উঠবে, "উচ্ছের কচি।"

"কচি পাঁঠা বুড়ো মেষ" ভবকান্তবাবু হাঁকবেন। ছেলেরা অমনই বলবে "দইয়ের আগা ঘোলের শেষ।"

আর সারাক্ষণ পটল হাঁসফাঁস করতে করতে হাসবে। ভবকান্তবাবু যদি বলেন, "অমন হাঁসফাঁস কচ্ছিস কেন রে ?"

পটল বলবে, "বিচিগুলো বড্ড গজগজ কচ্ছে যে সার।"

"কেন, বিচি বার করে দোলমা করতে হবে ?"

পটল জোরে-জোরে ঘাড় নাড়বে।

ভবকান্তবাবুর ঢালাও অর্ডার হবে, "এই, তোরা পটলকে দোলমা বানিয়ে আন।"

অমনই ছেলেদের হাতে হাতে পটল চলে যাবে একটা হাইবেঞ্চে। শুয়ে পড়বে উপুড় হয়ে, আর ছেলেরা তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত টিপেটুপে দিতে থাকবে। পটল মাঝে-মাঝে, 'এই কাতুকুতু লাগছে, এই কাতুকুতু লাগছে' বলে চিকরে-চিকরে উঠবে। কিন্তু মোটের ওপর তার এ-সময়টা ভারী আরামের। ইতিমধ্যে ভবকান্তবাবু বোর্ডের ওপর ম্যাপখানা সড়সড় গড়গড়

করে এঁকে ফেলবেন।

ম্যাপ আঁকা ভবকান্তবাবুর আর-এক বাতিক। গ্লোব রয়েছে, নিয়ে এলে পারেন। ছাপানো ম্যাপও রয়েছে, তা-ও আনতে পারেন। কিন্তু তা তিনি আনবেন না। ম্যাপটা এঁকে ফেলবেন শুধু হাতে গড়গড় করে। প্রথমে একটা আকার আঁকবেন খালি। জিজ্ঞেস করবেন, "কী এটা ? এটা কী ?"

"মানুষের মাথার খুলি সার।"

"তোকে বলেছে !" বলে ভবকান্তবাবু সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করবেন ডটরেখাগুলো, ছেলেরা বলবে, "আফ্রিকা, আফ্রিকা।"

আবার হয়তো অন্য ক্লাসে আর-একটা ম্যাপ এঁকে ফেলেছেন তিনি।

"বল তো এটা কী ?"

"প্রোটোপ্লাজ্‌ম সার।"

"অ্যামিবা। সার।"

আবার হাতের কাজ শুরু হবে ভবকান্তবাবুর। বলবেন, "কী কচ্ছি বল তো !"

দুষ্টু ছেলেও তো আছে, বলবে, "সার, কনে চন্নন পরাচ্ছেন।"

কেউ বলবে, "ধুতি গিলে কচ্ছেন সার।"

"এবার কী হল ?"

"অস্ট্রেলিয়া।"

পার্টিশন করা হলঘরে ক্লাস নিচ্ছেন ভবকান্তবাবু। পার্টিশনের ওধারেই রতনমণিবাবু। তিনি ভীষণ বিরক্ত হন।

উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপ এঁকে ভবকান্তবাবু বলছেন, "এই্‌ দ্যাখ বাইনারি ফিশন। একটা অ্যামিবা ভেঙে দুটো হয়ে যাচ্ছে, মাঝখানে ব্যাঙাচির ন্যাজ।"

আর যায় কোথায়, রতনমণি খেপে লাল। "ভূগোলের ক্লাসে তাই বলে আপনি বায়োলজি পড়াবেন মশাই ? বায়োলজির আপনি জানেন কী ?"

ভবকান্তবাবু যতই বলেন তিনি বায়োলজি পড়াননি, একটা তুলনা দিয়েছেন মাত্র, রতনমণিবাবু ততই খেপে যান।

"আপনি ক্লাসে ছেলেদের পেট টেপেন। আমি সবাইকে বলে দেব।"

"আচ্ছা বেশ, বলুন না, কান টেপা অর্থাৎ মলার চেয়ে পেট টেপা তো অনেক ভাল ?"

"তাই বলে আপনি একটা ছেলেকে নিয়ে রোজ মজা করবেন ? তার একটা হীনম্মন্যতা জন্মে যাচ্ছে, একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম, সেটা খেয়াল আছে ! একজন টিচার হিসেবে এ-জিনিস আপনি করতে পারেন না। কী ? আপনারা বলুন, পারেন উনি এটা করতে ? ওই ছেলেটি দেখবেন কিছু শিখছে না। অন্যান্য ক্লাসেও ও অমনই মনোযোগ চায়। তা ছাড়া ঘুমিয়ে পড়ে। পেট টিপে-টিপে লিভারের দোষ হয়ে যাচ্ছে ওর।"

শেষকালে নিজের কথা প্রমাণ করতে রতনমণিবাবু ক্লাস থেকে পটলকে ডাকিয়ে আনালেন। সব টিচার উপস্থিত, হেডমাস্টারমশাই পর্যন্ত। টিফিন পিরিয়ড। রতনমণির লুচি-তরকারি, ভবকান্তর থিন অ্যারারুট সব বাক্সে পোরা। হেডমাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী ?"

"পট...ইয়ে তো ত্‌-তরুণকান্তি।"

"পদবি কী ?" ধমক দিলেন হেডমাস্টারমশাই।

"পট...ইয়ে মানে পাল সার।"

"জিওগ্রাফি ক্লাসে কী শিখেছ ?"

পটল ফিক করে হেসে ফেলল।

"আফ্রিকার অবস্থান বলো।"

"দোলমা সার।"

"কী যা-তা বলছ ?"

থতমত খেয়ে পটল বলল, "না, মানে অবস্থা ভাল নয়।"

মাস্টারমশাইরা সব মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলেন। রতনমণিবাবুর মুখ উল্লাসে উদ্ভাসিত। ভবকান্তবাবু মাথা নিচু করে আছেন।

পটল চলে গেলে রতনমণিবাবু সোল্লাসে বলে উঠলেন, "হতে পারে ভবকান্তবাবু পপুলার। কিন্তু এই মূল্য দিয়ে পপুলারিটি..."

হেডমাস্টারমশাই তীব্র দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা অনেক হয়েছে।"

তিনি কোঁচা হাতে করে মশমশ শব্দ তুলে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় কারও দিকে তাকালেন না।

পরের দিন থেকে বোঝা গেল ভবকান্তবাবু ভীষণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। যে ভবকান্তবাবুর হাজার ঝগড়াঝাঁটিতেও মন টলে না, হাজার অপমানেও যিনি না রাম না গঙ্গা, আপন খেয়ালে থাকেন, সেই ভবকান্তবাবু টিফিনের সময়ে স্কুলের বাইরে চলে যান। তথাগত চুপিচুপি খবর আনল ভবকান্তবাবু জিবেগজা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। থিন অ্যারারুটও বোধ হয় খান না। কী যে ভবকান্তবাবু খান আজকাল, সে নিয়েও বেশ গবেষণামূলক আলোচনাচক্র বসে গেল। কিন্তু কোনও কিনারা হল না।

হেডমাস্টারমশাই আজকাল ভবকান্ত আর রতনমণির ক্লাস পাশাপাশি রাখেন না। কিন্তু যাঁরা ভবকান্তবাবুর পাশে ক্লাস পান, তাঁরাও জানালেন, ভবকান্তবাবু ক্লান্ত গলায় ঘ্যানঘ্যান করে ভূগোল পড়ানো কিংবা আঁক কষানো ছাড়া আর কিছুই করেন না। ভুলেও অ্যামিবা বা প্রোটোপ্লাজমের কথা তোলেন না, খালি অববাহিকা আর জলবিভাজিকা, আর্টিজীয় কূপ আর হিমানী-সম্প্রপাতের কথাই বলেন। নানা মাস্টারমশাইয়ের কোচিং-এ ছেলেরাও এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল রতনমণিবাবুও কেমন চুপসে গেছেন। তাঁকে আর কেউ ডবলমণি বলে না। তাঁর ধবধবে জামাকাপড় নিয়ে রগড় করে না। তাঁর নিত্য-নতুন টিফিনের প্রতি কটাক্ষ করে না, তাঁর পাশের ক্লাসে কাউকে দোলমা বানানো হয় না। রতনমণিবাবুরও জামাকাপড় আজকাল আর আগের মতন ফিটফাট থাকে না। অন্যমনস্কভাবে তিনি টিফিন-টাইমে হাঁক দেন, "কই হে ভবানীচরণ এদিকে এক কাপ চা দাও তো দেখি। আর গিয়ে একটা ঘুগনি।"

"বলেন কী, রতনবাবু ? আপনি খাবেন আমার ঘুগনি !"

"তোমার ঘুগনি নয় ভবানী, মটরের ঘুগনি।" গম্ভীরভাবে ভবানীকে সংশোধন করে দেন রতনমণিবাবু। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কেউ যদি বলে, "আজ টিফিনে কী রতনমণিবাবু ?"

রতনমণি উদাস কণ্ঠে বলেন, "না হে ; শরীরটা তেমন জুত পাচ্ছি না।"

টিফিনের সময়ে রতনমণিও স্কুল থেকে বেরিয়ে যেতে থাকলেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলেন, "বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসছি। এই যাব আর আসব।" সত্যি রতনমণির বাড়ি প্রায় পাশের গলিতে। ইচ্ছে করলেই ঘুরে আসতে পারেন বইকী !

কিন্তু হিন্দির মাস্টারমশাই ভকতরাম পাঁড়ে একদিন খবর আনলেন রতনমণিবাবু জাসুস বনে গেছেন।

কী ব্যাপার ? না ভকতরাম রোজই একটি নির্দিষ্ট দোকান থেকে পেঁড়া কিনে খান, সেইসঙ্গে থকথকে সরঅলা দুধ। সেদিন সবে গোঁফ থেকে সর মুছছেন, দেখেন ভবকান্তবাবু পাশ দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। গেলেন তো গেলেন, ভবকান্তবাবু তাঁর বিরাট মুগুর ভাঁজা শরীর নিয়ে ইচ্ছে করলেই

মেল-ট্রেনের গতিতে চলতে পারেন। কিন্তু এ কী ? তাঁর যাওয়ার একটু পরেই এলেন রতনমণি। পাঁড়েকে দেখতেও পেলেন না। উলটোদিকে পান-বিড়ির দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, "মোটাবাবু কোনদিকে গেলেন ?" দোকানদার আঙুল দিয়ে দেখাতেই রতনমণিবাবু কেমন পা টিপে-টিপে সেইদিকে চলে গেলেন।

শুনে তথাগত, কালোবরণ, সুপ্রিয়, নিরঞ্জন সব মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। ব্যাপারখানা কী ? ভবকান্তবাবু না হয় জিবেগজার বদলে বালুসাই খাবেন, কিংবা থিন অ্যারারুটের বদলে ক্রিম ক্র্যাকার। কিংবা খাবেন না। এর চেয়ে বেশি আর ভবকান্তবাবু কীই-বা করতে পারেন ? এর জন্য রতনমণি টিকটিকিগিরি করছেন ? আচ্ছা নাছোড়বান্দা মাথাপাগলা লোক তো ?

এখন রতনমণিকে দেখে অনেকেই মুচকি-মুচকি হাসে। কিন্তু রতনমণি খেয়ালও করেন না। তিনি আপনমনে কাগজ পাকিয়ে-পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেন, আরামে তাঁর চোখ দুটো বুজে আসতে থাকে।

কয়েক মাস কেটে গেছে। ভবকান্ত আর রতনমণির মধ্যে কথা বন্ধ, এ ছাড়া আর সব আগের মতোই চলছে। ভকতরাম সরঅলা দুধ খাচ্ছেন, হেডমাস্টারমশাই মনের সুখে মাস্টারদের ছুটি কাটছেন, পটল ক্লাসে নিয়মিত দাঁড় খাচ্ছে। এহেন সময়ে রতনমণির

অনেকদিনের একটা মনোবাসনা পূর্ণ হল। তাঁর বরাবরের ইচ্ছে ছিল বেশ সুন্দর একটু গ্রাম-গ্রাম পরিবেশে একটা বাগান কিনবেন। আম-কাঁঠাল, জাম-জামরুল, তেঁতুল-বট সব থাকবে, আর থাকবে একটি ছোট্ট টালির ছাদ দেওয়া ঘর, সামনে টানা বারান্দা, পাশে একটা ছোট্ট রান্নাঘর আর কলঘর। আর কিচ্ছু দরকার নেই। চিরকাল টাউন অঞ্চলে বসবাস, রতনমণিবাবুর এই ঘিঞ্জি আর ভাল লাগে না। ছুটির সময়ে তিনি তাঁর বাগানে গিয়ে থাকবেন। এমনটাই মনোগত ইচ্ছে রতনমণির। বেশ ক'দিন হাঁটাহাঁটি করে তিনি এমন একটি বাগানবাড়ির সন্ধান পেলেন। বায়নার টাকাকড়ি নিয়ে রতনমণি একেবারে তৈরি হয়েই বেরোলেন। পছন্দ হলে বায়নার টাকাটা একেবারে দিয়েই আসবেন। বাগানের মালিক হেটো-মেঠো লোক, বলেছে সন্ধেবেলায় যেতে। সারাদিন সে নিজের জমি-জমা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ঠিক সওয়া সাতটার সময়ে বাসস্টপে হাজির থাকবে সে।

ঠিক সওয়া সাতটার সময়েই বাস স্টপে পৌঁছলেন রতনমণিবাবু। কিন্তু কোথায় সে লোক? ছোট জায়গা। একটি ভদ্রলোক হাতে সুটকেস নিয়ে নামলেন। তাকেই জিজ্ঞেস করলেন রতনমণি। "ভূষণবাবুকে চেনেন?"

"ভূষণবাবু? ভূষণবাবু বলে তো কেউ... চেহারাটা কেমন বলুন তো!"

"বেশ গাটাগোট্টা, কপালে যেন একটা আব!"

"ওঃ তাই বলুন। ভুষনো! তা তাকে কী দরকার?"

বাগান-টাগানের কথা আর বিশদ বললেন না রতনমণি, সংক্ষেপে বললেন, সওয়া সাতটায় বাসস্টপে এসে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভূষণবাবুর।

"খাটা-পেটা লোক, ওদের কি আর ঘড়ি মুখস্থ থাকে মশাই! তা এক কাজ করুন না কেন, ওই রাস্তাটা ধরে সোজা পুব দিকে চলে যান। ভুষনোর বাগান বললেই লোকে দেখিয়ে দেবে জায়গাটা। ওখানেই ওকে পাবেন।"

বাগানের কথা শুনে বেশ হৃষ্ট হয়ে রতনমণি হাঁটা দিলেন। ক্রমে শীত সন্ধের কুয়াশা চেপে এল। চারদিকের ধানখেত আলুখেতের মধ্যে থেকে ধুনো গুগ্‌গুলের ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে কুয়াশা উঠতে লাগল। পুব-পশ্চিম আর কিছুই ঠাহর হয় না। টাউন গঞ্জের লোক রতনমণি, ঘিঞ্জি জায়গায় থাকা অভ্যেস। কূলকিনারাহীন মেঠো খেতজোতের মধ্যে তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন। এরই মধ্যে আবার কুয়াশা ভেদ করে গাট্টাগোট্টা মতো একটা লোক হাতে শক্তপোক্ত একটা লাঠি নিয়ে তাঁর দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। প্রথমে রতনমণি ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই এ সেই ভূষণ। তিনি প্রাণপণে "ভূষণবাবু, ভূষণবাবু" বলে চিৎকারও করেছিলেন। কিন্তু লোকটা রা কাড়ল না। শুধু লাঠিটা বাগিয়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসতে লাগল। তখন রতনমণি, কাছাকোঁচা, কোমরে তুলে, পালিশ করা জুতো, মাঠে-ঘাটে ফেলে "ওরে বাপ রে মা রে" বলে এক রামদৌড় দৌড়লেন। জীবনে কোনওদিন রতনমণি এমন দৌড় দৌড়ননি। শৌখিন মানুষ তিনি। কোনওদিনই দৌড়-ফৌড়ের ধার ধারেন না। আলতো চলেন, আলতো বলেন, চুলের টেরি, এ দিক থেকে ওদিক হতে পায় না। সেই রতনমণির বাবরি চুল আজ আর চুল বলে চেনা যাচ্ছে না। দৌড়তে-দৌড়তে রতনমণি ধপাস করে মাঠের ওপর পড়েছেন আর যমদূতের মতো সেই গাট্টাগোট্টা তাঁকে চেপে ধরেছে, এমন সময়ে স্বয়ং যমের মতনই এক আরও গাট্টাগোট্টা হুঙ্কার দিয়ে মাঠের ওপর যেন উড়ে এসে পড়ল। লাঠি গুটিয়ে যমদূত মাঠের মধ্যে দিয়ে একরকম লাফাতে লাফাতে উধাও হয়ে গেল। কাছাকোঁচা সামলে কোনওমতে টলমল করে উঠে দাঁড়িয়ে রতনমণি দেখেন—ভবকান্ত।

ভবকান্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, "এ কী! রতনমণিবাবু আপনি এখানে?"

রতনমণি বললেন, "এ কী! ভবকান্তবাবু আপনি এখানে!"

কুয়াশা ফাটিয়ে হা-হা করে হেসে ভবকান্ত বললেন "আরে মশাই, এই তো ন' পাড়া বাগনান! আমার নিজের জায়গা! এখানে আমি থাকব না তো কি আপনাদের বরদা-ইস্কুলের ছুটি-কাটা হেডমাস্টারমশাই থাকবেন? তবে ভাগ্যিস ছিলুম! কী বলেন!"

রতনমণি বললেন, "সে আর বলতে! আপনার থিন অ্যারারুটের মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক।"

ভবকান্ত বললেন, "আর জিবেগজা? সে কেন বাদ থাকবে?"

রতনমণি বললেন, "আরে জিবেগজার কি আর নিজের মুখ আছে! তার তো জিবে বাস। ফুল-চন্নন আপনার মুখেই পড়বে।"

ভবকান্ত রতনমণিকে আদর করে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। ভবকান্তর মা তাঁকে আদর করে লুচি-মাংস খাওয়ালেন।

"কোনও কিছু বাজারের পাবে না বাবা," ভবকান্তর মা বললেন, "ঘরের পাঁটা, ঘরের আটা, ভাল করে খাও।"

ভাল করেই খেলেন রতনমণি। ভবকান্তও পাশে বসে খেলেন। "কী, এখন আপনার বিশ্বাস হচ্ছে আমি থিন অ্যারারুট ছাড়াও কিছু খাই?"

"সে আর বলতে!" রতনমণি এক গাল হেসে-হেসে বললেন।

ভুষনোর বাগানবাড়িটি বেশ নির্বিঘ্নে কেনা হয়ে গেল রতনমণির। দামেও কিছু কিঞ্চিৎ সুবিধে হল। ছুটি-ছাটাগুলো ইদানীং রতনমণি ন' পাড়ার বাগানবাড়িতে গিয়েই কাটাচ্ছেন।

টিফিন-টাইমে এখন ভবকান্ত এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত হেসে বলেন, "ইন্টারভিউয়ের দিন আমি কিন্তু আপনাকে দেখে মুচকি হাসি হাসিনি। হাসতে পারি না। কেন বলুন তো?"

রতনমণি ও-কান থেকে এ-কান পর্যন্ত হেসে বলেন, "কেন আর? আপনার হাসিটা অট্টহাস্য জাতের। সে ন' পাড়ার মাঠে এক শীতের সন্ধেয় শুনেছিলুম বটে!"

বরদা-ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা বলে থাকেন, "ভবকান্ত-রতনমণির পুনর্ভাব ব্যাপারটা ঠিক যতটা সোজা-সরল দৈব-প্রেরিত বলে মনে হয় ততটা নাকি নয়।" রামভকত পাঁড়ে তো এক আজব কথা বলেন, তাঁর মতে, "রতনমণি জেনেশুনে খোঁজখবর করেই ভবকান্তর গ্রাম ন' পাড়ায় জমি কিনতে গিয়েছিলেন। ভবকান্তর সঙ্গে ভাব করতে।"

ভবানীচরণ আবার আর-এককাঠি বাড়া। তার মত, "বাগানখানাও ভবকান্তবাবুর। এবং ভুষনো তাঁরই লোক। রতনমণির সঙ্গে ভাব করবার জন্যই ভবকান্ত কপালে আব ভুষনোকে লাগিয়েছিলেন। ডাকাত-ফাকাত সবই নাকি তাঁর সাজানো।"

মানুষ মানুষকে মারধর করবার জন্য লোক লাগায় এসব আজকাল হামেশাই শুনছি। কিন্তু ভাব করবার জন্য একজন আর-একজনের পেছনে লোক লাগিয়েছে জীবনে এই প্রথম শুনছি বাবা।

বরদা-ইস্কুলের কারবারই আলাদা!

ছবি : দেবাশিস দেব

বিস্তীর্ণ ধুধু মরুভূমির ওপর যখন
দিগন্তে মিলিয়ে যায় উটের
'ক্যারাভান', হাওয়ার শনশন
শব্দের সঙ্গে উড়তে থাকে বালি,
নিস্তব্ধতার দিগন্তবিস্তৃত
সেই ছবি মন খারাপ
করে দেয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে
একঘেয়ে মনে হলেও মরুভূমির
জীবনেও আছে অনেক বৈচিত্র্য।
গৌতম হাজরা
মরুভূমির
অতীত
বর্তমান ও
ভবিষ্যৎ

বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর এ যেন এক অদ্ভুত খেয়াল। একদিকে যখন দেখা যায় সবুজের সমারোহ, তখন অন্যদিকে দেখা মেলে নিস্তব্ধ শুষ্ক মরু প্রান্তর। এইসব মরু প্রান্তরে সূর্যাস্তের সময় উটের সারির ছায়াছবির দিকে তাকালে মনে হয়, যেন আরব্য রজনীর শিহরন জাগছে শরীরে। হ্যাঁ, মরুভূমির কথাই বলছি। মরুভূমি মানেই বিশাল অঞ্চল জুড়ে শুধু ধু-ধু বালির রাজ্য, যেখানে দেখা যায় কাঁটাগাছের ঝোপ, আগাছা, ক্যাকটাস এবং বাবলা জাতীয় গাছ। দেখা যায় ইতস্তত ছুটে যাওয়া গিরগিটি, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী, মাকড়সা, লাল ডেঁয়ো পিঁপড়ে ও কিছু নাম-না-জানা পতঙ্গ।

সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে অনেক মরুভূমি। তার মধ্যে কোনওটা বড়, কোনওটা ছোট। এর মধ্যে যেমন আছে সাহারা, কালাহারি, গোবি, আটাকামা, থর মরুভূমি, তেমনই আছে নাম-না-জানা মরুভূমিও। সৌদি আরবের মধ্যভাগের উত্তরাংশে এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে, নাম নেফাদ, আর দক্ষিণাংশের সুবিশাল মরুভূমির নাম বার-আল-খালি। এটি সেরা মরুভূমিগুলির অন্যতম। এর আয়তন প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। সৌদি আরবের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই মরুভূমি। সায়ডম মালভূমির দক্ষিণ পশ্চিমে আছে বিশাল তাকলামাকান মরুভূমি আর মঙ্গোলিয়ান মালভূমির দক্ষিণে বিশাল গোবি মরুভূমি।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মরুভূমির নাম সাহারা, যার আয়তন ৩০ লক্ষ বর্গ মাইলেরও বেশি। এই বিশাল মরুভূমি অধিকার করে আছে পৃথিবীর মোট ভূমির $\frac{১}{১৬}$ ভাগ। উত্তর আফ্রিকার এই বিশাল মরুভূমি সত্যিই রহস্যময়। এখানকার শুকনো বালির রাজ্যে আছে অসংখ্য পাহাড়, চড়াই-উতরাই। এখানকার বালির গড়নও নানারকম। এই বিস্তীর্ণ বালির রাজ্যে গাছপালার চিহ্ন প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝে-মাঝে দেখা যায় লম্বা-লম্বা কিছু ঘাস আর ক্যাকটাস বা কাঁটা জাতীয় কিছু গাছ। দিনের বেলায় এখানকার উষ্ণতা ১৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে গিয়ে পৌঁছয়। এখানে বৃষ্টিপাত প্রায় নেই বললেই চলে। বছরে এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি। উটই এখানকার মরু জাহাজ।

দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিও খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দিগন্তবিস্তৃত ধু-ধু এই বালির রাজ্যে আছে পোকামাকড়ের গর্ত, সাদা-সাদা উইয়ের ঢিবি। আছে কঙ্কালসার জীর্ণ নদী। প্রতিদিন এখানকার তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যায়। কিন্তু এই মরুভূমিতেই আছে প্রাণের স্পন্দন। এখানেই দেখা মেলে বড়-বড় প্রাণী। অর্থাৎ সিংহ, চিতা, হায়েনা ইত্যাদি, যারা দিনের বেলায় গাছের ছায়ায় বসে-বসে ঝিমোয়। 'ব্ল্যাক সিঙ্ক' নামে একধরনের সরীসৃপ এখানকার রুক্ষ জমি দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে যায়।

প্রতিটি মরুভূমিই বৈচিত্র্যময়। সে গোবিই হোক, আটাকামাই হোক কিংবা অন্য মরুভূমি। প্রতিটি মরুভূমি নিয়েই আছে কিংবদন্তি। যেমন আছে ভারতবর্ষের রাজস্থানের থর মরুভূমির। শোনা যায়, হাজার-হাজার বছর আগে এই থর মরুভূমি নাকি সমুদ্রের তলায় ছিল। পরবর্তীকালে বিবর্তনের ফলে বিশাল সমুদ্র শুকিয়ে গিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এর আয়তন ২,১৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ভৌগোলিক দিক থেকে এই মরুভূমি যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনই আবার ইতিহাসের দিক থেকেও এই বালির রাজ্য অনেক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে। দিনের বেলায় এখানে তাপ গিয়ে পৌঁছয় ৫০ ডিগ্রি থেকে ৫৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। এই মরুভূমিতেই দেখা যায় উটের সারি আর ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সব সাপ। এ ছাড়া আছে চোরাবালি আর ধুলোর ঝড়।

মরুভূমি কীভাবে হল ? যতদূর জানা যায়, পৃথিবী সৃষ্টির গোড়ায় কোনও মরুভূমিরই অস্তিত্ব ছিল না। তা হলে মরুভূমির সৃষ্টির কারণটাই বা কী ? বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এটা নিছক প্রকৃতির খামখেয়াল। যেখানে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় 'ইকোলজি সিস্টেম' দ্রুত পালটে যাওয়ায় প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়। ফলে ওইসব অঞ্চলের মাটি শুকিয়ে পাথুরে জমিতে পরিণত হয়। পরে তা ঊষর মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। সাহারা মরুভূমির গুহাচিত্র থেকে বিজ্ঞানীরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, ৪০০০—২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাহারাতেও তৃণাচ্ছাদিত উর্বর অঞ্চল ছিল। সে-সময় এখানে গৃহপালিত পশুরা চরে বেড়াত। কিন্তু ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে এখান দিয়ে যখন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে এবং সৈনিকেরা যুদ্ধে গিয়েছিল, তখন সাহারা ছিল রুক্ষ। ওই সময় এখানে বিরাট-বিরাট উটেরও দেখা পাওয়া গিয়েছিল।

অতি সম্প্রতি মরুভূমির উৎপত্তি কীভাবে হল, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে নিউ মেক্সিকোর জোরনাডা মরুভূমিতে। এটি লাস ক্রুসেস থেকে ১৫ মাইল উত্তরে। এখানেই উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার ডিউক ইউনিভার্সিটির বায়োকেমিস্ট বিল স্কেলসিঙ্গার এবং তাঁর সহকারী জেন রাইক্স পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। তাঁদের প্রশ্ন জোরনাডা কীভাবে মরুভূমিতে পরিণত হল ? তাঁরা মনে করেন, মরুভূমিতেও

প্রকৃতির প্রতিকূলতা সহ্য করেও মানুষ সেখানে সংসার পাতে
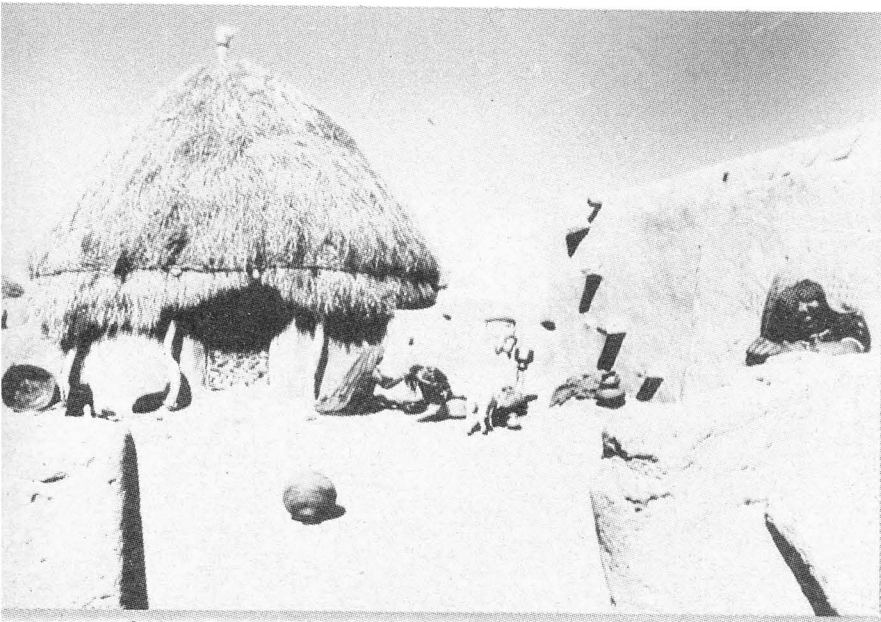
আছে প্রাণের স্পন্দন। এখানকার জল-বাতাসেও উদ্ভিদ জন্মাতে পারে। কিন্তু সেখানে এমন কী ঘটনা ঘটল, যাতে উদ্ভিদের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে মরুভূমির জন্ম হল?

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এজন্য দায়ী করেছেন প্রকৃতিকে। তাঁরা দেখেছেন, এই অঞ্চলের 'ওজোন' স্তর ক্রমশ কমে যাওয়ায় ভূপৃষ্ঠ প্রচণ্ড গরম হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রচণ্ড তাপে মাটি রুক্ষ হয়ে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এজন্য অবশ্য তর্ক-বিতর্কেরও শেষ নেই।

জোরনাডা মরুভূমিকে গবেষণার কাজে লাগানোর একটাই কারণ এই যে, জোরনাডা আর-পাঁচটা মরুভূমির মতো নয়। এটি একটি ব্যতিক্রমী মরুভূমি, যার 'ইকোসিস্টেম'-ই পুরোপুরি আলাদা। বিল স্কেলসিঙ্গার ও তাঁর সহকারী জেন রাইক্স জোরনাডা 'এগ্রিকালচার এক্সপেরিমেন্টাল রেঞ্জ'-এর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে গোটা জোরনাডা ঘুরে বেড়ান। তিনি তাঁদের জোরনাডার ইতিহাসও শোনান। জানা যায়, ১৬০০ বছর আগেও এই অঞ্চল দিয়ে স্প্যানিশ মালবাহী শকট যাতায়াত করত। তখন জোরনাডা ছিল সবুজ ঘাসের বিচরণ ভূমি। তাই জোরনাডার সবুজ অঞ্চলে দেখা যেত মেক্সিকান গবাদি পশুদের, পরে মার্কিন পর্যটকদেরও। দেখা গেছে, এর মূলে ছিল মাটির আর্দ্রতা। এখন এই মরুভূমিতে জলের স্তর আছে ৪০০ ফুট নীচে। ১৮৮০ সালে এখানে জলের স্তর আরও নীচে নেমে যাওয়ায়, সবুজের চিহ্ন অতি দ্রুত কমে গেছে। সেইসঙ্গে কমে গেছে গবাদি পশুর সংখ্যাও।

জোরনাডার লোকেরা বলেছেন, "এই মরুভূমি ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। এখানকার ঘাস ছোট হয়ে যাচ্ছে, মেসকুইট ও ক্রিসোট জাতীয় গাছ বাড়ছে। উর্বর মাটি ক্রমশ ধুলোবালিতে পরিণত হচ্ছে। কিছু-কিছু জায়গায় আবার বালিয়াড়িরও সৃষ্টি হয়েছে। ফলে জোরনাডার আকর্ষণ কমে যাচ্ছে।" এই একই ঘটনা ঘটছে সমগ্র পশ্চিম আমেরিকায়।

গবেষকেরা জোরনাডায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, জোরনাডার পাঁচ শতাংশ অঞ্চল জুড়ে মেসকুইট ও ক্রিসোট জাতীয় কাঁটাগাছ, ৩৭ শতাংশ অঞ্চল জুড়ে গুল্ম ও কাঁটালতা, আর ৫৮ শতাংশ ধু-ধু বালির রাজ্য। ১০০ বছর পরে অর্থাৎ, ১৯৬৩ সালের পরিসংখ্যানে জানা যায়, ৬৪ শতাংশ জমিই মেসকুইট
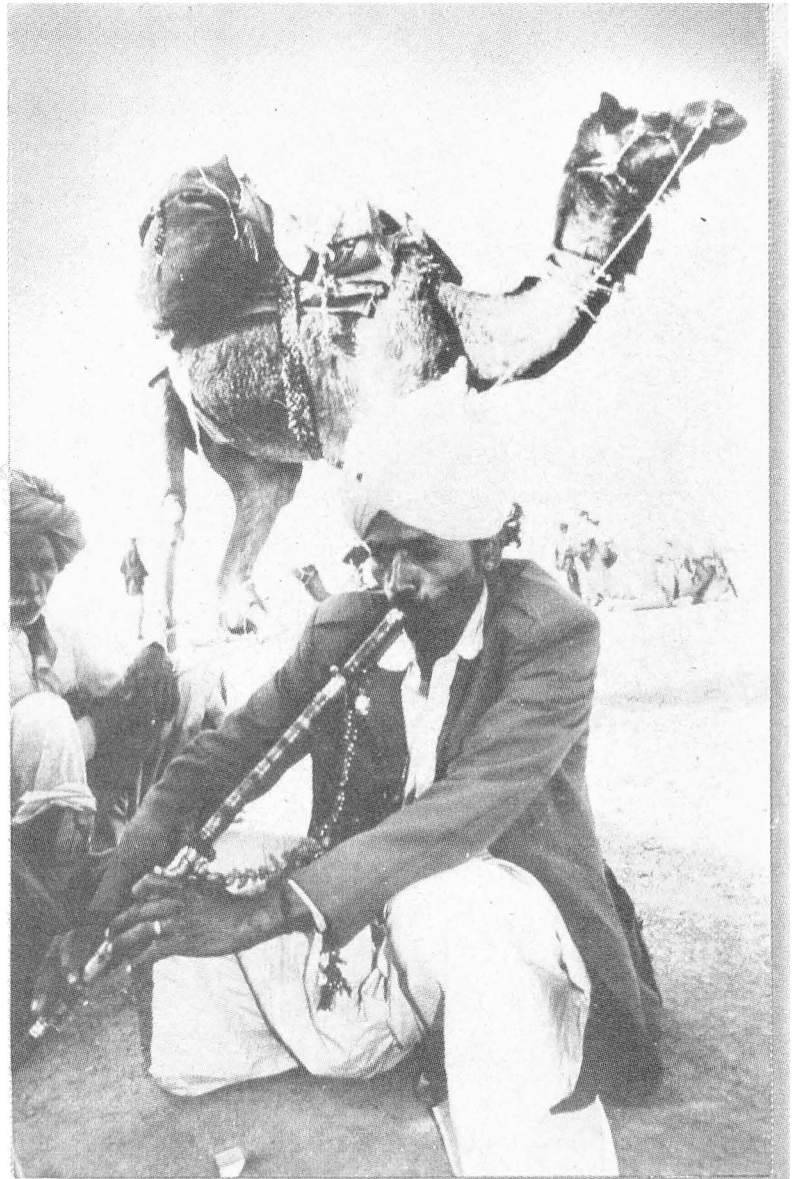
উটের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষের জীবনও বেশ বর্ণময়

আর ক্রিসোট জাতীয় গাছের দখলে আর ৩৬ শতাংশ ধু-ধু বালির রাজ্য।

ওয়াল্ট হুইটফোর্ড ১৯৬৪ সালে নিউ মেক্সিকো স্টেট্‌স ইউনিভার্সিটি থেকে এখানে এসেছিলেন গবেষণার জন্য। তিনি বলেছেন, "মন কেড়ে নেয় জোরনাডা। এর ইকোসিস্টেম অন্য মরুভূমির চেয়ে একেবারে আলাদা। আমার গবেষণার জন্য যা-যা দরকার, তার সবটাই এখানে পাওয়া যায়। এখানে যেমন গবাদি পশুর দেখা মেলে, তেমনই দেখা যায় জমির রুক্ষতা।"

জোরনাডার গবেষকেরা দেখেছেন এই মরুভূমি ক্রমেই বাড়ছে। আগে এখানে সমুদ্রের জল চুঁইয়ে আসত, ফলে এর ভূমি ছিল উর্বর। তাই ঘাস লতাগুল্ম জন্মাত স্বাভাবিক নিয়মেই। অবশ্য এখানকার আবহাওয়া শুকনোই ছিল। এর নরম মাটি বৃষ্টি শুষে নিত এবং প্রচণ্ড তাপে জল বাষ্প হয়ে সৃষ্টি করত মেঘ। সেই মেঘ থেকে আবার বৃষ্টি নামত। ফলে গাছ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বাড়তে থাকত। তাঁরা দেখেছেন এখানকার গাছের গোড়া মাটির অনেক নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত।

কিন্তু জোরনাডায় বৃষ্টিপাত ক্রমশ কমে যাওয়ায় জলের অভাবে মাটি রুক্ষ হয়ে উঠছে। ঘাস কমে গিয়ে সেখানে গুল্মের আকার নিয়েছে, যদিও এখানকার ঘাস যথেষ্ট পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করতে পারে।

মরুভূমি কেন সৃষ্টি হয়, কীভাবে বাড়তে থাকে—এর প্রকৃত কারণ খুঁজতে এই বিজ্ঞানীদের গবেষণা আমাদের কাজে লাগবে। মরুভূমির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে মানবসভ্যতার ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। তাই মরুভূমি নিয়ে গবেষণা যে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ, সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

ফোটো : কমলেশ কামিলা

বড়গল্প

সাপে আর নেউলে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
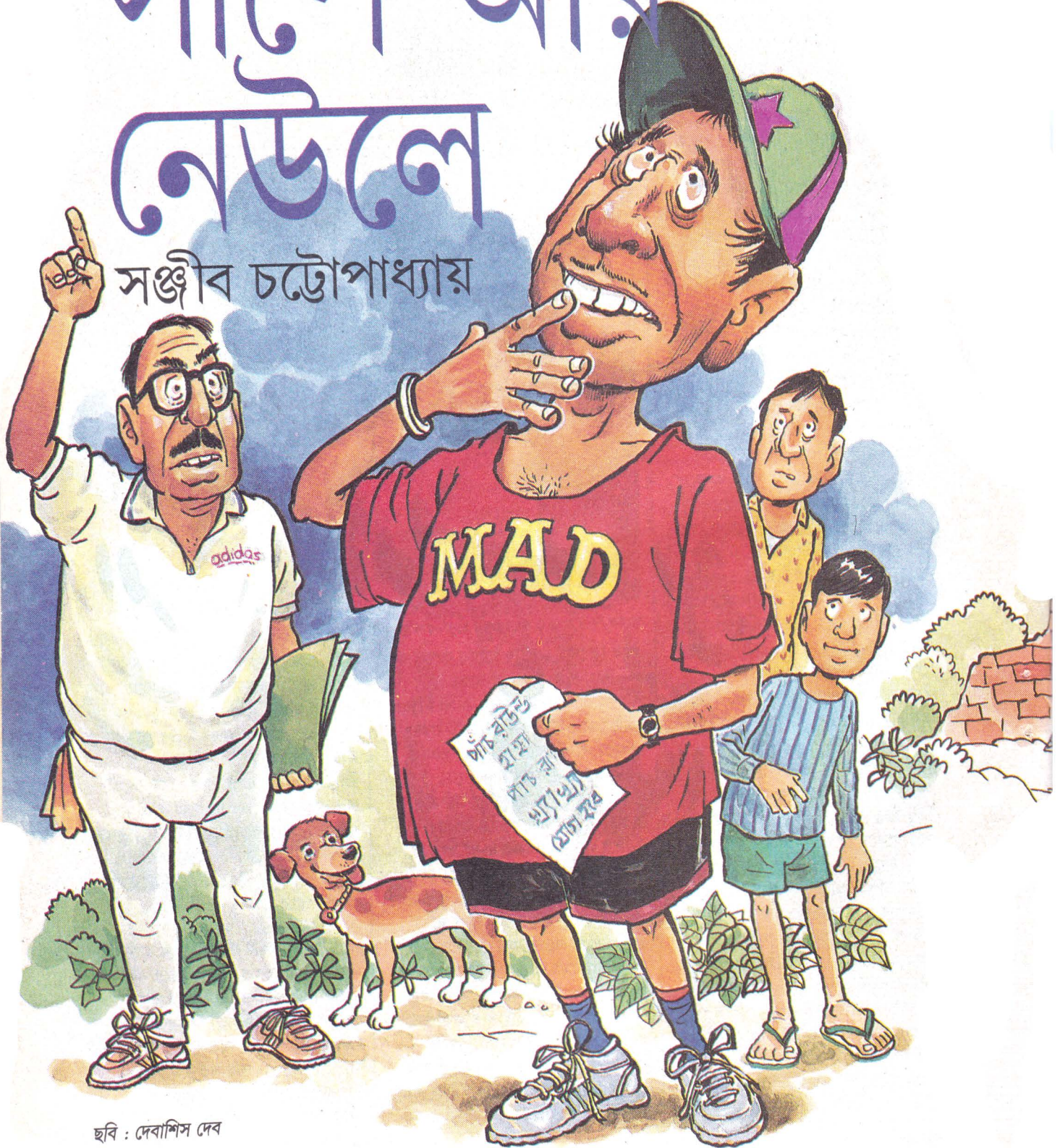
ছবি : দেবাশিস দেব

বেলা তখন ক'টা হবে, সকাল আট কি সাড়ে আট। বলা নেই কওয়া নেই চারজন ষণ্ডামার্কা লোক তরতর করে আমাদের দোতলায় উঠে এল। দক্ষিণের হলঘরের মতো বড় ঘরটায় ঢুকে ফার্নিচার-মার্নিচার যা ছিল সব ধরাধরি করে বাইরের বারান্দায় বের করতে লাগল। মেজোমামা পুবের জানলার ধারে জলপাইগুড়ি থেকে আনা আরামদায়ক একটা বেতের চেয়ারে বেশ ফলাও হয়ে বসে দর্শনের বই পড়ছেন। এতটাই ডুবে গেছেন বিষয়ে যে, ঘরের মধ্যে চারটে দৈত্যের মতো লোক কীসব টানাহ্যাঁচড়া করছে, সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। আমার মেজোমামা এইরকমই। পড়তে বসলে আর জ্ঞান থাকে না। ইদানীং ব্যায়াম করা ছেড়ে দিয়েছেন বলে বেশ একটু মোটা হয়েছেন, রংটাও বেশ ফরসা হয়েছে। এতদিনের ব্যায়াম হঠাৎ ছাড়ার কারণ, বড়মামা একদিন একটা মেডিকেল জার্নাল সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, "মেজো, পড়ে দ্যাখো, ব্যায়ামের কুফল। মাথামোটা হয়ে যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত সেই বোদামাথায় আর ঢুকবে না। ভাল চাও তো হোঁত

হোঁত ডনবৈঠক মারা ছেড়ে শুধু মর্নিং ওয়াকের ওপর থাকো।"

এই ওয়াকিংটা মেজোমামা কোনওকালেই পছন্দ করেন না। অকারণে হাঁটার কোনও মানে হয়! ফলে হপ্তায়-হপ্তায় ওজন বাড়ছে। যে-বইটায় তলিয়ে আছেন বিষয়টা তার জানি, বিজ্ঞান ও ভগবান। ভগবান কি আছেন!

মেজোমামার পেছনে দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড় টেবিল। এইবার সেই টেবিলটা বেরোচ্ছে। হুটপাট শব্দ শুনে মাসিমা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। দেখছেন ব্যাপারস্যাপার। বলা নেই কওয়া নেই, এরা কারা! মেজোমামা যেমন গ্রাহ্য করছেন না, ওরাও তেমনই গ্রাহ্য করছে না। টেবিলটাকে চারজনে মিলে তুলেছে। পেছনে একটা ড্রয়িং বোর্ড খাড়া করা ছিল, সেটা সপাটে পড়ল।

মাসিমা তখন একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, "মেজদা।"

মেজোমামার কানের রকমটা আমি জানি। মোটা, ভোঁতা, গম্ভীর শব্দ কানে যায় না। সরু, তীক্ষ্ণ আওয়াজে চমকে ওঠেন। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।

মাসিমা বললেন, "তোমার ঘরে এরা কারা?"

মেজোমামা এই প্রথম লোক চারজনকে দেখে মাসিমাকেই প্রশ্ন করলেন, "এরা কারা?"

"ঘরের আদ্দেক জিনিস বাইরে বেরিয়ে গেল, তুমি জানো না এরা কারা! কোন জগতে ছিলে?"

মেজোমামা ভুবনভোলানো সেই বিখ্যাত হাসিটি হেসে বললেন, "কুসি, আমি এখানে ছিলুম না রে!" লোক চারজন টেবিল ধরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়ে গেছে ভয়ানক। মাসিমার চেহারাটা ঠিক মা-দুর্গার মতো তেজস্বী।

মাসিমা বললেন, "তোমরা কে?"

যে উত্তর দিল সে মনে হয় দলের নেতা, "আমরা বড়বাবুর লোক।"

"বড়বাবুর লোক তো মেজোবাবুর ঘরে ঢুকে কী করছ?"

"বড়বাবুর অর্ডার।"

"বড়বাবুর অর্ডার! বড়বাবু কী অর্ডার দিয়েছে! টেবিল রাখো। উতারো।"

টেবিলটাকে মেঝেতে রেখে দলনেতা বলল, "মেঝেটা চটাব।"

"চটাব মানে?"

"মানে খুঁড়ে ফেলব।"

"খুঁড়ে ফেলব মানে, এটা কি বড়বাবুর মামার বাড়ি!"

দলনেতা বেশ এয়ার নিয়ে বলল, "অর্ডার সেইরকমই।"

মাসিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বড়দা কোথায় রে?"

বেশ কিছুক্ষণ আগে বড়মামাকে তিনতলার ছোট ছাতে দেখেছিলুম। শর্টস পরে সিদ্ধাসনে বসে সাঁই-সাঁই প্রাণায়াম করছেন। সেই কথাই বললুম।

মাসিমা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, "প্রাণায়ামের নিকুচি করেছে। শিগ্গির টেনে তুলো আনো।"

হঠাৎ কানে এল বড়মামার গলা। সুর করে বলছেন, "কুসি, হিয়ার আই অ্যাম। কুসি।"

একটু সরে গিয়ে আমরা ওপর দিকে তাকালুম। তিনতলার ছাদের বাহারি আলসের ফাঁকে বড়মামার হাসি-হাসি মুখ, "ম্যাডাম কুসি, দে আর জাস্ট এগজিকিউটিং মাই অর্ডার। গো অন আলম।"

"তুমি নেমে এসো।"

"নামছি, নামছি। জাস্ট অ্যানাদার রাউন্ড অব ডিপ অ্যান্ড সিনসিয়ার ব্রিদিং।"

"এইটাই তোমার লাস্ট ব্রিদ হবে, যদি এখুনি, এই মুহূর্তে না নেমে আসো।"

মেজোমামা ওপর দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, "ইউ উইল হ্যাভ টু কাউন্ট সরষে। ইউ উইল সি মাস্টার্ড ফ্লাওয়ার।"

মাসিমা তিরস্কার করলেন, "তোমার রাগ হচ্ছে না মেজদা!"

মেজোমামা হাসতে-হাসতে বললেন, "কী সুন্দর দুষ্টু-দুষ্টু মুখ দ্যাখো। রাগ করা যায়! অবিকল একটা লাউ। এসো, নেমে এসো ভ্রাতা, কুসির হাতে ছেঁচকি হবে।"

লোক চারজন অবাক হয়ে কাণ্ড দেখছে। এমন ফ্যামিলি এই বাজারে কে কোথায় দেখেছে।

বড়মামা সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে আসছেন ছোট ছেলের মতো।

মেজোমামা বলছেন, "নামছে দেখছিস যেন অনুষ্টুপ ছন্দ!"

মাসিমা বললেন, "পড়বে যখন, ছন্দ বেরিয়ে যাবে, হয়ে যাবে সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্ক।"

বড়মামার এখন এই সাধনা চলছে, 'থিঙ্ক ইয়াং অ্যান্ড ইউ উইল রিমেন এভার ইয়াং'। একটা বই কিনে এনেছেন, 'লাফটার ইজ দা বেস্ট মেডিসিন'। একটা বড় আয়না কিনে এনেছেন, রোজ সেইটার সামনে দাঁড়িয়ে নানাভাবে নিজেকেই নিজে ভেংচি কাটেন। আপনমনে নানারকম পাগলামি করেন। নিজের সঙ্গেই আবোলতাবোল বকেন। এইসব নাকি মডার্ন মেডিসিন।

শর্টস আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা বড়মামাকে ফ্যানটাসটিক দেখাচ্ছে।

মাসিমা কোনওরকম ভনিতা না করে বললেন, "তুমি এদের বলেছ মেজদার মেঝে খুঁড়তে!"

"বলেছি।"

"কেন বলেছ? এটা কী ধরনের শত্রুতা!"

"শত্রুতা নয় বৎস, মিত্রতা। প্রবল মিত্রতা। ওর জন্মদিনে ওকে আমি মার্বেল পাথরের ধবধবে সাদা একটা মেঝে উপহার দেব বলে মনস্থ করেছি। আমার গভীর বিশ্বাস, আগামী বছরে ও নোবেল পুরস্কার পেয়ে জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে।"

মাসিমা বললেন, "কীজন্যে পুরস্কার পাবে?"

"ভগবানকে আবিষ্কার করার কারণে, আজ পর্যন্ত কেউ যা পারেনি।"

"এই বংশের কেউ যদি নোবেল পুরস্কার পায়, সে পাবে পাগলামির জন্য। নমিনেশনের একেবারে এক নম্বরে থাকবে তোমার নাম। এমন সুন্দর লাল চকচকে মেঝেটা কী কারণে তোমার অসহ্য লাগছে! পয়সা বেশি হয়েছে? যদি হয়ে থাকে নষ্ট না করে গরিবকে দান করে দাও। তোমরা দুই পাগলে সংসার খরচটাকে কোথায় তুলেছ, কোনও ধারণা আছে? বিশ হাজার!"

বড়মামা বললেন, "কুসি, তোর এই এক আছে, টাকা টাকা, আরে টাকা কি তোর সঙ্গে যাবে! খরচ করতে শেখ। আমার কোষ্ঠীতে কী লেখা আছে জানিস, যত খরচ করবে, তত টাকা আসবে। আমি স্বপ্ন দেখেছি রে! ভোরের স্বপ্ন। আমার গ্রেট, গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার এসে বলছেন, মিস্টার মুকার্জি, আমি ইতালিয়ান মার্বেল পাথরের মেঝেতে, ভেলভেটের আসনে বসে, রুপোর জামবাটিতে, নিজেদের চাষের গোবিন্দভোগ চাল আর আমাদেরই কালো গাইয়ের ক্ষীরের মতো দুধ দিয়ে তৈরি পায়েস খেতুম, তাতে কান্দাহারের পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ গজগজ করত। আমাদের সেই পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আন। কুসি, থিঙ্ক বিগ ইউ উইল বি বিগ। ছুঁচোর কথা ভাবিসনি, হাতি ভাব, ছুঁচের কথা ভাবিসনি, শাবলের কথা ভাব। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। আমি কী ভাবি জানিস, আমি নেপোলিয়ান, আমি কাইজার, আমি এম্পারার, আমি জার, আমি বিক্রমাদিত্য, আমি হর্ষবর্ধন ...।"

মাসিমা ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, "তুমি একটি গোবর্ধন। গবা। তোমার মাথায় গোবর। মার্বেল পাথরের দাম জানো?

এই কুড়ি বাই আঠারো ঘরে কত লক্ষ টাকার মার্বেল লাগবে, আইডিয়া আছে ?"

"কুসি, মার্বেল কি আমি মার্কেট থেকে কিনব রে ভাই ! আমার এক পেশেন্ট একটা মার্বেল পাহাড় কিনেছে।"

"নিশ্চয় মেন্টাল পেশেন্ট !"

"আজ্ঞে না, শুগারের। আমি সেই শুগার ফ্যাকট্রিকে ম্যানেজ করেছি মানিক। সেই পাহাড়ের কিছুটা অংশ ধসিয়ে আমাকে দেবে। দি হোল হাউস উইল বি এ মার্বেল প্যালেস। ঘরে-ঘরে ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালে-দেওয়ালে দেওয়ালগিরি। সকালে ভাত, রাতে বিরিয়ানি।"

"তোমার লজ্জা করে না বড়দা ? তোমার আক্কেল কবে হবে ? একজন তোমাকে একটা ভাঙা মোটরগাড়ি ড্যাম চিপ বলে চৌত্রিশ হাজারে গছিয়ে গেল। সেই গাড়ি অ্যায়সা তেল খেতে আরম্ভ করল যে, শেষে সংসারটাই খেয়ে ফেলে আর কী ! এমন এক ড্রাইভার আনলে সাত মাসে সাতবার, গচ্চা আরও সাত হাজার। এই করতে-করতে চৌত্রিশ লাখে উঠল। সেই গাড়ি পড়ে আছে গোয়ালে। বেড়ালের আঁতুড় ঘর। তোমাকে আমি মেঝে করতে দেব না। যা আছে, বেশ আছে, সুন্দর আছে।"

মেজোমামা আমতা-আমতা করে বললেন, "একটা ইচ্ছে যখন হয়েছে, স্বপ্নে পাওয়া নির্দেশ, ফুলফিল না করলে পূর্বপুরুষদের ক্রোধ হবে, সংসারের ক্ষতি হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

মাসিমা ভেংচি কেটে বললেন, "ইত্যাদি, ইত্যাদি। তোমরা তোমাদের গ্রেট, গ্রেট, গ্রেট গ্র্যান্ডফাদারকে দেখেছ ! মিথ্যে বলতে গিয়ে এতটাই পেছিয়েছ যে, অরণ্যের কালে চলে গেছ। সেই সময় তোমাদের গ্রেটেস্ট গ্র্যান্ডফাদার বল্কল পরে ঘুরতেন, ঝলসানো মাংস খেতেন আর গুহায় থাকতেন। মার্বেল পাথরের গুহা হলেও বোঝা যেত। অর্ডিনারি পাথরের গুহা। রুপোর জামবাটি, গোবিন্দভোগ, স্বপ্নই বটে ! আলমসাহেব, মেঝেফেজে হবে না। যেখানকার-যেখানকার জিনিস সব সেইখানে-সেইখানে ফিট করে দিন।"

টেবিল এতক্ষণ আট হাতের চ্যাংদোলায় দোল খাচ্ছিল, ঠক ঠকাস করে মেঝেতে নেমে এল। আলমসাহেব বারকতক হাতের ব্যায়াম করে নিয়ে বললেন, "বড়বাবু গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল করবেন না। পাথর রইল পাহাড়ে আপনি হুকুম দিয়ে দিলেন মেঝে খুঁড়ে ফেল। মায়েদের পরামর্শ না নিয়ে কেন কাজ করতে যান ! বেকার পরিশ্রম হল।"

এই বেকার শব্দটাই হল কাল। বড়মামা ইদানীং অনেক সাধনার মধ্যে এই সাধনাটাও ঢুকিয়েছিলেন, কিপ আইসকুল। শতকাণ্ডেও মেজাজ বরফ। এর নাম তিতিক্ষা। সেই তিতিক্ষা সামান্য একটা শব্দের গুলিতে তাসের ঘরের মতো চুরমার হয়ে গেল। সম্বোধন তুমি থেকে তুই-এ নেমে এল, "কী বললি, বেকার ! কত টাকা তোকে দিতে হবে বল ! ফুল রোজ দিয়ে দেব। সুধাংশু মুকুজ্যে বেকার কাজ করায় না। বল তোদের কত টাকা রোজ।"

আলমসাহেব থতমত খেয়ে বললেন, "বড়বাবু,টাকার কথা কি আমি একবারও বলেছি। আমাদের ওটা কথার মাত্রা।"

সঙ্গে-সঙ্গে বড়মামা বললেন, "মেঝে আজই খোঁড়া হবে। পাহাড় থেকে পাথর না আসে, দোকান থেকে আসবে। বিশ-বাইশ লাখ যা লাগে এই সুধাংশু মুকুজ্যেই ক্যাশডাউন করবে।"

মাসিমা গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমার অ্যাকাউন্টে বাইশ হাজারও নেই।"

"কেন নেই ?"

"বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়েছ।"

এমনকি এই পৃষ্ঠাটিতেও দেখতে পাবেন ত্বকটি কত বেশি উজ্জ্বল।
দুঃখ এই যে, এর কোমলতাটি অনুভব করতে পারবেন না।

আপনি সব সময়ই চেয়েছেন কোমল ত্বক...
স্বপ্ন দেখেছেন আরও উজ্জ্বল ত্বকের।
দেখুন এবার ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী অ্যাক্টিভ
ফেয়ারনেস ময়েশ্চারাইজার-এর বিস্ময়।
প্রতিটি ফোঁটা এমন সক্রিয় উপাদানে সমৃদ্ধ
যা ভেতর থেকে কাজ করে মৃদুল প্রাকৃতিক
পন্থায় — ত্বককে করে তুলতে কোমল,
উজ্জ্বল... দৃষ্টিনন্দন।

ত্বক করে তোলে কোমল
এর প্রকৃতিদত্ত আর্দ্রতা সঞ্চারী উপাদান হারানো আর্দ্রতা ফিরিয়ে দিয়ে আপনার ত্বক করে তোলে কোমল ও নমনীয়।

ত্বক করে তোলে উজ্জ্বলতর
এর ত্বক উজ্জ্বল করা বিশেষ ভিটামিনগুলি ত্বক শ্যামলা করে তোলা পিগমেন্ট মেলানিনকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে আপনার ত্বক আরও উজ্জ্বল করে তোলে 6 সপ্তাহের মধ্যে।

রোদ থেকে বাঁচায়
এর ডাব্‌ল সানস্ক্রীন্‌স আপনাকে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলি থেকে বাঁচায়।

Fair & Lovely
ACTIVE
FAIRNESS MOISTURISER
For soft, fair skin

অ্যাক্টিভ ফেয়ারনেস ময়েশ্চারাইজার
শুধু উজ্জ্বলতর ত্বকই নয়, কোমলতরও

হিন্দুস্তান লিভার স্কিন সেন্টার-এর
উদ্ভাবনী ত্বক পরিচর্যা
আপনার ত্বকের প্রয়োজনে নিয়োজিত বিজ্ঞান

Lintas Fal P 1 2719 Bg

"কুছ পরোয়া নেই, বাড়ি বিক্রি করে দেব। তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকার প্রপার্টি।"

"বাড়িই যদি বিক্রি করে দিলে, তা হলে মেঝেটা হবে কোথায়! আমাদের মাথায়! যতসব আজগুবি কথা।" বড়মামার মুখটা দেখার মতো হল। অসহায়, করুণ।

নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন, "মেঝে তা হলে হবে না!"

মাসিমা বললেন, "না, সুখে থাকতে আর ভূতে কিলোবে না। অনেক খেলা তুমি দেখিয়েছ, এইবার রেস্ট।"

বড়মামা আবার উত্তেজিত, "রেস্ট! আমার খেলা শেষ হবে না কালীচরণ'! সারাজীবন আমি খেলব। আমি দুবাই যাব।"

মেজোমামা এতক্ষণে কথা বললেন, "দুবাই যাবি কি সোনা আনতে?"

"না, পেট্রোডলার আনতে। কাগজে দেখেছি, দুবাই ভারতীয় ডাক্তার চাইছে। তিন বছর ডাক্তারি করে তিরিশ লাখ টাকা কামিয়ে ফিরে আসব।"

মাসিমা আলমদের বললেন, "ব্যস, একেবারে পাকা কথা, আজ থেকে তিন বছর পরে কাজ শুরু হবে।"

বড়মামা বললেন, "না, না, অত দেরি নয়, লোনে সব হবে। এসে ঝটাঝট শোধ করে দেব।"

"তোমাকে লোনটা কিসের এগেনস্টে দেবে?"

"এই বাড়িটা। শোধ করতে না পারলে, বাড়ি, জমি, সব তোমার, আমি ডিড সই করে দেব।"

মাসিমা বললেন, "এটার মাথায় তিন বালতি বরফজল ঢেলে দে ভাগনে। প্রাণায়ামের বায়ু ফুসফুসে না ঢুকে মাথায় চড়ে বসেছে। তাতেও না হলে রাঁচি।"

আলমসাহেব বললেন, "সব বেক...।"

ঢোক গিলে সামলে নিলেন। বলতে চাইছিলেন, সব বেকার হয়ে গেল। জোর করে একমুখ হেসে বললেন, "ফালতু টাকা নষ্ট করে কী হবে! এমন সুন্দর বিলিতি পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের মেঝে, আয়নার মতো চকচক করছে। এক যদি হাওলার টাকা ধরতে পারতেন, তা হলে গোটা বাড়িটাই মার্বেলে মোড়া যেত। বরং কোথাও মার্বেলের একটা রক করে নিন। সকাল, বিকেল সবাই একসঙ্গে বসে চা-বিস্কুট খাবেন। গল্প করবেন।"

॥ ২ ॥

গভীর রাতে কী একটা কারণে আমার ঘুম ভেঙে গেল। একই ঘরে দুটো আলাদা খাটে আমি আর বড়মামা ঘুমোই। দেখি, বড়মামার খাটটা খালি। এত রাতে ভদ্রলোক গেলেন কোথায়! দেখা দরকার। দরজা ভেজানো ছিল। খুলে বাইরে ছাতে এলুম। অল্প চাঁদের আলোয় চারপাশে ওড়না টানা। আগে আমার খুব ভূতের ভয় ছিল। নাইন থেকে টেনে ওঠার পর ভয় চলে গেছে। এখন আমি একা একটা পোড়োবাড়িতে থাকতে পারি। ভূত বাঘ নয়, সাপ নয়, বিছে নয়। ভূত কামড়ায় না, আঁচড়ায় না, কেবল একটু ভয় দেখায়। ভয় না পেলেই হল। চেহারার কোনও ছিরিছাঁদ নেই, কঙ্কালসার। সে আর কী করা যাবে।

যেদিকটায় বাগান, আম, কাঁঠাল, কলা, নারকেল, কদম, কৃষ্ণচূড়ার একাকার কাণ্ড, ছাদের সেই দিকটায় বড়মামা চুপ করে বসে আছেন। একটা উল্কা জ্বলতে-জ্বলতে দক্ষিণ থেকে পশ্চিম আকাশের দিকে সাঁই-সাঁই করে চলে গেল। স্কুলে আমরা এর নাম রেখেছি 'তারকার আত্মহত্যা'। বড়মামা আমার দিকে পেছন ফিরে বসে আছেন। আমি যেই কাঁধে হাত রেখেছি, শিউরে উঠলেন। ভয়ে কাঠ। আমাকে ভূত ভেবেছেন। মৃদু স্বরে বলছেন, "রাম, রাম।"

আমি ধীরে ডাকলাম, "বড়মামা।"

আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, "তুই?"

"এত রাতে একা-একা তুমি এখানে কী করছ?"

"সত্য খুঁজছি।"

"সত্য আবার কী?"

"বোস এইখানে। রাতের বেলা ঘুমোস কেন? ঘুমিয়ে জীবনটাকে নষ্ট করলি। জেগে থাকলে কত কী জানতে পারা যায়! কত কী দেখা যায়! জানিস তো, পাখিদের মধ্যে একমাত্র প্যাঁচাকেই বলে জ্ঞানী, ওয়াইজ আউল। কারণ, পৃথিবীর সবাই যখন ঘুমোয় তখন প্যাঁচা জেগে থাকে, রাতের চৌকিদার। এই তো একটু আগে আমগাছের এই ডালটায় বসে আমাকে দেখছিল, কী ঘুমোওনি! সবাই তো ঘুমোচ্ছে, তুমি কেন জেগে! যেই বলেছি, আমি যে তোমার শিষ্য, কী খুশি! বললে, রাতকে জানলেই সত্যকে জানতে পারবে।"

"আপনি এক-একদিন এক-একরকম বলেন। এই সেদিন বললেন, উপনিষদ বলছেন, জ্ঞানই সত্য আর সূর্যই হল জ্ঞান। দিন ছাড়া সূর্য পাবেন কোথায়! সেদিন বললেন, জ্ঞানসূর্য, অজ্ঞানের অন্ধকার।"

"এইসব ব্যাপারে তোর মাথাটা রিয়েল মোটা। যে-সূর্য সকালে পুব আকাশে ধকধক করে জ্বলে, ওটা ফায়ার বল। টন টন হিলিয়াম দাউ-দাউ জ্বলছে। আমাদের গরমে, ঘামে, ঘামাচিতে রোজ অতিষ্ঠ করে মারছে। কবে যে এই জ্বলা শেষ হবে! পৃথিবীটা একটু ঠাণ্ডা হবে! দরকার নেই আমার আমগাছ, জামগাছ, দরকার নেই ফড়িং, প্রজাপতি। পৃথিবীটা কিছুদিনের জন্যে আইসক্রিম হয়ে যাক। শ্বেত ভালুক আর হোয়াইট টাইগার, স্নো লেপার্ড আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পেঙ্গুইন। আর কুছ নেহি মাংতা।"

কোথা থেকে অন্যরকম একটা গলায় কে প্রশ্ন করল, "খায়েগা কেয়া। হরি মটর!"

গলাটা বেশ ভারী। ছাতে সম্প্রতি যে নতুন জলের ট্যাঙ্কটা তৈরি হয়েছে, প্রশ্নটা এল তার ওপাশ থেকে। সেদিকে একটা বেলগাছ আছে। খুবই প্রাচীন। প্রবাদ আছে, গাছে নাকি বন্ধুভাবাপন্ন এক ব্রহ্মদৈত্য বহুদিন বসবাস করছেন। এই পরিবারেরই এক মানুষ, সামান্য অপরাধে ব্রহ্মদৈত্য হয়ে আছেন। কিন্তু কেউ কোনওদিন তাঁর দর্শন পায়নি।

বড়মামা আমার হাতটা কষকষে করে চেপে ধরলেন। আমার বুকের ভেতরটাও গুমগুম করছে। যুক্তিবাদে তেমন জোর পাচ্ছি না। লৌকিক অলৌকিক হয়ে গেল বলে। আমিও বড়মামার হাতটা জোরে চেপে ধরেছি। এই কণ্ঠস্বর তাঁরই। বড়মামা খুব ভক্তিভরে বললেন, "প্রভু! রাতের প্রাণী প্যাঁচাদেরও তো খাদ্য আছে।"

"কী খাদ্য বৎস?"

"ইঁদুর।"

"ইঁদুর পাবে কোথায়, সবই যদি বরফ হয়ে যায়!"

"প্রভু, বরফে গর্ত খুঁড়ে শ্বেত ইঁদুর বের করব। হোয়াইট র‍্যাট।"

"বৎস, হোয়াইট র‍্যাট কী খেয়ে বাঁচবে? হোয়াইট ব্যাট? গবেট!"

বড়মামা ব্রহ্মদৈত্যের ওপর ভীষণ কুপিত হয়ে বললেন, "আমার বাঁচার ব্যবস্থা আমি করে নেব, আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি সকাল-বিকেল আচ্ছাসে পেঁয়াজ, আদা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে পেঙ্গুইনের ডিমের ওমলেট আর কফি খাব। চমরি গাইয়ের দুধ দিয়ে রাবড়ি করে খাব। লেবু দিয়ে ছানা কাটিয়ে কমলাভোগ তৈরি করব।"

এইবার ব্রহ্মদৈত্য আরও কুৎসিত গালাগাল দিলেন, "পাঁঠা, সূর্য চলে গেলে সবুজও অদৃশ্য হবে। যে ঘাস তুমি এখন খাও সেই

ঘাসও হবে না, শাকপাতা, গাছপালা সব মরে যাবে। কোথায় পাবে তোমার পেঁয়াজ, লেবু, কাঁচালঙ্কা, সরষে, সরষের তেল। সব প্রাণী, জীবজগৎ মরে ভূত হয়ে যাবে। সূর্য আছে বলেই জল থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি। মরুভূমি আছে বলেই মৌসুমী বায়ু, ধান, চাল, গম, রবিশস্য। গর্দভ, সূর্য ফাদার হলেও পৃথিবীর মাদার।"

"প্রভু, এত গালাগাল দিচ্ছেন কেন?"

"আমি তোমার শিক্ষক ছিলাম বৎস। তোমার মতো গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করার কৃতিত্ব যে আমার। সূর্যশূন্য পৃথিবী মৃত পৃথিবী।"

"মানতে পারলাম না প্রভু, সাইবেরিয়া, আইসল্যান্ডে মানুষ বাঁচছে কী করে! সমুদ্রের তলায় আছে অঢেল সম্পদ। নতুন ধরনের মানুষ নতুন জীবনে অভ্যস্ত হবে। সবুজ মাঠের বদলে সাদা মাঠ, সাদা বাড়ি, জুতোর বদলে স্কেটিং শু, মোটরের বদলে স্লেজ, টানবে বলগা হরিণ, স্কি করতে-করতে অফিস। আলোর মালায় শহর, নগর ঝিলমিল করবে। ঠাণ্ডার দেশের ধর্ম হবে খ্রিস্ট ধর্ম। দিকে-দিকে ক্রিসমাস ট্রি, পাতায়-পাতায় আইসক্রিমের মতো বরফ। চার্চ বেল। হিম। লুঙ্গি, গামছা, পাজামা, পাঞ্জাবি বিদায়। শুধু প্যান্ট, কোট, হ্যাট, টাই। সিল মাছের গ্রিল, ডলফিনের ড্রিল! আকাশে সবসময় চাঁদ আর তারা। কেয়া মজা!"

"ছাগল।"

"কে ছাগল?"

"তুমি একটি আস্ত বোকাপাঁঠা। সূর্য চলে গেলে চাঁদ আলো পাবে কোথায়?"

"আমাদের রকেট গিয়ে হ্যালোজেন ফিট করে দিয়ে আসবে।"

"তুমি একটি পাগল।"

"তুমি একটা ভূত।"

"তুমি একটা মুক্তকচ্ছ উন্মাদ।"

"মনে পড়েছে, কচ্ছপ আর কাঁকড়া খাব, ঝিনুক আর মাশরুম খাব।"

আমাদের পেছনে কখন যে মাসিমা এসে দাঁড়িয়েছেন আমরা খেয়াল করিনি। তরজার মতো ঝগড়া, ঝগড়ার মতো তরজা চলেছে। মাসিমার হাতে বেত। সেটা নাচাতে-নাচাতে বললেন, "এই যে, বলি, এটা যে রাত সেটা খেয়াল আছে কী?"

"আছে।"

"রাত্তিরে মানুষ কী করে!"

"ভোগীরা ঘুমোয়, যোগীরা জেগে থাকে।"

"পাগলরাও জেগে থাকে, আর দাওয়াই হল পেটাই।"

মাসিমা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই এখানে কী করছিস। তোর কাল স্কুল নেই!"

আমার তখন উত্তেজনার শেষ নেই। মাসিমাকে আমি মৌ বলি। "জানো মৌ, বেলগাছের ব্রহ্মদৈত্য এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সত্যি-সত্যি। নিজের পরিচয় দিলেন, বড়মামার মাস্টারমশাই ছিলেন। খুব ভাল ব্রহ্মদৈত্য, বড়মামাকে গাধা, ছাগল, পাগল সব বলেছেন।"

"ব্রহ্মদৈত্য! সিদ্ধিফিদ্ধি খেয়েছিস নাকি? এত বছর এ-বাড়িতে আছি, একদিনও কিছু শুনলাম না।"

বড়মামা বেশ অহঙ্কারের গলায় বললেন, "সাধক ছাড়া ওঁরা দর্শন দেন না, কথাও বলেন না।"

"কথাটা কোনদিক থেকে আসছিল রে!"

"ট্যাঙ্কের ওপাশ থেকে। যেদিকে বেলগাছ।"

মাসিমা দুদ্দাড় করে সেদিকে এগোলেন। শুনতে পেলুম মাসিমা বলছেন, "ও পালের গোদা, তুমিও আছ।"

বড়মামা হামা দিয়ে সেদিকে কিছুটা এগিয়ে ট্যাঙ্কের পাশ থেকে উঁকি মারলেন, "মেজো, তুই?"

"ভগবানকে দেখব বলে বসে ছিলুম, এমন সময় ব্রহ্মদৈত্য ভর করল।"

মাসিমা হতাশ হয়ে বসে পড়লেন থেবড়ে, "বুঝলে, আমার দ্বারা আর হবে না। তোমাদের জন্যে চাই জাঁদরেল একজন শাসক। তোমরা যা বেড়েছ না!"

দূরে একটা বিশাল কারখানা আছে। সেখানকার পেটা ঘড়িতে ঢ্যাং-ঢ্যাং করে দুটো বাজল। উত্তরে আকাশে ব্লপ করে ভেসে উঠল একটা আলোর বল। ধীরে-ধীরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে ফানুসের মতো। ওদিকে বিরাট ক্যান্টনমেন্ট। মিলিটারিরা গভীর রাতে অনেক কিছু পরীক্ষা করে। আলোর বলটায় অনেকরকম শব্দ হচ্ছে, যেন মন্ত্র পড়ছে। সহসা আকাশভর্তি আলো হয়ে গেল। সেই আলোয় ছাতে আমাদের ছায়া পড়ল। গাছের পাতায় ঘন কালো ছায়া, এত জোর আলো। কিছু পাখি ভোর হয়ে গেছে ভেবে বোকার মতো কিচিরমিচির করে উঠল।

বড়মামা বললেন, "মার্কার। সেকেন্ড ওয়ারে আমি অনেকবার দেখেছি।"

জিজ্ঞেস করলুম, "মার্কার কী?"

"রাত্তিরবেলা শত্রু কোথায় আছে দেখার জন্যে এই ফসফরাস আলো ভাসানো হয়।"

হঠাৎ মাসিমা বললেন, "রাতটা কত সুন্দর! এমন কত সুন্দর রাত আমরা ঘুমিয়ে নষ্ট করি। ভাগ্যিস জেগে ছিলুম তাই না এমন সুন্দর আলো দেখতে পেলুম।"

বড়মামা মাসিমার কথায় খুব খুশি হলেন, "আমি তো সেইজন্যে জেগে থাকারই চেষ্টা করি। রাতে অনেক সত্য ধরা যায়।"

মেজোমামা জ্ঞানী মানুষ, সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "একটু কারেকশন করে দিই, সত্য অনেক নয়, সত্য এক এবং অদ্বিতীয়।"

বড়মামা বললেন, "সেটা কী?"

মেজোমামা গান গেয়ে উত্তর দিলেন, "আমি নেই, তুমি নেই, কেউ নেই, কেউ নেই, ওড়ে শুধু একঝাঁক পায়রা।"

"এ তো সেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান রে! আমার কলেজ জীবনের। শ্যামল মিত্রের সেই গান, স্মৃতি তুমি বেদনা। সতীনাথের পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম। কীসব গান! আমাদের কলেজ সোশ্যালে অখিলবন্ধু এসেছিলেন। সে কী গান, ও দয়াল বিচার করো। সিনেমায় আমার প্রিয় হিরো ছিলেন, অসিতবরণ। সেইসব দিন হইহই করে চলে গেল মিছিলের মতো। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান হয়ে গেল, আসবে না ফিরে কোনওদিন।"

মাসিমা আমাকে বললেন, মোটা বড় শতরঞ্জিটা আনতে, সেটা ধরাধরি করে পাতা হল। উত্তর আকাশের মিলিটারি আলো মিলিয়ে গেছে। গাছপালা আবার মিশে গেছে নরম অন্ধকারে। চাঁদ আবার তার জেল্লা ফিরে পেয়েছে। তিনটে সরাল ওঁয়াক-ওঁয়াক করে ডাকতে-ডাকতে আকাশের অনেকটা উঁচু দিয়ে উত্তর দিকে উড়ে গেল। এইবার সোজাসুজি একটা উল্কাপাত হল। ছেলেবেলায় আমরা বলতাম, তারা খসে পড়ল।

শতরঞ্জির মাঝখানে বসেছেন মাসিমা, আমরা তিনজনে তাঁকে ঘিরে আছি মুখোমুখি। মাসিমার প্রিয় দুধসাদা, থুপুরথাপুর বেড়ালটা কোলে এসে বসেছে। নাম তার 'চিত্রা'। রূপের গরবে আমার সঙ্গে বেশি কথাই বলে না, পাত্তাও দেয় না, মাসিমা একবার ডাকলেই, যেখানেই থাকুক, চামরের মতো লেজ খাড়া করে ছুটে আসবে। রুপোলি চাঁদের আলোয় চিত্রার রূপ ফেটে
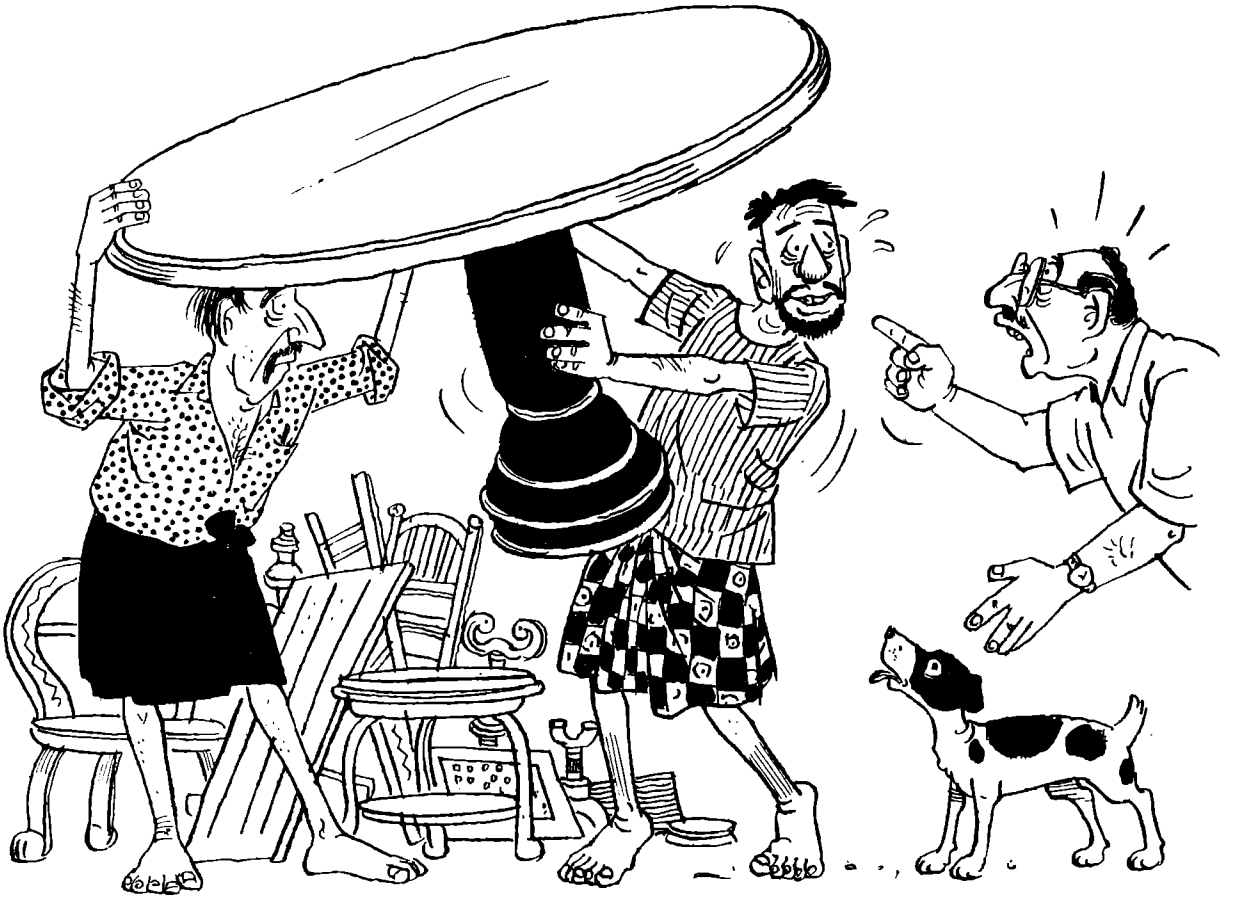
পড়ছে, সাদা বড়-বড় লোমের ডগা জরির মতো চকচক করছে। সব যেন ফ্লুরোসেন্ট ফাইবার। নারকেল গাছের পাতা চাঁদের আলো ধরায় এক্সপার্ট। পাতার ঝিরিঝিরি বেয়ে পিছলে পড়ছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, আমি একটা ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে বসে আছি। মাঝরাতের পরেই বাতাস ঘুরে যায়। তাই গেল। এতক্ষণ ফুলের গন্ধ ছিল না। তাও এল। ভোরের জন্য ফুল তার সাজি সাজাচ্ছে। সূর্যপ্রণাম করবে, মন্দিরে যাবে।

মাসিমা বললেন, "একটা প্রশ্ন আমার খুব ইচ্ছে করে তোমাদের করি।"

বড়মামা বললেন, "করো, করো। প্রশ্নোত্তরের আসর হয়ে যাক।"

"আচ্ছা, তোমরা দু'জনেই কেন বিয়ে করলে না!"

বড়মামার চটজলদি উত্তর, "মেয়েদের দেখলেই আমার মনে হয় বোন অথবা মা, আর জীবনের সেরা বোন-কাম-মা কুসিকে তো পেয়েই গেছি। আর আমি কিছু চাই না বাবা! জীবন ভরপুর। একমেবাদ্বিতীয়ম আমার কুসি। আর আমি চাই না কিছু।"

"মেজদা, তোমার কেস?"

"এমন একটা বোন থাকতে কোন ছাগলে বিয়ে করবে! কুসি, আমি তোর নাবালক ডিপেন্ডেন্ট। বিয়ে খুব ব্যাড থিং। যতবার বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছি, ততবারই আমার পেটখারাপ হয়েছে। মালা, সানাই, টোপর এ তিনো হায় ফাঁসিকা ফান্দা!"

"তুমি এই ডায়ালগ শিখলে কোথা থেকে, ফাঁসিকা ফান্দা।"

মেজোমামা অপরাধী বালকের মতো মাথা নিচু করে ভয়ে-ভয়ে বললেন, "লুকিয়ে-লুকিয়ে শোলে দেখেছি।"

"তুমি লাইন দিয়ে টিকিট কেটে হলে বসে শোলে দেখেছ। শেম, শেম!"

মেজোমামা হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, প্রতিবাদের গলায় বললেন, "সত্যি বলছি হলে নয় শোভনদের বাড়িতে ভি সি আরে। কী মিউজিক! এ দোস্তি, ছোড়েঙ্গে নেহি। কুসিকো নেহি ছোড়ুঙ্গা। লালা, ট্রালা ট্রালা।"

"কী বরাত! এক ছবিতে এতদিনের চরিত্রটা বিগড়ে গেল। সত্যি বলছ, হিন্দি গান গাইছ, ডায়ালগ বলছ, ভাগনে বসে আছে পাশে।"

"ও তো আমাদের বন্ধু।"

অনেক উঁচু দিয়ে একটা প্লেন যাচ্ছে। একেবারে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। ডানার তলার আলো ফ্ল্যাশ মারছে। আমি বললুম, "এত রাতে প্লেন যায় কোথায়!"

মেজোমামা বললেন, "ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট। লন্ডন হয়ে নিউ ইয়র্ক। তুইও একদিন আমাদের মাথার ওপর দিয়ে এইভাবে উড়ে যাবি বিশাল জগতে।"

বড়মামা বললেন, "ওই ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপটার দিকে তাকিয়ে আজ আমার কত কথাই মনে পড়ছে! চাঁদের আলোয় কেমন পড়ে আছে দ্যাখ। বৃদ্ধ অতীত। পুরনো সেই দিনের কথা। এক সময় এই গোটা গ্রামটা আমাদের জমিদারি ছিল। দূরের ওই কারখানা, কাগজ কল, কাপড়ের কল, উত্তরের ওই বিল, সব ছিল আমাদের সম্পত্তি। বাবার কথা তোদের মনে পড়ে!"

মেজোমামা বললেন, "অস্পষ্ট!"

মাসিমা বললেন, "একেবারেই নয়।"

"মানুষের মতো মানুষ ছিলেন, আমরা তাঁর পায়ের নখের যুগ্যি নই। তিনি ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী। ওই যে দেখছিস চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংসস্তূপ, ওর তলায় আছে একটা চোরকুঠুরি। একটা সুড়ঙ্গও আছে। সোজা চলে গেছে জোড়া বিলের ধারে। ছেলেবেলায় দেখেছি সেখানে একটা ডাম্বা লেটার বক্স। ওই

যেমন দেখা যায়, মন্দিরের মতো লাল রং করা। আসলে সেটা লেটার বক্স ছিল না। কায়দাটা ছিল অদ্ভুত। উলটে শুইয়ে দিলে গহ্বরের মুখ। নামলেই সুড়ঙ্গ। বিপ্লবীরা ওই পথে এসে কুঠুরি থেকে বোমা, রিভলভার, পিস্তল, গুলি, সব নিয়ে যেতেন। বারীন ঘোষ অনেকদিন লুকিয়ে ছিলেন আমাদের চিলেকোঠায়।"

"তুমি তখন কত বড় ?"

"বালক। বোধবুদ্ধি হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে বাবা পাঠশালা করতেন। আমার খুব মজা লাগত। বিরাট, সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু হচ্ছে। দেশ থেকে ইংরেজ খেদানো। মায়ের সব গয়না গেল। জমিদারি বিক্রি হতে লাগল। বিপ্লবের খরচ জোগাতে বাবা ফতুর। মাঝে-মাঝে পুলিশ আসে, বাড়ি সার্চ করে। বাবা টিকিতে জবাফুল বেঁধে চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডীপাঠ করেন, ঘণ্টা নাড়েন। পুলিশের সব প্রশ্নের উত্তরে সংস্কৃত বলেন। গ্রামে রটে গেল বাবার অলৌকিক ক্ষমতা। যাকে যা বলেন তাই হয়। গভীর রাতে শূন্যপথে ভ্রমণ করেন। তাগা-তাবিজে অসম্ভবকে সম্ভব করেন। খোদ দারোগার মরো-মরো মেয়ের গায়ে আঙুল ঠেকাতেই সে উঠে বসল। ধন্য, ধন্য। গোটা পুলিশ-ব্যারাক বাবার ভক্ত। কে ধরবি ধর !"

মেজোমামা বললেন, "সত্যি, এইরকম পাওয়ার এসেছিল ?"

"কতটা পাওয়ার, কতটা প্রচার, সে-বিচারের বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। তবে হ্যাঁ, বাবা ছিলেন মহাসাধক। সে-ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই। অষ্টমীর দিন দুর্গাদালানে বসে যখন চণ্ডীপাঠ করতেন, মনে হত মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। বুক ওঠানামা করছে। অসাবধানে মায়ের গায়ে অস্ত্রের খোঁচা লাগলে রক্ত বেরোবে। প্রকৃত শাক্ত ছিলেন। বিসর্জনের দিন রাতে জ্বর আসবেই আসবে, ধুম জ্বর। একদিন মনে আছে, ওই যে বুড়ো আমগাছ, এখন বুড়ো, তখন যুবক, গাছটার তলায় বাবা বসে আছেন খোলা গায়ে, আমরা বাচ্চারা সব খেলা করছি। গাছে কচি-কচি আম। কে একটা ছেলে আধলা ইট ছুড়েছে। ইটটা ডালে লেগে ছিটকে এসে সপাটে বাবার পিঠে। চওড়া পিঠ। ফরসা ধবধবে। একেবারে থেঁতলে গেল। বাবা ছেলেটাকে ডেকে শান্ত গলায় বললেন, 'ইট ছুড়ো না বাবা, তোমাদেরই মাথায় লাগবে।' ছেলেটা বাবার ক্ষতস্থান, আর অমন শান্ত কথা শুনে, হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। ছেলেরা দুব্বো ঘাস ছিঁড়ে, চিবিয়ে-চিবিয়ে রস বের করে বাবার ক্ষতস্থানের ওপর থেবড়ে-থেবড়ে লাগাচ্ছে। বাবা হাসছেন। সে এক দৃশ্য। আজও ভুলিনি। কী সহ্যশক্তি ! বাবা বলতেন, বিপ্লবী মানে সাধক, সাধক মানে বিপ্লবী। চলে যাওয়ার দু'দিন আগে, আমার হাতে একটা ডায়েরি দিয়ে বললেন, 'আমি চলে যাওয়ার পর মন দিয়ে পড়বে। এটা শুধু তোমারই জন্যে, আর কেউ যেন না পড়ে। হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে, একটা বাক্সয় ভরে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় বিসর্জন দেবে। কোনও ভুল যেন না হয়।' তখন আমার বয়েস ষোলো।"

মাসিমা খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, "সে কী, এই ডায়েরির কথা তো তুমি আগে আমাদের কখনও বলোনি। কোথায় সেই ডায়েরি ! আমি পড়তে চাই।"

"সরি ! বাবার নির্দেশ পালন করতে আমি বাধ্য, অন্তত ওই ডায়েরিটা পড়ার পর।"

মেজোমামা বললেন, "আমিও দাদার সঙ্গে ছিলাম। বাক্সটা জলে পড়ে ধীরে-ধীরে তলিয়ে গেল। তারিখটা ছিল ২৫ ডিসেম্বর, আমার মনে আছে স্পষ্ট। একজন সুন্দর চেহারার সন্ন্যাসী স্নান করছিলেন, তিনি বললেন, 'সব মনে আছে তো, ভুলে যাওয়ার আগে লিখে রেখো। শুধুমাত্র শ্রুতি আর স্মৃতিতে বিশ্বাস কী !' আচ্ছা দাদা, সাধু কেমন করে বলেছিলেন ! একটু পরে আমরা তাঁকে কত খুঁজলুম, আর পাওয়াই গেল না !"

বড়মামা সুন্দর একটা উত্তর দিলেন, "দ্যাখ, বিদ্যুতের খুব শক্তি, আমরা জানি, মাপতেও পারি। কিন্তু কেন এই শক্তি, আমরা বলতে পারব না। সেদিন একটা হার্ট অপারেশনের সময় আমি অ্যাসিস্ট করছিলাম। রিবকেজ ফেঁড়ে হার্টটাকে বের করে এনে, আইসপ্যাক দিয়ে তার ধুকপুকুনি থামানো হল। রোগী তখন হার্ট অ্যান্ড লাং মেশিনে। প্র্যাকটিক্যালি ডেড। এদিকে তার নিজের হার্টও ফ্রোজন। অপারেশন হল। হার্টটাকে ক্যাভিটিতে ভরে টুক করে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দেওয়া হল। চালু হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। এখন একটা প্রশ্ন, প্রথম স্পন্দনটা কে দিয়েছিল। আমরা তো চালু যন্ত্র নিয়েই এসেছি ; কিন্তু ভাই, প্রথম কে চালু করেছিলেন। দেখলুম, বরফ দিয়ে বন্ধ করা যায়, আবার বিদ্যুৎ দিয়ে চালু করা যায়, তা হলে কে তিনি ?"

বড়মামা তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে, সাধকের মতো দু'হাত তুলে বললেন, "এই সত্যটাই জানতে চাই, রাতের পর রাত তাই জেগে থাকি। জানতে চাই, কে আমি !"

মেজোমামা তাঁর উদাত্ত গলায় বলে উঠলেন :

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা—
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী' পরে
শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা—
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা ॥

এই মেজোমামার কাছে আমি আবৃত্তি শিখে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি। মেজোমামা খুব ভাল অভিনয় করতেন কলেজে। শেক্সপিয়রের নাটকে। সুইমিং চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। বড়মামা মাঝে-মাঝেই বলেন, মেজো আমার গর্ব।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, "বড়দা, ডায়েরিতে কী লেখা ছিল আমাদেরও বলা যাবে না ?"

"দ্যাখো, ডায়েরিতে বাবা আমাকে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। বাবাই আমার গুরু। একটা কাগজের মোড়কে দিল বীজমন্ত্র। ডায়েরিতে ছিল নির্দেশ। আমার জীবনের পথটা তিনি এঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বরফের ধ্যান করবে। বলেছিলেন, রাতকে আপন করে নেবে। বলেছিলেন, বাঘ যেমন অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকে, সত্যও সেইরকম অন্ধকারে থাকে। তিনটে জিনিস মানতে বলেছিলেন, নারীর অঙ্গ স্পর্শ করবে না, আরতি লঙ্ঘন করবে না, মিথ্যা বলবে না।"

মাসিমা বললেন, "আরতি লঙ্ঘনের মানে ?"

"ধর যদি দেখিস কোনও মন্দিরে আরতি হচ্ছে, যত তাড়াই থাক একটু দাঁড়িয়ে প্রণাম করে যাবি।"

"আর কী লেখা ছিল ?"

"লেখা ছিল, চণ্ডীমণ্ডপের তলার চোরকুঠুরিতে ভয়ঙ্কর একটা জিনিস আছে, যেটা পেলে, যে পাবে তার অদ্ভুত একটা শক্তি আসবে, পাওয়ার। সে যা ইচ্ছে করবে তাই হবে।"

"সেটা কী ?"

"জানি না।"

"তুমি অনুসন্ধান করোনি ?"

"কী করে করব ! এক ঝড়ের রাতে মণ্ডপটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। স্তূপাকার। জঙ্গল। কার সাহস হবে ওখানে যাওয়ার !"

"জীবনের পথ কী বলেছেন ?"

"কর্তব্য। দেশ স্বাধীন হল, দেশ ভাগ হল, আমাদের জায়গাজমি সব জবরদখল হয়ে গেল। সুবিধাবাদীরা গদিতে বসল। এই গ্রামের এক ধান্দাবাজ, ইংরেজের ইনফরমার মন্ত্রী হয়ে গেল। বিপ্লবীদের স্থান হল না। দশমীর সন্ধেবেলা বাবা মারা গেলেন। শ্মশানে মুখাগ্নি করছি, ওদিকে বিসর্জনের বাজনা

বাজছে। মা পাগল হয়ে গেলেন। ষোলো বছরের আমি। সংসারের দিকে তাকালাম। দুই বোন, এক ভাই, অপ্রকৃতিস্থ মা। তিন মাস স্বাভাবিক, ন'মাস অস্বাভাবিক। ডায়েরিতে লেখা, কর্তব্য। মামলা, দেনা, জ্ঞাতি-শত্রুতা। ঘুম চলে গেল। সেই থেকে আমি রাতজাগা প্রাণী। প্যাঁচা আমার বন্ধু। সাহস করে একদিন চোরকুঠুরিতে নামলাম।"

মাসিমা বললেন, "এই যে বললে অনুসন্ধান করোনি !"

"আমি করিনি বলিনি, আমি প্রশ্ন রেখেছি, কী করে করব ! তার মানে এই নয়, আমি করিনি। আমি তোদের সাসপেন্সে রেখেছি।"

চটপট, চটপট কয়েক ফোঁটা জল আমাদের গায়ে পড়ল। আমরা সবাই আকাশের দিকে তাকালুম। কোথাও কিছু নেই। হাহাকার ফাঁকা। বড়মামা বললেন, "অবাক হওয়ার কিছু নেই, মাঝে-মাঝে মেঘ ছাড়াই আকাশ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ে শিশিরবিন্দুর মতো। একেই বোধ হয় বলে স্বাতী নক্ষত্রের জল। ঝিনুক জানে। কপ করে গিলে নিলেই মুক্তো। কে যেন বলেছিল, একটি-একটি শিশির কণায় ধানের গর্ভে চাল আসে।"

বাতাস একটু ভিজে-ভিজে। মাসিমা তাঁর শাড়ির আঁচলটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। পাছে ঠাণ্ডা লেগে যায়। আঁচলে সুন্দর ধূপের গন্ধ। মাসিমা কাপড়ের আলমারিতে ধূপের খালি প্যাকেট রাখেন, সুবাসিত হবে বলে। মাসিমা উদ্‌গ্রীব, চোরকুঠুরি থেকে বড়মামা কী পেলেন, "কী পেলে তুমি ?"

"ধপাস করে তো নীচে গিয়ে পড়লুম। মড়াক করে একটা শব্দ হল। ভাবলাম ঠ্যাংটা ভাঙল বুঝি। পাঁচ সেলের টর্চটা জ্বাললাম। কিসের ওপর পা পড়ল দেখি। শুকনো একটা গাছের ডাল। বিজবিজ করে উইপোকা বেরোচ্ছে। অজস্র ইঁদুর চারদিকে দৌড়চ্ছে চিক-চ্যাঁক করে। টর্চের আলোয় তাদের বিন্দু বিন্দু চোখ হিরের মতো জ্বলছে। ওপর থেকে নেমে এসেছে ঘন কালো ঝুল। বিরাট-বিরাট মাকড়সা দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘাপটি মেরে আছে। অনেকটা দূরে দেখি ডাইনির চুলের মতো কী ঝুলছে। জায়গাটায় ঘুরপাক খাচ্ছে নীল বাষ্প। পরে আবিষ্কার করলাম, ওপরের কোনও বড় গাছ, যাকে বলে বৃক্ষ, শিকড় নামিয়ে দিয়েছে। থেকে-থেকে শিসের শব্দ। প্রথমে ভেবেছিলাম, বড় কোনও সাপ। গোখরো অথবা তক্ষক। পরে বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝলাম, বাতাস, নানা ফুটো দিয়ে সাঁই-সাঁই করে ঢুকছে। অনুসন্ধান করব কী ! ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণীদের জ্বালায় পালাই-পালাই অবস্থা। সেই সময় হঠাৎ যেন নির্দেশ এল, সামনে দশ পা এগোও। এইবার ডান দিকে তাকাও একটু ওপরে। তাকাতেই মনে হল, সেখানে একটা খুপরি আছে। লুজ একটা ইট। সাহস করে ইটটা টানতেই প্রথমে খানিক ধুলো বেরোল ঝুরঝুর করে। পায়ের ওপর সব জমা হল। ভয় করছে, ফ্যাঁস করে সাপ না বেরোয় ! টর্চ মারলুম। বেশ গভীর। কাঁধ পর্যন্ত হাত ঢুকে যাবে। প্রথমে-হাত পা ঢুকিয়ে গাছের সেই ভাঙা ডালটা সাঁদ করালাম। মনে হল কিছু একটা আছে, শুধু আছে না, ঠেললে সরে যাচ্ছে। তখন 'জয় মা' বলে ঢোকালাম হাত। বার করে আনলাম জংধরা একটা লোহার বাক্স। একটু টানাটানিতেই ঢাকনাটা উপড়ে চলে এল হাতে। আলো ফেলতেই ভয়ে হাড় হিম। গুটিয়ে পাকিয়ে রয়েছে সাপের একটা কঙ্কাল। ভয়ে তিন লাফ। কিছুক্ষণ ভাবলাম। আবার নির্দেশ, সাহস করে জিনিসটা তোলো। তবু সাহস হচ্ছে না। অনেকক্ষণ থম মেরে রইলাম। দেওয়ালের ভয়ঙ্কর মাকড়সাগুলো হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে খিড়খিড় করে নাচানাচি শুরু করল। দু-একটা লাফিয়ে নেমে পড়ল মেঝেতে। বাতাসের সিঁসিঁ ভীষণ বেড়ে গেল। গাছের ঝুলো শেকড়গুলো হিলহিল করে উঠল। আবার, যা থাকে বরাতে—দু' আঙুল দিয়ে জিনিসটাকে টেনে তুললাম। আঃ, কী সুন্দর !"

বড়মামা হঠাৎ থেমে গেলেন। আকাশে সেই ভোরের তারাটা মুকুটের কোহিনুরের মতো জ্বলজ্বল করছে। সমস্ত প্যাঁচা রাত শেষ হবে বলে সমস্বরে ডেকে উঠল, চলো, ভাই শুতে যাই, বিশ্রী দিন ওই আসছে। কর্কশ, ঘসঘস, গোলমাল, চিৎকার, মানুষেরা এইবার জাগছে ।

মাসিমা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "হঠাৎ, হঠাৎ থেমে পড়াটাই তোমার রোগ। ব্যাটারি ডাউন গাড়ির মতো। তারপর বলো, কী হল তারপর !"

বড়মামা বললেন, "আর তো শোনার কিছু নেই। এইবার যা তা দেখার। জিনিসটা তোদের দেখাব।"

"কবে ?"

"আজই। ভোরের নীল আলোয়। দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবি, গ্যারান্টি।"

॥ ৩ ॥

আকাশে আলোর ডানা। সত্যিই ডানা। রাজহাঁসের পালকের মতো শিল্পীর তুলিতে আঁকা নিখুঁত একটু মেঘ। যেন মা-সরস্বতী তাঁর হাতের কলমটি সুপ্রভাত লিখে ভাসিয়ে দিয়েছেন পুব আকাশে ! ধারে-ধারে লাল রং ! তিনি আসছেন নতুন একটি দিনের ঘোষণাপত্র হাতে নিয়ে।

বড়মামা হাঁক পাড়লেন, "হরিদা।" সঙ্গে-সঙ্গে জাহিরুলদের বাড়ির মুরগি ডেকে উঠল, কোঁকোর কোঁ। ওদিকে সিদ্ধেশ্বরীতলায় মঙ্গলারতি শুরু হয়ে গেল। শুকতারা আকাশের গায়ে অস্পষ্ট একটা টিপ।

হরিদা আমাদের ম্যানেজার কাম অভিভাবক কাম সব কিছু। ত্রিভুবনে নেই কেউ। এই বাড়িকেই নিজের বাড়ি করে নিয়েছেন। আমরাই তাঁর সব। তবে শোনা যায়, হরিদা খুব বড় পরিবারের মানুষ। বিরাট জমিদার ফ্যামিলির ছেলে। বিষয়-সম্পত্তির লোভে হরিদার বাবাকে বিষ দিয়ে খুন করা হয়েছিল। হরিদার মাকে সাপে কামড়েছিল, সেও এক সমাধানহীন রহস্য। হরিদা সেই শৈশবেই এক সাঁওতাল পরিবারের আশ্রিত হয়েছিলেন। জঙ্গলে মানুষ। সেই পালক-পিতা ছিলেন এক সেরা গুনিন। হরিদা তাঁর কাছ থেকে অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। ঘড়ি ছাড়াই বলতে পারেন ঠিক-ঠিক ক'টা বেজেছে। কাক কী বলছে তিনি বোঝেন। এক মুঠো ধুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে দিতে পারেন দিনটা কেমন যাবে। মুখ দেখে বলে দিতে পারেন শরীরের কোথায় গোলযোগ। আরও, আরও অনেক কিছু। পরিষ্কার একটা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরেন। গায়ে হাফশার্ট। অঙ্কে ভীষণ পাকা। শিবঠাকুরের পরম ভক্ত। কত বয়েস, তবু ভীষণ ফিট। ওষুধ হল গাছপাতা, শিকড়বাকড়। সংস্কৃত স্তোত্র যখন সুরে আবৃত্তি করেন, বাড়িটা ঋষির আশ্রম হয়ে যায়। খুব ভাল রাঁধতে পারেন। হরিদা সকলের দাদা, পরামর্শদাতা। গরিবের চিকিৎসক। চিকিৎসায় অসুখ অবশ্যই সারে। বড়মামা হরিদাকে স্পেশ্যাল একটা ঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। গান শুনতে ভালবাসেন বলে একটা মিউজিক সিস্টেম কিনে দিয়েছেন।

হরিদা এসে দাঁড়ালেন। এরই মধ্যে চানটান করে টিপটপ। এইটাই তাঁর অভ্যাস। পুকুরের জলে আলো যেই ফুটল, শালুকের পাপড়ি যেই খুলল, যেই ফুটল টগর, মাথায় ফুল দিয়ে হরিদা ডুব দেবেন জলে, ফুলগুলো সব ভেসে-ভেসে চলে যাবে জলের আন্দোলনে। একটা-একটা করে হাঁস ভারিক্কি চালে জলে নামবে। মন্দিরের ত্রিশূলে বসে দোয়েল ধরবে তান। হরিদা উদাত্ত গলায় পাঠ করবেন গায়ত্রীমন্ত্র। এই সময়টাকেই বলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত।

বড়মামা বললেন, "দাদা, রাতটা কাল ছাতেই কাটল, এইবার
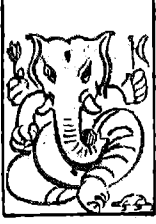
বারান্দায় বসে একটু চা সেবন।"

"সব রেডি, নামলেই হয়।"

আমরা খুব দুঃখ-দুঃখ মুখে আকাশের দিকে তাকালাম। রাতের রহস্য-উপন্যাস যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। ডিমের কুসুমের মতো সূর্য ক্ষণকাল পুবদিগন্তে অবস্থান করে চড়চড় করে মধ্যগগনে উঠে পড়বে আগুনের গোলার মতো। সবকিছু এত স্পষ্ট হবে, উত্তাপ এত অসহ্য হবে যে, ভাল লাগবে না। নিজেকে মনে হবে জোয়াল পরানো বলদ।

সাবিত্রীদি আমাদের বাড়িতে সর্বক্ষণ থাকেন। তাঁর জীবন সবচেয়ে দুঃখের, তাই তিনি সবচেয়ে আনন্দে থাকেন। সদাই যেন নাচছেন। চকচকে মুখে সবসময় ঝকঝকে হাসি। বড়মামা পটনা স্টেশন থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। মাসিমার ট্রেনিং-এ একেবারে চোস্ত। নাচতে ভালবাসেন বসে মাসিমা নাচ শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেদের খুব হিংসে। তারা বলে, পাঁচিলের এপারে নিজেদের জগতে সব বেশ আছে। ক'দিন থাকবে রে বাপ! চিরদিন কি সমান যায়। পতন একদিন হবেই হবে। কারও ক্ষমতা নেই ঠেকায়। মাসিমাকে সবাই মেমসায়েব বলে ব্যঙ্গ করে। বলে, "মেমসায়েব যেন ইউরোপ আমেরিকা তৈরি করে ফিরিঙ্গিনি সেজেছে।"

বিশাল ট্রেতে সাজানো কাপ, টিপট বাহারি, এক প্লেট বিস্কিট। মার্বেল পাথরের টেবিলে নামিয়ে রেখে সাবিত্রীদি বললেন, "গুড মর্নিং।"

আমরা সমস্বরে বললাম, "মর্নিং।"

সাবিত্রীদি পদ্মের ডাঁটার মতো দীর্ঘ হাত দুটো জড়ানো সাপের ভঙ্গিতে ওপর দিকে তুলে নমস্কার করলেন পুব আকাশের সূর্যকে। অপূর্ব ভঙ্গি। "হ্যাভ টি", বলে চলে গেলেন। দিনটাকে ভাল করে শুরু করতে হয়। তারপর যা হয় হোক। এই সেই শুরু।

হরিদা বললেন, "ঝট করে মুখ ধুয়ে এসো। বাসী মুখে চা আমি অ্যালাউ করব না।"

ভিজে-ভিজে মুখে আমরা ফিরে এসে যে যার জায়গায় বসলুম। গভীর বারান্দা। সাবেক আমলের জাফরি। তরুণ তপনের কিরণ বিপরীত দেওয়ালে নকশা এঁকেছে। সার-সার অর্কিডের টব। সামনের গাবগাছে সাদা একটা বক বসে-বসে প্ল্যান করছে, কোন পুকুরে যাবে আজ। হরিদা কাপে-কাপে চা ঢালছেন। মাসিমা রোজই বলেন, আমি ঢালি। আজও বললেন। হরিদার সেই একই উত্তর, "যেদিন আমার হাত কাঁপবে।" বড়মামার তিনটে কাক, আমরা বলি কাকত্রয়ী, ঠিক এসে গেছে। বড়মামার হাত থেকে তিনজনে তিনখানা বিস্কুট ঠোঁটে নিয়ে সাট-সাট উড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই পরিচিত কাশির শব্দ। নেপালবাবু। প্রবীণ শিক্ষক। কেউ কোথাও নেই। ভাঙা একটা বাড়িতে থাকেন। ছেলেরা বিরাট চাকুরে, প্রবাসী। বৃদ্ধ একা কমা দিয়ে যাচ্ছেন, একদিন ফুলস্টপ বসিয়ে দেবেন। কষ্ট দেখে বড়মামা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, চা, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব এখানে। 'মর্নিং টি'-র জন্য আসছেন। সাবিত্রীদি ম্যানেজ করবেন। ইংরেজির নামকরা শিক্ষক। সাবিত্রীদির সঙ্গে একটা কথাও বাংলায় হবে না। দু' পক্ষই ইংরেজি চালাবেন। ভুল বললে মাস্টারমশাই শুধরে দেবেন। রাতের খাবার আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। নোনাধরা ভাঙা বাড়ির দোতলায় বড় একটা লাইব্রেরি আছে। ভাল-ভাল বই। আমুন্ডসেনের আন্টার্টিক অভিযান। এভারেস্ট অভিযান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। ডেভিড লিভিংস্টোনের ডার্কেস্ট আফ্রিকা। ভলক্যানো। কত কী? বলেছেন, "খোকা! তুই এত সেবা করিস, তোকে সব দিয়ে যাব। জীবনে লেখাপড়ার চেয়ে আনন্দের কিছু নেই।"

বড়মামা বললেন, "এইবার তা হলে সেইটা। ওয়ান্ডার অব ওয়ান্ডার্স।"

বড়মামা বারান্দার একেবারে শেষ ঘরটায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই ঘর থেকে আদেশ এল, "ক্লোজ ইওর আইজ।"

আমরা চোখ বোজালাম। পায়ের শব্দে বুঝতে পারছি বড়মামা আসছেন। শ্বেতপাথরের টেবিলের কাছে এসে গেছেন। কিছু একটা রাখার শব্দ হল।

"ওপ্‌ন ইওর আইজ।"

এ কী! এমন জিনিস জীবনে দেখিনি। ছোট-ছোট সমান মাপের হাড় দিয়ে তৈরি একটা বেল্ট। প্রতিটি হাড়ের মাঝখানে একটা করে ঝকঝকে লাল পাথর বসানো। বকলসটা ড্রাগনের মুখ। সেখানে সমান দূরত্বে ছোট-ছোট নীল পাথর।

বড়মামা বললেন, "লালগুলো সব বহুমূল্য রুবি, আর নীলগুলো নীলা।"

আমরা সবাই ভয়ে-ভয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লুম। এমন অপূর্ব জিনিস অতীতে দেখিনি কখনও। ভবিষ্যতেও দেখব বলে মনে হয় না। মন মনে-মনেই বলছে, কী সুন্দর, কী সুন্দর! স্পর্শ করার সাহস হচ্ছে না। ভয় এবং ঘেন্না। কিসের হাড় কে জানে!

হরিদা ভাল করে দেখে, সোজা হয়ে বললেন, "আমার সামান্য জ্ঞান থেকে যা মনে হচ্ছে, এটা চিন দেশের।"

মেজোমামা বললেন, "এটা তো ওই ড্রাগনটা দেখলেই বোঝা যায়।"

হরিদা বললেন, "এই ব্যাপারে আমার আরও একটু লেখাপড়া করা আছে। এটা শাঙ্গ ডাইন্যাস্টির জিনিস। তোমরা যে যার জায়গায় বসে পড়ো, আমি ঝট করে তোমাদের মতো জ্ঞানীদের একটু জ্ঞান দিয়ে যাই। জিনিসটা আমি বিলক্ষণ চিনতে পেরেছি। বেশি না, তোমাদের হাজার ছয়েক বছর পেছোতে হবে। তবে আরও দু' হাজার বছর এগিয়ে এসে চার হাজার বছর থেকেই শুরু করব।"

বড়মামা বললেন, "পিপাসা।"

মেজোমামা বললেন, "হ্যাং ইওর পিপাসা। এখন একমাত্র পিপাসা হল জ্ঞানের পিপাসা। থার্স্ট ফর নলেজ।"

বড়মামা বললেন, "তা হলে চা এখন থাক।"

মেজোমামা বললেন, "চা! আরে চা তো লিকুইড নলেজ। সৃষ্টির কাজ শেষ করে হাত ধুতে-ধুতে ভগবান বললেন, 'নাও, আই উইল সেটল ফর এ কাপ অব টি। ইংরেজ শুনল টি, বাঙালি শুনল চা, হিন্দুস্থানিরা শুনল চায়ে।'"

মাসিমা বললেন, "তা হলে ঢালি।"

হরিদা বললেন, "আমি একটু খাব।"

মেজোমামা কারেকশান করলেন, "পান করব।"

কুলকুল করে সোনালি রঙের চা ঝরনাধারায় নামতে লাগল স্বচ্ছ, সুন্দর কাপে। আর তখনই সাবিত্রীদি নীচে থেকে বলল, "বড়দা, মাস্টারমশাই ওয়ান্টস টু সি ইউ।"

বড়মামা তাড়াতাড়ি বাস্কেটে জিনিসটা ভরতে-ভরতে বললেন, "দয়া করে ওপরে আসবেন।"

মাস্টারমশাই আসছেন। পায়ের শব্দ। ধীরে-ধীরে উঠছেন। চুড়ির শব্দ। তার মানে সাবিত্রীদি ধরে-ধরে আনছে। শার্লক হোম্‌স হতে আর বিলম্ব নাই! আমরা সবাই ভালমানুষের মতো মুখ করে বসে আছি। মাস্টারমশাই প্রায় ছ' ফুট লম্বা। সামনে সামান্য ঝুঁকে আছেন। একমাথা পাকা চুল। টকটকে ফরসা। বনেদি ঘরের মানুষ।

চেয়ারে বসে দু' কদম কাশলেন। ভাল করে সকলকে দেখে নিলেন একবার, "যাক তোমরা সকলে ভাল আছ দেখে ভালই
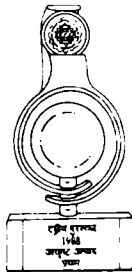
লাগছে। সৎচিন্তায় মানুষ ভালই থাকে। শোনো ডাক্তার, আমি একটা কাজের কথা বলি। আমাদের ঠাকুরদালানটা তুমি দেখেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাড়িটা আমি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দুটো প্লট করে, একটা বেচে দেব, আর সেই টাকায় নিজের জন্যে ছোট্ট একটা বাংলো তৈরি করব।"

"সুন্দর সিদ্ধান্ত। যতদিন না বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, ততদিন আপনি আমাদের সম্মানিত গেস্ট।"

মাস্টারমশাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। ছানিপড়া বড়-বড় চোখ দুটো জল-টলটলে হচ্ছে। আবেগে শরীর কাঁপছে।

আবেগটা কেটে যেতেই গলা পরিষ্কার করে মাস্টারমশাই বললেন, "তোমরা ভাল, তোমরা যে এত ভাল তা জানতাম না। তোমরা ভিন্নগ্রহের মানুষ। মনে আছে ডাক্তার, তোমাদের আমি অস্কার ওয়াইল্ডের 'হ্যাপি প্রিন্স' পড়াতাম। মনে পড়ে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই পড়ানো কি ভোলা যায় !"

"সোয়ালো, সোয়ালো, আমি দেখতে পাচ্ছি, দূরে, বহু দূরে গরিবের একটি কুটির। One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worm, and she has a coarse, redhands, all pricked by the needle far she is a Seamstren. রানির প্রধান পরিচারিকার নাচের পোশাকে এমব্রয়ডারি করছে। খাবার নেই, আগুন নেই, ছেলেটা খিদেয় কাঁদছে। সোয়ালো তুমি আমার তরোয়ালের হাতলে যে বহুমূল্য রুবিটা রয়েছে সেইটা খুলে ওকে দিয়ে এসো। কিছুদিন তবু চলবে। এইভাবে সোয়ালোকে দিয়ে প্রিন্স তার সবকিছু দান করে দিল গরিবদের। সোনার আস্তরণ, চোখের মণি। মেয়র একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সোনার মূর্তি সিসের হয়ে গেছে। পায়ের তলায় মরে পড়ে আছে ছোট্ট সোয়ালো। মূর্তি উৎপাটিত। আগুনে দেওয়া হল ধাতুটাকে উদ্ধার করে নেওয়ার জন্যে। সব গলে গেল, গলল না তার হৃদয়টি। মনে পড়ে সেই শেষ লাইন ক'টা :

Bring me the two most precious things in the city—said the God to one of His Angels; and the Angel brought Him the leader heart and the dead bird.

You have rightly chosen—said God,—far in my garden of Paradise this little bird shall sing far evermore, and in my city of Gold the Happy Prince shall praise me.

"ডাক্তার,তোমার হৃদয়টা ওই প্রিন্সের হৃদয়।"

"মাস্টারমশাই, আপনার সব মুখস্থ।"

"ভাল যা কিছু, সব আমি স্মৃতিতে ধরে রাখি। শোনো ডাক্তার, আমি আশ্রয়ের জন্যে আসিনি। আমি এসেছি তোমাকে কিছু দিতে, যদি অনুগ্রহ করে নাও।"

"কী জিনিস মাস্টারমশাই !"

"ঠাকুরদালানের বিরাট মেঝেটা ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের। দু'রকমের, সাদা আর কালো। তাঁদের পয়সা ছিল। তুমি ওই পাথরগুলো সব নিয়ে এসো তোমার লোক দিয়ে।"

"কত দাম হবে মাস্টারমশাই ?"

"এক পয়সাও না।"

বিস্ময়ে বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল। এইবার তাঁর চোখে জল।

"কাল থেকেই শুরু করিয়ে দাও।"

মাস্টারমশাই ধীরে-ধীরে, পা টেনে-টেনে চলে গেলেন।

বড়মামা অভিভূতের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য ! এইটাকে যখনই আমি বের করি, তখনই ভয়ঙ্কর

রকমের ভাল একটা কিছু ঘটে। এর কোনও ব্যাখ্যা নেই। কুসি, কাল তোকে বলেছিলুম, এই বাড়িতে মার্বেল আসছেই আসছে।"

হরিদা বললেন, "ওটা এমন একটা অঞ্চলের জিনিস, যে অঞ্চলের মাটিতে জাদু আছে।"

বড়মামা বেতের চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, "বলুন, বলুন, শুনি, আর বেশি সময় নেই। লাফিং ক্লাব হয়ে আমাকে চেম্বারে যেতে হবে।"

হরিদা শুরু করলেন, "চিন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানের অঞ্চলটিকে এখন বলা হয় হেনান। চার হাজার বছর আগে নাম ছিল, য়ু ঝাও। পশ্চিম থেকে পুবে ঢালু একটি প্রদেশ। তিন দিকে পাহাড়, পশ্চিমে ঝিয়াও আর ফুনিউ পর্বতমালা, দক্ষিণে থংবো আর দাবিয়ে পাহাড়, আর উত্তরে তাইহান। আর পুব দিক দিয়ে ভীমবেগে ছুটে চলেছে চিনের বিখ্যাত হলুদ নদী হুয়াংহে, সঙ্গে দোসর হুয়েহে। এই হেনানেই থাকতেন সেই বিখ্যাত মানুষটি, চিনের রূপকথায় যাঁর নাম, দি ফুলিশ ওল্ড ম্যান।"

হরিদা চা খেলেন এক চুমুক, তারপর শুরু করলেন, "Long long ago there lived a foolish old man. বৃদ্ধের বাড়ির সামনে আকাশছোঁয়া দুটি পাহাড়, তাইহান আর ওয়াংয়ু। আকাশ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। ও-পাশের কোনও কিছুই দেখা যায় না। বৃদ্ধ তার ছেলেদের ডেকে বললে, আয়, আমাকে একটু সাহায্য কর। পাহাড় দুটোকে এখান থেকে সরাব। শুরু হয়ে গেল খোঁড়া। গর্ত করে পাহাড় দুটোকে তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে বোকা বুড়ো। দিনরাত তারা খুঁড়ছে আর খুঁড়ছে। মানুষ বলছে, দ্যাখো, বোকাটার কী বুদ্ধি! কিন্তু, স্বয়ং ভগবান যখন জানতে পারলেন, তখন একেবারে অভিভূত! মানুষটার কী জেদ, কী কঠিন তার সঙ্কল্প! ভগবান তাঁর দুই দেবদূতকে ডেকে বললেন, 'যাও, পাহাড় দুটোকে একেবারে উত্তরে সরিয়ে দিয়ে এসো।' রাতের অন্ধকারে দেবদূত দু'জন পাহাড় দুটো পিঠে নিয়ে উড়ে গেলেন উত্তরে। এই কাহিনী ছড়িয়ে গেল ঘরে-ঘরে। পরে, আধুনিককালে এর ব্যাখ্যা হল, ইচ্ছে থাকলে, উদ্যোগী হলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। এই হুয়াংহে নদীতে আধুনিক চিন বাঁধ তৈরি করে। খরস্রোতা এই ত্রিধারার জলকে সেচের কাজে লাগিয়ে কী ফসলই না ফলাচ্ছে। এই হেনানের মাঝখানে আছে বিখ্যাত, পবিত্র পঞ্চ পাহাড়ের একটি—মাউন্ট সং। এই পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে আছে হাজার বছরের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ সংগিয়াং। আর একেবারে পাদদেশে আছে সেই বিখ্যাত মন্দির, শাওলিন, যেখানে ক্যারাটে আর কুংফুর চর্চা হয়। শাং ডাইনাস্টিতে এইখানে স্থাপিত হয়েছিল দাস রাজ্য। হেনানের উত্তরে ছিল তার রাজধানী-জিন-পুরাতত্ত্ববিদরা ঝিয়াউটানে এক্সকাভেশন চালিয়ে সেই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। দশ হাজারের মতো অপূর্ব-অপূর্ব সব শিল্পনিদর্শন উদ্ধার করা গেছে। বেরিয়েছে হাড়ের কাজ, কচ্ছপের খোল কেটে তৈরি শিল্পকর্ম। বেরিয়েছে প্রাচীনতম অক্ষরে কচ্ছপের খোলের ওপর লেখা পুঁথি। সেকালের মানুষের জ্যোতির্বিদ্যা, ক্যালেন্ডার, আবহাওয়াতত্ত্ব এবং শিল্পচর্চার লিখিত ইতিহাস। ব্রোঞ্জের পাত্র বেরিয়েছে নানারকম আর পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জের তৈরি আটশো পঁচাত্তর কিলোগ্রাম ওজনের চার চৌকো, চারপায়াঅলা একটি ধূপদান বা ধুনুচি। অসাধারণ তার কারুকার্য। চারপাশে ড্রাগন। তোমার ওই হাড়ের বেল্টটা প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন। শাং ডাইনাস্টির জিনিস। কচ্ছপের খোলা কেটে তৈরি। হয়তো কোনও রাজকুমারীর কোমরবন্ধনী। তোমার কাছে ওটা আছে কেউ যেন কোনওভাবেই জনতে না পারে। লন্ডনে সুদবির অকশনে নিয়ে গেলে কোটি টাকা দাম উঠবে। যারা ট্রেজার হান্টার তারা জানতে পারলে তোমাকে খুন করবে। ওই বেল্টে ম্যাজিক্যাল পাওয়ার, অকাল্ট, স্পিরিচুয়াল পাওয়ার, সবই থাকতে পারে। ওই জগতের কূলকিনারা নাই।"

বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল ভয়ে। বললেন, "এইটা পাওয়ার পর থেকে আমাদের ভাগ্য ফিরেছে। এটাকে এখন কাছছাড়া করি কী করে!"

বড়মামা অসহায়ের মতো আমাদের মুখের দিকে তাকালেন।

॥ ৪ ॥

মোহনদার দোকানের সামনে সাইকেল থেকে নামলাম। নামলাম বললে ভুল হবে। কারণ, সাইকেল থেকে আমি বেশ কায়দা করে নামতে পারি না। আমার সপাটে পতন হল। মোহনদার দোকানের নাম, প্রমথ বিল্ডার্স। মোহনদা কাচের গেলাসে চা খাচ্ছিলেন। সাইকেল থেকে আমার নামার রকম দেখে জটায়ুর মতো হেসে উঠলেন। কয়েক মাস হল শিখেছি। ওঠা আর নামাটায় এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। হরিদা বলেছেন, ও হতে-হতে হয়ে যাবে। কয়েকবার মোক্ষম ধরনের পতন না হলে সাইকেলকে ঠিক চেনা যায় না।

মোহনদার হাসি দেখে ভীষণ রাগ হল। রাগ-রাগ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "আলমদা কোথায়?" রেগে গেছি বুঝতে পেরেছেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "ডাক্তারবাবুর সাইকেল?"

"হ্যাঁ!"

"তোমার বড়মামা যত বিদঘুটে জিনিস কেনেন। একটা কোম্পানি প্রথম এই মডেল বের করেছিল। বিরাট উঁচু। ছ' ফুট না হলে পা পাবে না। তোমার ছ' ফুট হতে আর কতটা বাকি?"

"দু' ফুট।"

"ও হয়ে যাবে। এই তো তোমার বাড়ের বয়েস, চড়চড়িয়ে বেড়ে যাবে। ওই তোমার আলম আসছে। শুনলাম তোমার বড়মামা পাহাড় কিনেছেন! এইবার একটা সমুদ্র কিনতে বলো।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এত রেগে যাও কেন, তোমার মামারা কত বড়লোক ছিলেন, সে আমার ঠাকুরদার কাছে শুনেছি। তোমার দাদুর বিশাল বড় কাঠের ব্যবসা ছিল বার্মায়। নিজেদের একটা জাহাজও ছিল। যা-তা ভেবো না ভাগনে! এই গোটা গ্রামটাই তোমাদের ছিল। এত রেগে যাও কেন! তোমার সঙ্গে একটু মজা করব না তো কার সঙ্গে করব?"

আলমদাকে বললাম, "সাইকেলে উঠুন, বড়মামার তলব।"

"কে উঠবে?"

"আপনি।"

"কোথায় উঠব?"

"সিটে।"

"তাই বলো। বড়মামা কোথায়?"

"এই মুহূর্তে লাফিং ক্লাবে। সেইখানেই যেতে বলেছেন। ত্রাণনাথের মাঠে।"

"পাগলের আখড়ায়!" সাইকেল চালাতে-চালাতে আলমদা বললেন। আমি বসে আছি সামনের রডে। মাঠে ওরা খেটেখুটে খুব সুন্দর সবুজ ঘাস করেছে। ময়দানে যেমন ক্লাবটেন্ট আছে, সেইরকম একটা সুন্দর টেন্ট। একটা ফোল্ডিং টেবিল, একটা ফোল্ডিং চেয়ার। চেয়ারে বড়মামা। সাদা ট্রাউজার, সাদা স্পোর্টস শার্ট। আমরা যখন গেলাম, তখন বড়মামা একজনকে প্রশ্ন করছেন, আমরা শুনেছি, "আপনি কতদিন হাসছেন?"

"সাতদিন। আজ নিয়ে আট।"

"কোনও উন্নতি?"

"কী উন্নতি, তা তো বলেননি।"

"হুঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা, পাখির মতো হালকা লাগছে?"

"পাখি কীরকম হালকা তা তো জানি না সার।"

"সার নয়, দাদা, এটা সরকারি অফিস?"

"আজ্ঞে না।"

"আজ্ঞে বাদ।"
"ইয়েস সার!"
"আবার সার!"
"সার বাদ সার।"
"কোথায় কাজ করেন বলুন তো?"
"রাইটার্সে সার।"
"তুলোর মতো হালকা মনে হয় নিজেকে?"
"না।"
"শোলার মতো?"
"না সার।"
"থার্মোকলের মতো?"
"নো সার।"
"মাটির খালি কলসির মতো?"
"না সার।"
"তা হলে কতটা হালকা মনে হয়?"
"সিমেন্টের বস্তার মতো।"
"তা হলে উন্নতিটা কী হল?"
"হল না সার!"
"আচ্ছা, অন্য বিভাগে যাই। হজম কেমন হচ্ছে?"
"হচ্ছে না, খেতেই ইচ্ছে করে না।"
"মোটা হচ্ছেন কী করে?"
"পিতামাতার কৃপায়। একজন ছিলেন পর্বত, আর একজন পর্বতী।"
"ক' গেলাস জল খান?"
"ঢুক-ঢুক খাই, ক' গেলাস হয় বলতে পারব না।"
"ঘুম?"
"ভীষণ। পড়লুম কি মরলুম।"
"রাগ?"
"ভীষণ! মনে হয় সব ব্যাটাকে পেটাই।"
"গুনগুন করে সবসময় গান গাইতে ইচ্ছে করে?"
"না, গালাগাল দিতে ইচ্ছে করে।"
"কাকে?"
"আমার বাড়িঅলাকে।"
"পৃথিবীকে সুন্দর মনে হচ্ছে?"
"নরক।"
"বাঁচার ইচ্ছে বাড়ছে?"
"বাতের যন্ত্রণায় মরে গেলাম।"
"আপনাকে কোন ধরনের হাসি দেওয়া হয়েছে, হিহি, হাহা, হোহো, কোনটা?"
"হিহি তো মেয়েদের সার। আমার পাঁচ রাউন্ড হাহা, তিন রাউন্ড হোহো।"
"আমি লিখে দিচ্ছি, ওর সঙ্গে পাঁচ রাউন্ড খ্যাখ্যা যোগ হবে।"
"একটু দেখিয়ে দেবেন না সার!"
"পঞ্চানন।"
বড়মামা আমাদের ইশারায় দাঁড়াতে বলেছিলেন। এতক্ষণের কাণ্ড দেখে আলমদা অনবরত হাসছিল। বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, "হাসছ কেন?"
আলমদা বললেন, "হাসির ক্লাবে হাসব না!"
"ঠিকই তো।"
বড়মামা মাঠে নামলেন। আমরা পেছনে। একজনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, বড়মামা প্রশ্ন করলেন, "হাসছ না কেন? হাসছ না কেন?"
তিনি বললেন, "হাসা উচিত নয়।"
বড়মামা বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে, প্রায় ধমকে উঠলেন, "হাসা উচিত নয় কেন?"
"কাল আমার শ্বশুরমশাই মারা গেছেন।"
বড়মামা হনহন করে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "আর পাঁচ মিনিট, কাতুকুতু সেকশনটা দেখলেই কাজ শেষ।"
ওইটুকু সময়ের মধ্যে আমাদের অনেক বিভাগ দেখা হল, কাতুকুতু, গড়াগড়ি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসি, দেঁতো হাসি, হাসি কাশি। হাসি কাশি হল, যাঁরা হাসতে-হাসতে কাশিতে চলে যান, তারপর জল, পাখা, বুকে মালিশ।
বড়মামা মাঠের একপাশে এসে আলমসাহেবকে বললেন, "তোমার ফুলটিম নিয়ে আজই চলে যাও মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে। ঠাকুর দালানের সমস্ত পাথর সাবধানে একটাও না ভেঙে তুলে ফেলো। আমাকে দান করেছেন।"
"ও তো খুব দামী পাথর!"
"জানি। রাজভবনে আছে।"
ওপাশে পরিচালক তখনই হাঁকলেন, "স্টার্ট, হাহা, ওয়ান, টু, থ্রি!"
সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল, "হাহা, হাঃ হা, হাহা।"
আমরা পালিয়ে বাঁচলাম। ওদিকে নারীবিভাগে হিহি। ডানপাশে একটা ব্যানারে লেখা রয়েছে স্লোগান, লাফ ফর লাইফ, লাফ ফর হেল্থ, লাফ ফর ওয়েল্থ, লাফ্টার দি বেস্ট মেডিসিন।"

॥ ৫ ॥

বড়মামাও এলেন মাস্টারমশাইয়ের ঠাকুরদালানে। চারপাশে অনেক গাছ, তার মাঝখানে তিনপাশ খোলা বিশাল সেই নাটমন্দির। যে দেওয়ালকে পেছনে রেখে মায়ের মূর্তি বসত, সেই দেওয়ালের অপূর্ব কারুকার্য এখনও কিছু-কিছু আছে। সবচেয়ে সুন্দর মেঝেটা। কিছুই যত্ন হয় না, তাও কী শোভা! সাদা, কালো ইতালিয়ান মার্বেলের চোখধাঁধানো কাজ।
বড়মামা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ ফরমান দিলেন, "আলম, এ জিনিস তোলা হবে না।"
"তা হলে?"
"তা হলে এইখানেই থাকবে। এই নাটমন্দির আমি সংস্কার করাব। ছাত আর কিছু-কিছু পিলার ড্যামেজ হয়েছে! এখানে আমি মহাপ্রভুর মূর্তি স্থাপন করব। এখানে হবে একালের শ্রেষ্ঠ পাঠবাড়ি। পাঠ হবে, সঙ্কীর্তন হবে। কী না হবে?"
"মাস্টারমশাইয়ের জিনিস, আপনি করার কে?"
"আমি কিনে নেব। এর ওপর কোনও কথা আছে!"
"না, নেই।"
"তুমি মেরামতির কাজে লেগে যাও। রথের দিন উদ্বোধন।"
"মূর্তি কোথায় পাবেন এত তাড়াতাড়ি!"
"সেটা আমার ব্যাপার, আমি বুঝব।"
"আমরা এখন তা হলে কী করব!"
"তুমি এইখানে বোসো। আমি পাকা কথাটা কয়ে আসি।"
মাস্টারমশাই নীচের বৈঠকখানায় বসে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মোটা একটা বই পড়ছিলেন। এমনই তন্ময় যে, আমাদের প্রবেশ বুঝতে পারেননি।
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বড়মামা বললেন, "আমি এসেছি।"
চোখ তুলে তাকালেন, "তোমরা! আরে এসো এসো, বোসো। কী সংবাদ!"
বড়মামা উত্তেজনায় বসতে পারলেন না। মাস্টারমশাইয়ের হাত দুটো ধরে বললেন, "ওই অংশটা আপনি আমাকে বিক্রি করুন, আমি ওই মন্দির সংস্কার করে, মহাপ্রভুর মূর্তি বসিয়ে, পাঠবাড়ি করব। আপনার, আমার পূর্বপুরুষ খুশি হবেন। ওইখানে দাঁড়িয়ে আমি এই নির্দেশ পেলাম। আপনার বসবাসের জন্যে আমি একটা ছবির মতো ব্যবস্থা করব। আপনি আপনার

লাইব্রেরি আর নিত্যপূজা ও পাঠ নিয়ে থাকবেন। ইচ্ছে করলে এই অংশটা বিক্রি করে টাকাটা ফিক্সড করে দিন।"

চশমার মোটা কাচের আড়ালে বড়-বড় চোখ। মাস্টারমশাই অস্বাভাবিক দৃঢ় গলায় বললেন, "আমি বিক্রি করব না।" একটু থেমে রইলেন, বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেছে। মাস্টারমশাই আরও জোর গলায় বললেন, "আমি সবটাই তোমাকে দিয়ে দেব। তুমি এখানে এমন একটা কিছু করো, যাতে অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবীর স্মৃতি রক্ষা হয়। তিনি ছিলেন গৃহী সাধক, সর্বত্যাগী দেশসেবক।"

বড়মামা একটু ভাবনা-চিন্তা করে বললেন, "বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার, অনেকের তো আপত্তি থাকতে পারে!"

"কার আপত্তি! এসব আমার নামে। আমি তোমাকে উইল করে দিয়ে যাব।"

"পাড়ার লোকে পাঁচ কথা বলবে। বলবে, আমি আপনাকে তোয়াজ করে সব লিখিয়ে নিয়েছি।"

"রাখো তোমার পাড়ার লোক! শোনো ডাক্তার, আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। যে কোনওদিন চলে যেতে পারি। মানুষকে বেশি পাত্তা দিয়ো না। নিজের কাজ করে যাও।"

"আমরা তা হলে আসি।"

"এসো, তুমি আমাকে বড় নিশ্চিন্ত করে গেলে বাবা।"

আলমদা বাইরে বসে ছিলেন। বড়মামা বললেন, "কাল থেকে কাজে লেগে যাও।"

সাইকেলে চেপে আমরা ফিরে এলুম। চেম্বারে রোগীদের লাইন পড়ে গেছে। বড়মামা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "একটা দিনের তরেও কি শান্তি নেই! আমার যে এখন নুন-লেবু মাখিয়ে ভুট্টা খেতে ইচ্ছে করছে। আমার যে এখন মাছ ধরতে ইচ্ছে করছে।"

বড়মামা গজগজ করতে-করতে চেম্বারে ঢুকলেন। ঢুকেই একজনকে ভীষণ ধমক দিলেন, "আপনার অসুখ মশাই কোনওদিন সারবে না। এখানে আপনি ইয়ার্কি মারতে আসেন। কাল গুপির দোকানে আলুর চপ খাচ্ছিলেন। এদিকে আলসারের রোগী!"

এত ধাতানি খেয়েও ভদ্রলোক হাসছেন, "জানি, এই ভুলটা আপনিও করবেন। ওটা আমি নই, আমার যমজ ভাই। আমাদের দু'জনকে অবিকল একরকম দেখতে। কে বিশ্বনাথ, কে জগন্নাথ, বুঝতে পারবেন না। ছেলেবেলায় একজনকে দু'বার খাওয়ালেন, আর একজনের উপোস। খাওয়ানো হয়ে গেলেই কপালে কাজলের টিপ। যেন ভোট দেওয়া হল। এই বুদ্ধিটা বেরোতে আমরা দু'জন খেয়ে বাঁচলুম। আর স্কুলে ঢোকার পর আমাকে ন্যাড়া করে দিলেন। একজনের চুল, একজন ন্যাড়া। ন্যাড়া জগন্নাথ। চুলো বিশ্বনাথ। চমৎকার ব্যবস্থা।"

বড়মামা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "আমার কাছে কে আসে?"

"আমরা দু'জনেই আসি। এ চুলোয় আর কে আছে যে, ডেথ-সার্টিফিকেট দিতে পারে!"

বড়মামা অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আমি ফিট-সার্টিফিকেটও দিই। আপনি কে?"

"নাম বললে গুলিয়ে যাবে, আমি আলসার, আমার ভাই আলুর চপ। তবে প্রবলেমটা কী হয় জানেন, আলুর চপ অনেক সময় ভুল করে আলসারের মুখে ঢুকে যায়, চিনতে পারে না তো! মাঝে-মাঝে আমারই সন্দেহ হয়, কে প্রকৃত বিশ্বনাথ, কে প্রকৃত জগন্নাথ। আমার মা গুলিয়ে ফেলেননি তো!"

"মাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়!"

"করেছিলুম। মা বলেছিলেন, দুটো নামই রইল, যখন যার যেটা ইচ্ছে, সেইটা ব্যবস্থা করিস। নাম হল জামা। লোক কখনও নীল জামা পরে, কখনও লাল।"

"আরে দুর, ও উপমাটা আসছে না এখানে। নামের ওপর লোকে জামা চড়ায়। লাল বিশ্বনাথও বিশ্বনাথ, নীল বিশ্বনাথও বিশ্বনাথ।"

ওপাশ থেকে এক প্রবীণ মানুষ বললেন, "একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে, এখানে তো অসুখের হরিহর ছত্রের মেলা!

ওই ইয়ারটিকে ছাড়ুন এইবার।"

"আপনার প্রবলেম !" স্টেথো নিয়ে বড়মামা এগোলেন সেইদিকে।

ভদ্রলোক বললেন, "সেই যে আমি বিষ খেয়েছিলুম !"

বড়মামা থমকে গেলেন, "সে তো পুলিশ কেস।"

"না, পুলিশ কেস নয়, হাউসহোল্ড পয়জন। গৃহপালিত বিষ।"

"কী খেয়েছিলেন আমার আজকাল আর কিছুই মনে থাকে না।"

"রোগীদের আপনারা কি আর মানুষ ভাবেন! সব গোরু-ছাগল। আমি কাফ মিকশ্চার খেতে গিয়ে দু' ঢোক টিংচার আইডিন খেয়ে ফেলেছি। ভুল করে।"

পাশে বসে ছিল বাচ্চা নাতনি। সে অমনই চিৎকার করে উঠল, "না ডাক্তারবাবু, না, দিদার সঙ্গে ঝগড়া করে দাদাইয়া আইডিন খেয়েছিল, তারপর বাবা এসে নুন-জল খাইয়ে বমি করিয়ে দিল, অনেক রাত্তিরে, আমি জেগে-জেগে সব দেখেছি।"

"অ্যায় চোপ, একদম চোপ, বড়দের কথায় একদম কথা বলবি না।" বৃদ্ধ খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠলেন। নাতনিও কিছু কম যায় না। সে ঘাড় বেঁকিয়ে, মুখ ভেঙিয়ে বলল, "না, বলবে না আবার, তুমি আমার দিদাকে কেবল কষ্ট দাও, সেলফিশ জায়েন্ট।"

বৃদ্ধের ফরসা মুখ লাল হয়ে গেল। বড়মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। বুড়ির আদরে বাঁদর হয়ে গেছে। দিদার গুপ্তচর। একালের মাতাহারি। ওর কোর্টমার্শাল হওয়া উচিত।"

নাতনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "দিদা আমার, আমি যা খুশি তাই করব, তোর তাতে কী ! এই যে সকালে তোর বাবা গরম জিলিপি এনেছিল, আমাদের একখানাও দিয়েছিলিস !"

"দিদা তিনটে খেয়েছে। তোমাকে বলেনি। তোমার তো শুগার, জিলিপি খাবে ! জিলিপি !"

বড়মামা তাড়াতাড়ি বললেন, "আপনার কমপ্লেনটা কী ?"

"নো খিদে, নো স্লিপ, চোখে সরষে ফুল।"

"আয়োডিনের এফেক্ট। শুগার কত ?"

"লাস্ট তিনশো আশি।"

"বলেন কী, শুগার ফ্যাক্টরি। খুব হাঁটুন। ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি।"

"মেয়েরা খেতে পারে ?"

"ঘুমের ছেলে-মেয়ে নেই।"

"অলরাইট।"

"তার মানে !"

"মানে, আমার ওয়াইফকে খাওয়াব। বুড়ি যদি একটু ঘুমোয়, তা হলে এই বুড়োটাও সুখে নিদ্রা যেতে পারে। কমপ্লেন অ্যান্ড কমপ্লেন অ্যান্ড কমপ্লেন। প্লেন আর ল্যান্ড করে না, সারা রাত চক্কর।"

কম্পাউন্ডার মানিকদা এসে বললেন, "করছেন কী, সাতটা কল আছে। দুটো এখন-তখন।"

বড়মামা তৎপর হলেন, ঝপাঝপ প্রেসক্রিপশন, ধপাধপ ইঞ্জেকশন। চেম্বার খালি। কেবল একজন মহিলা চুপ করে বসে আছেন উদাস মুখে। কাঁচাপাকা চুল। একেবারে যেন মায়ের মূর্তি। বড়মামা ড্রয়ার খুললেন, এক খামচা নোট নিয়ে সসম্ভ্রমে গিয়ে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলার কাছে, যেন অঞ্জলি দিচ্ছেন। কারও মুখে কোনও কথা নেই। ভদ্রমহিলা লজ্জায় অধোবদন, বড়মামা চোখ বুজে আছেন। নোট হস্তান্তরিত। ভদ্রমহিলা কাঁদছেন।

আমি জানি, কেসটা কী ! এক বিখ্যাত ডাক্তারের স্ত্রী। দুটো ছেলেই অমানুষ, চোর, চিটিংবাজ। ডাক্তারবাবুর অকালমৃত্যুর কারণ তারাই। বাড়ি, গাড়ি, চেম্বার সব বিক্রি হয়ে গেছে। একটি ছেলে বোধ হয় জেল খাটছে।

বড়মামা পুব দিকের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, ভদ্রমহিলা চলে যাচ্ছেন। ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছেন। গোটা ব্যাপারটাই ঘটে গেল নিঃশব্দে। ভীষণ শব্দে উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন। বুম করে একটা শব্দ হল। টায়ার ফাটল রাস্তায়।

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "পথ পেয়ে গেছি মাস্টার হাবু।"

যখন যা খুশি নামে ডাকা বড়মামার অনেক মজার একটা মজা। কয়েকদিন আগে মাসিমাকে ডাকছিলেন 'ম্যাডাম ফিশফ্রাই'। মেজোমামাকে কয়েকদিন ডেকেছিলেন, 'শ্রীমান ভরদ্বাজ'। আমাদেরও বেশ মজা লাগে। কম্পাউন্ডার দাদা তাড়া দিলেন, "সাতটা কল, দুটো এখন-তখন।"

বড়মামা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "যাক, মরে যাক সব, বেঁচে থেকে কী হবে ! মানুষের হাতে মরার চেয়ে রোগে মরা ভাল।"

চেয়ারে ধপাস করে বসে বললেন, "পাকা পেয়ারা খেতে ইচ্ছে করছে।"

বড়মামার ডাক্তারি ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললুম, "চলুন, চলুন, কল শেষ করে আমাদের পেয়ারাবাগানে যেতে হবে ক্রোটন গাছ কিনতে।"

"রা-রাইট ইউ আর। লেট্‌স গো।"

গাড়িতে বসে বললেন, "দ্যাখ তো, এখন-তখনে প্রথম কে আছেন !"

কলবুক খুললুম, "হরিসাধন দত্ত।"

"থ্রোট ক্যানসার, লস্ট কেস।"

বিছানায় আধশোয়া, জ্বলে-পুড়ে যাওয়া কঙ্কালসার এক মানুষ। জোরে-জোরে শ্বাস ফেলছেন হাপরের মতো, ফ্যালফ্যালে দুটো চোখ। পাশে বসে আছেন স্ত্রী। শীর্ণ চেহারা, উদ্বিগ্ন মুখ। দেখলেই মনে হয় বড় ঘরের মেয়ে। ঘরের বাইরে লাল মেঝেতে, পা গুটিয়ে হতাশ হয়ে বসে আছেন বড় ছেলে, মানবদা। কলেজের অধ্যাপক। আমার সঙ্গে আলাপ আছে। বড়মামা রোগীর ঘরে ঢুকে গেলেন, আমি মানবদার পাশে মেঝেতে বসে পড়লাম।

মানবদা আমার ডান হাতটা আলতোভাবে ছুঁয়ে বললেন, "আজকের দিনটা কাটে কি না সন্দেহ। এ কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। মাঝে-মাঝে মনে হয়, কিছুই যখন করার নেই, চলে যাওয়াই ভাল।"

সারা বাড়ি থম মেরে আছে। যেন বর্ষার আকাশের তলায় মৃত্যুর কালো ছাতা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়মামা বেরিয়ে এলেন, থমথমে মুখ। বুকপকেট থেকে টাকা বের করে মানবদা ভিজিট দিতে গেলেন। বড়মামা ফিসফিস করে বললেন, "আমাকে জানোয়ার ভেবো না। শোনো, এক পারসেন্টও আশা নেই। প্রস্তুত থাকো। একটা স্টেরয়েড দিয়ে গেলুম। যতক্ষণ চলে। হার্ট স্ট্রং, তাই ফাইট করতে পারছেন। তুমি মাকে এইবার একটু রিলিফ দাও।"

"পাশ থেকে কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না। অনেকবার চেষ্টা করেছি।"

গাড়িতে এসে বড়মামা বললেন, "চারপাশে গিজগিজ করছে মৃত্যু, তার মধ্যে আমরা কোলা ব্যাঙের মতো খপাং-খপাং লাফাচ্ছি। লোকসভা, বিধানসভা করছি। আকাশ ভেঙে সব চাপা পড়ে গেলে বাঁচা যায়। তোর স্কুল কবে খুলছে ?"

"এখনও পনেরো দিন।"

"বাঁচা গেছে। তুই সব দেখে রাখ, পরে গল্প, উপন্যাসে মানুষের কথা লিখবি। দু' নম্বরটা দ্যাখ।"

"বিনোদ দত্ত।"
"মরেছে।"
"না, মরেনি, মরলে কেউ কল দেয় !"
"ধুর, ও মরবে কেন ! মরেছি আমি। কিছু রুগি থাকে যারা ডাক্তারকে মারে। পকেটে-পকেটে রোগ। দুটো কথা মনে রাখ, পরে জট ছাড়াবি। মানুষের রোগ, আর রোগের মানুষ। ইংরেজি করতে পারিস, আর ও জি ইউ ই। রোগ।"

বিনোদবাবুর বিশাল বাড়ি। চতুর্দিকে তার ধ্যাবড়া-ধ্যাবড়া কাজ। উৎকট রং। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে শুনছি, রেকর্ড প্লেয়ারে ধাঁইধাপ্পড় গান হচ্ছে। বিচ্ছু টাইপের গোটাকতক বাচ্চা উঠোনে রবারের বল পেটাচ্ছে। একটা বউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় কাজের মেয়েটাকে গালাগাল দিচ্ছে। আর একটা বউ খ্যাড়খেড়ে গলায় উপদেশ দিচ্ছে, "ও বলে কিছু হবে না, বেশ করে পিটিয়ে দাও।" মোটা থলথলে, আদুর গা, লুঙ্গি-পরা একজন লোক বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলছে, "হ্যাঁ, আমার জেলে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। খেদ্‌দাও, খেদ্‌দাও, উকিলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট আছে। আঃ, কুমার শানু যা গায় না, নাচতে ইচ্ছে করে। বাংলার গৌরব, শানু আর সৌরভ। আর একটা সেঞ্চুরি হাঁকড়ে দিলে।"
নীচের উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যায় গুটকে, ফুটবল রাখ, ব্যাট পেটা। মেরাদোনা নয়, সৌরভ।"

সেই শব্দব্রহ্ম ভেদ করে, বারান্দার প্যাঁচ খুলে আমরা দ্বিতীয় মহলে এলাম। বিছানায় ছত্রিশটা বালিশ ফিট করে শয্যাশায়ী, পাকা টুসটুসে এক বৃদ্ধ।
"ডাক্তার, আজ আবার একটা করে বিট মিস করছে।"
"ভয় নাই, আজ শেষ ওষুধ অব্যর্থ নিয়ে এসেছি।"
"কী, কী, বিলিতি ?"
"জাপানি।"
"আরে, ওরা তো বামন অবতার ! কী ওষুধ !"
"সাইজটা একটু বড়, গিলতে পারবেন ?"
"চেষ্টা করে গিলতেই হবে। বাঁচতে যখন হবে ! কত বড় ?"
"একটা কোয়ার্জ রিস্টওয়াচ। জেন্টস নয়, লেডিজ।"
"আমি মরে যাচ্ছি ডাক্তার, আর তুমি আমার সঙ্গে কৌতুক করছ !"
বড়মামা হঠাৎ ডিক্টেটরের গলায় বললেন, "গেট আপ, উঠে বসুন।"
ভদ্রলোক ভয়ে-ভয়ে উঠে বসলেন।
"বিছানা থেকে নেমে আসুন। গেট ডাউন।"
ইংরেজি কমান্ডে বেশ কাজ হচ্ছে। ভদ্রলোক কাঁপতে-কাঁপতে মেঝেতে দাঁড়ালেন।
বড়মামা বললেন, "কানে কিছু আসছে, গান-বাজনার শব্দ !"
"ও তো অষ্টপ্রহরই আসছে। তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না শান্তিতে।"
"দু' মাত্রার তাল, লেফ্‌ট-রাইট। নিন আসুন, আমার সঙ্গে নাচুন। ধেই, ধেই, ধেই, ধেই। এই বিটে নাচুন। হার্টবিট আর মিস করবে না।"
পাকা ঠান্দির মতো চেহারার এক ভদ্রমহিলা পান-জর্দা চিবোতে-চিবোতে ঘরে ঢুকে বললেন, "বুড়ো, এইবার জব্দ হয়েছে। সারাটা জীবন বাতিকের অসুখে আমাকে জেরবার করে দিলে।"
বৃদ্ধ নাচতে-নাচতে বললেন, "বেশ লাগছে নাচতে !"
বড়মামা মহিলাকে বললেন, "এবার আর আমাকে ডাকবেন না, নাচের মাস্টারমশাইকে কল দেবেন। অনেক কম খরচে আরোগ্য।"
মহিলা বললেন, "কাউকে ডাকতে হবে না, আমিই নাচিয়ে দেব।"
"এর পর আমাকে ডাকলে, ঘুমের ওষুধ দিয়ে ওপরের বাঙ্কে তুলে দেব। ঘুমোতে-ঘুমোতে ডেস্টিনেশনে। হরিবোল ইস্টিশন।"
বড়মামা ভিজিটের টাকা গুনে-গুনে পকেটে পুরলেন।
ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে বললেন, "ডাক্তার, আমাকে ত্যাগ কোরো না, তা হলে আমায় প্রাণত্যাগ করতে হবে।"
বড়মামা গাড়িতে বসে উত্তরটা দিলেন, "তোমার মতো দুধেল গোরুকে কেউ ত্যাগ করে ? তোমার তো অসুখ নয়, ব্যায়রাম। ব্যায়রামের ব্যুৎপত্তি জানিস—ব্যয় করিলেই আরাম।"
পেয়ারাবাগানে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় দুটো। রোদের দুপুর চড়চড় করছে। গাছের পাতা ঝিম মেরে আছে। জায়গাটা এতই সুন্দর যে লোকে বলে, দ্বিতীয় বারাণসী। কোনও গাছে ঝাপড়া হয়ে আছে হলদে ফুল, কোনও গাছে সাদা। তামাটে-নীল আকাশ, হলুদ, সাদা ফুলের বাহার, নিঝুম সবুজ পাতা, ঘন ছায়া, এত বড়-বড় ফিঙে পাখি, শালিকের ঝাঁক।
মেটে রাস্তা দিয়ে টিকোতে-টিকোতে চলেছে বড়মামার হিন্দুস্তান ফোর্টিন। যার সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। সেটা যেন মুঘল আমলের দুর্গ। ছোট-ছোট লাল ইটে গাঁথা সুউচ্চ পাঁচিল। কয়েদি টপকাতে পারবে না। জায়গায়-জায়গায় সবুজ শৈবাল ছোট-ছোট পরগাছা। বিশাল একটা দরজা। হাতি গলে যাবে। বড়মামা হর্ন দিলেন। ঘড়ঘড় করে খুলে গেল দুর্গের দরজা। যেন স্বপ্ন খুলে গেল। লাল টুকটুকে চওড়া একটা পথ ভেতরে হারিয়ে গেছে। শুধু গাছ আর গাছ। রঙের বিস্ফোরণ। মশমশ শব্দে গাড়ি দরজা অতিক্রম করে কিছুটা গিয়ে ঘস করে থামল।
অদ্ভুত এক শীতলতা, অদ্ভুত শান্তি। জীবনে প্রথম বাবুই পাখির বাসা দেখলাম। গাছের ডালে সার-সার ঝুলছে। প্রত্যেকটায় একটা করে গোল দরজা। একটা করে পাখির ঠোঁট উঁকি মারছে। এক জোড়া কুবো পাখি বিশাল লেজের ভারে টলবল করে উড়ছে। যে ডালে বসছে সেই ডালই ঝুঁকে পড়ছে দেহভারে। ছোট-ছোট পেয়ারাগাছ আষ্টেপৃষ্ঠে ফল ধরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দেখলাম আফ্রিকার কালো পেঁপেগাছ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব কালো। ক্রোটন অন্তত পঁচিশ-তিরিশ রকমের। ফার্ন বহুরকমের। রাশি-রাশি হাইব্রিড গোলাপ। অবাক-করা ডোরাকাটা গোলাপ। প্রায় এক-একটা বারকোশের মতো সূর্যমুখী। রং হল সানসেট ইয়েলো ! গোল্ডেন কাঞ্চন। জিনিয়ার কী বাহার ! পিটুনিয়া এখনও ফুটছে। হেঁটে-হেঁটে আর শেষ করা যাচ্ছে না। পান্থপাদপ পাতার পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইছে। আয়নার মতো এখানে-ওখানে পড়ে আছে ছোট-ছোট জলাশয়। পাড় বাঁধানো বিশাল এক পদ্মপুকুর। বাতাসে পাতার কানগুলো মুচড়ে দিয়ে যাচ্ছে। বড়-বড় পদ্মফুল গোটা-গোটা ভ্রমরের অহঙ্কারে ফেটে পড়ছে। বড়মামা একদিকে হারিয়ে গেছেন, আমি একদিকে। হেথায় আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা।
"আর পারি না" বলে, সিমেন্ট বাঁধানো একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম। পায়ের তলায় মখমল-সবুজ ঘাস। হাতের পাতার চেয়েও বড় চিত্র-বিচিত্র প্রজাপতি ভেসে-ভেসে যাচ্ছে চারপাশ দিয়ে। আমি আর এখান থেকে যাব না। তামাটে রঙের চারজন বলশালী মানুষ দূরে একটা কিছু করছেন। রোদে চকচক করছে শরীর। মাথার ওপর ফড়িংয়ের ঝাঁক।
বহু দূর থেকে বড়মামার গলা, "শিগ্‌গির আয়।"

বাগানের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা কুঠিয়ার সামনে বড়মামা। জানলায় উঁকি মারছেন। দরজায় মরচে-ধরা তালা।

আগাছা, লতা, গুল্ম দণ্ডবৎ হয়ে আছে।

বড়মামা বললেন, "দ্যাখ, দ্যাখ, উঁকি মেরে দ্যাখ।"

আলোছায়ায় একটি মূর্তি। পাথরের কোন দেবতার, বুঝলাম না। "একটা মূর্তি!"

বড়মামা খলখল করে হেসে বললেন, "মহাপ্রভু! চিনতে পারছিস না, মহাপ্রভুর মূর্তি।" "কানু, কানু!" বড়মামা ছুটছেন।

তামাটে বর্ণ মানুষদের মধ্যে একজন এগিয়ে এলেন, "কী হয়েছে ডাক্তারবাবু!"

"মহাপ্রভুর মূর্তি।"

"হ্যাঁ, অবহেলায় পড়ে আছেন বহুদিন। চোদ্দ বছর আগে এক বৈষ্ণব সাধক এখানে ছিলেন। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'বৃন্দাবন দর্শন করে আসি' বলে সেই যে গেলেন, আর এলেন না।"

"মূর্তি আমার চাই, যা লাগে।"

"আপনি নেবেন! নিয়ে যান, একটা পয়সাও লাগবে না। রাতে আমার ঘুম হয় না। স্বপ্ন দেখি। কিছু না করতে পারার ভয়ে মরি।"

বড়মামা ঘর্মাক্ত সেই মানুষটিকে জড়িয়ে ধরলেন। ফড়িং উড়ছে, প্রজাপতি খেলছে, একঝাঁক টিয়া মহাকলরবে পেয়ারাগাছে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিনটে রাজহাঁস, চতুর্থটাকে গলা মিলিয়ে ডাকছে। বড়মামা কাঁদছেন। দমকা একটা বাতাসে গাছের মাথা দুলিয়ে দিয়ে গেল। কৃষ্ণচূড়ার চূড়াপাতায় বাতাস নাচছে।

বহুকালের পুরনো চাবি। তালার প্যাঁচ আর ঘোরেই না। ফোঁদলে করে তেল ঢালা হল। একসময় ফুস করে তালা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে ঠাকুর-ঠাকুর গন্ধ। মনে হল সঙ্কীর্তন চলছিল। এইমাত্র বন্ধ হল। দেওয়ালে একটি মৃদঙ্গ ঝুলছে। বেদির ওপর একজোড়া খঞ্জনি। বিছানার একটি রোল একপাশে। পূজার আসনটি আজও পাতা। মনেই হচ্ছে না ঘরটি অব্যবহৃত। কেউ কি রোজ গভীর রাতে এসে সব পরিচ্ছন্ন করে পূজায় বসতেন! শ্বেতপাথরে দণ্ডায়মান মূর্তি যেন বড়মামাকে দেখে হাসছেন, 'এসো, এসো, এগিয়ে এসো, চোদ্দটা বছর আমি তোমার অপেক্ষায় আছি।'

বড়মামা এগোচ্ছেন। কোথায় পা পড়ছে দিশা নেই। মূর্তির সামনে তিনিও মূর্তি হয়ে গেলেন। আমাদের পণ্ডিতমশাই যেমন বলেন, কাষ্ঠপুত্তলিবৎ। চিত্রার্পিত। আমি অতশত বুঝি না; কিন্তু আমারও মনে হচ্ছিল মূর্তির একটা প্রভাব আমাদের মধ্যে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা সবাই বর্তমান ছেড়ে অতীতের দিকে চলেছি।

সন্ধে তখন প্রায় সাতটা। একটা ম্যাটাডর ভ্যানে আমরা বসে আছি। মহাপ্রভুর মূর্তি ধরে। আমাদের ঘিরে আছে ক্রোটন আর ফার্নের টব। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন মেজোমামা আর মাসিমা।

তাঁরা দু'জনে ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠার আগেই বড়মামা চিৎকার ছাড়লেন, "ওরে শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা, তিনি এসেছেন।"

দু'জনেই থ' হয়ে গেছেন। অন্ধকারে হদিস পাচ্ছেন না। পাতার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখেই মাসিমা বললেন, "এ কী গো! এ কী সুন্দর!"

গাড়ির ওপর বড়মামার নৃত্য, "মহাপ্রভু এলেন, মহাপ্রভু।"

শাঁখ বাজল। ছুটে এসেছেন হরিদা। প্রথমে নামল গাছের টব। এইবার নামছেন মহাপ্রভু, ধীরে, সাবধানে, সন্তর্পণে। শীতল, মসৃণ। চন্দনের গন্ধ। গাড়িতে যতক্ষণ ধরে বসে ছিলাম, মনে হচ্ছিল, আমার সবচেয়ে প্রিয়জনকে ধরে আছি। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটা কত সুন্দর।

দোতলার বারান্দায় এসে বসলেন মহাপ্রভু। যেন বাড়ির সর্বময় অভিভাবক! গলায় দুলছে জুঁইফুলের গোড়ের মালা। সবাই বসেছি সামনে।

হরিদা বললেন, "অনেক আশ্চর্য দেখেছি, এমন দেখিনি কখনও। মহাপ্রভুর এমন সুন্দর মূর্তি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিলেন পেয়ারাবাগানে! এমন মূর্তি সহসা দেখা যায় না!"

বড়মামা বললেন, "আমি আজ সকালে আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর অবস্থা দেখে ঠিক করেছি, অনাথ মেয়েদের জন্যে একটা আশ্রম করব। যেখানে কর্মই হবে ধর্ম। ধর্মই কর্ম নয়।"

মেজোমামা বললেন, "গুড আইডিয়া।"

মাসিমা বললেন, "এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আমাদের বাবা আর মায়ের নাম। আমাদের মা জীবনে কোনও সুখই পাননি। আমাদের বিপ্লবী বাবার জন্যে সব ত্যাগ করেছিলেন। ছেঁড়া কাপড়, দিনের পর দিন উপোস।"

॥ ৬ ॥

আবার সেই চাঁদের আলোর রাত।

রাতের ঘড়িতে সংখ্যা এক। আকাশ থেকে রুপোর তবক খসে-খসে পড়ছে। এমন প্রখর চাঁদের আলো যে, গাছের প্রতিটি পাতা গুনে নেওয়া যায়। দক্ষিণের বাতাস বইছে, বুঝি বসন্তকাল। কোকিলরা চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারছে না। আকুল আবেগে বারেবারে ডেকে উঠছে।

পুবের আকাশে নতুন এক ছবি, দুধসাদা এক মন্দিরের চূড়া। সাদা একটি পতাকা ফনফন করে উড়ছে। সেই মন্দির, যে মন্দিরের স্বপ্ন বড়মামা দেখেছিলেন। মহাপ্রভু সেখানে শ্বেতপাথরের বেদিতে। ফুলের সাজে সেজে আছেন। মাস্টারমশাইয়ের আশ্রম তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে মহিলাবাস। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী এসে গেছেন। তিনি আবার মাস্টারমশাইয়ের দেখাশোনা করছেন।

আমাদের প্রত্যেকের বয়েস দু' বছর বেড়ে গেছে। হরিদার সব গোঁফ পেকে গেছে। মাসিমা নাকি চার-পাঁচটা পাকা চুল খুঁজে পেয়েছেন নিজের মাথায়। মেজোমামার ভুঁড়ি আরও দু' ইঞ্চি বেড়েছে। আমি আরও লম্বা হয়েছি।

সকলে একসঙ্গে বললেন, "পুব দিকে তাকালে মনে হচ্ছে স্বপ্ন। পতাকাটা যেন প্রেম-ভালবাসার মতো উড়ছে। ঠিক মাথার ওপর সেই সাক্ষীতারাটা।"

বড়মামা বললেন, "তা হলে আমি বাকি গল্পটা বলি। আমাদের বেঁচে থাকার গল্প! আমাদের অপ্রকৃতিস্থ মা ওই ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন। একটা-একটা করে ইট তুলে আঁচলে রাখছেন আর বলছেন, 'এক টাকা, দশ টাকা, কুড়ি টাকা, একশো টাকা।' ছোট্ট ফ্রক পরা কুসি যতবার মা বলে কাছে যাচ্ছে, মা বলছেন, 'খুকি রাত হয়েছে বাড়ি যাও, রামছাগলে গুঁতিয়ে দেবে।' কুসি কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে আসছে আমার কাছে, 'দাদা, মা কেন আমাকে চিনতে পারছে না!' মেজোর টনসিলের ধাত, নাগাড়ে কেশে যাচ্ছে। কেউ নেই। ওই অতটুকু মেয়ে আমাকে রান্নায় সাহায্য করছে। অতীতের সেই দৃশ্য চোখ বুজলেই দেখতে পাই। বুকের কাছে কাঠকুটো ধরে এগিয়ে আসছে। দু' হাতে বালতি নিয়ে আসছে হেঁইসো-হেঁইসো করে। নিজেই নিজের চুল বাঁধছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'দাদা, তুমি বিনুনি করতে পারো!'

"এই দুর্দিনে এলেন হরিদা। দাদা বলি, কিন্তু হরিদা আমার বাবা। আজ আমি যা হয়েছি তা ওই মানুষটির জন্যে। আমাদের সংসার চালাবার জন্যে, আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে হরিদা জুটমিলে চাকরি করেছেন। হরিদা আমাদের মাকে চোখে-চোখে রেখেছেন, বাড়ি থেকে যাতে ছিটকে বেরিয়ে না যান। হরিদা আমাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্যে মাসের পর মাস কোর্ট-কাছারি

করেছেন। শেষে যা হল, সে এক অলৌকিক ব্যাপার। কে একজন জোর করে হরিদাকে একটা লটারির টিকিট গছিয়েছিল, সেই টিকিটে লেগে গেল ফার্স্ট প্রাইজ। আমার, মেজোর, কুসির লেখাপড়ার খরচ ওই টাকা থেকেই হল।

"আর মায়ের মৃত্যু! সে তো ভোলার নয়! মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। যেন দীর্ঘ একটা ঘুমের পর জেগে উঠলেন। বলতে লাগলেন, 'ওমা! তোরা কবে এত বড় হলি! এই বুঝি কুসি, তোকে কত ছোট দেখেছি।' মা আবার সংসারটাকে সাজিয়ে তুললেন। মায়ের হাতের বিখ্যাত রান্না খেয়ে আমরা মোটা হতে লাগলুম। কী আনন্দ! হঠাৎ পায়ে একটা পেরেক ফুটল। আমাদের কাউকে জানতে দিলেন না। টিটেনাসে মৃত্যু হল। আমরা ভাবছি হিস্টিরিয়া, একমাত্র হরিদাই ঠিক ধরেছিলেন ডাক্তার না হয়েও। নতুন করে শুরু করতে গিয়ে মা শেষ হয়ে গেলেন। শ্বাস আর দীর্ঘশ্বাস, এই আমাদের জীবন। বুঝলি মেজো, ডাক্তার হওয়ার ফলে জীবনটাকে আচ্ছাসে দেখা গেল।"

"তুমি তো সাধক দাদা!"

"তুই একদিন আমাকে শয়তান বলেছিলিস।"

"তুমি আমাকে একদিন পাঁঠা বলেছিলে।"

"তুমি তার আগে আমাকে প্যাঁচা বলেছিলে।"

"তুমি তার আগে আমাকে উড়নচণ্ডে বলেছিলে।"

মাসিমা এইবার হুঙ্কার ছাড়লেন, "স্টপ, স্টপ আই সে।"

বড়মামা বললেন, "কেন এমন করলুম জানিস, মাকে ভুলব বলে। দৃশ্যটা যে চোখের সামনে ভাসছে। পরের দিন রেজাল্ট বেরোল। ডাক্তার হয়েছি আমি। ডাক্তার! শ্মশানচিতার সামনে দাঁড়িয়ে বলে এলাম, জানো মা, তোমার সব দুঃখের অবসান করব বলে, রাত জেগে, রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে এই এতটা পথ এলাম, তুমি খাঁচা খুলে উড়ে গেলে। তোমার মুখটা কত সুন্দর ছিল, তোমার দু' চোখে কত স্নেহ ছিল, তোমার দু' হাতে কত সেবা ছিল, তোমার মনে কত ত্যাগ ছিল, তোমার হৃদয়ে কত বড় একটা আকাশ ছিল, তুমি ছাই হয়ে গেলে!"

"স্টপ, স্টপ আই সে।"

মাসিমার চাঁদের আলো মুখে হিরের দানার মতো জল।

"সেদিনও ছিল এমনই চাঁদের আলোর রাত। কেউ ছিল না শ্মশানে। কুসি, তোর মুখটা ঠিক আমার মায়ের মতো।"

"দাদা"— মাসিমা বড়মামার কোলে মুখ গুঁজলেন। মেজোমামা ধীরে হাত রাখলেন মাসিমার পিঠে। সেদিনের সেই প্লেনটা উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে আলোর পিচকিরি ছুড়তে-ছুড়তে। সেই প্যাঁচা আমগাছের ডালে।

মাসিমা বড়মামার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। চাঁদের আলোয় সাদা ব্লাউজ-পরা পিঠটা ঠিক যেন দুধের মতো সাদা! ঘাড়ের কাছে আলগা খোঁপা। পিঠের ওপর পড়ে আছে তিনটে হাত, দুটো বড়মামার, একটা মেজোমামার। প্রশ্ন জাগছে, মানুষের অতীতটা কি লিকুইড, শুধু জল? হাসি আর আনন্দের পাউডার বলে কিছু নেই। থাকবে কী করে! নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। পৃথিবীর তিনভাগই যে জল। বড়মামার বড়-বড় চোখ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল মাসিমার পিঠে পড়ছে।

মাস্টারমশাই সেদিন হ্যাপি প্রিন্সের কথা বলছিলেন। সারাদিন ওড়াউড়ির পর ক্লান্ত সোয়ালো সোনায় মোড়া প্রিন্সের মূর্তির দু' পায়ের ফাঁকে আশ্রয় নিয়ে ভাবছে, আই হ্যাভ এ গোল্ডেন বেডরুম। সোয়ালো ডানার তলায় তার ছোট্ট মাথাটা গুঁজে সবে ঘুমোতে যাবে, পিঠের ওপর বড় একফোঁটা জল পড়ল। আকাশে একটুকরো মেঘ নেই, বড়-বড় তারা, উজ্জ্বল একটি রাত, তাও বৃষ্টি। উত্তর ইউরোপের আবহাওয়া প্রকৃতই ভয়ঙ্কর।

আবার একফোঁটা জল।

সোয়ালো ভাবছে, দুর ঘোড়ার ডিম, এই মূর্তির কী দরকার, যে একটা ছোট্ট পাখিকে বৃষ্টির আশ্রয় দিতে পারে না। এর চেয়ে বরং একটা চিমনি ভাল। যাই, আবার উড়ি।

ডানা মেলার আগেই আবার একফোঁটা জল। সোয়ালো তখন ওপর দিকে তাকাল, এ কী দেখছি! দ্য আইজ অব দ্য হ্যাপি প্রিন্স ওয়্যার ফিল্ড উইথ টিয়ারস, অ্যান্ড টিয়ারস ওয়্যার রানিং ডাউন হিজ গোল্ডেন চিকস। হিজ ফেস ওয়াজ সো বিউটিফুল ইন দ্য মুনলাইট!

আমার বড়মামা যেন সেই হ্যাপি প্রিন্স। সেই মূর্তির মতোই তিনি দেখতে পাচ্ছেন— অল দ্য আগলিনেস, অ্যাণ্ড অল দ্য মিজারি অব মাই সিটি।

পুব দিকের আলসের কাছে আমরা গিয়ে দাঁড়ালুম পাশাপাশি। চাঁদের সমুদ্রে ভাসছে নতুন মন্দিরের চূড়া। হাঁসের ডানার মতো পতপত করছে পতাকা। একটি তারা তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। দুধসাদা মন্দির-চূড়া।

আমি বললুম, "বড়মামা, আপনার মন্দিরের চূড়াটা কী ফ্যানটাসটিক দেখাচ্ছে!"

বড়মামা বললেন, "আমার মন্দির কী রে! বল, মানুষের মন্দির; বল, দুঃখ নয় সুখ; বল, ঘৃণা নয় প্রেম; বল, মৃত্যু নয়, জীবন; বল, অশান্তি নয়, শান্তি; বল, আমরা মানুষ।"

শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ। সে কী! মঙ্গল আরতি শুরু হল বড়মামার মানবমন্দিরে। রাত তা হলে ভোর হল! মাস্টারমশাই মহামানবের ঘুম ভাঙাচ্ছেন!

একটু আগে আমরা কেঁদেছি
এখন আমাদের মুখে হাসি
মানুষের দুটো পা
সুখ আর দুঃখ!

এইরকম কিছু মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বড়মামা বললেন, "রাতের রহস্য যদিও-বা জানা যায়, মানুষের জীবনের রহস্য কোনওদিনই জানা যাবে না।"

মেজোমামা বললেন, "স্টিফেন হকিং প্রায় একই রকম বলেছেন, যে নিয়মে প্রকৃতি বাঁধা তা বোঝা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু মানুষের সমাজের নিয়মকানুন চির দুর্বোধ।"

"তার মানে তুই বলতে চাইছিস আমি হকিং থেকে মেরেছি?"

"এর মানে কি তাই হল?"

"হ্যাঁ, হল।"

"আচ্ছা কুচুটে তো!"

"তুমি ভারী সরল!"

"তোর মতো কুটিল নই!"

মাসিমা শাসন করলেন, "স্টপ, স্টপ আই সে। তোমাদের স্বভাব জীবনে পালটাবে না।"

দুই মামা হাসতে-হাসতে সমস্বরে বললেন, "সাপে আর নেউলে, ম্যাডাম!"

মন্দিরে শুরু হয়েছে নাম-সঙ্কীর্তন।

পঞ্চবাঁটি

হিমানীশ গোস্বামী

আস্তে-আস্তে জীবরামের অদ্ভুত আচরণ আর কথাবার্তা ছাত্রদের অভ্যেস হয়ে গেল। প্রথম-প্রথম ওর বিরুদ্ধে প্রভূত পরিমাণ নালিশে সুপারিনটেনডেন্ট দুর্গতিহরণবাবু জেরবার হয়ে পড়ছিলেন। আর সে কী নালিশ! ওর কথাবার্তায় নাকি ফাঁদ পাতা থাকে। অনেকেই ওই ফাঁদে পড়ে গিয়ে বিপদে পড়েছে কতবার। একদিন সে উত্তেজিত হয়ে কোত্থেকে ঘুরে এসে চিৎকার করে বলেছিল, "শোনো সব, আজ থেকে কলিকাল শুরু হয়ে গেল! আজ থেকে কলিকাল শুরু হয়ে গেল!"

চিৎকার শুনে সকলে অবাক! আজ থেকে কলিকাল শুরু হয়ে গেল আবার কীরকম কথা? হস্টেলের ছেলেরা যত বলে, "ব্যাপারটা কী, তুমি অমন চেল্লাচ্ছ কেন, কলিকাল তো কবে শুরু হয়ে গেছে। দ্বাপরের পর কলিকাল, এ তো সবাই জানে।"

"উঁহু!" জীবরাম তার মাথা নাড়ে। "আজ থেকেই কলিকাল শুরু হল। আমার কথা যদি তোমাদের অবিশ্বাস হয় তা হলে অবশ্য আমার কীই-বা বলবার থাকতে পারে। একজন সহপাঠীর কথা যদি তোমাদের অবিশ্বাস উৎপাদন করে, তা হলে এ-জগতে আর থাকার কী সুখ রইল!"

তীর্থ বলল, "না, না, অবিশ্বাসের কথা কী বলছ জীবরাম। অবিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবে কিনা আজ থেকে যে কলিকাল শুরু হল, তার নিশ্চয়ই একটা প্রমাণ দেওয়ার ব্যবস্থা তুমি করতে পারবে? না, না, এক্ষুনি তোমাকে প্রমাণ দিতে হবে এমন কথা বলছি না, দু', পাঁচ, সাতদিন পরে দিলেও চলবে। হয়তো উপনিষদ কিংবা ভৃগু থেকে উদ্ধৃতি দিতে হবে তোমাকে। সেসব বই তোমার কাছে নাও থাকতে পারে।"

জীবরাম শুনে বলল, "প্রমাণ চাইলে এক্ষুনি চাও, পরে হলে চলবে না।"

"কোথায় প্রমাণ?" হরিনারায়ণ তার ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে একটু মিটিমিটি হেসে বলল, "প্রমাণ কি তোমার পকেটে আছে?"

জীবরাম অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "কী করে বুঝলে, অ্যাঁ। তুমি নিশ্চয় আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছ।"

হরিনারায়ণ একটু ভিতু গোছের। সে বলল, "না ভাই, আমি গোয়েন্দাগিরি করতে যাব কেন। তুমি চোর না ডাকাত, নাকি খুনে? না ভাই তোমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করিনি আমি।"

জীবরাম তখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেলফুলের কয়েকটা কুঁড়ি বের করল। সাধন তার মোটা পাওয়ারের চশমা জামার তলার অংশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিবিষ্টভাবে কুঁড়িগুলোকে দেখে বলল, "এ তো কয়েকটা কুঁড়ি! বেলফুলের কুঁড়ি বলেই তো মনে হচ্ছে।"

জীবরাম বলল, "রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে না, 'কাল ছিল ডাল খালি আজ ফুলে যায় ভরে!' ওখানে একটু ভুল আছে বলে মনে হয়—হবে, 'কাল ছিল ডাল খালি আজ কুঁড়িতে যায়

ভরে !' আগে খালি ডাল থাকে, পরে কুঁড়ি হয় তবে না ফুলে ভরে যায় ? যাকগে, এই যে বেলফুল এর ডাল কাল ছিল খালি, আজ কুঁড়ি হয়েছে। এর আগে কুঁড়ি হয়নি, তাই আজ থেকে কলিকাল শুরু হয়েছে বলা যায়। বলা যায় নয় কেবল—বলা উচিতও !"

এবারে ভাঙা গলায় চিরঞ্জীবের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে একটু ভাঙা গলায় বলল, "হুঁম বাবা, বুঝেছি।"

জীবরাম বলল, "বুঝেছ তো চুপ করে থাকো। দেখি অন্যেরা কতটুকু বুঝেছে।" কিন্তু আর কেউ কথা না বলায় জীবরাম বলল, "ঠিক আছে চিরঞ্জীব, দেখি তো তুমি কেমন বুঝেছ ?"

চিরঞ্জীব বলল, "এ তো সোজা ব্যাপার। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল/ কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।' কুসুমকলি মানে ফুলের কুঁড়ি। কুঁড়ি মানে কলি, আর ডালে কুঁড়ির সমারোহ দেখা দিলে বলা যায় কলিকাল।" চিরঞ্জীব কথা বলে একটু দম নিয়ে বলল, "আমি একবার কুঁড়িকে ফেরাতে দেখেছি।"

জীবরাম একটু থমকে গেল যেন। সে বলল, "কুঁড়ি কোথায় চলে গিয়েছিল যে তাকে ফেরাতে দেখবে ?" বলে হাহা করে একটু হাসল।

চিরঞ্জীব বলল, "আমাদের বাড়িতে চুনকাম করানো হচ্ছিল সেই সময় আমার জেঠু বললেন, কলি একবার ফেরালে চলবে না, আবার কলি ফেরাও। তখন চুনকামের মিস্তিরি রামপদকাকা ফের কলি ফেরাল। আর কলি মানে তো কুঁড়ি !"

জীবরাম পেয়েছিল শিবরামের ধারা। শিবরাম চক্রবর্তী। আর বনসাগর হাই স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্ররা জীবরামের অদ্ভুত আচরণ আর কথাবার্তা শুনে-শুনে কয়েকজন জীবরামের মতো কথাবার্তা শুরু করেছিল। এক সংক্রামক রোগের মতো এটি জীবরামের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। একদিন দুর্গতিহরণবাবু ক্লাসে ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে বলতে বলায় ক্লাসের মনিটার পাঁচু বলেছিল, "ব্যঞ্জনবর্ণ নানা রঙের হয়। তবে হলুদের ভাগটাই বেশি। পুঁইডাঁটা দিয়ে যে ব্যঞ্জন রান্না হয় তার রং প্রধানত সবুজ হয়। সঙ্গে কুমড়ো আর টম্যাটো দিলে ব্যঞ্জনের রঙে আসে বৈচিত্র্য।"

"চুপ, চুপ করো পাঁচু। তোমার ওই অবান্তর কথা থামাও !"

পাঁচু খুব নিরীহ মুখ করে বলল, "সার আমার কথা অবান্তর হল ? আমি কি কিছু ভুল করেছি ?"

চিৎকার করে দুর্গাবাবু বললেন, "এই গাধার দলকে শায়েস্তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শিগ্‌গিরই এই ইস্কুলে বিপদহরণকে ফিট করে দিয়ে যাব। ও হল গিয়ে সাঙ্ঘাতিক মানুষ। সম্পর্কে আমার ভাই হয়। বিপদহরণ কথা কম বলে, বেতই চালায় বেশি। ক্লাসে এসে সে প্রথমেই সকলকে একচোট বেত দিয়ে পেটে। সে দক্ষিণ চাঁপাডাঙা ইস্কুলের হেডমাস্টার, ওখান থেকে ওকে নিয়ে আসব, তখন মজা বুঝবে !"

জীবরাম বলল, "বিপদের কথা !"

দুর্গতিহরণবাবু বললেন, "কী বললে জীবরাম ? বিপদের কথা ? বিপদের কথা বলেই তো ওকে এখানে আনাচ্ছি।"

"না সার, আনাবেন না !" কাতরকণ্ঠে জীবরাম বলেছিল, "উনি এলে সমবেতদের সমবেত মেরে একশা করবেন।" কে যেন পেছন থেকে চাপাগলায় বলে উঠল, "তখন রিকশা করে হস্টেলে ফিরতে হবে।"

দুর্গতিহরণ প্রায়ই বিপদহরণের ভয় দেখান। ছাত্ররা ভয় পায় কিন্তু তাদের অদ্ভুত ভাষা ছাড়ে না। একদিন হস্টেলে এলেন সাধনের কাকা। তিনি সামরিক বিভাগের ক্যাপ্টেন। কিছুদিন হল লাদাখে লে অঞ্চলে আছেন। ওখান থেকে হস্টেলের ছাত্রদের জন্য অনেকটা মিষ্টি এনেছেন। তিনি একটি প্যাকেট আবার দিয়েছেন দুর্গতিহরণবাবুকেও। তাতে দুর্গতিহরণ ভারী খুশি। মিষ্টিটার স্বাদ একেবারে অন্যরকম। তাতে সুজি আছে, আর আছে প্রচুর পরিমাণে কাজুবাদাম, আখরোট আর কিশমিশ। দুর্গতিবাবু ওই অপূর্ব মিষ্টান্ন খেয়ে সাধনকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন সেদিনই। বললেন, "শোনো সাধন, তোমার কাকা ভারী চমৎকার লোক। এত মিষ্টি তিনি এনেছেন তোমাদের জন্য। চমৎকার মিষ্টি, আমাকেও অনেকটাই দিয়েছেন। কিন্তু মিষ্টিটার নাম ঠিক জিজ্ঞেস করা হয়নি, তুমি এর নাম জানো ?"

সাধন বলল, "লে হালুয়া সার !"
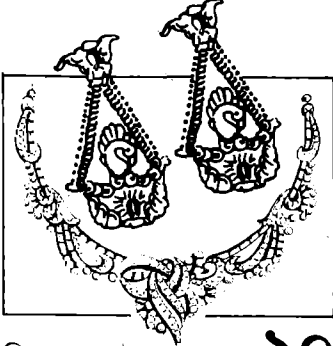
শুনেই দুর্গতিহরণবাবুর চেহারার পরিবর্তন হল। তিনি জানেন, লে হালুয়া কথাটা অতি খারাপ। একটু গোলমেলে লোকেরা এই কথা ব্যবহার করে। ভদ্রসমাজে মোটেই চলন নেই। বড়দের কাছে এমন কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করা হয় না। অথচ সাধন কথাটা মিথ্যেও বলেনি। লে অঞ্চল থেকে সুজির এই মিষ্টির নাম অবশ্য সে জানে না, তবে কি না এটাকে হালুয়া বললে ভুলও হয় না। দুর্গতিহরণবাবু অবশ্য জানতেন না, সাধনের কাকা লে অঞ্চল থেকে ওই মিষ্টি এনেছেন। তিনি তাই রেগে গিয়ে ফের প্রশ্ন করলেন, "এই মিষ্টির নাম কী বললে, আবার বলো!"

সাধন দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল, "লে হালুয়া সার।"

সেদিন ক্লাসে সাধনকে আধ ঘণ্টা হাতে ইট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন দুর্গতিহরণ।

আর একদিন শোনা গেল জীবরাম নাকি উড়ন্ত চাকি দেখেছে। তবে খুব কাছ থেকে নয়, অন্তত একশো মিটার দূর থেকে। খুব স্পষ্ট নয় তবে জীবরাম বলেছে সে হাজার টাকা বাজি ধরতে পর্যন্ত রাজি আছে। বাজি ধরাটা ভারী অপরাধ দুর্গতিবাবুর মতে। তার ওপর উড়ন্ত চাকি দেখার মতো গাঁজাখুরি গল্পকে সত্যি বলে প্রচার করা। তিনি ক্লাসেই জীবরামকে বললেন, "ওহে জীবরাম, তোমার টাকা শস্তা হয়েছে, না? হাজার টাকা বাজি যে ধরেছ শুনলাম, তা হারলে সে-টাকা তুমি কোত্থেকে জোটাবে? শুনলাম তুমি অতিশয় বাজে কথা বলেছ।"

জীবরাম বলল, "বাজে কথা আমি বলি না সার, আমি সত্যি কথাই বলি। আপনি আমার কোন কথাটা মিথ্যে বলছেন? আমার হাজার টাকা নেই সেটা সত্যি কথা, কোত্থেকেই বা অত টাকা পাব বলুন, তবে হারলে তো টাকার প্রশ্ন আসে। আমি হারব না।"

"তুমি নাকি বলেছ তুমি উড়ন্ত চাকি দেখেছ? সেটা প্রমাণ করতে বললে তুমি কী বলবে আমি জানি। তুমি বলবে উড়ন্ত চাকি তুমি দেখেছ কিন্তু কাছে যেতেই সেটা হুশ্ করে ফের উড়ে গেছে, তাই তো?"

"না সার।" জীবরাম বলল, "আমি উড়ন্ত চাকি দেখাতে পারি। তবে এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে সার!"

দুর্গতিহরণবাবু বললেন, "মানে অমাবস্যার দিন যদি বুধবার হয় আর সেদিন যদি আকাশে মেঘ থাকে, আর সরোবরে পাঁচটা পদ্মফুল ফোটে একেবারে সাদা রঙের, তবে গঙ্গাজলে চান করে চোখ বন্ধ করে দু' ঘণ্টা আটত্রিশ মিনিট চুপ করে বসে থাকলে তবে দেখা যাবে, তাই তো? না হয় ওইরকমই অসম্ভব একটা কথা বলবে?"

জীবরাম বলল, "না সার, আমি উড়ন্ত চাকির সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিতে পারি। আমার কটকের বন্ধু সুরেশ্বর চাকির দাদা বীরেশ্বর গত বছর ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর থেকে কলকাতায় উড়ে গিয়েছিলেন। টেক অফ করার সময় তিনি রুমাল নাড়ছিলেন জানলার পাশে বসে, তখন তাঁকে আবছা-আবছা দেখেছিলাম। প্রায় একশো মিটার দূর থেকে হলেও আমি চিনতেও পেরেছিলাম। আমার কাছে একটা বাইনোকুলারও ছিল।"

শুনে ক্লাসসুদ্ধু ছাত্র খুব জোরে না হলেও চাপাভাবে হেসে উঠেছিল। দুর্গতিহরণের দুর্গতি হরণ করার মতো কেউ ছিল না। সত্যি তো, বীরেশ্বর চাকি বিমানে যখন উড়ছিলেন তখন জীবরাম তাঁকে দেখেছে। দেখতেই পারে, এর মধ্যে মিথ্যে তো কিছু নেই। তবে ওই উড়ন্ত চাকি কথাটার ব্যবহার সরল সহজ হয়নি সেটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে ওই কথা বলার জন্য কাউকে মিথ্যেবাদী ঠিক বলা যায় না।

একদিন রাত্রের খাওয়ার সময় হইচই শোনা গেল। দুর্গতিবাবুর সেদিন শরীর ভাল ছিল না। সন্ধে হতে-না-হতেই সামান্য একটা ওমলেট আর দু'খানা রুটি ডাল দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ রাত ন'টার সময় শোরগোল শুনে তিনি জেগে উঠলেন। তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। চিৎকার করে বললেন, "কী ব্যাপার, অ্যাঁ, ডাকাত পড়েছে নাকি?"

কে যেন ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে এসে বলল, "সার, জীবরামের প্রিয় পাত্র হারিয়ে গেছে!"

শুনে ভয়ঙ্কর আশ্চর্য হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "জীবরামের প্রিয় পাত্রটা কে?" তাঁর মাথাটা ঘুরে উঠল। হস্টেল থেকে কেউ উধাও হয়ে গেলে সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। কেলেঙ্কারিরও ব্যাপার। এদিকে তাঁর শরীর ভাল নেই, এই অবস্থায় কোথায় যাবেন, কী করবেন বুঝতে না পেরে চিৎকার করে হাঁক দিলেন, "জীবরামকে এখনই আমার কাছে

পাঠিয়ে দাও।"

জীবরাম ভয়ে-ভয়ে দুর্গতিহরণের ঘরে এসে হাজির। দুর্গতিহরণবাবু বললেন, "এ কী শুনছি, তোমার নাকি প্রিয় পাত্র হারিয়েছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সার।" কুণ্ঠিতভাবে জীবরাম বলল, "হারিয়েছে।"

"কে সে ?" হুঙ্কার ছাড়লেন দুর্গতিহরণবাবু। তারপর বললেন, "যত সব ঝামেলার ব্যাপার। প্রিয় পাত্রটির নাম কী, কোন ক্লাসে পড়ে ?"

জীবরাম বলল, "তার কোনও নাম নেই বিশেষ, আর সে কোনও ক্লাসেই পড়ে না।"

এবারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল দুর্গতিহরণবাবুর। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এখানে তুমি মজা করতে এসেছ নাকি। তোমার প্রিয় পাত্রর নাম নেই, সে কি হয় ? আর কোনও ক্লাসে পড়ে না, তবে কি সে কুকুর কিংবা বেড়াল ?"

"না সার, কুকুরও নয়, বেড়ালও নয়। একটা ছোট ঘটি।"

"ঘটি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ সার, গত বছরে জন্মদিনের সময় আমার পিসি দিয়েছিলেন। চমৎকার ঘটি। তার ওপর খোদাই করে আমার নামও লেখা আছে। সেটায় করে রোজ জল খেতাম।"

এবার একটু প্রশমিত হন দুর্গতিহরণবাবু। ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ওই ছোকরাটি কথার প্যাঁচে হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে ওস্তাদ। আর সব তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও জুটেছে বটে! একটু সাবধান হয়েই থাকতে হবে তাঁকে। উপায় নেই। মিছে কথা তো বলেনি। তবে ঘটিটা হারানো একটা বিচ্ছিরি ঘটনা বটে। তিনি দরোয়ান দুখিরাম আর মনিটার পাঁচুকে ডেকে পাঠালেন। খোঁজাখুঁজি করে ঘটিটা পাওয়া গেল ইঁদারার ধারে। বাসন ধোওয়ার পর বাসন মাজার লোক ভুলে ফেলে এসেছিল। যাক, প্রিয় পাত্র সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এর পরে একদিন ক্লাস নাইনে ঘোর তর্ক-বিতর্ক চলছে। খবরের কাগজে বেরিয়েছে বনগাঁর কাছে একটা গ্রামে বজ্রাঘাতে তিনজন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন সাতজন। খবরটা পড়ে মনিটার পাঁচু বলল, "বজ্রাঘাতে বাঁচা খুব ভাগ্যের কথা। ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ, যা কিনা মানুষকে ঝলসে দেয়, পুড়িয়ে দেয়।"

এই সময় হঠাৎ চিরঞ্জীব বলে ওঠে, "বজ্রাঘাতের কথা বলছ, আমার কথা শোনো। আমি অন্তত তিনবার বজ্রাঘাত সহ্য করেছি!"

শুনে জীবরাম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে, "মিথ্যে কথা। অসম্ভব কাণ্ড! বাজ মাথায় বা গায়ে পড়ার আশঙ্কা এত সামান্য যে, সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। একই লোকের ওপর দু'বার বাজ পড়েছে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, আর তিনবার ? অসম্ভবকে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে গুণ করলে যত অসম্ভব, তিনবার বাজ পড়াও সেরকম অসম্ভব। যদি গুল মারতে চাও চিরঞ্জীব, তা হলে এক কাজ করো, গুলমার্গে যাও। শুনেছি ভারী চমৎকার জায়গা। গুলমার্গই তোমার উপযুক্ত স্থান!"

চিরঞ্জীব দুঃখিত মুখে বলল, "ভাই জীবরাম, আমি তোমার শিষ্য হয়ে তোমার ওপর দিয়ে গেলাম। তোমাকে রাম ঠকান ঠকিয়েছি ভাই। আমি অবশ্য মিথ্যে কথা বলিনি একদম। দু' বছর আগে গঙ্গায় নৌকো ভাড়া করে বেড়াচ্ছিলাম ঠাকুর বিসর্জনের সন্ধেয়। সেদিন আমাদের নৌকোটা যখন দক্ষিণেশ্বরের কাছে গিয়েছে, তখন হঠাৎ একটা বজরা সামনে থেকে এসে আমাদের নৌকোকে ধাক্কা মারে। একবার নয়, পরপর দু'বার। আমরা কোনওক্রমে ব্যালান্স করে বেঁচে যাই। ভাগ্যক্রমে নৌকোটা দু' পাক ঘুরে যায়, কিন্তু ডোবে না। তারপর ফেরার সময় মাঝির দুর্বুদ্ধিতে আর-একটা বজরার সঙ্গে...।"

হা-হা করে হেসে উঠল জীবরাম। বলল, "ভারী চমৎকার ঠকিয়েছ তুমি। আমার অন্তত বোঝা উচিত ছিল। বজরার আঘাতকে চমৎকার বজ্রাঘাতে রূপান্তরিত করেছ। তবে আমার বড়মামা সত্যি-সত্যি একজনের গায়ে বাজ পড়তে দেখেছিলেন। কিন্তু লোকটির কিছু হয়নি, সামান্য একটু আঘাত লেগেছিল।"

এবারে সাধন বলল, "এটা আমি ধরে ফেলেছি। বাজপাখি! কিন্তু বাজপাখি হঠাৎ পড়বে কেন ?"

জীবরাম বলল, "হঠাৎ নয়, ওঁরা মাঠের ভেতর দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, অনেক দিন আগেকার কথা। এক জমিদারবাবু পাখি শিকার করতে বেরিয়ে সাতাশটা গুলি খরচ করে একটি পাখিও মারতে পারেননি। হঠাৎ উড়ন্ত বাজটিকে দেখে তিনি চোখ বন্ধ করে দুম করে গুলি চালিয়ে দেন, এবং কী আশ্চর্য, গুলিটি বাজের গায়ে লাগে। আহত বাজটি এসে পড়ে লোকটির গায়ে।"

চিরঞ্জীব বলল, "কতরকম বিপদ হয়। কথা নেই, বার্তা নেই, গায়ে বাজ পড়ল! একবার আমাদের বিপদ হয়েছিল খুব। ওই যে বললাম তিনবার বজ্রাঘাত হয়েছিল, তারই কয়েকদিন পর। একটি গুপ্তচর আমাদের খুব বিপদে ফেলেছিল। আমরা প্রায় দশ-বারোজন বাড়ির লোক আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যান্ডেলে তিনদিনের জন্য গিয়েছিলাম। সেখানেই ব্যাপারটা ঘটে।"

সাধন বলল, "গুপ্তচর ? ভারী ইন্টারেস্টিং তো ?"

চিরঞ্জীব বলল, "গুপ্তচরের পাল্লায় পড়ে আট ঘণ্টাখানেক আটকে থাকতে হয়েছিল। খাদ্য নেই, পানের উপযুক্ত জল নেই। ভয়ানক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।"

মনিটার পাঁচু বলল, "কোন দেশের গুপ্তচর চিরঞ্জীব ?"

চিরঞ্জীব বলল, "কোন দেশের আবার, আমাদেরই দেশের।"

"বলো, বলো তোমার কাহিনী!" সকলে একসঙ্গে বলে উঠল।

"বিশেষ কিছু বলার নেই।"

চিরঞ্জীব বলল, "নৌকোয় করে আমরা গঙ্গায় বেড়াচ্ছিলাম, তখন বোধ হয় ভাটা চলছে। হঠাৎ নৌকোটা আটকে গেল কিসে। মাঝি অনেক চেষ্টা করেও নৌকোটাকে চালাতে পারল না। বোঝা গেল আমরা গুপ্তচরে আটকে গেছি। চরটা জলের একটু নীচেই ছিল লুকিয়ে। আর শুনেছ আজব কথা ? যে মাঝি ওই নৌকো চালাচ্ছিল সে বলে কিনা সে সাঁতার জানে না! সেজন্য সে যে সাঁতরে পাড়ে গিয়ে অন্য কোনও নৌকো আনবে তাও হল না। দূর-দূর দিয়ে দু'-একটা নৌকো চলে গেল, কিন্তু আমাদের চিৎকার হয় তারা শুনতে পেল না, নয়তো ইচ্ছে করেই সাহায্য করতে এল না। শেষে জোয়ার যখন এল, তখন নৌকো গুপ্তচরের হাত থেকে পরিত্রাণ পেল।"

জীবরাম এইভাবে বনসাগর হাই স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রদের এক-একটা কথার ধাঁধার ওস্তাদ তৈরি করে ফেলেছিল। ওর আর ওর সঙ্গীদের নিয়ে কত যে মজার গল্প আছে তা এইটুকু জায়গায় তো আর শেষ করা যাবে না, তাই এখানেই শেষ করতে ইচ্ছে করছে।
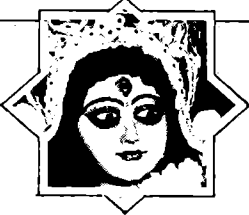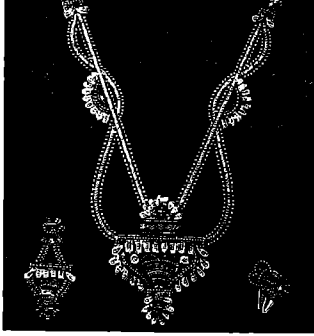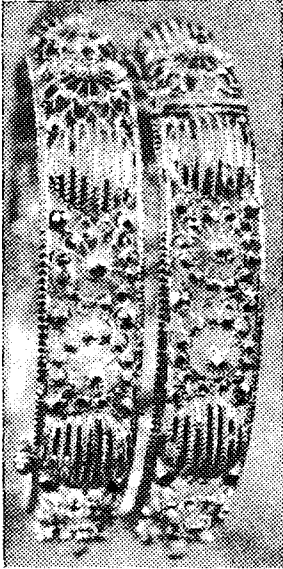
আবার ইচ্ছে করছেও না। আচ্ছা, আর-একটা গল্প বলে এবারের মতো শেষ করা যাক।

একদিন জীবরাম কথায়-কথায় বলল, তাদের গ্রামে একটা বাজার আছে, সেই বাজারে তার এক পিসেমশাই দোকান দিয়েছেন, সেই দোকানের সামনে পাথরের একটা শিবমূর্তি বসিয়েছেন। কাছেই পাঁচটা বিশাল বটগাছ। এদিকে অনেক আগে থেকেই একটা বড় শিবমন্দির ওখানেই আছে। সেখানে রোজই কেউ-না-কেউ পুজো দেয়। ভোগও দেয়, আর বড়-বড় উৎসবের সময় কত যে পুণ্যার্থী সেখানে আসেন তার ঠিকঠিকানা নেই। জায়গাটার নাম বিরাটগঞ্জ, সেটাই আগে চালু ছিল, কিন্তু শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে থেকে তার নাম হয়ে গেছে 'পঞ্চবটী'। আগে কাছের লোকেরা এই নাম বলত, কিন্তু ধীরে-ধীরে নাম বদলে-বদলে এখন আর কেউই পুরনো নাম বলে না। বলে 'পঞ্চবঁটি'। এদিকে আমার পিসেমশাই দোকান খুলেছেন এমন জিনিসের, যা সহজে বিক্রি হয় না। খাতা, কাগজ, পেন্সিল, চক, স্লেট, স্লেটের পেন্সিল, কালি, নিব, বল পয়েন্ট রিফিল। জেদি মানুষ, রোজ দোকানে গিয়ে বসেন আর দিনের শেষে কখনও দশ, বড়জোর ত্রিশ টাকার বিক্রি হয়। পিসেমশাইয়ের বড়দা শহরে থাকেন, তাঁর মাথায় অনেক আইডিয়া। গ্রামে বেড়াতে এসে পিসেমশাইয়ের দুর্দশা দেখে বলেন, "ওরে করেছিস কী? বেনাবনে কি মুক্তো ছড়ায় কেউ? এখানে হাজার-হাজার লোক আছে, তাদের মধ্যে লেখাপড়া করে ক'জন? তুই একটা মিষ্টির দোকান দে। আর যাই হোক বা না হোক, সব লোকেরই মিষ্টির ওপর লোভ থাকে। দেখছিস না গাঙ্গুলিরা, তারপর ঘোষরা দোকান দিয়ে কত ঐশ্বর্য করে ফেলেছে। সুখেন তো তেলেভাজার দোকান দিয়েই কত টাকা করেছে। তুইও এক কাজ কর, ভাল কারিগর রেখে সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপির দোকান দে। এইসব কাগজপত্তর পেন্সিল এসব কারও দরকার হয় রোজ? মাত্র তো রোজ পঁচিশ-ত্রিশ টাকার বিক্রি!"

পিসেমশাই বলেন, "কী, আমি এত বড় ফ্যামিলির ছেলে, আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজোয় মোষ বলি হত, কালীপুজোয় একশো একটা পাঁঠাবলি হত। ঠাকুর্দা ছিলেন হেডমাস্টার, বাবা ম্যাজিস্ট্রেট, এখনও কত টাকা পেনশন পান, আর আমি করব মিষ্টির দোকান? না দাদা, মিষ্টির দোকান করা আমার দ্বারা হবে না। তা ছাড়া আজকালকার লোক, কে কোত্থেকে ছানা সরাবে, চিনি সরাবে, নইলে গণ্ডায়-গণ্ডায় গিলবে, ওদের ওপর নজর রাখতে পারব না।"

পিসেমশাইয়ের দাদা তখন ভেবে-ভেবে বললেন, "তুই এই দোকানই চালা, দিনে পঁচিশ-ত্রিশ টাকাই বা মন্দ কী! তবে এর সঙ্গে তুই বঁটির দোকান দে। শুধু বঁটি নয়, সাঁড়াশি, বালতি, মগ, ছুরি। শিল-নোড়াও রাখবি। একটা শিল-নোড়া একটা পরিবারের চলে ত্রিশ বছর, কিন্তু এই গ্রামে তো দুশো পরিবার, বছরে পাঁচ-ছ'টা তো বিক্রি হবে। আশপাশের গ্রামের লোকেরাও আসবে কিনতে। আর দোকানটার নামও বদলাতে হবে। আসলে নামটাই ভাল করে ভেবে বের করেছি আমি। এখন নাম আছে খাতাপত্র। এবারে নাম হোক পঞ্চবঁটি।"

পিসেমশাইয়ের ভাই তো অবাক! "কী নাম বললে দাদা, পঞ্চবঁটি? বলো পঞ্চবটী। বঁটি হতে যাবে কেন?"

"বটীর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুটা খাটবে না দাদা। বঁটি ঠিক হলেও পঞ্চবঁটির কোনও মানে হয় না।"

পিসেমশাইয়ের দাদা বললেন, "মানে হবে না কেন, ওই নাম শুনেই তো লোকে এসে জড়ো হবে। আর ভুলও হবে না তো। আগেই বলেছি তুই বঁটি বেচবি। পাঁচরকম সাইজের বঁটি থাকবে। যারা একসঙ্গে পাঁচটা বঁটি কিনবে তাদের জন্য থাকবে একটা বিশেষ উপহার, ধর ছোট একটা দু' ব্যাটারির টর্চলাইট। দেখবি এই পঞ্চবঁটি নাম দেখেই কত লোক মজা পাবে। তারা দোকানটা দেখতে আসবে, বঁটি না কিনলেও অন্য কিছু কিনবে।"

বলার সময় হিজিবিজি কাটছিল জীবরাম। যেখানে সে দু'বার লিখেছিল পঞ্চবঁটি! সেই কাগজটা টেবিলেই পড়ে ছিল। পরে দুর্গতিহরণবাবুর চোখে পড়লে তিনি মনে-মনে বলেন, "পঞ্চবঁটি! এইসব বানান লেখা হচ্ছে! যেই লিখুক, কাল তাকে আচ্ছা শিক্ষা দেব।" বলে তিনি কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে ভরলেন। "লেখাটি কার এবার বের করতে হবে, তারপর তাকে যা মজা দেখাব না!"

ভেবেই তিনি আনন্দ পেলেন। দুর্গতিবাবুর গতি বেড়ে গেল।

ছবি : দেবাশিস দেব

চলো যাই অন্য ব্রহ্মাণ্ডে

পথিক গুহ

মার্টিকে মনে আছে ? মার্টি ম্যাকফ্লাই—সেই যে ছেলেটার বন্ধু ছিলেন এক খ্যাপা বিজ্ঞানী, যিনি ওকে তৈরি করে দিয়েছিলেন একটা 'টাইম মেশিন' বা 'সময়-যান'—যাতে চেপে বসলেই চলে যাওয়া যায় অতীতে। কিংবা ভবিষ্যতে।
'ব্যাক টু দ্য ফিউচার' ফিল্মের কাহিনীর কথা বলছিলাম। রবার্ট জেমেকিস-এর যে ছবিতে আটের দশকের এক তরুণ ওরকম গাড়িতে চড়ে পৌঁছে গেল পাঁচের দশকে। মানে, ওর জন্মের অনেক আগে। মানে, ওর বাবা-মায়ের যখন বিয়েই হয়নি !
যারা দেখেছ ছবিটা, তারাই জানো কী কেলেঙ্কারির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল মার্টি। যখন দেখেছিল ওর বাবা-মায়ের বিয়েটা কিছুতেই হচ্ছে না। যাতে সেটা হয় সেজন্য ওর কী আপ্রাণ প্রচেষ্টা। হবেই, নইলে ও যায় কোথায় ? ওর যে জন্মই হয় না। আর, তারপর ওরকম টাইম মেশিনে চড়ে অতীতে ফিরে যাওয়াও হয় না। ও কি তা হলে একটা ভূত ?
কাহিনীতে শেষমেশ বাবা-মায়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেলে মার্টি। আর তারপর ফিরে আসে অতীত থেকে বর্তমানে। পাঁচের দশক থেকে ফের আটের দশকে। অর্থাৎ, সে-সময়ের তুলনায় ভবিষ্যতে। ব্যাক টু দ্য ফিউচার !

টাইম ট্র্যাভেল—অর্থাৎ, সময়-যানে চড়ে ইচ্ছেমতো অতীতে বা ভবিষ্যতে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের এক গাণিতিক উপহার। সরাসরি নয়, পরোক্ষে।
বাস্তবে কেউ এখনও সম্ভব করে তোলেনি কাজটা। আর, সেজন্য অনেক বিজ্ঞানীও বাতিল করে দিয়েছেন ওরকম সম্ভাবনা।
স্টিফেন হকিং তো বলেইছিলেন যে, টাইম ট্র্যাভেল অসম্ভব ! ওঁর যুক্তিটা ছিল অনেকটা এনরিকো ফার্মির বক্তব্যের মতো। ভিন্ গ্রহের প্রাণীরা যে নেই, সেটা বোঝাতে উনি শুধু একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিতেন। 'হোয়ার আর দে ?' অর্থাৎ, থাকে যদি ই. টি-রা তা হলে ওদের দেখা পাইনি কেন ? আর, দেখা দিতে যখন আসেনি ওরা, তখন নিশ্চিন্তে বলা যায় ওরা নেই। টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে হকিংয়ের বক্তব্যও সেরকম। তাই একদা লিখেছিলেন, "ওটা যদি সম্ভবই হত তা হলে একুশ শতক বা তারপরের যুগের কেউ হঠাৎ এসে পড়ত আমাদের
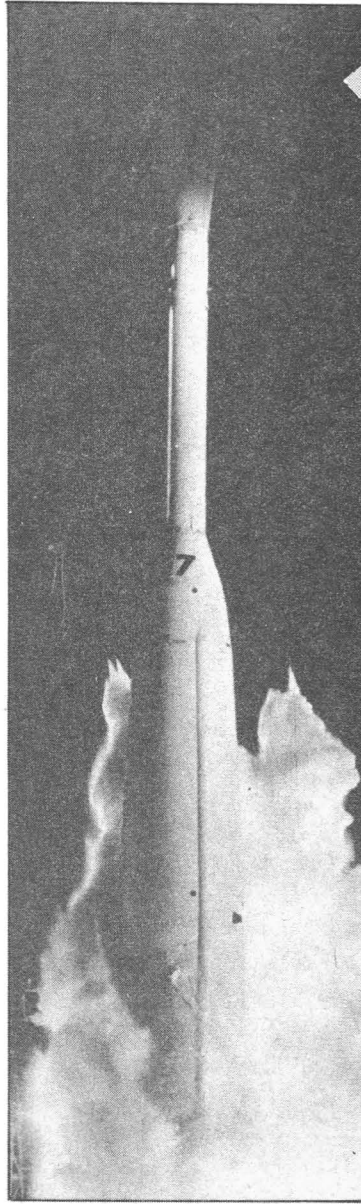
সময়-যানে চড়ে ইচ্ছেমতো অতীত বা ভবিষ্যতে চলে যাওয়া কি সত্যিই সম্ভব ? আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পরোক্ষে সেরকমই ইঙ্গিত দিলেও এনরিকো ফার্মি, স্টিফেন হকিং প্রমুখ বিজ্ঞানীরা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিলেন তেমন সম্ভাবনা। সম্প্রতি অবশ্য হকিং মন্তব্য করেছেন, সময়ভ্রমণ সম্ভব।

সামনে। যখন আসেনি, তখন ও-জিনিসটা অসম্ভব !"
সম্ভব কি অসম্ভব, সে-প্রশ্নে বিজ্ঞানের কচকচি বাদ দিলেও প্রথমেই যে আপত্তিটা ওঠে সেটাই ওই ব্যাক টু দ্য ফিউচার ছবির উপজীব্য। ব্যাপারটাকে বলে 'প্যারাডক্স'। ধাঁধা। যাতে সম্ভব আর অসম্ভব গুলিয়ে যায়। ওই যেমন মার্টি-র অতীতযাত্রা। সত্যিই তো, যদি সম্ভব হত পেছনে চলে যাওয়া, তা হলে যে উলটেপালটে যেত সব। ইচ্ছে করলেই তো ওর বাবা-মায়ের বিয়েটা ভেঙে দিতে পারত মার্টি। তা হলে ও জন্মায় না। আর অতীতেও যাওয়া হয় না। এ কেমন ব্যাপার ? একটা ছেলে জলজ্যান্ত রয়েছে। কিন্তু তখন সে দেখতে পাচ্ছে, সে জন্মাতে পারে, আবার না-ও পারে। অর্থাৎ, জন্মানোটা তার হাতে। কিন্তু তা হলে সে এল কোথা থেকে ?
কেউ-কেউ বলবেন, এমনও তো হতে পারে যে, মার্টি চেষ্টা করলেও পারবে না তার জন্ম ঠেকাতে। অর্থাৎ, ওর মা-বাবার বিয়ে হবেই। সেটাই বা কেমন ব্যাপার ? ইংরেজিতে 'ফ্রি উইল' বলে একটা বিষয় বোঝানো হয়।
যা-খুশি-তাই করার ক্ষমতা। আমরা কী করব বা না-করব তা আমরা নিজেরা ঠিক করি। মানে, করতে পারি। আমি আইসক্রিম খাব না কফি, তুমি স্কুল যাবে না বল পেটাবে রকে— সেসব আমি বা তুমি ঠিক করি। মানছি যে, আইসক্রিম না পেলে কফি-ই খাই শেষপর্যন্ত, আর তুমিও মায়ের পিটুনির ভয়ে স্কুলেই

হয়তো যাবে। কিন্তু সেটা কথা নয়। এটা না করে ওটা কিন্তু আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো করতে পারি। ফের বলি মার্টির কথা। মার্টি কি চাইলে পারত না, মা বা বাবার একজনকে খুন করতে ? তা হলে কী হত ? না-কি আমাদের এটা মানতে হবে যে, ওদের কারও দিকে পিস্তল তাক করলেই ওর হাত হয়ে পড়ত অবশ ? তা-ও কি কখনও হয় ?
ঠিক এই ব্যাপারটাকেই বলে 'গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স'। নাতি অতীতে পৌঁছে গুলি করে মেরে ফেলল তার ঠাকুর্দাকে। যিনি তখনও কিশোর। অর্থাৎ, ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর বিয়েটা হয়নি তখনও। এবার তা হলে নাতি কোথা থেকে আসবে ? ওই অনেকটা মার্টির ব্যাপারস্যাপারের মতো।
ওরকমই আর-একটা ধাঁধা 'আর্টিস্ট'স প্যারাডক্স'। এক তরুণ শিল্পী বসে ছবি আঁকছেন। এমন সময় তাঁর ঘরে ঢুকলেন একজন 'আর্ট-ক্রিটিক'। তিনি এসেছেন ভবিষ্যৎ থেকে। মানে কয়েক দশক পরের সময় থেকে। চিত্র সমালোচকের হাতে একখানা দামি বই। তাতে লক্ষ-লক্ষ টাকা দামের অনেক ছবির প্রিন্ট। ছবিগুলো সবই ওই আর্টিস্টের। তবে তরুণ বয়েসের নয়, পরেকার আঁকা। অর্থাৎ, তখনও যেসব ছবি আঁকেননি তিনি। আঁকবেন পরে কোনওদিন। শিল্পী আদর করে বসালেন সমালোচককে। আর শুনলেন ভবিষ্যতের গল্প। শুনলেন, কীরকম কদর হবে তাঁর ছবির। এর পর সমালোচক সময়-যানে চড়ে ফিরে গেলেন ভবিষ্যতে—মানে তাঁর নিজের যুগে। আর শিল্পী অনেক অনুনয়-বিনয় করে তাঁর কাছ থেকে রেখে দিলেন আর্ট প্রিন্টের বইটা। এর পর, ওই বই দেখে এবার আঁকতে শুরু করলেন ভাল-ভাল ছবিগুলো !
এ কেমন ব্যাপার ? প্রিন্ট দেখে ওরিজিনাল ছবি আঁকা ? নকল দেখে আসল ? কিন্তু আগে আসল না আঁকা হলে নকল আসে কোথা থেকে ? সত্যি এ একটা ধাঁধা। বিজ্ঞান বলে, আগে কারণ, পরে কার্য। অর্থাৎ, কার্যকারণের একটা সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু এখানে যে সেই সম্পর্কটা উলটো।
এরকম হতে পারে বলেই সময়-ভ্রমণকে এতদিন বাতিল করে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বলেছেন, ওটা বাস্তবে সম্ভব নয়। এখন কেউ-কেউ আবার বলছেন নতুন কথা। বলছেন, বড্ড সোজাসুজি ভাবছি বলেই আমরা নস্যাৎ করে দিয়েছি ব্যাপারটা। আসলে, এই ব্রহ্মাণ্ড আমাদের কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি রহস্যময়। আর সেই রহস্যময় জগতে অনেককিছুই আমাদের স্বাভাবিক চিন্তার পরিপন্থী। যেমন 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স' তত্ত্ব।
এ-শতাব্দীর গোড়ার দিকে উদ্ভাবিত ওই 'থিওরি' অনুযায়ী, কোনও ক্রিয়ার ফলে আমরা কী দেখব তা নির্ভুল বলা যায় না। বলা যায় কেবল অনেক ফলাফলের কোনটার সম্ভাবনা কত। পারমাণবিক কণা নিউট্রনের ভাঙন দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। ওই কণাটা ভেঙে বেরোয় 'প্রোটন', 'ইলেকট্রন' আর

'ব্যাক টু দ্য ফিউচার' ছবির একটি দৃশ্য

'অ্যান্টিনিউট্রিনো'। একটা নিউট্রন ভাঙতে গড় সময় লাগে ২০ মিনিট। কিন্তু সব নিউট্রনের বেলাতেই সেটা এক নয়। একসঙ্গে অনেক নিউট্রন থাকলে একটা প্রথম মিনিটেই ভাঙতে পারে। আবার অন্য একটার বেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগতে পারে, অথচ, নিউট্রনেরা তো সবাই এক। মানে গঠনের দিক থেকে একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও তফাত নেই। তা হলে এরকম ব্যাপার কেন ?
কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এর ব্যাখ্যা মেলে হিউঘ এভারেট-এর তত্ত্ব অনুযায়ী। ১৯৫৭ সালে প্রবর্তিত ওই থিওরি বলছে, যে জিনিস ঘটা সম্ভব তা ঘটেই—কোনও-না-কোনও বিশ্বে। ব্রহ্মাণ্ড আসলে একটা নয়, অনেক। এভারেট এরকম মনে করতেন বলেই ওঁর তত্ত্বকে 'মালটিভার্স কনসেপ্ট' বা 'বহুবিশ্ব ধারণা' বলা হয়। ওই ধারণা বলছে, অনেক বিশ্বের প্রত্যেকটাতেই যে নির্দিষ্ট নিউট্রনটার ভাঙন লক্ষ করব, সেটার একটা করে কপি রয়েছে। আর সেইসব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটাতে রয়েছি আমরাও। মানে, আমাদের কপি। যত মুহূর্তে নিউট্রন কণার ভাঙন সম্ভব তত মুহূর্তেই ভাঙছে সেটা। কোনও না কোনও বিশ্বে। অর্থাৎ, সেই মুহূর্তে একটামাত্র বিশ্বে। বাকিগুলোর নয়। আমরা যদি দেখি ১৯ মিনিটে ভাঙল, তা হলে বুঝতে হবে একটামাত্র বিশ্বে সেটা ঘটল। অন্য বিশ্বে—যেখানে ওই নিউট্রনের কপি সামনে বসে আছে আমাদের একটা করে কপি—সেখানে ওই কণাটা তখনও অটুট। বা আগেই ভেঙে গেছে। মানতে কষ্ট হচ্ছে ? হবেই। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের চরিত্র একটু অদ্ভুত !
কোয়ান্টাম মেকানিক্স গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স-এর সমাধান করে 'মালটিভার্স' তত্ত্বে। যে বিশ্বে নাতি অতীতে যাওয়ার জন্য টাইম মেশিনে চড়ে বসে, সেই বিশ্বে ঠাকুর্দার সঙ্গে ঠাকুমার বিয়েটা হয়েছিল। ফলে জন্মেছিল ঠাকুর্দার ছেলে। এবং নাতি। আর যে বিশ্বের অতীতে পৌঁছচ্ছে— এবং ভেঙে দিচ্ছে ঠাকুর্দার বিয়ে—সেখানে ঠাকুর্দা বিয়ে করেননি ঠাকুমাকে। ফলে জন্মায়নি নাতির বাবা কিংবা নাতি।
একইরকমভাবে শিল্পীর ধাঁধার সমাধান করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক মাইকেল ডামেট। ওঁর মতে, চিত্রসমালোচক যে বিশ্ব থেকে ফিরে যাচ্ছেন অতীতে, সেই বিশ্বে শিল্পী সত্যিই

শিখেছিলেন দারুণ আঁকা। কিন্তু তিনি যখন অতীতে পৌঁছলেন তখন পেলেন এক ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। ওখানে শিল্পী সত্যিই আসল দেখে নকল আঁকলেন। অবশ্য শিল্পীও সেখানে অন্য বিশ্বের শিল্পীর কপি।

তোমরা ভাবতে পারো, এটা গোলমালের হিসেব। এটা আজগুবি জিনিসের সম্ভাব্যতা প্রমাণে বাস্তবের চেহারাটাকে গুলিয়ে দেওয়া। সত্যি, সেরকম ভাবলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে, উত্তরে শুধু এটুকু বলতে হয় যে, বাস্তব কখনও-কখনও কল্পনার চেয়েও আজগুবি। অবিশ্বাস্য। যেমন সমাধান করে অক্সফোর্ডের দুই বিজ্ঞানী ডেভিড ডয়েশ আর মাইকেল লকউড সম্প্রতি লিখেছেন, "টাইম ট্রাভেলের বিরুদ্ধে আপত্তি-ই আসলে বাস্তবের ভুল ধারণার ফসল। যাঁরা আপত্তি জানাচ্ছেন, তাঁরা এগিয়ে আসুন নতুন যুক্তি নিয়ে।" বোঝো অবস্থা! আমাদের প্রচলিত ধারণায় বাস্তব আর অবাস্তব কেন উলটেপালটে যাচ্ছে! আজগুবিটাই নাকি সত্যি।

হয়তো সেজন্যই সময়ভ্রমণ বা সময়যান নিয়ে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ বাড়ছে দিন দিন। প্রমাণ, একাধিক গবেষণাপত্র। 'ফিজিক্যাল রিভিউ'-এর মতো 'সিরিয়াস

ক্লিভল্যান্ডের কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক লরেন্স ক্রস

কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তাদের একজন নিল্স বোর বলতেন, কোয়ান্টাম মেকানিক্স জানতে গিয়ে যে চমকে উঠবে না, সে এর কিছুই বুঝবে না। আর-এক নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রিচার্ড ফিনম্যান একবার কোয়ান্টাম তত্ত্ব বোঝানোর এক বক্তৃতামালার শুরুতে ছাত্রদের বলেছিলেন, "আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সারা পৃথিবীতে বারোজনেরও বেশি পণ্ডিত 'রিলেটিভিটি' বুঝলেও, কোয়ান্টাম মেকানিক্স কেউ বোঝে না। আমি বলতে যাচ্ছি প্রকৃতির আচরণ কেমন। আমি যখন পড়াব তখন ক্রমাগত নিজেদের প্রশ্ন কোরো না 'কিন্তু এটা কী করে এমন হবে?' কারণ, তা হলে এক অন্ধকার কানাগলিতে ঢুকে পড়বে। যেখান থেকে কেউ কখনও বেরোয়নি। কেউ জানে না এটা কী করে এরকম।"

বহু বিশ্ব তত্ত্বে সময়-ভ্রমণের ধাঁধার জার্নাল'-এও ছাপা হচ্ছে সেসব। আর, সবচেয়ে বড় কথা, কেউ-কেউ আবার ভবিষ্যতের টাইম মেশিনের নকশা নিয়ে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। কারণ, ওঁরা ধরে নিয়েছেন জিনিসটা অবাস্তব নয়। এ-ব্যাপারে কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি. ক্লার্ক-এর বক্তব্যই বোধ হয় মনে ধরেছে ওঁদের। ক্লার্ক বলেন, "প্রচণ্ড অগ্রসর প্রযুক্তির সঙ্গে ম্যাজিকের কোনও তফাত নেই।" সত্যি কথা। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর বিশ্বতত্ত্বের পণ্ডিত এবং 'হাইপারস্পেস' নামে বেস্ট সেলার-এর লেখক মিচিকো কাকু সম্প্রতি লিখেছেন, "নিউটনের মতন জিনিয়াসকে যদি বলা হত তিনশো বছর পরেকার বিজ্ঞান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে, তা হলে তিনিও নিশ্চয়ই ধরতে পারতেন না তাঁর পরবর্তী বিজ্ঞানের অনেক বিপ্লব। আজ যা আধুনিক পদার্থবিদ্যা তার অনেকটাই মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও আজগুবি বলে গণ্য হত।"

বড় খাঁটি কথা বলেছেন কাকু। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাটাই এরকম। তাতে গুলিয়ে যায় বাস্তব আর অবাস্তব। য়ুরি গাগারিনের মহাকাশযাত্রা কিংবা নিল আর্মস্ট্রং-এর চাঁদে অবতরণ দিয়ে আমাদের ম্যাজিকের শুরু। শেষ কোথায় হবে এক্ষুনি বলা মুশকিল।

মহাশূন্যযাত্রায় আমরা আপাতত থমকে গেছি বড় এক বাধার সামনে পড়ে। দূরত্ব। মহাকাশের বিস্তৃতি মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতার তুলনায় বড় বিশাল, অতিকায়। সেখানে দূরত্ব মাপা হয় মাইল কিলোমিটারে নয়, আলোকবর্ষে। অর্থাৎ, সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বেগে ছোটে যে আলো সে একবছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে, সেই মাপে। আমাদের সূর্যের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রের দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার আলোকবর্ষ। অন্য তারাদের তো কথাই নেই। এহেন দূরত্ব পাড়ি দিতে তাই চাই এমন মহাকাশযান, যা চলবে কয়েকশো কিংবা কয়েক হাজার বছর। কারণ, আলোর বেগে—অথবা তার কাছাকাছি বেগেও—ছোটা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। সুতরাং, মহাশূন্যে সত্যিকার অভিযান মানে শত-শত কিংবা হাজার-হাজার বছরের ধাক্কা। অতদিন যে বাঁচি না আমরা! আর, যদি আমাদের আয়ু হতও অতদিন, তা হলেও কি আর সহজে যাওয়া যেত দূর-দূরান্তে?

দীর্ঘযাত্রার জন্য মহাকাশযানের চাই প্রচুর জ্বালানি। এদিকে বেশি জ্বালানি ভরলে যান হয়ে পড়ে ভারী। তখন একটুখানি ছুটতেই তার লাগে অনেকটা জ্বালানি। অর্থাৎ, জ্বালানি কম নিলে কম খরচ। আর বেশি নিলে বেশি। সুতরাং ওতে তেমন লাভ নেই।

এ-সমস্যার সমাধান কম জ্বালানিতে দীর্ঘপথ পাড়ি। সেটা হতে পারে 'অ্যান্টিম্যাটার' জ্বালানিতে। হ্যাঁ, অ্যান্টিম্যাটার। সাধারণ পদার্থকণার উলটো চরিত্রের কিছু কণার অস্তিত্ব ১৯৩০ সালে অনুমান করেছিলেন বিজ্ঞানী পল ডিয়াক। যেমন প্রোটনের অ্যান্টি-প্রোটন, ইলেকট্রনের পজিট্রন ইত্যাদি। ১৯৩২ সালে ওরকম কণাদের অস্তিত্বের প্রমাণ করেন কার্ল অ্যান্ডারসন। প্রোটনের সঙ্গে অ্যান্টি-প্রোটনের কিংবা ইলেকট্রনের সঙ্গে পজিট্রনের ছোঁয়া লাগলেই দু'রকম পদার্থের বিনাশে মিলতে পারে প্রচুর এনার্জি। কারণ এতে দুটো পদার্থের

নিল্‌স বোর

এনরিকো ফার্মি

পুরো ভরটাই আইনস্টাইন-এর সূত্র ($E=mc^2$) মেনে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ জ্বালানিতে সেটা হয় না। কারণ, ওতে এনার্জি মেলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, পদার্থের বিনাশে নয়।
কিন্তু অ্যান্টিম্যাটার জ্বালানি মিলবে কোথায়? ব্রহ্মাণ্ডে পদার্থের প্রায় পুরোটাই ম্যাটার। কেন এরকম— কেন যা হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ অর্ধেকটা ম্যাটার আর বাকি অর্ধেকটা অ্যান্টিম্যাটার, সেরকম নেই ব্রহ্মাণ্ডে— তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। সেটা অন্য ব্যাপার। খবর হল, অ্যান্টিম্যাটার ল্যাবরেটরিতে এখন পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে একতিল পরিমাণ।
রকেটের জ্বালানির জন্য যতটা প্রয়োজন, সেই টন টন অ্যান্টিম্যাটার তৈরি করতে দেউলিয়া হয়ে যাবে পশ্চিমের দেশগুলো। তবে সেটা আজকের প্রযুক্তিতে। যদি সত্যিই একদিন বদলায় বিজ্ঞান? তা হলে কী-কী হতে পারে তার খবরাখবর পাবে 'স্টার ট্রেক' সিরিয়ালে। হ্যাঁ, যেখানে মহাশূন্য পাড়ি নেহাত জলভাত। যেখানে অ্যান্টিম্যাটার জ্বালানি, 'টেলিপোর্টেশন', টাইম ট্রাভেল ঘুরেফিরে আসে বারবার। আসেন ডঃ ম্যাককয়, ক্যাপ্টেন কার্ক আর মিঃ স্পক।
স্টার ট্রেকের ওরকম একাধিক গিমিক ভেলকি, না কি বিজ্ঞান, সেটা যাচাই করার জন্য সম্প্রতি কলম ধরেছেন একজন পদার্থবিজ্ঞানী। আমেরিকার ক্লিভল্যান্ডে কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক লরেন্স ক্রস। লিখেছেন তাঁর নতুন বই 'দ্য ফিজিক্স অব স্টার ট্রেক'।
স্টার ট্রেক পুরোটাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, এমন দাবি করেননি ক্রস। জানিয়েছেন, অতিরঞ্জন কিংবা ভুল ওখানে আছে। ভুল? হ্যাঁ, তা আছেই তো! মহাশূন্যে সঙ্ঘাতের বিকট শব্দ বারবার আছে ছবিটায়। কিন্তু ওখানে আওয়াজ হবে কী করে? হাওয়া বা অন্য মাধ্যম তো নেই মহাশূন্যে। আর অতিরঞ্জন? এ-ব্যাপারটা ক্রস দেখেছেন অন্যভাবে। বলেছেন, "আসলে আমি দেখতে চাই ওই সিরিয়ালে ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে কী বলা যায়? 'একেবারে অসম্ভব' না কি 'প্রায় অসম্ভব'?" ওঁর মন্তব্য, "ওখানে বলা টেকনোলজি যদি প্রথমটা হয়, তা হলে তা কোনওদিনই অর্জন করবে না মানুষ। আর, যদি দ্বিতীয়টা হয় তা হলে তা আমাদের করায়ত্ত হবেই।" কবে? ক্রসের হিসেব, তেইশ শতকে।
উদাহরণ হিসেবে ক্রস টেনেছেন টেলিপোর্টেশনের ব্যাপারটা।
রডেনবেরি-নির্মিত সিরিয়ালে প্রায়ই দেখবে 'বিম মি আপ, স্কটি' বলতেই একজন আস্ত মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। ঠিক আমরা যেমন করে এখন 'ফ্যাক্স' করে চিঠি বা ফোটো পাঠাই। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে একজন মানুষ যেসব অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি সেগুলোকে তুলে এনে অন্য জায়গায় ঠিক তেমনি করে সাজানো। তেমনটা করতে পারলে মানুষকেও ফ্যাক্স করা যায়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, সেটা করতে গেলে প্রথমে মানুষটা যত পরমাণু দিয়ে তৈরি, তাদের প্রত্যেকটার অবস্থান, ভর, বেগ, 'এনার্জি'—এরকম হাজারও তথ্য জানা চাই। ক্রস হিসেব কষে দেখিয়েছেন, অত বিপুল তথ্য যদি কম্পিউটারে ভরে রাখা যায়, তা হলে প্রয়োজন হবে ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০ কিলোবাইট মেমরির। অর্থাৎ, ১০ গিগাবাইটের 'হার্ড ড্রাইভ'-এ যদি ওসব তথ্য ভরে রাখতে হয় তা হলে এত ড্রাইভ লাগবে যে, সেগুলো পরপর সাজালে এই পৃথিবী থেকে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির দূরত্বের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জায়গা নেবে! কিন্তু, ক্রস জানাচ্ছেন, গত দু'দশকে তথ্য সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা যে-হারে কমছে, তাতে মোটামুটি একটা কম্পিউটারে একটা মানুষের উপাদান সব পরমাণুর তথ্য ভরে ফেলা যাবে আগামী ২০০ বছরের মধ্যে!
স্টার ট্রেকের আর-এক কৌশল 'ওয়ার্প ড্রাইভ'—যার সাহায্যে সময়ভ্রমণ সম্ভব হয় সিরিয়ালটায়— তাও, ক্রসের মতে, রীতিমত প্রযুক্তিগত দক্ষতার ব্যাপার। 'ওয়ার্মহোল' বা 'স্পেস-টাইম'-এর মধ্যে সুড়ঙ্গ তৈরি করতে পারলে যে চোখের নিমেষে মহাশূন্যের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বা বর্তমান থেকে অতীতে চলে যাওয়া যায়, তা গণিত প্রমাণ করেছে। কিন্তু সেই সুড়ঙ্গ খুঁড়তে বিজ্ঞানের নতুন তত্ত্বের সাহায্য ছাড়াও দরকার প্রচুর এনার্জি। এতটা যে, তা জোগাড় করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই পৃথিবীর বুকে একসঙ্গে প্রচুর এনার্জি পাওয়ার যন্ত্র বলতে এখন 'অ্যাকসিলারেটর'। যেখানে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান কণারা দু'দিক থেকে ছুটে আসে। আর তারপর ওদের ঠোকাঠুকিতে মেলে শক্তি। এরকম অ্যাকসিলারেটর এখন পৃথিবীর বেশ কয়েকটা জায়গায়। কিন্তু, তাদের মধ্যে যে এনার্জি মেলে তার অনেক, অ-নে-ক-গুণ এনার্জি চাই ওয়ার্মহোল তৈরি করতে। কত গুণ? ক্রসের হিসেব, এখন একটা অ্যাকসিলারেটরে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ এনার্জির ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ গুণ! তবু ক্রসের ধারণা, ওয়ার্মহোল একদিন তৈরি হবেই।
হয়তো তাই। গত বছর এইচ.জি. ওয়েল্‌স-এর 'টাইম মেশিন' প্রকাশের শতবর্ষপূর্তিতে বহুআলোচিত হয়েছে আপেক্ষিকতার পণ্ডিত কিপ থর্ন-এর বই 'ব্ল্যাক হোল্‌স অ্যান্ড টাইম ওয়ার্পস: আইস্টাইন'স আউটরেনাস লেগেসি'। বইটাতে থর্ন— যিনি ব্ল্যাক হোল নিয়ে বাজি জিতেছেন হকিং-এর সঙ্গে— জানিয়েছেন ওয়ার্মহোল তৈরির 'ব্লু-প্রিন্ট'।
সর্বশেষ খবর, চারদিকে টাইম ট্রাভেল নিয়ে এত উৎসাহের মাঝখানে এখন মত বদলেছেন হকিং। সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছেন, সময়ভ্রমণ সম্ভব।
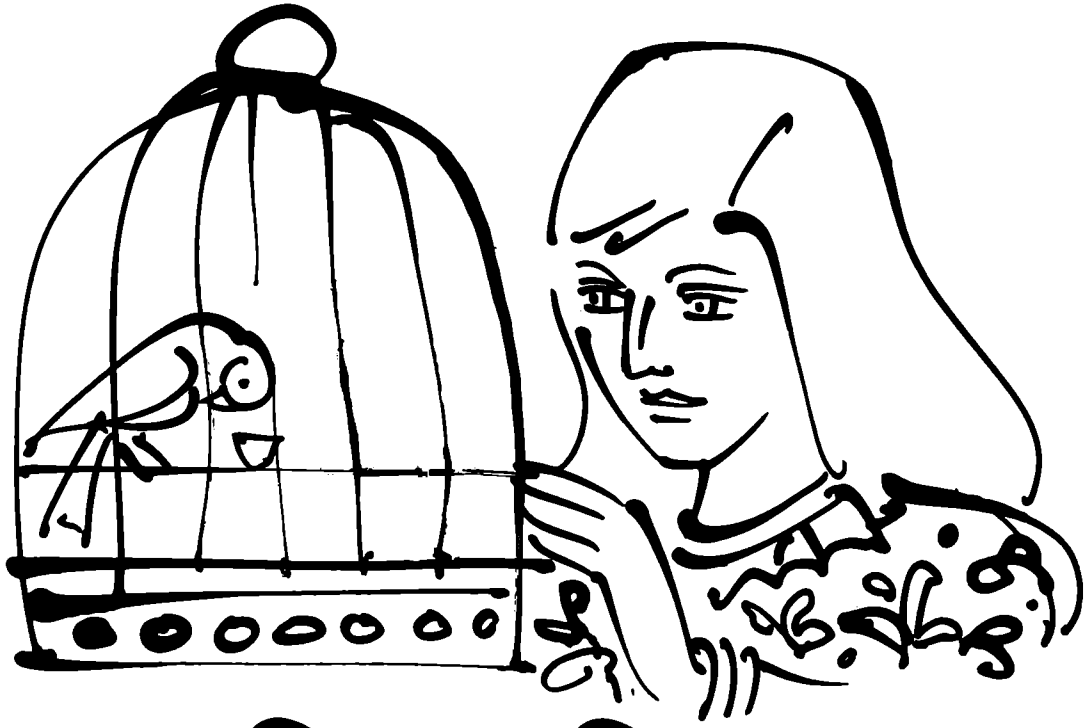
সুখির পাখি

পার্থ বসু

বেল বাজতেই সুখি দৌড়ে গেল। এন্তাড়াতাড়ি কে এল রে বাবা! ওমা! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একগাল হাসি নিয়ে ভেলুমামা আর ভেলুমামি।

"তোমরা এসে গেছ?" দরজাটা আর-একটু চওড়া করে খুলে সুখি জিজ্ঞেস করল।

ভেলুমামার পেছনে দুটো হাত, "হ্যাপি বার্থডে সুখিরানি। তোর জন্য কী এনেছি বল তো?" ভেলুমামি একটু মোটাসোটা। জমকালো সিল্ক পরেছেন, তায় তিনতলায় উঠতে গিয়ে ঘেমেনেয়ে নাকের পাশে, চিবুকের খাঁজে পাউডার বেরিয়ে গেছে—সুখি স্পষ্ট দেখল।

"কী করে বলব? আগে ভেতরে এসো না!"

"না।" ভেলুমামারও পাঞ্জাবির কাঁধ, ভুঁড়ির কাছটায় ঘামের ছোট্ট-ছোট্ট চিহ্ন। "আগে বল দেখি—কী হতে পারে?"

ভেলুমামি আর থাকতে পারলেন না। "চল তো ভেতরে যাই। ফ্যানের তলায় বসি। আমিই বলে দিচ্ছি—"

বলবার আগেই ভেলুমামা ডান হাতটা সামনে আনলেন। একটা খাঁচা, খাঁচার ভেতর একটা টিয়াপাখি। তার লাল বাঁকানো ঠোঁট, গলায় লাল-হলুদের সুন্দর বর্ডার, কিন্তু চোখদুটো পাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে।

"ওমা! টিয়াপাখি। মা, দ্যাখো এসে—"

সুখি একদৌড়ে ঘরের ভেতর। ভেলুমামারা ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, "টিয়া নয় এটা। একে বলে মদনগৌরী—বুয়েচ?"

"বোসো তোমরা। মাকে ডাকি!" সুখি যেন নেচে উঠল। ফ্যানটা ফুলস্পিডে চালিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটল।

সকাল থেকেই মা আর কাঞ্চনদিদি কতরকম খাবার তৈরি করেছেন। মাছের কচুরি, চিকেনের পিজা, ভেজিটেব্‌ল প্যাটিস, পুডিং। সারাটা ফ্ল্যাট এমন খাবারের গন্ধে ভরে আছে যে, ঘুরতে-ফিরতেই সুখির জিভের তলায় জল জমছে।

বাবা সকালবেলা ফ্যানের ব্লেড, ঘরের দেওয়াল, টিভির পেছনে খানিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালিয়ে অফিস গেছেন। ফেরার পথে কেকের দোকান থেকে মস্ত কেক নিয়ে আসবেন, কথা আছে। সুখির ভাবনা, লোকজন এসে যাচ্ছে সব—বাবা দেরি করবেন না তো!

একটু পরেই আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে সুব্রতা এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সুখি, পেছনে বেঁটেখাটো কাঞ্চনমাসি। সেন্টার টেবিলের ওপর খাঁচাসুদ্ধু পাখিটা দেখে সুব্রতা অবাক!

"ও কী করেছ দাদা, একদম সত্যিই জ্যান্ত পাখি! কী কাণ্ড, বলো দেকিনি!"

"আর বোলো না!" ভেলুমামি বললেন, "এখন তো খাঁচার পাখি পাওয়া যায় না। কীসব ব্যানডট্যানড হয়েছে নাকি! তা সেই হাতিবাগান মার্কেটের পেছনদিকে—সে অনেক কাণ্ড করে—"

কাঞ্চনমাসির সর্বদা হাসিমুখ। "ছোলা, জলও তো দেওয়া আছে দেখছি। তা রাখবে কুথায়?"

"কেন! ওই যে বারান্দায়, একটাই তো বারান্দা, সেখানে বাইরেটা বেশ দেখতে পাওয়া যায়।" সুখি দু' হাত জড়ো করে বুকের কাছে এনে দেখতে লাগল। কিন্তু পাখিটা দু'-একবার ডান্ডার ওপর এদিক-ওদিক করে একধারে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

"যাক গে। সেসব কথা পরে হবে। কাঞ্চন, খাঁচাটা নিয়ে ওদিকে একটা কাগজ পেতে রেখে দে তো। এখনই নোংরা করবে সব।"

সুখি বলল, "কিন্তু এ-ঘরেই থাকবে। সবাই এসে দেখবে না!"

সুব্রতা বলল, "ঠিক আছে। এ-ঘরেই থাক। তা হলে একটা চট পেতে খাঁচাটা ওই জানলার কাছে কার্নিসে এখন রেখে দে। ও আসুক আগে। এখন তোমাদের আগে একটু চা করে দিই। আমিও এককাপ তা হলে এখনই খেয়ে নিই। ওঃ, সারাদিন যা গেল না—" সুব্রতা আঁচল দিয়ে গলা মুছলেন।

সারা সন্ধ্যা বকুলবাগান রোডের সেই ফ্ল্যাটবাড়িটা হইচই, কথায়, গানে, খাওয়াদাওয়ায় মত্ত হয়ে রইল। কতরকম উপহারের প্যাকেট—বই, ফুল, ক্যাসেট, জামার পিস, পারফিউম, মিষ্টির বাক্স ইত্যাদি-ইত্যাদি জিনিসে ভরে গেল বড় টেবিলটা। সুখির আনন্দ আর ধরে না। চোদ্দটা মোমবাতি এক ফুঁয়ে নিভিয়ে কেক কাটা হল। কিন্তু সব কৌতূহল উৎসাহের মাঝখানে জায়গা নিল খাঁচায় বন্ধ সেই পাখিটা। বন্ধুরা এসে কেউ শিস দিল। কেউ আঙুল ঢুকিয়ে ছুঁতে চাইল। কতরকম মন্তব্য করল কতজনে। মদনগৌরী একপাশে জড়োসড়ো হয়ে চোখ বুজে সব শুনে গেল, কখনও চোখ পাখিয়ে রাগ দেখাল। কিন্তু, একবারও নড়ল না। টুঁ শব্দটি করল না। সবাই শেষে মেনে নিল, এখন তো ওর ঘুমের সময়। এখন ওকে ডিসটার্ব করা উচিত নয়।

ভেলুমামার ছেলে পলুদা একটু দেরিতে এল! সুখির চেয়ে বয়েসে বড়। ক্যারাটে শিখেছে, সাঁতার জানে, চমৎকার ঘুড়ি আর দোদমা বাজিও তৈরি করতে পারে। এমন যার এতরকম প্রতিভা, সে কিন্তু একবার মাধ্যমিকে ব্যাক পেয়ে পরের বছর পাশ করে এবার উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য তৈরি হচ্ছে। সেটা পরীক্ষকদের কোনও গণ্ডগোল নিশ্চয়—খাতা নিয়ে আকছার যা হচ্ছে না! অতএব, পলুকে বেশ গম্ভীর-গম্ভীর দেখায়। আর খুব সিরিয়াস কথা বলে, যেটুকু না বললেই নয়।

সুখি যে-প্রশ্নটা অনেককেই এতক্ষণ ধরে করেছে, পলু আসতেই কেকের প্লেট এগিয়ে দিয়ে সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করল, "পলুদা, তুমি বলো তো—এই পাখি কথা বলতে পারে, গান শেখালে করবে?"

পলু যথোচিত গম্ভীর হয়ে বলল, "শেখাতে পারা চাই। তা ছাড়া, শেখালেই যে করবে তার কি মানে? তার মধ্যে যদি ইয়ে থাকে, তা হলেই করতে পারে। না থাকলে তো এমনি-এমনি হবে না।"

সুখি কিচ্ছু বুঝতে না পেরে অন্যদিকে চলে গেল। পলু গম্ভীরভাবে সাজগোজ-করা খুকিদের দেখতে লাগল।

সবাই চলে গেলে অনেক রাতেও পাখিটাকে নিয়ে একটা সমস্যা—কোথায় রাখা যায়! বারান্দার তারে এত রাতে কীভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এই নিয়ে সুখির বাবা-মা যখন ভীষণ ভাবনায়, তখন কাঞ্চনমাসি আবার বলে দিল, "এ-বাড়িতে একটা হুলো কিন্তু ঘোরাফেরা করে!" তা হলে? ড্রয়িংরুমের জানলার ধারে? শার্সি যে বন্ধ থাকে? গরম লাগবে না? শেষে ঠিক হল, একটা পাল্লা খুলে রেখে সেখানেই খাঁচাটাকে রাখা হবে।

পরের দু'দিন শনিবার, রবিবার। কতজন এলেন। আর পাখিটাকে নিয়ে কতরকম কথা বলে গেলেন। সুখির এক সম্পর্কিত ঠাকুরদা এসেছিলেন। একসময় ছিলেন কলেজের অধ্যাপক, ফিলজফি না কী পড়াতেন, অনেকদিন রিটায়ার করে এক বৃদ্ধাবাসে থাকেন। দুটি ছেলেই বিদেশে বাসা বেঁধেছে। তিনি তো বলে গেলেন, খাঁচার পাখি বেশিদিন বাঁচে না। একটু হাসলেন তিনি, "অবশ্যি আমরাও খাঁচায় থাকি। আমাদের আয়ু আছে, কারণ অভ্যাস হয়ে গেছে। আমাদের এই আত্মাটাও তো একটা খাঁচার মধ্যে, জানো দিদিভাই?"

তারপর এলেন মা'র এক ভাগ্নে। শহরের কাছেই এক হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে, আর এস্তার পদ্য লেখে। লিটল ম্যাগাজিন-ভর্তি পদ্য বেরোয় ধ্রুবতারা মুখুজ্যের। কীরকম মোলায়েম করে টেনে-টেনে বলল, "আহা, বন্দি বিহগ! পাখিকে ছেড়ে দিতে হয় আকাশের নীল মঞ্চে—সেখানে সে গান করবে, পাখ্‌না মেলে সাঁতার দেবে সাগরসমান নীল নভে—"

"থাম দেখি তুই! নে, চা খেয়ে নে!" সুব্রতা বলল, "সব পাখি গান গায় না। সব পাখি আকাশে সবসময় সাঁতরে বেড়ায় না।"

নতুন ম্যাজিক শিখছে পাড়ার বেকার ছেলেটি, হুবো। তার কথা হল, "দ্যাখ, পাখিটাকে দে ক'দিনের জন্য সুখি! আমি কীরকম ওকে হাতের ওপর, মাথার ওপর, কাঁধে, পায়ের গোড়ালির ডিমেও নাচতে শেখাব। আবার ভ্যানিশ করে দেব। দেখিস, সে এক মজা হবে।"

বাবাদের কবেকার কোন এক কুলগুরুর নাতি, না পুতি না কীসব সম্পর্ক, দৈনিক পূজাপদ্ধতি চটিবইটা কিনে দু'-একটা শিবস্তোত্র শিখেছে; অবশ্য নিজে সে কর্পোরেশনের প্লাম্বারের মিস্ত্রি। ফি বেস্পতিবার সেই হরিসাধন পুরুতঠাকুর মা'র শোওয়ার ঘরের এক কোণে রাখা লক্ষ্মীঠাকুরের পটের সামনে জল-বাতাসা দিয়ে বরাদ্দ পঁচিশ পয়সা পায়। সে আহ্লাদি মুখে বলে গেল, "দিব্যি তো পাখিটি! এক কাজ করুন। পাখিটাকে হরিনাম শেখান। সকালবেলায় নামগান শুনলে পুণ্যি হবে—হ্যাঁ!"

অঙ্কের মাস্টারমশাই গজেন্দ্রবাবু হপ্তায় দু'দিন আসেন। এমনিতেই আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো সুখিও টিভি দেখে, গান শেখে, জলসাটলসায় নাচগান করে, ছবিও নাকি আঁকতে পারে। তা এসব কাজ তিনি একদম পছন্দ করেন না। তার ওপর একটা টিয়াপাখি নিয়ে সুখি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে, সেই নতুন উপদ্রবটি তাঁর পক্ষে সহ্য করা বড় কঠিন। গজেনবাবু আরও অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, অঙ্কের খাতার প্রায় প্রতিটি পাতায় এ-কোণে, ও-কোণে টিয়েপাখির ছবি এঁকে রেখেছে সুখি। হোমটাস্কের অঙ্ক যে-ক'টি করেছে তার সবক'টিতেই ভুল উত্তর। মহা চটে গিয়ে গজেনবাবু সুখির বাবাকে ডেকে সেদিন বলেই দিলেন, "দেখুন মশাই, এই মেয়ে যদি এবার অঙ্কে গোল্লা পায় আমাকে কিছু বলতে আসবেন না। ওই, ওই পাখিটাকে বলবেন—কেমন!" গজগজ করতে-করতে ছড়ি ঘুরিয়ে জুতোয় ভীষণ শব্দ তুলে গজেনবাবু নীচে নেমে গেলেন।

তার চেয়েও ভয় দেখিয়ে গেলেন বাবার অফিসের এক বন্ধু। চায়ে একটা সশব্দে চুমুক দিয়ে তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে খুবই চিন্তিতমুখে জানালেন, "শোনো হে। একটা কথা বলে রাখি। ওই যে সারাদিন বারান্দায় পাখির খাঁচা ঝুলিয়ে রাখো, কিংবা এই খোলা জানলাতেই রাখো—এটা কিন্তু সেরকম কারও চোখে পড়লে হামলা হতে পারে। মানে বলছি কি, চারপাশে এতরকম ওই যে বলে পশুক্লেশ বারণ সমিতি-টমিতি গোছের কীসব হয়েছে না—তারা খবর দিলে পুলিশে হ্যাঙ্গাম করতে পারে হে। আমার এক ভায়রা, সে থাকে গোড়েতে, তার ছেলেটার জেদে একটা ময়না—"

"ও বাবা!" সুব্রতা বেশ ভয় পেয়ে

গেলেন। "দরকার নেই ওসব শুনে। এখন কী করা যায় বলো তো?" সজলের দিকে তাকিয়ে সুব্রতা কথাটা বলল। "আবার মেয়েটার কীরকম মায়া পড়ে গেছে জানেন না তো!"

এখন সুখি ওর পাখিটার কথাই সারাক্ষণ ভাবে। সকালে উঠেই মুখ ধোওয়ার আগে একবার দেখে, সকালে নিজের খাবার থেকে রুটির টুকরো বাটির মধ্যে ফেলে দেয়। স্কুল যাওয়ার সময় টা-টা করে, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে খাঁচার ওপরেই একটা চুমু খেয়ে যায়। কাঞ্চনমাসিকে বারবার মনে করিয়ে দেয়, ছোলা দিতে আর জল বদলে দিতে। স্কুল থেকে এসেও অনেকক্ষণ ধরে পাখিটাকে দেখে। মদনগৌরীর কোনও ভাবান্তর নেই! সে কাঠির ওপর পায়চারি করে, কিংবা খাঁচাটার দেওয়াল বেয়ে ঠোঁট ধরে ওঠানামা করতে থাকে। কাছে গেলে এখনও কেমন চোখ পাকায়, সন্দেহের চোখে তাকায়। সুখি তাকে গান শোনায় কত। সকালে আশাবরী, সন্ধ্যায় পূরবী—যা কিছু শিখেছে সে। পাখিটা গান শোনে না। গান তো করেই না। কথা কিচ্ছু বলে না। সবসময় যে রেগে টং হয়ে থাকে! নিয়মিত সুখি লক্ষ করেছে, যখন সন্ধের ঠিক আগে বিকেলের আকাশে এক-একটা ঝাঁক বেঁধে দলে-দলে টিয়েপাখি কতরকম কথা বলতে-বলতে উড়ে যায়, তখন খাঁচার ভেতরে মদনগৌরী চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখনই শব্দ করে! সুখির সে-সময়টা শুধু মনখারাপ করে।

একদিন সুখির এক নিজের খুড়তুতো ভাই এল, গৌতম। তার বাবা-মা থাকেন শান্তিনিকেতনে। গৌতম থাকে একজনের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে, কাজ করে বিড়লা টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে। শনি-রবিবার ছাড়া ছুটি পেলেই বোলপুরে ছোটে। সুখির খুব প্রিয় দাদা গৌতম, একদম বন্ধুর মতো। গৌতম জন্মদিনে আসতে পারেনি। সেদিন এল কারুসঙ্ঘের তৈরি চমৎকার একটা শাপ্‌লা নিয়ে। সুখি কী খুশি!

গৌতম জিজ্ঞেস করল, "জন্মদিনে কী-কী পেলি বল তো এবার?"

সুখি উত্তর দেওয়ার আগেই সুব্রতা বলে উঠল, "সে আর বোলো না বাপু! তুমি তো আমার ভেলুদাদাকে চেনো। সে একটা খাঁচায় করে পাখি নিয়ে এল। জন্মদিনের প্রেজেন্টেশন!"

"তারপর?" গৌতম প্রশ্ন করল, "সেটা কি খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেল নাকি?"

"পালিয়ে গেলে তো পালিয়ে গেল, হয়ে যেত!" সুব্রতার যেন আক্ষেপ শোনা গেল।

"না। পালায়নি।" সজল কোচের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমি সব বলছি শোনো।" সব কথা, প্রত্যেকের মতামত, সুখির পাখির ওপর ভালবাসায় পড়াশোনার ক্ষতি—সব শুনল গৌতম।

"সে কী? এতে ভাবনার কি আছে জেঠিমা?" গৌতম কীরকম উৎসাহী হয়ে উঠল, "ছোটদের সঙ্গে পশুপাখির ভাব থাকাটা তো ভীষণ জরুরি। যেসব বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েরা থাকে সেখানে হয় কুকুরছানা নয় খরগোশ বা বেড়াল, বেজি, পাখি, যা পাওয়া যায় রাখতে হয়। এর একটা চমৎকার ইমপ্যাক্ট আছে! সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার। ছেলেমেয়েরা ভালবাসতে শেখে তাদের চারপাশের জগৎটাকে, তাদের জ্ঞানও বাড়ে এসব পশুপাখির স্বভাব-চরিত্র-রুচি ইত্যাদি নিয়ে। অন্তত স্বার্থপর হয় না!"

"তুমি বাপু অন্যরকম কথা বলছ যে!" সুব্রতা আবার ধাঁধায় পড়ে গেল।

সজল কিছুটা নিশ্চিন্ত হল, "আমারও তো তাই মত। কিন্তু কী জানি, আজকালকার সব চারদিকের ব্যাপার। প্রবলেম একটা আছেই লেগে—"

"ওকে!" গৌতম বারান্দায় গিয়ে পাখিটাকে দেখল। "খুব বেশি বয়স নয় মনে হচ্ছে। জানো জেঠিমা, আমাদের ওখানে, মানে মিউজিয়ামে একটা 'পেট ক্লাব' আছে, মানে সেই ক্লাবে পোষা পশুপাখি থাকে আর তাদের মেম্বার হচ্ছে ছোট ছেলেমেয়েরা। সেখানে মাঝেমধ্যেই সেইসব ছোটদের পশুপাখিকে ক'দিনের জন্যে তাদের, মানে মেম্বারদের বাড়িতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়; আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তা, দেখি কী করা যায়!"

"কী করবে তুমি বলো তো!" সুখি এতক্ষণে মুখ খুলল।

"দাঁড়া, ভেবে দেখি। কথাও বলতে হবে আমাদের বসের সঙ্গে। পেট ক্লাবের সঙ্গেও। কিচ্ছু ভাবিস না রে, তোর পাখি তোরই থাকবে। এই আর কী, মাঝে-মাঝে আমাদের ওখানে বেড়াতে যাবে—রাজি?"

"উরে বাবা, মন খারাপ করবে!" সুখি প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি!

"বাঃ! তুই দেখ, খাঁচাটায় সারাক্ষণ বন্ধ থাকে পাখিটা। শুধু খায় আর পালাবার পথ খোঁজে—তাই না? তার চেয়ে বরং, মাঝেমধ্যে ওর বন্ধুদের সঙ্গে কাটিয়ে আসবে একজায়গায়। সেটা কি তোর ভাল লাগবে না?"

সুখির চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

তিনদিন পরে সুখি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখল, খাঁচাটা আছে। ছোলাভর্তি বাটি আছে। জলও দেওয়া আছে। শুধু মদনগৌরী নেই।

"মা!" সুখি খুব জোরে ডাকতে গেল। যেন জোর পেল না। একবুক কান্না এসে আটকে দিল গলাটাকে। সুব্রতা শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি। "কী হয়েছে?"

সুখি শুধু বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখল।

"ও, এই ব্যাপার!" সুব্রতা মেয়েকে জড়িয়ে ধরল, "কী হয়েছে? ওই তো আছে। আয়, আমার সঙ্গে আয়।"

সুখি খাঁচাটার কাছে গেল। মা খাঁচাটাকে নামিয়ে আনলেন। সুখি দেখল, খাঁচার মধ্যে মাঝখানের ডালে কাত করা আছে একটা রঙিন ছবি—ঠিক তার পাখিটাই যেন। সেরকমই লাল বাঁকা ঠোঁট, সবুজ শরীর, গলার কাছে লাল-হলুদের বর্ডার। সঙ্গে একটা চিঠিও আছে।

সুব্রতাই দরজা খুলে চিঠিটা বের করে সুখির হাতে দিল। পেট ক্লাব থেকে লেখা আছে, "তোমার পাখিটা এখানে তার সঙ্গীসাথি পেয়ে বড় খুশিতে আছে। তোমার যখনই ইচ্ছে হবে, দেখতে আসবে। নিয়ে যেতেও পারো কিছুদিনের জন্য ইচ্ছে করলে" ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সুখির মনটা যেন হালকা হয়ে গেল। কিছুটা দুঃখ রয়েও গেল। "মা, সে আর আসতে চাইবে থোড়াই!"

"কেন আসবে না? দেখিস, সে তোকে চিনতেও পারবে। থাক। খাঁচাটা এখন থাক। যখন আসবে তখন নিজের ঘরেই কাটিয়ে যাবে।"

তবু ঘুরেফিরে সুখির চোখ চলে যায় খালি খাঁচাটার দিকে। যেন কতদিনের সঙ্গী, হঠাৎ ছেড়ে চলে গেছে। এখন আদর করবে কাকে? গান শোনাবে কাকে? সুখির মাঝে-মাঝেই চারদিকটা ফাঁকা লাগে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

খাঁটি দুধের বাড়ি

আবুল বাশার

আবিরমামার ছেলেবেলা কেটেছে নগরে। নগর মানে শহর নয় মোটে। নগর হল গ্রাম। অজ গ্রাম। রাঢ়বাংলার একটি পুরনো গ্রামের নাম নগর। সেই গ্রামে ছিল আবিরমামার দাদুর বাড়ি। মামা দাদুর বাড়ি থেকে নগরের মাইনর স্কুলে শৈশবে পড়াশোনা করতেন। মাইনর স্কুল বলতে ওখানে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত লেখাপড়া করা যেত। মাইনর স্কুলটা পরে জুনিয়ার হাই হয়েছিল। মামা তার আগেই নগর ছেড়ে চলে আসেন।

নগরের মাইনর স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন জলধর সরকার। তখনকার দিনে শিক্ষকদের 'পণ্ডিত' বলে ডাকা হত। যেমন জলধর সরকারকে ডাকা হত জলধর – পণ্ডিত। হেডমাস্টারমশাই ছিলেন হেড-পণ্ডিত। তারপর দ্বিতীয় যিনি, তিনি হলেন সেকেন্ড-পণ্ডিত। তারপর থার্ড-পণ্ডিত। এখনকার যেমন হেডসার, তখনকার তেমনই হেড-পণ্ডিত।

পদমর্যাদার দিক থেকে জলধর ছিলেন সেকেন্ড-পণ্ডিত। গ্রামের মানুষ তাঁকে জলধর-পণ্ডিত বলেই জানত। মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী। গরিব হলেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রখর। শোনা যায়, সারাজীবনে তিনি কখনও একটি মিথ্যা কথাও বলেননি।

স্কুলের সামান্য মাইনে, তাই দিয়ে সংসার চালানো ছিল দায়। সেইজন্য তিনি একটি গাভী পুষেছিলেন। সেই লাল রঙের গাভীটির পালাপোষার দায়িত্ব ছিল পণ্ডিতের স্ত্রী কমলার ওপর। কমলা দুধ বিক্রি করতেন। আবিরমামা ছেলেবেলায় জলধর-পণ্ডিতের কাছে অঙ্ক শিখেছিলেন। মামার দাদু রোজ ভোরে মামাকে পণ্ডিতের বাড়ি গণিত শেখাতে পাঠাতেন।

এক ঢিলে দুই পাখি মারতে হত আবিরমামাকে। স্কুল যাওয়ার আগে জলধর-পণ্ডিতের কাছে গণিত শেখা এবং কমলাকাকিমার কাছ থেকে ঘটিতে করে দুধ নিয়ে আসা! এক হাত দিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরা বই, অন্য হাতে দড়ি দিয়ে কাঁধে বাঁধা ঝুলন্ত ঘটি— ভোরবেলার এই দৃশ্য মামার চিরকাল মনে থাকবে।

কিন্তু গল্পটায় একটা ভূত আছে। নইলে আবিরমামা এই গল্প আমাদের শোনাবেন কেন!

মামা আমাকে বলেছিলেন, "বুঝলি চুনো, কোনও-কোনও মানুষের ভূত-বাতিক থাকে। সেটা কীরকম শুনবি?"

"বলোই না, শোনা যাক!"

আবিরমামা বললেন, "কোথাও কিছু নেই, অথচ হঠাৎ ভূত দেখে ফেলে কেউ-কেউ। দিনদুপুরে ভূত, রাতদুপুরে ভূত, সাঁঝের সেঁঝো ভূত, জ্যোৎস্নায় ভূত, অমাবস্যায় ভূত। সবসময় ভূত-ভূত না করলেই নয়! এটাকেই বলে ভূতের বাতিক।

"অঙ্ক কষাতে-কষাতে জলধর-পণ্ডিত একদিন আমাকে গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার কমলাকাকিমা আজকাল আবার ভূত দেখতে পাচ্ছেন, বুঝলে আবির! উঠোনের ওই কোণের বেলগাছে নাকি একটা মধুখেকো ভূত এসে জুটেছে।' বলে পণ্ডিত মানুষটি তাঁর কাঁচাপাকা ফুলো গোঁফের তলে বিষম একখানা উৎকট হাসি দিয়ে উঠলেন।

"সেই হাসির খকখক আওয়াজ শুনে কমলাকাকিমা উঠোনে হাতের গোবরজলের ন্যাতা থামিয়ে বলে উঠলেন, 'শোনো বাবা আবির, যা বলছি মন দিয়ে শোনো! খাঁটি একটা ভূত দেখা সৌভাগ্যের ব্যাপার। খাঁটি দুধ, খাঁটি মধু

আর খাঁটি ভূত, সবজায়গায় পাওয়া যায় না।'

"'হ্যাঁ কাকিমা!' বলে কাকিকে সমর্থনও করলাম। তারপর পণ্ডিত-পত্নী কমলার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

"কমলাকাকিমা সামান্য দম নিয়ে বললেন, ' আগে বলো, তামাম নগরে কোথায় তোমরা খাঁটি দুধের জন্য আসো, কোথা পাও খাঁটি দুধ?'

"'আজ্ঞে কাকিমা, খাঁটি দুধ আর কোথায়, দাদু বলেন, লাল গাই ছাড়া কেউই খাঁটি দুধ দেয় না। তুমি তো চোখের সামনে দুয়ে ঘটি ভরে দাও! কত ফেনা হয়?'

"'ফেনা হবে না! দুধ যদি খাঁটি হয়, ফেনা হতে বাধ্য। সেই ফেনা তো আমরা লুকোই না। যারা লুকোয় তাদের দুধ দুইবার ভাঁড় আলাদা। পাত্র ঠিক না থাকলে দুধও ঠিক থাকবে না, এই তোমায় বলে দিলাম। তোমারই চোখের সামনে তারা দুইবে, কিন্তু ধরতেই পারবে না কখন জল মেশানো হল!'

"'কখন আজ্ঞে, কাকিমা?'

"'ভাঁড়ের মুখ যদি মানুষের মুখের মতো ছোট হয়, তা হলে তার পেটে কী আছে বোঝা যাবে না। গোরুর বাঁট ধোয়ার জল রইল ভাঁড়ের পেটে, দুইবার আগে তোমার চোখের সামনে সেই ধোয়া জল পাত্র উপুড় করে ফেলে দেওয়া হল না, তারপর ভাঁড়ের গলা উপচে ফেনা উঠে এল, তুমি ফেনা দেখে ভাবলে দুধ খাঁটি। অঙ্কটা বুঝলে।'

"'হ্যাঁ কাকিমা, বুঝেছি। ভাঁড়ের গলা যদি সরু হয়...'

"'হ্যাঁ, মানুষের মতো যদি হয়! মানুষ বললে মানুষের অপমান করা হয়, পণ্ডিত রাগ করবেন তাতে। বলি কি, এইরকম ভাঁড়, গলা-সরু ভাঁড় কবে থেকে চালু হল যেন! বকের মতোও বলা যায় না, তাতে হয় কি, সরু জিনিসটাকে বাড়াবাড়ি রকম সরু দেখায়। তবে মোটামুটি গলাওলা ভাঁড়ই হল প্রথম দুধে জল মেশানোর কায়দা। এটা জানতে?'

"'অবাক কাণ্ড কাকি!'

"'তবেই বোঝো! তুমি জানতে না। আর-একটু খুঁটিয়ে বলি তা হলে?'

"'হ্যাঁ, বলো!'

"জলধর-পণ্ডিত আবার ফুলো মুখ-উপচানো গোঁফের তলায় হেসে উঠলেন। কেননা তাঁর কাছেও কাকিমার কথা বোধ হয় বেশ উপভোগ্য ঠেকছিল।

"কমলাকাকি বললেন, 'বাঁট ধোয়ার জল সরু-গলা পাত্রের তলায় গোপন রইল, কেমন? দিনে-দিনে সেই জলের পরিমাণ বাড়ানো দিয়ে দুধে জল মেশানোর চালিয়াতিটা চোখের ওপর দিয়েই করেছে মানুষ। এইজন্য তোমাকে দেখতে হবে পাত্রটা কেমন। এবং সরু গলার পাত্রে কে বা কারা দুধ দুইতে পারে।'

"'সবাই পারে না?'

"'না। আমি দুইছি কিসে! পেতলের ছোট বালতিতে। বালতির কোনও গলা নেই, সবটাই পেট। মুখ-খোলা। আগে দুইতাম পেতলের ডাবরে। হাত পেকে গেলে সরু গলাতেও পারা যায়। কিন্তু সেটাও অভ্যেস করতে হয়। পিঠ দিয়ে বেড়ে সরু লম্বা ভাঁড়টাকে দু'পায়ের ফাঁকে ধরে গোপন করতে হবে, কারণ তাতে লুকনো জল আছে।'

"'অবাক কাণ্ড!'

"'আবার তুমি 'অবাক কাণ্ড' বললে আবির! শোনো তা হলে, আরও একটু বলি। খালি পাত্রে দুধ চোঁ করার শব্দ আর জলের ওপর সরু-গলার পাত্রে চোঁ করার শব্দ আলাদা।'

"'আজ্ঞে!'

"'সব জিনিসকেই লক্ষণ মিলিয়ে বুঝতে হয়। আজকাল কেন, কোনও জিনিসই কোনওকালে চোখ-কান-নাক বুজে গ্রহণ করতে নেই। শোনো বলি, আমার কাছে কুমোরপাড়ার গগন দুধের ভাঁড় বেচতে এসেছিল, আমি ওকে তাড়িয়েছি। বলেছি, এখানে ও-পাত্র চলবে না। উঠোনের সুর্মা ফজলিগাছে উনি আছেন। চেয়ে-চেয়ে সবই দেখছেন।'

"'উনি! উনিটা কে কাকিমা?'

"'শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, এই তিনটে লক্ষণ দেখে তবেই বুঝবে, সেই তিনিই এসেছেন।'

"' কে তিনি? বলো কাকিমা, কে তিনি, কোথায় তিনি? ভারী ধন্দে ফেললে তো তুমি!' বলে একফাঁকে এক ঝলক জলধর-পণ্ডিতের গোঁফের দিকে চাইলাম। দেখি, বিস্ময়ের চাপে সেই গোঁফ বেশ খানিকটা ঝুলে পড়েছে একপাশে কাত হয়ে।

"কাকিমা বললেন, 'এতে ধন্দের কী আছে আবির! তোমাকে খুব সাফ কথা বলছি। প্রথমেই শব্দ পাওয়া গেল।' বলেই কমলাকাকি খানিকক্ষণ ন্যাতা বোলালেন উঠোনে। হাত থামিয়ে বেলগাছের চুড়োর দিকে চেয়ে কিছুটা বিড়বিড় করলেন, কপালে বাঁ হাতটা ঠেকালেন চকিত প্রণামে বার-দুই।

"আবার বলে উঠলেন, 'শব্দই পাওয়া গেল প্রথমে!'

"'আজ্ঞে!'

"'ডানা মুড়ে ডালের ওপর বসার শব্দ, কাঁটায় পালক আটকে গিয়ে ফরফর করে উঠল।'

"'বলছ কী কাকি! আপনি কিছু বুঝছেন সার?'

"জলধর-পণ্ডিত গম্ভীর লয়ে মাথা নাড়েন। অর্থাৎ তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। সেই মাথা নাড়া দেখে রহস্যকে আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাই করেন কমলাকাকি। বলে ওঠেন, 'তারপর এল গন্ধ। ডানায় নীল নদীর গন্ধ। জর্ডন নদীর গন্ধ, ফরাত নদীর ঘ্রাণ। প্যালেস্টাইনের যিবুষ-পাহাড়ের সুর্মার গন্ধ আর মিদিয়নের আতর। বিশ্বাস করো, তারপরই স্পর্শ করল আমাকে, গা কেমন শিউরে উঠল। পা ভারী হয়ে গেল।'

"'তারপর? তা হলে তুমি রাজা সলোমনের গল্প বেশ মন দিয়েই পড়েছ বুঝতে পারছি।'

"'হ্যাঁ, প্যালেস্টাইনের প্রাচীন রাজা সলোমনের পোষা জেন ছিল কয়েক সহস্র। প্রথমে আমি জেন কাকে বলে তাই-ই জানতাম না আবির। গল্প পড়ে বুঝতে পারা গেল ডানাওলা দৈত্যগুলোই হচ্ছে জেন।'

"এই অবধি শুনে জলধর-পণ্ডিত হাহা করে গোঁফ নড়িয়ে অট্টহাসি করে উঠলেন। তারপর কেবলই বলতে থাকলেন, 'মন্দ না। মন্দ না। ফজলি গাছে জেনের বাসা। বাদশা জেন নাকি জেনের বাদশা, কমলা? মন্দ না। মন্দ না।'

"কমলাকাকি সামান্য মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'মন্দই বা কেন হবে! কোন দুঃখে হবে! সলোমনের জেন কখনও মন্দ হতে পারে! আমি বলছি উনি এসেছেন। কেন এসেছেন, তা-ও বলছি!'

"এবার কমলাকাকি কথা বলার আগেই এই সকালে শীতের শেষাশেষি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। একটা কালোমতো মেঘ কোথা থেকে উড়ে এসে ফজলিগাছের মাথায় লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে চড়াত করে উঠল ভয়ঙ্কর ধমকের মতো। ঝরঝর করে ক'ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল, [illegible]র ঢাকঢোল পেটাতে পেটা[illegible] বাজিয়ে মেঘ দিগন্তের

দিকে সরে চলে গেল। মেঘের ডাকে পিলে চমকে গেছে, বজ্রের আলোয় চোখ এমন ধাঁধিয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে মাথার ভেতরটা কেমন শূন্য খাঁ-খাঁ করছে আর দৃষ্টিতে মরুভূমির কুয়াশা।

"'ও মাগো,' বলে ন্যাতা হাতে কাকি উঠোনেই চিত হয়ে পড়ে গেলেন।

"বুঝলি চুনো। আমারই দোষ। কাকিমার যে ভূতের বাতিক হয়েছিল, তার জন্য আমার ভূমিকা কিছু কম ছিল না। আমিই নগরে জনকল্যাণ ক্লাবের পাঠাগার থেকে নানা জাতের ভূতের বই ইসু করিয়ে আনতাম। কাকিকে দিতাম। সলোমনের জেন আসলে পুরনো প্যালেস্টাইনের রাজকাহিনীর অন্তর্গত। রাজা সলোমন ছিলেন সুবিচারক এবং জেনের বাদশা। তিনি যখন জেরুজালেমে ইলোহের মন্দির তৈরি করেন তখন এই জেনেরা শ্রমদান করে, অর্থাৎ খেটে দেয়। এই জেনেরা তামার খনিতে অনেক সময় বেগার খেটে দিয়েছে। 'বেগার' কথাটা সেই কিং সলোমনের পিরিয়ড থেকেই চলে আসছে। বলে দিই, ইলোহে ছিলেন সলোমনের নিয়ন্তা।" বলেই আবিরমামা নগরের ছেলেবেলার কাহিনীতে ফিরে গেলেন। এই কাহিনীর তিনিই কথক-নায়ক।

"হল কী, জেনটা তা হলে প্যালেস্টাইন থেকে আসা। সলোমনের জেন মরে এ-দেশে এসেছে। এসেছে কোথায়? কমলাকাকিমার উঠোনের ফজলিগাছে। পাখা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেছে। কিন্তু এখানেই এল কেন?

"বাজের চড়াত যেই হল, অমনই রোঁয়া ফুলে উঠল পাহাড়ি মৌমাছির চাকে। পাহাড়ি মৌমাছির চক্রটা ছিল আমগাছের ডালে। কাকিমার মনে হত, ওই মধুচক্রের মৌমাছি এখানকার নয়। কারণ এইধরনের জাম-কালো হোঁতকা মোটা-মোটা মৌমাছি নগরের মৌমাছি কিছুতেই নয়। চাকের দিকে যত চাইবে তোমার কেমন রোমাঞ্চ হবে। ইয়া বড় চাক। আষাঢ়ের বর্ষাজল-খাওয়া জামের মতো টসটস করছে।

"একদিন ফটফটে পূর্ণিমা রাতে চাকের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কমলাকাকি। হঠাৎ ঝরঝর করে মধু ঝরে পড়ল। জিভ পেতে দিলেন। স্বাদ কী বলব, সাধারণ মধুর চেয়ে দশগুণ মিষ্ট আর তীব্র। মধুও ভারী। জিভটাকে এমন করে জড়িয়ে নিল যে, গালে জিভে টাকরায় আলজিহ্বায় সব কেমন মেখে গেল, আঠায় আর মুখ খুলতেই চায় না। মুখ একেবারে বুজে গিয়েছে। তো, এই হল আরব মরুভূমি সিনয় পাহাড়ের মধু বা ধরো পারন প্রান্তরের কোনও পাহাড়ি চাক কিংবা গিলিয়দ পাহাড়ের জিনিস।

"'কাকিমা বাজের ডাক দিগন্তের দিকে চলে গেলে বেশ কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখলে আবির, ওই গাছে ইলোহের বাজ ডেকে গেল। প্যালেস্টাইন ছিল মধুদুধের দেশ। সব খাঁটি। সেখানে দুধ আর মধুর নহর বইত। পুন্নিমে রাতে চেখে দেখেছি, প্যালেস্টাইনের গাঢ় মসিনার গন্ধ, মসিনা-মধু! ছুটির দিন দুপুরে এসো আবির, দেব। খেতে দেব।'

"'তুমি কী বলছ কাকিমা!'

"'হ্যাঁ বাছা! দুধে জল মেশানোর অঙ্কটা যখন পণ্ডিতমশাই করাবেন, গলা খাটো কোরো বাপু, নইলে জেন শুনতে পাবে।' বলে কমলাকাকিমা গভীর মনোযোগে উঠোন নিকোতে শুরু করলেন। দেখলাম, জলধর পণ্ডিতের মুখটা কেমন হাঁ হয়ে গেছে। গোঁফজোড়া চুপসে পড়েছে মুখের গহ্বরে। আমার কেমন অসোয়াস্তি হচ্ছিল। অঙ্কটার ওপর কেমন ভয়ানক ক্রোধ হচ্ছিল।

"কেমন কাঁপাকাঁপা গলায় সেকেন্ড পণ্ডিত অপরাধীর ভঙ্গিতে বললেন, 'সেই কবে থেকে মানুষ দুধে জল মেশাচ্ছে কমলা! সন্ত কবিরের একটি দোহায় খাঁটি দুধের অনাদরের কথা আছে। কবির লক্ষ করেছিলেন, নগরের পথে-পথে, গলিতে 'গোরস' অর্থাৎ দুধ হেঁকে ফিরছে, অথচ বাজে নেশার জিনিস মদিরা ঠাঁইবসা দোকান থেকেই উড়ে যাচ্ছে। গলিতে গাই আর ছাগল-মাকে গলতানি ধরে টেনে নিয়ে ফিরতে আর 'দুধ নেবে গো, খাঁটি দুধ' বলে মানুষকে হাঁকতে শুনেছিলেন কবির। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, মানুষ বাড়ি বয়ে এসে দুধ নিয়ে যায়। দুর্ভাগ্য আমার, বাড়ি বয়ে এসে ছাত্র দুধে জল মেশানো অঙ্ক শিখে যাচ্ছে। সাবধান কমলা, জেনটা তা হলে সত্যিই চাকটা পাহারা দিয়ে বসে রয়েছে।'

"'ওইজন্যেই তো উনি এসেছেন গো! খাঁটি দুধ আর খাঁটি মধু খাবেন বলে। না হলে গরিব পণ্ডিতের বাড়িতে খোবানি, খর্জুর কিছুই তো নেই, কেন আসবেন বলো! শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে বাদশার জেনকে চিনতে হবে। এই জেনটাই ছিল বাদশার মন্দির গড়ার সর্দার-মিস্ত্রি।' বলে কমলাকাকিমা চুপ করলেন।

"সেই থেকে যখনই ভোরে উঠোনের ফজলিগাছটা পেরিয়ে পণ্ডিতের বাড়ি পড়তে গেছি, মনে হয়েছে সত্যিই উনি গাছে অদৃশ্য ডানা মেলে চুপচাপ বসে রয়েছেন, এক মহাবৃদ্ধ জেন, সহস্র-সহস্র বৎসর তাঁর বয়স। মধু আর দুধ ছাড়া যিনি কিছুই আহার করেন না।

"কমলাকাকি ওঁকে বাটিতে করে রোজ সকালে দুধ খেতে দিতেন। ফজলিতলার গোড়ায় বাটিটা রেখে বলতেন, 'খেয়ে নিয়ো বাছা। গেরস্তের অকল্যাণ কোরো না। আমার ভগবতী যেন বেঁচে থাকে। আমার ছেলে পল্টু কলেজে পড়ছে, ও যেন পাশ করে আসে। দুধের সুনাম রক্ষা কোরো, আমিও কখনও দুধে জল মেশাই না।'

"জেন কি আর সত্যিই দুধ খেত! তবু কাকির মনে হত, জেনটা সত্যিই কিছুটা খেয়েছে। তারপর কমলা সরকার সেই বাটির দুধ পুকুরের জলে উৎসর্গ করে বলতেন, 'এঁটো জলে যাক।'

"জলধর – পণ্ডিত মাঝে-মাঝেই বলতেন, 'তোমার কাকিমা আসলে পাগল, আবির। ভূতের বাতিক। চাকের আকার-প্রকার দেখে আমারও কিন্তু ভয় করে! ওইগুলো সত্যি কি মৌমাছি, না কি অন্য কিছু! তবে মধু যে খাঁটি, গুড় মেশানো নয়, গন্ধে বোঝা যায়।'

"'আপনি তা হলে সার নিজেও গন্ধ পান!'

"'কিছু-কিঞ্চিৎ পাই বইকী! একদিন যেন রাত্রে ডানা ঝাপটানোও শুনেছি! দুধে জল মেশানো অঙ্কটা যেদিন তোমাকে কষালাম, সেই রাত্রে পাখার ঝাপট এই আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। ভয়ে কেমন সিঁটিয়ে গেলাম আমি।'

"'তাই নাকি সার?'

"'হ্যাঁ, আবির! তুমি কি শব্দ শোনো কিছু? দুধ পড়ার শব্দ, জলের ওপর চোঁ করে পড়ছে!'

"আমি চুপ করে গেলাম। একদিন ফজলিতলার উঠোন দিয়ে আসতে গিয়ে সেই শব্দ সত্যিই পেলাম। সরু-গলার ভাঁড়ের মধ্যে জলের ওপর দুধ পড়ছে তীব্রবেগে। হঠাৎ কেন যেন মনে হল, কমলাকাকিমা কি তা হলে দুধে জল দিচ্ছেন আজকাল?

"পল্টু একদিন কলেজ হস্টেল থেকে

বাড়ি এল। হস্টেল খরচের টাকা পণ্ডিত যথাসময়ে পাঠাতে পারেননি। অভাবের সংসার। এদিকে লাল গাইয়ের দুধ কমে গেছে। বাছুর যত বড় হয় দুধ তত কমে। তাই-ই তো স্বাভাবিক। দুধ কমতে থাকলে খাদকের সংখ্যা কমাতে হয়। লজ্জার মাথা খেয়ে পড়শি গেরস্তের বাড়ি গিয়ে বলে আসতে হয়, 'দুধের টান হচ্ছে গো, আর পারব না। ঘটি পাঠিয়ো না।'

"সবই বলে আসতে হয় কমলাকাকিকে। বলতেই যখন যেতে হয়, কাকির সেই মনের অবস্থা তখন কাকিই বোঝেন। আর কেউ বুঝবে না। লজ্জা করে, অভাবের তাড়নাও থাকে। তখনই তো গাছের জেনের কাছে কাকির পরীক্ষা। জেনটা তখন পাখা ফড়ফড় করে বেশি।

"পল্টুরই সামনে জলধর – পণ্ডিত সেদিন হঠাৎ ফস করে বলে ফেললেন মাথা থেকে ঘাসের আঁটি নামাতে নামাতে, 'দুধ যত কমে আসে, দুধ তত গাঢ় হয় কমলা।'

"'হয়। কিন্তু হঠাৎ এ-কথা ?'

"পণ্ডিত ঘাসের বোঝা টেনে এনেছেন মাঠ থেকে। আমরা লক্ষ করেছি, কী কষ্টের সেই ঘাস! মাথায় করে শিশির-কাদা-মাখা ঘাস টানা একজন পণ্ডিতের পক্ষে যত না লজ্জার, তার চেয়ে মেহনতের। কাদা – শিশিরের জলের সঙ্গে ঘাড় চুঁইয়ে নামে। কাঁধের চুলগুলো পলির জলের মতো সেঁতিয়ে ওঠে। বুকের চুলের ভেতর দিয়ে কাদা গড়ায়।

"পণ্ডিত ঘাস নিজেই জোগাড় করেন। দুধ যত কমে যেতে থাকে, পণ্ডিতের চোখে তত ভয় জাগে, অভাবের ভয়, অর্থকষ্টের তাড়া, তিনি ততই ভাল ঘাস জোগাড়ের চেষ্টা করেন। বেশি করে ঘাস দিতে চান লাল গাইয়ের মুখে। ঘাস ছাড়া অন্য দুধবৃদ্ধিকারক খাবার জোগাড় করার সাধ্য পণ্ডিতের নেই।

"সেই তিনিই সেদিন বিমূঢ় গলায় বলে ফেললেন, 'দুধ যত কমে আসে, দুধ তত গাঢ় হয়।'

"এই বাক্যটি শুনে কমলা সরকারের আজ কেমন খটকা লাগে। কথার গন্ধটি অন্যরকম যেন। জানা কথাই পণ্ডিত বলেছেন, অভাবে পড়ে সেই জানা অচেনা ঠেকল। সত্য কথাটাকে কমলা কাকির কেমন ভয় করল। আমগাছের চুড়োর দিকে এক নিমেষ চেয়েই তাঁর বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কেমন সিরসির করে উঠল সেই ঠাণ্ডা অনুভূতি।

"পণ্ডিত তা হলে জল মেশাতে বলছেন! কমলাকাকিমার মনে হল, আজ তিনি পণ্ডিতের সম্মান কী করে বাঁচাবেন! গাঢ় দুধে সামান্য জল মেশালে খাদক কিছুই ধরতে পারবে না। খাঁটি দুধের বাড়ির দুধকে সলোমনের ইলোহে পর্যন্ত কখনও সন্দেহ করেন না। জেন কি সে-কথা জানে না!

"হস্টেলের টাকা কোনওরকমে জোগাড় করা গেলেও পল্টুর হাতে দেওয়ার হাতখরচের মতো পাঁচটি টাকা কিছুতেই জোগাড় হচ্ছিল না।"

একদিন পরের ঘটনা। আবিরমামা সকালে ঘটি করে দুধ নিয়ে ফিরলেন। ছুটির দিন। রাত হয়েছিল। দশটা বেজে গেছে। আকাশে ফিনফোটা জ্যোৎস্না। একেবারে পাগল-করা জ্যোৎস্না যাকে বলে! এইসময় চাঁদের কিরণে চাকের পাহাড়ি মৌমাছি খুব মত্ত হয়। জামের মতো একটার গায়ে আর একটা ঠেলাঠেলি করে। তীব্র জ্যোৎস্নার সেই দৃশ্য যে কী, বোঝানো যায় না। একবার পণ্ডিত-বাড়ি ছুটে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করল আবিরমামার।

তখনই দোরের কাছে একজনকে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাড়ির লোক "কে গো" বলে হেঁকে উঠল। আসলে হেঁকেছে হেঁশেলের কাজের লোক মিনতিমাসি।

"আমি পল্টুর মা। পণ্ডিতের বউ গো!"

"ও, তুমি! কেন গো, কী হল!"

"হেঁশেলে ঝাঁপ দিচ্ছ বুঝি!"

"হ্যাঁ, বাছা!"

"আবিরকে একটু ডেকে দাও না মিনতিমাসি! আবিরের দাদু কি ঘুমিয়ে গেছেন!"

"ডেকে দিচ্ছি। দাদুর ঘুম কোথা? কেন?"

"উনি দুধ খেয়েছেন?"

"হ্যাঁ, খেয়েছেন। কেন?"

"আমার একটু উপকার করো না মাসি। পণ্ডিতের সম্মান বাঁচাও!"

মিনতিমাসি আর কাকিমার কথার মধ্যেই ঘর থেকে বাইরের উঠোনে ছুটে আসেন আবিরমামা। বাড়ির অন্যরাও আসে। এমনকী দাদুও বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছেন।

দাদুই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, "কে এসেছে?"

মিনতি জবাব দিল, "পণ্ডিতের বউ। আবিরকে চাইছে।"

কাকিমা এবার কান্নাধরা গলায় জানতে চাইলেন, "দাদুর কি দুধ খাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ বউমা!"

"আমাকে ক্ষমা করুন পিসে। মাসি, তুমি আবিরের দাদু, আমার পিসেকে এই দুধটুকু ফুটিয়ে দাও না! আমার চরিত্র চলে গেছে আবির। সব মৌমাছি উড়ে চলে যাচ্ছে!"

"সে কী!" বলে আবিরমামা চমকে উঠলেন।

কাকিমা বললেন, "আমি দুধে জল মিশিয়ে বেচেছি পিসে! সকালের দুধে জল ছিল! এ আমি কী করলাম! ছেলের হাতে পাঁচটা টাকা হাতখরচ দেব বলে পাশের বাড়ির ময়নার মায়ের কাছে গেলাম। ধার চাইলাম। ময়নার মা একপো দুধ চাইলে পিসে! তারপর কী যে হল মাথার মধ্যে!" বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন কমলাকাকিমা।

কাঁদতে-কাঁদতেই কাকি বললেন, "আবির দুধ নিয়ে চলে এল। ঘটি-মাপা দুধ। একঘটি একপো। তাতে যে লালি গাইয়ের বাঁটধোয়া জল রয়েছে ঠাকুর! পণ্ডিতের কথায় কেন বিশ্বাস করলাম, দুধ কমলে গাঢ় হয়! কেন করলাম আবির! আমার মৌমাছি সব উড়ে চলে গেল! তুমি দেখবে না?"

জ্যোৎস্নারাতে পাহাড়ি মৌমাছিরা সিনয় কি গিলিয়দ পাহাড়ের দিকে উড়ে গেল। মামা বললেন, "মৌমাছির সেই আশ্চর্য উড়ে যাওয়া চেয়ে-চেয়ে দেখেছি চুনো। সেই দৃশ্য যেমন ভুলিনি, কমলা কাকিমার সেই অদ্ভুত কান্নাও ভোলা যায় না।"

কাকি বলেছিলেন, "আবির চলে আসার পর পণ্ডিত পাগলের মতো মাঠে ঘাস আনতে গেছেন, সেই ঘাস লালিকে খাইয়ে অপেক্ষা করেছি পিসেমশাই! এই এতক্ষণে রাত দশটায় দুধ নামল। লালিকে কেঁদে-কেঁদে বললাম, 'তোমার সন্তানের জন্য দুধ নামাও ভগবতী, খাঁটি দুধ দাও মা!' তিনিই রক্ষে করলেন শেষে। কিন্তু..."

মামার নগর ছেড়ে আসার আগে ওই 'কিন্তু'টা চাক হয়ে ঝুলে ছিল ডালে। মৌমাছি ছিল না।

মামা বললেন, "সেই মৌমাছিরা আবার ফিরে আসবে নগরে।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

এখানেই থাকো

শ্যামলকান্তি দাশ

দুধে উবুচুবু নদীর ওপরে ছানামাখনের ধপধপে সাঁকো,
সুতাহাটা গিয়ে কাজ নেই আর, বুঝলে ঠাকুমা, এখানেই থাকো।
সেলাই-ফোঁড়াই যা-খুশি করো না, সারাদিন ঘরে আলো থইথই,
হাত বাড়ালেই চিনির কাগজ, হাত বাড়ালেই মিছরির বই।
মেঘের ওপাশে ফুটফুটে সাদা, রসগোল্লার তুলতুলে বাড়ি,
মিহিদানা দিয়ে বানানো রাস্তা, ছুটছে মারুতি কন্টেসা গাড়ি।
মধুর পুকুরে সোনার টুকরো, হিরে চমকায় আনাচেকানাচে,
দেখলেই চোখ ট্যারা হয়ে যাবে, চাঁদ দোল খায় ঘোড়ানিমগাছে।
হাত বাড়ালেই ধরা দেবে ছবি, হাত বাড়ালেই কবিতার মিল,
এটা তোমাদের সুতাহাটা নয়, চারদিকে কাক, চারদিকে চিল।
এখানে কোথাও দুষ্টুমি নেই, কোথাও হয় না বইখাতা চুরি,
চাইবার আগে পাতে পড়ে যায় টপাটপ করে ফল ও ফুলুরি।
স্বপ্নের মতো বৃষ্টির ফোঁটা, ঝমঝম করে দৌড়য় মাঠে,
হাওয়ার গন্ধ খুশির গন্ধ সারা দিনরাত জান্‌লা-কপাটে।
লোকজন কারও সাতে-পাঁচে নেই, যে যার মতন নাচছে গাইছে,
হাতে কাজ কম, কী আর করবে, ফাঁকা রাস্তায় নৌকো বাইছে।
সুতাহাটা গিয়ে কোনো লাভ নেই, বুঝলে ঠাকুমা, এখানেই থাকো,
সুনসান বাড়ি, খুশিমনে তুমি সারাদিন ধরে আলপনা আঁকো।
এখানেও পাবে পুজো-পুজো ভাব, যেই-না শিউলি কাশফুল ফোটে,
ঢ্যাম-কুড়-কুড় ঢাকের বাদ্যি, আকাশে-বাতাসে আগমনী ওঠে।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

কোকা-কোলা জানাচ্ছে
শারদ শুভেচ্ছা !

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার সনৎ জয়সূর্য যেভাবে ছেলেখেলা করছেন আজকের বিশ্বের সেরা বোলারদের নিয়ে, তাতে একদিনের ক্রিকেটের খোলনলচেই হয়তো বদলে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই তাঁর নামের পাশে লেখা হয়ে গেছে একদিনের ক্রিকেটের বেশ কয়েকটি বিশ্বরেকর্ড।

সব্যসাচী সরকার

জয়সূর্য যেন বিশ্বক্রিকেটের 'মানববোমা'

ফোটো : অলক মিত্র

এবার পুজোয় আপনার বাড়ীতেই হোক অসুর নিধন

“এটা ব্যাটিং হচ্ছে ? কে তোমাকে প্রতিটা বল তেড়ে-তেড়ে মারতে বলেছে ? বলের দিকে চোখ নেই, প্রতিটা বলে অন্ধের মতো ব্যাট চালাচ্ছ, ক্রিকেটটা এত সোজা হয়ে গেছে, অ্যাঁ ? এত সোজা ? বারবার বলছি, বল থেকে চোখ সরাবে না, তবু ? আর একবার আনাড়ির মতো ব্যাট চালালে নেট থেকে বের করে দেব।”

ক্যাপ্টেন চিৎকার করছে দেখে ছেলেটা দুটো বল পা বাড়িয়ে ডিফেন্স করল। লোকটা বলে কী ? নেট থেকে বের করে দেবে ? না, না, আর মারার দরকার নেই। বহু কষ্টে কলম্বো এসেছে সে, এখানে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারার কোনও মানেই হয় না। আসলে ব্যাট হাতে নিলেই যে তার অনেক দূরে বল পাঠাতে ইচ্ছে করে। ব্যাটের সঙ্গে বলের যোগাযোগ হওয়ার ওই শব্দ তাকে আদৌ স্বাভাবিক হতে দেয় না। বোলার ছুটে আসছে দেখলেই হাত নিশপিশ করে। শুধু-শুধু বোলারকে মাথায় চড়তে দেওয়ার কোনও মানে হয় ? কিন্তু কী করবে, নেটের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন। ওর খেলার

অরবিন্দ ডি সিলভা ফোটো : রাসবিহারী দাশ

একদিনের ক্রিকেটে জয়সূর্য (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়) এখন সবচেয়ে আলোচিত নাম ফোটো : তপন দাশ

অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের সমন্বয় : অর্জুন রণতুঙ্গা (ডান দিকে) ও হাসান তিলকরত্নে

ফোটো : কমল ভুঁইয়া

ভঙ্গি একদৃষ্টে লক্ষ করে যাচ্ছে। আরও গোটাচারেক বল খেলে দেওয়ার পর আবার ক্যাপ্টেনের হুঙ্কার, "অ্যাই ছেলে, তোমার মাথায় কি কিচ্ছু ঢোকে না ? তোমাকে প্রতিটা বল ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলতে বলা হয়েছে ? আগের বলটা হাফভলি পড়ল আর তা-ও তুমি ড্রাইভ করলে না ? বল দেখে খেলতে বলেছি বলে হাফভলি মারবে না ? ছেড়ে দেবে ?"

অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। বুঝে উঠতে পারছে না, ঠিক কী করা উচিত। কী করে দেখালে ক্যাপ্টেনের দাঁত খিঁচোনো একটু বন্ধ হবে। ক্যাপ্টেন কিন্তু এগিয়ে আসছে না তার দিকে। বরং বোলিং রানআপের দিকে যাচ্ছে রুমেশ। রুমেশ রত্নায়েকে। শ্রীলঙ্কার এক নম্বর বোলার। রুমেশ রানআপে পৌঁছে গেছে দেখে ক্যাপ্টেন ফিরল ছেলেটার দিকে। "ক্লাব বোলারদের পেয়ে খুব ঠ্যাঙানি হচ্ছিল—নাও, রুমেশকে খেলো। ফ্রন্টফুটে এসে লিফ্‌ট করে বাইরে ফেলতে পারবে ? মনে রেখো, রুমেশ আজকাল বলে-বলে বুক পর্যন্ত লিফ্‌ট পাচ্ছে। দেখো চোয়াল-টোয়াল ভেঙো না আবার।"

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে খ্যাকখ্যাক করে হাসছে কয়েকজন। অত্যুৎসাহী কিছু স্কুল-ছাত্র প্র্যাকটিস দেখতে এসেছে সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে। খুব বেশি ভিড় নেই, কিন্তু সবাই হাঁ করে দেখছে কালো ছেলেটাকে। রোগাটে গড়ন, মাথার সামনের দিকটা ১৯-২০ বছরেই ফাঁকা হয়ে টাক পড়ে গেছে। খুদে-খুদে দুটো চোখে অপরাধী-অপরাধী ভাব। একজন বলল, "রুমেশ এবার ওকে খাবে। খালি মাথায় ব্যাট করছে ছেলেটা, মুণ্ডুটা মাঠে রেখে না বাড়ি ফিরতে হয় !"

সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবের মাঠের প্র্যাকটিস পিচটা বেশ শক্ত। বল পড়ে ব্যাটে আসে। রুমেশ রানআপে দাঁড়িয়ে বলে থুতু মাখাচ্ছে দেখে স্টান্স নিল ছেলেটা। ন্যাটা ব্যাটস্‌ম্যান, কিন্তু স্টান্সটা একেবারেই ভাল না। কনুইটা তেরছাভাবে মিড উইকেটের দিকে মুখ করে আছে। রুমেশ প্রথম বলটা ঠুকে দিয়েছে, শর্টপিচ। পেছনের পায়ে ব্যালান্স করে নিয়ে সপাটে হুক করল ছেলেটা। বল নেটে ধাক্কা খেয়ে ফিরল। নেট না থাকলে নির্ঘাত ওভার বাউন্ডারি। পরের চারটে বলেও একই গল্প। যা ফেলছে রুমেশ, সব বলে ডেলিভারির আগেই স্টেপ আউট করছে ছেলেটা। তারপর অবলীলায় তুলে দিচ্ছে এদিক-ওদিক। আর কী প্রচণ্ড জোর এক-একটা স্ট্রোকে। ছেলেটার অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রতিটা স্ট্রোকের পরই সে লাজুকভাবে একবার দেখে নিচ্ছে ক্যাপ্টেনের মুখ। এই বুঝি আবার বকুনি শুরু হল।

বকুনি তো দূরের কথা, ক্যাপ্টেন ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে, তার হাতে কী জিনিস চলে এসেছে। আধঘণ্টার মধ্যে দর্শকরা দেখল, ক্যাপ্টেন ওই টাকমাথা ছেলেটার ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে।

বছর-দুই আগে শ্রীলঙ্কার ভারত সফরের সময় হোটেলে বসে এই গল্পটা বলার

আত্মবিশ্বাস আর অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাওয়ার প্রবল ইচ্ছের নাম জয়সূর্য ফোটো : অশোক মজুমদার
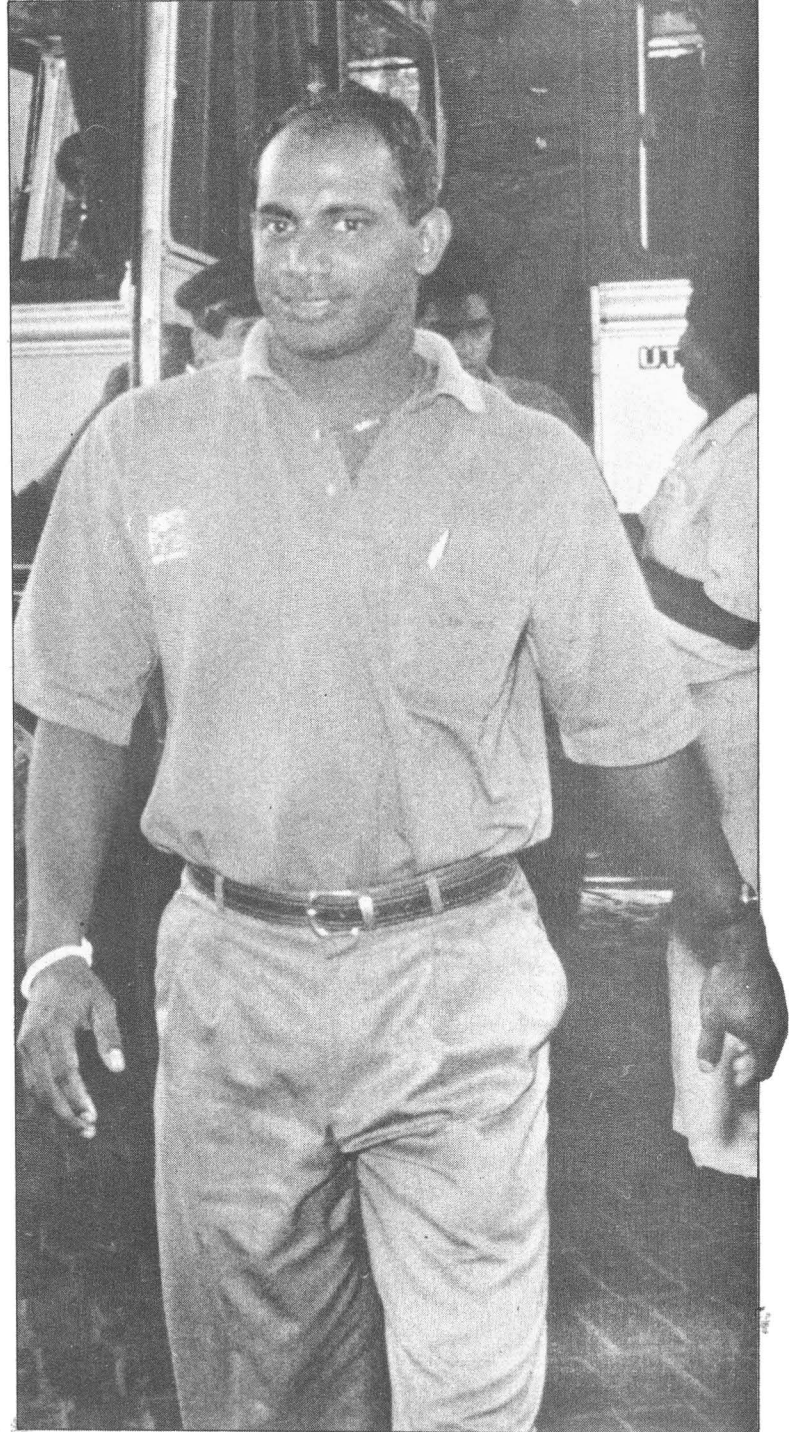
সময়ও খুব আশাবাদী লাগেনি রুমেশ রত্নায়েকে-কে। মনে আছে, টাকমাথা জয়সূর্য আর ক্যাপ্টেন রণতুঙ্গার গল্পটা বলেই বলেছিলেন, "রণতুঙ্গা এত করল ছেলেটার জন্য, তবু ছেলেটা দেখুন ক্লিক করল না। নিজে পেস বল করি বলে জানি, সনৎ-এর মধ্যে বল আগে দেখে ফেলার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। এত ভাল 'আইসাইট' আমি অন্য কোনও ক্রিকেটারের মধ্যে দেখিনি। সিরিয়াসনেসের অভাবের জন্য কিছু করতে পারছে না।"

আর এই সেদিন চণ্ডীগড়ে বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল চলার সময় যখন সনৎ তেরান জয়সূর্যকে 'প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট' করে দেওয়া হল, মনে পড়ল রুমেশ রত্নায়েকের মুখ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাঁর সেই বক্তব্য, "সিরিয়াসনেসের অভাব। সেজন্যই ছেলেটা কিছু করতে পারছে না।" বিশ্বকাপে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট, তারপরই সিঙ্গার কাপে একের পর এক বিশ্বরেকর্ডসহ ম্যান অব দ্য সিরিজ—সনৎ জয়সূর্য কী করে ফেলেছেন, আমরা জানি! এখন জয়সূর্য মানেই বিশ্বক্রিকেটের 'মানববোমা'। ব্যাট হাতে ক্রিজে এলেই বিস্ফোরণ। আমরা যারা ক্রিকেট নিয়ে লেখালিখি করি, বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরও অনেককে দেখেছি, নাক সিঁটকে বলছেন, "লাক ভাল ছিল বলে বিশ্বকাপে পার পেয়ে গেছে। বেশিদিন এই জয়সূর্য চলবে না।" চলেছে, হইহই করে চলেছে। ৬৫ বলে ১৩৪, ২৮ বলে ৭৬, এক ওভারে ৩০ রান! চোখ বুজে লিখে ফেলা যায়, ক্রিকেট নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসলেও নায়কের এইসব

আছে অবিশ্বাস্য সব স্ট্রোক নেওয়ার ক্ষমতা

ক্রিকেটকে বর্ণময় করে তোলে এসব শট
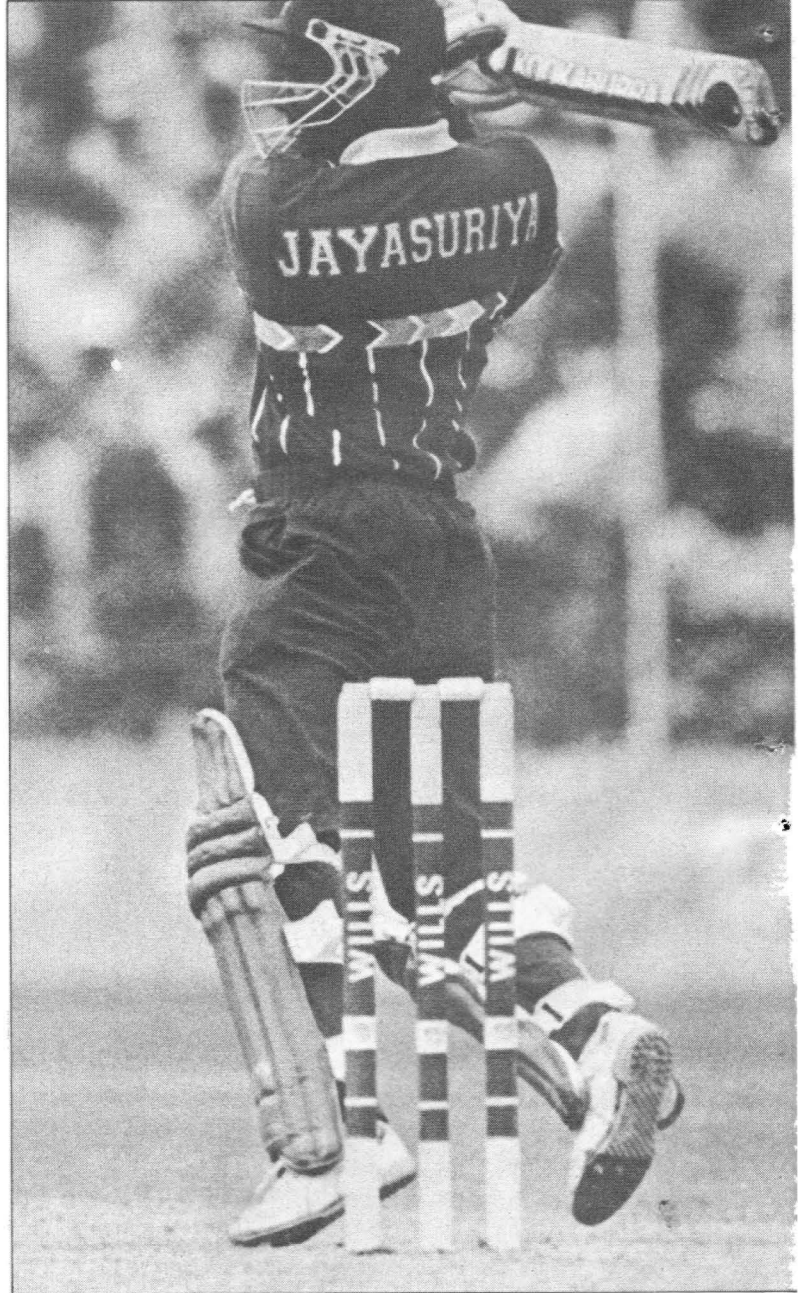
পারফরম্যান্স লেখা সম্ভব হত না কোনও লেখকের পক্ষে। কারণ সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। লোকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিত।
অথচ গত বছরের ডিসেম্বরেও আর-দশটা মাঝারিমানের ক্রিকেটারের সঙ্গে জয়সূর্যের কোনও তফাত ছিল না। ফাইভ বা সিক্স ডাউনে নেমে বেশ তেড়েফুঁড়ে মারতে পারেন, বাঁ হাতে অর্থোডক্স স্পিনটা খারাপ নয়। খুব অল্পকথায় এই ছিলেন জয়সূর্য। তা হলে তফাতটা কোথায় হয়ে গেল ? রাতারাতি কোন দৈত্য ভর করল জয়সূর্যের ওপর ?

৬৫ বলে ১৩৪, ২৮ বলে ৭৬, এক ওভারে ৩০ রান ! চোখ বুজে লিখে ফেলা যায়, ক্রিকেট নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসলেও নায়কের এইসব পারফরম্যান্স লেখা সম্ভব হত না কোনও লেখকের পক্ষে।

আসলে দৈত্যটা ছেলেবেলা থেকেই ছিল। চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে ছিল ছেলেটার মধ্যে। ছেলেটা জানত না, ওর বাবা-মা জানতেন না। কিন্তু টের পেত কেউ-কেউ। মাতারা-র ধীবররা। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে মাতারা একটা ছোট্ট মাছ ধরার বন্দর। সাতজন্মে এখান থেকে কেউ জাতীয় দলে খেলা তো দূরের কথা, ঘরোয়া ক্রিকেটেও নাম-টাম করেনি। ছেলেটারও করার কথা ছিল না। বাবা কবে কলম্বো থেকে একটা কাঠের ব্যাট এনে দিয়েছেন, স্কুল ছুটির পরই চলত বালির ওপর দাপাদাপি। কখনও রবারের বল, কখনও স্রেফ ইটের ঢেলা। সনতের সমস্যা ছিল, এত জোরে বল মারত সে, প্রায়ই বল গিয়ে পড়ত সমুদ্রে। বল হারানো মানেই যে বন্ধুদের কাছে দোষী হয়ে যাওয়া। কাজেই বেশিরভাগ দিনই বাবার কাছ থেকে পয়সা জোগাড় করে বল কিনতে হত তাকে। যখন অন্ধকার আস্তে-আস্তে নামতে শুরু করত, ঘরে ফিরতে শুরু করত মাছের ট্রলিগুলো, ধীবররা সনৎকে নিয়ে টানাটানি শুরু করত। কী করে যেন ওরা জেনে ফেলেছিল, এই ছেলেটার চোখ দুটো সাঙ্ঘাতিক। অনেক দূরের জিনিস দূরবিন ছাড়াও দেখতে পায়। পারে দাঁড়িয়ে সনৎকে বলতে হত, ক'টা ট্রলি ফিরে আসছে, কোনটা বা একটু পিছিয়ে পড়েছে।
বিশ্বকাপের সময় ভারত-শ্রীলঙ্কা গ্রুপ লিগের ম্যাচে জয়সূর্য যখন মনোজ প্রভাকরের কেরিয়ার শেষ করে দিচ্ছেন, প্রেসবক্সে বসে আমরা জনাকয়েক ভারতীয় সাংবাদিক শ্রীলঙ্কার রিপোর্টার বিজেতুঙ্গে-র কাছে শুনছিলাম সনৎ জয়সূর্যের উঠে আসার গল্প।
হাসতে-হাসতে বিজেতুঙ্গে বলেছিলেন, "মাতারা-য় যে লোকগুলো মাছ ধরে, তারা বুঝেছিল আর বুঝেছিল রণতুঙ্গা। জয়সূর্যের বাবা সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন, কখনওই চাননি ক্রিকেট ছেলেটার মাথাটা খাক। ক্লাব-ক্রিকেটে জয়সূর্যকে দেখে রণতুঙ্গা নিজে মাতারা-য় গিয়ে ওর বাবাকে রাজি করায়। মাতারা থেকে যাতায়াত করতে অসুবিধে হয় বলে রণতুঙ্গা ওকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিল।"
'৮৮-'৮৯ সালে শ্রীলঙ্কার 'বি' টিমের হয়ে পাকিস্তান সফরে পরপর দুটো টেস্টে ২০৩ নট আউট আর ২০৭ নট আউট করে নির্বাচকদের খাতায় নাম তুলে ফেলেন এবং এর পর টেস্ট টিমে ঢোকাটা ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। '৯১ সালের ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে ৪৮২ রান করে ব্যাটিং গড়ে শীর্ষে থাকা, '৯২-'৯৩ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার প্রথম জয় আনতে গিয়ে প্রথম বলে ছয় মেরে ইনিংস শুরু, বা মোরাতুয়ায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ২৯

প্র্যাকটিস সেরে ফেরার পথে
ফোটো : দেবীপ্রসাদ সিংহ

রানে ছয় উইকেট নিয়ে একা ম্যাচ জিতিয়ে দেওয়া, এসব জয়সূর্য করেছেন। এবং তা লোকে ভুলে গেছে। এই ধরনের ছুটকো-ছাটকা পারফরম্যান্স তো অনেকেই আকছার করছে। কিন্তু জয়সূর্যের যে একটাও টেস্ট সেঞ্চুরি নেই। অস্ট্রেলিয়া থেকে কোচ হয়ে এলেন ডেভ হোয়াটমোর আর এসেই বললেন, "না, না, ওই ৪৮তম ওভারে নেমে দশ বলে ১৫-২০ করার জন্য তোমাকে টিমে রাখা হয়নি। ওপেন করতে হবে তোমাকে। সামনেই অস্ট্রেলিয়া সফর। সেখানে কিন্তু অন্য কেউ থাকুক না থাকুক, তুমি ওপেন করছই।" কিন্তু ওপেন করানোর সিদ্ধান্ত কি একা নিয়েছিলেন হোয়াটমোর ? রণতুঙ্গার ভূমিকা ছিল না ? সেই অভিশপ্ত সেমিফাইনালের আগের দিন ইডেনে দাঁড়িয়ে রণতুঙ্গা বলেছিলেন, "ডেভ আর আমি দু'জনেই জানতাম, ছেলেটার টাইমিং অসম্ভব ভাল। কিন্তু নিজে তো আগে বিশ্বাস করতে হবে, পারব। সনৎ নেটে এত ভাল ব্যাট করত, অথচ প্রায়ই ম্যাচে গিয়ে 'চোক' করত। হয়তো খুব ভাল শুরু করল, ৩০-৪০ করে ফেলেছে, তারপরই নির্বোধের মতো একটা স্ট্রোক নিয়ে আউট হত। অস্ট্রেলিয়ায় বেনসন অ্যান্ড হেজেস আর টেস্ট সিরিজের সময়ই দেখলাম, সনৎ নেটের সনতের মতো খেলতে শুরু করেছে।"

জয়সূর্য আর কালুভিথরনে। কালুভিথরনে আর জয়সূর্য। শ্রীলঙ্কা '৯৬ বিশ্বকাপ না জিতলেও এই দুটো নাম নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের নাড়াচাড়া করতেই হত। আর বিশ্বকাপ জেতার পর তো বলাই হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্বকাপের আগে জয়সূর্য-কালুভিথরনেকে দিয়ে ওপেন করানোর মধ্যেই শ্রীলঙ্কার বিশ্বজয়ের বীজ লুকনো ছিল। ইডেনে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের আগের দিন আমরা বাংলা কাগজের কয়েকজন রিপোর্টার তাজ বেঙ্গল হোটেলের লবিতে জয়সূর্যকে ধরেছিলাম। শ্রীলঙ্কা টিমের কারও বিশ্বকাপের সময় প্রেসের কাছে মুখ খোলার অধিকার ছিল না। কিন্তু বাংলা কাগজের রিপোর্টাররা ছাড়বে কেন ? 'মেন্ডিস না বলেছেন' বলে যত লাজুক মুখে এড়িয়ে যান, তত ছেঁকে ধরে রিপোর্টাররা। একটু দূরে দাঁড়ানো রণতুঙ্গা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ার পরও শুধু বলেছিলেন, "আমি সামান্য ক্রিকেটার। দল চাইছে ওপেন করে প্রথম ১৫ ওভারের সুযোগ নিই। আমিও চেষ্টা করছি। এর আগে মোট গোটা কুড়ি ম্যাচে ওপেন করেছি, কিন্তু গত জানুয়ারিতে অ্যাডিলেড টেস্টে ১১২ করার পর থেকেই মনে হয়েছে, আমি পারব। পারা উচিত।"
ইংরেজি খুব ভাল বলেন না, প্রায়ই 'ইউ নো' আর 'আই মিন টু সে'-এর মধ্যে আটকে যান। কিন্তু কী প্রবল আত্মবিশ্বাস। স্পষ্ট মনে আছে, মাথা নিচু

জয়সূর্যের বিশ্বরেকর্ড

- ❑ একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি। মাত্র ৪৭ বলে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরে, গত এপ্রিলে। শেষপর্যন্ত ৬৫ বলে করেন ১৩৪ রান। আগের রেকর্ড আজহারউদ্দিনের। ৬২ বলে সেঞ্চুরি ছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে, '৮৮-'৮৯ সালে বরোদায়।
- ❑ একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম হাফ-সেঞ্চুরি। মাত্র ১৭ বলে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরে, গত এপ্রিলে। আগের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার সাইমন ওডোনেলের, '৯০ সালে শারজায় ১৮ বলে ৫০ করেছিলেন তিনি।
- ❑ একদিনের ক্রিকেটে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরে ৬৫ বলে ১৩৪ করতে গিয়ে মারেন ১১টি ছক্কা। আগের রেকর্ড গর্ডন গ্রিনিজের। ভারতের বিরুদ্ধে অ্যান্টিগা-য় '৮৪ সালে আটটি ছয় মেরেছিলেন গ্রিনিজ।
- ❑ সিঙ্গাপুরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমির সোহেলের এক ওভারে ৩০ রান, পরপর চারটি বলে ছক্কা সহ। আগের সেরা ২৭ রান। '৯৪ সালে সেলিম মালিক ও আসিফ মুজতবা করেন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এবং '৯১ সালে মইন খান করেছিলেন শারজায় ইয়ান বিশপের বিরুদ্ধে।

জয়সূর্য : কে কী বলেন

ইয়ান চ্যাপেল : এই ছেলেটার ব্যাটিং-এর সময় মুশকিল হয়, আপনি নিশ্চিন্তে 'টয়লেট'-এ যেতে পারবেন না। কারণ ফিরে এসে হয়তো দেখবেন সেঞ্চুরি করে ফেলেছে ! জয়সূর্য ক্রিকেট খেলাটা নিয়ে যা-খুশি তাই করছে, বেশিদিন এভাবে চললে বোলারদের পাগলের ডাক্তার দেখাতে হতে পারে।

অর্জুন রণতুঙ্গা : ধরুন, বিপক্ষ টিম আগে ব্যাট করে ৪০০ তুলে ফেলল। তবু সনৎ তাড়া করবেই। হেরে যেতে পারে, তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অসম্ভবের জন্য একটা চেষ্টা ও করবেই। এই মানসিকতাটাই ওকে এতদূর নিয়ে এসেছে। আমার মতে, এখন ও বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন।

আমির সোহেল : মারাত্মক ফর্মে আছে। বলটা যেখানে পাঠাতে চাইছে, সেখানেই পাঠাচ্ছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, জয়সূর্য বিশ্বের সেরাদের একজন হয়ে গেছে। এইরকম 'পিন্চ হিটিং' ও কতদিন চালাতে পারবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। দেখা যাক, কী হয়।

দলিপ মেন্ডিস : পাঁচ ওভারে একটা টিমের স্কোর ৭০ আর একজন নট আউট ৬৬, অন্যজন নট আউট ০, এই ধরনের স্কোর কেউ কখনও স্বপ্নেও দেখেছে না শুনেছে ? জয়সূর্য সিঙ্গাপুরে এটাও করে দেখিয়েছে। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর সিঙ্গাপুরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটো ইনিংসে পরিষ্কার, এখন ওর ফর্মের ধারেকাছে কেউ নেই। নিজের সেরা সময়ে ভিভ রিচার্ডস-ও এই ব্যাটিং করতে পারেনি। মাঠ ছোট বলে ওর কৃতিত্ব ছোট করা ঠিক নয়। বাকিরা ব্যাট করার সময় মাঠের আয়তন কি বেড়ে গিয়েছিল ?

পিটার রোবাক (ক্রিকেট-লেখক) : একদিনের ক্রিকেটে পিন্চ হিটিং নতুন নয়। হয়েই থাকে। কিন্তু দেখতে হয় এর মধ্যে ক'টা 'ক্রিকেটিং শট' আর ক'টাই বা অক্রিকেটীয় শট। জয়সূর্যের ব্যাটিংয়ের ইতিবাচক দিক হল, যত দিন যাচ্ছে, ক্রিকেটিং শটের সংখ্যা বাড়ছে। বেশিরভাগই ক্লিন হিট। ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখতে পারলে ওর জন্য ক্রিকেটের খোলনলচেই বদলে যেতে পারে।

করে ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলেন, "চ্যাম্পিয়ান হওয়ার মতো একটাই তো দল আছে। শ্রীলঙ্কা।" কিন্তু বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল আর ফাইনালেই যে খেলতে পারেননি জয়সূর্য। সাতটা ম্যাচে সাত ইনিংস খেলে শচীন তেণ্ডুলকরের ৫২৩-এর পাশে তাঁর মোট ২১২ রান একেবারেই ম্যাড়মেড়ে। বিশ্বকাপে ১৬০টা বল খেলে ২১২ রান করার পরও স্রেফ একটা মারকুটে 'পিন্‌চ হিটার' হিসেবে জয়সূর্যকে দেখেছে ক্রিকেট দুনিয়া। বড়জোর একজন সফল অলরাউন্ডার। যিনি ইডেনের ঘূর্ণি পিচে একের পর এক উইকেট তোলার ক্ষমতা রাখেন। জয়সূর্য সব দেখেছেন, শুনেছেন আর আসল ভেলকিটা দেখল সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের পরই ছিল শারজার টুর্নামেন্ট এবং শারজায় গিয়ে শুনলাম, সিঙ্গাপুরের প্যাডাং নাকি এত ছোট মাঠ ছিল যে, ৬৫ বলে ১৩৪ বা ২৮ বলে ৭৬ কোনও ব্যাপারই নয়! ওয়াকার ইউনুসের ঠ্যাঙানিটা কিচ্ছু নয়, আকিব জাভেদের মার খাওয়াটা কিচ্ছু নয়, এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর অফস্পিনার সাকলিন মুস্তাকের মার খাওয়াটাও কিছু নয়। একটার পর একটা বিশ্বরেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে জয়সূর্যের ব্যাটিং, তবু মাঠ ছোট এই অজুহাতে তাঁর রেকর্ডে কালি মাখানোর চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। দুটো প্রশ্ন উঠতেই পারে, উঠছেও। এক, মাঠ যতই ছোট হোক, বাইশ গজেই ওয়াকার ইউনুস, আকিব জাভেদদের খেলতে হয়েছে জয়সূর্যকে। দুই, মনে রাখা ভাল, বাকিরা মানে শচীন তেণ্ডুলকর বা সঈদ আনোয়াররা ব্যাট করার সময় মাঠের আয়তন বেড়ে যায়নি।

তা হলে কি লারা-শচীন-মার্ক ও'-দের পাশাপাশি রাখতে হবে জয়সূর্যকে? শচীন এখনও যা পারেননি, লারার নামের পাশে এখনও যা নেই, সে-সবই তো করে দেখাচ্ছেন তিনি। তবু মাতারা-র ছেলেটাকে আরও অনেক, অনেক রাস্তা পেরিয়ে যেতে হবে। একটা-দুটো ম্যাচে ৬৫ বলে ১৩৪ বা রেকর্ডবুকে নাম তোলাকে এই নিষ্ঠুর খেলা বড়জোর সেলাম জানাতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তোলে না। মারকুটে, বিধ্বংসী, ধ্বংসাত্মক ব্যাটসম্যান ছিল, একদিনের ক্রিকেটে গোটা কয়েক বিশ্বরেকর্ড আছে—এটুকু লিখেই সনৎ জয়সূর্যের নামের পাশে ইতিহাস দাঁড়ি টেনে দিতেই পারে।
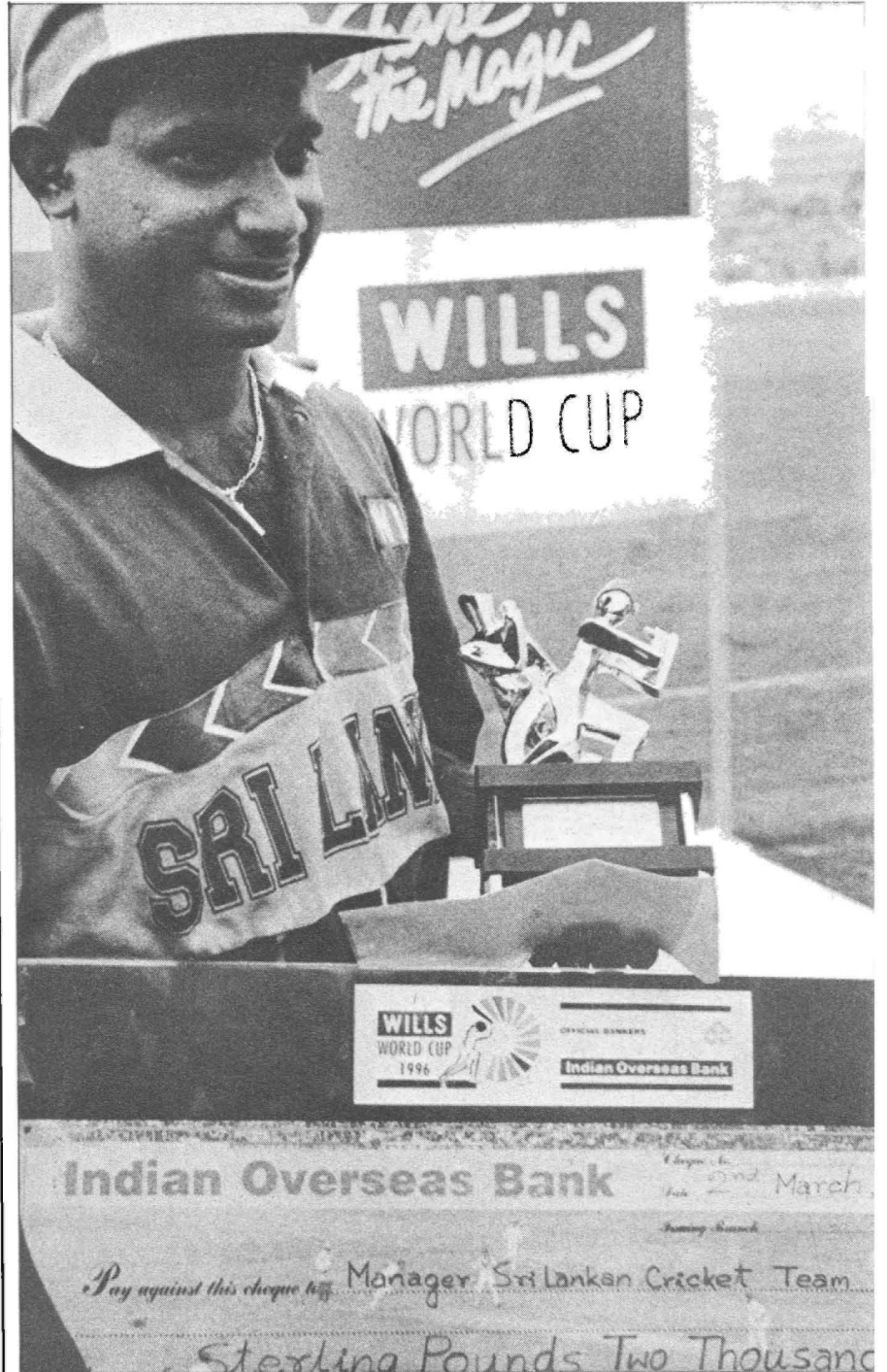
সাফল্যের যোগ্য পুরস্কার : এরকম মুহূর্ত বারবার ফিরে আসুক জয়সূর্যের জীবনে ফোটো : তপন দাশ

আর যদি উলটোটা হয়? যদি এভাবেই আর বছর তিনেকও চালিয়ে যেতে পারেন জয়সূর্য? কী লিখবে 'উইজডেন'? কী লিখবেন 'সানডে টাইম্‌স'-এর ক্রিকেট-লিখিয়েরা?
"ভারতের একেবারে তলায় ছোট্ট দেশ শ্রীলঙ্কা, তারও আবার দক্ষিণে ছোট্ট বন্দর মাতারা থেকে উঠে এসেছিল এক ক্রিকেটার। বাঁ হাতি ব্যাট, বাঁ হাতি স্পিনার। '৯৬ বিশ্বকাপের পরই ওই ক্রিকেটারের ব্যাটিং ক্রিকেট দুনিয়াকে স্তব্ধ করে দেয়। একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটিং রাতারাতি পৌঁছে যায় একুশ শতকে।" দু'হাজার সাল পর্যন্ত জয়সূর্য টিকে গেলে একথা কিন্তু উইজডেন সম্পাদককে লিখতে হতেই পারে। স্বাভাবিক।

ব্যর্থতা থেকেই শিখেছি

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

ফোটো : অলক মিত্র

প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিটা বোধ হয় যে-কোনও ক্রিকেটারের কাছেই সবচেয়ে স্মরণীয়। আমার কাছেও। তার ওপর জীবনের প্রথম টেস্টেই শতরান, স্বভাবতই একটু আনন্দ তো হচ্ছিলই। লর্ড্‌স টেস্টে সেঞ্চুরিটাকে তাই আমি আমার দুটো সেঞ্চুরির মধ্যে একটু বাড়তি নম্বর দেব। আসলে জীবনে প্রথম টেস্ট খেলতে নামার আগে অনেককিছু প্রমাণ করার ছিল। অন্য সকলের কাছে তো বটেই, নিজের কাছেও। চাপের মুখে ভেঙে পড়ি না, সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটেও সফল হতে পারি, 'টেকনিক' কিংবা মানসিকতার দিক থেকে পিছিয়ে নেই। আমার মনে হয় ইংল্যান্ড সফরের পর এই জিনিসগুলো আমি ক্রিকেট-দুনিয়াকে বোঝাতে পেরেছি।

লর্ডসে শতরানের পর চলে গিয়েছিলাম আমার কাকা অনিমেষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। কোনও অনুষ্ঠান নয়, বাড়তি কোনও উচ্ছ্বাসও অনুভব করিনি। শুধু নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম। টেন্টব্রিজে দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটার পর নিজেকে একটু হালকা লাগছিল।

এই যে বলা হয় বাঙালিরা কিছু পারে না, এ-কথা আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। বহুবার কথাটা শুনেছি, শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জোর দিয়ে বলতে পারি, কথাটা একেবারেই বাজে। নিজের অভিজ্ঞতা এবং আশপাশের চেনা পরিবারগুলিকে দেখে বলতে পারি, বাঙালি অভিভাবকরা একটু বেশি রক্ষণশীল। ছেলেমেয়েদের বাইরে ছাড়লে যে উপকার হয়, সেটা অনেকে বোঝেন না। কিন্তু বাঙালি ক্রিকেটারদের একবার সুযোগ দিয়েই গায়ে 'ব্যর্থ' লেবেল আটকে দেওয়া অর্থহীন। আমি কোনও বিতর্কে ঢুকতে চাই না, ঢুকছিও না। কিন্তু সুযোগ পেয়েও 'বাঙালি ক্রিকেটাররা ব্যর্থ', মানতে নারাজ আমি। রাহুল দ্রাবিড়ের কথাই ধরুন। এর আগে ভারতীয় দলের হয়ে চারটে ইনিংসে কিন্তু ও দুই অঙ্কের রানও করতে পারেনি। কিন্তু টেস্টে কীরকম দারুণ খেলল! সুযোগ পেলে সবাই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে।

আমার অবশ্য নতুন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে রাহুলকেই সবচেয়ে ভাল লাগে। ভীষণ নির্ভরযোগ্য। বিক্রম রাঠোরও ভাল ব্যাটসম্যান, তবে আমি রাহুলকেই এগিয়ে রাখব। এদের সকলের সঙ্গেই জুড়ি
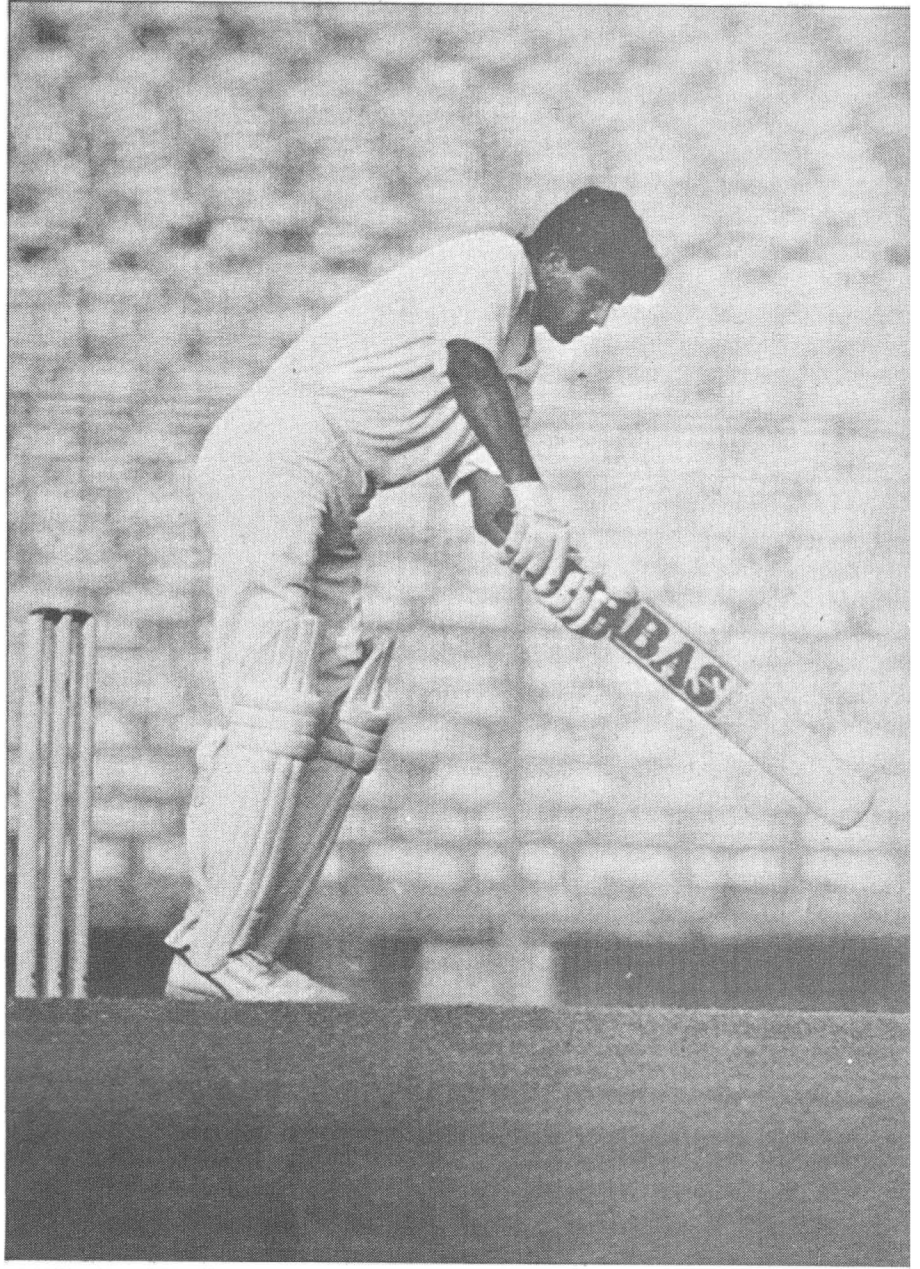
টেস্ট-ক্রিকেট মানেই ধৈর্যের খেলা — *ফোটো : নির্মলেন্দু মজুমদার*

বাঙালি ক্রিকেটারদের একবার সুযোগ দিয়েই তাঁদের গায়ে ব্যর্থতার 'লেবেল' আটকে দেওয়া অর্থহীন। সুযোগ পেয়েও বাঙালি ক্রিকেটাররা ব্যর্থ, এ-কথা মানা যায় না।

বেঁধে খেলেছি। আলাদা করে কিছু বলার নেই। তবে শচীন সম্পর্কে কিছু উচ্চারণ করাটাই মুশকিল, নিঃসন্দেহে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। নন-স্ট্রাইকার এন্ড-এ ওঁর দাঁড়িয়ে থাকাটা আলাদা অভিজ্ঞতা।

দেশে ফিরে এত লোকের ভালবাসা, এত সংবর্ধনায়, সত্যি কথা বলতে গেলে আমি একটু অবাকই। কলকাতার লোকের আমার খেলা ভাল লেগেছে, তাঁরা আমাকে নিয়ে ভেবেছেন, এটা সত্যিই আমার সৌভাগ্য। কিন্তু তারকার ভাবমূর্তিতে আমি একেবারেই অভ্যস্ত

নই। নিজের মতো থাকতে চাই এবং আরও বেশি করে ক্রিকেট খেলতে চাই। আমার এখন একটাই কাজ, দেশের হয়ে বেশি খেলা। পরপর দুটি টেস্টে সেঞ্চুরি হয়তো মানুষের মনে প্রত্যাশা তৈরি করে দিয়েছে, বারবার ওইরকম ব্যাট করা সম্ভব! কিন্তু আমি খুব ভাল করে জানি তা হবে না। আমাকেও কোনও সময় ব্যর্থতার বোঝা বহন করতেই হবে। এবং তখন বিমানবন্দরে আমার জন্য কেউ ফুলমালা নিয়ে অভ্যর্থনা করবে না। আমি মানসিকভাবে সেই ঘটনার জন্যও তৈরি।

আসলে যে-কোনও মানুষই তো ব্যর্থতা থেকে শেখে। আমিও শিখেছি, শিখব। গত তিন বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। মোহনবাগান ক্লাবে অরুণলালদের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতায় হয়তো আমার লাভ হয়েছে, তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সফল হতে গেলে আরও কিছু প্রয়োজন। সেইদিক থেকে বলতে পারি, ভারতীয় (এ) দলের হয়ে বেশ কিছু ম্যাচ খেলা আমার পক্ষে কাজে দিয়েছে। ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার আগে আমার মধ্যে শুধু একটাই ভাবনা ছিল, সুযোগ পেলে নিজেকে প্রমাণ করা। তার চেয়ে বেশি কিংবা কম কিছুই ভাবিনি। যদি ব্যর্থ হতাম, আবার ফিরে এসে ক্রিকেটে মন দিতাম।

এইবারও সুযোগ না পেলে ক্রিকেট ছেড়ে দিতাম কি না বলা মুশকিল। একটি কথা অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই, শুধু প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ক্রিকেট খেলে অর্থ এবং খ্যাতি পেতে গেলে টেস্ট পর্যায়ে উঠতেই হবে। বাবার ব্যবসা আছে, অতএব আমার অর্থের প্রয়োজন নেই বলা ভুল। সকলেই তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। তবে একটা কথা অনস্বীকার্য, আমার ক্রিকেটের পেছনে বাড়ির লোকের অবদানই সবচেয়ে বেশি। সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার সময়েও তাঁরা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

আজ ক্রিকেটের জন্যই আমার পরিচিতি, কিন্তু ছেলেবেলায় আমার প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। চুটিয়ে ফুটবল খেলতাম, আমার স্কুলে যাওয়ার একমাত্র আকর্ষণ ছিল, সেখানে গিয়েই ফুটবল খেলা। তা না হলে স্কুলে টানা ছ'ঘণ্টা ক্লাস করতে একেবারেই ভাল লাগত না। মাধ্যমিকে অবশ্য ভালই নম্বর পেয়েছিলাম, ৭০০-র ওপরে। উচ্চ মাধ্যমিকেও ফার্স্ট ডিভিশন। আসলে তখনও আমি খেলাকে এত গুরুত্ব দিইনি। পড়ার পেছনেই বেশি সময় দিতাম। বি.কম. পড়ার সময় থেকেই অবশ্য ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত, ক্লাস করার সময়ই পাইনি। বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে বি.কম. পাশ করি।

স্কুলে পড়ার সময় ফুটবল, ক্রিকেট ছাড়াও ব্যাডমিন্টন, টেব্‌ল টেনিস খেলেছি। পরে অবশ্য ঘটনাচক্রে ক্রিকেটটাই বেছে নিলাম। তবে এখনও পাড়ার মাঠে বল নিয়ে নেমে পড়ি। আমি মোহনবাগানের সমর্থক, আর বিদেশে প্রিয় ব্রাজিল। জিকো পছন্দের খেলোয়াড়, তবে প্রিয় নিঃসন্দেহে দিয়েগো মারাদোনা। একাই ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলটাকে টেনেছিলেন। 'দুর্দান্ত,' 'অপ্রতিরোধ্য' যাবতীয় বিশেষণ ওঁর নামের পাশে বসানো যায়। ১৯৮৬ সালে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোলটার কথা কোনওদিন ভুলব না। নিজে মাঝমাঠে খেলতাম বলে কি না জানি না, ভাল লাগে জার্মানির লোথার ম্যাথাউসকে।

ঠিক তেমনই নিজে বাঁ-হাতি বলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান চার্লস লারার নামটা প্রিয় ব্যাটস্‌ম্যানদের তালিকায় রাখবই। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের খেলা খুব বেশি দেখিনি, তবে অ্যালান বর্ডার প্রিয় ব্যাটস্‌ম্যান। যে ভদ্রলোক টেস্টে ১১ হাজারের বেশি রান করেছেন, তাঁর ভক্ত না হয়ে উপায় নেই।

ক্রিকেটের বাইরে আমি ভক্ত কুমার শানুর। গান শুনতে ভালবাসি, তাই কোথাও গেলেও সঙ্গে 'টেপ' থাকে। শানুর হিন্দি-বাংলা দু' ধরনের গানই ভাল লাগে, পছন্দ অভিজিতের গানও। সিনেমা দেখতে পছন্দ করি না, বরং টান আছে টিভির দুটো স্পোর্টস চ্যানেলের ওপর। আর ভালবাসি জি. টিভি দেখতে, বিশেষ করে 'আন্দাজ' বলে একটি ধারাবাহিক। জামাকাপড়ের দিক থেকে জিন্‌স আর টি. শার্টই পছন্দ।

আসলে ক্রিকেট আমার এতটাই সময় নিয়ে নেয়, অন্য কোনও দিকে মন দেওয়ার সময় পাই না। কোনও বোলারকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবি না। বরং ব্যাটস্‌ম্যানের নিজস্ব মানসিকতাটাই দরকারি। আমি সবসময় নিজেকেই 'মোটিভেট' করার চেষ্টা করি। কারণ জানি, ২২ গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে একাই সামলাতে হবে সব আক্রমণ।

অনুলিখন : সুমন ভট্টাচার্য

ওলিম্পিকের প্রতীক এই পাঁচটি বলয়

স্বপ্নের ওলিম্পিক স্বপ্নের খেলোয়াড়

তানাজি সেনগুপ্ত

স্বপ্ন না দেখলে জীবনে সাফল্য আসে না। ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রতিকূলতা জয় করে এবারের আটলান্টা ওলিম্পিকের সফল খেলোয়াড়রা পুরনো এই কথাটাই নতুনভাবে প্রমাণ করলেন।
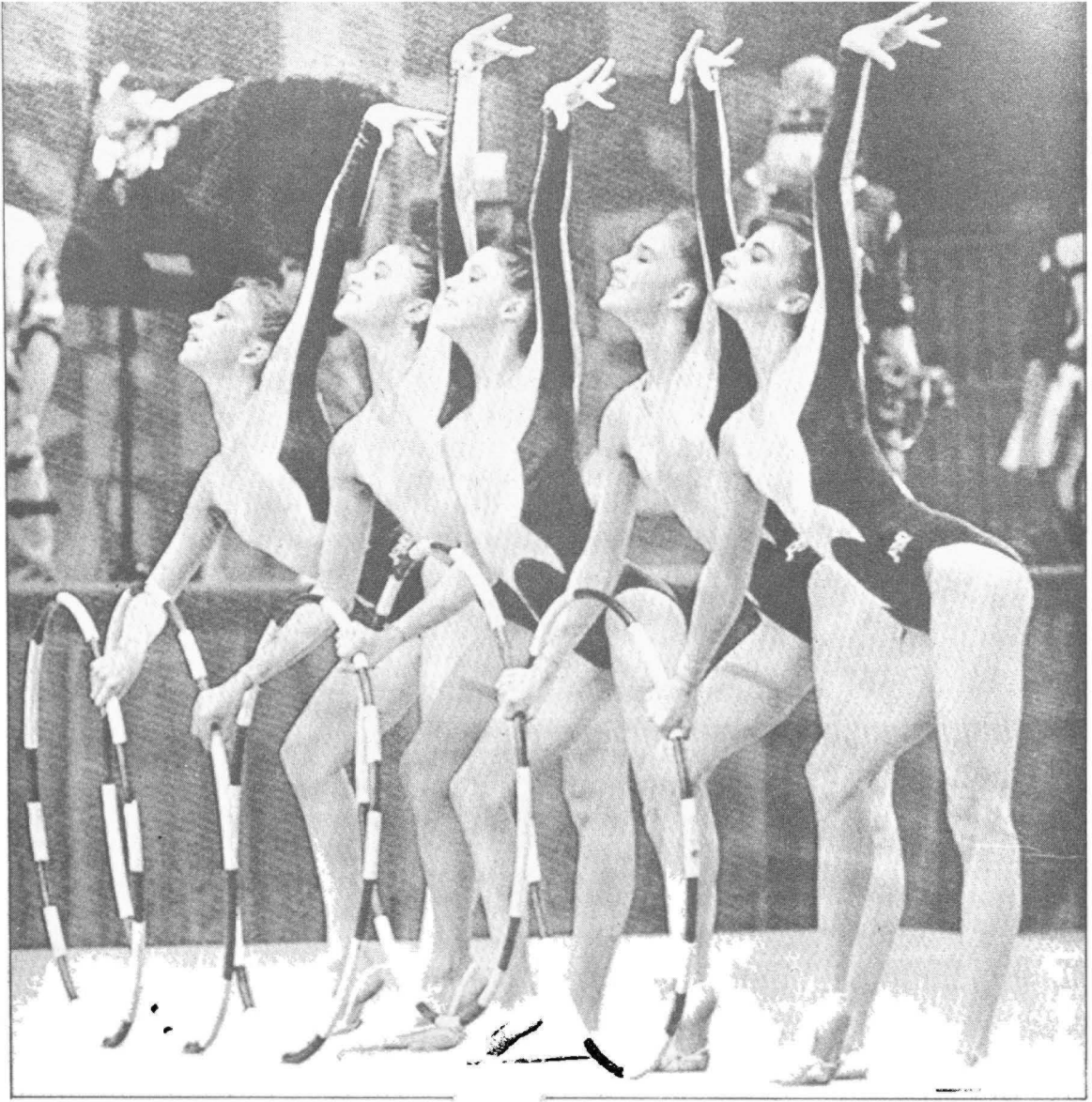
আনন্দ, উত্তেজনা, রোমাঞ্চে ভরপুর ছিল শতবর্ষের ওলিম্পিক। কিন্তু তা যে এত মধুর তা কে জানত! আটলান্টায় এই ওলিম্পিকের প্রায় শেষ মুহূর্তে তা জানালেন আমাদের খুব কাছের একজন, কলকাতার তরুণ টেনিস-তারকা লিয়েন্ডার পেজ। দীর্ঘ ৪৪ বছরের খরা কাটিয়ে ব্যক্তিগত 'ইভেন্ট'-এ ভারতকে একটি পদক এনে দিলেন তিনি। এই শতাব্দীর শেষ ওলিম্পিক নানাদিক থেকে স্মরণীয়। তা আরও স্মরণীয় হয়ে রইল আমাদের কাছে, প্রধানত লিয়েন্ডারের জন্যই। আটলান্টায় ১৮৩৮টি পদকের মধ্যে অন্তত একটি আমাদের,৯৫ কোটি ভারতবাসীর কাছে আপাতত এটাই বড় সান্ত্বনা। ডেভিস কাপে বড়-বড় অনেক তারকাকে এর আগে হারিয়েছেন লিয়েন্ডার। ওলিম্পিকেও দেখালেন সেই কৃতিত্ব। যাঁদের তিনি হারিয়েছেন সত্যি বলতে কী, প্রত্যেকেই বিশ্ব 'র‍্যাঙ্কিং'-এ

তাঁর চেয়ে অনেক এগিয়ে। অত্যাধুনিক 'ট্রেনিং প্রোগ্রাম' কী, তাও কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানতেন না লিয়েন্ডার। কিন্তু তাতে কী! প্রবল আত্মবিশ্বাসী, অদম্য উৎসাহী ও কঠোর পরিশ্রমী লিয়েন্ডারকে কোনও বাধাই দমাতে পারেনি।

ভারোত্তোলক নঈম সুলেমানোগলুকেও ছেলেবেলা থেকে নানা বাধা-বিপত্তির সামনে পড়তে হয়েছে। একে ছোটখাটো চেহারা, তার ওপর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। বন্ধুরা টিটকিরি, ঠাট্টা করেছে, বিদ্রূপ করেছে। বাড়ি ছিল বুলগারিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের পাহাড়ি গ্রাম পিটিথাইচরে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম নঈমের। বাবা একসময় খনিতে কাজ করতেন, পরে ট্রাক চালাতেন। দারিদ্র্য তো ছিলই, সঙ্গে ছিল অপমান। বার্সেলোনা ওলিম্পিকেও সোনা জিতলেন। এবারও ৬৪ কেজি বিভাগে সোনা, সোনা জয়ের হ্যাট্রিক করলেন নঈম। পৃথিবীর আর কোনও ভারোত্তোলকের এই কৃতিত্ব নেই। ভারোত্তোলনে সর্বোত্তম হিসেবে গণ্য হলেন মাত্র চার ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতার 'পকেট হারকিউলিস' নঈম সুলেমানোগলু। তিনটি ওলিম্পিক সোনা সমেত তাঁর দখলে আপাতত ২২টি বিশ্বখেতাব, ৪৩টি বিশ্বরেকর্ড। ২৯ বছরের নঈম সুলেমানোগলু আটলান্টায় দেখিয়ে দিলেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, বিদ্রূপ, অপমান এগুলো আসলে কোনও বাধাই নয়। প্রবল ইচ্ছাশক্তি, লড়াকু মনোভাবই আসল ব্যাপার।
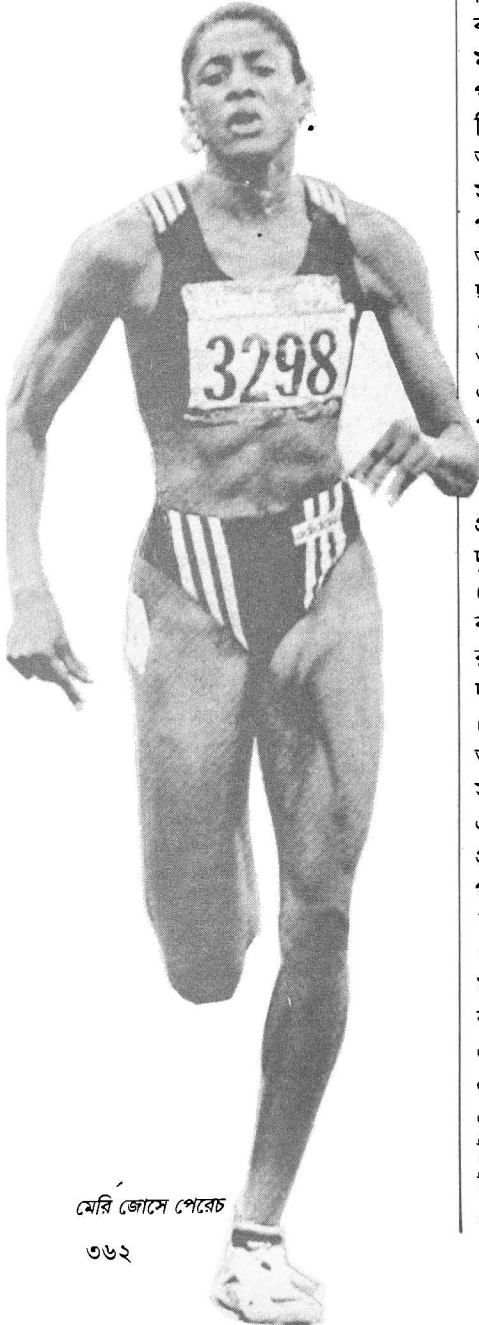
পর পর তিনটি ওলিম্পিকে সোনা জিতলেন রাশিয়ার কুস্তিগির আলেকজান্ডার কারেলিনও। সুলেমানোগলুর মতোই। মিল এই পর্যন্তই। আর সবকিছুতেই দু'জনের অমিল। কারেলিন উচ্চতায় অনেক বড়, ছ'ফুট চার ইঞ্চি, ওজনও অনেক বেশি, ২৮৬ পাউন্ড। জন্মের সময়ই তাঁর ওজন ছিল ১৫ পাউন্ড। সাইবেরিয়ার এই 'সুপার-হেভিওয়েট' কুস্তিগির এখন পর্যন্ত কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হারেননি। ১৯৮৭ থেকে অপরাজিত। আগের দুটি ওলিম্পিকে ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি হারান, এর মধ্যে মাত্র দু'জন শেষপর্যন্ত লড়াই চালাতে পেরেছিলেন। এই বিরাট চেহারার কুস্তিগিরের ব্যক্তিগত জীবন অনেকটা রূপকথার মতো। ছেলেবেলায় রাজ্য দলের প্রতিযোগিতার ঠিক আগে তাঁর পা ভেঙে যায়। চিন্তিত কোচের মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা, সেই সময় কারেলিন তাঁকে আশ্বস্ত করেন। এবং ঠিক সময়েই প্রতিযোগিতায় নামেন, প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েও দেন। তাঁর একটি পায়ে তখনও প্লাস্টার বাঁধা।

ওলিম্পিকে 'ডাব্‌ল' করার আগে থেকেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ান আমেরিকার মাইকেল জনসন। গত ওলিম্পিকের ব্যর্থতা এবার তিনি মুছে ফেললেন ২০০ এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতে। এই প্রথম ওলিম্পিকে কোনও স্প্রিন্টার একই সঙ্গে এই দুই ইভেন্টে সোনা জিতলেন। ২০০ মিটারে জনসন নতুন বিশ্বরেকর্ডও গড়েন। এই মানুষটির ছেলেবেলায় কেউ কিন্তু ভাবতেই পারেননি যে, তিনিই হতে চলেছেন বিশ্বের সেরা স্প্রিন্টার। তাঁর বাবা পল জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে ছেলেবেলায় এত মোটা ছিল যে, গলা বলে কোনও জিনিস ছিল না। নিয়মিত কঠোর অনুশীলনের ফলে সেই ছেলেই এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা 'গ্ল্যামারাস স্টার'। ২৮ বছর বয়সী ছ'ফুট এক ইঞ্চি উচ্চতার ও ১৮০ পাউন্ড ওজনের জনসন এখন বছরে উপার্জন করেন কোটি-কোটি টাকা। অর্থের প্রতি তাঁর কিন্তু তেমন মোহ নেই, দৌড়ই সব। তিনটি 'মার্সিডিজ বেঞ্জ' গাড়ি পেয়েছিলেন উপহার হিসেবে, ভাই-বোনদের দিয়ে দিয়েছেন। শখ বলতে কানে হিরের দুল পরা, গান শোনা আর পুরনো দিনের ফিল্ম দেখা। আটলান্টার নায়ক জানিয়েছেন, দৌড় ছাড়ার পর তিনি অভিনয় করতে পারেন। সেসব অবশ্য অনেক দূরে। আপাতত রেকর্ড গড়া এবং ভাঙা।

২০০ এবং ৪০০ মিটারে ডাব্‌ল করলেন ফ্রান্সের মেরি জোসে পেরেচও। মহিলা বিভাগে। গত ওলিম্পিকেও ৪০০ মিটার দৌড়ে তিনি জেতেন।

আটলান্টা ওলিম্পিকে হঠাৎই সকলের নজর কেড়ে নিয়েছেন কানাডার ডোনোভান বেইলি। ১০০ মিটার দৌড়ে বেইলি শুধু জিতলেন না, 'দ্রুততম দৌড়বীর' হলেন না, ওলিম্পিকে বিশ্বরেকর্ডও গড়লেন ৯.৮৪ সেকেন্ডে দৌড়ে। জামাইকার মানুষ বেইলি থাকেন টরন্টোর শহরতলি ওকাভিল-এ। যেখানে 'বাস্কেটবলার' হিসেবেই তাঁর নাম ছিল। জামাইকার কিংস্টনে সামান্য কাজ করতেন তাঁর বাবা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানটির ইচ্ছে ছিল বাস্কেটবল খেলে অর্থোপার্জন করবেন। কানাডায় সপরিবার চলেও আসেন তাঁরা। হঠাৎই দৌড়ের আসরে যোগ দেন বছর তিনেক আগে। এখন তো তিনি ইতিহাস।

ওলিম্পিকের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসেবে নিজেকে আটলান্টাতে আবার প্রমাণ করলেন কার্ল লুইস। ৩৬ বছর বয়স হয়ে গেছে, দু'বছর ধরে ভাল ফর্মেও ছিলেন না। এমনকী লংজাম্পের হিটেও প্রায় বাতিল হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ানদের কাজই হল শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া। তাই ফাইনালে নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেন, দক্ষতাকে উজাড় করে দিলেন। ফলে আবার সোনা। এই নিয়ে পরপর চার

মেরি জোসে পেরেচ

ওলিম্পিকে লংজাম্পে সোনা, এই 'ইভেন্ট'-এ দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। চারটি ওলিম্পিক থেকে ন'টি সোনা, অ্যাথলেটিক্সে একমাত্র পাভো নুর্মির আছে। ন'টি সোনার চেয়েও বেশি কৃতিত্ব ১৬ বছর ধরে ফর্ম ধরে রাখা। এই পেশাদারি লড়াইয়ের যুগে বিরল কৃতিত্ব। শতবর্ষের ওলিম্পিকের সেরা ঘটনা কার্ল লুইসের অসামান্য কৃতিত্ব। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, পরবর্তী ওলিম্পিকে আর এই বর্ণময় চরিত্রটিকে আমরা পাব না।

কিংবদন্তির এক সাঁতারুকে এই ওলিম্পিকে ছুঁয়ে ফেললেন রাশিয়ার আলেকজান্ডার পোপোভ। সেইসঙ্গে জিতে নিলেন 'দ্রুততম সাঁতারু'র সম্মানও। ১৯২৪ এবং ১৯২৮ সালের ওলিম্পিকে 'টারজান' নামে খ্যাত জনি ওয়াইজমুলারের পর পোপোভই প্রথম সাঁতারু, যিনি পরপর দুটি ওলিম্পিকে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সোনা পেলেন। শুধু তাই নয়, সাঁতারের পুল তোলপাড় করে তিনি তুলে নিলেন ৫০ মিটার ফ্রি স্টাইলের সোনাও। গতবারও সোনা পান তিনি। অর্থাৎ পরপর দু'বার 'দ্রুততম সাঁতারু' হওয়ার 'কৃতিত্ব। বার্সেলোনার পর আটলান্টায় 'সোনার ডাব্‌ল'। ওলিম্পিকে চারটি ব্যক্তিগত সোনা, দুটি বিশ্বখেতাব, তবু পোপোভ খুশি নন। 'রুশ টর্পেডো' জানিয়েছেন, 'গ্রেট' হতে চান না তিনি, চান তিনটি ওলিম্পিক জিতে 'গ্রেটেস্ট' হতে। ২৪ বছর বয়সী আলেকজান্ডার পোপোভ এখন থাকেন অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায়। আগামী ওলিম্পিকে তিনি হয়তো দেশ বদল করে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নামবেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য পরিবর্তন হবে না।

সোল ওলিম্পিকে ১৪ বছরের একটি মেয়ে ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক সাঁতারে সোনা এনে দিয়েছিলেন হাঙ্গারিকে। হইচই হলেও, তখন মাতামাতি হয়নি। সেই কিশোরী, আটলান্টায় সোজা ঢুকে পড়লেন ওলিম্পিকের ইতিহাসে। এবার ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা জিতে হাঙ্গারির ক্রিশ্চিনা এগারসেগি ছুঁয়ে ফেললেন অস্ট্রেলিয়ার ডন ফ্রেজারকে।

এবারে আটলান্টায় দেখা গেল সম্পূর্ণ অজানা এক সাঁতারুকে, আয়ারল্যান্ডের ২৬ বছরের তরুণী মিশেল স্মিথের। ২০০ এবং ৪০০ মিটার মেডলি ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে, মোট তিনটি সোনা জেতেন তিনি। সাঁতারে ২৬ বছর মানে বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া। সকলকে অবাক করে দিলেন সেই 'বৃদ্ধা' সাঁতারুই। তার চেয়েও বড় কথা, আয়ারল্যান্ডে সাঁতারের কোনও ঐতিহ্যই নেই। সাতের দশকে সেখানকার এক সাঁতার 'মিট'-এ সকলে হিটে যোগ্যতা অর্জন করায় একটি পত্রিকা রসিকতা করে লিখেছিল, "ভাগ্য ভাল, কেউ ডুবে যায়নি।" এই দেশ থেকেই এসে আটলান্টায় হইচই ফেলে দেন মিশেল। সাঁতারে এক অভিনব প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু করেছেন তাঁর স্বামী, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের অ্যাথলিটদের মতো। তাতেই বাজিমাত করলেন মিশেল স্মিথ।

শুধু প্রবীণ নন, নবীনদেরও এই ওলিম্পিকে জয়জয়কার। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই প্রবাদের পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন চিনের ফু মিং জিয়া। প্ল্যাটফর্ম ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিংয়ে জোড়া সোনা পেলেন তিনি। ৩৬ বছর পর মহিলাদের ডাইভিংয়ে জোড়া সোনা জিতলেন ফু। ১৯৬০ সালে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন পূর্ব জার্মানির ইনগ্রিড ক্রেমার। গত ওলিম্পিকে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪, তখনই প্ল্যাটফর্মে সোনা জেতেন ফু। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই তিনটি সোনা তাঁর দখলে।

এবার আটলান্টায় চমক দেখিয়েছে আফ্রিকা। এবার আফ্রিকার দেশগুলি পেয়েছে ১০টি সোনা। এত বেশি সোনা এর আগে তারা পায়নি। অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, বক্সিং—সবেতেই আফ্রিকার প্রাধান্য। সাঁতারে ডাব্‌ল সোনা পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেনি হেন্‌স। ইথিওপিয়ার কৃষক পরিবারের কন্যা ফতুমা রোবা অসাধারণ দক্ষতায় জিতে নিয়েছেন ম্যারাথনের সোনা। ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেন রোবা। জীবনে টেলিভিশন দেখার সুযোগ পাননি। এখন নিজেই টেলিভিশনের প্রধান দ্রষ্টব্য হয়ে উঠলেন। প্রবাদপুরুষ আবে বিকিলার পর তিনিই দ্বিতীয়, যিনি ইথিওপিয়া থেকে ম্যারাথনে সোনা জিতলেন। মহিলাদের পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে বুরুন্ডির ভেনুস্টি নিয়াংগাবো প্রথম হওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এবারই পূর্ব আফ্রিকার এই ছোট্ট দেশটি ওলিম্পিকে প্রথম অংশ নিল এবং প্রথম চেষ্টাতেই ওলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ান হয়ে বেরিয়ে আসা অসাধারণ কৃতিত্ব। দুর্দান্ত কৃতিত্ব ফুটবলে নাইজিরিয়ার সোনা পাওয়া। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার মতো সেরা দেশকে হারিয়ে আফ্রিকা প্রমাণ করল, অদূর ভবিষ্যতে এই দেশটি ফুটবলে সেরা শক্তিগুলিকে
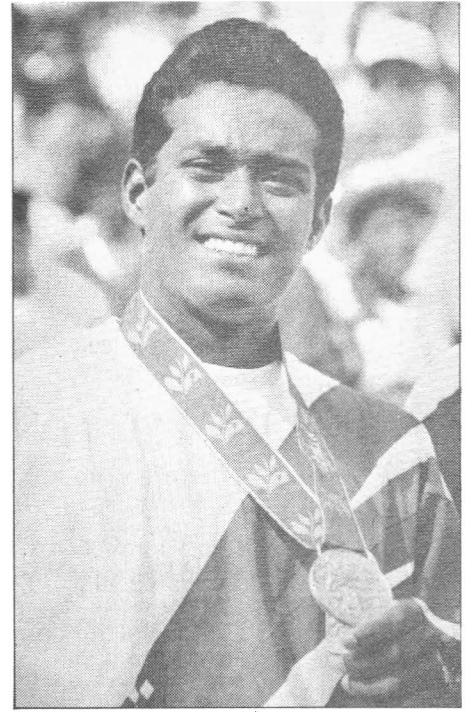
লিয়েন্ডারের হাত ধরে এল ওলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদক

কঠিন চ্যালেঞ্জ জানাবে। নওয়ানকো কানুর মতো ফুটবলার যে-কোনও দেশের গর্ব।

দেশকে গর্বিত করার মতো কৃতিত্ব দেখালেন আমেরিকার কেরি স্ট্রুগও। দলগত জিমন্যাসটিক্স প্রতিযোগিতায় প্রায় শেষদিকে রাশিয়ার চেয়ে এগিয়ে ছিল আমেরিকা। কিন্তু হঠাৎই ঘটল বিপর্যয়। তাদের সেরা প্রতিযোগী ডোমিনিক মোসিয়ানু ভল্টে ব্যর্থ হলেন। শেষ ভরসা ছিলেন স্ট্রুগ। তিনি প্রথম ভল্ট খারাপ দিলেন না। কিন্তু 'ল্যান্ডিং'-এর সময় পায়ে চোট লাগিয়ে ফেললেন। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আবার ভল্টের প্রস্তুতি নিলেন। যন্ত্রণায় তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দেশকে জেতাতে হবে, সঙ্কল্পে অটল স্ট্রুগ। দৌড় শুরু করলেন এবং ভল্ট দিলেন অনবদ্য, ল্যান্ডিং-ও হল চমৎকার—কিন্তু যন্ত্রণায় বাঁ পা মাটিতে ফেলতেই পারলেন না। তাতে কী! যন্ত্রণা এবং আনন্দ দুই-ই এখন সমার্থক। অর্থাৎ তাঁর দেশ জিতেছে। দাঁড়াতে পারলেন না স্ট্রুগ। স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হল তাঁকে বাইরে। বিজয়মঞ্চে এলেন কোচ বেলা ক্যারোলির কোলে চেপে, পায়ে ব্যান্ডেজ। কিন্তু এর ফলে ব্যক্তিগত ইভেন্টে নামার সুযোগ হারালেন স্ট্রুগ। নিজে জিতলেন না, কিন্তু দেশ জিতল। বিশ্বরেকর্ড করলেন না, অনেক পদকও পেলেন না, কিন্তু এই ব্যক্তিগত আত্মত্যাগে ওলিম্পিক আদর্শকে আটলান্টায় অনেক উঁচুতে তুলে দিলেন ১৮ বছরের কেরি স্ট্রুগ।

শেন ইন্দ্রজাল

গৌতম ভট্টাচার্য

মোহনবাগান মাঠের সদস্য গ্যালারির কয়েক ধাপ ওপরে। অত্যন্ত জড়সড় আর সঙ্কুচিতভাবে বসা তিনি। টুপিটা সাইড করে পরা, কোনাচে করে রাখা মুখের অনেকটাই যাতে ঢেকে থাকে। আর একটু পর-পরই ভয়ার্ত মুখে নীচের দিকটা দেখছেন।

কিন্তু ডাকসাইটে শেন ওয়ার্ন ভয়টা পাচ্ছেন কাকে ? মনে হল, মাঠের ভেতর জড়ো হয়ে থাকা রিপোর্টার-ফোটোগ্রাফারদের। হাতে যে তাঁর সিগারেট। এতক্ষণ হাড়ভাঙা প্র্যাকটিসের পর একটু 'স্মোক' না করলে চলছে না। কিন্তু সেই সিগারেট খাওয়াটাই যদি রিপোর্টাররা দেখে ফেলেন বা ফোটোগ্রাফারের লেন্স বন্দি হয় ? তিনি—শেন ওয়ার্ন যে তখন একটা বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ফেলবেন খুদে ক্রিকেটারদের জন্য। কী করে সেটা করেন, বিশ্বব্যাপী যে একটা ইমেজ তিনি !

শেন ওয়ার্ন মানুষটাই এরকম। সর্বদাই নিজের বেড়ে ওঠার অনুজ্জ্বল পরিবেশ আর নানান সীমাবদ্ধতার সঙ্গে তাঁর খ্যাতি যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ব্রায়ান লারা, শচীন তেন্ডুলকর আর তিনি—ত্রয়ীকে বারকয়েক ইন্টারভিউ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ওয়ার্নই সবচেয়ে অকৃত্রিম। মাঠের বাইরেও ক্রিকেট সার্কিটকে তিনি একটা গুগলি দিয়ে রেখেছেন। খ্যাতি আর প্রচারের সর্বগ্রাসী আলো মানুষ হিসেবে তাঁকে বদলাতে পারেনি। মানুষ হিসেবে তিনি ভীষণ দেমাকি ভেবে যারা কাছে ভিড়তে ইতস্তত করে, তারাই পরে বোঝে 'গুগলি'-তে কী বোকা বনেছে। আমি যেমন। প্রথম সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বেশ হকচকিয়েই গিয়েছিলাম। "ডোন্ট কল মি মিস্টার ওয়ার্ন," শুরুতেই তিনি সম্বোধনের দিকটা পরিষ্কার করে দিলেন। তা হলে কী বলে ডাকা হবে তাঁকে ? "কল মি শেন। দ্যাটস মাই নেম।"

সর্বকালের সেরা স্পিনার খুঁজতে গিয়ে গত ৫০ বছরে বহুবার বিল ওরিলিকেই বেছে নিয়েছেন ডন ব্রাডম্যান, কিন্তু ইদানীং তাঁর পছন্দ পালটেছে। ডন এখন সেরা স্পিনারের তালিকায় শেন ওয়ার্নকেই রাখছেন। শুধু টেস্টেই নয়, এক দিনের ম্যাচেও শেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগের দিন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক একহাত নিলেন ওয়ার্নকে। হয়তো অস্ট্রেলিয়ার ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করতে চাইছিলেন রণতুঙ্গা। বিপক্ষের এক নম্বর অস্ত্রকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। কিন্তু কী বলবেন এবার ওয়ার্ন ? কী বলতে পারেন ? পালটা আক্রমণে নিশ্চয়ই এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবেন এবার রণতুঙ্গাকে। যাবতীয় গরম বুলির সঙ্গে একটা তথ্যই তো যথেষ্ট: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আমার, আমাদের রেকর্ডটা দেখে নিন।

চ্যানেল নাইনে প্রতিদিন তাদের সান্ধ্য খবরের মধ্যে কয়েক মিনিট বরাদ্দ থাকে ওয়ার্নের জন্য। তাঁর সেই নিজস্ব অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ককে ইন্টারভিউ করতে মাঠে ঢুকলেন ওয়ার্ন। গদ্দাফি স্টেডিয়ামে ওদের পেছন-পেছন আমরা কয়েকজন সাংবাদিকও। প্রথম প্রশ্ন করলেন, "স্কিপার, অর্জুন তো আবার আমায় একহাত নিয়েছে। কী করব এবার আমি ?"

টেলর বললেন, "জবাবটা মাঠে দাও।

মার্ক টেলর সব সময়ই উৎসাহ দিয়ে গেছেন

ওখানে করে দেখাও।”
জবাবটা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। পরের দিন অরবিন্দ ডি সিলভার হাতে বেধড়ক মার খান ওয়ার্ন। ১০-০-৫৮-০ ঘটে যাওয়ার পর লাহোর ড্রেসিংরুমের বাইরে তাঁর গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার দৃশ্যটা ভুলতে পারিনি কয়েক মাস বাদেও। যেমন ভুলতে পারিনি এই রুচিবোধ।

লাহোরেই দেখা হয়ে গেল ডেভিড ফ্রিথের সঙ্গে। ফ্রিথ হলেন 'উইজডেন' ক্রিকেট মান্থলি পত্রিকার সম্পাদক এবং বাঙালি ক্রিকেট-পাঠকদের এতদিনে জেনে যাওয়ার কথা, ব্রাডম্যানের ঘনিষ্ঠতম সাংবাদিক। তখনই জানলাম ওয়ার্নের দারুণ ভক্ত হলেন ডন। শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিল ওরিলিকে যিনি তাঁর জীবনে দেখা সেরা স্পিনার বেছেছেন, ওরিলি-গ্রিমেট-মেইলির সঙ্গে খেলেছেন, টপ ফর্মের রিচি বেনোকে দেখেছেন, তাঁর কাছে ওয়ার্ন এক নম্বরে ? ফ্রিথ বললেন, “হ্যাঁ, সার ডন ভীষণ পছন্দ করেন ওয়ার্নের বোলিং। মনে করেন, ওদের সময় খেললেও ওয়ার্ন ঝুড়ি-ঝুড়ি

বিল ওরিলি

উইকেট পেত।”
গত ৫০ বছর, কে সেরা স্পিনার বলতে গিয়ে যে ডন বারবার টাইগার ওরিলিকেই খুঁজে পেয়েছেন তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলালেন কেন ? ওয়ার্নকে কি এতটাই ভাল লেগেছে তাঁর ? না কি ফ্রিথের পত্রিকাতেই বার হওয়া একটি লেখা শেষ বয়েসে ডনকে প্রভাবিত করল ? লেখাটির বক্তব্য ছিল, ব্রাডম্যান ক্যাপ্টেন হিসেবে বড় বেশি রক্ষণাত্মক ছিলেন। লেখাটি পড়ামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন এক অস্ট্রেলীয়। দ্রুত লম্বা চিঠি পাঠান তিনি 'উইজডেন' অফিসে।

প্রতিভার পাশাপাশি আছে একনিষ্ঠ পরিশ্রম

রিচি বেনো
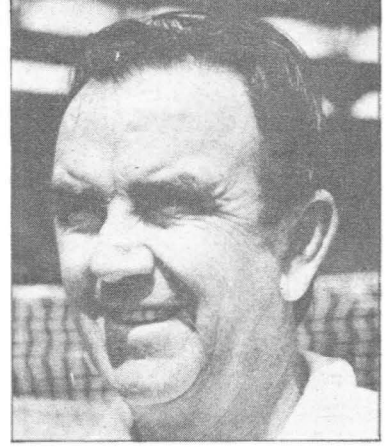
ববি সিম্পসন
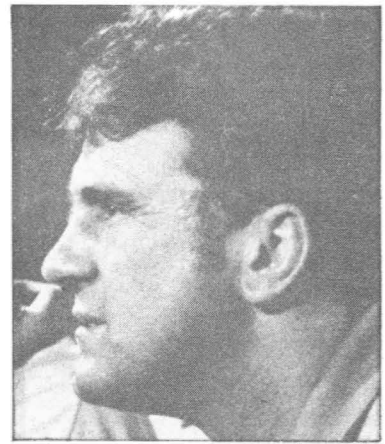
মার্ক টেলর

চিঠিপত্রের দফতরে যথেষ্ট গুরুত্বসহ তা ছাপাও হয়।
পত্রপ্রেরকের নাম ব্রাডম্যান, আর উসকে দেওয়া লেখাটি যাঁর কলমপ্রসূত, তিনি বিল ওরিলি। তবে চুলোয় যাক ব্রাডম্যান-ওরিলি বৈরিতা, ওয়ার্ন যে অন্তত গত ৩০-৪০ বছরের সেরা স্পিনার তা নিয়ে তর্কের বিশেষ অবকাশ নেই। আমরা চিরকাল বলে এবং বিশ্বাস করে এসেছি কপিলদেব বিদেশে জন্মালে আরও বেশি উইকেট পেতেন। ভারতের মরা উইকেটে যিনি ৪৩৪ শিকার সংগ্রহ

করতে পারেন, তিনি বিলেতের ভিজে আবহাওয়া পেলে কী করতেন? একই সঙ্গে এবার এটাও ভাবা যাক, ভারত-পাকিস্তানে জন্মালে ওয়ার্ন কী করতেন ? অস্ট্রেলিয়ার পিচে বাউন্স বেশি, লেগ স্পিনার সামান্য সাহায্য পায় কিন্তু ঘূর্ণি উইকেট নিয়মিত পায় কোথায় ? আজহার-ওয়াদেকর মাঝে বিদেশিদের জন্য এখানে যেসব ভাগাড়ের ব্যবস্থা রেখেছিলেন তাতে বল করতে পেলে ওয়ার্ন হয়তো জিম লেকারের এক টেস্টে ১৯ উইকেটকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফেলতেন।

প্রথম যখন ওয়ার্ন ফুলকি ছোটাতে শুরু করেন দিলীপ বেঙ্গসরকরকে বলতে শুনেছিলাম, "ধুর, কোনও বোলারই না। অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটস্‌ম্যানরা ব্যাকফুট খেলতে অভ্যস্ত। স্পিনারের বিরুদ্ধে পা ব্যবহার করতেই জানে না ওরা। আমাদের বা পাকিস্তানিদের উইকেট নিক, তারপর মানব, বড় বোলার।"

বেঙ্গসরকর যেমন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যাপারে তাঁর মতামত সম্পূর্ণ উলটে ফেলেছেন, ওয়ার্নের বেলায়ও তাই। এবং শুধু তো টেস্ট ম্যাচ নয়, ওয়ার্ন ধারাবাহিক পারফর্ম করে যাচ্ছেন একদিনের ম্যাচেও। ব্রাডম্যানের বলার মধ্যে কতটা আন্তরিকতা আছে সে-সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ান রিপোর্টাররাও হয়তো নিঃসন্দেহ নন। ববি সিম্পসন কিন্তু খুব আপ্লুতভাবে বলেছিলেন, ওয়ার্নই তাঁর দেখা সেরা স্পিনার। বলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়ায় ওকে ঘিরে যে উন্মাদনা তার আঁচ ব্রাডম্যানের পর কাউকে পোয়াতে হয়নি।

পেশাদারি বিনোদনের জগতে ঈর্ষা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। ঈর্ষার জ্বলুনি সহ্য করতে না পেরে মহাতারকাকে মনোবিদের সাহায্য নিতে হয়েছে, এমন ঘটনাও হাতের কাছে মজুত। আচ্ছা, ওয়ার্নকে কি ওঁর টিমমেটরা হিংসে-টিংসে করেন না ? সিম্পসন প্রশ্ন শুনে হাসলেন, "একেবারেই না। বরং শেনকে ধন্যবাদ দেয়, ওদের ওপর থেকে চাপটা সরিয়ে নেওয়ার জন্য। শেন থাকায় নজরটা থাকে ওর ওপর। বাকিরা খোলা মনে খেলতে পারে।"

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে একটা কথা চালু আছে, 'মেটশিপ'। মানে 'বন্ধুত্ব'। একে অন্যের জন্য। 'একা' কেউ নয়। আলাদা করে নয়। এই মেটশিপের আদর্শ মডেল ওয়ার্ন। ওঁকে ইন্টারভিউ করতে গিয়ে প্রথম প্রশ্নটা করেছিলাম, "আপনার সাফল্যের গল্প তো প্রায় রিপ্লে-র বিলিভ ইট অর নট-কে ধরে ফেলার মতো। অস্ট্রেলীয় বোর্ডের অকাদেমি থেকে যে অভব্যতার জন্য ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিল সে যদি এমন তুঙ্গস্পর্শী সাফল্যের রথে উঠতে পারে তাকে রিপ্লে-র বিলিভ ইট অর নটের সঙ্গে তুলনা ছাড়া আর কী করব ?" ওয়ার্ন কিন্তু লজ্জায় পড়ে গেলেন, "টিম মে-র প্রভাব আমার ওপর খুব পড়েছে। আমাদের কম্বিনেশনটা খুব কাজ করেছে। আমি ওর সঙ্গে বল করে খুব আনন্দ পাই। আমাদের ব্যাটস্‌ম্যানদেরও আমি খুব প্রশংসা করব। আমাদের ছ'জন খুব ভাল ব্যাটস্‌ম্যান আছে যারা নিয়মিত রান করে বিপক্ষের ওপর চাপ রাখে। আমরা পরে বা প্রথম, যখনই বল করার সুযোগ পাই না কেন, হাতে প্রচুর রান থাকে।"

"ববি সিম্পসন আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন...বেনো অনেক কিছু শিখিয়েছেন...মার্ক টেলর সাহায্য করে যাচ্ছেন সবসময়," ওয়ার্ন এবার লম্বা ফিরিস্তি দিতে শুরু করলেন। সেই ওয়ার্ন যাঁর আদর্শ ইয়ান বোথাম (যাবতীয় নিয়মকানুন ভেঙে তছনছ করে দেওয়ার জন্য) এবং যাঁকে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট 'সংশোধিত বিদ্রোহী' বলে জানে। "এ সব শিক্ষক পেয়েছি আমার ভাগ্য।"

কিন্তু দিনের শেষে তো আর শিক্ষক নন, ছাত্র এবং কেবল ছাত্রকেই আসল কাজটা করে দেখাতে হয়। "হ্যাঁ, হয়তো তাই। আমি কখনও হাল ছেড়ে দিই না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করি। কিন্তু সে তো অনেকেই করে। মোদ্দা কথাটা হল, আমার ভাগ্য ওদের চেয়ে ভাল।"

রিচার্ড হ্যাড্‌লি বলেছেন, "কপিলদেবের রেকর্ড যদি কেউ ভাঙতে পারে তো সে আপনি। আপনার কী মত ?"

"আমার কী মত," ওয়ার্ন আবার যেন লজ্জায় পড়ে গেলেন। "উফ, নিজেকে গভীর সম্মানিত মনে করেছিলাম যখন প্রথম এই মন্তব্যটা শুনি। হ্যাড্‌লি আমার সম্পর্কে এত বড় ধারণা পোষণ করেন শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। তবে একটা কথা আমি ভালই বুঝি। লক্ষ্য বহু-বহু-বহু দূর। যিশু, আমি কী পারব ?"

আমরা অবশ্যই ব্রাডম্যান নই, যিশুও না, কিন্তু একটা ছোট ভবিষ্যদ্বাণী করতেই পারি, ওয়ার্ন থেকে যাবেন আরও অনেক দিন। এই মানসিকতার লোক হাউইয়ের মতো দ্রুত ছাই হয়ে যেতে আসেন না।

ফাগোয়ারার দিনগুলি

বাইচুং ভুটিয়া

জে সি টি-তে বিজয়ন আর আনচেরির সঙ্গে খেলতে পেরে যতটা খুশি বাইচুং, ঠিক ততটাই দুঃখিত কলকাতার অসংখ্য ফুটবল অনুরাগী ও ভক্তদের ছেড়ে গিয়ে।

মাঝে-মাঝে স্বপ্নে কলকাতার ফুটবল-পাগল দর্শকদের ভালবাসার সেই ছবিগুলো ভেসে ওঠে। গ্যালারি থেকে সেই আমার নামে জয়ধ্বনি, সেই আমাকে একবার ছুঁয়ে দেখার আকুলতা, স্পর্শ পেলে আনন্দে উদ্বেল হওয়ার উচ্ছ্বাস, না, ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। দিল্লি থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরের ছোট্ট শহর ফাগোয়ারায় এসেছি মাসপাঁচেক হল। এর মধ্যেই রীতিমত হাঁফিয়ে উঠেছি আমি। হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, কেন ? উত্তরে বলব, যতই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখুক আমাদের ক্লাব জে সি টি, ফুটবল-উন্মাদনা একদম নেই এখানে। কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটের জমজমাট অঞ্চল দিয়ে তো বটেই, সল্টলেকের ফাঁকা রাস্তায় যখন হেঁটে বা বাইকে চেপে ঘুরতাম তখন আমাকে দেখতে কত আগ্রহী মানুষই না দাঁড়িয়ে যেতেন ! বলতেন, "ওই দ্যাখো বাইচুং যাচ্ছে।" ছোট্ট বস্তির ভাঙা টালির চালের ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসা কিশোর থেকে অ্যাটাচি হাতে সওদাগরি অফিসের পদস্থ কর্মীরাও বলতেন, "গোল চাই ভুটিয়া, গোল চাই।" এসব কিছুই নেই পঞ্জাবের এই শিল্পশহরে। বাজারে, জনবহুল রাস্তায় হেঁটে গেলে কেউ ফিরেও তাকান না আমার, বিজয়ন বা তেজিন্দরের দিকে। এটা কি ভাল লাগে ?

অথচ ক্লাব আমাদের কোনও ব্যাপারেই কার্পণ্য করে না। চার রুমের একটা এয়ারকন্ডিশনড বাড়িতে আমরা পাঁচজন থাকি। আমি, চ্যাপম্যান, বিজয়ন, আনচেরি আর বার্নার্ডি। ঘরে সাত চ্যানেলের রঙিন টিভি। বেল টিপলেই ইচ্ছামতো খাওয়ার ব্যবস্থা। সুইমিং পুল, মাল্টিজিম, একটা মোহনবাগানের চেয়েও ভাল মাঠ আছে, অভাব নেই কোনও কিছুই। তবুও, হ্যাঁ, তবুও, এই পরিবেশ আমার একেবারে ভাল লাগে না।

আমাদের দিন শুরু হয় সাড়ে পাঁচটায়। ঘুম ভাঙায় কখনও রুমমেট কার্লটন, কখনও পাশের ঘরের বিজয়ন। চা খেয়েই ঘণ্টাতিনেকের অনুশীলন। ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে হয় সাঁতারে যাওয়া, নয়তো কঠিন বা ভারী অনুশীলন হলে টিভি দেখা বা গান শোনা। মাঝে-মাঝে ক্লাবে গিয়ে দুপুরটা 'স্নুকার' খেলেই কাটিয়ে দিই। ঘড়ি ধরে দুপুর সাড়ে বারোটায় খাওয়াও সারতে হয় এরই মধ্যে। তারপর বিকেলে আবার প্র্যাকটিস ঘণ্টাখানেক। রাতে হয় টিভিতে খেলার 'ক্লিপিংস' বা সিনেমা দেখা, নয়তো ব্যাডমিন্টন খেলা। বাঁধাধরা জীবন। জগজিৎ কটন মিল্সের নথিভুক্ত কর্মী না হয়েও তাই আমরা সব

যখন ইস্টবেঙ্গলে খেলতেন ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

শূন্যে শরীর ভাসিয়ে ঐতিহাসিক সেই ব্যাকভলি *ফোটো : সন্তোষ ঘোষ*

অর্থেই ফুটবলকর্মী, শিল্পী নই।
সিকিমের যে-গ্রামে আমার জন্ম, সেই তিগিতাব গ্রামটা ভারী সুন্দর। পাহাড়ি গ্রাম যেমন হয় সেরকমই। ছোট-ছোট বাড়ি আর অসংখ্য সবুজ গাছগাছালি। এখানে শিশুরা আপন খেয়ালে বড় হয়ে ওঠে। আমি বা এখন ইস্টবেঙ্গলে খেলা শেরাপরা যেভাবে বড় হয়ে উঠেছি। ফুটবলার হয়তো নাও হতে পারতাম। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় পাল্লা দিতে হয়তো ইডেনে নামতে হত আমাকে। হয়ে যেতে পারতাম কাকা এবং আমার 'ফিলজফার অ্যান্ড গাইড' কর্মা ভুটিয়ার মতো সরকারি অফিসার। তা সত্ত্বেও আমি বেছে নিয়েছি ফুটবলকে, কারণ খেলাটা আমার ভাল লাগে। এর উন্মাদনা আমাকে উদ্দীপ্ত করে।
যে-কথা বলছিলাম, সেই উন্মাদনাই নেই জে সি টি-তে। গত পাঁচ মাসে মাত্র দশদিন থেকেছি ক্লাবের বাংলোয়, তবুও হাঁফিয়ে উঠেছি। বাঙ্গালোরে জাতীয় ক্যাম্পেও একই অবস্থা। আক্রামভের শাসন আর ফুটবল-এর বাইরে আর কোনও জীবন নেই। কলকাতার মতো ঝুড়িভর্তি 'ফ্যান লেটার' নেই, 'বাইচুং'-'বাইচুং' চিৎকার নেই, ফুটবলের স্রোতে ভেসে যাওয়ার মতো জায়গা নেই। তবুও কলকাতা ছেড়ে গেছি আমি। কারণ, তা না হলে বাঁচতাম না। বিশ্বাস করুন, একের পর এক টুর্নামেন্ট খেলে-খেলে শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। ৩৬৫ দিনে দেড়শো ম্যাচ। মানুষ বাঁচে! সিকিম থেকে যা নিয়ে এসেছিলাম তার থেকে একটুও বাড়াতে পারছিলাম না। শেখার সুযোগ নেই। কখনও নঈমসার, কখনও আক্রামভ শুধুই জয় পেতে চাইতেন আমাকে দিয়ে। প্রতিদিন গোল করার চাপ। জেতানোর চাপ। একটা অটোমেটিক মেশিনেরও তো বিশ্রাম দরকার। মনে হচ্ছিল, আমার পনেরো বছরের ফুটবল-জীবন পাঁচ বছরেই শেষ হয়ে যাবে। তাই পালাতে চেয়েছিলাম অনেকদূর। ডাক এসে গেল জে সি টি-র। ভালবাসার শহর, আমাকে উজাড় করে দেওয়া প্রিয় কলকাতাকে তাই ছাড়তেই হল বাধ্য হয়ে, বাঁচার জন্য। আফসোস হলেও সুসজ্জিত বাংলোর নরম বিছানায় শুয়ে তাই এ-কথা ভেবে সান্ত্বনা পাই—আরও কিছুদিন ফুটবল খেলতে পারব আমি।
কিন্তু তবুও, মাঝে-মাঝেই দেখতে ইচ্ছে করে প্রিয় শহরকে। ভুলতে পারি না। বাঙ্গুরে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি আমি। ভাইরা ওখানেই থাকে। সুযোগ পেলে চলে আসি। যেমন এসেছিলাম ফেডারেশন কাপের সময়। দলের ফল অবশ্য ভাল হয়নি এবারের ক্লাব চ্যাম্পিয়ান টুর্নামেন্টে। বিশ্রীভাবে টাইব্রেকারে হেরে গেছি আমরা, ডেম্পোর কাছে। দারুণ বকাবকি করেছেন কোচ সুখবিন্দর সিংহ। ভেবেছিলাম ফাইনাল খেলব ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। সে-সুযোগ আর হয়নি। সেমিফাইনালে খুবই বাজে খেলেছিলাম। গোল তো করতেই পারিনি, টাইব্রেকারেও শটটা পোস্টে মেরে দলকে ডুবিয়েছি। তাই দুঃখ হচ্ছে বইকী! মাঠে শুনলাম অনেকেই বলছেন, 'যেমন চলে গেছ, এবার বোঝো, হাল কী হয়।' ওদের দুঃখ, ক্ষোভ আছে বুঝি। কিন্তু বাইচুং তো এখানে থাকতেও অনেক ম্যাচ খারাপ খেলেছে, সেগুলো কেন ভুলে গেলেন? একজন ফুটবলারের প্রতিদিন ভাল যায় না। মারাদোনারাও ব্যর্থ হন। আর আমি তো কোন ছার! এগুলো সাফাই নয়, ফুটবলার হিসেবে আত্মোপলব্ধি।
তবুও কলকাতা আমার প্রিয় শহর। এখানে আবার ফিরতে চাই আমি। কিন্তু ফুটবল পরিকাঠামোর বদল দরকার। পরিবর্তন দরকার কর্মকর্তাদের মানসিকতার। পঞ্চাশটির বেশি ম্যাচ যাতে না খেলতে হয় তার ব্যবস্থা করুক ক্লাবগুলো। তা হলে আবার ফিরবে আপনাদের বাইচুং, এই কলকাতায়।

জে সি টি-র তিন মহাতারকা : বাঁ দিক থেকে বাইচুং, বিজয়ন আর আনচেরি *ফোটো : সন্তোষ ঘোষ*

অনুলিখন : রতন চক্রবর্তী

আনন্দমেলা
শচীন তেন্ডুলকর
ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন অধিনায়ক হয়েছেন শচীন তেন্ডুলকর। ব্যাটিং-এর মতো নেতৃত্বেও তিনি সফল হবেন, আশা করা যায়। বিশ্ব-ক্রিকেটে ভারতকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান এনে দেওয়ার সমস্ত গুণই আছে শচীনের।
ফোটো : প্যাট্রিক ইগার
OFFICIAL T.STE
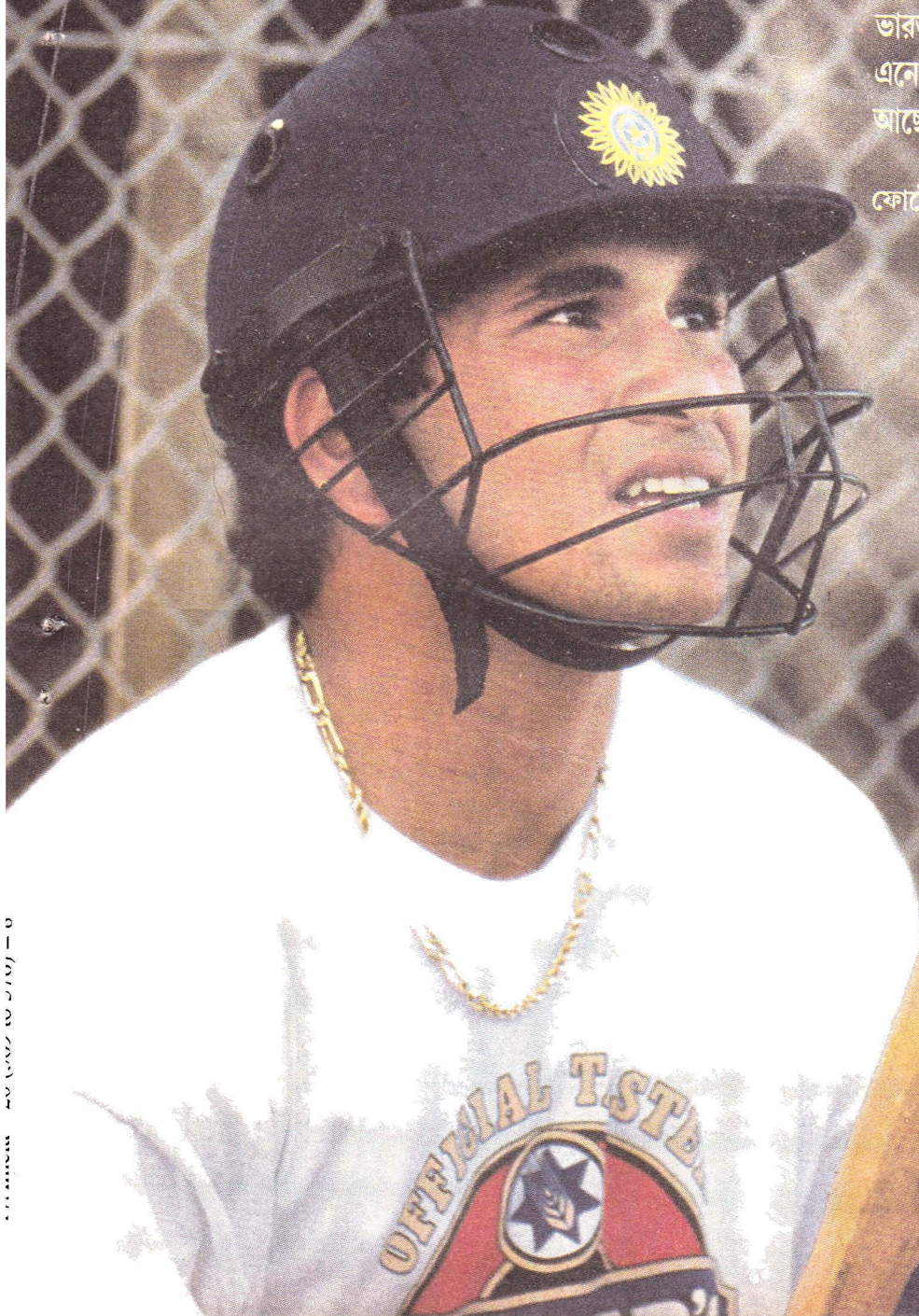
খেলাতেও আছে বিজ্ঞানের নানা নিয়ম

পৌলোমী সেনগুপ্ত

শীতকাল বললেই মনে পড়ে মেলা, কমলালেবু, রঙিন সোয়েটার, মিঠে রোদ আর অবশ্যই সার্কাস। সার্কাসের অন্যতম মজার খেলা কী? অবশ্যই জিমন্যাস্টিকস বা ভারসাম্যনির্ভর খেলাগুলি। ভাবলে অবাক হতে হয়, কী অনায়াসে প্রায় অসম্ভবকে-সম্ভব করে তোলেন সার্কাসের কলাকুশলীরা। দর্শকের আসনে বসে মনে হতেই পারে এসব খেলার বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলিকে মোটেই আমল দেওয়া হয় না। এই

জিমন্যাস্টিক্‌সের ভারসাম্যের খেলার পেছনেও কাজ করে বিজ্ঞানের নানা নিয়ম। বিজ্ঞানের সূত্রকে কাজে লাগিয়েই খেলা দেখান সার্কাসের কুশলী শিল্পীরা।

ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছেন সার্কাসের কলাকুশলীরা

ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। এইসব খেলার পেছনেও নিয়মিতভাবে কাজ করে যায় বিজ্ঞান।

সাতের দশকের গোড়ার দিকে মিখাইল সেটিন নামে এক রুশ ক্রীড়াবিজ্ঞানী সার্কাসের নানা খেলার পেছনে কীভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম কাজ করছে, তা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর সব এক্সপেরিমেন্টই হয়েছিল মিনস্কের 'বেলোরুশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল কালচার অ্যান্ড স্পোর্টস' নামে এক গবেষণাকেন্দ্রে।

একজনের ঘাড়ের ওপর অন্য একজনকে দাঁড় করিয়ে একটা লম্বা স্তম্ভ গড়ে তোলার খেলা অনেক সার্কাসেই খুব জনপ্রিয়। এই খেলাটি নিয়েই সেটিন শুরু করেছিলেন তাঁর গবেষণা। প্রথমে একজন সার্কাসশিল্পীর ঘাড়ে অন্য একজনকে ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়াতে বলা হল। তারপর সেটিনের নির্দেশে নিভে গেল ঘরের সব আলো। এতে অবশ্য শিল্পীরা একটুও ঘাবড়াননি। অন্ধকারের মধ্যেও ঠিকই দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা। আবার আলো জ্বলে উঠল। সেটিন এবার তৃতীয় শিল্পীকে দ্বিতীয়জনের ঘাড়ের ওপর উঠে দাঁড়াতে বললেন। তৃতীয়জন উঠে মানব-স্তম্ভ আরও উঁচু করে ফেলার পর আবার নিভিয়ে দেওয়া হল আলো। কিন্তু কী আশ্চর্য! টলে গেল স্তম্ভ। শিল্পীরা ভারসাম্য না রক্ষা করতে পেরে মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হলেন। অথচ সার্কাসের শিল্পীদের কাছে মানব-স্তম্ভ তৈরি করা বেশ তুচ্ছ ব্যাপার। মাত্র তিনজনে তৈরি স্তম্ভ অন্ধকারের ধাক্কায় টলে গেল? অন্ধকারে এই ধরনের স্তম্ভ তৈরি কি সার্কাসের আলোকোজ্জ্বল এরিনায় স্তম্ভ তৈরির চেয়ে কঠিন? 'নিউরোলজিস্ট' বা 'স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞ'রা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সহজেই। এই স্তম্ভ তৈরি মানুষের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতাকে শেষ সীমায় ঠেলে দেয়। আর এই কাজটি সম্ভব হয়েছে শরীরের তিনটি অংশের সমান-সমান অংশ নেওয়ার ফলে। প্রথমত, কানের মধ্যে থাকা 'ভেস্টিবিউলার সিস্টেম' ভারসাম্যের ব্যাপারে কাজ করতে থাকে। এই সিস্টেম শরীরের সামান্য নড়াচড়ারও খবর রাখে। শরীরের অবস্থানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের খবরও কান থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় পলকে। এ ছাড়া, ভারসাম্য রক্ষার কাজে শরীরের স্নায়ুতন্ত্রও থাকে অত্যন্ত সজাগ। প্রতিটি

নড়াচড়ার খবর রাখে এই তন্ত্র। তৃতীয় ভূমিকাটি অবশ্য চোখের, বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, রেটিনার। সাধারণ অবস্থায়, ধরা যাক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, এই তিনটি অংশের একযোগে ব্যবহার দরকার হয় না। কিন্তু যেসব শারীরিক অবস্থানে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন সেখানে তিনটিকেই একসঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। মানব-স্তম্ভ প্রতিটি কলাকুশলীই অল্প-অল্প দুলতে থাকেন; এত অল্প যে, চোখে দেখে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারসাম্য রাখতে দরকার হয় ত্রিমুখী চেতনার। দু'জনের তৈরি স্তম্ভের ক্ষেত্রে চোখের সাহায্য ছাড়াও ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, কিন্তু তিনজনের ক্ষেত্রে তা অসম্ভব। দুইয়ের বেশি সংখ্যায় মানব-স্তম্ভ তৈরি করলে ভারসাম্যের জন্য দরকার শরীরের তিনটি অংশই। এইজন্যই পরীক্ষাগারের আলো নিভিয়ে দেওয়ার পর তিনজনে তৈরি মানব-স্তম্ভ ভেঙে পড়েছিল। অর্থাৎ, এ-কথা প্রমাণিত হয় যে, সার্কাসের আলোকোজ্জ্বল এরিনা ভারসাম্যের খেলার বিশেষভাবে সহায়ক।

মেন্ট্রিয়লের 'সির্ক দিউ সোলেই' (সূর্যের সার্কাস) নামের সার্কাসে কসরত দেখায় সেভেনদর্জ ও উলজিবায়ার চিমেদ—১২ বছর বয়সী মঙ্গোলিয়ান দুই যমজ ভাই। শরীর বাঁকিয়ে নানারকম কৌশল দেখাতে পারে এরা। দেখলে মনে হবে এদের শরীরে 'হাড়' বলে কোনও পদার্থ নেই। অথচ, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে, শরীরকে বাঁকানোর পথে বাধা হল আমাদের মাংসপেশি। এই মাংসপেশিই কিছুটা নমনীয় হলে, শরীরকে ইচ্ছেমতো বাঁকানো সম্ভব। শরীরের হাড়ের কাঠামো আর মাংসপেশি একসঙ্গে কাজ করে শরীরকে এমন এক অবস্থা পর্যন্ত নিয়ে যায়, যাতে কোনও ক্ষতি না হয়। যত বেশি চেষ্টা করা যায়, মাংসপেশি ততই নমনীয় হয়ে ওঠে। তার মানে, শারীরতত্ত্বের দৃষ্টিতে চিমেদ ভাইদের সঙ্গে আমাদের কোনও পার্থক্যই নেই।

এ ছাড়াও অবশ্য জিমন্যাস্টিকসের জগতে আরও একটি রহস্য আছে। আমাদের শরীরে একধরনের প্রোটিন উৎপন্ন হয়, যার নাম 'কোলাজেন'। দেহের ভাঁজ হওয়া বা প্রসারিত হওয়ার সময় কাজে দেয় এই বিশেষ প্রোটিন। কারও-কারও শরীরে উৎপন্ন কোলাজেন প্রসারণ-সঙ্কোচনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কোলাজেন কীরকম হবে তা নির্ভর করে জিনের ওপর।

জাগলিংয়েও আছে অঙ্ক

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে অঙ্কশাস্ত্রের গবেষকরা 'জাগলিং' ব্যাপারটা নিয়ে খুবই উৎসাহী। দশম শতাব্দীর বিখ্যাত অঙ্কবিদ আবু সাহল বাগদাদের বাজারে কাচের বোতল নিয়ে লোফালুফি করতেন। কিন্তু গত দশকের অঙ্কবিদরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন 'জাগলিং ম্যাথমেটিক্স'। এই প্রথার অন্যতম প্রবর্তক রন গ্রাহাম এখনকার বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং ইন্টারন্যাশনাল জাগলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি।

গ্রাহাম আবিষ্কার করেছেন যে, জাগলিংয়ের সাহায্যে 'ইকোয়েশন' বা 'সমীকরণ'-এর সমাধান সম্ভব। এবং এর সাহায্যে তিনি কিছু অঙ্কের সূত্রও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। গ্রাহাম মনে করেন, এই সূত্রগুলি খুবই সহজ। যেমন, পাঁচের কম সংখ্যক বল চারবার শূন্যে ছুড়ে কয়েকটি বিভিন্ন 'সিকোয়েন্স' বা 'ক্রমাবর্তন' তৈরি করা সম্ভব? উত্তর হল 5^4 বা 625। কম্পিউটারের সাহায্যে গ্রাহাম জাগলিং ম্যাথসের আরও কিছু সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

কোনও-কোনও মানুষের শরীরে পাওয়া যায় 'এহলার্স-ডানলোস সিনড্রোম'—এমন জিন, যার তৈরি কোলাজেন সাধারণের চেয়ে বেশি প্রসারণযোগ্য। সেভেনদর্জ বা উলজিবায়ারের শরীর এই কোলাজেনের জন্যই বিস্ময়করভাবে নমনীয়। কিন্তু মজা হল, এহলারস-ডানলোস সিনড্রোম আছে এমন মানুষের সংখ্যা কিন্তু খুব কম নয়, আসলে বেশিরভাগ মানুষ এই খবরটাই জানেন না। অনেকেই হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন এ-কথা না জেনেই যে, তাঁরা চাইলে সার্কাসে চাকরি পেয়ে যাবেন এখনই।

অনেক সময়ই দেখা যায় শূন্যে লাফিয়ে উঠে ডিগবাজি খাওয়ার সময় শিল্পী দু' পা ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে যান। সার্কাসের কোচেরাও এই ব্যাপারটির ওপর জোর দেন, কেননা এতে ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গিটি আরও ভালভাবে দেখা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

মানব-স্তম্ভ
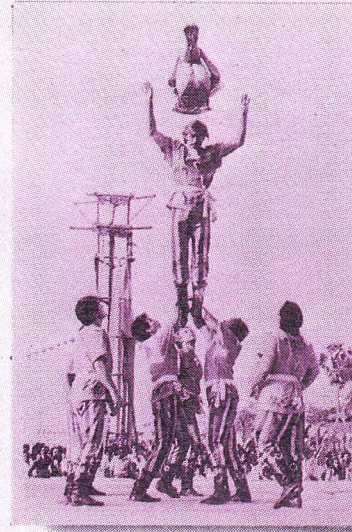
শূন্যে লাফিয়ে উঠে পা বুকের কাছে টেনে ভাঁজ করা অসম্ভব। তা হলে কীভাবে হয় এই কাজটি?

নিউটনের তৃতীয় সূত্রকে এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে। সোজা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা থেকে লাফালে কোনও 'কৌণিক ভর' বা 'অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি' থাকতে পারে না। সুতরাং লাফানোর সময়ই শরীরকে পেছনে একটু হেলিয়ে রাখার পরামর্শ দেন কোচেরা। সমস্ত শরীরকে পায়ের সঙ্গে সরলরেখায় না রেখে, সেই রেখা থেকে শরীরের উপরিভাগ একটু বাইরে রাখা হয়। এর ফলে দেহ সোজা ওপরে না গিয়ে একটু পেছনদিকে চলে যায়, যার ফলে ডিগবাজি খাওয়া বেশ সহজ। এর পর যখন শিল্পী পা ভাঁজ করে বুকের কাছে তোলেন বলে মনে হয়, তখন আসলে তিনি শরীরের ওপরের অংশ পায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। এই সম্পূর্ণ কাজটি কিন্তু গতিবেগ সম্পর্কিত নিয়মগুলির বাস্তব প্রয়োগের ফলে ঘটে। "আসলে, সমস্ত শরীরটাই ঘুরছে। তাই মনে হয় কাঁধ দুটি নড়ছে না, নড়ছে শুধু পা দুটি। কিন্তু নড়ে দুটোই।" বলেন বরিস ভেরকোভস্কি, বিখ্যাত সার্কাসের কোচ। বরিস অবশ্য তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এমন কোনও শিল্পীকে বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করে বলেন না। তিনি বলেন, "এসব কেউ সোজাসুজি বোঝায় না। কোনও নির্দেশে এখানে কাজ হবে না। বরং অভ্যাস গড়ে তোলাটাই মূল কথা।" অর্থাৎ, সার্কাসের খেলাগুলির পেছনে বিজ্ঞানের নিয়মগুলি কাজ করে চলে নিজের মতো। জেনে বা না-জেনে এই নিয়মকানুন কাজে লাগিয়ে নেওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে কোচ ও কলাকুশলীদের সাফল্য।

মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এখনও
দেখা মেলে আদিম অরণ্যের

গারো পাহাড়ের ডাকে

মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ জুড়ে আছে গারো পাহাড়। এখানকার আদিম অরণ্যে এখনও আছে বিরল প্রজাতির সব পশুপাখি। আছে ছবির মতো সুন্দর এক-একটি জনপদ, মানুষ আর নদী। আছে রহস্যময় এক গুহা, যার প্রবেশপথে সারাদিন জেগে থাকে রামধনু।

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

ভারতবর্ষের বুকে এখনও যদি কোথাও আদিম বনভূমি টিকে থাকে, তা হলে তা আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। বিশেষত অরুণাচল ও মেঘালয় রাজ্যে। গভীর, রহস্যময় সব বন। অন্যান্য রাজ্যের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এসব বনের পরিচিতি প্রায় নেই বললেই চলে।

মেঘালয়ের দুই পাহাড়— গারো আর খাসি। গারো পাহাড় আছে মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ জুড়ে। গুয়াহাটি থেকে গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি আর কৃষ্ণৈ হয়ে রাস্তা সোজা গিয়েছে পশ্চিম গারো

জঙ্গলের পথে চোখে পড়ে হাতির পাল

পাহাড়ের দিকে। ওই রাস্তা ধরেই যাওয়া যায় তুরা নামের সদর শহরটিতে। সমতল থেকে রাস্তা ওপরে উঠতে শুরু করলেই চোখে পড়ে সুপারি গাছের বন। দৃশ্যটা হঠাৎ কেরলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সুপারি বনের ফাঁকে-ফাঁকে আছে লম্বা-লম্বা বাঁশের ঝাড়। চারপাশ ভারী পরিচ্ছন্ন।

তুরা শহরটিও বেশ পরিচ্ছন্ন। ৬৬০ মিটার উঁচু এই ঝকঝকে শহরে প্রায় সব রকম শহুরে সুযোগসুবিধে তো আছেই, আর আছে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বেশ কয়েকটি বাংলো

আছে এখানে, আছে ছোট-বড় হোটেল। শহরের উপকণ্ঠে ৮৭৩ মিটার তুরা শৃঙ্গে 'ট্রেক' করারও ব্যবস্থা আছে।
তুরা-র ৪০ কিলোমিটার দূরে আছে রোমাঞ্চকর এক অরণ্য— নক্‌রেক। জীবপরিমণ্ডলের বৈচিত্র্যের জন্য নক্‌রেককে করা হয়েছে 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ'। নক্‌রেকে ঢোকার মুখে ছোট্ট গ্রাম ডারবোকগিরি। এখানে আছে অল্প কয়েকটা ঘর, বনবিভাগের বাংলো আর বনবিভাগ পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়।
বাংলোয় পৌঁছনোর খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন অশীতিপর গ্রামপ্রধান জ্ভান মোমিন। গ্রামপ্রধানের স্থানীয় নাম 'নক্‌মা'। এখানকার গ্রামজীবনে এঁরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন।
ডারবোকগিরি থেকে রাস্তা উঠে গেছে নক্‌রেকের দিকে। নুড়ি-ছড়ানো রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে গিরিশিরার ওপর দিয়ে। চলার পথের দু'ধারের খাদে সবুজ অরণ্য আর সামনে ঢেউয়ের মতো পাহাড়ের সারি। সাড়ে সাতচল্লিশ বর্গ কিলোমিটার নক্‌রেক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে আছে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির পাখি। পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠতে উঠতেই চোখে পড়ে দলবদ্ধ বুনো হাতির সারি। পাহাড়ের ঢালে ওদের ঘুরতে দেখা যায়। ১৪১৮ মিটার উঁচু নক্‌রেক শৃঙ্গে ওঠার শেষ অংশ বেশ খাড়াই।
নক্‌রেক শৃঙ্গ থেকেই বের হয়েছে সিমসাং নদী। পাড়ে দাঁড়ালে নদীর স্বচ্ছ জলে দেখা যায় মহাশের ও চিতল মাছের ঝাঁক।
নক্‌রেক থেকে ডান দিকে রাস্তাটা চলে গেছে উইলিয়াম্‌স নগর হয়ে সিজু অভয়ারণ্যের দিকে। সিজু যাওয়ার রাস্তার পাশে-পাশেই বয়ে চলে সিমসাং। সিজুতে সিমসাং যেন হয়ে ওঠে আরও রহস্যময়। নদীকে এখানে ঘিরে আছে গভীর সবুজ অরণ্য। নদীর জলে মাছের আশায় ইতস্তত উড়ে বেড়ায় 'রিভারটার্ন'-এর ঝাঁক। নদীর পাড়ের ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটোছুটি করে 'লিট্‌ল স্টিন্ট' আর 'স্যান্ডপাইপার' পাখিরা।
সিজুতে আছে আগর গাছ। কোনও কোনও আগর গাছে একধরনের ছত্রাক জন্মায়। আর সেই ছত্রাক থেকে তৈরি হয় একধরনের সুবাসিত তেল। বিদেশে, প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যে এই তেলের দাম কিলোগ্রাম প্রতি এক লক্ষ টাকা। শুধুমাত্র সিজু নয়, সমস্ত গারো পাহাড় জুড়েই আগর গাছ দেখতে পাওয়া যায়।
সিজুর অরণ্যে আছে খুব পুরনো ও দীর্ঘ এক গুহা। গুহার প্রবেশপথে সবসময় জল ঝরে চলেছে। সারাদিন সেখানে জেগে থাকে রামধনু। গুহার মধ্যে বয়ে চলে সিমসাং নদীর একটি ধারা। নদীর জলে অজস্র ছোট-বড় মাছ। গুহার অন্ধকারে বাস করে অন্তত দশ প্রজাতির বাদুড় জাতীয় প্রাণী। গুহার বাইরে সিমসাংয়ের পাড়ে আছে অজস্র ফসিল। এগুলির অধিকাংশই জলজ প্রাণীর। জীববিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিকদের কাছে সিজুর এই গুহা এক বড় আকর্ষণ।
গারো পাহাড় জুড়ে শোনা যায় মিষ্টি একটা ঘণ্টার শব্দ। এই শব্দ সৃষ্টি করে বড় ডানাওলা একধরনের রঙিন পোকা। যখন এরা ওড়ে তখন ছোট পাখি বলে ভুল হয়। এদের নাম 'সিকাডো'। সিকাডো গারোদের প্রিয় খাদ্য। সিকাডো ধরে ওরা পুড়িয়ে খায়।
সিজু থেকে পুব দিকে এগোলে বাঘমারা জঙ্গল। বাঘমারার কিছুটা আগেই পাহাড়ের গায়ে দেখা পাওয়া যাবে

দু'পাশে গভীর জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নির্জন রাস্তা

পতঙ্গভুক গাছ 'পিচার প্ল্যান্ট'-এর। ফুলের ভেতরটা ফাঁপা আর ওপরের দিকে একটা ঢাকনা আছে। পোকামাকড় বসলেই ঢাকনাটা খুলে যায় আর পোকামাকড় ভেতরে পড়লেই ঢাকনা আবার বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত এলাকাটিকেই 'পিচার প্ল্যান্ট সাংচুয়ারি' ঘোষণা করা হয়েছে।
বাঘমারা ছেড়ে আরও পুব দিকে এগোতে থাকলে বাঁ দিকে পড়বে গভীর সবুজ অরণ্যে ভরা গিরিখাদ, আর ডান দিকে অনেক নীচে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বিস্তৃত সমতল। সিমসাং বাংলাদেশে প্রবেশ করে নাম পেয়েছে সোমেশ্বরী। গিরিশিরার ওপর দিয়ে

রাস্তা চলে গেছে ১৫০ কিলোমিটার দূরের বালফাক্রামে। এ-রাস্তায় না আছে কোনও যানবাহন, না কোনও জনপদ। অনেকটা পর-পর ইতস্তত ছড়ানো-ছেটানো একটা-দুটো টিনের চালের বাড়ি। সন্ধে হতে না হতেই সব ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ। রাস্তায় সর্বত্রই বানরের উৎপাত। পড়ন্ত বিকেলে রাস্তার ওপর নেকড়ে বা খাদের ধারে বাঘ বা চিতাবাঘের দর্শন পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। পথের শেষ হবে মহাদেও-এ পৌঁছে। তুরা আর মহাদেওয়ের মধ্যে সারাদিনে একটিমাত্র বাস চলাচল করে। মহাদেওয়ের বনবিভাগের বাংলোটি বেশ বিলাসবহুল।

বালফাক্রামে ঘুম ভাঙে গিবনের হু-কু, হু-কু চিৎকারে। দূরবিনে চোখ রাখলে দেখা যাবে দূরে গাছের ডালে গিবনদের ব্যস্ততা। কুচকুচে কালো শরীরে সাদা ভুরুওয়ালা এই গিবন দেখতে বেশ মজার। বাংলোর পেছন দিয়ে জঙ্গলে ঢোকবার পায়েচলা কাঁচা পথ। দু'পাশে গা-ছমছম-করা গভীর বন। গাছের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে শিশু, চাপ, শাল, গামার, তিতা চাপ, কোকোন, পোমাং, বুনো কমলালেবু, বুনো কলা, বাঁশ, বেত প্রভৃতি। এ ছাড়া আছে গুরুত্বপূর্ণ আগর গাছ। অরণ্য আলো করে থাকে নানান বনফুল— ডেইজি, ল্যান্টানা, আজেলিয়া, বুনো টগর, কাঞ্চন ও আরও কত কী! মাইকেনিয়া লতা এ-জঙ্গলের বড় সমস্যা। মাইকেনিয়া অন্য গাছকে জড়িয়ে ধরে আস্তে-আস্তে মেরে ফেলে। আর আছে নাম-না-জানা অর্কিড। জঙ্গলে চলার পথে হাতির সামনে পড়তে হতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। গাছের মগডালে লাফালাফি করে জায়ান্ট স্কুইরেল। বিরল নানা প্রাণীর 'বাড়ি' এই বনভূমি। মার্বেল্ড ক্যাট, ক্লাউডেড লেপার্ড, গোল্ডেন ক্যাট-এর মতো বিপন্ন প্রজাতির বেড়ালও আছে। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে আছে স্লো লরিস, সেরো, গোরাল, বিন্টুরং, লাল পাণ্ডা প্রভৃতি। বড় প্রাণীর মধ্যে এই জঙ্গলে আছে বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি ও গাউর।

রঙিন পাহাড়ি পাখির মেলা বসে বালফাক্রামে। লং টেল্ড সিবিয়া, মালকোহা, ফর্কটেল, পেকিন রবিন, নানান জাতের থ্রাশ ও ওয়ার্বলার। গহন বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের ওপরে। এই রাস্তা ১৩ কিলোমিটার লম্বা। রাস্তার প্রতি বাঁকেই

পতঙ্গভুক 'পিচার প্লান্ট'

অপেক্ষা করে আছে অজানা রহস্য। ঝোপের আড়ালে কোথাও হয়তো লুকিয়ে আছে চিতাবাঘ, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে সব দেখছে। ওদিকে নীচে, গভীর খাদ থেকে ভেসে আসে হাতির বৃংহণ। রাস্তা শেষ হয়েছে এক

জঙ্গলের মধ্যে আছে 'মেরিট', যার অর্থ ছোট টিবি। প্রায় সাত ফুট এই টিবির ওপরে বাস করেন ফসলের দেবী 'রোক্কিমি'। এখানকার মানুষদের বিশ্বাস, বর্ষার পর টিবির যেদিক দিয়ে নুড়ি গড়িয়ে পড়ে, সে-বছর সেদিকেই ফসল বেশি হয়।

মালভূমিতে। মালভূমির সামনে এক গভীর সবুজ গিরিখাদ। সেখানে বয়ে চলে রাংবা, মহেশখোলা আর মহাদেও-খোলা নদী। এই তিন নদীর উৎস এই গিরিখাদ। বাঁ-দিকে সবুজ ঘাসে মোড়া একটা ঢালু জায়গা। সেখানে চরে বেড়ায় গাউর-এর ছোট-বড় দল।

গারোরা বিশ্বাস করেন, সমস্ত গারোকেই একবার যেতে হয় বালফাক্রামের এই মালভূমিতে। মালভূমির তিন কিলোমিটার দূরে আছে একটি জলাশয়। নাম 'চিড়িমাক'। মৃতদের আত্মারা মালভূমিতে বিশ্রাম করে এবং এই জলাশয়ে স্নান করে শুদ্ধ হয়। জঙ্গলের মধ্যে আছে 'মেবিট', যার অর্থ ছোট টিবি। প্রায় সাত ফুট এই টিবির ওপরে বাস করেন ফসলের দেবী 'রোক্কিমি'। এখানকার মানুষদের বিশ্বাস, বর্ষার পর টিবির যেদিক দিয়ে নুড়ি গড়িয়ে পড়ে, সে-বছর সেদিকেই ফসল বেশি হয়!

ফোটো : লেখক

নির্মল অনুভূতিতে হয়ে উঠুন শ্রীময়ী !
শিশির ভেজা প্রাতে অথবা তারায় ভরা রাতে অথবা অন্য যেকোন সময়ে যখন আপনি জানেন যে আপনাকে দারুন দেখাচ্ছে, তখনই আপনার দেহ-মন উপলব্ধি করে এক বিশেষ অনুভূতি। আর এর উৎস হোল পরিষ্কার, সুচ্ছ ত্বক।
অ্যান্ ফ্রেঞ্চ ডীপ্ ক্লীনজিং মিল্ক এর কাজ সেখানে শুরু, যেখানে সাবান ও জলের কাজ সারা। অ্যান্ ফ্রেঞ্চ ডীপ্ ক্লীনজিং মিল্ক ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে অতিরিক্ত তৈলাক্তভাব, ধুলো ময়লা আর মেক্-আপ মুক্ত করে রন্ধ্রমুখগুলো, যা অন্যথায় ত্বকের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তো এর ব্যবহার আপনার মুখায়বে ছড়িয়ে দেয় এক তরতাজা প্রানবন্ত অনুভূতি।
দিনে, রাতে ব্যবহার করুন অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ্ ক্লীনজিং মিল্ক এমন এক সুন্দর ত্বকের জন্য যা বাইরেও পরিষ্কার, ভেতরেও পরিচ্ছন্ন। দেখবেন,আপনি হয়ে উঠবেন অনন্যা।
Anne French
ডীপ্ ক্লীনজিং মিল্ক এত গভীরে পরিষ্কার করে, আর কেউ না পারে।
Anne French

অরণ্যদেব

অরণ্যের কাছাকাছি গড়ে উঠছে নতুন-নতুন শহর আর জনপদ।

ভরে উঠছে মাঠ আর কারখানায়, ওখানে একসময় সিংহের গর্জন শোনা যেত ...
গভীর অরণ্যে একটা জিনিস এখনও বদলে যায়নি।
গুপ্ত সম্পদ সবসময় মানুষকে কৌতূহলী করেছে ...
স্প্যানিশ মহাসমুদ্রে ডুবে থাকা স্বর্ণভাণ্ডার ...

রাজা সলোমনের হারিয়ে যাওয়া বিপুল সম্পদ ...

এবং জলদস্যুদের হারিয়ে যাওয়া বিপুল সম্পদের খোঁজ চলছেই ...

কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য,সবচেয়ে আলোচিত হল অরণ্যদেবের খুলিগুহার সম্পত্তি ...

এক রাজা এক সময় গভীর জঙ্গলে এটা দেখতে যান
ছেলেবেলা থেকে আপনার খুলিগুহার সম্পদের কথা শুনে আসছি, একবার সেটা দেখতে পাব ?
অবশ্যই দেখবেন।
5-20

শোনা যায়, সম্পদ দেখে বিস্মিত ও পুলকিত হলেন সেই রাজা
... অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়।

কী সম্পদ আছে অরণ্যদেবের খুলিগুহায়?
খুলিগুহার সম্পদ

দ্যাখো,
দ্যাখো বইটা।
ওহে, আনন্দে কেঁদে ফেলো না।
আমার কাজে লাগবে এটা!

হয়তো সত্যিই
কিছু আছে।
পৃথিবীর হারানো সম্পদ
অবশ্যই, আমি বলছি
অরণ্যদেবের সম্পদ
সত্যিই আছে।

অরণ্যদেবের সম্পত্তি : প্রবাদতুল্য অমূল্য সম্পদ, পৌরাণিক কথা অনুসারে সতেরো শতকে এর খোঁজ পাওয়া গেছে ...
কী দারুণ! এখান থেকে যখন বের হব, এই সম্পদ নির্বোধদের কাছে 'বিক্রি' করা যাবে।

বিক্রি করবে ? তুমি বোকা নাকি ? আমরাই সব নেব!
তুই জানিস কোথায় এই খুলিগুহা ?
অবশ্যই

কিন্তু কীভাবে পৌঁছব ? মাইলের পর মাইল অরণ্য ... তারপর গভীর অরণ্য ... বিষাক্ত তীর নিয়ে খুদে মানুষেরা ... অবশেষে স্বয়ং অরণ্যদেব ... অসম্ভব!
কিছুই অসম্ভব নয়।

একটা কথা তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাই ক্যাপি, একটু সমস্যা আছে ... আমরা কিন্তু জেলে আছি!
আমাদের এখনও বিচার হয়নি... তার মানে আমাদের আদালতে নিয়ে যাবে ...

... এবং আমরা আর ফিরে আসব না।
চলো তোমরা, বিচারক অপেক্ষা করছেন।
?
তোমরা যে কেন কোর্টের সময় নষ্ট করো ? তোমাদের দিনের পর দিন জেলে বন্দি করে রাখা উচিত!
ভালই বলেছ ...
পুলিশ

ফিরব না ? কী করে ?
আমার বন্ধু আছে ... মজাটা দেখে যাও।
6-17

তিনজন শয়তানকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিচারের জন্য
পুলিশ
পুলিশ

সার্গো, তুমি কি বলছ আমরা আর ফিরব না, মানেটা কী ?
শ-শ-শ্

বন্ধু, জোগাড় করেছি।
?

ওই ওরা আসছে ...

?!
পুলিশ

তুমি পুলিশের গাড়ি দেখতে পাওনি ? আর একটু হলেই ধাক্কা লেগে
যেত ... তোমাকে আমি আদালতে নিয়ে যাব।

দাঁড়াও, একদম নড়বে না।
বন্দুকের দিকে হাত বাড়িয়ো না ... কোপার ... এটা নিয়ে নিচ্ছি।

হাই, ক্যাপি।
হাই, ডোপি। ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। চলে এসো সবাই। আমি আমার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি।

এরা আমাদের সম্বন্ধে কিছু জানে না, খুঁজেও পাবে না ... আগুন লাগানোই ভাল।

পালাল ওরা...! !!
পুলিশ
আমি বলেছিলাম, আমার বন্ধু আছে ...
6-24

আমাদের বন্দিদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, গাড়িতে আগুনও লাগিয়েছে ...
কোনদিকে ওরা গেছে ? ওরা কারা ?
আগে কখনও দেখিনি, ওইদিকে গেছে একঘণ্টা আগে ...
আমাদের কে সাহায্য করবে, ক্যাপি ?

এক জেনারেল, ওঁর কাছেই তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি ! আমি ওঁর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করেছি ... বড় যোগাযোগ ...
উনি চাইছেন আমি যেন কোর্টে কোনও কথা না বলি । ওই জেনারেলকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ।
উনি চান ফিরে যেতে, সেজন্য দরকার প্রচুর অস্ত্র । তা না হলে ক্ষমতা দখল অসম্ভব ...

আমার লোকেরা তোমায় পেয়েছে সার্গো, বাকি দু'জন কারা ?
জেলে একই সেলে আমরা থাকতাম । আমি ওদেরও নিয়ে এসেছি । পেট, বুবা, এসো জেনারেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই ।

আমি তোমার জন্য বিদেশে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেছি । এখনই চলে যাও ... যতদিন না পরিস্থিতি শান্ত হয় ...
না, আমার একটা দারুণ পরিকল্পনা আছে জেনারেল ...

বিপ্লব ঘটানোর জন্য প্রচুর অর্থের দরকার ... আমি এক গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছি ... আপনি এখন অভিযানের টাকাটা দিন ...
গুপ্তধন ... এখন ... সত্যি ...

এই বইয়ে অরণ্যদেবের গুপ্তধন বিষয়ে সব লেখা আছে ... এই যে বুবা, সব জানে ... ঠিক কোথায় এটা !
!

এদের নিয়ে কী করবে ?
পথ দেখানোর জন্য ওই স্থানীয় ছেলেটিকে আমার এখন চাই । তারপর দুটোরই ব্যবস্থা করা যাবে । ঠিক আছে ?

বন্দিদের কীভাবে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল ? তোমাদের সঙ্গে তো অস্ত্রশস্ত্র ছিল !
ও য়া র্ডে ন

উঃ ... ওরা আমাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিল ...

এটা কি খুব ভাল ঘটনা ? এর পর যদি তোমাকে শাস্তি না দেওয়া হয় ...

পুলিশ তন্নতন্ন করে নিখোঁজ বন্দিদের খোঁজ চালাচ্ছে

থামো

পুলিশ

গভীর অরণ্য, কিন্তু ফাঁকা নয় !

সার্গো বলল, এই গ্রেনেডগুলো পিগমিদের মেরে ফেলবে .... অরণ্যদেবকেও।
আমি ভেবেছিলাম শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখবে।
বিপদ

অরণ্যদেব ... নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ান ... তাঁর মৃত্যু নেই ... কিছুই তাঁকে মারতে পারবে না ...

হয়তো ... বিষাক্ত গ্যাস ...

জলাটার দিকে এগিয়ে যাই ... আরও জোরে শোনা যাবে ... পিগমিগুলো গেল কোথায় ?
বাঁচাও !
বাঁচাও !

শব্দ নেই চারদিকে ... কেউ কোথাও নেই ...

বিষাক্ত তীর ! এগুলো দারুণ কাজ করে ...
বাঁচাও, ... খিদে ... আমাকে অরণ্যদেবের কাছে নিয়ে চলো...

পিগমিরা তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করল...
অরণ্য ... দেব ... অরণ্য ... দেব ...
মনে হচ্ছে আমার অভিনয়টা বুঝতে পারেনি ...

পিগমিরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলল ... তারপর পড়ল জলপ্রপাত
ওঃ... ওঃ...

একটা অদ্ভুত খুলির সামনে এসে দাঁড়াল... গুহার মুখটা খোলা...
এই হচ্ছে সম্পত্তিতে ভরা গুহা...বুবা এর কথাই বলেছিল !

?
?
হাজির হল অরণ্যদেবের সামনে ! ? ?

কাল মাঝরাতে সার্গো আর বুবা গ্যাস ছড়াতে শুরু করবে ...

... আমরা হেলিকপ্টারে করে নামব...গ্যাস-মুখোশ পরে নেব ...

অরণ্যদেবের খুলিগুহা-অভিযান এগিয়ে আসছে ...

গভীর জঙ্গলে গ্যাস-গ্রেনেডের পাহারায় আছে বুবা !

ওই সম্পত্তি থেকে কীরকম অর্থ পাব আমরা, পেট ?
কোটি কোটি... আমার অংশ দিয়ে আমি প্যারিসের অর্ধেকটা কিনে ফেলব ?

আমার অংশ দিয়ে ... আমি আবার আমার দেশ দখল করব, আর নিজেকে রাষ্ট্রপতি বানাব !
শুনতে ভাল লাগছে, জেনারেল !

ও জানে না এখনও ... ওর অংশ ... অন্যদের অংশ ... সবই আমার হতে চলেছে !

উঃ ... আ-মি ... খুব খিদে পেয়েছিল ... তাই খাবার খুঁজছি !
ও সেইজন্য তুমি ছুরি নিয়ে এসেছ ... ভেতরে এসো ...
খুলিগুহার মধ্যে

ভেতরে চলে এলাম ... কী সহজ ! কী মূর্খ !
দেখো, এটায় খুব বেশি কিছু ঐশ্বর্য নেই ... এগুলো নিয়ে আমার খুব আগ্রহও নেই ...

কিন্তু এই ঘরে প্রচুর সম্পদ আছে ... অনেক পুরনো দামি জিনিসে ভর্তি ... এই দ্যাখো, রাজা আর্থারের তরবারি ...
এগুলো দামি সম্পদ ?

"... এক্সকালিবার ... এটা দিয়েই রাজা আর্থার তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছিলেন"

?
এই জিনিসটাও দেখবার ... বিষধর সাপের বিষ ...

"... রানি ক্লিওপেট্রা নিজেকে মারবার জন্য এই সাপই ব্যবহার করেন ..."
9-2

এবার ... আর একটা অসাধারণ জিনিস ...
একটা মরচে-ধরা তরবারি ? একটা মৃত সাপ ? আমাকে শিশু পেয়েছে ? সম্পত্তি কোথায় গেল ?

সার্গো গেল কোথায় ? কপ্টার আসার সময় হয়ে গেছে ... ওরা আমাদের সঙ্কেতের অপেক্ষা করবে ...

ও যদি না আসে, আমিই গ্যাস গ্রেনেডগুলো ছুড়ব ...আর নিজেই সঙ্কেত পাঠাব ...
বিষাক্ত গ্যাস

আর কতদূর ?
জেনারেল, আমরা পঞ্চাশ মাইল দূরে ।

আর সম্পত্তি দেখতে চাও ?
এইসব আবর্জনাকে ... সম্পত্তি বলছে !
উঃ ; না ... ধন্যবাদ !

আমার আরও সম্পত্তি আছে এই ঘরে, তুমি দেখবে ?
উঃ ... না, না ... আর নয় ...
9-16

ভালই লাগল ... তবে মাথা ধরেছে ... একটু ঘুরে আসি ...
?

যেভাবে হোক এখান থেকে বেরোতে হবে ... আমাদের পরিকল্পনা ... সম্পত্তি ... ও তো আবর্জনা মাত্র ... বুবাকে একবার পাই—

আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে হেলিকপ্টার আসার কথা ! একেবারে তুচ্ছ ব্যাপার ... পেটের সেই বই ... সব মিথ্যে ... ।

তাড়াতাড়ি এসো ! দেরি করলে কেন ? কপ্টার যে-কোনও সময় চলে আসবে !
সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছ ?

সম্পত্তি ? আবর্জনা ! কোনও সম্পত্তি নেই ! আমাদের অভিযান শেষ ।
!

হঠাৎ ... রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে একটা শব্দ।

ধর ধর

উঃ... !

"অরণ্যদেব ক্রুদ্ধ হলে অরণ্যের গাছও কাঁপতে থাকে" জঙ্গলের প্রবাদ !

শান্ত অরণ্যের রাত্রি ... অরণ্যদেব আলোর সঙ্কেত দেখাতে লাগলেন ...

... তারপর দুটি ভারী শরীর বয়ে নিয়ে চললেন ... শস্যের বস্তার মতো ...

ওরা যখন নামবে ... ভাল অভ্যর্থনার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ওই যে আলোর সঙ্কেত !
সার্গো আর বুবা তাদের কাজ শুরু করেছে। বিষাক্ত গ্যাস নিশ্চয়ই ছড়িয়েছে। গ্যাস মুখোশ পরে নাও ... আস্তে-আস্তে মাটিতে নামাও !
10-14

পথ দেখানোর আলোরও ব্যবস্থা হয়েছে। সার্গো নিশ্চয়ই এইসব করেছে !
এখন আর পিগমিদের কোনও ভয় নেই ... সব মরে গেছে ...

কেউ নেই ... জঙ্গলে সবাই মরে পড়ে আছে ... মুখোশ পরে নাও ... ওই দ্যাখো কুকুরটাকে ... !
ওই তো সার্গো আর বুবা ...
ও কি মরে গেছে ?

সার্গো ... !
মুখোশ খুলে ফ্যালো ... কোনও বিষাক্ত গ্যাস নেই ...
চারদিক তাকিয়ে দ্যাখো ...

!

!

তোমাদের ঘিরে রেখেছে হাজার বিষাক্ত তীর ... একটা গুলি ছুড়লে ... তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে মৃত্যু ... বন্দুকগুলো মাটিতে ফেলে দাও !

বন্দুকের বিপক্ষে তীর ... তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন ? ...গুলি করো...
না, জেনারেল, হাজার-হাজার তীর ... সব কিন্তু বিষাক্ত ...

জেনারেল, ও যা বলছে শুনুন, আর কিছু করার নেই !

আমি লড়াই ছাড়া এই বিপুল সম্পত্তি ছাড়তে রাজি নই ... আমি আদেশ দিচ্ছি ... গুলি করো !

সমস্ত বন্দুক ফেলে দাও ... সবাই !
!

10-21
বোকার দল ... কী হয়েছিল ? গ্যাসই বা কোথায় ... তোমরা ...
মাথা ঠাণ্ডা করুন, জেনারেল ! আপনি কিছুই হারাননি ... আমি 'সম্পত্তি' দেখেছি ...আবর্জনা ছাড়া কিছু নয় !
ও মিথ্যুক !

মাননীয় ভদ্রজনেরা ... আমার সম্পত্তি চুরির জন্য আপনাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে !
আমি দেখেছি ... !
আপনারা ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন !

এটাই হচ্ছে সেই জিনিস যাকে ও আবর্জনা বলেছে ... সম্রাট আর্থারের তরবারি ... রোনাল্ডের শিং !

ট্রিজান আর ইসোল্ডের ভালবাসার পাত্র এটা ... এটা সেই মুকুট ... যা সম্রাট সিজার প্রত্যাখ্যান করেন ... সম্রাট আলেকজান্ডারের পানপাত্র ... সব আসল, জেনারেল !
!

আবর্জনা ? বোকার হদ্দ ! এইসব জিনিস ... অমূল্য !
উঃ !-

এইসব প্রাচীন জিনিসের মূল্য জানিস ? কোটি-কোটি টাকা ... এইগুলোকে কেউ আবর্জনা বলে !
আমি কী করে ... জানব ? দেখতে তো আবর্জনাই মনে হচ্ছিল !
না, না, এখানে কোনও ঝগড়া নয় ...

আমি তোমাদের আরও কিছু জিনিস দেখাচ্ছি ...

এটা হচ্ছে আমার আর এক গোপন ঘর ... অল্পস্বল্প সম্পদের ... সার্গো এটার!
খোঁজ পায়নি ... আমার মনে হয় এইসব জিনিসকেও ও আবর্জনা বলবে ...

তুমি যখন এখানে এসেছিলে এর চেয়ে বেশি সম্পদের কথা কি ভেবেছিলে ?

অরণ্যদেবের সম্পদ খুলি গুহায় !
উহ ... উহ... !
সোনা ... হিরে-জহরত ... অফুরন্ত !
!!
এই তিনজন জেল থেকে পালিয়ে এসেছে ... আপনি ওদের সাহায্য করেছেন জেনারেল !

আমি তোমাদের আবার জেলে ফেরত দিয়ে আসব ... অনেকটা পথ হাঁটতে হবে অবশ্য ...
10-28

আফ্রিকা সংবাদ
পালিয়ে যাওয়া কয়েদিরা ফিরে এসেছে !
যে তিনজন পুলিশ ভ্যানে আগুন লাগিয়েছিল, তাদের বাঁধা অবস্থায় জেলের বাইরে পাওয়া গেছে। যে জেনারেল ওদের সাহায্য করেছিল তাকেও ...

তুমি ভেবেছিলে এগুলো আবর্জনা ... যদি বুবার সঙ্গে ঝগড়া না করতে ...
ওঃ, চুপ করুন !

মানুষের লোভ তাকে নরকেও নিয়ে যায় ... কখনও-কখনও কারাগারে।
সমাপ্ত

আর্কিমিডিসের তত্ত্বই মেনে চলে সাবমেরিন
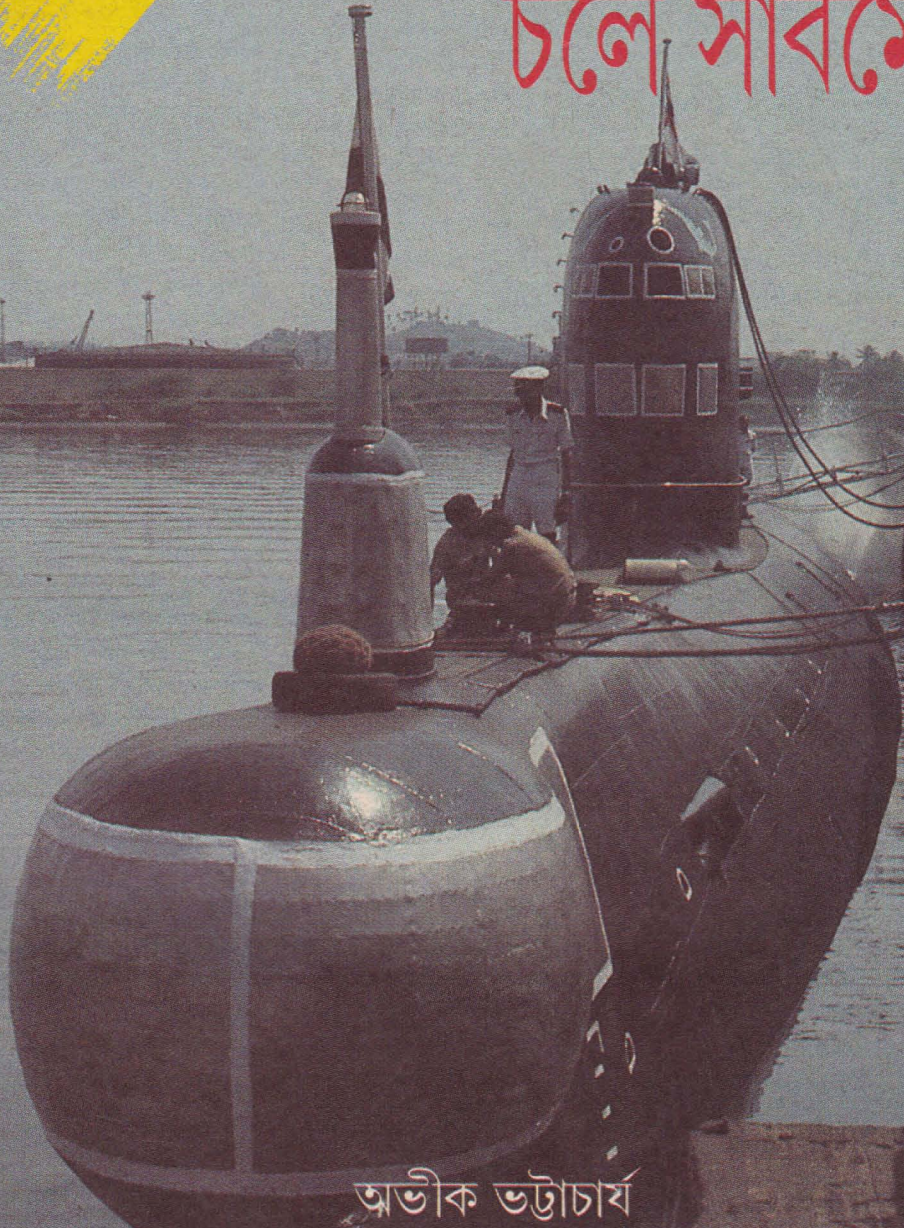
অভীক ভট্টাচার্য

কল্পবিজ্ঞানের বিখ্যাত লেখক জুলে ভের্ন-এর লেখায় আমরা পড়েছি 'নটিলাস' নামের এক ডুবোজাহাজের কথা। আজকের নিউক্লীয় শক্তিচালিত ডুবোজাহাজগুলি অবশ্য ক্ষমতায় ও শক্তিতে নটিলাসকেও ছাড়িয়ে গেছে। গত ৩৫০ বছরের ডুবোজাহাজের ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন ঘটলেও জলে ডোবা ও ভেসে ওঠার জন্য এখনও ডুবোজাহাজকে আর্কিমিডিসের তত্ত্বেরই দ্বারস্থ হতে হয়।

P/Amela—22/(393 to 400)=8

টেম্‌স-এর জল তখনও দূষণের প্রকোপে এখনকার মতো মিশকালো হয়ে ওঠেনি। আজকের কথা নয়, সময়টা ১৬২০ সাল। টেম্‌সের দুই তীরের কলকারখানাগুলি তখনও উদয়াস্ত বর্জ্য পদার্থ ঢালতে শুরু করেনি নদীর জলে। ভাগ্যিস করেনি। করলে, অদ্ভুত চেহারার শুশুকের মতো দেখতে প্রাণীটাকে হয়তো দেখতেই পেতেন না নৌকোর আরোহীরা। তখনকার দিনে নৌকোয় চড়ে লন্ডন শহরের সূর্যাস্ত দেখাটা ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। আজ থেকে ৫০ বছর আগেও কলকাতা শহরের অভিজাত মানুষরা যেমন ফিটনে চড়ে গঙ্গার ঘাটে হাওয়া খেতে যেতেন, টেম্‌সে নৌকোবিহার ছিল অনেকটা তেমনই। সেদিনও নৌকো থেকে ওঁরা দেখছিলেন টেম্‌সের জলে অস্তায়মান সূর্যের লাল আলোর প্রতিফলন। কিন্তু ওটা কী ? টেম্‌সের জলে শুশুক ? জল পরিষ্কার থাকায় জলের নীচে চোখ যাচ্ছিল বেশ কয়েক ফুট পর্যন্ত। কিন্তু ওটা তো নড়ছে না ! জলের প্রায় ন'-দশ ফুট গভীরে নিশ্চল থেমে আছে। সেদিন, কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েই, প্রমোদভ্রমণ স্থগিত রেখে ফিরে এসেছিলেন ওঁরা। পরে অবশ্য রহস্যটা পরিষ্কার হয়েছিল। শুশুক-টুসুক নয়, ওটা একটা 'সাবমার্সিব্‌ল বোট', এককথায় ডুবোনৌকো। এই পর্যন্ত পড়ে কেউ যদি সেই ডুবোনৌকোর সঙ্গে হাল আমলের পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিনের তুলনা করতে বসেন, তা হলে অবশ্য যারপরনাই হতাশ হতে হবে। কেমন ছিল সেই ডুবোনৌকো ? একটা লম্বাটে চেহারার নৌকোকে লোহার পাত দিয়ে মুড়ে, চামড়ার আচ্ছাদনে আগাপাশতলা ঢেকে তৈরি হয়েছিল আজকের ডুবোজাহাজের সেই আদিতম পূর্বসুরি। ব্যাপারটা প্রথমে মাথায় আসে কর্নেলিস ড্রেবেল নামে এক ওলন্দাজ নাবিকের। ১২ দাঁড়ের একটা নৌকোর খোল-নলচে পালটে ফেলে তিনি তৈরি করেন ওই ডুবোনৌকো। জলের তলায় বেশ কয়েক ঘণ্টা থাকার ব্যবস্থাও ছিল ওতে। তারপর ১৭৪৭ সালে উদ্ভাবিত হয় 'ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক প্রিন্সিপ্‌ল', এবং এখনও পর্যন্ত সব ডুবোজাহাজই ডোবা ও ভেসে ওঠার ব্যাপারে ওই প্রযুক্তিই অনুসরণ করে আসছে। ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের তত্ত্বটা ঠিক কীরকম ? তা হলে আমাদের ফিরতে হবে আর্কিমিডিসে প্লবতা ও জলে-ভসে-থাকা জিনিসের আপেক্ষিক ভার হ্রাসের যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন আর্কিমিডিস, তা তো সকলেরই জানা। কোনও অদ্রাব্য জিনিসকে জলে ডোবালে তা নিজের আয়তনের সমপরিমাণ জলকে অপসারিত করে। এখন ওই অপসারিত জলের ভর যদি জিনিসটির ভরের চেয়ে কম হয়, তবে তা ডুবে যাবে, আর বেশি হলে ভেসে থাকবে। সোজা কথায়, অপসারিত জলের ভরের চেয়ে জলে ডোবানো জিনিসটি যদি হালকা হয়, তবে তা ভেসে থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গেই চলে আসে ছেলেবেলার সেই পুরনো ধাঁধা—একখণ্ড লোহা জলে ডুবে যায়, কিন্তু একই ভরের একটা লোহার কড়াই জলে ভাসে কেন ? উত্তর খুবই সোজা, একখণ্ড লোহা যে আয়তনের জল অপসারিত করে তার চেয়ে লোহার ভর অনেক বেশি। কিন্তু কড়াইয়ের চেহারাটাই এমন যে, নিজের ভরের চেয়ে অনেক বেশি ভরের জলকে তা অপসারিত করতে পারে। সত্যি বলতে কী, নৌকো ব্যাপারটার সৃষ্টিই হয়েছে এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ডুবোজাহাজকে তো ভাসলেই চলবে না, ইচ্ছেমতো ডুবতেও হবে। আবার ডোবারও আছে অনেক কায়দা, নির্দিষ্ট গভীরতায় পৌঁছে থেমে থাকতেও হতে পারে। এটা কীভাবে সম্ভব ? আবার আমাদের যেতে হবে আর্কিমিডিসের কাছেই। আর্কিমিডিস বলবেন, কোনওভাবে যদি অপসারিত জলের ভরের চেয়ে নৌকোর ভর বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলে আর সমস্যাই থাকে না। সহজ একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা খালি বাটি জলের ওপর ভাসছে। ওটাকে ডোবানো দরকার। বেশ, বাটিটার মধ্যে আস্তে-আস্তে জল ঢালতে শুরু করা যাক। ক্রমশ বাটিটা ডুবতে থাকবে। উলটো প্রক্রিয়ার জন্যও সহজ সমাধান, একটু-একটু করে জল বের করে দিলেই আবার ভেসে উঠবে বাটিটা। ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের তত্ত্বও আসলে ঠিক এতটাই সহজ। ডুবোজাহাজের মধ্যে থাকে একটি বিশাল চৌবাচ্চা-ধরনের ব্যাপার, তাতে জল ঢোকার ও বেরনোর জন্যও থাকে আলাদা ব্যবস্থা। ডুবোজাহাজ ভাসবে না ডুববে, কতটা গভীরে ডুববে, সবই নির্ভর করে কতটা জল ঢুকছে বা বেরোচ্ছে তার ওপর। বলা বাহুল্য, এই হিসেবটা করার জন্য আজকের দিনে কাজে লাগানো হয়, মানুষ নয়, কম্পিউটার। কম্পিউটারই বলে দেয়, কতটা জল কী পরিমাণ ঢুকলে ডুবোজাহাজ কত জোরে ও কত গভীরে ডুববে। ডুবে-ডুবে জল খাওয়ার প্রচলিত প্রবাদটিকে একটু পালটে নিয়ে এটাকে বলা যেতে পারে জল খেতে-খেতে ডোবা। আদ্যিকালের চামড়ায় মোড়া ডুবোনৌকোই হোক বা আজকের নিউক্লীয় শক্তিচালিত 'ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন', জল খেতে-খেতে ডোবার ব্যাপারে এদের মধ্যে কোনও প্রযুক্তিগত পার্থক্য আজও আসেনি। অবশ্য পার্থক্য যে একেবারেই আসেনি তা নয়, আদ্যিকালের ডুবোজাহাজে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক বলতে বোঝাত চামড়ার থলের মতো কিছু আধার। ১৯ শতকের কলকাতায় যেরকম চামড়ার মশকে করে বাড়িতে

ভারতীয় নৌবাহিনীতেও আছে আধুনিক প্রযুক্তির ডুবোজাহাজ
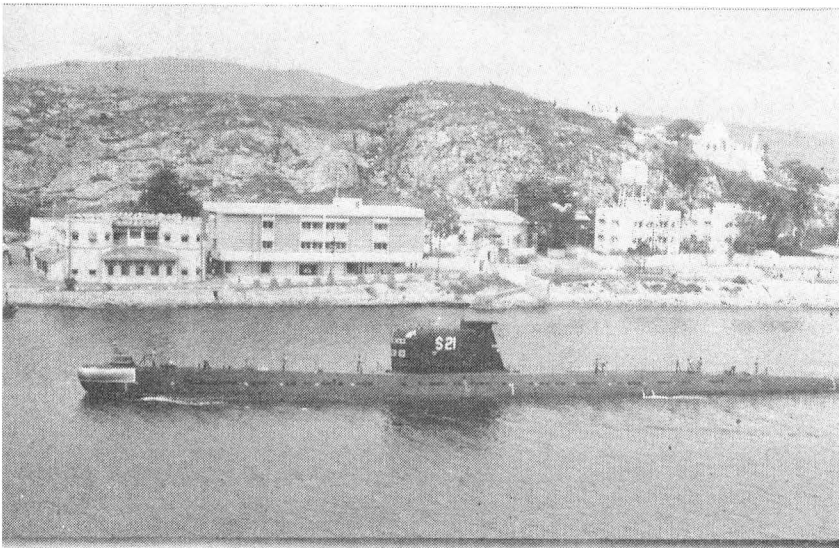
খাওয়ার জল সরবরাহ করতেন ভিস্তিরা, সেকালের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ছিল চেহারায় তার কাছাকাছি। ডুবোনৌকোর খোলের নীচের ছিদ্রের সঙ্গে যোগ থাকত সেই চামড়ার থলের। সেই ডুবোনৌকো অবশ্য যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হত না। যুদ্ধের কাজে প্রথম ডুবোজাহাজের ব্যবহার হয় আমেরিকার বিপ্লবের সময়। আজকের ডুবোজাহাজের আদিতম পূর্বসুরি সেই সাবমেরিনটির নাম ছিল 'টার্টল'। জলের প্রায় ছ' মিটার নীচে ঘণ্টায় তিন 'নটিক্যাল' মাইল গতিতে চলত সেই সাবমেরিন, একটানা ডুবে থাকতে পারত প্রায় আধঘণ্টা। ৬৮ কেজি ওজনের গোলাবারুদ বইতে পারত এটি। সেকালের হিসেবে এ বড় কম কথা নয়! আধুনিক সাবমেরিন উদ্ভাবিত হতে-হতে অবশ্য এসে যায় ১৯ শতক। ১৮০১ সালে রবার্ট ফাল্টন নামে এক মার্কিন প্রযুক্তিবিদ তৈরি করেন 'নটিলাস' নামে এক ডুবোজাহাজ। নটিলাস নামটা শুনে অন্য কিছু মনে পড়ছে কি? কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম সেরা লেখক জুলে ভের্ন তাঁর 'টুয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস্ আন্ডার দ্য সি' উপন্যাসে নটিলাস নামে এক অমিত ক্ষমতাসম্পন্ন ডুবোজাহাজের কথা শুনিয়েছিলেন আমাদের। ক্যাপ্টেন নিমো-র সেই জাহাজে ছিল মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র। বাস্তবের নটিলাস অবশ্য কল্পবিজ্ঞানের নটিলাসের ধারেকাছেও ছিল না। নিতান্তই সাদামাঠা সেই ডুবোজাহাজে অবশ্য ছিল আধুনিক সাবমেরিনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আকৃতিতে সেটি ছিল মাছের মতো, চলার সময় জলের বিপরীতমুখী ধাক্কা ও ঘর্ষণজনিত অভিঘাত এড়ানোর সুবিধে হত এই বিশেষ আকৃতির জন্য। এ ছাড়াও তাতে ছিল 'স্ক্রু প্রপেলার' আর অনুভূমিক হাল। ১৮৫৬ সালে ব্যাভেরিয়া-র উইলহেল্‌ম বয়ার তৈরি করেন ৫২ ফুট লম্বা এক বিশাল ডুবোজাহাজ, তার নাম দেন 'সি ডেভিল'। সি ডেভিলের বিশালত্বের গৌরব অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৬৩ সালে শার্ল ব্রুন নামে এক ফরাসি এঞ্জিনিয়ার তৈরি করেন ১৪৬ ফুট লম্বা 'লে প্লঁগোয়া' ডুবোজাহাজ। এতেই ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক থেকে জল বের করে দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম উচ্চচাপসম্পন্ন বাতাসকে কাজে লাগানো হয়। সাবমেরিন প্রযুক্তিতে এর পর অগ্রগতি শুরু হয় খুব দ্রুত। ইংল্যান্ডের 'নর্ডেনফেল্ড', স্পেনের 'পেরাল' প্রভৃতি
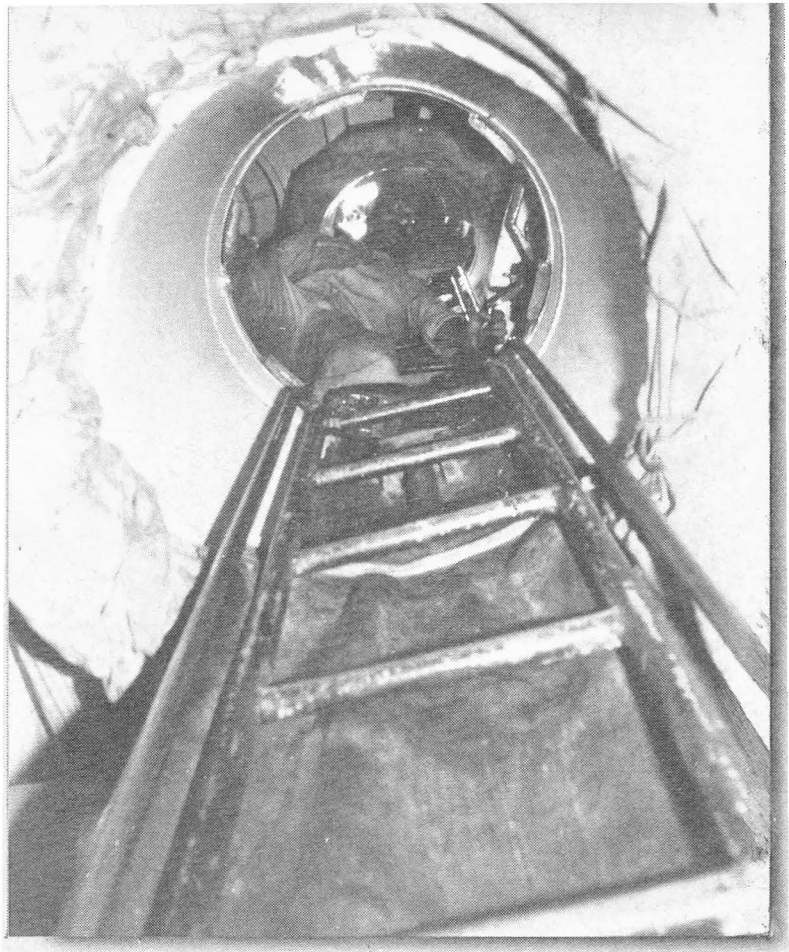
সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় ডুবোজাহাজের খোলের ভেতর

ডুবোজাহাজ ১৯ শতকের শেষের দিকে খুব নাম করে। এই শতকের শুরুতেই অবশ্য চলে আসে বিখ্যাত মার্কিন সাবমেরিন 'ইউ এস এস হল্যান্ড'। এই সাবমেরিনেই প্রথম কাজে লাগানো হয় 'ইন্টারন্যাল কম্‌বাশ্চন' প্রযুক্তি। জলের ওপরে ও নীচে চলার জন্য এতে ছিল গ্যাসোলিনচালিত এঞ্জিন এবং ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক মোটর। পাশাপাশি ছিল সাইমন লেক নামে এক এঞ্জিনিয়ারের তৈরি সাবমেরিন। সত্যি বলতে কী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে সাবমেরিনগুলি খবরের শিরোনামে এসেছিল, তার সবক'টিতেই ছিল হল্যান্ড ও লেক সাবমেরিনের বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়। তারপর অবশ্য বদলে গিয়েছে অনেক কিছুই। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরের আরও ১৫ বছরে বিজ্ঞান এগিয়ে গিয়েছে অনেকদূর। ১৯৫৮ সালে এসেছে পুরোপুরি স্ট্রিমলাইন্ড চেহারার 'স্কিপ্‌জ্যাক' সাবমেরিন, যাকে দূর থেকে দেখলে অবিকল একটি তিমি বলে মনে হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। নিউক্লীয় শক্তিচালিত এই স্কিপ্‌জ্যাক সাবমেরিন জলের সবচেয়ে গভীরে নামার রেকর্ডও করে ফেলেছে! এখানেই শেষ নয়, স্কিপ্‌জ্যাকের পর ১৯৫৯ সালে তৈরি হয়েছে 'ইউ এস এস জর্জ ওয়াশিংটন'। এই সাবমেরিনটির পুরোটাই যেন একটা যুদ্ধাস্ত্র। শুধু অস্ত্রই নয়, নৌযুদ্ধে এ-যাবৎ আবিষ্কৃত যাবতীয় অস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। ১৬টি 'পোলারিস থার্মোনিউক্লিয়ার ব্যালিস্টিক মিসাইল' জুড়ে দেওয়া হয়েছে এই ডুবোজাহাজে, তার ওপর আছে অত্যাধুনিক 'মাল্টিপ্‌ল ওয়ারহেড পসেডন মিসাইল'। হাইড্রোজেন বোমা আর ব্যালিস্টিক মিসাইলকে জুড়ে যদি একটা ডুবোজাহাজের চেহারা দেওয়া যায়, তবে যা দাঁড়াবে, তা-ই হল জর্জ ওয়াশিংটন। আজ যখন আমেরিকার 'চার্লস্টন' থেকে জর্জ ওয়াশিংটন তার নীরব সমুদ্রপরিক্রমা শুরু করে, কেবিনে কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা এঞ্জিনিয়ারটির কি একবারের জন্যও মনে পড়ে ১৭৭৬ সালের টার্টলের কথা, সেই টার্টল, যা একটি ব্রিটিশ ফ্ল্যাগশিপের খোলের নীচে বোমা ফাটিয়ে শুরু করেছিল নৌযুদ্ধের একটি নতুন অধ্যায়? না কি, কম্পিউটারের বোতাম টিপে জর্জ ওয়াশিংটনকে নির্দিষ্ট গতিতে নির্দিষ্ট গভীরতায় পৌঁছে দিতে-দিতে কোনও এক অসতর্ক কল্পনার মুহূর্তে নিজেকে তাঁর মনে হয় অন্য এক ক্যাপ্টেন নিমো?

ফোটো : তপন দাশ

ছবি : বিমল দাস

আলোর আকাশে ঈগল

শৈলেন ঘোষ

আমি সম্রাট নই। আমার কোনও চোখ-ঝলসানো প্রাসাদ নেই। আমার নেই কোনও সৈন্য-সামন্ত, মন্ত্রী-সান্ত্রী, পাত্র-মিত্র, সভাসদ!

তবে!

আমি এক অসভ্য বর্বর মানুষ। আমার নাম **শিজুমন**। আমার জন্ম এক পাহাড়ের গুহায়। তোমরা এখন আমার যে-গল্প শুনছ, সে-গল্প আমার অনেকদিন আগের। তখন আমার কত বয়েস বলতে পারব না। একশোও হতে পারে। হতে পারে তারও বেশি। হিসেব কষার মাথা নেই আমার। বলতে পারো, মুখ্যু। আমি শুধু একাই মূর্খ নই, মূর্খ আমাদের দলের অসংখ্য মানুষ সকলেই। তখন আমার জ্ঞান হয়নি। নেহাত ছোট। আমি বড় হয়েছি মায়ের পিঠে শুয়ে-বসে। মায়ের পিঠে বাঁধা ওই যে থলিটা, ওইটাই ছিল আমার ঠাঁই। ধীরে-ধীরে আমার বয়েস বাড়ল। আমি হাঁটতে শিখলুম নিজে-নিজে। তখন আমি জানতে পারলুম, আমাদের কোনও ঘর-বাড়ি নেই। আমরা ভবঘুরে। আমরা ঘুরে বেড়াই পাহাড়ে-পাহাড়ে, গুহায়, উপত্যকায়, দূরের

বনে, কাছের জঙ্গলে, এখান থেকে অন্য কোথাও, অন্য দেশে।

পাহাড়। দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। পাথরের রাশি। জমাট। কোথাও তুষার ঝলমল করছে তার শিখরে। কোথাও জ্বালামুখ তার চূড়োয়। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ধকধক করে। যখন দ্যাখো, তখনই। হাঁটতে-হাঁটতে আমি দেখি। দেখতে-দেখতে অবাক হয়ে যাই। ভাবি, যাচ্ছি কোথায় ? দল বেঁধে ? আরও কত হাঁটতে হবে ? কবে শেষ হবে হাঁটা ?

হ্যাঁ, আমরা দল বেঁধেই হাঁটি। জানি না, কেন আমরা ভবঘুরে। জানি না, এই অগুনতি মানুষ ঘুরছি কতদিন ধরে। আমাদের গায়ে নামমাত্র পোশাক। গাছের ছাল। নয়তো হরিণের চামড়া। হাড়কাঁপুনি শীতে কী কষ্ট। কে যে আমাদের সহ্য করার শক্তি দিয়েছে !

কে বলতে পারে, কেমন করে জ্ঞান হয় মানুষের। ওই মানুষটিকে দ্যাখো ! মনে হচ্ছে না, তিনি একটু অন্যরকম ? আমার জ্ঞান হলে আমি জানতে পারি, উনি আমাদের নেতা। ওঁর কথা মেনে চলতে হয়। অক্ষরে-অক্ষরে। দেব-দেবীর পুজো উনি ছাড়া আর কারও করার জো নেই। তাই ওঁকে আমরা বলি দেবদূত।

জেনেছি, এই পাহাড় আমাদের দেবী। দেবদূত বলেছেন, সে দেবীর গায়ের রং সাদা। বরফের মতো। বলেছেন গুহা হল মা-পৃথিবীর জঠর। মানুষের প্রথম জন্ম হয়েছে এই গুহাতেই। গুহারও দেবতা আছেন একজন। তিনি বৃষ্টিরও দেবতা। এমনকী, ঝঞ্ঝারও। আমাদের দেবদূতের অভিষেক হয়েছে এই গুহারই অন্ধকারে। আমি তাঁর অভিষেক দেখেছি। মনে আছে খুব আবছা।

গুহার দেবতার কী ভয়ঙ্কর মূর্তি। দেখলেই আমার চোখ মুদে যায়। তোমরা দেখলেও ভয়ে কাঁপবে। এ-কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। কী ভীষণ দুটো চোখ তাঁর। ড্যাবড্যাব করছে। ভাঁটার মতো জ্বলছে। দাঁতগুলো দ্যাখো, কী বিচ্ছিরি ! যেন দাঁতে বিষ মাখানো। খোঁচা-খোঁচা নখ। কে বলবে হাত ! হাত নয় তো,যেন থাবা। মানুষের রক্ত দেখলে তাঁর নোলায় জল আসে। তাই পুজোর সময় রক্ত না পেলে তিনি ভীষণ খাপ্পা। কী হিংস্র বলো !

গুহার দেবতা যেমন, তেমনই আমরাও। যেমন হিংস্র, তেমনই ঝগড়ুটে। আমাদের সবাই বলে যুদ্ধবাজ। লুঠেরা। হ্যাঁ ঠিকই বলে। লুঠতরাজ না করলে আমাদের চলবে কেমন করে ! আমবা খাব কী ! তাই কেউ আমাদের দেখতে পারে না। দেখলেই দুর-দুর করে তাড়িয়ে ছাড়ে। তবেই বলো, গুহার অন্ধকার ছাড়া আর কোথায় থাকব আমরা ? আমরা লুঠ করি খাবার। না-হয় ধনসম্পদ। লুঠ করতে গিয়ে মানুষ মারি। নিজেরাও মরি। এ তো নিত্যদিনের ঘটনা। মারতে-মারতে আমরা হিংস্র হয়েছি। আমরা সকলের বিশ্বাস হারিয়েছি। কাজেই খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে একটু যে শ্বাস নেব দিনের বেলা, তা আর হচ্ছে না। গুহার অন্ধকারই আমাদের ভাল।

তবে লুঠপাট তো আর আমরা ইচ্ছে করলেই করতে পারছি না। আমাদের দেবদূত হুকুম দেবেন, তবে। তবে আমরা যুদ্ধ করব। লুঠ করব। মানুষ মারব। তাঁর হুকুম ছাড়া এক পা-ও এগোবার ক্ষমতা নেই কারও।

আমাদের একজন যুদ্ধ-দেবতাও আছেন। তিনি স্বপ্নে দেখা দেন। দেখা দেন আমাদের দেবদূতকে। তিনি দেবদূতকে বলে দেন কখন যুদ্ধ করতে হবে। বলে দেন, কখন লুকিয়ে থাকতে হবে। তিনি যেমন-যেমন আদেশ করেন, দেবদূত আমাদের তেমন-তেমন করতে বলেন। আমরাও তেমন-তেমন করি। লড়ে যাই। মরি। লুঠ করি। খাই।

তবে গোড়া থেকেই গল্পটা শুরু করি।

॥ ২ ॥

আমি তখন খুব ছোট। সে এক অন্ধকার রাত। অন্ধকারে গুহার ভেতরটা থমথম করছে। আমরা তো ছোট। তাই এখন আমাদের ঘুমোবার রাত। আমার মতো ছোট যারা, সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু আমিই জেগে আছি। পড়ে আছি ঘুমের ভান করে। কেন ? আমি শুনেছিলুম, আজ যুদ্ধ হবে। আমি আজ যুদ্ধ দেখব। দেখব বললেই তো আর দেখতে পাচ্ছি না। আমরা যে ছোট। ছোটদের যুদ্ধ দেখার হুকুম নেই। তাই আমি মুখ গুঁজে পড়ে আছি চাটাইয়ের ওপর। আমার মা ঘুমোয়নি। মায়ের মতো আরও অনেকের মা-ও দেখতে পাচ্ছে না আমার মুখখানা। জানতে পারছে না আমি ঘুমোচ্ছি, না চোখ পিটপিট করছি। আমি চোখ পিটপিট করে দেখছি, আমাদের দলের জোয়ান মানুষেরা অন্ধকারে ঘুরঘুর করছে গুহার ভেতরে। মুখে কথা নেই তাদের। গুহার অন্ধকারে তাদের মুখ থমথম করছে। আমি আবছা-আবছা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা দেখলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে। অবশ্য আমার কথা আলাদা। আমি তো এদেরই একজন। আমি এদের রোজ দেখছি। এদের সঙ্গে উঠছি। বসছি। হাঁটছি। মানুষ হচ্ছি। আমি এখন ছোট। আমি জানি, একদিন আমি এদের মতো বড় হব। আমারও হবে ইয়া চওড়া বুকের ছাতি। আমিও হব অমনই দুর্দান্ত। আমিও ওদের মতো যুদ্ধ করব। শত্রুকে মারব তীর-ধনুক দিয়ে। কিন্তু যতক্ষণ না দেবদূত আদেশ করছেন, ততক্ষণ কিচ্ছু করা যাবে না। একটি তীর ছুড়েছ, কি মরেছ।

বাইরে কী ভীষণ শীত। বুকের রক্তও বুঝি ঠাণ্ডায় জমে যায়। গুহার ভেতরটা তবু ভাল। অবশ্য ততক্ষণ ভাল, যতক্ষণ না হাওয়া ঢুকে পড়ছে। তবে মাঝে-মাঝে কি আর ঢুকছে না ! হাওয়া ঢুকলে হিহি করে উঠছে সারা শরীর। অন্যদিন গুহার ভেতর আগুন জ্বলে। আজ জ্বলছে না। বোধ হয় আগুন জ্বললে আলো ঠিকরোবে। আর সবাই জানতে পারবে আমরা এখানে লুকিয়ে আছি। সবাই অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে দেবদূতের আদেশের জন্য। অন্ধকার। চাপা উত্তেজনা। সবাই ছটফট করছে। ওই দ্যাখো, দলে আমার বাবাও আছে।

হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম দেবদূত ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন। উদগ্রীব মানুষেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। অন্ধকার গুহায় তাঁর গলার স্বর গমগম করে উঠল। তিনি বললেন, "শোনো হে যুদ্ধ-দেবতার পুত্র-কন্যারা, যুদ্ধ-দেবতা আমায় স্বপ্নে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, আজ রাত্রেই উপত্যকার মানুষেরা আমাদের আক্রমণ করবে। তারা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সুতরাং তারা আমাদের আক্রমণ করার আগেই তাদের ওপর আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আর দেরি নয়। এগিয়ে চলো আমার সঙ্গে !"

সেই অন্ধকারে পাহাড় ডিঙোল গুহার মানুষেরা। চলল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। চুপিসারে। দেবদূতের সঙ্গে।

গভীর রাত। মানুষেরা ঘুমোচ্ছে ঘরে-ঘরে। নিশ্চিন্তে। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই গুহার মানুষরা সেই ঘুমন্ত মানুষদের ওপর। জ্বালিয়ে দিল তাদের ঘরবাড়ি। লুঠ করল, যা পেল তাই। হত্যা করল, যাকে পেল তাকেই। তারপর ফিরে এল গুহায়। সঙ্গে নিয়ে এল লুঠের জিনিস। আর, বন্দি করে আনল ক'জন মানুষকে। এরাই বুঝি রুখে দাঁড়িয়েছিল ! এরাই বুঝি বাধা দিয়েছিল গুহার জোয়ানদের।

সেই রাত্রেই আমরা পালালুম গুহা ছেড়ে। শীতের রাত। জমাট ঠাণ্ডা। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙোচ্ছে আমাদের দল। হাঁফাচ্ছে। যেন দম ফুরিয়ে যায়। পৌঁছে গেলুম নিরাপদ জায়গায়। আর-এক পাহাড়ের আর-এক চুড়োয়। ভোরের

আকাশ বুঝি দেখতে পাব এবার ? কেমন করে দেখতে পাব ! কুয়াশায় ছেয়ে গেছে চারদিক। এবার সূর্যদেবকে মানুষের একটি হৃৎপিণ্ড উপহার দিতে হবে। নইলে কুয়াশা কাটবে না। সূর্যদেবও উঠবেন না। সুতরাং একজন বন্দিকে হত্যা করা হল। তার হৃৎপিণ্ড উৎসর্গ করা হল দেবদূত সূর্যদেবকে। কুয়াশা কাটল। ঝলসে উঠল আকাশ। দেখা দিলেন সূর্য। কিন্তু আমাদের দলের অনেক মানুষকে আর দেখা গেল না।

কেন ?

কাল রাতের সেই যুদ্ধে তারা প্রাণ দিয়েছে। হয়তো বা অন্ধকারে পাহাড় ডিঙোতে গিয়ে তাদের প্রাণ গেছে। কেউ জানে না কেমন করে হারিয়ে গেছে তারা। কেউ জানতেও চায় না, মানুষ মরল, না বাঁচল। এখানে প্রাণের কোনও দামই নেই। প্রাণ নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। অত কী! আমাদের যুদ্ধ-দেবতাকেও সন্তুষ্ট করতে কত মানুষের যে প্রাণ যায় ! রোজ।

যুদ্ধ-দেবতা আমাদের ঝড়েরও দেবতা। তাঁর বাঁ পায়ে বাঁধা খঞ্জনা পাখির পালক। সঙ্গে একটা লকলকে সাপ। হাতে একটা বেঁকাতাড়া লাঠি। মুখের ওপর নীল রং দিয়ে ডোরাকাটা। গালে একটা পোড়া চিহ্ন। যুদ্ধ-দেবতার জন্মও হয়েছিল ভারী অদ্ভুতভাবে। তাঁর মা ছিলেন খুব ধার্মিক। খুব সৎ। যুদ্ধ-দেবতা জন্মাবার আগেই তাঁর একটি মেয়ে জন্মেছিল। আর জন্মেছিল তাঁর চারশোটি ছেলে। একদিন হয়েছে কী, মা তখন পুজো করছেন। হঠাৎ আকাশ থেকে একটা পালকের মুকুট ছিটকে পড়ল। পড়ল, তাঁর কোলে। তারপরেই দেখা গেল, তিনি একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু সে-পুত্রটি মোটেই শিশু নয়। হৃষ্টপুষ্ট একজন জোয়ান মানুষ। তাঁর বুকে একটি নীল রঙের বর্ম। মাথায় খঞ্জনা পাখির পালকের তৈরি মুকুট। বাঁ হাতে একটি বর্শা। বীরের মতো বুক ফুলিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

ব্যস, তাঁকে দেখেই মেয়ে রেগে টং ! মেয়ে তক্ষুনি তাঁর চারশো ভাইকে ডাক দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "শোনো, আমার বীর ভাইয়েরা, মা কাজটা ভাল করেননি। তিনি আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছেন। সুতরাং মাকে এক্ষুনি কেটে ফেলো !"

যেই না এই কথা শোনা, যুদ্ধ-দেবতা, যাঁর এইমাত্র জন্ম হল, ঝাঁপিয়ে পড়লেন বোনের ওপর। চোখের পলকে মেরে ফেললেন বোনকে। তারপর একাই লড়ে গেলেন চারশো ভাইয়ের সঙ্গে। সে কী ভীষণ লড়াই। চারশো ভাইকে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেললেন। তারপর হলেন আমাদের নেতা। সেই থেকে আমাদের রক্ষা করে আসছেন। আর তাঁরই ইচ্ছামতো দেবদূত আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন এক দেশ থেকে আর-এক দেশে। আমাদের হাঁটার যেন শেষ নেই।

কিন্তু আমি জানি, সবাইকে রক্ষা করলেও, যুদ্ধ-দেবতা আমার বাবাকে রক্ষা করতে পারেননি !

আমাদের এখানে দু-দুটো আগ্নেয়গিরি আছে। যখনকার কথা বলছি, তখন আমাদের দল চলেছে আগ্নেয়গিরির গা ঘেঁষে। যুদ্ধ-দেবতার আদেশে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে সারাদিন, সারারাত শুধু ধোঁয়াই বেরোচ্ছে। মিশে যাচ্ছে আকাশে। ওই মেঘের গায়ে। আমি হাঁটছি, আর আনমনে দেখছি। ঠিক তখনই একটা ভয়ঙ্কর শব্দে আমার বুক কেঁপে উঠল। মনে হল, পাহাড়টাই বুঝি ধসে পড়েছে। তারপরেই দেখি, আলোর ঝলকানি। আমার চোখ ঝলসে গেল। একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসছে! দাউ-দাউ করে। সঙ্গে-সঙ্গে আকাশটা মেঘে ঢেকে গেল। গর্জে উঠল মেঘ। ছুটে আসে বাতাসের ঝাপটানি। তারপর শুরু হয়ে গেল ঝড়।

পাহাড়ের ওপর তুলকালাম কাণ্ড। ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। আমাদের দেবদূত চেঁচিয়ে উঠলেন, "পালাও, পালাও! ঝড়ের দেবতা আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন। আর রক্ষে নেই। যে যেদিকে পারো পালাও!"

সঙ্গে-সঙ্গে লেগে গেল হুড়োহুড়ি। অত বড় দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল নিমেষে। পাথর টপকে যে যেদিকে পারল মারল ছুট। যেই সবাই ছুট মারল, অমনই আগ্নেয়গিরির মুখের ভেতর থেকে ছিটকে বেরোতে লাগল থান-থান পাথরের ইট। একটা মাথায় পড়েছে কি মরেছ। মাথা বাঁচাবার জন্য হুড়ুদ্দুম শুরু হয়ে গেল। তবু যদি এখানে গাছগাছালি থাকত! থাকলে, চেষ্টা করা যেত বাঁচবার। পাহাড়ের ঢালু পেরিয়ে আরও অনেকখানি নামতে হবে। তবে পাওয়া যাবে পপলার আর উইলোর বন। পাওয়া যাবে পাইন বনও। কিন্তু এখান থেকে ওখানে নামা কি সহজ কাজ! অথচ না-নেমে উপায়ও নেই। যতই ছুটছি, ঝঞ্ঝার দাপটও ততই বাড়ছে। আমি মায়ের হাত ছাড়িনি। মা আমাকে রক্ষা করছে। কখনও পাথরের আড়ালে মা আমাকে লুকোচ্ছে। আবার কখনও আমাকে টানতে-টানতে ছুটছে। কখনও মা বসে পড়ছে। মায়ের দুটো হাত আমার মাথায়। যেন না পাথর এসে লাগে। কখনও দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে আগলে ধরছে নিজের কোলের কাছে। না, না, আমি আর পারছিলুম না। ঝড়ের ঝাপটা যেন সারা গায়ে খামচি দিচ্ছে। কী ভয়ানক ঠাণ্ডা। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "মা, বাবা কই?"

মা হাঁপাতে-হাঁপাতে উত্তর দিল, "জানি না।"

হ্যাঁ, সত্যিই। সেদিন থেকে আর কোনওদিন জানতে পারিনি আমার বাবা কোথায় গেছে। বুঝি হারিয়ে গেছে! হারিয়ে গেছে, না কুচ্ছিত ঝড়ের দেবতা বাবাকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে? কে জানে?

হ্যাঁ, এই ফাঁকে বলে রাখি, আমাদের আর-এক দেবতা আমার মাকেও কেড়ে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে। সেই আমার ভীষণ কষ্টের গল্পটাই এবার শোনাব তোমাদের। এই দেবতা ছিলেন ভারী নিষ্ঠুর। ভারী নির্দয়। তাঁকে বলা হত অনিষ্টের দেবতা। মানুষের তিনি যেমন অনিষ্ট করতেন, তেমনই তিনি জাদুও জানতেন। তাই তাঁকে আমরা বলতুম জাদুকর। মানুষের ভাল করা দূরে থাক, এই জাদু দিয়ে তিনি মানুষকে মেরে ফেলতেন। আবার তাঁকে বলা হত গনগনে রোদের দেবতা। রোদের তেজে তিনি জমির ফসল ঝলসে দিতেন। দুর্ভিক্ষ লেগে যেত দেশে। সব ছারখার হয়ে যেত। মানুষ মরত অনাহারে। আর এই জাদুকর দেবতা তাই দেখে, দু' হাত তুলে নাচানাচি করতেন। অবশ্য তাঁকে দেখাও যেত না যখন-তখন। ছোঁয়াও যেত না ইচ্ছেমতো। কখনও-সখনও তাঁকে দেখা যেত একটা উড়ন্ত ছায়ার মতো। কিংবা যেন একটা বিকট চেহারার পিশাচ। নয়তো, একটা হিংস্র জাগুয়ার। এই দেবতা স্কন্ধকাটা সেজে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতেন। তখন তিনি পরতেন একটা ছাই রঙের পোশাক। হাতে থাকত তাঁর নিজেরই কাটা মাথাটা। কী ভয়ানক! কোনও ভিতু মানুষ হঠাৎ দেখলে আর রক্ষে ছিল না। সটান অক্কা যেত সে।

হ্যাঁ, এই অনিষ্টের দেবতাকে সবাই ভীষণ ভয় পেত। তাই তাঁকে তুষ্ট করার জন্য মানুষের চেষ্টাও কম ছিল না। কেমন করে মানুষ তাঁকে তুষ্ট করত সেই কথাটা বলি এবার।

আমাদের এখানে যুদ্ধ লেগেই ছিল। কথায়-কথায় যুদ্ধ। এই যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ মরত যেমন, বন্দি হতও তেমন। এই বন্দিদের মধ্যে যাকে দেখতে ছিল সবচেয়ে সুন্দর, তাকে সাজানো হত আরও সুন্দর করে। তাকে গান শেখানো হত। বাঁশি বাজাতে শেখানো হত। ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হত তার সারা অঙ্গ। আর, কী তার পোশাক! ঝলমল করছে। দেখলে, চোখ ঝলসে যাবে। আটজন ছেলে সব সময় তৈরি থাকত তার হুকুম শোনার জন্য। পুরো একটা বছর ধরে এমনই আদর আর যত্নে তার মনকে আনন্দে ভরিয়ে রাখা হত। কত নাচ, কত উৎসব তাকে নিয়ে।

তারপর?

তারপর হত কী, ঠিক একটি বছর পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হত মন্দিরে। খুব জাঁকজমক, শোভাযাত্রা করে। সে শোভাযাত্রায় কত যে মানুষ যোগ দিত, গুনে শেষ করা যায় না। শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। মন্দিরে পৌঁছে তাকে শোয়ানো হত সবচেয়ে উঁচু চত্বরে। তারপর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পুজো-টুজো করে তার হৃৎপিণ্ডটা উৎসর্গ করত অনিষ্টের দেবতাকে। অনুষ্ঠানের একটু এধার-ওধার হওয়ার জো ছিল না। তা হলেই সর্বনাশ! কার যে গর্দান নেবেন তিনি, কেউ জানে না। যখনই মানুষের অনিষ্ট করার ইচ্ছে হত তাঁর, উড়ন-ছায়ার ভেক ধরতেন। ধরেই তিনি শুরু করে দিতেন সর্বনাশা ভেলকির খেলা। এমনই এক সর্বনাশা ভেলকির খেলা তিনি সেদিনও করেছিলেন। উড়ন-ছায়ার ভেক ধরে তিনি নাচতে শুরু করে দিলেন। এমনই মজা, সেই নাচ দেখে আমরা কেমন আনমনা হয়ে গেলুম। দলে-দলে মানুষ সেই ছায়ার সঙ্গে নাচতে শুরু করে দিল। সেই দলে মা ছিল। আমিও। সেই ছায়া নাচতে-নাচতে গাইতেও শুরু করে দিল। আমরাও নাচতে-নাচতে গাইতে লাগলুম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো। নাচতে-নাচতে সেই ছায়া এগিয়ে চলল। আমরাও তার পিছু নিলুম। আমরা তার সঙ্গে চলে এলুম নদীর তীরে। গানে গলা মিলিয়ে, আর নাচে পা মিলিয়ে আমরা নদীর তীর পেরিয়ে উঠে পড়লুম সাঁকোর ওপর। নদীর বুকে। ছায়া নাচছে শূন্যে। আমরা নাচছি সাঁকোর ওপর। ছায়া গান গাইছে বাতাসে সুর ছড়িয়ে। আমরা গান গাইছি নাচের তালে সাঁকোর পলকা কাঠের ওপর। সে কী হুল্লোড়। অসংখ্য মানুষ যেন পাগলের মতো দিশেহারা হয়ে লাফালাফি করছে।

তারপরেই মড়-মড়-মড়াত।

পড়-পড়-পড়াত।

ভেঙে গেল সাঁকো। অত মানুষের অত ভার সইতে পারেনি সাঁকো। আমরা হুড়মুড়িয়ে সবাই ছিটকে পড়লুম জলের ভেতর। অনিষ্টের দেবতার উড়ন-ছায়াটা 'হা-হা-হা' করে হেসে উঠল শূন্যে। আমরা জলের তলায় তলিয়ে গেলুম। আমি এতক্ষণ মায়ের কাছে-কাছে ছিলুম। কিন্তু সাঁকো ভাঙতে কে যে কোথায় ছিটকে গেলুম, আর দেখতে পেলুম না। আমি জলে পড়ে 'মা-মা' করে আর্তনাদ করে উঠলুম। কিন্তু মায়ের কোনও সাড়াই পেলুম না। আমি জলে হাবুডুবু খেতে-খেতে কোথায় যে ভেসে গেলুম, নিজেও জানি না। কেননা, আমার জ্ঞান ছিল না।

অনেকক্ষণ পর আমার জ্ঞান এসেছিল। আমি বুঝতে পারলুম, নদীর তীরে আমি গড়াগড়ি খাচ্ছি। কেউ কোথাও নেই। নদীর জলে রাতের আকাশ ছায়া ফেলেছে। অনেক তারার আকাশ। আমি ধড়ফড় করে উঠে পড়লুম। জলের ছলাতকার ছাড়া কানে আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল সেই অত মানুষের হুল্লোড়! কোথায় গেল অত নাচ, গান! তার একটু রেশও আর নেই। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। মনে পড়ে গেল মায়ের কথা। কোথায় গেল আমার মা? 'মা' বলে ডাক দিয়ে, আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলুম। কিন্তু পারলুম না। আমি চিৎকার করার আগেই কে যেন হেসে উঠল! বিচ্ছিরি গলায়। আমি চমকে তাকালুম। এদিক-ওদিক। কাউকে দেখতে পেলুম না। শুধু একটা ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি শুনতে পেলুম সেই হাসির। হাসির প্রতিধ্বনি নদীর এ-কূল থেকে ও-কূল তোলপাড় করতে লাগল। অন্ধকারে। কী কর্কশ সেই হাসি। আমার কান বুঝি ফেটে যায়! আমি দু' হাতে দু' কান চেপে তারস্বরে চিৎকার করে মাকে ডাক

দিলুম, "মা-আ-আ-আ !"

সেই হাসিও অমনই দ্বিগুণ জোরে শব্দ তুলল, "হা-হা-হা।"

আমি ভয় পেলুম। উঠে দাঁড়ালুম। নদীর কিনারা ছেড়ে ছুটতে গেলুম। পারলুম না। তবু বারবার চেষ্টা করলুম। টলতে-টলতে হাঁটতে লাগলুম। হাসিটাও আমার পিছু নিল। আমি এবার হনহন করে হাঁটলুম। বুক আমার দুরুদুরু কাঁপছে। আরও জোরে যে হাঁটতে পারছি না। এমন সময়ে মনে হল, সেই হাসি আমার চেয়েও আগে চলেছে। চলতে-চলতে সেই হাসি থমকে থামল। একেবারে আমার সামনে। আমিও থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য সেই কর্কশ গলার শব্দ হুঙ্কার ছেড়ে বলল, "কোথায় যাচ্ছিস ?"

আমি ভয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলুম। ভয়-জড়ানো গলায় বলে উঠলুম, "মায়ের কাছে।"

সে আবার হাসল। হাসতে-হাসতে বলল, "তোর মাকে আর খুঁজে পাবি না।"

"কেন ?" শিউরে উঠলুম আমি।

"তোর মাকে আমি পাথর করে দিয়েছি।" যে হাসছিল, সে হাসতে-হাসতেই বলল।

"না-আ-আ-আ !" আমার গলায় আতঙ্ক। আমারও গলার শব্দ ভেসে গেল নদীর এপার থেকে ওপারে।

তারও হাসির শব্দ আমার গলার শব্দকে ছাপিয়ে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। তারপরেই তার মূর্তিটা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল। শূন্যে। আমি ভয়ে জবুথবু হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

সে বলল, "আমি জাদুকর। তোরা বলিস অনিষ্টের দেবতা। তোর মাকে আমার জাদুর শক্তিতে পাথর করেছি। সে এখন নদীর জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। তুই বেঁচে গেছিস। কিন্তু ভাবিস না তুই বেঁচে যাবি ! তোকে আমি বাঁচতে দেব না। তুই এখন নেহাতই ছোট আছিস। তোর কলিজাটার ওপর আমার লোভ। ওইটি আমার চাই ! একবার চেয়েছি যখন, তখন আর নিস্তার নেই।"

আমি জানি, সত্যিই আমার আর নিস্তার নেই। কেননা, অনিষ্টের দেবতার চোখ যার ওপর একবার পড়ে, তাকে মরতেই হয়। সুতরাং আমাকেও মরতে হবেই। মরতে যখন হবেই, তখন দেবতাকে ভয় পাওয়ার আর কী আছে আমার ! হঠাৎ কে যেন আমার মনে সাহস দিল। মন বলল, "আর কেঁদে-ককিয়ে কোনও লাভ নেই। রুখে দাঁড়াও ! দ্যাখো না কী হয় !"

মনের কথা শুনে আমি চোখের জল মুছে ফেললুম। নির্জন নদীর তীর। আমার গলার স্বরকে কঠিন করে চেঁচিয়ে উঠলুম, "আপনি কেমন দেবতা ! একটা ছোট্ট ছেলেকে ভয় দেখান একা পেয়ে। নেমে আসুন শূন্য থেকে। সাহস থাকে মাটিতে দাঁড়ান আমার মুখোমুখি। শক্তি থাকে আপনি নিজের হাতে আমার কলজেটা উপড়ে নিন। আর তা যদি না পারেন, মিথ্যে গলা ফাটিয়ে হম্বিতম্বি করে কোনও লাভ নেই।"

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই অনিষ্টের দেবতা, মানে সেই জাদুকর এবার সাঙ্ঘাতিক গর্জন করে হেসে উঠল। তাঁর সেই হাসির শব্দে অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। গাছগাছালি মাথা ঝাঁকিয়ে ঝরঝর করে ঝাঁকি দিল। আমার পায়ের তলার মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। তারপরেই আমার চোখে ছিটকে এল একটা আলোর ঝলকানি। ঝলকানি ঝলসে উঠতেই আমার চোখের পাতা বুজে গেল। চোখ খুলতেই দেখি, আমার সামনে, মাটিতে দাঁড়িয়ে অনিষ্টের দেবতা। মুখখানা তাঁর ঠিক একটা ভাল্লুকের মতো। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মুখে কালো আর হলদে রঙের ডোরাকাটা। দেহখানা যেন আলকাতরায় চোবানো। দু'পায়ে তার ঘণ্টি বাঁধা। তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে দু'পা তুলে লাফিয়ে উঠলেন। ঝনঝন করে তাঁর দু'পায়ের ঘণ্টি বেজে উঠল। আমি আঁতকে উঠলুম। তিনি ভীষণ হাঁকার দিয়ে বললেন, "এবার দেখতে পাচ্ছিস অনিষ্টের দেবতাকে ? আমার কাছে তুই একটা পুঁচকে উচ্চিংড়ে। তোর গায়ে আমার হাত দিতে হবে না। আমার চোখ দুটো এক্ষুনি যদি জ্বলে ওঠে, তুই দাউ-দাউ করে পুড়ে মরবি। আমার পায়ের ঘণ্টা যদি আর-একবার বেজে ওঠে, তুই মাটির নীচে তলিয়ে যাবি। ওই মাটির নীচে অন্ধকারে তুই খিদের জ্বালায় ছটফট করবি। একটুকরো আলোর জন্য হাঁকপাঁক করে হাঁপাবি। তারপর ওই জমাট অন্ধকারটা যখন তোকে জাপটে ধরবে, তোর বুক ফেটে দম বন্ধ হয়ে যাবে। তোকে কেউ দেখতেও পাবে না। তোর কথা কেউ জানতেও পারবে না। তুই মরে পড়ে-পড়ে পচবি।"

তবে আর কী। কিসের তোয়াক্কা এই দেবতাকে ! মরতেই যখন হবে তখন দুটো কথা শুনিয়ে দিতে দোষ কী। আমি সেই কথা ভেবেই চেঁচিয়ে উঠলুম, "শুনুন, হে অনিষ্টের দেবতা, আপনি ভাববেন না, আপনার ওই বিদঘুটে মূর্তি দেখে আমি ভয়ে মূর্ছা যাব। এবার দেখান আপনার জাদুবিদ্যার কেরামতি ! বাজান আপনার পায়ের ঘণ্টা ! দেখি কে আমাকে পাতালে বন্দি করে !"

"ওরে ছেলে, তোর এত দুঃসাহস !" দেবতার মাথায় যেন খুন চাপল। ঝাঁঝাল গলায় হুঙ্কার ছেড়ে তিনি বললেন, "দ্যাখ তবে আমার ক্ষমতা !" বলে তিনি মাটিতে ঠুকে-ঠুকে তাঁর পায়ের ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। বাজাতে-বাজাতে তিনি হাতের চেটোটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ফস করে একটা পুতুল কোত্থেকে এসে তাঁর হাতের চেটোর ওপর নাচতে লাগল। আমি অবাক হয়ে গেলুম। অবাক হয়ে দেখতে-দেখতে আনমনে পুতুলটার দিকে এগিয়ে চললুম। কখন যে দেবতার নাগালের মধ্যে চলে এসেছি, একেবারেই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখি, তাঁর হাতের পুতুলটা ঝপ করে উবে গেল। দেবতা খপ করে আমাকে ধরে ফেললেন। আমি থতমত খেয়ে গেলুম। দেবতা হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতে আমার চুলের মুঠি ধরে টান মারলেন। আমি বাঁই-বাঁই করে চরকি খেতে লাগলুম। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছি। আর চিৎকার করেই বা কী লাভ ! আমার সময় তো ঘনিয়ে এসেছে !

এমনই সময়ে কোত্থেকে একটা দমকা বাতাস ছুটে এল। মারল এক ধাক্কা অনিষ্টের দেবতাকে। দেবতার হাত ফসকে গেল। আমি ছিটকে পড়লুম একদিকে। অন্যদিকে দেবতা হুমড়ি খেয়ে চিতপটাং। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনিষ্টের দেবতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমিও পড়িমরি করে উঠে পড়েছি। আমি শুনতে পেলুম, সেই দমকা বাতাসের সঙ্গে কে যেন অনিষ্টের দেবতাকে শাসাচ্ছেন, "ওহে জাদুকর, অনিষ্টের দেবতা, তুমি আমায় চিনতে পারছ ? আমি যুদ্ধের দেবতা। আমি ঝড়েরও দেবতা। তোমার স্পর্ধা তো কম নয় ! আমার দলকে আমি নিয়ে যাচ্ছি নতুন পৃথিবীর সন্ধানে। আমাদের যাত্রার মধ্যিখানে তুমি কোথা থেকে হাজির হয়ে আমাদের অনিষ্ট সাধন করতে এসেছ ? বেশ কিছুক্ষণ আগে তুমি আমার দলের অনেক মানুষকে নদীর জলে ছুড়ে ফেলে পাথর করে দিয়েছ, তোমার জাদুর ক্ষমতায়। নদীর ওই পাথরের মধ্যে ছেলেটির মা-ও আছে। ছেলেটির মাকে পাথর করে তুমি সন্তুষ্ট নও। তোমার এখন লোভ তার হৃৎপিণ্ডের ওপর। কিন্তু শুনে রাখো অনিষ্টের দেবতা, আমি তা হতে দেব না।"

আমি দু'জন দেবতার কাউকে তখন দেখতে পাচ্ছি না। দু'জনেই অদৃশ্য। আমার মনে হল, সেই অদৃশ্য অবস্থায় অনিষ্টের দেবতা রাগে হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে-হাঁপাতে তিনি গর্জে উঠলেন, "ওহে যুদ্ধের দেবতা, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। তুমি আমার অজান্তে লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাকে আঘাত করো ! জানো, আমি ইচ্ছে করলে এক্ষুনি এই পৃথিবীটাকে মুঠোভর্তি ধুলো করে দিতে

পারি !"

যুদ্ধ-দেবতারও গলা কঠিন হল। তিনিও গর্জন করে বলে উঠলেন, "আমিও ইচ্ছে করলে এক্ষুনি তোমার দেমাক ভেঙে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারি।"

"দাও, দেখি তোমার কত ক্ষমতা !" বলে সেই অদৃশ্য অনিষ্টের দেবতা পায়ের ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে দেখি, দেবতা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছেন। তখন কী বীভৎস মূর্তি সেই অনিষ্টের দেবতার। যেন একটা কালো কুচকুচে দৈত্য। তিনি লাফিয়ে-লাফিয়ে নাচছেন। যতই নাচছেন, ততই মনে হচ্ছে, আকাশ কাঁপছে। মাটিও ফাটছে। আর তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে।

চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই আমি দেখতে পেলুম আমাদের যুদ্ধ-দেবতাকেও। দেখলুম, তাঁর সারা দেহ দিয়ে ঝড় যেন আছড়ে পড়ছে। যেন লণ্ডভণ্ড করে সব কিছু তিনি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চান। অনিষ্টের দেবতার চোখের আগুন তাঁকে ছুঁতে পারছে না। যুদ্ধ-দেবতা যখনই তাঁর হাতের বর্শা তুলছেন, বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। বিদ্যুতের ঝিলিকে তাঁর নীল দেহটা আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে উঠছে। তাঁর হাতের বেঁকাতেড়া লাঠিটা ঠিক সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করে তেড়ে যাচ্ছে অনিষ্টের দেবতার দিকে।

আমাকে নিয়ে দুই দেবতার লড়াই। আমি ভয়ে চুপসে যাচ্ছি। সেই ধুন্দুমার লড়াই যতই তীব্র হচ্ছে, কী হিংস্র হয়ে উঠছে তাঁদের মূর্তি। অনিষ্টের দেবতার পায়ে বাঁধা ঘণ্টা এখন আর টুং টুং করে বাজছে না। আকাশ থেকে অনেক বাজ একসঙ্গে মাটিতে পড়লে যেমন শোনায়, ঘণ্টার শব্দ তেমনই শুনতে লাগছে। আমার কান ফেটে যাচ্ছে। যুদ্ধ-দেবতার ঝড়ের দাপট এমন যে, মনে হচ্ছে আমাকে বুঝি কুটোর মতো উড়িয়ে নিয়ে যায় ! ঝড়ের দাপটে মস্ত-মস্ত গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে। নদীর জল কূল ভেঙে উপচে পড়ছে। বুঝি সব ভেসে যায়। আমি ভয়ে ছুট দিলুম।

কোথায় ছুটব ? যেদিকেই যাই সেইদিকেই যুদ্ধের গর্জন। আকাশ, পাতাল কাঁপছে। দুই দেবতার সেই যুদ্ধ এখনই যে থামবে, তার কোনও লক্ষণ নেই। তবু আমি ছুটছি। যতই ছুটছি, ততই যেন মনে হচ্ছে, অনিষ্টের দেবতার সেই কালো কুচকুচে মূর্তিটা আমার পেছনে তেড়ে আসছে। আর যুদ্ধ-দেবতার হাতে ভয়ঙ্কর সেই বর্শাটা শূন্যে চরকি খাচ্ছে। অনিষ্টের দেবতার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ অনিষ্টের দেবতার হুঙ্কারে সামনের পাহাড়ের চুড়োটা খসে পড়ল। আমি ভয়ে থমকে গেছি। এই বুঝি পড়ল আমার ঘাড়ের ওপর। না। আমি বেঁচে গেছি। আমার ঠিক মাথার ওপর দিয়ে সেটা উড়ে গেল। পড়ল একটা খাদের নীচে। আমি আবার ছুটলুম। বুঝতে পারলুম, এবারও আমায় বাঁচালেন যুদ্ধের দেবতা। তাঁর ঝড়ের আঘাতে পাথরটা উড়ে গিয়ে খাদে পড়েছে।

॥ ৩ ॥

অন্ধকার। অন্ধকারে পাহাড় ডিঙিয়ে আমি ছুটছি। এখন ঠাণ্ডা তার বিষদাঁত দিয়ে যতই কামড় দিক, আমায় ছুটতে হবে। অনিষ্টের দেবতা না ধরে ফেলেন আমায়। তার আগেই আমাকে লুকিয়ে পড়তে হবে। ভেবে পাচ্ছি না, কোথায় লুকোব। ভেবে পাচ্ছি না, দেবতার চোখকে কেমন করে ফাঁকি দেব। সেই দৃশ্যটা একবার চোখ বুজে ভাবো, অনিষ্টের দেবতা আমাকে ধরার চেষ্টা করছেন। চেষ্টা করছেন, যুদ্ধ-দেবতার সঙ্গে লড়াই করতে-করতে। যুদ্ধ-দেবতার ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে অনিষ্টের দেবতা নাকাল হয়ে লুটোপুটি খাচ্ছেন, তবু আমাকে তাড়া করতে ছাড়ছেন না। আমিও মিথ্যে বাঁচার জন্য প্রাণপণে ছুটছি। আকাশে বিদ্যুৎ। মাটিতে অন্ধকারের ছায়া। শূন্যে যুদ্ধের দামামা। আমি একা।

এই যাঃ !

কী হল ?

আমার পা পিছলে গেছে, আমি পড়ে যাচ্ছি।

কোথায় পড়ছি ?

ওপর থেকে নীচে।

"বাঁচাও !" আমি চিৎকার করে উঠলুম। কিন্তু তার আগেই একটা গর্তের ভেতরে আমি হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়লুম। উঃ ! ভীষণ লেগেছে আমার। বুঝি, হাড়গোড় ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। গর্তের ভেতরটা এত অন্ধকার, কিছু নজর করতে পারছি না। কিন্তু বাইরে যে এখনও দুই দেবতার যুদ্ধ চলছে তার হুঙ্কার আমার কানে আসছে। শুনতে পাচ্ছি তাঁদের আস্ফালন।

"কে ?" হঠাৎ একটা গম্ভীর গলার শব্দ। প্রতিধ্বনি তুলল, কে-কে-কে ?

আমি চমকে উঠেছি। আমার চোখ গর্তের অন্ধকারে। আলোর খোঁজে ছটফট করতে লাগল।

"কে ?" তার গলার শব্দ আরও জোরে চিৎকার করে উঠল।

আমি কাউকে দেখতে না-পেয়ে ভয়েময়ে বলে ফেললুম, "আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"এটা আমার কথার উত্তর হল না। আমি জিজ্ঞেস করছি, তুই কে ?" সে এবার কড়কে উঠল।

আমি উত্তর দিলুম, "আমি একজন ছেলে।"

"তুই এত উজবুক কেন ? তুই যে একটা ছেলে, তা আমি দেখতে পাচ্ছি !" তার গলায় আরও ঝাঁঝ বাড়ল, "কোথাকার ছেলে তুই ?"

"আমি হেথাকার ছেলে।" অন্ধকারে মুখ ঘুরিয়ে আন্দাজে উত্তর দিলুম।

"হেথা বলতে ?" তার গলা কড়কে উঠল।

"হেথা বলতে, যেথায় আমি পড়ে আছি।"

সে বলল, "হেথাকারই যদি হোস, তবে তোকে আমি চিনতে পারছি না কেন ?"

আমি কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালুম। উত্তর দিলুম, "সবাই তো সবাইকে চেনে না। আমিও বোধ হয় তোমাকে চিনি না।"

এবার সে ক্ষিপ্ত হয়েই তেড়ে উঠল, "'বোধ হয়' মানে ?"

আমি একটুও ভয় না-পেয়ে বললুম, "তোমার গলার স্বরটা আমার কাছে একেবারেই অচেনা। তার ওপর তোমাকে অন্ধকারে দেখতেও পাচ্ছি না। সেইজন্যই 'বোধ হয়' বলছি।"

আমার উত্তর শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে খস্‌খস করে পাথর ঘষতে লাগল। আমার মনে হল দুটো পাথরের ঘষটানি লেগে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিকে। মুহূর্তের মধ্যে সেই ফুলকির ছোঁয়া লেগে ফস করে আগুন জ্বলে উঠল শুকনো পাতায়। সেই আগুনের আভায় তাকে দেখতে পেলুম। একজন জোয়ান মানুষ। চেটাই-এর ওপর বসে আছে। মনে হয় এতক্ষণ শুয়ে ছিল।

"এবার দেখতে পাচ্ছিস ?" খুবই তিরিক্ষি মেজাজে জিজ্ঞেস করল সে।

আমি এক মুহূর্তও দেরি না-করে উত্তর দিলুম, "হ্যাঁ।"

"চিনতে পারছিস ?"

আমি বললুম, "মনে পড়ছে না।"

সে যেন এবার একটু ঠাট্টা করেই বলল, "আমাকে যার মনে পড়ে না, তার আর কাকে মনে পড়ে ?"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলুম, "মাকে।"

"তা হলে মাকে ছেড়ে, এখানে অন্ধকারে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস

কেন ?" তার গলা আবার গাঁক-গাঁক করে উঠল।

আমি রাখঢাক না-করে জবাব দিলুম, "অনিষ্টের দেবতা মাকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে পাথর করে দিয়েছেন। মা কোনও দোষ করেনি। এখন আবার আমাকে তিনি মারতে চান। আমিও কোনও দোষ করিনি।"

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাকে জাপটে ধরল। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। এ কী! লোকটা এমন করে আচমকা আমাকে ধরে কেন! আমি হাঁকপাঁক করে বলে উঠলুম, "তুমি আমাকে ধরছ কেন ?"

সে তেড়ে উঠল, "তুই তো ভারী সর্বনেশে ছেলে! অনিষ্টের দেবতার ইচ্ছেকে তুই অমান্য করিস! তাই বলি আকাশে এমন দুর্যোগ কেন! দেবতার চোখে ধুলো দিয়ে তুই লুকিয়ে বেড়াস! জানিস, তার মনের সাধ না মেটালে তিনি এক্ষুনি পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন!"

"পারবেন না।" বলে আমি তার দু' হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলুম। বলে উঠলুম, "আমায় রক্ষা করবেন আমাদের যুদ্ধ-দেবতা।"

সে চমকে উঠল। বলল, "তুই যুদ্ধ-দেবতার দলের সঙ্গে আছিস ? শুনে রাখ, আমার দেবতার সঙ্গে তাঁর শত্রুতা। অনিষ্টের যিনি দেবতা, তিনিই আমরা দেবতা। তার মানে, তুই আমার শত্রু। তোর আর নিস্তার নেই।" বলে সে আমায় প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিল। আমি প্রাণপণে হাত-পা ছুড়তে লাগলুম। কিন্তু তার সঙ্গে যুঝে ওঠার ক্ষমতাই আমার নেই। আমি তো এইটুকু।

সে আমায় সেই অন্ধকার গর্ত থেকে বাইরে নিয়ে এল। দুই দেবতার তুমুল লড়াই তখনও আকাশ-মাটি কাঁপাচ্ছে। লোকটা আমাকে সাপটে ধরে ছুট দিল। ছুটতে-ছুটতে চেঁচাল, "হে জাদুকর, অনিষ্টের দেবতা," আপনি যাকে চান তাকে আমি পাকড়াও করেছি। সে আমার হাতে বন্দি। বন্দিকে নিয়ে আমি মন্দিরে যাচ্ছি। সেইখানে, আপনার মূর্তির সামনে তাকে আমি কোতল করব।" বলতে-বলতে সে যেমন জোরে ছুটছিল, তেমনই জোরে ছুটতে লাগল। আমিও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলুম।

আমি এখন বুঝতে পেরেছি, যে লোকটা আমায় ধরেছে, সে এখানকারই বাসিন্দা। আমি পরদেশি। লুঠেরা। এই লোকটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে। কাজেই এর হাতে আমাকে মরতেই হবে। আর নিস্তার নেই।

উফ! দুই দেবতার যুদ্ধের কী তেজ! এখনও পাহাড় কাঁপছে। এখনও বজ্রের শব্দে থরথর করছে চারদিক। যুদ্ধের আতান্তর মাথায় নিয়ে লোকটা পাথর ডিঙোচ্ছে। তার হাতের চাপে আমি ছটফট করছি। আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর বোধ হয় আমার যুদ্ধের দেবতা আমাকে বাঁচাতে পারলেন না। তবু আমি চিৎকার করে উঠলুম, "হে আমার যুদ্ধ-দেবতা, আমাকে বাঁচান!"

হঠাৎ আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। আকাশে কী একটা অদ্ভুত আলো ঝিলিক দিল। আমি সেই আলোয় ঝাপসা চোখে দেখলুম, যুদ্ধ-দেবতার সেই তেড়াবেঁকা লাঠিটা শূন্যে কাঁপছে। তারপর প্রচণ্ড জোরে ছিটকে এসে পড়ল এই লোকটার মাথায়। আমাকে ধরে রাখার আর তার ক্ষমতা নেই। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল পাথরের ওপর। তার হাত ফসকে আমিও পড়লুম। সে আর নড়ল না। আমি উঠে দাঁড়ালুম। মনে হল তার প্রাণ গেছে। তার দিকে আমার আর চোখ ফেরানোর সময় নেই। অনিষ্টের দেবতার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি গোপন আস্তানার খোঁজ করতে লাগলুম এদিক-ওদিকে। ছুটে-ছুটে।

ছুটছি বটে, কিন্তু রাতের এই অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কার সাধ্য গোপন আস্তানার খোঁজ পায়। এখন যুদ্ধের শব্দ ছাপিয়ে আমার কানে আসছিল পাহাড়ের চুড়ো থেকে লাফিয়ে পড়া জলপ্রপাতের শব্দ। জলপ্রপাত যে কোনদিকে, কোথায়, আমি দেখতেই পাচ্ছি না। দুই দেবতার যুদ্ধের শব্দের সঙ্গে সে-ও যেন পাল্লা দিয়ে ঝরঝর করছে। মনে হচ্ছে, এখনই বুঝি পাহাড়টা ধসে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

"আ-আ-আ!" আমি চিৎকার করে উঠেছি। পাথরে আমার পা হড়কে গেছে। বুঝতে পারলুম, শ্যাওলায় পা পড়েছে। বোধহয় জলপ্রপাতের জল জমে শ্যাওলা পড়েছে পাথরে। আমি টাল সামলাতে পারলুম না। পাথরে ঠোক্কর খেতে-খেতে সিধে আমি জলপ্রপাতের জলেই পড়লুম। জল ছুটে চলেছে ওপর থেকে নীচে। পাথরে-পাথরে সে জল ধাক্কা খাচ্ছে। কী তার তোড়! সেই তোড়ে হাবুডুবু খেতে-খেতে আমিও ভেসে চললুম। কার সাধ্য সেই তোড়ের সঙ্গে পাল্লা দেয়! আমি যেন একটা কুটো। জলে ভেসে চলেছি উলটে-পালটে। পাথরে ঠুকে-ঠুকে আমার হাড়গোড় বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। এখন আর শীত পাচ্ছে না আমার। ভয়ে সে কখনই আমার শরীর থেকে পালিয়ে গেছে। এই যে জলপ্রপাতের বরফ-গলা জল তাও এখন গায়ে লাগছে না। পাহাড় ডিঙিয়ে যে-জল নীচে ছুটে যায়, সে যে কী দুরন্ত, যারা না দেখেছে তাদের বোঝানো যায় না।

আর কতক্ষণই বা আমি যুঝতে পারব জলের সঙ্গে! কতক্ষণই বা বেঁচে থাকব প্রাণে! তবে কি আমাদের যুদ্ধ-দেবতা পারলেন না আমাকে বাঁচাতে! শেষমেশ কি আমারও মায়ের মতো অবস্থা হবে! হয়তো তাই। আমার মনে হল, আমি আর তাকাতে পারছি না। মনে হল, আমি জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি স্রোতের সঙ্গে। আমি ভীষণ হাঁপাতে লাগলুম। আমার চোখের ওপর রাতের অন্ধকারের চেয়েও আরও গভীর অন্ধকার নেমে এল। আমি আর কিছুই জানি না।

॥ ৪ ॥

রাত কেটে যখন সকাল হল, তখন কি তোমরা আমাকে দেখতে পেয়েছিলে ? দেখতে কি পেয়েছিলে আমার নিঃসাড় দেহটা অনেক পাথরের খাঁজে আটকে দোলা খাচ্ছে ?

না, আমার প্রাণ যায়নি। জলে নাকানি-চোবানি খেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। যখন আমার জ্ঞান ফিরল, আমি দেখলুম, সকাল হয়েছে। আলোয় ভরে গেছে চারদিক। আলো পড়েছে দূরে-দূরে পাহাড়ের গায়ে, চুড়োয়, বরফের ওপর। নয়তো গাছের মাথায়। আর পড়েছে সফেন জলে। আমি সেই জলের ওপর ভাসতে-ভাসতে আটকে আছি পাথরের খাঁজে। আশ্চর্য, এখনও কেমন করে বেঁচে আছি!

হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল সেই ভাঙা সাঁকোটার দিকে। শিউরে উঠেছি আমি। মনে পড়ে গেল, অনিষ্টের দেবতা এই সাঁকোর ওপর তাঁর জাদুর জোরে টেনে এনেছিলেন আমাদের। আমি বেঁচে গেছি। মা পাথর হয়ে গেছে। তবে কি এই পাথরেরই একটি আমার মা! আমি জল তোলপাড় করে মাকে খুঁজতে লাগলুম।

এই পাথর থেকে ওই পাথর। ওই পাথর থেকে আর-এক পাথরে হাবুডুবু খাই আমি। কিন্তু খুঁজে পাই না মাকে। কেমন করে পাব ? এ তো সবই নিছক পাথর। কোনওটাই তো মূর্তি নয়। কাজেই খুঁজতে-খুঁজতে আমি কাহিল হয়ে পড়লুম। এবার আমার কাঁপুনি এল। জলের ভেতরে আমি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলুম। আর ভাবতে লাগলুম, এবার আমি কী করব!

এমন করে জলে আর বেশিক্ষণ থাকা যায় না। ঠাণ্ডায় জমে আমিও যদি পাথর হয়ে যাই! আশ্চর্যের কিছু নেই। এখনও যে কেন হইনি, সেইটাই আজব ঘটনা। পারি, চাই নাই পারি আমাকে

তীরে ওঠার চেষ্টা করতেই হবে। নদীর তীর জুড়ে পাহাড়ের ঢল। আমি পাথর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এগিয়ে চললুম। জলের স্রোত ভেঙে তীরে ওঠা যে কী দুঃসাধ্য কাজ, যে জানে না তাকে বোঝাব কেমন করে! এই পাথরটা আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে ওই পাথরটা যেই ধরতে যাব, জলের ঝাপটায় হাত ফসকে যায়। একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার। তারপর যখন ধরতে পারি তখন আর দম থাকে না।

এমনই করে অনেক পাথর যখন টপকেছি তখন আচমকা নজর পড়ে গেল আকাশের দিকে। দেখি, আমার ঠিক মাথার ওপর একটা ঈগল পাখি সোনালি ডানা ছড়িয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিপদে পড়লে সব মানুষ যা করে আমিও তাই করলুম। তার দিকে চেয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলুম, "বাঁচাও-ও-!"

চেঁচালে কী হবে! পাখির কি সেই সাধ্য আছে যে আমাকে বাঁচায়! কিন্তু আশ্চর্য, আকাশে উড়তে-উড়তে নেমে এল ঈগল। বসল, জলের ওপর মুণ্ডু-তোলা একটা পাথরের ওপর। সে জুলজুল করে দেখতে লাগল আমাকে। আমিও কাতর চোখে তাকাই তার দিকে। এখন জলের ছলাতকারের শব্দ ছাড়া যেমন সব নিস্তব্ধ, তেমনই সেই ঈগলও নিশ্চুপ। আমিও বোবা। কে দিল পাখিকে অমন সোনালি পালক? কী সুন্দর দেখতে লাগছে! হঠাৎ পাখিটা উড়ে গেল। তার সোনা-রং ডানা জলের ওপর ঝিলমিলিয়ে উঠল। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম সেইদিকে। মনে-মনে ভাবতে লাগলুম, এমন পাখি আমি তো আর কখনও দেখিনি!

হি-হি-হি! আচমকা কে হেসে উঠল!

তার হাসির সঙ্গে আচমকা জলের ওপর ঢেউ উঠল। আমি চমকে পিছু ফিরলুম। দেখে থমকে গেলুম। আমার পেছনে উনি কে? জলে ভাসছেন? চোখ ঝলসে গেল! এমন রূপবতী, এ কার মা?

আমায় এমন করে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি আবার হাসলেন।

আমি কোনও কথা বলতে পারলুম না।

আমাকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি নিজেই বললেন, "আমি না থাকলে তুই কখন ডুবে যেতিস। তুই যখন এই জলে পড়ে গেলি, সেই তখনই তোকে আমি কোলে তুলে নিলুম।" বলেই তিনি মুচকি হাসলেন। হাসতে-হাসতেই জিজ্ঞেস করলেন, "তুই আমাকে চিনতে পারছিস?"

আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চেনবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু চিনতে পারলুম না।

তিনি বললেন, "তা বটে, তুই আমায় চিনবি কেমন করে? তুই তো আমায় দেখিসনি কোনওদিন। আমি স্রোতের দেবী। এই যে নদী, ওই যে ঝরনা, ওই সমুদ্র, সবাই আমার ছেলেমেয়ে। আমার দাদাই গুহার দেবতা।"

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। কেননা, আমি তো আগেই বলেছি, গুহার দেবতা ভয়ঙ্কর। যেমন তাঁকে দেখতে, তেমনই তিনি হিংস্র। আমার মতো ছোট্ট যারা, তাদের ওপর ভীষণ লোভ গুহার দেবতার। উৎসবের সময় একটার পর একটা ছেলেকে ধরে এনে বলি দেওয়া হয় গুহা-দেবতার মূর্তির সামনে। তা হলে এবার কি আমার পালা! স্রোতের দেবী এবার কি তা হলে আমাকে তুলে দেবেন গুহা-দেবতার হাতে? আমি ভয়ে কুঁচকে গেলুম।

স্রোতের দেবী আমার মুখের চেহারাটা দেখে বোধ হয় মনের কথাটা বুঝতে পারলেন। বললেন, "এবার কী হবে তোর? কী করবি একা?"

আমার কান্না পেল, অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু আমার মুখে একটি কথাও সরল না। চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

স্রোতের দেবী আমার চোখে জল দেখে কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভয়-মেশানো একটা চাপা স্বরে বলে উঠলেন, "চোখের জল মুছে ফেল, মুছে ফেল! তুই কি জানিস না আমার দাদার লোভ ওই তোদের মতো ছোট্ট ছেলের চোখের জলের ওপর? লোভ তোদের প্রাণের ওপর? তাই তোদের মতো ছোট্ট ছেলেদের ধরে এনে দাদার সামনে বলি দেওয়া হয়। তোরা মরণের ভয়ে যতই কাঁদিস, দাদার ততই আনন্দ। কেননা, তোদের চোখের জলই বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে আকাশ থেকে। আমার দাদা যেমন গুহার দেবতা, তেমনই বৃষ্টিরও। দাদাকে তাই তুষ্ট করার জন্য তোদের প্রাণ উৎসর্গ করা হয়। তোরা যতই কাঁদবি, ততই বৃষ্টি। বৃষ্টি না হলে ফসল হবে কেমন করে? মানুষ বাঁচবে কী করে?"

আমি থমকে গেলুম। আমার চোখ ভয়ে শুকিয়ে গেল।

দেবী বললেন, "তোকে এবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

আমি চমকে গেলুম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "কোথায়?"

উত্তর পেলুম, "আমার আশ্রয়ে।"

ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "এই পাহাড়ি নদীর আছাড়ি-পিছাড়ি স্রোতে কোনও মানুষ বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। আমি তোকে রক্ষা করেছি এতক্ষণ। এইবার আমার সঙ্গে আমার আশ্রয়ে না-গেলে তুইও ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাবি।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার আশ্রয় কোথায়?"

তিনি বললেন, "জলের নীচে। সেখানে তোকে লুকিয়ে রাখব।"

"কেন?" ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

স্রোতের দেবী বললেন, "তোর জন্য কাল সারারাত যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধ-দেবতা, অনিষ্টের দেবতার সঙ্গে। সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে যুদ্ধের সেই ভীষণ গর্জন আর শোনা যাচ্ছে না। তাই বলে যেন মনে করিস না অনিষ্টের দেবতা হেরে গেছে! আবার যুদ্ধ হবে। সে যখন গোঁ ধরেছে, তখন সে তোর প্রাণ নেবেই। কিন্তু যতক্ষণ তুই আমার কাছে আছিস, আমি তোকে রক্ষা করব। তোর মা নেই। অনিষ্টের দেবতার কোপে তোর মা পাথর হয়ে গেছে। অনিষ্টের দেবতা ইচ্ছে করলে তার জাদুর জোরে তোকেও পাথর করে দিতে পারে। এখন আমিই তোর মা। আমি পৃথিবীর সব শিশুরই মা। আমি তোদের রক্ষা করি। তুই আয় আমার সঙ্গে।"

আমি বললুম, "হে স্রোতের দেবী, আমি জলের নীচে বাঁচব কেমন করে?"

"আমি তোকে বাঁচিয়ে রাখব। জলের নীচে তোর কোনওদিন প্রাণ যাবে না।" বলে স্রোতের দেবী আমার মাথায় হাত রাখলেন।

আমি আর কোনও কথা বলতে পারলুম না। স্রোতের দেবীর হাত ধরে আমি জলের গভীরে তলিয়ে গেলুম। আর মনে-মনে ভাবতে লাগলুম, স্রোতের দেবী সত্যিই কি পৃথিবীর সব শিশুর মা! কে জানে!

জলের স্রোতে ভেসে-ভেসে অনেকখানি যাওয়ার পর আমার চোখের সামনে ওটা কী দেখা যায়?

একটা মন্দির।

আমি দেখে চমকে উঠেছি। শুধু জল আর জল। সেই জলে ডুব দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মন্দির। সাদা ঝকঝক করছে।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই স্রোতের দেবী বললেন, "ওইটা আমার আশ্রয়। এসে গেছি। আর তোর ভয় নেই। ভেতরে আয়!"

তবুও আমার মন কিন্তু-কিন্তু করছে। কেবলই মনে হচ্ছে, স্রোতের দেবীর মনের ভেতরে অন্য কোনও মতলব নেই তো! অবশ্য থাকলেই বা কী করা! অগত্যা আমি মন্দিরেই ঢুকে পড়লুম। মন্দিরে ঢুকে দু'পা গেছি কি যাইনি, আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। আমি যেন চোখে অন্ধকার দেখলুম। এ কী! আমার চোখের সামনেই যে দাঁড়িয়ে আছেন গুহার দেবতা। দ্যাখো, ঠিক তেমনই দাঁত বের করে হাসছেন। আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলুম।

গুহার দেবতা আমার দিকে ডগডগে চোখে তাকিয়ে খকখক করে হাসতে লাগলেন। হাসতে-হাসতে স্রোতের দেবীকে বললেন, "বোন, তোর জন্য আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। মনে হচ্ছে, ছেলেটার ওপর আমার যে লোভ, এ-খবরটা বোধ হয় তোর কানে আগেই পৌঁছে গেছে! তাই দাদাকে তৃপ্ত করার জন্য ধরে এনেছিস। খুব ভাল! খুব ভাল! দ্যাখ, ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছে এর কলজের স্বাদটা নেহাত মন্দ হবে না।"

"না!" থমকে দাঁড়িয়ে ফোঁস করে উঠলেন স্রোতের দেবী। "তোমার জন্য একে আমি নিয়ে আসিনি।"

"তবে?" যেন অবাক হলেন গুহার দেবতা।

"আমি একে আমার মন্দিরে আশ্রয় দেব বলে নিয়ে এসেছি। ছেলেটির মা নেই। বাবা নেই। অনিষ্টের দেবতা এর মাকে পাথর করে দিয়েছে। নদীর জলে ডুবে আছে এর মা।" বলতে-বলতে স্রোতের দেবী আমাকে আগলে ধরলেন।

গুহার দেবতা খুব জোরে হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, "এ তো ভাল কথাই। মা নেই যখন, তখন কাঁদবার লোকও নেই। বাবা নেই যখন, তখন বাধা দেওয়ারও কেউ নেই।"

"আমি আছি!" ঝাঁঝিয়ে উঠলেন স্রোতের দেবী।

গুহার দেবতার হাসিমুখটা এবার খানিক ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বোনের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "তুই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস?"

"না।"

"তবে?"

স্রোতের দেবী বললেন, "আমি যা বলছি, সত্যি বলছি। আমি একে রক্ষা করব। এ আমার সন্তান।"

গুহা-দেবতার সেই ফ্যাকাসে মুখখানা এবার যেন ধীরে-ধীরে লাল হয়ে উঠল। ওই কুচ্ছিত মুখ বুঝি বোনের কথা শুনে রেগে অমন রক্ত-রাঙা হয়ে উঠেছে। হয়তো তাই। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, "শোন রে বোন, ভাল চাস তো ছেলেটাকে আমার হাতে তুলে দে! নইলে তুইও রেহাই পাবি না। ভুলে যাস না, আমি গুহার দেবতা! তোর দাদা আমি। আমায় অমান্য করা মানে, তোর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। আমার শেষ কথা, ছেলেটার কলিজা আমার চাই!"

গুহা-দেবতার অমন আস্ফালন দেখে স্রোতের দেবীর গা কশকশ করে উঠল। দেবীও ক্ষিপ্ত গলায় উত্তর দিলেন, "তবে আমারও শেষ কথা শোনো দাদা, আমি ছেলেটিকে তোমার হাতে কিছুতেই তুলে দেব না। কিছুতেই মরতে দেব না আমি। তোমার মনের যা ইচ্ছে তুমি তাই করতে পারো। তোমার ওই রক্তচক্ষুকে ভয় পাই না আমি। ভেবো না, আমার ক্ষমতা নেই। তোমার দেমাক কেমন করে ভাঙতে হয়, আমার জানা আছে।

স্রোতের দেবীর কথা শুনে গুহা-দেবতা রণমূর্তি ধারণ করলেন। যেখানে বসে ছিলেন সেখান থেকে একটা লম্বা লাফ মারলেন গুহা-দেবতা। সটান পৌঁছে গেলেন স্রোতের দেবীর একেবারে মুখের সামনে। চোখের পলকে দেবী আমাকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। দু' হাতের থাবা দিয়ে দেবীকে ঠেলা মারলেন গুহা-দেবতা। আশ্চর্য! ঠেলা মারতেই সেই গভীর জলের অতল উত্তাল হয়ে উঠল। কোথা থেকে যে কী হল, আমি কিছুই ঠাওর করতে পারলুম না। দেখতে পেলুম, স্রোতের দেবীর মাথার চুল লণ্ডভণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কী প্রচণ্ড স্রোত বইল সেইসঙ্গে। আমি জলের স্রোতে হাবুডুবু খেতে লাগলুম। দেখতে পেলুম না আর কিছুই। মনে হল, বোধ হয় ভাই-বোনে যুদ্ধ লেগেছে। আমি জলের ভেতর ঘূর্ণি-স্রোতে লুটোপুটি খেতে-খেতে ভেসে যাচ্ছি। শতচেষ্টা করলেও এই দুর্দান্ত স্রোত আর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করি, এমন তাগত আমার নেই। আমায় ভেসে যেতেই হল। ভাসতে-ভাসতে কোথায় যাচ্ছি, জানি না। আমার চোখের সামনে আমি এখন স্রোতের দেবীকেও দেখছি না, দেখছি না গুহার দেবতাকেও। ঢেউয়ের ঝাপটা খেতে-খেতে আমারই চোখের পাতা বুজে আসছে। জোর করে চেয়ে আছি। কখনও দেখতে পাচ্ছি, কখনও পাচ্ছি না। তবে কি জলের ভেতর ঢেউয়ের ঝাপটানিতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে! নাকি এমনই ঢেউ তুলে স্রোতের দেবী আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অজানা কোনও দেশে!

আমি আর বেশিক্ষণ পারিনি জলের সঙ্গে যুঝতে। পারিনি ঢেউয়ের উথাল-পাথাল সহ্য করতে। আমি হারিয়ে গেলুম জলের তলায়। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। দম যেন আটকে আসছে। কিছুই ভাবতে পারছি না আর। আমার আর মনে পড়ল না মায়ের কথা। মনে পড়ল না বাবার কথা। কিংবা মনে পড়ল না আমাদের সেই দলের কথা। সেই দলের সঙ্গে মায়ের হাত ধরে পাহাড় ডিঙোনোর কথা যেমন ভুলে গেলুম, তেমনই ভুলে গেলুম সেই আগ্নেয়গিরির কথাও। তার মুখ দিয়ে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। ধকধক করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। আমি আর চাইতে পারছি না। এমন করে ঘুম কেন জড়িয়ে ধরছে আমার চোখের পাতা! আমি আর চেয়ে থাকতে পারলুম না। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর আর কিছুই জানি না।

॥ ৫ ॥

অনেকক্ষণ পর আমার ঘুম ভাঙল। অনেকক্ষণটা কতক্ষণ পর, আমি বলতে পারব না। নাকি, অনেকক্ষণটা অনেকদিন, তাও খেয়াল করতে পারছি না। কেননা, তখনও আমি জলের তলায়। জলের তলায় ভাসছি। মাথায় ঢুকছে না, এখন দিন, না রাত। আলো, না অন্ধকার। আমি ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠলুম। মিথ্যে লাফাই। জলের ওপরে যে আকাশ, তার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারল না আমার দৃষ্টি। আমি প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলুম। তাও মিথ্যে। জলের ভেতর আমার চিৎকারটা চিৎকার হল কি না, তাই-বা কে বলবে! কিন্তু বোধ হল, এখন আর তেমন বিপজ্জনক প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছি না। ঢেউও নেই। এখানে জল বড় শান্ত। আমি যেন জলের দোলনায় দুলছি। দুলতে-দুলতে ভেসে চলেছি।

কিন্তু কোথায় গেলেন সেই স্রোতের দেবী? আর তো দেখতে পাচ্ছি না সেই গা-ছমছম-করা গুহা-দেবতাকে! তবে কি ভাই-বোনের যুদ্ধ এখনও চলছে? না কি স্রোতের দেবীর রোষে গুহা-দেবতাও জলের তলায় তলিয়ে গেছেন? ভাবতে-ভাবতে আচমকা আমার চোখে ভেসে উঠল যুদ্ধ-দেবতা আর অনিষ্টের দেবতার সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দৃশ্যটা। ভেসে উঠল স্রোতের দেবী আর তাঁর দাদা গুহা-দেবতার ধুন্ধুমার লড়াই-এর ছবিটাও। যুদ্ধ-দেবতা আমায় বাঁচালেন ভালুক-মুখো অনিষ্টের দেবতার হাত থেকে। বাঁচলুম বটে, কিন্তু রেহাই পেলুম না তবুও। এবার মরতে-মরতে বেঁচে গেলুম গুহা-দেবতার থাবা থেকে। বাঁচলুম স্রোতের দেবীর দয়ায়।

কিন্তু এর পর? চারদিক সুনসান। তাঁরা কেউ নেই

কোথাও। এখন, কেমন করে আমি ভেসে উঠব জলের ওপরে? কে আমায় হাত ধরে তুলবে? কে বলে দেবে পথের দিশা?

এমন সময়ে হঠাৎ আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। দেখি কী, চারদিকে ফোঁটা-ফোঁটা আলো ভেসে বেড়াচ্ছে জলের গভীরে। ভাসতে-ভাসতে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কাছে আসতেই আমার গায়ে কাঁটা দিল। দেখি, একঝাঁক মাছ। বীভৎস দেখতে। তাদের চোখ দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। আমি রাক্ষসের গল্প শুনেছি। শুনতে-শুনতে রাক্ষসের একটা বিচ্ছিরি ছবি আমার চোখের ওপর ভেসে উঠত। কিন্তু এগুলো যেন রাক্ষসের চেয়ে ভীষণ। তার ওপর এদের চোখে আলো। যেন আগুন জ্বলছে। এই বুঝি আমার গায়ের ওপর পড়ে! আমি পালাতে গেলুম। পারলুম না। দেখি, আমার একেবারে নাগালের মধ্যে অনেক ঘোড়ামুখো জন্তু! কোত্থেকে হাজির হল কে জানে! সাঁতার কাটছে। খুব বেশি হলে আমার হাতের চেয়ে একটু বড় এই জন্তুগুলো। সরু। লম্বা-লম্বা। একটার গায়ে আর-একটা ল্যাজ জড়িয়ে ভেসে চলেছে দলে-দলে। আমি ভড়কে গেছি। একদিকে চোখে-আলো রাক্ষুসে মাছ, আর-একদিকে ঘোড়ামুখো পুঁচকে জন্তু। আমাকে কামড়ে দেবে নাকি! ভয়ে, জলের ভেতর হাত-পা ছুড়ে আমি লাফাতে লাগলুম। ঘোড়াগুলো ল্যাজ-ট্যাজ গুটিয়ে যে যেদিকে পারল দে-লম্বা। আমি পরে শুনেছিলুম, এদের বলে সমুদ্রের ঘোড়া। এদের ছানাপোনারা মায়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করে না। ছানাপোনার বাবার পিঠে থাকে একটা করে থলি। এই থলির ভেতর ছানাপোনারা চুপটি করে বসে থাকে। আর ছানাদের বাবা তাদের পিঠে নিয়ে জলে-জলে ঘুরে বেড়ায়।

সে যাই হোক, আমি যে নদীর জলে হাবুডুবু খেতে-খেতে এখন সমুদ্রের জলে ভেসে এসেছি, আমি তখনও পর্যন্ত সেটা জানতুম না। সমুদ্রের অতলে তখন একটার পর একটা কত যে রকমারি প্রাণী দেখতে পেলুম! একটু আগে জলের ভেতর যেমন রাক্ষুসে মাছ দেখলুম, তেমনই দেখলুম ঘোড়া। এখন আবার দেখতে পেলুম সমুদ্রের সিংহ। সিল মাছ। আমার মতো দু'জন, একজনের মাথায় আর-একজন দাঁড়ালে যতটা লম্বা দেখায় ঠিক অতটা বড় একটা সমুদ্রের সিংহ। পাখনা দিয়ে জল কেটে-কেটে অমনই দুটো-সিংহ আমার দিকে ধেয়ে আসছে। তাদের কী মূর্তি! দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়! আমি তো আর জলের নাড়ি-নক্ষত্র কিছুই জানি না। কাজেই ওদের হাত থেকে বাঁচার রাস্তাও আমার জানা নেই। আমার এবার মরণ কেউ ঠেকাতে পারছে না।

দেখতে-দেখতে সেই ধুমসো সিংহ দুটো একেবারে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল বুঝি! না, আমায় ছুঁল না। আমায় দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে একবার একটা আমার ডান দিকে যাচ্ছে, আর-একটা বাঁ দিকে। একটা পায়ের দিকে যায় তো অন্যটা মাথার দিকে সাঁতরে আসে। তখন রাক্ষুসে মাছ আর ঘোড়াগুলোকে দেখে আমি জলে লাফালাফি করেছিলুম। তারা ভয়ে পালাল। এখন আমিই ভয়ে জলের ভেতর কুঁকড়ে গেলুম।

এমনই সময়ে হঠাৎ একটা সিংহ সাঁই করে জলের মধ্যে ডুব মারল। মেরেই আমায় ঠেলে দিল। আমি ভুস করে ডিগবাজি খেয়ে উলটে গেলুম। আচমকা এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেলে, কে ভয় পায় না বলো? আমি বাঁচবার জন্য আঁকপাঁক করে উঠলুম। সামলে গেছি। দ্যাখো এবার বুঝি আবার ঢুঁ মারে!

না, আর তো মারল না। কী ভাবল কে জানে! আমার দিকে আর চাইল না। কিছু বললও না। সিধে চলে গেল সাঁতার কাটতে-কাটতে। কোথায়, কে জানে! আশ্চর্য, কী অদ্ভুত কায়দায় সাঁতার কাটছে! মাঝে-মাঝে ডুব দিচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে! দুটো যেন মস্ত-মস্ত পাথরের ডেলা। ছিরিছাঁদ কিছুই নেই। সাঁতার কাটছে।

আচ্ছা, তোমাদের কি একবারও মনে হচ্ছে না, এই জলের অতলে শ্বাস নিয়ে আমি কেমন করে বেঁচে আছি? তোমাদের যদি এমন ভাবনা মনে আসে, তবে, বলি, আমিও ঠিক এমন কথাই ভাবছি। বটেই তো, আমি বেঁচে আছি কেমন করে, জলে ডুবে? কেমন করে ভাসছি এই গভীর জলের নীচে। তবে কি স্রোতের দেবীর কোনও ইন্দ্রজালের শক্তি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে!

ওই দ্যাখো, একদঙ্গল রংবেরঙের মাছ কেমন রং ছড়িয়ে সাঁতার কেটে ভেসে যাচ্ছে! যেন নাচছে। মুঠো-মুঠো রং। কী সুন্দর দেখতে লাগছে খুদে-খুদে মাছগুলোকে। রঙিন। গায়ের রং দেখলে চোখ ফেরায় কার সাধ্য! একঝাঁক এমনই রং-টুলটুল মাছ আমার দিকে এগিয়ে এল। আমাকে দেখে কি তারা অবাক হল? মাছের মনের কথা আমি আর জানব কেমন করে? কিন্তু একটুও ভয় পেল না। সত্যি বলতে কী, তারা যেন আমায় দেখে আনন্দে লুটোপুটি খেতে লাগল। তারা যেন রং ছড়িয়ে খেলা করছে। মাঝে-মাঝে আমার গা ছুঁয়ে যেন আমায় ডাকছে। বলছে, "এসো না, আমাদের সঙ্গে খেলা করো।"

আমার কী সাঙ্ঘাতিক বিপদ! মুহূর্তের জন্য বিপদের কথা ভুলে অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম, মাছেদের সেই রঙের খেলা। তারা পাখনা মেলে এগিয়ে চলেছে। আমিও ভেসে চলেছি তাদের সঙ্গে। ভাসতে-ভাসতে তলিয়ে যাচ্ছি। সমুদ্রের আরও গভীরে ওই রং-ঝলমল মাছেদের সঙ্গে। শেষমেশ বোধ হয় সমুদ্রের অতলেই আমায় ভেসে বেড়াতে হবে মাছেদের সঙ্গে। পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়া আকাশ-ভাঙা-আলো আমি হয়তো আর কোনওদিন দেখতে পাব না। জলের এই প্রাণীগুলোর মতো তখন কি আমারও নাম হবে জলের মানুষ?

দাঁড়াও, দাঁড়াও! রং-ঝলমল মাছেদের সঙ্গে এ আমি কোন রঙের রাজ্যে চলে এসেছি! আমার চোখ যে ঝলসে যায়! এ যে ওই রঙিন মাছেদের চেয়েও আরও রঙিন এক চোখজুড়ানো ফুল-পাতার বাগান। আমি সামনে দেখি, পেছনে দেখি শুধু রং আর রং। যত ফুল, তত গাছ। যত মাছ, তত রং। থরেথরে কে সাজিয়ে রেখেছে। আমার পা ঠেকল বালিতে। আমার চোখের পাতায় কে যেন এঁকে দিল রঙের স্বপ্ন! কত মাছ এ-বাগানে! কোনওটা একরঙা। কোনওটা পাঁচরঙা। কে যেন তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে নানা রঙের আঁকিবুকি। তাদের গায়ে। তারা আমায় দেখেই লুকিয়ে পড়ল। কেউ লুকোল পাতার আড়ালে। কেউ টুকি দেয় ফুলের আড়ালে। কোনওটা কমলা-লাল। কোনওটা হলদে-নীল। কোনওটা সবুজ-সাদার ঝলকা। কে সাজিয়ে রেখেছে সমুদ্রের অতলজলে এমন স্বপ্নের গাছগাছালি? এমন ফুল-পাপড়ির স্বপ্নলোক?

আমি পরে শুনেছি, এই স্বপ্নলোকের নাম প্রবালদ্বীপ।

আমি আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। ভুলে গেলুম খিদে-তেষ্টার কথা। ভুলে গেলুম আমার কষ্ট। আমিও ওই মাছেদের মতো ফুলের রাজ্যে হারিয়ে গেলুম। আমিও মাছের মতো ফুল-পাতার আড়ালে-আড়ালে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিলুম। আমি হাত বাড়াই ধরতে। মাছেরা পালায়। আমি লুকিয়ে পড়ি। মাছেরা আমায় খোঁজে। আমি কি পারি মাছেদের চোখকে ফাঁকি দিতে? তারা ঠিক দেখতে পায়। কোনখান দিয়ে, কোন ফাঁকে যে আমায় এসে ছুঁয়ে ধরে, আমি বুঝতেই পারি না। তারা একসঙ্গে ঝাঁক বাঁধে। একসঙ্গে আমার গায়ে মুখ ঠেকায় তারা। যেন খুশিতে আদর করে। আমি হেসে ফেলি। মাছেরা হাসে কি না জানি না। কিন্তু তারা যে আনন্দে উচ্ছল হয়ে জলের ভেতরে নাচন-কোদন করে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

দ্যাখো, দ্যাখো, আরও কতরকমের মাছ সেখানে হাজির হয়েছে ! আমিও খেলতে-খেলতে হারিয়ে গেলুম সমুদ্রের জলের বাগানে। হারিয়ে গেলুম ফুল-পাতা আর রঙিন গাছের আড়ালে। সত্যি বলছি, তখন আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করল না এখান থেকে। মনে হল, এখানেই থাকব চিরদিন। এখানেই মাছেদের সঙ্গে মাছ হয়ে খেলা করব।

আরি ব্যস ! কী সুন্দর একটা গোলাপ-রঙা ফুলের পাপড়ি !

না, না, ওটা ফুলের পাপড়ি নয়। ওটাও একটা মাছ। অনেকটা তারাফুলের মতো দেখতে। কেমন চুপটি করে ফুলের সঙ্গে ফুল হয়ে লুকিয়ে আছে ! ভাবছে আমি বুঝি দেখতেই পাইনি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। আমি তাকে ধরব বলে যেই না হাত বাড়িয়েছি, এই দ্যাখো, পালাল। পারলুম না। কী করল, অন্য আর-একটা গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইল। আর তাকে খুঁজে পায় কে ! আমি তো কোন ছার ! যারা সমুদ্রের অন্য জীব, তারাই হার মানবে !

আমি অবশ্য তাকে খুঁজতে ছাড়লুম না। কিন্তু হায় রে, খোঁজাই সার ! খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎ আমি চমকে উঠেছি। খুশিতে আমার চোখ ঝলমল করে উঠল। দেখি, অন্য আর একটা মাছ। ঠিক প্রজাপতির মতো দেখতে। গাছের আড়াল থেকে পিটপিট করে আমাকে দেখছে। তারপরেই, কোথাও কিছু নেই, জলের ওপর ভাসতে-ভাসতে নাচতে লাগল। আমি তো অবাক ! আমি আর হাত বাড়ালুম না। ও নাচুক। আমি দেখি !

আরে, ও-দুটো কী ? মাছ, না কাঠবিড়ালি ? মুখখানা দ্যাখো ! কে যেন কাঠবিড়ালির মুখ এনে বসিয়ে দিয়েছে। রঙের বাহার দেখেছ ! লাল-মাটির আভা ছড়িয়ে আছে সারা পিঠে। বুকে আর পেটে বাদামি রং। আর ল্যাজের খানিকটা গাঢ় হলদে, আর খানিকটা হালকা হলদে। দ্যাখো, প্রজাপতি মাছের সঙ্গে কাঠবিড়ালি-মাছদুটোও কেমন নাচছে ! অবশ্য প্রজাপতির মতো কি আর পারছে ! প্রজাপতি-মাছটাকে যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনই তার নাচ। প্রজাপতি-মাছের পাখনাটা দ্যাখো, একদম হলদে। গায়ের ওপর কোথাও হলদে আভা, কোথাও লালচে। আর পিঠ থেকে পেট পর্যন্ত ডোরা-ডোরা-দাগ নাচছে যখন, রং যেন ঠিকরে পড়ছে !

কোথাও কিছু নেই, উফ, আমার পিঠে কে যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিল ! কী রে বাবা, জলের ভেতর আগুন ! আমি শাঁ করে পিছু ফিরেছি। দেখি, একটা সাপ। না, না, ঠিক সাপ না। সাপের মতো দেখতে। এও একটা মাছ। কী হিংস্র ! আমি কিছু বোঝার আগেই, সে আবার আমার গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দিল। সে বোধ হয় আমাকে পছন্দ করছে না। তাই বারেবারে আমাকে আক্রমণ করছে। ওই দ্যাখো, সেই কাঠবিড়ালিও পালাল, প্রজাপতিও নাচ থামাল। লুকিয়ে পড়ল। আমি তো আর কোথাও লুকোতে পারব না। ওরা ফুল-পাতার রঙের সঙ্গে নিজের রং মিশিয়ে এমন চুপটি করে বসে থাকবে, কেউ টেরই পাবে না ! আমার আর লুকোবার জায়গা কই ! তা ছাড়া আমার গায়ের রং তো আর মাছের মতো বাহারি নয়। অগত্যা সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি জলের ভেতর দাপাদাপি শুরু করে দিলুম। সাপ কিন্তু ছাড়ে না আমায়। আমি জলে টুঁ মারতে-মারতে একবার এদিকে যাই, নয়তো ওদিকে পালাই। সাপও ছেঁকা দেওয়ার জন্য আমাকে তাড়া করে একবার এদিকে আসে, নয়তো ওদিকে যায়। এ কী হল ? এ আবার কার খপ্পরে পড়লুম ? এই সাপ-মাছটা যে খুব বড়, তা নয়। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে ধরতে পারি। কিন্তু ধরলে যদি ভীষণ ছেঁকা লেগে যায় ! দ্যাখো, আমাকে সে পরোয়াই করছে না ! থোড়াই ভয় পাচ্ছে আমায় ! দরকার নেই আর। এই পাজিটার হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে, পালাতেই হবে। কাজেই আমি দু'হাত দিয়ে জল কাটিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলুম।

অত সহজ ! জলের ভেতর পালাবার পথ কোথায় ! আমি এই কিলবিলে সাপ-মাছটার কাছে একেবারে হেরে বসে আছি। আমি হাত-পা ছুড়ে পালিয়ে যাওয়ার যতই চেষ্টা করি, সাপটা ঠিক ততই আমার সামনে চলে আসে। অগত্যা জলের ভেতর লম্ফঝম্প শুরু করে দিলুম। সে যেন জলের ভেতর জল নিয়ে হুল্লোড়। না, সে আর আমার কাছে আসতে পারে না। অবিশ্যি স্বপ্নের রঙে ঘেরা এই প্রবাল-বাগানের কোনও ক্ষতি হল কি না, জানি না। হলেও, দু-চারটে ফুলের পাপড়ি হয়তো খসে পড়তে পারে। কিংবা দু-একটা গাছের ডালপাতাও ভাঙতে পারে। তাতে রং-বাহারের এই যে প্রবাল তার কী আর এমন ক্ষতি বলো !

আমি এমন লম্ফঝম্প করতে-করতে এ কোথায় চলে এসেছি ! আর পারি না। একটু থামতে হবে। একটু দম না-নিলেই নয় ! দম ফুরিয়ে গেছে। হাত-পাগুলো এমন অবশ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে সেগুলো আর শরীরে নেই। না, সেই ছেঁকা-দেওয়া সাপ-মাছটাকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি না ! তা হলে বোধ হয় জলের ঝাপটায় কাবু হয়ে সে পালিয়েছে। তবু বিশ্বাস নেই। এই ফুলের আড়ালে খানিকটা লুকিয়ে থাকাই ভাল।

ওমা ! আমি যেটাকে ফুল বলে মনে করেছি, সেটাও যে সমুদ্রের একটা জীব ; আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি ! সে চোখের পলকে আমাকে জাপটে ধরল। দ্যাখো, তার কত হাত-পা। শ্যাওলার মতো পিচ্ছিল তার দেহটা। চামড়া এমন ফিনফিনে, এদিকে চোখ রেখে দেখলে, চামড়ার ভেতর দিয়ে ওদিকটা স্পষ্ট দেখা যাবে। তার হাত-পা যেন গায়ের সঙ্গে কে সেলাই করে বুনে রেখেছে। দেহটা যে তার খুব বড়, তেমন নয়। কিন্তু হাত-পাগুলো অ্যায়সা লম্বা। আমার মতো আরও দু'জনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরতে পারে। এই হাত-পায়ের মাঝখানে তার মুখ। সেই মুখে যেন পাখির ঠোঁট বসানো। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে সাঁতার কাটতে শুরু করে দিল। আমি যতই হাত-পা ছুড়ে লাফালাফি করছি, ততই তার জাপটানি শক্ত হচ্ছে। আমি কাবু হয়ে কেমন যেন নিঝ্‌ঝুম হয়ে যাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, সে এই প্রবালের বাগান ছেড়ে আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলেছে। আমি আর থাকতে পারলুম না। তার নরম গায়ে আচ্ছাসে দিলুম এক খিমচি। অমনই সে ঠোঁটের বাড়ি দিল এক ঠোক্কর। আমার মাথায়। মাথা ঝনঝন করে উঠল। সে আমাকে আরও জোরে পেঁচিয়ে ধরল। আমি আর দম ফেলতে পারি না। তবে কি জন্তুটার হাতে এবার আমায় মরতে হবে ! হয়তো। কারণ, যেভাবে আমাকে পেঁচিয়ে ধরেছে, তাতে মরণ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

সে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে এল সেই প্রবাল-বাগান থেকে সমুদ্রের অথই জলে। তার হাত-পায়ের প্যাঁচে আমাকে আচ্ছা করে জড়িয়ে নিয়ে সে খেলা শুরু করে দিল। কখনও সে আমাকে জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়, কখনও জলের ওপরে। কখনও ডিগবাজি মারে, কখনও গোত্তা খায়। আর আমি ঢকঢক করে সমুদ্রের নোনাজল গিলি আর উগরে দিই। সে যে কী কষ্ট, কী বলব ! আমার মনে হচ্ছে, এই নোনাজল গিলতে-গিলতেই আমার দম ফুরিয়ে যাবে। এবার আর আমার মরণ কেউ ঠেকাতে পারছে না। হায় রে, মরলে কি মাছেরাই আমার দেহটা ঠুকরে-ঠুকরে খাবে ! তার উত্তর কে দেবে !

খুব রক্ষে। আমি মরতে-মরতেও বেঁচে গেছি। হাত-পাওলা জন্তুটা অনেকক্ষণ ধরে, আমার সঙ্গে বেশ খানিকটা ধস্তাধস্তি করল। জলের অনেকটা দূরে সাঁতরে এল। তারপরেই হল এক কাণ্ড ! ওই দ্যাখো তেড়ে আসছে তার দিকে তারই এক শত্রু। তখন আমি জানতুম না, এই শত্রুটির নাম কুকুর-মাছ। পরে শুনেছি। যেমন শুনেছি এখন আমি যার প্যাঁচে বন্দি, তার নাম

অষ্টভুজ শম্বুক।

আমাকে আর বেশিক্ষণ সেই অষ্টভুজের হাতে বন্দি থাকতে হল না। অষ্টভুজ তার শত্রু কুকুর-মাছটাকে আচমকা দেখতেই তার পিলে গেছে চমকে। তার প্যাঁচ আলগা হয়ে গেল। আমায় মারবে কী! নিজে বাঁচে কি না তাই দ্যাখো! অষ্টভুজের প্যাঁচ যেই না আলগা হয়েছে আমার দেহটাও অমনই আপনা-আপনি সেই প্যাঁচের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমার যেন শরীরে আর সাড় নেই। আমি বেশ খানিকক্ষণ মড়ার মতো জলে ভাসতে লাগলুম। এতক্ষণ যে মরণ-যন্ত্রণায় আমি ভুগছিলুম তার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি। আঃ! দম ফেলে বাঁচলুম!

বাঁচলুম কী! দ্যাখো, কী সাঙ্ঘাতিক দেখতে কুকুর-মাছটাকে। লম্বায় মাছটা আমার মতো। হাঁ-মুখটা তার নীচের দিকে। গায়ের রংটা খয়েরি। তার ওপর কালো চাকা-চাকা দাগ। চোখ দেখলে কে বুঝবে, কখন সেই চোখে রাগ আর কখনই বা আনন্দ। কুকুর-মাছটা তাড়া করল সেই অষ্টভুজটাকে। কুকুর-মাছের যে একটি রসালো খাবার এই অষ্টভুজ, আমার সে তো জানার কথা নয়। শুধু দেখছি শাঁ-শাঁ করে জলে সাঁতার দিয়ে কুকুর-মাছটা এগিয়ে চলেছে অষ্টভুজের দিকে। অষ্টভুজের এবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। দ্যাখো, অষ্টভুজটা কেমন করে পালাচ্ছে! মুখখানা তার কুকুর-মাছের দিকে। সামনে মুখ রেখে পেছনে জল টেনে-টেনে ছুটছে যেন! এমনই করে জলে সাঁতার কাটে নাকি ওরা! এতক্ষণ দেখিনি তো!

অবশ্য, আমায় আর বেশিক্ষণ দেখতে হল না। চোখের পলকেই কুকুর-মাছটা ধরে ফেলল অষ্টভুজটাকে। কুকুর-মাছটা বুঝি জিতে গেল।

না মশাই না। জিতব বললেই আর জেতা যায় না। শত্রুর সঙ্গে লড়াই না করে কে হাল ছাড়ে! অষ্টভুজটাও কুকুর-মাছটাকে জড়িয়ে ধরার জন্য তৈরি। কুকুর-মাছটা যেই না তাকে আক্রমণ করেছে, অমনই লেগে গেল ঝটাপটি। আমি একপাশে ভাসতে ভাসতে লড়াই দেখতে লাগলুম। কে জিতবে, এখনও জানি না। জানি না বলেই আমার মনে হল, এখানে ভাসতে-ভাসতে আর লড়াই না-দেখাই ভাল। কারণ যেই জিতুক সে আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। একটু আগে অষ্টভুজের চাপে তো মরতে বসেছিলুম। এবার যদি কুকুর-মাছটা আমাকে তাক কষে, তবে রেহাই নেই। আমি এই কথা ভেবে আড়ষ্ট হাতদুটো নাড়াবার চেষ্টা করলুম। পারলুম। পা দুটোও ছুড়তে পারলুম। সেইভাবেই ধীরে-ধীরে হাত-পা ছুড়ে পালাবার মতলব আঁটলুম। ওদের তখন জোর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কে জিতবে, দরকার নেই দেখার। আমি ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মানে-মানে সরে পড়লুম। এমনই লড়াই লেগেছে, আমি আছি না গেছি সেদিকে কে নজর দেবে!

তোমাদের কী বলব, কতরকমের যে মাছ আর কতরকমের যে প্রাণী জলের মধ্যে দেখতে পেলুম! কোনওটাকে দেখতে যেমন বিচ্ছিরি, তেমনই কোনও-কোনওটা কী সুন্দর। কোনওটা মারমুখো, আবার কোনওটা শান্ত। একঝাঁক গোরুমুখো-মাছ দ্যাখো! কেমন এদিক থেকে ওদিকে সাঁতরে যাচ্ছে! দেখলে ভয় লাগে! অবশ্য না, কারও দিকে তেড়ে যায় না। ঠান্ডা মেজাজে সাঁতার কাটছে। ওই দ্যাখো শজারু-মাছ! এদিকেও আসছে! তুমি প্রথমটা দেখলে ভাববে, শজারু-মাছের দেখার মতো আর কী আছে! কিন্তু আমাকে যখন সে হঠাৎ দেখল, দেখে রেগে-মেগে ফুলে উঠল, উরি বাবা, দেখি তার গা-ভর্তি কাঁটা। একবার ফুটিয়ে দিলেই হয়! রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। অবিশ্যি আমায় দেখল বটে, কিন্তু আমার দিকে এল না। কিন্তু আমি এই দূর থেকেই দেখতে পেলুম, মাছটা যখন ফুলে উঠল, তখন তার গা-ভর্তি কাঁটার সঙ্গে কতরকমের রং ঠিকরে বেরিয়ে এল। বা রে! বেশ মজা তো!

হঠাৎ দেখা গেল আর-এক মজা। তবে এ-মজাটা চোখে দেখার আগে আমার কানই শুনতে পেল। আমার কানে এল, এই জলের মধ্যে কে যেন শিস দিয়ে গানের সুর ভাঁজছে। আমি হকচকিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি একঝাঁক মাছ শিস দিতে-দিতে এদিকেই ভেসে আসছে। মাছগুলো যে আমার চেয়ে অনেক বড় সেটা দেখেই বুঝেছি। কতরকমের শব্দ যে তাদের মুখে! গান গাইছে, না শিস দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে? না কি, আমাকে ভয় দেখাচ্ছে? কে জানে! এখন ভয় দেখালেই বা আমার কী করার আছে! এমন ঝাঁক বেঁধে ধেয়ে আসছে! এই বুঝি পড়ল আমার ঘাড়ে! আর যদি সত্যিই পড়ে, আমার কী করার আছে! তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমি জলে ভাসতে লাগলুম।

দ্যাখো, দ্যাখো মাছগুলো কেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে ঘিরে ধরছে। সে-ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে পালাবার পথ নেই। আমার মনে হল, এবার ওরা একসঙ্গে আমার ওপর চড়াও হবে। আমার আবার ঘনিয়ে এল বিপদ! এই ফাঁকে দেখতে পেলুম, মাছের পিঠগুলো কালো। পেটের দিক সাদা। মাথাটা টিপিমতো। নাকটা ইয়া লম্বা। আর, বড় বলে বড়! আমার মতো তিনজনকে একসঙ্গে জুড়লে যতটা বড় দেখায়, ঠিক ততটা।

কী আশ্চর্য, মাছগুলো আমায় কিচ্ছু করল না! উলটে শিস দিচ্ছে আর ঢেউ তুলছে। ঢেউ তুলছে, না, নাচছে? আমাকে দেখে তবে কি মাছগুলোর আনন্দ হয়েছে? তাই হবে! দ্যাখো, নাচের বহর দ্যাখো! কী অদ্ভুত দেখতে লাগছে! এ-দৃশ্য যে না-দেখেছে, তাকে কি বোঝানো যায়? একটা মাছ দ্যাখো একেবারে আমার হাতের নাগালে! আমি ধরব নাকি? আমায় ধরতে হল না। সে-ই আমার হাতে মুখ দিল। আমায় টানল তার ঠোঁট দিয়ে। কেন টানছে? আমাকেও কি নাচতে বলছে?

তাকে বলতে হল না। আমি নিজেই নেচে ফেললুম। তবে আমার নাচটাকে সত্যি যেন নাচ ভেবে বোসো না! বরং বলতে পারো জলের ভেতর কুস্তি। জলের মধ্যে আমার সেই ছেলেমানুষি কোস্তাকুস্তি দেখে, মাছেদের আনন্দ দ্যাখে কে! তারা জোরে-জোরে শিস দিতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ কোথাও কিছু নেই এই নাচুনে-মাছগুলো থমকে গেল। তাদের মুখে আর শিস নেই। পাখনায় তাদের দোলা নেই। কিন্তু দেখে তারা কি ভয় পেয়েছে! সঙ্গে-সঙ্গে তারা দলবেঁধে দিল সাঁতার-দৌড়। জলের ভেতর উথাল-পাথাল। দৌড়ের সে কী দৃশ্য! আমি তো দেখেশুনে একদম হাঁদা। আচমকা কী এমন হল! কেন পালাল মাছের দল!

পালাবে না? ওই দ্যাখো, ওটা কী আসছে? একটা যেন নীল রঙের পাথর! ভেসে আসছে জলের ওপর দিয়ে। শব্দ উঠছে শোঁ-শোঁ। তার ধাক্কায় জল উছলে উঠছে। আমি টাল খাচ্ছি। ধাক্কায় ভেসে যাচ্ছি।

আরও কাছে আসতে আমার দফারফা। না, না, এটা তো পাথর নয়! একটা বিকট জন্তু। যেন দৈত্য। সিধে আমার দিকে তেড়ে আসছে। আর জলের তোড়ে আমি নাকানিচোবানি খেয়ে তলিয়ে যাচ্ছি। আমার আর কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই। জলের ভেতর যেন প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। জন্তুটা কোথা থেকে যে কী করল, আমি কিছুই ঠাহর করতে পারলুম না। জন্তুটা হুড়মুড় করে আমার পেটের নীচে মুখটা ঢুকিয়ে মারল এক ঘাই। আমি ওপর দিকে হাত-পা ছুড়ে যেন উড়ে গেলুম। কতটা ওপরে, বুঝতে পারলুম না। তারপর জলে দোল খেতে-খেতে সটান বসে পড়লুম তার পিঠের ওপর। পড়েই হাঁপাতে লাগলুম। কিন্তু
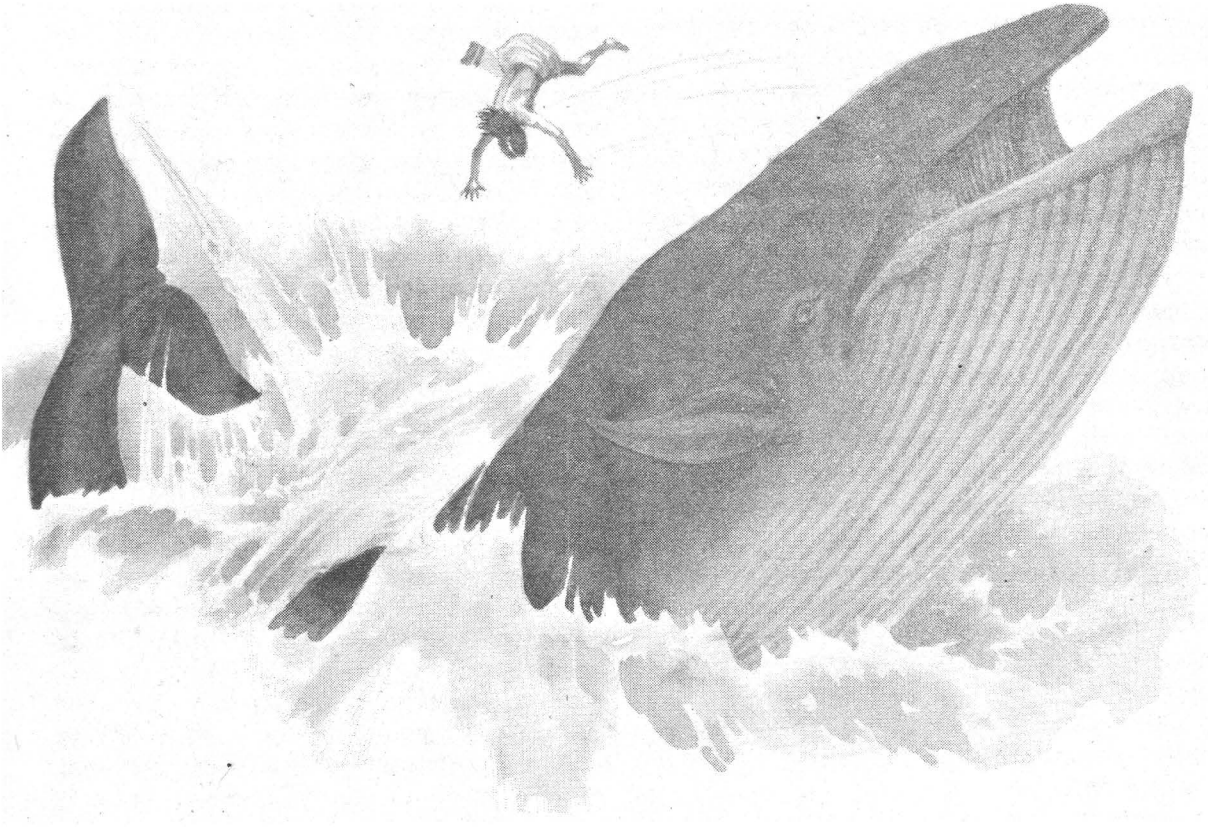
শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, ওই বিরাট জন্তুটা আমাকে আর কিছু করল না। নাই করুক, আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তার পিঠে বসে থাকি। দ্যাখো, পিঠটা কত উঁচু! নীচের দিকে তাকিয়ে আমি থ' হয়ে গেলুম। এখান থেকে ইচ্ছে করলেই নামতে হচ্ছে না। যদিও জলের মধ্যে আছি, যদিও জলের মধ্যে ভেসে আমি পালাতে পারি, তবুও পালাবার উপায় নেই। তার পিঠটা যেমন উঁচু, তেমনই লম্বা আর চওড়া। তুমি পালাবে কোনদিক দিয়ে! যেদিকেই চোখ ফেরাই, সেইদিকে দেখি তার চওড়া পিঠটা ভাসছে। পেছনে যাই, দেখি, একটা যেন টানা মাঠ। দৌড় লাগাতে খুব মজা। পাশে যাই, চোখে পড়ে না তার পাখনা। জলের ভেতর স্রোত কাটিয়ে সে চলেছে। জন্তুটা যে কত বড়, কে আন্দাজ করবে! আমি যে তার পিঠের ওপর ঘুরছি-ফিরছি, বসছি-উঠছি তার কোনও গ্রাহ্যই নেই! কেমন চুপচাপ জলে সাঁতার কেটে ভেসে যাচ্ছে! এতক্ষণ আমি জলের ভেতরে হাত-পা ছুড়ে ভেসেছি। সাঁতার কেটেছি। এখন মজাসে আমি তার পিঠে দাঁড়িয়ে। চলেছি এদিক থেকে আর-একদিকে। কিন্তু কোথায় চলেছি! এই ধুমসো জন্তুটা আমায় পিঠে নিয়ে কোথায় চলল! সে আর আমি জানব কেমন করে!

আমি পরে শুনেছি, এই ধুমসো জন্তুটির নাম তিমি মাছ। আসলে মাছ বললেও তিমি কিন্তু মাছ নয়। বলে, অনেক, অ-নে-ক দিন আগে এখনকার এই তিমি নামের মাছটা, জলে থাকত না। তখন তিমিকে মাছ বলত না, বলত, জন্তু। তখন তাদের পায়ে খুর ছিল। জন্তুটা মাটিতে ছোটাছুটি করত। তারা মাছের মতো কখনওই ডিম পাড়েনি। এখনও ডিম পাড়ে না। মা-তিমি ডিমের বদলে বাচ্চার জন্ম দেয়। মায়ের দুধ খায় বাচ্চারা। দুধ খেয়ে বড় হয়। বড় হয় মানে কি তোমার-আমার মতো! এত বড় হয়, না-দেখলে ধারণাই করতে পারবে না। অবশ্য এখন আমি দেখছি, আর তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি।

থাক সে-কথা। এখন যে-কথাটা বারবার মনে হচ্ছে তা হল, এর পর আমার কপালে কী আছে! ভয়ে বুক দুরু-দুরু করলেও, তিমির পিঠে চেপে আমার যে আরাম লাগছে না, তা যেন মনে কোরো না। যেমন মজা লাগছে, তেমনই আরাম। উফ! এতক্ষণ জলে পড়ে-পড়ে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। কতক্ষণ পরে একটু আয়েস করতে পারছি। সে ঠিক আছে। কিন্তু এর পর তিমিটা যদি আমায় চিবিয়ে খায়! যদি খায়, খাবে। কী আর করা যাবে বলো!

তখন তিমির মুখটা আমার ভাল করে দেখা হয়নি। এখন অবশ্য তিমির পিঠের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে মুখখানা দেখা যেতে পারে। কিন্তু সাহস হচ্ছে কই! তবে, যাই বলো আর তাই বলো, তিমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমায় একটুও ভয় দেখায়নি। আমায় কেমন পিঠে নিয়ে সাঁতার কাটছে। তবে কি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় তিমিটা! হবে হয়তো। দেখি না! বলে, বুকে বল আনলুম। তিমির মুখখানা দেখার জন্য আমি তার পিঠের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে, মুখ দেখতে চললুম। সত্যি, তিমিটা লম্বা বলে লম্বা। হামাগুড়ি দিচ্ছি তো দিচ্ছি। কোথায় শেষ রে বাবা!

শেষমেশ পৌঁছে গেলুম তিমির মাথার কাছে। উরি বাবা, মাথার ওপর কত বড় একটা গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ছে। আর-একটু কাছে গেলেই হয়েছিল আর কী! নির্ঘাত নিশ্বাসের ধাক্কায় বেহুঁশ হয়ে যেতুম। দ্যাখো, তিমিটার মাথায় কত চুল! লম্বা-লম্বা চুলগুলো মুখের ওপর এমন ঝুলে আছে, দেখলেই তুমি ভাববে গোঁফ! হাঁ-মুখটা কই! যাচ্চলে, চোখ দুটোই বা কোথায়! আমি হাত বোলাতে লাগলুম এদিক-ওদিক। মিথ্যে হাত বোলানো। তার হাঁ-মুখও দেখতে পেলুম না, চোখও দেখা গেল না। হঠাৎ তিমিটা এমন জোরে

নিশ্বাস ফেলতে লাগল, সেখানে দাঁড়ায় কার সাধ্য ! হাঁ-মুখ দেখে আর কাজ নেই। শেষে কি ওই নাকের গর্তে বে-টাল হয়ে গোত্তা খাব ! নাক দিয়ে একবার পেটের মধ্যে পিছলে গেলেই, ব্যস। দরকার নেই বাবা ! তারচে' বরং পিঠের মাঝখানে গিয়ে বসি। সেখানে অন্তত নাকের গর্ত দিয়ে সেঁধিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। সেই ভাল।

হ্যাঁ, আমি আবার ফিরে এলুম। তবে এটা পিঠের মাঝখান, না অন্য কোথাও, তা বলতে পারব না। আমি জানি না এর পর আরও কত দুর্ভোগ আছে আমার ভাগ্যে। একটার পর একটা, কত ঘটনাই যে ঘটছে, সে তো তোমরা দেখছই। এখন বলো তো, এই জলের ভেতর থেকে আমি ডাঙায় উঠি কেমন করে ! শেষকালে কি আমিও জলের প্রাণীর মতো জলেই বাস করব ! বাস করব এই তিমির মতো ! না-কি ওই রং-ঝলমল মাছেদের মতো ! না, না, আমি তিমিও হব না, রঙিন মাছও না। আমায় যদি সত্যিই থাকতেই হয় জলের ভেতর, তবে আমার ইচ্ছে, আমি ওই প্রবালবাগের ফুল হয়ে থাকব। বলো, কতরকমের ফুল ! কত রং ! একটি রঙিন ফুল হয়ে যদি জলের ভেতর দোল খাই, তাহলে কী মজা ! তার ওপর ওই রং-টুকটুক মাছের দল যদি লুকোচুরি খেলে আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে, তা হলে মজার ওপর মজা।

না, আমি আর চুপচাপ বসে থাকতে পারছি না। আমার ঘুম পাচ্ছে। অবশ্য জলের ভেতর হলেও আমি সটান শুয়ে পড়তে পারি তিমির পিঠের ওপর। আমি শুয়েই পড়লুম। তারপর জলের দোলায় দুলতে-দুলতে আমি তিমির পিঠে ঘুমিয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম আমার জানার কথা নয়। জলের ভেতরে তো আর আকাশ নেই। সূর্যও ওঠে না। চাঁদও জ্যোৎস্না দেয় না। কাজেই বলা যায় না, কখন সকাল, কখন সন্ধে। তাই আমিও বুঝতে পারলুম না, তখন সকাল, না সন্ধে। আমার ঘুম ভেঙেছিল আচমকা। আচমকাই আমার মনে হল, কে যেন আমায় চ্যাংদোলা করে তিমির পিঠ থেকে তুলে নিল। ছুড়ে দিল অনেক দূরে। আমি ভয়েময়ে চিৎকার করে উঠলুম। তারপরেই দেখলুম, আমি একলাই ছিটকে পড়িনি। পড়েছে আর একটা জন্তু। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। এমনকী, কয়েক মুহূর্ত আমি দমও ফেলতে পারলুম না। কী হল ব্যাপারটা !

ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক। আমার সঙ্গে আর-একটা যে-জন্তু ছিটকে পড়েছে, সে একটা মানুষখেকো হাঙর। পিঠটা বাদামি। বুকটা সাদা। দাঁতের পাটি দেখলে, তার সামনে দাঁড়ায় দেখি, কে ! কার এমন বুকের পাটা আছে ! হাঙরটা যে আমায় খাবে বলে আক্রমণ করেছিল, সেটা তখনই আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু ছিটকে পড়েও যখন হাঙরটা আমার দিকে ধেয়ে এল তখনই মালুম হল, সে আমায় খাবে। সে আসছিল তার ভয়াল দাঁতগুলো ছরকুটে। তেড়ে, আমার দিকে। এই বুঝি আমাকে কামড়ে ধরে ! চোখের পলকে কী যে হল, তিমিটা তীরের মতো ঝাঁকুনি দিয়ে মারল ল্যাজের বাড়ি হাঙরের মাথায় এক ঝাপটা। হাঙরটা লাট খেতে-খেতে ছিটকে পড়ল সাত হাত দূরে। পড়েই নিজেকে সামলে নিল চোখের পলকে। আবার তেড়ে এল দ্বিগুণ জোরে। আর রক্ষে নেই আমার ! এবার ওই দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল বলে !

না তো ! সে এবার আমায় আক্রমণ করল না তো ! হাঙরটা সটান ঝাঁপিয়ে পড়ল তিমিটার ওপর। দাঁত দিয়ে কামড়ে তিমির গা থেকে তুলে নিল অ্যাত্তোখানি মাংস। রক্ত গড়িয়ে পড়ল তিমির গা বেয়ে। ভেসে গেল জল রক্তে-রক্তে। রক্ত দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। হাঙরটার ওপর রাগে আমার গা রিরি করে উঠল। কী, আমার বন্ধুর গায়ে দাঁত বসাস ! হ্যাঁ, তিমি আমার বন্ধুই তো। সে ভালবেসে তার পিঠে আমায় স্থান দিয়েছে। সে যে এই হিংস্র হাঙরটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য লড়াই করছে, সেটা বুঝতে আমার সময় লাগেনি। না, আর আমার ভিতুর মতো সিঁটিয়ে থাকা উচিত নয়। আমি এগিয়ে গেলুম। আমার আর কতটুকু শক্তি ! এই হাঙরটার কাছে আমি তো একটা টিকটিকির চেয়েও তুচ্ছ ! তা হোক। আমি আর এক মুহূর্তও দেরি করলুম না। লাফিয়ে উঠলুম হাঙরের পিঠে পেছন থেকে। হাঙরটা তখন তিমির ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। আমিও কামড়ে ধরলুম হাঙরের পিঠটা। জোরে, আরও জোরে। আমিও কামড়ে খাবলে তুলে নিলুম তার পিঠের একদলা মাংস। এবার সে লেগে গেল আমার সঙ্গে। তিমির ঠোঁট ছেড়ে সে এমন জোরে এক ঘাই মারল, আমি বুঝি এই ছিটকে পড়ি তার পিঠ থেকে ! না, পারল না সে। এবার সে বারবার তিড়িং তিড়িং লাফাতে শুরু করে দিল। আমিও নাছোড়বান্দা। যতই লাফাচ্ছে সে ততই আমি আঁকড়ে ধরে খামচি দিচ্ছি ! মারছি ধাঁই-ধপাধপ কিল, চড়, ঘুসি। তার পিঠে। ঘাড়ে। যেখানে পাচ্ছি সেখানেই। না, আমি কিছুতেই ছাড়ব না তার পিঠ। সে লাফিয়ে উঠছে। ঘুরপাক খাচ্ছে। ল্যাজের ঝাপটায় জল ছড়াচ্ছে। ডুব দিচ্ছে। আমিও ততই তাকে কিলোচ্ছি। নয় খামচে দিচ্ছি। কামড়াচ্ছি। কিন্তু একবার যে কী হল, হাঙরটা হঠাৎ এমন একটা পাক মারল, আমি টাল সামলাতে পারলুম না। হড়কে তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লুম। বুঝতে পারলুম, জলের জন্তুর সঙ্গে লড়াই করা ডাঙার মানুষের কাজ নয়। তার ওপর আমার হাতে কোনও অস্ত্রও নেই। তাই, ছিটকে পড়েই আমি বুঝতে পারলুম, আর আমার রক্ষে নেই। ওই দ্যাখো, সে হাঁ করে তেড়ে আসছে ! মুখের ভেতরটা কী ভয়ঙ্কর ! এই বুঝি কামড়ে ধরল আমার ঘাড়টা ! এবার আমি কোনদিকে পালাই ! আঃ !

না, হাঙর পারল না আমায় ধরতে। ওই দ্যাখো, আমার বন্ধু তিমিকে। তার পিঠে রক্ত। ঠোঁটে রক্ত। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাঙরটার ওপর। তার বিরাট দেহটা দিয়ে হাঙরটাকে ঠুসে ধরল জলের মধ্যে। তারপর তার মুখের ওপর এমন একখানি ঝাপটা মারল, হাঙর বুঝি চোখে অন্ধকার দেখে ! আমি বেঁচে গেছি। অবশ্য তখনকার মতো। কিন্তু ওই দ্যাখো, আবার সে আমাকে তেড়ে আসছে। ওই দ্যাখো, তার একটা চোখ তিমির ঝাপটায় ফুটো হয়ে গেছে। রক্ত গড়াচ্ছে। শুনতে পাচ্ছ, হাঙরের নিশ্বাসের শব্দ ? জলে বুদবুদ কাটছে। এবার সে আমাকে নয়, আক্রমণ করতে ছুটল তিমিকে। অত বড় দেহটা তো, তিমি আর চোখের পলকে ঘোরাতে-ফেরাতে পারে না। মুশকিল তো সেখানেই। কাজেই জলের ছোট-ছোট জন্তুগুলো তাকে দুমদাম ধাক্কা মারলেও সে অত গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু এখন তার অন্য মূর্তি। হাঙরটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সে দিল আর এক ঝাপটা। দ্যাখো, দ্যাখো, হাঙরের মুখখানা তুবড়ে গেছে। তবু হাঙর থামে না। সে তোবড়ানো মুখখানা নিয়েই লাফ মারল তিমির ঘাড়ে। আমিই বা হাঙরকে ছাড়ব কেন ! এই তাল। আমিও লাফ দিলুম হাঙরের পিঠে। আবার শুরু করে দিলুম। মার, মার, ঘুসি মার ! দে কামড়ে ! সে কী লড়াই তখন হাঙরের সঙ্গে তিমির, আর একটা মানুষের। অবিশ্যি আমাকে তেমন লম্বা-চওড়া মানুষ যেন ভেবে বোসো না। আমি ছোট্ট মানুষ। তা, এইটুকু ছোট্ট মানুষই তখন যা লড়াই করল একটা হিংস্র মানুষ-খেকো হাঙরের সঙ্গে, দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যেতে। নিশ্চয়ই বলতে, বাহাদুর ছেলে বটে !

কতক্ষণ আমাদের সেই লড়াই চলেছিল বলতে পারব না। জলের মধ্যে সে এক তুমুল লড়াই। হাঙরও ছাড়ে না, আমরাও ছাড়ি না। হাঙরের তেজ কী ! মরতে-মরতেও মরে না। কিন্তু

না-মরলে কী হবে, আমার আর তিমির গুঁতোর ঠেলায় আধমরা হয়ে পালাবার পথ পায় না সে। কোথায় পালাল, কে জানে! তবে, যেখানেই সে পালাক বাঁচতে আর তাকে হচ্ছে না। আজ হোক, কাল হোক সে মরবেই। কানা চোখ আর তোবড়ানো মুখ নিয়ে কি বাঁচা যায় বেশিদিন? হাঙরটাও তো কম বড় নয়। তিমির মতো অত বড় না হলেও যেন ভেবো না আমার মতো পুঁচকে। ঘাড়ে-গর্দানে হাঙরও কম যায় না! একটি জলের রাক্ষস যেন!

উফ! হাঁপিয়ে গেছি ভয়ানক। তিমিও হাঁপাচ্ছে। তার নিশ্বাস ফেলার গর্তটা দম নিচ্ছে হাঁসফাস করে। আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে তার মুখের কাছে এগিয়ে গেলুম। তার ঠোঁটের যেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে সেখানে হাত বুলিয়ে দিলুম। সে ঝপ করে মুখখানা জলের ভেতর নামিয়ে আমাকে তার মস্ত ঠোঁটের ওপর তুলে নিল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। ভাবলুম, এই বুঝি তিমি আমাকে খেয়ে ফেলে! না, মিথ্যে আমি ভয় পেয়েছি। সে আমায় আদর করল। আমাকে তার ঠোঁটে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল জলে ভেসে-ভেসে। আমি তার মস্ত ঠোঁটটার ওপর বসে-বসে আহত ঠোঁটে হাত বোলাতে লাগলুম।

আর আমি হাঁপাচ্ছি না। তিমিও না। কিন্তু তিমির গা দিয়ে আর ঠোঁট দিয়ে তখনও রক্ত গড়াচ্ছে। অবশ্য একটু-একটু। কমতে-কমতে যখন রক্তঝরা বন্ধ হল, ঠিক তখন থেকেই আমার হাতটাও ব্যথা করতে লাগল। হবেই তো! তখন হাঙরের গায়ে, পিঠে কিল, ঘুসিটা তো কম মারিনি! হাঙরটা কী গুণ্ডা!

এখন কোথায় চলেছি তিমির ঠোঁটে বসে! কোথায় যে তিমির ল্যাজ, এখানে বসে আন্দাজও করা যায় না। সত্যি, কত বড়! এত বড় দেহ নিয়ে ঘোরাফেরা করা কি সহজ কথা! শত্রু চুপিচুপি এসে যদি তোমাকে কামড়ে ধরে, তুমি জানতেও পারবে না, কোনদিক থেকে সে এল। তার ওপর তিমিটা কী শান্ত। বোধ হয় সব তিমিই এমন। এত শান্ত হওয়াও ভাল নয়। শত্রু তোমায় আক্রমণ করলে তুমি তাই বলে কিছু বলবে না! চুপ করে থাকবে? কক্ষনো না।

হাঙরের সঙ্গে লড়াই করে এখন আমি মালুম পাচ্ছি। ঝিমঝিম করছে সারা শরীর। আমার মতো একটা পুঁচকে ছেলের এই হাঙরের সঙ্গে লড়াই করার গল্পটা যে শুনবে, সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। তা, বিশ্বাস না করলে আমি আর কী করতে পারি! কিন্তু তোমরা তো দেখলে আমি পারি কি না। এখন তো দেখছ, আমি দিব্যি তিমির ঠোঁটের ওপর বসে-বসে কেমন ভেসে যাচ্ছি! তোমরাই বলো, এটাও কি মিথ্যে? এর পরে আবার যে কী হয়, কে জানে! যাই হোক, এখন যার ঠোঁটে বসে আমি চলেছি, সে আমার বন্ধু। আমার এই বন্ধুটি যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী, এটা তো আর কেউ অস্বীকার করতে পারছে না।

আমি চলেছি। আরও কতক্ষণ চলব, সে তিমিই জানে। কোথায় নিয়ে চলল তিমি আমাকে? এখনও রক্ত পড়ছে তার ক্ষত দিয়ে। তবে তেমন না। কিন্তু দেখলে মনে হবেই, এখনও তিমির যন্ত্রণা কমেনি। কমবে কেমন করে? হাঙরটা কামড়ে খাবলে নিয়েছে কতটা মাংস, বলো! অতটা মাংস আমার সারা শরীরে আছে কি না, সন্দেহ।

কতক্ষণ আর বসা যায়। পিঠে ব্যথা ধরে গেল। না, একটু না-শুলেই নয়। কিন্তু শুলে যদি আবার ঘুম পায়! আবার যদি আর একটা হাঙর আমায় শিকার ভেবে আক্রমণ করে! খেপেছ, আর ঘুমোতে আছে! তবে একটু শুয়ে নিতেই হয়। পিঠটা বড্ড টনটন করছে। আমি শুয়েই পড়লুম। একেবারে টানটান চিত হয়ে। তিমির পিঠের ওপর। আঃ, আরাম বটে! হায় রে, এই সময়ে আকাশটা যদি দেখতে পেতুম। কেমন করে দেখব! জল, জল, চারদিকে জল। জলের সমুদ্র। সমুদ্রের জল তোলপাড় করে তিমি চলেছে। আর সেই তিমির পিঠে শুয়ে-শুয়ে আমি চলেছি। কোথায়? কে বলবে? কেউ জানলে তবে তো বলবে। সুতরাং আমি ডুবে-ডুবে ভাসছি। মনে-মনে ভাবছি, মায়ের কথা। বাবার কথা। মা পাথর হয়ে গেছে অনিষ্টের দেবতার জাদুর জোরে। আর বাবা যে আমার চোখের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেল! আর খুঁজে পেলুম না কোনওদিন। আমার চোখের পাতা বুজে এল। চোখের পাতা বুজে-বুজে আমি মাকে দেখি। মায়ের মুখখানা যেমন দেখতে পাই, তেমনই বাবারও। বাবার যুদ্ধে যাওয়ার সেই মূর্তিটা মনে পড়লে, আমার ভীষণ ভয় লাগে। চোখ দুটো লাল টকটক করছে। দাঁতে দাঁত চেপে বাবা এগিয়ে চলেছে। হাতে তীর-ধনুক। অনেক লোক বাবার দলে। আমার মা আমার হাত ধরে দেখছে সেই দৃশ্য। যতক্ষণ দেখা যায়।

আচ্ছা, তিমির কি ঘুম পায় না?

কেন পাবে না! তিমি যেমন ঘুমোয়, তেমনই অসংখ্য মাছও ঘুমোয়।

কোথায় ঘুমোয়?

জলে। কেউ-বা জলের এধারে-ওধারে পাথরের খাঁজে। এখন যেমন আমার ঘুম পাচ্ছে তিমির পিঠে দুলতে-দুলতে। তেমনই জলের দোলনায় মাছেরও ঘুম পায়।

বলো, কতক্ষণ হয়ে গেল! এখনও তিমির থামবার নাম নেই। আমার ঘুমের তবে দোষটা কী! তাই তো, যদি সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়ি, তখন কী হবে?

আমি সত্যিই আর পারি না, নিজের চোখ দুটোকে জাগিয়ে রাখতে। আমি সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর আমার সব কেমন অন্ধকার হয়ে গেল। কিছুই দেখতে পেলুম না আর।

॥ ৬ ॥

তারপর যখন ঘুম ভাঙল, নিজের চোখকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। এ আমি কোথায় এসেছি! এ কী দেখছি আমি! কোথায় সেই জল! কোথায় সেই তিমি! আমার মাথার ওপর খোলা আকাশ। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আমি পড়ে আছি এই আলোছড়ানো মাটির ওপর। এইমাত্র ধড়ফড় করে উঠে বসলুম। আমার সামনে অগুনতি গাছ-গাছালি। মস্ত উঁচু পাহাড়। আমার চেনা। কে নিয়ে এল আমাকে এখানে? কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল আমার। এবার? কোথায় যাব? বেশ তো ছিলুম জলের গভীরে। আমার বন্ধু পেয়েছিলুম এক মস্ত বড় তিমি। এই বন্ধু না থাকলে, হাঙরের পেটে যেতে হত আমায়। জলে হিংস্র হাঙর। আর মাটিতে যে হাঙরের চেয়েও নৃশংস এই দেবতারা। দেবতাদের খিদে পেলে তারা আমাদের রক্ত চান। চান আমাদের হৃৎপিণ্ড। আমার সেই হৃৎপিণ্ড নিয়ে কী কাণ্ডটাই না হল! স্রোতের দেবী আমায় রক্ষা করলেন। কিন্তু এখন কোথায় এলুম! কোন অজানা দেশে!

আরে! দ্যাখো, দ্যাখো, আমার সামনে কত খাবার! গাছের ছেঁড়া পাতার ওপর কে সাজিয়ে রেখেছে। এখানে তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি এ অন্য কারও খাবার? নিশ্চয়ই এদিকে-ওদিকে কেউ আছে।

কী আশ্চর্য কথা শোনো, আমি যতক্ষণ জলের ভেতরে ছিলুম, আমার একটুও খিদে পায়নি। কিন্তু এখন চোখের সামনে খাবার দেখে আমার নোলায় জল আসছে। আমার দারুণ খিদে পেয়ে গেল। সামনে খাবার, অথচ মুখে দেওয়ার জো নেই। কী যে করি! আরও একটা কথা শোনো, আমার গায়ে জড়ানো পোশাকটারও যা হাল হয়েছে! তোমরা দেখলে হেসে কুটোকুটি খাবে। আর আমি লজ্জায় মরব। রক্ষে এই যে, আমাকে দেখার

জন্য তোমরা কখনওই এতদূরে আসতে পারছ না। অবশ্য, তোমরা যদি আমার জন্য একটা পোশাক নিয়ে আসো, তবে, বেঁচে যাই আমি ।

না, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। কেউ এল না। অনেকক্ষণ ধরে খাবারের দিকে ঠায় চেয়ে আছি। আর লোভ সামলাতে পারছি না। চোখের সামনে খাবার। আর পেটে খিদে। অথচ চুপচাপ বসে-বসে দেখছি। হ্যাংলার মতো। এটা কি ভাল দেখায় ! না, মোটেই ভাল দেখায় না। বরং শেষ করে ফেলাই ভাল। সুতরাং দোনোমনো করার কোনও কারণ নেই। গপগপ করে খেয়ে ফেললুম ।

শেষপর্যন্ত কেউ এল না। কেউ এল না বলে কেউ কোনও আপত্তিও করল না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এই খাবার কি তবে আমার জন্যই কেউ নিয়ে এসে, এখানে রেখে দিয়েছিল ? যদি সত্যিই আমার জন্য কেউ নিয়ে এসে থাকে, তবে কে আনল ? কে সে ? আমার চোখের আড়ালে সে লুকিয়ে আছে কেন ?

একটা কথা বলি এই ফাঁকে। আমার পেট ভরে গেছে। বাহ্ ! খাবারের কী সোয়াদ ! এখনও মুখে লেগে আছে। পেট তো ভরল। এর পর ?কোথায় যাই ? কী করি ?

আমি উঠে দাঁড়ালুম। পোশাকটাকে এঁটেসেঁটে বেঁধে নিলুম। শীত করছে। করুক। আমি হাঁটতে শুরু করে দিলুম। কোনদিকে যাই ! চলো, যাওয়া যাক ওই ঘন গাছের জঙ্গলে। একা আমি। ভাবছ, ভয় করছে কি না ? করবেই তো। আমার সঙ্গে এখন মাও নেই। বাবাও নেই। নিদেন আমাদের দলেরও কেউ নেই। আমি একেবারে একা। আমায় একাই ঘুরতে হবে। আর ঘুরতে-ঘুরতে খুঁজতে হবে আমাদের সেই দলটাকে। খুঁজতে হবে দলের নেতা সেই দেবদূতকে ।

আমি জঙ্গলের ভেতরে, আরও ভেতরে ঢুকে পড়লুম। হাঁটছি আর দেখছি। দেখছি, জঙ্গলের গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত পাহাড়টা। আমি যে কোথায় চলেছি তার হাটহদ্দ কিছুই জানি না। শুধু জানি, হাঁটতে-হাঁটতেই হয়তো একদিন আমাদের দলটাকে দেখতে পাব। দেখতে পেলেও আমার মাকে, বাবাকে সে-দলে খুঁজে পাব না আর কোনওদিনই। আমি এখন একজন অনাথ ছেলে। বলো, এই দুঃখ নিয়েই তো রোজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ব আমি। রোজ সকালে ঘুম ভাঙবে আমার ।

পাহাড়টা যেখানে একেবারে জঙ্গলের গায়ে ঝুঁকে আছে সেখান থেকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম পাহাড়ের চুড়োটা। ওই উঁচু চুড়োটা যেন ফুলে-ফুলে ভরে আছে। কী জানি কেন মন বলল, ওইদিকেই যাই। তাই, ওই ফুলের শোভা দেখার জন্যই আমার পা ওইদিকেই এগিয়ে চলল। নীচে জঙ্গল টপকে আমার পা চলল, ফুলের বনের দিকে। ওই পাহাড় চুড়োয় ।

পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা একা-একা আমার মতো পুঁচকে ছেলের মোটেই সহজ কাজ নয়। বড়-বড় পাথর টপকানো তো আছেই, তার ওপর আছে মারাত্মক সব খাদ। একটু অন্যমনস্ক হলেই পা ফসকে পড়ব ওই নীচে। তারপর যে কী হবে, সে তোমরাও জানো। মা যখন ছিল আমায় ভয় ছিল না। কখনও মায়ের কোলে চড়ে, নয়তো হাত ধরে পাথর টপকেছি। এখন একা। পড়লে কেউ জানতেও পারবে না ।

আচ্ছা, তোমরা কি গানের শব্দ শুনতে পাচ্ছ ?

হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে ।

কোথা থেকে ভেসে আসছে গানের সুর ! এই নির্জন পাহাড়ে কে গান গায় !

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম ।

চুপ। আর কথা নয়। কান পেতে শোনো ! চোখ বুলিয়ে খোঁজো তাকে, যে গান গায়। খোঁজো পাহাড়ের

আনাচে-কানাচে !

হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এ-গান তো কেউ একা গাইছে না। এ যে অনেকজনের গলা ! অনেক মেয়ের গলায় গানের সুর উঠেছে। ভেসে আসছে বাতাসে দোল খেয়ে। তবে কি পাহাড়ের চুড়োয় ফুটে ওঠা ফুলের বাগান থেকে ভেসে আসছে এই গান ! আমি আবার এগিয়ে চলি। ধীর পায়ে, পাথরে-পাথরে পা ফেলে, ওই চুড়োয়, ফুল-বাগানে। ফুলের গন্ধ নাকে আসছে। মন ভরিয়ে দিচ্ছে। এত ফুল এখানে কে ফুটিয়ে রেখেছে ! কে ?

পৌঁছে গেছি। শুনতে পেয়েছি, ফুলের আড়াল থেকে গানের সুর। দেখতে পেয়েছি এক পাথর ঘেরা গুহা। গুহার ভেতর মন্দির। আমার চোখ ঝলসে উঠেছে। ফুলের যত রং, যেন তত রং গুহার ভেতর মন্দিরের। আমি থামলুম। স্পষ্ট হল গান। সুরে-সুরে ভরে গেছে মন্দির। আমি উঁকি দিলুম পাথরের পাশে লুকিয়ে। লুকিয়ে-লুকিয়ে গান শুনি। আহা রে, আমিও যদি ওদের মতো গাইতে পারতুম !

হঠাৎ থেমে গেল গান।

কেন ?

হঠাৎ কার মিষ্টি গলার স্বর শুনতে পেলুম। ঠিক যেন আমার মায়ের গলা, "কে ওখানে ?"

আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছে। আমি ভাবলুম, বুঝি-বা আমার মা। আমি পড়িমরি একছুটে ঢুকে পড়লুম মন্দিরের ভেতরে। তারপরেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। এ কে ! না, আমার মা নয় তো !

তবে ?

"কে তুই ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আমি তাঁকে দেখে হতবাক হয়ে গেছি। ইনি কে ! এমন রূপসী ! বসে আছেন সিংহাসনে। বনবেড়ালের চামড়ায় ঢাকা সেই সিংহাসন। তাঁর সারা গায়ে ফুলের অলঙ্কার। তাঁকে ঘিরে বসে আছে একদল অপ্সরা। ফুটন্ত ফুলের মতো সুন্দর। আমি ড্যাবড্যাব করে দেখতে লাগলুম।

তিনি আমার চোখের দিকে কটমট করে তাকালেন। গম্ভীর গলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুই ?"

"আমি শিজুমন।" ভয়েময়ে বলে ফেললুম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে এসেছিস কেন ?"

উত্তর দিলুম, "ভেবেছিলুম তুমি আমার মা।"

তিনি ধমক দিলেন, "মিথ্যে কথা বলছিস ?"

আমি বললুম, "তুমি বিশ্বাস করো, মিথ্যে বলছি না। আমি বন-পাহাড়ে হাঁটতে-হাঁটতে তোমাদের গান শুনতে পাই। শুনতে-শুনতে এখানে চলে এসেছি। তোমার গলা শুনে আমার মনে হয়েছিল, তুমি আমার মা।"

"বানিয়ে বলছিস ?" তিনি কড়কে উঠলেন। মুখখানা তাঁর রাগে রাঙা হয়ে উঠল। তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন, "জানিস আমি কে ?"

আমি উত্তর দিতে পারলুম না। তাঁর চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, "আমি ফুল আর ভালবাসার দেবী। আমি ভালবাসি সবাইকে। ভালবাসতে শেখাই মানুষকে। কিন্তু তোর মতো চোর আমার দু' চক্ষের বিষ।"

আমি বললুম, "বিশ্বাস করো, আমি চোর নই।"

তিনি বললেন, "শুনে রাখ, আমি দেবী। আমি সবার মনের কথা জানি। তুই যে চোর, তোর চোখ দেখে তা জানতে পেরেছি। তোকে মরতে হবে।" বলে তিনি হাঁক পাড়লেন, "এই কে আছিস !"

হাঁক দিতেই দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক কোত্থেকে ছুটে এসে আমাকে ধরল।

দেবী বললেন, "লোহার শেকল দিয়ে একে বেঁধে রাখ। ছেলেটা আমায় মিথ্যে কথা বলেছে। ছেলেটা চোর। কাল শাস্তি হবে।"

তাঁর আদেশ শুনেই লোক দুটো আমায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল। আমার পায়ে শেকল বেঁধে ফেলে রাখল আর-একটা গুহাঘরে। আমার দিকে আর ফিরেও তাকাল না। আমি আবার শুনতে পেলুম গান। এবার বোধ হয় গানের সঙ্গে নাচও হচ্ছে। কেননা, শুনতে পেলুম, নূপুরের রিনিঝিনি শব্দ গানের তালে-তালে। বলো, আর কি ভাল লাগে গান শুনতে ? আমি তো এখন বন্দি। আমি পড়ে-পড়ে কাঁদতে লাগলুম। আর ওরা মনের আনন্দে নাচতে লাগল।

এ কেমন বিচার ? এ কেমন দেবী ? যে দেবী আমার মনের কথা বুঝতে পারেন না, তাঁকে আবার দেবী বলে নাকি ! যে-দেবী আমাকে চোর বলেন, তিনি মিথ্যে দেবী। তোমরাই বলো, এতক্ষণ ধরে তো তোমরা আমার সঙ্গে আছ। তোমরা কি একবারও দেখেছ, আমাকে চুরি করতে ? মনে হয়েছে কি আমি লোভী ? আমি মিথ্যে কথা বলি ?

আমার হাতে শেকল। পায়ে শেকল। লোহার। আমার শক্তি নেই নড়াচড়া করার। কাজেই আমি পড়ে-পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কখন বেলা গেল। সন্ধে নামল। রাত এল। আমি কিছুই টের পেলুম না। কেউ আমার মুখে একফোঁটা জলও তুলে দিতে এল না। কাঁদতে-কাঁদতে আমার চোখের জলে ভেসে গেছে এই অন্ধকার গুহা। চোখে এত জল আসে কোত্থেকে, এত জল ! বুঝি, চোখের ভেতরেও ঝরনা আছে !

হঠাৎ মনে হল, কোনও এক গাছের ডালে, কোনও এক মস্ত পাখির ডানা ঝটপট করে উঠল। আমি কাঁদতে-কাঁদতে চমকে গেলুম। মুখ তুলে চাইলুম। যেদিকে চাই সেইদিকেই অন্ধকার। কাউকে দেখা যায় না। কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। অন্ধকারকে কেন যে সবাই অন্ধকার বলে, কে জানে ! অন্ধকারের নামটা যদি অন্ধকার না হয়ে অন্য কিছু হত ! তবে এখন অন্ধকারের নাম শুনে আমরা যত ভয় পাই, তখন হয়তো পেতুম না। অন্ধকার মানেই যে ভয়, এটাই বা কার মাথায় এল প্রথম ? কে রটাল এই সর্বনেশে কথাটা ?

ওই শোনো, গাছের ডালে পাখির ঝটপটানি এখনও থামেনি। এ আবার কী কাণ্ড ! কেমন পাখি, কী পাখি আমি কিছুই জানি না। শুধু তার ঝটপটানিই শুনছি। তবে কি গাছের ওই পাখিকে কেউ আঘাত করেছে ! না কি, কোনও শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে ! একা-একা ! হায় রে, আমি যদি বন্দি হয়ে না থাকতুম, তবে আমিও লড়াই করতুম। লড়াই করতুম পাখির হয়ে। পাখির শত্রুর সঙ্গে। কে না ভালবাসে বলো পাখিকে ? আহা, বলো, পাখি কত সুন্দর ! আরও সুন্দর লাগে যখন সে বাসার আড়ালে ছানাপোনাদের আদর করে। আদর করে তার মুখের খাবার কেমন ছানাপোনাদের মুখে তুলে দেয় ! কচি-কচি মুখগুলি কেমন মায়ের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকায় !

আমার মাও আমার চিবুক ছুঁয়ে কতবার যে চুমো খেয়েছে ! তখন আমি আরও ছোট। এখন আর মায়ের মতো আমাকে কে আদর করবে ? কেউ না, কেউ না। এখন আমি বন্দি। বন্দি একা, অন্ধকারে।

আমার আবার কান্না পেয়ে গেল। আমি আবার ডুকরে কেঁদে উঠলুম। কাঁদতে-কাঁদতে আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল ফেলে আসা সেই দিনগুলি। ভেসে উঠল, খোলা আকাশের স্বপ্ন। সূর্যের দিন, আর চাঁদের রাত। বেজে উঠল, নদীর কলতান। ঝরনার ঝরা-গান। সে-দিনগুলি ছিল কত সুন্দর !

হঠাৎ এই অন্ধকারে ঝলসে উঠল আলোর রোশন। ও কে ?

কে দাঁড়ালেন আমার মুখের সামনে ? আমি থতমত খেয়ে গেলুম। আমার চোখের ওপর ভেসে-ওঠা এ-মুখখানি কার ঝলমল করছে ! এ যে দেখি ফুল আর ভালবাসার দেবী !

"শিজুমন।" তিনি ডাকলেন।

শোনো, শোনো ! তাঁর ডাক শুনে পাখির ঝটপটানি থেমে গেছে। আমি চমকে উঠেছি।

তিনি আবার ডাকলেন, "শিজুমন, ভয় পাস না বাবা। আমি ভালবাসার দেবী।"

আমি অবাক হলুম তাঁকে দেখে। তাঁর কথা শুনে। এখন কেমন নরম তাঁর গলার স্বর। কেন ? কেমন আলোয় ঝলসে উঠেছে তাঁর মুখখানি ! কথা বলতে পারলুম না আমি একটিও।

তিনি বললেন, "আমি ভুল করেছি শিজুমন। আমি তোকে মিথ্যে শাস্তি দিয়েছি। মিথ্যে ওই লোহার শেকল দিয়ে তোকে বেঁধে রেখেছি। আমি কেন এমন নির্দয় হলুম !"

তবু আমি কথা বলতে পারলুম না। ছলছল চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম।

তিনি আমার আরও কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর দেহের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার চোখে। তিনি আমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসলেন। বললেন, "কাঁদছিস কেন শিজুমন ? আমি আর তোকে বন্দি করে রাখব না। আমি তোর বন্দি শেকল খুলে দেব।" তিনি হাত বাড়ালেন। শেকলে টান দিলেন। ঝনঝন করে উঠল শেকল। আমার বাঁধন খুলে গেল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম।

"তোর জন্য খাবার এনেছি।" তিনি খাবারের পাত্রটি আমার সামনে রাখলেন।

আমি এতক্ষণ তাঁর মুখ দেখেছি আলোয়। হাতে খাবার দেখিনি অন্ধকারে। এখন আলোর রোশনাই খাবারের ওপর উছলে পড়েছে। তিনি একটি হাত আমার মাথায় রাখলেন। আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। তিনি একটি হাতে চিবুক ছুঁলেন। তারপর আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। বুঝি, আমার চোখ মোছাতে-মোছাতে তাঁর চোখ দুটিও ছলছলিয়ে উঠল। আমি অবাক চোখে দেখতে লাগলুম। আর ভাবতে লাগলুম, দেবদেবীরাও কাঁদেন !

হঠাৎ তিনি খাবারের থালায় হাত দিলেন। একটুকরো খাবার তুলে নিয়ে আমার মুখে ধরলেন। বললেন, "খা !"

আমার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল।

"খা !" আদরে উথলে উঠল তাঁর গলার স্বর।

আমি হতবাক হয়ে খেতে লাগলুম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "অনেকক্ষণ খাসনি, না ?"

তিনি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর কথা শুনে আমি লজ্জা পেয়েছি।

তিনি এবার আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, "তোর গান ভাল লাগে ?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ। কথা বললুম না।

"গাইতে পারিস ?"

এতক্ষণে আমি কথা বললুম, "না।"

"আমি তোকে শিখিয়ে দেব।" তিনি আমার মুখে খাবার তুলে দিতে-দিতে বললেন।

আমি থতমত খেয়ে গেলুম তাঁর কথা শুনে। আনন্দে তোলপাড় করে উঠল আমার বুকের ভেতরটা।

ভালবাসার দেবী আমার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন এখনও। আমি খাচ্ছি। এক-একদিন আমি রাগ করে না খেলে, মাও ঠিক এমনই করে আমাকে খাইয়ে দিত। খুব দুষ্টুমি করলে কার মা না মারে। আমার মাও আমাকে মারত। যে-হাত দিয়ে মারত, সেই হাত দিয়ে যখন মা আদর করে খাইয়ে দিত, তখন কাঁদতে-কাঁদতেও কী ভাল লাগত। এখন যেমন ভালবাসার দেবীর হাতে খেতে ভাল লাগছে।

হঠাৎ ভালবাসার দেবী বলে বসলেন, "জানিস, বলতে লজ্জা করে, আমি এখানে লুকিয়ে আছি।"

আমি চমকে তাকালুম তাঁর মুখের দিকে। থ' হয়ে গেছি তাঁর এই অদ্ভুত কথা শুনে। আমার মুখে কথা সরল না। শুধু মনে হল, এ কী কথা বলেন ভালবাসার দেবী !

তিনি আবার বললেন, "আমার শত্রু আমার পিছু নিয়েছে। সে কাউকে গান গাইতে দেখলে হিংসেয় ফেটে পড়ে। আমি গান গাই। সে সহ্য করতে পারে না। আমি ভালবাসি সবাইকে। আমায় ভালবাসে সবাই। তাই আমি তার চোখের বিষ। সে আমায় হরণ করে বন্দি করে রাখতে চায়। যেন কেউ না আমায় দেখতে পায়। আমার গান শোনে। তার হাত থেকে বাঁচার জন্যই আমি এখানে লুকিয়ে আছি।"

আমি বোবার মতো শুনছি তাঁর কথা। আমার মুখে আর খাবার উঠছে না। মন জানতে চায়, কে সে শত্রু ? সে কি কোনও দানব, না, শয়তান ? জিজ্ঞেস করার জন্য অস্থির হচ্ছি। কিন্তু পারছি না। অবশ্য আমায় জিজ্ঞেস করতে হল না। ভালবাসার দেবী নিজেই বললেন, "সে-ও এক দেবতা।"

দেবতা ! কে তিনি ? জানার জন্য আমার মন আকুল হয়ে উঠল।

"কে জানিস ?"

আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, 'না, আমি জানি না। আমি জানতেই চাই !'

তিনি বললেন, "সে দেবতা হল, গুহার দেবতা।"

আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলুম। কেননা, সেই গুহা-দেবতার লোভ আমার হৃৎপিণ্ডের ওপর। স্রোতের দেবী আমায় রক্ষা করেছিলেন। এবার যদি সেই হিংস্র দেবতা ভালবাসার দেবীকে খুঁজতে-খুঁজতে এখানে হাজির হন ! তা হলে আমিও যে ধরা পড়ে যাব। তখন নিশ্চিত মরতে হবে আমায়। ভালবাসার দেবী আমায় কিছুতেই বাঁচাতে পারবেন না। তিনি তো নিজেই বিপদে পড়েছেন ! তা হলে এবার আমি কী করব !

কোনওরকমে খাওয়া শেষ করলুম আমি।

ভালবাসার দেবী বললেন, "এখানে এই গুহা-মন্দিরে তোর ভয়ের কিছু নেই। আমি আছি। সঙ্গে আছে আমার সহচরীরা। তুই যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারিস। আমার ভাল লাগবে। আমি তোকে ভালবাসব।"

দেবী চলে গেলেন। গুহা-মন্দিরের এদিকটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল। ভীষণ ভয়ে আমার বুক ধুকধুক করছে। একটু আগে ভালবাসার দেবীর মুখে গান শেখার কথা শুনে আনন্দে উছলে উঠেছিল আমার মন। থাক এখন গান শেখা। এখন কেমন করে বাঁচব, সেই ভাবনায় জেরবার হয়ে যাচ্ছি। ভাবনাটা যতই চেপে ধরছে, অন্ধকারটা ততই ঘন হচ্ছে। যে-কথা শুনিয়ে গেলেন দেবী, সে-কথা শুনে কার চোখে ঘুম আসে ! সুতরাং এই অন্ধকারে গুহা-দেবতার মুখখানা বারবার আমার চোখে ভেসে উঠছিল। আমি অস্থির হয়ে উঠছি। কখনও শুচ্ছি, কখনও বসছি। আর মনে-মনে ভাবছি, এখানে থাকব, না পালাব। এই অন্ধকার ডিঙিয়ে, এই রাত্রে পালাবই বা কোথায় ? কোনদিকে যাব ?

না, ভয় পেলে আমার চলবে না। আমায় যেতেই হবে। অন্ধকারের চেয়েও ভয়ঙ্কর গুহা-দেবতা। আমার কী ক্ষমতা, তাঁর সঙ্গে পারি ! কাজেই পালাবার জন্য আমি বুকে সাহস আনলুম। খুব সন্তর্পণে পা ফেললুম। অন্ধকারে। জানি না কোনদিকে যাচ্ছি। জানি না, এই পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে আমি গুহার আরও গভীরে চলে যাচ্ছি কি না। আমার কপালে কী আছে জানি না।

যাই থাক, আমাকে হাঁটতেই হবে।

হাঁটতেই হবে। কারণ অন্ধকার গুহার ভেতর তো আর ছোটা যায় না। হনহন করে যে হাঁটব, তারও উপায় নেই। কোথাও খানা, কোথাও খন্দ। মস্ত-মস্ত পাথর। তার ওপর একটু যদি অন্যমনা হই, ছিটকে পড়ব হোঁচট খেয়ে। হয় মাথা ফাটবে, না-হয় পা মচকাবে। তার চেয়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পাই ভাল।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, আমি অন্ধকারকে জয় করতে পেরেছি। মনে হচ্ছে, এবার আমি আকাশ দেখতে পাব। দেখতে পাব অসংখ্য তারা। আকাশের গায়ে। দেখতে পাব আলোর রোশনাই। তারার গা ছুঁয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে।

॥ ৭ ॥

না তো, আমি আকাশ তো দেখতে পেলুম না। এ যে দেখি গুহার ভেতর মশাল। জ্বলছে। আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এখানে মশাল জ্বেলেছে কে? কেন জ্বেলেছে? আমি থমকে দাঁড়ালুম। ঝটপট একটা মস্ত-পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিলুম। নিঃসাড়ে। তারপর উঁকি মারলুম।

অনেকক্ষণ পরেও কাউকে দেখতে পেলুম না। অনেকক্ষণ পরেও কারও সাড়া-শব্দ শোনা গেল না। শুধু মশালই জ্বলছে। তবে আর কতক্ষণই বা এই ঘুপচির মধ্যে বসে থাকা যায়! আমি পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এলুম। এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখি এধার-ওধার। বলা যায় না, কেউ যদি ওত পেতে থাকে!

না, আমি গুহার দেবতাকে দেখতে পেলুম না। দেখতে পেলুম, গুহার দেওয়াল জুড়ে পাথরের মূর্তি। পাথর কেটে কে এত মূর্তি গড়েছে? ওই দ্যাখো, একটা হরিণ! ঠিক মনে হচ্ছে, অনেক গাছের ফাঁক দিয়ে ছুটছে। দ্যাখো, দ্যাখো, একটা পাখি কেমন গাছের ডালে বসে আছে! মায়ের পিঠে বাঁধা ছেলেটা কেমন জুলজুল করে দেখছে! এটা যুদ্ধের ছবি। দু' দলে যুদ্ধ হচ্ছে। কারও বুকে তীর। কারও মাথা কেটেছে। কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

আশ্চর্য! এত মূর্তি। দেখতে-দেখতে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। মশালের আলোয় উছলে উঠেছে সেইসব মূর্তি। দেখে আমি বিপদের কথা ভুলেই বসলুম। যদি পারি তো এক্ষুনি খোদাই করি, সমুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর হাঙরের হাঁ-করা মুখখানা। উফ্! আমার চোখে এখনও ভাসছে সেই মুখ।

"হা-হা-হা!"

কে এমন বিকট সুরে হেসে উঠল! চকিতে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেলুম, একজন বুড়োমানুষকে। তাঁর মাথায় ঝাঁকড়া চুল। লম্বা দাড়ি। লম্বা পোশাক। এ পোশাক কি কোনও পাখির পালক দিয়ে তৈরি : না-কি সাপের ছাল দিয়ে বোনা।

বুড়োমানুষটি হাসতে-হাসতেই বললেন, "অমন করে কী দেখছিস?"

আমি কথার উত্তর দেব কী, এখন দৌড় মেরে পালাতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু আমি জানি, এই মশালের আলো পেরোলেই অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কী কষ্ট করে আমি ফুল আর ভালবাসার দেবীর আস্তানা থেকে পালিয়ে এসেছি সে তো তোমরা জানোই। এখন আমার বুঝতে কোনও অসুবিধেই হল না এ-আলো কে জ্বেলেছেন। তবে, এইসব মূর্তি এই বুড়োমানুষটি গড়ছেন কি না, তখনও বুঝতে পারিনি।

তিনি বললেন, "তোর যে খুব মূর্তি খোদাই করতে ইচ্ছে করছে, আমি জানি।" বলে তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, "তোকে আমি শিখিয়ে দেব।"

আমি কেমন বোকার মতো তাঁর দিকে তাকালুম।

"আমি কিন্তু তোকে চিনি।" মানুষটি বললেন।

আমার ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। মনে হল, আবার বোধ হয় কোনও বিপদে পড়ে গেলুম আমি।

তিনি বললেন, "তুই যে খুব বিপদে পড়েছিস, সেটাও আমার জানা আছে।"

তাঁর মুখে এই কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা ধক করে চমকে উঠল। আমি যে বিপদে পড়েছি, এই মানুষটি কেমন করে জানলেন!

"তোকে যে বিপদে ফেলেছে, তাকেও আমি জানি।"

আমার মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল।

"সে অনিষ্টের দেবতা। তাই না?"

আমার কেমন যেন হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

"তুই নিশ্চয়ই এই বুড়োকে চিনিস না।"

আমার বোধ হয় আর কথা না বললেই নয়। কিন্তু আমি কিছু বলার আগে তিনিই বললেন, "আমি শিল্পসৃষ্টির দেবতা। আমি সভ্যতার দেবতা।"

মুহূর্তের মধ্যে আমি তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নোয়ালুম। কে না জানে, তিনি আমাদের সেই দেবতা, যিনি আমাদের সৎ হতে শেখান। তিনি বলেন, কেমন করে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার করতে হয়। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, এই মূর্তি খোদাই করেছেন এই দেবতা, গুহার পাথরে। সবার অজান্তে।

তিনি আমার মাথায় হাত দিলেন। বললেন, "ওঠ!"

আমি উঠে দাঁড়ালুম।

তিনি বললেন, "ভয় পাস না। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি, কোনও দেবতাই তোর প্রাণ নিতে পারবে না। পারবে না ওই অনিষ্টের দেবতাও। সে চায় না মানুষ সভ্য-ভব্য হোক। সে চায় না মানুষ শিল্পসৃষ্টি করতে শিখুক। শিখুক গান গাইতে। মূর্তি খোদাই করতে। সে চায় শুধু প্রাণ। তোদের মতো শিশুদের প্রাণ। আমি বাধা দিই। তাই তার আমার ওপর এত রাগ। সে আমাকে অপমান করে। তাই আমি এই অন্ধকার গুহায় বাস করছি। এইখানে একলা বসে মূর্তি খোদাই করছি গুহার পাথরের দেওয়ালে। আমি বুঝতে পেরেছি, তোরও ইচ্ছে তুই মূর্তি খোদাই করিস। আমি তোকে শিখিয়ে দেব।"

হঠাৎ একটা অদ্ভুত সাহসে আমার বুকটা ফুলে উঠল। হঠাৎ আমি কথা বললুম। বললুম, "দেবতা, আপনি দয়া করলে আমি ঠিক পারব।"

তিনি দরদভরা গলায় বললেন, "এই তো চাই। এই তো সাহসী মানুষের মতো কথা!"

সেইদিন থেকে আমি সেই গুহার গহ্বরে থেকে গেলুম। সেই হল আমার আশ্রয়। সেইদিন থেকে শুরু হল আমার মূর্তি খোদাই-এর শিক্ষা। শিল্পসৃষ্টির দেবতা গুহার দেওয়ালে মূর্তি খোদাই করেন। আমি দেখি। দেখতে-দেখতে অবাক হই। ভাল লাগে। কী সুন্দর!

এমনই করে দেখতে-দেখতে একদিন নিজেই আমি পাথরে খোদাই করলুম। একটি ঝরনা। দেবতা জানতে পারলেন না। একদিন একটি নদী। সেদিনও তাঁকে বললুম না। আর-একদিন একটি সূর্য। আমার সূর্য ফুটে উঠল দেবতার চোখের আড়ালে। এ-গুহাটা তো অনেক বড়। কোথায় ফুটে ওঠে আমার নদী, আমার ঝরনা, আমার সূর্য তিনি জানবেন কেমন করে! দেবতা আমায় কেন এত ভালবাসেন! তিনি আমায় ভালবেসে এনে দিয়েছেন উড়ন্ত সাপের পালকের পোশাক। কী সুন্দর। ঘুমতি রাতে তিনি আমায় গল্প বলেন। বলেন, "দ্যাখ শিজুমন, মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষই মানুষকে মারে। শুনেছিস কোনওদিন একটা জাগুয়ার আর-একটা জাগুয়ারকে মেরে ফেলেছে? না। শুনিসনি। কিন্তু নিশ্চয়ই শুনেছিস, মানুষ যেমন মানুষকেই মারে, তেমনই সে মারে জীবজন্তু—যাকে পায় সামনে,

ছাপা শাড়ির প্রথম কথা
অভিজাত সম্বলপুরী কটকি, গাদোয়াল সিল্ক, ঘাটচোলা আর হ্যান্ডলুম ডিজাইনের হুবহু রূপান্তর ছাপা শাড়িতে।
অভিনবত্বের শেষ কথা
এছাড়া বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সমন্বয়-তো আছেই।
নিখুঁত বুনোট
100%
পাকা রং
নারীর মনের কথা
PRAKASH
COTTON PRINTED SAREES
প্রকাশ প্রিন্টস, মুম্বাই
কেনার সময় আসল চিহ্নটি অবশ্যই দেখে নেবেন

তাকেই। আর যে-দেবতা মানুষকে হিংস্র করেছে, সে হল অনিষ্টের দেবতা।" বলতে-বলতে তিনি থামেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, "ঘুমিয়ে পড়লি শিজুমন ?"

"না, না।"

"আমার কথা শুনছিস ?"

"হ্যাঁ।"

"ভাল লাগছে ?"

"খুব।"

তিনি বললেন, "তোকেও কাছে পেয়ে আমারও খুব ভাল লাগছে। এতদিন ধরে তুই আমাকে দেখলি। আমি কেমন করে মূর্তি খোদাই করি তুই দেখছিস। শিখছিস। কী শিখেছিস আমি কাল দেখব। পাথর খোদাই করতে হবে। পারবি না ?"

আমি খুব নরম গলায় উত্তর দিলুম, "হে দেবতা, আমি নিজে-নিজে মূর্তি খোদাই করতে পারি।"

তিনি অবাক হলেন। বললেন, "কই, আমি এখানে কোথাও দেখিনি তো ?"

আমি বললুম, "হে দেবতা, আমার খোদাই করা মূর্তি আপনি এখানে তো দেখতে পাবেন না। আমি খোদাই করেছি গুহার আরও একটু ভেতরে।"

তিনি আমার কথা শুনে ব্যস্ত হলেন। বললেন, "চ', চ' আমাকে নিয়ে চ' সেখানে। আমি দেখব।"

আমি বললুম, "এখনই ? এখন রাতের অন্ধকার। কাল সকালে গেলে হয় না ?"

তিনি বললেন, "না, না। কাল আমরা এ-গুহা ছেড়ে আর-এক গুহায় চলে যাব। মশালটা জ্বাল ! চ' দেখে আসি তোর নিজের হাতে-খোদাই মূর্তি !"

বুঝতেই পারছ, পাথর ঠুকে-ঠুকে আগুনের ফুলকি দিয়ে এখন আমি মশাল জ্বালতে পারি। মশাল হাতে দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম আমার ছবির সামনে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। দেখতে লাগলেন আমার হাতে-গড়া মূর্তি। আমি দেবতার মুখ দেখছি। দেখছি, সে-মুখে ধীরে-ধীরে হাসি ফুটছে। হঠাৎ তিনি হা-হা করে হেসে উঠলেন। আনন্দে। আমি চমকে উঠলুম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি মাথা নত করলুম। তিনি বললেন, "শাবাশ।" বলে জড়িয়ে আদর করলেন।

পরের দিন দেবতা সত্যিই আমায় নিয়ে চললেন আর-এক গুহায়। আর-এক পাহাড়ের গহ্বরে। সেই আর-এক পাহাড়ের গা-ঘেঁষে একটা ঘন বন। বনের কোলে লাফিয়ে পড়ছে একটা ঝরনা। লুটোপুটি খাচ্ছে না কি, লুটোপুটি খেয়ে নূপুর বাজাচ্ছে ? আর ওই গাছের ডালে খঞ্জনা পাখিটা কেমন গান গাইছে। ওই দ্যাখো, নাম-না-জানা আর-এক পাখি কেমন শিস দেয় ! কী ভালই না লাগে !

দেবতা জিজ্ঞেস করলেন, "শিজুমন, পারবি, ওই খঞ্জনা পাখির মতো আর-এক পাখি পাথরে খোদাই করতে ?"

"হ্যাঁ, পারব।" আমি উত্তর দিলুম। "কিন্তু..."

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু বলে থামলি কেন ? কী বলতে চাস ?"

"দেবতা, আমার পাথরে খোদাই করা খঞ্জনা তো এমন করে গান গাইতে পারবে না।" আমি উত্তর দিলুম।

তিনি বললেন, "পাথরের পাখি গান গায় না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "হে দেবতা, কেন গায় না ? কেন পাথরে খোদাই নদীর বুকে ঢেউ ওঠে না ? কেন সবাই চুপ করে থাকে ? জীবন নেই কেন ?"

দেবতা আমার মুখের দিকে চাইলেন। কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "যার ক্ষমতা আছে, সে-ই পারে পাথরে জীবন দিতে।"

"আমায় আপনি সেই ক্ষমতা দিন না !"

তিনি উত্তর দিলেন, "শোন রে শিজুমন, ক্ষমতা কেউ কাউকে দেয় না। ক্ষমতা লুকিয়ে আছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। সবার চোখের সামনে। সেই ক্ষমতাকে খুঁজে বার করতে হয়। যে ঠুঁটোর মতো চুপচাপ বসে থাকে, সে খুঁজে পায় না ক্ষমতা। পারে না পাথরে জীবন দিতে।"

দেবতার কথা শুনে সেইদিন থেকে আমার যে কী হল, এই অন্ধকার গুহায় বসে মূর্তি খোদাই করতে মন আর সায় দেয় না। মনে হল, এখনই বেরিয়ে পড়ি। হ্যাঁ, সত্যিই বেরিয়ে পড়লুম তখনই, আকাশের নীচে। আলোতে। ছুটে যাই বনে। ছুটে-ছুটে খুঁজে বেড়াই ক্ষমতা। পাই না। আবার ফিরে আসি গুহায়।

এমনই করে ক'টা দিন কাটল। ক'টা দিন আনমনা হয়ে ক'টা মূর্তি খোদাই করলুম। কিন্তু আর ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না গুহার অন্ধকারে বন্দি থাকতে। মন কেমন করে আলোর জন্য। একটুখানি আলো।

আশ্চর্য, দেবতা বুঝি বুঝতে পেরেছিলেন আমার মনের কথা ! তাই, হঠাৎ সেদিন তিনি আমায় জিজ্ঞেস করে বসলেন, "শিজুমন, আমার কাছে তোর আর থাকতে ভাল লাগছে না, না রে ?"

আমি হকচকিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। দেখলুম মশালের আলোয় তাঁর মুখখানা হাসিতে ঝকঝক করছে। ভারী মিষ্টি সেই হাসি। আমার কেমন মায়া লাগল মুখখানি দেখে। আমি লজ্জা পেলুম। কী বলব আমি দেবতাকে ? তাঁকে কি আমি মিথ্যে বলব ? না, কক্ষনো না।

তিনি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আমায় সভ্য-ভব্য হতে শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন, মূর্তি খোদাই করতে। তিনি দেবতা। তাই আমার মনের কথা জানতে পেরেছেন। তাঁকে আমার লুকোবার কিছুই নেই। আমি উত্তর দিলুম, "হে দেবতা, আপনি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। আমায় ভালবেসেছেন। আপনাকে আমি কেমন করে ভুলতে পারি ? হে দেবতা, আপনিই তো বলেছেন, ক্ষমতা লুকিয়ে আছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। সেই ক্ষমতা খোঁজার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই গুহার অন্ধকারে থাকতে মন মানে না। তাই আমার ইচ্ছে, পৃথিবীর আলোয় আমি ক্ষমতার খোঁজ করব।"

আমি যা ভাবতে পারিনি, তাই হল। তিনি খুশিতে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আদর করলেন। তারপর বললেন, "ওরে শিজুমন, আমি যে তোর মুখে এই কথাটাই শুনতে চেয়েছি। ওরে ছেলে, আমি জানতুম একদিন তোর এই ইচ্ছেটাই তুই আমাকে বলবি। তুই যদি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঘুরে পাথরে জীবন দেওয়ার ক্ষমতা খুঁজে পাস, তবে আমার চেয়ে আর কে বেশি খুশি হবে ! ওরে শিজুমন, আমি দেবতা। আমি তোকে আশীর্বাদ করেছি। কোনও দেবতাই তোর প্রাণ নিতে পারবে না। তোর আর কোও ভয় নেই। তুই এগিয়ে যা !"

॥ ৮ ॥

পরের দিনই আমি শিল্প-সৃষ্টির দেবতার কাছে বিদায় নিয়ে সত্যি-সত্যি বেরিয়ে পড়লুম। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ছড়ানো বনের পথ ধরে এগিয়ে চললুম। আমি জানি না কী খাব। কোথায় শোব। আমার গায়ে উড়ন্ত সাপের পালকের পোশাক। আর আমার কাঁধের ঝুলিতে পাথর খোদাই করার একটি ছেনি। একটি হাতুড়ি। শিল্প-সৃষ্টির দেবতা দিয়েছেন। একা-একা হাঁটতে-হাঁটতে আমি বুঝতে পারছি, এখন আমি ঠিক তেমনটি আর ছোট নই। আমি বড় হয়েছি। আমি যে-চোখে সেই ছেলেবেলায় আকাশ দেখে হাতছানি দিতুম, এখন আর তা দিই না। এখন মনে হয়, আকাশ আছে বলেই পৃথিবী এমন সুন্দর।

আকাশ আছে বলেই সূর্যের আলো আছে। চাঁদের জ্যোৎস্না আছে। আছে তারার ঝলমলানি। পাখিরা খেলে বেড়ায় রঙিন ডানা মেলে। আকাশের জন্যই বুঝি বন এমন সবুজ ! ফুল এমন রঙিন ! নদী এমন উচ্ছল ! পাহাড় পরেছে তুষারের মুকুট !

আমি কোথায় চলেছি ? শুধু বন আর বন। হাঁটছি। দেখছি। দাঁড়াচ্ছি। ওই যে মস্ত গাছটা, কত পাখি তার ডালে-ডালে। না-জানি কতকাল ধরে এমনই করে দাঁড়িয়ে আছে। কত পাখি গেল। কত পাখি এল। গাছের কোটরে বাসা বাঁধল। ছানা-পোনাদের বড় করল। উড়তে শেখাল। তারপর একদিন সবাই উড়ে চলে গেল। আচ্ছা, পাখিরা কি গাছের কথা মনে রাখে ? তাদের মন কি গাছের জন্য কেমন-কেমন করে না ? পাখি ডানা মেলে উড়তে পারে। কাঠবিড়ালি ডালে-ডালে ছুটতে পারে। কিন্তু গাছ কিছুই পারে না। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেখানে জন্মায়, সেইখানেই। আমি ওই মস্ত গাছটার বুকে বুক ঠেকালুম। চিৎকার করে উঠলুম, "ও আমার নাম-না-জানা গাছ, তুমি আমার বন্ধু হবে ? আমি বড্ড একা। আমার কেউ নেই। আমি তোমায় ভালবাসি গাছ। তোমার কি আমাকে দেখে একটুও কষ্ট হচ্ছে না ? তুমি কেন হাসতে পারো না, গাছ ? কেন পারো না কথা বলতে ? গান গাইতে ? ফুল আর ভালবাসার দেবী গান গাইতে পারেন। আমি চুপিচুপি একদিন তাঁর গান শুনে, মনে রেখেছি। তুমি শুনবে সেই গান ? আমি গাচ্ছি। তোমার কান থাকে শুনো। না-থাকে বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকো !" বলে, আমি গাইতে শুরু করলুম। শুরু করার আগে তোমাদের কানে-কানে বলি, এ-গানটা কিন্তু ভালবাসার দেবীর নয়। আমার নিজের। তাই বিচ্ছিরি। বেতালা। এ-বেতালা গানই শোনাতে লাগলুম গাছকে :

এমন যদি হত,
ফুলগুলো সব পাখির মতো
হাওয়ায় ভেসে উড়ত,
পাখির ছানা ডিম না-ফুটে
গাছের ডালে ফুটত !
মজা হত ভারী
তোমরা বোধ হয় বলতে আমায়
আচ্ছা বোকার ধাড়ি !

এমন যদি হত,
গাছগুলো সব জলের ওপর
গটমটিয়ে হাঁটত,
মাছের ছানা জল না-ছুঁয়ে
ডাঙার ওপর নাচত !
মজা হত ভারী
তোমরা বোধ হয় বলতে আমায়
আচ্ছা বোকার ধাড়ি !

ওই তো দ্যাখো, আমার গান শুনে গাছটা কেমন পাতার ঝুমঝুমি বাজাচ্ছে ! ওই তো বাতাস কেমন নাচছে। আমি উঠে পড়লুম গাছের ওপর। লাফ দিলুম, এ-ডাল থেকে আর-এক ডালে। আনন্দে হাততালি দিলুম। তারপর পাতায়-পাতায় লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিলুম।

ওই দ্যাখো, ওই পাশের গাছে একটা সাপ ! গাছের ডাল জড়িয়ে কেমন ফণা তুলেছে। আমি এই গাছের এই ডালে দুলতে-দুলতে আর-এক গাছে লাফ দিলুম। আরে, দ্যাখো-দ্যাখো একঝাঁক সারস। গাছের ডাল ছেড়ে ফুড়ুত ! আকাশে উড়ল। একেবারে আমার মাথার ওপরে। কত হরিণ দ্যাখো ! ছুটছে। ছুটছে, না নাচছে ! আমি তরতর করে নেমে পড়লুম, গাছ থেকে মাটিতে। ওই যে ছোট্ট হরিণটা মায়ের পিছু ছুটছে, আমিও ছুটলুম তার পেছনে। ছুটলে কী হবে ! আমি কি ধরতে পারি ! তবু ছুটলুম। ছুটে-ছুটে খেলা শুরু করে দিলুম। গাছের আড়ালে। পাতার ফাঁকে-ফোকরে। আমার খেলা দেখে আকাশের সারসের দলও কেমন আনন্দে উথাল-পাথাল করছে ! ওরে বাবা ! একটা কুচকুচে ভালুক কেমন একটু দূরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে ! পেটে-পেটে ওর কী মতলব কে জানে !

না, না, ভালুকটা উঠে দাঁড়াল। দেখতে পাচ্ছ, আমার দিকেই হেঁটে আসছে ! কী ধুমসো রে বাবা ! কী হবে ? আমায় মারবে নাকি ! না, এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়। আমি পড়িমরি করে সামনের গাছটায় উঠে পড়লুম। ও বাবা ! ভালুকটাও যে উঠছে ! কেমন হেলাফেলা করে গাছে উঠে পড়ল। আমি কী করি। মারলুম এ-ডাল থেকে ওই সামনের ডালে লাফ। তার গ্রাহ্যই নেই। সেও উঠে পড়ল। আমিও একটা নীচের ডালে ঝুলে পড়লুম। ওমা, ভালুকটাও দ্যাখো কেমন ঝুলে পড়ল। এই বুঝি আমার ঘাড়ে পড়ে। না, না, পড়ল না তো ! ডাল ধরে কেমন দুলছে। ভালুক দুলছে। গাছও ঝমঝমাচ্ছে। আকাশের সেই সারসের দল গাছের ডালে নেমে এসে শিস দিচ্ছে। তবে কি সবাই একসঙ্গে আনন্দ করছে ! আমিই শুধু ভয়ে মরছি ! না, না, আমি বেবাক ভুলে গেলুম ভয়ের কথা। আমি গাছ, পাখি আর ভালুকের নাচ-গান-হল্লা দেখতে লাগলুম হাঁ করে !

এ কী ! হঠাৎ কোথাও কিছু নেই ভালুকটা ঝাঁপ দিল। ঝপাং। আমি যে ডালে বসে আছি, সটান সেই ডালে। আমি ছিটকে পড়লুম সিধে মাটিতে। লাগল একটু। ভালুকটাও লাফ মেরে পড়ল। মাটিতে। আমি দিলুম ছুট। গাছ থেকে পড়ে আমার লাগল, না ভাঙল, কে আর ভাবে সে-কথা। এখন পালাতে পারলেই বাঁচি !

আমি ভয়েময়ে অনেকখানি পালিয়ে এসেছি। অনেকখানি এসে মনে হল, দেখি তো ভালুকটা এখনও আমায় তেড়ে আসছে কি না। এই ভেবে আমি পিছু ফিরেছি। ফিরেই থমকে গেছি। হ্যাঁ, ওই তো আসছে। কী কাণ্ড দ্যাখো ! ভালুকটার পিঠে একটা বানরছানা ! আমি তো দেখে ভ্যাবাচাকা হাম্বা ! এমন মজা লেগে গেল, আর কে পালায় ! বানর-পিঠে ভালুকটা চোখের পলকে আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সটান সিধে হয়ে দাঁড়াল। যেমন আমি দাঁড়িয়ে আছি। তারপর বানরছানাটাকে পিঠে নিয়ে নাচতে লাগল। এই রে, বানরছানাটা বুঝি ডিগবাজি খায় ! না, না, দ্যাখো, ছানাটা কেমন ভালুকের গলা জড়িয়ে আছে শক্ত হাতে !

নাচতে-নাচতে ভালুকটা আমার একেবারে সামনে এল।

আমি ভয় পেলুম না।

নাচতে-নাচতে আমায় ছুঁতে লাগল।

আমার হাসি পেল।

বানরছানাটা ভালুকের পিঠ থেকে হঠাৎ লাফ মারল আমার দিকে।

আমি আঁতকে উঠলুম।

আমার বুকটা জড়িয়ে ধরল।

আমি হেসে ফেললুম।

ভালুকটা নাচ থামিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

বানরটা আমার বুক থেকে ঝাঁপ দিল।

আমি হাঁপ ছাড়লুম।

বানরটা লুটোপুটি খেতে লাগল।

আমিও লুটোপুটি খেতে লাগলুম। খেতে-খেতে দেখলুম, সেই একপাল হরিণও আনন্দে হুটোপাটি লাগিয়ে দিয়েছে। সেই একঝাঁক সারসের সঙ্গে অসংখ্য রঙিন পাখিও আকাশে ডানা

ছড়িয়ে দিয়েছে। বাতাসে ভাসতে-ভাসতে কলরোল তুলেছে। সে যে কী আনন্দের দৃশ্য, যে না দেখেছে তাকে কেমন করে বোঝাই!

ওমা! কোথাও কিছু নেই, ভালুকটা ঝট করে আমায় পিঠে তুলে নিল। বনের ভেতর হাঁটা দিল। কী মজা! আমার মাথার ওপর উড়ে চলল ঝাঁক-ঝাঁক সারস। কত রঙিন পাখি। উরি বাবা দ্যাখো, কত বানর! ওই দ্যাখো সেই ছোটকু বানরটা। একটু আগে আমাকে জড়িয়ে ছিল। এখন কেমন মায়ের পিঠে বসে আছে!

হঠাৎ এ কী হল! ভালুকটা অমন বিগড়ে গেল কেন! হঠাৎ কেন আমাকে ছুড়ে ফেলে দিল তার পিঠ থেকে! কেন পালাল বনের ভেতর ঝোপের আড়ালে! বানরগুলোই বা কেন হুপহাপ করে লুকিয়ে পড়ল এ-গাছে, ও-গাছে। কোথায় গেল আকাশের সারসের দল! রঙিন পাখির ঝাঁক! কেন অমন সব চুপচাপ হয়ে গেল! আমি শুধু একলাটি দাঁড়িয়ে আছি বনের ভেতরে। দেখছি, ফ্যালফ্যাল করে। সত্যি বলছি আমি একদম বোকা হয়ে গেছি। কেননা, আমি যেদিকেই তাকাই, দেখি, সেদিকটা খাঁ-খাঁ। বোঝবার উপায় কী, একটু আগে এখানে একটা মস্ত মজার কাণ্ড হচ্ছিল।

কাণ্ডটা বটে! দ্যাখো, আমার সামনে কে!

ওই দ্যাখো, তার চোখদুটো জ্বলছে!

মুখখানা কী হিংস্র! দেখতে পাচ্ছ, গায়ে তার হলদে পুটকির আঁকিবুকি? ল্যাজটা কত বড়! বলতে পারো, ওর নাম কী?

জাগুয়ার।

আমি আঁতকে উঠলুম। দাঁড়াব, না পালাব? জাগুয়ারের মতো বনের গলি-ঘুঁজি আমার জানা নেই। যেখানেই পালাই, নিস্তার নেই। তবে কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মরব?

ওই তো সে এসে পড়ল! আমার সামনে। ওখান থেকে একটা লাফ মারলেই, আমার ঘাড় মটকে যাবে। না, জাগুয়ারটা এখনও লাফ মারল না। আমার দিকে প্যাটপ্যাট করে দেখতে লাগল। আর যেন মনে-মনে বলতে লাগল, আর বেশিক্ষণ নয়। যতক্ষণ পারিস শ্বাস নিয়ে নে। এর পর তোকে চিবিয়ে খাব!

হ্যাঁ, সত্যিই তখন আমি জোরে-জোরেই শ্বাস নিচ্ছি। জানি শয়তানটা এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ে। তখন যদি আমার মুখখানা তোমরা দেখতে, নিশ্চয়ই তোমাদের করুণা হত। তোমরাও হায়-হায় করে বলে উঠতে, গেল, গেল, ছেলেটো গেল!

কিন্তু অত সহজে যাওয়ার ছেলে আমি নই। তাই যেই না—জাগুয়ারটা একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, আমি দিয়েছি চোঁচাঁ দৌড়। ব্যস! হল উলটো বিপত্তি। আমার ছুট দেখে জাগুয়ারটাও মারল লাফ। সটান আমার মাথা টপকে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার পথ আটকে। দাঁড়াক। আমি আবার উলটো দিকে দিলুম ছুট। পলকে সেও লাফাল। আমার পথ আটকাল। তারপর তেড়ে এল। কিন্তু ধরল না তখনও। আমি তার তাড়া খেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরপাক খেতে লাগলুম। কিন্তু কতক্ষণ ঘুরপাক খাব! কতক্ষণ আমার দম থাকবে! এইবার আমায় মরতে হবে।

আশ্চর্য! ঠিক এই সময়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। কোথায় ছিল একটা সোনালি ঈগল। আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাগুয়ারের পিঠের ওপর। খামচে দিল নখ দিয়ে। আচমকা খামচানি খেয়ে জাগুয়ারটাও লাফিয়ে উঠল। অমনই ঈগলটা তার মাথায় দিল ঠোঁটের ঠোক্কর। যন্ত্রণায় গর্জে উঠল জাগুয়ারটা। এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে সে ঈগলটাকে ধরার জন্য

তাক করতে লাগল। কিন্তু আকাশের পাখিকে ধরা কি অত সোজা! নখের খোঁচা আর ঠোঁটের ঠোক্কর খেয়ে রক্তে গা ভেসে গেল জাগুয়ারের। তার মাথা গেল বিগড়ে। এবার ঈগলটা আবার যেই তাকে আঘাত করতে গেছে, অমনই জাগুয়ারটা আচমকা মেরেছে এক ল্যাজের ঝাপটা। ঈগলটা ছিটকে পড়ল। ফেঁসোর মতো হাওয়ায় ভেসে গেল তার গায়ের পালক। ঈগল আবার উঠল। পলকে সে আবার আঘাত করার জন্য ঝটাপটি লাগিয়ে দিল। তাই না-দেখে জাগুয়ারটা মারল লাফ। তারপর দে-লম্বা। কোথায় যে গেল আর দেখা গেল না।

আমি ছুটে গেলুম ঈগলটার কাছে। হাঁপাচ্ছে। তুলে নিলুম। বোধ হয় ল্যাজের ঝাপটায় পায়ে আঘাত লেগেছে। আমি তাকে বুকে নিয়ে ছুটে চললুম। কোথায় একটু জল পাওয়া যায়! না, ঈগলকে বাঁচাতেই হবে! আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করেছে ঈগল। তাকে বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণ যায়, যাক। আমি তাই ঈগলকে বুকে নিয়ে বনের ঝোপঝাড় ডিঙোতে লাগলুম। একটু জলের জন্য। তারপরেই আমি শুনতে পেলুম জলের ঝরঝরানি। কান পেতে ওই ঝরঝর শব্দ শুনি, আর ছুটি। যতই ছুটি, ততই যেন শব্দ এলোমেলো হয়ে যায়। কই জল? কোনদিকে? শব্দ যেন চারদিক থেকে ছুটে আসছে। অথচ জলের চিহ্ন নেই। এ কী ধাঁধায় পড়লুম। আমি দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি। একটু জল। ঈগলের জন্য। না, আমি আর পারছি না। আমার পা টলমল করছে। আমার মাথায় যেন চক্কর লেগে গেছে। আমি বসে পড়লুম। ঈগলকে বুক থেকে নামিয়ে পাশে রাখলুম। তারপর অনেকক্ষণ হাঁসফাস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগলুম। তখন আর কিছুই মনে পড়ছিল না। ভারী কষ্ট হচ্ছিল।

॥ ৯ ॥

কতক্ষণ অমনই করে পড়ে ছিলুম বলতে পারব না। হঠাৎ যখন মনে হল, আমি বোধ হয় ঘুমোচ্ছিলুম, তখনই চোখ খুলেছি। চোখ খুলতেই কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। এ যে অন্ধকারে সারা বন ঢেকে গেছে! কিচ্ছু নেই, কেউ নেই। নেই সেই ঈগলটাও। তখন যে একটার পর একটা অতসব কাণ্ড ঘটে গেল, তার একফোঁটা চিহ্নও অন্ধকারে ঠাহর করতে পারছি না। এ তো ভারী তাজ্জব কাণ্ড! বসে-বসে আমি অন্ধকার হাঁটকাতে লাগলুম। আর ভাবতে লাগলুম সেই ঈগলের কথা। কোথা থেকে উড়ে এল জানি না। কেন আমায় বাঁচাল, তা-ও জানি না। তবে কি আমি স্বপ্ন দেখেছি? সে কি তবে স্বপ্নের ঈগল?

আরে, অন্ধকারে কিসে যেন হাত ঠেকল! খাবার! কে দিল? কে রেখে গেল? কে এমন করে আমাকে দয়া করছে বারবার? আমি অবাক হয়ে ভাবছি। শুধুই ভাবছি। আর খাবারের টুকরো মুখে ফেলছি।

খিদে মিটল বটে। অন্ধকারে কী করব আমি। গাছের গায়ে গাছ গা ঠেকিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আকাশটা পর্যন্ত নজরে পড়ছে না। দল বেঁধে যখন বাবা আর মায়ের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে পথ হেঁটেছি, তখন আকাশ দেখে কেমন করে দিক ঠাহর করতে হয়, শিখেছি। সুতরাং এখন যদি একফালি আকাশও দেখতে পেতুম, তবে বোধ হয় বন থেকে বেরনোর পথের হদিস করা যেত। সত্যি করে বলো তো, তোমরা যদি আমার মতো হঠাৎ অন্ধকার বনে হারিয়ে যেতে, কী করতে? কেঁদেই ভাসিয়ে দিতে, তাই না? বটেই তো! তাবড়-তাবড় জোয়ানদেরও ধাত ছেড়ে যাবে আমার মতো বিপদে পড়লে।

কী করা যাবে! ভয় পেছনে তাড়া করলেও, ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপলে চলবে না আমার। যাহোক করে রাত কাটাবার একটা আস্তানা খুঁজে বার করতেই হবে। এখনও হঠাৎ-হঠাৎ ঈগলটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আহা রে, কে জানে ঈগলটা বাঁচল, না মরল। হয়তো দ্যাখো, বনেরই কোনও জন্তু আহত ঈগলটাকে খেয়ে ফেলেছে। জাগুয়ারটা যে তাকে আবার আক্রমণ করেনি, তাই-বা কেমন করে অবিশ্বাস করি! একটা আহত পাখিকে যে কেউ আক্রমণ করতে পারে, তাতে বাহাদুরির কিছু নেই। কিন্তু বাহাদুর তাকেই বলি, যে জাগুয়ারের মতো একটা হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে লড়ে যেতে পারে। তা-ও কী, লড়াইটা আমার মতো একজন পথের ছেলের প্রাণরক্ষা করার জন্য। সাহস কাকে বলে! কিন্তু আমার জন্যই বা ঈগলের অত দয়া কেন? অথচ, সেই পাখির মুখে আমি একফোঁটা জলও দিতে পারলুম না।

আমি শিউরে উঠলুম! একটা যেন চাপা নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! চকিতে আমি চোখ ফেরালুম। কিন্তু কাকেই বা দেখতে পাব এই জমাট অন্ধকারে! অথচ বুঝতে পারছি নিশ্বাসের শব্দটা কাছে আসছে। স্পষ্ট হচ্ছে। এমন সময়ে একটা গরম হাওয়ার তাপ লাগল আমার গায়ে। হঠাৎ বাজ পড়লে মানুষ যেমন আঁতকে ওঠে, আমারও তাই হল। আমি ধড়ফড় করে পিছু ফিরলুম। আমি ভেবেছিলুম, সেই জাগুয়ারটাই বুঝি পেছনে এসেছে। কই জাগুয়ার! এ যে এক বিকট মূর্তি! যেন একটা দানব। সে চিৎকার করে হেসে উঠল। আমার কানে তালা লেগে গেল। আমি চেপে ধরলুম দু'হাত দিয়ে আমার কান, অন্ধকারে চোখ দুটো তার ভাটার মতো জ্বলছে! মুখের গহ্বরটা লাল টকটক করছে। ঘোর অন্ধকারে কী ভীষণ দেখতে লাগছে।

সে ঝপ করে হাসি থামাল। ছ্যাতলাপড়া দাঁত দু'পাটি কড়মড় করতে লাগল। আমি ঝট করে আমার ঝুলির ভেতর হাত পুরতে গেলুম। ঝুলির ভেতর মূর্তি খোদাই করার হাতুড়ি আর ছেনিটা আছে। ওই হাতুড়ি দিয়ে ওকে আমি আঘাত করব। কিন্তু ঝুলি তো নেই! এদিকে হাতড়াই। ওদিকে হাতড়াই। ঝুলি কই? তবে কি কোথাও পড়ে গেছে। এই যাঃ! এখন কী করি? দানবের মতো ভয়ঙ্কর সেই জীবটা আমার দিকে হাত বাড়াল। আমাকে বুঝি ধরে ফেলে! আমি পালাই! কিন্তু কোথায় পালাই? যেদিকে চোখ যায় সেইদিকেই অন্ধকার। পালাবার পথ দেখতে পাই না। সুতরাং এখন দানবের হাতে আমায় মরতেই হবে। আর আমার যেই মরার কথা মনে হয়েছে, তখনই কে যেন আমার মনের ভেতর চেঁচিয়ে উঠল, "শিজুমন, ভিতুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে মরে, সে মানুষ নয়। মরতে হলে দু' ঘা দিয়ে মরো।"

বুকটা আমার সাহসে ফুলে উঠল। আমি চেঁচিয়ে কড়কে উঠলুম, "শোন রে দানো, ভাল চাস তো যেখানে আছিস সেখানে দাঁড়িয়ে থাক! আর এক-পা যদি কাছে আছিস, আমার হাতে তুই মরবি।"

অমনই আবার হেসে উঠল সেই দানব। সেই হাসিতে আচমকা ঝড় ওঠে। গাছের গায়ে গাছ লুটিয়ে পড়ে সেই হাসির ঝড়ে। গাছে-গাছে পাখ-পাখালি ঝড়ের ধাক্কায় ঘুরপাক খায়। চিৎকার করে। মাটি বোধ হয় কাঁপে। ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি! আমি টাল খেয়ে পড়তে-পড়তে সামলে যাই। মনে-মনে ভাবলুম, যার হাসির শব্দে ঝড় ওঠে, সে আমাকে খামচে ধরলেই আমার কাজ সারা! তবু দমলে চলবে না। তাই, আমি আবার বললুম, "শোন রে, নক্তচর, তোর হাসিতে ঝড় উঠুক, কি মাটি কাঁপুক, আমি ভয় পাই না। আমি যদি এক্ষুনি লাফিয়ে উঠে তোর চুলের গোছা খামচে ধরি, তোর মুণ্ডুখানা উপড়ে যাবে!"

সে এবার আরও জোরে হেসে উঠল। আরও জোরে শব্দ উঠল। মনে হল, কোথায় যেন মাটি ফাটল। যেন পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। বুঝি বাজ পড়ল ! হ্যাঁ, ওই তো বাজ পড়েছে ! বনে আগুন লেগেছে ! ওই তো, দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে বন। বনে আগুন দেখে আমি থরহরিকম্প। এখন কী করি ? আহা রে, গাছগুলো অমন অসহায়ের মতো পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, আর আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব ! এখন তো আমি আগুনের আলোয় দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট সব কিছু ! দেখতে পাচ্ছি সেই দানবটাকেও। সে গর্জে উঠল, "ওরে পুঁচকে খোকা, আর পালাবি কোথায় ? ওই আগুনই তোকে পুড়িয়ে মারবে ! আমি এবার মারব টুসকি। তুই উড়তে-উড়তে পড়বি আগুনে। তারপরেই সব শেষ !"

আমিও কম যাই না ! আমিও অগ্নিমূর্তি ধরলুম। বললুম, "যে-আঙুলে তুই টুসকি মারবি রে দানব, সে-আঙুল তোর মচকে ভেঙে দেব !"

"ভাঙ দেখি !" বলে সে যেই টুসকি মারার জন্য আঙুল বাড়িয়েছে, আমিও লাফিয়ে উঠে তাকে ধরতে গেছি। বলব কী, চোখের পলকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে কোথায় যে পালাল, আমি দেখতেই পেলুম না। আশ্চর্য !

কিন্তু এদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দাউ-দাউ করে। বন পুড়ছে। চারদিক আগুনে-আগুনে লাল হয়ে গেছে। বনের পাখি প্রাণের ভয়ে আকাশে চিৎকার করে উড়ছে। বানরগুলো লাফ দিচ্ছে এ-গাছ থেকে ও-গাছে। পালাচ্ছে। কাঠবিড়ালি ছুটছে। যে যেদিকে পারছে। দ্যাখো, সেই হরিণগুলোকে ! দ্যাখো, ভাল্লুকের দৌড়। কোথায় যে কে পালাবে ! হায় রে, আমি যে কী করি ! এই গাছ আমার বন্ধু। ওই হরিণ, বানর, ভালুক, এমনকী ওই ছোট্ট কাঠবিড়ালিও আমার বন্ধু। আমি কেমন করে বাঁচাই ওদের ! আমি চিৎকার করে উঠলুম, "হে আগুনের দেবতা, তুমি দয়া করো ! হে দেবতা, তুমি আমাকে ঝলসে দাও, ওদের রক্ষা করো। আমার প্রাণ নিলে ওরা যদি বাঁচে, তবে তুমি আমার প্রাণ নাও !"

কিন্তু আগুনের দেবতা আমার কথায় কান দিলেন না বুঝি ! আগুন জ্বলছে। লকলক করে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। চিৎকার করি। কাঁদি। এদিক-ওদিক ছুটি। জড়িয়ে ধরি হরিণছানাকে। ওর গায়ে না আগুন লাগে। বুকে তুলে নিই কাঠবিড়ালিকে। আহা ! আগুনের তাপ না-লাগে তার গায়ে। তবু আগুন বাধা মানে না। আমি কেঁদে উঠি, "হে বৃষ্টির দেবতা, আমার মতো ছোট্ট যারা, তাদের চোখে জল দেখলে তুমি খুশি হও। তারা যত কাঁদে, তোমার দয়ায় ততই বৃষ্টি হয়। দ্যাখো হে দেবতা, আমার চোখে জল। আমি উৎসর্গ করছি তোমাকে। তুমি জল দাও, আকাশ ভেঙে জল দাও ! বনের আগুন নেভাও ! আমার বন্ধুদের বাঁচাও !" বলতে-বলতে আমি ছুটি। ছুটতে-ছুটতে আকাশের ওপারে হাত তুলে হাহাকার করি। একটুকরো মেঘ যদি দেখতে পাই।

হায় রে, কই মেঘ ?

আমি আবার আর্তনাদ করি, "হে মেঘের দেবতা, একটু কি দয়া করবে না ? আকাশ কাঁপিয়ে তুমি কি একবারও গর্জে উঠবে না ? তুমি কি ছড়িয়ে দেবে না এই জ্বলন্ত বনের গায়ে বৃষ্টির ঝরনা ?"

আমি জানি না, বৃষ্টির দেবতার কানে আমার কথা পৌঁছল কি না। কিন্তু আকাশের দিকে চেয়ে এখন আর আমি দেখতে পাই না অসংখ্য তারার একটি তারাও। দেখতে পেলুম, বিদ্যুতের ঝলকানি। শুনতে পেলুম, মেঘের গর্জন। আমার কান্না-ভেজা চোখের পাতায় একটি-দুটি ফোঁটা। আমি আকাশের দিকে হাত তুলে আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম। আমার চোখের জল এখন যেন খুশির কান্না হয়ে আমার গাল ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে যেন বাঁধ মানে না। আমার চোখ কান্নার জলে যতই ভেসে যায়, বৃষ্টির ফোঁটাগুলি ততই যেন অঝোরে উপচে পড়ে বনের গায়ে-গায়ে। মাটিতে। আমি দেখতে পাই আগুনের সঙ্গে বৃষ্টির লড়াই। এ লড়াইয়ে কে জিতবে সবাই জানে। তবু শেষ অবধি লড়ে গেল আগুন। পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেল বনের কত গাছ। গাছে-গাছে পাখিদের কত ঘরকন্না। কত প্রাণ। কত প্রাণী।

আশ্চর্য, আগুন তো হারল, কিন্তু বৃষ্টি তো এখনও থামল না। সে তো ঝরেই চলেছে। একটানা। ঝমঝম। আমার অবস্থাটা দ্যাখো ! দ্যাখো, বৃষ্টিতে ভিজে কী দুর্গতি হয়েছে। কাঁপছি ঠকঠক করে ঠাণ্ডায়। কোথায় দাঁড়াব ? কোথায় দাঁড়িয়ে মাথাটা বাঁচাব ? আচ্ছা, থামো না ! আর তো বৃষ্টির দরকার নেই। দেখতে তো পাচ্ছ আগুন নিভে গেছে।

বয়ে গেছে বৃষ্টির। সে ঝরেই চলেছে। যেন আর কোনওদিন থামবে না। অগত্যা আমাকে আবার চিৎকার করতে হল, "হে বৃষ্টির দেবতা, তোমার দয়ায় আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বন। এবার তুমি যদি দয়া করে থামো, আমি রক্ষা পাই।"

আমার যেন মনে হল, আমার কথা শুনে বৃষ্টির ফোঁটারা ঝমঝম করে চেঁচিয়ে উঠল :

আকাশের দূর দূর
মেঘ ডাকে গুড় গুড়
দেবতার খুশিমতো ঝরছি,
তোমাদের কান্নায় জৌলুস পান্নায়
বৃষ্টির ফোঁটাগুলি গড়ছি।
কই দিলে দক্ষিণা ?
সোনা দানা ? ছি ছি ছি না
শুনে রাখো দাও তুমি বলি যা,
দেবতাই নিজে কন
পেলে তিনি খুশি হন
দাও যদি তোমার কলিজা।

বৃষ্টির এই সর্বনেশে কথা শুনে আমি থমকে দাঁড়াই। বুঝতে পারি বৃষ্টির দেবতার আমি এখন নজরবন্দি। তিনি আমার হৃৎপিণ্ড চান। এখানে, এখন আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমার হৃৎপিণ্ড তাঁর চাই-ই। নইলে, বৃষ্টি তো থামবেই না। এমনকী আমি যেখানে যাব, সেইখানে বৃষ্টিও আমাকে ধাওয়া করবে। বৃষ্টির জলে ভিজে-ভিজে আমার প্রাণ শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য, এখন যদি মাথা বাঁচাবার মতো একটা ঠাঁই পেতুম, তবে হয়তো লড়াই করা যেত বৃষ্টির দেবতার সঙ্গে। কিন্তু সে-ঠাঁই কোথায় বা খুঁজে পাই এই দুর্যোগে ! কাজেই আধপোড়া এই বনের গাছগাছালির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি বৃষ্টির জলে ভিজতে লাগলুম। আচ্ছা বলো তো, দেবতারা আমাদের মতো ছোট-ছোট ছেলেদেরই কেন প্রাণ চান। অবাক লাগে ভাবতে। কী অন্যায় লোভ। যেসব দেবতা রক্ত ছাড়া তুষ্ট হন না, তাঁরা কেমন দেবতা ! কী দরকার সেসব দেবতার পুজো করে !

থাক সে-কথা। আমি জানি না, কখন ভোর আসবে। আরও কতক্ষণ এই বৃষ্টির জলে আমায় ভিজতে হবে তাও আমি জানি না। বৃষ্টি যে থামবে না, সে তো বৃষ্টিরাই আমায় জানিয়ে দিল। আমিও যে প্রাণ দেব না, এ-কথা চিৎকার করে বৃষ্টিদের বলা হয়নি। কিন্তু মন আমার বারবার বলতে চাইছে, "হে দেবতা, ক্ষমতা থাকে আপনি আমাকে বৃষ্টির জলে ভিজিয়ে মারুন ! ভাববেন না আমি নিজের ইচ্ছেয় বুক পেতে দেব। বুক পেতে কখনওই বলব না, এই আমার প্রাণ। আমি আপনাকে উৎসর্গ করলুম। আমি লড়াই করব আপনার সঙ্গে। চিৎকার করে বলব,

আমি আপনাকে ভয় পাই না।"

ওই দ্যাখো, রাতের আকাশটা যেন একটু-একটু ফরসা হচ্ছে। জানি তো, সূর্য উঠবে না। মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে অঝোরে ঝরেই যাবে বৃষ্টি। বৃষ্টি ঝরুক। তবু তো অন্ধকার কাটবে। রোদের ঝিলিক নাই থাক। চোখের দৃষ্টি দিনের ঝাপসা আলোয় পথ চিনে ঠিক চলতে পারবে।

আলো ফুটছে। বৃষ্টি ঝরছে। আমি ভিজছি। ভিজতে-ভিজতে হাঁটছি। আমার চোখের ওপর ভেসে উঠছে আগুনে পোড়া ধ্বংসের ছবি। আমি অবাক চোখে দেখতে-দেখতে দাঁড়াচ্ছি। ভাবছি, আহা, কাল যারা হাওয়ায় দুলে-দুলে পাতার ঝুমঝুমি বাজিয়েছে, আজ আর তাদের অনেকেই নেই। গাছের পোড়া কঙ্কালগুলো বৃষ্টির জলে ভিজছে। মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমি চান করছি।

হ্যাঁ, এখন আলোয় স্পষ্ট হয়েছে চারদিক। আমি দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে দূরে, আরও খানিক দূরে আগুনের কোনও চিহ্ন নেই। আগুন পৌঁছতে পারেনি ওখানে। এখনও ওখানে গাছেরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওইদিকেই এগিয়ে চললুম। তোমাদের কি মনে আছে শিল্পসৃষ্টির দেবতা আমাকে একটি পোশাক দিয়েছিলেন? মনে আছে, সেটি কিসের তৈরি পোশাক? ভুলে গেছ নিশ্চয়ই। সেটি উড়ন্ত সাপের পালকের পোশাক। এখন কী দুর্দশা হয়েছে সেই পোশাকের! দেখলে, চিনতেই পারবে না। পোশাকটা যে খুলে ফেলব, তারও জো নেই। খালি গায়েই ভিজতে হবে।

উফ! কী কাণ্ড! হঠাৎ ঝড় উঠল! উরিব্বাস, মনে হচ্ছে, বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের যুদ্ধ লেগে গেছে! ঝড় যেন কোথা থেকে উড়ে এসে বৃষ্টির দফারফা করে দিচ্ছে!

ঠিক বটে! ছাঁত করে উঠল আমার বুকের ভেতরটা। মনে হল, হ্যাঁ, এটা তো যুদ্ধই বটে! আমার ভালবাসার সেই শিল্পসৃষ্টির দেবতা, তিনি তো ঝড়েরও দেবতা! তিনি আমাকে বাঁচাবার জন্য বৃষ্টির দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন না তো!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখো, বৃষ্টিভরা মেঘগুলো ঝড়ের দাপটে কেমন উথাল-পাথাল করছে! বৃষ্টির ফোঁটারা ঝড়ের আঘাতে ছত্রাকার হয়ে এদিকে-ওদিকে ঝাপটা মারছে! বৃষ্টির ঝরঝর শব্দটা যেমন ভয়ঙ্কর, তার চেয়েও ভীষণ ঝড়ের শোঁ-শোঁ গর্জন। আমাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়!

এ কী! হঠাৎ শিলাবৃষ্টি শুরু হল যে! কোথায় পালাই? কার আড়ালে মাথা বাঁচাই? শিলাবৃষ্টির সঙ্গে তো আর যুদ্ধ করা যায় না! কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম, ঝড় আর এখন শুধুই ঝড় নয়। ঘূর্ণিঝড়। সেই ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে আমিও ঘুরতে লাগলুম। আর আকাশভাঙা পড়ন্ত শিলার আঘাতে জেরবার হয়ে হাঁপাতে লাগলুম। আমি যে আর সহ্য করতে পারি না!

বলতে-বলতেই একটা মস্ত শিলা আমার মাথায় এসে পড়ল। আমি যেন চোখে অন্ধকার দেখলুম। আমি শত চেষ্টা করেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। আমি লুটিয়ে পড়লুম। তারপর আর কিছুই মনে নেই। বোধ হয় আমি জ্ঞান হারালুম।

॥ ১০ ॥

হঠাৎই আমার জ্ঞান ফিরেছিল। কত পরে, আমি বলতে পারব না। চোখ খুলে তাকিয়ে আমি অবাক! কই সেই বন! কই বৃষ্টি, ঝড় আর শিলা! শুকনো খটখটে পাথরের ওপর আমি শুয়ে আছি। আমার সেই ভিজে শপশপে পোশাকটা শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে। আমি উঠে বসবার চেষ্টা করলুম। আকাশের দিকে নজর পড়ে গেল। আকাশ আলোয় উছলে আছে। আমি উঠে বসলুম। চারপাশটা ঠাহর করার চেষ্টা করলুম। কিছুই চিনতে

পারলুম না। চিনতে পারলুম, চারদিকে শুধুই পাহাড়। আমি পাহাড়ের চুড়োয় শুয়ে আছি। কে আনল আমায়, এখানে? শুনতে পাচ্ছি ঝরনার ঝরাপাত। দেখতে পাচ্ছি এধারে-ওধারে দু-একটা পাইন গাছ। এখানে বনও নেই, পাখিও নেই। শুধু রোদ। ছড়িয়ে আছে আমার সারা গায়ে। ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের মাথায়। তুষারের গায়ে। তবে কি শিল্পসৃষ্টির দেবতা আমাকে এখানে নিয়ে এলেন? আমার শিহরন লাগল। আমি উঠে দাঁড়ালুম।

এ কী! এখানেও কে খাবার দিয়ে গেল! সেই একই রকম, একই খাবার! যেন আমার ধাঁধা লেগে যাওয়ার গোত্তর। বারবার এ কার ভেলকি দেখছি আমি? খিদে যে আমার পায়নি, তা নয়। কিন্তু আমি তো কারও কাছে 'খেতে দাও' বলে কেঁদে ভাসাচ্ছি না! তবে? তবে কে আমায় এমন যত্ন করে খাবার দিচ্ছে?

আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। আমি বসলুম। খাবারের সামনেই। খেয়ে ফেললুম।

এ আবার কী দেখছি! মনে হচ্ছে সেই ঝুলিটা! আমার চোখের সামনে পড়ে আছে। এই ঝুলির ভেতরেই তো আমার পাথর খোদাই করার ছেনি, হাতুড়ি ছিল। দেখি তো! হ্যাঁ, এই তো ঝুলির ভেতরে ছেনি, হাতুড়ি! এগুলিই তো শিল্পসৃষ্টির দেবতা আমাকে দিয়েছিলেন। আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম। তবে কি দেবতাই আবার আমায় ফিরিয়ে দিলেন! আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। দেখতে লাগলুম এই পাহাড়ের চুড়ো থেকে ওই অনেক দূরে উপত্যকার দিকে। তারপর ঝুলিটা কাঁধে ফেলে ভাবলুম, এবার আমি যাব। কোথায় যাব, জানি না। কোথায় গেলে পাথরে খোদাই করা মূর্তির জীবন খুঁজে পাব, তাও জানি না। তবু আমায় পাহাড় থেকে নামতেই হবে। আমি পা ফেললুম।

কিন্তু পাহাড়ের এই চুড়ো থেকে নামবার রাস্তা কই? যেদিকে যাই সেইদিকেই পাথর। পেল্লায়-পেল্লায়। পথ আটকে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। আর, যেদিকে পাথর নেই, সেদিকে খাদ। পাথরও ডিঙোনো যাবে না, খাদই বা টপকাই কেমন করে! এ কী কাণ্ড! কে আমায় এমন বিপদে ফেলল! কেউ কি তবে আমাকে এখানে বন্দি করেছে! আমি নীচের ওই ধু-ধু উপত্যকার দিকে তাকিয়ে প্রাণের ভয়ে চিৎকার করে উঠলুম, "কে আছ! আমাকে বাঁচাও! আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

আমার এই গলার চিনচিনে শব্দ এখান থেকে যে কারও কানে পৌঁছবে না, এ তো সবাই জানে। কিন্তু কে না বাঁচতে চায়! বিপদে পড়ে, মরার আগে কে না বাঁচার জন্য চিৎকার করে! তার ওপর আমার তো এই বয়েস। আমার ভয় পাওয়াটা কি অন্যায়? তাই আমি প্রাণপণে চিৎকার করে "আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও" বলে গলা ফাটালুম। আমার গলা প্রতিধ্বনি তুলছে। পাহাড়ে-পাহাড়ে। কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না। চেঁচাতে-চেঁচাতে আমার গলা ভাঙল। তবুও আমার ভাঙা গলা চিৎকার করেই চলল।

হঠাৎ আমার চিৎকার থেমে গেল। আমি থমকে গেছি। চমকে চেয়ে দেখি, আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে একজন অদ্ভুত চেহারার মানুষ। এইটুকুনি লম্বা। আমার চেয়ে ছোট্ট দেখতে। ঠিক বামনের মতো। মাথাখানা অ্যাত্তো বড়। যত বড় মাথা, ঠিক তত বড় নাক। বড়-বড় দাঁত। তিনি হাসছেন ফিক-ফিক করে। হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে চিনতে পারছিস?"

আমি উত্তর দিতে পারলুম না। ফ্যালফ্যাল করে তাঁকে দেখতে লাগলুম।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে তিনি নিজেই বললেন, "আমার নাম বামন-দেবতা। চারদিকে যত পাহাড় দেখছিস, পাহাড়ের মাথায় যত চুড়ো দেখছিস, এসব আমার। কেউ না এদের ক্ষতি করতে পারে, এটা দেখাই আমার কাজ। আমি পাহাড়ের রক্ষাকর্তা।"

আমি কথা না বলে মাথা নত করলুম।

তাঁর ফিকফিকে হাসিভরা মুখখানা এবার গম্ভীর হল। তাঁর চোখে যেন সন্দেহ। তিনি কথা বললেন, "আমার এমন সজাগ চোখকে ফাঁকি দিয়ে তুই কেমন করে এখানে এলি?"

আমি কথা বলব কী! তাঁকে দেখে ভেতরে-ভেতরে এমন হাসি পাচ্ছে! আমি জানি, কথা বলতে গেলেই আমি হেসে ফেলব। তাই অনেক কষ্টে হাসিটাকে পেটের মধ্যে আটকে আমি তাঁর খাটো-খাটো হাত-পাগুলো দেখতে লাগলুম।

তিনি এবার কড়কে উঠলেন, "আমার দিকে অমন হাঁ করে কী দেখছিস? কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

আমি তাঁর কড়কানি শুনে আঁতকে উঠলুম। আর কথা না-বললেই নয়! আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, "ঠিক জানি না।"

"তার মানে?" তিনি চোখ টেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি উত্তর দিলুম, "তার মানেটা আমিও জানি না।"

তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, "তুই তো ভারী ব্যাদড়া ছেড়ে। মুখে-মুখে তর্ক করিস! যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর না-দিয়ে, আজেবাজে কথা বলছিস! জানিস, এক্ষুনি যদি তোর গালে চড়িয়ে দিই, তুই একটা কুটোর মতো হাওয়ায় উড়ে যাবি!"

এই কথা শুনে আমার যে কী হল, আমি বলে ফেললুম, "আপনার ওই বাঁটকুলে হাত আমার গালেই পৌঁছবে না।"

ব্যস, হল উলটো বিপত্তি। দেবতাদের চেহারার ছিরিছাঁদ নিয়ে যে ঠাট্টা-তামাশা করা উচিত নয়, এটা আমি ভুলেই বসলুম। বামন-দেবতা আমার কথা শুনে তিড়িং করে এমন একখানি লাফ মারলেন যে, আমি আর থাকতে পারলুম না। শেষমেশ হেসেই ফেললুম। তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন। উঠে পড়লেন আর-একটা পাহাড়ের চুড়োয়। সেখান থেকে হাত-পা ছুড়ে তিনি চিৎকার করে আমাকে ধমকাতে লাগলেন, "তোর আস্পর্ধা তো কম নয়! তুই আমার হাত-পা তুলে কথা বলিস! অসভ্যের মতো হাসিস!" বলে তিনি ওই ওপর থেকে আমাকে টিপ করলেন। চোখের নিমেষে দিলেন ঝাঁপ। এই বুঝি পড়েন আমার ঘাড়ে! এই বুঝি ভাঙল আমার ঘাড়! আমি যে একটু সরে দাঁড়াব, তারও ফুরসত পেলুম না। তিনি পড়লেন। ধপাস! যাঃ! পা ফসকে গেছে! আমার ঘাড়ে না-পড়ে তিনি পড়লেন আর-একটা পাথরের ওপর। পড়েই চিতপটাং! নিশ্চয়ই লেগেছে। আমি হাসি থামিয়ে ছুটে গেলুম তাঁর দিকে। ওমা! এ কী! তিনি যে নিজেই সটান উঠে দাঁড়ালেন! আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "লাগল?"

তিনি গা-হাত-পা ঝাড়তে-ঝাড়তে গোঁজ হয়ে বললেন, "দেবতাদের লাগে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "লাগে না কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "দেবতারা দেবতা বলে।"

আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, "দেবতারা কেন দেবতা?"

তিনি এবার তাঁর গোঁজ মুখখানা তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। কী ভাবলেন। তারপর তাঁর একটি ছোট্ট হাত তুলে আমার দিকে আঙুল ছুড়ে বললেন, "দেবতারা তোর মতো মানুষ নয় বলে।" বলেই তিনি হাসলেন, "হা-হা-হা!"

আমি অবাক হয়ে গেলুম। এ কী! এই তিনি হম্বিতম্বি করছিলেন। এখন আবার হাসছেন! শুধুই হাসলে তা-ও কথা ছিল। আমার যেন মনে হল, সেই হাসিতে কেমন একটা ভালবাসা মেশানো।

হ্যাঁ, সত্যিই তো! তিনি আমায় হাসতে-হাসতে ডাকলেন।

আমায় ভালবাসলেন। বললেন, "তোর গায়ে হাত দেওয়া আমার সাধ্যে নেই। আমার কেন, কারও সাধ্য হবে না। কোনও দেবতাই তোর প্রাণ নিতে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোর কপালে আঁকা আছে দেবতার আশীর্বাদ। কে তোকে আশীর্বাদ করেছেন ? কোন দেবতা ?"

আমার মনে পড়ে গেল শিল্পসৃষ্টির দেবতার কথা। আমি তাঁর কথাই বললুম বামন-দেবতাকে। তিনি বললেন, "শিল্পসৃষ্টির দেবতা যাকে আশীর্বাদ করেন, সে তো মানুষেরও সেরা মানুষ।" বলে তিনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আদর করলেন। তারপর আবার বললেন, "আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই কোনও দেবতা তোর অনিষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। তাই কোনও অলৌকিক শক্তি তোকে এই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। ভাল করেছে। আমার কাছে থাকলে তোর আর কোনও ভয় নেই। এই পাহাড়ের চুড়োকে যেমন বুকে আগলে রক্ষা করছি, তেমনই করে রক্ষা করব তোকেও।" বলে তিনি আমার চিবুক ছুঁলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে মাথা রাখলুম।

হ্যাঁ, বামন-দেবতা আমায় আশ্রয় দিলেন সেই পাহাড়-চুড়োয়। আঃ! কী চমৎকার আশ্রয়টি। পাহাড়ের গা ছুঁয়ে উঠেছে অসংখ্য পাইন গাছ। তার নীচে পাথর-ঘেরা আশ্রয় তাঁর। একা থাকেন। তাই ছোট্ট। তা হোক। তারই একপাশে আমার একটু জায়গা হল। তিনি বললেন, "ওরে ছেলে, তোর নাম জানি না। কী তোর নাম ?"

"শিজুমন।"

তিনি বললেন, "শিজুমন, এখানে তোর যখন যা মন চাইবে তুই তাই করিস। কেউ মানা করবে না। আমি তো খুদে, এইটুকু। একটুখানি জায়গা হলেই আমার কুলিয়ে যাবে। তোর জন্য রইল আমার বাকি সবটুকু জায়গা। এখানে কেউ আসবে না। আমার নজরদারি ভারী সজাগ। কারও সাধ্য নেই আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ এখানে হানা দেয়। তবে হ্যাঁ, রোজ সকালে এখানে সূর্য আসেন। আমাকে আলো দেন। চাঁদ ওঠেন পাহাড়-চুড়োর ফাঁকে। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দেন। বাতাস ছুঁয়ে যায় আমাকে যখন-তখন, সর্বক্ষণ। কখনও সে শান্ত। কখনও দুরন্ত। কখনও সে বয়ে আনে মেঘ। নেমে আসে বৃষ্টি। কখনও শিলা, কখনও তুষার।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "হে দেবতা, এখানে পাখি আসে না ?"

তিনি জাঁক দেখিয়ে বললেন, "আসার জো আছে !"

আমি বললুম, "পাখি তো আর পাহাড়ের ক্ষতি করে না।"

তিনি বললেন, "পাখি বড্ড চেঁচায়।"

আমি জবাব দিলুম, "আমিও যদি চিৎকার করি ?"

"তুই তো আর পাখি নোস।" বলে তিনি হাসলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, "দ্যাখ, আমিও চেঁচাই।"

"কেন ?"

তিনি উত্তর দিলেন, "মুখের কাজ তো শুধু খাবার গেলা নয়। আমরা গল্প করি মুখে। হাসি। গান গাই। তা বল, সারাদিন মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকা যায় ? পাখিদের এখানে আসতে দিয়ে লাভ কী ? তারা কি আমার সঙ্গে গল্প করবে ?"

আমি বললুম, "গল্প না করুক, গান তো শোনাতে পারে।"

তিনি বললেন, "চিকির-মিকিরকে তুই গান বলিস ?"

আমি উত্তর দিলুম, "ওই চিকির-মিকিরই আমার ভাল লাগে।"

তিনি বললেন, "আমার কান ঝালাপালা হয়ে যায়।"

আমার মনে হল আর কথা না বাড়ানোই ভাল। যেটুকু আশ্রয় পেয়েছি, তিনি অসন্তুষ্ট হলে সেটুকুও যাবে। কাজেই, আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলুম।

তারপর ? দিন যায়। এক-একদিন তাঁকে আমার এক-এক করে সব কথা শোনালুম, কেমন করে বাবাকে হারিয়েছি। কেমন করে মা হারিয়ে গেল। কেমন করে আশ্রয় পেলুম শিল্পসৃষ্টির দেবতার কাছে। কেমন করে শিখলুম তাঁর কাছে পাথরে মূর্তি খোদাই করতে।

দিন যায়। একদিন তিনি একখণ্ড পাথর এনে দিলেন। বললেন, পাথরে মায়ের মুখ খোদাই করতে। সেই পাহাড়-চুড়োর নির্জনে বসে তাঁরই ইচ্ছেমতো মায়ের মূর্তি খোদাই করি আমি। বামন-দেবতা কখনও আমার পাশে এসে বসেন। কখনও যান অন্য কোনও চুড়োয় নজরদারি করতে। ছোটখাটো এই দেবতার হাঁটা-চলা, ওঠা-বসা দেখলে তুমিও হেসে কুটোকুটি হয়ে যাবে। প্রথম-প্রথম আমার যত হাসি পেত, এখন আর তত পায় না। অনেক সয়ে গেছে। তার ওপর এখন মায়ের মূর্তি খোদাই করছি। অন্য কথা ভাববার সময় কই আমার ! আমার চোখে এখন শুধুই মায়ের মুখখানি ভেসে উঠছে। আমার মা। এই দ্যাখো, পাথরে একটু-একটু করে কেমন আমার মাকে গড়ে তুলছি।

একদিন পাথরে আমার হাতে মায়ের চোখ ফুটল।

দেবতা বললেন, "সুন্দর।"

একদিন মায়ের মুখে হাসি-মাখা ঠোঁটদুটি সাজিয়ে দিলুম।

দেবতা বললেন, "চমৎকার।"

একদিন মায়ের মুখখানি গড়া শেষ হল।

দেবতা বললেন, "অপূর্ব।"

কিন্তু আমার মন ভার হয়ে গেল। আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল মায়ের মুখখানি দেখে। আমার চোখে কান্না ঝরল। মনে পড়ে গেল, আমাদের সেই দিনগুলির কথা। মায়ের হাত ধরে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে পাড়ি দেওয়া। এক গুহা থেকে আর-এক গুহায়। এক দেশ থেকে আর-এক দেশে। সেইদিনই আমার মনে হল, আমি যেন বন্দি হয়ে আছি এই পাহাড়-চুড়োয়। এই নির্জন পাহাড়-চুড়ো যেন বন্দিশালা। কে যেন পাথর দিয়ে ঘিরে রেখেছে আমাকে। আমার দম আটকে আসে ! বন্দিশালা ভেঙে কে আমায় নিয়ে যাবে এখান থেকে ? আমার মন হাঁসফাস করে ওঠে।

একদিন বামন-দেবতা হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, তোর মুখে আর হাসি দেখি না কেন, এখন ?"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারি না। আমি চেয়ে থাকি আকাশের দিকে।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আকাশে কী দেখিস ?"

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আলতোভাবে হাসি।

তিনি ব্যস্ত হন। জিজ্ঞেস করেন, "তোর কী হয়েছে বল তো ?"

আমি এবার বলি, "না, কিছুই তো হয়নি।"

তিনি বললেন, "আমি দেখছি, যেদিন তোর মায়ের ওই মূর্তিটা গড়া শেষ করলি, সেইদিন থেকেই তুই যেন কেমন আনমনা হয়ে গেছিস।"

আমি উত্তর দিতে পারলুম না।

আমায় চুপ থাকতে দেখে তিনি কী ভাবলেন, জানি না। হয়তো আমাকে অবাক করে দেওয়ার জন্যই তিনি আচমকা বললেন, "জানিস, কাল আমি একটা চোর ধরেছি।"

আমি চমকে তাকালুম তাঁর দিকে।

তিনি বললেন, "হ্যাঁ রে ! পাহাড়ের এই চুড়োটার মাথার ওপর চরকি খাচ্ছিল। ভেবেছিল, আমার চোখে ধুলো দেবে ! অত সোজা ! আমি নিঃসাড়ে চুড়োয় উঠে তাকে ধরে ফেলেছি।" বলেই তিনি আমার হাত ধরলেন। আমায় টানতে-টানতে বললেন, "চ', চোরটাকে দেখবি চ'।"

আমি তাঁর সঙ্গে চোর দেখতে চললুম।

এ কার সামনে আমায় নিয়ে এলেন বামন-দেবতা ? এ কী ! এ যে সেই ঈগল ! এই ঈগলই তো জাগুয়ারের সঙ্গে লড়াই করে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল ! হ্যাঁ, হ্যাঁ ! ওই তো তার ডানা দুটি সোনালি পালকে ঢাকা ! ওই তো তার মায়াবী চোখ দুটি আমার দিকে কেমন চেয়ে আছে ! কী করুণ ! এ কী ! তার পা দু'টি যে শেকলে বাঁধা ! পাখি বন্দি ! হায় ! হায় !

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, "এই কি আপনার চোর ?"

"হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছিস না, চোখ দুটো কেমন লোভে টসটস করছে ?" বামন-দেবতা উত্তর দিলেন।

"আপনার কী চুরি করেছে বামন-দেবতা, এই ঈগল ?"

তিনি জবাব দিলেন, "চুরি করেনি। করত।"

আমি আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "হে বামন-দেবতা, আপনার কোন জিনিসের ওপর এই হতভাগ্য ঈগলের লোভের দৃষ্টি পড়েছিল ? আপনার তো মহামূল্য কোনও জিনিসই নেই।"

তিনি বললেন, "চোর কি শুধু মহামূল্য জিনিসই চুরি করে ? কে বলতে পারে, সে আমাকেই চুরি করার ফন্দি আঁটেনি ! মহামূল্য কোনও জিনিসের চেয়ে, দেবতা যে আরও অনেক বেশি মূল্যবান, সেটা কে না-জানে ! আমি তাই ঈগলকে বন্দি করেছি। এই বন্দি অবস্থায় ঈগলকে কিছুই খেতে দেওয়া হবে না। ঈগল না-খেয়ে মরবে, এই আমার শাস্তি।"

আমি চিৎকার করে আপত্তি জানালুম, "না-আ-আ ! আপনি পাখিকে মারতে পারবেন না। এ আপনার অন্যায় বিচার। আকাশ তো আপনার একার নয়। আকাশ পাখিরও। পাখি যদি আকাশে উড়ে ঘুরে বেড়ায় তবে তাকে কেন চোর বলেন দেবতা ? কেন তাকে শাস্তি দেবেন ?"

তিনি আমার চিৎকার শুনে থমকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কঠোর হল। তারপর তাঁর খুদে হাতের একটা খুদে আঙুল তুলে আমাকে শাসালেন, "শোন শিজুমন, তোকে আমি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছি এখানে থাকার জন্য। আমাকে হুঁশিয়ার করার জন্য নয়। আমি দেবতা। আমি যা বলব, সেই হল শেষ কথা। আমার কথার যে অবাধ্য হয়, তার শাস্তি মৃত্যু। আমি ভেবেছিলুম, শিল্পসৃষ্টির দেবতার কাছে তুই ভদ্রতা শিখেছিস। শিখেছিস শান্তশিষ্ট হতে। কিন্তু না। তুই অসভ্যের মতো চিৎকার করে আমাকে ধমকাস ! তোর এই বেয়াদপি আমি সহ্য করব না। শুনে রাখ, ওই ঈগলের সঙ্গে তোকেও মরতে হবে না-খেয়ে। আজ থেকে তোকেও আর কোনও খাবার দেওয়া হবে না। আজ থেকে তোকে আর কোনও মূর্তি গড়তে দেব না আমি। দ্যাখ, তোর মূর্তি গড়ার যন্ত্রগুলো আমি এই ফেলে দিলুম পাহাড়ের খাদে !" বলে তিনি আমার ঝুলিটা টান মেরে ছুড়ে দিলেন। ওই নীচে, যেখানে চোখ যায় না, ঝুলিটা সেখানে গিয়ে পড়ল। একটু শব্দও আমার কানে এল না।

আমি কিন্তু একটুও ভয় পেলুম না দেবতার আদেশ শুনে। আমি বললুম, "হে বামন-দেবতা, আমি মরতে ভয় পাই না। মরব তবু ভাল। তবুও আমি, যে আমার উপকার করেছে তার কথা কোনওদিনই ভুলতে পারি না। শুনুন দেবতা, এই ঈগল একদিন আমাকে এক হিংস্র জাগুয়ারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।"

বামন-দেবতা তেমনই কঠিন স্বরে বললেন, "শোন শিজুমন, কে তোকে জাগুয়ারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, আমি জানি না। কিন্তু যে আমার আকাশসীমা টপকে এখানে দৃষ্টি দিয়েছে, তাকে আমি বন্দি করেছি। তাকে মরতেই হবে। সে চোর। আর সেই চোরের হয়ে যে গুণগান করে, সে-ও চোর। তাকেও মরতে হবে। ঈগলের পায়ে শেকল বেঁধেছি, যাতে সে উড়ে পালাতে না পারে। কিন্তু তোর পায়ে আমি কোনও শেকল বাঁধব না। কারণ

তুই উড়তে পারিস না। আর পায়ে ভর করে যে পালাবি, তেমন কোনও রাস্তাই তোর জন্য খোলা নেই। থাক এখানে পড়ে। অনাহারে একটু-একটু করে শুকিয়ে মরার দিন গোন।" বলে বামন-দেবতা একটা বিশ্রী হুঙ্কার ছেড়ে আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। আর সেই তখন থেকেই না খেয়ে আমি মরবার দিন গুনতে লাগলুম।

তবু ভাল, দেবতা আমাকে বেঁধে রাখেননি। এখনও আমি উঁচু-নিচু পাথর ডিঙিয়ে এদিকে-ওদিকে ঘোরাফেরা করতে পারছি। খাবার না-জুটলে, ক'দিন পরে সে-ক্ষমতাও থাকবে না। বামন-দেবতা যে এমন রাগী, তা আমার এতদিনে একবারও মনে হয়নি। রাগ সবারই হয়। দেবতার তো হতেই পারে। কিন্তু এমন নির্দয় শাস্তি দেওয়াটা কি উচিত কাজ! তা-ও যদি তেমন দোষের কিছু হত! হ্যাঁ, আমি তাঁর মুখের ওপর চিৎকার করেছি। ঠিক কথা, আমি অন্যায় করেছি। আমাকে তুমি যত পারো শাস্তি দাও। কিন্তু ওই নিরীহ পাখিটা? ও কী অন্যায় করেছে যে, তাকে শেকল বেঁধে বন্দি করতে হবে? অনাহারে মারতে হবে?

হঠাৎ মাথার মধ্যে কেমন একটা মতলব উঁকি দিয়ে উঠল। মনে হল, আচ্ছা, আমি কি পারি না ওই ঈগলের বাঁধন খুলে ওকে মুক্তি দিতে! কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলুম আমি। মনটাকে যতই শক্ত করার চেষ্টা করছি, সে যেন বাগ মানছে না। এখনই যেন ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে ওই ঈগলের কাছে। এখনই মুক্তি দেওয়ার জন্য মন আনচান করে উঠছে। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই!

না, দুর্বল হলে চলবে না আমার। ধরা পড়ি পড়ব। মরতে তো হবেই। কিন্তু একটা নিরীহ প্রাণীকে যদি বাঁচিয়ে মরি! হ্যাঁ, সে-প্রাণী ওই ঈগল। তার জন্যই, আমি এতদিন বেঁচে আছি। এ-কথা ভোলা যায়! অবশ্য, বামন-দেবতার চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব শক্ত। তাঁকে ফাঁকি দিতে হলে আমাকে চোরই সাজতে হবে। চোর সেজে ঈগলের প্রাণ বাঁচাতে হবে। এমন চোর কে না হতে চায়!

সেইদিন থেকেই আমি সুযোগ খুঁজি। বামন-দেবতা তো আর শুধু এই পাহাড়ের চুড়োটির দিকেই নজর রাখেন না, তাঁকে নজর রাখতে হয় ওই দূরে-দূরে আরও অনেক পাহাড়ের চুড়োয়। সেখানে তাঁকে রোজ যেতে হয়। যেসব রাস্তায় আমাদের পা ফেলতে ভয়, যেসব পাথরে পা ফেললে আমরা নিশ্চিত মরব, সেইসব পাথরে কেমন অক্লেশে পা ফেলে বামন-দেবতা একটা চুড়ো থেকে আর-একটা চুড়োয় লাফান, তা দেখার। অবশ্য, তিনি যখন লাফান, দেখলেই হাসি পেয়ে যায়! কিন্তু এখন আর হাসি পায় না। মনে হয়, বামন-দেবতাকে অমন গেঁড়িগুড়গুড়ে দেখতে হলে কী হবে, তাঁর পেটের মধ্যে শয়তান বাস করে।

আমার সমস্ত মতলবটাই ভেস্তে যায় বুঝি! কারণ, আশ্চর্য ঘটনা হল, যেদিন তিনি আমাদের শাস্তি দেওয়ার কথা শোনালেন, সেইদিন থেকে তিনি আর অন্য কোনও চুড়োয় নজরদারি করতে যান না। এখন নজরদারি তাঁর আমার আর ঈগলের ওপর। সাধ্য কী, আমি তাঁকে ফাঁকি দিয়ে ঈগলের কাছে যাই! তিনদিন কেটে গেছে। তিনদিনে পেটে কিছু পড়েনি। সারাদিন, সারারাত খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছি। তাঁর পাশে শোয়াও আমার নিষেধ। মরণ এগিয়ে আসছে। ভাবিনি, এমন তিলে-তিলে তিনি আমাকে মারবেন। কে জানে, তিনদিন না খেয়ে ঈগল এখনও বেঁচে আছে কি না। তার কাছে যাওয়ার তো উপায় নেই। তাই খবর পাওয়ারও কোনও রাস্তা নেই। অবশ্য সে যেখানে আছে, সে-জায়গাটা কোথায়, আমি জানি। বামন-দেবতা নিজেই তো আমাকে নিয়ে গেছলেন চোর দেখাতে। কী অদ্ভুত বিচার বলো, একটা আকাশের ঈগল, উড়তে-উড়তে পাহাড়ের চুড়োর কাছে চলে এসেছে বলে সে হয়ে গেল চোর!

আমার এখন আর একটুও হাঁটাচলা করতে ইচ্ছে করে না। ভালও লাগে না। মনে হয়, পড়ে থাকি পাথরের ওপর। একটু উঠে বসলেই, হাঁপাই। দম আটকে আসে। এমনই করতে-করতে একদিন দম ফুরিয়ে যাবে। সেদিন আর কতদূর? আর যেন পারি না।

আমার শরীরের এই দশা দেখেই বোধ হয় বামন-দেবতা বুঝেছিলেন, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। বুঝেছিলেন, আর কী হবে ছেলেটার ওপর নজর রেখে! ওকে মরতে দাও শান্তিতে। এই ভেবেই বোধহয় সেদিন থেকে তিনি আর আমার ওপর নজর দেওয়ার দরকার মনে করেননি। সত্যিই, সেদিন থেকে তাঁকে আর আমি দেখতে পাই না। না রাতে, না দিনে। দিনে কী করেন জানি না। তবে রাতে যে তিনি আর জাগেন না, জেগে আমায় পাহারা দেন না, সেটা, এত কষ্টের মধ্যেও আমি বুঝতে পারি। কেননা, দু'দিন আগে পর্যন্ত গভীর রাতে তাঁকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেছি। খুটখাট আওয়াজ শুনেছি তাঁর চলাফেরার। তাঁর ড্যাবড্যাবে চোখ দুটোও আর তেমন জ্বলজ্বল করে আমার দিকে একবারও জ্বলে উঠতে দেখি না। কাজেই, মনে হয়, তিনি নিশ্চিন্তেই ঘুমোন এখন। সেদিনও গভীর রাতে তিনি বোধ হয় ঘুমোচ্ছিলেন।

হায় রে! এমন সুযোগ আর আসবে না! এই সময়ে একবার যদি যেতে পারি ঈগলের কাছে! কিন্তু আমি যে একেবারেই থুবড়ো হয়ে গেছি। আমি যে উঠতে পারি না। বসতে পারি না। দাঁড়াবার কথাই ওঠে না। যে উঠতে পারে না, সে আবার দাঁড়াবে কেমন করে! আগেই বলেছি, হাঁপিয়ে উঠি। তবে ঈগলের কাছে যাব কেমন করে! কেমন করে তাকে বাঁচাব? কিন্তু এখনও কি সে বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে তবেই তো বাঁচানোর কথা ওঠে! সে যাই হোক, তবু যদি একবার যেতে পারতুম ঈগলের কাছে!

কী করে যে হঠাৎ আমার মন শক্ত হয়ে উঠল! আশ্চর্য! সেই রাতেই আমি সেই উঁচু-নিচু পাথরের এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর পাক খেয়ে গড়াতে লাগলুম। উফ! কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে! তা হোক। এই সুযোগ। আমাকে ঈগলের খোঁজ নিতেই হবে। একবার করে পাক খাই, অনেকক্ষণ থামি। দম নিই। আবার পাক খাই, গড়িয়ে চলি। এমনই করে গড়াতে-গড়াতে ঈগলের কাছে যাওয়ার পথ খুঁজি। অন্ধকারে। সে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা, এখন তা কাউকে বোঝাতে পারব না।

হ্যাঁ, আমি অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়েছিলুম ঈগলের সেই আস্তানা। দেখতে পেয়েছিলুম ঈগলকে। অবাক কথা, দেখি সে বেঁচে আছে। আমায় দেখতে পেয়েই অস্থির হয়ে সে ডানা ঝাপটাতে লাগল। মনে হল না, খেতে না পেয়ে সে আমার মতো মরতে বসেছে! আমি তার একেবারে মুখের সামনে পৌঁছে গেলুম। তার পায়ের দিকে নজর পড়ল আমার। তার পায়ে গলানো লোহার আংটা। সেই আংটার সঙ্গে লোহার শেকল জড়ানো। সেই শেকল গাছের সঙ্গে বাঁধা। আমার শক্তি নেই এই লোহার শেকল আমি খুলি। মরবার আগে মানুষের কতটুকুই বা শক্তি থাকে! যেটুকু শক্তি আছে, সেটুকু দিয়েই আমি ঈগলের বন্দি পায়ের আংটা দুটো টানামানি করতে লাগলুম। লাগছে তার। বুঝতে পারছি। তবু তার গলায় একটুও কষ্টের শব্দ শুনতে পাই না।

আমি কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করেছি, জানি না। ওই দ্যাখো, তার একটা পায়ের আংটা খুলে গেছে! আমি আনন্দে হাঁপাতে লাগলুম। আর-একটা পা খুলতে পারলেই ঈগল মুক্তি পাবে। আমি আবার টানামানি শুরু করে দিলুম। খোলে না। বারবার টানি। তবু খোলে না। শেষমেশ ওই শীতেও আমি ঘেমেনেয়ে গেলুম। তবুও পারলুম না। আমি হেরে গেলুম। আমার সারা

শরীর কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। খাটুনির এত কষ্ট কি আর সহ্য করা যায় এই শরীরে! আমি কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লুম। আমার হাত নড়ে না। চোখ বুজে আসে। কিছুই মনে পড়ে না। সব ভুলে যাই। সব। এমনকী, ঈগলের কথাও।

॥ ১১ ॥

কেমন করে আমার আবার সব মনে পড়েছিল, খেয়াল করতে পারি না। কেমন করে চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলুম, তা-ও মনে নেই। কিন্তু চোখ তাকিয়েই আমি হকচকিয়ে গেছি। দেখলুম, আমি শুয়ে আছি নরম মাটির ওপর। গাছে-গাছে ঢাকা চারদিক। আমি ধড়ফড় করে উঠতে গেলুম। পারলুম না। আমার শক্তিই নেই। আমি যে চিৎকার করে কাউকে ডাকব, সে-ক্ষমতাও নেই আমার। আমি অসহায়ের মতো পড়ে রইলুম। এখন আমি আবার ভাবতে পারলুম। মনে পড়ে গেল সেই বামন-দেবতার কথা। কোথায় গেলেন তিনি! আমিই বা কোথায় এসেছি! কে নিয়ে এল এখানে, আমায়?

আমি উঠে বসবার চেষ্টা করলুম। কোথায় এসেছি, সে-জায়গাটা তো একবার দেখা দরকার। উঠে বসার মিছেই চেষ্টা। আমি পড়ে-পড়েই মাথা তুললুম। উঃ। পারা যায় না। মাথার ভেতরটা টনটন করে ওঠে। মাথা বুঝি খসে পড়ে মাটিতে! কিন্তু, ওটা কী দেখতে পেল আমার চোখ! এ যে দেখি, চোখের সামনে আবার সেই খাবার! ঠিক আগের মতো! কে সাজিয়ে রেখেছে! কে আমার বিপদে বারবার আমাকে এমন করে ভালবাসছে! হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বাঁচতে হলে আমায় পেটে কিছু দিতেই হবে। না-খেয়ে এখনও বেঁচে আছি। এর পর আর রক্ষে নেই। তাই অনেক কষ্ট করে হাত বাড়ালুম খাবারের দিকে। হাত পেলুম। শুয়ে-শুয়েই মুখে পুরলুম। যেন চিবোতে পারি না! তবু, কষ্ট করেই চিবোলুম। আঃ, এমনই করে খেতে-খেতে ফুরিয়ে গেল খাবার। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

বেশ ক'দিন, এমনই করে খেতে-খেতে আমার শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। আমি একদিন উঠতে পারলুম। বসতে পারলুম উঠে। একদিন দাঁড়াতে পারলুম। হাঁটতে পারলুম। হাঁটতে পারলুম দাঁড়িয়ে। আর সেইদিন আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, যে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, আমার জন্য রোজ খাবার আনে, তাকে ধরতেই হবে। তাই এই নির্জন বনে তাকে খুঁজি। আমি, একলাটি।

কিন্তু যে লুকিয়ে থাকতে চায়, তাকে কি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়! তবু খুঁজি আঁতিপাতি করে। কার এত দয়া আমার ওপর? তিনি কি মানুষ, না দেবতা? কেন, আমায় দেখা দিতে চান না? এ আমায় জানতে হবে। তবে কি তিনি সেই দয়ালু শিল্পসৃষ্টির দেবতা? তিনিই কি আমাকে চোখে-চোখে রেখেছেন? হবে হয়তো! কেননা, তিনিই যে আমায় আশীর্বাদ করেছেন, কেউ আমার প্রাণ নিতে পারবে না। তাই মরতে-মরতেও আমি বেঁচে আছি।

আরে! আরে! সামনে ওটা কী? পড়ে আছে? হ্যাঁ, এই তো আমার সেই ঝুলিটা। বামন-দেবতা যেটা ওই পাহাড়ের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এর ভেতরই তো মূর্তি গড়ার হাতুড়ি আর ছেনিটা ছিল। দেখি, দেখি, আছে কি না!

কই? ঝুলি তো শূন্য। কোথায় গেল হাতুড়ি আর ছেনি? তা হলে বোধ হয় বামন-দেবতা যখন ছুড়ে দেন, তখনই সেগুলো এধার-ওধার ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে।

এমন সময়ে আচমকা আমার পেছনে কে যেন বলে উঠল, "এই ছেলে, এখানে কী খুঁজছিস, একা-একা?"

আমি ঘাবড়ে গেছি। হন্তদন্ত হয়ে পিছু ফিরে দেখি, আমার সামনে যে-মানুষটি এখন দাঁড়িয়ে আছে, তার পরনের পোশাকটা হুবহু আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া দলের পোশাকের মতো। আমি শিউরে উঠলুম। তবে কি এই মানুষটি আমাদেরই দলের একজন? আমার আর সবুর সইল না। উত্তেজনায় দমবন্ধ হয়ে আসে আমার। আমি প্রায় কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি কি আমাদের যুদ্ধ-দেবতার দলের লোক?"

তার মুখে অন্তরঙ্গ হাসি। সে বলল, "হ্যাঁ।"

আমি প্রায় নেচে লাফিয়ে উত্তর দিলুম, "আমিও ওই দলের।"

সে বলল, "তাই তোর মুখখানা চেনা-চেনা লাগছে।" বলে ভাল করে দেখল আমায়।

আমার উত্তেজনায় দমবন্ধ হয়ে আসে।

সে হাসতে-হাসতেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুই আমাকে চিনতে পারছিস?"

আমি খানিক বোকার মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। চেনবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।

সে বলল, "আমি কিন্তু তোর নাম জানি। শিজুমন, তাই না?" বলে ফিক করে হাসল।

আমার গায়ে কাঁটা দিল। আমার নিজের দলের একজন মানুষের দেখা পেয়ে আমার সাহসে বুক ফুলে উঠল। আমি তাকে বললুম, "আমার নামটা তুমি ঠিক বলেছ।"

সে জিজ্ঞেস করল, "তুই এখানে এলি কেমন করে?"

আমি খুশিতে উছলে বলে উঠলুম, "সে-ও এক মস্ত ঘটনা। আমি তোমাকে সব বলব। আগে তুমি বলো, তুমি এখানে এলে কী করে!"

সে বলল, "সে-ও এক মস্ত গল্প। বলতে অনেক সময় লাগবে।"

সে আমাকে জিজ্ঞেস করার আগেই আমি তাকে বললুম, "আমি এখন একা।"

সে বলল, "তা-ও জানি। তোর বাবা তুষারঝড়ের কবলে পড়েছিল। তোর মা পড়েছিল অনিষ্টের দেবতার ভেলকির কবলে।"

আমি তার মুখের দিকে আবার একবার অবাক হয়ে তাকালুম। তারপর বললুম, "তুমি তা হলে সবই জানো।"

লোকটি উত্তর দিল, "নিজের দলের খবর কে না রাখে!"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "আমাদের দল এখন কোথায় আছে?"

সে বলল, "আমিও জানি না। আমি তাদের খুঁজছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তুমিও তা হলে হারিয়ে গেছ?"

সে উত্তর দিল, "যুদ্ধে আমি বন্দি হয়েছিলুম। আমার বাঁচার কোনও কথাই নয়। যেখানে আমাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, সেটা ছিল একটা গুহা। সেখান থেকে বেরোবার কোনও রাস্তাই আমার জানা ছিল না। যারা আমায় বন্দি করেছিল, তারা বোধ হয় ভেবেছিল, গুহা-দেবতার সামনে আমায় হত্যা করবে। কিন্তু তাদের মতলব কাজে এল না। হল কী, যেদিন আমাকে হত্যা করা হবে, ঠিক তার আগের দিন পাহাড়ে হঠাৎ ধস নামল। গোটা পাহাড়টা যেন মাটির ওপর মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়ল। আমার সেই বন্দি গুহাটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমার ভাগ্য বলতে হয়। আমি বেঁচে গেলুম। পালিয়ে যাওয়ার পথ খুলে গেল আমার। আমি দৌড় মারলুম। দৌড়তে-দৌড়তে এইখানে চলে এসেছি। বলতে পারিস লুকিয়ে আছি। এবার এখান থেকেও পালাতে হবে।"

আমি বললুম, "বলো তো, আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি।"

সে বলল, "সে তো ভালই হয়। দু'জনে একসঙ্গে খুঁজব আমাদের দলটাকে। খুঁজে পেলে দলের সঙ্গে মিশে যাব। তার

ওপর, তুইও যেমন একা, তেমনই আমিও। দু'জনে একসঙ্গে থাকলে আমি তোকে দেখতে পারি। তুইও আমাকে দেখতে পারবি। বিপদের কথা তো কিছুই বলা যায় না।"

কথা বলতে-বলতে আমরা অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছি। যতই এগোচ্ছি, ততই কেমন যেন গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছি। তা হোক, কিন্তু আমার এখন আর তত ভয় নেই। যতই হোক নিজের দলের মানুষের দেখা পেয়েছি। এটা কি কম কথা! আমার শতগুণ সাহস বেড়ে গেছে।

কতক্ষণ হাঁটছি, বলতে পারব না। তবে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু আমার সঙ্গীটির যে কষ্ট হচ্ছে, সেটা তার চলন দেখেই বুঝতে পারছি। সে খানিক হাঁটছে। খানিক দাঁড়াচ্ছে। থেকে-থেকে হোঁচট খাচ্ছে। তার এই অবস্থা দেখে আমিই তাকে বললুম, "তোমার বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে।"

সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, অনেকক্ষণ হাঁটছি তো!"

"একটু বসলে তো হয়।" আমি বললুম।

সে জবাব দিল, "যেখানে-সেখানে বসা যায় না। বিশেষ করে অচেনা জায়গায়। কোনখান দিয়ে কখন বিপদ আসে, কে বলতে পারে। একটা নিরাপদ জায়গা না-পেলে বিশ্রাম নেওয়ার কথা ভাবছি না আমি।"

আমি উত্তর দিলুম, "আমার অবশ্য কষ্ট হচ্ছে না।"

সে বলল, "তুই তো এখনও ছেলেমানুষ। আমার তো বয়েসটা কম হল না!"

আমি তার মুখে বয়েসের কথা শুনে তার মাথার দিকে তাকালুম। তারপর বললুম, "অবশ্য এখনও তুমি বুড়ো হওনি।"

সে হাসল। বলল, "মাথার চুল দেখে বলছিস?"

আমিও হাসলুম।

আমার হাসি শেষ হয়নি। সে আচমকা বলল, "ওটা কী বল তো?" বলে আঙুল দেখাল।

আমি অনেক গাছের ফাঁক দিয়ে একটা পাথরঘেরা আস্তানা দেখতে পেলুম। একেবারে ঝোপঝাড়ে ভর্তি ওই দিকটা। আমি বললুম, "চলো, দেখি।"

হাঁটা দিলুম।

এবার হাঁটাটা খুব সহজ হল না। কেননা, অনেক প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর পথ আটকে পড়ে আছে। তার ওপর কাঁটা-ভর্তি ঝোপঝাড়। পাথর টপকানো যেমন কষ্টের, তেমনই কষ্ট ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে চলা। আমার পায়ে দু-একটা কাঁটা ফুটেও গেল। যাক। জানি তো, ওই সামনের পাথরটা কোনওরকমে পেরোতে পারলেই কেল্লাফতে। একেবারে আস্তানাটার সামনে।

আশ্চর্য, যতটা ভয় পেয়েছিলুম, মোটেই ততটা নয়! সামনের পাথরটা আমরা খুব সহজেই টপকে গেলুম। একেবারে মুখোমুখি পড়লুম আস্তানাটার। চারদিকে পাথর। এমনকী, ছাদটা পর্যন্ত পাথর দিয়ে ঢাকা। গুহায় বাস করে যেসব মানুষ, এমন আস্তানা তো তাদের কাছে স্বর্গ। আমি এদিক-ওদিক না দেখেই সিধে সেই পাথরঘেরা জায়গাটার ভেতরে ঢুকে পড়লুম।

পরক্ষণেই আমি চমকে উঠেছি। একটা কানফাটা শব্দ। আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি। চোখের পলকে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। দেখি কী, অনেক কষ্টে এইমাত্র যে-গহ্বরে ঢুকেছি, সেই গহ্বরের মুখে একটা পাথর গড়িয়ে পড়েছে। আমার বেরিয়ে যাওয়ার পথ আটকে গেছে। আমি চিৎকার করে উঠলুম, "বাঁচাও-ও-ও!"

কিন্তু কে বাঁচাবে? সেখানে আমি ছাড়া তখন আর মাত্র একটি প্রাণী। তার কী ক্ষমতা এই পাথর নড়ায়! তবু আমি পাথরের গায়ে-গায়ে আঘাত করতে লাগলুম। আঘাত করে আর্তনাদ করতে লাগলুম, "আমায় বাঁচাও-ও-ও! বাঁচা-ও-ও!" আমি এদিকে ছুটি, ওদিকে যাই। ভয়ে ছটফট করি। পাথরে ঠেলা মারি। নড়ে না পাথর। আমি যেন বন্দিশালায় আটকা পড়েছি। এই বন্দিশালায় একটা পাথরের গায়ে যেখানে আর- একটা পাথর ছুঁয়ে আছে, সেখানে ছোট-ছোট ফোকর দেখা যাচ্ছে। সেখান দিয়ে আলো আসছে। আমি সেই ফোকরে চোখ গলিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলুম আমার সেই দলের মানুষটিকে, "ও দাদা, আমায় বাঁচাও!"

"হা-হা-হা!" হঠাৎ আমি হাসি শুনতে পেলুম। তারপরেই ফোকরে রাখা চোখ দিয়ে আমি দেখতে পেলুম, এক ভয়াবহ দৃশ্য। দেখতে পেলুম, আমাদের সেই অনিষ্টের দেবতা হা-হা করে হাসছেন। আমি ভয়ে দলা পাকিয়ে গেলুম। আর দেখতে পারলুম না সেই দৃশ্য।

কিন্তু শুনতে পেলুম, অনিষ্টের দেবতা আমাকে শাসাচ্ছেন, "এতদিন তুই আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিস। আজ ধরা পড়েছিস। শিল্পসৃষ্টির দেবতা তোকে আশীর্বাদ করেছেন, তোর প্রাণ কেউ নিতে পারবে না। হ্যাঁ, তাঁর আশীর্বাদের জন্যই তোর গায়ে আমি হাত দিতে পারিনি। নইলে কবেই তোকে মেরে ফেলতুম! আজও তোর গায়ে আমায় হাত দিতে হল না। ছদ্মবেশে, তোর দলের লোক সেজে আমি তোকে বোকা বানিয়েছি। এখন তুই বন্দি। এ-বন্দিদশা তোর কোনওদিন ঘুচবে না। এই নির্জন জঙ্গলের এইখানে কেউ কোনওদিন আসবে না। কেউ কোনওদিন জানতেও পারবে না, শিজুমন নামে একটা ছেলে এই মস্ত-মস্ত পাথরের আড়ালে বন্দি হয়ে আছে। কেউ তোকে খেতে দেবে না। এককোঁটা জলও পাবি না। কেউ তোকে নিজের হাতে মারবে না। আমাকেও মারতে হল না। কিন্তু খিদে-তেষ্টার জ্বালায় তুই নিজে-নিজেই মরবি। তিলে-তিলে। তুই আর দেখতে পাবি না কোনওদিন কাউকে! আমাকেও না। আমি তোর হৃৎপিণ্ড খেতে চেয়েছিলুম। দিসনি। এবার শাস্তি ভোগ কর না খেয়ে। হা-হা-হা! হা-হা-হা।"

সে প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে তার হাসি মিলিয়ে গেল। তারপরে সব নিস্তব্ধ।

॥ ১২ ॥

আমি এখন একা। ভয়ঙ্কর একা। এমনই এক ভয়ঙ্কর বিপদ নিয়ে আমার শুরু হল আর-এক জীবন। মস্ত-মস্ত পাথরের চাঁইগুলো আমায় ঘিরে আছে। অসহায়ের মতো এই পাথরে মাথা ঠেকিয়ে আমার মতো একজন ছোট্ট ছেলে কাঁদছে। আর ভাবছে, কী হয় মানুষের মরে গেলে?

আমি অনেকক্ষণ থমকে বসে রইলুম। অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলুম এলোমেলো কত কথা। ভাবতে-ভাবতে এমনই আনমনা হয়ে গেলুম যে, কখন দিনের আলো চলে গেছে, খেয়াল করতে পারিনি। খেয়াল করব কেমন করে! কারণ, যেখান দিয়ে দিনের আলো আসছিল, মানে, ওই পাথরের ফোকরগুলোর দিকে, আমার নজরই পড়েনি।

হঠাৎ যখন চমক ভাঙল, তখনই আমার দৃষ্টি পড়ল ওই ফোকরগুলোর দিকে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলুম। একটার পর একটা অনেক ফোকর। চোখ রাখি একটার পর একটাতে। বাইরে অন্ধকার। হঠাৎ এই ফোকরটার কাছে এসে থতমত খেয়ে যাই। আমার চোখের সামনে খাবার। কে সাজিয়ে রেখেছে ফোকরের পাথরের ওপর! কে রেখে গেছে জল! কে আমায় বারবার এমন করে ভালবাসছে! সে জানলই বা কেমন করে আমি এখানে বন্দি! সে বোধ হয় আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু কে সে? সে নিশ্চয়ই আমাকে বাঁচতে বলছে। সুতরাং আমায় বাঁচতে হবে। আমি খাবার মুখে দিলুম।

পরের দিন আরও একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। পাথরের ওই ফোকরের একটাতে কে রেখে গেছে আমার সেই মূর্তি

খোদাই করার হাতুড়ি আর ছেনি! আমি অবশ্য সেদিন কুড়িয়ে পেয়েছিলুম শূন্য ঝুলিটা। বামন-দেবতা ঝুলিসুদ্ধু আমার এই হাতুড়ি আর ছেনি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন খাদে। কে খুঁজে এনে দিল! সেই খাদেই কি এই বন্দিশালা! কে আমায় এমন চোখে-চোখে রেখেছে?

এই গহ্বরের বন্দিশালায় কেটে গেল আমার ক'টা দিন আর ক'টা রাত। আশ্চর্য, আমায় একদিনও না খেয়ে থাকতে হয়নি। কে আমায় খাবার দিয়ে যায় রোজই, আমি এখনও তা জানতে পারিনি। সে কখন যে আসে আর কখন যে যায় তারও হদিস করতে পারিনি আমি। একদিন তাকে ধরব বলে তক্কে-তক্কে ছিলুম। কিন্তু পারিনি। সেইদিন থেকে আর চেষ্টাও করিনি। যে দেখা দেবে না, তাকে বন্দিশালায় বসে কেমন করে দেখি! অগত্যা আমি নিরাশ হয়ে বন্দিজীবন কাটাই একা-একা! যদিও মূর্তি গড়ার হাতুড়ি, ছেনি ফিরে পেয়েছি, তবুও আর ভাল লাগে না কিছু করতে। আমি বসে থাকি চুপচাপ। সে যে কী যন্ত্রণা, কাকে বলি!

একা-একা চুপচাপ আমার মতো ছোট্ট ছেলে আর কতদিন থাকতে পারে? অস্থির হয়ে উঠল আমার মন। কী করি! কিছুই ভেবে পাই না। তাই একদিন আনমনে আমি পাথরের ওপর ছেনি বসাই। হাতুড়ি মারি। পাথর ছিটকে পড়ে টুকরো হয়ে কেটে-কেটে। কার মূর্তি খোদাই করব আমি! জানি না। তবু হাতুড়ি পড়ে ছেনির ওপর। পাথর কেটে খসে পড়ে এদিক-ওদিক। আমি থমকে থামি। খসে পড়া পাথরের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে আমি জুলজুল করে দেখতে থাকি। আমার বুকের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে। আচমকা মনে হল, এমনই করে তো ছেনির আঘাতে আমি আমার বন্দি পাথরটা ফুটো করে ফেলতে পারি! আমি তো পারি, সেই ফুটোর ভেতর দিয়ে আমার বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুদে বার করতে! ভাবতে-ভাবতে উত্তেজনায় আমার গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হল, এই মস্ত পাথরটাকে ফুটো করা কি সহজ কাজ! কতদিন লাগবে? কত বছর? কেউ জানে না। আমার মন বলল, লাগুক অনেক দিন, যাক অনেক বছর। এই পাথর কাটতে-কাটতে একদিন ফুটো হবেই। একদিন আমি মুক্তি পাবই। একদিন এই অন্ধকার থেকে আমি আলোয় ফিরব।

আমি আর সময় নষ্ট করলুম না। সেই তখন থেকেই আমি পাথর ভাঙতে শুরু করে দিলুম। অবশ্য মনে একটা দারুণ ভয়! যদি অনিষ্টের দেবতার কানে পাথর ভাঙার শব্দটা পৌঁছে যায়! না, ভয় পেলে চলবে না। মরে তো বসেই আছি। তবু চেষ্টা করতে দোষ কী।

বলেছি তো, এই বন্দিশালায় অনেক ফাঁক-ফোকর পাথরের গায়ে-গায়ে। বাতাস বইলে ওই ফাঁক দিয়ে ফুরফুর করে বন্দিশালায় ঢুকে পড়ে। তার ছোঁয়া লাগে আমার গায়ে। রাতে শিশির পড়ে পাথরের আনাচে-কানাচে। পাথরের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বন্দিশালার ভেতরে, টুপটাপ। দিনে সূর্যের রোশনাই পাথরের ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ে বন্দিশালায়। তেরছা হয়ে। যেন আলোর তরোয়াল। আর রাতে যেদিন চাঁদ ওঠে আকাশে, সেদিন জ্যোৎস্নার আলো পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে অনেক আলো হয়ে লুকোচুরি খেলে আমার সঙ্গে।

ঠুক, ঠুক। হাতুড়ির ঘা পড়ে ছেনির ওপর। বাতাস বয় ফুরফুর। পাথর ভাঙে।

ঠুক, ঠুক। শিশির পড়ে পাথরে-পাথরে টুপটাপ। পাথর ভাঙে।

ঠুক, ঠুক। আকাশে সকাল নামে। রোদ ছুঁয়ে যায় ঝিকমিক। পাথর ভাঙে।

ঠুক, ঠুক। জ্যোৎস্না নামে রেশম নরম তুলতুল। পাথর ভাঙে।

এমনই করে শীত যায়। বসন্ত আসে। চাঁদ ওঠে। বৃষ্টি ঝরে। তারা ফোটে। সূর্য ওঠে।

এমনই করে ক'টা বসন্ত চলে গেল, আমি জানি না।

আমি পাথর ভাঙি ঠুক, ঠুক।

এমনই করে ক'টা বর্ষা চলে গেল, রোদ উঠল, আমি দেখিনি।

আমি পাথর কাটি ঠুক, ঠুক।

এমনই করে কত সকালে কত সূর্য উদয় হল, মনে রাখিনি।

আমি পাথর ফাটাই ঠুক, ঠুক।

এমনই করে পাথর ভাঙতে-ভাঙতে কেমন করে ছেলেবেলার দিনগুলি আমার হারিয়ে গেল, খেয়াল নেই। তারপরে কেমন করে আমি বড় হলুম, একটু বড়, আরও বড়, অনেক বড়, মনে নেই। কবে আমার কেমন করে মাথার চুলে পাক ধরল, বলতে পারব না। এখন আমার মাথাভর্তি চুল। গালভর্তি দাড়ি! চামড়া কুঁচকে গেছে। মুখে বলিরেখা। ছোট্ট একটা ছেলে বন্দিশালার গহ্বরে, পাথর ভাঙতে-ভাঙতে বুড়ো হয়ে গেল। আশ্চর্য! কে আমায় এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে? কে আমায় খাবার এনে দেয়? কার দয়ায় আমি বেঁচে আছি? তার কি বয়েস বাড়েনি? সে কি বুড়ো হয় না? কে সে, আমায় এই নতুন সাপের চামড়ার পোশাক এনে দিয়েছে? এখনও জানি না। আমি জানি শুধু ঠুক, ঠুক করে পাথর ভাঙতে। এখনও ভাঙছি। জানি না, আরও কতদিন ভাঙতে হবে। জানা নেই, কবে আমি বন্দিশালার পাথর ভেঙে খোলা আকাশের নীচে খানিক দাঁড়িয়ে শ্বাস নিতে পারব। অনিষ্টের দেবতাকে আর আমি দেখিনি কোনওদিন। হয়তো তিনি ভেবেই নিয়েছেন, কবেই আমি মরে গেছি। আমি যে সারাজীবন ধরে পাথর ভাঙছি, এটা বুঝি তিনি ভাবতেই পারেন না। ঠক-ঠক-ঠক। এই একটাই শব্দ কত শব্দ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নির্জন এই বনে। কতকাল ধরে।

এ কী! এ কী! হঠাৎ আমি কেন চমকে উঠি এমন করে! কেন আমার চোখ দুটি অমন অস্থির হয়ে ওঠে! পাথর ভাঙতে-ভাঙতে কেন আমার হাত কাঁপে। বুকের ভেতরটা কেন উত্তেজনায় অমন দুরু-দুরু করে ওঠে!

দ্যাখো, দ্যাখো, পাথর ভাঙতে-ভাঙতে আমি আলো দেখতে পেয়েছি! একটুকরো আলো কেমন আমার ভাঙা পাথরটার ছোট্ট গর্তের ভেতর দিয়ে আমার গায়ে এসে পড়ল, এইমাত্র। হ্যাঁ ভেঙেছে, পাথর ভেঙেছে। আরও একটু ঘা মারো! আরও খানিক হাত চালাও! আরও ভাঙুক!

আরও ভাঙতে-ভাঙতে আমি বন্দিশালা ভেঙে চুরমার করে ফেলেছি। আলোয়-আলোয় ভরে গেল বন্দিশালা। আমি বেরিয়ে পড়লুম। আমি এবার লাফাব, না, আনন্দে ছুটব? না কি চিৎকার করে গড়াগড়ি খাব?

আমার লাফানো হল না। আমি ছুটতেও পারলুম না। আমার মুখ দিয়ে চিৎকারও বেরোল না। আমি এখন আর সেই ছোট্ট শিজুমন নই। আমি এখন এক বুড়ো মানুষ। বন্দিশালার বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমার চোখে কেমন ধাঁধা লেগে গেল। আমার পা কেমন কাঁপতে লাগল। মনে হল আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। হয়তো পড়ে যাব এক্ষুনি।

না, আমি পড়ব না। আমি মন শক্ত করলুম! ফিরে-ফিরে দেখছি ওই ভাঙা পাথরটার দিকে। ওই তো হাঁ করে আছে পাথরের চাঁইটা। ওই তো পাথরের ছিটকে-পড়া কণাগুলি ঢিপি হয়ে আছে। কত দিন, কত বছর ধরে জমেছে, কে বলবে!

এবার? বন্দিদশা থেকে মুক্তি তো পেলুম। এবার যাব কোথায়? আমি কাঁপা পায়ে ধীরে-ধীরে, ঠুক-ঠুক করে হাঁটতে লাগলুম। হাঁটতে-হাঁটতে শেষবারের মতো আমার বন্দিশালার গহ্বরটার দিকে ফিরে তাকালুম। কতদিনের বন্ধু আমার এই গহ্বর। তাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে মন যদি কেমন-কেমন করে, তুমি দোষ দিতে পারো না আমার মনকে।

আমি হাঁটছি। কিন্তু পা চলছে কই? পা দুটো কি হাঁটতে ভুলে গেল! হয়তো তাই। এতদিনের বন্দি-পা আমার একেবারেই অচল হয়ে গেছে। আমার শিরদাঁড়াটা শক্ত করে আমি তো আর সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারছি না! কোমর ভেঙে যাচ্ছে। কেবলই সামনে ঝুলে পড়ছি। ঝুলে-ঝুলেই পা ফেলে আমি হাঁটছি।

কষ্ট হলেও আমি দাঁড়াইনি কোথাও। এইদিনের বেলাতেও কেউ যদি বনের মধ্যে আমায় দেখতে পেত, নিশ্চয়ই আঁতকে উঠত আমার চেহারা দেখে। ভাবত, হয় আমি কোনও পিশাচ, না-হয় খোক্কস। ঘুরে বেড়াচ্ছি কারও ঘাড় মটকাবার জন্য। কে আর জানত, আমার নাম শিজুমন। কে আর ভাবত, আমিও একদিন ছোট্ট ছিলুম। আমারও একদিন খেলা করতে ইচ্ছে করত। ইচ্ছে করত, গান গাইতে। নয়তো খোলা আকাশের নীচে ছুটোছুটি করতে। একা-একা।

দ্যাখো, হাঁটতে-হাঁটতে কোথায় চলে এসেছি! আমি বোধ হয় এবার মানুষের মুখ দেখতে পাব। শুনতে পাব তাদের গলার স্বর। আমায় দেখে কেউ হয়তো মুখ ফিরিয়ে নেবে। নয়তো হেসে উঠবে কিংবা ছি ছি করে উঠবে আমার ছিরি দেখে।

॥ ১৩ ॥

আচ্ছা, দূরে, অনেক দূরে ওটা কী দেখা যাচ্ছে? পা দুটোকে মনে-মনে বললুম, আর একটু চালিয়ে হাঁট রে বাছারা! হায়! হায়! বাছাদের কী দোষ! যিনি পায়ের মালিক, মানে আমি, শিজুমন, যতক্ষণ না পা দুটো জোরে নাড়াতে পারছি, ততক্ষণ পা এমনই করে হাঁটবে। তাই হাঁটুক।

তবে থেমো না যেন!

অনেক দূরের ওইটা এখন অনেক কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি। এই জায়গাটা বেশ উঁচু। এখানে একটু দাঁড়ানো যাক। দেখতে পেলুম, নীচে জল-থই-থই একটা মস্ত হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে সবুজ জমি। জমির ওপর বড়-বড় ঘরদোর। অনেক মানুষ। ওই দূরের মানুষগুলোকে এত ছোট লাগছে, মনে হচ্ছে মাটি কামড়ে পোকা হাঁটছে।

আমি এই উঁচু জায়গাটা থেকে নামতে শুরু করলুম। সাবধান! মনে হচ্ছে, চোখে কম দেখছি। নামতে-নামতে হোঁচট খেলুম। পড়তে-পড়তেও বেঁচে গেলুম। এখান থেকে পড়লে আর রক্ষে ছিল না। কাজেই আরও সতর্ক হয়ে পা ফেললুম।

হ্যাঁ, হ্রদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। দ্যাখো, জলা-জমিতে নলখাগড়ায় ভর্তি। কতরকমের পাখি। যত হাঁস দেখছি, মুরগিও তত। আঃ! এবার আমি একটু মুখে জল দেব। কতদিন হয়ে গেল, কতদিন আমি চান করিনি। জলে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করলুম। জলের আয়নায় আমার মুখখানা ভেসে উঠল। ইস! সত্যিই কী চেহারা হয়েছে আমার! এই কি আমি? আমার নামই কি শিজুমন? আমি আর আমাকে চিনতে পারি না। আমি মুখে জল দিলুম। ঘাড়ে-মাথায় জল ছিটোলুম। অনেকক্ষণ জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দূরে, ওই জল-ঘেরা সবুজ দ্বীপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। এখান থেকে আর-একটু দূরে দেখতে পেলুম, হ্রদের বুকের ওপর দিয়ে একটা সেতু চলে গেছে দ্বীপের ঠিক মাঝখান পর্যন্ত। আমি একটু হাঁটলুম। সেতুর ওপর উঠে পড়লুম। কত মানুষ এপার-ওপার করছে! কেউ আমায় দেখল, কেউ-কেউ দেখল না। কেউ হাসল, অনেকে হাসল না। আমি গা বাঁচিয়ে সেতুর ওপর দিয়ে এগিয়ে চললুম। কত পালটে গেছে আমার দেখা সেই পৃথিবীটা! পালটে গেছে মানুষ। পালটে গেছে তাদের চালচালন। তাদের

পোশাক-আশাক। আমি তাদের পাশে নেহাতই এক অসভ্য মানুষ। আমার পোশাকটা যেমন বেমানান, তেমনই আমার হাবভাব। ওদের দেখে আমার নিজেরই কেমন নিজেকে ঘেন্না করছে। তবু হাঁটছি। সেতু পেরিয়ে আমি যাব সবুজ দ্বীপের ওপারে।

শেষ হল আমার সেতু পেরনো। আমি দ্বীপে পৌঁছে গেছি। আমি যেখানে দাঁড়ালুম, সেখান থেকে দেখছি, শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। দেখছি কত ছোট-বড় বাড়ি। কেউ বেরোচ্ছে। কেউ ঢুকছে। কেউ হাঁটছে। কেউ ছুটছে। এ আমি কোথায় এলুম!

দ্যাখো, দ্যাখো, একটি ছোট্ট ছেলে তার হাঁসের সঙ্গে কেমন হ্রদের জলে সাঁতার কাটছে! খেলা করছে! ওই দ্যাখো, খেলতে-খেলতে হাঁসটা কেমন জলের ওপর থেকে উঠে পড়েছে! দ্যাখো, কেমন প্যাঁক-প্যাঁক করে ছুটছে হাঁসটা! পড়িমরি করে ছেলেটাও উঠে পড়ল। হাঁসটা তখন কতদূরে চলে গেছে। ছেলেটাও ছুটল হাঁসটাকে ধরতে। আমার এমন মজা লেগে গেল! মনে হল, আমিও ছুটি। ধরি হাঁসটাকে। সত্যি, কী সুন্দর দেখতে হাঁসটাকে! একদম সাদা, ধবধব করছে। ছোট্ট। রাজহাঁসের ছানা। আমি সত্যি-সত্যি ছুটতে গেলুম। টাল সামলাতে পারলুম না। পা হড়কে ধপাস! হেসে উঠল ছেলেটা। হাসতে-হাসতে আমায় দেখল। আবার ছুটল। আমি লজ্জায় আধখানা হয়ে গেলুম। ছি, ছি, আমি যে বুড়ো হয়েছি, এ-কথাটা একদম ভুলে বসে আছি! আমি পড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চারদিক দেখতে লাগলুম। আরও যে অনেক মানুষ আমাকে দেখছে, এটা যখন বুঝতে পারলুম, তখন তড়বড় করে উঠতে গিয়ে আবার পড়লুম। লেগেছে। মালুম দিচ্ছে। আর-একবার নিজে-নিজে চেষ্টা করতেই একজন মানুষ এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে আমাকে উঠতে সাহায্য করলেন। আমি উঠে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, "আর কি হাঁসের পেছনে ছোটার বয়েস আছে আপনার?"

আমি 'হ্যাঁ', 'হুঁ' কিছুই বলতে পারলুম না। লজ্জায় মুখ নিচু করে হাঁটতে লাগলুম। হাঁটতে-হাঁটতে দেখি, এ-দ্বীপ এক মস্ত শহর।

শহরে পথ আছে। গঞ্জ আছে।

গাড়ি-জুড়ির রথ আছে। সওয়ার আছে।

হইহল্লার বাজার আছে।

হাজার-হাজার মানুষ আছে।

আরও খানিকটা যেতে আমি দেখতে পেলুম, শহরের ঠিক মাঝে, না, শহরের ঠিক বাঁকে একটা মস্ত উঁচু টিপি। পাথর সাজিয়ে আরও উঁচু করছে সেই টিপিটা অনেক মানুষ। টিপিটার গা বেয়ে ওপরে উঠছে একের পর এক সার বেঁধে শ'য়ে-শ'য়ে। তাদের পিঠে বাঁধা পাথরের বোঝা। উফ! দেখলেই ভয় লাগে। এই বুঝি পড়ে যায়! না, পড়ছে না কেউ। তারা ক'পা হাঁটছে। খানিক থেমে দম নিচ্ছে। আবার উঠছে। ওপরে, টিপির গা বেয়ে। আমি অবাক চোখে দেখছি। ভাবছি, কী শক্তি ওদের!

হঠাৎ একটা ভাবনা মনের ভেতর চেপে বসল। তাই তো, এর পর আমি কী করব! বন্দি যখন ছিলুম, কাজ ছিল, বন্দিশালার পাথর ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসার। একনাগাড়ে পাথর ভেঙেছি। আর এখন? আমি কি পারব, ওদের মতো পাথর বইতে? হায়! হায়! আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি! আমার বয়েসটা যে হারিয়ে গেল, ওই পাথরের বন্দিশালায়!

কত কথাই মনে আসছে। ফেলে আসা কত কথা। ঘুমও পাচ্ছে। কোথায় বসে একটু ঝিমিয়ে নিই? ওই তো সামনেই একটা গাছ। গাছের নীচেই বসা যাক! শুতেই বা দোষ কী! টিপির ওপর মানুষের হল্লা-গুল্লা ছাড়া আর সব নিস্তব্ধ। জায়গাটা খুব নিরিবিলি। শান্তিতে একটু ঘুমনো যাক। ঘুমে চোখ ডুবে আসছে। কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে মানুষের হল্লা-হাসি। আমি সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়লুম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। এ কী! রাত হয়ে গেছে যে! ইস! একেবারে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আমি! আকাশে চাঁদ উঠেছে। আকাশ-ভর্তি আলো। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পড়েছে আমার গায়ে। কোনও মানুষের সাড়া-শব্দ নেই। নিস্তব্ধ চারদিক। শুধু ঝিল্লির শব্দ কানে আসছে। বন্দিশালায় এই ঝিল্লির শব্দ শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এখন সয়ে গেছে। কিন্তু চমকে ওঠার মতো আবার সেই ঘটনা এখানেও। চাঁদের আলোও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার সামনে খাবার। আশ্চর্য! খিদে যে আমার পেয়েছে, সে না বললেও তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। সুতরাং আর ভাববার কিছু নেই। চেটেপুটে খেয়ে পেট ভরালুম। আবার শোয়া। এছাড়া আর তো কিছু করার নেই এই রাতদুপুরে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আমার কাছে এ-ঠাণ্ডা এমন কী আর! ছোটবেলায় তুষারপাতের সময় কত পাহাড় ডিঙিয়েছি। তখনকার কথা মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে।

পরের দিন ভোর হতে-না-হতেই পিলপিল করে লোক জুটছে টিপির মাথায়। আমি পরে শুনেছি, এটাকে টিপি বলে না। বলে পিরামিড। শুরু হয়ে গেল পাথর বওয়ার কাজ। এ কী! সেই অসংখ্য মানুষের মধ্যিখানে সেই ছেলেটাকে দেখছি না? হ্যাঁ, ওই তো সাদা হাঁসটাও তো তার সঙ্গে হাঁটছে। দ্যাখো, কী ভয়ানক কাণ্ড! এই নীচের থেকে পিঠে করে সে পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওপরে! কেন? ওইটুকু ছেলে কেন অমন কষ্ট করছে? ইচ্ছে করল ছুটে যাই। তাকে বলি, তুমি কেন পাথর বইছ? তোমার পাথর আমাকে বইতে দাও! কিন্তু হায় রে! আমার কি এখন সে-ক্ষমতা আছে! আমার যে তিনমুণ্ডু এক হয়ে গেছে। আমি যে বুড়ো থুত্থুড়ো!

সূর্য উঠে গেছে। তখনও আবছা কুয়াশায় ঢেকে আছে সারা চত্বর। গাছের পাতা ছুঁয়ে টুপটাপ শিশিরের ফোঁটা পড়ছে। একদল সারস উড়ে যাচ্ছে। কুয়াশায় লুকোচুরি খেলছি। লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখছি ছেলেটাকে। দেখছি তার ছোট্ট রাজহাঁসের কাণ্ড! সে তার বন্ধুর পিঠে বাঁধা পাথর দেখছে ফিরে-ফিরে। যেন পিঠ থেকে পাথর পড়ে না যায়। সে উঠছে, নামছে। ডাকছে, থামছে। আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আরও ভাল করে আরও একটু দেখি। দেখতে-দেখতে হাঁটি। হাঁটতে-হাঁটতে চলে আসি এইখানে। এইখানেই সে বারবার আসছে। এইখানেই সে তুলে নিচ্ছে পাথরের ভার পিঠে। এইখানেই সে হাঁসটাকে আদর করছে। এইখানেই সে খানিক দাঁড়াচ্ছে। আমিও দাঁড়ালুম। আজ আর ছুটতে হল না তার পিছু। আজ সে নিজেই দাঁড়াল আমাকে দেখে। আমি হাসলুম। সে আমার হাসি দেখে হাত তুলল কি না, দেখতে পেলুম না। আমি তার দিকে হাত বাড়ালুম। হাঁসটা প্যাঁক-প্যাঁক করে ডেকে উঠল। ছেলেটা আচমকা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "ছেলেধরা, ছেলেধরা।"

আমি থতমত খেয়ে গেছি।

দেখতে-দেখতে এক দঙ্গল লোক ছুটে এল।

আমি পালাবার পথ দেখছি।

দেখতে-দেখতে দঙ্গল বেঁধে লোকগুলো আমাকে চেপে ধরল।

আমার দম আটকে আসছে।

লোকগুলো আমায় মারতে শুরু করল।

আমি অসহায়ের মতো মার খাচ্ছি।

এমন সময়ে একজন লোক এল। হর্তাকর্তা হবে বোধ হয়। সবাইকে হাঁক পেড়ে বলল, "মেরো না! রাজপ্রাসাদে নিয়ে

চলো !"

আমাকে সবাই মিলে টানতে-টানতে রাজপ্রাসাদে নিয়ে চলল।

আমি মরতে-মরতে রাজপ্রাসাদে চললুম। রাস্তায় দলে-দলে লোক জুটে গেল। আমার পিছু নিল। চেঁচাতে লাগল, "ছেলেধরা, ছেলেধরা !"

আমি কথা বলতে পারলুম না। আমার চোখ জলে ভিজে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে আমায় রাস্তায় ঘোরানো হল। অনেকক্ষণ ধরে অনেক মানুষের হম্বিতম্বি শুনতে পেলুম আমি। আমার পা আর হাঁটে না। আমায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসা হল প্রাসাদের সামনে। আর সাধ্যে কুলোচ্ছে না আমার। আমি টলে-টলে পড়ে যাচ্ছি। তবু আমায় যেতে হল প্রাসাদের ভেতরে। সামনেই বাগান। বাহারি গাছ। রঙিন ফুল। কত পাখি। উড়ে গেল। আর কিছু নজরে পড়ল না। চোখের দৃষ্টি আবছা হয়ে আসছে। আমি কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ছি। আমাকে আর মারার কী আছে ! আমি তো মরেই আছি।

আমি বুঝতে পারলুম, সবাই মিলে আমাকে একটা মস্ত ঘরের মধ্যে টেনে আনল। মস্ত ঘরটা এত বড়, আমার চোখ সবটা ঠাহর করতে পারল না। একটা অদ্ভুত সুগন্ধ নাকে এল। ভাল লাগল। একটু স্বস্তি পেলুম। দোতলার সিঁড়ি ভেঙে আমাকে সম্রাটের সামনে নিয়ে আসা হল। আমি আবছা-আবছা দেখলুম সম্রাট সিংহাসনে বসে আছেন। সিংহাসনটা সোনার না রুপোর, আমি বলতে পারব না। তবে দেখতে পেলুম, সম্রাটের মাথায় আশমানি রঙের মুকুট। বোধ হয় মুকুটে গাঁথা অনেক মণিমুক্তো। আলোয় ঠিকরে মণিমুক্তোর জেল্লা আমার চোখের ওপর ঝিলিক দিচ্ছে। মাঝে-মাঝে। আমি চোখ বুজে ফেলছি। সম্রাট গায়ে দিয়েছেন, নীল আর সবুজে গাঁথা পাখির পালকের আলখাল্লা। আমি তাঁকে যেমন করে দেখছি, মনে হল তিনিও আমাকে তেমন করেই দেখছেন। হঠাৎ তিনি গম্ভীর গলায় গর্জন করে উঠলেন, "কে লোকটা ?"

একজন বলে উঠল, "আজ্ঞে, ছেলেধরা।" সে বোধ হয় সম্রাটের পরামর্শদাতা।

"হুম," করে একটা রাগের শব্দ গলায় এনে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, "কোন ছেলেটাকে ধরেছে ?"

পরামর্শদাতা উত্তর দিল, "ধরেনি, ধরব-ধরব করছিল।"

মনে হল, সম্রাট ভুরু কোঁচকালেন। তারপর পরামর্শদাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী পরামর্শ দেন ? কী করা উচিত ?"

পরামর্শদাতা বলল, "করা তো অনেক কিছুই যায়। তবে লোকটার বয়েস হয়েছে। প্রাণে মেরে কোনও লাভ হবে না। যাতে লোকটা কোনওদিন কোনও ছেলেকে ধরতে না পারে, তাই আমি বলি লোকটার হাতদুটো উপড়ে ফেললেই যথেষ্ট।"

"তবে তাই হোক।" বলে সম্রাট আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে, তোমার কী বলার আছে ?"

আশ্চর্য, আমি উত্তর দিতে গেলুম, আমার মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। কথা বলার জন্য আমার গলার ভেতরে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল।

সম্রাট আবার বললেন, "চুপ করে আছ কেন ?"

আমি প্রাণপণে কথা বলার চেষ্টা করলুম। তবু পারলুম না। বিষম খেলুম।

আমায় বিষম খেতে দেখে সম্রাট বললেন, "লোকটা বোধ হয় বোবা।"

আমি ভয়ে ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলুম। আমি মনে-মনে ভাবতে লাগলুম, আমি কি তবে সত্যিই বোবা হয়ে গেছি। এই এত বছর বন্দি ছিলুম আমি। এত বছরে কারও সঙ্গে একটি কথাও বলতে পারিনি আমি। তবে কি কথা না বলে, আমি কথা বলতে ভুলে গেলুম !

সম্রাট আবার গর্জে উঠলেন, "নিয়ে যাও একে ! এর হাত দুটো উপড়ে নিয়ে হ্রদের জলে ফেলে দাও !"

সম্রাটের আদেশ শুনে আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে গেল। আমায় আবার ওরা টান মারল। আমার শক্তি নেই। তবু আমি বাঁচার জন্য হাঁকপাঁক করতে লাগলুম। তারপর হঠাৎই আমি কথা বলতে পারলুম। আমার গলা দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল, "না-আ-আ।"

মস্ত ঘরটায় প্রতিধ্বনি উঠল, "না-আ-আ।" আমি ভয়ে হাঁপাতে লাগলুম। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললুম, "না, আমি বোবা নই ! আমি বোবা নই ! আমায় কিছু বলতে দিন সম্রাট ! আমার কথা শুনুন !"

সম্রাট হুকুম দিলেন, "ঠিক আছে। ও কী বলতে চায়, বলতে দাও ওকে !"

আমি তখন ঠকঠক করে কাঁপছি।

সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলতে চাও তুমি ?"

আমি কাঁপতে-কাঁপতে বললুম, "আজ্ঞে, আমি ছেলেধরা নই।"

"তবে তুমি কে ?"

"আমি একজন খোদাইকর। আমি শিল্পী।"

"শিল্পী !" সম্রাট যেন চমকে উঠলেন। আমাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। হয়তো দেখলেন আমার চেহারাটা। নয়তো গায়ের পোশাকটা। না-হয় আমার মুখখানা। তারপর হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথাকার শিল্পী হে তুমি ? তোমার কোনও খবর আমাদের কারও জানা নেই তো। কে তোমায় শিল্পী বলেছে ? তোমাকে দেখলে তো মনে হয়, তুমি হয় ছেলেধরা, না হয় চোর।"

আমার গলায় যতটুকু শক্তি ছিল, সেই সব শক্তি দিয়ে আমি প্রতিবাদ করে বললুম, "আমি ছেলেধরাও নই, আমি চোরও নই। আমি খোদাইকর। আমি মূর্তি খোদাই করতে জানি। শিল্প-সৃষ্টির দেবতা আমাকে শিখিয়েছেন।"

সম্রাট আঙুল তুললেন আমার দিকে। বললেন, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ ! দেবতা কখনও কাউকে কিছু শেখান না। নিজেকে শিখতে হয় নিজে-নিজে।"

আমি উত্তর দিলুম, "সম্রাট আমি নিজে-নিজেই শিখেছি। দেবতার দেখে-দেখে। আমি নিজে-নিজেই গড়তে পারি আপনি যা চান। কিন্তু আপনি যদি আমার এই হাতদুটো উপড়ে ফেলে দেন, আমি কিছুই করতে পারব না।"

সম্রাট আমার কথা শুনে বোধ হয় কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "আমি যদি তোমার হাতদুটো উপড়ে না নিয়ে তোমাকে রেহাই দিই, তবে তুমি আমার ওই যে পিরামিড তৈরি হচ্ছে ওর গায়ে সুন্দর একটি শিল্প খোদাই করতে পারবে ?"

"পারব। বলুন, কী খোদাই করতে হবে ?"

সম্রাট উত্তর দিলেন, "তোমার যা ইচ্ছে। তোমার মন যা চায়, তাই-ই তুমি খোদাই করতে পারো। শিল্পীর কাজে আমি খবরদারি পছন্দ করি না।" তারপর পরামর্শদাতাকে বললেন, "আপনারা ওকে ছেড়ে দিন। সত্যিই যদি এই মানুষটি আমার মনপছন্দ কোনও ছবি খোদাই করতে পারে পিরামিডের গায়ে, তবে আমার প্রাসাদ খোলা থাকবে এই খোদাইকরের জন্য চিরদিন। আর যদি মিথ্যে বলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার ধান্দা করে থাকে, তবে এর শাস্তি হবে মৃত্যু।" বলতে-বলতে তিনি আমার দিকে আবার চোখ ফিরিয়ে বললেন, "যাও হে শিল্পী, তোমার কাজ শুরু করে দাও। তোমাকে আমি ছেড়ে দিলুম এখনকার মতো।"

আমি মাথা নোয়ালুম। তারপর বললুম, "হুজুর, আমার যে

খোদাই করার যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। হুজুর, বন্দিশালার পাথর কাটতে-কাটতে আমার ছেনি, হাতুড়ি ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে।"

"বন্দিশালা!" সম্রাট চমকে উঠলেন। বললেন, "তবে কি তুমি সত্যিই চোর? চুরির অপরাধে তবে কি তুমি সত্যিই বন্দিশালায় বন্দি ছিলে? পাথর ভেঙে পালিয়ে এসেছ?"

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম।

"চুপ করে গেল কেন?"

আমি শান্ত গলায় উত্তর দিলুম, "না সম্রাট, আমি আবার বলছি, আমি চোর নই। বন্দিশালায় বন্দি থাকার সেই কাহিনী মস্ত। আপনার পছন্দমতো আমার খোদাইয়ের কাজ যেদিন শেষ করব, সেদিন যদি আপনার ওই চোখ দুটি আমার কাজ দেখে খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, সেদিন আমার সব কথা আপনাকে শোনাব সম্রাট! তার আগে আমার কিছুই বলার নেই। বললেও আপনি বিশ্বাস করবেন না। আর কেই-বা বিশ্বাস করতে পারে আমার এই হতশ্রী চেহারা দেখে? আমার ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক দেখে?"

"ঠিক আছে, তোমাকে নতুন পোশাক দেওয়া হবে। ছবি খোদাই করার জন্য তোমার যা-যা সরঞ্জাম দরকার, সব তুমি পাবে। এমনকী, আমার প্রাসাদে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও হবে। তুমি এগিয়ে যাও!" সম্রাট আমায় ভরসা দিলেন।

শিল্প-সৃষ্টির দেবতার কাছে আমি শিখেছি ভদ্র হতে, শান্ত হতে! শিখেছি, কেমন করে বড়মানুষকে মান্য করতে হয়। আমি ঠিক তাঁরই শেখানোমতো সম্রাটের সামনে আবার মাথা নত করে বললুম, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

ঠিকই, সম্রাট আমাকে সবই দিলেন। কিন্তু তবুও আমি সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারলুম না। আমার শিরদাঁড়া শক্ত হল না। আমার চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট হল না। আমার নিশ্বাসের শব্দটা ক্ষীণ হয়ে আসছে। ভয় হল, পিরামিডের গায়ে ছবি খোদাইয়ের আগেই আমার জীবন যদি শেষ হয়ে যায়! তবে যে সম্রাটের কাছে প্রমাণ করে যেতে পারব না, আমি চোর নই, আমি শিল্পী!

॥ ১৪ ॥

না, আর দেরি করা ঠিক নয়। সম্রাটের দেওয়া নতুন পোশাক পরেছি আমি। আমার হাতে পাথর খোদাই করার ঝকঝকে ছেনি, হাতুড়ি। আমি প্রাসাদ ছেড়ে পথে বেরোলুম। ভারী কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। তবু হাঁটছি। ভাবছি, পিরামিডের গায়ে কী ছবি খোদাই করব আমি? কী ছবি দেখলে সম্রাটের চোখ দুটি খুশিতে ভরে উঠবে? সম্রাট বলবেন, বাহ!

আচ্ছা, আমি যদি সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর ছবি খোদাই করি পিরামিডের দেওয়ালে?

না, সেটা তেমন জুতসই হবে না। সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর মুখ, সে কি একটা শিল্প হল?

তবে আঁকব নাকি রাতের আকাশ? অনেক তারা?

না। পাথরে খোদাই আকাশ আর তার বুকে তারা? এটা কোনও ছবিই নয়। এ-ছবি সবাই আঁকতে পারে। তবে হ্যাঁ, সত্যিকারের আকাশটা যদি পাথরের ওপর এনে বসিয়ে দিতে পারতুম! যদি রাতের তারা সেই আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলত, তবে সেই হত ছবি। জীবন্ত। আমি চাই, জীবন্ত ছবি খোদাই করতে! আমি চাই পাথরের বুকে প্রাণ দিতে।

ভাবতে-ভাবতে চলে এসেছি সেই পিরামিডের কাছেই। কত মানুষ! সবাই কারিগর। কে জানে, কত বছর ধরে এই কারিগরের দল গড়ছে এই পিরামিড! আমিও তো অনেক বছর ধরে পাথরে হাতুড়ি ঠুকেছি। তবে একা-একা। এখানে অনেক মানুষ। অনেক মানুষ পিঠে বেঁধে পাথর তুলছে ওপরে। মাথা উঁচু হচ্ছে পিরামিডের। কিন্তু আমার মাথা উঁচু হবে কেমন

করে ?

আরে ! আরে ! ওই দ্যাখো, সেই ছেলেটা ! দ্যাখো, দ্যাখো, ছেলেটা আজও পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নীচের থেকে পিরামিডের মাথায় ! ওই দ্যাখো, তার বন্ধু, রাজহাঁসের ছানাটা ! ছানাটার পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে দিয়েছে আজ। কেমন ঝুমঝুম করে বাজছে তার পায়ে ! আর দরকার নেই বাবা কাছে গিয়ে। বরং এইখান থেকেই দেখি, এই আড়াল থেকে। আচ্ছা, ছেলেটার কেন মনে হল, আমি ছেলেধরা ? কেন সে আমায় দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল ? কই, ওর রাজহাঁসটা তো ভয় পেল না ! তবে কি রাজহাঁসটা বুঝতে পেরেছিল, আমি ছেলেধরা নই ? কে জানে ! রাজহাঁসের মনের কথা আমি জানব কেমন করে !

আচ্ছা, ছেলেটা কেন পাথর বইছে ? এত কষ্ট করে ? তবে কি ওর কেউ নেই ? আমার মতো ছেলেটাও কি একা ? অবশ্য, ঠিক একা বলা যায় না। ওর তো একজন বন্ধু আছে। সাদা ধবধবে একটা রাজহাঁস। পায়ে ঝুমঝুম ঘুঙুর বাজছে। মুখে প্যাঁক-প্যাঁক ডাক ছাড়ছে। আর ছেলেটার পায়ে-পায়ে হাঁটছে। একবার পিরামিডের মাথায় উঠছে। আর-একবার নীচে নামছে। কতবার যে এমন ওঠা-নামা করল, কে জানে ! যেন বন্ধুকে আগলে আছে রাজহাঁসের ছোট্ট ছানাটা।

আমিও যখন ছোট ছিলুম, একটা ঈগল কেমন আমাকে একটা জাগুয়ারের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল ? ওই ঈগলও কি আমার বন্ধু হতে চেয়েছিল ? নিশ্চয়ই চেয়েছিল। নইলে সে বামন-দেবতার আস্তানায় গেল কেন ? কেন সে পাহাড়-চুড়োয় উঠেছিল ? বুঝি আমায় দেখছিল ! আচ্ছা, ঈগলটা জানল কেমন করে আমি একা ? সে কতদিনের কথা। তবু আমার এখনও মনে আছে, বামন-দেবতা তাকে বন্দি করেছিলেন পায়ে শেকল পরিয়ে। আমি অনেক কষ্ট করে তার একটা পায়ের শেকল খুলতে পেরেছিলুম। আর-একটা পায়ের খুলতে পারিনি। জানি না, তার কী হল ! কে জানে, হয়তো একটা পায়ের শেকল পরেই তার জীবন শেষ হয়ে গেছে।

হায় ! হায় ! হায় ! ও কী হল ! ও কী হল ! দ্যাখো, দ্যাখো, পিঠভর্তি পাথর নিয়ে বে-টাল হয়ে পড়ে গেল ছেলেটা ! ওই অত পাথরের ভার অমন একটা ছোট্ট ছেলে কতক্ষণ ধরে বইতে পারে ! লেগেছে, ভীষণ লেগেছে ! ওই তো সে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল। ছেলেটা যে উঠতেই পারছে না। ওই যে অত মানুষ তোমরা পাথর বইছ, একটু নজর দাও ছেলেটার দিকে ! দেখছ না, পাথরের চাপে তার মাথাটা থেঁতলে গেছে ? দ্যাখো একটা পাথরের চাঁই তার বুকের ওপরেও ছিটকে পড়েছে। ওই দ্যাখো, তার বন্ধু হাঁসটা কেমন চিৎকার করে ছোটাছুটি করছে। একবার সে ছুটে যাচ্ছে বন্ধুর কাছে। একবার ছুটে আসছে এইদিকে ! একবার সে তার বন্ধুর বুকের ওপর চাপা-পড়া পাথরটা মুখ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে হাঁকপাঁক করে। পারছে না। মাথা ঠুকছে পাথরটার ওপর। পাথর সরছে না। বন্ধুর মুখের কাছে মুখ এনে হাঁস আদর করছে। আকুলি-বিকুলি করে ডাকছে হয়তো কাউকে। যেন চেঁচিয়ে বলছে, বাঁচাও-ও ! বাঁচাও-ও ! আমার বন্ধুকে বাঁচাও-ও। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কে সাড়া দেবে ? সকলেই যে কাজ করছে ! পাথর বইছে ! পিরামিডের মাথায় উঠছে !

আমি কি যাব ? আমি কি দেখব একবার ?

না, আমার যাওয়ার দরকার নেই। ওই দ্যাখো, দুটি মানুষ ওই দিকেই যাচ্ছে। ওরা বোধ হয় রাজহাঁসের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। ওরা এবার ছেলেটিকে বাঁচাবে !

না, তারা ফিরে তাকাল না। না, তারা শুনল না রাজহাঁসের চিৎকার। তারা চলে গেল যেদিকে যাওয়ার কথা, সেইদিকে।

আমার আর লুকিয়ে থাকা সাজে না। আমি বেরিয়ে পড়লুম আড়াল থেকে। আমি আনচান করে ছুটতে গেলুম। পারলুম না ছুটতে। আমি হনহন করে হাঁটতে গেলুম। পারলুম না হাঁটতে। আমি ঠুকঠুক করে এগিয়ে গেলুম। যেমন করে এগিয়ে যায় একশো বছরের ওপর এক বুড়োমানুষ। কতক্ষণে পৌঁছব আমি ওই ছেলেটার কাছে, ওই ওপরে ? পারব তো উঠতে ?

হ্যাঁ, আমায় উঠতেই হবে। সব শক্তি দিয়ে আমায় উঠতে হবে। এই তো আমি পা ফেলেছি। ওপরে উঠছি আমি।

হাঁসটা এখনও চেঁচাচ্ছে।

আমি উঠছি। হাঁপাচ্ছি।

হাঁসটার চিৎকার কমছে।

আমি উঠছি। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

হাঁসটার চিৎকার আরও কমছে।

আমি উঠছি। পা টলছে।

হাঁসটার চিৎকার আরও, আরও কমছে।

টলতে-টলতে আমি পৌঁছে গেলুম ওপরে। ওই তো ছেলেটা। ওই তো হাঁস। শুয়ে আছে ছেলেটির কপালে মুখ রেখে। যেন চুমো খাচ্ছে। টলতে-টলতে আমি দেখতে লাগলুম। দেখতে-দেখতে আমি হাঁপাতে লাগলুম। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি পড়ে গেলুম। আর দাঁড়াতে পারি না। আমি হামাগুড়ি দিই। আমাকে যেতেই হবে ছেলেটির বুকের কাছাকাছি। আমাকে সরিয়ে দিতেই হবে, ওর বুকের ওপর পড়ে-থাকা ওই পাথরের চাঁইটা।

না, আমি আর হামাগুড়িও দিতে পারছি না। আমার বুকটা মাটিতে ঠেকে গেছে। আমি বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পাথর-ভাঙা কাঁকরে আমার বুকটা ছড়ে যাচ্ছে। যাক ! রক্ত পড়ছে। পড়ুক ! আমাকে যেতেই হবে।

আমি পৌঁছে গেছি। আঃ। আর পারি না। দম যেন বন্ধ হয়ে যায় ! যাক দম বন্ধ হয়ে ! আমি হাত বাড়ালুম ছেলেটির বুকে-পড়া পাথরটার ওপর। আমি পারলুম, হ্যাঁ আমি পারলুম। সরিয়ে দিলুম পাথরটা ওর বুকের ওপর থেকে। আমি তার বুকে মাথা রাখলুম। ছেলেটির বুক কাঁপছে। আমি হাঁপাচ্ছি। দেখছি, হাঁসটা মুখ ঠেকিয়ে রেখেছে ছেলেটির কপালে। বোধ হয় আর তার দম নেই। বোধ হয় আর সে পারবে না চেঁচাতে। বোধ হয় সে এমনই করে তার বন্ধুকে আগলে রাখবে। এই তো ছবি !

আমার মন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে চিৎকার করে বলতে চায়, হ্যাঁ, আমি পেয়েছি, ছবি পেয়েছি। এই আমার ছবি ! একটি ছোট্ট রাজহাঁসের ছানা তার আহত বন্ধুকে আগলে কপালে চুমো খাচ্ছে ! এইমাত্র যে-পাথরটা ছেলেটির বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছি, ওই পড়ে আছে সেটি সামনে। আমাকে এই ছবি খোদাই করতে হবে এই পাথরটার ওপরেই। ছেলেটি বোধ হয় এই পাথরের আঘাতেই আহত। আমার কাঁধের ঝুলিতে এখনও সম্রাটের দেওয়া হাতুড়ি আর ছেনিটা আছে। ছেলেটির বুক থেকে আমি মাথা তুললুম। শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে আমার। আমি থরথর করে কাঁপছি। কাঁপতে-কাঁপতেই আমি হাতুড়ি আর ছেনিটা বার করলুম আমার ঝুলির ভেতর থেকে। অনেক কষ্টে এগিয়ে গেলুম পাথরটার কাছে। পাথরে ছেনি ঠেকালুম। হাতুড়ির ঠোকা দিলুম। ঠক, ঠক। শব্দ উঠল। ঠিক যেমন করে শব্দ উঠত আমার বন্দিশালায়। পাথর ভাঙার শব্দ।

আমি আমার ঠোকা দিলুম, ঠক, ঠক !

আবার মারলুম, ঠক,ঠক !

শুধু শব্দই উঠছে। কই, ছবি তো খোদাই করতে পারছি না ?

আবার হাতুড়ি ঠুকি। আবার ঠুকি। আবার।

পারছি না। কিছুতেই পারছি না ছবি খোদাই করতে। শুধু পাথরই ভাঙে। পাথরের টুকরোগুলো ছিটকে পড়ে। আমার কপালে ঘাম জমে। হাঁপ ধরে।

না, না, হার মানলে চলবে না। আমি আমার হাত দুটো শক্ত করলুম। আরও শক্ত। আরও জোরে হাতুড়ি ঠুকলুম, আবার।

ছবি নয়, ছবি নয়! পাথরের টুকরোই শুধু খসে পড়ছে। যেমন করে খসে পড়ত বন্দিশালায়। তবে কি বন্দিশালার পাথর ভাঙতে-ভাঙতে আমার হাত ছবি খোদাই করতে ভুলে গেল! ছেনিতে হাতুড়ি ঠেকালেই সে বুঝি শুধুই ভাঙবে। আমার হাত কি এখন পাথর ভাঙতেই পারে! আর কিছু পারে না!

আমি ভয় পেলুম। জোরে-জোরে আঘাত করলুম ছেনির ওপর হাতুড়ি। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল আমার বুকের ভেতরটা। পাথরে আমার মাথা নুয়ে পড়ে। আমি শুয়ে পড়ি। আমার হাত গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। সে আর ওঠে না। আমার চোখের আলো বুঝি নিভে যায়!

হঠাৎ সামনের গাছটায় কিসের একটা ঝাঁকুনি লাগল! ঝরঝর করে ঝরে পড়ল একঝাঁক পাতা। আমি আবছা চোখে তাকালুম গাছের দিকে। গলা দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল, "কে?"

শুনতে পেলুম, কে যেন বলে উঠল, "আমি তোর মা।"

শিরশির করে উঠল আমার সারা শরীর। এতক্ষণ আমার চোখের ওপর ছড়িয়ে ছিল যে ছায়া, মুহূর্তে যেন সে উধাও হয়ে গেল। আমি দেখতে পেলুম, গাছের ডালে বসে আছে একটা ঈগল। আমি আর্তনাদ করে উঠলুম, "কী বললে?"

ঈগল উত্তর দিল, "শিজুমন, আমি তোর মা।"

আমার চোখের পাতায় অবাক চাউনি। সে চোখ স্থির।

ঈগল আবার বলল, "হ্যাঁ, আমি তোর মা। এতদিন তোকে আমি রক্ষা করে এসেছি আমার চোখে-চোখে রেখে। তোকে আমি তোর অজান্তে কখনও লুকিয়ে রেখেছি বনে, কখনও পাহাড়চুড়োয়। কখনও লড়াই করেছি জাগুয়ারের সঙ্গে, কখনও আটকেছি অনিষ্টের দেবতাকে। তোর জন্য খাবার এনেছি। তোকে নতুন পোশাক দিয়েছি। তুই যে আমার ভালবাসার শিজুমন।"

আমার চোখ ছলছল করে উঠল। গড়িয়ে পড়ল একটি-দুটি ফোঁটা। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তবু আমি কোনওরকমে জিজ্ঞেস করলুম, "মা, অনিষ্টের দেবতা তোমাকে তো নদীর জলের পাথর করে দিয়েছিলেন! তুমি ঈগল হলে কেমন করে?"

"ওরে শিজুমন, যেদিন নদীর বুকে জল ছিল না, নদীর জলে স্রোত ছিল না, সেদিন শিল্পসৃষ্টির দেবতা আমার ওই পাথরে একটি ঈগলের মূর্তি খোদাই করেছিলেন। সে আমি। ওরে শিজুমন, কত যত্ন করে তিনি ঈগলের মুখ গড়লেন। চোখে তারা ফোটালেন। ডানায় পালক গাঁথলেন। আর তখনই মনে হল, আমার প্রাণটা থিরথির করে কেঁপে উঠেছে বুকের ভেতর। আমার ডানার পালকে বাতাসের ঢেউ লেগেছে। আর তখন থেকেই আমি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি। শিল্পসৃষ্টির দেবতা বোধ হয় চেয়েছিলেন, আকাশে উড়ে-উড়ে আমি তোকে লক্ষ রাখি। তোকে রক্ষা করি। ওরে শিজুমন, সেই তখন থেকেই আমি তোকে চোখে-চোখে রেখেছি। তোর জন্যই আমি এতদিন বেঁচে আছি। এবার আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। তুই আমার কাছে আয়! আমি তোকে নিয়ে যাব।"

আমার শিহরন লাগল। আমি ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করলুম, "আমায় কোথায় নিয়ে যাবে মা?"

আমার ঈগল-মা উত্তর দিল, "কোথায় যাব জানি না। শুধু জানি, জীবন শেষ হলে, সবাই যেখানে যায়।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ মা, আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু মা, যাওয়ার আগে পাথরে যে একটি ছবি খোদাই করে যেতে হবে আমায়। আমায় যে সেটি উপহার দিতে হবে সম্রাটকে। তাঁকে বলে যেতে হবে, আমি ছেলেধরা নই, আমি শিল্পী।"

মা উত্তর দিল, "ওরে শিজুমন, তোর হাত আর যে পারবে না ছবি খোদাই করতে। একশো বছর ধরে তোর হাত বন্দিশালার পাথর ভাঙতে-ভাঙতে ছবি খোদাই করতে ভুলে গেছে। শুধু পাথর ভাঙতেই শিখেছে। এখন তোর হাতে যখনই হাতুড়ি উঠবে, তখনই সে ভাঙবে। গড়বে না।"

আমি কেঁদে ফেললুম। কাঁদতে-কাঁদতে বললুম, "আমি পারব মা, গড়তে পারব। তুমি আমার কাছে এসো। আমার হাত ধরো। আমি তোমায় ছুঁয়ে খোদাই করব, একটি আহত ছোট্ট ছেলের কপালে তার বন্ধু রাজহাঁস চুমো খাচ্ছে। না, ছেলেটির আহত হওয়ার কথা নয় মা। ছেলেটি পাথর বইছিল। ছেলেটির যাতে কষ্ট না হয় তাই তার বন্ধু হাঁস ঘুঙুর-পায়ে নেচে-নেচে বন্ধুকে আনন্দ দিচ্ছিল। বলো তো মা, একটি ছোট্ট ছেলে কেন পাথর বইবে? কেন সে খেলা করবে না, বন্ধুদের সঙ্গে, খোলা আকাশের নীচে, সবুজ মাঠে? কে বলছে তাকে পাথর বইতে? কঠিন পাথর?"

মা কী উত্তর দিয়েছিল, আমি শুনতে পাইনি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলুম, আমার চোখ বোধ হয় আর দেখতে পাবে না। সব যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি মৃদু গলায় আবার বললুম, "মা, এসো মা, আমার কাছে, আমি ছবি আঁকব পাথরে এ-ক-টি ছে-লে-র ক-পা-লে..."

আমি আর কথা বলতে পারিনি। হয়তো মা গাছের আড়াল থেকে নেমে এসেছিল। আমার পাশে। আমার মনে নেই। হয়তো মা আমার হাতে তুলে দিয়েছিল হাতুড়ি। হয়তো আমার নিস্তেজ হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল ছেনিটি। হয়তো আমি পেরেছিলুম খোদাই করতে আমার স্বপ্নের ছবিটি। হয়তো সম্রাট দেখেছিলেন সেই ছবি। হয়তো জেনেছিলেন, আমি চোর নই। আমি শিল্পী। আমার কিছুই মনে নেই।

হ্যাঁ, মনে আছে শুধু, আমি আকাশে উড়ে চলেছি, মায়ের পিছু-পিছু, সোনালি ডানা ছড়িয়ে। মায়ের মতো আমিও এক ঈগল। আলোর আকাশে ঈগল।

শব্দসন্ধান

দেবসেনাপতি

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) আপনার। (৫) অনেক আংটিতে এই লাল রত্নটি দেখা যায়। (৮) 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা—ঘরে-ঘরে।' (১১) সীতা—দুঃখিনী। (১৪) আশীর্বাদ ও অভয়দান। (১৫) বিদেশে রাজা বা সরকারের প্রতিনিধি। (১৭) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ। (১৮) পশ্চাৎ আগত। (১৯) বধ করা হয়েছে এমন। (২০) চিহ্ন। (২২) অনিমন্ত্রিত আগন্তুক। (২৩) যে হুজুরের চাকর। (২৫) সূর্য। (২৬) প্রশ্ন করলে যা দিতে হয়। (২৮) দাম, মূল্য। (২৯) বংশ। (৩০) নিচু, হেঁট। (৩২) কাটা বা ঘায়ের প্রলেপজাতীয় ওষুধ। (৩৩) সরস্বতী। (৩৪) উত্তম গন্ধ বা সৌরভ। (৩৬) বাধা। (৩৭) দুধের সর। (৩৯) তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। (৪০) যা মনকে মুগ্ধ করে। (৪২) সহজেই যা মেলে। (৪৩) বিরুদ্ধে। (৪৫) চাষবাসের খেত। (৪৬) উঠল—তো কটক যাই। (৪৮) প্রাপ্য বস্তুর জন্য বারবার দাবি। (৫০) চোখের পাতা। (৫২) ষোলোটি ষোড়শদানযুক্ত গৌরবজনক শ্রাদ্ধ, যা ধনীর পক্ষে সম্ভব। (৫৪) চঞ্চল মন যার। (৫৮) এ থাকলেই ভাগনে জোটে। (৬০) পকেট। (৬১) দিনের পরেই আসে। (৬৩) অহঙ্কার। (৬৪) ভয়ে বা বিশেষ কারণে চম্পট। (৬৫) যথার্থ, প্রকৃত। (৬৮) মৃতদেহ। (৬৯) এই কাবাব লা-জবাব। (৭১) যে-উদ্ভিদের প্রধান অংশ মাটির মধ্যে থাকে। (৭২) যে-হাতির দাম লাখ টাকা। (৭৪) অবসরহীন। (৭৬) রুপোর মতো উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ। (৭৮) কেনা, খরিদ। (৮০) সম্পাদন, কার্য। (৮২) দর্শনযোগ্য বস্তু। (৮৩) লোক, মানুষ। (৮৪) হুঁকো-গড়গড়ায় যা সেবন করা হয়। (৮৫) যে-ফল দেখতে সুন্দর, কিন্তু স্বাদে অখাদ্য। (৮৭) শিলাবৃষ্টি। (৯০) মধুর স্বাদ, তাই আমের এই নাম। (৯৩) প্রণাম করছে এমন। (৯৪) প্রতিপালনকারী। (৯৫) টাকার লোভে লোকে এর টিকিট কেনে। (৯৬) একবেলা ভাতের বদলে যা খেতে আমরা অভ্যস্ত। (৯৭) মুহূর্ত। (৯৯) রক্তবর্ণ। (১০১) যত মত,—পথ। (১০২) বাঘের মতো প্রকাণ্ড। (১০৪) মণ্ডপ। (১০৫) অন্ধকার। (১০৭) লঙ্কায় এরাই ছিল রামচন্দ্রের পরম সহায়। (১০৮) প্রতারক, ধাপ্পাবাজ। (১১০) আঙুলের ডগায় থাকে। (১১২) বাসনা। (১১৩) শিবাজির গুরু। (১১৫) 'চিক্-চিক্ করে বালি কোথা নাই কাদা, এক ধারে—ফুলে-ফুলে সাদা।' (১১৮) সম্পত্তিশালী ধনবান। (১২০) অরণ্যবাবদ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব। (১২২) রবিশঙ্কর এই বাজনার পণ্ডিত। (১২৩) কটিবন্ধ। (১২৪) প্রতিজ্ঞা। (১২৫) চা এলেই গল্পের আসর যা হয়ে ওঠে।

উপর-নীচ : (১) চিরপ্রচলিত। (২) মিঠাই-এর দোকানে এর ওপর মিষ্টি সাজানো থাকে। (৩) আকাশ। (৪) কৌশল। (৫) পরাজয়। (৬) পেটে খিদে মুখে—। (৭) 'একবার না পারিলে দেখ—।' (৮) '—পেয়েছির দেশে কোথাও নেইকো কোঠাবাড়ি।' (৯) ব্যাঘাত, বিঘ্ন। (১০) বনফুল। (১১) বার্ধক্য, স্থবিরতা। (১২) শহর। (১৩) মতের অমিল। (১৬) টেলিভিশন। (১৭) যা তর্ক দ্বারা মীমাংসা করতে পারা যায় না। (১৮) এ কখনও আপন হয় না। (২১) একধরনের ফারসি বা আরবি কবিতা। (২৪) ফল ধরে এমন। (২৭) বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার, যিনি বলির দর্প চুর্ণ করেছিলেন। (৩১) '—তালবনরাজিনীলা।' (৩২) কারও পাকা ধানে—দিনে নেই। (৩৩) 'বিধি যখন—, কী করবেন বল রাম।' (৩৫) সমাজের প্রধান। (৩৬) বন্যা। (৩৮) যে লাভ করেছে। (৩৯) বিদেশ থেকে পণ্য আনা। (৪১) দক্ষিণ ভারতের একটি উন্নত ভাষা। (৪৪) একজাতের দিগম্বর সন্ন্যাসী। (৪৭) ইঙ্গিত, সঙ্কেত। (৪৯) যা হতে পারে না। (৫১) '—পেলে একটু থামি, দাঁড়ি পেলে দাঁড়াই।' (৫২) বন। (৫৩) আগের বার। (৫৪) মাছ বা মাংস বা সবজির বড়া। (৫৫) কিংশুক। (৫৬) বিনাশ। (৫৭) মনে জন্ম বলে কন্দর্পের এই নাম। (৫৯) যে-বয়স্ক লোকের গোঁফদাড়ি ওঠেনি। (৬০) পাকামি, বাচালতা। (৬২) শুশ্রূষাকারিণী। (৬৩) যেদিন গঙ্গাস্নানের ফল দশবিধ পাপ হরণ করে। (৬৬) গুণগান। (৬৭) ঠোঁটের কোণ, সৃক্কণী। (৭০) মাথা কাটা। (৭১) কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। (৭৩) যা টানলে ঘোড়া থামে। (৭৪) এই সময়ে বৈদ্য, ওষুধ সবই ব্যর্থ। (৭৫) হঠাৎ-পাওয়া সুযোগ। (৭৬) যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা। (৭৭) বলা হবে এমন। (৭৯) অজুহাত। (৮১) লক্ষ্মীদেবী। (৮৬) পাতলা করে কাট—মাছটিরে। (৮৭) পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। (৮৮) নৌকোর ওপরে বিছানো তক্তা। (৮৯) বিভিন্ন ধরনের সবজি। (৯০) নমস্কার। (৯১) যার তলের ছায়ায় বড় শান্তি। (৯২) নির্মল জল। (৯৩) সত্য জ্ঞান। (৯৪) একটুতেই ভয়ে অস্থির হয় এমন। (৯৮) হত্যা। (১০০) লজ্জা। (১০৩) বলীর—, নির্বলীর ঘুম। (১০৪) বিলিয়ে দেওয়া। (১০৬) স্নেহ, মায়া। (১০৭) বাসস্থান। (১০৯) চোরাই দ্রব্য। (১১১) সংবাদ, তথ্য। (১১২) খনি। (১১৪) স্ত্রী, পত্নী। (১১৬) '—হূনদল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।' (১১৭) দেবী সরস্বতীর কাছে যা লাভ করে মূর্খ কালিদাস মহাকবি হয়েছিলেন। (১১৯) অহঙ্কার, দর্প। (১২১) পর্বত।

(সমাধান ৫৬১ পাতায়)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

রঙ্গলাল

মানস রায়

রঙ্গলাল বসে আছে দাওয়ায়। মাটির ঘর। খড়ে-ছাওয়া ঘরের চার চালা। নতুন খড়ের গন্ধে চালার ওপর পাখিরা ভিড় করেছে। হুটোপাটি করছে। ঘরের চারপাশ ঘিরে চওড়া দাওয়া। নিকনো। সেই দাওয়াতেই একটা ভাঙা তক্তাপোশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে রঙ্গলাল।

সে তাকিয়ে আছে অনেক দূরে। দাওয়া-লাগোয়া গাছগাছড়ায় ভর্তি চৌকো উঠোন পেরিয়ে, সামনের আলের খোঁচা পথ পেরিয়ে তার চোখ চলে গেছে রেললাইনে।

রেললাইন বেয়ে, আল বেয়ে মানুষজনকে তার গ্রামে ঢুকতে হয়। গ্রামে ঢোকার মুখেই তার বাড়ি।

দহরপুর গ্রামটা একেবারে ধু-ধু মাঠের মাঝখানে। বর্ষায় ধানখেত যখন টিয়া-সবুজ হয়, তখন গ্রামটা ঝাঁকড়া চুলের মাথার মতো পৃথিবীর বুকে জেগে থাকে। আর এই শীতে ফসল-কাটা ন্যাড়া মাঠের মাঝে গ্রামটি নিঃসঙ্গ হয়ে প্রহর গোনে।

এখন অবশ্য তত শীত নেই। শীত যাই-যাই করছে। ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে। সকালে এই সময়টায় গা শিরশির করে। বেলা বাড়লে রোদের তেজ বেড়ে যায়। রাতে আবার সেই গা-শিরশিরানি ঠাণ্ডা।

রঙ্গলালের গা কিন্তু আদুর। শুধু ধুতিটা হাঁটুর ওপর তুলে খাটো করে কোমরে জড়ানো। সারা গায়ে খড়ির আঁচড়। মাথায় শনের মতো চুল। উসকোখুসকো মৃদু হাওয়ায় অল্প-অল্প কাঁপে। মুখে অজস্র ভাঁজ। চোখের জমি লাল। সেই লাল জমিতে জেগে আছে দুটো কালো চিকচিকে চোখ। সাদামাঠা সারা শরীরে একমাত্র চোখ দুটোই যা একটু অন্যরকম।

তার শীত করে না। দেশগ্রামের পৌষের ঠাণ্ডাও তার গায়ে লাগে না। বছরভর তার গা উদোম, তার কাছে সকালও যা, রাতও তা। সে রাত থাকতে ওঠে। শুকতারা তখন পুব আকাশে হেলে পড়ে। মরা চাঁদের আলো বাঁশঝোপের গায়ে এসে পড়ে না। সে উঠে তার দাওয়ার সামনে চৌকো উঠোনের একপাশে রাখা তুলসীতলায় জল দেয়। মনসাগাছে জল দেয়। আর বিড়বিড় করে বকে। তারপর আলো ফুটলে সে এসে বসে দাওয়ার এই তক্তাপোশটিতে। এবং চেয়ে থাকে রেললাইনের দিকে। অপলক। তার চোখে পাতা পড়ে না। তাকে কেউ কোনওদিন হাসতেও দেখেনি। যদি-বা কালেভদ্রে সে কখনও হেসেছে, সে-হাসি বড় অপার্থিব। কষ-ঘাটা হাঁয়ে কালো-কালো দাঁতের নড়বড়ে সারি বেরিয়ে পড়ে। থুতনির খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকে অপলক চোখ। হাসলেও

চোখের পাতা পড়ে না !

আজও তেমনই ভাবে তার দাওয়াটিতে বসে আছে রঙ্গলাল। এবং চেয়ে আছে পথের দিকে।

সকালের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা একটু আগে চলে গেছে। সকালে-বিকেলে দু'জোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে এ-লাইনে। আপ-ডাউন। বাকি সারাদিন শুধু মালগাড়ির মেলা। আর রাত বাড়লে মেলগাড়ির ছোটাছুটি। প্রান্তর জুড়ে ঝমঝম শব্দ। আগের দিনে ট্রেন চলে গেলে আকাশে ধোঁয়া কালো হয়ে থাকত। এখন ডিজেল এঞ্জিনের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয় না, শুধু শব্দ বাজে চরাচরে।

সেরকমই একটা শব্দ বাজছে এখন। এখান থেকে দেখা যায় না ; তবে ট্রেন আসে, থামে এবং চলেও যায়—তা টের পাওয়া যায়। কাছেই স্টেশন। রঙ্গলালের বাড়ি থেকে স্টেশন মাইল-তিনেক হবে। স্টেশনের পাশে দহরপুর বাজার। বাজারের আশপাশে কাঁচা-পাকা বাড়ির বসতি আছে।

ওই বাজার আর স্টেশনকে কেন্দ্র করে উত্তর-দক্ষিণে ও পুবে আরও ছ'-সাতটা গ্রাম মাইল পাঁচ-ছয়ের মধ্যে আছে। সেসব গ্রামে দহরপুর গ্রামের মতোই অনেক আদিবাসী মানুষের বসতি। এবং এইসব গ্রামের মানুষগুলোর একমাত্র পরিত্রাতা রঙ্গলাল। সাপে কাটা, ভুতে পাওয়া থেকে শুরু ওলাওঠা, পেঁচোয়-পাওয়া সব রকমের সঙ্কটে সিদ্ধহস্ত রঙ্গলাল। একেবারে ধন্বন্তরি গুনিন। বিপদে পড়ে সব্বাই ছুটে আসে। এ-অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও ভরসা এই রঙ্গলাল।

কিন্তু আজ কোথায় গেল মানুষগুলো ! রঙ্গলাল গম্ভীর মুখে তক্তাপোশে বসে থাকে। ট্রেনটাও চলে গেল। অন্যদিন ট্রেন থেকেও লোক নামে। আজ তো কই একটা মনিষ্যি পর্যন্ত এ-পথ মাড়াল না !

রঙ্গলাল রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকে। রেললাইনের ওপারে পশ্চিমদিকে কোনও গ্রাম নেই। আছে একটা মজা বিল। বিল পেরিয়ে মাইলখানেক গিয়ে শুরু হয়েছে জঙ্গল। জঙ্গলের পরে নুড়িপাথরের এক সোঁতা, তারপর উঁচুনিচু টিলার সারি, এবং তারপর ফের জঙ্গল। এই জঙ্গল সোজা চলে গেছে দুমকা মালভূমিতে।

রঙ্গলালের যখন বছর চোদ্দ বয়স, তখন সে পালিয়ে এসেছিল দুমকা মালভূমির এই জঙ্গলে। রঙ্গলালকে ওই একটু-একটু বড় হওয়ার বয়সটায় ভূতে পেয়েছিল। একদিন ঘুটঘুটে অন্ধকারের এক শেয়াল-ডাকা রাতে হঠাৎ তলপেট চেপে ধরে সে ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠে। অস্বাভাবিক এক ঘড়ঘড় শব্দ তার গলা থেকে বেরোতে থাকে। চোখ লাল

হয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। অস্বাভাবিক ওই ঘড়ঘড় শব্দে বাবার ঘুম ভেঙে যায়। মা-ও উঠে পড়েন। আট-দশটা ভাইবোন কান্না জুড়ে দেয়। বাবা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরে রঙ্গলালকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করেন। রঙ্গলালের শরীরে তখন কী শক্তি! বাবার একার সাধ্য কী রঙ্গলালকে বাঁধেন! আশপাশের বাড়ির ছেলেরা এসে পড়ে। সবাই মিলে রঙ্গলালকে কবজা করল। রঙ্গলাল বাঁধা অবস্থায় তখনও ফুঁসছে। রঙ্গলালকে ওইভাবে রেখে বাবারা সেই রাতেই ছুটলেন মালভূমির জঙ্গলে মনোহর ওঝাকে খবর দিতে।

মনোহর যখন এল তখন আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। সকালের আলোয় সে রঙ্গলালকে ভাল করে দেখল। এবং তারপরই সে রায় দিল, "এরে বোঙ্গায় ধরেছে।" টানা চার ঘণ্টা তার লেগেছিল রঙ্গলালের ঘাড় থেকে ভূত নামাতে। শরীর থেকে ভূত চলে যাওয়ার পর রঙ্গলাল কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল, কোনও ভারী অসুখ থেকে সবে উঠেছে সে। ওইরকম ঝিমিয়ে সে দিনচারেক মতো টানা ঘরে পড়ে ছিল। পঞ্চম দিনের দিন সে উধাও হয়ে যায়। বাবা তার খোঁজও করেননি। বরং এই ভেবে বাবার স্বস্তি এসেছিল যে, অন্তত একটা বোয়াল-পেট কমল। মা কিন্তু রঙ্গলালের জন্য কাঁদতেন।

রঙ্গলাল জানত, আর কেউ না-কাঁদুক মা তার জন্য চোখের জল ফেলবেন। সে মায়ের বড় ছেলে। মায়ের খুব আদরের। কিন্তু কী করবে রঙ্গলাল! ওই ঘটনার পর তার কিছুতেই বাড়িতে মন বসত না। একদিন তাই ঘুরতে-ঘুরতে হাজির হল মনোহরের ডেরায়।

মনোহরের ডেরায় সে বছর ছয়েক ছিল। ওই সময়ে সে শেখে সাপে-কাটা ও ভূতে-পাওয়া রোগীর চিকিৎসা। এ ছাড়া আরও নানা রোগের চিকিৎসার অলিগলি সে রপ্ত করে। তারপর একদিন মনোহরের ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। পুবমুখো হাঁটতে-হাঁটতে সোঁতা, জঙ্গল, টিলা পেরিয়ে চলে আসে এই দহরপুরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঙ্গলাল। তারপর মাঝে কত বছর কেটে গেল! তখন কোথায় ছিল এই ইট-বালির পাকা স্টেশন, স্টেশন-লাগোয়া বাজার, বসতি, সাইকেল ভ্যান। তখন কি ছাই লাইনের পাশে দোসর আরও একটা রেললাইন পাতা ছিল, না এত খেতি-জমি বুক চিতিয়ে শুয়ে ছিল! সবই রঙ্গলালের চোখের সামনে গড়ে উঠল। এত লোক ছিল না, লোক বাড়ল। তাদের এত রোগ ছিল না, রোগ বাড়ল। রঙ্গলালের এত খ্যাতি ছিল না, খ্যাতি বাড়ল। তার এত বয়সই কি ছিল তখন!

হাঁটুর ব্যথাটায় এখন বয়স মালুম হয় রঙ্গলালের। তার গুরু বলেছিল, "সাড়ে সাতশো পুন্নিমার আলো শরীলে ছুঁলে ব্যতা-বেদনা চাগাড় দেয়।" রঙ্গলালকে কি সাড়ে সাতশো পুন্নিমার আলো ছুঁয়েছে?

রঙ্গলালের কাছে তার হিসেব নেই। এত হিসেব সে রাখবে কখন? সকাল থেকে সন্ধে মানুষগুলো আসছে তো আসছেই। রঙ্গলাল নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত পায় না। কিন্তু আজ হলটা কী? মা-মনসা বা শীতলা ঠাকরুন কি সব ঘুমিয়ে পড়লেন! বাবা শিবের চ্যালারাই বা করছেটা কী? একটা মানুষের ঘাড়ে চাপতেও কি তাদের পা ব্যথা করছে?

এদিকে সকালের ট্রেন চলে গেল।

চৌকো উঠোনে পিপুলগাছের ছায়াও লম্বা হচ্ছে।

রঙ্গলালকে বিড়বিড় করতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বউ। তার হাতে অ্যালুমিনিয়ামের কান-তোলা কাঁসিতে খানিক মুড়ি এবং গেলাসে চা। মুড়ির কাঁসি আর চায়ের গেলাস জানলার কার্নিসে নামিয়ে রাখল বউ। এই সময় ওই অবস্থায় রঙ্গলালকে বিরক্ত করতে নেই, সে জানে। রঙ্গলালের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা এবং ভয়ও। দুনিয়ার ছত্রিশ কোটি দেবদেবী রঙ্গলালের বশীভূত। ভূত-প্রেতও সব তার পোষা। আজ্ঞাবহ। এমন একটা লোককে তার মতো এক সাধারণ মহিলা ভয় বা শ্রদ্ধা না করে পারে!

কাঁধের আঁচলটাকে গলায় পেঁচিয়ে গুটি-গুটি পায়ে রঙ্গলালের সামনে গিয়ে টিপ করে প্রণাম করল বউ। তারপর উদ্বিগ্ন মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "তেনারা এয়েচেন?"

রঙ্গলাল মুখে কোনও কথা বলল না। সে আড়চোখে বউয়ের গদগদ ভাব আর উদ্বেগ দেখে চোখ বুজে ফেলল। তারপর দ্বিগুণ জোরে বিড়বিড় করতে-করতে নিজের মাথার চুল খামচে ধরল। অর্থাৎ তার শরীরে সত্যি-সত্যিই তেনারা এয়েচেন। দেব-দেবী, ভূত-প্রেত তার শরীরে ভর করছে।

রঙ্গলাল বউয়ের বিশ্বাস ভাঙতে চায় না। বউ বিশ্বাস করে, চারপাশে সবার অলক্ষে দেব-দেবীরা রাগী-রাগী মুখ নিয়ে সবসময় ঘুরে বেড়ান। পান থেকে চুন খসলে তাঁরা মানুষের শরীরে রোগ ঢুকিয়ে দেন। দেব-দেবীদের মতোই ভূত-প্রেতদেরও দেখা যায় না, কিন্তু তাদের দুষ্টুমি টের পাওয়া যায়। যখন-তখন তারা মানুষের শরীরে ঢুকে দাপাদাপি শুরু করে দিতে পারে। তবে তার কর্তার কাছে এরা কেউই সুবিধে করতে পারে না। এদের সকলের টিকি কর্তার হাতে বাঁধা। কর্তা যা বলবে সকলকে তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতেই হবে। এমনকী দেব-দেবীরা পর্যন্ত কর্তার কথা ফেলতে পারেন না। এ নিয়ে রঙ্গলালের বউয়ের খুব গর্ব, এবং সেইসঙ্গে কর্তার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ও ভয়ও।

সেবার বর্ষার ঠিক শুরুতে নারায়ণগড় থেকে একটা মেয়েকে আনা হয়েছিল। মেয়েটার বয়স বছর পনেরো। তাকে ভূতে পেয়েছে। সে সন্ধেবেলা বাঁশবাগানে গিয়েছিল। ভূতটা তখনই ধরে তাকে। প্রথমটায় তত বোঝা যায়নি। মেয়েটা এমনিতে ছটফটে, কিন্তু বাঁশবাগান থেকে বাড়ি ফেরার পর কেমন গুম মেরে গিয়েছিল। সাড়ে আটটায় ডাউন ধৌলি চলে যাওয়ার পরও মেয়েটা একই রকম গুম মেরে ছিল। নৃত্য শুরু করল রাতের প্রথম প্রহরের শুরুতে। তাকে থামানো যায় না। তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলছে, মাটিতে-দেওয়ালে মাথা ঠুকছে। দাঁতে দাঁত দিয়ে কখনও চোখ কপালে তুলে হাত-পা ছুড়ছে। বাড়ির জোয়ান ছেলেরাও তাকে আটকে রাখতে পারছে না। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায় শেষে মেয়েটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সে রাতটার জন্য ফেলে রাখা হয়েছিল। ভোর হতেই তাকে রঙ্গলালের কাছে নিয়ে আসা হয়।

রঙ্গলালের বউ ঘটনাটা দেখেছে। মেয়েটাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই চ্যাংদোলা করে রঙ্গলালের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। রঙ্গলাল তীক্ষ্ণ চোখে এক পলকের জন্য মেয়েটাকে দেখেছিল। তারপর উত্তরদিকের ঘরটায় ওই অবস্থাতেই মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

বউয়ের স্পষ্ট মনে আছে সেই ভূতে-মানুষে লড়াই। রঙ্গলাল যত জোরে মন্ত্র পড়ে তত জোরে চেঁচায় মেয়েটা। আর সে কী অপার্থিব গলার

স্বর মেয়েটার! ঘণ্টাখানেক পর রঙ্গলালের মন্ত্র পড়ার শব্দ ধীরে-ধীরে কমে আসতে থাকে। মেয়েটাও ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। তারপর হঠাৎই একসময় বন্ধ ঘরের দরজা হাট হয়ে খুলে যায়। রঙ্গলাল টলতে-টলতে বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় উবু হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ঘরে মেয়েটারও কোনও সাড় নেই। মিনিট পাঁচেক পর রঙ্গলাল উঠে বসল। দুধ আনা হয়েছিল। গরম করা হল। রঙ্গলাল ঢকঢক করে এক গেলাস দুধ খেল। বিড়ি ধরাল। তারপর বলল, "গহন রাতের চেয়েও সাঁঝে তেনারা বেশি অশিষ্ট হন। আগানে-বাগানে ওত পেতে থাকেন। সুযোগ পেলেই তাঁরা শরীলে ঢুকে যান। সাঁঝের ভূত নামাতে তাই কষ্ট হয় বেশি।"

স্বামীর এরকম অনেক ঘটনাই দেখেছে বউ। সত্যি, মানুষটার কী ভয়ঙ্কর ক্ষমতা! আরও একবার গলায় আঁচল দিয়ে রঙ্গলালের পায়ে মাথা ঠুকল বউ।

রঙ্গলাল আচমকা হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল। বউ ভয় পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। রঙ্গলাল শুধোল, "খিদা লেগেছে। যা, কিছু নিয়ে আয়।"

বউ বলল, "ওমা, তাই তো, মুড়িগুলা তো জানলার কার্নিসেই পড়ে আছে।"

রঙ্গলাল বলল, "তবে আর কী, যাঃ। দেব-দেবী, ভূত-প্রেতগুলোকে না খাইয়ে রাখবি নাকি!"

রঙ্গলালের খাওয়া মানে পৃথিবীর সব দেব-দেবী আর ভূতের দলের সেবা করা। বউ এটা জানে। সে এক হাত জিভ কেটে ছুটল মুড়ি আনতে। দেরি হলে তেনারা অসন্তুষ্ট হবেন। পরিবারে অমঙ্গল নেমে আসবে।

কিন্তু মুড়ি নিয়ে এসেও বউ দেখল, রঙ্গলাল একভাবেই হেসে চলেছে। বউয়ের খানিক স্বস্তি হল, আবার আশঙ্কাও হল এই ভেবে যে, রঙ্গলাল এত হাসছে কেন, হাতেই বা ওই আয়না কেন, কোথা থেকে এল ওই আয়না? ওই আয়নাটা কি সে মুড়ি আনতে যাওয়ার আগে রঙ্গলালের হাতে দেখেছে? এই আয়নাটা তো রঙ্গলাল আয়না-চালুনির সময় ব্যবহার করে!

রঙ্গলাল আয়নায় মুখ দেখছে আর হ্যা-হ্যা করে হাসছে। হাসতে-হাসতেই আয়নার দিকে তাকিয়ে রঙ্গলাল বলল, "বউ, একটু কাঁচা দুধ আনতে পারিস?"

কাঁচা দুধ দিয়ে আয়না-চালা হয়, বউ এটা জানে। আজ রোগী নেই। রঙ্গলালের হাত খালি। তাই কি সে

আয়না চেলে অভ্যেসটা রাখছে? বউ খুশি হল। মনে-মনে বলল, 'ভালই হল। অনেকদিন মেয়েটার কোনও খবর পাইনি। আয়না চাললে মেয়ের একটা খবর নিশ্চয় পাওয়া যাবে।' বউ ছুটল কাঁচা দুধ আনতে।

রঙ্গলাল থালা থেকে একমুঠো মুড়ি গালে দিল। একমুঠো আয়নার দিকে ছুড়ল। বাঁ হাতে ধরা ছিল আয়নাটা। আয়নায় লেগে মুড়ি মাটিতে পড়ে গেল। আবার একগাল মুখে পুরল রঙ্গলাল। একমুঠো আয়নার দিকে ছুড়ে মারল। এইভাবে আট গাল রঙ্গলাল নিজে খেল, আট মুঠো আয়নায় ছুড়ে মারল। রঙ্গলালের পায়ে-পায়ে-থাকা কালো কুকুরটা মাটিতে পড়ে যাওয়া মুড়ি খেতে লাগল।

রঙ্গলালের হাসি কিন্তু থামেই না। বউ এনে দিল কাঁচা দুধ। কাঁচা দুধ সে আয়নার ওপর থেকে ধীরে-ধীরে ঢালতে থাকল। একবার, দু'বার, তিনবার। সাতবারের বার মন্ত্র পড়তে গিয়ে রঙ্গলাল গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। মাঝপথে মন্ত্র থামিয়ে আবার মন্ত্র পড়তে লাগল। কেটে-কেটে। আটবারের বার আরও ধীরে-ধীরে দুধ ঢালতে লাগল আয়নায়। মুখ তার থমথমে। মন্ত্র পড়া সে শেষ করল কোনওমতে। তারপর কাপড়ের খুঁট দিয়ে আয়না মুছতে-মুছতে বলল, "ভাল ঠেকছে না রে বউ। মেয়েটাকে কেন দেখলাম আয়নায়? এবং ওইভাবে?"

বুকটা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বউয়ের। সে ডুকরে কেঁদে উঠল, "খারাপ কিছু দেখলে নাকি?"

রঙ্গলাল বলল, "আমি ভাবছি, আয়নায় কেন ভেসে উঠবে মেয়েটার শুকনো মুখ? একবার নয়, বারবার!"

বউ বলল, "ও আমার কী হল গো? ওইজন্য কাল থেকে মনে কু গাইছিল। তোমায় বলিনি। আজ দ্যাখো, আয়নাই বলে দিল।"

রঙ্গলাল আশ্বাস দিয়ে বলল, "চিন্তা করিস না। কিচ্ছু হবে না। আমারও তো দেখতে ভুল হতে পারে।"

বউ কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "তোমার কক্ষনো ভুল হয় না। তুমি ঠিকই দেখেছ।"

মায়ের কান্না শুনে ছেলে এগিয়ে এল। সে খেতখামারে কাজ করে। সে বেরোচ্ছিল। দাঁড়িয়ে গেল। ছেলেকে দেখে মায়ের কান্না আরও বেড়ে গেল, "ওরে দ্যাখ না, আমার সব্বোনাশ হয়ে গেল...মেয়েটার আমার কী হল গো..."

রঙ্গলাল বলল, "মাকে ভেতরে নিয়ে যা। এক্ষুনি হয়তো লোকজন এসে পড়বে।"

ছেলে বলল, "বাবা, ঠিক দেখেছ তো ?"

রঙ্গলাল বলল, "আমি তো সাধারণত ভুল দেখি না। আয়না আমাকে মিথ্যে বলতে সাহস করবে না।"

মায়ের মতো ছেলেরও অগাধ বিশ্বাস বাবার ওপর। সে বলল, "তাই তো, তুমি ভুল দেখবে কেন ? তুমি কোনওদিন ভুল দ্যাখোনি।"

রঙ্গলাল ত্রস্ত হয়ে বলল, "বয়স হয়েছে। আমার ভুল হতেই পারে।"

ছেলে গলা ঝাঁকিয়ে বলল, "নাহ্, অসম্ভব ! হতেই পারে না।" একটু থেমে বলল, "তা হলে কি আমি ওর বাড়ি ঘুরে আসব ?"

মা বললে, "তাই যা বাবা।"

রঙ্গলাল বলল, "কী করে যাবে এখন ? সকালের আপটা তো চলে গেছে।"

মা কান্না চেপে রাখতে-রাখতে বলল, "তবে ?"

রঙ্গলাল নির্বিকারভাবে বলল, "কোনও চিন্তা নেই। একটা দিন তো। কিচ্ছু হবে না। কাল সকালের ট্রেনে বেটা চলে যাক।"

মাকে সরিয়ে নিয়ে গেল ছেলে। বাড়ির ভেতর থেকে বউয়ের চাপা কান্নার গুন্‌গুন শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছেলে বেরিয়ে গেছে। রোদ খানিক তেতে উঠেছে। রঙ্গলাল সেই আগের মতো আবার তক্তাপোশের ওপর একই ভঙ্গিতে বসে। চেয়ে আছে সামনের পথের দিকে। ভাবছে। এটা সে কী করল ?

ভাবছে রঙ্গলাল। এটা কি সে ঠিক করল ? নিজের মেয়ের নামে বউ-ছেলের কাছে শেষে মিথ্যেটা বলে বসল ! ছেলে ও বউ তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। তার কথা তারা শেষ কথা হিসেবে নেয়। অথচ সে কিনা শেষে তাদের সঙ্গে ছলনা করল, তাও মেয়ের নাম দিয়ে !

আসলে রঙ্গলাল বড় অসহায়। সে সত্যি বলতে পারে না। সবসময় তার মুখ দিয়ে মিথ্যে কথাটাই বেরিয়ে পড়ে। সে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। এটা তার পেশাদারি অভ্যেস। গত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে সে শুধু মিথ্যে কথাই বলে এসেছে, লোকদের ভয় দেখিয়ে এসেছে। লোকে ভয় না পেলে তার পেটের ভাত জুটবে কেমন করে ? সংসারই বা সে কী করে চালায় ?

লোকে জানে, তার অন্তত দশটা পোষা ভূত আছে। সে রুষ্ট হলে এই ভূতগুলোকে সে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, আবার তুষ্ট হলে ভূত নামিয়েও দেয়। অনেক অবাধ্য ভূতকে সে শায়েস্তাও করতে পারে। কিন্তু রঙ্গলাল তো জানে ভূত বলে কিচ্ছু নেই। তার এই এত বছর হয়ে গেল, সে একদিনও একটা ভূতও দেখেনি। আসলে নানা কারণে মানুষগুলোর খিঁচুনি ধরে। মানুষগুলো তাই ছটফটায়। ভাবে ভূতে ধরেছে। কিন্তু এই আসল তত্ত্বটা মানুষগুলোকে জানালে রঙ্গলালের কি পেট চলবে ? পেট চালাতে গেলে রঙ্গলালকে ভয় দেখাতেই হয়।

দেব-দেবীর ব্যাপারেও রঙ্গলাল একই ভাবে মানুষগুলোকে ভয় দেখায়। সে বলে, "দেহের প্রত্যেকটা রোগের মূলে কোনও-না-কোনও অসন্তুষ্ট দেব বা দেবীর রোষ। এইসব দেব-দেবী তুষ্ট না হলে রোগ সারে না। আর এঁদের তুষ্ট করার কৌশল একমাত্র তারই জানা। সব দেব-দেবীই তার হাতের মুঠোয়।" লোকেরাও তা বিশ্বাস করে। অতএব আগে তারা রঙ্গলালকে তুষ্ট করে। রঙ্গলাল তুষ্ট হলে দেব-দেবীরাও তুষ্ট। রোগ থেকে মুক্তি। রঙ্গলালের আয় হয়।

অথচ রঙ্গলালের চেয়ে আর বেশি কে জানে যে, ভূতের মতোই দেবদেবীরাও তার কথা আদৌ পাত্তা দেন না। মা-মনসা, মা-শীতলা, বনবিবি সব্বাই তাকে বুঝে গেছেন। তবু পীড়িতের পরিবারের সামনে তাকে মা-মনসাদের সঙ্গে কথা বলতেই হয়। লোকে ভয়ে-বিস্ময়ে দেখে তার ক্ষমতা। এসবই স্রেফ লোক দেখানো। মানুষ বাঁচে আয়ুর জোরে।

কিন্তু কীই-বা করতে পারে রঙ্গলাল ? তার শরীরে সাড়ে সাতশো পুন্নিমার আলো ছুঁয়েছে। দেখতে-দেখতে কত বেলা গড়িয়ে গেল। এই এতদিন শুধুমাত্র জীবিকার জন্য সে মিথ্যের জাল বুনে-বুনে মানুষগুলোর সঙ্গে অভিনয় করে গেছে। আসল রঙ্গলালকে কেউ দেখতে পায়নি। মুখোশের আড়ালে থেকেই সে কাটিয়ে দিল গোটা জীবন।

এমনকী ছেলে-বউয়ের কাছেও সে তার মুখোশটি খোলে না। অভ্যাসবশেই খোলা হয় না। এই যে আজ সকালেও সে মুখোশটা খুলতে ভুলে গিয়েছিল। বউয়ের গদগদ ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে মুখোশ খোলার কথা মনে ছিল না তার। আয়না চেলে তাই সে ফট করে মেয়ের নামেই মিথ্যে কথাটা দিব্যি বলে ফেলেছিল।

রঙ্গলালের মন খারাপ হয়ে যায়। সে চুপ করে তক্তাপোশে বসে থাকে। বসেই থাকে। থম-মারা সকাল গড়িয়ে যায়। প্রান্তর কাঁপিয়ে মালগাড়ি চলে যায়। অনেক উঁচুতে চিলেরা ঘুরপাক খায়। কালো কুকুরটা তক্তাপোশের পায়ার কাছে ঝিম মেরে পড়ে থাকে। বউয়ের কান্নায় গোঙানি শোনা যায় একটানা।

ছেলে বেরিয়ে গেছে কাজে। বউ রান্নাঘরে। কাঁদতে-কাঁদতেই রাঁধছে। বাসন-কোশনের ঠ্যংঠাং শব্দ ভেসে আসছে। একবার বউ কুয়োতলায় গিয়েছিল। এই দাওয়ার পাশ দিয়ে উঠোন পেরিয়ে যেতে হয় কুয়োতলা। রঙ্গলাল মনে-মনে এতই কুঁকড়ে ছিল যে, বউয়ের দিকে সরাসরি মুখ তুলে চাইতে পারেনি। আড়চোখে চেয়ে দেখেছে, বউয়ের মুখ থমথমে, চোখে জল নেই, শুধু থেকে-থেকে ফোঁপাচ্ছে শব্দ করে।

দুপুরে খেতে বসেও রঙ্গলাল দেখেছে, বউয়ের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। একই ভাবে ফুঁপিয়ে চলেছে তার বউ। মরমে মরে যায় রঙ্গলাল। সে ভাল করে খেতে পারে না। কোনওরকমে চাট্টি খেয়ে ফের তক্তাপোশে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে বসে। বউয়ের সামনে সে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারছিল না।

রঙ্গলালের রাগ হয়ে যায়। এই সময়ে একটাও রোগী আসে না কেন ? দেশ থেকে কি সাপেরা সব উধাও হয়ে গেছে ? ভূতেরা কি সব কৈলাসে পালিয়েছে ? না কি ওঝা দেখার আগেই সাপে-কাটা রোগীরা ভাল হয়ে গেছে, কিংবা ভূতেরা ঘাড় থেকে নেমে পড়েছে ?

রঙ্গলাল বিড়বিড় করে। এই সময় একটা রোগী-টোগি এলে বরং খানিক সময় কাটত। অন্তত এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা তো খানিক কাটিয়ে ওঠা যেত।

বিকেল গড়িয়ে আসে। রোদ অনেক নরম হয়ে পড়ে। বিকেলের ডাউন ট্রেনটা চলে গেল। রঙ্গলাল দেখল, লাইন বেয়ে কিছু লোক এসে আলের পথ ধরল। রঙ্গলাল নড়েচড়ে বসল। ভাল করে চাইল। লোকগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে তারই বাড়ির দিকে। তাদের কাঁধে চারপেয়ের ওপর শুয়ে একটা মানুষ। কী আবার রোগ বাধাল

মানুষটা ?
লোকগুলো সোজা হেঁটে এসে রঙ্গলালের উঠোনে উঠল। তাদের কাঁধ থেকে চারপেয়েটাকে নামিয়ে রাখল। কিন্তু এ কে ? রঙ্গলাল চমকে উঠল। সে দু' হাতে মুখ ঢেকে ককিয়ে উঠল, "না, না, এ আমি চাইনি।"

বউ ছিল বাড়ির ভেতরে। সারাদিনই সে ফুঁপিয়ে গেছে। রঙ্গলালের চিৎকার শুনে তার ফোঁপানি বন্ধ হয়ে গেল। কত রকমেরই তো রোগী আসে, অনেকে মরেও যায় চোখের সামনে, কই রঙ্গলাল তো এভাবে চিৎকার করে ওঠে না। বউ ভেতর থেকে ছুটে এল উঠোনে। দেখল, তার মেয়ে চারপেয়ের ওপর শুয়ে আছে। নিথর।

সে মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল, "এ আমার কী সর্বনাশ করলে গো !"

মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিল রঙ্গলাল। তার চোখ জলে ছলছল করছে। সে স্বরভাঙা গলায় বারবার বলতে থাকল, "বিশ্বাস কর, এ আমি চাইনি ! বিশ্বাস কর..."

বউ উথালিপাথালি খেতে-খেতে বলল, "জানতাম, তোমার কথাই সত্যি হবে। তোমার আয়না-চালা কখনও ভুল হয় না।"

দলে ছিল জামাই, বেয়াই আর জামাইয়ের জনাকয়েক বন্ধু। রঙ্গলালের বউয়ের কথা শুনে তারা সবাই রঙ্গলালের দিকে তাকাল।

বেয়াই বলল, "তুমি আয়না চেলেছিলে ?"

রঙ্গলাল হাতজোড় করে কাতর স্বরে বলল, "বিশ্বাস করো তোমরা, এসব ভুল। আয়না-চালাচালি সব মিথ্যে। ওসব বুজরুকি।"

বেয়াই ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তবে আর কী ? যা হওয়ার হয়েছে। রঙ্গলাল কখনও মিথ্যে গুনতে পারে না।"

রঙ্গলাল প্রায় আর্ত চিৎকার করে উঠল, "না, না, এসব বাজে, মিথ্যে, বুজরুকি।"

রঙ্গলালের কথায় কেউ কান দিল না। তার কথা কেউ বিশ্বাসও করল না। রঙ্গলালের প্রতি তাদের এতদিনের বিশ্বাস তার একদিনের কথায় তারা উড়িয়ে দেবে কেমন করে !

বেয়াই বলল, "ওসব ছাড়ো রঙ্গ, দ্যাখো মেয়েটাকে বাঁচাতে পারো কি না। এখনও বোধ হয় শ্বাস পড়ছে।"

এখনও বোধ হয় শ্বাস পড়ছে ! চকিতে মেয়ের দিকে ফিরে তাকাল রঙ্গলাল। ভেসে যাওয়া জলে চোখ ঝাপসা। ওই ঝাপসা চোখে তাকিয়ে তার মনে হল, মেয়েটার চোখ পিটপিট করছে। ধীরে-ধীরে। খুবই ধীরে।

রঙ্গলাল একছুটে মেয়ের কাছে গেল। ঝটকায় বউকে সরিয়ে দিল। তারপর নিচু হয়ে মেয়ের শরীরে প্রায় নাক ঠেকিয়ে শুঁকতে লাগল। বউ তড়িঘড়ি উঠে একটা আকন্দের মালা কোনওরকমে গেঁথে রঙ্গলালকে পরিয়ে দিল। এসব উপচার তার জানা। এতদিন ধরে চিকিৎসায় রঙ্গলালকে সাহায্য করতে-করতে কোন রোগের অনুষ্ঠানে কী উপচার লাগে তা তার মুখস্থ। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার শুরুতেই গুনিনকে আকন্দের মালা পরিয়ে দিতে হয়। তখন মা মনসা অধিষ্ঠিত হন ওই মালায়। এর পর গুনিন রোগীর ক্ষতস্থান থেকে যত রক্ত চুষে নেবে ততই মালাটা নীল হয়ে উঠবে। মানে, দেবী নিজের কাছে বিষ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। শেষে রোগী বিষমুক্ত হয়ে চোখ খুলে তাকায়। আর মালাটা যদি তখন নীল হয়ে না ওঠে তা হলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য।

বেয়াই বলল, "কাল সন্ধেরাতে কেটেছে। বাঁ-পায়ের গোছে। চার আঙুল অন্তর তিনটে তাগা বেঁধে দিয়েছি।"

রঙ্গলাল দেখল, মেয়ের পায়ের পাতার খানিকটা ওপরে সুচ ফোটার মতো চারটে সরু ফোঁটা। ক্ষত ফুলে উঠেছে। ক্ষতের চারপাশে বেশ খানিক জায়গা জুড়ে হালকা নীল রং। এখনও কি বিষটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েনি !

সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষতের ওপর। তারপর শুষতে থাকে।

রঙ্গলালের মুখ নিচু। মেয়ের পায়ের ওপর উপুড়-করা। কেউ দেখতে পায় না তার মুখ। জলে ভেসে যায় তার দু'চোখ। সে নিজের কাছে নিজেই হেরে গেছে। নিজের কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। তার শরীরের সব শক্তি যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে জোর পাচ্ছে না। হাত-পা ছেড়ে যাচ্ছে। চোখের জলে ভাসতে-ভাসতে তার এখন বড় ইচ্ছে করছে, সে যদি সাধারণ মানুষ হত, বড় ভাল হত ! সাধারণ মানুষের মতো তারও তখন স্থির বিশ্বাস থাকত, আকন্দের মালা একসময়ে নীল রং নেবেই, মা মনসা মেয়ের শরীরের সব বিষ ফিরিয়ে নেবেন, এবং মেয়ে দু'চোখ মেলে তাকাবে। কিন্তু সে তো হওয়ার নয়। এ সত্য তার চেয়ে বেশি কে আর জানে ?

তবু রঙ্গলাল শেষ শক্তি দিয়ে প্রাণপণে ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে টানতে লাগল। এবং এক সময়ে সে মেয়ের পায়ের ওপরই সংজ্ঞাহীন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

অনেক রাতে রঙ্গলালের জ্ঞান ফিরে এল। সে চোখ মেলে দেখল, তার সেই দাওয়ার তক্তাপোশের ওপর সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। মাথার ওপর আকাশভরা তারা ছেয়ে আছে। তাদের চাঁদোয়ার তলায় পৃথিবীটা বড় অন্ধকার এবং চুপচাপ।

রঙ্গলাল উঠে বসল। দেখল, বউ দাওয়ায় তক্তাপোশে পিঠ দিয়ে মাথা দু'হাঁটুর মাঝে গুঁজে মাটিতে বসে আছে। কালো কুকুরটা একটু তফাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। উঠোন সুনসান।

বুকটা হুহু করে উঠল তার। মনে পড়ল সব কথা। উঠে দাঁড়াল। দু'পা এগিয়ে দাওয়া থেকে নেমে উঠোনের দিকে ফের তাকাল। মাথাটা বড় ঝিমঝিম করছে।

বউ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

অতবড় নৈশঃব্দ্যের মধ্যে বউয়ের আচমকা গলার স্বরে চমকে উঠল রঙ্গলাল। একটু সামলে বউকে পালটা প্রশ্ন করল, "ওরা কোথায় ? মেয়ে ?"

বউ ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "শ্মশানে।"

বউয়ের মতো রঙ্গলালেরও ইচ্ছে হল অমনভাবে কেঁদে ওঠে। পারল না। কাঁদতে গেলেও তো বড় শ্বাসের দরকার হয়। সেরকম একটা বড় শ্বাসও সে নিতে পারছে না যেন ! কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ দুর্বল লাগছে শরীরটা ! গলার কাছে বড় ঢেলাটা আটকে আছে। ওটা সরাতে না পারলে সে বড় শ্বাসটা নেয় কেমন করে ! কেমন করেই বা সে বউয়ের মতো কেঁদে ওঠে !

বউ ফের জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

রঙ্গলাল ধীর পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে মাথা নিচু করে অস্ফুটে বলল, "শ্মশানে।"

বউ রঙ্গলালের কথাটা শুনতে পেল না।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

দৃষ্টিহীনদের পথ দেখাবে গোলেজের আবিষ্কার

সুব্রত রায়

চোখবাঁধা অবস্থায় কারও পক্ষে কি যাওয়া সম্ভব ধর্মতলার মোড় থেকে বি বা দী বাগ ? প্রায় অসম্ভব এই কাজকে সম্ভব করে তুলতে উঠেপড়ে লেগেছেন এক দৃষ্টিহীন বিজ্ঞানী, ডাঃ রেজিনাল্ড গোলেজ। গোলেজের এই আবিষ্কার দৃষ্টিহীনদের নতুন আলোর সন্ধান দেবে।

কথায় আছে, 'রাজা কর্ণেন পশ্যন্তি'। বিজ্ঞানের কল্যাণে এবার কেবল রাজা নন, সাধারণজনও কানে দেখবেন। সুবিধে হবে দৃষ্টিহীনদের। ধরা যাক, চোখবাঁধা অবস্থায় কাউকে ধর্মতলার মোড় থেকে বি বা দী বাগ যেতে বলা হল। কত বাস রাস্তা, ট্রাম, ট্যাক্সি, মিনির জ্যাম পেরোতে হবে তা মোটামুটি জানি। প্রতিদিন খোলা চোখে এই পথ যেতে অনেককেই নাকানিচোবানি খেতে হয়। চোখবাঁধা অবস্থায় একা যাওয়া অসম্ভব ! যদি না কেউ তোমার কানে পুঙ্খানুপুঙ্খ রাস্তার বিবরণ বলে দিতে থাকে। ডান দিকে লোহার থাম। সামনে জল। ওখানে একটু উঁচুমতো। বাঁ দিকে একটা ট্রাম। ওদিক থেকে একটা বাস ভীমগতিতে এগিয়ে আসছে। প্রায় চার সেকেণ্ডের মধ্যে ঘাড়ে এসে পড়বে। সরে দাঁড়াও। এবার বেশ কিছু মানুষ রাস্তা পার হচ্ছে। এগিয়ে চলো। পাথর দেখে। গোত্তা লাগলে আঙুল ছেঁচে যাবে। সামনে একটা গর্ত। ছোট্ট লাফ দিতে হবে। প্রায় পথ পেরিয়ে এসেছ। সাবধান। জোরে পা চালাও। একটু ডান দিক চেপে চলো। আবার বাঁ দিক থেকে একটা ট্রাম আসছে।

কনগ্রাচুলেশন। একটা বড় রাস্তা পেরোলে।

এমন অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন এক দৃষ্টিহীন বিজ্ঞানী। ডাঃ রেজিনাল্ড গোলেজ। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া সান্তা বারবারায় তিনি ভূগোল বিষয়ে গবেষণা করেন। সম্প্রতি গোলেজের তৈরি অন্ধ মানুষের জন্য অভিনব এক 'নেভিগেশন সিস্টেম'-এর 'প্রোটোটাইপ' পরীক্ষা করে দেখা হয়। পরীক্ষা করেন গোলেজ নিজেই। দর্শকদের সামনে চোখে কালো চশমা, কানে হেডফোন বাঁধা গোলেজ অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পথ হেঁটে দেখালেন। কেউ যেন তাঁর কানে বলে দিচ্ছে ওখানে লাইব্রেরি। এই সিঁড়ি। ওই রাস্তা। বেঞ্চ-ফুটপাথ বাঁ পাশে। বেথেসডা ম্যাডিসনে ন্যাশনাল আই ইনস্টিটিউট। আমেরিকার এই গবেষণাগারে চক্ষুরোগের সাম্প্রতিকতম বহু বিষয়ে গবেষণা চলছে। আই ইনস্টিটিউটের 'ভিশুয়াল প্রসেসিং প্রোগ্রাম'-এর ভারপ্রাপ্ত ডাঃ মাইকেল ওবের ডোরফেরের মতে গোলেজের এই আবিষ্কার দৃষ্টিহীনদের জগতে অভাবনীয় মুক্তির দরজা খুলে দেবে। গোলেজের গবেষণার কাজে অর্থকরী সাহায্য মিলেছে আই ইনস্টিটিউট থেকেই।

মহাকাশে ন্যাভস্টার গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম

কৃত্রিম উপগ্রহ এবং...

মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর খবর প্রচুর। তবে সুফল অনেক। ১৯৯৩ সালে ডিজিটাল এভিওনিকসের জগতে স্যাটেলাইটের ফলে এসেছে 'গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম' বা 'জি পি এস আই'। ফলে ভারতবর্ষ সমেত বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশের গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট পাঠানোর চাহিদা বেড়েছে। দাম কমেছে রিসিভারের। হাজার ডলারের কম খরচে এখন এমন রিসিভার পাওয়া যায়, যা দিয়ে সুদূর মহাশূন্যে বসে পৃথিবীর মাটিতে কোনও বস্তু বা জায়গার অবস্থান ১০০ মিটারের মধ্যে নিখুঁত করে বলা যাবে। আর এই স্থান নির্দিষ্টকরণের কাজ সম্পূর্ণ করতে লাগবে মাত্র ১০০ ন্যানো সেকেন্ড। ন্যানো সেকেন্ড হল সেকেন্ডের ১০০ কোটি ভাগ। জি পি এসের সাহায্যে উন্নত, আধা উন্নত বিমানবন্দরগুলিতে আজকাল সম্পূর্ণ স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে বিমান ওঠানো-নামানো হচ্ছে। খুব প্রয়োজন না হলে পাইলট এবং সহকারীর কাজ এ-ক্ষেত্রে চুপচাপ বসে থাকা।

জি পি এসে-র আধুনিক সংস্করণ হল 'ডিফারেনশিয়াল জি পি এস' অথবা 'ডি জি পি এস'। এই ব্যবস্থায় কোনও জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট করে প্রথমে মহাকাশের রিসিভার তার অবস্থানের ত্রুটি অঙ্ক কষে দেখে। যদি ত্রুটি একটি বিশেষ পূর্বনির্দিষ্ট সীমার বেশি হয়, তবে স্যাটেলাইট সেই অবস্থানের ভৌগোলিক তথ্য অন্য রিসিভারে পাঠায়। সেখানে ত্রুটি সংশোধন করার জন্য একধরনের 'ফিল্টারিং' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এইভাবে আরও নিখুঁত 'নেভিগেশন' এবং 'পজিশনিং' সম্ভব। তবে এই অবস্থান নির্ধারণ কেবল স্থিরবস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চলমান বস্তু ও প্রাণীর জন্য জি পি এসে-র সর্বাধুনিক সংস্করণটিও ইতিমধ্যে এঞ্জিনিয়াররা সৃষ্টি করেছেন।
আকাশে উড়ে যাওয়া বিমান অ্যাস্টেরয়েড কিংবা মাটিতে হেঁটে চলা মানুষকেও এই নতুন জি পি এস সংস্করণটি এক মিটারেরও কম ভুল করে চিহ্নিত করতে পারে। অর্থাৎ মহাশূন্য থেকে চলমান দৃষ্টিহীন বা তার পাশের স্থির টেলিফোন বুথকে প্রায় নিখুঁতভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এই নতুন পদ্ধতির নাম 'কিনেম্যাটিক জি পি এস ল্যান্ডিং সিস্টেম'। মূলত এরোপ্লেন জাতীয় উড়োযানের জন্য তৈরি হলেও এতে কাজ চলবে সবরকম স্থির ও চলমান পদার্থের। 'ডপলার দশাবদল' নামে অতি পরিচিত একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র আছে। তাতে কোনও তরঙ্গ উৎস যদি নির্দিষ্ট গতিতে ছুটতে থাকে তবে ওই তরঙ্গের গ্রাহকের কাছে কীভাবে তরঙ্গটি পৌঁছবে তার হিসেব বাঁধা। কিনেম্যাটিক জি পি এস যন্ত্র ডপলার দশাবদলের ওপর নির্ভর করে কাজ করে।
ডিজিটাল এভিওনিকসের জগতে আজকাল মাইক্রোইলেকট্রনিক্স ছাড়া চলে না। উন্নত ধরনের কম্পিউটার তৈরিতেও মাইক্রোইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার। জি পি এসে-র জন্য এ পি জি-৭৩ নামে যে রেডারটি ব্যবহৃত হয়, তাতে তিনটি দু'ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি মাপের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মাল্‌টিচিপস মডিউল আছে। বলা বাহুল্য, মাল্‌টিচিপ্‌স মডিউলে অনেক ইলেকট্রনিক্‌স সূক্ষ্ম সার্কিট থাকে।

ভবিষ্যতে হয়তো দৃষ্টিহীনের চলার পথেও এই ধরনের যন্ত্রের ভূমিকা হবে প্রচুর

গোলেজের ভাবনা সফল করতে হলে কেবল যে জি পি এস-কেই আরও উন্নত করতে হবে তা নয়। চাই সব বড়সড় যন্ত্রকে আরও ছোট করা। না হলে রেডার রিসিভার হেডফোন সব নিয়ে প্রায় এক মানুষ বাড়তি ভার টানা কারই বা ভাল লাগে! সেজন্য আগামী প্রজন্মে কারিগরেরা তৈরি করছেন 'মাইক্রোমেশিন'। 'মাইক্রো ইলেকট্রোমেকানিক্যাল' সিস্টেম'বা 'এম ই এম এস' নামে এই অতিক্ষুদ্র যন্ত্রগুলি খালি চোখে প্রায় দেখাই যাবে না। অত্যন্ত ছোট আকারের বিভিন্ন কারিগরি যন্ত্র 'এচিং' পদ্ধতিতে সিলিকনের পাতে বসানো হয়। তারপর ওই পাতেরই ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ দিয়ে মেকানিক্যাল অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এমন মাইক্রো মেশিনের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল আগামী যুগের ভিডিও প্রোজেক্টর। এই যন্ত্রের ডিজাইন বেশ জটিল। এতে 'ফোকাসিং'-এর জন্য বেশ কয়েক হাজার অতি ক্ষুদ্র 'অ্যাডজাস্টেবল্‌' আয়না ব্যবহার করা হবে। পুরো যন্ত্রাংশটি ধরে যাবে মাত্র দু' বর্গ ইঞ্চি জায়গার মধ্যে। ওজনেও হালকা। বিজ্ঞানের উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে গোলেজের তৈরি পার্সোনাল নেভিগেশন সিস্টেমটি একদিন মাথায় ওয়াকম্যানের মতো লাগিয়ে চলা যাবে।

মনোপদার্থবিজ্ঞান ও কথা-বলা-ম্যাপ

মানসিক শক্তির ব্যবহারে ইদানীং বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে অনেক রকম কাজ করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, হাত না ছুঁয়ে প্লেন বা গাড়ি চালানো। কেবল চিন্তাশক্তি দিয়ে কম্পিউটারের 'কি-বোর্ড' টেপা। ওই ধরনের কাজকে বলে 'মস্তিষ্ক সঞ্চালিত নিয়ন্ত্রণ' বা 'ব্রেন অ্যাকচুয়েটেড কন্ট্রোল'। মানুষের চিন্তাপ্রবাহ মোটামুটি চাররকম বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে। গভীর ঘুমের মধ্যে ডেলটা তরঙ্গ। স্বপ্ন দেখার সময় থিটা তরঙ্গ। ঘুমভাঙা আধো-জাগরণে আলফা তরঙ্গ এবং জেগে থাকা মানুষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে বিটা তরঙ্গ। ডেলটা তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম। ০.৫ থেকে ৪ হার্জ। বিটা তরঙ্গের সবচেয়ে বেশি। ১৩ থেকে ২০ হার্জ। দৃষ্টিহীন মানুষদের পথচলার কাজে মানসিক শক্তির ব্যবহার করা হবে বইকী! কার্নেগি মেলোজ ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী ডাঃ রোবার্তে

ক্লাৎস্কি এ-কাজে গোলেজকে সাহায্য করছেন। গোলেজের যন্ত্রটিকে বলা চলে 'পার্সোনাল নেভিগেশন সিস্টেম' বা 'ব্যক্তিগত নৌবাহ ব্যবস্থা'। অনেকটাই অন্ধকার সমুদ্রে অজানা পথে জাহাজ চালাবার মতো ঘটনা।
গোলেজের নৌবাহ ব্যবস্থা পথের কোথায় পাথর বা খানাখন্দ আছে কেবল তাই বলে দেবে না, পথযাত্রীর অবস্থানের ভৌগোলিক বিবরণটিও এতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা যাবে। অর্থাৎ গ্রাম থেকে কোনও দৃষ্টিহীন মানুষ এসে যদি শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়ান এবং সেখান থেকে হাতিবাগান যাওয়ার ইচ্ছে করেন তবে ওই পথপ্রদর্শকটি মানচিত্র দেখে তাঁকে পথ চিনিয়েও নিয়ে যেতে পারে। এমন অত্যাশ্চর্য কাজ করার জন্য চাই কথা-বলা-ম্যাপ।
গোলেজ সারা পৃথিবীটাকেই কম্পিউটারে পুরে ফেলছেন। কোনও বিশেষ অঞ্চলে বেড়াতে যাওয়ার আগে যেমন লোকে সে অঞ্চলের মানচিত্র কেনে, তেমনই ওই নতুন ব্যবস্থার জন্য কেনা দরকার সেই অঞ্চলের ডিস্ক। টোকিয়ো শহরের ম্যাপের বদলে টোকিয়ো কম্পিউটার ডিস্ক। কলকাতা দেখার আগে টুরিস্টরা কিনবেন কলকাতার ডিস্ক। পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত হাই টেক। উঁচুমানের কারিগরি কুশলতা ছাড়া ব্যক্তিগত নৌবাহ ব্যবস্থা অচল। মূলত চার থেকে আটটি সঙ্কেত পাঠানো হয়। এর সাহায্যে গোলেজের যন্ত্রটি পারিপার্শ্বিক এলাকার অবস্থানগত মানচিত্রের এক নতুন 'ভারচুয়াল অ্যাকাউস্টিক ডিসপ্লে' বা 'শব্দ প্রতিবিম্ব' সৃষ্টি করে।
এই ডিসপ্লে একরকম কথা-বলা-ম্যাপ। যা আপনিই বলে দেবে পথচারীর চারপাশে কোথায় কী আছে।
মানচিত্রটিকে 'ভারচুয়াল' বলা হয় তার কারণ পথচারীর মনে হবে বাড়ি, ঘর, লাইব্রেরি, উঠোন, সিঁড়ি, টিউব স্টেশন সব যেন আপনাআপনি নিজেদের নাম ঘোষণা করছে। 'এইখানে ঘোষেদের বাড়ি', 'ওই রাস্তার নাম রবীন্দ্র সরণি', 'সামনে নেতাজির মূর্তি', 'এখানে হাওড়ার ব্রিজ' চলমান পথিককে গাড়ির কথা জানাবে কিনেম্যাটিক জি পি এস। পৃথিবীর মাটি থেকে মহাশূন্যে উপগ্রহ মারফত সব তথ্য বিশ্লেষণ করে গোলেজের পথপ্রদর্শক যন্ত্র পথযাত্রীর কানে মুহূর্তের মধ্যে খবর পৌঁছে দেবে। ফলে অন্ধ মানুষকে থামতে হবে না। পথপ্রদর্শক যন্ত্রের নির্দেশ শোনা অভ্যস্ত হলে তিনি চলবেন আর-সকলের মতোই।
কেবল উন্নত কারিগরিই নয়, অনুভূতিরও ওই যন্ত্রে জায়গা আছে। দৃষ্টিহীনদের অনুভূতিশক্তি প্রবল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সম্পর্কে সরাসরি কোনও প্রমাণ না থাকলে এ-কথা আমরা জানি এক ইন্দ্রিয়ের অভাব পূরণের জন্য বাকি ইন্দ্রিয়গুলি বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই তাদের সূক্ষ্মতাও বেশি। ক্লাৎস্কি এবং গোলেজ তাই দৃষ্টিহীনদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদাভাবে। শব্দ শুনে আপনি-আমি সেই শব্দ কতদূর থেকে আসছে না বুঝলেও দৃষ্টিহীন মানুষ তা অনেক বেশি নিখুঁতভাবে বুঝতে পারেন। আধুনিক বিজ্ঞানে ওই বিষয়টিকে মনোপদার্থবিদ্যা বলা হয়।
নৌবাহযন্ত্রে হেডফোন সংলগ্ন ইলেকট্রনিক কম্পাসের সাহায্যে সঠিকভাবে পথচারীর কানদুটির অবস্থান মেপে একটি কম্পিউটারে পাঠানো হয়। সেই কম্পিউটারে আশপাশের পথঘাটের মানচিত্রও ডিস্কের মাধ্যমে ধরা থাকে। এবার বিশেষ নেভিগেশন সিস্টেমটি অঙ্ক কষে এমন এক প্রাবল্যের শব্দ সৃষ্টি করে, যা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকেই করা সম্ভব।
ধরা যাক ন্যাশনাল লাইব্রেরির মেন গেট থেকে আমাদের দৃষ্টিহীন পথিক প্রায় ৩০ মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছেন। এই অবস্থায় মহাকাশের কৃত্রিম উপগ্রহ ও কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক কম্পাসের যুগলবন্দিতে পথচারী যখন শুনবেন 'এখানে জাতীয় পাঠাগার' তখন তাঁর সত্যি মনে হবে শব্দটি আসছে সামনে প্রায় ৩০ মিটার দূর থেকে। এবার যদি যাত্রী বাঁ দিকে ঘুরে দাঁড়ান মনে হবে শব্দ আসছে ডান দিকে ৩০ মিটার দূরত্ব থেকে। ঠিক একই ভাবে রাস্তা চলার সময় বাঁকের মুখেও মানচিত্রের কথা বলা ভাষণে দিকনির্দেশ পালটাবে।

ভবিষ্যতের আলো

কিছুদিন আগে অবধি জনসাধারণের মনে দৃষ্টিহীনদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ অনীহা ও ঔদাসীন্য ছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলগুলিও তেমন আশাপ্রদ ছিল না। এইসব পরীক্ষার ধরন মোটামুটি এক ধাঁচের। একটি ঘরে কোনও অতিরিক্ত সাহায্য ছাড়া কোনও দৃষ্টিহীন মানুষকে হাঁটাচলা করতে বলা হত। ঘরের আসবাব এবং আয়তন সম্পর্কে আগে থাকতে কোনও আভাস দেওয়া হত না। বিজ্ঞানীরা ওই ঘরের মধ্যে দৃষ্টিহীনের চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য মাপার চেষ্টা করতেন। এ যেন অক্ষর না চেনা ছাত্রকে কলেজের অঙ্ক কষতে দেওয়া। ইদানীং অবশ্য পরীক্ষার ধরন পালটেছে। এখন কোনও ব্যক্তিকে একটি ত্রিভুজাকৃতি রাস্তার দুই বাহু ধরে হাঁটতে দেওয়া হয়। শেষে সবচেয়ে ছোট পথ ধরে তাকে ফিরে আসতে বলা হয়। ক্লাৎস্কির এই পরীক্ষায় দৃষ্টিহীনেরা চোখবাঁধা মানুষের চেয়ে সামান্য ভালই ফল করেছেন। মনস্তত্ত্ববিদের মতে পরীক্ষার সুফল দৃষ্টিহীনদের নৌবাহ ব্যবস্থা তৈরির কাজে নতুন আশার আলো এনে দিয়েছে। ক্লাৎস্কির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুভূতি বিশেষজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ জ্যাক লুমিস। মস্তিষ্ক কীভাবে ছোট-ছোট ধ্বনিসঙ্কেত ব্যবহার করে শব্দের উৎস সন্ধান করে, তা লুমিসের গবেষণার বিষয়।
সব উন্নতিরই সমস্যা আছে। এখনও দৃষ্টিহীনের জন্য তৈরি পথপ্রদর্শক যন্ত্রটি জনসাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। তাই ব্যবসায়িকভাবে তৈরি করা এখনও শুরু হয়নি। গোলেজের যন্ত্রের মূল কাঠামোটি নির্ভর করে কথা-বলা-ম্যাপের ওপর। যদি রাস্তায় বাড়িঘরের তেমন ঘনবসতি না থাকে, তবে ব্যক্তিগত নৌবাহ ব্যবস্থা কাজ করবে ভাল। কিন্তু পথের দু'পাশে অজস্র বাড়িঘর, দোকান ও দর্শনীয় বিষয় থাকলে মুশকিল। হেডফোনের কথা-বলা-ম্যাপ তখন মনে হবে ২০টি দোকান থেকে একসঙ্গে আপনাকে ডাকছে। পুজোর মুখে যাঁরা কলকাতায় বাজার করেন তাঁরা এ-কথা হাড়ে-হাড়ে টের পান। এই ধরনের গোলমেলে অবস্থায় দৃষ্টিহীন মানুষটি বেজায় সংশয়ে পড়তে পারেন। দরকার, বিশেষভাবে ম্যাপের প্রোগ্রাম করা। যাতে কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটা দোকান-বাড়ি এবং পথের খুঁটিনাটি বিবরণ শোনা যায়। গোলেজের যন্ত্রে এখনও চলন্ত গাড়ি-ঘোড়া খুঁজে পাওয়া তেমন কার্যকর নয়। সময় লাগে বেশি। গাড়ি খুঁজে পাওয়ার আগে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা। গোলেজের ব্যক্তিগত নৌবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে আপাতত তাই লাঠিরও প্রয়োজন। দৃষ্টিহীনদের লাঠিটিকে সরানোর বদলে আরও উন্নত ছোট আয়তনের ভারচুয়াল অ্যাকাউসটিক ডিসপ্লে তৈরি করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বদলে গেছে আকাশযাত্রার ছবি

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বৈমানিকদের মতে, ভার বহনের বিষয়ে একটি বিমান আর একটি নৌকোর মধ্যে কোনও ফারাক নেই। বিপদের আশঙ্কা থাকে প্রতি মুহূর্তে দুটি যানের ক্ষেত্রেই। এর প্রধান কারণ হল, ক্ষমতার চেয়েও বেশি ওজন তোলা এবং ওজনকে ঠিকমতো সাজিয়ে না নেওয়া।

বিমানে তোলা হচ্ছে জিনিসপত্র

সেটা ছিল বিমানযাত্রার প্রথম যুগ। যাত্রীদের নিয়ে বিমানগুলি তখন সবেমাত্র কাছাকাছি দূরত্বে পাড়ি দিতে শুরু করেছে। কাজে না যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশি মজার জন্যই তখন বিমানে চড়া। সে আমলের বিমানগুলি ছিল চেহারায় ছোট এবং ওজনেও কম। বেশ কিছু বিমানের মাথায় তখন ছাদও থাকত না। তবু আকাশে ওড়ার আনন্দে যাত্রী জুটতেও দেরি হত না।
কিন্তু মজা কি সত্যিই ছিল সেইসব আকাশযাত্রার সময়? রোমাঞ্চকর সেইসব উড়ানের সময় কেমনই বা হত যাত্রীদের মনের অবস্থা? এর উত্তর বেশ হতাশাব্যঞ্জক। যাত্রীরা বিমানের আসনে বসবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হাজির হতেন ক্যাপ্টেন। না, যাত্রীদের বিনোদনের জন্য নয়, বরং উড়ানের আনন্দ ও মজা দুই-ই একেবারে মাটি করে দিতে। গম্ভীরভাবে ক্যাপ্টেন শোনাতেন তাঁর হুকুম। বিমান ছাড়ার সঙ্কেত দিলেই প্রতিটি যাত্রীকে বসে থাকতে হবে নিজের-নিজের জায়গায়। এবং ঠিক একই ভাবে থাকতে হবে প্রত্যেককেই, বিমানটি যতক্ষণ না ফের নেমে আসছে। তাঁর কথার নড়চড় হলেই বিমানটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। যার অনিবার্য ফল বিমান ধ্বংস এবং প্রতিটি যাত্রীর নিশ্চিত মৃত্যু। কেননা, সেই আমলের উড়ন্ত বিমানের ভেতর চলাফেরার অর্থই ছিল তার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া। আর তাই প্রাণ হাতে করেই যাত্রীরা বসে থাকতে বাধ্য হতেন যে যাঁর আসনে। এর পর কেটে গেছে অনেক সময়। এখনকার অতিকায় বিমানগুলি যুদ্ধজাহাজের মতোই শক্তপোক্ত। ভার বহনের ক্ষমতাও হয়েছে বিস্ময়কর। একটি বোয়িং ৭৪৭-৪০০ জাম্বো বিমানের উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। শূন্য অবস্থায় বিমানটির ওজন প্রায় ১,৭৮,৬৬১ কেজি। যাত্রী বহনের ক্ষমতা কম-বেশি ৪৫০ থেকে ৬৬০ জন। বোয়িংটির ভারবহনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ৩,৯৪,৬২৫ কেজি। এই বিপুল বোঝা নিয়ে ওড়ার জন্য বিমানটির জ্বালানিও লাগে প্রচুর। যাত্রা শুরুর আগে বিমানটির দু' দিকের ডানায় (এর ভেতরেই থাকে জ্বালানি) তাই ভরে দিতে হয় ১,৯২,০০০ লিটার জ্বালানি তেল। যে পরিমাণ জল থাকলে দিব্যি তৈরি হতে পারে একটি প্রমাণ সাইজের 'সুইমিং পুল'।
বিপুল বোঝা নিয়েও বিমানটি পাড়ি দেয় হাজার-হাজার কিলোমিটার পথ। ঘণ্টায় প্রায় ৯০৭ কিলোমিটার বেগে। এভারেস্টের চুড়ো কিংবা অতল সমুদ্র বিমানটির কাছে কোনও বাধা নয়। ৩৫ হাজার ফুট ওপরে উড়ন্ত অবস্থায় যাত্রীরা তখন লাভ করেন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সঙ্গীত, সিনেমা, সেরা খাদ্য এবং পানীয়ের সে এক এলাহি বন্দোবস্ত। স্ফূর্তিতে থাকেন বিমানটির সর্বাধিনায়কও। অত্যাধুনিক কম্পিউটার তাঁর হাতের কাজ কেড়ে নেয়। কষে দিতে থাকে নানা ধরনের জটিল হিসেব। তারপর এক নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছনোর পর এই যন্ত্রটিই চালিয়ে নিতে থাকে মস্ত বোয়িংটিকে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। ছবিটা কি তা হলে সত্যিই বদলেছে এতটাই? ওজন কি বিমানের কোনও সমস্যাই নয়? যে-কোনও বিমানের ভার বহনের ক্ষমতা কি সত্যিই সীমাহীন? জ্যোৎস্নারাতে আল্পসের চুড়ো দেখতে যদি বিমানের একদিকে চলে আসেন সমস্ত যাত্রী, ক্যাপ্টেন কি তখনও এমনই নিশ্চিন্তে থাকেন? উত্তরটি থমকে আছে সেই সুদূর অতীতেই। ভারবহনের বিষয়ে প্রথমযুগে বৈমানিকেরা যতটাই মনোযোগী ছিলেন, এখনকার বৈমানিকরাও ঠিক তেমনই। তাঁদের মতে, একটি বিমান আর একটি নৌকোর মধ্যে নাকি কোনও ফারাকই নেই। অন্তত কোনও অঘটনের ক্ষেত্রে। কেন না, বিপদের আশঙ্কা থাকে প্রতি মুহূর্তে এই দুটি যানের ক্ষেত্রেই। এর প্রধান দুটি কারণ হল ক্ষমতার চেয়েও বেশি ওজন বহন। এবং ওজনকে ঠিকমতো সাজিয়ে না নেওয়া। এই দুটি কারণেই পৃথিবীতে নৌকোডুবি হয় সবচেয়ে বেশি। বিমানের ক্ষেত্রেও এমন অঘটন ঘটেছে বহুবার।
অবশ্য বিমানের ওজনজনিত নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন অঙ্কের। প্রতিটি বিমানের ক্ষেত্রেই বেঁধে দেওয়া আছে ওজন বহনের সর্বোচ্চ সীমা। অঙ্ক কষে দেখতে হয় সেই সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে কি না। বিমানটির ভরকেন্দ্র একেবারে সঠিক রাখতে অঙ্কের হিসেবে সাজিয়ে নিতে হয় বহনযোগ্য ওজনকে। সেই অঙ্ক এখন আরও সহজ করে দিয়েছে কম্পিউটার।
এখানে উল্লেখ করা দরকার, একটি বিমানের সম্পূর্ণ ওজন বহন করে তার দুটি ডানা। বিমানটি নির্মাণের সময়ই ঠিক হয়ে যায় সেটির সর্বোচ্চ ভারবহন ক্ষমতা। কারিগরি পরিভাষায় যাকে বলে 'ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট'। ডানা দুটিকে যত কম ওজন বইতে হবে ততই নিরাপদ হবে বিমানটির 'টেক অফ' বা শূন্যে ভাসার সময়টি। ডানা-দুটিকে হালকা করার পথ তিনটি। জ্বালানি, যাত্রী কিংবা পণ্য এই তিনটির যে-কোনও একটি কমিয়ে দেওয়া।
শুধু পণ্য বা জিনিসপত্রের ওজনই নয়। ওজনের ক্ষেত্রে হিসেবে রাখা হয় যাত্রীদেরও। প্রতিটি বিমান কোম্পানি তাই বেঁধে দেয় যাত্রীদের গড় ওজন। সাধারণত এই ওজন মহিলা এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬৫ এবং ৭৫ কেজি। তবে এ-ওজনটিও পরিবর্তনশীল হতে পারে দেশ, এমনকী পেশা অনুযায়ী। বিমানের যে-অংশটিতে যাত্রীরা বসেন সেই জায়গাটিকে বলে 'মেন ডেক' বা 'প্যাসেঞ্জার্স কেবিন'। যাত্রী-বিমানের ঠিক এর নীচের অংশটি ব্যবহৃত হয় চিঠিপত্র, মালপত্র অথবা বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণের জন্য। বিমানের এই অংশটিকে বলে 'লোয়ার লোব' বা 'কার্গো হোল্ড'। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণের জন্যও এখন প্রতিযোগিতার আসরে নেমেছে বিমান। পণ্যবাহী এ-ধরনের বিমানকে বলে 'কার্গো এয়ারলাইন্স'।
যাত্রীদের গড় ওজন যেমন ঠিক করা থাকে, তেমনটি থাকে পণ্য বা মালপত্রের ক্ষেত্রেও। সুবিধের জন্য মালপত্র রাখার জায়গাটিকেও নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। এবং ঠিক করা থাকে কোন অংশে কত ওজন চাপানো হবে। এক-একটি এমন ভাগ বা অংশকে বলে 'জোন' বা 'কম্পার্টমেন্ট'। প্রতিটি জোন বা কম্পার্টমেন্টকে আবার সংখ্যার সাহায্যে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। যেমন জোন-১, জোন-২ ইত্যাদি। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত, হোল্ডের ভেতর মালপত্র সাজিয়ে রেখে তা ঘিরে দেওয়া হত জালের সাহায্যে (এখনও কিছু-কিছু বিমানে এ-ব্যবস্থা দেখা যায়)। তবে বর্তমানে এই ব্যবস্থাটি আরও উন্নত হয়েছে। প্রতিটি বিমানেরই আছে নিজস্ব 'কনটেনার' বা 'প্যালেট'। যাত্রীদের বড়-বড় ব্যাগ অথবা সুটকেস বহন করতে ব্যবহৃত হয় কনটেনার। নির্দিষ্ট আকৃতির ব্যাগ অথবা সুটকেস প্রায় ৫০টি করে রাখা যাবে এই বিশাল পাত্রটিতে। এবং মালপত্র সমেত প্রতিটি কনটেনারের সর্বোচ্চ ওজন বেঁধে দেওয়া থাকে ৮০০-৯০০ কেজি। প্যালেটে সাধারণত রাখা হয় আরও বেশি ভারী এবং পরিমাণেও অনেক বেশি এমন কোনও

বাণিজ্যিক পণ্য। এ-ক্ষেত্রেও এক-একটি প্যালেটের সর্বোচ্চ ওজন বেঁধে দেওয়া থাকে ২৫০০ কেজি থেকে ৩০০০ কেজি পর্যন্ত। তবে কোম্পানি অনুযায়ী বদলে যেতে পারে এই আধারগুলির সর্বোচ্চ ওজন।

বিমানটির ভরকেন্দ্র ঠিক রাখতে হোল্ডের মাঝবরাবর জায়গায় রাখা হয় জিনিসপত্র সমেত সবচেয়ে ভারী আধারটি। ভারী থেকে ক্রমশ হালকা, এইভাবেই ওজনকে বিন্যস্ত করা হয় বিমানটির দু' দিক বরাবর। তারপর প্রতিটি আধারকে আটকে দেওয়া হয় কঠিনভাবে নীচের চ্যানেলগুলির সঙ্গে। যাতে টেক-অফ করার সময় সেগুলি পেছনের দিকে সরে এসে ভরকেন্দ্রকে পরিবর্তিত করতে না পারে।

এই বিশাল পরিমাণ মালপত্র ওঠাতে সময় লাগে অবশ্য খুবই কম। দক্ষ কর্মীর দল একটি মস্ত জাম্বো জেটের ভেতরটি মাত্র আধঘণ্টাতেই পূর্ণ করে দিতে পারেন পণ্য বোঝাই করে। বহুক্ষেত্রে একই সঙ্গে চলে জিনিসপত্র নামানো এবং ওঠানোর কাজ। সুদক্ষ কর্মীরা অবশ্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই সাহায্য পান উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি এবং কম্পিউটারের। তবে অতীতে এইসব কাজ করতে গিয়ে মুখোমুখি হতে হত বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিমানের মুখ কখনও দেখা যেত ধীরে-ধীরে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আসলে মাল বোঝাই করতে গিয়ে ওজনের বিন্যাস সমানভাবে হত না। অনেক সময় ভরকেন্দ্র তাই পিছিয়ে যেত। আর তার ফলে বিমানগুলির মুখ হত ঊর্ধ্বমুখী। আবার ভরকেন্দ্রটি সামনের দিকে এগোলে ঠিক একই অবস্থা হত বিমানের পেছনদিকটির। আসলে বিমানটিকে নির্বিঘ্নে ওপরে তুলতে গেলে তার মুখটি একটি নির্দিষ্ট কোণ বরাবর রাখা দরকার। দেখতে হবে বিমানটির ভরকেন্দ্রও যেন খুব বেশি এদিক-ওদিক না করে। কেননা ভরকেন্দ্রর পরিবর্তন হলে পরিবর্তিত হবে বিমানটির নির্দিষ্ট কোণও। আর তার ফলে উড়তে গিয়ে বিপদে পড়তে পারে বিমানটি।

কার্গো হোল্ডে রাখা সমস্ত মালপত্রের ওজন লেখা হয় একটি কাগজে। যাকে বলে 'ট্রিম শিট'। প্রতিটি কনটেনারের ওজন এবং সম্ভাব্য অবস্থানের তথ্যও দেখানো হয় শিটটিতে। এর পর অঙ্ক কষতে হয় সঠিক ভরকেন্দ্রটি বের করার জন্য। তবে এই অঙ্কটিকে আরও জটিল
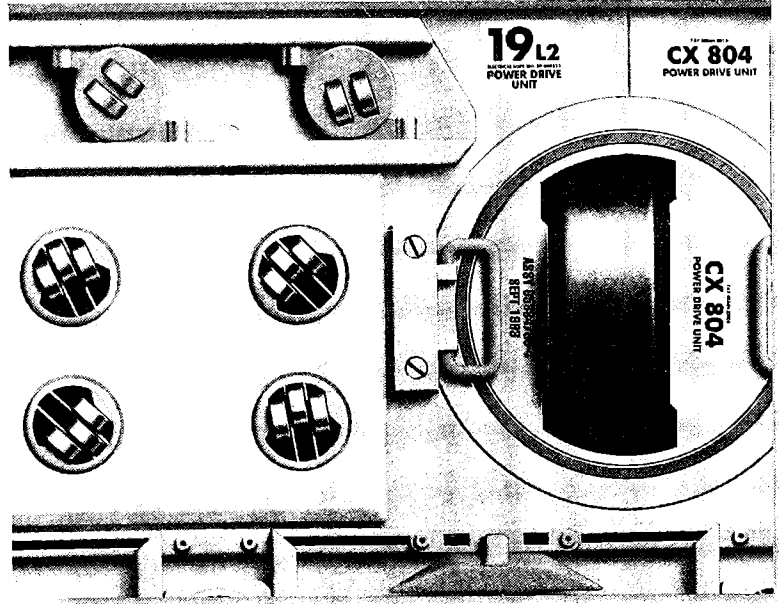
বিমানের 'হোল্ড'-এ জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার পেছনেও আছে বিজ্ঞান

করে তোলে বিমানটির জ্বালানি। কেন না, বিমান ওড়ার পরমুহূর্ত থেকে এটি কমতে থাকে বলে ক্ষণে-ক্ষণে বদলাতে থাকে বিমানটির ভরকেন্দ্র। জটিল হিসেবনিকেশকে এখন অবশ্য সহজ করে দিয়েছে কম্পিউটার। হোল্ডের ভেতরে রাখা মালপত্রের ওজনের হিসেব দেওয়া হয় ক্যাপ্টেনকে। প্রতিটি জোনের জন্য আলাদা-আলাদাভাবে। ক্যাপ্টেন দেখে নেন প্রতি জোনের সর্বোচ্চ সীমা কোথাও লঙ্ঘিত হয়েছে কি না। ট্রিম শিটটিতে থাকে ভরকেন্দ্রর হিসেবও। আর এইসব তথ্য এবং পরিসংখ্যানের মাধ্যমে ঠিক হয় বিমানটির টেক-অফ ওয়েট। নির্ধারণের সময় যদি দেখা যায় ভরকেন্দ্রটি বেশ কিছুটা এগিয়ে বা পিছিয়ে আছে, তবে ট্রিমিং হুইলটিকে যথাক্রমে পিছিয়ে কিংবা এগিয়ে আনা হয়।

বহন করা জিনিসপত্রের ব্যাপারে চিন্তার একমাত্র কারণ হতে পারে ওজন। তবে অঙ্ক মিলিয়ে একবার আকাশে ভেসে পড়তে পারলে কার্গো হোল্ডের বিষয়ে ক্যাপ্টেনের আর চিন্তার কিছু নেই। তবে কখনও-কখনও আবার ছবিটি সম্পূর্ণ বদলে যায়। এই কার্গো হোল্ডেই ক্যাপ্টেনের মন পড়ে থাকে পুরো যাত্রাপথে। নিষ্প্রাণ বাণিজ্যিক পণ্য নয়, যখন রক্তমাংসের নানা প্রাণী এই হোল্ডের ভেতর যাত্রী হয়ে ওঠেন। ছোট পাখি থেকে মস্ত গণ্ডারের মতো প্রাণী অনেক সময়ই সওয়ার হয় বিমানের। দেশ-বিদেশের চিড়িয়াখানার মধ্যে প্রাণী-বদলের জন্যই ওদের তুলে দিতে হয় বিমানে। আর এমন সওয়ারের খবর থাকলেই ক্যাপ্টেনের চিন্তা বাড়ে। যাত্রীদের মতো এইসব জীবজন্তুর প্রাণের জিম্মাদারও যে তিনি। কার্গো হোল্ডের ভেতর বাতাস চলাচল কম। তাপমাত্রাও একেবারে চরম। ক্যাপ্টেনকে তাই জানিয়ে দেওয়া হয় প্রাণীটির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে। হোল্ডের সেই অংশটুকুর তাপমাত্রা তখন নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ক্যাপ্টেনকে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা রাখা হয় অতিরিক্ত অক্সিজেনেরও।

একটি জরুরি প্রশ্ন প্রায়ই করা হত সে যুগের শিক্ষানবিশ বৈমানিকদের। ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যদি ছিটকে কোনও যাত্রী নীচে পড়ে যান, তবে বৈমানিকের দায়িত্ব কী হবে ? সঠিক উত্তরটি ছিল, বৈমানিককে তখনই ট্রিম হুইলের সাহায্যে এই ওজন বৈষম্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এখন অবশ্য দু'-চারজন যাত্রী আসন ছেড়ে উঠলেও বিমানটির ভারসাম্যের কোনও অসুবিধে হয় না। তবে নৈসর্গিক কোনও শোভা দেখতে মস্ত একটি জেট বিমানের সমস্ত যাত্রী যদি একদিকে চলে আসেন, তখন কী করবেন বৈমানিকটি ? তাঁকে ওই একই পথ বেছে নিতে হবে, যে-পথ বেছে নেওয়া হত বিমানযাত্রার সেই আদি যুগে। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর। আবার রয়েও গেছে কতকিছু, সেই আগেরই মতো। যেমন, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যা কি না চিরন্তন। শাশ্বত।

বড়গল্প

বাহাত্তর ঘণ্টা

দুলেন্দ্র ভৌমিক
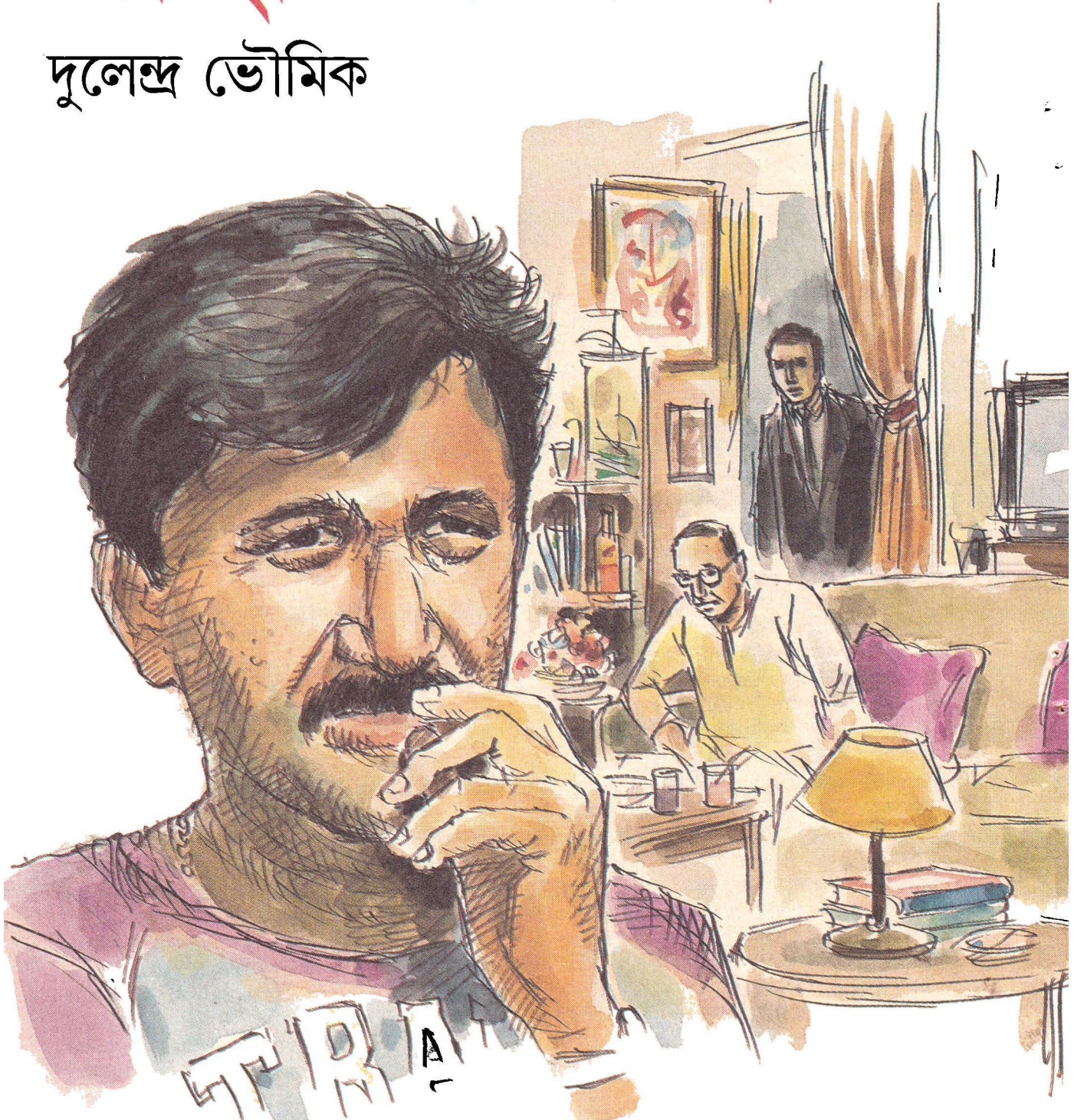
ঘটনাটা টের পাওয়া গেল গোল্ডকাপ ফাইনালের বাহাত্তর ঘন্টা আগে। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বলবার আগে গোল্ডকাপের ইতিহাসটা বলা দরকার। গোল্ডকাপ ফাইনাল খেলার গুরুত্ব গত দশ-বারো বছর ধরে ওলিম্পিক ফুটবলের ফাইনাল খেলার মতোই। শুধু কি গুরুত্ব, তার মর্যাদাও কম নয়! ইউরোপীয় কাপ ফুটবল আর বিশ্বকাপ ফুটবলের মধ্যে যতটা ফারাক, গোল্ডকাপ ফাইনাল আর ওলিম্পিক ফাইনালের মর্যাদা আর গুরুত্বে তার চেয়েও কম ফারাক।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ভারতের রাজা মহারাজারা এইরকম একটা ফুটবল কাপ প্রচলনের কথা ভাবছিলেন। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজ শাসনের অবসান হলেও বহু ব্রিটিশ সাহেব তখনও ভারতবর্ষে আছেন। চন্দননগর তখনও ফরাসিদের দখলে। দেশীয় রাজা-মহারাজাদের এই ভাবনার কথা পৌঁছেছিল ভারতে বসবাসকারী তখনকার ব্রিটিশদের কাছে এবং চন্দননগরের ফরাসি শাসকদের কাছেও। দেশীয় রাজাদের তাঁরাও উৎসাহ দিয়েছিলেন। ফলে গোয়ালিয়র এবং কলকাতায় মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, গোল্ডকাপের আয়োজন ভারতবর্ষে হবে। অবশেষে '৫০ সালে গোল্ড কাপের প্রথম খেলা হয় কলকাতায়। তখন শুধু ভারতীয় দলগুলিই খেলায়

ছবি : দেবাশিস দেব

অংশ নিতে পারত।' বছর কয়েক পর এই সিদ্ধান্ত বদল হয়। তখন এশিয়ার সবক'টি দেশই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পায়। তখন থেকেই ভারতের এই গোল্ডকাপ একটা আন্তর্জাতিক চেহারা এবং চরিত্র পেয়ে যায়। এখন তো এই প্রতিযোগিতা বিশ্বের সেরা সাতটি ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে বিবেচিত হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বহু ফুটবলপ্রেমী, সাংবাদিক আর খেলোয়াড়রা এসে ভিড় করেন এই খেলা দেখতে।

এবারও আয়োজনের কোনও খামতি ছিল না। দু'বছর অন্তর-অন্তর এই খেলা হয়। এ-বছর খেলাটি হচ্ছে। ফাইনাল হবে কলকাতায়। ইতিমধ্যেই দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা কলকাতায় পৌঁছে গেছেন। এসে গেছেন বিদেশি টিভি কোম্পানির লোকেরা। দুটো সেমিফাইনাল খেলার একটা হয়েছে কেরলে, অন্যটি দিল্লিতে। কলকাতার ফাইনালে মুখোমুখি হবে কোরিয়া এবং জাপান। ভারত অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালেই হেরে গেছে কোরিয়ার কাছে। দুটি দলের একটি পৌঁছে গেছে আজ সকালে। অন্য দুটি এসে পৌঁছচ্ছে রাত্রে। কলকাতার শহর তখন নতুন করে সাজতে ব্যস্ত। এয়ারপোর্ট থেকে ভি আই পি মোড় তারপর বাইপাসের শুরু থেকে অনেকটা পথ নানাবর্ণের আলোয় ঝলমল করছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের স্টেডিয়াম এবং স্টেডিয়ামের বাইরে তখন রকমারি আলোকসজ্জার আয়োজন চলছে। এইসব ঘটনা ঘটছে ফাইনাল খেলা শুরু হওয়ার বাহাত্তর ঘন্টা আগে। অর্থাৎ এসব হচ্ছে বাহাত্তর ঘন্টা আগের চিত্র।

ঠিক এই সময় স্টেডিয়ামের গেট দিয়ে জিপগাড়ি করে স্টেডিয়ামে এলেন টি. এন. পিল্লাই। তাঁকে সবাই পিল্লাই বলেই জানেন এবং ডাকেন। সদা হাসিখুশি চুয়াল্লিশ বছরের পিল্লাই জিপগাড়ি থেকে নামলেন থমথমে মুখে। পিল্লাইয়ের এমন গম্ভীর, এমন বিষাদঘন মুখ তাঁর পরিচিত লোকেরা কখনও দেখেনি। পিল্লাই গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই মহারাষ্ট্রের সুনীল কার্লেকর আর পঞ্জাবের সুরিন্দর সিংহ এগিয়ে এসে বলল,"হ্যালো মিঃ পিল্লাই!"

পিল্লাই কখনও যা করেন না, আজ তাই করলেন। ওঁদের কারও কথার জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেলেন স্টেডিয়ামের কনফারেন্স রুমের দিকে। ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ বোস কোথায়?"

মিঃ বোস অর্থাৎ অমরজিৎ বসু হচ্ছেন এবারের টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান। কলকাতা এবং ভারতের সবাই তাঁকে জানে নানু বোস নামে। ছোট-বড় সকলের কাছেই তিনি নানুদা। প্রভূত বিত্তশালী ঘরের ছেলে। নিজের বড় ব্যবসা। কিন্তু ফুটবল-অন্ত প্রাণ। পিল্লাইয়ের প্রশ্ন শুনে ঘরের মধ্যে বসা একজন বললেন, "নানুদা মাঠে আছেন।"

পিল্লাই আর কোনও কথা বললেন না। সোজা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। স্টেডিয়ামের এইদিক দিয়ে খেলোয়াড় এবং অফিশিয়ালরা মাঠে যান। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয় তারপর আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই মাঠে পৌঁছনো যায়। আন্ডারগ্রাউন্ড সিস্টেম। পিল্লাই ওই পথ দিয়েই মাঠে এলেন। মাঠের ফ্লাডলাইটগুলো তখনও জ্বলছে। ফলে গোটা মাঠ এবং স্টেডিয়াম তখন মধ্যদিনের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল। পিল্লাই দেখলেন, মাঠের মাঝখানে, ঠিক সেন্টার পজিশনে কয়েকজন পদস্থ পুলিশকর্তার সঙ্গে নানুদা দাঁড়িয়ে। পিল্লাই দ্রুত এগিয়ে গেলেন। নানু বোস পিল্লাইকে দেখে বললেন, "এসো, পিল্লাই। হোটেলের অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো চেক করে নিয়েছ তো?"

পিল্লাই ঘাড় নাড়লেন। যার অর্থ, চেক করা হয়েছে।

নানু বোস বললেন, "দিল্লি থেকে ফ্যাক্স পেয়েছি। জাপানের টিম যে প্লেনে আসছে সেটা হয়তো একটু লেট করতে পারে। এয়ারপোর্টে বাসের ব্যবস্থা করা আছে। তুমি শুধু এয়ারপোর্টে ফোন করে সময়টা জেনে নাও।"

পিল্লাই থমথমে গলায় বললেন, "নানুদা, সব ব্যবস্থা করা আছে। আমি একটা জরুরি কথা বলতে ছুটে এসেছি।"

নানু বোস এবার ভাল করে পিল্লাইয়ের দিকে তাকালেন। গত কুড়ি বছর ধরে যে পিল্লাইকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, আজকের এই মুখটা যেন সেই পিল্লাইয়ের নয়। তিনি একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর পুলিশ অফিসারদের বললেন, "এক্সকিউজ মি, আমি একটু আসছি।"

নানু বোস পিল্লাইয়ের কাছে এসে কিছু বলবার আগেই পিল্লাই মাঠের অন্যদিকে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "দাদা, এখানে নয়। একটু ফাঁকায় যেতে হবে।"

নানু বোস পিল্লাইয়ের পাশে-পাশে হেঁটে যেতে-যেতে জিজ্ঞেস করলেন, "পিল্লাই, কী হয়েছে? কোনও অফিশিয়াল প্রবলেম?"

পিল্লাই মুখে কোনও কথা বললেন না। শুধু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন, অফিশিয়াল কোনও সমস্যা নয়।

অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় এসে পিল্লাই থামলেন। তারপর নানু বোসের মুখের দিকে তাকালেন। পিল্লাইয়ের দু'চোখে তখন গভীর উৎকণ্ঠা আর ভয়। পিল্লাইয়ের চোখের ভাষা বুঝতে পারলেন নানু বোস। নানু বোস জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে পিল্লাই?"

পিল্লাই উত্তর দিলেন, "সার, সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

চমকে উঠে নানু বোস বললেন, "সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ?"

পিল্লাই বললেন, "ব্যাঙ্কের লকার থেকে গোল্ডকাপটা অন্যান্য বছরের মতো এবারও বার করে পালিশ করতে দেওয়া হয়েছিল রায় অ্যান্ড কোং-কে।"

নানু বোস বললেন, "হ্যাঁ। কলকাতায় পালিশের কাজ ওরাই করে। কী করেছে? পালিশ এখনও করেনি?"

পিল্লাই বললেন, "আমি আজ রায় কোম্পানিতে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম—"

নানু বোস অধৈর্য গলায় বললেন, "কী শুনলে?"

পিল্লাই বললেন, "কাপটা পাওয়া যাচ্ছে না।"

নানু বোস আর্তনাদের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠে বললেন, "হোয়াট! পাওয়া যাচ্ছে না মানে? সওয়া ফুট উঁচু একটা কাপ তো জেম্‌স ক্লিপ বা আলপিন নয়।"

পিল্লাই বললেন, "গতকাল দুপুরে আমরা কাপটা কোম্পানিতে দিয়েছি। আজ থেকে পালিশ শুরু হওয়ার কথা। ফাইনালের দিন মানে পরশু সকালে আমাদের নিয়ে আসার কথা।"

নানু বোস বললেন, "রাইট! সেইরকমই কথা হয়েছে। তুমি গিয়ে কী দেখলে?"

পিল্লাই বললেন, "অফিসঘরে মিঃ রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে। তিনি বললেন আজ বেলা সাড়ে বারোটা থেকে একটা অর্থাৎ টিফিন পিরিয়ডে কাপটা খোয়া গেছে।"

নানু বোস চিৎকার করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। কান্নাজড়ানো গলায় বললেন, "ইমপসিব্‌ল! কাপ খোয়া যেতে পারে না।"

পিল্লাই বললেন, "কিন্তু গেছে।" নানু বোসের মতো শক্ত মানুষও এবার ধপ করে মাঠের ওপর বসে পড়লেন। হতাশ গলায় বললেন, "এখন কী হবে পিল্লাই? আর মাত্র বাহাত্তর ঘন্টা বাকি খেলা শুরু হতে। কিন্তু কাপটাই যদি মাঠে না থাকে...., না, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।"

পিল্লাই হাঁটুমুড়ে উবু হয়ে বসলেন নানু বোসের সামনে। বললেন, "কথাটা রায় কোম্পানির লোক ছাড়া আমি আর আপনি জানি। এবার বলুন কী হবে?"

নানু বোস উঠে দাঁড়ালেন। পিল্লাইয়ের দিকে তাকিয়ে

বললেন, "কথা আর কাউকে জানতে দেবেন না। কোনওভাবে যদি সংবাদপত্র খবরটা পেয়ে যায় তা হলে কালকেই চার কলাম হেডিং করবে। কমিটির সবাইকে জানাবার দরকার নেই। কারণ, আমাদের কোনওভাবে অপদস্থ করতে পারলে মনে-মনে সুখী হবে এমন কমিটি মেম্বারের সংখ্যা খুব নগণ্য নয়।"

পিল্লাই অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, "এখন কী করব ?"

নানু বোস হাতের পাইপটা ঘোরাতে-ঘোরাতে বললেন, "আগে রায় কোম্পানিতে চলুন। সেখান থেকে যাব স্পোর্টস মিনিস্টারের কাছে। তারপর সি এমের কাছেও যেতে হতে পারে।"

পিল্লাই বললেন, "পুলিশকে কিছু জানাবেন না ?"

নানু বোস বললেন, "এখন নয়। জানাতে তো হবেই। সেটা জানাবেন সি এম। " চলো আমরা রায় কোম্পানিতে যাই।"

পিল্লাইকে সঙ্গে নিয়ে নানু বোস মাঠের বাইরে এলেন। গাড়িতে ওঠার আগে সাংবাদিক, অফিসের কিছু লোক নানা প্রশ্ন নিয়ে এল। নানু বোস বললেন, "এখন কিছুই বলব না। সব তো আগেই বলেছি। এখন আমাদের কাজগুলো করতে দিন।"

সাংবাদিকদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অফিসের লোকদের বললেন, "আপনারা থাকুন। আমি ফিরে আসছি।"

গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললেন, "চলো।"

বাইপাসে এসে ড্রাইভার জানতে চাইল, "কোথায় যাব ?"

নানু বোস বললেন, "রায় কোম্পানি। পার্ক স্ট্রিট।"

॥ ২ ॥

ওঁরা দু'জনে যখন পার্ক স্ট্রিটে রায় কোম্পানিতে পৌঁছলেন কলকাতার বুকে তখন বিকেলের ছায়া নামছে। একতলা থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে হয়। রায় কোম্পানির মালিক শশধর তখন নিজের চেয়ারে স্থির হয়ে বসে। দেখে মনে হয় শরীরে যেন কোনও জোর নেই। দরজার মুখে পিল্লাই আর নানু বোসকে দেখে শশধর রায় কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। দু'হাতে বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে বললেন, "নানুদা আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর পথ নেই।"

নানু বোস বললেন, "তুমি আত্মহত্যা করলে যদি কাপটা পাওয়া যায় তা হলে এখনই তোমাকে আত্মহত্যা করতে বলতুম। এবার খুলে বলো তো কী ঘটেছে।"

শশধরবাবু বেল বাজালেন। একজন মধ্যবয়স্ক লোক এল। শশধরবাবু বললেন, "গোবিন্দকে ডাকো।"

একটু পরে গোবিন্দ এল। চোখ দুটো একটু কটা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। গোবিন্দ এসে দাঁড়াতেই শশধরবাবু বললেন, "এই গোবিন্দই কাপটা পালিশ করছিল। গোবিন্দ, বাবুদের সব বল।"

গোবিন্দ দু'জনের দিকে, অর্থাৎ পিল্লাই আর নানু বোসের দিকে তাকাল। ওর দু'চোখে ভয়ের ছায়া কাঁপছে। গোবিন্দ একটা ঢোক গিলে বলল, "সার! আমিই আজ সকাল থেকে পালিশে হাত লাগিয়েছিলাম।"

নানু বোস কঠোর গলায় বললেন, "তোমার হাতের বাইরে কাপটা গেল কীভাবে ?"

গোবিন্দর বোধ হয় গলা শুকিয়ে আসছিল। আবার একটা ঢোক গিলে বলল, "সাড়ে বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত আমাদের টিফিন। আজ সাড়ে বারোটার একটু আগে লোডশেডিং হয়। আমরা সবাই ওইসময়ই কাজ বন্ধ করে টিফিনে চলে যাই।"

নানু বোস প্রশ্ন করলেন, "তখন ক'টা বাজে ?"

শশধরবাবু বললেন, "তা তখন বোধ হয় সওয়া বারোটা।"

নানু বোস গোবিন্দর দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন,

"টিফিন করতে তোমরা কোথায় যাও ?"

গোবিন্দ উত্তর দিল, "নীচে।"

নানু বোস আবার জিজ্ঞেস করলেন, "নীচে নেমে যাওয়ার সময় কাপটা কোথায় রেখে গিয়েছিলে ?"

গোবিন্দ উত্তর দেয়, "আজ্ঞে, একটা টেবিলের ওপর।"

পিল্লাই প্রশ্ন করলেন, "এই দরজা ছাড়া তোমাদের ঘরে ঢোকার অন্য কোনও দরজা আছে ?"

গোবিন্দ বলল, "বাথরুমে যাওয়ার একটা দরজা আছে। কিন্তু সেটা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে।"

নানু বোস ধমক দেওয়ার মতো করে বললেন, "বন্ধ থাকে, কিন্তু আজ ছিল কি ?"

গোবিন্দ বলল, "ছিল সার।"

নানু বোস ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে হাঁটতে-হাঁটতে আবার চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, "তারপর কী হল ?"

গোবিন্দ বলল, "একটার একটু পরে বাতি এল।"

পিল্লাই জিজ্ঞেস করলেন, "তখন ক'টা বাজে ?"

শশধরবাবু উত্তর দিলেন। বললেন, "একটা দশ।"

এবার গোবিন্দ বলতে লাগল, "আলো আসার পর ঘরে এসে দেখি কাপটা টেবিলের ওপর নেই। তারপর থেকে খোঁজাখুঁজি। এরই মধ্যে পিল্লাইসাহেব পালিশ দেখতে এলেন।"

গোবিন্দ মাথা নিচু করে রইল। নানু বোস শশধরবাবুর ফোনটা টেনে নিয়ে ফোন করলেন। চাপা গলায় বললেন, "স্পোর্টস মিনিস্টারকে দিন। আমি নানু বোস কথা বলছি।"

ফোন কানে চেপে নানু বোস অপেক্ষা করতে লাগলেন। পাখার তলায় বসেও তিনি ঘেমে যাচ্ছেন। একটু পরে নানু বোস বললেন, "দাদা, নানু বলছি। আপনি কতক্ষণ আছেন ? আমি এখনই আসছি। সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখনই রওনা দিচ্ছি।"

ফোনটা নামিয়ে রেখে নানু বোস শশধরবাবুর দিকে তাকালেন।

আদেশের গলায় বললেন, "আমি মিনিস্টারের কাছে যাচ্ছি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি এবং আপনার সব স্টাফ যেন এখানেই থাকে।"

নানু বোস আর এক মুহূর্ত দেরি না করে পিল্লাইকে সঙ্গে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এলেন। মন্ত্রীমহাশয় তখন তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন। তাঁর টেবিলের সামনে জনাদুয়েক লোক বসে। নানু বোসকে দেখে মন্ত্রী বললেন, "এই তো টিকিটের আসল লোক এসে গেছে। এনারে বলেন, ইনিই গোছা-গোছা টিকিট দিতে পারবেন। আমার কাছে টিকিট কোথায় ?"

মন্ত্রীর সামনে বসা লোকজনেরা সবাই ঘাড় ফিরিয়ে নানু বোসকে দেখল। ওদের মধ্যে একজন বলল, "নানুদা, কোন একটা কাগজে বেরিয়েছে টিকিট কালোবাজারিদের হাতে চলে গেছে।"

এসব কথায় মন দেওয়ার মতো উৎসাহ এখন নেই নানু বোসের। তিনি শুধু বললেন, "যা খুশি বেরোক।"

তারপর মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দাদা, একটু কথা ছিল। যদি ..."

'যদি' শব্দটা বলে নানু বোস অ্যান্টি চেম্বারের দিকে তাকালেন। মন্ত্রীদের ঘরে আলাদা কথা বলার জন্য ঘরের মধ্যেই একটা ঘর থাকে। মন্ত্রী নিজের চেয়ার থেকে উঠে সেই অ্যান্টি চেম্বারে এলেন। সঙ্গে নানু বোস আর পিল্লাই। ঘরের মধ্যে একটা ইজিচেয়ার, খান দুই চেয়ার আর একটা গোল টেবিল। মন্ত্রী ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর নানু বোস নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, "দাদা, সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

মন্ত্রী আরামকেদারায় বসতে যাচ্ছিলেন। তিনি না বসে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। গভীর দৃষ্টিতে নানু বোসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী হয়েছে ?"

নানু বোস গলাটা আরও নামিয়ে এনে বললেন, "গোল্ড কাপটা খোয়া গেছে।"

মন্ত্রীমশাই আঁতকে উঠে বললেন, "এ কী বলছেন ? খোয়া গেছে মানে ?"

নানু বোস রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিলেন। রুমালটা পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে বললেন, "আজই বেলা সওয়া বারোটা থেকে একটা দশ এই সময়ের মধ্যে রায় কোম্পানির ঘর থেকেই কাপটা উধাও।"

মন্ত্রীমশাই আরামকেদারার ওপর বসে পড়লেন। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "কথাটা বেশি জানাজানি হয়নি তো !"

নানু বোস বললেন, "এখনও হয়নি। কিন্তু কতক্ষণ গোপন রাখব। বাহাত্তর ঘণ্টা পরে ফাইনাল শুরু হবে। তার আগেই কাপ নিয়ে মাঠে পৌঁছতে হবে। এখন কী করব ? হাতে তো সময়ও নেই।"

মন্ত্রীমশাই নাকে একটিপ নস্যি নিলেন। রুমাল দিয়ে নাক মুছে নিয়ে বললেন, "এটা কোনও সাধারণ চোরের কাজ নয়। এই গোল্ডকাপের ছবিটা ভারতের এবং এশিয়ার প্রায় সব কাগজে এতবার ছাপা হয়েছে, টিভিতে এত দেখানো হয়েছে যে, সবাই এটা চেনে। এটা কোথাও বিক্রি করা মুশকিল। তা ছাড়া নামে গোল্ডকাপ হলেও ওই কাপে তো সোনা অতি সামান্যই।"

নানু বোস বললেন, "শুধু গোল ছোট্ট বলটা সোনার। মাত্র তিন ভরি। কিন্তু ..."

মন্ত্রীমশাই বললেন, "কিন্তু কাপটার মূল্য অনেক। মাত্র তিন ভরি সোনার জন্য এতবড় রিস্ক কেউ নেবে না। ওর মূল্য-মর্যাদা চোরেরা বুঝবে না।"

নানু বোস অধীর কণ্ঠে বললেন, "এখন কী হবে ? আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না। কাপটা উদ্ধার না হলে দেশের মাথাকাটা যাবে। কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকে সুইসাইড করতে হবে।"

মন্ত্রী বললেন, "তাতে তো সমস্যার সমাধান হবে না।"

নানু বোস বললেন, "জাপানি ডিজাইনারকে দিয়ে ওই সময় কাপটা তৈরি করতে খরচ হয়েছিল পঁচিশ হাজার টাকা। আমি নিজের থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা দিতে রাজি আছি যদি কেউ কাপটা উদ্ধার করে দিতে পারে।"

মন্ত্রী বললেন, "উদ্ধার করতে হবে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে। সময় থাকলে খোঁজার সুযোগ ছিল। আমাদের হাতে তো সময়ও নেই।"

এবার মন্ত্রীমশাইও তাঁর মাথার ঘাম মুছলেন। টাকের ওপর তখনও বিন্দু-বিন্দু ঘাম। তিনি একবার ঘড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, "আপনি আমার গাড়িতে আসুন। একবার রায় কোম্পানিতে যাওয়া যাক। পিল্লাই সাহেব আপনার গাড়িতে আমাদের পেছন-পেছন আসুন।"

মন্ত্রীমশাই ঘর থেকে বার হওয়ার আগে নানু বোসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দোকান খোলা থাকবে তো ?"

নানু বোস বললেন, "হ্যাঁ, থাকবে। আমি সবাইকে থাকতে বলে এসেছি।"

মন্ত্রী বললেন, "তা হলে আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়া যাক।"

তিনজনে লিফ্‌ট দিয়ে নীচে নেমে এলেন। রায় কোম্পানির সবার সঙ্গে মন্ত্রী কথা বললেন। যে-ঘরে পালিশ হচ্ছিল সেই ঘরটাও দেখলেন। আধঘণ্টা থেকে বেরিয়ে আসার সময় মন্ত্রী শশধরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই কাপ খোয়া যাওয়ার

গুরুত্বটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন !"

শশধরবাবু অপরাধীর মতো মাথা নাড়লেন। ভয় আর আতঙ্ক শশধরবাবুকে যেন বোকা বানিয়ে দিয়েছে। মন্ত্রী বললেন, "আপনি এবং আপনার কোনও স্টাফ আমাদের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দোকান ছেড়ে যাবেন না। আর কাপ খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটা গোপন রাখবেন।"

মন্ত্রী এবার স্টাফদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারাও গোপন রাখবেন। যার মুখ থেকে কথা বেরোবে পুলিশ তাকেই লক-আপে পুরে দেবে। খুব সাবধানে কথাবার্তা বলবেন।"

তিনজন যখন ঘর থেকে দরজার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছেন তখন শশধরবাবু বললেন, "নানুদা, আপনারা এখান থেকে যাওয়ার মিনিট কুড়ি পরে একটা ফোন এসেছিল।"

নানু বোস ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "কার ফোন ?"

শশধরবাবু বললেন, "নাম বলেননি। শুধু জানতে চাইলেন কাপটার পালিশ ঠিকমতো চলছে তো ?"

নানু বোসের চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কী বললেন ?"

শশধরবাবু বললেন, "বললাম, পালিশ চলছে।"

মন্ত্রী বললেন, "এটাই বলে যাবেন। আমরা আবার আসব।"

তিনজনে যখন গাড়িতে উঠছেন তখন পার্ক স্ট্রিটের আলোগুলো জ্বলে উঠল। তিনজনেই দেখলেন, আলোর অক্ষরে ফুটে উঠেছে, গোল্ডকাপ ফাইনাল। ওয়েলকাম ফুটবল লাভার ইন ক্যালকাটা।"

নানু বোসের বুকের ভেতরটা তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

॥ ৩ ॥

স্পোর্টস মিনিস্টারকে নিয়ে নানু বোস আবার স্টেডিয়ামে ফিরে এলেন। স্টেডিয়ামের বাইরের ও ভেতরের আলোগুলো তখন সব জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। নানু বোস আলোগুলোর দিকে একবারও তাকালেন না। মন্ত্রীমশাই গাড়ি থেকে নামতেই একঝাঁক লোক এগিয়ে এসে মন্ত্রীকে ঘিরে ধরল। তাদের মধ্যে থেকে একজন বিনীত ভঙ্গিতে বলল, "সার, আলো কেমন দেখছেন ?"

মন্ত্রী একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে বললেন, "বেশ ভালই তো হয়েছে।"

অন্য সময় হলে ওখানে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কথা বলতেন। কিন্তু আজ মিনিটখানেকের বেশি দাঁড়ালেন না। নানু বোসকে সঙ্গে নিয়ে সোজা নিজের ঘরে গেলেন। পেছন-পেছন কিছু লোক আসছিল। সবাই মন্ত্রীর চেনাশোনা। তিনি দরজা পর্যন্ত এসে দাঁড়ালেন। দরজার গায়ে হাত রেখে পেছন ফিরে অন্যদের দিকে তাকালেন। তারপর একটু হেসে বললেন, "আপনাদের সঙ্গে একটু পরে কথা বলছি। এখন নানুদার সঙ্গে একটা মিটিং সেরে নিই। আসেন নানুদা।"

মন্ত্রী নানুদাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঘরের মধ্যে দুটি যুবক ছেলে বসে ছিল। তারা উঠে দাঁড়াতেই মন্ত্রীমশাই বললেন, "তোমরা বাইরের দরজায় থাকো। কাউকে আসতে দিয়ো না এখন।"

নানু বোস বললেন, "পিল্লাই আসবে তো।"

মন্ত্রী ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "পিল্লাইকে চেনো তো ?"

ওরা উত্তর দেওয়ার আগেই পিল্লাই এসে গেলেন। এবার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে মন্ত্রীমশাই বসলেন তাঁর চেয়ারে। সামনের চেয়ারগুলোর মধ্যে দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসলেন নানু বোস আর পিল্লাই।

মন্ত্রী কথা শুরু করলেন এইভাবে : "নানুদা, ব্যাপারটা এমন সিরিয়াস পর্যায়ে গেছে যে, সি এম-কে জানাতেই হবে। ফাইনাল খেলার উদ্বোধন তো উনিই করবেন। কাপটাও তুলে দেবেন উনি। তা ছাড়া উনি তো কমিটির প্রধান উপদেষ্টা।"

নানু বোস বললেন, "ওঁর সাহায্য তো দরকার। আপনি যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন।"

মন্ত্রী ঘরে ঢুকে চশমাটা টেবিলের ওপর খুলে রেখেছিলেন। এবার চশমাটা চোখে লাগিয়ে একবার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রায় চল্লিশ সেকেন্ড পর মন্ত্রী বললেন, "আমি স্টেডিয়াম থেকে বিভাস চৌধুরী কথা বলছি। জরুরি দরকার। সারকে একটু পাওয়া যাবে ?"

আবার একটু অপেক্ষা করার পর মন্ত্রী বললেন, "সার, আমি বিভাস। টুর্নামেন্ট নিয়ে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার হয়েছে। হ্যাঁ, সেই গোল্ডকাপটা খোয়া গেছে। ওই রায় কোম্পানি, যেখানে পালিশ করতে দেওয়া হয়েছিল। সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। আর আটষট্টি ঘণ্টা পর ফাইনাল। খুব গোপনে রাখতে হয়েছে ব্যাপারটা। হ্যাঁ, বলুন। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব অ্যারেঞ্জ করে আপনার কাছে যাচ্ছি। ঠিক আছে।"

মন্ত্রী ফোনটা রেখে দিলেন। তারপর নানু বোসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আমাদের সি পি সাহেব কি মাঠে আছেন ?"

নানু বোস বললেন, "থাকার তো কথা। সি এম কী বললেন ?"

মন্ত্রী একটু নস্যি নিলেন। রুমাল দিয়ে নাকটা মুছে নিয়ে বললেন, "সি পি আর আই জি-কে নিয়ে ওঁর বাড়িতে যেতে। বাড়িতে যাওয়ার আগে ঘটনাটা যেন জানানো না হয়।"

নানু বোস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি মাঠ থেকে সি পি সাহেবকে ডেকে আনছি।"

নানু বোস দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। পিল্লাই চুপ করে বসে রইলেন। তিনি টের পাচ্ছেন, তাঁর শরীর এই ঠাণ্ডা ঘরে বসেও ঘেমে যাচ্ছে। একবার চোখ তুলে মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। মন্ত্রীর চোখ দুটো বোজা। কপালের ভাঁজগুলো স্পষ্ট। ভ্রূ দুটো কোঁচকানো। এর অর্থ, চোখ দুটো বুজে তিনি ভাবছেন।

নানু বোসকে মাঠ পর্যন্ত যেতে হল না। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় দেখলেন, সি পি সাহেব আরও কয়েকজনের সঙ্গে ওপরে উঠে আসছেন। নানু বোসকে দেখে সি পি সাহেব ঠাট্টার সুরে বললেন, "কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন মশাই ! 'একটু আসছি' বলে সেই যে গেলেন আর পাত্তা নেই। ইভনিং নিউজ পেপারে কী বেরিয়েছে দেখেছেন ?"

নানু বোস চমকে উঠে বললেন, "কী ?"

সি পি বললেন, "টুর্নামেন্ট কমিটি আর পুলিশের যোগসাজসে নাকি বহু টিকিট চোরাকারবারি মানে ব্ল্যাকারদের হাতে চলে গেছে।"

নানু বোস বললেন, "ফাইনালের দিন পর্যন্ত এগুলো চলবে। এসব না থাকলে কলকাতার বিকেলগুলো গরম হবে কেমন করে ?"

সি পি'র সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে-আসতে নানু বোস বললেন, "বিভাসদা, মানে স্পোর্টস মিনিস্টার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

সি পি বললেন, "ওঁর আসার খবরটা পেয়েছি। আমি ওঁর ঘরেই যাচ্ছি।"

নানু বোস বললেন, "আসুন।"

দু'জনে মন্ত্রীর ঘরে ঢোকার পর মন্ত্রী বললেন, "আমাদের একটু সি এমের বাড়িতে যেতে হবে।"

সি পি জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকেও ?"

মন্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ। আই জি সাহেবকে খবর দেওয়া হয়েছে। উনিও সোজা পৌঁছে যাবেন।"

সি পি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো ?"

মন্ত্রী বললেন, "বোধ হয় ফাইনালের দিন সবদিকের সিকিউরিটি নিয়ে উনি হয়তো আমাদের কিছু বলতে চান। আমরা এখান থেকে ওঁর বাড়িতে যাচ্ছি সেই কথাটা এখানকার কাউকে বলার দরকার নেই।"

সি পি বললেন, "ঠিক আছে।"

মন্ত্রী বললেন, "তা হলে উঠে পড়া যাক।"

সবাই উঠে দাঁড়ালেন। নানু বোস বললেন, "পিল্লাই কি আমাদের সঙ্গে যাবে ?"

মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "অবশ্যই যাবেন।"

ঘর থেকে বেরিয়ে চারজন বাইরে এলেন। বাইরে তখন সবাই চা খেতে ব্যস্ত। কমিটির একজন মেম্বার বলে উঠলেন, "চা খাবেন নাকি ?"

মন্ত্রী হাত নেড়ে বারণ করলেন। নানু বোস হাতের ইশারায় করম থাপা আর রাম মিত্রকে ডাকলেন। দু'জনে পাশাপাশি বসে ছিলেন। দু'জন কাছে আসতেই নানু বোস বললেন, "মিত্তির, আজ রাতে দু'দলকে ডিনারে ডাকা হয়েছে। ডিনারটা দিচ্ছেন একটা বড় কোম্পানি।"

মিত্তির বললেন, "জানি। টায়ার কোম্পানি। এম. জি. আর।"

নানু বোস বললেন, "তুমি, থাপা, সুরেন্দ্র সিং, ইউসুফ, খোকা চাটুজ্যে আর অবনীদা হোটেলে চলে যেয়ো।"

রাম মিত্র জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা ?"

নানু বোস বললেন, "আমরা একটু পরে জয়েন করব।"

রাম মিত্তির বললেন, "কাল দুপুরে তো সি এম লাঞ্চ দিচ্ছেন ?"

নানু বোস বললেন, "হ্যাঁ।"

করম থাপা বললেন, "আপনি কি চলে যাচ্ছেন ?"

নানু বোস বললেন, "আমি আবার স্টেডিয়ামে ফিরেও আসতে পারি। তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না। ক্যালকাটা ট্রাভেলসকে কাল আটটা এ.সি লাক্সারি বাস দিতে বলা হয়েছে।"

থাপা বললেন, "আজ চারটে চেয়েছিলেন, চারটে দিয়েছে। একটা স্ট্যান্ডবাই রাখা আছে।"

নানু বোস বললেন, "কাল দু'টো লাগবে, দুটো স্ট্যান্ডবাই থাকবে। ফাইনালের দিন ষোলোটা দেবে। বারোটা থেকে তেরোটা লাগবে বাকিগুলো স্ট্যান্ডবাই। ফাইনালের দিন গাড়ি ক'টা বলেছ ?"

করম থাপা উত্তর দিলেন, "পঞ্চাশটা।"

নানু বোস বললেন, "ঠিক আছে। আমি আসছি।"

নানু বোস মন্ত্রীর গাড়িতে উঠলেন। সি পি'র গাড়িতে উঠলেন পিল্লাই।

সি এম-এর মিটিং রুমে ততক্ষণে এসে পৌঁছে গেছেন আই জি, চিফ সেক্রেটারি এবং হোম সেক্রেটারি।

কথা শুরু করলেন স্পোর্টস মিনিস্টার। তারপর সি এম-এর প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে নানু বোস, পরে পিল্লাই সব ঘটনা বললেন। অর্থাৎ যতটুকু ঘটনা তাঁরা জানেন। সব শোনার পর সি এম আই জি আর সি পি-র দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের কী মনে হয় ?"

আই জি তাকালেন সি পি'র দিকে। সি পি বললেন, "আমার ধারণা, এটা সাধারণ চোরের কাজ নয়। এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য কাজ করছে।"

সি এম বললেন, "কীরকম উদ্দেশ্য ?"

সি পি উত্তর দিলেন, "আমাদের এতদিনের টুর্নামেন্টকে কলঙ্কিত করা। আমাদের অপদস্থ করা।"

সি এম বললেন, "সেসব যারা করতে চাইছে তারা তো করবেই। কিন্তু ফাইনালের আগে কাপটা কেমনভাবে উদ্ধার করা যায় সেটার বিষয়ে কিছু ভাবছেন ? সময় তো খুবই কম।"

স্পোর্টস মিনিস্টার বললেন, "সময় কম এবং ব্যাপারটা করতে হবে এমনভাবে, যাতে কোনওভাবেই যেন সংবাদপত্র বা অন্য মিডিয়া জানতে না পারে।"

সি এম বললেন, "কাগজওয়ালারা জানতে পারলে তো সব দায় আমার ঘাড়েই চাপাবে। ওরা এমন লেখা-টেখা লিখবে যাতে মনে হবে আমার রাজত্বে চোর-ডাকাতদের 'প্রমোট' করা হচ্ছে। অন্য রাজনৈতিক দলেরা এটাকে একটা পলিটিক্যাল ইসু করে ফেলবে।"

সি পি বললেন, "আমাদের যা কিছু করার সেটা গোপনে করতে হবে।"

আই জি বললেন, "খুব কঠিন কাজ। পুলিশের বহু লোককে আজ থেকেই কাজে নামতে হবে। কথাটা ওঁদের দিক থেকেও লিক হতে পারে, আবার তাঁদের দিক থেকেও লিক হতে পারে যাঁদের কাছে পুলিশ যাবে।"

নানু বোস বললেন, "তা হলে আমাদের কী করণীয় ? আমরা কী করব ? আর তো হাতে সময় নেই।"

সি পি বললেন, "আমার একটা প্রস্তাব আছে। যদি সেটা আপনারা একটু শোনেন !"

সি এম বললেন, "আপনি বলুন। ওইসব শোনাটোনার জন্যই তো আপনাদের ডাকা হয়েছে।"

সি পি বললেন, "এই কাজের দায়িত্বটা যদি আমরা অন্য কাউকে দিই তা হলে ব্যাপারটা গোপন থাকার সম্ভাবনা বেশি।"

আই জি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কাকে দিতে চান ? তেমন বিশ্বস্ত কে আছে ?"

সি পি বললেন, "ক্যাটস আই-এর সব্যসাচী রায়কে। ওঁরা তো আমাদের হয়ে অনেক কাজ আগেও করেছেন।"

আই জি বললেন, "গুড আইডিয়া।"

তারপর সি এম-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী বলেন ?"

সি এম উত্তর দিলেন, "এসব ব্যাপার তো আপনারাই ভাল বুঝবেন। ওই আই-টাই কীসব বললেন, সে-ব্যাপারে আমি তো খুব একটা ওয়াকিবহাল নই।"

এতক্ষণ পর হোম সেক্রেটারি এবং চিফ সেক্রেটারি দু'জনেই বললেন, "যদি আপনারা ভাল মনে করেন তা হলে আজই যোগাযোগ করুন। সময় কিন্তু অল্প। ওই সব্যসাচীবাবু তো আর ভগবান নন। তাঁকেও তো কিছুটা সময় দিতে হবে।"

আই জি বললেন, "নিশ্চয়ই।"

সি পি বললেন, "আমরা আজই ওঁর কাছে যাচ্ছি। উনি সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে থাকেন।"

সি এম বললেন, "তবে তাই করুন।"

সবাই নমস্কার করে উঠে পড়লেন। বাইরে এসে গাড়িতে ওঠার সময় সি পি বললেন, "নানুবাবু আর পিল্লাইকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

স্পোর্টস মিনিস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কি যাবেন ?"

মন্ত্রী বললেন, "আপনারা যান। কী হল সেটা ফোনে জানাবেন।"

নানু বোস আর পিল্লাইকে সঙ্গে নিয়ে সি পি সাহেব আর আই

জি'র গাড়ি সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের দিকে রওনা দিল। বাইপাসের দু'ধারে তখনও অপরূপ আলোকমালা জ্বলছে।

॥ ৪ ॥

সব্যসাচী রায়ের চেহারাটা চোখে পড়ার মতো। ছ'ফুটের মতো লম্বা মেদহীন চেহারা। চোখ দুটো উজ্জ্বল, তবে একটু ভেতরে ঢোকানো। নাকটা বেশ খাড়া বলে চোখ দুটোকে বোধ হয় ওইরকম মনে হয়। মাথার চুল ছোট-ছোট। দাড়ি কামানো গাল দুটো মসৃণ নয়। ব্রণ বা ওইজাতীয় কিছু হওয়ার ফলে গালে অসংখ্য দাগ। অনেক মানুষের এমন অমসৃণ গাল থাকে। সব্যসাচী রায়কে দেখতে সুন্দর বলা যাবে না, কিন্তু সুপুরুষ বলা যাবে নিশ্চয়ই। তিনি একটা আরাম কেদারায় শুয়ে-শুয়ে বোধ হয় কিছু পড়ছিলেন। দরজার সামনে সি পি-র গলা পেতেই উঠে বসে দরজার দিকে তাকালেন। সবাইকে দেখতে-দেখতে উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "কী সৌভাগ্য, আজ একযোগে আপনারা !"

সি পি ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, "খুব জরুরি ব্যাপারে এসেছি। আপনার সাহায্য দরকার।"

সব্যসাচী বললেন, "আপনার সাহায্য করার জন্যই তো বসে আছি। হাতে বড়ধরনের কোনও কাজই নেই। দেশে কি ক্রাইম কমে গেল নাকি !"

ঘরের মধ্যে অনেক চেয়ার। সবাই চেয়ারগুলোতে বসলেন। সি পি নানু বোস আর পিল্লাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "খুব বিপদ।"

সব্যসাচী বললেন, "বিপদটা কেমন ?"

একটু সময় নিলেন সি পি। সবার মুখের দিকে একবার তাকালেন, তারপর খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দরজাটা বন্ধ করা যাবে।"

সব্যসাচী চেয়ার থেকে উঠলেন না। টেবিল থেকে রিমোট-কন্ট্রোল নিয়ে বোতাম টিপলেন। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ওইরকমই দেখতে আরও একটা জিনিস টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বললেন, "আপনারা চারজন আমার বাড়ির দরজা অতিক্রম করেছেন ছ'টা ছেচল্লিশ মিনিটে।"

সি পি বললেন, "আপনার কম্পিউটার এসব বলে দিতে পারে। কিন্তু কেন এসেছি সেটা তো বলতে পারে না।"

সব্যসাচী বললেন, "মানুষের মন বড় বিচিত্র। কম্পিউটারের সাধ্য কি তার নাগাল পায় !"

নানু বোস ভেতরে-ভেতরে অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। তিনি একবার আই জি আর একবার সি পি'র দিকে তাকালেন। এই তাকানোর অর্থ সি পি বুঝতে পারলেন। সি পি চেয়ারটা একটু টেনে বললেন, "এবার বিপদের কথাটা শুনুন।"

সব্যসাচী বললেন, "বলুন।"

সি পি, নানু বোস এবং পিল্লাইয়ের মুখ থেকে সব ঘটনা শোনার পর সব্যসাচী বললেন, "এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। দেশের মান-ইজ্জত তো ধুলোয় লুটিয়ে যাবে।"

নানু বোস বললেন, "আমরা যাঁরা এই টুর্নামেন্ট কমিটিতে আছি আমাদের কি আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে ! কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকে তো সুইসাইড করতে হবে।"

সব্যসাচী বললেন, "আপনি সুইসাইড করলে আপনি হয়তো বাঁচবেন কিন্তু দেশের মান-ইজ্জত তো বাঁচবে না।"

সব্যসাচী রায় একটু চুপ করে বসে রইলেন। টেবিলের ওপর একটা গোল পেপারওয়েট ছিল, সব্যসাচী একহাতে সেটাকে নাড়াতে-নাড়াতে বললেন, "রায় কোম্পানিটা কতদিনের দোকান ?"

নানু বোস বললেন, "রায় কোম্পানির বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।"

সব্যসাচী বললেন, "এই ধরনের কাপ তো কুয়ালালামপুরে থাকার কথা। ওখান থেকেই পালিশ-টালিস হয়ে আসে।"

নানু বোস বললেন, "যেহেতু গোল্ডকাপের হেড অফিস কলকাতা এবং গোড়া থেকেই এটা কলকাতায় থাকছে, তাই আমরা কলকাতাতেই রাখি। যে-বছর যেখানে ফাইনাল হয় সেখানে কাপটা কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

সব্যসাচী রায় উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করে নিয়ে সি পি'র দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "একটা কাজ কি আপনাদের পক্ষে করা সম্ভব ?"

সি পি প্রশ্ন করলেন, "কী কাজ ?"

সব্যসাচী বললেন, "গোল্ডকাপের ছবি দেওয়া কালার পোস্টার আছে ?"

সি পি উত্তর দেওয়ার আগে পিল্লাই বললেন, "আছে।"

সব্যসাচী বললেন, "কত আছে ?"

পিল্লাই বললেন, "আমরা হাজার দুই ছাপিয়েছিলাম। এখন হাতে হয়তো তিন-চারশো আছে। আর আছে কিছু কার স্টিকার।"

সব্যসাচী বললেন, "পেস্টারগুলোর সাইজ কত ?"

পিল্লাই বললেন, "চব্বিশ বাই কুড়ি।"

সব্যসাচী বললেন, "এই পোস্টার যে প্রেসে ছেপেছেন তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই প্লেট রয়ে গেছে।"

নানু বোস বললেন, "নিশ্চয়ই।"

সব্যসাচী বললেন, "এখান থেকে প্রেসে ফোন করুন। প্লেট রেডি থাকলে অফসেটে আরও হাজার পাঁচেক ছেপে দিতে দেরি হবে না। এখনই ছাপা শুরু করুক। আর আজ রাত থেকেই কলকাতা এবং তার আশপাশে এগুলো মারতে শুরু করে দিন। শহর এবং শহরতলির সবক'টা সোনার দোকানে গোল্ডকাপের পোস্টার যেন লাগানো হয়। এক-দেড়শো ছেলেকে এই কাজে লাগিয়ে দিন।"

সি পি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী মনে হয় ?"

সব্যসাচী বললেন, "আপাতত কিছুই মনে হচ্ছে না। এখনই যে কাজগুলো করতে চাইছি সেটা প্রিকশন হিসেবে। আসল কাজে নামার আগে এগুলো দরকার। আরও দুটো কাজ আপনাদের করতে হবে।"

নানু বোস বললেন, "বলুন কী করতে হবে। আমরা সবরকম কাজ করার জন্য তৈরি আছি।"

সব্যসাচী রায় বললেন, "আপনাদের কমিটি মেম্বারদের নামের তালিকা, ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর চাই। আর একটা কাজ হচ্ছে—" কথাটা শেষ না করেই সব্যসাচী রায় থামলেন। টেবিলে একটা লেখার প্যাড ছিল। সেই প্যাডে সব্যসাচী রায় কিছু নোট করে রেখেছিলেন। সেইদিকে তাকিয়ে বললেন, "কাপটা খোয়া গেছে যে সময়টায় তার কতক্ষণ পর স্পোর্টস মিনিস্টারকে নিয়ে আপনারা রায় কোম্পানিতে যান ?"

নানু বোস বললেন, "প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা রাইটার্স থেকে রওনা দিয়ে রায় কোম্পানিতে আসি। ওখান থেকে যখন বেরিয়ে স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছি তখন সন্ধে হয়েছে।"

সব্যসাচী রায় মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "ক্রীড়ামন্ত্রী মহাশয়কে নিয়ে এখন একবার ওখানে যাওয়া সম্ভব ?"

নানু বোস বললেন, "তা হয়তো সম্ভব। কিন্তু..."

সি পি-সাহেবও বললেন, "কিন্তু তাতে লাভ কী ?"

সব্যসাচী বললেন, "আমি আগামীকালের প্রত্যেকটা মরনিং ডেইলিতে একটা খবর চাইছি।"

সি পি বললেন, "কেমন খবর ?"

সব্যসাচী বললেন, "আজ রাত্রে স্পোর্টস মিনিস্টার নিজে গিয়ে

কাপের পালিশ দেখে এসেছেন। অর্থাৎ রায় কোম্পানিতে যে কাপের কাজ চলছে সেটা আমি জানাতে চাই।"

নানু বোস বললেন, "কাকে জানাতে চান?"

সব্যসাচী বললেন, "নিশ্চয়ই পাবলিককে নয়।"

আই জি এবং সি পি দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকালেন। সব্যসাচী বললেন, "আশা করি, আমার উদ্দেশ্যটা আপনারা দু'জন ধরতে পেরেছেন।" নানু বোস এবং পিল্লাই দু'জনেই সি পি আর আই জি'র মুখের দিকে তাকালেন। সি পি বললেন, "আপনার উদ্দেশ্যটা ভাল।"

সব্যসাচী বললেন, "এই ব্যবস্থাগুলো করে ফেলুন। আর আমি একবার রায় কোম্পানিতে যেতে চাই।"

সি পি বললেন, "আমাদেরও কি যেতে হবে?"

সব্যসাচী বলেন, "দরকার নেই। আমি নানুবাবুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। পিল্লাইবাবু, আপনি প্রেসে চলে যান। পোস্টার মারার লোক জোগাড় হবে তো?"

সি পি আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, "সেসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

সব্যসাচী বললেন, "কিন্তু মন্ত্রীমশাই আর একবার রায় কোম্পানিতে পালিশ দেখতে যাবেন তো?"

সি পি বললেন, "পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলে অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই যাবেন।"

সব্যসাচী এবার চেয়ারে বসতে-বসতে বললেন, "তা হলে আপনারা সেই ব্যবস্থাগুলো করতে থাকুন। আমি নানু বোসকে নিয়ে একটু পরে রায় কোম্পানিতে যাব।"

পিল্লাইকে সঙ্গে নিয়ে সি পি এবং আই জি উঠে পড়লেন। সব্যসাচী নিজের হাতঘড়িটা একবার দেখলেন। তারপর মোবাইল ফোনে নাম্বার লাগিয়ে কানে দিয়ে বললেন, "ছোটাই, কী করছিস? একবার চলে আয়। এলেই সব শুনতে পাবি।"

ফোনটা বন্ধ করে সব্যসাচী উঠে দাঁড়ালেন। নানু বোসকে বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন। আমি ড্রেসটা চেঞ্জ করে আসি।"

নানু বোসকে বসিয়ে রেখে সব্যসাচী অন্য ঘরে চলে গেলেন। মিনিট দশেক সময় গেল। তার মধ্যেই সব্যসাচী চলে এলেন এই ঘরে। ঘরের মধ্যে একা-একা দশ মিনিট বসে থাকার অভিজ্ঞতাটা নানু বোসের কাছে একেবারে অন্যরকম। প্রতিটা মিনিট যেন তাঁর কাছে এক-একটা ঘণ্টা মনে হচ্ছে। সময় যত এগিয়ে যাচ্ছে, ফাইনাল খেলার কিক অফের বাঁশি বাজার সময় ততই এগিয়ে আসছে। বাহাত্তর ঘণ্টা আগে খবরটা জানা গেছে, কিন্তু জানার পর থেকে যে সময়গুলো গেছে তার মধ্যে কাপ উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনাই দেখা যায়নি। যোগাযোগ করা, তদ্বির করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তদ্বির করা মানে কাপটা পেয়ে যাওয়া নয়। নানু বোসের শরীর থেকে-থেকে ঘেমে যাচ্ছিল। কখনও মনে হচ্ছিল তাঁর শরীরে আর শক্তি নেই। কাপটা যদি শেষপর্যন্ত না-ই পাওয়া যায় তা হলে বিকল্প ব্যবস্থা কী হতে পারে সেই ভাবনাটাও মাথায় আসছে। যথেচ্ছ টাকা দিলেও এই সময়ের মধ্যে ওইরকম ডিজাইনের একটা গোল্ডকাপ কারও পক্ষেই তৈরি করে দেওয়া সম্ভব নয়। নানু বোস মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। সব্যসাচী ঘরে ঢুকেই বললেন, "এখনই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন! এখন পর্যন্ত তো তদন্ত শুরুই হয়নি।"

নানু বোস জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী মনে হয়?"

সব্যসাচী রায় পালটা প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপারে?"

নানু বোস বললেন, "কাপটা কি উদ্ধার করা সম্ভব হবে?"

সব্যসাচী রায় উত্তর দিলেন, "কাজে না নামলে সেটা বোঝা যাবে না। আসলে হয় কী জানেন, গল্প, উপন্যাস, নাটক আর

সিনেমা এইসব পড়ে আর দেখে সাধারণ মানুষদের ধারণা হয়েছে গোয়েন্দারা সব পারেন। তাঁদের অসাধ্য বলে কিছু নেই। বাস্তব কিন্তু তা বলে না। বাস্তবে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে একবার নয়, একাধিকবার আমাদের হারতে হয়েছে। রহস্য সমাধানে ব্যর্থ হতে হয়েছে।"

নানু বোসের গলা এবং বুক শুকিয়ে গেল। অসহায়ভাবে সব্যসাচী রায়ের দিকে চোখ তুলে বললেন, "আমাদের গোল্ড কাপের বেলায় কি তেমনটাই আশঙ্কা করছেন ?"

সব্যসাচী রায় নিজের ড্রয়ার থেকে পাইপটা বের করলেন। টোবাকোর কৌটোটা নানু বোসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি কি এই ব্র্যান্ড ব্যবহার করেন ?"

নানু বোস ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু কেমন করে জানলেন ?"

সব্যসাচী পাইপে টোবাকো ভরতে-ভরতে বললেন, "এই জানার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই। আপনার বুকপকেটে পাইপ রয়েছে। হয়তো টোবাকোও সঙ্গে আছে, অথবা নেই। নিজে পাইপ ধরাতে গিয়ে ভদ্রতাবশে আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম। গোয়েন্দাদের সব কথাই কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক নয়।"

কথা শেষ করে সব্যসাচী পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে নানু বোসের দিকে তাকালেন। তারপর নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাতে যাওয়ার আগেই ঘরের কোনও জায়গা থেকে ক্রিং ক্রিং শব্দ হল। শব্দটা বেশ মৃদু এবং মিহি। সব্যসাচী টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখে নিয়েই বললেন, "ছোটাই এসে গেছে।"

নানু বোস জিজ্ঞেস করলেন, "ছোটাই কে ?"

সব্যসাচী উত্তর দেওয়ার আগে রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে দরজা খুলে দিলেন। নানু বোস নাম শুনে ভেবেছিলেন ছোটাই বোধ হয় ছোটখাটো একটি ছেলে। কিন্তু ঘরে যিনি ঢুকলেন, তিনি কোনওমতেই পাঁচ ফুটের বেশি লম্বা নন। তদুপরি চেহারাটা প্রায় গোলাকৃতি। অনায়াসেই একে মোটা বলা যেতে পারে। নানু বোস তার দিকে তাকাতেই সব্যসাচী বললেন, "এর নাম ছোটাই। আমার এক নম্বর সহকারী।"

নানু বোস মনে-মনে হতাশ হয়ে পড়লেন। একজন দক্ষ গোয়েন্দার এমন স্থূলকায় এবং ভুঁড়িওয়ালা সহকারী। তাও আবার এক নম্বর সহকারী। তিনি ফ্যালফ্যাল করে ছোটাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সব্যসাচী বললেন, "ইনি হচ্ছেন নানু বোস। নাম শুনেছিস ?"

ছোটাই বলল, "উনি তো আমাদের স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডে বিখ্যাত লোক।"

সব্যসাচী বললেন, "একটা জটিল ব্যাপার নিয়ে উনি এসেছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই জটিল সমস্যাটা মেটাতে না পারলে আমাদের দেশের মুখে চুনকালি পড়বে।"

ছোটাই জিজ্ঞেস করল, "সমস্যাটা কী ?"

সব্যসাচী জবাব দিলেন, "হাতে সময় কম। গাড়িতে যেতে যেতে বলব। তোর সঙ্গে কি বাইক আছে ?"

ছোটাই বলল, "হ্যাঁ।"

সব্যসাচী এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর নানু বোসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বাইক চালাতে পারেন ?"

নানু বোস উত্তর দিলেন, "পারি, কিন্তু অনেকদিন চালাইনি। আজকের এই মানসিক অবস্থায় বোধ হয় চালাতে পারব না।"

সব্যসাচী বললেন, "দরকার নেই। চলুন বেরিয়ে পড়ি।"

নীচে এসে দরোয়ানকে সব্যসাচী বললেন, "আমি একটা নিমন্ত্রণে যাচ্ছি। রামেশ্বর কোথায় ?"

দরোয়ান বলল, "অফিসঘরে। ডেকে দেব ?"

সব্যসাচী বললেন, "ডাকো। বলো আমি ডাকছি।"

দরোয়ান চলে যাওয়ার পর সব্যসাচী নানু বোসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নীচের তিনখানা ঘর নিয়ে আমার ক্যাটস আই-এর অফিস। এ ছাড়াও দুটো ঘর আছে। আমি থাকি দোতলায়। এটা আমার পৈতৃক বাড়ি।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই একটি ছেলে এসে সামনে দাঁড়াল। ছেলেটির স্বাস্থ্য বেশ ভাল। সব্যসাচী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "রামেশ্বর, তুমি ছোটাইবাবুর বাইকটা নিয়ে আমাদের ফলো করো। আমরা যাব..." কথা শেষ না করেই সব্যসাচী নানু বোসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "কোথায় যেন যাব ?"

নানু বোস বললেন, "পার্ক স্ট্রিট। রায় কোম্পানির বাড়িটা হচ্ছে..."

সব্যসাচী বললেন, "আর বলতে হবে না।"

রামেশ্বরকে আর কিছু বললেন না। শুধু একটা ইশারা করে নানু বোসের গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

নানু বোস অনেকটা পথ পর্যন্ত বাইকটাকে পেছন-পেছন দেখলেন। তারপর আর দেখতে পেলেন না। তবে কি রামেশ্বর পিছিয়ে পড়ল না কি অন্য রাস্তায় চলে গেল! সব্যসাচী রায় গাড়িতে যেতে-যেতে ছোটাইকে সব ঘটনা নিজে বললেন। নানু বোস বারবার পেছন ফিরে দেখছিলেন বলে সব্যসাচী বললেন, "পেছনে কী দেখছেন ? রামেশ্বরকে ? ভয় নেই, ও আমাদের আগে পৌঁছে যাবে। ওকে সেরকমই বলা আছে। ওখানে গিয়ে রামেশ্বরকে দেখলেও না চেনার ভান করে দোকানে ঢুকে যাবেন। আমরা কিন্তু কেউই রামেশ্বরকে চিনি না, রামেশ্বরও চেনে না। কথাটা মনে রাখবেন।"

নানু বোস ঘাড় নাড়লেন। পার্ক স্ট্রিট তখন আলোয় ঝলমল করছে। তেমনই ঝলমল করে জ্বলছে গোল্ডকাপের হোর্ডিংটা। যেটা একটা ইলেকট্রিক কোম্পানি স্পনসর করেছে। গোটাটাই নানা সাইজের বাল্ব আর টিউব দিয়ে তৈরি। রায় কোম্পানির সামনে গাড়ি থেকে নেমে সব্যসাচী প্রথমেই ওই আলোর হোর্ডিংটার দিকে তাকালেন। প্রশ্ন করলেন, "এরকম হোর্ডিং কলকাতায় ক'টা দেওয়া হয়েছে ?"

নানু বোস বললেন, "মোট আটটা।"

সব্যসাচী বললেন, "ঠিক আছে।"

ছোটাই কিন্তু সঙ্গে গেল না। ছোটাই গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চিকলেট চিবুতে আরম্ভ করল। সব্যসাচী আর নানু বোস ওপরে উঠলেন। এ-সময় রায় কোম্পানি খোলা থাকে না। কিন্তু আজ তো বন্ধ করার উপায় নেই। নানু বোস, স্পোর্টস মিনিস্টার এবং পুলিশের নির্দেশ ছিল টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে নানু বোস না বলা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকবে। কোনও স্টাফ যেতে পারবে না। অতএব সবাই ছিলেন।

সব্যসাচী রায় অফিসঘরে ঢুকে ঘরের চারপাশে তাকালেন। মাথার ছাদ, ঘরের দেওয়াল এবং আলমারি আর টেবিল-চেয়ারের ওপর চোখ বোলাতে-বোলাতে বললেন, "কতদিন আগের বাড়ি। অথচ এখনও কেমন মজবুত। বাড়িটার বয়স কত হবে রায়বাবু ?"

রায় উত্তর দিলেন, "আমাদের দোকান তো পঞ্চাশ পেরিয়ে একান্ন চলছে। বাড়িটার বয়স বোধ হয় ষাট-বাষট্টি হবে।"

সব্যসাচী বললেন, "হ্যাঁ, তা হবে। আপনার বয়স কত রায়বাবু ?"

রায়বাবু বললেন, "আমার এখন পঁয়ষট্টি। বি কম পাশ করে ব্যাঙ্কে কিছুদিন চাকরি করেছিলুম। বাবার তাড়নায় ব্যবসা দেখতে আরম্ভ করি চব্বিশ বছর বয়স থেকে। প্রায় একচল্লিশ বছর এই দোকানে আছি। এমন ঘটনা কখনও হয়নি।"

সব্যসাচী বললেন, "তাই তো হয় রায়বাবু। দুর্ঘটনা হঠাৎ করেই ঘটে। চলুন তো, আপনার পালিশঘরটা দেখি।"

রায়বাবুর সঙ্গে নানু বোস আর সব্যসাচী পালিশঘরে এলেন। কর্মচারীরা ওই ঘরেই অলসভাবে বসে আছে। সবার মুখ-চোখেই ভয়ের ছাপ। দেখে মনে হবে যেন লকআপে রাখা হয়েছে। ওঁদের তিনজনকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। সব্যসাচী একে-একে সবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন উচ্চতা মাপছেন। তারপর একে-একে সবার নাম জিজ্ঞেস করলেন। কতদিন কাজ করছে, কোথায় থাকে, বাড়িতে কে-কে আছে এইরকম কয়েকটা প্রশ্ন করার পর গোবিন্দকে বললেন, "তুমি তো আজ থেকে পালিশ শুরু করেছ, তাই না?"

গোবিন্দ উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

সব্যসাচী প্রশ্ন করলেন, "আজ কতক্ষণ পালিশ করেছ?"

গোবিন্দ উত্তর দিল, "কাজ শুরু হয় এগারোটা থেকে। বারোটার পর মানে টিফিনের একটু আগে লোডশেডিং হয়। আমাদের টিফিন সাড়ে বারোটা থেকে একটা। সাড়ে বারোটার আগে আলো চলে যায় বলে আমরা তখনই টিফিনে চলে যাই। ফিরে আসি আলো আসার পর। মানে..."

সব্যসাচী বললেন, "সেসব তো আগেই শুনেছি।"

কথাটা বলে ঘরের চারদিকে আরও একবার তাকালেন। ঘরের বাঁ দিকে আলমারির পাশে কিছু জিনিসপত্র পড়ে ছিল। সব্যসাচী সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "এগুলো কী?"

রায়বাবু বললেন, "ওই কিছু খালি ব্যাগ। বিভিন্ন পার্টি জিনিস নিয়ে আসে তো! কেউ ব্যাগটা ফেরত নেয়, কেউ-বা নেয় না।"

সব্যসাচী গিয়ে ব্যাগগুলো তুলে-তুলে দেখতে লাগলেন। দেখা শেষ করে বললেন, "এইরকম ব্যাগ ক'টা আছে?"

রায়বাবু বললেন, "হিসেব তো মনে নেই। তবে খানপাঁচেক হবে।"

সব্যসাচী গোবিন্দকে প্রশ্ন করলেন, "কাপটার ওজন কত হতে পারে? তোমার তো এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। তুমি বলতে পারবে?"

গোবিন্দ বলে, "কেন পারব না! কাপটার ওজন নীচের কাঠসুদ্ধু চার কিলো তিনশো গ্রাম।"

সব্যসাচী জিজ্ঞেস করলেন, "এত নিখুঁত মাপ তুমি কেমন করে জানলে?"

গোবিন্দ বলল, "কেন জানব না! কাপ যখন দেওয়া হয় তখন সেই কাপের সব জিনিস বলা থাকে। যেমন হাইট, ওজন, কী কাঠ দেওয়া আছে, সিলভারটা কত, গোল্ড কত। তাই আমি সব জানি।"

সব্যসাচী রায় এবার একটু হাসলেন। ঘরের কোণ থেকে একটা ব্যাগ টেনে নিয়ে বললেন, "গোবিন্দ, এই ব্যাগের মধ্যে কি কাপটা যেতে পারে?"

গোবিন্দ ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, যেতে পারে।"

সব্যসাচী বললেন, "রায়বাবু, আপনার চারটে ব্যাগ এখানে আছে। কোনওটারই হাতল নেই। পঞ্চম ব্যাগটার বোধ হয় হাতল ছিল, সেটাই মিসিং।"

রায়বাবু বললেন, "তাই নাকি?"

সব্যসাচী বললেন, "অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা আমার নিছক ধারণা। ধারণামাত্রেই সত্য হয় না।"

এবার পাইপটা ধরালেন সব্যসাচী রায়। রায়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলুন, আপনার অফিসঘরে যাই।"

অফিসঘরে এসে সব্যসাচী বললেন, "আপনার সবক'জন স্টাফের নাম-ঠিকানা আমাকে লিখে দিন।"

রায়বাবু বললেন, "এখনই লিখে দিচ্ছি।"

রায়বাবু তাঁর খাতা খুলে নাম টুকতে লাগলেন। সব্যসাচী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আজ কি আপনার সব স্টাফ হাজির ছিলেন?"

রায়বাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

সব্যসাচী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ কি হাফ ছুটি নিয়েছে?"

রায়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, একজন। শরীর খারাপ বলে টিফিনেই চলে গেছে।"

সব্যসাচী বললেন, "তার নাম-ঠিকানাটাও দিন। তলায় আন্ডারলাইন করে দেবেন ওর নামটা।"

রায়বাবু সব কাজ শেষ করে কাগজটা সব্যসাচীর হাতে দিয়ে বললেন, "এই নিন।"

সব্যসাচী কাগজটা নিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন, "আপনার নাম-ঠিকানাটা তো দিলেন না! যদি অডটাইমে আপনাকে দরকার হয়!"

রায়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, এখনই দিচ্ছি।"

সব্যসাচী রায় নানু বোসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলুন, চলা যাক।"

॥ ৫ ॥

নানু বোস আর সব্যসাচী রায় আবার ফিরে এলেন সব্যসাচীর বাড়িতে। নীচে নেমে নানু বোস ছোটাই এবং রামেশ্বর কাউকে দেখতে পেলেন না। গাড়িতে আসতে-আসতে নানু বোস জিজ্ঞেস করলেন, "ছোটাইবাবু আর রামেশ্বর কোথায়?"

পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে সব্যসাচী বাইরের দিকে তাকিয়ে অনেকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে এবং অলস গলায় বললেন, "ওরা ওদের কাজ সেরে চলে আসবে।"

নানু বোস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনার কী মনে হয় মিঃ রায়?"

সব্যসাচী বাইরের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। সেইভাবেই বললেন, "কী ব্যাপারে?"

মনে-মনে বিরক্ত বোধ করলেন নানু বোস। লোকটা কি পাগল নাকি, তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছে। এ-সময় ওই কাপটা ছাড়া আর কোন্ ব্যাপারেই বা নানু বোস প্রশ্ন করবেন। মনের বিরক্তি চেপে রেখে নানু বোস বললেন, "ওই গোল্ড কাপটার ব্যাপারে। আপনি কি কিছু অনুমান করতে পারছেন?"

সব্যসাচী রায় হতাশ গলায় বললেন, "এখন পর্যন্ত কোনও ক্লু পেলাম না। একটা কিছু ক্লু না পেলে তো এগোতে পারছি না।"

নানু বোস বললেন, "আমাদের হাতে তো আর সময়ও নেই।"

সব্যসাচী বললেন, "সেটাই তো সমস্যা। হাতে সময় থাকলে এত ভাবনা হত না।"

সাদার্ন অ্যাভেনিউ আসার আগেই সব্যসাচী বললেন, "নানুবাবু, আমাকে এখানেই ছেড়ে দিন। এখানে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার আছে।"

গাড়িটা দাঁড়াতেই সব্যসাচী রায় দরজা খুলে নেমে গেলেন। নেমে যাওয়ার সময় নানু বোস বললেন, "আমি আবার কখন যোগাযোগ করব?"

সব্যসাচী বাইরে থেকে গাড়ির দরজাটা ঠেলে দিয়ে বললেন, "আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে না। আমিই দরকার হলে যোগাযোগ করব।"

কথা শেষ করেই সব্যসাচী রায় হাত নাড়তে-নাড়তে ফুটপাথ পেরিয়ে গেলেন। একবুক হতাশা নিয়ে গাড়ির মধ্যে নানু বোস বসে রইলেন। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "সার, এবার কোনদিকে যাব? স্টেডিয়ামে কি?"

নানু বোস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "না। হোটেলে চলো। পার্টি নির্ঘাত এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে।"

গাড়ি হোটেলের দিকে চলতে লাগল। গাড়ির মধ্যে নানু বোস

চোখ বুজে বসে। একটু পরে চোখ খুলে ড্রাইভারের দিকে তাকালেন। ড্রাইভারের নাম দশরথ। গত কুড়ি বছর ধরে দশরথ নানু বোসের গাড়ি চালাচ্ছে। সে তার সাহেবের মেজাজ-মরজি বোঝে। নানু বোসও দশরথকে বিলক্ষণ চেনেন। তবুও বললেন, "দশরথ গাড়ির মধ্যে গোল্ড কাপ নিয়ে যত কথা হল সেটা যেন কেউ না জানে। সাদার্ন অ্যাভেনিউ আসার খবরটাও কাউকে বলবে না। আমার এই গাড়িটা সবার চেনা। আগামীকাল থেকে অন্য গাড়িতে যাতায়াত করব।"

দশরথ মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে সার।"

গাড়িটা আস্তে-আস্তে হোটেলের গেট দিয়ে ঢুকল। গাড়ি থামবার সঙ্গে-সঙ্গে হোটেলের দরোয়ান এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে সেলাম করল। অন্যদিন হলে নানু বোস তার হাতে একটা দশটাকার নোট বখশিশ হিসেবে গুঁজে দিতেন। আজ আর সেসব খেয়ালে এল না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বলরুমের দিকে যেতেই অমিত পোদ্দারের সঙ্গে দেখা। টুর্নামেন্ট কমিটিতে অমিত পোদ্দার আছেন একটা বড় ক্লাবের কর্মকর্তা হিসেবে, সেই ক্লাবের প্রতিনিধি হিসেবে। অমিত নানু বোসকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "কী ব্যাপার নানুদা! তোমার এত দেরি কেন? সবাই তোমার কথা জিজ্ঞেস করছে।"

নানু বোস এই পোদ্দারকে একদম পছন্দ করেন না। টাকার জোরে ক্লাবের কর্মকর্তা হয়েছেন। গত কয়েক বছর ধরে পোদ্দার গোল্ডকাপ কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ-বছর তো বহু টাকা খরচ করেছিলেন নানু বোসকে ভোটে হারিয়ে চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য। শেষপর্যন্ত ভোটে জিততে পারেননি। এই পোদ্দারকে নানু বোসের এখন সন্দেহজনক মনে হল। সব্যসাচী রায়কে পোদ্দারের নামটা কি তাঁর বলে দেওয়া উচিত? নানু বোস অপদস্থ হলে পোদ্দারই সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন। মনে-মনে এই কথাগুলো ভাবতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল। নানু বোস পোদ্দারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম।"

পোদ্দার একটু এগিয়ে এসে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "নানুদা, এনি প্রবলেম?"

নানু বোসের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। প্রবলেমের কথাটা পোদ্দার কেন বলছে? ও কি জানতে পেরেছে? কেউ কি ওকে বলেছে? নানু বোস গভীর দৃষ্টিতে পোদ্দারের দিকে তাকালেন। কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সুরেন্দ্র আর খোকা চাটুজ্যে নানু বোসকে দেখতে পেয়ে বলল, "কখন এলেন নানুদা? ভেতরে সবাই আপনার খোঁজ করছেন।"

ওঁদের সঙ্গে নিয়ে নানু বোস বলরুমে এলেন। বলরুমে তখন দেদার লোক। নানু বোসকে দেখে কেউ-কেউ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "নানুদা এসে গেছেন?" কেউ-কেউ বললেন, "এত দেরি কেন মশাই?" কেউ-কেউ আবার মুখে কিছু না বলে হাত নাড়লেন। নানু বোস গিয়ে দাঁড়ালেন স্পোর্টস মিনিস্টারের পাশে। মিনিস্টার নানু বোসকে নিয়ে একটু সরে এলেন। ঘরের মধ্যে সবাই সবার সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। কেউ কাউকে বিশদভাবে লক্ষ করছে না। মন্ত্রী নানু বোসকে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "খবর কী?"

নানু বোস উত্তর দিলেন, "এখনও কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি।"

মন্ত্রী বললেন, "পাওয়ার কোনও চান্স আছে কি? ক্লু পাক বা না পাক, কাপটা পাওয়া নিয়ে কথা।"

নানু বোস বললেন, "এখনও সেই অন্ধকারেই আছি। আজকের দিনটা তো প্রায় জলেই গেল বলা যায়! কালকের দিনটা হাতে। পরশুই তো ফাইনাল।"

মন্ত্রী গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিন্তু এত বড় পার্টিতে বেশিক্ষণ তো গম্ভীর হয়ে থাকার উপায় নেই। অতএব, নানা লোকের প্রশ্নে তাঁকে হাসতেও হচ্ছে, কথাও বলতে হচ্ছে। নানু বোস আর মন্ত্রীর চারপাশে অনেক লোক জমতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে খোকা চাটুজ্যে এসে নানু বোসকে ডেকে নিল। ভিড়ের বাইরে এসে বলল, "নানুদা, ওই লোকটা কে বলুন তো? ও তো আমাদের কমিটির কেউ নয়?"

নানু বোস বললেন, "কোন লোকটা?"

খোকা চাটুজ্যে এবার ফুলপ্যান্ট আর সাদা রঙের হাওয়াই শার্টপরা একটা লোককে দেখাল। তার পাশে মোটামতন একজন। নানু বোস একটু এগিয়ে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, "আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। তবে এম. জি. আর-এর লোক হতে পারে। মানে যাঁরা আজকের ডিনারটা দিচ্ছেন।"

নানু বোস খোকা চাটুজ্যের কাছ থেকে সরে এলেন। এই পার্টিতে তাঁর মন নেই। যার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তে যাচ্ছে তার কি এখন পার্টি, লোক-দেখানো দেঁতো হাসি আর খাবার ভাল লাগে! মন্ত্রীমশাই ডিনার খেলেন না। একটা ঠাণ্ডা খেয়েছিলেন। এবার চলে যাওয়ার সময় সবাইকে নমস্কার করে চলে গেলেন। তার একটু পরে নানু বোসও বলরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে নিজের গাড়ির নাম্বারটা বলতে যাওয়ার আগেই রিসেপশন কাউন্টার থেকে একটি সুদর্শন যুবক ছুটতে-ছুটতে এসে বললেন, "মিঃ বাসু, আপনার একটা আর্জেন্ট কল আছে।"

নানু বোস রিসেপশনে এলেন। একজন যুবতী লাল রঙের একটা ফোন দেখিয়ে বলল, "ওইটাতে কথা বলুন।"

নানু বোস ফোনটা তুললেন। "হ্যালো।" বলার পরেই ওদিক থেকে বলা হল, "নানুবাবু, আপনি এই হোটেলের তিনশো তিন নম্বর ঘরে চলে আসুন। একা আসবেন। কাউকে কিছু জানাবেন না।" ফোনটা ওদিক থেকে রেখে দেওয়া হল। কে ফোন করল সেটা জানার আগেই ফোন রেখে দেওয়া হয়েছিল। নানু বোস একবার ভাবলেন, তিনশো তিন নম্বরে একবার ফোন করে জেনে নেবেন কে ফোন করেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, তার চাইতে তিনশো তিন নম্বরে যাওয়াই ভাল। তিনি চারদিকে তাকালেন। তারপর রিসেপশন পেরিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন লিফ্টের সামনে। একটু অপেক্ষা করার পরই ওপর থেকে লিফ্ট নেমে এল। লিফ্টের ভেতর থেকে দু'জন বিদেশি মহিলা আর একজন পুরুষ নামলেন। নানু বোস লিফ্টে উঠে বোতাম টিপলেন। লিফ্ট ওপরে উঠতে লাগল।

রায় কোম্পানিতে তখন অন্য দৃশ্য। পুলিশের নির্দেশ যখন এল, তখন রাত্রি ন'টা। ন'টার পর রায়বাবু কর্মচারীদের বললেন, "এবার তোমরা বাড়ি যাও। কাল দশটায় সবাই এসো। যে কেলেঙ্কারিতে ফেঁসেছি তাতে না আমাদের সবাইকে হাজতে যেতে হয়! এ-ক'দিন কেউ কামাই কোরো না। যে কামাই করবে পুলিশ তাকেই সন্দেহ করবে।"

কাজের লোকেরা যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তখনই একটা ফোন এল। ফোন বাজলেই চমকে উঠছেন রায়বাবু। কাঁপা-কাঁপা হাতে ফোনটা ধরে রায়বাবু বললেন, "হ্যালো! রায় অ্যান্ড কোং? হ্যাঁ, কথা বলছি। আচ্ছা, কখন আসবে? সে কী! আমার অফিস তো খোলে দশটার একটু আগে। আমার সঙ্গে আসবে। ঠিক আছে।"

রায়বাবু ফোনটা রেখে দিলেন। রেখে দিয়ে সবার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "কাল যেন কেউ দেরি কোরো না।"

সবাই চলে যাওয়ার পর প্রধান দরজায় তিনটে তালা লাগিয়ে কোলাপসিবল গেট টেনে তাতে দুটো তালা ঝোলালেন। ওপর থেকে নীচে নেমে এসে নিজের ফিয়াট গাড়িটাতে উঠতে গিয়ে

দেখলেন তাঁর গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে সব্যসাচী রায় দাঁড়িয়ে আছেন। একটা টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছেন। রায়বাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি ? এখানে কেন ? ওপরে আসতে পারতেন !"

সব্যসাচী টুথপিকটা দাঁতে চেপে নিয়ে রায়বাবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর টুথপিকটা ফেলে দিয়ে বললেন, "বাইরের ওয়েদারটা কী চমৎকার দেখছেন। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।"

রায়বাবু শশব্যস্ত হয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে কি কোনও দরকার আছে ?"

সব্যসাচী বললেন, "তেমন কোনও দরকার নেই। আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে যাব। আপনার বাড়ি তো তালতলায়, তাই না ?"

শশধর রায় অর্থাৎ রায়বাবু বিষম ঘাবড়ে গেলেন। একটা ঢোক গিলে বললেন, "চলুন।"

সব্যসাচী রায় বললেন, "আপনার গাড়ি কে চালায় ?"

রায়বাবু বললেন, "আজ্ঞে, আমি।"

সব্যসাচী বললেন, "চলুন তা হলে।"

সব্যসাচী রায়ের জন্য পেছনের দরজাটা খুলে দিতেই সব্যসাচী বললেন, "আমি আপনার পাশে বসব।"

রায়বাবু কোনও কথা বললেন না। গাড়ি স্টার্ট দিলেন। একটু পথ আসার পর রায়বাবু বললেন, "সার, কোনও হদিস হল ?"

সব্যসাচী বললেন, "কিসের ?"

রায়বাবু বললেন, "ওই কাপটার। আপনাদের তো অনেক নলেজ। কিছু কি আন্দাজ করতে পারলেন ?"

সব্যসাচী রায় পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, "বাংলায় একটা প্রবাদ আছে সেটা জানেন কি ?"

রায়বাবু বললেন, "কতরকম প্রবাদই তো আছে। আপনি কোনটার কথা বলছেন ?"

সব্যসাচী পাইপে একটা টান দিয়ে বললেন, "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কিন্তু পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা, আর আমরা, মানে গোয়েন্দারা ছুঁলে বাহাত্তর ঘা। বাহাত্তর ঘা হলে কোনও ডাক্তার বাঁচাতে পারে না।"

শশধর রায় ভীত গলায় বললেন, "সার, এসব কথা আমাকে কেন বলছেন ! আমি তো আপনাদের সঙ্গে যথাসাধ্য সহযোগিতা করছি। এমন একটা ঘটনার জন্য আমারও কি কম খারাপ লাগছে ? দেশের মাথাটা হেঁট হয়ে যাবে।"

সব্যসাচী রায় প্রথমে বললেন, "আপনি গাড়িটা ঠিক করে চালান। মনে হচ্ছে আপনার হাত কাঁপছে। না পারলে বলুন, আমি চালাচ্ছি।"

শশধর রায় বললেন, "না-না, ঠিক আছে সার।"

এবার সব্যসাচী রায় বললেন, "আপনি ঠিকই সহযোগিতা করছেন। আপনাকে নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু..."

শশধর রায় উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু ?"

সব্যসাচী রায় সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, "তালতলা তো এসে গেল। আপনার বাড়িটা আর কতদূর ?"

শশধর রায় বললেন, "এবার বাঁয়ে ঘুরব। তিনটে বাড়ি ছাড়ার পরই আমার বাড়ি।"

সব্যসাচী বললেন, "বাড়িটা তো আপনার বাবার তৈরি ?"

শশধর রায় বললেন, "হ্যাঁ। বাবার আমলে একতলা ছিল। আমার আমলে..."

সব্যসাচী রায় বললেন, "দোতলা হয়েছে। আপনার ছেলের আমলে নিশ্চয়ই তিনতলা হবে।"

শশধর রায় নিজের বাড়ির সামনে এসে গাড়িতে হর্ন দিলেন।

হর্ন শুনেই বাইরের বাতিটা জ্বলে উঠল। সব্যসাচী দেখলেন, বাড়ির গেটটা বেশ বড়। গাড়িটা বোধ হয় এই গেট দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়। ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলে এসে গেটটা খুলে দিল। গেটের পাল্লা দুটো টেনে দু'দিকে সরিয়ে দিল। শশধর রায় গাড়িটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। গাড়ি থেকে নামবার সময় সব্যসাচী বললেন, "বাড়িতে সবার কাছে আমার পরিচয় দেবেন আপনার পুরনো বন্ধু। আজই দিল্লি থেকে এসেছি। আপনি আমাকে জোর করে এখানে এনেছেন।"

শশধর রায় বললেন, "ঠিক আছে। তাই হবে।"

এবার শশধর রায়ের পেছন-পেছন সব্যসাচী রায়ও সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে-উঠতে শুনলেন, দোতলার কোনও একটা ঘর থেকে বিদেশি মিউজিকের সুর ভেসে যাচ্ছে। র‍্যাপ জাতীয় কোনও গান। সব্যসাচী বললেন, "একতলায় কে থাকেন ?"

শশধর রায় বললেন, "আমার এক বিধবা দিদি আর তার মেয়ে। অন্য ঘরে কাজের লোকেরা শোয়। আর একটা ঘর ফাঁকা পড়ে আছে।"

সব্যসাচী বললেন, "আর দোতলায় ?"

শশধর বললেন, "একটাতে আমি আর আমার স্ত্রী। অন্যটাতে ছোট ছেলে। আর একটা বড় ছেলের। সে তো অফিসের কাজে এখন হলদিয়ায় আছে। মাসে পনেরো-বিশদিন ও বাইরেই থাকে।"

সব্যসাচী রায় এবার শশধরবাবুর পেছন-পেছন দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বারান্দার দু'পাশে তাকিয়ে বললেন, "ছোট ছেলে কী করে ?"

শশধর রায় উত্তর দেওয়ার আগেই ঘর থেকে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, "কী গো, আজ এত দেরি ?"

স্বামীর পাশে অপরিচিত এক ভদ্রলোককে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে মুখটা অন্যদিকে ফেরালেন। শশধরবাবু বললেন, "তোমায় ফোন করে তো বললুম, আজ ওই কাপের পালিশ দেখতে মন্ত্রী আসছেন। কত ভি. আই. পি. আসছেন। আজ তো দেরি হবেই। আর শোনো, ইনি হচ্ছেন..." এইটুকু বলেই শশধর রায় সব্যসাচীর দিকে তাকালেন। সব্যসাচী শশধরবাবুর স্ত্রীকে হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, "আমার নাম দেবাংশু রায়। শশধরদা আমার দাদার মতো। আমি দিল্লিতে থাকি। এই গোল্ডকাপের জন্য আজই কলকাতায় এসেছি। এসেই শশধরদা'র কাছে গিয়েছিলাম। উনি আমায় টেনে আনলেন। আমার জিনিসপত্র সব হোটেলে পড়ে আছে। কলকাতায় যখন থাকতাম, তখন তো শশধরদার রায় কোম্পানিতেই আমাদের আড্ডা জমত। সেইসব দিনের কথা আপনার মনে আছে রায়দা ?"

কথাটা বলেই সব্যসাচী শশধর রায়কে একটা কনুইয়ের খোঁচা দিলেন। সেই খোঁচা খেয়ে শশধর রায় বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মনে আছে। কেন মনে থাকবে না ? তাই তো আপনাকে ধরে নিয়ে এলাম।"

রায়গিন্নি আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি করলেন না। সব্যসাচী রায় হাতমুখ ধুয়ে এসে ঘরের সোফায় বসে বললেন, "রায়বাবু, আমি কিন্তু রাত্রেই চলে যেতে চাইব। আপনি আর আপনার স্ত্রী জোর করে আজকের রাত আমাকে এ-বাড়িতে রেখে দেবেন।"

রায়বাবুর মুখ আরও পাংশু হয়ে গেল। সেই মুখেই বললেন, "বেশ, তাই করব। আজ রাতে আপনাকে এখানেই রেখে দেব। জানি না, আমার অদৃষ্টে ক'টা ঘা আছে। আঠারো, না বাহাত্তর ?"

সব্যসাচী চাপা গলায় বললেন, "রায়দা, বাহাত্তরের ডবল হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ। মানে হানড্রেড ফরটি ফোর।"

রায়বাবু ঢোক গিলে বললেন, "তা জানি।"

রাত্রে খাবার টেবিলে তিনজন বসল। শশধর রায়, সব্যসাচী রায় এবং শশধরবাবুর ছোট ছেলে কৌশিক। কৌশিকের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মতো। গায়ের রং ফরসা। গালে সুন্দর করে ছাঁটা চাপদাড়ি। শশধরবাবুই কথায়-কথায় বললেন, "বি. কম পাশ করে চাকরির চেষ্টা করছে অথচ পৈতৃক ব্যবসাটা দেখার ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই।" সব্যসাচী ছেলেটির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "ফাইনাল খেলা দেখতে যাচ্ছ তো ?"

কৌশিক উত্তর দেওয়ার আগেই শশধর রায় বললেন, "এই শোন, তোর টিকিট আমি পেয়ে গেছি। ভি. আই. পি. ব্লকের টিকিট।"

কৌশিক ভাতের থালাটা নিজের দিকে টেনে নিতে-নিতে বলল, "কটা পেয়েছ ?"

শশধর রায় বললেন, "তোর জন্য দুটো পেয়েছি। আর আমার জন্য একটা।"

কৌশিক বলল, "বাবা, এবার কিন্তু আমি তোমার কাছে চারটে চেয়েছিলাম। তোমার ওই নানু বোস বগলে একগাদা টিকিট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার নিজের লোককে বিলোবার জন্য। অথচ আমরা পাচ্ছি না।"

শশধর রায় ভাত মাখতে-মাখতে বললেন, "টিকিটের এত আকাল, তার মধ্যে তুই কেন চারটে চাইছিস ! এটা দাতব্য করা হচ্ছে না !"

কৌশিক গলায় একটু তাচ্ছিল্যের সুর এনে বলল, "তোমার টিকিট তোমার কাছেই রেখে দাও। আমার পকেটে আজই চারটে ভি.আই.পি ব্লকের টিকিট এসে গেছে। আগামীকাল ফেনসিংয়ের ধারে চেয়ারে বসার দুটো টিকিট পেয়ে যাব।"

শশধর রায় ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে থামলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এত টিকিট তোকে কে দিল ?"

কৌশিক বাবার দিকে তাকিয়ে গর্বের ভঙ্গিতে বলল, "আমারও তো সোর্স থাকতে পারে। সেই সোর্সটা তোমার চেয়ে কিছু কম নয়।"

শশধর রায় বললেন, "সোর্সটা কে ?"

কৌশিক উত্তর দিল, "সেটা জেনে তোমার কী লাভ ? আমি নামটা বলি আর অমনই তুমি গিয়ে নানু বোসকে রিপোর্ট করো। এসব ঝামেলায় আমি নেই।"

এতক্ষণ নিঃশব্দে সব্যসাচী বাপ-ছেলের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। এবার রায়গিন্নির দিকে তাকিয়ে বললেন, "বৌঠান, আপনার লাউচিংড়িটা দারুণ হয়েছে। দিল্লিতে এরকম পাই না।"

রায়গিন্নি সলজ্জ হেসে বললেন, "আপনার দাদার কাণ্ডটা দেখুন ! একটিবার ফোন করে বলতে পারত। এরকম সাদামাঠা খাবার কোনও অতিথিকে দেওয়া যায় ?"

সব্যসাচী বললেন, "আমাকে একদম অতিথি ভাববেন না। অতিথি ভাবলে আত্মীয়তা হয় না। দূর সম্পর্কে আমরা আত্মীয় সেটা জানেন কি ? রায়দা সেটা বলেছেন ?"

কথা শেষ করেই সব্যসাচী টেবিলের তলায় হাত ঢুকিয়ে শশধর রায়কে একটা খোঁচা দিলেন। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো শশধর রায় খোঁচা খেয়েই বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, এটা তোমাকে বলা হয়নি। উনি আমাদের জ্ঞাতি। দেখা-সাক্ষাৎ বড় একটা হয় না তো, তাই..."

শশধর কথা শেষ না করেই সব্যসাচীর দিকে তাকালেন। সব্যসাচী বললেন, "এটা আমারই দোষ। এই যে কৌশিক, ও তো সম্পর্কে আমার ভাইপো। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে চিনি না।"

কৌশিক বলল, "সত্যিই চিনি না। আপনি যে সম্পর্কে আমার আঙ্কল হন, সেটা আজই প্রথম জানলাম।"

সব্যসাচী রায় এবার কৌশিকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কোনটা ভাল লাগে? ফুটবল, না ক্রিকেট?"

কৌশিক বলল, "দুটোই।"

সব্যসাচী বললেন, "এবার তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতে আসছে সিরিজ খেলতে। প্রথম ম্যাচ দিল্লিতে। তুমি দেখবে?"

কৌশিক বলল, "দিল্লিতে কী করে যাব? ওরা কলকাতায় এলে দেখব।"

সব্যসাচী বললেন, "বোকা ছেলে! আমি তো ওঁদের পাঁচটা টেস্ট আর পাঁচটা ওয়ান ডে দেখব। দেখতেই হবে। তোমার কোনও ভাবনা নেই। আমি দিল্লি থেকে তোমাকে প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেব। এয়ারপোর্টে আমি থাকব তোমার জন্য। এবার সবক'টা ম্যাচ তুমি আমার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখবে। রাজি?"

কৌশিক একবার মায়ের দিকে তাকাল। তারপরই বলল, "আমি রাজি।"

সব্যসাচী রায় বললেন, "গোল্ডকাপেও তুমি আমার সঙ্গে যাবে। খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে আমি তোমাকে নিয়ে যাব। রাজি আছ?"

কৌশিক সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "রাজি আছি।"

খাওয়া শেষ করে ওঠার পর সব্যসাচী বললেন, "রায়দা, এত রাতে আর হোটেলে ফিরব না। আজকের রাতটা যদি এখানেই থাকি তা হলে কি..."

রায়বাবু উত্তর দেওয়ার আগে কৌশিক বলল, "আঙ্কল আপনি এখানেই থেকে যান।"

সব্যসাচী একবার শশধর রায়ের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "কৌশিক, আমি আর তুমি এক ঘরে থাকব। আমার আবার নতুন জায়গায় একলা ঘরে ঘুম হয় না।"

কৌশিক বলল, "তাই ভাল। আমরা এক ঘরে থাকব। আঙ্কল, আপনি কি কখনও লারাকে মিট করেছেন?"

সব্যসাচী বললেন, "চাকরিটা তো সাংবাদিকতার। অতএব মিট তো অনেকবারই করতে হয়েছে। চলো, ঘরে গিয়ে এসব গল্প করা যাবে।"

সব্যসাচী কৌশিকদের ঘরে যাওয়ার আগে শশধরের দিকে একবার তাকালেন। একটু হাসলেন। তারপর 'গুড নাইট' বলে চলে গেলেন কৌশিকের ঘরে।

শশধর রায় খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আস্তে-আস্তে চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।

গির্জার ঘণ্টা থেকে বোঝা গেল এখন রাত বারোটা।

॥ ৬ ॥

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নানু বোস দেখলেন রাত্রি বারোটা বাজে। তার মানে একটা দিন চলে গেল। কাল সকাল থেকে আবার একটা দিন শুরু হবে এবং আস্তে-আস্তে শেষ হবে। তারপরের দিন বেলা তিনটেয় খেলা শুরু। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে অনেক ঘণ্টা খরচ হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত কাপ পাওয়া তো দূরের কথা, পাওয়ার ক্ষীণতম আশাও দেখা যায়নি। সব্যসাচী রায়ের কথামতো আজ যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার বিবরণ কালকের কাগজেই বেরিয়ে যাবে। ক্রীড়ামন্ত্রী কাপের পালিশ দেখে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন। সময়ের হিসেবে এই ঘটনা যখন ঘটছে তার অনেক আগেই কাপটা খোয়া গেছে। এটা হয়তো সব্যসাচী রায়ের কোনও কৌশল। কাপটা পাওয়া গেলে এই কৌশল খুবই তারিফ পাবে। কিন্তু না পাওয়া গেলে এই কৌশলটাও তখন অন্য চেহারা নেবে। প্রশ্ন উঠবে, কাপ খোয়া যাওয়ার এত ঘণ্টা পরে ক্রীড়ামন্ত্রী কেমনভাবে কাপের পালিশ দেখলেন!

নানু বোসের মাথার মধ্যে দপদপ করতে লাগল। তিনি বিছানার ওপর উঠে বসলেন। ঘরের মধ্যে এ. সি. মেশিন চলার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। হাতের কাছে টেলিফোন। বালিশের পাশে সেলুলার। কিন্তু এ-সময় কাকে ফোনে পাবেন? তাঁর মতো কেউ কি জেগে আছে? হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে পাইপটা টেনে নিলেন। কৌটো থেকে টোবাকো নিয়ে পাইপে ভরবার আগেই তাঁর বালিশের পাশে রাখা সেলুলারটা বেজে উঠল। নানু বোস টোবাকো আর পাইপ রেখে দিয়ে ফোনটা ধরলেন। ওপাশ থেকে সব্যসাচী রায়ের গলা পাওয়া গেল। নানু বোস বললেন, "কোনও সুখবর আছে?"

সব্যসাচী রায় জবাব দিলেন, "না, মশাই। কিস্যু নেই। কোনও সূত্র এখনও পাচ্ছি না।"

নানু বোসের গলা থেকে একটা হতাশব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ বের হল। সব্যসাচী বললেন, "আপনি রাত জাগবেন না। শুয়ে পড়ুন। কাল সকাল ছ'টায় আপনাকে একটু ময়দানে আসতে হবে।"

নানু বোস বললেন, "ময়দানে কোথায়?"

সব্যসাচী উত্তর দিলেন, "প্রেস ক্লাবটা চেনেন তো! সেই ক্লাবের গেটের সামনে আমি থাকব। এখন আর রাত জেগে শরীর খারাপ করবেন না। শুয়ে পড়ুন।"

সব্যসাচী রায়ের কথা শেষ হতেই নানু বোস টেলিফোনটা আবার বালিশের পাশে রাখলেন। আগামীকাল সকাল ছ'টায় প্রেস ক্লাবের গেটে তাঁকে দাঁড়াতে বলার কোনও কারণ নানু বোস খুঁজে পেলেন না। তবুও মনে-মনে এই ভেবে একটু সান্ত্বনা পেলেন যে, হয়তো কাল সকালেই আশাব্যঞ্জক কোনও খবর পাওয়া যাবে।

ওদিকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শশধর রায় শুনলেন সব্যসাচীবাবু অনেক ভোরে বেরিয়ে গেছেন। যাওয়ার আগে শুধু কাজের লোকটিকে বলে গেছেন, "আমি ন'টার সময় রায় কোম্পানিতে যাব। শশধরবাবু যেন আজ ন'টায় যান।" তারও একটু পরে শশধরবাবুর স্ত্রী এসে বললেন, "ছোটখোকাকে কি কোথাও পাঠিয়েছ?"

শশধর বললেন, "না। আমি তো কোথাও পাঠাইনি। দ্যাখো কোন রকে বসে আড্ডা মারছে!"

অন্যদিনের চাইতে তাড়াতাড়ি দোকানে এলেন শশধরবাবু। ওপরে উঠে দেখলেন, দোকানের বন্ধ দরজার সামনে সব্যসাচী রায় দাঁড়িয়ে। শশধরবাবু নিজের ঘড়িটা দেখতে-দেখতে বললেন, "আমি দেরি করে ফেলিনি তো?"

সব্যসাচী রায় মাথা নাড়লেন। মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন, দেরি হয়নি।

শশধর রায় যখন দোকানের তালা খুলছেন তখন সব্যসাচী বললেন, "আজ সব কাগজে খবর বেরিয়ে গেছে যে গতকাল সন্ধ্যার পর মন্ত্রীমশাই এসে কাপের পালিশ দেখে গেছেন।"

শশধর রায় চাবি দিয়ে তালা খুলছিলেন। তাঁর হাতটা থেমে গেল। পেছন ফিরে সব্যসাচী রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই রকম খবর বেরিয়েছে নাকি? সব কাগজে বেরিয়েছে?"

সব্যসাচী রায় বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শশধর রায় বললেন, "খবরটা তো সত্যি নয়।"

সব্যসাচী এবার একটু কঠিন গলায় বললেন, "সেটা আপনার কাছে। কিন্তু অন্যদের কাছে নয়। আজ আপনার টেলিফোনের পাশে আমার একজন লোক বসবে। কর্মচারীদের বলবেন, লোকটির নাম বিমল বসাক। আজ থেকে রায় কোম্পানিতে কাজ করবে। আপনার টেলিফোনের সঙ্গে একটা প্যারালাল লাইন আছে তো?"

শশধর বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

সব্যসাচী বললেন, "সকাল থেকে দোকান বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ফোন এলে আপনার সঙ্গে বিমলও ধরবে। বিমল কথা বলবে না। শুধু শুনবে। কথা বলবেন আপনি।"

শশধর রায় ভীত চোখে সব্যসাচীবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সার, আপনার সন্দেহ কি আমার দিকে ?"

সব্যসাচী রায় উত্তর দিলেন, "গোয়েন্দাদের স্বভাব ভাল নয়। নিজেকে ছাড়া আর সবাইকে তারা সন্দেহ করে।"

শশধর রায় বললেন, "এতদিন ধরে কাপটা পালিশ করছি। কখনও কোনও গণ্ডগোল হয়নি। কপাল মন্দ না হলে ..."

ফোনটা বেজে উঠতেই সব্যসাচী বললেন, "এটা আপনার ফোন নয়। আমার। আপনার ফোন আসবে সাড়ে ন'টার পর। এখনও সাড়ে ন'টা বাজেনি।"

সব্যসাচী ফোনটা ধরে বললেন, "এসে গেছিস। ওপরে চলে আয়।" ফোন নামিয়ে রেখে সব্যসাচী বললেন, "আপনার নতুন কর্মচারী বিমল বসাক আসছে।"

শশধর রায় পাখাটা চালিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসলেন। একটু পরে ছোটাই এল। ছোটাইকে দেখে সব্যসাচী বলে উঠলেন, "আয় বিমল। ইনি হচ্ছেন শশধর রায়। রায় কোম্পানির মালিক। ওঁকে সব বলা আছে। তুই কাজে লেগে যা।"

ছোটাই প্রশ্ন করল, "তুমি !"

সব্যসাচী উত্তর দিলেন, "একটু কাজে বেরোব।"

কথাটা শেষ করেই সব্যসাচী শশধরবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "চলি।"

নীচে নেমে দেখলেন তাঁর গাড়ির পেছনেও কে যেন গোল্ডকাপের স্টিকার লাগিয়ে দিয়ে গেছে। গোটা শহরের দেওয়াল জুড়ে গোল্ডকাপের রঙিন পোস্টার। সব্যসাচী যেমনটি চেয়েছিলেন, তেমনই হয়েছে। সব্যসাচী গাড়ি নিয়ে ময়দানে এলেন। প্রেস ক্লাবের গেটে সব্যসাচীর জন্য নানু বোসের অপেক্ষা করার কথা। আজ সকাল ছ'টায় সেইরকমই কথা হয়েছে। সব্যসাচী দেখলেন, পাইপ দাঁতে চেপে নানু বোস বসে আছেন। তাঁর পাশে সি পি সাহেব। সি পি সাহেব প্রশ্ন করলেন, "এনি প্রোগ্রেস ?"

সব্যসাচী ঠোঁট উলটে জবাব দিলেন, "নাথিং।"

সি পি সাহেব বললেন, "আমি নিজে সি এমের কাছে আপনার নাম প্রস্তাব করেছি। আমার মানটা আপনি বাঁচান। আপনি ফেল করলে আমাদের পুলিশ মহলে আমাকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হবে।"

সব্যসাচী বললেন, "আপনাদের দু'জনের কাছ থেকে দুটো হেল্প চাই। নানুবাবু, আপনি ওটা চেক করেছেন ? সকালে যেটা বললাম।"

নানু বোস বললেন, "হ্যাঁ। ও এখন মেডিক্যাল লিভে আছে।"

সব্যসাচী এবার সি পি-র দিকে তাকিয়ে বললেন, "জনার্দন চক্রবর্তী বলে এক ভদ্রলোক কালীঘাটে থাকেন। বছর সাতেক আগে মন্দির থেকে গয়না চুরির দায়ে দু'বছর জেল খেটেছিলেন। ভদ্রলোক এখন কালীঘাটে থাকেন না। খিদিরপুরে থাকেন। ওঁর পুরনো ফাইলটা লালবাজারে গেলে দেখা যাবে।"

সি পি বললেন, "আমার সঙ্গে লালবাজারে চলুন। আমি চেষ্টা করছি।"

সব্যসাচী বললেন, "একমাত্র নানুবাবু আর আপনি ছাড়া আর কেউ ফাইনাল খেলা শুরুর আগে রায় কোম্পানিতে কাপ দেখতে যেতে পারবেন না। এটা আপনাদের নাম করে আমি শশধরবাবুকে বলে এসেছি।"

সি পি বললেন, "তদন্তের ব্যাপারে আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। এ-ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই।"

সব্যসাচী বললেন, "নানুবাবু, আপনি এবার আপনার কাজে যান। দরকার হলে মোবাইলে কথা বলব। আমি সি পি সাহেবের সঙ্গে লালবাজারে যাচ্ছি।"

সব্যসাচী নিজের গাড়ির ড্রাইভারকে বললেন, "তুমি লালবাজারে চলে এসো। আমি সি পি সাহেবের গাড়িতে যাচ্ছি।।"

সি পি সাহেবের গাড়িতে উঠতে-উঠতে সব্যসাচী বললেন, "হলদিয়া থেকে একটা খবর আনিয়ে দিতে পারবেন ?"

সি পি. জিজ্ঞেস করলেন, "কী খবর ?"

সব্যসাচী রায় বললেন, "ওটা আপনার ঘরে গিয়ে বলব।"

গাড়িটা লালবাজারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

নানু বোস নিজের বাড়ি ঘুরে চলে এলেন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। স্টেডিয়ামের কনফারেন্স রুমের দিকে এগিয়ে যেতেই কেউ একজন বললেন, "নানুদা, স্পোর্টস মিনিস্টার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

নানু বোস জিজ্ঞেস করলেন, "উনি কোথায় ?"

উত্তর এল, "উনি নিজের ঘরে।"

নানু বোস আর কোনওদিকে না তাকিয়ে দ্রুত মন্ত্রীর ঘরে ঢুকে গেলেন। মন্ত্রীর ঘরে তখন তিন-চারজন লোক বসে। মন্ত্রী নানু বোসকে দেখেই বললেন, "আপনারা এখন একটু বাইরে যান। আমি নানুদার সঙ্গে কয়েকটা কাজের কথা বলি।"

চেয়ারে বসে থাকা লোকগুলো উঠে দাঁড়াল। আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বাইরে চলে গেল। মন্ত্রী বললেন, "দরজা বন্ধ করে দিন।"

দরজা বন্ধ করে দিয়ে নানু বোস বসলেন মন্ত্রীর মুখোমুখি। মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও খবর আছে ?"

নানু বোস হতাশ গলায় বললেন, "এখনও কোনও খবর নেই। শেষপর্যন্ত কী হবে তা জানি না।"

মন্ত্রী বললেন, "আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। আগামীকাল ফাইনাল। কালই তো কাপটা দরকার।"

নানু বোস বললেন, "দরকার তা জানি। কিন্তু কাপটা বোধ হয় হাজির করা যাবে না। রিপ্লিকাটাই হাজির করতে হবে। আর এটাই যদি হয় তা হলে সবকিছু ছেড়ে আমাকে ভারতের বাইরে চলে যেতে হবে।"

মন্ত্রী নস্যি নিলেন। রুমাল দিয়ে নাক মুছে নিয়ে বললেন, "আমার বিশ্বাস, ফাইনালের আগেই কাপটা উদ্ধার হবে।"

নানু বোস বললেন, "এটা আপনার বিশ্বাস। কিন্তু এটাই যে ঘটবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই।"

মন্ত্রী কোনও কথা বললেন না। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে। হঠাৎ নানু বোসের মোবাইল টেলিফোনটা বেজে উঠল। নানু বোস কথা বললেন। ফোনের ওদিকে সব্যসাচী রায়। নানু বোস বললেন, "বলুন, কী ব্যাপার ?"

ওদিক থেকে সব্যসাচী বললেন, "বেলেঘাটার শ্রীমা ইন্ডাস্ট্রিজ, যারা নানা ধরনের ব্যাগ বানায়, তাদের টেলিফোন নাম্বারটা দিচ্ছি। আপনি ওদের ডেকে পাঠান। হাজার কয়েক ব্যাগের অর্ডার দিন।"

নানু বোস বিরক্ত গলায় বললেন, "হাজার কয়েক ব্যাগ দিয়ে আমার কী হবে ? আপনি আসল কাজটা কতদূর করলেন ?"

সব্যসাচী উত্তর দিলেন, "এখনও কিছুই হয়নি। আপনি ফোন নাম্বারটা নিন। ব্যাগের অর্ডারটা প্লেস করুন।"

অসহিষ্ণু গলায় নানু বোস বললেন, "ব্যাগ নিয়ে আমি কী করব ?"

সব্যসাচী উত্তর দিলেন, "আপনাকে কিছু করতে হবে না। ওটা আমার দরকার। যা বলছি তাই করুন।"

সব্যসাচী রায় লাইনটা কেটে দিলেন। নানু বোসের মুখ থেকে সব ঘটনা শোনার পর মন্ত্রীমশাই বললেন, "উনি যা বলছেন তাই করুন।"

নানু বোস বাধ্য হয়ে সব্যসাচীর দেওয়া নম্বরে ফোন করলেন। ফোন করতে যাওয়ার আগে মন্ত্রী বললেন, "ওঁদের কাউকে ব্যাগের স্যাম্পেল নিয়ে এখানে আসতে বলুন।"

নানু বোস ফোনের ডায়াল ঘোরাতে-ঘোরাতে বিরক্ত গলায় বললেন, "ব্যাগ-ফ্যাগ দিয়ে যে কী হবে কে জানে! কাপের বদলে তো গাদা-গাদা ব্যাগ হাজির করলে হবে না!"

ফোন করে সব্যসাচী রায়ের নির্দেশমতো কথাগুলো বললেন নানু বোস। সেইসঙ্গে ব্যাগের স্যাম্পেল নিয়ে কাউকে স্টেডিয়ামে আসতে বললেন। নানু বোস বুঝতে পারছিলেন এসব কাজের কোনও মূল্য নেই। শুধু সময়টা চলে যাচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে ততই ফাইনাল খেলার সময়টা এগিয়ে আসছে আর নানু বোসের ভেতরে উত্তেজনা বাড়ছে। এই উত্তেজনার মধ্যে কোনও আনন্দ নেই। শুধু আতঙ্ক আর দুর্নামের ভয়। নানু বোস মন্ত্রীর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। দু'জনে মাঠে এলেন। চমৎকার করে গ্যালারির চেয়ারগুলো সাজানো হয়েছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু আজ আর এই অনুভূতিগুলো কাজ করছে না। বাইরের কোনও আনন্দই নানু বোসকে আজ আর স্পর্শ করতে পারছে না। তাঁর মনে হচ্ছিল গোটা গ্যালারি-ভর্তি দর্শক শুধু তাঁর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে তাকিয়ে আছে। হয়তো এখনই এই বিশাল জনস্রোত তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নানু বোসের বুকের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে কিছু লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। গ্যালারিতে তখনও কিছু কাজ হচ্ছিল। সেখানেও কিছু লোক। নানু বোস মন্ত্রীর সঙ্গে মাঠের বাইরে এলেন। মন্ত্রী এখান থেকে সোজা মহাকরণে যাবেন। তিনি চলে যাওয়ার পর নানু বোসও নিজের গাড়িতে গিয়ে বসলেন। কেউ একজন এসে নানু বোসকে জিজ্ঞেস করলেন, "নানুদা, কোথায় যাচ্ছেন?"

নানু বোস উত্তর দিলেন, "বাড়িতে।"

যিনি কথা বলছিলেন তিনিই আবার বললেন, "আজ লাঞ্চে কখন আসবেন? সি এম তো দুপুরে দু'দলকে লাঞ্চ দিচ্ছেন।"

গাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে-যেতে নানু বোস বললেন, "জানি। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব।"

বাইপাস দিয়ে গাড়ি করে আসতে-আসতে নানু বোসের হঠাৎ মনে হল, একবার রায় কোম্পানি ঘুরে যাওয়া যাক। হয়তো সব্যসাচীবাবু ওখানে থাকতে পারেন। না থাকলে যদি কোনও খবর মেলে!

রায় কোম্পানির ঘরে ঢুকতেই শশধর রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এটা কেমন ব্যাপার হল নানুদা?"

নানু বোস প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার?" প্রশ্নটা করেই নানু বোস ছোটাইয়ের দিকে তাকালেন। ছোটাই চোখ দিয়ে ছোট্ট একটা ইশারা করল।

শশধর রায় বললেন, "আমার সবক'টা কর্মচারীকে রায়বাবুর লোক সকাল সাতটায় বাড়ি থেকে তুলে সাড়ে ন'টায় এখানে এনেছে। কারও স্নান হয়নি, খাওয়া হয়নি, এমনকী সকালের বাথরুমও হয়নি।"

নানু বোস আরও একবার ছোটাইয়ের দিকে তাকালেন। শশধরবাবু সেটা লক্ষ করে বললেন, "নতুন লোক। আজ থেকে কাজ করছে।"

ছোটাই হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "আমার নাম বিমল বসাক।"

নানু বোস এবার ছোটাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"বিমলবাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। দয়া করে একটু বাইরে আসবেন ?"

ছোটাই বাইরের বারান্দায় এল। নানু বোস চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কাজ কিছু এগোল ?"

ছোটাই চিকলেট চিবুতে-চিবুতে উত্তর দিল, "কাজ চলছে। মনে হচ্ছে ভালই এগোচ্ছি। আমার গুরুর ওপর ভরসা রাখুন।"

নানু বোস বললেন, "আগামীকাল তিনটেতে খেলা। কাপটা তো তার আগে দরকার।"

ছোটাই বলল, "আমরা হিসেব করছি কী জানেন ?"

নানু বোস বললেন, "কী ?"

ছোটাই উত্তর দিল, "আর ক'ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে আছে। কাপটা যদি কলকাতার বাইরে পাচার হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে তো সময়মতো কাপ হাজির করা যাবে না।"

নানু বোসের শরীর কেঁপে উঠল। কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের কী মনে হচ্ছে কাপটা কলকাতার বাইরে চলে গেছে ?"

ছোটাই বলল, "যদি গিয়ে থাকে ? যেতেও তো পারে ! চোর কখনও চুরির জিনিস আমাদের নাকের ডগায় রাখবে না। আর এটা তো অন্য ধরনের চুরি।"

নানু বোস নীচে নেমে এসে গাড়িতে বসলেন। যে সমস্ত কাজ করার ছিল তা একে-একে নানু বোস করে যেতে লাগলেন। রাত্রে স্টেডিয়ামে এসে দেখলেন আলোয় ঝলমল করছে স্টেডিয়াম। কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় তোরণ তৈরি হয়ে গেছে। ফুটবল-জ্বরে আক্রান্ত কলকাতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কালকের ফাইনাল খেলার জন্য। পিল্লাই শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, "নানুদা, কোনও খবর পাওয়া গেল ?"

নানু বোস হতাশভাবে মাথা নাড়লেন। নিজের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে-উঠতে নানু বোস দেখলেন আরও একটা দিন শেষ হয়ে গেল। আজকের রাতটুকু শেষ হলেই আগামীকাল। মানে গোল্ডকাপের ফাইনালের দিন। নানু বোস নিজের ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চলবার শক্তিও ফুরিয়ে আসছে।

॥ ৭ ॥

নানু বোস ফাইনালের দিন স্টেডিয়ামে পৌঁছলেন বেলা একটা নাগাদ। কারও সঙ্গে কথা না বলে সোজা মন্ত্রীমশাইয়ের ঘরে এলেন। আগে থেকে বলা ছিল বলে মন্ত্রী তাঁর ঘরে সি পি সাহেব আর পিল্লাই ছাড়া কাউকে রাখেননি। নানু বোসকে দেখে সবাই তাকাল। সবার মুখই গম্ভীর এবং থমথমে। নানু বোস সি পি সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও খবর পেয়েছেন কি ?"

সি পি বললেন, "না। সি. এম. আজ কাপটার খোঁজ নিচ্ছিলেন। আমি তো কোনও জবাবই দিতে পারলাম না।"

মন্ত্রী বললেন, "কাপটা মাঠে হাজির করতে না পারলে ..."

তিনি কথাটা শেষ করলেন না। চুপ করে বসে রইলেন। আর খানিকক্ষণ পরেই গেট খুলে দেওয়া হবে। হাজার-হাজার দর্শক ঢুকবে স্টেডিয়ামে। যে-দু'টো হোটেলে খেলোয়াড়রা আছেন তাঁদের আনবার জন্য লাক্সারি বাস চলে গেছে। একটু পরেই দু'দলের খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা এসে পড়বেন। অঘটনটা না ঘটলে রায় কোম্পানি থেকে গোল্ডকাপটা এই সময় এখানে এসে যাওয়ার কথা।

মন্ত্রী বললেন, "আমাদের কিন্তু এবার একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে।"

নানু বোস বললেন, "কী সিদ্ধান্ত ?"

মন্ত্রী বললেন, "কাপটা আমরা আর পাচ্ছি না। অন্তত আজ পাচ্ছি না এটা ধরে নিয়েই এবার আমাদের কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে হবে।"

সি পি বললেন, "কী ঠিক করবেন ! গতকালের কাগজে বেরিয়ে গেছে আপনি নিজে কাপের পালিশ দেখে এসেছেন। প্রেস কনফারেন্সে নানুবাবু থেকে সবাই অনেক রকম কথা বলেছেন। এখন কৈফিয়ত কী বলা যেতে পারে ? কোনও কথাই তো নেই।"

মন্ত্রী বললেন, "সবদিক দিয়েই কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। আরও বড় কেলেঙ্কারিটা ঘটবে কয়েক ঘণ্টা পর। এই শহরের মাথায়, প্রশাসন ও টুর্নামেন্ট কমিটির ঘাড়ে যে কলঙ্ক চাপবে সেটা দু-দশ বছরেও মুছবে না।"

নানু বোস আর পিল্লাই কিছু বলার আগেই টেলিফোনে সি পির কাছে খবর এল, খেলোয়াড়দের বাস স্টেডিয়ামের গেটে পৌঁছে গেছে। সি পি বললেন, "ঘটনা যাই হোক, খেলোয়াড় আর কর্মকর্তাদের তো রিসিভ করতে হবে। চলুন সামনে যাই। ওঁদের গাড়ি এসে গেছে।"

ওঁরা চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। স্টেডিয়ামের প্রধান ফটক দিয়ে বাসটা মন্থর গতিতে ঢুকছে। লাল পাড় গরদের শাড়ি পরে মেয়েরা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে ফুলের মালা। বাসটা আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। যত এগিয়ে আসছে ততই হৃৎপিণ্ডের ওঠানামা দ্রুত হয়ে উঠছে চারজনের। নানু বোস গলগল করে ঘামছিলেন। বাসটা এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা খুলে এক-এক করে সবাই নামছেন। ওঁরা চারজন আরও একটু এগিয়ে গেলেন। নমস্কার বিনিময়, করমর্দন এগুলো হতে লাগল। মেয়েরা সবাইকে মালা পরিয়ে দিলেন। আরও মিনিট দশেক পর অন্য দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে দ্বিতীয় বাসটা এসে গেল। একই ভাবে তাঁদেরও মালা পরিয়ে দেওয়া হল। খেলোয়াড় আর কর্মকর্তারা তাঁদের নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেলেন।

শুকনো মুখে নানু বোস তাকালেন মন্ত্রীর দিকে। চারজনের কেউই কোনও কথা বললেন না। কথা বলার উদ্যমটাই হারিয়ে ফেলেছেন সবাই। খোকা চাটুজ্যে এসে নানু বোসকে বলল, "নানুদা, বিজয়দা'র খবর শুনেছেন ? বিজয়দার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।"

নানু বোস বললেন, "সে কী ? কালও তো আমরা একসঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলাম। কখন হল ?"

খোকা চাটুজ্যে বলল, "আজ ভোরে। মিনিট কুড়ি আগে ওঁর এক ভায়রা ফোন করে খবরটা দিলেন।"

মন্ত্রী বললেন, "আপনারা বাড়িতে ফোন করেছিলেন ?"

খোকা চাটুজ্যে উত্তর দিল, "করেছিলাম। বাড়িতে কেউ নেই। কাজের মেয়েটা বলল, সবাই হাসপাতালে গেছে।"

নানু বোস বললেন, "এখন তো আমাদের কারও পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।"

পিল্লাই বললেন, "বিজয়দা তো খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ।"

নানু বোস কিছু বলবার আগেই একটা মোটর সাইকেল স্টেডিয়ামের গেট দিয়ে ঢুকে সোজা নানু বোনের সামনে এসে দাঁড়াল। নানু বোস দেখলেন, মোটর সাইকেলের ওপর ছোটাই বসে। ছোটাইকে এ-সময় এখানে দেখে সি পি সাহেব, নানু বোস আর পিল্লাই তিনজনেই অবাক হলেন। তাঁদের মধ্যে একটা আশা জেগে উঠল। ছোটাই বাইক থেকে নামতে-নামতে বলল, "যা টাইট সিকিউরিটি, বাইক নিয়ে এখানে ঢুকতে জান কয়লা হয়ে গেল।"

সি পি জিজ্ঞেস করলেন, "সব্যসাচীবাবু কোথায় ?"

ছোটাই বলল, "ঠিক জানি না। বোধ হয় কিছু খোঁজাখুঁজি করছে।"

নানু বোস একবার মন্ত্রীমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ঘরে একটু বসতে হবে।"

মন্ত্রী বললেন, "চলুন।"

ঘরে আসার পর ছোটাই বলল, "শুনেছেন তো, আপনাদের কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বিজয় বর্মনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ?"

সি পি বললেন, "শুনেছি। কিন্তু আপনি কোত্থেকে শুনলেন ?"

ছোটাই বলল, "আমাকে মিঃ রায়, মানে আমার বস তো ফোন করে তাই বললেন।"

নানু বোস বললেন, "বিজয়দা কোন নার্সিংহোমে আছেন ?"

ছোটাই বলল, "তা তো জানি না। তবে চিন্তার কিছু নেই। ছোট্ট অ্যাটাক। সেরে যাবেন। শুধু ফাইনাল খেলাটাই দেখতে পাবেন না। এই যা।"

ছোটাইয়ের দিক থেকে সবাই চোখ সরিয়ে নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন। শুধু সি পি প্রশ্ন করলেন, "ফাইনাল খেলাটা কি বিজয়বাবু একটুও দেখতে পাবেন না ?"

ছোটাই বলল, "বোধ হয়, না। সেটা যদি রিস্ক হয়ে যায় ?"

ছোটায়ের এসব কথায় নানু বোস কোনও উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। আজকের ফাইনাল খেলাটা তাঁর জীবনে যে গভীর অভিশাপ বয়ে আনছে সেটা তিনি টের পেয়ে গেছেন। কাপ পাওয়ার আর যে কোনও চান্সই নেই সেটা বুঝতে পেরে নানু বোস বললেন, "বিভাসদা, বলুন কী করব ? কাপ তো পাওয়া গেল না !"

মন্ত্রী বললেন, "আমার মনে হয় এখন এটা বলে দেওয়া ভাল। খেলা শুরুর আগে সি এম এসে পড়বেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে না হয় ওঁকে দিয়েই বলাবার চেষ্টা করব। সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। এখন তো আর সময় নেই। বলতেই হবে। নিন্দা, গালমন্দ যা পাওয়ার সেগুলো পেতেই হবে। হয়তো এই টুর্নামেন্টের ফাইনালটা আর কখনও কলকাতায় করা যাবে না।"

নানু বোস দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। পিল্লাই নানু বোসের পিঠে হাত রেখে বললেন, "নানুদা, বি স্টেডি। আর ভেবে লাভ নেই। আমাদেরই ফেস করতে হবে।"

পকেট থেকে চিকলেট মুখে দিয়ে চিবোতে-চিবোতে ছোটাই বলল, "আপনারা ওই কাপটার জন্য ভাবছেন তো ! এখনই এত ভাববার দরকার নেই। খেলা শুরু করতে বল লাগে, কাপ নয়। খেলাটা শুরু হয়ে যাক।"

সি পি প্রশ্ন করলেন, "তারপর ?"

ছোটাই উত্তর দিল, "তার পরের কথাটা বলতে পারছি না। দেখা যাক কী হয় !"

ছোটাইয়ের কথা শুনে হাড়পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে নানু বোসের। তিনি একবার কঠোর চোখে ছোটাইয়ের দিকে তাকালেন। ছোটাইয়ের ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, কত বড় একটা দায়িত্ব ওদের দেওয়া হয়েছিল আর ওরা সেটা পালন করতে পারল না। সেজন্য কোনও অনুতাপের চিহ্ন নেই ছোটাইয়ের চোখে-মুখে। সি পি-র কাছে ঘন-ঘন নানা খবর আসছিল। সে-সবই খেলার মাঠ ও মাঠের বাইরের খবর। নর্থ চব্বিশ পরগনার এস পি এসে বলে গেলেন, স্টেডিয়াম ফুল হয়ে গেছে। দশ হাজার গ্যাস বেলুন মাঠ থেকে ছাড়া হবে, সে ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গেছে। নানু বোস জানেন, আর একটু পর সি এম এসে পড়বেন। তখনই তাঁকে মাঠে ঢুকতে হবে। তারপরই খেলা শুরু হবে। ঘড়ির কাঁটা বিকল হলে থেমে থাকতে পারে। কিন্তু সময় কখনও থেমে থাকে না। অতএব, সময় তার নিয়মমতো এগিয়ে যেতে লাগল। সি এম এলেন। মাঠ থেকে নানা রঙের বেলুন ছাড়া হল। স্টেডিয়ামের মাথার ওপরের আকাশটা বেলুনে-বেলুনে ছেয়ে গেল। বেলুনগুলো আরও ওপরে উঠে ভেসে যেতে লাগল দক্ষিণের দিকে। সি এম খেলার উদ্বোধন করলেন। দু'দলের খেলোয়াড়রা তৈরি। সেন্টারে বল বসানো। রেফারি খেলা শুরুর বাঁশি বাজানোর জন্য নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে। এই সময় খোকা চাটুজ্যে আর রাম মিত্র এসে নানু বোসকে জিজ্ঞেস করল, "কাপটা কি এসে গেছে ? কাকে আনতে পাঠিয়েছেন ?"

নানু বোস মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। মন্ত্রীমশাই বললেন, "প্রতিবার কে নিয়ে আসেন ?"

খোকা চাটুজ্যে উত্তর দিল, "প্রতিবার তো বিজয়দা নিজে নিয়ে আসেন। এবার তো বিজয়দা অসুস্থ।"

মন্ত্রী বললেন, "কেউ একজন নিশ্চয়ই গেছে।"

রেফারির বাঁশি বেজে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল খেলা। নানু বোসের দু'চোখ ছলছল করে উঠল। রুমালে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, "বিভাসদা, কাপটা যদি খেলার শেষেও হাজির হয় তাতেও মান বাঁচে ! সে-সম্ভাবনা নেই। মাত্র নব্বই মিনিট সময় হাতে। নব্বই মিনিট পর আর আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারব না। দেশের মাথায় কলঙ্ক চাপবে। দেশের লোক আমাদের ক্ষমা করবে না।"

গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে তখন চিৎকার, হাততালি আর টান-টান উত্তেজনা। নানু বোস এরই মধ্যে মাঠ ছেড়ে বাইরে এলেন। মন্ত্রীমশাইয়ের ঘরের সামনে পুলিশ। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পুলিশরা রয়েছে। কেউ-কেউ টিভিতে খেলা দেখছে। কারও হাতে বুঝি একটা ট্রানজিস্টার ছিল। ধারাভাষ্যকার বলছেন, "গোল্ডকাপটা প্রত্যেক বছরের মতো এ বছর মাঠে হাজির নেই। মনে হয় ওটা বিরতির পর মাঠে আনা হবে। খেলার ফলাফল এখনও গোলশূন্য।"

নানু বোস আবার মাঠে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। কয়েক ধাপ নামার পর তাঁর হাতের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। নানু বোস দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফোনটা কানে দিয়ে বললেন, "কে ?"

ওদিক থেকে সব্যসাচী রায় বললেন, "নানুবাবু, খেলা তো বেশ জমে উঠেছে।"

নানু বোস প্রায় ধমক দেওয়ার মতো করে বললেন, "ধ্যাত, মশাই। আপনি বুঝতে পারছেন এই খেলা শেষ হওয়ার পর আমার অবস্থা কী হবে ? আপনি এখন কোথায় ?"

সব্যসাচী রায় বললেন, "গঙ্গার ওপর বসে টিভিতে খেলা দেখছি।"

নানু বোস বললেন, "আপনি খেলা দেখছেন আর আমি মাঠ ছেড়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছি।"

সব্যসাচী রায় বললেন, "শুনেছেন তো আপনার পরম শুভার্থী বিজয় বর্মনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আমি তাকে নেচারোপ্যাথি করাচ্ছি। গঙ্গার হাওয়া গেলাচ্ছি। ঠিক আছে, পরে কথা হবে। ডোন্ট ওরি !"

সব্যসাচী রায় ফোন রেখে দিলেন। নানু বোস এসে মন্ত্রীমশাই আর সি পি সাহেবকে কথাটা বললেন। সি পি সাহেব বললেন, "স্টিল আই হোপ, কাপটা মাঠে আসবে। এখন উদ্ধার করতে যতটুকু সময়।"

নানু বোস আবেগতাড়িত গলায় বললেন, "আপনি বলছেন কাপটা আসবে ?"

মন্ত্রী বললেন, "আমারও বিশ্বাস, কাপটা আসবে।"

নানু বোস চোখ বুজে ঠাকুরকে মনে-মনে ডাকলেন। চোখ খোলার পর থেকেই শুরু হল আবার উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা। কখন আসবে ? কাপটা নিয়ে সব্যসাচী কখন মাঠে ঢুকবেন ?

প্রতীক্ষা করতে-করতে হাফটাইম হল। খোকা চাটুজ্যের সঙ্গে এবার অবনী সাহাও এসে বললেন, "এই নানু, কাপটা আনতে

কাকে পাঠিয়েছ ? ওটা আসবে কখন ?"

নানু বোস সি পি সাহেবের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, "আসছে। এসে পড়বে।"

অবনী সাহা বললেন, "আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না। প্রতিবার তো দুটোর মধ্যে কাপ মাঠে এসে যায়। অন্তত কলকাতায় যতবার ফাইনাল হয়েছে। এবার দেরি হচ্ছে কেন ?"

নানু বোসের হয়ে ছোটাই বলল, "প্রতিবার তো বিজয়বাবু কাপ নিয়ে আসেন। এবারও ওঁরই আনার কথা। কিন্তু ওঁর তো হার্ট অ্যাটাক হল। আমরা জানতে পারলাম অনেক পরে। তারপর তো লোক পাঠানো হল।"

আবার খেলা শুরু হয়ে গেল। হাতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়। খেলাটা ড্র হলে একস্ট্রা টাইম। তাতে অবশ্য কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। নানু বোস মনে-মনে তাই চাইছিলেন। কিন্তু নানু বোস চাইলেই তো হবে না ! হাফ টাইমের পর খেলা শুরু করে পনেরো মিনিটের মাথায় কোরিয়া গোল করল। চমৎকার গোল। কিন্তু নানু বোস, মন্ত্রী, পিল্লাই আর সি পি সাহেব গোলের চমৎকারিত্ব দেখলেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের ঘড়ির দিকে চোখ রেখে মনে-মনে ভাবলেন আর মাত্র তিরিশ মিনিট সময়। মাঠের মধ্যে তখন দু'দলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ সরে যাচ্ছে। আরও দশ মিনিট সময় গেল। এখন মাত্র কুড়ি মিনিট সময় বাকি। স্টেডিয়ামের মাথার ওপরে একটা হেলিকপ্টার উড়ে এল। স্টেডিয়ামের ওপরে বার দুই চক্কর দিয়ে সেটা দমদমের এয়ারপোর্টের দিকে উড়ে চলে গেল। সি পি ঘড়ি দেখলেন। সঙ্গে-সঙ্গে নানু বোসও। আর মাত্র পনেরো মিনিট সময় বাকি। কোরিয়া খেলাটাকে নিজেদের আয়ত্তে রেখেছে। গোল খাওয়ার সুযোগ কম। যদিও নানু বোস এক্সট্রা টাইমের জন্য খেলাটা ড্র হোক এটাই মনে-মনে চাইছিলেন। সি পি. সাহেবকে আস্তে করে বললেন, "আর মাত্র বারো মিনিট বাকি। এখনও ..."

খেলা শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে নানু বোসের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। নানু বোস ফোনে বললেন, "কে ?"

ওদিক থেকে সব্যসাচী বললেন, "খালি খেলা দেখলেই হবে। চলে আসুন।"

নানু বোস বললেন, "কোথায় ?"

সব্যসাচী রায় বললেন, "মন্ত্রীর ঘরের সামনে।"

নানু বোসের মধ্যে এবার অন্য ধরনের উত্তেজনা। তিনি মন্ত্রী আর সি পি কে বললেন। ওঁরা তিনজন দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওঁদের সঙ্গে পিল্লাইও এলেন। নানু বোস দেখলেন, ছোটাইয়ের চেয়ারটা খালি। ছোটাই যে কখন উঠে গেছে সেটা কেউ টের পাননি। মন্ত্রীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সব্যসাচী রায় পাইপ টানছিলেন। ওঁদের দেখে একটু হাসলেন। তারপর নানু বোসকে বললেন, "সেই কখন থেকে বিজয়দা কাপটা নিয়ে অসুস্থ শরীরে বসে আছেন।"

এবার ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, "বিজয়দা অবশ্য আসতে চাননি। আমিই বললাম, 'তাই কি কখনও হয় বিজয়বাবু ! কলকাতার ফাইনাল খেলায় আপনিই বরাবর কাপটা নিয়ে যান। এবারও আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।'"

নানু বোস বললেন, "কাপটা কোথায় ?"

সব্যসাচী রায় বিজয় বর্মনকে প্রশ্ন করলেন, "বিজয়দা, কাপটা কোথায় ? এঁদের দেখান।"

বিজয় বর্মন একটা বড় পলিথিনের ব্যাগ দেখালেন। সেটা টেবিলের পাশে রাখা। সেই ব্যাগের মধ্যে একটা বাক্স। ওই বাক্সটার মধ্যে গোল্ডকাপটা রাখা।

সি পি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর দু'মিনিট বাকি। কাপ নিয়ে মাঠে চলুন।" ওঁরা দরজা দিয়ে যাওয়ার সময় সব্যসাচী বললেন, "আমি এই ঠাণ্ডা ঘরে থাকি। অসুস্থ বিজয়দাকে একা রেখে যাওয়া উচিত নয়।"

॥ ৮ ॥

এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটলে তারপর খুব স্বাভাবিকভাবেই সবাই জানতে চাইবে কেমন করে কাপটা উদ্ধার হল এবং বিজয় বর্মন কেনই বা কাপটা নিয়েছিলেন আর কেমন করেই বা রায় কোম্পানি থেকে কাপটা সরিয়েছিলেন। এইসব কথা জানবার জন্যই নানু বোস সেই রাত্রেই তাঁদের বাড়িতে একটা পার্টি দিলেন। পার্টিতে লোক বেশি না। সব্যসাচী, ছোটাই, রামেশ্বর, মন্ত্রী, সি পি আর পিল্লাই।

সব্যসাচী পাইপটা ধরিয়ে বললেন, "বেচারা বিজয়বাবুকে বললে পারতেন।"

নানু বোস বললেন, "আমি ইচ্ছে করেই বলিনি।"

সব্যসাচী বললেন, "আমি কিন্তু মাঠ থেকে বিজয়দাকে নিয়ে গিয়ে সত্যি-সত্যি নার্সিংহোমে দিয়েছি। সেটা কোনও চিকিৎসার জন্য নয়। বাড়িতে গেলে বেচারি সুইসাইড করতে পারে ভেবে নার্সিংহোমে দিলাম। পাহারার ব্যবস্থাও করেছি।"

মন্ত্রী বললেন, "ব্যাপারটা কী হয়েছিল বলুন তো।"

সব্যসাচী রায় বললেন, "সেই পুরাতন ব্যাধি। যার নাম ঈর্ষা। খেলাধুলোর জগতে বিজয়দা অনেকদিন আছেন। নানুবাবুকে উনিই এনেছিলেন। কিন্তু সংগঠন দক্ষতায় নানুবাবু যখন অনেক ওপরে উঠে গেলেন আর এই গোল্ডকাপের ব্যাপারে যখন নানুদার নাম ভারত ছাড়িয়ে বিদেশেও চলে গেল তখন থেকেই বিজয়দা একটা ইগো, কমপ্লেক্স যাই বলুন তাতে ভুগতে লাগলেন। নিজের ছেলে বাপের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ব্যবসা শুরু করল। নানুদা সেই ছেলেকে সাহায্য করায় সে উন্নতি করতে লাগল।"

নানু বোস বললেন, "আমি সাহায্য করেছিলাম বিজয়দার ছেলে বলেই।"

সব্যসাচী বললেন, "সেটা বিজয়বাবুর পছন্দ ছিল না। বছর সাতেক আগে একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিজয়বাবু নানুদার বিরুদ্ধে মামলা করেন।"

নানু বোস বললেন, "মামলার ব্যাপারটা বিভাসদা জানেন। সরকার আমার কাছ থেকে চারটে লঞ্চ কেনে। বিজয়দা'র কাছ থেকে দুটো। বিজয়দার লঞ্চ তৈরি করার কোনও কারখানা ছিল না। ওটা আমার। সরকারকে যে দুটো লঞ্চ বেচা হয়েছিল সেটা ডিফেকটিভ। উনি আমার কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু যে দুটো আমাদের তৈরি সেই দুটো উনি অন্যদের বিক্রি করেছেন।"

সব্যসাচী রায় বললেন, "যাই হোক, এইসব ব্যাপার নিয়ে নানুদার ওপর একটা রাগ বিজয়দার ছিল। উনি গোল্ডকাপের চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু হতে পারেননি। তাই নানু বোসকে সারা ভারতের কাছে অপদস্থ করা, শুধু নানু বোস নয়, কমিটিতে নানুপন্থী সবাইকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য কাপ লোপাট করার বুদ্ধিটা উনি নিয়েছিলেন। আমার প্রথমেই ধারণা হয়েছিল, এই কাপ কমিটির কোনও লোক ছাড়া আর কেউ সরাবে না। স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে দেখতে হল রায় কোম্পানিতে কমিটির কোন্-কোন্ লোকের অবাধ যাতায়াত। সব'কজন কমিটি মেম্বারের নাম-ঠিকানা তো নানুবাবুর কাছ থেকে সেইজন্যই নিয়েছিলাম। তারপরই মনে হয়েছিল, এতে রায় কোম্পানির কোনও লোকের ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে। শশধরবাবু সব কথাই ঠিক বলেছিলেন। কিন্তু ক্রস চেক করতে গিয়ে ধরা পড়ল কাপটি যেদিন খোয়া যায় সেদিন লোডশেডিংয়ের একটু আগে শশধরবাবুর ছোট ছেলে কৌশিক

এসেছিল এবং লোডশেডিং থাকতে-থাকতেই চলে যায়। শশধরবাবু এই কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর ছেলে কৌশিককে দেখতে আমি একটা ছুতো করে শশধরবাবুর বাড়িতে যাই। রাত্রে থাকি। কৌশিকের কাছে পরিচয় দিই আমি দিল্লির স্পোর্টস জার্নালিস্ট। কৌশিকের কথায় বুঝি ওর কাছে ভি আই পি ব্লকের চারটে টিকিট আছে। আপনারা যেখানে বসে খেলা দেখেন সেখানকার দুটো টিকিটিও ও পাবে। আমার তখনই স্ট্রাইক করে। ভোরবেলা আমি মিথ্যে কথা বলে ওকে নিয়ে বাইরে আসি। ওকে আমার অফিসে এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, 'টিকিটগুলো কে দিয়েছে? কাল রাত্রে তোমার টিকিটগুলো দেখেই বুঝেছি এগুলো জাল। আমি জার্নালিস্ট নই। পুলিশের লোক। তোমাকে লক আপে যেতে হবে।' আমি জানতাম, এই কথার পর কৌশিক ভয় পাবেই। সত্যি ভয় পেল। আমাকে বলল, 'বিজয় বর্মন টিকিটগুলো বিনে পয়সায় দিয়েছে। তবে চারটে নয়, দশটা।' আমি বললাম, 'কেন দিয়েছে?' দু-চারবার ভয় দেখাতেই বলে দিল, 'আমাকে একটা কাজ করে দিতে হয়েছে।' আমি বললাম, 'কী কাজ?' কৌশিক বলল, 'শুধু আধঘণ্টার জন্য কাপটা বাইরে এনে আমাকে দেবে। লোডশেডিং ছিল বলে সবার চোখ বাঁচিয়ে ব্যাগে করে কাপটা নিয়ে নীচে আসি। আমার বাবা তখন বাথরুমে।' নীচে এসে কৌশিক দেখে একটা মারুতি গাড়িতে ওর দাদা শৌভিক বসে।"

নানু বোস আঁতকে উঠে বলেন, "শৌভিক! ও তো আমার অফিসে কাজ করে। শশধরবাবুর অনুরোধেই চাকরি দিয়েছিলাম। কাজকর্মের দিক থেকে মোটেও ভাল না।"

সব্যসাচী বললেন, "জানি। বিজয়বাবু নিজের অফিসে শৌভিককে চাকরি করে দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে। একই টোপ দিয়েছে কৌশিককেও। ওরা কিন্তু জানত কমিটির নির্দেশেই কাপটা গোপনে বাইরে আনতে হবে। কৌশিক কাপটা দেয় শৌভিককে। শৌভিক কাপটা পৌঁছে দেয় বিজয়বাবুকে। বিজয়বাবুর ইচ্ছে ছিল লঞ্চে করে কাপটা পৌঁছে দেবে হলদিয়াতে। তাই শৌভিক নানুবাবুর অফিস থেকে মেডিক্যাল লিভ নিয়ে হলদিয়া চলে যায় বাসে করে। বাড়ির লোক অবশ্য জানে অফিসের কাজেই গেছে। আমার জেরার মুখে কৌশিকের কাছ থেকে তথ্যগুলো জানার পরই আমি আপনাকে শৌভিক সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। এর কিছুটা খবর যেমন কৌশিকের মুখ থেকে বের করি তেমনই বাকি খবরটার জন্য রামেশ্বরকে হলদিয়া পাঠাই। এ-ব্যাপারে সি পি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। বিজয়বাবু চেয়েছিলেন তাঁর যে লঞ্চটা হলদিয়া যাচ্ছে তাতে করে কাপটা হলদিয়াতে পাঠাবেন। উনি তো যাবেন না। ওঁকে তো মাঠে থাকতে হবে। কাপটা কার হেফাজতে যাবে? তখনই জনার্দন চক্রবর্তীর নামটা জানতে পারি। ওদিকে শৌভিক তখন হলদিয়া পুলিশের নজরবন্দি। জনার্দনকে বাড়ি থেকে ধরে তার মুখ থেকে খবর বার করে তাকে আমার অফিসে আটকে রাখি। তবুও বিজয় বর্মন বলে কথা! আরও একটু শিওর হওয়া দরকার। কাপ খোওয়া যাওয়ার পরও মন্ত্রী কাপের পালিশ দেখেছেন বলে খবরটা আমি এইজন্যই করতে বলেছিলাম যে, যিনি কাপটা নিয়েছেন বা যার আছে কাপ আছে সে এই খবরে বিভ্রান্ত হবে। একমাত্র সেই রায় কোম্পানিতে ফোন করে কাপ সম্পর্কে জানতে চাইবে। আমি ছোটাইকে শশধরবাবুর প্যারালাল লাইনে বসালাম। আমার অনুমান মিলে গেল। সকাল পৌনে দশটায় কাপ সম্পর্কে খোঁজ নিতে প্রথম ফোন এল বিজয় বর্মনের। তিনি কাপটা দেখতে চাইলেন। ছোটাইকে আমার সব বলা ছিল। ছোটাইয়ের ইঙ্গিত পেয়ে শশধরবাবু বললেন, 'আপনিই তো কাপটা প্রতিবার নিয়ে যান। তা আসুন না। এসে দেখে যান।'

"ছোটাইয়ের টেলিফোন পেয়ে আমি নীচে অপেক্ষা করতে থাকি। বিজয়বাবু ওপরে যান। পেছন-পেছন আমিও যাই। উনি কাপটা দেখতে চান। আমি তখন ওঁর পিঠে পিস্তলটা ঠেকিয়ে বলি, 'আমার সঙ্গে আসুন। কাপটা আমি দেখাব।' আর তো উপায় নেই। স্বীকার করতে হল। আমি বললাম, 'কেউ জানবে না। আপনার কোনও বিপদ হবে না।' কাপটা রাখা ছিল লঞ্চে। ওখান থেকে ফোন করে ওঁর স্ত্রী আর মেয়েকে লঞ্চে নিয়ে আসি। হার্ট অ্যাটাকের মিথ্যে খবরটা আমিই রটাই। এবার লঞ্চ থেকে কাপ নিয়ে স্টেডিয়ামে। এতক্ষণে ওঁর বউ আর মেয়ের বাড়ি চলে যাওয়ার কথা। একবার ফোন করবেন নাকি?"

নানু বোস সব্যসাচী রায়কে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আপনার ফিসটা কত?"

সব্যসাচী রায় বললেন, "নানুবাবু, এই কাপটা উদ্ধার না হলে শুধু আপনার মাথা কাটা যেত না, আমাদেরও যেত। মাথা আর সম্মান দুটোই বেঁচেছে এর চেয়ে বড় ফিস আর কী হতে পারে! পুলিশ-গোয়েন্দারাও দেশকে ভালবাসে। ভালবাসার কোনও দাম হয় না নানুদা।"

সি পি বললেন, "আমার মুখটা রেখেছেন। এবার বিষ্ণুমূর্তি চুরির কেসটা আমরা আপনাকেই দেব।"

সব্যসাচী চামচে দিয়ে স্যুপ তুলতে-তুলতে বললেন, "পারব তো?"

সবাই সব্যসাচীর কথা শুনে হেসে উঠলেন। মন্ত্রী বললেন, "ভাল করে খেলাটাই দেখতে পারিনি। আজ সাড়ে দশটায় আবার দেখাবে। যেটা রেকর্ড করা আছে। নানুদা, টিভিটা খোলেন।"

কুইজ
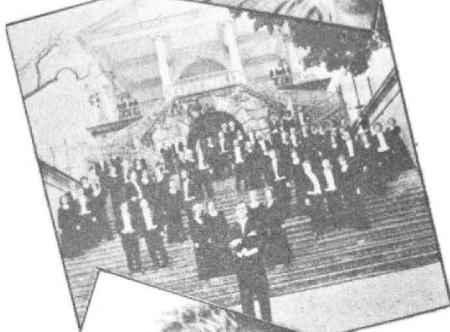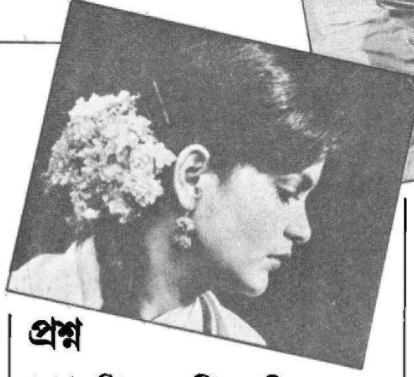
প্রশ্ন

(১) 'প্লাস্টিক সাজারি' আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক অবদানের একটি। আমাদের দেশে অবশ্য প্রাচীন যুগেও বিষয়টি অজানা ছিল না। সবচেয়ে পুরনো প্লাস্টিক সাজারির নজির কোনটি ?

(২) কম্পিউটার এখন ঢুকে পড়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। কিন্তু অনেকেই জানেন না, কবে ভারতে প্রথম এর ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কবে এবং কোথায়, বলতে পারো ?

(৩) 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' বা 'শ্বেত বামন' নক্ষত্র একটি নির্দিষ্ট ভরসীমা অতিক্রম করলে 'সুপারনোভা'-য় পরিণত হয়। এই ভরসীমার আঙ্কিক মান নির্ণয় করেছিলেন এক ভারতীয় বিজ্ঞানী। তাঁর নাম কী ?

(৪) ভারত প্রথম পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৭৪ সালের ১৮ মে। মাটির ১০৭ মিটার গভীরে ঘটানো হয়েছিল সেই বিস্ফোরণ। কোথায় ?

(৫) ভারতীয় মুদ্রার নাম রুপিয়া। শব্দটি হিন্দি হলেও আদতে এটি এসেছে সংস্কৃত থেকে। মূল শব্দটি কী ?

(৬) গরম হাওয়াভরা বেলুনে চেপে অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার প্রথম নজিরটি স্থাপিত হয় ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে। ওই বেলুনেরই আরোহী তার পরের বছর আরও একটি দুর্দান্ত রেকর্ড করেন। কে তিনি ? রেকর্ডটিই বা কী ?

(৭) আমাদের শরীরের ২০৬টি হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হল ফিমার। সবচেয়ে ছোট হাড়টি কী ?

(৮) স্মরণশক্তি, অর্থাৎ কোনও কিছু মনে রাখতে পারার ক্ষমতা অনেকটাই অভ্যাসনির্ভর, চেষ্টা করে তা বাড়ানোও যেতে পারে। এ-বিষয়ে অবশ্য চিনের গং ইয়াং লিং আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। মুখস্থ করার ব্যাপারে তিনি দুর্দান্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কী কৃতিত্ব ?

(৯) পশ্চিম আমেরিকার 'প্রেইরি' অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় কালো লেজঅলা এক ধরনের বন্য কুকুর। 'ব্ল্যাক টেল্‌ড প্রেইরি ডগ' নামে পরিচিত এই প্রজাতিটির বৈজ্ঞানিক নাম কী ?

(১০) সবচেয়ে বড় 'প্রাইমেট'-জাতীয় প্রাণী হল গোরিলা। সবচেয়ে ছোট প্রাইমেট কোনটি ?

(১১) ব্যাকটিরিয়া প্রথম আবিষ্কার করেন কোন বিজ্ঞানী ?

(১২) পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আছে জাতীয় উদ্যান বা 'ন্যাশনাল পার্ক'। সবচেয়ে বড় ন্যাশনাল পার্ক কোনটি ? এটি কোথায় অবস্থিত ?

(১৩) সবচেয়ে বড় পশু-উদ্যান (জুলজিক্যাল রিজার্ভ) আছে কোথায় ?

(১৪) 'সুনামি' (tsunami) কী ?

(১৫) 'ফেরোমোন' কী ?

(১৬) পৃথিবীকে দেখতে দু'দিক চাপা একটা বলের মতো, সকলেই জানেন। সেক্ষেত্রে ভূগোলকের বৃহত্তম পরিধি মাপা উচিত কোন অঞ্চলে। এর আঙ্কিক মান কত ?

(১৭) পৃথিবীর ভর প্রথম নির্ণয় করেন স্কটল্যান্ডের এক বিজ্ঞানী, ডঃ নেভিল মাস্কেলিন। এর আঙ্কিক মান কত ?
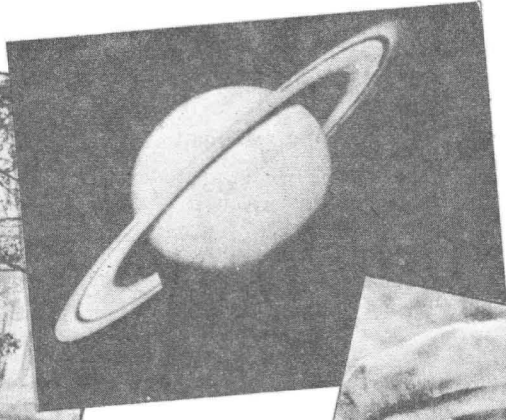
পৃথিবীর ঘনত্বই বা কত ?

(১৮) পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় খোঁজ পাওয়া গেছে পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলাস্তরের। এটির বয়স কত ?

(১৯) এভারেস্ট পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ, এরকমই জানা আছে। কিন্তু সেটা ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার নিরিখে মাপা। সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসা কোনও পর্বতশৃঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্য সমুদ্রের একেবারে তলা থেকেই মাপ নেওয়ার রীতি আছে। সেক্ষেত্রে উচ্চতম শৃঙ্গের শিরোপা মাউন্ট এভারেস্টের পাওয়ার কথা নয়। সমুদ্রের তলা থেকে নেওয়া মাপ অনুযায়ী পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ কোনটি ?

(২০) পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন। প্রতি সেকেন্ডে গড়ে কী পরিমাণ জল আমাজন থেকে অতলান্তিক মহাসাগরে মেশে ?

(২১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে অস্ট্রিয়ার এক সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ ও তাঁর পরিবারের কাহিনীকে ভিত্তি করে তৈরি হয় বিখ্যাত একটি চলচ্চিত্র। ১৯৬৫ সালে সেরা ছবি হিসেবে অস্কার পায় সেই ছবিটি। ছবিটির নাম কী ?

(২২) গ্রামীণ মহিলাদের সর্বাত্মক উন্নয়ন কর্মসূচিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৮০ সালে ভারত সরকার একটি নতুন মুদ্রা চালু করেন। মুদ্রাটি কত টাকার ?

(২৩) পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মী নিয়োজিত আছেন একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানটির নাম কী ?

(২৪) এদেশের প্রথম পাটকল তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গের রিষড়ায়। কত সালে ? কে তৈরি করেন সেই পাটকল ?

(২৫) ভারতে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে পুরনো 'হোমিনিড'-এর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৬৯ সালে, শিবালিক পর্বতে। 'হোমো স্যাপিয়েন্স'-এর আবির্ভাবেরও আগেকার এই হোমিনিড শ্রেণীগুলির নাম কী-কী ? জীবাশ্মগুলি কত বছরের পুরনো ?

(২৬) কুমিরের সবচেয়ে বিরল প্রজাতিটি পাওয়া যায় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই। প্রজাতিটির নাম কী ?

(২৭) ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে মঞ্চে মৃত্যুদৃশ্য দেখানো ছিল রীতিবিরুদ্ধ। মাত্র একটি সংস্কৃত নাটকেই এই রীতি লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। কোন নাটকে ? নাটকটির রচয়িতা কে ?

(২৮) সাম্প্রতিক অতীতে এক ভারতীয় চিত্রকরের আঁকা একটি ছবি মুম্বইয়ের একটি নিলামে ১০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এটি একটি রেকর্ড। ছবিটি কার আঁকা ?

(২৯) ভারতের কোন চলচ্চিত্র-অভিনেত্রীকে নিয়ে ফ্রান্সে প্রথম 'রেট্রোসপেক্টিভ' অনুষ্ঠিত হয় ?

(৩০) সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবির সুরসংযোজনা করেছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। একটি বিখ্যাত ইংরেজি ছবিতে সুরসংযোজনার জন্য তিনি 'অস্কার নমিনেশন'-ও পান। কোন ছবিতে ? ছবিটির পরিচালকই বা কে ?

(৩১) পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিম পাড়ে 'অস্ট্রিচ'। সবচেয়ে ছোট ডিম পাড়ে কোন পাখি ?

(৩২) সারা পৃথিবীতে সাপের কামড়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যান কোন দেশে ?

(৩৩) সবচেয়ে পুরনো সরীসৃপের ফসিল 'লিজি দ্য লিজার্ড'-এর খোঁজ মিলেছে ১৯৮৮ সালে, স্কটল্যান্ডের কাছে। ফসিলটি কত বছরের পুরনো ?

(৩৪) যে-কোনও ধরনের ঘাসই খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে দ্রুত বাড়ে কোন ঘাস ? এদের বৃদ্ধির হার কীরকম ?

(৩৫) পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা অনেক হলেও তাদের মধ্যে খুব কমই এখন সক্রিয়। সক্রিয় আগ্নেয়গিরির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু কোনটি ?

(৩৬) 'সেন্ট সুইদিন'স ডে' কী ?

(৩৭) উত্তর মেরুতে দেখতে পাওয়া যায় 'অরোরা বোরিয়ালিস'। দক্ষিণ মেরুতেও দেখা যায় তেমনই এক আলো। এর নাম কী ?

(৩৮) ১৯৮৭ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী আয়ান শেলটন খোঁজ পেয়েছেন নতুন এক সুপারনোভা-র। মহাকাশের কোন অঞ্চলে আছে এই সুপারনোভা ?

(৩৯) 'অ্যাস্ট্রোব্লেম' কাকে বলে ?

(৪০) পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৪৯,৫৯৮,০২০ কিলোমিটার। কিন্তু এটা গড়-দূরত্ব। পৃথিবীর কক্ষপথ যেহেতু উপবৃত্তাকার, অর্থাৎ পৃথিবীর অনুসুর ও অপসুর অবস্থানে সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্বের গড় এটি। অনুসুর ও অপসুর অবস্থায় পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব কত ?

(৪১) প্লুটো গ্রহটির সন্ধান মেলে ১৯৩০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। কোন জ্যোতির্বিদ প্রথম খোঁজ পান এটির ?
(৪২) সৌরপরিবারের মধ্যে আপেক্ষিক ঘনত্বের বিচারে সবচেয়ে এগিয়ে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবীর আপেক্ষিক ঘনত্ব ৫.৫১৫ (জলের তুলনায়)। সৌরপরিবারের সবচেয়ে কম ঘনত্ববিশিষ্ট গ্রহ কোনটি ? এর আপেক্ষিক ঘনত্ব কত ?
(৪৩) আকাশে তাকিয়ে আমরা প্রায় সকলেই দেখেছি কালপুরুষ। এই কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীরই একটি তারা 'বেতেলজিউ'। সূর্যের প্রায় ৫০০ গুণ বড় এই নক্ষত্রটির একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৭৮ সালে। বৈশিষ্ট্যটি কী ?
(৪৪) পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় 'ওপেন কাস্ট' খনি আছে কোন দেশে ?
(৪৫) সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র আছে কোথায় ?
(৪৬) জন রিড-এর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'দুনিয়া কাঁপানো ১০ দিন' ('টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড') নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি ফিল্ম। এই জন রিডের জীবন নিয়েই তৈরি হয় আর-একটি ছবি, পরিচালনা করেন ওয়ারেন বেটি। ছবিটির নাম কী ?
(৪৭) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর'গুলির একটি আছে লিথুয়ানিয়ায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন নিউক্লীয় শক্তি-উৎপাদনকেন্দ্রটি আছে এশিয়াতে। কোন দেশে ?
(৪৮) সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচেয়ে বড় স্মৃতিভাণ্ডারবিশিষ্ট কম্পিউটারটি আছে কোন দেশে ? এটির 'মেমরি-ক্যাপাসিটি' কত ?
(৪৯) দীর্ঘতম 'টেলিফোন কেব্‌ল লাইন' উদ্বোধন করেন রানি এলিজাবেথ-২, ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে। সমুদ্রের তলা দিয়ে ১৫,১৫১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই বিশাল কেব্‌ল লাইন সংযুক্ত করেছে কোন কোন দেশকে ?
(৫০) এখনও পর্যন্ত পৃথিবী থেকে যে ক'টি মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছেছে কোনটি ? উৎক্ষেপণের মুহূর্তে এটির গতিবেগ কত ছিল ?
(৫১) সৌরজগতের বাইরে প্রথম কোন মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে পৃথিবী থেকে ?
(৫২) পুরনো প্রাসাদ, কেল্লা ও দুর্গ দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই। পুরনো আমলের সেইসব কেল্লা ও দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি হল 'হ্রাদকানি কাস্‌ল'। এটি আছে কোন দেশে ?
(৫৩) সবচেয়ে বড় হোটেল আছে রাশিয়ার মস্কোয়। ৩২০০ ঘরের এই হোটেলটি চালু হয়েছে ১৯৬৭ সালে। এটির নাম কী ?
(৫৪) হলিউডের এক বিখ্যাত চিত্রতারকার আত্মজীবনীর নাম 'লয়টারিং উইথ ইনটেন্ট' ? কার আত্মজীবনী এটি ?
(৫৫) 'সিনেমা-ভেরিতে' কথাটি আধুনিক চলচ্চিত্রের একটি অত্যন্ত পরিচিত বিষয়। এই তত্ত্বটির প্রচলন করেন কে ?
(৫৬) এই শতকের দুইয়ের দশকে একটি মার্কিন সিনেমা-পত্রিকা চলচ্চিত্রের প্রসারের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। পত্রিকাটির নাম কী ?
(৫৭) সবচেয়ে বড় যাত্রিবাহী জাহাজের নাম হল 'সভারেন অব দ্য সিজ'। এটি কোন দেশের ?
(৫৮) আয়তন ও ব্যস্ততার দিক থেকে দেখতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই আছে পৃথিবীর প্রধানতম দুটি বন্দর। কী-কী ?
(৫৯) এযাবৎ যত মোটরগাড়ি তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল 'বুয়াতি রয়্যাল'। এটির আছে এক মজার রেকর্ড। কী সেটি ?
(৬০) সবচেয়ে বড় পেট্রোল-পাম্প স্টেশন আছে সৌদি আরবে। ক'টি পাম্প-ইউনিট আছে ওই স্টেশনে ?
(৬১) কলকাতার মতোই পৃথিবীর আরও বেশ কিছু শহরে এখনও চলে ট্রাম। কোন শহরে ট্রামের প্রচলন সবচেয়ে বেশি ?
(৬২) সাইকেলে 'নিউম্যাটিক টায়ার'-এর প্রচলন করেন কে ?
(৬৩) ব্যস্ততম পাতালরেল বলতে মস্কোর মেট্রোকেই ধরা হয়। প্রতিদিন গড়ে কত যাত্রী আসাযাওয়া করেন এই মেট্রোয় ?
(৬৪) পথে একবারও না থেমে বিমানে অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার প্রথম নজিরটি স্থাপিত হয় ১৯১৯ সালে। কারা গড়েছিলেন সেই নজির ?
(৬৫) সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন যাত্রিবাহী বিমান হল 'এরোস্পাশিয়েল কনকর্ড'। এর গতিবেগ ঘণ্টায় কত কিলোমিটার ?
(৬৬) 'ট্রাফিক জ্যাম' বা 'যানজট' কলকাতার মানুষের অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু যানজটের রেকর্ডের তালিকায় কলকাতার অনেক ওপরে আছে ফ্রান্স। ফ্রান্সেই হয়েছিল যানজটের সর্বকালীন রেকর্ড। কবে ? কোথায় ?
(৬৭) ১৯৬৮ সালে 'মিস এশিয়া' হয়েছিলেন মুম্বইয়ের এক নামকরা অভিনেত্রী। তাঁর নাম কী ?
(৬৮) কোনও ছবি, ভাস্কর্য বা কোনও শিল্পসামগ্রী প্রায়ই খুব চড়া দামে বিক্রি হতে শোনা যায়। কিন্তু কখনও-কখনও পোস্টারও হয়ে ওঠে দামি। সবচেয়ে

বেশি দামে বিক্রি হওয়া পোস্টার কোনটি ?

(৬৯) প্রাচীনতম লিপি কী ?

(৭০) সাধারণত ব্যঞ্জনবর্ণ আর স্বরবর্ণ মিলিয়েই তৈরি হয় উচ্চারণযোগ্য ধ্বনি। কিন্তু ইংরেজিতে একটি শব্দে পরপর ছ'টি ব্যঞ্জনবর্ণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। শব্দটি কী ?

(৭১) ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে বড় শব্দ হল 'floccinaucinihilipilification'। এতে ২৯টি অক্ষর আছে। কিন্তু ডাক্তারি পরিভাষায় এর চেয়েও ঢের বড় শব্দ আছে। ডাক্তারি পরিভাষায় সবচেয়ে বড় লাতিন শব্দটি কী ? এতে ক'টি অক্ষর আছে। ?

(৭২) সবচেয়ে বড় 'অপেরা হাউস' আছে কোথায় ? এর আসন-সংখ্যা কত ?

(৭৩) ১৯৭৩ সালে কোন ছবিতে অভিনয়ের জন্য 'ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড' পান ডিম্পল কাপাডিয়া ?

(৭৪) বিখ্যাত ফিল্ম 'ইউ'ল নেভার গেট রিচ' ছবিতে ফ্রেড অ্যাস্টেয়ার-এর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন অতীতের এক জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তাঁর নাম কী ?

(৭৫) 'দ্য রেনট্রি কান্ট্রি' ছবিতে অভিনয় করেছেন কোন জনপ্রিয় জুটি ?

উত্তর

(১) চিকিৎসাশাস্ত্রের পণ্ডিত সুশ্রুত একটি কৃত্রিম নাক তৈরি করেছিলেন খ্রিস্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে।

(২) 'এইচ. ই. সি— টু এম' এদেশের প্রথম কম্পিউটার। ১৯৫৫ সালে কলকাতায় এর ব্যবহার শুরু হয়।

(৩) সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। এই ভরসীমাকে বলা হয় 'চন্দ্রশেখর'স লিমিট'।

(৪) রাজস্থানের পোখরানে।

(৫) রৌপ্য। একসময় রুপোর মুদ্রাই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম।

(৬) পার লিন্ডস্ট্যান্ড। দ্বিতীয় নজিরটি হল বেলুন নিয়ে সবচেয়ে বেশি উঁচুতে ওঠা— ১৯,৮১১ মিটার (৬৪,৯৯৬ ফুট)।

(৭) কানের ভেতরের 'স্টেপিস' বা 'স্টিরাপ'। লম্বায় মাত্র ২.৬ মিলিমিটার।

(৮) ১৫,০০০ টেলিফোন নম্বর তাঁর মুখস্থ।
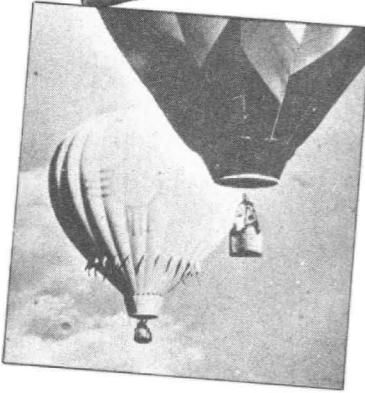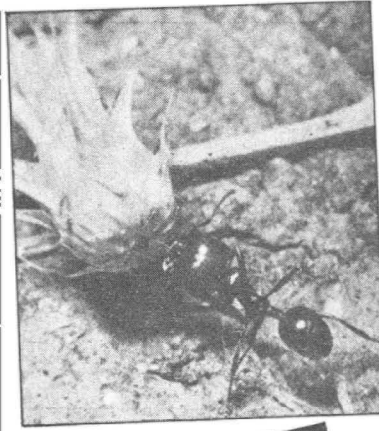
(৯) 'সিনোমিস লুডোভিশিয়ানাস'।

(১০) মাদাগাস্কারের লেসার মাউস লেমুর। আয়তনে একটি ইঁদুরের চেয়েও সামান্য ছোট এই বানরগোত্রীয় প্রাণী।

(১১) অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহোক।

(১২) কানাডা-র অ্যালবার্টা-য় আছে 'উড বাফেলো ন্যাশনাল পার্ক'।

(১৩) 'এতোশা ন্যাশনাল পার্ক', নামিবিয়া।

(১৪) এক ধরনের প্রকাণ্ড ঢেউ। উচ্চতায় এগুলি ৮০ মিটারেরও বেশি হতে দেখা গেছে। বেশি দেখা যায় জাপান সাগরে।

(১৫) পিঁপড়ের শরীর থেকে নিসৃত একধরনের হরমোন। এরই প্রভাবে পিঁপড়েরা দূর থেকেও পরস্পরের উপস্থিতি টের পায়।

(১৬) নিরক্ষীয় অঞ্চলে। ৪০,০৭৫.০২ কিলোমিটার।

(১৭) ৫.৯৭৪×১০^{২১} টন। ঘনত্ব জলের তুলনায় ৫.৫১৫ গুণ।

(১৮) ৭০০ কিলোমিটার বিস্তৃত এই জিরকন স্ফটিক শিলার বয়স আনুমানিক ৪৩০ কোটি বছর।

(১৯) মাউনা কিয়া। সমুদ্রের তলা থেকে এর উচ্চতা ৩৩,৪৭৬ ফুট। (এভারেস্টের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট।) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অবশ্য মাউনা কিয়ার উচ্চতা মাত্র ১৩,৭৯৬ ফুট।

(২০) ৪,২০০,০০০ কিউসেক।

(২১) 'দ্য সাউন্ড অব মিউজিক।'

(২২) ১০০ টাকার। এটির ওজন ৩৫ গ্রাম।

(২৩) ভারতীয় রেল। ১৯৮৯ সালের হিসেব অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীসংখ্যা ১,৬০,০০০ জন।

(২৪) ওয়েলিংটন জুট মিল। ১৮৫৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন জর্জ অকল্যান্ড।

(২৫) 'রামাপিথেকাস', 'সুগ্রীবাপিথেকাস' ও 'শিভাপিথেকাস'। ফসিলগুলি ১৪,০০০,০০০ বছরের পুরনো।

(২৬) ঘড়িয়াল।

(২৭) 'উরুভঙ্গ'। ভাস।

(২৮) মকবুল ফিদা হুসেন।

(২৯) স্মিতা পাতিল।

(৩০) 'গান্ধী'। রিচার্ড অ্যাটেনবরো।

(৩১) ভার্ভেন হামিংবার্ড।

(৩২) শ্রীলঙ্কায়। গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৮০০ মানুষ সেখানে মারা যান করেট, রাসেল্‌স ভাইপার ও গোখরো সাপের কামড়ে।

(৩৩) ৩৪ কোটি বছর।
(৩৪) বাঁশ। কোনও-কোনও প্রজাতির বাঁশ দিনে এমনকী তিন ফুট পর্যন্তও বাড়ে।
(৩৫) ওজোস দেল সালাদো। আন্দিজ পর্বতমালায়, চিলি এবং আর্জেন্টিনার মাঝামাঝি এটি অবস্থিত।
(৩৬) ইংল্যান্ডের মানুষরা বিশ্বাস করেন, প্রতি বছরের ১৫ জুলাই তারিখের আবহাওয়া দেখেই বোঝা যায় সে-বছর কেমন বৃষ্টি হবে। এটা অবশ্য নিছকই প্রচলিত বিশ্বাস।
(৩৭) 'অরোরা অস্ট্রালিস'।
(৩৮) 'বৃহৎ ম্যাগেলানিক মেঘ' নক্ষত্রপুঞ্জে, পৃথিবী থেকে ১৭ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে।
(৩৯) মহাকাশ থেকে আসা উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার সময় ভূপৃষ্ঠে ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়। তৈরি হয় ছোট-বড় নানা গহ্বর। এগুলিকেই বলে 'অ্যাসট্রোব্লেম'।
(৪০) যথাক্রমে ১৪৭,০৯৭,৮০০ কিলোমিটার ও ১৫২,০৯৮,২০০ কিলোমিটার।
(৪১) ক্লাইড উইলিয়ম টমবাও।
(৪২) শনি। এর আপেক্ষিক ঘনত্ব জলের তুলনায় মাত্র ০.৬৪৫ গুণ।
(৪৩) নক্ষত্রটির চারপাশে আছে ধুলো আর গ্যাসের এক উজ্জ্বল বলয়। বলয়টির আয়তন নক্ষত্রটির ব্যাসের প্রায় ১,১০০ গুণ।
(৪৪) জার্মানির বার্গহাইম-এর কাছে ফরচুনা-গারসড্রর্ফ খনি।
(৪৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যান্ড কুলি বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র। এর উৎপাদন-ক্ষমতা ১০,৮৩০ মেগাওয়াট।
(৪৬) 'রেড্স'। ছবিটির জন্য সেরা পরিচালক হিসেবে অস্কার পান ওয়ারেন বেটি।
(৪৭) জাপানের ফুকুশিমা-য়।
(৪৮) ক্রে-২ কম্পিউটার। আমেরিকায়। এটির মেমরি ক্যাপাসিটি ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ ৬৪ বিট ওয়ার্ড্স, ৩ কোটি ২০ লক্ষ বাইট 'মেন মেমরি'।
(৪৯) কানাডার পোর্ট আলবার্নি, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সিডনি-র মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে এটি।
(৫০) হেলিওস-বি। সূর্যের ৪৩ কোটি

৪০ লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছেছে এটি। রওনা হওয়ার মুহূর্তে এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৪ লক্ষ কিলোমিটার।
(৫১) পাইওনিয়ার-১০।
(৫২) চেক প্রজাতন্ত্রে।
(৫৩) হোটেল রোশিয়া।
(৫৪) পিটার ও'টুল।
(৫৫) জিগা ভের্তভ।
(৫৬) 'ফোটোপ্লে'।
(৫৭) ফ্রান্স।
(৫৮) নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সি।
(৫৯) মাত্র ছ'টি গাড়ি তৈরি হয়েছে। কোনও মডেলের এত কম গাড়ি তৈরি হওয়ার এই নজির আর কোথাও নেই।
(৬০) ২০৪টি।
(৬১) রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ (বর্তমান নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ)। ৫৩টি ট্রাম-রুট আছে এই শহরে।
(৬২) জন বয়েড ডানলপ।
(৬৩) সব ক'টি স্টেশনের হিসেব মিলিয়ে ধরলে সংখ্যাটা অকল্পনীয়, প্রায় ৬৫ লক্ষ।
(৬৪) ক্যাপ্টেন জন উইলিয়ম অ্যালকক ও লেফটেন্যান্ট আর্থার হুইটেন ব্রাউন।
(৬৫) ২,৩৩৩ কিলোমিটার।
(৬৬) ১৯৮০ সালে, পারি থেকে লিয়ঁ শহরের মধ্যে ১৭৬ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে হয়েছিল যানজট।
(৬৭) জিনাত আমন।
(৬৮) ভিয়েনার একটি এগজিবিশনের জন্য কলম্যান মোসার-এর তৈরি একটি পোস্টার বিক্রি হয়েছিল ৬২,০০০ ডলারে।
(৬৯) কিউনিফর্ম লিপি।
(৭০) ল্যাচস্ট্রিং (latchstring)।
(৭১) 'Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconissises'. এতে আছে ৪৫টি অক্ষর। এটি একটি রোগের নাম। এর অর্থ হল, খুব সূক্ষ্ম সিলিকনের গুঁড়ো প্রশ্বাসের সঙ্গে নাকে ঢুকে ফুসফুসে যে সংক্রমণ ঘটায়, সে সংক্রান্ত শ্বাসকষ্ট।
(৭২) মেট্রোপলিটান অপেরা হাউস, লিঙ্কন সেন্টার, নিউ ইয়র্ক। এর আসনসংখ্যা ৩৮০০।
(৭৩) ববি।
(৭৪) রিটা হেওয়ার্থ।
(৭৫) মন্টগোমারি ক্লিফ্ট ও এলিজাবেথ টেলর।

পদ্মরাগমণির খোঁজে ফ্রান্সিস

অনিল ভৌমিক

সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে ছুটে চলেছে ফ্রান্সিসদের জাহাজ। দেশে ফেরার তাড়া। তাই পালগুলো জোর হাওয়ায় ফুলে উঠছে। জাহাজের গতি দ্রুত হলেও ভাইকিংরা দাঁড় ধরে টানছে। ছপ-ছপ শব্দ তুলে দাঁড় উঠছে, পড়ছে।

তখন বিকেল। পশ্চিম আকাশে গভীর কমলা রং ছড়ানো।

হঠাৎ মাস্তুলের মাথায় বসে-থাকা নজরদার পেড্রোর চিৎকার শোনা গেল, ডাঙামতো দেখা যাচ্ছে। ডেক-এ মারিয়া দাঁড়িয়ে ছিল রেলিং ধরে। এ-সময়টায় মারিয়া সূর্যাস্ত দেখে। ডেকে বিশ্রাম নিচ্ছিল কয়েকজন ভাইকিং। তাদের মধ্যে একজন ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। রেলিং ধরে তাকাল পশ্চিম দিকে। দেখল, কমলা রঙের দিগন্তে, উঁচু টিলামতো, এখন কালো দেখাচ্ছে। হ্যারি আর মারিয়া দু'জনেই ফ্রান্সিসের কাছে এল।

মারিয়া বলল, "কী করবে এখন?"

ফ্রান্সিস বলল, "জায়গাটা কোনও দ্বীপ না দেশ, সেটা এখান থেকে বোঝার উপায় নেই।"

"রাতে ওই বড় টিলামতো জায়গাটায় চলো। হয়তো জনবসতি আছে। কথা বলে জানতে হবে এটা কি একটা দ্বীপ না দেশের অংশ। সেটা জানলেই বুঝতে পারব আমাদের দেশ আর কতদূর।" হ্যারি বলল।

"ঠিক আছে," ফ্রান্সিস বলল, "চলো, রাতে খোঁজ নিতে যাব।"

"আমিও যাব," মারিয়া বলল।

"না, না," ফ্রান্সিস বলল, "জায়গাটা কেমন, কারা থাকে, কিছুই জানি না আমরা। এ-অবস্থায় তোমাকে নিয়ে গেলে বিপদ বাড়বে।"

মারিয়া আর কোনও কথা বলল না।

ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে নিল। বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফ্রান্সিস রাত গভীর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত গভীর হল। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে জাহাজের হালের কাছে এল। দড়ির মই দিয়ে তিনজনে জাহাজের সঙ্গে বাঁধা নৌকোটায় নেমে এল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি তরোয়াল নিয়েছে। শাঙ্কো নিয়েছে তীর-ধনুক।

ওরা নৌকো ছেড়ে দিল। সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলতে-দুলতে নৌকো চলল সেই বড় টিলাটার দিকে। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল নয়। বেশ অন্ধকারের মধ্যেই ওদের নৌকো চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেখল বড় টিলাটা খাড়া উঠে গেছে। এখানে জনবসতি থাকার কথা নয়। ফ্রান্সিস নৌকো চালাল টিলামতো জায়গাটা ছাড়িয়ে তীরের দিকে। টিলামতো জায়গাটা ছাড়িয়ে নৌকো এল কিছুটা সমতল এলাকায়। এখানে নৌকো বাঁধল ফ্রান্সিস।

তিনজনে নৌকো থেকে নেমে এল। হেঁটে চলল প্রায়-সমতলভূমি দিয়ে। বেশ কিছুটা যেতেই দূর থেকে দেখল কাঠ আর পাথরের কিছু বাড়িঘর।

প্রথম যে-বাড়িটা পড়ল ওরা সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজাটা আঙুল দিয়ে ঠকঠক শব্দ করল। ঘরের মধ্যে থেকে একজন স্পেনীয় ভাষায় বলল, "কে?"

শাঙ্কো স্পেনীয় ভাষাতেই বলল, "আমরা ভিনদেশি। কোথায় এলাম সেটা জানতে এসেছি। আমরা বন্ধু।"

দরজাটা খুলে গেল। একটি লোক এসে দাঁড়াল। গায়ে এখানকার ধীবরদের মতো ঢোলাহাতা জোব্বা। বলল, "কী ব্যাপার?"

হ্যারি জিজ্ঞেস করল, "এ-জায়গাটার নাম কী?"

"আসার সময় ওই বড় টিলাটা তো দেখেছেন?" লোকটি বলল।

"হ্যাঁ।" হ্যারি বলল।

"ওই টিলাটার নাম দেওয়া হয়েছিল, 'তারিকের টিলা', এখন নাম হয়েছে জিব্রাল্টার।" লোকটি বলল।

হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, জিব্রাল্টার নামটা শুনেছি। ভূমধ্যসাগরে এই জায়গাটা। তার মানে আমরা এখনও ভূমধ্যসাগর থেকে বেরোতে পারিনি।"

"ঠিকই বলেছেন," লোকটি বলল, "এই জিব্রাল্টার পার হলেই অতলান্তিক মহাসাগর।"

"তা হলে তো দেশ থেকে আমরা এখনও বেশ দূরে।" শাঙ্কো বলল।

লোকটি বলল, "কিন্তু আমি ভাবছি আপনারা পাহারাদার সৈন্যদের নজর এড়িয়ে এলেন কী করে?"

ঠিক তখনই যেন অন্ধকার ফুঁড়ে চারজন সৈন্য ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। সৈন্যদের একজন বলল, "আমাদের নজর এড়িয়ে একটা মাছিও আসতে পারবে না।"

ফ্রান্সিসরা দেখল সৈন্যদের গায়ে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলে পাথুরে মাটিতে ফেলে দিল। হ্যারিও তরোয়াল ফেলে দিল। শাঙ্কোও তীর-ধনুক রেখে দিল। ফ্রান্সিস গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল, "আমরা লড়াই চাই না, বন্ধুত্ব চাই।"

একজন সৈন্য বলল, "তোমরা কারা?"

"আমরা ভাইকিং। আমরা জাহাজে চড়ে এখানে এসেছি। সমুদ্রতীরে এসেছি এটা কোন জায়গা সেটা জানতে।" হ্যারি বলল।

"এটা জিব্রাল্টারের দক্ষিণ ভাগ। উত্তর আফ্রিকার মরক্কো এখান থেকে খুবই কাছে। রাজা ফার্দিনান্দ এখানে বহু লোকের বসতি গড়তে সাহায্য করেছেন। যাতে উত্তর আফ্রিকা থেকে কেউ এখানে আক্রমণ চালাতে না পারে সেজন্য আমরা এখানে দিনরাত পাহারা দিই।" সৈন্যটি বলল।

হ্যারি বলল, "এটা কোন জায়গা সেটা তো জানা হল। এবার আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাব।"

"না," সৈন্যটি মাথা নেড়ে বলে উঠল, "তোমাদের বন্দি করা হল। কাল রাজদরবারে তোমাদের হাজির করব। রাজা ফার্দিনান্দ তোমাদের বিচার করবেন। তিনি যা হুকুম করবেন তাই পালিত হবে। চলো আমাদের সঙ্গে।"

হ্যারি ওদের দেশীয় ভাষায় বলল, "ফ্রান্সিস এখন কী করবে?"

ফ্রান্সিস বলল, "এখন লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। এখানে পাহারাদারদের আরও দল আছে। একটা দলকে হারালেও অন্য দলের হাতে ধরা পড়ব। তাই ওরা যেখানে নিয়ে যেতে চায় চলো। রাজা ফার্দিনান্দ কী হুকুম দেন দেখি। ততক্ষণ আমাদের চুপ করে শান্ত হয়ে থাকতে হবে।"

সৈন্যদের মধ্যে একজন ফ্রান্সিসদের হেঁটে চলার ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসদের নিয়ে পাহারাদার-সৈন্যরা চলল। যেতে যেতে ওরা দূর থেকেই দেখল একটা ছোট দুর্গ। পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। বড় কাঠের দরজার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। দ্বাররক্ষী সৈন্যরা দুর্গের দরজার একটা পাল্লা ঘরঘর শব্দে খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা সৈন্যদের পেছনে-পেছনে দুর্গে ঢুকল।

দুর্গটা বড় কিছু নয়। পাথুরে চত্বর পেরিয়ে সৈন্যরা একটা পাথরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

তখন ভোর হয়েছে। দুর্গের পেছন দিককার জঙ্গল থেকে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। স্নিগ্ধ রোদ পড়েছে দুর্গের মাথায়, দেওয়ালে আর চত্বরে। সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের সেই ঘরে ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। দেখল, মেঝেয় শুকনো ঘাসপাতার বিছানামতো। দেখা গেল কিছু সৈন্য শুয়ে-বসে আছে। বোঝা গেল এটা কয়েদ ঘর নয়। সৈন্যদের মধ্যে একজন বলল, "তোমরা এই ঘরে থাকবে। একটু বেলায় রাজ দরবার বসবে। তোমাদের রাজা ফার্দিনান্দের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কেউ পালাবার চেষ্টা করলে মরবে।" সৈন্যরা চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ঘাসপাতার বিছানায় বসল। তারপর আস্তে-আস্তে শুয়ে পড়ল ফ্রান্সিস। মাথার পেছনে দু' হাত রেখে শুয়ে রইল। ফ্রান্সিস লক্ষ করল দু'-তিনটি নিরস্ত্র সৈন্য মাঝে-মাঝেই দরজা দিয়ে ওদের দেখে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল ওদের নজরে রাখা হয়েছে। হ্যারি ওর কাছে সরে এল। বলল, "ফ্রান্সিস, আমাদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে রাজা ফার্দিনান্দের মর্জির ওপর। যদি ফার্দিনান্দ আমাদের ফাঁসির আদেশ দেন?"

ফ্রান্সিস বলল, "তেমন কোনও অপরাধ তো আমরা করিনি। আমরা তখন সে-কথাই বলব।"

"ধরো, রাজা ফার্দিনান্দ সেসব শুনলেন না, ফাঁসির আদেশই বহাল রাখলেন। তখন?" হ্যারি বলল।

"তখন প্রাণটাকে বাজি রেখে সুযোগ বুঝে পালাতে হবে।" ফ্রান্সিস বলল।

কিছু পরে সেই সৈন্যদের একজন ঘরে

ঢুকল। পেছনে তিন-চারজন সৈন্য। গোল পাতায় সকালের খাবার এনেছে ওরা। ফ্রান্সিস উঠে বসল। দেখল পাতায় দুটো করে মোটা রুটি আর একটু তরকারি। খেতে-খেতে ফ্রান্সিস ওই সৈন্যটিকে জিজ্ঞেস করল, "রাজদরবারে আমাদের কখন নিয়ে যাবে?"

"একটু বেলা হলে আমি রাজদরবারে নিয়ে যাব।" সৈন্যটি বলল।

বেলা বাড়ল। সৈন্যটি এল। ফ্রান্সিসদের বলল, "রাজদরবারে চলো।"

সৈন্যটি ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। দুর্গের দক্ষিণ কোনায় পাথর আর কাঠে তৈরি একটা ঘর। ঘরের সামনে লোকজনের ভিড়। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। একটু অন্ধকারমতো ঘরটার দেওয়ালে মশাল জ্বলছে। দেখা গেল পাথরের সিংহাসনে নীল গদি পাতা আসনে রাজা ফার্দিনান্দ বসে আছেন। মাথায় তিনকোনা মুকুট। মুখে অল্প দাড়ি গোঁফ। রং টুকটুকে ফরসা, গায়ে সোনালি, রুপোলি কাজ-করা রেশমের ঢোলাহাতা পোশাক।

ফ্রান্সিসরা একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রাজা ফার্দিনান্দ দুটো বিচার শেষ করলেন। এবার সেই সৈন্যটি রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলতে লাগল ফ্রান্সিসদের কথা। তার কথা শেষ হতে রাজা ফার্দিনান্দ ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনলাম তোমরা ভাইকিং। তা এখানে কেন এসেছ?"

ফ্রান্সিস বলল, "আমরা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। কতরকম বিদেশি মানুষদের সংস্পর্শে আসি। কত দেশে প্রকৃতিও কত বিচিত্র। এসব আমাদের ভাল লাগে।"

এবার হ্যারি একটু এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল, "এর নাম ফ্রান্সিস। কত দ্বীপের, দেশের গুপ্তধন, অত্যন্ত দরকারি গোপনে রাখা কাগজপত্র ফ্রান্সিস নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছে।"

"এ তো ভাল কথা।" রাজা বললেন ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে, "তুমি পারবে রাজা রোডারিকের পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে?" রাজা বললেন।

"আপনি যদি দয়া করে সমস্ত ঘটনাটা বলেন তা হলে বুঝতে পারব রাজা রোডারিকের পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে পারব কি না।" ফ্রান্সিস বলল।

"বেশ। তোমাকে সব বলছি।" একটু থেমে বলতে লাগলেন, "প্রায় দুশো আড়াইশো বছর আগের কথা। মুর দলপতি তারিক ইবন জিয়াদ জিব্রাল্টার, মানে এই দেশ আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। তখনকার রাজা রোডারিকের অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা ছিল তারিকের চেয়ে বেশি। তবু তিনি তারিক ইবন জিয়াদের কাছে হেরে গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করলেন। তখন থেকে এখানকার বেশ উঁচু বড় টিলাটার নাম হয় তারিকের টিলা। পরে নাম হয় জিব্রাল্টার।"

"রাজা রোডারিকের পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার সম্বন্ধে বলুন।" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ, এবার সে-কথায় আসছি। রাজা রোডারিকের কাছে ছিল বেশ কিছু বড় আকারের অত্যন্ত মূল্যবান পদ্মরাগমণি। যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগে একটা ঘাসে তৈরি কাগজে তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন কোথায় তিনি পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার রেখে গেলেন। কাগজটা তিনি তাঁর একমাত্র ছেলেকে দিয়ে গিয়েছিলেন। রাজা রোডারিক যুদ্ধে মারা গেলেন। তাঁর ছেলে কাগজটা নিয়ে লুকিয়ে স্পেনে পালাতে গিয়ে তারিকের সৈন্যদলের হাতে বন্দি হল। তারিক সেই কাগজটা পেয়েছিলেন কিন্তু সেই লেখার পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। কারণ লেখাটা ছিল প্রাচীন লাতিন ভাষায়।" একটু থেমে রাজা ফার্দিনান্দ বলতে লাগলেন, "তারপর থেকে জিব্রাল্টারে চলল মুর রাজাদের রাজত্ব। কোনও মুর রাজাই সেই প্রাচীন লাতিন ভাষায় লেখাটার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেননি। সবশেষে আমার সেনাপতি সেই কাগজটা পেয়েছে রাজ কোষাগারে।"

"আপনারা কি লেখাটার পাঠোদ্ধার করেননি?" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ, পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। রাজা বললেন।

পাশের পাথরের আসনে বসা একজন বৃদ্ধ অমাত্যকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি সাবের। প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনিই ওটার পাঠোদ্ধার করেছেন।"

"তা হলে তো পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার আপনারা উদ্ধার করেছেন।" হ্যারি বলল।

রাজা বললেন, "না, উদ্ধার করতে পারিনি। কেন পারিনি সেটা পণ্ডিত সাবের বলবেন।"

এবার সাবের বললেন, "কাগজটা ঘাস থেকে তৈরি কাগজ। চামড়ার মিশেল দেওয়া পার্চমেন্ট কাগজ নয়। কতদিন আগেকার কাগজ। তাই পোকায় কেটেছে, জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়েও গেছে। কোথাও-কোথাও লেখা মুছে গেছে। কোথাও অস্পষ্ট।"

হ্যারি বলল, "মাননীয় রাজা, আমরা একবার ওই কাগজটা দেখতে পারি?"

"বেশ তো।" রাজা বললেন। তারপর সাবেরকে বললেন, "আপনিই

ওদের কাগজটা দেখিয়ে দিন।"

বৃদ্ধ সাবের আসন থেকে উঠলেন। ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিতে সঙ্গে যেতে বললেন।

রাজপ্রাসাদের শেষের দিকে রাজ কোষাগার। পাথরের ঘরের দরজায় তালা দেওয়া। চারজন সৈন্য পেতলের বর্শা হাতে ঘরটা পাহারা দিচ্ছে। বৃদ্ধ সাবের তাদের বললেন, "দরজা খোলো।"

সৈন্যরা সাবেরকে মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানাল। একজন গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ভেতরে ঢুকল সকলে। ঘরটায় মশাল জ্বলছে। দেখা গেল পরপর কয়েকটা লোহার সিন্দুক। একটা সিন্দুকের পেছন থেকে বৃদ্ধ সাবের একটা চামড়ার থলিমতো ওঠালেন। হাতে নিয়ে থলিটার মুখ খুললেন। ভেতর থেকে পাকানো একটা চৌকোনা কাগজ বের করলেন। কাগজটা মেলে ধরতে ধরতে বললেন, "কত মুর রাজা এখানে রাজত্ব করে গেল। তারা কেউই এটার তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এই রাজ কোষাগারের এক কোনায় পড়ে ছিল এটা। অব্যবহারে, অযত্নে আজকে লেখাটার এই অবস্থা। এতদিনে আমি এই কাগজটা চামড়ার থলিতে ভরে রেখেছি।" পাকানো কাগজটা তিনি ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে ধরলেন। হ্যারি কাগজটা হাতে নিল। বৃদ্ধ সাবের বললেন, "যেটুকু পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি, সেটা মূল লেখার নীচে-নীচে অনুবাদ করে স্পেনীয় ভাষায় লিখে রেখেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে পারিনি।"

হ্যারি কাগজটা হাতে নিল। পাকানো কাগজটা টেনে সোজা করল। দেখা গেল কাগজটার এখানে-ওখানে ছেঁড়া। মূল প্রাচীন লাতিন ভাষায় লেখাটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কয়েকটা জায়গায় মুছেও গেছে। বেশ কয়েকটা শব্দ পড়াই যাচ্ছে না। সাবের মূল লেখার নীচে-নীচে স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করে লিখে রেখেছেন। হ্যারি ছাড়া-ছাড়া অনুবাদটা পড়ল :

রয়েনো ভিস্তা— । —পাথরের— ।—
নীচে থেকে ওপরে— ।
—পদ্মরাগমণির— রেখেছি ।
কাগজটা— হাতে— পড়ে । রাজা
রোডারিক ।

হ্যারি বারকয়েক স্পেনীয় অনুবাদটা পড়ল। কিন্তু ঠিক অর্থ বের করতে পারল না। বুঝল কাগজের লেখাটা নিয়ে ভাবতে হবে। তারপরে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হবে। হ্যারি বলল সাবেরকে, "এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি যতটা পড়তে পেরেছেন ততটাই অনুবাদ করেছেন। এবার মাননীয় সাবের— আপনাকে একটা অনুরোধ করছি।"

"বলো।" সাবের বললেন।

"যদি আপনি দয়া করে কাগজটা আমাদের দেন তা হলে আমরা পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করতে পারি।" হ্যারি বলল।

"তোমরা কি প্রাচীন লাতিন ভাষা জানো?" সাবের বললেন।

"না। আমরা অন্যভাবে চেষ্টা করব। তবে প্রয়োজনে আপনার সাহায্যও নিতে হবে।" হ্যারি বলল।

"বেশ, কাগজটা তোমাদের কাছে রাখো। তবে মনে রেখো, কাগজটা আমি তোমাদের দিচ্ছি নিজের দায়িত্বে। ভিনদেশি তোমরা, যদি কাগজটা নিয়ে পালিয়ে যাও তা হলে আমি কিন্তু বিপদে পড়ব।" সাবের বললেন।

ফ্রান্সিস বলল, "আপনি কিছু ভাববেন না। চেষ্টা করে পাঠোদ্ধার করতে পারলে তো ফেরত দেবই, না পারলেও ফেরত দেব। আসল কথা, পাঠোদ্ধার করার জন্য আমরা কিছুদিন কাগজটা আমাদের কাছে রাখতে চাই।"

"ঠিক আছে। নিয়ে যাও। চেষ্টা করে দ্যাখো।" সাবের বললেন।

তিনজনে রাজকোষাগার থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে দেখল আকাশের যেন রং পালটে গেছে। ছাইরঙা মেঘ ছোটাছুটি করছে। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। সেইসঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সাবের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, "লিভেন্টার শুরু হয়ে গেছে।"

"লিভেন্টার কী?" হ্যারি জানতে চাইল।

"পুব দিক থেকে এইরকম প্রচণ্ড হাওয়া বয়, সেইসঙ্গে কখনও বৃষ্টি। চলে কখনও পঞ্চাশ দিন, কখনও একশো দিন। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল।" সাবের বললেন।

তিনজনে রাজসভায় ফিরে এল। বৃদ্ধ সাবের গিয়ে নিজের আসনে বসলেন। হ্যারি রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল, "মাননীয় রাজা, আপনি এই দুর্গে কোনও একটা ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা সেখানে থেকে রাজা রোডারিকের পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার খুঁজে বের করব।"

"বেশ।" রাজা ফার্দিনান্দ বললেন। তারপর সেনাপতিকে কাছে ডাকলেন। কিছু বললেন। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, "আমার সঙ্গে চলুন।"

রাজসভার বাইরে এসে সেনাপতি দক্ষিণমুখো চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা।

একটা পাথর আর কাঠের তৈরি ঘরের সামনে এসে সেনাপতি দাঁড়াল। বলল, "আপনারা এই ঘরেই থাকবেন।" সেনাপতি এগিয়ে এসে ঘরের দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। দেখল ঘরটা বেশ বড়। মেঝেয় শুকনো ঘাস দড়ি দিয়ে বেঁধে বিছানা করা। তার ওপর মোটা কাপড় পাতা।

ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। তারপর মাথার নীচে দু'হাত রেখে শুয়ে পড়ল। সেই কাগজটার লেখা বারবার পড়তে লাগল। ছিঁড়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া অক্ষর ও শব্দগুলো বাদ দিয়ে-দিয়ে লেখাটা এরকমই দাঁড়িয়েছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস কাগজটা হ্যারিকে দিল। হ্যারি কাগজের লেখাগুলো পড়তে-পড়তে একটা জায়গায় দেখল একটা বর্ণ আছে। পুরো শব্দটা মুছে গিয়ে শুধু ওই বর্ণটাই আছে।

এই সময় সাবের ঘরে ঢুকলেন। হ্যারি বলে উঠল, "আসুন, আসুন। আপনার সাহায্য খুবই প্রয়োজন।" সাবের বিছানায় বসলেন।

হ্যারি কাগজটা দেখিয়ে বলল, "রয়েনো ভিস্তা কী?"

"এখান থেকে উত্তর দিকে কিছুদূরে একটা পাহাড় আছে। তারই নাম রয়েনো ভিস্তা।" সাবের বললেন।

"আজ বিকেলেই আমরা সেই পাহাড় দেখতে যাব।" ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি কাগজটা দেখিয়ে বলল, "এই জায়গায় দেখুন একটা বর্ণ আছে। আপনি সেই বর্ণটা কী তা লেখেননি।"

"দেখি, দেখি।" সাবের সেই জায়গাটা দেখলেন। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ পড়ে বললেন, "ঠিকই বলেছ। খুব আবছা 'প' বর্ণটা দেখতে পাচ্ছি। পুরো শব্দটা নেই।"

হ্যারি ওই জায়গার 'প' বর্ণটা মনে রাখল। ফ্রান্সিস 'প' বর্ণটা দেখল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তারপর সাবের চলে গেলেন।

বিকেলে ফ্রান্সিস সেনাপতির কাছে

গেল। বলল, "আমরা রয়েনো ভিস্তা যাব। আপনি আমাদের একটা গাড়ি দিন।"

সেনাপতি বলল, "মহামান্য রাজা আপনারা যখন যা চাইবেন তাই দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা তৈরি হোন।"

ফ্রান্সিস ঘরে ফিরে এল। কিছুক্ষণ পরে চারটে সাদা ঘোড়ায় টানা কালো রঙের একটা গাড়ি ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। কালো রঙের গাড়িটার গায়ে সোনালি-রুপোলি রঙের ফুল, লতাপাতার কাজ।

ফ্রান্সিসরা তৈরিই ছিল। ওরা গাড়িতে উঠল। কোচওয়ান গাড়ি চালাল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গাড়ি রয়েনো ভিস্তা পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসরা নেমে এল। দেখল সাদাটে রঙের রয়েনো ভিস্তা পাহাড় খুব একটা উঁচু নয়। ওখান থেকেই ওরা দেখল সাদাটে পাথরের মধ্যে দুটো গুহার মুখ। এবার ওরা পাহাড়টার চারপাশে ঘুরে এল। বিকেলের নরম আলোয় উত্তর দিকে আরও একটা গুহামুখ দেখা গেল। একেবারে খাড়া উঠে যায়নি পাহাড়টা। একটু হেলানো হয়ে উঠে গেছে।

সন্ধে হয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা গাড়িতে চড়ে ফিরে এল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারি আর ফ্রান্সিস মোমবাতির আলোয় কাগজটা পড়তে লাগল। অনেকবারই পড়া হয়ে গেছে কাগজটা। হ্যারি মাথার পেছনে দু'হাত রেখে শুয়ে পড়ল। কাগজের লেখাটা হ্যারির মুখস্থ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ তিনজনই চুপ। হঠাৎ হ্যারি উঠে বসল। বলল, "একটা-একটা করে ফাঁকগুলো কথা দিয়ে ভরাতে হবে। দ্যাখো প্রথমে রয়েনো ভিস্তার পরে ফাঁক আছে। ওখানে হবে পাহাড়। দাঁড়াল রয়েনো ভিস্তা পাহাড়। তার পরের ফাঁকে হবে সাদা। মানে সাদা পাথরের। আর সত্যিই সে রয়েনো ভিস্তা পাহাড়টা সাদা পাথরের, তারপর ফাঁক। প্রশ্ন হল সাদা পাথরের কী? ফ্রান্সিস বলল, "যদি ধরি সাদা পাথরের চুড়ো?"

হ্যারি বলল, "পাহাড়ের চুড়োয় মণিমাণিক্য রাখলে সহজেই চোখে পড়বে। জায়গাটা গোপন হতে হবে। পাহাড়ে গোপন জায়গা মানেই গুহা। আমরা রয়েনো ভিস্তায় তিনটে গুহা দেখেছি। মুছে যাওয়া শব্দগুলো যোগ করলে দাঁড়াবে, গুহা নীচ থেকে ওপরে তিনটে। তারপরেই অস্পষ্ট বর্ণ—প। 'প' দিয়ে অনেক শব্দ হতে পারে। পরের ফাঁকটা ভেবে পূরণ করতে হবে। সবশেষে লেখা হয়েছিল, কাগজটা শত্রুর হাতে না পড়ে। নীচে রাজা রোডারিকের নাম তো রয়েইছে।"

ফ্রান্সিস আর হ্যারি যে-ফাঁকটা পূরণ করা গেল না, সে-জায়গাটা ভাবতে লাগল। শাঙ্কো তততক্ষণে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকছে। কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি শুয়ে পড়ো। রাত হচ্ছে। কালকে ভাবা যাবে।" দু'জনে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিসরা গোল রুটি আর আনাজের ঝোল খাচ্ছে তখনই সাবের এলেন। ফ্রান্সিসরা তাঁকে সমাদরে বসাল। হ্যারি বলল, "আচ্ছা, রয়েনো ভিস্তা পাহাড়টার রং বেশ সাদাটে। কেন বলুন তো?"

"রয়েনো ভিস্তা পাহাড়টা চুনা পাথরের।" সাবের বললেন।

হ্যারি প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, "সাদা পাথরের নয়, হবে চুনা পাথরের।"

ফ্রান্সিস বলল, "আচ্ছা, বলুন তো রয়েনো ভিস্তা পাহাড়ে ক'টা গুহা আছে?"

"ঠিক বলতে পারব না। আমি তো ওই পাহাড়ে কখনও উঠিনি।" সাবের বললেন। তারপর বললেন, "ওই পাহাড়ে কি আপনারা উঠবেন?"

ফ্রান্সিস বলল, "পাহাড়টায় উঠতে চেষ্টা করব।"

"পারবেন উঠতে?" সাবের বললেন।

"সেটা এখনই বলতে পারছি না। পাহাড়টা ভাল করে দেখে বলব।" ফ্রান্সিস বলল।

"ওই পাহাড়ে উঠতে চাইছেন কেন?" সাবের বললেন।

"কারণ রাজা রোডারিকের চিঠিতে ওই পাহাড়টার উল্লেখ আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই পাহাড়ের কোনও গুহায় পদ্মরাগমণির ভাণ্ডারের কথাই রাজা লিখেছেন।"

"দেখুন চেষ্টা করে।" সাবের বললেন।

সাবের চলে গেলেন। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে পাঠাল সেনাপতির কাছ থেকে বেশ লম্বা একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে আসতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো দড়ি নিয়ে এল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর তিনজনে রাজবাড়ির সেই গাড়িতে চড়ে রয়েনো ভিস্তা পাহাড়ের কাছে এল। গাড়ি থেকে নেমে ফ্রান্সিস পাহাড়টার নীচে এল। পাথরে হাত দিয়ে দেখল কঠিন চুনা পাথর। মন দিয়ে পাহাড়ের হেলানো গা-টা দেখল। দেখল— এখানে-ওখানে শক্ত চুনাপাথর উঁচিয়ে আছে। পাথরে খাঁজও আছে। ফ্রান্সিস বুঝল, পাহাড়টায় ওঠা যাবে। বলল, "হ্যারি আমি পাহাড়টায় উঠছি।"

"পারবে?" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস বলল, "রাজা রোডারিক নিশ্চয়ই কাউকে দিয়ে সেই পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার কোনও গুহাতে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য সেই লোকটিকে রাজা রোডারিক মেরে ফেলেছিলেন, যাতে কেউ না ওই পদ্মরাগমণির ভাণ্ডারের খোঁজ পায়। একজন লোক যদি এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পেরে থাকে তবে আমি পারব না কেন?"

"দ্যাখো চেষ্টা করে।" হ্যারি বলল।

ওরা কথাবার্তা বলছে তখনই হঠাৎ ঝোড়ো বাতাসের গতি বেড়ে গেল। সেইসঙ্গে বৃষ্টিও শুরু হল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা কোরো না। বরং নীচের গাছগাছালির তলায় গিয়ে অপেক্ষা করি। বৃষ্টি থামলে তখন ওঠার চেষ্টা কোরো।"

ফ্রান্সিস বলল, "মনে নেই সাবের বলেছিলেন— এই ঝোড়ো বাতাস কখনও-কখনও পঞ্চাশ দিন একশো দিন চলে। আমরা কি ততদিন অপেক্ষা করে থাকব?"

"অন্তত বৃষ্টিটা কমতে দাও।" হ্যারি বলল।

"না, আমি আজই উঠব।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর যে দড়িটা শাঙ্কো এনেছিল তার একটা মাথা ফ্রান্সিস কোমরে বাঁধল। তারপর উঁচিয়ে থাকা দুটো চুনাপাথর ধরে ফ্রান্সিস উঠতে শুরু করল। হ্যারি আর শাঙ্কো দুটো পাথরের খাঁজে গিয়ে আশ্রয় নিল। এখানে বৃষ্টি ততটা লাগছে না।

ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে ওঁচানো পাথর ধরে-ধরে আস্তে-আস্তে উঠতে লাগল। বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা যেন ফ্রান্সিসকে ছুড়ে ফেলতে চাইছে। ওর সারা শরীর ভিজে গেছে। এত ভিজে গেছে, মনে হচ্ছে যেন স্নান করেছে। ফ্রান্সিসের কানে আসছে শুধু ঝোড়ো

হাওয়ার শনশন শব্দ আর একটানা বৃষ্টির শব্দ। ফ্রান্সিস দু'পা উঠছে। বিশ্রাম নিচ্ছে। তারপর আবার উঠছে।

বৃষ্টি একটু কমল। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা চলল। চুনাপাথরে বৃষ্টির জল পড়াতে চুনাপাথর থেকে একটা গরম ভাপ বেরোচ্ছে যেন। বৃষ্টি আরও কমল। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। বৃষ্টি কমে যাওয়ায় গরম ভাপটা যেন বাড়ল।

ওপরের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস দেখল গুহাটার মুখ। খুবই কাছে। এই গুহাটা লক্ষ্য করেই ফ্রান্সিস পাহাড়টায় উঠতে শুরু করেছিল।

একটু পরেই ফ্রান্সিস গুহামুখের একটা পাথর ধরে গুহাটার মুখে উঠে এল। শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গুহামুখে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস তখন ভীষণ হাঁফাচ্ছে। নীচের দিকে তাকাল একবার। হ্যারি আর শাঙ্কো হাত নাড়ছে। ফ্রান্সিস গুহার মধ্যে আস্তে-আস্তে ঢুকল। গুহার মুখটায় দেখল কোনওরকমে মাথা নিচু করে দাঁড়ানো যাচ্ছে। ফ্রান্সিস এবার গুহার মেঝে, দেওয়াল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে-দেখতে চলল। মুখের পরেই গুহাটা বেশ বড়। সহজেই হাঁটতে পারছিল ফ্রান্সিস। একটু অন্ধকার শুরু হল। বাইরে বৃষ্টি। ম্লান আলো পড়েছে। ফ্রান্সিস ভেবেছিল একটা জ্বলন্ত মশাল আনবে। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে মশাল জ্বালানো যাবে না।

মেঝে আর চারদিকের পাথুরে দেওয়াল সেই ম্লান আলোয় দেখতে-দেখতে গুহাটার শেষপ্রান্তে এল। কিন্তু পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার দেখতে পেল না কোথাও। এতক্ষণে ফ্রান্সিস বুঝল বেশ গরম লাগছে। চাপা গুহা, তাও চুনাপাথরের, গরম লাগবেই। গুহার শেষপ্রান্তটা দেখে ফ্রান্সিস গুহার মুখে আস্তে-আস্তে ফিরে এল। গুহামুখ থেকে হ্যারি আর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে হাত এপাশ-ওপাশ নাড়ল। ওরা বুঝল ফ্রান্সিস পদ্মরাগমণির ভাণ্ডারের খোঁজ পায়নি।

ফ্রান্সিস আবার উঠতে লাগল পাহাড়টার চুড়ো লক্ষ্য করে। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা কমেনি। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে চুড়োর কাছে উঠে এল। চুড়োর মস্তবড় পাথরটার খাঁজে ভর দিয়ে ফ্রান্সিস চুড়োয় উঠে এল। পাথরটায় বসে কিছুক্ষণ হাঁফাল। তারপর হাঁফভাবটা কমলে কোমর থেকে দড়ির মুখটা খুলল। দড়িটা চুড়োর পাথরে জড়িয়ে টানটান করে বাঁধল। তারপর অন্য মুখটা নীচে নামিয়ে দিল। একটু পরেই দড়ি বেয়ে বেয়ে শাঙ্কো উঠে এল। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "এখন অন্য দুটো গুহায় তল্লাশি চালাতে হবে।" ফ্রান্সিস বলল, "দড়ি গুহাদুটোর মুখে ঝুলিয়ে তুমি গুহাদুটো দেখে এসো। আমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

শাঙ্কো ঝুলন্ত দড়িটা অন্য গুহাটার মুখ দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। তারপর দড়ি দু'হাতে ধরে পাহাড়ের গায়ে পা দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে একটা গুহার মুখে নেমে এল। ঢুকল গুহার মধ্যে। ভ্যাপসা গরমটা বাড়ল। শাঙ্কো ওই অল্প আলোতে গুহার শেষ অবধি ভাল করে দেখল। পদ্মরাগমণির ভাণ্ডারের হদিস পেল না। অন্য গুহাটায়ও ঢুকল। সেখানেও পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার দেখতে পেল না। ফ্রান্সিসের কাছে ফিরে এল। বলল সব। ফ্রান্সিস বলল, "আরও একটা গুহা আছে উত্তর দিকে। গুহাটা নীচে থেকে দেখা যায় না। আমি সেই গুহাটা দেখতে যাচ্ছি।"

ফ্রান্সিস দড়িতে ঝুলে-ঝুলে সেই গুহাটার মুখে নেমে এল। ঢুকল গুহাটায়। গুহাটা বেশি বড় নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই গুহাটা ভাল করে দেখা হয়ে গেল। এই গুহা নিয়ে চারটে গুহাই দেখা হল। কোনও গুহায় পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার নেই। ফ্রান্সিস দড়ি ধরে-ধরে পাহাড়ের গায়ে পা দিয়ে ধাক্কা দিতে-দিতে চুড়োর দিকে উঠতে লাগল। হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে ওর ডান পা-টা ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস আশ্চর্য হয়ে গেল। বাঁ পা দিয়ে চাপ দিল। দুটো পা-ই ঢুকে গেল। বোঝা গেল জায়গাটা ফাঁপা। তার মানে এখানে একটা গুহা আছে। ফ্রান্সিসের মনে পড়ল সাবের কাগজটায় আবছা একটা বর্ণ দেখে বলেছিলেন প বর্ণ। তার মানে পঞ্চম। এটাই সেই পঞ্চম গুহা। নিশ্চয়ই এই গুহায় পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার আছে।

ফ্রান্সিস দু'পা দিয়ে গুহামুখে জড়ো করা চুনাপাথর সরাতে লাগল। একটু পরেই গুহামুখ দেখা গেল। গুহামুখে দাঁড়াবার মতো জায়গা দেখা গেল। ফ্রান্সিস চুড়োর দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "শাঙ্কো, শাঙ্কো।"

প্রচণ্ড হাওয়ার শব্দে শাঙ্কো প্রথমে ফ্রান্সিসের ডাক শুনতে পেল না। তারপর শুনতে পেল। চুড়ো থেকে নীচের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস হাতের ইশারায় নেমে আসতে বলল।

একটু পরেই শাঙ্কো দড়ি ধরে-ধরে নেমে এল। গুহার মুখে দাঁড়াল দু'জনে। চুনাপাথর দু'হাতে সরাতে লাগল তারা। বেশ কিছুক্ষণ পাথর সরাবার পর গুহাটা স্পষ্ট দেখা গেল। বড় গুহা নয়। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হল। আগে ফ্রান্সিস হামাগুড়ি দিয়ে চলল। পেছনে শাঙ্কো।

ফ্রান্সিস এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে হঠাৎ সামনে দেখল একটা লম্বাটে বাক্স। বাক্সটার গায়ে চুনের গুঁড়োর স্তর। ফ্রান্সিসের মনে সংশয়, এই বাক্সটাতেই কি পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার আছে?

ফ্রান্সিস লম্বাটে বাক্সটা আস্তে-আস্তে দু'হাতে ধরে নিয়ে এল। তারপর বাক্সটার ওপরের ডালাটা টানল। ডালা খুলে গেল। সেই ম্লান আলোয় দেখা গেল সারা বাক্সবোঝাই শুধু বড়-বড় পদ্মরাগমণি। এত কম আলোতেও ঝকঝক করছে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল, "শাঙ্কো, পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার পেয়েছি। ফিরে চলো।"

শাঙ্কো আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "ও হো হো।" ফ্রান্সিস গলা মেলাল। এবার উলটো দিকে হামাগুড়ি দিয়ে দু'জনে গুহার মুখে ফিরে এল। ফ্রান্সিস ওর কোমরের ফেট্টি খুলল। বাক্সটার গায়ের চুন মুছল। দেখা গেল কালো ওক কাঠে তৈরি বাক্সটার গায়ে লতাপাতার লাল-সবুজ মিনে-করা। ফ্রান্সিস ফেট্টির কাপড়ে বাক্সটা বেঁধে ঝুলিয়ে নিল। তারপর দু'জনে দড়ি বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে এল। পদ্মরাগমণির ভাণ্ডার দেখে হ্যারি আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "ও হো হো।" ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোও গলা মেলাল।

এবার তিনজনে চলল গাড়ির দিকে। ফ্রান্সিস বলল, "রাজা রোডারিক একজন লোক নয়, কয়েকজনকে পাহাড়ে উঠতে পাঠিয়েছিলেন। চুড়োয় দড়ি বেঁধে আমরা যেভাবে উঠেছি, ওই লোকগুলোও সেইভাবে উঠেছিল। বাক্সটা রেখে গুহার মুখ ওরা চুনাপাথর দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই পঞ্চম গুহাটা লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে গেল এতদিন।

তিনজন গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল দুর্গের দিকে।

ছবি : অনুপ রায়

ধাঁধা-হেঁয়ালি হরেকরকম

অনীশ দেব

'আশ্বিনের মাঝামাঝি/উঠিল বাজনা বাজি/ পুজোর সময় এল কাছে—' পুজো একেবারে দোরগোড়ায় এসে হাজির না হলেও আকাশে-বাতাসে এখন পুজোর গন্ধ, চারপাশে নতুন কাশফুল, আর নতুন সাজপোশাকের সন্ধানে সাজ-সাজ রব। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে তোমাদের সামনে হাজির করা হল পুজোর হরেকরকম ধাঁধা-হেঁয়ালি। পুজোর ছুটিতে এগুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়ে খুঁজে বের করো সঠিক উত্তর। পরেই যদিও এগুলোর উত্তর দেওয়া আছে, তবুও তোমাদের কাছে অনুরোধ, আগেভাগেই উত্তর দেখে নেবে না। প্রতিটি ধাঁধা অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে না পারলে তবেই দেখবে উত্তর। তবেই না জমবে বুদ্ধির লড়াই! আমার ধারণা, তোমরা অনেকেই এই ধাঁধাগুলো সমাধান করতে পারবে—যদিও দু-একটা ধাঁধা একটু শক্ত মনে হতে পারে। আর যে সবক'টা ধাঁধাই সমাধান করতে পারবে, তাকে আগেভাগেই জানিয়ে রাখি অভিনন্দন।

এবারে এসো, হাতে-কলমে নেমে পড়ো ধাঁধা-হেঁয়ালি সমাধানের কাজে।

পুজোর ধাঁধা

পুজোর সময় মা-বাবার সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে ছ' বছরের টুকুন। হঠাৎ একটা জায়গায় এসে অনেকক্ষণ কীসব দেখে ও মাকে ডেকে বলল, "মা, মা—দ্যাখো, ২২টা হাত, ৩০টা পা আর ৬টা লেজ।"
কোনও প্রাণীর এত হাত-পা এবং লেজ হয় বলে আমাদের জানা নেই। টুকুন তা হলে কী দেখে এ-কথা বলল?

লিপ ইয়ারের রহস্য

আগামী ২০০০ সাল লিপ ইয়ার। কিন্তু আগামী ২১০০ সাল লিপ ইয়ার হবে না কেন?

চক্রযানের চক্কর

আমাদের পাড়ার মোটর গ্যারাজে স্কুটার, মোটরবাইক, অটোরিকশা আর মোটরগাড়ি মেরামত করে। সেই গ্যারাজে সুমন নামে একটি মজার ছেলে কাজ করে। সে প্রায়ই নানারকম প্রশ্ন করে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।
গত মাসের প্রথম সপ্তাহে গাড়ির কাজ করাতে গ্যারাজে যেতেই সুমন আমাকে একটা প্রশ্ন করে ধন্দে ফেলে দিল। ও বলল, "দাদা, গত মাসে আমাদের গ্যারাজে দু'চাকা, তিন চাকা আর চার চাকার গাড়ি মিলিয়ে মোট ৪৫টা গাড়ি মেরামত করা হয়েছে। ওদের মোট চাকার সংখ্যা ১৩০। বলুন তো, স্কুটার-মোটরবাইক ক'টা ছিল, ক'টা অটো ছিল, আর ক'টা গাড়ি ছিল?"
আমি একটু ভেবে বললাম, "আরও কিছু খবর দাও, সুমন, তা না হলে দু-তিনরকম উত্তর বেরোচ্ছে।"
তখন ও বলল, "ঠিক আছে, বলছি। দু'চাকার গাড়ির সংখ্যা তিন চাকার গাড়ির দ্বিগুণ। এবারে বলুন—"
তোমরা পারো সুমনের প্রশ্নের উত্তর দিতে?

পিথাগোরাসের উপপাদ্য এবং চন্দ্রকলা

ভয় নেই, কঠিন কোনও অঙ্ক হাজির করছি না তোমাদের সামনে। শুধু দুটো ছবি আঁকতে হবে—তাও আবার দেখে-দেখে। কারণ, দুটো ছবিই আমি এঁকে দিয়েছি। মনে হতে পারে, দেখে-দেখে ছবি কপি করা কী এমন শক্ত কাজ! কিন্তু এই আঁকার একটা শর্ত আছে। কাগজ থেকে পেনসিল না তুলে একবারেই আঁকতে হবে ছবি দুটো। আর একই অংশের ওপরে দু'বার পেনসিল বোলানো চলবে না।
প্রথম ছবিটা পিথাগোরাসের উপপাদ্য নিয়ে। গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাসের জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫৮২ সাল নাগাদ। গণিতশাস্ত্রে তাঁর অবদান প্রচুর হলেও তিনি বোধ হয় সবচেয়ে বিখ্যাত তাঁর সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্যটির জন্য। তিনিই প্রথম গাণিতিক উপায়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, কোনও সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের ওপর আঁকা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজটির অন্য দুটো বাহুর ওপরে আঁকা বর্গক্ষেত্রের মোট ক্ষেত্রফলের সমান। সুতরাং এই ছবিটাই এঁকে দিলাম নীচে (১ নং ছবি।)
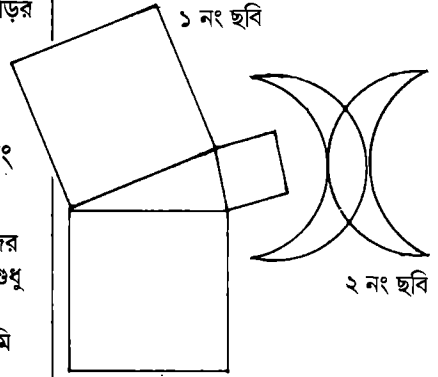
দ্বিতীয় ছবিটা চন্দ্রকলার। দুটো বাঁকা চাঁদ পিঠোপিঠি ছেদ করে আছে পরস্পরকে।
এই দুটো ছবিকেই তোমরা শর্ত অনুযায়ী এঁকে ফ্যালো ঝটপট।

সিকি-আধুলির সমস্যা

ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেইভাবে ছ'টা সিকি (২৫ পয়সার কয়েন) ও ছ'টা আধুলি (৫০ পয়সার কয়েন) সাজিয়ে নাও। তারপর, মাত্র একটা কয়েন সরিয়ে, আর কিছুটা দুষ্টু-বুদ্ধি ব্যবহার করে, কয়েনগুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে দিতে পারো যাতে

প্রত্যেক সারিতে শুধু আধুলি বা সিকি থাকে ?
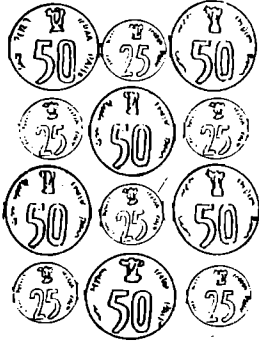
পাঁচতলার বারান্দা ও দেশলাইয়ের বাক্স

বিকেলবেলা পাঁচতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচের বাগান আর লোকজন দেখছিলেন সোমেনকাকু। ওঁর দু'পাশে দাঁড়িয়ে মজার-মজার গল্প শুনছিল সায়ক আর মোনালিসা—দু' ভাই-বোন। সোমেনকাকু আজ বেড়াতে এসেছেন ওদের বাড়িতে। এসেই শোনাতে শুরু করেছেন ওঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা। গল্প করতে-করতে হঠাৎই পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখলেন সোমেনকাকু। কিন্তু পকেট হাতড়ে দেশলাই বা লাইটার খুঁজে পেলেন না। তখন বললেন, "অ্যাই, একটা দেশলাই নিয়ে আয় তো বউদির কাছ থেকে—"
কথাটা শোনামাত্রই দু'ভাই-বোন ছুট লাগাল ঘরের দিকে, কে আগে দেশলাই নিয়ে আসতে পারে সোমেনকাকুর জন্য। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দু'জনে দুটো দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে এসে হাজির।
"এই নাও, কাকু, দেশলাই—" বলে দু'জনেই দেশলাইয়ের বাক্স এগিয়ে দিল সোমেনকাকুর দিকে।
সোমেনকাকু মুশকিলে পড়ে গেলেন। কার দেশলাই নেবেন তিনি ? একটু ভেবে তিনি হেসে বললেন, "ঠিক আছে। একটা প্রশ্ন করব। যে ঠিক উত্তর দিতে পারবে তার কাছ থেকে দেশলাই নেব আমি। প্রশ্নটা হল, বাক্সগুলো না খুলে বলতে হবে কোন দেশলাইয়ের বাক্সে বেশি কাঠি আছে।"
সায়ক তাড়াতাড়ি "খুব সহজ" বলে ওর দেশলাইয়ের বাক্সটা কানের কাছে নিয়ে ঝাঁকাতে যাচ্ছিল, বারণ করলেন সোমেনকাকু, "উঁহু, বাক্স ঝাঁকিয়ে দেখা চলবে না। আর, একটা সূত্র বলে দিই তোদের : তোদের ফ্ল্যাটটা একতলা বা দোতলায় হলে এ-প্রশ্ন আমি করতাম না।"
সায়ক আর মোনালিসা তখন গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে গেল সোমেনকাকুর প্রশ্নের উত্তর। তোমরা পারো বেচারা দুই ভাই-বোনকে সাহায্য করতে ?

পিঁপড়ে থেকে চিনির দানার দূরত্ব কত

কুন্তলের পড়ার টেবিলে একটা ছোট কাঠের বাক্স রাখা আছে। বাক্সের ভেতরে কুন্তলের ছবি আঁকার সরঞ্জাম আছে। একটু আগেই ও ছবি আঁকছিল—পিঁপড়ের ছবি। কারণ, একটা পিঁপড়ে ওর টেবিলে ঘোরাফেরা করছিল। এখন ছবি আঁকা ছেড়ে কুন্তল সামনের জানলা দিয়ে বাইরের নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎই ওর নজরে পড়ল কোথায়-লুকিয়ে-পড়া পিঁপড়েটা আবার দেখা দিয়েছে। ওর বাক্সের ওপরে উঠে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছে। ঠিক তখনই কুন্তল দেখতে পেল, একটা চিনির দানা পড়ে আছে টেবিলে, বাক্সের কোণ ঘেঁষে। পিঁপড়েটা যদি চিনির দানাটা নিয়ে যেতে চায় তা হলে ওটাকে কতটা পথ পাড়ি দিতে হবে ? মনে-মনে ভাবল কুন্তল।
ছবিতে কুন্তলের বাক্সের মাপ দেখানো হল। আর পিঁপড়েটা আছে বাক্সের এক কোণে, A বিন্দুতে। যদি চিনির দানাটা
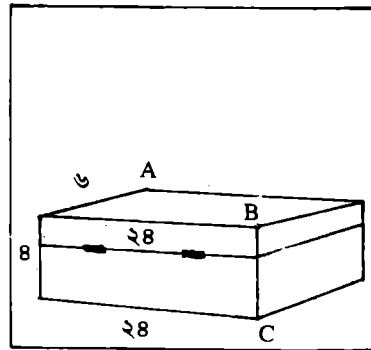
ছবির B বিন্দুতে থাকে, তা হলে বলতে পারো, চিনির দানা পর্যন্ত পৌঁছতে পিঁপড়েটার সংক্ষিপ্ততম পথের দৈর্ঘ্য কত ?
যেহেতু প্রথম প্রশ্নের উত্তর বেশ সহজ, তাই জুড়ে দিলাম দ্বিতীয় প্রশ্ন : চিনির দানাটা যদি C বিন্দুতে থাকে, তা হলে A বিন্দু থেকে C বিন্দুতে পৌঁছনোর সংক্ষিপ্ততম পথের দৈর্ঘ্য কত হবে ?

চাকতির সমস্যা

আটটা চাকতিকে ছবির L বর্ণের মতো সাজানো হয়েছে। L-এর লম্বা বাহু তৈরি করা হয়েছে পাঁচটা চাকতি দিয়ে, আর খাটো বাহুতে রয়েছে তিনটি চাকতি। মাত্র একটি চাকতি জায়গা থেকে সরিয়ে L-বর্ণটাকে এমনভাবে তৈরি করতে পারো যাতে দুটি বাহুতেই পাঁচটি করে চাকতি থাকে ?
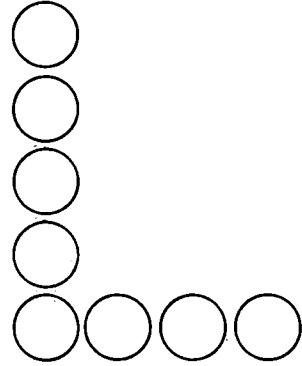
সাদা বেলুন, কালো বেলুন

দুটো সমান মাপের বেলুনে সমান পরিমাণ হিলিয়াম গ্যাস ভরা আছে। বেলুন দুটোর তফাত শুধু তাদের রঙে : একটা বেলুন সাদা, আর একটা বেলুন কালো। হিলিয়াম গ্যাস যেহেতু বাতাসের তুলনায় হালকা (অর্থাৎ, ঘনত্ব কম), তাই দুটো বেলুনই উড়ে যাবে আকাশে। হিলিয়ামের বদলে হাইড্রোজেন গ্যাসও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন দাহ্য গ্যাস, আর হিলিয়াম অদাহ্য। তাই হিলিয়াম হাইড্রোজেনের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ।
এখন প্রশ্ন হল, রোদঝলমলে দিনে হিলিয়াম গ্যাসভরা এই দুটো বেলুনের মধ্যে কোন বেলুনটা তাড়াতাড়ি ওপরে উঠবে ?

ত্রিভুজ আর বৃত্তের সমস্যা

এই প্রশ্নটা জ্যামিতি নিয়ে। আর তার সঙ্গে একটু-আধটু অঙ্কও কষতে হবে তোমাদের। পাশে দুটি ছবি আঁকা আছে। একটি হল, সাদা বৃত্তের মধ্যে সুষমভাবে আঁকা একটি কালো সমবাহু ত্রিভুজ। ত্রিভুজের একটি শীর্ষবিন্দুই বৃত্তের পরিধি স্পর্শ করেছে। আর
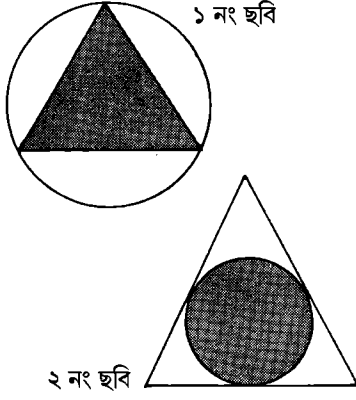
দ্বিতীয় ছবিটি প্রথম ছবির উলটো : সাদা সমবাহু ত্রিভুজের মধ্যে একটি কালো বৃত্ত। বৃত্তটা ত্রিভুজের তিনটি বাহুই স্পর্শ করে আছে। বলতে হবে, কোন ছবির কালো এবং সাদা অংশের অনুপাত বেশি। প্রথম বৃত্তের ব্যাস ১০ একক, আর দ্বিতীয় ছবির সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১০ একক।

উত্তর

পুজোর ধাঁধা

টুকুন দুর্গাঠাকুর দেখছিল। গণেশ থেকে শুরু করে কার্তিক পর্যন্ত হিসেব করলে পাওয়া যাবে মোট হাত-পা ও লেজের হিসেব। হিসেবে যখন লেজ আছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে, বাহনগুলোকেও টুকুন হিসেব থেকে বাদ দেয়নি। তবে পা ও লেজের হিসেব মেলানোর জন্য তোমরা অসুরের সঙ্গী মৃত মোষটাকেও কিন্তু মনে রেখো।

লিপ ইয়ারের রহস্য

আমরা জানি, ৩৬৫ দিনে এক বছর। তবে এটা কিন্তু সঠিক হিসেব নয়। একটা সৌরবর্ষ সম্পূর্ণ হয় মোটামুটিভাবে ৩৬৫ দিন, ৫ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট, ৪৬ সেকেন্ডে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, চার বছর পরপর প্রায় ২৩ ঘণ্টা, ১৫ মিনিট সময় বাড়তি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং চার বছর পরপর ফেব্রুয়ারি মাসে একটা দিন বাড়িয়ে দিয়ে ক্যালেন্ডারে সময়টাকে সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু তার ফলে প্রতি চার বছরে প্রায় ৪৫ মিনিট মতো ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। তা হলে দেখা যাবে, ১২৮ বছরে প্রায় একদিনের গরমিল হয়ে যাচ্ছে। আর প্রতি ৪০০ বছরে প্রায় তিনদিনের ঘাটতি। এই ঘাটতির গরমিল মেলানোর জন্য প্রতি ৪০০ বছরে তিনটে করে লিপ ইয়ার বাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ, শতকের বছরগুলো যদি ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য না হয় তা হলে সেগুলোকে লিপ ইয়ার ধরা হয় না। সেইজন্যই ২১০০ সাল ৪ দিয়ে বিভাজ্য হওয়া সত্ত্বেও লিপ ইয়ার নয়। কারণ ২১০০ সাল ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য নয়। এখন আমরা যে-ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি তার নাম গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। এর আগে প্রচলিত ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। প্রতি বছরে দিনের সংখ্যার হিসেবে ট্রপিক্যাল ইয়ার বা ক্রান্তীয় বর্ষের সঙ্গে এই দু'রকম ক্যালেন্ডার-বর্ষের কীরকম তফাত, সেটা নীচের তালিকায় দেখানো হল।

বর্ষ	ক্রান্তীয় বর্ষ	গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার-বর্ষ	জুলিয়ান ক্যালেন্ডার-বর্ষ
দিনের সংখ্যা	৩৬৫.২৪২২	৩৬৫.২৪২৫	৩৬৫.২৫০০

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বর্তমানে প্রচলিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে ১০,০০০ বছরে ক্রান্তীয় বর্ষের সঙ্গে মাত্র ৩ দিনের গরমিল হবে—যা খুবই সামান্য।

চক্রযানের চক্কর

এই ধরনের সমস্যা সমাধান করতে বীজগণিতের সাহায্য নিলে সুবিধে হয়। সেইভাবে অঙ্ক কষে সহজেই বের করা যায় যে, গত মাসে সুমনদের গ্যারাজে এসেছিল ১০টি অটোরিকশা, ২০টি স্কুটার বা মোটরবাইক, আর ১৫টি গাড়ি। সুমন যদি শেষ তথ্যটা না জানাত, তা হলে অনেকরকম উত্তর পাওয়া যেত। যেমন, ৩৪টি অটো, আটটি স্কুটার আর তিনটি গাড়ি। অথবা, ২০টি অটো, ১৫টি স্কুটার আর ১০টি গাড়ি। কিংবা, ৩০টি অটো, ১০টি স্কুটার আর পাঁচটি গাড়ি।
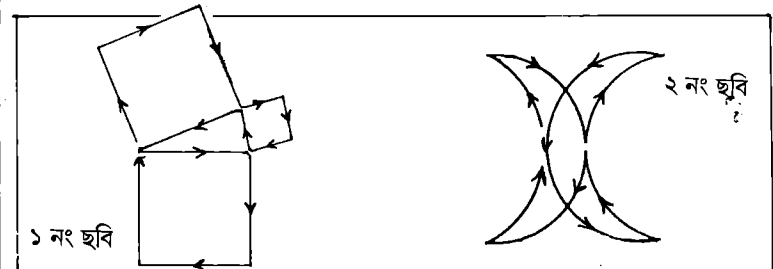
সিকি-আধুলির সমস্যা
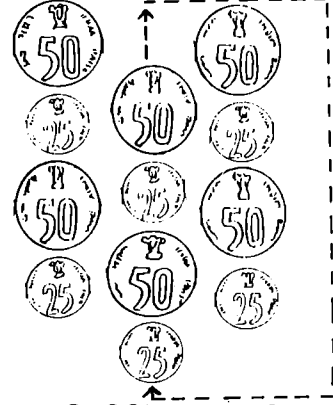
প্রথম সারির সিকিটাকে আঙুল দিয়ে চেপে নিয়ে আসতে হবে শেষ সারির আধুলির নীচে। তারপর সেই সিকিটাকে চেপে ধরে মাঝের স্তম্ভটিকে একঘর ওপরে ঠেলে দিলেই পাওয়া যাবে তাক লাগানো সমাধান।

পাঁচতলার বারান্দা ও দেশলাইয়ের বাক্স

দেশলাইয়ের বাক্স দুটোকে অনুভূমিক অবস্থায় রেখে একই সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে পাঁচতলার বারান্দা থেকে। পড়ন্ত দেশলাইয়ের বাক্সে দুটো বল কাজ করবে : পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং বাতাসের বাধা। যে-দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠির সংখ্যা বেশি, তার ওপর বেশি মাধ্যাকর্ষণ বল ক্রিয়া করবে। আবার দুটো বাক্সের মাপ সমান হওয়ায়, বাতাসের বাধাজনিত বল দু'-ক্ষেত্রে একই হবে। সুতরাং, ওপর থেকে পড়ার সময় ভারী দেশলাইয়ের বাক্সটা বেশি ত্বরণ নিয়ে নীচে পড়বে এবং মাটিতে পৌঁছবে

পিথাগোরাসের উপপাদ্য এবং চন্দ্রকলা

আগে। এ থেকেই বোঝা যাবে কোন দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠির সংখ্যা বেশি। তবে এই পরীক্ষার সময় বাক্স দুটোর মধ্যে কাঠির তফাত বেশি হলে ভাল হয়। তা হলে বাক্স দুটোর মাটিতে পৌঁছনোর সময়ের তফাতটা সহজে বোঝা যাবে।

পিঁপড়ে থেকে চিনির দানার দূরত্ব কত

আমরা জানি যে, দুটি বিন্দুর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম পথ হচ্ছে সরলরেখা। অতএব A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে পৌঁছনোর সংক্ষিপ্ততম পথ AB সরলরেখা। একটি আয়তক্ষেত্রের দুটি বিপরীত কৌণিক বিন্দু A ও B। অতএব AB সরলরেখার দৈর্ঘ্য হল আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য। AOB সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের
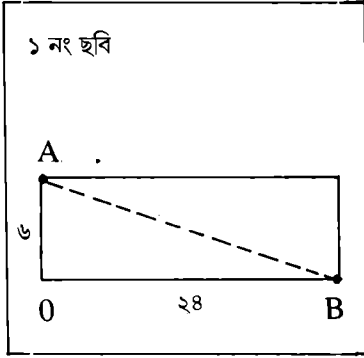
উপপাদ্য প্রয়োগ করে বের করা যায় যে, AB = ২৪.৭৪ একক (প্রায়)।
দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান করতে হলে কুন্তলের বাক্সের দুটি তলকে (বাক্সের ওপর দিক ও পেছন দিক) কল্পনায় একই সমতলে নিয়ে আসতে হবে। সেই অবস্থায় A থেকে C বিন্দু পর্যন্ত সংক্ষিপ্ততম পথের দৈর্ঘ্য AC সরলরেখা।
APC সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে
AC^2 = ১০²+২৪²
অর্থাৎ, AC = ২৬ একক।
কৌতূহলী পাঠকদের জানাই, O বিন্দু থেকে S বিন্দুর দূরত্ব ১৪.৪ একক। অর্থাৎ, পিঁপড়েটা A থেকে S বিন্দু বরাবর সরলরেখায় এসে, বাক্সের পেছনের তল বেয়ে SC সরলরেখা বরাবর চিনির দানার দিকে এগোবে। সেটাই হবে তার সংক্ষিপ্ততম পথ।

চাকতির সমস্যা

L-এর বড় বাহুর সবচেয়ে ওপরের চাকতিটাকে তুলে নিয়ে L-এর কোনার
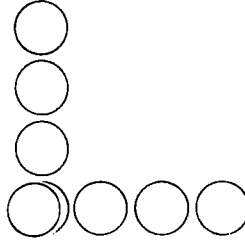
চাকতির ওপরে বসিয়ে দিতে হবে। তা হলেই L-এর দুটি বাহুতেই পাঁচটি করে চাকতি থাকবে।

সাদা বেলুন, কালো বেলুন

সূর্যের তাপে দুটো বেলুনের হিলিয়াম গ্যাসই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এর ফলে বেলুন দুটোর আয়তন বাড়বে। সাদা রঙের তুলনায় কালো রঙের (সত্যি-সত্যি
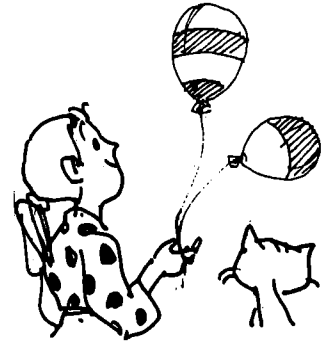
কিন্তু কালো রং বলে কিছু হয় না। যেসব রং আমরা দেখতে পাই, সেগুলো গরহাজির হলেই কোনও বস্তুকে আমরা কালো দেখি।) তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি। তাই কালো বেলুন সাদা বেলুনের তুলনায় তাড়াতাড়ি আয়তনে বাড়বে। ফলে সেটা সাদা বেলুনের তুলনায় বেশি বায়ু অপসারিত করবে। এই বাড়তি বায়ু অপসারণের ফলে পাওয়া যাবে বাড়তি প্লবতা বল। এই বাড়তি প্লবতা বলই কালো বেলুনটিকে সাদা বেলুনের তুলনায় তাড়াতাড়ি আকাশে উঠতে সাহায্য করবে।

ত্রিভুজ আর বৃত্তের সমস্যা

দ্বিতীয় ছবির কালো ও সাদা অংশের অনুপাত প্রথম ছবির অনুপাতের দ্বিগুণেরও বেশি।
প্রথম ছবির কালো আর সাদা অংশের অনুপাত

$$\frac{৩\sqrt{৩}}{৪\pi - ৩\sqrt{৩}} = ০{\cdot}৭০৫ \text{ (প্রায়)}$$

আর, দ্বিতীয় ছবির কালো ও সাদা অংশের অনুপাত

$$\frac{\pi}{৩\sqrt{৩} - \pi} = ১{\cdot}৫২৯ \text{ (প্রায়)}$$

ওপরের 'π' চিহ্নটি যে গ্রিক বর্ণমালার একটি হরফ তা বোধ হয় তোমরা জানো।
এই বর্ণটির উচ্চারণ হল 'পাই' এবং এর মান আনুমানিক $\frac{২২}{৭}$।
উত্তর দুটো দেখে তোমরা একটা ব্যাপার স্পষ্ট বুঝতে পারছ যে, কালো ও সাদা অংশের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কখনওই বৃত্তের ব্যাসের মাপ বা ত্রিভুজের বাহুর মাপের ওপরে নির্ভর করে না। তাই প্রশ্নে দেওয়া ১০ একক মাপটি ব্যবহার না করেও তোমরা এই উত্তর বের করতে পারো।
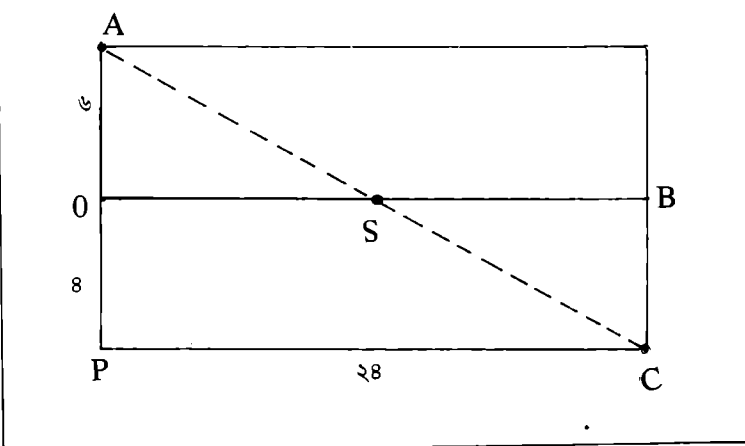
কবে ধরা দিল আকাশের বিদ্যুৎ

প্রদীপচন্দ্র বসু

পৃথিবীতে এখন যেসব বড়-বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র দিনরাত অবিরাম বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছে, তার শুরু টার্বো জেনারেটর দিয়ে। মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্য অদূর ভবিষ্যতে কি মহাকাশেও স্থাপন করা হবে বিদ্যুৎ-কেন্দ্র ?

ফোটো : তপন দাশ

রাত নয়, মধ্যদুপুর। তবু যেন অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। ওই মেঘ কৃষ্ণবর্ণ, ভারীও। যেন ঝুলে পড়েছে পৃথিবীর ওপর। প্রাচীন গ্রিসের আদিম অধিবাসীরা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে ভয়ের চোখে তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। এর পর কী হবে ? হঠাৎ একটা তীব্র আলোর ঝলসানো রেখা এঁকেবেঁকে চোখের নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে দিল কালো আকাশের ক্যানভাস। চোখ ধাঁধিয়ে দিল সকলের। তারপরই কানে তালা ধরানো বজ্রপাতের গুম গুম আওয়াজ। সংবিৎ ফিরে পেতে মানুষগুলি তাকালেন পরস্পরের দিকে। কেন কালো আকাশের বুকে এই অকস্মাৎ আলোর ঝলক ? কেনই বা ওই গুম গুম শব্দ ? সেদিন তাঁদের বুদ্ধি খুঁজে পায়নি এসবের কারণ। সরল মনে তাঁরা ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই ঈশ্বর কুপিত হয়েছেন। সেজন্যই হয়তো তাঁদের দিকে ছুড়ে দিচ্ছেন আলোর বর্শা। শব্দের বাণ।

এই গ্রিস দেশের অধিবাসীরাই প্রথম জানতে পারেন বিদ্যুতের অস্তিত্ব। এক গ্রিক দার্শনিক খ্রিস্টের জন্মের ৬০০ বছর আগে লক্ষ করেছিলেন যে, তৈল স্ফটিককে (অ্যাম্বার) সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়। ঘষার পর তৈল স্ফটিকটি কাছের যে-কোনও হালকা জিনিস যেমন কাগজ, পালক বা কাপড়ের টুকরোকে কাছে টেনে নেয়। থেলস অব মিলেটাস আবিষ্কৃত এই ঘর্ষণজনিত টান, যা আসলে চৌম্বক শক্তির প্রতিক্রিয়া, কয়েক শতাব্দী ধরে আদিম মানুষের কাছে খেলার বিষয় ছিল।

চুম্বকের কথা মানুষ প্রথম জানতে পারে চুম্বক-পাথরের মাধ্যমে। বহু শতাব্দী আগে ক্রিট-এ ম্যাগনাস নামে এক বৃদ্ধ মেষপালক ছিলেন। উইলো কাঠের একটা লাঠি হাতে তিনি মেষদের শাসন করতেন। লাঠির ডগাটা ছিল লোহা দিয়ে বাঁধানো। একদিন ওই লাঠির ডগা দিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে পাথরের টুকরো সরাতে গিয়ে দেখলেন একটা টুকরো লোহার সঙ্গে লেগে উঠে এল। এই পাথর, আসলে যা 'লোডস্টোন', তাতে আছে অম্লজানযুক্ত লোহা। গ্রিস ছাড়াও উত্তর আমেরিকা ও সুইডেনে এই পাথর পাওয়া যায়। লোহার সংস্পর্শে এসে লোডস্টোনের চৌম্বক প্রতিক্রিয়া হয়। ম্যাগনাস তা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন বলে এই প্রতিক্রিয়ার নাম দেওয়া হয় 'ম্যাগনেটিজ্‌ম'। এই ম্যাগনেটিজ্‌ম থেকেই 'ম্যাগনেট' বা 'চুম্বক' শব্দটির সৃষ্টি।

গ্রিসের ম্যাগনেশিয়া অঞ্চলে যে লোডস্টোন প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল, উইলিয়াম গিলবার্টের গবেষণায় তা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। রানি প্রথম এলিজাবেথের চিকিৎসক গিলবার্ট সর্ব প্রথম চুম্বক নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গবেষণা শুরু করেছিলেন। লোডস্টোনের তৈরি একটি গোলাকৃতি বল এবং দণ্ডের ওপর বসানো লোহার সুচ নিয়ে গবেষণা করতে-করতে গিলবার্ট প্রথমে বের করেন চুম্বকের দুই মেরু। এভাবেই তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পুরো পৃথিবীটাই এক গোলাকৃতি চুম্বক এবং পৃথিবীরও দুই চুম্বক মেরু আছে। চুম্বকের সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তির সম্পর্ক বের করতে গিলবার্ট 'ইলেকট্রোস্কোপ' নামে একটি যন্ত্র তৈরি করেন। এই ইলেকট্রোস্কোপ তৈরি ও গিলবার্টের বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণায় অন্যান্য অগ্রগতি সে-সময় আরও অনেক মানুষকে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণায় উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু ১৭ শতক পর্যন্ত এই গবেষণায় সেরকম অগ্রগতি হয়নি।

১৭ শতকে বিদ্যুতের গবেষকরা প্রথম উদ্যোগী হন 'স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি' বা 'স্থির বিদ্যুৎ' উৎপাদনে।

ইলেকট্রোস্ট্যাটিক তরঙ্গ তৈরির প্রথম 'ঘর্ষণ যন্ত্র' বা 'ফ্রিকশন মেশিন' তৈরি করেন অটো ভন গুয়েরিক। জার্মান পদার্থবিদ ও এঞ্জিনিয়ার গুয়েরিক এয়ার পাম্প তৈরির জন্যও প্রযুক্তির জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। গুয়েরিকের তৈরি ফ্রিকশন মেশিন উৎপাদিত স্থির বিদ্যুৎকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর কাজে প্রথম সফল হন ইংরেজ গবেষক স্টিফেন গ্রে। ১৭২০ সালে গ্রে-র সাফল্যকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান জিন থিওফিল দেসাগিলারস। কোন-কোন বস্তুর মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তিকে প্রবাহিত করা যায়, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক 'কন্ডাক্টর'-কে প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন থিওফিল, ১৭৩৬ সালে। স্থির বিদ্যুৎকে প্রবহমাণ করার পাশাপাশি সংরক্ষণের উদ্যোগও শুরু হয়েছিল সেই সময়। এ-কাজে প্রথম সফল হন হল্যান্ডের লেডেন শহরের এক ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম পিটার ভ্যান মেসেনব্রুক। ১৭৪৫ সালে মেসেনব্রুক যে বিদ্যুৎ সংরক্ষণের আধার তৈরি করেছিলেন, তাকে অনেকে মজা করে বলল, 'মিস্টার মেসেনব্রুকস ওয়ান্ডারফুল বটল'। এই 'বটল', যার বৈজ্ঞানিক নাম 'লেডেন জার', আসলে ছিল একটা বড়সড় কাচের বোতল, যার ভেতর ও বাইরের দেওয়াল টিন বা সিসার পাত দিয়ে মোড়া থাকত। বোতলের ভেতরে থাকত বিদ্যুৎসঞ্চারী ধাতব পাতে মোড়া অপরিবাহী কাচ। আজকের রেডিও, টিভিতে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল কনডেনসারের পূর্বসুরি এই লেডেন জার। আর, ঘর্ষণ বিদ্যুৎ তৈরির প্রথম যন্ত্রের নাম ছিল উইমসহার্স্ট মেশিন।

বিদ্যুৎ নিয়ে ১৮ শতকের মাঝামাঝি সবচেয়ে চমকপ্রদ আবিষ্কার করেছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। 'বাইফোকাল' চশমার আবিষ্কর্তা এবং লেখক ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন মাটির ওপর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিনে তৈরি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ আর আকাশের বিদ্যুচ্চমক সমধর্মী। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক, বিদ্যুতের এই শ্রেণীবিভাগ এবং বিদ্যুৎকে যে সঠিক পরিবাহী ব্যবস্থার মাধ্যমে যে-কোনও দিকে পাঠানো যায়, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন মানুষকে তাও প্রথমে জানান। আকাশের বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণায় বেঞ্জামিনের ঘুড়ি উড়িয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে আছে।

বিদ্যুৎ-গবেষকরা প্রথম তৈরি করেছিলেন স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। ১৮ শতকের শেষ পর্যায়ে দুই ইতালীয় বিজ্ঞানী প্রথম 'কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি' তৈরি করেন। ইংরেজি 'কারেন্ট' শব্দের অর্থ 'স্রোত'। যে বিদ্যুৎ স্থির না হয়ে থেকে স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়, তাকে বলে 'কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি'। ইতালীয় দুই বিজ্ঞানীর একজন ছিলেন লুইগি গ্যালভানি, অন্যজন আলেকজান্দ্রিও ভলতা। জীবদেহে বিদ্যুতের উপস্থিতি এবং তার প্রবাহ নিয়ে 'গ্যালভানিজ্‌ম' তত্ত্ব। ভলতা তৈরি করেছিলেন ভলতায়িক সেল, যা থেকে আজকের বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সৃষ্টি। বেশ কয়েকটি দস্তা ও তামার চাকতি পরপর সাজিয়ে তার মধ্যে নুনজলে ভেজানো পিচবোর্ড রেখে তারপর দুই প্রান্ত ধাতব তার দিয়ে জুড়ে প্রথম তৈরি হয়েছিল ভলতায়িক সেল।

প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে ব্যাটারির সাহায্যে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন রীতিমত খরচের ব্যাপার। তা ছাড়া এই বিদ্যুৎ সেরকম জোরালোও নয়। এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় বিদ্যুৎ-চুম্বক আবিষ্কারের পর।

ডেনমার্কের পদার্থবিজ্ঞানী হ্যান্স ওরস্টেড ১৮২০ সালে বিদ্যুৎ-চুম্বক তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করলে পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে শোরগোল পড়ে যায়। তাঁর আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে গরিব কর্মকারের ছেলে মাইকেল ফ্যারাডে তৈরি করেন 'ডায়নামো'। মাত্র ১৩ বছর বয়সে অভাবের তাড়নায় বই বাঁধাইয়ের কাজ শুরু করার পর ফ্যারাডের নেশা ছিল প্রতিটি বই বাঁধাইয়ের আগে একবার পড়ে ফেলা। এভাবেই একটা বই পড়ে ওরস্টেডের আবিষ্কারের কথা জানতে পারেন ফ্যারাডে। জানার পর থেকেই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, চুম্বক দিয়ে কেন বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা যাবে না। এই ভাবনা মাথায় রেখে ফ্যারাডে ডায়নামো তৈরির কাজে হাত দেন।

ফ্যারাডে ডায়নামো তৈরির আগেই ফরাসি পদার্থবিদ ডমিনিক ফ্রাসোয়াঁ জঁ আরাগঁ ও তাঁর সহকর্মী আদ্রেঁ মেরি অ্যামপিয়ার চৌম্বকত্ব ও বিদ্যুতের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ফ্যারাডে প্রথম দেখালেন যে, চৌম্বকত্ব, বিদ্যুৎ ও গতির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। ফ্যারাডে ডায়নামো তৈরি করার পর ধীরে-ধীরে বিদ্যুৎ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। আজ যে আমরা নানারকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছি, তার মূলে আছে ফ্যারাডের ডায়নামো। বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ফ্যারাডের স্মরণীয় নানা অবদান আছে। বেতার তরঙ্গের আবিষ্কার, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরির প্রবর্তন, ইলেকট্রোড নির্মাণ, 'আয়ন' ও 'ক্যাথোড', 'অ্যানোড' ইত্যাদি শব্দের স্রষ্টাও এই ফ্যারাডে। ডায়নামো তৈরির অব্যবহিত পরেই তৈরি হয় ইলেকট্রিক মোটর। ডায়নামোতে একটি অশ্বখুরাকৃতি চুম্বকের মধ্যে তারের 'কয়েল' বা 'আরমেচার' ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয়, আর ইলেকট্রিক মোটরে বিদ্যুতের সাহায্যে কয়েল ঘোরানো হয়। ১৯ শতকের গোড়ার দিকে পশ্চিম ইউরোপে শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ে গবেষণা আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ১৯ শতকের শেষের দিকে বিদ্যুতের ব্যবহার আধুনিক মানবসভ্যতার বিকাশে অপরিহার্য হয়ে উঠতে শুরু করে। এর আগে ১৮০২ সালে সার হামফ্রে ডেভি প্রথম 'আর্ক ল্যাম্প' তৈরি করেন। এর পর টমাস আলভা এডিসন গবেষণা করেন ইনক্যানডেসেন্ট লাইট বাল্ব নিয়ে, যা আমরা প্রতি ঘরে লাগাই। ১৮ শতকের শেষে মার্কারি ভেপার ল্যাম্প তৈরি হয়। এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৮৮২ সালে নিউ ইয়র্কের পার্ল স্ট্রিটে প্রথম বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন।

ব্যাটারি, ব্যাটারির পর ডায়নামো এবং তারপর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল জেনারেটর।

এ-কাজে প্রথম উদ্যোগী হন সুইস অঙ্কবিদ লিওনার্দ ইউলার ও তাঁর পুত্র অ্যালবার্ট। তাঁদের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদনের টারবাইনটি তৈরি করেন ফরাসি প্রযুক্তিবিদ বেনোরেত ফর্নিরন। বাষ্পচালিত টারবাইন তৈরি করেছিলেন সুইডিশ এঞ্জিনিয়ার গুস্তা প্যাট্রিস দে লাভাল। নিজের তৈরি টারবাইনের সঙ্গে ইলেকট্রিক জেনারেটর জুড়ে গুস্তা-ই প্রথম জানালেন বিদ্যুতের বাণিজ্যিক উৎপাদনে টার্বো জেনারেটরের ব্যবহার কীভাবে আমাদের সামনে খুলে দেবে নতুন দিগন্ত। পৃথিবীতে এখন যেসব বড়-বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র দিনরাত অবিরাম বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছে, তার শুরু গুস্তা-র 'টার্বো জেনারেটর' দিয়ে। বাষ্পচালিত টারবাইনের পর তৈরি হয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলশক্তি চালিত টারবাইন। তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রে কয়লা বা জ্বালানি তেল বয়লারে পুড়িয়ে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয় টারবাইন চালানোর জন্য। অন্যদিকে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রে জল ওপর থেকে প্রচণ্ড বেগে টারবাইনের ব্লেডে আঘাত করে একে ঘুরিয়ে দেয়। পরমাণু বিভাজনের সাহায্যে তাপ উৎপন্ন করে জলকে বাষ্পীভূত করে টারবাইন ঘোরানো হয় পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে। গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জ্বালানি গ্যাস বা ন্যাপথাকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। শোনা যাচ্ছে, পৃথিবীর মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্য অদূর ভবিষ্যতে নাকি মহাকাশেও স্থাপন করা হবে বিদ্যুৎ-কেন্দ্র।

আকাশে রকমারি বিদ্যুচ্চমক

স্ট্রিক লাইটনিং : দাগদাগ ঝলমলে বিদ্যুৎ রেখা।
ফর্কড লাইটনিং : কাঁটাচামচের কাঁটা বা গাছের শাখার মতো দেখতে।
শিট লাইটনিং : চতুর্দিকে বিস্তৃত বিদ্যুচ্চমক।
জিগজ্যাগ লাইটনিং : আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ রেখা।
চেন লাইটনিং : আকস্মিক বিদ্যুৎ রেখা, দেখতে শিকলের মতো।
লিডেড লাইটনিং : পূর্বগামী বিদ্যুৎ রেখার চমক।
বল লাইটনিং : গোলাকৃতি উজ্জ্বল বিদ্যুচ্চমক।

অপ্রচলিত বিদ্যুৎশক্তি

সৌর বিদ্যুৎ : ফোটোভলতায়িক কোষের মাধ্যমে সূর্যশক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করে সেই বিদ্যুৎ বহুরকম কাজে লাগানো হচ্ছে। সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে বলে ফোটোভলতায়িক কোষকে সৌরকোষও বলে।
বায়ু-বিদ্যুৎ : বায়ু-বিদ্যুৎ তৈরি হয় হাওয়া কল থেকে। এই হাওয়া কলে থাকে দুটি বা তিনটি ব্লেড ও একটি রোটর। এই রোটরের সঙ্গে জেনারেটর যুক্ত করলে সহজেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।
ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র : আজকাল খুব ছোট-ছোট টারবাইন তৈরি করে ঝরনা বা জলপ্রপাতের ধারার নীচে বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। ব্যবহার করা হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ, জোয়ার-ভাটা।
আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ : আবর্জনা জাতীয় জৈব পদার্থ সরাসরি পুড়িয়ে বাষ্প তৈরি করে টার্বোজেনারেটর চালিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।
ভূ-তাপ শক্তি : অনেক জায়গায় মাটির নীচে গরম বাষ্প পাওয়া যায়। এই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব।
ম্যাগনেটো হাইড্রো ডায়নামিক্স: এই পদ্ধতিতে কয়লার গরম গ্যাস সরাসরি উচ্চ শক্তির চুম্বকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
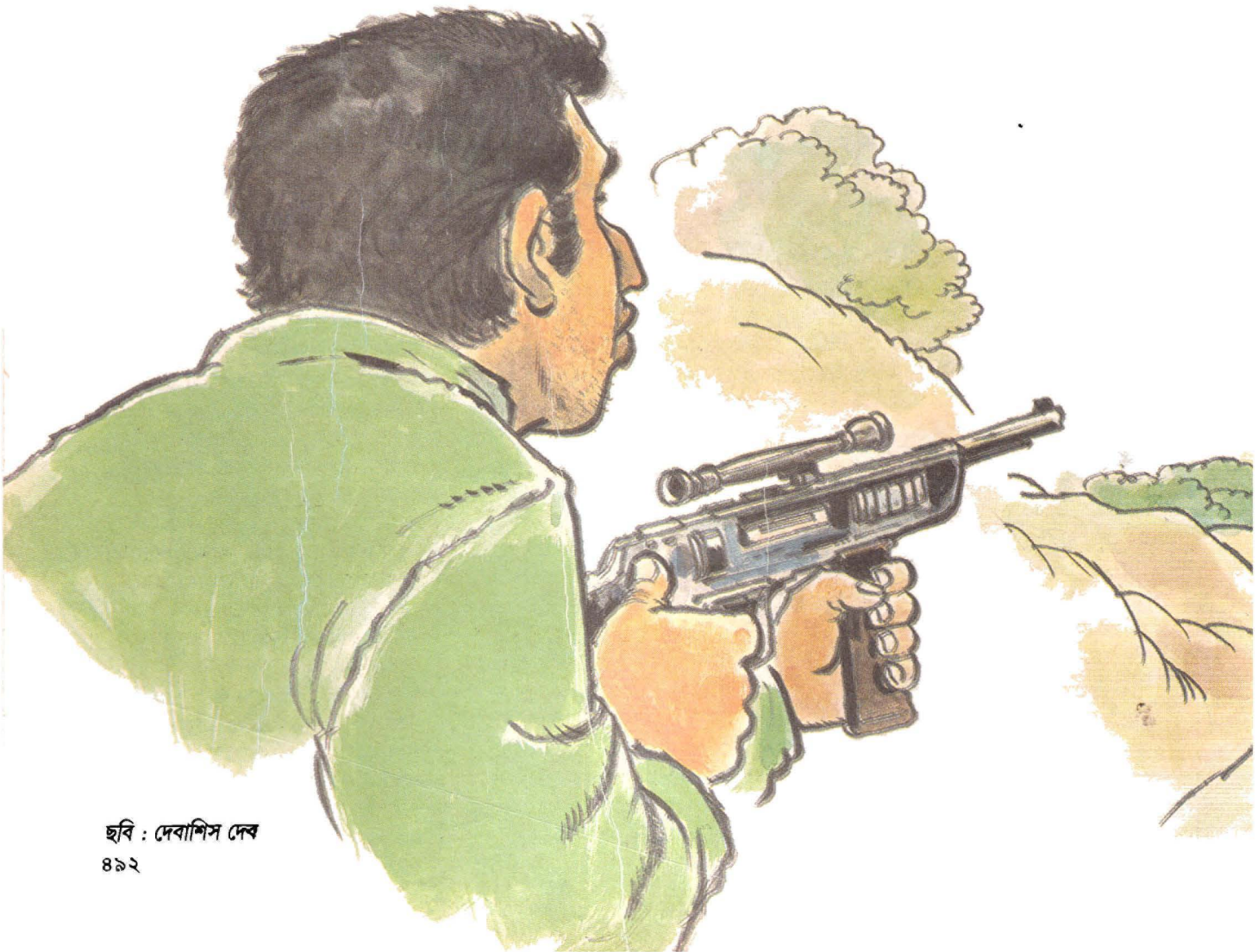
ছবি : দেবাশিস দেব
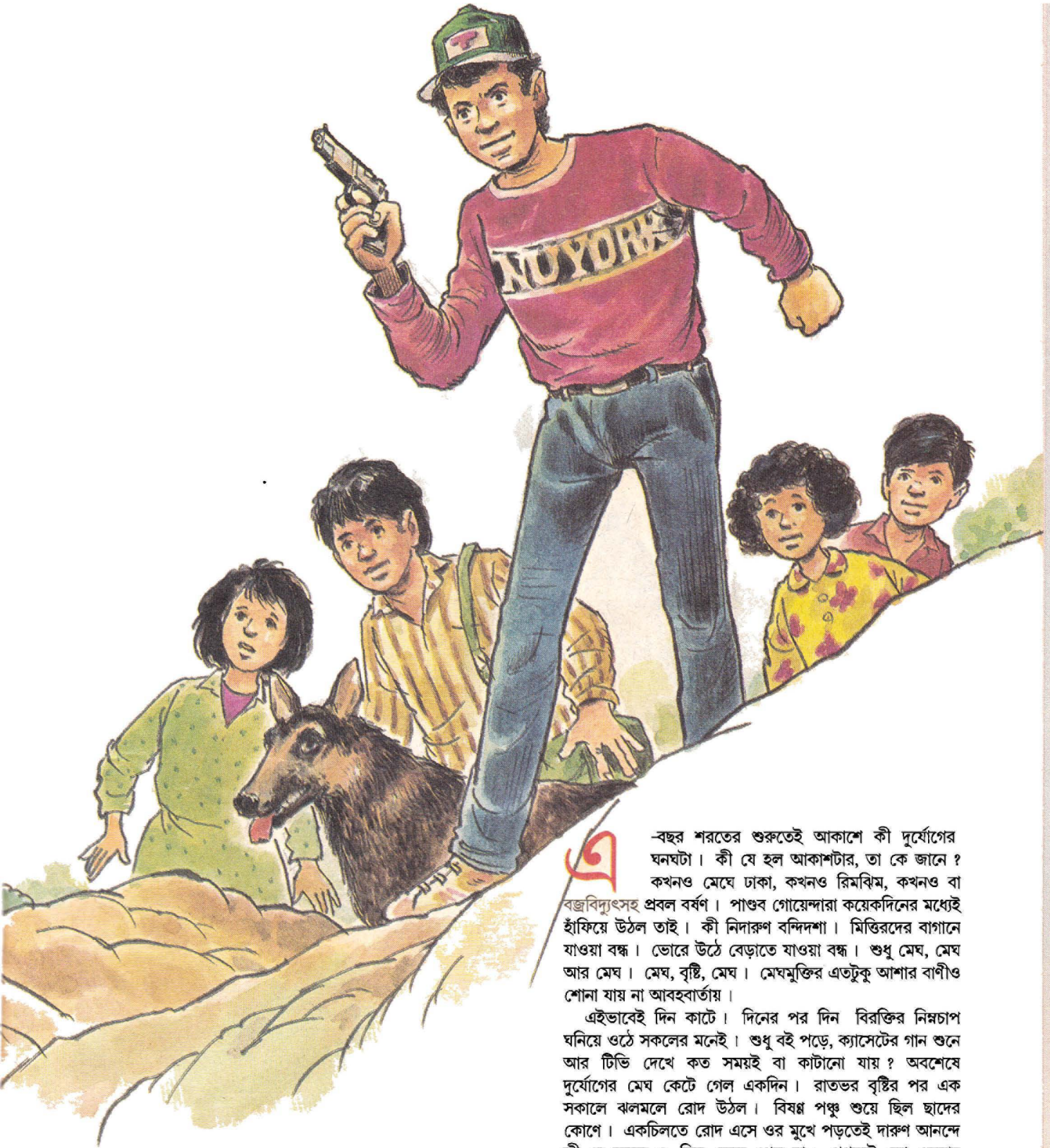
এ-বছর শরতের শুরুতেই আকাশে কী দুর্যোগের ঘনঘটা। কী যে হল আকাশটার, তা কে জানে? কখনও মেঘে ঢাকা, কখনও রিমঝিম, কখনও বা বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষণ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা কয়েকদিনের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠল তাই। কী নিদারুণ বন্দিদশা। মিত্তিরদের বাগানে যাওয়া বন্ধ। ভোরে উঠে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ। শুধু মেঘ, মেঘ আর মেঘ। মেঘ, বৃষ্টি, মেঘ। মেঘমুক্তির এতটুকু আশার বাণীও শোনা যায় না আবহবার্তায়।

এইভাবেই দিন কাটে। দিনের পর দিন বিরক্তির নিম্নচাপ ঘনিয়ে ওঠে সকলের মনেই। শুধু বই পড়ে, ক্যাসেটের গান শুনে আর টিভি দেখে কত সময়ই বা কাটানো যায়? অবশেষে দুর্যোগের মেঘ কেটে গেল একদিন। রাতভর বৃষ্টির পর এক সকালে ঝলমলে রোদ উঠল। বিষণ্ণ পঞ্চু শুয়ে ছিল ছাদের কোণে। একচিলতে রোদ এসে ওর মুখে পড়তেই দারুণ আনন্দে কী যে করবে ও, কিছু ভেবে পেল না। প্রথমেই তো একবার লাফিয়ে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে দেহটা টান করে নিল। তারপর

ছাদের ঘেরাটার ওপর পা রেখে শাঁখের মতন মুখটাকে তুলে দু'চোখ ভরে দেখে নিল সুয্যি ভগবানকে। পরক্ষণেই ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দ্রুত নেমে এল বাবলুর ঘরে।

বাবলু তখনও ঘুমোচ্ছিল। পঞ্চুর ইচ্ছে হল না ওর ঘুমটাকে ভাঙায়। তবুও উত্তেজনাকে চেপে রাখতে না পেরে ঘনঘন লেজ নেড়ে ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

বাবলুর ঘুম তো সজাগ। তাই চোখ মেলে তাকিয়েই পঞ্চুকে দেখে উঠে বসল সে। বলল, "তোর আবার কী হল? অমন করছিস কেন? বাড়িতে অতিথি এসেছে বুঝি?"

পঞ্চু আনন্দে ওর পাজামা কামড়ে টান দিল।

মা ছিলেন পাশের ঘরে। এ-ঘরে এসে বললেন, "কে আবার আসবে? কতদিন পরে আজ একটু রোদের মুখ দেখেছে ও, তাই অমন করছে।"

বাবলুর যেন অবিশ্বাস্য মনে হল কথাটা। বলল, "রোদ উঠেছে! কই, দেখি?" বলেই তরতরিয়ে ছাদে উঠল।

পঞ্চুও চলল ওর পিছু-পিছু।

সত্যিই তো! বাবলু দেখল নির্মেঘ আকাশে কত পাখি উড়ছে। চারদিকের বৃষ্টিস্নাত গাছের পাতায় নতুন রোদ চিকচিক করছে। প্রতিবেশীদের গাছে শিউলি ফুটেছে কত। হলুদ বোঁটার দুধ-সাদা ফুলগুলি যেন নিষ্পাপ শিশুর মতো হাসছে। কী চমৎকার!

বাবলু নীচে নেমে বাথরুমের কাজ সেরে ঘরে এসে বসতেই ওর মা চা-বিস্কুট আর গরম হালুয়া খেতে দিলেন ওকে। পঞ্চু হালুয়ার খুব ভক্ত, তাই একটু বেশি পরিমাণেই দিলেন।

কাগজওলা এসে খবরের কাগজ দিয়ে গেল।

আর ঠিক তখনই বাইরে একটি স্কুটারের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ যেন স্কুটার থামিয়ে নামল ওদের গেটের কাছে। কে এল?

বাবলু পঞ্চুকে বলল, "দ্যাখ তো রে, কে?"

পঞ্চু একছুটে বেরিয়ে গিয়েই ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে মাতিয়ে দিল চারদিক। পরক্ষণেই কুঁই-কুঁই। বাবলু বুঝল, এ তো বিরক্তির নয়, এ যে আনুগত্যের সুর। কে এল?

যে এল সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল দরজার কাছে। তার পরনে জিন্‌স-এর প্যান্ট, টাওয়েল গেঞ্জি। বিনুনি বাঁধা চুল। চোখে সানগ্লাস। হাতে একগোছা রংবাহারি ফুল। মুখে রহস্যের হাসি। দরজা ঠেলেই সে বলল, "ভেতরে আসতে পারি?"

বিস্মিত বাবলু বলল, "শুধু আসতে নয়, বসতেও পারেন।"

"ধন্যবাদ।" বলে আসন গ্রহণ করেই বলল, "তবে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থাটা একটু ভাল করেই করবেন কিন্তু।"

"চেষ্টা করব।"

এইবার প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সে বলল, "যত শীঘ্র সম্ভব এই কাগজটাতে একটা সই করে দিন।"

বাবলু বলল, "আমি তো সই করতে পারি না। টিপসই চলবে?"

সে একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "চলবে। অ্যাক্‌সেপ্ট করলাম।"

বাবলু কাগজের লেখাটা পড়ে একটু মুচকি হেসে বলল, "জাস্ট এ মিনিট। স্ট্যাম্পপ্যাডটা কোথায় আছে দেখি আগে।"

"ওটা পরে দেখলেও হবে। এখনই হাতের কাছে না পেলে পরে দোকান থেকে আনিয়ে টিপ্পাটা দিয়ে দেবেন।"

"খুব ভাল কথা। কিন্তু এতবড় একটা সারপ্রাইজের পর অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারটা কীরকম আশা করেন একটু জানতে পারি কি?"

"বেশি কিছু নয়, এই ধরুন ডবল ডিমের ওমলেট, সঙ্গে টোস্ট, আপনাদের বাড়ির বিখ্যাত হালুয়া আর তার সঙ্গে সন্দেশ খানিকটা করে পেলে মন্দ হত না।"

"আর কিছু?"

"দুপুরে শুধু মাংস-ভাত হলেই চলবে।"

এমন সময় মা ঘরে ঢুকেই অবাক! বললেন, "কী ব্যাপার বিচ্ছু! তুই হঠাৎ এইরকম সাজলি কেন? তোকে যে চেনাই যাচ্ছে না!"

বাবলু আনন্দের আবেগে বলল, "জানো মা, কী করেছে দুষ্টুগুলো? এই দ্যাখো!" বলে কাগজটা মা'র দিকে এগিয়ে দিল বাবলু।

মা কাগজে চোখ বুলিয়েই অবাক, "ওরে বাবা! এর তো অনেক দাম।"

মায়ের কথা শেষ হতে-না-হতেই বিলু, ভোম্বল আর বাচ্চু ঘরে ঢুকল।

বাচ্চু বলল, "কিন্তু মাসিমা, আমাদের কাছে বাবলুদা যে এই তুচ্ছ জিনিসের চেয়েও অনেক—অনেক বেশি দামি।"

বাবলু বলল, "সত্যি, পারিসও বটে তোরা! কই দেখি কেমন জিনিস কিনেছিস।"

ওরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেটের কাছে এসে হাল্‌কা ধরনের লাল রঙের ছোট্ট স্কুটারকে দেখল। মা-ও দেখলেন। বাবলুর তো মন ভরে গেল স্কুটার দেখে। বলল, "এমন একটা গিফ্‌ট যে তোদের কাছ থেকে পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি।"

পঞ্চুরও আনন্দ কম নয়। তাই সে ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি, গড়াগড়ি কত কী করতে লাগল।

বিলুর হাতে একটা সন্দেশের বাক্স ছিল। সেটা সে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "বাবা এনেছেন। অফিসের কাজে কোথায় যেন গিয়েছিলেন, আমাদের জন্য বাক্স-ভর্তি সন্দেশ নিয়ে এসেছেন।"

বাবলু বলল, "কিন্তু স্কুটার। ওটা কখন এল?"

ভোম্বল বলল, "বলছি, বলছি, সব বলছি। এটাকে আগে দালানে ঢোকাই, তারপর খেতে-খেতে বলছি সব।"

মা ভেতরে গেলেন।

ওরা চাকা থেকে অল্প-অল্প কাদার দাগ মুছে দালানে ঢোকাল স্কুটারটাকে। তারপর বাবলুর ঘরের সোফায় আরাম করে গুছিয়ে বসে হাসি-হাসি মুখে ওর দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "এবারে বল, ব্যাপারটা কী?"

বিলু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়। এই তো সেদিন আমাদের পঁচিশতম অভিযান শেষ হল। তাই আমরা মনে-মনে ভাবছিলাম এই উপলক্ষে আমাদের তরফ থেকে তোকে কিছু দেওয়া যায় কি না। আমরা ঠিকই করেছিলাম ২৫ ফাল্গুন তোর জন্মদিনে তোকে একটা স্কুটার উপহার দেব। ইতিমধ্যে বাচ্চু, বিচ্ছুর বাবা কাল ওই দুর্যোগেও ওদের জন্য একটা স্কুটার কিনে এনেছেন। সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়িতে ফোন। আমরা চারজনে যুক্তি করলাম এই স্কুটারটাই তোকে উপহার দেওয়ার। কিন্তু তোর জন্মদিনে এই উপহার দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই আজই এটা তোর হাতে তুলে দিলাম। মনে কর, এটা আমাদের শারদ শুভেচ্ছা।"

বাবলু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। বলল, "একটা স্কুটারের শখ যে আমার কতদিনের, তা কী বলব! কিনব-কিনব করে কিছুতেই কেনা আর হয়ে উঠছিল না। তাই তোদের এই ভালবাসার দান আমি যে কোথায় রাখব ভেবে পাচ্ছি না।"

মা ততক্ষণে ওদের জন্য সবকিছুই করে এনেছেন। টোস্ট, ওমলেট, হালুয়া, চা, সেইসঙ্গে বিলুর আনা সন্দেশ।

ভোম্বল খেতে-খেতেই বলল, "স্কুটার তো হল। ভয়ঙ্কর দুর্যোগের ভেতর দিয়েই এল এটা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল এই সাতসকালবেলায় ফুল পাওয়া। বৃষ্টির জন্য ক'দিন জগন্নাথঘাটে ফুলের আমদানি একদম ছিল না
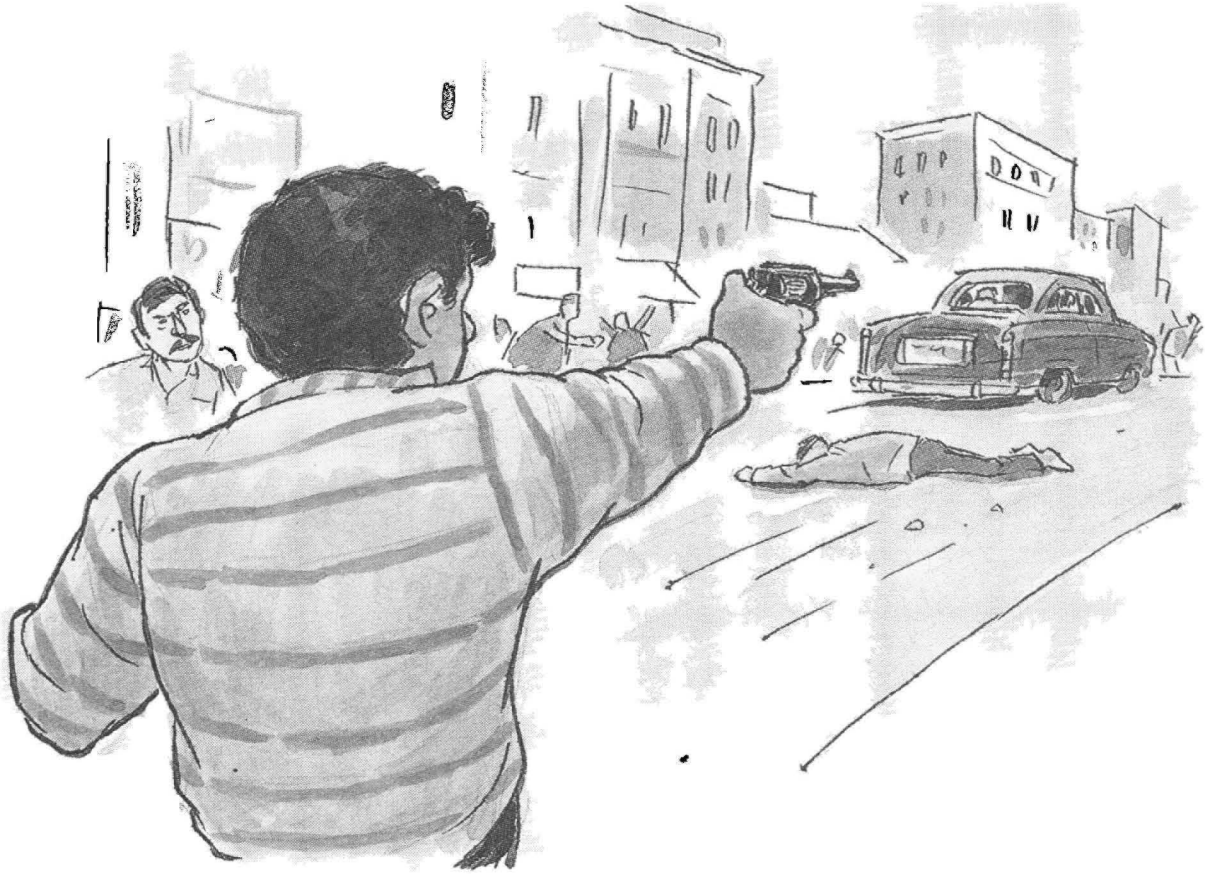
বলে আমাদের পাড়ার বনমালীদা কাল রাতে কোলাঘাটে গিয়েছিলেন ফুল আনতে। ভোরে ফুলের গাদা নিয়ে পাড়ায় ঢুকতেই পড়বি তো পড় আমার চোখে। একেই বলে কপাল! কোনও দরদাম নয়, হাতের কাছে যা পেলাম তুলে নিলাম। না হলে এই দুর্যোগে রজনীগন্ধার মালা, গোলাপের তোড়া পাওয়া যায় কখনও।"

মা বললেন, "যাক, খুব ভাল হয়েছে। তোরা এক কাজ কর। জলটল খা। খেয়ে পঞ্চাননতলায় একটু পুজো দিয়ে আয়। এই ধরনের নতুন কিছু কিনলে পুজো না দিয়ে তা ব্যবহার করতে নেই।"

বিচ্ছু খেতে-খেতেই জিভ কেটে বলল, "এই যাঃ। আমি যে চেপে চালিয়ে নিয়ে এলাম এটাকে!"

"তাতে কী! ওতে চেপেও পুজো দিতে যেতে পারিস তোরা। মোট কথা পুজো একটা দেওয়া চাই।"

মায়ের কথামতো পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চাননতলায় চলল পুজো দিতে। সে কী আনন্দ ওদের। স্কুটারটাকে সবাই মিলে ধরাধরি করে গড়িয়ে নিয়ে চলল মন্দিরের দিকে। মন্দিরের পুরোহিতমশাই আচায্যিপাড়ার দাদু দক্ষিণা পেয়ে একটু ফুল-বেলপাতা স্কুটারে ছুঁইয়ে দিতেই বিচ্ছুকে নিয়ে বাবলু চেপে বসল তাতে।

বিলু, ভোম্বল আর বাচ্চু হাত উঁচিয়ে বলল, "স্টার্ট।"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

বাবলুর স্কুটার চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে।

অনেক পরে বিচ্ছুকে নিয়ে বাবলু যখন ফিরে এল তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু কেউ নেই।

বাবলু বলল, "ওরা আসেনি এখনও?"

মা বললেন, "কেন আসবে না? তোদের জন্য অপেক্ষা করে বসে-বসে এই সবে গেল। ওরা অবশ্য আসবে এখনই। আমি সবাইকে খেতে বলেছি আজ। ও-বাড়ির রঘুকে দিয়ে মাংস আনিয়েছি। কিন্তু তোদের এত দেরি হল কেন রে?"

বাবলু স্কুটার রেখে বলল, "বাঃ। হবে না? এই স্কুটার নিয়ে চারদিক ঘুরে এলাম আমরা।"

এমন সময় হঠাৎই ফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই বাবার কণ্ঠস্বর কানে এল ওর।

"কে, বাবলা। এই শোন, তোকে একটা কথা বলি…।"

বাবলু আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, "তার আগে তোমাকে একটা দারুণ খবর দিই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা আজ আমাকে একটা স্কুটার উপহার দিয়েছে।"

"বলিস কী রে!"

"হ্যাঁ বাবা।"

"নাঃ। ওরা দেখছি তোকে সত্যিই ভালবাসে। তবে খুব সাবধানে চলাফেরা করিস কিন্তু। নতুন স্কুটার হাতে পেয়ে যেন বেপরোয়া হয়ে যাস না। কলকাতায় একদম যাবি না। আর শোন, পরশু বিশ্বকর্মা পুজো। আমার এক বন্ধু চিত্তরঞ্জনে থাকেন। ভদ্রলোক রেলের একজন পদস্থ অফিসার। ওখানে সুন্দরপাহাড়িতে নতুন বাংলো পেয়েছেন। আমাকে বিশেষ করে যেতে বলেছেন ওঁর ওখানে। তুই ইচ্ছে করলে তোর দলবল নিয়ে চলে আসতে পারিস। খুব ভাল লাগবে জায়গাটা। চারদিকে ছোট-ছোট টিলা, পাহাড়। অনেক গাছপালাও আছে। সবুজে ভরা চারদিক। এখান থেকে কল্যাণেশ্বরী, মাইথনও খুব একটা দূরে নয়। এই সুযোগে সেগুলোও দেখা হয়ে যাবে। তা

ছাড়া চিত্তরঞ্জনের বিশ্বকর্মা পুজো খুব বিখ্যাত। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপের নাম শুনেছিস তো ? রেল এঞ্জিন তৈরি হয় সেখানে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ওই কারখানারতেও সর্বসাধারণের জন্য অবারিত দ্বার। বহু দূর-দূরান্তের লোকও ওইদিন বিশ্বকর্মা পুজো দেখতে ওখানে আসে। তোরাও আয়।"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "অবশ্যই যাব। তুমিও যাবে তো বাবা ?"

"চেষ্টা করব। আমি ফোনে বন্ধুকে বলে রাখছি। তোদের কোনও অসুবিধে হবে না। উত্তর সুন্দরপাহাড়ি। বিষ্ণু প্রধানের বাংলো। ওঁর ছেলের নাম জয়দীপ। এই মনে রাখলেই হবে।"

বাবলু বলল, "আমরা যদি যাই কীভাবে যাব তা হলে ?"

"যদি কেন ? যেভাবে ইচ্ছে চলে আসতে পারিস। যে কোনও ট্রেনে বর্ধমানে পৌঁছে বাসেও যাওয়া যায়। তা ছাড়া হাওড়া থেকে একটানা আসতে গেলে তুফান আছে। খুব ভাল সময়ে পৌঁছয়। ওতে অবশ্য ভিড় হয় খুব। আরও একটা গাড়ি আছে, সেটা রাত্রি দশটা পঁয়তাল্লিশে ছাড়ে, মোকামা প্যাসেঞ্জার। আসানসোলে ভোর। চিত্তরঞ্জনে সকাল। তবে গাড়িটা অত্যন্ত বাজে গাড়ি। আলো-পাখা থাকে না। ধিক-ধিক করে আসে। চুরি, ডাকাতি হয়।"

বাবলু বলল, "তা হলে ওই গাড়িতেই আমরা যাব। আচ্ছা বাবা, ওতে কি কোনও স্লিপার কোচ আছে ?"

"আছে। একটাই কোচ। রিজার্ভেশনও অলওয়েজ অ্যাভেলেবল।"

বাবলু ফোন রেখে মাকে সব বলল।

বিচ্ছু তো পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল সবই। সে হঠাৎ আনন্দের উচ্ছ্বাসে পঞ্চুকে এমন জড়িয়ে ধরল যে, পঞ্চু বেচারি অস্থির হয়ে উঠল একেবারে।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চুও এসে গেছে।

সবাই সব শুনে আহ্লাদে আটখানা।

বিলু বলল, "আজ রাতের গাড়িতে আমরা গেলে কাল সকালে নামব। জায়গাটা চিনে-বুঝে নিতে কালকের দিনটাই যথেষ্ট। পরশু বিশ্বকর্মা পুজো দেখে পরের দিন যদি চলে আসি তা হলে কিন্তু ছোট্টখাট্টোর ওপরে গ্র্যান্ড টুর হয়ে যাবে একটা।"

বাচ্চু বলল, "কল্যাণেশ্বরী, মাইথন এগুলো তা হলে যাব কখন ?"

বাবলু বলল, "ওরই মধ্যে একফাঁকে দেখে নেব।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, দু'জনেই বলল, "যাই, তা হলে বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।"

শুধু বাচ্চু, বিচ্ছু নয়, পঞ্চুও চলল ওদের সঙ্গে।

সবে কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় হঠাৎই ঘন-ঘন বোমা আর গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পাড়াটা। পরক্ষণেই একটা কালো অ্যাম্বাসাডার ওদের পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল।

সেই শব্দ শুনে বাবলু, বিলু, ভোম্বলও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। চারদিকে লোকজন হইহই করছে তখন। লোকমুখে শুনল ওদের এলাকার ব্যাঙ্কে এক ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেছে এইমাত্র।

বাবলু তো চুপ করে থাকবার ছেলে নয়, তাই সঙ্গে-সঙ্গে ওর পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে বিলু, ভোম্বলকে বলল, "তোরা একটু বোস, আমি একবার দেখি শয়তানরা কতদূরে গেল।"

মা শুনেই বাধা দিলেন, "খবরদার বলছি। এক পা-ও এগোবি না। ওরা অতি সাঙ্ঘাতিক।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চুও ফিরে এসেছে তখন। ওরাও বলল, "বাবলুদা যেয়ো না। ওরা কিন্তু অনেকজন।"

বাবলু বলল, "ওইরকম একটা গাড়িতে ছ'-সাতজনের বেশি নিশ্চয়ই নেই।" বলে কারও কথা না শুনে স্কুটার বের করেই স্টার্ট দিল।

বিলু, ভোম্বলও বলল, "নাই-বা গেলি বাবলু ! কী দরকার।"

বাবলু ততক্ষণে উধাও। শয়তানরা যে-পথে গেছে সেই পথ ধরে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল। খানিক আসার পরই দেখল রক্তাপ্লুত একজন লোক পথের ওপরে ছটফট করছেন। প্যান্ট-শার্ট-টাই পরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক একজন। বাবলু কাছে গিয়ে স্কুটার থামিয়ে নেমে দাঁড়াতেই চিনতে পারল। ইনিই তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জয়ন্তবাবু।

বাবলু ঝুঁকে পড়ে বলল, "এ কী, জয়ন্তদা ! আপনি ? আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি বাবলু।"

জয়ন্তবাবু যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। বললেন, "কে ? বাবলু ? তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে ভাই। ওরা বোধ হয় এখনও খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি। ওদের কথাবার্তা যা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে ওরা সম্ভবত জানা গেটের দিকে গেছে। তুমি ওদের পিছু নাও। আমি এক্ষুনি পুলিশে ফোন করছি।"

"কিন্তু আপনার এইরকম অবস্থায়…।"

"আঃ। দেরি কোরো না, যাও। আমার আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। ওরা আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে। তাই একটা দাঁত ভেঙেছে শুধু, আর লেগেছে খুব।"

ততক্ষণে জয়ন্তবাবুকে সাহায্য করবার জন্য ছুটে এসেছে অনেক লোক।

বাবলু দ্বিগুণ জোরে স্কুটার চালিয়ে বাকসাড়ায় জানা গেটের দিকে ছুটল।

জয়ন্তবাবুর অনুমানই ঠিক। জানা গেটের কাছেই দেখতে পাওয়া গেল গাড়িটাকে। রেলের লেভেল ক্রসিং-এ আটকেছে গাড়িটা। বাবলু একটু দূর থেকেই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে গাড়ির পেছনদিকের টায়ারে গুলি করল একটা। এক গুলিতেই ভটাস।

ভীত-সন্ত্রস্ত ডাকাতের দল তখন কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে লাফিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে। কিন্তু বাবলুকে ওরা দেখতে পেল না। কেননা ও তখন একটা গুমটির আড়ালে।

বিপদ বুঝে ডাকাতরা গাড়ি থেকে নেমেই ছোটা শুরু করল। ওদের একজনের হাতে চামড়ার একটি ভারী সুটকেস। অপরজনের হাতে ঝোলাভর্তি কী যেন। বাদবাকিদের হাতে রিভলভার। দলে ওরা ছ'জন।

বাবলু অভিজ্ঞ ছেলে। সে অনুমান করতে পারল ওই ঝোলার মধ্যে কী আছে বা থাকতে পারে। তাই একটুও দেরি না করে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে সেই ঝোলায় একটা গুলি করতেই ওদের সব চালাকির অবসান ঘটল। সে কী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। হাহাকার আর আর্তনাদে ভরে উঠল জায়গাটা। ধোঁয়ার ভাব একটু কাটলে দেখা গেল মারাত্মক রকমের জখম হয়ে পড়ে আছে দু'জন লোক। বাকিরা গা-ঢাকা দিয়েছে। যে-লোকটার হাতে বোমা ছিল তার অবস্থা বেশি খারাপ। অপরজন জখম অবস্থাতেও সুটকেস নিয়ে বুকে হেঁটে পালাবার চেষ্টা করছে।

বাবলু সদর্পে ওদের কাছে গিয়ে মুখের ঢাকা সরাতেই চিনতে পারল ওদের। ওরা বেশ কিছুদিন ধরে এ-পাড়ায় ঘুরঘুর করছিল। বাবলু একজনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি পিলখানার ওদিকে থাকো না ?"

লোকটি যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তোমাদের ব্যবস্থা পুলিশই করুক। আমি আমার কাজ করি।" বলে টাকা-ভর্তি সুটকেসটা ওদের কবলমুক্ত করে ওর স্কুটারে এসে বসল।

চারদিকে তখন অনেক লোক। অনেকেই বাবলুর পরিচিত।

বাবলু সবাইকে বলল, "পুলিশ হয়তো এখনই আসবে।

আপনারা ঘিরে থাকুন এদের। না হলে পালিয়ে যাবে।" বলে আর দেরি না করে টাকা নিয়ে ঝড়ের বেগে কিছু সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কে এসে হাজির হল।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জয়ন্তবাবু তখন ফিরে এসেছেন। তাঁকে ফার্স্ট এড দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তাঁকে। বাবলু সুটকেসটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বলল, "ভাল করে গুনে দেখুন জয়ন্তদা, সব ঠিকঠাক আছে কি না।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "সত্যি, কী বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাকে!"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এসে হাজির হয়েছে তখন। ওরা সবাই জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে চা-জলখাবার খাওয়ালেন। দুষ্কৃতীদের গুলিতে একজন গার্ড এবং নিক্ষিপ্ত বোমায় দু'জন কর্মচারী অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে, টাকাগুলো উদ্ধার হয়েছে। সকলের প্রশংসায় তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখ।

ওরা আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হল। যেতে-যেতেই বিলু বলল, "আজ আমাদের জীবনের একটা স্মরণীয় দিন, কী বল বাবলু?"

বাবলু বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জীবনে স্মরণীয় দিন বলে কিছু নেই। তবে বলতে পারিস আমাদের জীবনে আজ এক অবিস্মরণীয় দিন। এবং এর মূলে এই স্কুটারটা। এর নম্বর দেখেছিস? পরপর সাত। অর্থাৎ লাকি অ্যান্ড ট্রিপ্‌ল সেভেন। এটা না থাকলে কিন্তু কিছুই হত না।"

সবাই সবিস্ময়ে বলল, "তাই তো!"

ওরা যখন ঘরে ফিরল মা তখন ওদের জন্য হানটান করছেন।

॥ ২ ॥

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে জুটল মিত্তিরদের বাগানে। দুর্যোগের জন্য ক'দিন তো ঘর থেকেই বেরোতে পারেনি ওরা। তাই বাগানের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্কই ছিল না বলতে গেলে। শুধু রোজকার অভ্যাসমতো পঞ্চুই এসে একবার করে টহল দিয়ে যেত। আর আসত বাবলু। তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। অল্পসময় থেকেই চলে যেত।

বর্ষার পর বাগানের জঙ্গল আরও ঘন হয়েছে। কত যে আগাছা গজিয়েছে তার ঠিক নেই। তারই মধ্যে ওরা একটা জায়গা একটু পরিষ্কার করে বসল।

বিলু বলল; "আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে কী ঠিক করলি তা হলে?"

বাবলু বলল, "ভাবছি যাব না। মনটা ভেঙে গিয়ে যাওয়ার উদ্যমটা কেন জানি না নষ্ট হয়ে গেল।"

পঞ্চু এক জায়গায় ঘাসের ওপর শুয়ে এক চোখে পিটপিট করে দেখছিল ওদের। এবার কেমন যেন গলাটা করে ডেকে উঠল।

বাচ্চু বলল, "কত আশা করলাম আমরা।"

ভোম্বল বলল, "তোর বাবাকে কী বলবি তা হলে?"

বাবলু বলল, "যা ঘটনা তাই বলব।" বলেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল বাবলু।

বিলু বলল, "তোর যদি মন না চায় তা হলে যাস না। কিন্তু তুই কি কোনও বিপদের আশঙ্কা করছিস?"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "যদিও ওরা দলে মাত্র ছ'জন, তবুও ওদের পেছনে কোনও বড় মাথাও থাকতে পারে তো? তা ছাড়া ধরা পড়ল দু'জন, বাকি চারজন পলাতক। এই দু'জনকে যেমন আমি চিনেছি, তেমনই ওরাও চিনেছে আমাকে। আমাকে চেনা মানেই আমাদের প্রত্যেককে ওদের চেনা হয়ে গেছে। এখন পুরো দলটা যতক্ষণ না ধরা পড়ে ততক্ষণ আমাদের একটা দুশ্চিন্তা রয়েই গেল বইকী! অত টাকার ব্যাপার। ওদের ওই মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়ার বদলা কি ওরা নেবে না ভেবেছিস? তাই এই মুহূর্তে কোথাও যেতে মন চাইছে না।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা ঠিকই বলেছে রে! এখন আমাদের কোথাও না যাওয়াই উচিত।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা বাবলু, এই ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে ম্যানেজার জয়ন্তবাবুর কোনও কারসাজি নেই তো?"

বাবলু বলল, "হঠাৎ তোর এইরকম মনে হওয়ার কারণ?"

"ব্যাঙ্ক ডাকাতি যারা করে তাদের নজর ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা, লকারের গয়না, এইসবের ওপরই থাকে। কিন্তু যাওয়ার সময় ম্যানেজারকে তুলে নিয়ে যায় এমন তো কখনও শুনিনি ভাই।"

বাবলু বলল, "তোর ধারণাটা ঠিক। তবে কিনা, যেহেতু জয়ন্তবাবু, তাই ব্যাপারটা ওইরকম হয়নি। জয়ন্তবাবুকে আমরা চিনি। উনি কখনওই ওইরকম কাজ করবেন না। তা ছাড়া এই ব্যাপারে উনি জড়িত থাকলে ভুলেও আমার কাছে জানা গেটের নাম করতেন না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একমত হল বাবলুর সঙ্গে।

বাচ্চু বলল, "আমার মনে হয় জয়ন্তবাবু ওদের ধাওয়া করে নিজেই উঠে পড়েছিলেন ওদের গাড়িতে।"

বিচ্ছু বলল, "সেটা হওয়াই সম্ভব।"

বিলু বলল, "মাঝখান থেকে আমাদের যাওয়াটা গেল ভেস্তে।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ বিলু, যাওয়া আমাদের হবেই। আজ না হয় কাল। তবে কিনা বিশ্বকর্মা পুজোটা দেখা হবে না এই যা!"

"আর ওই রেল এঞ্জিন তৈরির কারখানা? ওটা তো বছরে একদিনই খোলা থাকে সর্বসাধারণের জন্য।"

"ও আমরা যখন যাব তখনই দেখে নিতে পারব। কেননা আমরা যাঁর ঠিকানায় উঠব, তিনিই তো রেলের একজন পদস্থ অফিসার। অতএব ও ব্যাপারে নো প্রবলেম।"

বাবলুরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে ঠিক তখনই দেখা গেল জয়ন্তবাবু এবং অন্য কয়েকজন দ্রুতপায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার বল তো? আবার কী হল?"

বিলু বলল, "আসতে দে।"

জয়ন্তবাবু কাছে এসে বললেন, "এই যে পাণ্ডব গোয়েন্দারা! তোমাদের কাছেই এলাম। একটা দারুণ সুখবর দিতে।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"আহত যে লোক দু'জন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে…।"

ভোম্বল বলল, "ধরা পড়েনি, ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"ওই হল। ওদেরই সূত্র ধরে খিদিরপুরের একটি বিশেষ এলাকা থেকে পুলিশ এইমাত্র ওদের আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

বাবলু বলল, "কী নাম বলুন তো ওদের?"

"দু'জনই কুখ্যাত আসামি। একজন হল ডেকন সাউ। আর-একজন অঙ্গদ রায়।"

বাবলু বলল, "মাই গড। যে দু'জনের নাম আপনি করলেন, সেই দু'জনের একজনকেও আটকে রাখবার মতো কোনও জেলখানা এখনও তৈরি হয়নি। অতএব ওদের ধরা পড়ার

ব্যাপারে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই।"

বিলু বলল, "বরং ভয়ের ব্যাপার আছে। জেল থেকে বেরিয়েই ওরা বদলা না নেয়!"

জয়ন্তবাবু হেসে বললেন, "সে যা হওয়ার হবে। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে ওরা কোনওরকমেই ছাড়া না পায়। এখন যে জন্য তোমাদের কাছে আসা, সেই কথাই বলি। আজ আমাদের ব্যাঙ্কে কোনও কাজকর্ম হয়নি। বিশেষ পুলিশি পাহারায় রয়েছে সব। ইতিমধ্যে আমার বাড়ি থেকে ফোন এসেছে, মানে আমার মিসেসের একান্ত অনুরোধ তোমাদের একবার আমার বাড়িতে যেতে হবে। আমার এইসব সহকর্মীরাও যাবেন, তাই আমি নিতে এসেছি তোমাদের।"

বাবলু খুব খুশি হয়ে বলল, "আমরা সানন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। তবে যাওয়ার আগে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা জয়ন্তদা, ওরা কি আপনাকে কিড্‌ন্যাপ করতে চেয়েছিল?"

জয়ন্তবাবু হেসে বললেন, "আরে না না। ওরা ক্যাশ নিয়ে পালাবার সময় আমিই ওদের ধাওয়া করি। ওদের একজনকে গাড়িতে উঠতে বাধা দিলে ওরা আমাকেও তুলে নেয়। তারপর খানিক এসে চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে ড্রাইভারকে জানা গেটের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।"

বাবলু বলল, "আমরা আপনার সাহসের প্রশংসা করি।"

"না রে ভাই। আমি অত্যন্ত ভীতু লোক। আসলে কী জানো? সময় বিশেষে মানুষ কখনও-সখনও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আমারও তাই হয়েছিল। অত টাকা ওরা নিয়ে গেলে কী হত বলো তো? তাই ভাবলাম, জীবনের চেয়ে কর্তব্য বড়। এই ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপর। চলো, চলো, আমার গাড়িতে চলো তোমরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাগান থেকে বেরিয়ে এসে জয়ন্তবাবুর গাড়িতে চেপে বসল। জয়ন্তবাবুর অন্য সহকর্মীরা আলাদা একটা গাড়িতে চেপে ওদের সঙ্গে চললেন। পঞ্চুর হঠাৎ কী হল কে জানে? বাবলুদের সঙ্গে গাড়িতে উঠেও কী ভেবে যেন নেমে পড়ল। তারপর নিজের খেয়ালেই ছুটে চলল বাড়ির দিকে।

শিবপুর মন্দিরতলায় জয়ন্তবাবুর সুন্দর দোতলা বাড়ি। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর জন্য মন্দিরতলার এখন নামডাক খুব। জয়ন্তবাবুর স্ত্রী কল্যাণী ছোট্ট বাবুয়াকে নিয়ে গ্রিল দেওয়া বারান্দায় বসে ছিলেন। ওরা যেতেই অভ্যর্থনা করে ভেতরে বসালেন সবাইকে।

সকলের চোখ পড়ল বাবুয়ার দিকে। কী সুন্দর ফুটফুটে শিশুটি। ঠিক যেন দেবশিশু। হবে নাই-বা কেন? বাবা-মা দু'জনেই তো সুন্দর। 'ফিল্ম ফিগার' যাকে বলে ঠিক তাই। তাঁদের শিশু অপরূপ তো হবেই।

বিচ্ছু এমনিতেই ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে আদর করতে খুব ভালবাসে। তাই বাবুয়ার কাছে গিয়ে ওর দিকে হাত বাড়াতেই বাবুয়াও দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর কোলে।

বাচ্চু বলল, "ওমা, বেশ তো! হাত বাড়াতেই চলে এল!"

কল্যাণী বললেন, "কারও কোল বাছে না ও। যে হাত বাড়ায় তার কাছেই চলে যায়।"

বিচ্ছু বাবুয়াকে আদর করতে-করতে বলল, "আপনাদের বাড়িটা যদি আমাদের পাড়ায় হত, তা হলে কিন্তু রাতদিন ওকে রেখে দিতাম আমাদের কাছে।"

"তা হলে তো বেঁচে যেতাম। তোমাদের মতো ছেলেমেয়ের সঙ্গ পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? তোমরা না থাকলে কী যে হত আজ!"

বাবলু বলল, "কী আবার হত? ধরা ওরা পড়তই।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "কে ধরত ওদের? রাস্তায় অত লোক, কেউ কি এগিয়েছিল? ঠিক সময়ে তুমি ওদের পিছু না নিলে যেভাবেই হোক পালাত ওরা।"

বিলু বলল, "আপনারও লাক ভাল বলতে হবে। কী ভাগ্যিস, গুলি করেনি।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "সে-কথা একশোবার। খুব জোর প্রাণে বেঁচেছি। দাঁত একটা গেছে তাতে দুঃখ নেই। গা-হাত-পায়ের ব্যথাও সেরে যাবে দু'দিন বাদে। কিন্তু প্রাণে মরলে সংসারটাই ভেসে যেত আমার।"

কল্যাণী বললেন, "তোমরা বোসো। আমি তোমাদের জন্য জলখাবার নিয়ে আসছি।" বলে ভেতরে চলে গেলেন।

বাবুয়া তখন বাচ্চু, বিচ্ছুর সঙ্গে জোর খেলায় মেতে উঠেছে। খেলতে-খেলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে সে।

একটু পরেই কাজের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণী প্রত্যেকের জন্য ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন আর নানারকমের মিষ্টি এনে টেবিলে সাজালেন।

জয়ন্তবাবুর সহকর্মীরা বললেন, "এ কী করেছেন বউদি! দাদার অনারে এত!"

কল্যাণী বললেন, "মোটেই না। এসব পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অনারে। আমার বোন অলি আবার এদের দারুণ ভক্ত। এদের নিয়ে লেখা যত বই আছে সবই ও কিনেছে। ও যদি একবার দেখত এদের তো কী যে করত তার ঠিক নেই। আমি এখনই ফোন করছি ওকে। আগে জলযোগের পর্বটা মিটুক।"

বাবলুরা মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসল। সে কী খাওয়া! দমভর যাকে বলে।

খাওয়াদাওয়ার পর অন্যরা বিদায় নিলে কল্যাণী ফোনের কাছে গেলেন। তারপর ডায়াল ঘোরাতে-ঘোরাতেই বললেন, "আমার বোন অলির সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই এসো। ভারী মিষ্টি মেয়ে। আর ভয়ানক দুষ্টু। পাহাড়ে ঘুরতে খুব ভালবাসে। আমার বাপের বাড়ি চিত্তরঞ্জনে। সেখানেও পাহাড় আছে। তা ছাড়া কাছেই দেওঘর···।"

বাবলু বলল, "এক মিনিট। আপনার বাপের বাড়ি কোথায় বললেন?"

"চিত্তরঞ্জনে। আমার বাবা রেলে চাকরি করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। আগে আমরা আমলাদহিতে থাকতাম। এখন মিহিজামে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়ি করেছেন বাবা।"

বাবলু বলল, "আপনারা বিষ্ণু প্রধানকে চেনেন? সুন্দর পাহাড়িতে থাকেন। আমার বাবার বন্ধু।"

জয়ন্তবাবু বললেন, "চিত্তরঞ্জন বিশাল এলাকা। তা ছাড়া ওখানে সবই তো রেলের কলোনি। কাজেই ওখানে স্থায়ী বাসিন্দা বলতে কেউ নেই। বদলির চাকরি সব। তাই কে কাকে চেনে? আমার শ্বশুরমশাই হয়তো চিনতে পারেন।"

কল্যাণী বললেন, "তোমরা চিত্তরঞ্জনে গেছ কখনও?"

বাবলু বলল, "না। আজই রাতের গাড়িতে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকালের ওই ঝামেলার পর যাওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করেছি। না হলে পরশু বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ওখানে আমরা থাকতাম।"

কল্যাণী বললেন, "তবে তো ভালই হল। আমি কতদিন ধরে যাব-যাব ভাবছিলাম কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠছিল না। আসলে ছেলেটাকে নিয়ে একা-একা যেতে সাহস হয় না। ও তো ছুটিই পায় না একদম। তা ভাই তোমরা আর না কোরো না। আজকের দিনটা বাদ দাও, কাল ভোরেই চলো বেরিয়ে পড়ি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

কল্যাণী বললেন, "তাকিয়ে দেখছ কী? না হলে কিন্তু আমার যাওয়া হয় না।"

এল আই সি

পেনসন যোজনা

60 বছর বয়েসেও থাকুন 30 বছরের মত।

আত্মনির্ভর

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- স্ব-নিয়োজিত, পেশাদার ও বেতনভোগী শ্রেণীর জন্য এক অভিনব পেনসন যোজনা।
- পেশ হল আকর্ষণীয় আজীবন পেনসন-লাভের গ্যারান্টী, ফ্যামিলি পেনসনের সঙ্গে।
- নিধির 25% সম্পূর্ণ কর-মুক্ত রূপান্তরণের বিকল্প।
- ফ্যামিলি পেনসনের জন্যে জীবন বীমা সুরক্ষা।
- মহিলারাও জীবন বীমা সুরক্ষা পাবার যোগ্য।
- গ্যারান্টীকৃত পেনসন-লাভে আরো উন্নতির সম্ভাবনা।
- 80 সিসিসি (1)- এর অন্তর্গত 10,000 টাকা পর্যন্ত প্রিমিয়ামের উপর প্রতি বছর পুরোপুরি কর-ছাড়।

আরো জানতে হলে আপনার কাছের এল আই সি অফিস অথবা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আজই।

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

জনগণের সেবায় 40 বছর

R K SWAMY/BBDO LIC 5731/BE

জয়ন্তবাবু বললেন, "তোমরা তো যাবেই ঠিক করেছিলে। তা হলে আর দ্বিমত কেন ? তোমরা সঙ্গে থাকলে আমিও নিশ্চিন্তে ওদের ছেড়ে দিতে পারি।"

বাবলু বলল, "আমরা রাজি।"

জয়ন্তবাবু, কল্যাণী দু'জনেই খুশি হলেন। ছোট্ট বাবুয়াটা কী বুঝল কে জানে, হেসে গড়িয়ে পড়ল বিচ্ছুর কোলে।

জয়ন্তবাবু বললেন, "আমার তো গাড়ি আছে। কাজেই কোনও অসুবিধে নেই। কাল খুব ভোর-ভোর রওনা দিলে বেলা বারোটার মধ্যেই পৌঁছে যাবে তোমরা।"

কল্যাণী বললেন, "আর-একটা কথা। ওখানে গেলে আমাদের বাড়িতেই উঠবে কিন্তু। ওই সুন্দরপাহাড়ি-টাহাড়িতে নয়। আমাদের বাড়িতে লোকজনও কম। যথেষ্ট স্বাধীনতা পাবে। আমরাও সবাই মিলে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারব।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। এই কথাই রইল তা হলে ?"

কল্যাণী বললেন, "একেবারে পাকা কথা। তবে এক্ষুনি উঠো না যেন, একটু দাঁড়াও। অলিকে একবার ফোনে জানিয়ে দিই আমাদের যাওয়ার কথাটা।" বলে আবার ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, লাইন পাওয়া গেল না।

কী যে হয় কে জানে ?

বারবার ডায়াল ঘুরিয়েও মিহিজামের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে না পেরে ফোন রেখে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন কল্যাণী।

জয়ন্তবাবু বললেন, "এখন থাক। হয়তো লাইনে ডিসটার্ব আছে। পরে আমি সময়মতো একটু বেশি রাতে জানিয়ে দেব ওদের। সবাই তৈরি হয়ে নাও, কাল ভোরেই কিন্তু যাওয়া।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হাসিমুখে বিদায় নিল জয়ন্তবাবুর বাড়ি থেকে। জয়ন্তবাবুর ড্রাইভার গাড়ি করেই ওদের বাড়ি পৌঁছে দিলেন। কথা হল, কাল ভোরে আবার উনি আসবেন। অবশ্যই কল্যাণী ও বাবুয়াকে সঙ্গে নিয়ে। যাওয়া হবেই।

॥ ৩ ॥

পরদিন খুব ভোরে জয়ন্তবাবুর গাড়ির হর্ন শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা উল্লসিত হল। কী আনন্দ ! বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু রাত তিনটে থেকে এসে বসে আছে বাবলুর ঘরে। পঞ্চুও হানটান করছে যাওয়ার জন্য।

মা-ও উঠেছেন কখন। ছেলেমেয়েগুলোর পথে জলখাবারের জন্য লুচি, হালুয়া, সবই করে দিয়েছেন। ভরে দিয়েছেন মিষ্টির বাক্স।

বাচ্চু, বিচ্ছু তো ছুটে গিয়ে কল্যাণীর কোল থেকে ছোট্ট বাবুয়াকে নিয়ে এসে দেখাল বাবলুর মাকে। বলল, "দেখুন মাসিমা, কী সুন্দর দেখতে আমাদের ভাইটাকে।"

বিচ্ছু বলল, "একদিন দেখেই এর ওপরে আমার এমন মায়া পড়ে গেছে যে, কী বলব !"

মা আদর করে বাবুয়াকে বললেন, "কী রে, মামার বাড়ি যাওয়ার আনন্দে চোখে যে ঘুম নেই ! খুব আহ্লাদ না ?" বলে ওর গালটা একটু টিপে দিতেই হেসে গড়িয়ে পড়ল বাবুয়া।

বছর দুয়েকের শিশু। যেমন ফুটফুটে, তেমনই প্রাণবন্ত।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি করল না। সবাই এসে গাড়িতে বসল। বাবলু, বিলু আর ভোম্বল ড্রাইভারের পাশে ঠাসাঠাসি করে। পেছনের সিটে কল্যাণী, বাচ্চু, বিচ্ছু। বাবুয়া রইল কোলে। পঞ্চু ওদেরই এক পাশে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে জি. টি. রোড ধরে গাড়ি হাওয়ার গতিতে ছুটে চলল।

আকাশ তখনও ভালভাবে পরিষ্কার হয়নি। জি. টি. রোড ফাঁকা। তবে ডাউনের জিনিস-ভর্তি লরি খুব বিরক্ত করছিল। ড্রাইভারের নাম দিনুদা। তিনি পাকা হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাতে-চালাতেই বললেন, "ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "কিসের ব্যাপার দিনুদা ?"

দিনুদা বললেন, "অনেকক্ষণ থেকে একটা গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে। মনে হচ্ছে ফলো করছে আমাদের।"

ভয়ার্ত কল্যাণী বললেন, "সে কী !"

দিনুদা বললেন, "কতবার সাইড দিলাম গাড়িটাকে। তবুও আমাদের ক্রস করছে না।"

দিনুদার কথা শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরকে দেখে নিল একবার। তারপর পেছনের গাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "দু-তিনজন আছে মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "আপনি গাড়িটাকে একটু স্লো করে একেবারেই থামিয়ে দিন তো।"

দিনুদা বললেন, "একেবারে থামিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে ? জায়গাটা বড় নির্জন।"

"তাতে কী ? তখনই তো বোঝা যাবে ওদের আসল উদ্দেশ্যটা।"

"যদি ওরা আক্রমণ করে ?"

"ওরা যদি আমাদের অনুসরণকারী হয় তা হলে যখন হোক সুবিধেমতো জায়গায় আক্রমণ ওরা করবেই।"

বিলু বলল, "এখন আমরা কতদূরে এসেছি বলুন তো ?"

"মগরা পেরিয়েছি সবে। ত্যালাণ্ডুর মাঠের কাছাকাছি এসেছি।"

বাবলুর কথামতো দিনুদা গাড়ির গতি কমাতেই পেছনের গাড়ির গতিও কমে গেল। সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডার একটা।

বাবলু বলল, "মনে হচ্ছে আমাদেরই ফলো করছে ওরা।"

কল্যাণী বললেন, "ওরা কারা ? ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতদের কেউ নয়তো ?"

বাবলু বলল, "হতে পারে।"

কল্যাণী বললেন, "শোনো, তোমরা ছেলেমানুষি কোরো না। যত তাড়াতাড়ি পারো বর্ধমানে নিয়ে চলো গাড়িটাকে।"

বাবলু বলল, "আপনি একদম নার্ভাস হবেন না বউদি। বদ মতলব যদি সত্যিই থাকে ওদের, তা হলে কিন্তু এমন শিক্ষা পাবে ওরা যে, আর কখনও এমন কাজ করতে সাহস করবে না।"

কল্যাণী বললেন, "দোহাই তোমাদের ! আমার বাবুয়ার মুখ চেয়ে তোমরা ওদের ঘাঁটিয়ো না।"

বাবলু বলল, "আপনি শুধু বাবুয়ার কথাই ভাবছেন। আমাদের কথা ভাবছেন না ? জয়ন্তদার কথা ভাবছেন না ? এই জাল যদি ওদেরই হয় তা হলে ওখানে জয়ন্তদাও কি খুব নিরাপদে আছেন ?"

কল্যাণী ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবার।

বাবলু দিনুদার কানে ফিসফিস করে কিছু বলতেই দিনুদার মনঃপূত হল কথাটা। বললেন, "ঠিক আছে।" বলেই হঠাৎ একটু জোরে গিয়ে ক্যাঁ-ক্যাঁচ শব্দে গাড়িটা আচমকা ব্রেক কষে এমন আড়াআড়িভাবে রাখলেন, যাতে আপ-ডাউনের কোনও গাড়িই আর কোনওমতে যাতায়াত করতে না পারে।

ওষুধে কাজ হল।

পেছনের গাড়িটাও ব্রেক কষতে বাধ্য হল তখন।

কালো গেঞ্জি আর ময়লা প্যান্ট পরা তিনজন নেমে এল গাড়ি থেকে। ওদের একজনের হাতে লোহার চেন, একজনের হাতে ছোরা, আর-একজনের হাতে রিভলভার।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নেমে এল প্রত্যেকে। সঙ্গে পঞ্চুও।

ওরা ওদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "অ্যাই ! রাস্তার মাঝখানে গাড়িটাকে এইভাবে রাখলি কেন রে তোরা ?"

বাবলু হেসে বলল, "সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবে দাদা।

তার আগে এসো তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করে নিই।"

যে লোকটার হাতে রিভলভার ছিল সে বাবলুকে বলল, "আগে গাড়িটাকে সাইড কর। তারপর আলাপ করবি।"

বাবলু বলল, "তাই কি হয় ব্রাদার ? তোমাদের মতন ঘুঘুকে ধরবার এটাই যে মোক্ষম ফাঁদ।"

ওর সঙ্গে আর যে দু'জন ছিল তারা বলল, "ছেড়ে দে ভিমা। কেটে পড়। এইভাবে আর-একটু সময় থাকলেই সপ্তরথীতে ঘিরে ফেলবে আমাদের। ওই দ্যাখ্ কত গাড়ি আসছে।"

ভিমা বলল, "আসতে দে। আমার রিভলভারের নলের কাছে সবাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমায় বাধা দিতে এলে একজনও বেঁচে ফিরবে না।" বলেই দিনুদার কাছে গিয়ে বলল, "গাড়িটাকে সোজা করে শিগ্‌গির নেমে এসো গাড়ি থেকে। কুইক। এখন থেকে এই গাড়ি আমি চালাব। জয়ন্ত বোসের বউ-বাচ্চা আর এই ছেলেমেয়েগুলোকে আমার চাই।"

বাবলু বলল, "এ আর এমন কী কথা, দিনুদা নেমে আসুন তো গাড়ি থেকে। যেভাবে রাখলে ভাল হয় সেইভাবেই রাখুক ওরা গাড়িটাকে।"

বাবলুর কথা শুনে দিনুদা নেমে আসতেই ভিমা বসতে গেল ড্রাইভারের আসনে। যেই না হেঁট হয়ে বসতে যাওয়া, বাবলু অমনই সজোরে একটা লাথি মারল ভিমাকে। সেই লাথির আঘাত সহ্য করতে না পেরে ভিমা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। বাবলু একটুও দেরি না করে ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েই তাগ করল ওর দিকে।

আর যে দু'জন লোক ওর সঙ্গে ছিল তারা তখন ছোরা আর চেন নিয়ে তেড়ে এল বাবলুর দিকে। কিন্তু এলে কী হবে ? পঞ্চু তখন পঞ্চানন। ওকে তখন রুখবে কে ? ভোরের ভৈরব হয়ে গর্জে উঠল সে। বিকট একটা ডাক ছেড়ে পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দু'জনের ওপর।

ততক্ষণে অনেক গাড়ি এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। সামনে-পেছনে অনেক, অনেকগাড়ি। তাদের মধ্যে জিনিস-ভর্তি লরির সংখ্যাই বেশি। সেইসব লরির ড্রাইভার সর্দারজিরা দলে-দলে নেমে এসেই তাদের বিশাল শরীর নিয়ে জাপটে ধরল তিনজনকে। তারপর বাবলুর মুখে সব শুনে সে কী বেদম প্রহার।

দিনুদা সেই সুযোগে গাড়িটাকে ঠিক করে নিলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ওই তিনজনের হাল কী হল তা দেখবার জন্য আর অপেক্ষা না করে গাড়িতে এসে বসল। দিনুদা জ্যাম কাটিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন বর্ধমানের দিকে। কল্যাণী বাবুয়াকে বুকে চেপে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

প্রথমে কিছুটা সময় নীরবতা। তারপর দিনুদাই একসময় বললেন, "যাক, এতক্ষণে বিপন্মুক্ত হওয়া গেল।"

বাবলু বলল, "কী করে বুঝলেন ?"

"সর্দারজিরা যে হারে মেরামত করছে ওদের, তাতে আজই ওদের শেষ দিন।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। তবুও বিপদের আশঙ্কা আমাদের রয়েই গেল। আসলে ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা সাকসেসফুল না হওয়ায় ওরা দারুণ চটেছে আমাদের ওপর।"

ভোম্বল বলল, "তবে এই দুষ্টচক্রের মূল নায়ককে ধরবার একটা ক্লু কিন্তু পাওয়া গেছে।"

সবাই তখন ভোম্বলের দিকে তাকাল, "কীরকম !"

ভোম্বল একপাশে রাখা দুটো নাম্বার প্লেট বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এ দুটো কী ?"

"নাম্বার প্লেট। কোথায় পেলি এগুলো ?"

"তুই যখন ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলি, সেই সময় সবার নজর এড়িয়ে এক ফাঁকে এ দুটো ম্যানেজ করেছি আমি। একটা গাড়িতে লাগানো ছিল। আর-একটা ছিল গাড়ির ভেতরে।"

বিলু বলল, "প্লেট দুটো ভুয়োও তো হতে পারে।"

বাবলু বলল, "পারে। তবে গাড়িতে যেটা লাগানো ছিল সেটা ভুয়ো হলেও ভেতরেরটা নয়। এরই সূত্র ধরে আমরা জেনে নেব এই গাড়ির মালিক কে ? তারপর...।"

দিনুদা বললেন, "নাঃ। তোমরা সত্যিই ক্লেভার।"

দেখতে-দেখতে বর্ধমান এসে গেল। তখন সকাল হয়ে রোদ উঠে গেছে। মা যদিও বাড়ি থেকে অনেক খাবার বেঁধে দিয়েছিলেন তবুও বর্ধমান শহরে এসে বাড়ির খাবার খায় কে ? তাই ওরা কার্জন গেটের কাছে একটা দোকানের সামনে গাড়ি রেখে গরম-গরম কচুরি, চা, সীতাভোগ, রাজভোগ অনেক কিছুই খেল।

কল্যাণীও বাড়ির জন্য একটু বেশি পরিমাণে সীতাভোগ মিহিদানা নিয়ে নিলেন। বাবা সন্দেশ খেতে ভালবাসেন, তাই সন্দেশও নিলেন কয়েকটা। আবার যাত্রা শুরু। দুর্গাপুর, আসানসোল হয়ে চিত্তরঞ্জন মিহিজামে।

এখানে আসামাত্রই মন যেন ভরে গেল। কী আশ্চর্য সুন্দর দেশ। কেমন যেন একটা আরণ্যক পরিবেশ চারদিকে। শুধুই সবুজের মেলা। ওই তো একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কী পাহাড় কে জানে ? ওই কি তবে সুন্দরপাহাড়ি ? যার কোলে বিষ্ণু প্রধানের বাংলো হয়তো।

রাঙামাটির মিহিজামে ছোট্টখাট্টো একটা বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামতেই গাড়ির আওয়াজ শুনে যে মেয়েটি ওর বান্ধবীদের নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, তারই নাম অলি। অলি চৌধুরী।

এক-একজনের নামের সঙ্গে মুখের এমন একটা সামঞ্জস্য থাকে যে, দেখলেই মনে হয় এর এই নাম যথার্থই। অলিকে দেখেও তাই মনে হল। অলি এসে ছোট্ট বাবুয়াকে বুকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে তুলল প্রথমে। তারপর কল্যাণীকে বলল, "সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্য। আমার বান্ধবীরাও হানটান করছে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখবে বলে। আসতে এত দেরি যে ?"

কল্যাণী বললেন, "আর বলিস না। যা বিপদ গেল, বরাত জোরে বেঁচে ফিরেছি সব।"

কল্যাণীর বাবা-মাও বেরিয়ে এসেছেন তখন। মেয়ের মুখে এই কথা শুনেই বললেন, "সে কী ! আবার কী হল ? জয়ন্তর ফোনে কালকের ডাকাতির কথা তো শুনেছি। কিন্তু...।"

কল্যাণী বললেন, "বলব, বলব, সব বলব।"

অলি সকলকে সমাদরে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। এমন সুন্দর করে সাজানোগোছানো ঘর খুব কমই চোখে পড়ে। বিশেষ করে শহর থেকে দূরে—অনেক দূরে। সেই ঘরে সকলকে বসিয়ে বলল, "সত্যি, তোমরা যে আসবে তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি ! হঠাৎ জামাইবাবুর ফোন পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ফোনে তোমাদের আসবার কথা শুনে কী খুশি যে হয়েছি তা কী বলব !"

বাবলু বলল, "তোমার দিদির মুখে শুনলাম তুমি নাকি আমাদের দারুণ ভালবাসো ?"

অলি দুষ্টুমি করে বলল, "ভুল শুনেছ, যাদের চোখেও দেখিনি কখনও, তাদের ভালবাসব কী করে ? তবে তোমাদের নিয়ে লেখা সব বই-ই আমি পড়েছি। শুধু পড়েছি নয়, ভালবেসে বইগুলোকে পরপর সাজিয়েও রেখেছি। এই যে আমার বান্ধবীরা, এদেরও বুক সেলফে তোমাদের বই ঠাসা। শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনা সবারই। তাই আমার মুখে খবর পেয়ে
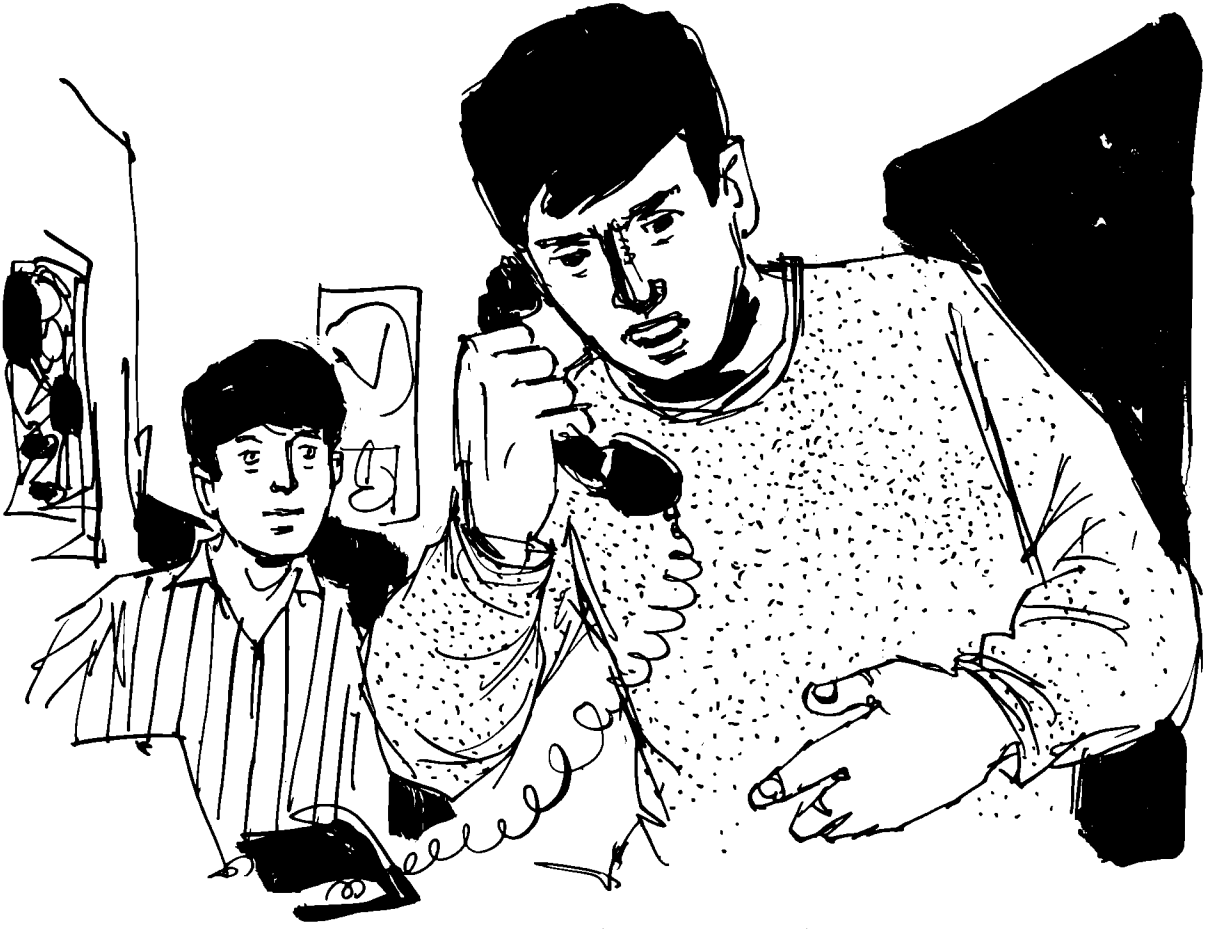
কখন থেকে এসে বসে আছে সব।"

বাবলু হেসে বলল, "তাই বুঝি ? এও তো আমাদের প্রতি ভালবাসার আর-এক নিদর্শন।"

বাবলুর কথায় হেসে উঠল সকলেই।

ওরা যখন জমিয়ে গল্প করছে তেমন সময় অলির বাবা-মা এসে একবার দেখা দিয়ে গেলেন। ছোট্ট বাবুয়াটা এ-ঘর ও-ঘর করে বাড়ি মাতিয়ে দিল। কখনও বা পঞ্চুর ঘাড়ে-পিঠে উঠে নাস্তানাবুদ করতে লাগল ওকে। পঞ্চুর কিন্তু বিরক্তি নেই।

আটপৌরে একটি ডুরে শাড়ি পরে কল্যাণী এসে বললেন, "শোনো, তোমরা সবাই এসে আগে মুখ-হাত ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নাও। তারপর একটু জলখাবার খেয়ে...।"

বাবলু বলল, "প্লিজ বউদি, আর ওই ব্যবস্থাটা দয়া করে করবেন না। বর্ধমানের খাওয়ার কথাটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ?"

"ওই একই অবস্থা তো আমারও। কিন্তু মা যে শুনছেন না।"

বাবলু বলল, "মাকে বুঝিয়ে বলুন। আর-এক কাজ করুন, আমার বাড়ি থেকে মা যে খাবারগুলো করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো গাড়িতেই পড়ে আছে। ওগুলো এনে অলি আর ওর বান্ধবীদের দিয়ে দিন। ওরা খেয়ে নিক।"

অলি বলল, "সে আমরা খেতে রাজি আছি। কিন্তু তোমরা কি কিছুই খাবে না ?"

বাবলু বলল, "কে বলল খাব না ? তোমাদের বাড়িতে এসে সারাটা দিন উপোস করে থাকব নাকি ?"

অলি বলল, "বেশ, এখন কিছু খেতে ইচ্ছে না করে আপাতত দুটো করে রসগোল্লা গালে দিয়ে মিষ্টিমুখ করো। এই প্রথম এলে তোমরা।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তবে চা খেতে আপত্তি নেই কিন্তু। চা কিংবা কফি।"

অলি ওদের সকলকে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটু পরেই বাবলুর মায়ের দেওয়া খাবারগুলো নিয়ে এসে বান্ধবীদের ভাগ করে নিজেও খেতে বসে গেল।

বাবলুরা বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এলে অলিদের সঙ্গে বসেই ওদের দেওয়া রসগোল্লা খেয়ে মিষ্টিমুখ করল। তারপর শুরু হল চা-পর্ব। পঞ্চুও বাদ গেল না তাতে।

চা-পর্ব শেষ হলে অলি বলল, "বেলা কিন্তু খুব একটা বেশি হয়নি। চলো, সবাই মিলে একটু ঘুরে আসা যাক।"

বাবলু বলল, "তার আগে আমার একটা আবদার ছিল যে।"

অলি হেসে বলল, "বলো।"

"তোমাদের ফোনটা কি একবার ব্যবহার করতে দেবে ?"

"নিশ্চয়। বাড়িতে ফোন করবে বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

বাবলু ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে বাড়িতে মায়ের সঙ্গে কথা বলেই আবার নতুন করে ডায়াল করল।

ওদিক থেকে সাড়া পাওয়া যেতেই বলল, "হ্যালো ! পুলিশ স্টেশন ?"

"ইয়েস। ইনস্পেক্টর ভার্মা স্পিকিং।"

"সার, নমস্কার। আমি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাবলু বলছি। মিহিজাম থেকে।"

"কী ব্যাপার !"

বাবলু তখন এক-এক করে সব বলল।

সব শুনে অলি আর ওর বন্ধুদের চোখ তো কপালে উঠে গেল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "বলো কী ! দুটো নম্বরই তা হলে আমাকে দাও। খুব বুদ্ধির কাজ করেছ তোমরা নাম্বার প্লেট দুটো সরিয়ে নিয়ে। তবে ও-গাড়ি আটক হয়ে যাবে। আর নাম্বার যখন জানা গেছে তখন গাড়ির মালিককেও খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না আমাদের।" তারপর বললেন, "তোমাদের ওখানকার ফোন নম্বর কত ?"

বাবলু অলিকে বলল, "তোমাদের ফোনের নম্বর ?"

অলি নম্বর বলল। ইনস্পেক্টর সেটা নোট করে নিলেন।

বাবলু বলল, "নজর রাখবেন সার। ওরা জয়ন্ত বোসের ক্ষতি করবার চেষ্টা করতে পারে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "অবশ্যই। পুলিশের কাজ পুলিশ ঠিকই করবে। থ্যাঙ্কস্।" বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন।

বাবলু সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাক। একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মনে হয় এখানে দুটো দিন এখন নির্বিঘ্নেই কাটানো যাবে।"

অলি বলল, "দুটো দিন কেন ?"

বাবলু বলল, "আবার ক'দিন ? আজ আর কাল। কাল বিশ্বকর্মা পুজোটা দেখে পরশু চলে যাব।"

"ওটি হচ্ছে না বন্ধু। তোমাদের আমরা সহজে ছাড়ছি না। অন্তত কয়েকটা দিন থেকে যাও।"

বাবলু বলল, "এর বেশি একদিনও থাকতে পারব না। আমাদের কাজ নেই বুঝি ?"

অলি এসে বাবলুর হাত ধরে বলল, "না বাবলু, প্লিজ, ওরকম কোরো না। খুব মন খারাপ হয়ে যাবে তা হলে।"

অলির বান্ধবীরা একবাক্যে বলল, "দু'দিনের জন্য কেউ আসে ?"

বাবলু বলল, "আমাদের যে উপায় নেই।"

বাচ্চু বলল, "বেশ তো, আমরা যেমন হঠাৎ করে তোমাদের এখানে এসে পড়লাম তোমরাও তেমনই হঠাৎই একদিন আমাদের ওখানে গিয়ে হাজির হও না কেন ?"

অলি বলল, "যাবই তো। বিশেষ করে আমার দিদির বাড়ি যখন ওখানে, তখন যেতে আমাকে হবেই। বান্ধবীরাও যাবে। কিন্তু তোমাদের এই দু'দিন থেকে চলে যাওয়াটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। এইটুকু সময়ের মধ্যেই মনে-মনে কত পরিকল্পনা করে ফেলেছিলাম। তোমাদের নিয়ে মধুপুর যাব, গিরিডি যাব, উশ্রী জলপ্রপাত দেখব, দেওঘর, শিমুলতলা যাব। কিন্তু...।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। আমাদেরও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটু আগেই ফোনের কথা তো শুনলে। পুলিশ ওই গাড়ির মালিকের ঠিকানা পেলেই আমাদের দায়িত্ব বাড়বে। বিশেষ করে এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের বিপদের আশঙ্কা পদে-পদে। তোমার দিদি, জামাইবাবু, ছোট্ট বাবুয়া, আমরা, প্রত্যেকের। এখন যে-কোনও উপায়েই হোক, ওদের ধরতে না পারলে কী যে হবে বা হতে পারে তা কে জানে ?"

এর পরে আর কথা চলে না। তাই সবাই নীরব হল।

বাবলু বলল, "তা ছাড়া এখানে আসবার আদৌ কোনও পরিকল্পনাই ছিল না আমাদের। আমার বাবার এক বন্ধু রেলের অফিসার। সুন্দরপাহাড়িতে বাংলো পেয়েছেন। এখানকার বিশ্বকর্মা পুজো দেখব বলে এখানেই আসছিলাম আমরা। এমন সময় এইসব অঘটন।"

অলি বলল, "তোমার বাবার বন্ধুটি কে ?"

"বিষ্ণু প্রধানের নাম শুনেছ ?"

অলির তো চোখ কপালে উঠে গেল। সেইসঙ্গে শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনারও। সবাই বলল, "ওরে ব্বাবা। উনি তো মস্ত অফিসার। আগে দুর্গাপুর না আসানসোল কোথায় যেন ছিলেন। সম্প্রতি বদলি হয়ে এখানে এসেছেন। শুনেছি, খুব ভাল লোক।"

"ওঁর ছেলের নাম জয়দীপ।"

"ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। রাজপুত্রের মতন দেখতে। ওকে সবাই প্রিন্স বলে এখানে।"

বাবলু বলল, "যাক, ভালই হল। তোমরা আমাদের ওইখানেই নিয়ে চলো। আগে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি। তার কারণ আমাদের তো ওখানেই ওঠবার কথা, তাই হয়তো ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তা ছাড়া আমার বাবারও আসবার কথা ওখানে।"

অলি বলল, "বেশ তো, চলো।"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজ পেরিয়ে ফার্স্ট গেটের কাছে এল। চারদিকে তখন বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য সাজসাজ রব। উৎসবের আনন্দে জমজমাট চারদিক। লাউড স্পিকারের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেলেও দূরের পাহাড় এবং সবুজ বনানীর ভেতর থেকে কেমন যেন একটা পুজো-পুজো গন্ধ ভেসে আসছে। কত, কত ঘুড়ি উড়ছে নির্মেঘ আকাশে। এইসব দেখে মনপ্রাণ একই সঙ্গে ভরে উঠল সকলের।

সুন্দর পিচঢালা পথ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে একসময় ওরা বিষ্ণু প্রধানের বাংলোর কাছে এল। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল বাবলুর বাবা কেমন অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন বাংলোর লনে। পঞ্চু তো দেখামাত্রই ছুট। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে একেবারে পায়ের কাছে ঘন ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে ওর আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল।

ওরা যেতেই বাবা বললেন, "ব্যাপার কী তোদের ? এত দেরি করলি কেন তোরা ?"

বাবলু বলল, "কাল থেকে যা গেল আমাদের ! হয়তো আসাই হত না।"

বাবা এবার অলি ও তার বান্ধবীদের দেখে বললেন, "এরা কারা ?"

বাবলু বলল, "এদের পরিচয় পরে দিচ্ছি। আগে আমার কথা শোনো।"

বাবা বললেন, "শুনব তো বটেই। তোরা ঘর থেকে বেরোবার নাম করলেই দুনিয়ার ঝামেলা তোদের আঁকড়ে ধরে। তাই নতুন কী আর শোনাবি ?"

ওদের কণ্ঠস্বর শুনে সস্ত্রীক বিষ্ণু প্রধান তখন বেরিয়ে এসেছেন।

বাবা বিষ্ণু প্রধানকে বললেন, "যা ভয় করছিলাম তাই। আবার কীসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে সব।" বলে বাবলুকে বললেন, "কী, ব্যাপারটা কী ?"

বিষ্ণু প্রধানের কাজের লোকটি এসে তখন প্রত্যেকের বসবার জন্য চেয়ার ও মোড়া পেতে দিয়ে গেল।

বাবলু বলল, "আগেই বলে রাখছি, আমরা কিন্তু কেউ কিচ্ছু খাব না। পেট একেবারে ভর্তি।"

বাবা বললেন, "না খাস না খাবি। কিন্তু তোদের জিনিসপত্তর কই ?"

বাবলু অলিকে দেখিয়ে বলল, "এদের বাড়িতে। এর নাম অলি। এ কে জানো তো বাবা ? আমাদের পাড়ায় যে ব্যাঙ্কটা আছে, তারই ম্যানেজার জয়ন্তবাবুর রিলেটিভ।"

"অ। তা শুনি এবার তোদের কাহিনী।"

বাবলু তখন সব কিছু সবিস্তারে খুলে বলল এক-এক করে।

সব শুনে বাবা বললেন, "ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেস মানে তো একটা সংগঠিত ব্যাপার। রীতিমত ট্রেনিং না নিয়ে এইসব কাজে নামে না কেউ। আর দলেও ওরা নেহাত কম থাকে না। জালও

ছড়ানো থাকে অনেকদূর। অতএব সাবধান।"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "বিশেষ করে ওরা যখন অত ভোরেও তোমাদের পিছু নিয়েছে তখন তোমরাই যে ওদের টার্গেট তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

অলি বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না, ওরা যে ভোরে বেরোবে একথা দুষ্কৃতীরা জানতে পারল কী করে ?"

বাবা বললেন, "যখন ওদের মধ্যে এইসব আলোচনা হচ্ছিল তখনই হয়তো আড়ি পেতেছিল কেউ।"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "এগজ্যাক্টলি।"

বাবলু বলল, "এটাও একটা ভেবে দেখার বিষয়। কিন্তু কে কখন কোথা থেকে আড়ি পাতল ? পঞ্চু অবশ্য আমাদের সঙ্গে ঘরের ভেতরেই ছিল।" বলে একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আচ্ছা বিলু, জয়ন্তদার সহকর্মীরা ক'জন ছিলেন বলো তো ?"

বিলু বলল, "ছ'জন।"

বিচ্ছু এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, "তবে তাঁরা কিন্তু আমাদের আলোচনার আগেই বিদায় নিয়েছিলেন। জলযোগ পর্ব শেষ হতেই চলে গিয়েছিলেন তাঁরা।"

বাচ্চু বলল, "ঠিক তাই। ঘরে তখন আমরাই ছিলাম। আর ছিল কাজের মেয়েটি।"

ভোম্বল বলল, "অবজেক্‌শন। সবসময় কাজের লোকেদের সন্দেহ করা উচিত নয়। ওদের লোক নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ ঘাপটি মেরে ছিল আশপাশে কোথাও। তা ছাড়া ওকে সন্দেহ করলে তো দিনুদাকেও সন্দেহ করতে হয়।"

বিলু বলল, "অবান্তর কথা বলিস না। দিনুদা হচ্ছেন সন্দেহের বাইরে।"

"কারণ ?"

"কারণ, ওই শয়তানরা যে আমাদের পিছু নিয়েছে সে-কথা দিনুদাই তো বলেছিলেন। আর বাবলুর নির্দেশমতো দিনুদা গাড়িটাকে ওইভাবে না রাখলে কিছুতেই ওদের বেকায়দায় ফেলা যেত না।"

ভোম্বল বলল, "মানছি। এখন তা হলে ধরে নিতে হবে, হয় ওরা আড়ি পেতেছিল, নয়তো কাজের মেয়েটির মারফত জেনেছে, তাই তো ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ তাই। এ-সবই অবশ্য তদন্তের বিষয়।"

বিষ্ণু প্রধান বললেন, "সে তোমরা তদন্ত করো আর যাই করো, আমার মতে বলে কী, বাবা তোমরা আর এখানে থেকো না। এই জায়গা এখন তোমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। যত শিগ্‌গির পারো এখান থেকে চলে যাও তোমরা।"

বাবা বললেন, "চলে গেলেও যে রেহাই পাবে তা নয়।"

"তবু অচেনা জায়গায় বিপদে না পড়াই ভাল। ওই ধরনের শয়তানদের কলকাতা থেকে মিহিজামে এসে একটা প্যানিক করে যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়।"

বাবলু বলল, "সেই ভয় তো আমরাও করছি। মগরার কাছে যে তিনজন ধরা পড়ে মারধোর খেয়েছে তাদের একজনও যদি ছিটকে বেরিয়ে আসে তা হলে কিন্তু হাল আমাদের খারাপ করে দেবে। ওরা নিজেরা না এলেও দলের অন্য কাউকে পাঠিয়ে ক্ষতি করবে আমাদের।"

বিষ্ণু প্রধানের ছেলে জয়দীপ বোধ হয় ঘরের ভেতরে বসে সব শুনছিল, এবার বেরিয়ে এসে বলল, "কিচ্ছু করবে না। ওরা ঘুঘুও দেখেছে, ফাঁদও দেখল। তা ছাড়া এই চিত্তরঞ্জনের এলাকাটা বড় কম নয়। লম্বায় সাত মাইল, চওড়াতেও সাত মাইল। সম্পূর্ণ রেলের এলাকা। চারদিক ঘেরা। অতএব এর ভেতরে ঢুকে হঠাৎ করে একটা প্যানিক করে যাওয়া অত সোজা নয়।"

বন্দনা বলল, "কী যে বলেন, যারা দিনের বেলায় ব্যাঙ্কে এসে সশস্ত্র ডাকাতি করে যায় তাদের আবার অসাধ্য কী ?"

বাচ্চু, বিচ্ছু দু'জনেই বন্দনাকে সায় দিয়ে বলল, "ঠিকই তো।"

অলি বলল, "তা ছাড়া আমরা তো রেলওয়ে কলোনির বাইরে থাকি। মিহিজামে। তাও একটু ভেতর দিকে।"

জয়দীপ বলল, "তাতে কী ? যেখানেই থাকো নির্ভয়ে থাকো। ওদের কেউই আসবে না। ওরা এখন মারধোর খেয়ে ধরা পড়ে পালাবার তাল করছে। তোমরা মনের আনন্দে ঘোরো। যাও, সামনের ওই টিলা পাহাড়ে উঠে চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দ্যাখো। আজকের দিনটা থাকো, কাল সকালে চলে যাও কল্যাণেশ্বরী। পারলে ওখান থেকে মাইথনটাও দেখে নিয়ো।"

শ্বেতা বলল, "মাইথনের জলাধার কিন্তু এই টিলার ওপর থেকেও ভাল দেখা যায়।"

জয়দীপ বলল, "ভাল দেখা যায় না, অস্পষ্ট। তবু কাছ থেকে দেখার একটা আলাদা আনন্দ আছে।"

অলি বলল, "আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে। খুব ভাল হয় তা হলে।"

জয়দীপ একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "চলো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা, অলি ও তার বান্ধবীরা, পঞ্চুকে নিয়ে চমৎকার পিচ ঢালা পথ ধরে জয়দীপের সঙ্গে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। ছোট্ট পাহাড়। খাড়াই পথ বেয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই ওপরে উঠে পড়ল।

সত্যিই সুন্দর। প্রথমেই ওরা বহুদূরের মাইথন জলাধার দেখল। ঘোলা জল কেমন টলটল করছে। তারপর সুন্দরভাবে সাজানো রেলওয়ে কলোনি। আর অফুরন্ত সৌন্দর্যে ভরা লাল মাটির বুকে ঘন সবুজের মিহিজাম। এ যেন সেই ঘরের কাছে আরশিনগর বলে মনে হল। এই টিলার ওপরই পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান কোনদিকে তার দিক্‌নির্ণয় করা আছে। এমনকী বসে সময় কাটানো এবং প্রকৃতি দেখার ভাল ব্যবস্থাও করা আছে এখানে। ওরা তাই যে যার পছন্দমতো একটা করে স্থান বেছে নিয়ে ছড়িয়েছিটিয়ে বসল।

আর পঞ্চু ? তার আনন্দ দেখে কে ? সে যে কী করবে কিছু ভেবে না পেয়ে টিলা পাহাড়ের ঝোপেঝাড়ে যত রঙিন প্রজাপতি উড়ছিল সেগুলোর পেছনে ছোটাছুটি শুরু করল ভৌ-ভৌ করে।

জয়দীপ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে পঞ্চুর কেরামতি দেখতে লাগল। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা দেখতে লাগল জয়দীপকে। জয়দীপ ওদের সমবয়সী না হলেও ওদের চেয়ে খুব একটা বড় নয়। কী অপূর্ব মুখশ্রী জয়দীপের। আর কী দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত। যেমন গায়ের রং, তেমনই মার্জিত কথাবার্তা। সাধ করে কি প্রিন্স বলা হয় ওকে ? সত্যিই প্রিন্স। রাজকুমার।

অলি ও তার বান্ধবীরা সবাই বলল, "জয়দীপদা, শুনেছি আপনি তো খুব ভাল স্টুডেন্ট। তা মাঝেমধ্যে আমাদেরকেও একটু গাইড করুন না !"

জয়দীপ মিষ্টি হেসে বলল, "কে বলল আমি ভাল স্টুডেন্ট ? পড়াশুনো করি এই পর্যন্ত। কিন্তু জীবনে কখনও প্রথম দশজনের একজন হতে পারিনি।"

অলি বলল, "কিন্তু আমরা যে তাও না। এই শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনা, আমরা সবাই একই ক্যাটিগরির।"

জয়দীপ বলল, "আমি তোমাদের দূর থেকে অনেকবার দেখেছি। আমি জানি তোমরা খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু তোমরা ইচ্ছে করেই পড়াশুনোয় ফাঁকি দাও।"

বন্দনা বলল, "তা যা বলেছেন ! আসলে টিভির নেশা আমাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, বইয়ের পড়ায় আর মন

বসাতে পারছি না।"

জয়দীপ বলল, "বাজে কথা। আমি তো দিনরাত টিভি দেখি। সিনেমাও কম দেখি না। তাতে তো পড়াশুনোর অসুবিধে হয় না আমার।"

চন্দনা এমনিতেই মুখচোরা মেয়ে। তবুও জয়দীপের কথার উত্তরে অবাক হয়ে বলল, "আপনি সিনেমা দেখেন ?"

"টিভি, সিনেমা সবই দেখি !"

মাধুরী বলল, "সত্যিই আপনি অসাধারণ।"

জয়দীপ বলল, "মোটেই না। তবে এইসবের মধ্য দিয়েই দিনে একবার অন্তত নিয়ম করে বই নিয়ে বসি। তোমরাও বসো, দেখবে পড়ায় মন কখন একসময় আপনা থেকেই বসে গেছে। আসলে এ সবই অভ্যাসের ব্যাপার।"

বন্দনা বলল, "তবুও আপনি একটু দেখুন না আমাদের।"

জয়দীপ বলল, "আমার সময় কখন ? খেলাধুলো, শারীরচর্চা, এইসব করতেই তো সময় চলে যায়। এর ওপর নিজের পড়া আছে।"

অলি বলল, "তাতে কী ? ওরই ফাঁকে আমাদের একটু দেখুন। না হলে কিন্তু আমরা আপনাকে ছাড়ব না।"

জয়দীপ বলল, "বেশ, সব সাবজেক্ট তো পারব না, তবে সপ্তাহে দু'দিন আমি তোমাদের আর্টস গ্রুপটা দেখিয়ে দিতে পারি।"

অলিরা তো দারুণ খুশি। সেইসঙ্গে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও।

বাবলু বলল, "যাক, এখানে এসে তা হলে একটা কাজ অন্তত হল। কাল থেকেই লেগে পড়ো তা হলে।"

অলি চোখ দুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "ওমা ! কাল থেকে কী করে হবে ? কাল তো আমরা চরকি ঘোরান ঘুরব। তা ছাড়া কাল বিশ্বকর্মা পুজো। তোমরা আছ। যা কিছু হবে তোমরা চলে যাওয়ার পর।"

জয়দীপ বাবলুকে বলল, "তোমরা কবে যাচ্ছ ?"

"আমরা পরশু সকালেই চলে যাব।"

"তা হলে ওইদিন থেকেই শুরু হোক।"

অলি বলল, "সবচেয়ে ভাল হয় পুজোর পর থেকে হলে।"

বাবলু বলল, "সে কী ! পুজোর তো এখনও অনেক দেরি। এই ক'দিন কী করবে ?"

অলি বলল, "অনেক দেরি কোথায় ? মাত্র পনেরো দিন বাকি। এই ক'দিনে পড়ায় মন বসবে না।"

বিলু বলল, "আশ্চর্য ! এত আগ্রহ তোমাদের। অথচ সব যখন ঠিক হল তখনই এড়াতে চাইছ ? বেশ মেয়ে তো !"

অলি বলল, "না না, এড়াতে চাইছি না। কারণটা অবশ্য তোমাদের বলা হয়নি, আসলে আমরা সকলেই একটি পর্বত অভিযাত্রী দলের সদস্যা। আমাদের এখন প্রশিক্ষণ চলছে। শিগ্‌গির দূরে কোথাও মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং-এ যাব আমরা। হয়তো সেটা পুজোর আগেই।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে বলল, "কোথায় ?"

"জায়গাটা এখনও ঠিক হয়নি। তবে খুব সম্ভবত অমরকণ্টকে।"

বাবলু বলল, "ওরে বাবা ! সে তো অনেকদূর। ঘরের কাছেই শুশুনিয়া, জয়চণ্ডী থাকতে অতদূরে কেন ?"

"ওসব জায়গার ট্রেনিং হয়ে গেছে আমাদের। এ বছর অমরকণ্টক হলে সামনের বছর চলে যাব হিমালয়ে। মোট কথা, যাওয়া আমাদের হবেই। ব্যবস্থা একেবারেই পাকা।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় হঠাৎ সেখানে এমন কয়েকজনের আবির্ভাব ঘটল যাদের উপস্থিতি মেনে নিতে পারল না কেউই। জয়দীপের অমন সুন্দর মুখখানি কালো হয়ে উঠল। সে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা

যাও, আমি এদের সঙ্গে একটু কথা বলব, কেমন ?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আগন্তুকদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর পঞ্চুকে ইশারা করে মেয়েদের নিয়ে এক-এক করে নেমে এল। ওরা ভেবে পেল না এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে জয়দীপের মতো ছেলের কী সম্পর্ক থাকতে পারে। তবুও বেলা অনেক হয়েছে, তাই আর এই ব্যাপারে বেশি মাথা না ঘামিয়ে অলিদের বাড়ির দিকেই রওনা হল ওরা।

॥ ৪ ॥

খানিক আসার পর বাবলু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। অলিকে বলল, "শোনো, তোমরা বাড়ি যাও। আমরা একটু আসছি।"

অলি বলল, "কোথায় যাবে তোমরা ?"

"একটু কাজ আছে আমাদের।" বলে বাচ্চু, বিচ্ছুকেও ইশারায় অলিদের সঙ্গে যেতে বলল।

অলি বলল, "বেশ একসঙ্গে আসছিলাম, হঠাৎ দলছুট হয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হল ?"

বন্দনা বাবলুর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই কিছু একটা অনুমান করে বলল, "আমাদের যখন যেতে বলছে তখন চল না !"

বিচ্ছু দল থেকে সরে এসে বাবলুকে কাছে ডেকে বলল, "তুমি কি আর একবার ওই টিলায় যেতে চাও বাবলুদা ?"

"হ্যাঁ। কেননা ওখানকার পরিস্থিতি একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে।"

"আমারও। মনে.হচ্ছে জয়দীপদা কোনও চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে।"

"ঠিক তাই। সেইজন্যই ব্যাপারটা কী, তা জানতে ইচ্ছে করছে।"

অলিরা বাচ্চু, বিচ্ছুকে নিয়ে ওদের বাড়ির দিকে চলল।

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে রয়ে গেল সেখানেই।

বিলু বলল, "তুই কেন রয়ে গেলি আমি বুঝতে পেরেছি। এবার কি তবে সুন্দরপাহাড়ি অভিযান ?"

"অবশ্যই। ওই লোকগুলোর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই কেমন যেন একটা অন্যরকমের গন্ধ পেলাম।"

ভোম্বল বলল, "আমিও। তা ছাড়া ওরা আসতেই জয়দার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল দেখেছিস ?"

বাবলু বলল, "দেখেছি বইকী ! তাই তো একটু নজরে রাখতে চাই ওদের। মনে হয় নির্ঘাত কোনও বিপদ ঘটতে চলেছে ছেলেটার।" বলে পঞ্চুকে ইশারা করে দ্রুত এগিয়ে চলল সুন্দর পাহাড়ির দিকে।

খানিক এসে পাহাড়ে ওঠবার মূল পথ ছেড়ে খুব সন্তর্পণে ওরা পাথরের খাঁজ ধরে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ওপরে উঠল। পঞ্চুও উঠল ওই একই কায়দায়। তারপর ঘন একটি ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লক্ষ করতে লাগল ওদের গতিবিধি।

ওরা মোট চারজন ছিল।

ওদের একজনের কথা কানে এল, "আমাদের প্রস্তাবে তা হলে রাজি নও ?"

জয়দীপ বলল, "বললাম তো, ও-কাজ কোনওমতেই সম্ভব নয়।"

"কিন্তু এর জন্য তোমার বাবাকে কী কঠিন মূল্য দিতে হবে তা কী জানো ?"

"আমার বাবাকে আপনারা চেনেন না তাই এই কথা বলছেন। আমাকে খুন করে আমার লাশ আমাদের বাড়ির সামনে ফেলে রাখলেও উনি রাজি হবেন না আপনাদের প্রস্তাবে।"

"তোমাকে খুন করার পর তোমার বাবা যে রাজি হবেন না তা আমরা জানি। কেননা, তখন তাঁর জেদ আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু একান্তই যদি রাজি না হন তা হলে এই কাজ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ খোলা থাকবে কী ?"

"আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।"

"সেই ইচ্ছেটা যদি খুবই মারাত্মক হয় ?"

"হবে।" জয়দীপ এবার কঠিন গলায় বলল, "আমার যা বলবার আমি বলেছি। এখন আপনারা যেতে পারেন।"

বাবলুরা সবই লক্ষ করল।

ওরা কিছু সময় চুপ থেকে বলল, "আজকের মতো আমরা যাচ্ছি। কাল সকালে এক নম্বর গেটের কাছে থাকব। তোমাদের শেষ সিদ্ধান্তটা জানিয়ো। বাবাকে বোলো, রায়সেন চুক্তিতে রাজি হলে টাকার অঙ্ক দশ লাখ। না হলে...।" বলেই একজন একটা রিভলভার বের করে ট্রিগার টিপল।

শব্দ হল খট করে। কিন্তু গুলি বেরোল না।

লোকটা বলল, "কালকের পরে কিন্তু এখান দিয়ে আর খট করে শব্দ হবে না। তখন হবে 'ডিসুম'। অর্থাৎ গুলি ছুটবে।"

জয়দীপ কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

লোকগুলোও আর অপেক্ষা না করে প্রস্তুত হল যাওয়ার জন্য। যাওয়ার আগে আর-একবার স্মরণ করিয়ে দিল, "কাল সকাল আটটা। এক নম্বর গেটের কাছে। কালই কিন্তু শেষদিন।"

ওরা চলে গেলে জয়দীপও চলে গেল।

বাবলুরাও তখন আত্মপ্রকাশ করল এক-এক করে। ওরা সেই জায়গায় এসে দাঁড়াল, যেখানে একটু আগেই নাটকের দৃশ্যের মতো ঘটনা ঘটে গেল একটা।

বাবলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ !"

বিলু বলল, "লোকটা যখন রিভলভার বের করল তখন আমি তো ভাবলাম দিল বুঝি শেষ করে।"

বাবলু বলল, "ও যে গুলি করবে না তা আমি জানতাম। না হলে তো লেলিয়েই দিতাম পঞ্চুকে। তবে কালকের ব্যাপারটা যে কোন দিকে মোড় নেবে তা কে জানে ?"

ভোম্বল বলল, "আজই নিষ্পত্তি একটা করে দেওয়া যেত ব্যাপারটার। ওদের যেতে দিলি কেন ? ওরা কী চায় তা ওদের মুখে শুনেই ব্যবস্থা একটা করা যেত।"

বাবলু বলল, "হট করে কিছু করা যায় ? জয়দাকে ওরা আক্রমণ করলে আমরা অবশ্য ছেড়ে দিতাম না, এখন আসল ব্যাপারটা কী তা জানতে হবে তো ?"

বিলু বলল, "জানাজানির কিছু নেই। বক্তব্য ওদের পরিষ্কার। রায়সেনের এই দুষ্টচক্র অন্যায়ভাবে কোনও অবৈধ বিল পাস করিয়ে নিতে চায় বিষ্ণু প্রধানের মাধ্যমে। রেল ব্যবস্থাকে দিনে-দিনে অবনতি ও লোকসানের দিকে এরাই তো ঠেলে দিচ্ছে। ওদের শর্ত মানলে 'ও কে', না মানলেই ডিসুম।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক তাই। কিন্তু ওদের যা হাবভাব তাতে মনে হয় বাবার ওপর বদলা নিতে ছেলেকে ওরা মারবেই।"

বিলু বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

"এখন তা হলে উপায় ? কী উপায়ে রক্ষা করা যায় ওকে ?"

বাবলু বলল, "রক্ষা ওকে করতেই হবে। বিশ্বকর্মা পুজো দেখা মাথায় থাক। কল্যাণেশ্বরী, মাইথনেও গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালে আমরা এক নম্বর গেটের কাছে ঘাপটি মেরে থাকব। তারপর, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। যদি ওরা আসে আর ওরা যদি জয়দাকে আক্রমণ করে তা হলে কিন্তু একজনও ফিরে যাবে না ওদের।" বলে পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চু মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বের করল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

ওরাও আর রইল না ওপরে। ধীরে-ধীরে নেমে এল। রোদ যেমন চড়া তেমনই ভ্যাপসা গুমোট। বহু দূরের মাইথনের জলাধারের দিক থেকে একটা কালো মেঘ ধেয়ে আসছে। মনে হয় বৃষ্টি হবে। ওরা নেমে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অটো পেয়ে

গেল। খুব একটা দূরের পথ তো নয়, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল মিহিজামে।

কিন্তু বাড়ি ফিরেই আর-এক দুঃসংবাদ। শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনারা বিদায় নিয়েছে। স্তব্ধ প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চু, বিচ্ছু আর অলি। অলির চোখে জল। কল্যাণীকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। আশপাশের বাড়ি থেকেও অনেকেই এসে হাজির হয়েছেন। ব্যাপারটা কী ?

অলি একটা হলুদ খামের চিঠি বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "একটা কিছু করো। আমাদের এই বিপদে পুলিশ নয়, তোমরাই এখন একমাত্র ভরসা।"

বাবলু চিঠিটা পড়েই সেটা বিলুর হাতে দিল। বিলু দিল ভোম্বলকে। চিঠিতে যা লেখা আছে তা হল এই :

"জয়ন্ত বোস আমাদের বাধা না দিলে আর ওই শয়তান ছেলেটা আমাদের পেছনে ধাওয়া না করলে আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হত না। ওদের দ্বারা ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা। যাই হোক, বাচ্চাটাকে নিয়ে গেলাম। বেশি নয়, তিন লাখ পেলেই ছেড়ে দেব। জয়ন্ত বোসের মতন একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে এই টাকাটা কিছুই নয়। কাল সন্ধেবেলা কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পেছনের জঙ্গলে বরাকর নদীর ঝরনার ধারে বিনিময় হবে। দেরি করলে প্রতিদিনের হিসেবে দিতে হবে এক লাখ করে। অর্থাৎ পাঁচদিনে পাঁচ প্লাস তিন, মোট আট লাখ। ছ'দিন কিন্তু নয়। হয় টাকা, না হয়...। পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। ফল তাতে খারাপ হবে।"

অলি বলল, "এখন আমরা কী করব বলো ?"

বাবলুরা নিরুত্তর। ওরা যে কী বলবে ভেবে পেল না। একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে-না-খেতেই আর-একটা দুশ্চিন্তা এসে হাজির হল। বিপদের পর বিপদ।

কল্যাণী কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "তোমরা সবাই চুপ করে গেলে কেন ভাই ? তোমরাই বলো, এখন আমি কী করব ? এই মুহূর্তে অত টাকা কোথায় পাব আমি ?"

বাবলু বলল, "জয়ন্তদাকে খবর দেওয়া হয়েছে ?"

অলি বলল, "হ্যাঁ।"

"উনি কি আসছেন ?"

"না। বলেছেন কোনওরকম হুমকির কাছে মাথা না নোয়াতে।"

কল্যাণী বললেন, "কিন্তু আমার বাবুয়া ? তাকে কী করে ফিরে পাব ?"

কল্যাণীর বাবা বললেন, "এই অবস্থায় পুলিশকে জানানো ছাড়া আমাদের কোনও উপায়ও নেই।"

বাবলু বলল, "ওই ভুলটি করবেন না দয়া করে। লেনদেনের মাধ্যমে যদিও ছেলেটাকে ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, থানা পুলিশ করলে সেটুকুও থাকবে না। পুলিশে খবর দিলে ওরা হয়তো রাগের চোটে মেরেই ফেলবে ছেলেটাকে।"

মা বললেন, "তা হলে কী করব ? অত টাকা কোথায় পাব আমরা ?"

বাবলু বলল, "ওর বাবাকে আসতে দিন।"

"সে তো আসবে না বলেছে।"

"বলেছেন। পরে তো মতের পরিবর্তন করতেও পারেন। ছেলে বলে কথা ! কিন্তু ভয় হচ্ছে উনি না ওখানকার পুলিশকে জানিয়ে দেন ব্যাপারটা।"

অলি চোখের জল মুছে বাবলুর হাত দুটি ধরে বলল, "তোমরা তো অনেকের অনেক সমস্যার সমাধান করেছ, তোমরা কি পারবে না আমাদের বাবুয়াকে আবার আমাদের বুকে ফিরিয়ে এনে দিতে ?"

বাবলু বলল, "পারতেই হবে। পারবার জন্য কৌশলে উপায়ও একটা বের করতে হবে। কিন্তু ওকে ওরা এই বাড়ির ভেতর থেকে নিয়ে গেল কী করে ?"

কল্যাণী বললেন, "অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছি। তার ওপর কাল ওইরকম সব কাণ্ড ঘটে গেল। রান্নাঘরে বসে মায়ের সঙ্গে সেই নিয়েই আলোচনা করছিলাম। ছেলেটা এ-ঘর, ও-ঘর করে খেলছিল। হঠাৎ ঘরের ভেতর কাচ ভাঙার শব্দ। ভাবলাম ছেলেটাই কিছু ফেলে ভাঙল বুঝি। তাই ছুটে গিয়ে দেখি জানলার শার্সির কাচ ভাঙা। আর ওই হলদে খামের চিঠিটা পড়ে আছে ঘরের ভেতর। সেইসঙ্গে ছেলেটাও নেই।"

"দিনুদা কোথায় ?"

"দিনুদা তো আমাদের পৌঁছে দিয়েই কারমাটারে ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গেছেন।"

বাবলু আর কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করে সকলকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কল্যাণী আবার কান্নাকাটি শুরু করলেন। অলিও কেঁদে-কেঁদে সারা। ওদের সকলের কান্না দেখে বাচ্চু, বিচ্ছুর চোখেও জল এসে গেল।

বাবলু অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে বাথরুমে ঢুকে স্নানপর্ব শেষ করল। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু প্রত্যেকেই।

স্নানপর্ব শেষ হলে বাবলু অলিকে বলল, "শোনো, তোমাদের বাড়ির যা পরিস্থিতি তাতে আমার মনে হয় আমাদের আর এখানে না থাকাই ভাল। তাই আমরা এখনই বিদায় নিচ্ছি। আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। ওটাও আমরা বাইরেই সেরে নেব।"

অলি বলল, "না, তা হয় না। তোমরা আমাদের অতিথি। কত আয়োজন আজ তোমাদের জন্য। তোমরা চলে গেলে কী করে হবে ?"

"সেইজন্যই তো বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের চোখের জলের সামনে কিছুই যে আমাদের মুখে রুচবে না। পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, তোমাদের অবস্থা দেখে ও কেমন মূক হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমাদের এই বিপদের দিনে তোমরা আমাদের পাশে না থেকে চলে যাবে ?"

"চলে না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"আমি কিন্তু অনেক আশা করেছিলাম তোমাদের কাছে।"

বাবলু বলল, "তুমি কী আশা করেছিলে তা আমি জানি। তোমার আশা যাতে পূর্ণ হয় সেইজন্যই আমরা যাচ্ছি। তবে বাড়ি যাচ্ছি না কিন্তু। এইখানেই আশপাশে কোথাও থাকব। এখন আমাদের সামনে দারুণ একটা সমস্যা চ্যালেঞ্জের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। যেভাবেই হোক, সেটার মোকাবিলা করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে কী করব তা স্থির করতে গেলে এখান থেকে চলে যেতেই হবে আমাদের।"

অলি কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল ওদের মুখের দিকে। তারপর বলল, "তোমরা কোথায় রইলে না রইলে আমি কী করে জানব ?"

"আমরা নিজেরা এসেই হোক অথবা ফোনেই হোক জানিয়ে দেব তোমাকে। তারপর তুমি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। বাবুয়াকে ওদের কবল থেকে নিয়ে আসতে গেলে তোমার সাহায্যের যে আমাদের একান্তই প্রয়োজন ! ইতিমধ্যে আমরা এখান থেকে সরে গিয়ে পাঁচজনে পরিকল্পনা করে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে নেব।"

অলি বলল, "বেশ। আমি তা হলে তোমাদের ডাক পাওয়ার আশায় রইলাম।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের ভুল না বুঝে আমাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল অলিদের বাড়ি থেকে। ওরা পথে নেমে সবে দু'-এক পা এগিয়েছে এমন সময় প্রবল বর্ষণ শুরু

হল। সে কী ভয়ঙ্কর দুর্যোগ! ওরা ছুটে গিয়ে একটা শেডের মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিল। এই দিনদুপুরেও যেন সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন।

এই চিত্তরঞ্জন মিহিজাম তো বড় কোনও শহর নয়, তাই হোটেল-লজের আধিক্য নেই। বৃষ্টি থামলে ওরা খোঁজখবর নিয়ে স্টেশনের এক নম্বর গেটের কাছে একটি লজ পেয়ে গেল। নীচের তলায় চার-পাঁচজনের শোওয়ার মতো বড়সড় একটি ঘরই পেল ওরা। সামনে গ্রিল দেওয়া বারান্দা আছে। বেশ চমৎকার।

সেই ঘরে জিনিসপত্তর রেখে ওরা খেতে চলল। দুপুর দুটো এখন। সকালের খাওয়া কখন হজম হয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে সবার। থাকার জায়গার অভাব হলেও খাবার হোটেলের এখানে অভাব নেই। ওরা ওরই মধ্যে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল দেখে ঢুকে পড়ল।

বাঙালির হোটেল। বাংলার খাওয়া। স্টেশনের ওপারটা বিহারে হলেও এপারে বর্ধমান জেলা। কাজেই খাওয়াদাওয়া রুচি অনুযায়ী। নিরামিষ, আমিষ দুই-ই আছে। ওরা মাছ-ভাতের অর্ডার দিয়ে খেতে বসে গেল। হোটেলে ভিড়ের জন্য আলাদা মাংস-ভাত বেঁধে নিল পঞ্চুর জন্য।

তারপর লজে ফিরে পঞ্চুকে খাইয়ে বারান্দায় পাহারায় রেখে ঘরে ঢুকে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে শয্যাগ্রহণ করল ওরা। এখন একটু ভালভাবে বিশ্রাম না করলেই নয়! কখন সেই শেষরাতে ঘুম থেকে উঠেছে সব। তারপর সারাটা দিন যা গেল তা বলবার নয়।

ওরা সবাই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু সবাই নির্বাক।

একসময় বিচ্ছুই নীরবতা ভঙ্গ করল, "বাবলুদা!"

"বল।"

"তখনকার ব্যাপারটা কী হল?"

"খুবই সিরিয়াস। বলবার সময় পাইনি বলে বলিনি।"

"এবারে বলো।"

বাবলু সুন্দরপাহাড়ির ঘটনাটা খুলে বলল বাচ্চু, বিচ্ছুকে।

সব শুনে বাচ্চু, বিচ্ছু কোনও মন্তব্যই করতে পারল না। আবার নীরবতা।

অনেক পরে বাচ্চুই বলল, "সব যেন কীরকম জট পাকিয়ে গেল, তাই না বাবলুদা?"

"হ্যাঁ রে। এ এক জটিল রহস্য। একদিকে ব্যাঙ্ক ডাকাতির জের, অপরদিকে দুষ্টচক্রের কবলে জয়দীপদার বিপন্নতা। কী নিষ্ঠুর নিয়তি যে ওর জন্য অপেক্ষা করছে তা কে জানে?"

বিচ্ছু বলল, "আমরা তা হলে কীভাবে এগোব? কাল যদি ওই রায়সেন চক্রের মোকাবিলা করতে যাই তা হলে বাবুয়াকে উদ্ধার করা যায় না। অথচ ওই নিষ্পাপ শিশুটাকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে এনে তো দিতেই হবে।"

বাচ্চু বলল, "অবশ্যই।"

বাবলু বলল, "কোনওকিছুই আমি ভেবে উঠতে পারছি না। যত চিন্তা করছি ততই যেন মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে।"

বিলু বলল, "এমন জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কখনও পড়িনি।"

ভোম্বল বলল, "কখনও পড়িনি বললে ভুল হবে। তবে অ্যাকশনটা অন্যবারের তুলনায় এবারে একটু বেশি। কেননা আমাদের এখন উভয় সঙ্কট।"

বাবলু বলল, "সবকিছু নির্ভর করবে সকালের পরিস্থিতির ওপর। যাই হোক, বিকেলবেলা আমাদের প্রধান কাজ হল

একবার বিষ্ণু প্রধানের বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করা। বাবাকে সব কথা খুলে বলতেই হবে। কেননা, বিষ্ণু প্রধান তাঁর বন্ধু যেহেতু, তাই তিনি কী বলেন একবার জানা দরকার।"

বিলু বলল, "অলিকেও তো একটা খবর দিতে হবে। আমরা কোথায় উঠলাম তা না জানালে ও বেচারি মনে-মনে দুঃখ পাবে খুব।"

বাবলু বলল, "বাবার সঙ্গে কথা বলার পরই আমরা ওদের ওখানে যাব। তা ছাড়া দেখতে হবে জয়ন্তদার কোনও ফোনটোন এল কি না।"

ভোম্বল বলল, "উনি নিজেও এসে হাজির হতে পারেন।"

বাবলু বলল, "এত তাড়াতাড়ি আসবেন কী করে? এলেও আসতে সন্ধে পার হয়ে যাবে।"

বিলু বলল, "এলে কিন্তু খুবই ভাল হয়। কেননা ওঁর সঙ্গেও তো এই ব্যাপারে কিছু করতে যাওয়ার আগে একবার পরামর্শ করা দরকার।"

বাচ্চু বলল, "উনি কী পরামর্শ দেবেন?"

"এমনও তো হতে পারে, বাবুয়ার মুক্তিপণ হিসেবে উনি সম্পূর্ণ টাকাটাই দিতে রাজি হয়ে গেলেন।"

ভোম্বল বলল, "অসম্ভব! তা উনি কখনওই করবেন না।"

এমন সময় বারান্দায় কুঁই-কুঁই ডাক।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ। দ্যাখ তো রে কে এল?"

বিলু উঠে গিয়ে দরজাটা অল্প ফাঁক করতেই দেখতে পেল অলিকে। একটা লেডিজ সাইকেল নিয়ে ঘরের সামনে মোরাম বিছানো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলু বলল, "কে রে, বিলু?"

"অলি।"

সাইকেলটা বারান্দায় রেখে বিলুর সঙ্গে অলি ভেতরে এলে বাবলু বলল, "আমরা তো কোনও খবর দিইনি। তুমি কী করে জানলে আমরা এখানে উঠেছি?"

অলি বলল, "আমি তো এইখানকারই মেয়ে। কাজেই এই অঞ্চলে হোটেল-লজ কোথায় কী আছে, সবই আমার নখদর্পণে। তাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি আমার।" তারপর একটু থেমে বলল, "তবে একটা কথা, আমাদের যা হওয়ার তা হয়েছে। আমাদের ব্যাপারে তোমরা কতখানি কী চিন্তাভাবনা করলে জানি না। তবুও তোমরা কিন্তু সাবধানে থেকো।"

বাবলু অলির মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, "হঠাৎ এ-কথা কেন?"

"কারণ আছে। প্রথমত, ওই হলদে খামের চিঠিতে তোমরা জেনেছ ওদের রাগ তোমাদের ওপর কতখানি, দ্বিতীয়ত, আমি এখানে আসবার সময় দেখলাম দু'জন লোক দূর থেকে তোমাদের এই ঘরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলছে।"

বাবলু হেসে বলল, "তাতেই বুঝে গেলে ওরা আমাদের বিরোধিতা করতে নেমে পড়েছে?"

অলি বলল, "আমি তোমাদের মতন গোয়েন্দা না হলেও একেবারে অক্ষরজ্ঞানহীন নই। যে দু'জনকে আমি দেখলাম তোমরাও তাদের চেনো। ওরা সেই লোক, যাদের আবির্ভাবে সুন্দরপাহাড়ির ওই সুন্দর পরিবেশটা অসুন্দর হয়ে উঠেছিল।"

বাবলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ!"

ভোম্বল ফোঁস করে উঠল, "কই, কোথায় তারা?"

বাবলু ভোম্বলকে ইশারায় বসতে বলল। তারপর বলল, "তারা যেখানেই থাক, মাথা গরম করিস না। এখন একদম ঘাঁটানো নয় ওদের। এমনকী, পথেঘাটে দেখা হলেও চিনতে না পারার ভান করে চলে যাবি। যেচে কথা বলতে এলে এমন ভান দেখাবি যেন আগে যে ওদের দেখেছিস এ-কথা মনেও নেই তোদের।"

বিলু বলল, "বাবলু ঠিকই বলেছে। এখন ওদের দিকে মনোযোগ দিলে ওরা সতর্ক থাকবে। পাশ দিয়ে চলে যাব, তবু তাকাব না। যাতে ওরা কোনওভাবেই আমাদের সন্দেহ না করে।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ কাল সকালের পরিস্থিতি দেখার পর যা করবার করব, এই তো?"

অলি আর থাকতে পারল না। বলল, "কাল সকালের পরিস্থিতি মানে? ওরা তো সন্ধের পর বলেছে। তোমরা কি বলতে চাও বাবুয়াকে নিয়ে যাওয়ার পেছনে ওদেরও হাত আছে?"

বাবলু বলল, "কোনও সিক্রেট ব্যাপার নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে আমরা আলোচনা করি না। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার কাছে কোনও কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়। তোমাদের বাড়ি থেকে আমাদের ওইভাবে চলে আসার আরও একটা কারণ আছে। শুধু বাবুয়া নয়, আরও একজনের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হচ্ছে আমাদের।"

অলি বলল, "কে সে?"

বাবলু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "আমার বাবার বন্ধু বিষ্ণু প্রধানের একমাত্র ছেলে জয়দীপদা।"

"জয়দীপদা?"

বাবলু তখন সকালের ঘটনাটা বুঝিয়ে বলল অলিকে। তারপর বলল, "কী ভয়ঙ্কর একটা বিপদের মুখোমুখি হয়েছে ছেলেটা বুঝতে পারছ তো? ওর যা বক্তব্য, তা ও বলেই দিয়েছে। কাল সকালেও যদি মতের পরিবর্তন না করে সঠিক কথা জানিয়ে দেয়, তখন কী হবে বা হতে পারে তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ?"

"ওরা তা হলে মেরেই ফেলবে ওকে?"

"ঠিক তাই। কিন্তু আমরা কিছুতেই তা হতে দেব না। প্রাণপণে বাধা দেব আমরা। প্রয়োজনে ওদের গুলি ছোটার আগেই আমার গুলি ছুটবে।"

"তা হলে বাবুয়াকে উদ্ধারের কী হবে?"

"মনে-মনে পরিকল্পনা একটা করে ফেলেছি। রাত্রিবেলা আরও একবার রিহার্সাল দিয়ে নেব। তুমি কিন্তু যোগাযোগ রেখো আমাদের সঙ্গে। আর তোমার জামাইবাবু যদি এসে যান তা হলে একটুও দেরি না করে আজ রাতেই তাঁকে নিয়ে চলে এসো আমাদের কাছে।"

অলি বলল, "বেশ। কিন্তু যদি না আসেন?"

"আসবেনই। একান্তই যদি না আসেন তুমি এসো। তবে রাত্রে নয়। কাল দুপুরের দিকে।"

অলি বলল, "তাই আসব। তোমরা কিন্তু আমার দিদির ছেলেটাকে...।"

বাবলু বলল, "তুমি এখন আসতে পারো।"

অলি একটু যেন আহত হয়ে নতমস্তকে বিদায় নিল।

ও চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সদলবলে বেরিয়ে পড়ল বিষ্ণু প্রধানের বাংলোর দিকে। এ-পথ সে-পথ করে যখন ওরা বাংলোয় এসে পৌঁছল তখন শুনল দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরই বাবা হঠাৎ করে দুর্গাপুরে চলে গেছেন।

॥ ৫ ॥

রাত তখন ন'টা। পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্টেশন-ধারের একটি দোকান থেকে রুটি আর মুরগির মাংস খেয়ে লজে ফিরে শোওয়ার আয়োজন করছে তেমন সময় ঠক-ঠক-ঠক।

বাবলু সাড়া দিল, "কে?"

"আমি জয়ন্ত বোস।"

ছেড়ে পিস্তলটা সঙ্গে রেখে ডেকে তুলল সকলকে। বলল, "কী রে! মর্নিংওয়াকে যাবি না?"
ভোম্বল একটু আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে 'ভোরনিং ওয়াক'। এখনও ভোর আছে তো?"
"আছে, আছে। ওঠ, উঠে পড় দেখি?"
বাবলুর ডাক পেয়ে এক-এক করে সবাই উঠে পড়ল এবার। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে তারাভরা আকাশের নীচে পা রাখল রাজপথে। সত্যি, কী অপূর্ব ভোর। সামনেই এক নম্বর গেট, বাসস্ট্যান্ড। আসানসোল ও বর্ধমানের বাস, যাত্রী বোঝাই করছে। চায়ের দোকানগুলোয় ড্রাইভার, কন্ডাক্টর ও প্যাসেঞ্জারদের ভিড়। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল। এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ভোরের বেলায় গরম চায়ে চুমুক দিয়ে পায়চারি করা যে কী দুর্লভ অভিজ্ঞতা, তা যার না হয়েছে সে বুঝবে না।
চা খেয়ে এ-পথ-সেপথ করে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতে লাগল ওরা। বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য আলোয় আলো চারদিকে। দূরের চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপের বিশাল শেডটা যেন একটা দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে।
একসময় ভোরের আবছা ভাব কেটে গেল। সকালও হল একসময়। হঠাৎই বিলুর নজর পড়ল লোকগুলোর দিকে। বলল, "বাবলু, লুক দ্যাট।"
"হোয়্যার?"
"ওই গুমটির ওধারে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে।"
"হ্যাঁ রে। তাই তো, নজরে রাখ।"
ভোম্বল বলল, "ক'টা বাজে এখন?"
বিচ্ছু ওর ঘড়ি দেখে বলল,"ছ'টা।"
"ওরে বাবা। তার মানে এখনও দু' ঘণ্টা।"
এইভাবেই সময় কাটতে লাগল। আটটাও বাজল একসময়। আটটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল লোকগুলো। কিন্তু হলে কী হবে? জয়দীপের পাত্তাই নেই।
বাচ্চু, বিচ্ছু তখন বাবলুর নির্দেশে পায়চারি করতে-করতে লোকগুলোর খুব কাছাকাছি গিয়ে কানখাড়া করে ওরা কী বলে না বলে শুনতে লাগল।
ওদের একজন বলল, "আর আসবে না। সময় পার হয়ে গেছে।"
"আমি তো বলেই ছিলাম। ভয়ানক জেদ ওদের।"
"তা হলে?"
"তা হলে আর কী? ডেথ ওয়ারেন্ট ইসু করো। পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ হোক।"
"কিন্তু ওরা যদি আগে থেকেই ব্যাপারটা গভর্নমেন্টের নোটিসে এনে থাকে। পুলিশে খবর দিয়ে থাকে?"
"ওইসব ভয় করতে গেলে এইসব কাজে নামা উচিত নয়। পুলিশের ভয় করলে কি ক্রাইম করা যায়? হিমালয়ে গিয়ে সাধু হয়ে বসে থাকো তা হলে।"
"তা হলে দেব নাকি এক গুলিতে এখনই শেষ করে?"
"খবরদার নয়। ছেলেটাকে প্রথমে কিডন্যাপ করা হবে। তারপর কোনও জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে জ্যান্ত বাঘের মুখে। যাতে প্রমাণ হবে খুন বা অপহরণ নয়, বন্যজন্তুর আক্রমণেই মারা গেছে ছেলেটা। উপরন্তু ডেডবডির কোনও চিহ্ন থাকবে না। নিখুঁতভাবে সব প্রমাণও লোপ হয়ে যাবে।"
নিজেদের মধ্যে ওরা যখন এইসব কথাবার্তা বলছিল তখন ওদেরই একজনের চোখ পড়ল বাচ্চু, বিচ্ছুর ওপর। ওরা কথা বন্ধ করে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর ফিসফিস করে কীসব বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে। একজন শুধু এগিয়ে গিয়ে বিচ্ছুর চিবুকে হাত দিয়ে বলল, "কী নাম তোমার খুকু?"
বিচ্ছু বলল, "আমার অনেক নাম। ডাকনাম বিচ্ছু। ভাল নাম শূর্পণখা।"
লোকটা লাফিয়ে উঠল, "সে কী! তোমার মতন এমন একটি ফুটফটে মেয়ের কখনও ওইরকম নাম হয়? তুমি মিথ্যে কথা বলছ। এখানে কী করতে এসেছিলে?"
বিচ্ছু লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, "লক্ষ্মণের নাক-কান কাটতে।"
লোকটি গম্ভীর হয়ে বলল, "অল্পবয়সেই একটু বেশি পেকেছ দেখছি। যাও, এইভাবে রাস্তায়-রাস্তায় না ঘুরে ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করো। আমরা অত্যন্ত বদ লোক। আমাদের কথাবার্তা কিছু শোনবার চেষ্টা কোরো না, কেমন? বলেই লোকটি ইশারায় অন্যদের যেতে বলে নিজেও চলে গেল সেই জায়গা ছেড়ে।
বিনা যুদ্ধে সকালটা কেটে গেল দেখে বাবলুদেরও আনন্দের অবধি রইল না। তবুও ওদের পরিকল্পনা তো জেনেছে, তাই সেই খবরটা দেওয়ার জন্য বিষ্ণু প্রধানের বাংলোর দিকে চলল ওরা।
সস্ত্রীক বিষ্ণু প্রধান তখন বাংলোর বাইরে যে ঘাসজমিটা আছে সেখানে পায়চারি করছিলেন। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখে দূর থেকেই হাত নেড়ে স্বাগত জানালেন। বাবলুরা দেখল বিষ্ণু প্রধানের মুখে দুশ্চিন্তার এতটুকু ছায়াও নেই।
বাবলু কাছে গিয়ে বলল, "জয়দীপদা কোথায়?"
বিষ্ণু প্রধান বললেন, "কেন গো, এই সাতসকালবেলা আবার জয়দীপদাকে কী দরকার?"
"কয়েকটা কথা বলতাম ওঁকে।"
"সে তো নেই।"
"কোথায় গেছে? আপনি কি জানেন ওঁর খুব বিপদ?"
"জানি। সেইজন্যই তো কাল রাতের অন্ধকারে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি ওকে। কিন্তু তোমরা কী করে জানলে?"
"আমরা আড়াল থেকে সব শুনেছি। ওরা হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।"
"তাও জানি। এই রায়সেন চক্রটা মোস্ট ডেঞ্জারাস। ওরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। ও এখানে থাকলে ওরা ওকে মারতই। তাই ওকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া পথ ছিল না।"
"বেশ করেছেন। কিন্তু এবার তো ওরা আপনাকে আক্রমণ করবে।"
"করুক না। তবুও আমি ওদের জালিয়াতির ফাঁদে পা দিয়ে আমার আদর্শের পথ থেকে সরে যাব না। আমার সততার ওপর বিশ্বাস রেখেই কর্তৃপক্ষ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমিও তাই সাধ্যমতো চেষ্টা করব আমার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে।"
পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সেখানে বৃথা সময় নষ্ট না করে লজে ফিরে এল। চারদিকে তখন মাইক বাজিয়ে মহা ধুমধামের সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজো শুরু হয়ে গেছে।

ওরা লজে ফিরে এসেই কল্যাণেশ্বরী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে পৌঁছতে পারলে ওদেরই ভাল। কেননা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গেলে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া দরকার। কল্যাণেশ্বরী যখন তীর্থস্থান তখন সেখানে রেস্টহাউস বা ওই ধরনের কিছু নিশ্চয়ই থাকবে। সময় হাতে থাকলে মাইথনটাও দেখে নেওয়া যাবে একফাঁকে। তারপর লড়ে যাবে দুষ্টের দমনে।
তাই ওরা সবকিছু গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে করে ওভারব্রিজ পেরিয়ে মিহিজামে অলিদের বাড়িতে ওসে হাজির হল। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসেই দেখল অবাক কাণ্ড! একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। আর অনেক পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে সেখানে।

বাবলুর বুকের ভেতরটা ঢিপ করে উঠল। বলল, "কী ব্যাপার বল তো ? খারাপ কিছু হল নাকি ? এত পুলিশ কেন ?"

জয়ন্তবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার শ্বশুরমশাইয়ের কীর্তি। এত করে বোঝালাম, তবু মেয়ের শোকে উতলা হয়ে থানা-পুলিশ করে যাচ্ছেতাই একটা ব্যাপার করলেন।"

বাবলু বলল, "যাঃ। সবকিছুই বানচাল হয়ে গেল। পুলিশ গিয়ে যদি ওই জায়গায় তল্লাশি শুরু করে তা হলে ওদের জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।"

জয়ন্তবাবু মাথা ঠুকতে লাগলেন। বললেন, "কী সর্বনাশ হল বলো তো ?"

বাবলু বলল, "কী বলব বলুন ? আর-একটু তর সইল না ভদ্রলোকের ?"

জয়ন্তবাবু বললেন, "ওখানে কি আর যাওয়ার প্রয়োজন আছে ?"

বাবলু বলল, "না, নেই। তবে আমরা যাব, বেড়াতে। পিকনিকের মেজাজ নিয়ে।"

জয়ন্তবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "দিনুদাকে বলা আছে। দিনুদাই নিয়ে যাবে তোমাদের।"

বাবলু বলল, "না জয়ন্তদা। আমরা একটু স্বাধীনভাবেই যেতে চাই। গাড়িটা থাকলে যে-কোনও মুহূর্তে আপনাদেরই কাজে লাগবে। আমরা বাসে যাব, সন্ধে পর্যন্ত ঘুরব। তারপর কাল সকালে ফিরে যাব যে-যার বাড়িতে।"

"তাই যাও ভাই, তোমাদের কিছু বলবার মতো মুখ তো আমার নেই।"

অলির মা-বাবা দু'জনেই বোধ হয় ভুলটা বুঝতে পেরে বাবলুর মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যে, সে চাহনির অর্থ যে কী বাবলুরা তা বুঝতে পারল না।

এখানকার পুলিশ অফিসার তখন ঘরে বসে কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবার বেরিয়ে এসে সকলকে দেখেই বললেন, "তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা ? তোমাদের নাম আমি শুনেছি। এইমাত্র তোমাদের ওখানকার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে যা নির্দেশ পেয়েছি তাতে আমাদের সহযোগিতা তোমরা সবসময়ই পাবে।"

বাবলু বলল, "আমাদের কোনও সাহায্যের দরকার নেই তো। আমরা বেড়াতে এসেছি, ঘুরে বেড়িয়ে সবকিছু দেখে কাল সকালেই চলে যাব।"

"তবু যদি প্রয়োজন হয়, বোলো। তবে একটা কথা, তোমরা অভিজ্ঞ ছেলেমেয়ে, আইনকানুনগুলো একটু মেনে চলবার চেষ্টা কোরো। এই যে ছেলেটাকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে গেল, এত টাকা চাইল, এসব তোমরা পুলিশকে জানালে না কেন ?"

বাবলু তখন ভীষণ রেগেছে। তবুও একটু মেকি হেসে বলল, "বাঃ রে। এসব আমরা আপনাদের জানাতে যাব কেন ? ছেলে কি আমাদের ? এর জন্য তো ছেলের বাবা-মা, দাদু-দিদিমা সবাই আছেন।"

"এই কথা তোমাদের মুখ থেকে শুনব আশা করিনি। ওদের তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারতে। তা ছাড়া পুলিশকে যখন তোমরা নানাভাবে সাহায্য করে থাকো, তখন...।"

বিচ্ছু বলল, "বেশ তো, ছেলেটার ব্যাপারে না হয় জানানো হয়নি, মেয়েটার ব্যাপারে তো হয়েছে। আজই সন্ধের সময় তিন লাখ টাকার মাধ্যমে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পেছনে বরাকর নদীর ঝরনার ওপারে যে জঙ্গলটা আছে সেইখানে বিনিময় হবে। ধরুন না সেইসময় হাতেনাতে।"

"ওদের ধরবার জন্য সবরকমের ফাঁদই আমরা পেতে রেখেছি।"

বাবলু বলল, "তা হলে তো ধরা ওরা পড়বেই। আমরা তা হলে বিদায় নিই, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ওরা আর একটুও না দাঁড়িয়ে স্থানত্যাগ করল। ওরা বাড়ির বাইরে যেতেই ছুটে এলেন জয়ন্তবাবু, "বাবলু !"

"বলুন দাদা।"

"ওদের ওপর রাগ করে আমার পাশ থেকে সরে যেয়ো না ভাই। আমার বাবুয়াকে আমার কাছে এনে দাও। প্লিজ, ওরা তোমাদের কতটুকু জানে ?"

"এখন যা হয়ে গেল তাতে আমাদের আর কিছু করার নেই জয়ন্তদা। আপনি নিজেও তো বুঝতে পারছেন, পাকা ঘুঁটি কীভাবে কেঁচে গেল। এই থানা-পুলিশের ব্যাপারটা কি এতক্ষণে ওদের কাছে পৌঁছয়নি ভেবেছেন ? ফলে ওরা আদৌ আর ওইদিকেই যাবে না। বাবুয়া আর অলিকেও ফেরত পাবেন না আপনারা। আমার এখন একটাই ভয়, ওদের মেরে ওরা প্রতিশোধ না নেয় !"

"আমি এখন কী করব তা হলে ?"

"ভগবানকে ডাকুন আর পুলিশের সঙ্গে থাকুন।"

জয়ন্তবাবুর মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, "উঃ ভগবান !"

বাবলুরা বিদায় নিয়ে এক নম্বর গেটের কাছে এসে বাসে উঠতে গেল। কিন্তু না, বাসে যা ভিড় তাতে পঞ্চুকে উঠতেই দিল না কেউ। অবশেষে একজনের সহযোগিতায় ওরা একটা জিপ ভাড়া করে কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্যাণেশ্বরীতে গিয়ে পৌঁছল।

॥ ৬ ॥

কল্যাণেশ্বরী যে এত ভাল জায়গা তা কে জানত ? জিপ ওদের নামিয়ে দিয়েই বিদায় নিল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা দোকানে জুতো রেখে ফুল-মালা ইত্যাদি কিনে প্রথমেই চলল মন্দিরে পুজো দিতে।

এই কল্যাণেশ্বরীর কত নামই না শুনেছে ওরা ! আজ সেই বিখ্যাত মন্দিরে দেবীদর্শনে এসে ওরা তাই অভিভূত হয়ে গেল। দেবী কল্যাণেশ্বরীর পুজো দিতে-দিতে ওরা ওদের জয় প্রার্থনা করল। প্রার্থনা করল, অশুভ শক্তির যেন বিনাশ হয়। আর প্রার্থনা করল, বাবুয়া ও অলির নিরাপত্তার। মা হলেন কল্যাণময়ী। ওদের অন্তরের ডাক নিশ্চয়ই তিনি শুনবেন। তিনি সদয় হলে সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়ে যাবে।

পুজো দিয়ে প্রসাদী প্যাঁড়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করে পঞ্চুর মুখেও একটু দিয়ে মন্দিরের পেছনে সেই ঝরনার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। এখন ভাদ্র মাস। ঝরনার জল তাই কলকল করে নামছে। সে কী দৃশ্য। কত লোক স্নান করছে। প্রসাদী ফুল-বেলপাতা জলে দিচ্ছে। ক্যামেরায় ছবি তুলছে কত লোক।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, কী সুন্দর, না ? মায়েদের নিয়ে একবার আসবে এখানে ? দারুণ একটা পিকনিক স্পট কিন্তু।"

বিচ্ছু বলল, "এলে এইরকম পচা ভাদ্রে নয়, শীতকাল দেখে আসব।"

বাবলু বলল, "এলেই হয় !" বলে হঠাৎই পাথরে পা রেখে রেখে, কখন ও ঝরনার জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে, ওপারে চলে গেল। তারপর একটু উচ্চস্থানে উঠে চারদিক বেশ ভাল করে দেখে আবার ফিরে এল।

পঞ্চু তো আনন্দে কখনও এ-পার কখনও ও-পার করছে। কখনও-বা মনের আনন্দে গা ভেজাচ্ছে ঝরনার জলে।

অনেকটা সময় এইভাবে কাটানোর পর একসময় ভোম্বল বলল, "আর নয়। এইবারে স্নানপর্বটা সেরে নিয়ে কোনও একটা হোটেলে বসে খেয়ে নিই চল। খুব খিদে পেয়েছে আমার।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে কেটে পড়া যাক।"

বাবুল বলল, "কেটে পড়বি কী রে ! নাটক দেখবি না ? সন্ধের

পর তো আড়াল থেকে লুকিয়ে আমরা দেখব বিনিময়টা কীরকম হয়।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে তো আজকের রাতটা এখানেই কোথাও কাটাতে হয় আমাদের।"

"কাটার। স্নানের ব্যাপারটা চুকিয়ে নিয়ে চল আমরা আগে একটা থাকার ব্যবস্থা করি কোথাও।"

বাবলুর কথা বোধ হয় শুনতে পেল একজন। লোকটা ঘুরেফিরে ফুলমালা, ধূপ ইত্যাদি বিক্রি করছিল। বলল, "তোমাদের কি ঘর চাই? আমার সন্ধানে ঘর আছে। ভাল ঘর। একশো টাকা লাগবে।"

বাবলু বলল, "তা লাগুক। পছন্দ হলে নিশ্চয়ই নেব।"

"পছন্দ হবেই। বাসস্ট্যাণ্ডের ধারে দোতলার ওপরে ঘর। তোমরা ঘর নিলে আমি দশ টাকা কমিশন পাব। নাও না ভাই! গরিব মানুষ আমি। খুব উপকার হয় তা হলে। এই করেই দিন চলে আমার।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, একটু অপেক্ষা করুন। আমরা স্নানটা সেরে নিই।"

লোকটি বলল "আমি এখানেই আছি।" বলে আবার তার কাজ করতে লাগল।

বাবলুরাও দেরি না করে এক-এক করে নেমে পড়ল ঝরনার জলে। স্নানের পরিকল্পনা ওদের আগে থেকেই ছিল। তাই তৈরি হয়েই এসেছিল ওরা। স্নান সেরে লোকটির সঙ্গে চলল ঘর দেখতে।

ঘর দেখেই পছন্দ হয়ে গেল ওদের। বেশ বড়সড় ঘর, বাথরুমটা আলাদা। তা হোক। ছ'জনের শোওয়ার ব্যবস্থা আছে ঘরে। ওরা পাঁচজন। কাজেই কোনও অসুবিধেই হবে না। সেই ঘরই ওরা একশো টাকায় পেয়ে গেল। বাবলু টাকাটা মালিকের হাতে দিয়ে দশটা টাকা লোকটিকে দিতেই লোকটি বলল, "না, না। এ টাকা তোমরা দেবে কেন? আমার কমিশন এখান থেকেই পাব। কারও কাছ থেকে বেশি নেব না ভাই।"

বাবলু বলল, "তা হোক, আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি অত্যন্ত সৎ লোক। এটা আমরা খুশি হয়েই আপনাকে দিচ্ছি।"

লোকটি অভিভূত। বলল, "তোমাদের ভাল হোক। কোনওরকম অসুবিধে হলেই তোমরা আমাকে জানিয়ো, কেমন? আমার নাম ভানু। ফুল-মালা বেচি। সবসময় এইখানেই থাকি আমি।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা ভানুদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এখানে নির্ভয়ে চারদিক ঘুরে বেড়ানো যাবে তো? মানে কোনও বদ লোকের পাল্লায় পড়ব না তো আমরা?"

"না, না। সেসব ভয় নেই। চোর-ডাকাতের জায়গা এটা নয়। এখানে কেউ বদমায়েশি করতে এলে মেরে ঠাণ্ডা করে দেব তাকে।" বলে চলে গেল।

বাবলুরা তখন ভাল একটা হোটেল দেখে দমভর খেয়ে পঞ্চুকে খাইয়ে ঘরে এল বিশ্রাম নিতে।

ভোম্বল তার বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলল, "কাল সকালেই যাচ্ছি তো আমরা?"

বাবলু বলল, "দেখি না, সন্ধের পর কী হয়!"

"কী আবার হবে? পুলিশ যে তখন বলল ওরা নাকি ওদের ধরবার জন্য সবরকমের ফাঁদ পেতে রেখেছে, কিন্তু কোথায় কী?"

বাবলু বলল, "আমি তো চারদিক লক্ষ করে কাউকেই দেখতে পেলাম না।"

বিলু বলল, "পুলিশ অত বোকা নয়। তা হলে অত বড়-বড় ক্রিমিনালরা সব ধরা পড়ত না। তবে কিনা আজকের ব্যাপারটা একটু চুপিসারে হয়ে গেলেই ভাল হত। এখন ফাঁদ যেমনই হোক না কেন, শিকার আসছে না।"

বাবলু বলল, "লোকগুলোকে ধরবার আমি একটা চমৎকার প্ল্যান করেছিলাম। ওরা ব্রিফকেস নিয়ে অলি আর বাবুয়াকে ফেরত দিলেই পঞ্চু পেছন দিক থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ত ওদের ওপর। আর সেই সুযোগে আমি ব্রিফকেসটা ছিনিয়ে নিতাম ওদের কাছ থেকে। তারপর গোলমাল বুঝলেই দেখাতাম পিস্তল।"

"এতে কি সমস্যার সমাধান হত ?"

"সাময়িকভাবে হত। টাকাগুলো বাঁচত। ছেলেমেয়েও ফেরত আসত। পরের ব্যাপারটা সামাল দিত পুলিশ।"

এইভাবেই আলোচনা করতে-করতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই পঞ্চুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা হয়ে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কী আশ্চর্য ! না এল পুলিশের গাড়ি, না জয়ন্তদা। ওরা বৃথাই সময় নষ্ট করল। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও কেউ যখন কোনওদিক থেকেই এল না, তখন ওরা হতাশ হয়ে ফিরে এল ঘরে।

বাবলু মনমরা হয়ে বসে রইল ওর বিছানায়।

বিলু বলল, "কেন এত চিন্তা করছিস ? এইরকম হবে তা কি জানতিস না ?"

"তা নয়। ভাবছি ওরা এল না কেন ?"

"হয়তো বুঝেছে এসে কোনও লাভ হবে না, তাই।"

বিচ্ছু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। হঠাৎই কী দেখে যেন সচকিত হয়ে উঠল সে। বলল, "বাবলুদা, শিগ্‌গির একবার এদিকে এসো তো ?"

"কেন রে ?" বলেই উঠে দাঁড়াল বাবলু।

"এসোই না ! এইমাত্র একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে থামল। আর....।"

শুধু বাবলু নয়, সবাই ছুটে এল জানলার কাছে। এসেই দেখল একজন লোক একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে। লোকটির গালে-কপালে পট্টি লাগানো। ওরা এক নজর তাকিয়েই বুঝল সে আর কেউ নয়, ভিমা। ভিমা এখানে কী করে এল ? তবে কী.... !

বাবলু এক মুহূর্তও দেরি না করে পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুত নেমে এল নীচে।

ততক্ষণে ভিমা অ্যাম্বুলেন্সে স্টার্ট দিয়েছে। ও যেতে যেতেই উধাও হয়ে গেল সে।

ভানুদা আশপাশেই কোথাও ছিলেন বোধ হয়। তাই কাছে এসে বললেন, "কী ব্যাপার ! কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো ? হলে বলবে।"

বাবলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "দাদা, এইমাত্র যে অ্যাম্বুলেন্সটা এখান দিয়ে গেল সেটাকে দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ, ওটা তো রায়সেন কোম্পানির অ্যাম্বুলেন্স।"

চমকে উঠল বাবলু। বলল, "ঠিক জানেন ?"

"না জানলে বললাম কী করে ?"

"যেভাবেই হোক ওই অ্যাম্বুলেন্সটাকে ধরতেই হবে।"

"অসম্ভব !"

"আপনি একটু সাহায্য করলেই সম্ভব হবে। আপনি এক্ষুনি কারও কাছ থেকে ম্যানেজ করে একটা স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিন আমাকে।"

"তা না হয় দিলাম কিন্তু এই রাত্রিবেলায় অচেনা জায়গায় কোথায় যাবে তুমি ? তা ছাড়া লোক ওরা ভাল নয়। ওই অ্যাম্বুলেন্সে রোগীও থাকে, চোরাই জিনিসও থাকে।"

বাবলু বলল, "যাই থাক, আগে আপনি আমার ব্যবস্থা করুন।"

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই নেমে এসেছে।

ভানুদা তখনই এই বাড়ির মালিকের স্কুটারটি চেয়ে বাবলুকে দিলেন। বাবলু সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে "জয় মা" বলে পঞ্চুকে স্কুটারে বসিয়ে ঝড়ের বেগে উড়ে চলল অ্যাম্বুলেন্স যে পথে গেছে সেইদিকে। ক্রোধে পঞ্চুর চোখ দুটো তখন হায়েনার মতো জ্বলছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে মসৃণ পিচঢালা পথ ধরে এঁকেবেঁকে অনেকদূর যাওয়ার পর একসময় অ্যাম্বুলেন্সটা চোখে পড়ল। পাহাড়ের কোলে একটু সমতলে একটি গোলাপি রঙের দোতলা বাড়ির সামনে ছায়াঅন্ধকারে রাখা ছিল সেটা।

বাবলু স্কুটারের গতি কমিয়ে সেটাকে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে পঞ্চুকে নিয়ে খুব সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল সেই বাড়ির দিকে। বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে। তার মানে লোক আছে ভেতরে। কিন্তু ভেতরে ঢোকবার সহজতম কোনও পথই কোথাও নেই। নেই জলনিকাশের দেওয়াল পাইপ। ও তবুও অ্যাম্বুলেন্সের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখে নিল ভেতরটা। সেটাও ফাঁকা। সাদা রঙের মারুতি ভ্যানের অ্যাম্বুলেন্স। তার গায়ে বড়-বড় অক্ষরে লেখা আছে 'রায়সেন অ্যান্ড কোং'। সে ভেবে পেল না এই চক্রটার সঙ্গে ভিমার সম্পর্কটা কী ? তবে কি ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতির চক্রেও রায়সেন কোং জড়িত ? না কি এরাই তারা ?

যাই হোক, ভিমা নিশ্চয়ই ভেতরে গেছে। এখন ওর বেরিয়ে আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যদি না আসে ? বাবলু ভেবে পেল না এই মুহূর্তে সে কী করবে ? বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারলে অনেক রহস্যই জানা যেত। কিন্তু ওই দুর্ভেদ্য দুর্গে কী করে ঢুকবে ও ? হঠাৎই পরপর কয়েকটা গুলির শব্দে কেঁপে উঠল বাড়ির ভেতরটা।

অমন যে পঞ্চু সেও কেমন হয়ে গেল। পিঠের শিরদাঁড়া টান করে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরল সে। বাবলুও পিস্তলটা হাতে নিল। কে কাকে গুলি করল তা কে জানে ?

একটু পরেই বাড়ির দরজা খুলে গেল। যমদূতের মতন দু'জন লোককে নিয়ে সুট-বুট-হ্যাট পরা একজন ওলের মতন লালমুখো লোক একটি ব্রিফকেস হাতে মিলিটারি মেজাজে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। কী অমানুষিক চেহারা তার ! মুখটা যেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। ওরা গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে বসতেই দু'জন লোক স্ট্রেচারে করে বয়ে আনল কাকে যেন। তারপর তাকে নিয়েই অ্যাম্বুলেন্স মুখ ঘুরিয়ে রওনা হল চিত্তরঞ্জনের দিকে।

বাবলু ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে পঞ্চুর সাহায্য নিয়ে বাধা দিতে পারত লোকটাকে। কিন্তু ফল তাতে খারাপ হত। কেননা এই বাড়ির রহস্য অনাবিষ্কৃতই রয়ে যেত তা হলে। এই বাড়িতে এখন কে আছে, কী আছে, গুলি করে মারা হল কাকে, কাকে নিয়ে যাওয়া হল, ভিমা কোথায়, এসবের কোনও কিছুই জানা যাবে না। সবই অজানা থেকে যাবে। তাই ওরা চলে যাওয়ার পর বাবলু বাড়ির ভেতরে ঢোকবার উপায় ভাবতে লাগল।

সবে দু-এক পা এগিয়েছে, এমন সময় দেখল একজন লোক বেরিয়ে এসে টর্চের আলো ফেলে চারদিক দেখে নিল বেশ ভাল করে। বাবলু একটা পিপুলগাছের গোড়ায় লুকিয়ে পড়েছিল তাই রক্ষে। না হলে ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কী ! লোকটা সবকিছু দেখে নিয়ে ভেতরের লোকেদের আলোর সঙ্কেত দিল। অমনই দেখা গেল দু'জন লোক একটা ডেডবডিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এসে পাহাড়ের খাদের দিকে চলে গেল। টর্চ হাতে লোকটাও গেল ওদের সঙ্গে। বাবলু আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ঢুকে

পড়ল বাড়ির ভেতরে। বাবলু একা নয়, পঞ্চুও ঢুকল।

বাড়ির নীচের তলায় দুটো ঘর। ওপরে দুটো। একপাশে সিঁড়ি। সিঁড়িতে চাপ-চাপ রক্তের দাগ। কোন হতভাগ্যর রক্ত, তা কে জানে ? বাবলু পঞ্চুকে নীচে পাহারার জন্য রেখে ওপরে উঠল। ওপরে উঠেই দেখল একটি ঘরের ভেতর গুলিবিদ্ধ একজন মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বাবলু ছুটে তার কাছে গিয়ে দেখল সে আর কেউ নয়, ভিমা। হায় রে বেচারি ! কী করুণ ভবিতব্য !

ভিমাও ওকে দেখল। দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তবুও আর্তস্বরে বলতে লাগল, "জল, একটু জল।"

শত্রু যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন, মরণকালে তার মুখে জল একটু দিতেই হয়। বাবলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা প্লাস্টিক জাগে ভরা জল এনে ভিমার মুখে দিল। ভিমা আকণ্ঠ পান করল সেটা। তারপর বহু কষ্টে হাত নেড়ে ইশারায় বাবলুকে বলল, "পালাও-পালাও।"

বাবলু বলল, "তোমাকে গুলি করল কে ?"

ভিমার কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেল। কিছু বলতে পারল না। তবে সমানে আকারে ইঙ্গিতে ওকে চলে যেতে বলল।

বাবলু বলল, "তুমি তো মরবেই। আমারও মৃত্যুভয় নেই। অতএব বলেই ফেলো তোমাকে মারল কে ?"

ভিমা অতি কষ্টে বলল, "কো-ম-পা-নি।"

"কোথায় গুলি করেছে তোমার ?"

ভিমা দেখিয়ে দিল জায়গাটা। গুলি করেছে দু' জায়গায়। বুকে আর পেটে। অর্থাৎ বাঁচবার কোনও আশাই আর নেই।

বাবলু বলল, "ওরা কোথায় ? জয়ন্তবাবুর সেই ছেলেটা আর অলি ? কোথায় তারা ?"

ভিমা ইশারায় ওকে পাশের ঘরে যেতে বলল।

বাবলু তক্ষুনি পাশের ঘরে গিয়েই দেখল ছোট্ট বাবুয়াটা ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ও কি বেঁচে আছে ? না ঘুমোচ্ছে ? নাকি আচ্ছন্ন হয়ে আছে কোনও ওষুধের প্রভাবে ? বাবলু ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বুঝল শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। কিন্তু অলি কই ? সে তো নেই। বাবলুর হঠাৎই মনে হল স্ট্রেচারে শুইয়ে একজনকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেই কি তবে অলি ? ও আবার ছুটে এল ভিমার কাছে।

ভিমার তখন একেবারেই শেষ অবস্থা।

বাবলু ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, "ছেলেটা আছে। কিন্তু সে কই ? সেই মেয়েটা ?"

"সে নেই।"

"তা তো জানি। কিন্তু কোথায় সে ?"

"ও-ও-ওকে নিয়ে গেছে।"

"কোথায় ?"

"পাঁ-চ-মা।"

"পাঁচ মাইল ?"

আর কিছুই বলতে পারল না ভিমা। একবার একটু বেঁকে উঠেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

বাবলুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "মা কল্যাণেশ্বরী তোমার কল্যাণ করুন।"

বাইরে একটা প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল তখন।

বাবলু এবার যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। আর এখানে থাকা ঠিক নয়। এক্ষুনি হয়তো ফিরে আসবে শয়তানগুলো। এখন আর যুদ্ধ নয়। ছোট্ট বাবুয়াকে তার বাবা-মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়াটাই আশু কর্তব্য। কিন্তু তার আগে ঘরের ভেতরগুলো একটু ভাল করে দেখে নিতে পারলে মন্দ হত না !

বাবলু যখন এইসব ভাবছে তখন হঠাৎই ওপরে উঠে এল পঞ্চু। তারপর এমন ছটফট করতে লাগল, যার অর্থ বুঝে নিতে বাবলুর দেরি হল না। এখানে লুকোবারও কোনও জায়গা নেই। এদিকে সিঁড়িতেও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। ও তাই উপায়ান্তর না দেখে বাথরুমের মধ্যেই ঢুকে পড়ল। বাবলু আর পঞ্চু দু'জনেই ঢুকল বাথরুমে। ঢুকে দরজাটা অল্প ফাঁক করে দেখতে লাগল ওরা কী করে না করে।

ওরা যা করল তা বড়ই মর্মান্তিক। ভিমার পা দুটো ধরে মরা কুকুরকে যেভাবে নিয়ে যায় সেভাবেই টানতে-টানতে নিয়ে চলল সিঁড়ি বেয়ে।

এ-দৃশ্য দেখা যায় না। রাগে নিশপিশ করতে লাগল বাবলু। একবার ভাবল এই নৃশংসতার চরম প্রতিশোধ এখনই নেয়। পরক্ষণেই ভাবল, এইসব করতে গিয়ে যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় তো বাবুয়াকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া গতকাল ভোরের আবছায়ায় ভিমার যে ভয়ঙ্কর মূর্তি সে দেখেছিল সেই দৃশ্য মনে হতেই ভাবল এদের পরিণাম এইরকমই হওয়া উচিত।

ওরা নেমে গেলে বাবলু দুটো ঘরেই খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কিন্তু না, ওর কাজে লাগে এমন কিছুই সে পেল না। যা আছে তা সবই ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্তর। তবু কিছু কাগজ, খাম পকেটে পুরে বাবুয়াকে বুকে নিয়ে পঞ্চুকে ইশারা করেই নেমে এল নীচে। কিন্তু দরজা টেনেই মাথায় হাত। দরজাটা বাইরে থেকেই শিকল দেওয়া।

সর্বনাশ ! কী হবে ?

বাবলুর বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। বিপদের পর বিপদ। ছোট্ট বাবুয়াটা হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল তারস্বরে। বাবলু ওকে থামাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

ততক্ষণে ওরা ছুটে এসেছে। ওদের পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে বাবলু। এখন সম্মুখ সমরে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই আর নেই। তাই দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ওদের শিকল খোলার সুযোগ দিল।

শিকল খুলে যেই না ওরা ভেতরে ঢুকতে যাবে পঞ্চু অমনই ভয়ানক একটা ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধরাশায়ী হল ওরা। তারপর সেই রাতের আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যে যেদিকে পারল পালাল। পঞ্চুও এদিক-ওদিক করে অনেকদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওদের।

এইসব দেখেশুনে কান্না মাথায় উঠে গেল বাবুয়ার। সে দু' হাতে বাবলুর গলা জড়িয়ে ধরল। বাবলু ওকে নিয়ে চলে এল সেই ঝোপের ধারে, যেখানে ওর স্কুটারটা রাখা ছিল। তারপর সেটাকে টেনে বের করে পঞ্চুকে উঠিয়ে নিয়ে স্টার্ট দিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে কল্যাণেশ্বরীতে যখন এসে পৌঁছল তখন নিস্তব্ধ, নিঝুম চারদিক। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর ভানুদা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

বাবলুকে ফিরে আসতে দেখে আনন্দের অবধি রইল না ওদের। বাচ্চু, বিচ্ছু দু'জনেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবুয়াকে। ছেলেটাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। স্কুটারের মালিককে স্কুটার ফেরত দিয়ে ভানুদাকে অভিনন্দন জানিয়ে বাবলু সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পঞ্চু এখন বেজায় খুশি। কেননা আজকের এই অভিযানে কিছু অন্তত করতে পেরেছে সে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে কল্যাণেশ্বরী থেকে বিদায় নিল ওরা। গতরাতে ঘুম বেশ ভালই হয়েছে। বিলুরা বুদ্ধি করে কিছু খাবার কিনে রেখেছিল তাই রাতটা উপোসে কাটাতে হয়নি। সকালে ওরা একটা জিপ ভাড়া করে চলে এল চিত্তরঞ্জনে। তারপর ওভারব্রিজ পেরিয়ে অলিদের বাড়িতে যখন এল সেখানে তখন শোকের ছায়া। এমন সময় হঠাৎ করে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই অভিভূত সকলে।

ওরা যে আসবে বা আসতে পারে তা যেন অপ্রত্যাশিত মনে হল এ-বাড়ির মানুষজনদের কাছে। তার ওপর বাবুয়াকে সঙ্গে নিয়ে।

জয়ন্তবাবু আর কল্যাণী হারানিধি ফিরে পেয়ে কী যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

জয়ন্তবাবু চিৎকার করতে লাগলেন, "ওরে, কে কোথায় আছিস দেখে যা রে, ওরে দ্যাখ রে আমার কে ফিরে এসেছে।" বলেই বিচ্ছুর কোল থেকে বাবুয়াকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে তুললেন। তারপর কল্যাণীর বুকে ছেলেকে সঁপে দিয়ে হাঁকডাক শুরু করলেন, "দিনুদা! দিনুদা! শিগ্‌গির আপনি দোকানে যান। সন্দেশ, রসগোল্লা যা পান তাই নিয়ে আসুন।"

কল্যাণী বাবুয়াকে বুকে নিয়ে বললেন, "আমার রক্ত দিয়েও তোমাদের এ ঋণ আমি শোধ করতে পারব না ভাই। মায়ের ছেলেকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে দিয়েছ তোমরা, এ কি কম কথা? মায়ের আশীর্বাদ রইল তোমাদের ওপর।"

বাবলু বলল, "শুনুন, আপনারা খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হবেন না। তার কারণ, বহুকষ্টে বাবুয়াকে আমরা উদ্ধার করলেও অলির কোনও খোঁজ পাইনি। সে এখনও দুষ্কৃতীদের কবলে।"

অলির বাবা-মা দু'জনেই কেঁদে ফেললেন, "সে কী! অলি আসেনি?"

"না। সম্ভব হয়নি তাকে ফিরিয়ে আনা। এমনকী সে যে কোথায় তাও জানি না আমরা।"

খবর পেয়ে শ্বেতা, মাধুরী, বন্দনা, চন্দনা, সবাই ছুটে এসেছে। সবাই বলল, "এসেছে? অলি এসেছে? কোথায় সে? অলি কই?"

বাবলু বলল, "জানি না।"

বন্দনা বলল, "সে কি তা হলে ফিরবে না?"

"কী করে বলব?"

"আমরা কত আশা করলাম!"

জয়ন্তবাবু বললেন, "আমার বাবুয়াকে তোমরা কোথায় পেলে?"

বাবলু বলল, "তার আগে বলুন আপনি কাল সন্ধের সময় ওখানে গেলেন না কেন? পুলিশ কেন গেল না?"

জয়ন্তবাবু ওদের ভেতরে এনে বসালেন। তারপর বললেন, "তোমরা কিছু শোনোনি?"

"না তো। কিছুই শুনিনি আমরা। কিছুই জানি না।"

"কাল তোমরা চলে যাওয়ার পরই পুলিশও বিদায় নিল। আর ঠিক তারপরই সে কী বিপর্যয়! হঠাৎ কোথা থেকে চার- পাঁচজন দুষ্কৃতী মুখে কালো কাপড় বেঁধে স্টেনগান পাইপগান নিয়ে ঘরে ঢুকেই বলল, 'টাকাটা দিন।' আমরা রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, 'কিসের টাকা?' ওরা ধমক দিয়ে বলল, 'শিগ্‌গির টাকা দিন।' প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভয়ে-ভয়ে আমরা টাকা-ভর্তি ব্রিফকেসটা তুলে দিলাম ওদের হাতে। ওরা সেটা নিয়ে বলল, 'গুনে দেখার সময় নেই আমাদের। তিন লাখই আছে তো?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ছেলেটা?' ওরা হাসল। হেসে বলল, 'পুলিশে খবর দেওয়ার সময় মনে ছিল না? ছেলেমেয়ে কিছুই ফেরত পাওয়া যাবে না আর। এখন তিন লাখ নিয়েছি, এর পর তিরিশ লাখ নেব। তারপর ভেবে দেখব কী করা যায়!' আমরা ওদের পায়ে ধরতে গেলাম। ওরা আমাদের লাথি মেরে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'এক সপ্তাহ বাদে আবার আমরা আসব। পারলে ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভেঙেও টাকাটার ব্যবস্থা করে রাখবেন। কোনওরকম চালাকি করতে যাবেন না আমাদের সঙ্গে, বুঝেছেন? বিষ্ণু প্রধান ভেবেছিলেন আমাদের চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধিমান তিনি। কিন্তু আমরা যে কতবড় বোকা তা এবার হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন।"

এই পর্যন্ত শুনেই ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল বাবলু। বলল, "আমরা আসছি।"

"সে কী! দিনুদা তোমাদের জন্য খাবার আনতে গেছেন।"

"আমাদের এখন খাওয়াদাওয়ার সময় নেই। এখন আমাদের অনেক কাজ।" বলেই হাঁক দিল, "পঞ্চু! বিলু! সবাই আয়। কুইক।"

বাবলুর কথায় সবাই উঠে দাঁড়াল। তারপর কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে একেবারে বাইরে।

বিলু বলল, "এখন কোথায় যাবি বাবলু?"

"বিষ্ণু প্রধানের ওখানে। মনে হচ্ছে জয়দীপদার ব্যাপারে কোনও কিছু গোলমাল একটা হয়েছে।"

ওরা যতটা সম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে স্টেশনের এপারে এসে দুটো রিকশা নিল। তারপর সুন্দরপাহাড়িতে বিষ্ণু প্রধানের বাংলোয় এসেই শুনল জয়দীপদা কিডন্যাপ্‌ড। যা ভেবেছে তাই। বাবলুর আশঙ্কা ষোলোআনাই সত্যি। ও আর একমুহূর্ত বিলম্ব না করে সবাইকে নিয়ে স্টেশনে এল। হাওড়া যাওয়ার তুফান এক্সপ্রেস তখন ধীর শ্লথ গতিতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। বাবলু প্রত্যেকের টিকিট কেটে একটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর বগিতে উঠে সেই যে চুপ হয়ে গেল, তারপর সারাটা পথে কারও সঙ্গে আর কোনও কথাই বলল না।

॥ ৭ ॥

ওরা যখন বাড়ি ফিরল রাত্রি তখন আটটা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, যে-যার বাড়ি চলে গেলে বাবলু মুখ-হাত ধুয়ে ওর ঘরে এসে পোশাক পরিবর্তন করেই বাবাকে একটা ফোন করল। ভাগ্য ভাল যে, একবার ডায়াল করতেই পেয়ে গেল লাইনটা।

বাবা বললেন, "কেমন ঘুরলি চিত্তরঞ্জন? নতুন করে কোনও ঝামেলা হয়নি তো?"

বাবলু সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "জয়দীপদার একটা খারাপ খবর আছে।"

"কীরকম!"

"রায়সেন চক্র কিড্‌ন্যাপ করেছে ওকে।"

"বলিস কী রে!"

"আরও অনেক কিছুই হয়েছে। যাই হোক, আমি এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই।"

"আমি কাল সকালেই যাচ্ছি। তুই নিশ্চিন্ত থাক।"

ফোন রেখে মায়ের দেওয়া এক কাপ চা খেয়েই বাবলু এবার থানায় গেল। কেউ তো নেই, পঞ্চুই সঙ্গে গেল তাই।

থানার বড়বাবু বাবলুকে দেখেই বললেন, "তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। ওদিককার খবর?"

"ভাল নয়। আমি যে গাড়ির নম্বর দুটো দিয়েছিলাম তার কী হল?"

"দুটো নম্বরই ফল্‌স।"

"বলেন কী!"

"তবে গাড়ির মালিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। জনৈক ব্যবসায়ীর গাড়ি ওটা। কার পার্কিং থেকে খোয়া যাওয়া এই গাড়ির জন্য একটা ডায়েরিও করিয়েছিলেন উনি।"

"ওঁর নাম-ঠিকানাটা পাওয়া যাবে?"

"অবশ্যই।" বড়বাবু একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে বাবলুর হাতে দিলেন।

বাবলু সেটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "আর ওই ডাকাত তিনজনের খবর?"

"ওদের মধ্যে দু'জন জনতার প্রহারে মৃত, একজন পলাতক।"

বাবলু এই ব্যাপারে আর কোনও কথা পুলিশকে না বলে বাড়ি

চলে এল। কাল সকালে বাবা দুর্গাপুর থেকে এলে বাবার সঙ্গে আলোচনার পর যা করবার করবে। কিন্তু কী করবে, কী করে করবে কিছুই ভেবে পেল না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, ব্যাঙ্ক ডাকাত ও অপহরণকারীরা একই দলের লোক।

রাত্রিবেলা বাবলুকে খেতে দিয়ে মা বললেন, "তোর কী হয়েছে বল তো বাবলা ? চিত্তরঞ্জন থেকে ঘুরে আসার পরই দেখছি তুই যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। তোর মনে কোনও আনন্দ নেই। কী যেন ভাবছিস। ওই শয়তানগুলো ওখানেও যায়নি তো ?"

বাবলু বলল, "আজ আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না মা। আমি বড় ক্লান্ত।"

"তা হলে রাত করিস না। শুয়ে পড়।"

বাবলু পঞ্চুকে ঘরে নিয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। শোওয়ার আগে রায়সেন কোম্পানির সেই কাগজপত্তরগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ও। দেখতে-দেখতে হঠাৎই একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর কত কী চিন্তা করল নিজের মনেই। বিষ্ণু প্রধান চাপা লোক। হয়তো অহঙ্কারী। তাই নিজের ব্যাপারে বা ছেলের ব্যাপারে মুখ খোলেননি ওদের কাছে। তবুও তিনি ওর বাবার বন্ধু। তাই ওঁর ছেলের ব্যাপারে মাথা ওরা ঘামাবেই। আর প্রাণপণ চেষ্টা করবে অলিকেও ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কোথায় অলি, কোথায় জয়দীপ। ভিমা মরবার আগে শুধু বলতে পেরেছে 'পাঁ-চ-মা—।' এই কথার অর্থ কী ? ওখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোথাও কী ? এই ব্যাপারে একমাত্র বাবাই হয়তো আশার আলো দেখাতে পারেন। রায়সেন কোম্পানির ব্যাপারে বাবা কিছু-না-কিছু জানবেনই। এইসব চিন্তা করতে-করতে একসময় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল বাবলু।

ভোরের সময় ভোর হল। ঘুমও ভাঙল ঠিক সময়। আজ আর মর্নিং ওয়াকে যেতে ইচ্ছে করল না ওর। কেন কে জানে, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও এল না কেউ। বাবলু উঠে দরজা খুলে পঞ্চুকে বাইরে বেরোতে দিল।

দেখতে-দেখতে সকাল হল। ওর বাথরুমের কাজ শেষ হলে মা চা-বিস্কুট দিয়ে গেলেন।

সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে এমন সময় বাবা এলেন। কোম্পানির গাড়িতেই এসেছেন বাবা।

তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির হল এক-এক করে।

বাবা ঘরে ঢুকে কাপড়-জামা ছাড়তে-ছাড়তেই বললেন, "কাল রাতেই বিষ্ণু প্রধানকে ফোন করেছিলাম। শুনলাম ছেলেটা নাকি ল্যান্সডাউনে ওর মাসির বাড়ি যাচ্ছিল। হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই নিখোঁজ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই নির্বাক হয়ে বসে রইল।

বাবা মুখ-হাত ধুয়ে এসে ওদের সঙ্গে চায়ের আসরে বসতেই মা গরম-গরম লুচি আর হালুয়া দিলেন প্রত্যেককে। সেইসঙ্গে চা।

বাবলু বাবাকে বলল, "আমরা মিহিজামে যাদের বাড়িতে উঠেছিলাম সেই বাড়ির মেয়েটাকেও কিডন্যাপ করেছে ওরা। আর নিয়ে গিয়েছিল জয়ন্তদার ছেলে বাবুয়াকে।"

মা শুনেই শিউরে উঠলেন, "বলিস কী রে! ওই দুধের বাচ্চাটাকে ?"

"হ্যাঁ। তবে বহুকষ্টে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে পেরেছি কিন্তু মেয়েটার কোনও হদিস পাইনি। ব্যাঙ্ক ডাকাতদের যে দলটা মগরার কাছে আমাদের আক্রমণ করেছিল, তাদেরই একজনকে ওই রায়সেন চক্রের হাতে মরতে দেখে বুঝেছি এই ডাকাতিটা ওদেরই কাজ। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না এই রায়সেন চক্রটা কী ?"

বাবা বললেন, "তা হলে শোন, রায়সেন বলতে যেন রায় আর সেন এইরকম কিছু মনে করিস না। এককালে এটি একটি বিদেশি সংস্থা ছিল। এর মালিক ছিলেন রায়সেন হিব্‌রো। পরে হস্তান্তর হতে-হতে এখন এমন একজনের মালিকানায় এসে পৌঁছেছে যে, লোকটা মানুষ না পিশাচ তা কেউ জানে না। কয়লা, কোকেন, আকরিক লোহা, সিমেন্ট, কী নিয়ে না ব্যবসা এবং দুর্নীতি করছে লোকটা! ওর অসাধুতার জন্য কোম্পানি লাটে উঠেছে। মোটা-মোটা টাকা দিয়ে কয়েকজন চোর-ডাকাত পুষছে এখন। সৎ উপায়ে টাকা রোজগারের চেয়ে অসৎ উপায়ে কোটিপতি হওয়ার নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে। নিজের বুক-করা জিনিস নিজেই ডাকাতি করে ক্ষতিপূরণ চাইছে রেলের কাছে। কী বিরাট দুর্নীতির চক্র।"

বাবলু বলল, "লোকটাকে পুলিশে ধরছে না কেন ?"

"কী করে ধরবে ? প্রমাণ কই ? তা ছাড়া টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে সকলের।"

"লোকটার নাম জানো ?"

"আলেকজান্দার মারিয়া।"

"এটা কোনও নাম হল ?"

"ওই নামেই খ্যাত ও।"

"কোথাকার লোক বলে মনে হয় ?"

"জানি না। তবে মনে হয় গোয়ানিজ।"

"গোয়ানিজরা অত ফরসা হয় নাকি ? লাল ওলের মতো মুখ।"

বাবা সবিস্ময়ে বললেন, "তুই কী করে জানলি ? লোকটাকে দেখেছিস ?"

বাবলু তখন সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল বাবাকে।

সব শুনে বাবা বললেন, "তোরা কি এই ব্যাপারে এগোতে চাস ?"

"অবশ্যই।"

বাবা গম্ভীর হয়ে আর এক কাপ চা খেয়ে উঠে গেলেন।

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বিলুকে বলল, "শোন, তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাব আমি। ফিরতে হয়তো দেরি হবে, বাড়িতে একটু বলে আয়।"

ভোম্বল ববল, "আমরা যাব না ?"

বাবলু বলল, "পঞ্চু যাবে। আসলে আমি স্কুটার নিয়ে যাব তো। সকলের হবে না। তোরা বরং এক কাজ কর, একটু বেলায় ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজ নে জয়ন্তদা ফিরেছেন কি না।"

ভোম্বল ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

বাচ্চু বলল, "তোমরা দু'জনে কোথায় যাবে বাবলুদা ?"

"ঘুরে এসে বলব।"

বাবলু স্কুটার বের করে 'পঞ্চু' বলে হাঁক দিতেই তীরবেগে গলির মোড় থেকে ছুটে এল পঞ্চু। বিলুও কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এল বাড়ি থেকে। বাবলু ওদের নিয়ে স্কুটারে চেপে রওনা হল মন্দিরতলার দিকে।

বিলু বলল, "এদিকে কোথায় যাবি রে ?"

বাবলু বলল, "এখন কোনও কিছু জিজ্ঞেস করিস না, দ্যাখ না, কোথায় যাই।"

বিলু চুপ করল।

বাবলু স্কুটার নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে উঠেই টোল ট্যাক্স দিয়ে ওপারে পৌঁছে পিজির পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ল হরিশ মুখার্জি রোডে। লাল রঙের একটা বাড়ির সামনে এসে নম্বর মিলিয়ে স্কুটার থামাল বাবলু। তারপর স্কুটারটাকে একটু নিরাপদ দূরত্বে ফুটপাথের ওপর রেখে বিলুকে বলল, "তুই এখানে থাক। বিশেষ প্রয়োজনে আমি একবার ওই বাড়ির ভেতরে যাব। যদি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে না ফিরি তুই তা হলে ভবানীপুর থানায় চলে

চলে এল। কাল সকালে বাবা দুর্গাপুর থেকে এলে বাবার সঙ্গে আলোচনার পর যা করবার করবে। কিন্তু কী করবে, কী করে করবে কিছুই ভেবে পেল না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, ব্যাঙ্ক ডাকাত ও অপহরণকারীরা একই দলের লোক।

রাত্রিবেলা বাবলুকে খেতে দিয়ে মা বললেন, "তোর কী হয়েছে বল তো বাবলা ? চিত্তরঞ্জন থেকে ঘুরে আসার পরই দেখছি তুই যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস। তোর মনে কোনও আনন্দ নেই। কী যেন ভাবছিস। ওই শয়তানগুলো ওখানেও যায়নি তো ?"

বাবলু বলল, "আজ আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না মা। আমি বড় ক্লান্ত।"

"তা হলে রাত করিস না। শুয়ে পড়।"

বাবলু পঞ্চুকে ঘরে নিয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। শোওয়ার আগে রায়সেন কোম্পানির সেই কাগজপত্তরগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ও। দেখতে-দেখতে হঠাৎই একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর কত কী চিন্তা করল নিজের মনেই। বিষ্ণু প্রধান চাপা লোক। হয়তো অহঙ্কারী। তাই নিজের ব্যাপারে বা ছেলের ব্যাপারে মুখ খোলেননি ওদের কাছে। তবুও তিনি ওর বাবার বন্ধু। তাই ওঁর ছেলের ব্যাপারে মাথা ওরা ঘামাবেই। আর প্রাণপণ চেষ্টা করবে অলিকেও ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কোথায় অলি, কোথায় জয়দীপ। ভিমা মরবার আগে শুধু বলতে পেরেছে 'পাঁ-চ-মা—।' এই কথার অর্থ কী ? ওখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোথাও কী ? এই ব্যাপারে একমাত্র বাবাই হয়তো আশার আলো দেখাতে পারেন। রায়সেন কোম্পানির ব্যাপারে বাবা কিছু-না-কিছু জানবেনই। এইসব চিন্তা করতে-করতে একসময় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল বাবলু।

ভোরের সময় ভোর হল। ঘুমও ভাঙল ঠিক সময়। আজ আর মর্নিং ওয়াকে যেতে ইচ্ছে করল না ওর। কেন কে জানে, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও এল না কেউ। বাবলু উঠে দরজা খুলে পঞ্চুকে বাইরে বেরোতে দিল।

দেখতে-দেখতে সকাল হল। ওর বাথরুমের কাজ শেষ হলে মা চা-বিস্কুট দিয়ে গেলেন।

সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে এমন সময় বাবা এলেন। কোম্পানির গাড়িতেই এসেছেন বাবা।

তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির হল এক-এক করে।

বাবা ঘরে ঢুকে কাপড়-জামা ছাড়তে-ছাড়তেই বললেন, "কাল রাতেই বিষ্ণু প্রধানকে ফোন করেছিলাম। শুনলাম ছেলেটা নাকি ল্যান্সডাউনে ওর মাসির বাড়ি যাচ্ছিল। হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই নিখোঁজ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই নির্বাক হয়ে বসে রইল।

বাবা মুখ-হাত ধুয়ে এসে ওদের সঙ্গে চায়ের আসরে বসতেই মা গরম-গরম লুচি আর হালুয়া দিলেন প্রত্যেককে। সেইসঙ্গে চা।

বাবলু বাবাকে বলল, "আমরা মিহিজামে যাদের বাড়িতে উঠেছিলাম সেই বাড়ির মেয়েটাকেও কিডন্যাপ করেছে ওরা। আর নিয়ে গিয়েছিল জয়ন্তদার ছেলে বাবুয়াকে।"

মা শুনেই শিউরে উঠলেন, "বলিস কী রে! ওই দুধের বাচ্চাটাকে ?"

"হ্যাঁ। তবে বহুকষ্টে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে পেরেছি কিন্তু মেয়েটার কোনও হদিস পাইনি। ব্যাঙ্ক ডাকাতদের যে দলটা মগরার কাছে আমাদের আক্রমণ করেছিল, তাদেরই একজনকে ওই রায়সেন চক্রের হাতে মরতে দেখে বুঝেছি এই ডাকাতিটা ওদেরই কাজ। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না এই রায়সেন চক্রটা কী ?"

বাবা বললেন, "তা হলে শোন, রায়সেন বলতে যেন রায় আর সেন এইরকম কিছু মনে করিস না। এককালে এটি একটি বিদেশি সংস্থা ছিল। এর মালিক ছিলেন রায়সেন হিব্রো। পরে হস্তান্তর হতে-হতে এখন এমন একজনের মালিকানায় এসে পৌঁছেছে যে, লোকটা মানুষ না পিশাচ তা কেউ জানে না। কয়লা, কোকেন, আকরিক লোহা, সিমেন্ট, কী নিয়ে না ব্যবসা এবং দুর্নীতি করছে লোকটা! ওর অসাধুতার জন্য কোম্পানি লাটে উঠেছে। মোটা-মোটা টাকা দিয়ে কয়েকজন চোর-ডাকাত পুষছে এখন। সৎ উপায়ে টাকা রোজগারের চেয়ে অসৎ উপায়ে কোটিপতি হওয়ার নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে। নিজের বুক-করা জিনিস নিজেই ডাকাতি করে ক্ষতিপূরণ চাইছে রেলের কাছে। কী বিরাট দুর্নীতির চক্র।"

বাবলু বলল, "লোকটাকে পুলিশে ধরছে না কেন ?"

"কী করে ধরবে ? প্রমাণ কই ? তা ছাড়া টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে সকলের।"

"লোকটার নাম জানো ?"

"আলেকজান্দার মারিয়া।"

"এটা কোনও নাম হল ?"

"ওই নামেই খ্যাত ও।"

"কোথাকার লোক বলে মনে হয় ?"

"জানি না। তবে মনে হয় গোয়ানিজ।"

"গোয়ানিজরা অত ফরসা হয় নাকি ? লাল ওলের মতো মুখ।"

বাবা সবিস্ময়ে বললেন, "তুই কী করে জানলি ? লোকটাকে দেখেছিস ?"

বাবলু তখন সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল বাবাকে।

সব শুনে বাবা বললেন, "তোরা কি এই ব্যাপারে এগোতে চাস ?"

"অবশ্যই।"

বাবা গম্ভীর হয়ে আর এক কাপ চা খেয়ে উঠে গেলেন।

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বিলুকে বলল, "শোন, তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাব আমি। ফিরতে হয়তো দেরি হবে, বাড়িতে একটু বলে আয়।"

ভোম্বল ববল, "আমরা যাব না ?"

বাবলু বলল, "পঞ্চু যাবে। আসলে আমি স্কুটার নিয়ে যাব তো। সকলের হবে না। তোরা বরং এক কাজ কর, একটু বেলায় ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজ নে জয়ন্তদা ফিরেছেন কি না।"

ভোম্বল ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

বাচ্চু বলল, "তোমরা দু'জনে কোথায় যাবে বাবলুদা ?"

"ঘুরে এসে বলব।"

বাবলু স্কুটার বের করে 'পঞ্চু' বলে হাঁক দিতেই তীরবেগে গলির মোড় থেকে ছুটে এল পঞ্চু। বিলুও কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এল বাড়ি থেকে। বাবলু ওদের নিয়ে স্কুটারে চেপে রওনা হল মন্দিরতলার দিকে।

বিলু বলল, "এদিকে কোথায় যাবি রে ?"

বাবলু বলল, "এখন কোনও কিছু জিজ্ঞেস করিস না, দ্যাখ না, কোথায় যাই।"

বিলু চুপ করল।

বাবলু স্কুটার নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে উঠেই টোল ট্যাক্স দিয়ে ওপারে পৌঁছে পিজির পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ল হরিশ মুখার্জি রোডে। লাল রঙের একটা বাড়ির সামনে এসে নম্বর মিলিয়ে স্কুটার থামাল বাবলু। তারপর স্কুটারটাকে একটু নিরাপদ দূরত্বে ফুটপাথের ওপর রেখে বিলুকে বলল, "তুই এখানে থাক। বিশেষ প্রয়োজনে আমি একবার ওই বাড়ির ভেতরে যাব। যদি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে না ফিরি তুই তা হলে ভবানীপুর থানায় চলে

যাবি। তুই নিজেও কিন্তু একটু সাবধানে থাকবি, কেমন ?"
বিলু বলল, "আচ্ছা।"
বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে সেই বাড়ির দিকে এগোল। বাড়ির কাছে এসে বাড়িটার নীচে-ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেমপ্লেটটাও পড়ে নিল। ঘুশৃণেশপ্রসাদ ভাট। অর্থাৎ জি. এস. ভাট। ঠিক জায়গাতেই এসেছে তা হলে। বাবলু আর কোনওদিকে না তাকিয়ে ডোর-বেলে চাপ দিল এবার।
একজন দরোয়ান গোছের লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কৌন ?"
"বাবু বাড়িতে আছেন ?"
"নেহি।"
"কোথায় গেছেন ?"
লোকটি বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল, "কৌন হো তুম ?"
"যেই হই না কেন, আমি জানতে চাইছি বাবু কোথায় গেছেন ?"
দরোয়ান এবার ভয়ে-ভয়ে বলল, "তুম ও পাঁচপণ্ডববালা লেড়কা তো নেহি ?"
বাবলু হেসে উঠল হো-হো করে। তারপর বলল, "ঠিকই ধরেছ তুমি, আমিই সেই। পঞ্চপাণ্ডবদেরই একজন। বাবু গাড়িটা ফেরত পেয়েছে ?"
"হাঁ। মিল গয়া।"
"কোথায় সেটা ? বাইরে দেখলাম না তো ?"
"বাবু লে কর গয়া।"
"এখন কে আছে বাড়িতে ?"
"কোঈ নেহি। ম্যায় অকেলে হুঁ।"
"আমি একবার ঢুকব বাড়ির ভেতর।"
"নেহি। বাবুকো আনে দিজিয়ে।"
বাবলু তখন বাধ্য হয়েই পিস্তলটা বের করল। করে বলল, "জানো নিশ্চয়ই, আমি গুলি চালালে আমার ফাঁসি হয় না। রাস্তা ছাড়ো।"
পঞ্চু তখন বাবলুর আদেশের অপেক্ষা না করেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে পড়ল ওপরে। তারপর এমন হাঁকডাক করতে লাগল যে, মনে হল নিশ্চয়ই সে কিছু-না-কিছু দেখেছে সেখানে।
বাবলু দরোয়ানকে বলল, "চলো, ওপরে চলো।"
দরোয়ান অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবলুকে নিয়ে ওপরে উঠল।
একটি বন্ধ ঘরের দরজার ওপর পঞ্চু তখন লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর সেই ঘরের জানলায় উঁকি দিচ্ছে ফুটফুটে একটি কিশোরীর মুখ। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া।
বাবলু এসেই শিকলটা খুলে দিতে অপরূপ সুন্দরী পঞ্চদশী এক কিশোরী ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।
বাবলুর চোখে তখন ক্রোধের আগুন। দরোয়ানকে বলল, "এই যে তখন বললে এ-বাড়িতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তা হলে এখানে মেয়ে এল কোত্থেকে ?"
দরোয়ান আর উত্তর দিতে পারল না।
বাবলুর নির্দেশে পঞ্চু তখন ছাদের ওপরটা দেখতে গেল।
মেয়েটার চোখে জল। সে কাঁদতে-কাঁদতে বাবলুকে বলল, "আমাকে বাঁচাও। আজ নিয়ে দশদিন হল এরা আমাকে এই ঘরে আটকে রেখেছে।"
বাবলু বলল, "কে তুমি ? তোমার নাম কী ?"
মেয়েটি বলল, "আমার নাম রাগিণী। আমি জব্বলপুরের মেয়ে। আমার বাবা একজন ডি. এফ. ও। চোরাকাটরাদের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার বাবা এদের ক্রোধানলে পড়েছেন। তাই বাবার ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে এরা আমাকে এইখানে নিয়ে এসে আটকে রেখেছে।"
বাবলু বলল, "আর কোনও ভয় নেই তোমার। তুমি এখন মুক্ত। তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সবরকম ব্যবস্থাই আমি করব।" বলেই দরোয়ানকে বলল, "এ-বাড়িতে আর কাকে-কাকে আটকে রেখেছ ?"
দরোয়ান কিছু বলার আগেই নীচের থেকে ভারী গলার একটা কণ্ঠস্বর কানে এল, "শিউপুজন ! এ শিউপুজন !"
দরোয়ান সাড়া দিল, "হাঁ বাবু।"
"বাহারকা দরোয়াজা খুলা রাখকা কিঁউ ?"
বলার সঙ্গে-সঙ্গেই অঘটন। শিউপুজন এক ধাক্কায় বাবলুকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়েই দরজায় শিকল তুলে দিল। তারপর রাগিণীর হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল নীচের দিকে।
রাগিণী চিৎকার করতে লাগল, "ছাড়ো, ছাড়ো। ছোড় দো মুঝে। ছেড়ে দাও বলছি।" বলে জোর করে হাত ছিনিয়ে নিতে গেল। কিন্তু শিউপুজনের আসুরিক শক্তির সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন ?
বাবলু জানলা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখেই চেঁচাল, "পঞ্চু ! পঞ্চু !"
পঞ্চুকে কি ডাকতে হয় ? পঞ্চুর কান খাড়াই থাকে। বাবলুকে ঠেলে ঘরে ঢোকানো, শিকল দেওয়া, রাগিণীর চিৎকার, সবই কানে গেছে ওর। তাই বাবলুর ডাক পাওয়ার আগেই নেমে আসছিল সে। এবার অধিক উৎসাহে ভয়ঙ্কর হাঁকডাক ছেড়ে ক্ষিপ্র গতিতে ধেয়ে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল শিউপুজনের ওপর।
একশোটা ভেড়ার গোয়ালে একসঙ্গে আগুন লাগলে যেরকম আর্তনাদ ওঠে, শিউপুজনের গলা দিয়েও সেইরকম আওয়াজ বের হতে লাগল।
ততক্ষণে বাড়ির মালিক ঘুশৃণেশপ্রসাদ ভাটও তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে ওপরে উঠে এসেছেন। এসেই প্রথম প্রশ্ন, "ইয়ে ক্যা তামাশা হো রহা হ্যায় ?"
আগুনে যেন ঘি। পঞ্চু এবার শিউপুজনকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাট ও তার সঙ্গী দু'জনের ওপর।
তাই না দেখে ঘরবন্দি বাবলু দারুণ উৎসাহ দিতে লাগল পঞ্চুকে, "শাবাশ পঞ্চু, শাবাশ ! ছিঁড়ে খা ব্যাটাদের। একটাকেও আস্ত রাখিস না। টুকরো-টুকরো করে দে।"
ততক্ষণে মুক্ত রাগিণী শিকল খুলে মুক্তি দিয়েছে বাবলুকে। আর সেই সুযোগে শিউপুজনও 'আরে বাবা রে মর গয়িরে' বলে ঘরে ঢুকেই খিল আটকাল দড়াম করে।
রাগিণীর রাগও তখন চরমে। শিউপুজন ঘরে ঢুকতেই দরজায় শিকল দিল সে।
এদিকে ভাট ও তার সঙ্গীদের অবস্থা তখন কাহিল করে দিয়েছে পঞ্চু।
সঙ্গী দু'জনকে দেখেই তো বাবলু অবাক ! এরাই তো সুন্দর পাহাড়িতে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল জয়দীপদাকে। ওরাও যারপরনাই অবাক হয়ে গেল বাবলুকে দেখে। এ কী করে সম্ভব ?
বাবলু বলল, "ওরে শয়তান ! তোমরাও এইখানে এসে জুটেছ ?"
কিন্তু বাবলুর কথার উত্তর দেবে কে ? পঞ্চুর আক্রমণের ঠেলায় ওরা তখন প্রাণ বাঁচানোয় ব্যস্ত। তাই এই অবস্থায় পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায়ই খুঁজে পেল না ওরা। দু'জনেই তখন শিম্পাঞ্জির মতন লাফাতে-লাফাতে নেমে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে।
বাবলু ভাটকে পঞ্চুর জিম্মায় রেখে রাগিণীকে নিয়ে ধাওয়া করল ওদের দু'জনের দিকে।
হতভম্ব বিলু স্কুটার নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাইরে। ভেতরে যে কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, বাবলুর মতলবটা কী, তা সে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। এবার সেই পরিচিত দুষ্কৃতী দু'জনকে বাড়ির

ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখেই স্কুটার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর।

বাবলু আর রাগিণী সমানে চেঁচাতে লাগল, "মার, মার, মার ব্যাটাদের।"

ততক্ষণে বহু লোক ছুটে এসেছে সেখানে, "কী হয়েছে ? কী হয়েছে ভাই ?"

বাবলু রাগিণীকে দেখিয়ে বলল, "এই যে, এই মেয়েটাকে চুরি করে এনে লুকিয়ে রেখেছিল এই বাড়ির ভেতর। চাঁদা তুলে মারুন এদের।"

কিন্তু মারবে কাকে ? এত লোকের ভেতর থেকে যে কীভাবে পালাল ওরা, তা টেরও পেল না কেউ। সবাই তখন ওদের ধরবার জন্য ছুটল।

দোতলার ওপর তখন আর-এক নৃত্যনাট্য। ঘুশৃণেশপ্রসাদ ভাট তখন একটা ডাইনিং টেবিলের ওপর লাফাচ্ছেন আর পঞ্চু তাঁকে 'ভৌ-ভৌ' করে ভয় দেখাচ্ছে।

বাবলু, বিলু, রাগিণী, তিনজনই ওপরে উঠে এসেছে তখন।

পঞ্চু পুনরাদেশের জন্য বাবলুর কাছে ছুটে যেতেই ভাট লাফিয়ে পড়লেন ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে। পঞ্চু সেখানেও ছুটে গেল। গিয়ে কাছা, কোঁচা কামড়ে এমন টান দিল যে, সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ভাট সেই অবস্থাতেও হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন।

তখন আর পঞ্চু নয়, বাবলু, বিলু, রাগিণী সবাই তাড়া করেছে তাঁকে। কিন্তু ছাদে উঠেই উনি যে অমন একটা কাণ্ড করবেন তা কে জানত ? প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছাদের ওপর থেকে রাস্তায় লাফিয়েই প্রাণত্যাগ করলেন তিনি।

বাবলুরা আর কী করে ? এ-বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর ভাল করে সার্চ করে ফোন করল ভবানীপুর থানায়। তারপর পুলিশকে সব জানিয়ে শিউপুজনকে টা-টা করে নেমে এল নীচে। বাইরে তখন অনেক, অনেক লোক।

বাবলু বিলুকে বলল, "তুই রাগিণীকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে যা। আমি থানায় একবার দেখা করে আসি, কেমন ?"

বিলু তাই করল।

বাবলু চলে গেল ভবানীপুর থানায়। রহস্যের জট আবার নতুন করে পাকিয়ে গেল।

দুপুরবেলা দারুণ একটা খাওয়াদাওয়া হল বাবলুদের বাড়ি। ওদের এখন যা মানসিক অবস্থা তাতে দারুণ খাওয়াদাওয়ার সময় এটা নয়। তবুও হল। তার কারণ, বাবা বাইরে থাকেন। বাড়িতে এলে তাঁর জন্য ভাল কিছু করতেই হয়। আর এই রাগিণী, দশ-বারোদিন ঘরছাড়া। দুষ্কৃতীদের দেওয়া কুকুরের খাদ্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষুধার তাড়নায় প্রতিদিনই গ্রহণ করতে হয়েছে ওকে। তাই আজ ও এ-বাড়ির বিশেষ অতিথি। এবং ওর জন্যই এত আয়োজন। অবশ্য এই ভোজবাসরে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও বাদ পড়েনি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাগিণীকে নিয়ে চলল মিত্তিরদের বাগানে। ওর মুখে সবকিছু শোনার পরই চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাগানে পৌঁছে পঞ্চু সর্বপ্রথম আনাচেকানাচে ঘুরে একবার টহল দিয়ে দেখে নিল কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কি না। তারপর ছুটে এসে গ্যাট হয়ে বসতেই বোঝা গেল অল ক্লিয়ার।

বর্ষার পর অনেক আগাছা জন্মেছিল চারদিকে। তাই ওরা ঘরের মেঝেটাকে একটু ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে বসল।

বাবলু প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "জয়ন্তদার কোনও খবর আছে ?"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, উনি ফিরে এসেছেন।"

"অলির কোনও খবর ?"

"কোনও খবরই নেই।"

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, এবার তুই আমাকে বল, হরিশ মুখার্জি রোডের ওই বাড়িটার সন্ধান তুই পেলি কী করে ?"

বাবলু বলল, "শোন তা হলে, চিত্তরঞ্জন থেকে ফিরে প্রথমেই আমি থানায় যাই। সেখানে গিয়ে শুনি আমাদের সংগ্রহ করা গাড়ির নম্বর প্লেটের দুটোই ভুয়ো। তবে গাড়ির মালিকের সন্ধান পুলিশ পেয়েছে। মালিক একজন ব্যবসায়ী। ওঁর গাড়ি নাকি চুরি যায়। চুরি যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে থানায় ডায়েরিও করেন। আমি কৌতূহলবশে পুলিশের কাছ থেকে মালিকের নাম-ঠিকানা নিয়ে আসি। পরে রাত্রিবেলা রায়সেন কোম্পানির সেই কাগজপত্তরগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে এই ব্যবসায়ীর নামের কয়েকটি চিঠি আমি পাই। তাতে সবই জিনিসের অর্ডারের ব্যাপার ছিল। কিন্তু সন্দেহের কাঁটাটা আমাকে বিঁধল এই কারণে যে, ওই ব্যবসায়ীর নাম-ঠিকানার সঙ্গে এই কাগজপত্তরের অর্ডারের নাম-ঠিকানার আশ্চর্য মিল দেখে। তখনই আমি বুঝতে পারলাম এই জি. পি. ভাট আলেকজান্দার মারিয়ারই লোক। এবং গাড়ি চুরির ব্যাপারে থানায় ডায়েরি লেখানোটা স্রেফ পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। তাই আমি মনস্থির করি গোপনে তদন্ত করবার। ভাগ্যিস গেলাম, তাই তো উদ্ধার করতে পারলাম রাগিণীকে। ঘুশৃণেশ পাপের পরিণাম মৃত্যুকে নিজেই ডেকে নিলেন। আর চিত্তরঞ্জনের ওই দুষ্কৃতী দু'জনকে ওদের ওখানে দেখেই বুঝলাম ছেলেমেয়ে চুরির ব্যাপারেও এই দলটি বেশ সক্রিয়।"

বাবলুর কথা মন দিয়ে শুনছিল সবাই।

বাবলু ওর বক্তব্য শেষ করে রাগিণীকে বলল, "এবার তোমার কথা বলো শুনি। তোমাকে ওরা কীভাবে চুরি করে আনল ?"

রাগিণী বলল, "তোমাকে তো বলেইছি আমার বাবা একজন ডি. এফ. ও। আমার বাবার নাম জয়নারায়ণ যোশি। বাড়ি আমাদের বারাণসীতে। ওইখানেই আমার জন্ম। পড়াশুনো। ওইখানে আমার প্রচুর বাঙালি বান্ধবী আছে। তাই আমি বাংলা বলতে, লিখতে বা পড়তে পারি। আমার মা-বাবা সবাই পারেন। তা আমার বাবার চাকরিসূত্রে আমরা এখন জব্বলপুরে আছি। এই যে ঘুশৃণেশপ্রসাদ বা আলেকজান্দার, এদের একটি দুষ্টচক্র আছে। সেই চক্রের কাজই হল জঙ্গলের ভাল ভাল গাছপালা লুকিয়ে কেটে বেচে দেওয়া। ওরা করত কী, পিপারিয়া, পাঁচমারি প্রভৃতি জায়গার গভীর জঙ্গলে চোরাগোপ্তা হানা দিয়ে গাছ কেটে সাফ করে দিত। আমার বাবা...।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল প্রায়। বলল, "জাস্ট এ মিনিট। কী বললে ? পাঁচমারি ?"

"হ্যাঁ। আমরা নন বেঙ্গলিরা বলি পচমড়ি। কিন্তু ওই নাম শুনে তুমি এত চমকে উঠলে কেন বাবলু ?"

বাবলু সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "দ্যাখো কারবার! ভিমা ওই যে 'পাঁ-চ-মা' পর্যন্ত বলে আর বলতে পারেনি, সে-জায়গাটা তা হলে...।"

সবাই বলল, "পাঁচ মাইল নয়, পাঁচমারি।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, পাঁচমারিই। কেননা, দেখা যাচ্ছে এই পাঁচমারির সঙ্গে ওই কুখ্যাতরা ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত।" বলে রাগিণীকে বলল, "তারপর ?"

রাগিণী বলল, "তা তোমরা যেমন পঞ্চপাণ্ডব, ওই পাঁচমারিতেও তেমনই পঞ্চপাণ্ডবের নামে পাঁচটি গুহা আছে। কথিত আছে অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডবরা ওইসব গুহায় কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। তা যাই হোক, একবার আমি আমার দু'জন বান্ধবীকে পাঁচমারি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেইসময়ই দুষ্কৃতীরা আমাকে অপহরণ করে। তারপর নাগপুর

দিয়ে নিয়ে আসে কলকাতায়।"

বাবলু বলল, "শোনো, আমাদের পরিচিত একটি ছেলে আর মেয়েকে ওরা গুম করেছে। ওদের কোথায় রেখেছে-না-রেখেছে সেই ব্যাপারে কিছু শুনেছ কী ?"

"না। ওরা কি কাউকে জানিয়ে-শুনিয়ে কিছু করে ? তবে কোথা থেকে যেন রাজপুত্রের মতন একটি ছেলেকে ওরা ধরে এনেছিল। কী মার মারল ওরা তাকে। ওদের বলতে শুনেছি জঙ্গলে ক্ষুধিত বাঘের মুখে ছেলেটাকে ছেড়ে দেবে বলে নাকি এখান থেকে পাঁচমারিতেই নিয়ে গেছে ওরা।"

বিচ্ছু শিউরে উঠে বলল, "নিশ্চয়ই জয়দীপদা।"

বাচ্চু বলল, "সে ছাড়া আর কেউ নয়।"

রাগিণী বলল, "হ্যাঁ। ওর নাম জয়দীপ। ওরা তাই বলছিল বটে ! বাবার মুখে শুনেছি, ওরা নাকি খুবই সাঙ্ঘাতিক। এমনই নৃশংস ওরা যে, নিজেরা খুন না করে জ্যান্ত মানুষটাকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ওরা ছেড়ে দেয় হিংস্র জানোয়ারের মুখে। দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে ওরা আনন্দ পায়।"

বাবলু দু'হাতে কান চেপে বলল, "ও মাই গড। জয়দীপ আর অলির তা হলে একই দশা করবে ওরা !"

রাগিণী বলল, "অলি কে ?"

বাবলু বলল, "তোমারই মতো এক প্রাণোচ্ছল কিশোরী। ভারী মিষ্টি মেয়ে।" বলেই বলল, "আর নয়। আর দেরি করলে চলবে না। বিলু, তৈরি হ'। পাঁচমারি আমাদের যেতেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "কবে যাবি ?"

"আজ হলে আজ, না হলে কাল।"

বিলু বলল, "আজ কী করে হবে ? গেলে কালই যাব। আজ বরং একটু চেষ্টা করে দ্যাখ, কালকের কোনও টিকিট পাস কি না।"

ভোম্বল বলল, "যে গাড়িতে জায়গা পাবি সেই গাড়িতেই নিয়ে নিবি।"

রাগিণী বলল, "যে গাড়িতে মানে ? হাওড়া থেকে জব্বলপুরের একটাই গাড়ি যায়, ভায়া ইলাহাবাদ, বম্বে মেল। হাওড়ায় ছাড়ে রাত আটটায়, পরদিন পৌঁছয় বিকেল পাঁচটা পনেরোয়। পিপারিয়ায় পৌঁছবার সময় রাত্রি সাড়ে আটটায়। তবে কিনা চার-পাঁচ ঘণ্টা লেট থাকে প্রায়ই। আট ঘণ্টা, ন' ঘণ্টা, এমনকী বারো ঘণ্টা লেটের রেকর্ডও আছে।"

বাবলু বলল, "লেটের কথা অবশ্য বলা যায় না। আবার রাইট টাইমেও যেতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "পাঁচমারি যেতে হলে আমাদের কি পিপারিয়ায় নামতে হবে ?"

"হ্যাঁ।"

বাবলুরা আর বসে না থেকে উঠে পড়ল।

পঞ্চুও একবার গা-ঝাড়া দিয়ে দেহটা টান করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

বাবলু বাড়ি ফিরে পাঁচমারি যাওয়ার কথা বাবাকে বলতেই বাবা বললেন, "অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, বিশেষ করে পুজোর আগে টিকিটের ডিম্যান্ড খুব একটা থাকে না। তাই কালকের টিকিট তোরা পেয়েও যেতে পারিস। কনফার্মড টিকিট না হলেও আর. এ. সি. পাবিই। তবে টিকিটটা তোরা পিপারিয়া পর্যন্ত কাটিস। জব্বলপুরে ব্রেক জার্নি করে মেয়েটাকে ওর মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে তারপরে যাস। ওর বাবা যখন ডি. এফ. ও তখন জঙ্গলের পথঘাট ওঁর নখদর্পণে। উনি তোদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন। পাঁচমারি অত্যন্ত ভাল জায়গা। আমি ওখানে বার-দুই গেছি। ওখানে গিয়ে সময় পেলে আর কিছু দেখিস-না-দেখিস, জটাশঙ্কর গুহা আর ধূপগড়ের সূর্যাস্ত দেখবি।
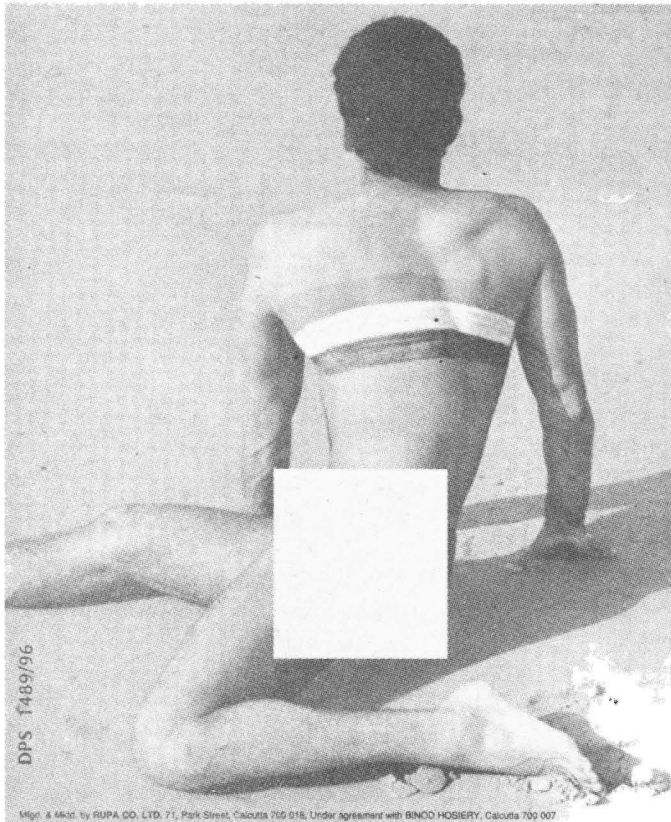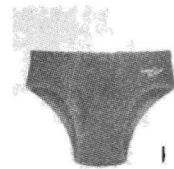
আরও অনেক কিছুই দেখবার আছে। ঝরনা আর জলপ্রপাত দেখে মন ভরে যাবে। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না শয়তানরা ওখানে ঘাঁটি গাড়ল কী করে? কেননা, ওটা তো ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। থিকথিক করছে মিলিটারি।"

বাবলু বলল, "তাতে কী? দেবস্থানেই তো যতসব ঠগবাজ আর জুতো-চোরের আড্ডা হয়।"

বাবলুর কথায় সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

বাবলু আর দেরি করল না। বেশি করে টাকা-পয়সা নিয়ে বিলু আর ভোম্বলকে সঙ্গে করে হাওড়া স্টেশনে গেল টিকিট কাটতে।

॥ ৮ ॥

রেলের ব্যাপারস্যাপারই বোধ হয় আলাদা। কখনও একমাস আগে লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট পাওয়া যায় না, আবার কখনও বা আগের দিন গিয়েও টিকিট পাওয়া যায়। বাবলুরা ছ'জনের জন্য ছ'টা টিকিটই পেয়ে গেল। একেবারে কনফার্মড বার্থ।

রাত আটটায় গাড়ি। ভায়া ইলাহাবাদ বম্বে মেল।

ওরা যথাসময়েই স্টেশনে এল। তারপর এস-ফোর কোচে ওদের জন্য নির্ধারিত বার্থে মনের মতন জায়গা পেয়ে দারুণ খুশি হল ওরা। সবচেয়ে খুশি হল এই কারণে যে, ওরা পেয়েছিল আলাদা একটা কুপে। যেটি ভেতর থেকে লক করে দেওয়া যায়। নিশ্চিন্তে ঘুমনো যায়। আর পঞ্চুকেও অন্যের বিরক্তি এড়াতে সিটের তলায় লুকিয়ে থাকতে হয় না সবসময়।

ট্রেন ছাড়লে টিকিট চেক হয়ে যাওয়ার পরে বাবলু প্রথমেই লক করে দিল কুপের দরজাটা। পঞ্চু এবার নির্ভয়ে বিচ্ছুর পাশে বসে জেলিমাখানো রুটি খেতে-খেতে আঁধার রাতের প্রকৃতি দেখতে লাগল। কী মজা!

আনন্দ বাবলুদেরও কম না। তার একটা কারণ আছে। প্রথমত, অপ্রত্যাশিতভাবে রাগিণীকে উদ্ধার করায় জয়ের গৌরবে ভরে আছে ওরা। মেয়েটিকে ওর বাবা-মায়ের হাতে পৌঁছে দিলে নিশ্চয়ই তাঁরা খুশি হবেন। দ্বিতীয়ত, রাগিণীর বাবার সাহায্য পেলে ওদের পাঁচমারি অভিযান ভালই হবে। তা যদি হয়, তা হলে জয়দীপদা বা অলির সেরকম খারাপ কিছু হয়ে না থাকলে ওদের উদ্ধার করতেও খুব একটা অসুবিধে হবে না।

ওরা গাড়িতে বসে নিজেদের মধ্যেই ওদের এই অভিযানের ব্যাপারে কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সেই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। দেখতে-দেখতে বর্ধমান এসে গেলে খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিল ওরা। চিলি চিকেন, রুমালি রুটি আর সন্দেশ, এই ছিল ওদের খাদ্য তালিকায়। খাওয়া শেষ হলে সবাই শুয়ে পড়ল যে-যার বার্থে।

সকাল হলমোগলসরাইতে। এখানে এলেই কাশীর কথা মনে পড়ে যায় বাবলুর। মনে হয় এখনই ছুটে যায় বিশ্বনাথের গলিতে, দশাশ্বমেধের ঘাটে। এখানে ওয়াটার বট্‌লে জল ভরে ওরা কলা আর ডিম সেদ্ধ কিনে নিল কয়েকটা। জেলি-রুটি সঙ্গে আছেই। তাই চা কিংবা কফিতে চুমুক দিলেই চমৎকার ব্রেকফাস্ট।

ওরা তাই করল।

এর পর ট্রেন চুনার, মির্জাপুর, বিন্ধ্যাচল হয়ে ইলাহাবাদে এল। সেখানে রেলের খাওয়া খেল নিয়মরক্ষা করতে। তারপর কত, কত স্টেশন পার হল ওরা। মানিকপুর, সাতনা, কাটনির পর একসময় এসে পৌঁছল জব্বলপুরে। ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। পৌঁছতে তাই সন্ধে হয়ে গেল।

এখানে স্টেশনের কাছেই থাকার জন্য লালা গোকুলদাসের একটি বড়সড় ধর্মশালা আছে। আর আছে বাজারের কাছে অজস্র লজ। খুব জমজমাট জায়গাটা। তবে বাবলুদের তো এখানে লজে ওঠবার দরকার হবে না, ওরা উঠবে রাগিণীদের বাড়িতে। বাড়ি মানে ওদের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া আছে লাজপত কুর্জের ন্যাপিয়ার টাউনে, সেইখানে।

জব্বলপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে রাগিণীর নির্দেশিত পথে ওরা ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের পেছন দিকে এল। তারপর অজস্র অটো এসে ওদের ছেঁকে ধরতেই রাগিণী একটি অটোকে ডেকে বসতে বলল সবাইকে। অটো ড্রাইভারকে বলল, "ন্যাপিয়ার টাউন।"

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ওরা যথাস্থানে এসে অটো থেকে নামতেই কোথা থেকে যেন এক ভদ্রমহিলা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন রাগিণীকে। একবার শুধু বললেন,"হাম দোনো কো ছোড় কর তু কাঁহা চলি গয়িথি বেটি?"

রাগিণীর মা। নিকটবর্তী কোনও মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছিলেন বোধ হয়। মেয়েকে দেখতে পেয়েই আর স্থির রাখতে পারলেন না নিজেকে। কেঁদেকেটে ভাসিয়ে দিলেন।

অন্য প্রতিবেশীরাও তখন ছুটে এসেছে, "আরে দেখো, দেখো, কৌন আয়া!"

রাগিণীর বাবাও তখন মেয়ের প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে নেমে এসেছেন দোতলার ফ্ল্যাট থেকে।

মিলনপর্ব শেষ হল।

রাগিণী পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ওর বাবা-মায়ের। বলল, "এরাই আমাকে ওই দুশমনদের ডেরা থেকে উদ্ধার করেছে। না হলে কী যে ছিল আমার নসিবে, তা কে জানে?"

রাগিণীর বাবা মিঃ যোশি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সমাদরে নিয়ে গেলেন ওঁদের ফ্ল্যাটে।

কৌতূহলী প্রতিবেশীরা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ছুটে এলে রাগিণীই বলল, "আই অ্যাম ভেরি টায়ার্ড। বাদ মে সব কুছ বতায়েঙ্গে। অভি হমকো থোড়া রেস্ট করনে দিজিয়ে।"

ব্যস! একটি কথাতেই কাজ হল। বিদায় নিল সব।

সারাদিনের ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর করতে সবাই সর্বাগ্রে ভালভাবে স্নানটা করে নিল। তারপর দেহের ক্লান্তি দূর করে ঘরে এসে বসতেই রাগিণীর বাবা-মা প্লেট-ভর্তি খাবার এনে খেতে দিলেন সকলকে।

মিঃ যোশি বললেন, "তুমহারে বারে মে অভি কুছ না কুছ তো বতাও। মুসিবত মে সহায়তা করনেবালে হি সচ্চা দোস্ত হৈ। তুম হমারে মেহমান নহি, দোস্ত ভি হো।"

বাবলু বলল, "যোশিজি, প্রথমে আপনি আপনার মেয়ের মুখেই সব শুনুন। তারপর আমাদের কথা আমরা বলব।"

রাগিণী তখন এক-এক করে সেইদিনের সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল ওর বাবাকে।

সব শুনে যোশিজি বললেন, "সেইদিন থেকে তো আমাদের ভেতরেও আমরা নেই। থানা-পুলিশ অনেক কিছুই করলাম। কিন্তু কেউ কোনও সন্ধানই দিতে পারল না আমার মেয়ের। তাই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে যখন বসে ছিলাম তখনই ওদের কাছ থেকে একটা প্রস্তাব এল। আর তাতেই বুঝলাম ওকে অপহরণটা করেছে কারা।"

বাবলু বলল, "প্রস্তাবটা কী? করলই বা কে?"

"ঘুশ্‌ণেশ ভাট। জঙ্গলের মূল্যবান গাছপালার চোরাচালানে ওর ওপরে তো আর কেউ নেই।"

বিলু বলল, "আলেকজান্দার মারিয়ার ভূমিকাটা এখানে কীরকম?"

"এই অঞ্চলে ও কিন্তু খুব একটা ফেমাস নয়। এমনকী ওর চেহারাও দেখিনি কোনওদিন। মনে হয় ঘুশ্‌ণেশই ওকে এখানে আমদানি করেছে সম্প্রতি।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক নয়। গডফাদার এখানে আলেকজান্দার মারিয়াই। শত্রুকে বাঘের মুখে ফেলে বিপর্যস্ত করার নেশা ওই

শয়তানেরই। এতদিন সে নেপথ্যে ছিল। এখন জাল আরও বিস্তার করে প্রকাশ্যে আসছে। ভাটের মৃত্যুসংবাদ হয়তো সে পায়নি এখনও। তাই এখনও ফাঁদ পাতলে ওকে ধরা যায়। কিন্তু কী প্রস্তাব রেখেছিল ওরা শুনি?"

"অন্য কিছু না, ওদের বিরোধিতা না করে ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে ওরা আমার মেয়েকে ফেরত দেবে।"

"আপনি উত্তর দিয়েছিলেন?"

"না। ভেবে দেখার জন্য একটু সময় চেয়েছিলাম।"

বাবলু বলল, "এখন তো মেয়ে ফেরত পেয়ে গেছেন, তাই আর ভাবাভাবির কোনও ব্যাপার নেই। এবার আমাদের কাহিনী শুনুন।" বলে ওরাও ওদের কথা সব খুলে বলল যোশিজিকে।

যোশিজি শুনে বললেন, "তার মানে এখনও দু'জন ওদের হাতে বন্দি আছে। এবং তারা আছে এই অঞ্চলেই।"

"ঠিক তাই। আর এই ব্যাপারেই আপনাকে সবরকমের সাহায্য করতে হবে আমাদের।"

"আই মাস্ট ডু ফর ইউ। আমি তোমাদের পুরো মদত দেব। কী আমাকে করতে হবে বলো?"

"পাঁচমারির পাহাড়-জঙ্গলের পথঘাট ভাল চেনে এমন একজন লোকের সন্ধান আমাদের দিতে হবে। ওখানে থাকার ব্যবস্থাটাও করে দিতে হবে আপনাকে।"

"মেরা খেয়াল হ্যায় কি তুম সব পহলেবার যা রহে। তো ঠিক হ্যায়, ইস সিল্‌সিলে মেঁ ম্যায় তুমহারে লিয়ে জরুর মদত করুঙ্গা। আমার এক দোস্ত আছে ওখানে, ডি. পি. জয়সওয়াল। চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট। বনবিভাগের সবচেয়ে বড় অফিসার। আমি তো জব্বলপুরে পোস্টেড। কিন্তু উনি আছেন ওখানে। ওঁর গাড়ির ড্রাইভার বীর সিং দুর্ধর্ষ লোক। আমি ওই বীর সিংকে তোমাদের সঙ্গে ফিট করে দেব।"

বিলু বলল, "সেইসঙ্গে একটা গাড়ি।"

"অবশ্যই। আমাদের হাতে অনেক জিপ আছে।"

রাগিণীর মা বললেন, "তুম সব জিতে রহো বেটা। মেরা ভাগ্য আচ্ছা হ্যায় কি মেরি লেড়কি মিল গয়ি। ম্যায় জানতা হুঁ কি সাচ্চা দোস্ত ওহি হ্যায় জো সময় পর কাম আয়ে।"

মিঃ যোশি বললেন, "তোমরা কবে যাবে?"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে তো দেরি করা উচিত নয়, তাই কালই যাব আমরা।"

"তা হলে এক কাজ করো, কাল সকাল ন'টায় একটা ট্রেন আছে। সেটায় গিয়ে কাজ নেই। প্যাসেঞ্জার ওটা। তারপরই আছে দুপুর তিনটে কুড়িতে ভাগলপুর-বোম্বাই এক্সপ্রেস। তাতেই চলে যাও তোমরা। টিকিট কাটার কোনও ব্যাপার নেই। ব্রেক জার্নি তো লেখানোই আছে, শুধু একটা সই করিয়ে নেওয়া। ওই গাড়িতে গেলে সন্ধের আগেই পৌঁছে যাবে। পিপারিয়ায় নেমে ওইদিনই পচমড়ি যাবে না। ঠিক স্টেশনের উলটো দিকে একটা লজ দেখতে পাবে। দেবশ্রী লজ। সেইখানে উঠবে। পঞ্চাশ-ষাট টাকায় ঘর পেয়ে যাবে তোমরা। পরদিন সকালে ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের এপাশে এলেই দেখবে পচমড়ির সরকারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। তাতে চেপেই চলে যাবে তোমরা।"

বাবলু বলল, "এখান থেকে পাঁচমারির কোনও বাস নেই?"

"না। এই নিয়ে আমরা অনেক লেখালিখি করেছি। লেকিন কুছু হয়নি। নাগপুর আর ভোপাল থেকে বাস আছে। জব্বলপুর সে নেহি।"

বাবলু বলল, "আমরা তা হলে ট্রেনেই যাব।"

রাগিণী বলল, "কাল যদি তোমরা দুপুরের গাড়িতে যাও, আমি তা হলে সকালের দিকে তোমাদের মার্বেল রক্‌টা দেখিয়ে আনতে পারি।"

মার্বেল রকের নাম শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

বাবলু বলল, "আরে তাই তো! মার্বেল রক, নর্মদার জলপ্রপাত, সবই তো এইখানে। অভিযানের উত্তেজনায় ওসবের কথা মনেই ছিল না। মন পড়ে আছে পাঁচমারির দিকে। স্পটগুলো কতদূর এখান থেকে?"

মিস্টার যোশি বললেন, "জায়দা দূর নেহি। ওনলি বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার। এই বাজারের কাছেই অটো স্ট্যান্ড থেকে অটো, ট্রেকার, জিপ, ট্যাক্সি সবকিছুই পেয়ে যাবে। আট-দশ রুপিয়া করে ভাড়া লাগবে। কোনও অসুবিধা হবে না। আমার লেড়কি থাকবে সঙ্গে।"

ওদের যখন এইসব কথাবার্তা হচ্ছে পঞ্চু তখন কী ভেবে যেন নিজের মনেই 'গোঁয়াউ' করে একটা শব্দ করল।

বিচ্ছু বলল, "দেখেছ কাণ্ড, এতক্ষণ আমরা এমনই কথায় মত্ত ছিলাম যে, ওর দিকে কেউ নজরই দিইনি!" বলেই বলল, "কী হয়েছে পঞ্চু! কিছু বলবি?"

পঞ্চু কী আর বলবে? লেজ নেড়ে-নেড়ে সে বারবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগল। তার মানে এইভাবে বসে থেকে-থেকে বোর লাগছে ওর।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর বসে না থেকে পঞ্চুকে নিয়ে চলল রাতের আলোকমালায় সজ্জিত জব্বলপুর শহর দেখতে। রাগিণীও গেল সঙ্গে। কী সুন্দর ছোট্ট শহর। খুব ভাল লাগল ওদের।

সে-রাতটা দারুণ কাটল ওদের। দূরপাল্লার ট্রেন জার্নির পর হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুতে পেলে এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যায়।

ওরা সবাই উঠলে বাড়িটা যেন গমগমিয়ে উঠল।

পঞ্চুর একটু অসুবিধে হচ্ছিল বাইরে যেতে পারছিল না বলে। তবে ওর একটা মস্ত গুণ যে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

সকালের একপ্রস্থ জলযোগের পর চা-পর্ব শেষ করে সবাই চলল নর্মদা প্রপাত দেখতে। কী আনন্দ! এই আনন্দটা আরও প্রকট হত, যদি না জয়দীপদা বা অলির ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তার একটা কাঁটা খচখচ করত।

ওরা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসতেই অনেক লজ দেখতে পেল। এখান থেকে বাঁ দিকের রাস্তাটা চলে গেছে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে, ডান দিকেরটা অটো স্ট্যান্ডে।

রাগিণী বলল, "জানো তো, এখানে আগে ঠগির উপদ্রব ছিল খুব।"

ভোম্বল বলল, "ঠগি মানে?"

"সে একটা সম্প্রদায়। এরা করত কী, চোখের নিমেষে একজন মানুষকে গলায় কাপড়ের ফাঁস আটকে মেরে ফেলত। তারপর তাকে মাটিতে পুঁতে ভালমানুষটি সেজে ঘরে ফিরত।"

"কী সর্বনাশ! এমন করবার কারণ?"

"ওদের ধারণা, নর্মদা তীরের মা চৌষট্টি যোগিনী এতে সন্তুষ্ট হন।"

বাচ্চু বলল, "তারপর ভ্রান্ত ধারণাটা দূর হল কী করে?"

"সহজে কি হয়? ১৮৩৬ সালে ঠগ দমনের জন্য এখানে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রি খোলা হয়। তারপরেও প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল ওদের বাগে আনতে।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা, এখানে বাঙালির বসবাস কীরকম?"

"ওরে বাবা! প্রচুর বাঙালি আছে এখানে। বিশেষ করে মদন মহল, ঘামাপুরা এইসব অঞ্চলে তো বাঙালির বাস অনেক বেশি।"

যাই হোক, ওরা সামান্য পথ পায়ে হেঁটে অটো স্ট্যান্ডের কাছে যেতেই শুনতে পেল "ভেরাঘাট, ভেরাঘাট—।"

বাবলু বলল, "ভেরাঘাটটা কী?"

রাগিণী বলল, "ওইখানেই তো যাব আমরা। ভেরাঘাটে মার্বেল রক আর তার অনতিদূরে ধুমাঘাটে নর্মদা প্রপাত।"

বিচ্ছু বলল, "বেশ নাম তো? ভেরাঘাট, ধুমাঘাট!"

"কেউ-কেউ দুমাঘাটও বলে। আমরা বলি ধুঁয়াধার।"

ওরা সবাই একটা ট্রেকারে উঠে বসলে পঞ্চুও ওদের পাশে গিয়ে বসল। আজকাল ওকে নিয়ে কেউ কিছু বললে ওর খুব লজ্জা করে। কিন্তু এখানকার লোকেরা এত ভাল যে, কেউ কিছু তো বললই না, উপরন্তু একজন একটা গরম তেলেভাজা এনে খাইয়ে গেল ওকে।

এখন সময় নয়, তাই যাত্রী নেই। অনেক দেরি করে মাত্র কয়েকজন যাত্রীকে নিয়েই ট্রেকার ভেরাঘাটের দিকে চলল।

খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় ট্রেকার এসে থামলে রাগিণী বলল, "এই জায়গাটার নাম মদনমহল। ১১১৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন গোন্ড রাজ মদন শাহ।"

এখানেও যাত্রী উঠল না ট্রেকারে।

ট্রেকার আবার চলতে শুরু করল। পথে বাঁ দিকে একটি পাহাড়ের ওপর এক সুদৃশ জৈনমন্দির লক্ষ করল ওরা। তারপর ব্যালেন্সি রক্-এর পাশ দিয়ে একেবোর ভেরাঘাটে।

ওরা ট্রেকার থেকে নেমে ধাপেধাপে সিঁড়ি বেয়ে নর্মদার ঘাটে যেখানে নামল, সেই জায়গাটার নাম পঞ্চবটী। এইখান থেকেই নৌকোয় করে মার্বেল রক দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। ভাড়া মাথাপিছু পাঁচ টাকা। জনা পনেরো লোক হলে তবেই নৌকো ছাড়ে। কিন্তু এখন অসময়। একে তো যাত্রী নেই, তায় জলের টান খুব। ফলে নাও চলাচল বন্ধ।

তবে রাগিণী ছাড়বার পাত্রী নয়। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মার্বেল রক সে দেখাবেই। তাই অনেক দৌড়ঝাঁপ করে একজন মাঝিকে রাজি করাল। মাঝি পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে নিয়ে যেতে রাজি হল সবাইকে। কথা হল নৌকোয় বসে কেউ নড়াচড়া করবে না, ঝুঁকে পড়ে জলে হাত দিতে যাবে না, আর যে পর্যন্ত যাওয়ার পর নৌকো এগোতে চাইবে না, সেই পর্যন্ত গিয়েই ফিরে আসতে হবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাতেই রাজি। কিন্তু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। পঞ্চুকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। যতবার ওকে নৌকোয় ওঠানো হয় ততবারই ও লাফিয়ে নেমে আসে ডাঙায়। শেষকালে রাগিণী ওর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে গাল টিপে 'লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, ভয় কী?' বলতে তবেই ও উঠল। উঠেও দুষ্টুটা চোখ বুজে বসে রইল। কেন অমন করল ও, তা কে জানে?

নৌকো ছাড়ার পর ধীরে-ধীরে একটু বাঁক নিয়েই প্রবেশ করল এক স্বপ্নের মায়াপুরীতে। দু'পাশে ১০৫ ফুট পর্যন্ত উচ্চ ম্যাগনেশিয়াম লাইমস্টোনের পাহাড়। সে কী অপূর্ব শোভা!

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অভিভূত।

বাবলু বলল, "দ্যাখ দ্যাখ, পঞ্চু! জীবন সার্থক কর। বোকার মতন চোখ বুজে থাকিস না।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! জলভ্রমণে এত ভয় পঞ্চুর?

রাগিণী বলল, "আবার কখনও এখানে এলে এসো চাঁদনি রাতে। ওইসময়ে এখানকার দৃশ্য না দেখলে সত্যিকারের একটা মনোরম দৃশ্য দেখা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে।"

বাবলু বলল, "চেষ্টা করব। তবে কিনা ভ্রমণ আমাদের আছে, হবে। কিন্তু উপভোগ যে কতটা করব সেটাই হচ্ছে ভাবনার বিষয়। রোদ্দুরের পেছনে যেমন ছায়া থাকে, আলোর পেছনে যেমন থাকে অন্ধকার, আমাদের পেছনেও তেমনই ক্রাইমের কালো মেঘ সর্বদাই ধাওয়া করে। এখন ভয় হচ্ছে, এই মুহূর্তে কোথাও থেকে কোনও শত্রুর নাও এসে আমাদের ধাক্কা মেরে উলটে না দেয়।"

বিলু বলল, " তা যা বলেছিস, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।"

নৌকো এক জায়গায় এলে রাগিণী মার্বেল পাথরের একটি দেওয়াল দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, এর নাম মাংকিজ লিপ।"

বাবলুরা দেখল।

নৌকো তখন দুটি রকের মাঝখানে এসে পড়লে মাঝিরা বলল, "আর নয়, আর যাওয়া যাবে না। খুব সাবধান এখানে। কেউ যেন নড়াচড়া কোরো না। যদি একবার উলটোয় তো আমাদের সাধ্য নেই কাউকে বাঁচাবার।"

রাগিণী বলল, "না, না। আর এগিয়ে কাজ নেই। এবার ফিরেই চলো। নাও ঘুমাও।" বলে বাবলুদের বলল, "ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, ওই হচ্ছে এলিফ্যান্টস্ ফিট, আর ওই ওটা হল হর্সেস ফিট। অন্য সময় হলে ওখানে যাওয়া যেত কিন্তু এখন জলের ভীষণ টান।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এজন্য কোনও আক্ষেপ নেই। কেননা মার্বেল রক যে কী জিনিস, সে-সম্বন্ধে একটা ধারণা তো হল।

ওরা যখন জলভ্রমণ সেরে ডাঙার মাটিতে পা দিল বেলা তখন বারোটা।

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু? ট্রেন ক'টায়?"

রাগিণী বলল, "তিনটে কুড়িতে।"

"তা হলে?"

বাবলু বলল, "তা হলে আর কী? আজকের রাতটা যখন আমাদের পিপারিয়ায় থাকতেই হচ্ছে তখন তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। ধুঁয়াধারে গিয়ে নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাতটা দেখে আসি চল। আমরা বরং বম্বে মেলেই যাব।"

রাগিণী বলল, "আমার মনে হয় সেইরকমই করা উচিত। কেননা এখানে এসে এই দৃশ্য না দেখলে পস্তাতে হবে। আর কখনও নাও তো আসতে পারো।"

ভেরাঘাট থেকে ওরা আবার ট্রেকারে উঠল। কয়েক মিনিটের রাস্তা। একটাকা করে ভাড়া। যাই হোক, ওরা জনহীন ধুঁয়াধারে পৌঁছে গেল একসময়। চারদিকে শুধুই পার্বত্যময় প্রান্তর। তারই মাঝখান দিয়ে ভীষণ গর্জনে প্রপাতে পড়ছে নর্মদা।

ওরা প্রথমেই একটা দোকানে বসে গরম জিলিপি আর চা খেল।

এ ছাড়া এখানে খাবেই বা কী? টুরিস্ট নেই। তাই অর্ধেক দোকান বন্ধ।

পঞ্চু চা খেল না। শুধু জিলিপি খেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে মুক্ত প্রান্তরে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তারপর বড়সড় একটা পাথরের ওপর উঠে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। একচোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল নিবিষ্ট মনে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দোকান থেকে বেরিয়ে আসতেই একলাফে নেমে এল পঞ্চু। তারপর ওদের সঙ্গ ধরে ল্যাং-ল্যাং করে চলল বাধ্য অনুগত হয়ে।

সকলের আগে রাগিণী। তারপর পাণ্ডব গোয়েন্দারা। তারও পরে পঞ্চু।

ওরা উচ্চস্থান থেকে প্রপাতে যাওয়ার মুখে ঢাল বেয়ে খানিকটা নীচে নামতেই হঠাৎ দেখল পঞ্চু সকলের আগে ছুটে গিয়ে কান খাড়া করে কী যেন শুনল।

বাবলুও থমকে দাঁড়াল এবার।

বিলু বলল, "কী হল?"

"কিছু শুনতে পেলি?"

"কী শুনব? শুধুই তো জলগর্জন। চিত্রকোটের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।"

"এ ছাড়া আর কিছু ?"

সবাই বলল, "না তো !"

ওরা আবার পথচলা শুরু করল। দারুণ চড়া রোদ। তাড়াহুড়োয় টুপিগুলো আনতে ভুলে গেছে। রাগিণীদের ফ্ল্যাটেই ব্যাগের মধ্যে রয়ে গেছে সেগুলো।

একটু গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল বাবলু, "ওই শোন।"

বিলু বলল, "কী শুনব ?"

"মনে হচ্ছে অলির গলা। আমাদের ডাকছে।"

পঞ্চু তখন ঝরনাধারার মতন গড়িয়ে-আসা এক জায়গায় নর্মদার জল পান করছে আকণ্ঠ ভরে। জিলিপি খাওয়ার পর এই সুমিষ্ট জলপান যেন তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছে ওকে।

বিলু বলল, "অলি ! অলি এখানে আসবে কোত্থেকে ?"

"তা জানি না। দু'বারই মনে হল যেন বহুদূর থেকে ও-ই ডাকছে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমরা সবাই মার্বেল রক আর জলপ্রপাতের দৃশ্যে মন রাখলে কী হবে তুই আসলে এর মধ্যেও ডিপ্‌লি অলিদের কথা চিন্তা করছিস। এ তারই ফল। অলি এখন হয় বাঘের পেটে, নয়তো পাঁচমারির মহারণ্যে।"

বাবলু বলল, "হবেও বা !"

ওরা তখন পায়ে-পায়ে একেবারে নর্মদার সেই বিখ্যাত জলপ্রপাতের কাছে চলে এসেছে।

রাগিণী বলল, "আগে এই জলপ্রপাতের ধারেকাছে যাওয়া যেত না। দূর থেকেই দেখতে হত। এখন বড়-বড় পাথর ফেলে রেলিং ঘিরে এমনভাবে জায়গাটাকে বাঁধিয়ে দিয়েছে যে, খুব সামনে থেকেই ভালভাবে জলপ্রপাতটা দেখা যাচ্ছে।"

বাচ্চু বলল, "জলপ্রপাত কিন্তু এইরকম সময় অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই দেখতে হয়।"

ওরা যখন ঝুঁকে পড়ে এইসব দেখছে ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠল ভোম্বল, "উঃ গেছি রে, বাবা রে !"

সবাই ঘিরে ধরল ভোম্বলকে, "কী হল ! কী হল ! কী হল ভোম্বল ?"

ততক্ষণে আর-একটা বড়সড় পাথর এসে পড়েছে বাবলুর পায়ের কাছে। এই পাথরটা পায়ের গাঁটে লাগলে কী যে হত তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। কে ? কে এইভাবে পাথর ছোড়ে ? এই জনমানবহীন প্রান্তরে কে করে এই বদ রসিকতা ? ওরা গা-বাঁচানোর জন্য সরে এল একপাশে। আবার— আবার একটা পাথর এসে পড়ল।

জায়গাটা পাহাড়ি। তাই আশপাশে অনেক বড়-বড় পাথর আছে। তারই খাঁজে লুকিয়ে পড়ল ওরা।

রাগিণী বলল, "কী ব্যাপার বল তো ? এখানে এমন অসভ্যতা কেউ তো করে না ?"

বাবুল বলল, "মনে হয়, আমাদেরই শত্রুপক্ষের কেউ আড়াল থেকে নজর রেখেছে আমাদের দিকে। তারাই আক্রমণ করছে আমাদের।"

পঞ্চু তখন বীরবিক্রমে ছুটে গেছে সেইদিকে।

পাথর তখন পঞ্চুর দিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সতর্ক হয়ে সেইদিকে এগোল। এখানে তো ছোটা যাবে না। খুব সাবধানে পা ফেলে যেতে হবে। তাই চলল ওরা।

ততক্ষণে পঞ্চু গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একজনের ওপর। বেঁটে মোটা হেঁড়ে মাথা মাঝবয়সী একজন লোক। দেখলেই যেন কেমন-কেমন বলে মনে হয়। ছেঁড়া, ময়লা পোশাক পরনে। একগাদা নুড়ি-পাথর জড়ো করে বসে ছিল। পঞ্চু গিয়ে তার হাতটাকে কামড়ে ধরতেই বিকট চিৎকার করতে লাগল সে।

তার ওপর ভোম্বল গিয়ে মারল তাকে এক ঘুসি।

বিলুও দিতে যাচ্ছিল ঘা-কতক। বাবলুই আটকাল তাকে। লোকটার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলেই বলল, "পাত্থর ফেকতা হ্যায় কাহে ? উ ?" বলে ভোম্বলকে দেখিয়ে বলল, "দেখো তো ক্যায়সা চোট দে দিয়া মেরা দোস্ত কো।"

লোকটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে নিজের ভাষায় যা-তা বলে গেল। কী যে বলল, রাগিণীও তা বুঝল না।

বাচ্চু বলল, "পাগল নাকি ?"

বিচ্ছু বলল, "সেয়ানা পাগল। ধরা পড়ে এখন পাগল সাজছে।"

বাবলু চোখ রাঙিয়ে বলল, "যাও, হটো হিঁয়াসে। জলদি নিকালো। ভাগো।"

লোকটি তবুও হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পঞ্চু এবার 'ভৌ-ভৌ-ভুক' করে যেই না তেড়ে গেল ওর দিকে, তখনই আবার চিৎকার করে পালাল সে।

ভোম্বল ওর জামাটা তুলে ধরে বলল, "উঃ। শয়তানটা আমার পিঠের কী অবস্থা করেছে দেখেছিস ?

সত্যিই, জায়গাটা কেমন লাল হয়ে উঠেছে। ছড়ে গিয়ে রসও বেরোচ্ছে সেখান দিয়ে।

রাগিণী একটু নর্মদার শীতল জল সেখানে চাপড়ে দিয়ে বলল, "আহা রে !"

এমন সময় হঠাৎই ওদের কানে এল, "বাবলু—উ—, আমি এখানে— এ—এ—।"

নিজেদের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না ওরা। এ যে অলির গলা। অলি এখানে এল কোত্থেকে ? নর্মদার ভীমগর্জনে সেই কণ্ঠস্বর আবার হারিয়ে গেল।

পঞ্চু একবার আকাশের দিকে মুখ করে ডেকে উঠল, "ভৌ—ভৌ—উ—উ—উ।"

বাবলু বলল, "না। আর কোনও সন্দেহ নেই। আমি স্পষ্ট শুনেছি অলির গলা। ওরা নিশ্চয়ই পাঁচমারি যাওয়ার পথে যে-কোনও কারণেই হোক অলিকে এইখানেই কোথাও আটকে রেখেছে।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক তাই।"

ওরা তখন অলির খোঁজে আরও একটু উচ্চস্থানে উঠল।

পঞ্চু অবশ্য ওদের আগেই ওপরে উঠেছে।

ওরা দেখল জলপ্রপাতের অদূরে এক উচ্চস্থানে হালকা ধরনের একটু জঙ্গলের মধ্যে বহুদিনের পুরনো দোতলা একটা বাড়ি আছে। সেই বাড়ির দোতলার একটি ঘরের জানলার খড়খড়িটা ওঠানামা করছে। ওরা সেই বাড়ির দিকেই চলল।

বিলু বলল, "খুব সাবধানে বাবলু ! ভয়ঙ্কর রকমের কোনও আক্রমণের মুখোমুখি এবার হয়তো হতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "আশঙ্কাটা অবশ্য একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু আমার মনে হয়, শত্রুরা বোধ হয় ধারেকাছে কোথাও নেই। থাকলে কখনওই অলিকে এইভাবে চেঁচাতে দিত না। যাই হোক, ওই শত্রুপুরীতে সকলের যাওয়াটা ঠিক হবে না। তুই সকলকে নিয়ে আশপাশে লুকিয়ে থাক। আমি পঞ্চুকে নিয়ে বাড়িটার ভেতরে গিয়ে ঢুকি। অলিকে উদ্ধার করে আমি সঙ্কেত দিলেই তুই সবাইকে নিয়ে অটো স্ট্যান্ডে চলে যাবি। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। আগে তুই উদ্ধার কর মেয়েটাকে।"

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল।

বিলু সবাইকে ইশারা করে লুকিয়ে পড়ল যে-যার সুবিধেমতো জায়গায়। দূরে নর্মদার জলপ্রপাতের ধারে একদল ফরেনার এসে জুটেছে তখন।

বাড়িটার দিকে লক্ষ রেখে পঞ্চু আর বাবলু সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে লাগল। বাবলুর হাতে পিস্তল। শয়তান আলেকজান্দারটা যদি একবার ওর মুখোমুখি হয় তা হলে আজই ওর শেষদিন। বাড়ির ভেতরে ঢুকবার আগে পঞ্চু একবার চটজলদি দেখে এল ভেতরটা। তারপর 'ভুক-ভুক' শব্দ করে বাবলুকে ডাকতেই ভেতরে ঢুকল বাবলু। নীচে-ওপরে করে অনেক ঘর আছে এ-বাড়িতে। সাবেককালের রাজারাজড়াদের বাড়ি। এখন শয়তানের ঘাঁটি। নীচেকার সব ঘরেই শিকল দেওয়া। তা থাক। ও পা টিপে-টিপে দোতলায় উঠেই অলিকে যে ঘরে রাখা ছিল সেই ঘরের সামনে এল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘরের দরজাতেই তালা দেওয়া।

বাবলু এদিক-সেদিক খুঁজে একটা লোহার শিক জোগাড় করে সেইটা দিয়ে শিকলে চাড় দিতেই সবসুদ্ধু উপড়ে এল সেটা। তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল অলিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বেচারি! কেঁদে-কেঁদে চোখের কোলে কালি পড়েছে। পেটভরে খেতে না পেয়ে রোগা হয়েছে। বাবলু সর্বাগ্রে অলির বন্ধন মুক্ত করল।

মুক্ত অলি বাবলুর হাত দুটো ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, "আমার বাবুয়াসোনার খবর কী বাবলু?"

বাবলু বলল, "সে এখন তার মায়ের কোলে।"

"সত্যি বলছ তো?"

"তোমাকে মিথ্যে বলে লাভ? কিন্তু এখানে তোমাকে আনল কে?"

"আলেকজান্দার মারিয়া নামের সেই দুষ্কৃতী। এইটাই হচ্ছে ওই শয়তানের আসল ঘাঁটি।"

বাবলু বলল, "সত্যিই বুদ্ধি আছে লোকটার! এ এমন একটা জায়গা যেখানে কারও নজর ভুলেও কখনও পড়বে না। নর্মদার গর্জনে এখানকার কোনও আর্তনাদই কানে পৌঁছবে না কারও। আর শত-সহস্র লোকের দৃষ্টি এখানে এলে জলপ্রপাতের দিকে চলে যাবে বলে এদিকে মনোযোগ দেওয়া দূরের কথা, ফিরেও তাকাবে না কেউ। অতএব ওই দুষ্কৃতীদের এইটাই হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়। তা সেই গ্রেট আলেকজান্দার এখন কোথায়?"

"আমাকে রোগী সাজিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে এসে জব্বলপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়েই দু'জন লোকের দায়িত্বে রেখে সে চলে গেছে এখান থেকে বহুদূরের পাঁচমারিতে।"

বাবলু বলল, "তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে এলে তুমি কী করে বুঝলে তোমাকে কোথায় নামাল?"

"আমাকে ওরা অপহরণ করে প্রথমে রেখেছিল মাইথনের কাছে ওদের একটা ঘাঁটিতে। সেইখানেই ওদের কথাবার্তায় সব শুনেছি।"

"বাবুয়াকে আমি ওইখান থেকেই উদ্ধার করেছি।"

"ওইখান থেকেই ওরা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসে।"

"তাও জানি। আমার চোখের সামনে দিয়েই নিয়ে যায় তোমাকে। অবশ্য ওটা যে তুমি, তা তখন বুঝতে পারিনি। সঙ্গে আরও দু'জন ছিল।"

"সেই দু'জনই এখানে আছে। জব্বলপুরে ট্রেন থেকে নামার আগেই জ্ঞান ফেরে আমার। এখন শুনছি আজ রাতে একটা জিনিস বোঝাই ট্রাকে করে আমাকেও নিয়ে যাবে পাঁচমারিতে।"

"তার মানে তোমাকেও ওরা বাঘের মুখে দেবে।"

"জানি না। যাই হোক, আমি বন্দিনী অবস্থায় এই ঘরে থেকে কী কষ্ট যে পাচ্ছিলাম, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। মাঝে-মাঝে কষ্ট করে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেও জানলার খড়খড়ি তুলে জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ

তোমাদেরকে একটা দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে কখন থেকে চেঁচাচ্ছি। একবার মনে হল তোমরা যেন থমকে দাঁড়ালে। পরক্ষণেই কোথায় যে হারিয়ে গেলে আর তোমাদের দেখতে পেলাম না।"

"কিন্তু ওরা কোথায় ? যে দু'জন তোমাকে বন্দি করে রেখেছে ?"

"ওরা লরির ব্যবস্থা করতে জব্বলপুরে গেছে। তুমি আমাকে নিয়ে শিগ্‌গির এখান থেকে পালিয়ে চলো বাবলু। না হলে ওরা যদি এসে পড়ে তা হলে কিন্তু ভীষণ বিপদ হবে।"

এমন সময় দূর থেকে একটি মোটরবাইকের ভটভট শব্দ শোনা গেল।

শিউরে উঠল অলি, "বাবলু ! ওরা আসছে। ওই— ওই শোনো।"

বাবলু বলল, "একদম ঘাবড়াবে না। হাতে আমার কী আছে দেখছ তো ? কিন্তু জয়দীপদা ? সে কোথায় ?"

"জয়দীপদা ! কী হয়েছে জয়দীপদার ?"

"তুমি জানো না ?"

"কই, না তো।"

"ওকেও ওরা কিডন্যাপ করেছে।"

"তা হলে বোধ হয় সে আর বেঁচে নেই। ওকে তো ওরা বাঘের মুখে দেবে বলেছিল।"

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই মোটরবাইকটা এসে থামল দরজার সামনে। যাঃ। কী হবে ? এ-বাড়ির ছাদে ওঠার উপায় নেই। সিঁড়ি ভাঙা। বাবলু তাড়াতাড়ি জানলার খড়খড়ির কাছে গিয়ে সেটা তুলে বিলুদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল। দিয়েই অলির হাত ধরে বলল, "কুইক।"

কুইক তো হল। কিন্তু যাবে কোন পথে ? সিঁড়িতে তখন পদশব্দ।

অলির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল তো একটা ! যাই হোক, ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে বাইরে লাফাতে পারবে ? ওই পাথরটার ওপর ?"

"অসম্ভব !"

"তা হলে এসো, বুক ফুলিয়ে ওদের সামনে দিয়েই নেমে যাই।"

"কী বলছ পাগলের মতো ?"

"ঠিকই বলছি। এসো, এসো, দেরি কোরো না।"

"এমন ভুল কোরো না বাবলু।"

"আমি ভুল করি না, ড্রামা করি। এসো, আমাদের এই ড্রামার হিরো হবে পঞ্চু।"

পঞ্চুর তো বুক ফুলে উঠল এই কথা শুনে। ও তখন শিরদাড়া টান করে রুখে দাঁড়াল।

অলির হাত ধরে বীরদর্পে ওদের দেখিয়েই নীচে নামতে লাগল বাবলু।

ওরা দু'জন ছিল। সেই দৃশ্য দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। কিন্তু উঠলে কী হবে ? যেই না বাধা দেবে বলে তেড়ে এল, পঞ্চু এমনই ভীষণ হাঁকডাক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর, দু'জনেই তখন সিঁড়িতে গড়াগড়ি।

বাবলু আর অলি কোনওরকমে ওদের টপকে নীচে এল। তারপর মোটরবাইকে চেপে স্টার্ট দিতে গিয়েই বুঝল শয়তানরা চাবি দিয়ে রেখেছে সেটাতে।

অগত্যা বাবলু আবার ফিরে গেল ওদের কাছে। পঞ্চু তখনও নাস্তানাবুদ করে মারছে দু'জনকে। কখনও ঘাড়ে উঠছে, পিঠে চড়ছে, কখনও-বা বুকে উঠে বগলের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ওরাও আঁচড়কামড়ের জ্বালায় কখনও বাবা রে, মা রে করছে, কখনও-বা কাতুকুতু খেয়ে খিলখিল করে হাসছে।

বাবলু ওদের কাছে গিয়ে বলল, "এ ভাই ! প্লিজ, মেহেরবানি করকে বাইককা চাবি দে দিজিয়ে মুঝে।"

চাবি দেবে কী, রাগের চোটে তো ওরা যা-তা বলে গালাগালি শুরু করল তখন।

বাবলু বলল, "কাহে কো গালি দেতা হ্যায় ভাই ? চাবি দে দো না, নেহি তো ইয়ে ধর্মরাজ অধার্মিক কো জিন্দা নেহি ছোড়ে গা।"

ওদের একজন তখন চাবিটা ছুড়ে দিল বাবলুকে।

বাবলু অলিকে নিয়ে মোটরবাইকে চেপে সেটাতে স্টার্ট দিতেই পঞ্চু ওদের ছেড়ে বাবলুর পিছু নিল।

বিলুরা তখন অটো স্ট্যান্ডে।

বাবলু হেঁকে বলল, "তোরা পঞ্চুকে নিয়ে একটা অটো কিংবা ট্রেকারে আয়। আমরা এতে করেই জব্বলপুর চলে যাচ্ছি। সাবধানে আসবি কিন্তু। একটুও দেরি করিস না।"

আর কখনও দেরি করে ? বিলু সঙ্গে-সঙ্গে একটা জিপ পেয়ে সবাইকে নিয়ে উঠে পড়ল তাতে। তারপর নন স্টপে জব্বলপুর। জব্বলপুর তো এল। কিন্তু বাবলু কই ? অলি কোথায় ? ওরা এল না কেন ? দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল, তবুও ওরা ফিরল না। দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ যেন ধীরে-ধীরে গ্রাস করল সকলকে।

॥ ৯ ॥

রাগিণীদের ফ্ল্যাটে বসে তাই দুর্ভাবনার অন্ত রইল না। মিঃ যোশি থানায় খবর নিয়ে জানলেন পথে কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। না পাওয়া গেছে কোনও মোটরবাইক, না কারও বেওয়ারিশ লাশ। তা হলে ? তা হলে ওরা বেপাত্তা হল কীভাবে ?

বিলু বলল, "আমার মনে হয় ওই যে দু'জন ধুঁয়াধারে অলির পাহারায় ছিল, বাবলুরা চলে আসার পর ওরা নিশ্চয়ই শহরের ঘাঁটিতে ওদেরই কোনও লোককে ফোনে সব জানায় আর তারাই পিছু নিয়ে কব্জা করে ওদের। এখন একমাত্র উপায় হল অযথা এখানে সময় নষ্ট না করে সোজা পাঁচমারিতে চলে যাওয়া।"

ভোম্বল বলল, "পাঁচমারি আমাদের যেতেই হবে। কেননা সব রহস্যের মূলকেন্দ্র পাঁচমারিই। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে বাবলু ফিরে আসে ?"

বিলু বলল, "সেই চিন্তাও করেছি। আমরা পাঁচমারিতে গিয়েই মিঃ যোশির পরিচিত কারও সঙ্গে যোগাযোগ করব। তা হলে হবে কি, অযথা সময়ও নষ্ট হবে না আর টেলিফোনের মারফত জানতে পারব ওরা ফিরল কি না।"

ভোম্বল বলল, "দি আইডিয়া। এই ব্যাপারে যোশিজি কী বলেন শুনি ?"

মিঃ যোশি বললেন, "আমি তো বলেইছি আমি সবরকমেই সাহায্য করব তোমাদের। তোমরা এখন কিংবা আর-একটু পরে গেলেও বম্বে মেল পেয়ে যাবে। অনেক লেট আছে আজ গাড়িতে। তোমরা পিপারিয়ায় নেমে লজ পেলে লজ, না হলে স্টেশনেই কাটিয়ে দিয়ো রাতটা। তারপর ভোরের বাস ধরে চলে যেয়ো পাঁচমারিতে। বাসস্ট্যান্ডের সামনেই একটা লজ পাবে, সেটাতে উঠবে না। অসম্ভব চার্জ ওদের। নবাগত যাত্রীরা নতুন জায়গায় গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথমেই ওই লজটাকে অবলম্বন করে। তোমরা তা না করে বাস থেকে নেমে বাঁ দিকের পথ ধরে একটু এগোলেই বাজারের রাস্তা পাবে। সেখানে অজস্র শস্তার লজ। তোমরা বাঁ দিকে পর-পর দুটি পথ দেখতে পাবে। দ্বিতীয় পথটি ধরে একটু এগোলেই দেখবে ডান দিকে হোটেল ময়ূর। আমার পরিচিত লজ। আমার নাম করবে সেখানে। আমি ওদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে রাখব। আমার এখানে তো ফোন নেই।

অফিসে ফোন। তবু আমি যোগাযোগ করব। আর ইতিমধ্যে আমার বন্ধু জয়সওয়ালের গাড়ির ড্রাইভার বীর সিং'কেও জানিয়ে রাখছি ব্যাপারটা। ও-ই তোমাদের পথ চেনাবে। সে নিজেই যোগাযোগ করবে তোমাদের সঙ্গে।"

ব্যস ! আর দেরি নয়। পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বিলুরা যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল।

রাগিণী ওর বাবাকে বলল, "ম্যায় ভি যাউঙ্গা সবকো সাথ।"

মিঃ যোশি কী আর বলেন ? একটু চুপ করে থেকে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তু মাত যা বেটি।"

রাগিণী বলল, "ডরো মাত। মেরা কুছ নেহি হোগা মাম্মি। ম্যায় সব কুছ সামাল লেঙ্গে। তা ছাড়া আমি সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে ওদের।"

অগত্যা আর না-করলেন না কেউ। বিলুরাও রাগিণীকে সঙ্গে নিতে আপত্তি করল না।

মিঃ যোশি ওদের সকলকে খাইয়েদাইয়ে নিজে স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। বম্বে মেল নয়, ভাগলপুর-বোম্বাই এক্সপ্রেস লেট করে এসেছিল। তাতেই তুলে দিলেন ওদের।

রাত বারোটায় পিপারিয়া। ওরা যখন ট্রেন থেকে নামল চারদিক তখন সুনসান। ছোট্ট শহরটি তখন একেবারেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাগিণী বলল, "কী করবে, স্টেশনেই থাকবে, না লজে উঠবে বলো ?"

বিলু বলল, "এত রাতে লজ পাব আমরা ?"

"ওই তো লাইনের ওপারেই আলো জ্বলছে দেবশ্রী লজের। চলো তো দেখি ?"

ওরা লাইন টপকে ওপারে যেতেই দেখল ট্রেন লেটের খবর পেয়ে লজের ম্যানেজার খাতাপত্তর নিয়ে তখনও বসে আছেন। রাগিণী এখানে এলে এই লজেই ওঠে। তাই ওর পরিচিত সবাই। এককথায় বেশ বড়সড় একটা ঘর পেয়ে গেল ওরা। নো ডিপোজিট। পাঁচজনের শোওয়ার ঘরের ভাড়াও মাত্র ষাট টাকা।

ওরা ঘরে ঢুকে বাথরুমের কলে মুখ-হাত ধুয়ে একটুও বিলম্ব না করে শুয়ে পড়ল সবাই। পঞ্চু এককোণে ম্লান মুখে বসে রইল। বাবলু না থাকলে কিছুই ভাল লাগে না ওর। সত্যি, কী যে হল বাবলুটার ?

সকালের রোদ শার্সির কাচ দিয়ে মুখে এসে পড়তেই চোখ মেলল বিলু। ইস্ রে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সকাল এখন সাড়ে ছ'টা। ও সবাইকে ডেকে তুলল। তারপর চটপট দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল সবাই। ভোরের বাস বেরিয়ে গেছে। এখন সকাল সাতটার আগে বাস নেই। সেই বাস ধরতেই হবে যেমন করে হোক।

রাগিণী বলল, "বাস না থাকলেও অসুবিধে নেই। জিপ আছে। অনবরত যাতায়াত করে। বাসের ভাড়া তেরো টাকা, জিপে পঁচিশ।"

বিলু বলল, "বেশিদূর নয় তা হলে ?"

"না, না। মাত্র চুয়ান্ন কিলোমিটার পথ। তবে কিনা সময় নেয় দেড় ঘণ্টা। যাওয়ার সময় দেড়, ফেরবার সময় এক। পাহাড়ের পথ তো। সমতল নয়। শুধু চড়াই আর চড়াই।"

ওরা লজ ছেড়ে রেলের ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওপারে গিয়ে দেখল 'পচমড়ি' লেখা একটি ঝকঝকে সরকারি বাস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওরা টিকিট কেটে বাসের সিট নিয়ে জিনিসপত্তর ভেতরে রাখল।

এইখানে একটু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। বাসযাত্রীদের প্রবল আপত্তি বাসে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না। অবশেষে রাগিণী ড্রাইভারকে ওর বাবার পরিচয় দিয়ে, জয়সওয়ালজির নাম বলে বীর সিং-এর কথা বলতেই ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে নিতে রাজি হয়ে গেলেন। ড্রাইভারের সিটের পেছন দিকেই একটা বসবার জায়গা থাকে। পঞ্চুর জন্য সেই জায়গাটাই বরাদ্দ হয়ে গেল।

কিন্তু হলে কী হবে ? বাস আর ছাড়ে না। শোনা গেল সাতটার বাস আটটায় ছাড়বে। কারণ বম্বে মেল বারো ঘণ্টা লেট। অর্থাৎ রাত আটটার গাড়ি সকাল আটটায় এলে তবেই ছাড়বে বাস।

ওরা ততক্ষণে চা-পর্বটা শেষ করে নিল।

ট্রেন আসার পরই বাস ছাড়ল। যাত্রীর অভাব, তাই অনেক সিটই ভরেনি। বাস প্রথমেই এল মাটকুলি নামে একটি জায়গায়। এখানে চারদিকেই পাহাড়। বাস এখানে কুড়ি মিনিট থামবে। ওরা তাই একঘেয়েমি দূর করবার জন্য নেমে পায়চারি করতে লাগল। পঞ্চু ভয়ে নামেনি। বলা যায় না, ও বেশি নামা-ওঠা করলে যদি ওরা বিরক্ত হয়, তাই চুপচাপ বসে পিটপিট করে দেখতে লাগল সকলকে।

বাস আবার ছাড়ল। এইখান থেকেই শুরু হল পাহাড়ে ওঠার ঘাটপথ। সে কী অনির্বচনীয় দৃশ্য চারদিকে, তা বর্ণনায় প্রকাশ করা যাবে না। কী অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্য ! প্রকৃতি এখানে যেমন উদার তেমনই উন্মুক্ত। যতই দেখল ওরা ততই মন ভরে গেল।

বিচ্ছু আক্ষেপ করে বলল, "হায় রে ! আজ যদি বাবলুদা থাকত সঙ্গে, তা হলে কী ভালই না হত ! বাবলুদা পাহাড়-পর্বতের দৃশ্য দেখতে কত ভালবাসে।"

বাচ্চু বলল, "অলিরও কপাল ! মুক্ত হয়েও মুক্তি পেল না বেচারি !"

বিলু বলল, "তবে একটা কথা, বাবলু যদি ঠিক থাকে তো অলিও ঠিক থাকবে।"

ভোম্বল বলল, "আমি কি ভাবছি জানিস ? বাবলু অলিকে নিয়ে ফেরবার সময় সন্দেহজনক কাউকে দেখে তার পিছু নেয়নি তো ?"

বিলু বলল, "হতে পারে। তোর ধারণাটা কিন্তু অমূলক নয়। তবে কিনা এক্ষেত্রে ও কি এতবড় রিস্ক নেবে ? আমার মনে হয় বিপদেই পড়েছে ওরা।"

বাস যথাসময়ে পাঁচমারিতে এসে পৌঁছল।

॥ ১০ ॥

এই সেই পাঁচমারি। সমুদ্রতল থেকে যার উচ্চতা সাড়ে তিন হাজার ফুট মাত্র। শীতেও অধিক শীত নয়, গ্রীষ্মও মধুময়। অমরকণ্টক থেকে শুরু করে অসিরগড় পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ছ'শো মাইল ব্যাপী যার বিস্তৃতি, সেই সাতপুরা পর্বতমালার মধ্যেই এই পাঁচমারি। বিন্ধ্য পর্বতের সাতপুত্রই সাতপুরা পর্বত নামে খ্যাত। হোসঙ্গাবাদ জেলার দক্ষিণভাগের প্রায় সমস্তটাই এই সাতপুরা পর্বতমালায় ঘেরা। এর সর্বোচ্চ চূড়া ধূপগড়ের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৪৪৫৪ ফুট। পাঁচমারি শৈলাবাসে একটি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে তিনটি, দুটি হাসপাতাল, একটি ডিসপেনসারি, তিনটি ডাকঘর, একটি তারঘর, একটি টেলিফোন অফিস, একটি থানা, তহশিল কোর্ট, কী নেই ? আর আছে জব্বলপুর ব্রিগেডের একটি স্যানাটোরিয়াম ও আর্মি এডুকেশন সেন্টার। লোকসংখ্যাও আট হাজারের ওপর।

বিলুরা এই রমণীয় পাঁচমারিতে বাস থেকে নেমেই মুগ্ধ হয়ে গেল। আবার ভয়ও পেল খুব। এই দিগন্তবিস্তৃত পর্বতমালার ঘন অরণ্যানীর মধ্যে কোথায় বাবলু, কোথায় অলি, কোথায়ই বা জয়দীপদা !

এখানে নামার পর কোনও অসুবিধেই অবশ্য হল না ওদের। সঙ্গিনী রাগিণীই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাসস্ট্যান্ড থেকে বাঁ দিকে বেঁকে বাঁ-হাতি দ্বিতীয় সড়কে ময়ূর লজ। ওরা যেতেই ম্যানেজার বললেন, "উপর চলা যাইয়ে। রুম নাম্বার ফাইভ।"

বিলুরা অবাক! একজন বয় এসে ওদের জিনিসপত্তরে হাত লাগিয়ে ওপরে নিয়ে গেল।

ওদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে একজন নেপালি যুবক বসে ছিল। ওরা যেতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল ওদের।

রাগিণী উল্লসিত হয়ে বলল, "আ রে! বীর সিং, তুম?"

"হাঁ বহিনজি, বাবুজিকা ফোন আয়া থা সাহাবকো পাস। ইসি লিয়ে হম সবেরে আকে রুমকা বুকিং ক্যারোয়ায়া।"

"বেশ করেছ। খুব ভাল কাজ করেছ।"

"তুমহারে বারে মে সব কুছ শুনা। আভি ঠিক তো হ্যায়?"

"হ্যাঁ ভাই।"

বিলুরা সকলে যার-যার জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখলে বীর সিং পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে খুব আদর করতে লাগল ওকে। পঞ্চু এইরকমই চায়। তাই ও দারুণ অভিভূত।

একটু পরেই চা এল।

বীর সিংই অর্ডার দিয়েছিল বোধ হয়।

সবাই মুখ-হাত ধুয়ে চা খেতে বসল। চা খেতে-খেতে রাগিণীর সঙ্গে কত যে কথা হল বীর সিং-এর, তার আর শেষ নেই। ওরা কেন এবং কীজন্য এসেছে, রাগিণী সব বুঝিয়ে বলল বীর সিংকে।

সব শুনে বীর সিং খুব খুশি হয়ে বিলুকে বলল, "বিল্লু ভাই, আমার নাম বীর সিং, বাবার নাম বাহাদুর সিং। দোনো মিলকর আমি হয়ে গেছি বীর বাহাদুর সিং। শর্ট করে বীর সিং। তোমাদের হাওড়ার চারাবাগানে আমি অনেকদিন ছিলাম। এক তার কারখানার গাড়ি চালাতাম আমি। যোশিজি কাল রাতে টেলিফোনে সব কিছু বলেছেন, তবু তোমাদের মুখেও শুনলাম। এখন মুশকিল যেটা হল এই পচমড়িতে তোমরা লাখ-লাখ টাকা নিয়ে ঘুরলেও কেউ চোরি-ডাকাতি করবে না। লেকিন, বিকেল চারটার পর পাহাড় জঙ্গলে থাকবে তো শের উর আকে তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এইখানে আলেকজান্দার মারিয়া এসে কী করে যে কী করছে তা ভেবে পাচ্ছি না। তাই আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা তোমরা এখানকার পুলিশকে জানালেই ভাল করতে।"

বিলু বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ ভাইসাব। তবে কিনা আমরা থানা-পুলিশ করছি না কেন জানো? তা হলে ওই শয়তানটা এই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আমরা চাইছি লোকটাকে হাতেনাতে ধরতে। তারপর থানা-পুলিশ করব।"

"কী করে ধরবে? তোমরা কি ওকে দেখেছ?"

"না। তবে বাবলু, অলি আর জয়দীপদার সন্ধান পেলেই ওকে চিনে নিতে পারব।"

"তোমরা যে কী করে কী করবে আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। এই পচমড়িতে কত যে জায়গা আছে তা কি তোমরা জানো? মোট একশো একুশটি দর্শনীয় স্থান আছে এখানে। জিপ ভাড়া করে বিভিন্ন গ্রুপে মাইলের পর মাইল গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরলে তবেই এসব দেখা যায়। অন্তত মাস খানেক এখানে না থাকলে এতসব দেখা কারও পক্ষেই সম্ভব হয় না।"

বিচ্ছু বলল, "জিপে করেও কি সম্ভব নয়?"

"না। সব জায়গায় জিপ যায় না। তা ছাড়া এখানকার যে সব প্রাগৈতিহাসিক গুহা আছে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবার হদিস সবাই দেবে, কিন্তু গাইড হতে চাইবে না কেউ।"

বিচ্ছুর চোখে জল এল এবার, "তা হলে কি বাবলুদাকে আর আমরা ফিরে পাব না?"

"ওকে যে এইখানেই নিয়ে আসবে তার কি কোনও প্রমাণ আছে?"

"না।"

"তা হলে? যাই হোক, তোমরা এক কাজ করো, এখন আর বসে না থেকে জটাশঙ্কর গুহার দিক থেকে একটু ঘুরে এসো। আমি ততক্ষণ তোমাদের জন্য একটা জিপের ব্যবস্থা করি।"

বীর সিং বিদায় নিলে ওরা ঘরে তালা দিয়ে সবাই চলল জটাশঙ্কর গুহা দেখতে। পাঁচমারির সবচেয়ে কাছের এবং রমণীয় স্থান এই জটাশঙ্কর। এ-পথ রাগিণীর পরিচিত। তাই কোনও অসুবিধে হল না।

এই পথে যেতে-যেতে ডান দিকের একটি পাহাড়ের ওপর একটি গুহা ওদের চোখে পড়ল। এটির নাম হনুমান বা গণেশ গুম্ফা। প্রকৃতির খেয়ালে এই গুহার মুখটা হনুমানের মতো আর এর মধ্যের বিভিন্ন স্থানের আকৃতি কোনওটি গণেশের, কোনওটি শিবের, কোনওটি বা সাপের ফণার মতো। এ ছাড়াও একটি সুমিষ্ট জলের ঝরনাও আছে এর ভেতর। এই পাহাড়ে তখন মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং চলছে। বিশাল একটি প্রস্তরখণ্ডের মাথায় দড়ি বেয়ে উঠছে কত মেয়ে। ছোট্ট একটি পাহাড়ি নালা পার হয়ে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে পর্বতারোহণ শুরু করল ওরা।

পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠে চারদিকের প্রকৃতি দেখে মোহিত হয়ে গেল সকলে। হঠাৎই বিলু চাপা গলায় বলে উঠল, "ভোম্বল! ওই দ্যাখ।"

ভোম্বল সবিস্ময়ে বলল, "কী রে!"

"ওই, ওই দ্যাখ, কে আসছে।"

শুধু ভোম্বল নয়, ওরা সবাই দেখল জটাশঙ্কর গুহার দিক থেকে একজন ভীষণদর্শন ওলমুখো লোক একটি মোটরবাইকে চেপে দ্রুত সেই পথে এগিয়ে আসছে। এ সেই মোটরবাইক, যেটাতে চেপে অলিকে নিয়ে নিখোঁজ হয়েছে বাবলু।

ভোম্বল বলল, "এটা সেটাই কী?"

"পেছন দিকটা লক্ষ করে দ্যাখ, কেমন এক ধরনের ঝালর দেওয়া আছে।"

"তার মানে ওরা এখানেই আছে।"

বিলু আক্ষেপ করে বলল, "হায়, হায় রে! কেন যে মরতে এই গণেশ গুম্ফায় উঠতে গেলাম! চারটে হাত-পা'ও বেরোল না, কিছু না। মাঝখান থেকে আমাদের প্রধান শত্রু হাতছাড়া হয়ে গেল। এই লোকই যে আলেকজান্দার তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু এই লোক জটাশঙ্করে কেন?"

"কে জানে?"

ওরা গণেশ গুম্ফার ওপর থেকে নেমেই ছুটল লোকটার পিছু নিতে। কিন্তু সে তখন কোথায়? চোখের পলকে সে পাহাড়ের বাঁকে কোথায় যে হারিয়ে গেল দেখতে পেল না কেউ।

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় জটাশঙ্করে গেলেই বোধ হয় এর জট খুলবে। ওদের ওরা ওইখানেই নিয়ে গিয়ে রেখেছে কোথাও।"

বিলু বলল, "ঠিক তাই। এমনকী আমরা যে ওদের খোঁজে পাঁচমারিতে আসব তাও হয়তো ওরা জানে, আর সেইজন্যই বাইক নিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছে আমাদের কোথাও দেখতে পায় কি না।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক বলেছ বিলুদা। তা হলে এখন?"

ভোম্বল বলল, "চলো জটাশঙ্কর।"

ওরা জটাশঙ্করের পথই ধরল। কী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এই পথে। কলকল নদী, ঝরনা, হরিয়ালি আর রাস্তা, ঘন দ্রুমলতায় আচ্ছন্ন উঁচু-উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে একসময় ওরা গুহায় গিয়ে

পৌঁছল। স্ট্যালাকটাইট স্ট্যালাগমাইট পাথরের গুহা। সরকারিভাবে আলোর ব্যবস্থা আছে তাই রক্ষে, না হলে ঘনান্ধকার। গুহার ছাদ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। গুহার ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে জম্বু নামে এক নদী । বাসুকিনাগের ফণার মতো গুহার একটি অংশে রয়েছেন জটাশঙ্কর মহাদেব।

এখানকার পরিবেশ এমনই যে, এখানে কাউকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অনবরত তীর্থযাত্রীরা আসছেন এখানে। পুজোপাঠ হচ্ছে। ওরা পঞ্চুকে নিয়ে সেই পাতাল গহ্বর থেকে ওপরের আলোর জগতে ফিরে এল। গুহার বাইরে এসেই দেখল বীর সিং জিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

বিলু বীর সিংকে বলল, "ভাইসাব, একটু আগে এখানে একজন লোক মোটরবাইকে চেপে এসেছিল। আমাদের মনে হয় ওই লোকই আলেকজান্দার। তা যদি হয়, তা হলে বাবলুরা নির্ঘাত এখানে আছে।"

বীর সিং বলল, "এক মিনিট।" বলে গুহামন্দিরের আশপাশে যে দু-একটি ঝোপড়ির চা দোকান আছে সেখানে গিয়ে কীসব কথাবার্তা বলে ফিরে এসেই বলল, "ওই লোকের নাম মহাদেও খাণ্ডেলবালা। এখানে পুজো দিতে আসে। প্রায়ই ওকে ছোটি আনহোনির দিকে দেখা যায়। কিন্তু ও কী করে তোমাদের আলেকজান্দার মারিয়া হবে?"

রাগিণী বলল, "ওই লোক কুখ্যাত হলে আমার বাবাও ওকে জানতেন।"

বিলু বলল, "তোমার বাবার কাছে তো ওই নাম বলিনি আমরা। আলেকজান্দার মারিয়ার নামই বলেছি। তাই উনি বুঝতে পারেননি। তা ছাড়া ঘুশৃণেশপ্রসাদ ভাট তো এই অঞ্চলেরই লোক।"

রাগিণী বলল, "ঘুশৃণেশ শিবের নাম। ওই নাম যখন, তখন উনি নিশ্চয়ই মরাঠি। মানসাদ কিংবা ঔরঙ্গাবাদের লোক। তবে মহাদেও খাণ্ডেলবালা এবং আলেকজান্দার মারিয়া একই ব্যক্তি হতে পারেন। জটাশঙ্করের পুজো দিতে যখন আসেন তখন তিনি কোনওমতেই গোয়ানিজ হতে যাবেন না। গোয়ানিজরা অধিকাংশই খ্রিস্টান।"

বিচ্ছু বলল, "হতে পারে। গোয়ায় কিন্তু হিন্দুদের বিখ্যাত শান্তাদুর্গার মন্দির আমরা দেখে এসেছি।"

বীর সিং বলল, "একবার যদি ওই লোককে আমি দেখতাম তো চিনে নিতে পারতাম। তা ঠিক আছে। এখন তোমরা এসো আমার সঙ্গে। কিছু-কিছু টুরিস্ট স্পট তোমাদের দেখাই। ও যদি সেই লোকই হয় তা হলে নিশ্চয়ই তোমাদের খোঁজে ও হন্যে হয়ে ঘুরবে। আর, একবার আমার চোখে পড়লে ঠিকই চিনে নেব ওকে।"

বিলু বলল, "ওর ওই মোটরবাইকের নম্বর হচ্ছে থ্রি জিরো নাইন। গণেশ গুম্ফায় উচ্চস্থানে থাকায় ওই নম্বরটা আমরা অবশ্য লক্ষ করতে পারিনি।"

বীর সিং বলল, "তোমাদের অনুমান যদি ঠিক হয়, ও লোক তা হলে ধরা পড়বেই। এখন চলো, একটু ঘুরেফিরে দেখি যদি কোথাও দেখা পাই লোকটার।"

ওরা সবাই জিপে উঠলে জিপ দ্রুত এগিয়ে চলল। পাহাড়ের ওপর এমন সুন্দর সুরম্য পথ খুব কম জায়গাতেই আছে। প্রথমেই ওরা সাতপুরা ন্যাশনাল পার্কের দিকে মূল রাস্তা ধরে একটু এগিয়েই ডান দিকের পথ ধরল। এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে লাফাতে-লাফাতে চলল জিপ। এক-এক সময় মনে হল এই উলটে যায় আর কী! বেশ খানিকটা এইভাবে যাওয়ার পর বীর সিং বলল, "আর এগনো যাবে না। এখানে নেমেই হাঁটতে হবে। এটা হল মায়দেও এলাকা। এখানে পরপর অনেক গুহা আছে। চলো একটু দেখে আসি।"

সত্যি, কী দারুণ জঙ্গল চারদিকে। দেখলে ভয় করে, আবার ভালও লাগে। গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চলে একসময় ওরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর নির্জনে ওরা ছাড়া আর কারও অস্তিত্বও নেই। এইসব গুহায় সিজন টাইম ছাড়া সচরাচর কোনও টুরিস্ট আসেই না বলতে গেলে। না আসার কারণও আছে। এ যা জঙ্গল, তাতে দিনমানেও কোনও বন্যজন্তু হঠাৎ আক্রমণ করলে রক্ষা করবার কেউ নেই। ওরা একটির-পর-একটি গুহা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। আর পঞ্চু তোলপাড় করতে লাগল বনবাদাড়।

কী অসাধারণ সব চিত্রকলা এই প্রাগৈতিহাসিক গুহাগুলিতে! বেশিরভাগ গুহাতেই দু'দল যোদ্ধার মধ্যে লড়াইয়ের দৃশ্য। তীর, ধনুক, রমণী ও বাইসনের ছবিও আছে। কোনওটি স্পষ্ট, কোনওটি অস্পষ্ট। অনুমান করা হয়, চুনাপাথর ও একধরনের গাছের ছাল পুড়িয়ে ছাই করে আঁকা হয়েছিল এইসব ছবি। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ছবিগুলির শিল্পকর্মে অ্যানাটমি জ্ঞান দেখে এগুলিকে এক্স-রে ছবি নাম দিয়েছেন।

গুহা দেখে আবার জিপে উঠল ওরা।

বীর সিং এবার যেখানে নিয়ে এল ওদের, সেই জায়গাটা পাঁচমারি শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। একটি গোলাপবাগের সামনেই খাড়া পাহাড়। বেশ কিছু টুরিস্ট এসেছে সেখানে। সেই পাহাড়ে নীচে-ওপরে করে মোট পাঁচটি গুহা।

রাগিণী বলল, "পাণ্ডব কেভ। পঞ্চপাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় খাণ্ডবপ্রস্থে এলে এইসব গুহায় বসবাস করেন।"

বীর সিং বলল, "আরে না, না, এসব বুদ্ধিস্টদের আমলের।"

রাগিণী বলল, "সে যাই হোক, ওগুলো তর্কের ব্যাপার। তবে পঞ্চপাণ্ডবদের এই পঞ্চমেধি থেকেই পচমড়ি নামটা এসেছে।"

এইসব গুহামুখগুলো তারের জাল দিয়ে বন্ধ করা। ছোট-ছোট গুহা। ওরা অনেক অনুসন্ধান করে এখানকার কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও ওদের মনের মতন কোনও খবর পেল না।

বীর সিং বলল, "মারদেও গুহা ছেড়ে এই জায়গায় ওদের এনে রাখবে না। তবে তোমাদের ফলো করতে এদিকে যদি কেউ আসে তো সে- কথা আলাদা।"

ওরা ধাপে-ধাপে সিঁড়ি ভেঙে গুহার মাথায় উঠল। এটা কী পাঁচমারির মনুমেন্ট? এখান থেকে পাঁচমারির সবকিছুই দেখা যেতে লাগল। কী আশ্চর্য-সুন্দর প্রকৃতির রূপ এখানে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়।

ওরা পাণ্ডব কেভ দেখে আবার চলল নতুন কোনও স্পটের দিকে। আবার জঙ্গল। গভীর, গভীরতর জঙ্গল আর তেমনই এবড়োখেবড়ো রাস্তা।

বিলু বলল, "এবারে কোন গুহা?"

বীর সিং বলল, "এবারে আর গুহা নয়। এবার যাচ্ছি বি-ফল্‌স। যমুনা প্রপাত।"

বিচ্ছু বলল, "এখানে আবার যমুনা কোত্থেকে এল?"

"সে যমুনা তো নয়। বি-ফল্‌স। দারুণ একটা জলপ্রপাত। মৌমাছির মতন দেখতে এর জলধারাগুলো কণায়-কণায় ছড়িয়ে পড়ে বলে এইরকম নাম। এবারে জিপ যেখানে থামবে সেখান থেকে অনেক নীচে নামতে হবে। পারবে তো?"

সবাই বলল, "পারতেই হবে।"

নীরব শুধুই পঞ্চু। সে আর কিছুই বলছে না। বাবলু ছাড়া ও যেন হতাশায় কীরকম ঝিমিয়ে পড়ছে।

একজায়গায় গিয়ে জিপ থামিয়ে বীর সিং রাগিণীকে বলল, "দিদিভাই, তুমি এদের পথ দেখিয়ে নীচে নিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে কিন্তু। আমাকে গাড়ির পাহারায় থাকতে হবে। দেখছ তো, কেউ কোথাও নেই।"

রাগিণী বলল, "ঠিক আছে। আমিই নিয়ে যেতে পারব। তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। তুমি গাড়িতেই থাকো।"

রাগিণীর সঙ্গে ওরা ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ক্রমশ নীচে নামতে লাগল। নামছে তো নামছেই। পথ আর শেষ হচ্ছে না। অবশেষে একসময় ওরা একটি জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছল।

রাগিণী বলল, "যমুনা প্রপাত।"

বিলু বলল, "এই দেখতে এখানে আসা ? কিন্তু এখানেও তো কারও অস্তিত্ব নেই।"

রাগিণী বলল, "আসল জায়গাটা এখান থেকে অনেক নীচে। এই যমুনা প্রপাত পরে নয়নমনোহর বি-ফল্স হয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "এতদূর এসেছি যখন দেখেই যাই। কথায় বলে যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই।"

কথাটা ঠিক। ওরা তাই আশায় বুক বেঁধে জঙ্গলের পাকদণ্ডী বেয়ে বি-ফল্স দেখতে চলল। কিছুটা নীচে নামার পর হঠাৎই কী দেখে যেন ভয়ঙ্কর একটা ডাক ছেড়ে ছুটে গেল পঞ্চু। কী দেখল ও ? কুকুর বাঘকে ভীষণ ভয় করে। ও কি তবে বাঘ দেখল ? কিন্তু এ- ডাক তো ভয়ের ডাক নয়। এ যে ক্রোধের।

ওরা দেখল একটি ঘন ঝোপের ধারে সকলের চোখের আড়ালে বড় একটি গাছের গুঁড়িতে জয়দীপদাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে কারা। আর বি-ফল্স-এর শীতল ধারায় সাবান মেখে আরাম করে স্নান করছে দু'জন লোক। এরা সেই লোক, হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে পঞ্চুর তাড়া খেয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল যারা।

বিলু উল্লসিত হয়ে বলল, "পেয়েছি, পেয়েছি। এতক্ষণে পেয়েছি ওদের। এইবারে বাবলুর খোঁজ পাবই পাব।"

লোক দুটো যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ওদের দেখে। বিশেষ করে পঞ্চুকে দেখে পরমানন্দ মোটেই লাভ করল না।

বাচ্চু, বিচ্ছু আর রাগিণী তখন অর্ধ অচেতন জয়দীপকে বন্ধনমুক্ত করেছে।

বিলু বলল, "শয়তান। তোমরা এইখানে এসে হাজির হয়েছ তা হলে ? আমাদের আর দু'জন কোথায় ?"

ভোম্বল তখন একটা পাথর ছুড়ে একজনের মুখে মারতেই পঞ্চু করল কী, অপরজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। পঞ্চুর এই এক দোষ, রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে এমনভাবে লোকটার ঘাড়ে লাফাল যে, টাল সামলাতে না পেরে দু'জনেই ছিটকে পড়ল খাদের দিকে। প্রাণান্তকর একটি আর্তনাদ বেরিয়ে এল লোকটার গলা দিয়ে। ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল একেবারে খাদে পড়েনি। তবে একটা আগাছাকে আঁকড়ে ধরে হাজার ফুট খাদের দিকে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে লোকটা। সেখান থেকে ওকে ওঠাবার কোনও পথই খোলা নেই।

আর পঞ্চু ! সেও একটা ঝোপে আটকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে।

বিলু আর বিচ্ছু জয়দীপদার বন্ধন-দড়িটা পঞ্চুর দিকে ঝুলিয়ে দিতেই ও সেটাকে প্রাণপণে কামড়ে ধরল। এবার অনায়াসেই ওকে টেনে তুলল ওরা। যাক, ফাঁড়া কাটল।

বাকি রইল অন্য একজন। বিলু আর ভোম্বল রক্তচক্ষু করে তাকে বলল, "এবারে বলো আমাদের আর দু'জন কোথায় ?"

লোকটি বলল, "আমি জানি না।"

বিলু ডাকল, "পঞ্চু !"

লোকটি বলল, "বলছি, বলছি। ওই নচ্ছারটাকে একদম ডেকো না। একটুও সহবত শেখেনি ও।"

ভোম্বল ধমক দিয়ে বলল, "বাজে কথা রাখো। বলো, আমাদের আর দু'জন কোথায় ?"

"ওরা এতক্ষণে বাঘের পেটে।"

বিলু বলল, "তাই যদি হয়ে থাকে তুমিও তা হলে বাঘের পেটেই যাও।" বলে ওদেরই আনা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে লোকটাকে ওদের কাছে টেনে আনল প্রথমে। তারপর বেধড়ক পিটিয়ে যে গাছের গুঁড়িতে জয়দীপকে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেই গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল।

কাজ শেষ হলে বিলু বলল, "তোমার এমন নধর মাংস বনের বাঘ এসে ছিঁড়ে খাবে সে- দৃশ্য দেখার আনন্দ আমরা তো উপভোগ করতে পারব না, তা হলে আমরাই বাঘের খোরাক হয়ে যাব। তাই বিদায় বন্ধু, বিদায়।"

লোকটা এবার কাতরভাবে বলল, "আমার অন্যায় আমি স্বীকার করছি ভাই। আমাকে তোমরা মুক্তি দাও। তোমাদের আর দু'জনকে মহাদেও পর্বতমালার এক গুহার মধ্যে রাখা হয়েছে এইটুকুই শুধু বলতে পারি। তবে বেঁচে আছে কি না জানি না।"

বিলু বলল, "থ্যাঙ্কস। তবে তোমার মুক্তির ব্যাপারটা তোমার ভাগ্যের ওপর থাক। তোমার এবং তোমার ঝুলন্ত বন্ধুর মঙ্গল কামনা করি। যদি হঠাৎ করে বি-ফল্স দেখতে কোনও টুরিস্ট এসে যায় তা হলে নিশ্চয়ই তোমরা মুক্তি পাবে। বন্ধুর কথা বলতে পারছি না, তুমি পাবেই।"

বিলুর নির্দেশে সবাই এবার ওপরে উঠতে লাগল। শুধু জয়দীপদাকে নিয়েই যা ভোগান্তির শেষ রইল না। তবে সকলের ওপরে পঞ্চু। সকলের আগেই সে ওপরে উঠল।

বীর সিং তো ভাবতেই পারেনি এমন অসম্ভব সম্ভব হবে বলে। তাই ওদের সঙ্গে জয়দীপকে দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে গেল সে।

বিলু বলল, "বাবলুর সন্ধান পেয়েছি ভাইসাব। ওকে নাকি ওরা মহাদেও পর্বতমালার কোনও একটা গুহায় রেখেছে।"

বীর সিং বলল, "যেখানেই রাখুক, ওর খোঁজে গোটা পাহাড় আমি তোলপাড় করে ফেলব। এখন শিগ্‌গির চলো একে আগে লজে পৌঁছে দিয়ে আসি। বেলা এখন দেড়টা। তোমরাও কোনও একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নেবে চলো।"

জয়দীপ বলল, "তাই চলো ভাই, আমারও বড্ড খিদে পেয়েছে। ক'দিন তো আধপেটা খেয়ে আছি। আজও সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি।"

বীর সিং প্রথমেই ওদের লজে নিয়ে এল। তারপর সকলের স্নান শেষ হলে খাবার জন্য একটা হোটেল দেখিয়ে দিল ওদের। নিজেও খেল সেখানে। খাওয়াদাওয়ার পর বলল, "তোমরা একটু বিশ্রাম নাও। আমি চট করে একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে গাড়িতে একটু তেলটেল দিয়ে আনি। কেমন ?"

বীর সিং চলে গেল।

বিলুরা জয়দীপকে লজে নিয়ে এসে শুয়ে পড়তে বলল।

জয়দীপ কান্নাধরা গলায় বলল, "তোমাদের ঋণ আমি এ জনমে শোধ করতে পারব না ভাই। যেভাবে তোমরা আমার প্রাণরক্ষা করলে তার তুলনা হয় না। পারলে আমার বাড়িতে একটা ফোন করে আমার খবরটা জানিয়ে দিয়ো। একে তো আমি মানিলেস, তার ওপরে শক্তিহীন। এখন আমি শুধুই ঘুমোব। বড় দুর্বল আমি।"

বিলু বলল, "জয়দীপদা, আপনি এখন ফুল রেস্টে থাকুন। সেটাই আপনার পক্ষে মঙ্গলের। কেননা, আমরা তো এখনও শত্রুমুক্ত নই। তবে আমাদের বেরোতেই হবে। কেননা, বাবলু আর অলি দু'জনকেই কিড্‌ন্যাপ করেছে ওরা।"

জয়দীপ বলল, "আমাকে নিয়ে এসেছে না হয় আমার বাবার ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে। কিন্তু ওদের কেন ধরল ?"

বিলু বলল, "শয়তানের রক্তপিপাসা যখন চরমে ওঠে তখন কী যে করে তারা, তার কোনও ঠিক থাকে না।"

এইসব কথাবার্তার ফাঁকেই বিলুরা ওদের অভিযানের জন্য তৈরি হয়ে নিল। যার যা সঙ্গে নেওয়ার, নিয়ে নিল সবই। সেই আংটা লাগানো নাইলনের ফিতে, ছোরা, কোনও কিছুই নিতে ভুলল না। যদিও নৈশ অভিযান অসম্ভব, তবুও টর্চ নিতে ভুলল না। কিন্তু এত সত্ত্বেও চরম দুঃসংবাদটা বয়ে আনল বীর সিং-ই। একটু পরেই ও ফিরে এসে বলল, "বিল্লু ভাই, খুব একটা মুশকিল হয়ে গেছে যে!"

"কীরকম?"

"আমাকে এখনই সাহেবকে নিয়ে পিপারিয়ায় যেতে হবে। কাল দুপুরের আগে ফিরতে পারব না।"

"সে কী! আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে তা হলে।"

"কোনও উপায় নেই। শুধু তাই নয়, আর কোনও জিপের ব্যবস্থাও করে উঠতে পারলাম না। কাজেই কালকের দিন পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।"

বিলু বলল, "অসম্ভব! আর-এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারব না আমরা। তবে একটা কথা, আপনি আমাদের দু-একটা স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? রাগিণী তো পথঘাট চেনে, ওকে নিয়েই আমরা চারদিক ঢুঁড়ে ফেলতে পারি।"

বীর সিং বলল, "তোমরা স্কুটার চালাতে পারো? তা হলে দু-একটা নয়, এক ডজন স্কুটার জোগাড় করে দিতে পারি তোমাদের।"

রাগিণী বলল, "কিন্তু আমি যে পারি না?"

বিলু বলল, "তাতে কী? ডাব্‌ল ক্যারি করে নেব আমরা।" বলে বীর সিংকে বলল, "আপনি আমাদের তিনটে স্কুটারের ব্যবস্থা করে দিন। একটাতে থাকব আমি। পঞ্চু থাকবে আমার সঙ্গে। একটাতে ভোম্বল। ও চাপিয়ে নেবে রাগিণীকে। বাচ্চু ও বিচ্চু থাকবে আর-একটাতে।"

বীর সিং বলল, "এসো তা হলে।"

ওরা জয়দীপকে সাবধানে থাকতে বলে দলবদ্ধ হয়ে চলল সকলে। বীর সিং ব্যবস্থা করে দিল স্কুটারের। তিনটের জায়গায় চারটে স্কুটারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বীর সিং বলল, "সন্ধের আগেই ফিরে পড়বে কিন্তু। আর চারটের পর ভুলেও জঙ্গলে থাকবে না। আমার কথা অমান্য করলে দারুণ বিপদে পড়ে যাবে। মিলিটারিরাও রাতভিত এখানকার জঙ্গলে ঢোকে না।"

বিলু বলল, "আমাদের নিরাপত্তা আমাদের কাছে ভাইসাব। এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ওরা বীর সিংকে বিদায় জানিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল মহাদেও পর্বতমালার দিকে।

পথে যেতে-যেতে হঠাৎ একজায়গায় এসে কী যেন দেখে স্কুটার থামিয়ে দিল বিলু।

সবাই বলল, "কী হল?"

বিলুর আগেই পঞ্চু তখন ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে সেটা।

বিলু সেটা হাতে নিয়েই বলল, "এটা এখানে কী করে এল? এটা তো বাবলুর পিস্তল।"

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু সবাই দেখল পিস্তলটা বাবলুরই। কিন্তু এই পিস্তল এখানে পথের ধারে পড়ে আছে কেন? তবে কী?...

রাগিণী বলল, "এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভয়ঙ্কর জায়গা এটা। এর নাম খাণ্ডি খো। ওরা নিশ্চয়ই ওদের দু'জনকে এখানেই শেষ করেছে।"

বিচ্চু বলল, "খাণ্ডি খো? সে আবার কী?"

"কাছে চলো, দেখবে।"

ওরা একটু এগিয়েই এক বিপজ্জনক খাদের পাশে এসে দাঁড়াল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দু'দিকের পাহাড়ের মাঝে গভীর

খাদের খাণ্ডি খো নালা বয়ে চলেছে। ওপর থেকে নীচের দিকে তাকালেই বুক শুকিয়ে যায়। এর উদাসীন সৌন্দর্য মনকে যেমন ভরিয়ে তুলল তেমনই এর ভয়াবহতাও কাঁপিয়ে দিল বুক। এই খাণ্ডি খো নালা অদূরেই দেনবা নদীতে গিয়ে মিশেছে।

রাগিণী বলল, "এই নালার ভেতরে কাউকে ফেললে তার কী অবস্থা হবে একবার ভাবতে পারো? এখানে চেঁচালে এর প্রতিধ্বনি পাহাড়ে- পর্বতে গমগম করে। একটুকরো পাথর ফেললে খুব জোরে শব্দ হয়। ভারী পাথর ফেললে মনে হয় যেন তোপ দাগছে।"

ওরা যখন খাণ্ডি খো নালার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখছে ঠিক তখনই চারদিক থেকে পাথরের বৃষ্টি শুরু হল ওদের ওপর। আর সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে একটা মোটরবাইক এসে এমন আচমকা তুলে নিল রাগিণীকে যে, পঞ্চুও ছুটে গিয়ে তার নাগাল পেল না। বিলু লক্ষ করল এটা সেই মোটরবাইক যার নম্বর হচ্ছে 'থ্রি জিরো নাইন।' ওরা বিভ্রান্তির ভাব কাটিয়ে আর-এক মুহূর্তও দেরি না করে ধাওয়া করল সেই অপহরণকারীকে।

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক। অলিকে নিয়ে দিব্যি আসছিল সে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে বুঝল একটি দ্রুতগামী ট্রাক ভীষণ জোরে ধাওয়া করেছে ওদের। উদ্দেশ্য যে সাধু নয় তা ও বুঝতে পারল। তাই দ্বিগুণ জোরে সেও চালিয়ে নিয়ে চলল বাইকটাকে। কিন্তু একসময় যখন দেখল পরপর দু-তিনটি গাড়ি এসে ঘিরে ফেলেছে ওদের, তখন বাধ্য হয়েই ব্রেক কষতে হল।

ততক্ষণে চার-পাঁচজন ছুটে এসেছে।

একজন বলল, "ইয়ে হ্যায় থ্রি জিরো নাইন। মারো বদমাশকো, চোরি করকে ভাগতা হ্যায়।"

ব্যস! ওদের কিল, চড়, ঘুসি পড়তেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল বাবলু। এর পর আর কিছুই ওর মনে নেই।

আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কাটল তখন দেখল একটি অন্ধকার গুহায় স্যাঁতসেতে মেঝের ওপর শুয়ে আছে ওরা। বাবলু আর অলি। সেই গুহায় এককোণে একটি প্রদীপ জ্বলছে। আর সেখানে ফুল, বেলপাতায় ঢাকা আছে একটি শিবলিঙ্গ। অর্থাৎ কোনও গুহামন্দির এটা। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?

বাবলু উঠে বসেই ঠেলা দিয়ে ডাকল অলিকে, "অলি! অলি! শিগ্‌গির ওঠো।"

অলিও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বলল, "আমরা কোথায় বাবলু?"

"জানি না। তবে একটা গুহামন্দিরে।"

"কীভাবে এলাম আমরা এখানে?"

"কী করে জানব? চোখ মেলেই দেখি দু'জনে শুয়ে আছি। মনে হচ্ছে এখন অনেক রাত।"

"আমরা কি বন্দি?"

"তাই-বা বলি কী করে? তা হলে তো আমাদের হাত-পা বাঁধা থাকত।"

বাবলু বলল, "যাক, একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত যে, আমরা দেবতার স্থানে আছি। এখনও পর্যন্ত বাঘের পেটে যখন যাইনি তখন আর আমাদের পায় কে? কিন্তু আমার পিস্তল? সেটা গেল কোথায়?"

"সে কী! পিস্তল নেই?"

বাবলু আর অলি গুহার ভেতরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। কিন্তু না, কোথাও নেই পিস্তলটা। বাবলুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বলল, "এইজন্যই অপহরণকারীরা আমাদের বেঁধে রেখে যায়নি। ওরা জানে আত্মরক্ষার হাতিয়ার কেড়ে নিলে এই পাহাড়-জঙ্গলে আমরা অসহায়। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ কোথায়? এটা ভুতুড়ে গুহা নয়তো?"

অলি এদিক-সেদিক দেখতে-দেখতে হঠাৎ একজায়গায় দেওয়ালে হাত বুলিয়ে বলল, "এই দ্যাখো বাবলু, কী বড় একটা ফাটল। একজন লোক কোনওরকমে কাত হয়ে এর ভেতরে ঢুকতে-বেরোতে পারে। তাও মোটা লোক পারবে না। আমার মনে হয় ওরা আমাদের এই পথেই নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এর শেষ কোথায়?"

বাবলু বলল, "জানবার দরকার নেই। আগে সকাল হোক, তারপর দেখা যাবে।"

গুহার অভ্যন্তরে দীর্ঘ রাত্রির শেষ আর হয় না। ওরা একমনে সেই শিবলিঙ্গের কাছে ওদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে লাগল।

অনেক পরে গুহার অন্ধকার একটু-একটু করে কাটতে থাকলে ওরা বুঝতে পারল ভোর হচ্ছে। পাহাড়-জঙ্গলের দেশে ভোরও ভয়াবহ। তাই আর-একটু বেলা বাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অবশ্য বেরিয়ে ওরা যাবে কোথায়? বাইরে পাহারা নিশ্চয় থাকবেই।

হঠাৎ কাদের যেন পদশব্দ ও কথা বলার আওয়াজ কানে এল ওদের।

বাবলু অলিকে ইশারা করে ফাটলের দু'পাশে দেওয়াল ঘেঁষে চেপে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, "বেগতিক দেখলেই ধাক্কা দিয়ে পালাব।"

অলি বলল, "ওরা যদি অনেকজন হয়?"

বাবলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "চু-উ-উ-প।"

পদশব্দ আরও এগিয়ে এল। যারা এল তারা পূজারী ব্রাহ্মণ। সাদা থান পাট করে পরা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ওদের একজনকে বলতে শোনা গেল, "জয় শঙ্কর ভগবান কী! ও দোনো কাঁহা গায়েব হো গয়া? না জানে কৌন বদনসীব কা আওলাদ।"

এই কথা কানে যেতেই ওরা দু'জনে আত্মপ্রকাশ করে প্রণাম করল পূজারীদের।

পূজারীজি বললেন, "জি'তে রহো বেটা। ক্যা নাম তুমহারা? মকান কাঁহা?"

বাবলু ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ওদের বিপদের কথা খুলে বলল পূজারীদের।

পূজারীজি বললেন, "তুম দোনো বঙ্গালকা? উধার হম পাঁচ সাল থে। তা ঠিক আছে। কুছু ভয়ডর নাই। এইখানে জাগ্রত বাবার স্থান আছে। অন্যায় করে কেউ পার পাবে না। মহাদেও পর্বতমালার এই যে গুহা দেখছ, এই হল গুপ্ত মহাদেব। ভস্মাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উনি এখানে এসে লুকিয়েছিলেন। এই পর্বত দু'ফাঁক হয়ে বাবাকে আশ্রয় দিয়েছিল। কাল বিকেলে যখন আমি গুহার মুখ বন্ধ করে গাঁওতে ফিরে যাচ্ছি, তখন দেখি জঙ্গলের ভেতরে একটা ঝরনার ধারে তোমাদের দু'জনকে হাত-পা বেঁধে কারা ফেলে দিয়ে গেছে। আমি বহু কষ্টে ওইখান থেকে নিয়ে এসে তোমাদের রেখে গেছি এই শঙ্কর ভগবানের কাছে। আমার গাঁও দূর। দোনোজনকে তো আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। না হলে ঘরেই নিয়ে যেতাম।"

এর পর পূজারীরা অনেকক্ষণ ধরে পুজো করলেন। কর্পূর, ধূপ জ্বেলে আরতি করলেন। তারপর প্রসাদ দিলেন দু'জনকে। একটা করে কলা, লাড্ডু আর ছোলা।

ওরা তৃপ্তি করে তাই খেল।

বাবলু বলল, "আচ্ছা পূজারীজি! আমরা এখন কোথায় আছি?"

"গুপ্ত মহাদেব। এইখান থেকে জঙ্গল পার হয়ে দু'-তিন কিলোমিটার গেলেই পঁহুছে যাবে বড়ি মহাদেব। আরও ন'-দশ

কিলোমিটার যাবে তো পঁচমড়ি।"

"আমরা তা হলে পাঁচমারিতেই আছি ?"

"হ্যাঁ। ওইখানে পঁহুছে তোমরা সিপাহি লোগ্‌কে সব কুছ বতাবে তো সব ঠিক হোয়ে যাবে।"

বাবলু পূজারীদের কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে সেই রমণীয় পার্বত্যপথে চলতে শুরু করল। পাহাড় আর অরণ্যের রূপ দেখে মন মোহিত হয়ে গেল দু'জনের। যেতে-যেতেই বাবলু বলল, "বিলুরা এখন কোথায় তা কে জানে ? এমন সব সুন্দর দৃশ্য, সঙ্গে এসেও দেখতে পেল না।"

অলি বলল, "আমার মনে হয় ওরা এখানে নিশ্চয়ই এসেছে। হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজছে হয়তো।"

"পাঁচমারি এত সুন্দর জায়গা বলেই লোকে এখানে বেড়াতে আসে। আমরা তো আমাদের অভিযানে কত দেশ ঘুরলাম। কিন্তু পাহাড়-পর্বতের এমন সৌন্দর্য কোথাও দেখিনি !"

"কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, জ্যান্ত মানুষকে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে যারা মজা দেখে, তারা হঠাৎ আমাদের এইভাবে রাস্তার ধারে ফেলে রাখল কেন ?"

"হয়তো তাড়াতাড়ি ধেয়েছে। না হলে লোকজন থাকায় সুবিধে করতে পারেনি। হাজার হলেও মিলিটারি বেস তো। আমার মনে হয় আমার পিস্তলটা ওইখানেই কোথাও পড়ে গেছে।"

কথা বলতে-বলতে একসময় ওরা বড় সড়কে এসে পড়ল। তারপর স্থানীয় দু'-একজনের কাছে পথনির্দেশ নিয়ে এগিয়ে চলল বড়ি মহাদেবের গুহামন্দিরে।

অলি বলল, "আর পারছি না। কী খিদে যে পেয়েছে আমার !"

"আমারও। কিন্তু এখানে খাব কোথায় ? কোথাও কিছু তো নেই।"

"তা ছাড়া কিছু খেতে গেলে পয়সাও তো লাগবে।"

"টাকাপয়সা সবই আছে আমার কাছে। দুষ্কৃতীরা আর যাই করুক, ওগুলোতে হাত দেয়নি। পিস্তলটা হয় ওরা নিয়েছে নয়তো পড়ে গেছে।"

পথ চলতে-চলতে একসময় ওরা বিশালাকৃতির একটি গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। গুহার ভেতর থেকে ঝরনার জলধারা বেরিয়ে আসছে। কত লোক স্নান করছে সেই ঝরনায়। চারদিকে সাধুর আশ্রম। দোকানপাট। গুহামন্দিরের সামনে অসংখ্য ত্রিশূল পোঁতা। গুহার ছাদ বেয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল পড়ছে। ভেতরে বড়ি মহাদেবের স্থান। ওরা বিগ্রহ দর্শন করে শুনল শিবরাত্রিতে নাকি মস্ত মেলা বসে এখানে। এলাকার চেহারাটাই তখন পালটে যায়।

যাই হোক, মহাদেবের দর্শনলাভের পর একটি দোকানে বসে বেশ করে কচুরি, জিলিপি ইত্যাদি খেয়ে চা খেল। দেখতে দেখতে বেলা অনেক হয়ে গেছে। বারোটার ওপর।

অলি বলল, "কখন যে রাত শেষ হল, কখন যে বেলা বাড়ল, কিছুই বুঝতে পারিনি আমরা।"

এক বাঙালি পরিবার ছেলেমেয়ে নিয়ে জিপ ভাড়া করে পাঁচমারির এই গুহামন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। বাবলু তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদেরকেই অনুরোধ করল ওদের পাঁচমারি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাঁরা রাজি হলেন। তবে বললেন, পাণ্ডব কেভের কাছে ওদের নামিয়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবেন ওঁরা। পাণ্ডব কেভ থেকে পাঁচমারি বাজার মাত্র তিন কিলোমিটার।

ওরা তাতেই রাজি হয়ে পাণ্ডব কেভের সামনে নামল।

বাবলু বলল, "চলো, আগে আমরা কেভগুলো ঘুরে দেখি। পরে সময় পাব কিনা জানি না। তা ছাড়া বলা যায় না, ওরাও যদি আমাদের খোঁজে বেরিয়ে থাকে তা হলে হঠাৎ করে দেখাও হয়ে যেতে পারে।" এই বলে যেই-না রাস্তা পার হতে যাবে অমনই একটা জিপ কোথায় যেন যেতে-যেতে হঠাৎ ওদের দেখতে পেয়ে ঘুরে এল ওদের দিকে। ইচ্ছেটা এই যে, জিপের চাকায় পিষে দেবে।

বাবলু অলির হাত ধরে হেঁচকা একটা টান দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা লাইট পোস্টের ধারে। জিপের লোকগুলো সবাই ওদের চেনা। মোট চারজন ওরা। দু'জন পঞ্চুর কামড় খাওয়া ধুঁয়াধারের, আর বাকি দু'জন সুন্দরপাহাড়িতে জয়দীপদাকে যারা ভয় দেখাচ্ছিল তারা।

ওরা জিপ থামিয়ে ওদের ধরবে বলে ছুটে আসছিল। হঠাৎ দু'জন ব্যক্তি স্কুটারে চেপে সেদিকে এসে পড়ায় পালাল তারা।

ব্যক্তি দু'জন বাবলুদের কাছে এসে বলল, "ও আদমি কৌন থা ?"

বাবলু বলল, "জানি না। আর-একটু হলেই আমাদের চাপা দিত।"

"অ্যায়সা তো নেহি হোনা চাহিয়ে হিঁয়া পর।"

ততক্ষণে আরও অনেক লোক ছুটে এসেছে ওদের দিকে। একজন বলল, "পহলে হিঁয়া পর অ্যায়সা নেহি হোতা। লেকিন আজকাল কুছ বাহারকা আদমি কি ওজোরসে অ্যায়সা হোতা।"

"লেকিন ও আদমি হ্যায় কৌন ?"

"কৌন জানে ? ওসব অপ্সরা বিহার মে য়াতা।"

বাবলুরা আর দাঁড়িয়ে না থেকে পাণ্ডব কেভে ঢুকল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ঘুরেফিরে সবকিছু দেখে যখন নেমে এল, বাবলুর মাথায় তখন অপ্সরা বিহার চেপেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, অপ্সরা বিহার কিধার ?"

"থোড়ি দূর হিঁয়াসে। শর্টকাটসে যাওগে তো দো মিল, নেহি তো পাঁচ মিল লাগ যায়ে গা।"

"ওখানে আছেটা কী ?"

"আরে বাবা। ফেমাস ফল্‌স। আউর আগাড়ি যাওগে তো বিগ ফল্‌স মিলেগা। রজত প্রপাত। কাঁহাকা আদমি তুম ?"

বাবলু ওদের পরিচয় দিয়ে অনেক সত্য গোপন করে লোকটাকে বলল এমন একজনকে জোগাড় করে দিতে, যে কিছু টাকার বিনিময়ে ওদের এই দুটো ফল্‌স দেখিয়ে আনতে পারে।

লোকটি বলল, "সকালের দিকে হলে ভাল হত। কিন্তু এখন গেলে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।" তবু সে স্থানীয় একটি দেহাতি ছেলেকে ধরে এনে বলল, "ইয়ে লেড়কা, তুম দোনোকা গাইড বনেগা। বিশ রুপিয়া দে দিজিয়ে। আউর জলদি যাইয়ে।"

ছেলেটি তো কুড়িটা টাকা পেয়ে দারুণ খুশি। ওর ভাষায় কত কী বলতে-বলতে চলল ওদের সঙ্গে। ওরা তার কিছুই বুঝল না।

যেতে-যেতে অলি বলল, "ওখানে গিয়ে তোমার কোন লাভটা হবে বাবলু ? কেন এতখানি রিস্ক নিলে ? তোমার সঙ্গে না আছে পিস্তল, না আছে পঞ্চু।"

"কেন, তুমি তো আছ ? কেউ আমাকে ধরতে এলে তাকে একটা ঘুসি লাগাতে পারবে না ?"

অলি হাসল। বলল, "কী যে বলো !"

ওরা সহজ পথে হালকা একটা জঙ্গল পার হয়ে অপ্সরা বিহারের গভীর বনপথ ধরল। হঠাৎই এক জায়গায় পিচ রাস্তার ওপর একটা ঝোপের ধারে আবিষ্কার করল সেই জিপটাকে, যেটা একটু আগেই ওদের চাপা দিতে যাচ্ছিল।

বাবলু বলল, "তা হলে ওরা অপ্সরা বিহারেই গেছে।"

"কিন্তু ওরা চারজন, আমরা দু'জন। আমার কিন্তু ভয় করছে।"

"আমার একটুও ভয় করছে না। আসলে আমি কেন যাচ্ছি জানো? মারামারি করতে নয়। গোপনে ওদের ডেরাটা দেখে আর পথ চিনে আসতে।"

বাবলু এবার ছেলেটাকে বুঝিয়ে বলল, কিছু দুষ্ট লোক অপ্সরা বিহারে গেছে। ও যেন দূর থেকেই বিহারটা দেখিয়ে দেয় ওদের।

ছেলেটি বলল, "মালুম হ্যায়। উধার ডাকু লোগ্ খারাবি কাম করনে যাতা।"

সে কী ভয়ঙ্কর জঙ্গল সেখানে! সেই জঙ্গলের গভীরতম অঞ্চলে প্রবেশ করতেই প্রপাতের শব্দ ওদের কানে এল। ছেলেটি ইশারায় ওদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ছুটে গিয়ে আশপাশ দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের।

বাবলু আর অলি নির্ভয়ে সেখানে যেতেই ছেলেটি বলল, "ইয়ে হ্যায় অপ্সরা বিহার।"

গভীর অরণ্যের মাঝখানে নয়নাভিরাম এক জলপ্রপাত। ওরা তাই দেখে আনন্দে কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। অবস্থান দেখে মনে হল এখানে টুরিস্ট আসে। এখন অফ সিজন। তাই যাত্রী নেই। একটি পাহাড়িয়া ঝরনা নেচে-নেচে নেমে এসে সৃষ্টি করেছে এই জলপ্রপাতের। ওরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেই দৃশ্য উপভোগ করল। কিন্তু কোথায় গেল সেই দুষ্কৃতীরা?

বাবলু ছেলেটিকে বলল, "রজত প্রপাত কিধার হ্যায়?"

"আউর আগাড়ি। লেকিন ও লোগ্ তো হ্যায় হুঁয়া 'পর।"

"ঠিক হ্যায়। আগে তো বাড়ো।"

অলি এবার শক্ত করে চেপে ধরল বাবলুর হাতটাকে। বলল, "গোঁয়ার্তুমি না করে চলে এসো বলছি। আমি কিন্তু আর-এক পা'ও এগোব না।"

বাবলু একটা সুঁচলো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "কথা না বলে চুপচাপ এসো।"

অগত্যা ভয়ে-ভয়েই চলল অলি।

প্রায় দু'-তিন ফার্লং পথ আসার পরই রজত প্রপাতের দেখা মিলল। একটা রেলিং ঘেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরের রজত প্রপাত নয়ন ভরে দেখতে লাগল ওরা। পাহাড়ের অনেক উচ্চস্থান থেকে অনেক, অনেক নীচে লম্বালম্বিভাবে অপ্সরা প্রপাতের ধারাটাই ঝরে পড়ছে সাড়ে তিনশো ফুট নীচে।

দুষ্কৃতীরা এখানেও নেই।

সেই দৃশ্য দেখতে-দেখতে মোহিত হয়ে বাবলু বলল, "কী সুন্দর! এই অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্যের কথা এ-জীবনে কখনও ভুলব না। ওদের যদি দেখা পাই তবে ওদের নিয়ে আবার আমি এখানে আসব।"

অলি বলল, "প্রাণে যদি বাঁচো তবে তো? না হলে তোমার গোয়েন্দাগিরির এইখানেই শেষ।"

বাবলু ছেলেটিকে বলল, "ওসব আদমি কাঁহা ছুপা গয়া? ভ্যানিশ হো গিয়া ক্যা?"

"নেহি, ও লোগ নীচে উতার গয়া। উধার ডাকু হ্যায়। মাত যাও উধার।"

বাবলু বলল, "আমি যাব।"

"আরে উধার দেখনে কো কুছ নেহি মিলেগা। স্রেফ গহেরা জলকুন্ড ঔর গুম্ফা হ্যায়। আর হ্যায় ওসব খতরনক আদমি। ও লোগ্ ইনসান নেহি। ডাকু হ্যায়, ডাকু।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ে গলার একটি করুণ কান্না, এবং সেইসঙ্গে কাউকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল ওরা। চকিতে বড় একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। সেই আড়াল থেকেই ওরা দেখল একজন লোক মারতে-মারতে নিয়ে আসছে একটি মেয়েকে। সেই মেয়েটি আর কেউ নয়, রাগিণী।

বাবলু আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। ওরা কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ পেছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। তারপর ঘাড় ধরে মাথাটা বড় একটা পাথরে ঠুকে দিতেই রাগিণীকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মাথা ধরে বসে পড়ল লোকটা।

বাবলু একটা গাছের ডাল ভেঙে তার ওপর ঘা-কতক দিয়েই বলল, "শয়তান, বল একে কোথায় পেলি?"

রাগিণী তখন উল্লাসে জড়িয়ে ধরেছে অলিকে। বলল, "তোমরা এখানে!"

"ভাগ্যক্রমে এসে পড়েছি। কিন্তু তুমি? তুমি এদের খপ্পরে পড়লে কী করে?"

"আমরা তো সবাই তোমাদের খোঁজেই এসেছিলাম এখানে। কিন্তু খাণ্ডি খো'র নালায় গহেরা খাদ দেখতে গিয়েই ওদের হাতে পড়ে যাই। শয়তানটা যে কোথায় ওত পেতে ছিল তা কে জানে?"

অত মার খেয়েও লোকটির বোধ হয় চেতনা হয়নি। তাই সে হঠাৎ একটা পাথর উঁচিয়ে যেই না মারতে যাবে বাবলুকে, অমনই কোথা থেকে যেন ভয়ঙ্কর একটা হাঁক ছেড়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। তারপর কুকুরে-মানুষে সে কী তুমুল লড়াই! লোকটি মারাত্মক জখম হয়ে ছটফট করতে লাগল।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই ছুটে এসেছে।

বাবলুর গাইড ছেলেটি তখন ব্যাপারস্যাপার দেখে হাওয়া।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! তোরা এখানে কোত্থেকে এলি?"

বিলু বলল, "আমরা এই শয়তানটাকে অনুসরণ করেই এখানে এসেছি। ভালই হল, এর আগে এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়নি বলে। তা হলে রাগিণীকে উদ্ধার করে আমরা ফিরেই যেতাম। তোদের সঙ্গে দেখা হত না।" বলেই বলল, "আচ্ছা বাবলু, তোরা কি খাণ্ডি খোর দিকে গিয়েছিলি?"

"খাণ্ডি খো? ও জায়গার নামই শুনিনি তো যাব কী? আমরা মহাদেও পর্বতমালার একটা গুহার ভেতরে ছিলাম।"

"এই নে, তোর পিস্তলটা। ওটা আমরা ওইখানে কুড়িয়ে পেয়েছি। কিন্তু তোর ওটা ওখানে গেল কী করে?"

বাবলু পিস্তলটা কপালে ঠেকিয়ে বলল, "ওরা হয়তো আমাদের এখানেই আনতে চেয়েছিল। কিন্তু কারও নজরে পড়ায় অথবা সন্ধে হয়ে যাওয়ায় আমাদের নিয়ে এদিক-সেদিক করতে যাওয়ার ফলেই পড়ে গিয়েছিল ওটা। যাক, আমার পয়মন্ত জিনিসটা যে ফিরে পেয়েছি এই ঢের।"

ভোম্বল বলল, "শুধু পিস্তল নয়, জয়দীপদাকেও উদ্ধার করেছি আমরা।"

সবিস্ময়ে বাবলু বলল, "বলিস কী রে!"

ভোম্বল বলল, "উঃ। সে কী কাণ্ড!"

বাবলু বলল, "পরে সব শুনব। এখন শয়তানের ঘাঁটিটা খুঁজে বের করি চল। দেখি যদি এদের গডফাদারের দেখা-সাক্ষাৎ পাই।" বলে সেই ক্ষতবিক্ষত লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "তোদের আর সব লোকরা কোথায়? বস কিধার? আলেকজান্দার মারিয়া? আজ ওকে 'মারিয়া' ওর রক্তপান 'করিয়া' তবেই আমরা যাব।"

লোকটি নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "খাণ্ডেলবালা উধার হ্যায়। খড় মে।"

বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "রাখ তোর খাণ্ডেলবালা। আলেকজান্দার মারিয়া কোথায়? সেই শয়তানটাকেই তো খুঁজছি আমি।"

লোকটি কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "ওহি তো হ্যায়।"

বিলু তখন সব বলল।

বাবলু বলল, "চল তো নীচে গিয়ে দেখি।"

নীচে নামবে কী, অর্ধপথেই বাধা। সেই চারজন লোক তখন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উঠে আসছে ওপরে। আর যায় কোথা ? পঞ্চুর রাগ তখন চরমে। ওরা কিছু করতে যাওয়ার আগেই বাঘের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। সেই টাল কি সামলানো যায় ? দু'জন ছিটকে পড়ল গভীর খাদে। বাকি দু'জন কয়েক ধাপ নীচে পাথরের চটানে। হাত-পা ভেঙে একশা কাণ্ড। বিলু আর ভোম্বল তখন ছুটে গিয়ে ওদের হাত থেকে কেড়ে নিল অস্ত্রগুলো।

ততক্ষণে গহেরা জলকুণ্ডের ধারে একটি গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে গভীর বনের ভয়ঙ্কর। বাবলু দেখল গুহার মুখে ছোট্ট একটা লোহার গ্রিল গেট। অর্থাৎ বাঘের মুখে জ্যান্ত মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে এর ভেতরে বসেই মজা দেখে বাছাধন। গ্রিল গেটটি ঝোপঝাড়ের আড়ালে এমনভাবে আটকানো আছে, যা সচরাচর কারও চোখেও পড়ে না।

আলেকজান্দার মারিয়ার হাতে স্টেনগান। বাবলুর হাতে পিস্তল। আলেকজান্দার একটু নিম্নভূমিতে, পাণ্ডব গোয়েন্দারা কয়েক ধাপ ওপরে।

বাবলু ওর দিকে পিস্তল তাগ করে বলল, "তারপর মিঃ আলেকজান্দার ওরফে মহাদেও খাণ্ডেলবালা ? আপনি তো খুব চমৎকার একটি জায়গা বেছে নিয়েছেন ব্রাদার ? অনেকদিন ধরে অনেক মানুষকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে এইখানে বসে মজা দেখেছেন। আজ কিন্তু সেই মজাটা আমরা দেখব।"

আলেকজান্দার পাহাড় কাঁপিয়ে হাসল। বলল, "আমি না আলেকজান্দার, না খান্ডেলবালা, না গোয়ানিজ, না বেঙ্গলি, না খ্রিস্টান, না হিন্দু। আই হ্যাভ নাথিং। বাট ইউ উইল ডাই।" বলেই স্টেনগানটা তুলে ধরল।

তারপর ? তারপর কী হল ?

তারপর হঠাৎই দেখা গেল পঞ্চু আর আলেকজান্দার রজত প্রপাতের গহেরা জলকুণ্ডে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে নেমে আসছে সামরিক বাহিনীর লোকেরা।

আলেকজান্দার গ্রেফতার হল। আর সেই গুহার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হল মারাত্মক কিছু অস্ত্রশস্ত্রসহ দু'জন মৃতপ্রায় লোককে।

সবই তো হল। কিন্তু পুলিশে খবর দিল কে ?

ওরা সবিস্ময়ে দেখল, কয়েক ধাপ ওপরে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওদের গাইড সেই ছেলেটি আর তারই কাঁধে হাত রেখে বীর সিং।

বিলু বলল, "এ কী ভাইসাব, তুমি ! তুমি এখানে এলে কী করে ?"

বীর সিং বলল, "সবই ওপরওয়ালার মর্জি বিল্লুভাই। যেতে গিয়েও আমার যাওয়া হল না। সাহাবের হঠাৎ কী একটা টেলিফোন আসতেই যাওয়া পোস্টপন্ড হয়ে গেল। তাই তোমাদের খোঁজে এদিক-সেদিক করতে-করতে এইখানে চলে এলাম।"

বিলু আর ভোম্বল উল্লসিত হয়ে বলল, "হুর্‌রে।"

পঞ্চু তখন জলে ভিজে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এসেছে।

বীর সিং বলল, "তোমরা আর দেরি কোরো না। এখনই চলে এসো। একটু পা চালিয়ে গেলে ধূপগড়ের সূর্যাস্তটা হয়তো আজই তোমরা দেখে নিতে পারবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আর তখন পায় কে ? ওরা অনেক কষ্ট করেও হাঁফাতে-হাঁফাতে ওপরে উঠে এল।

বিলু বলল, "ওই স্কুটারগুলোর তা হলে কী হবে ?"

"ও নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব হবে না। আমার বলা আছে। আগে তোমরা জিপে ওঠো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা জিপে উঠতেই বীর সিং ঝড়ের গতিতে ধূপগড়ের দিকে নিয়ে চলল জিপটাকে।

সূর্য তখন অস্তাচলে।

জিপ থেকে নেমেই ওরা কোনওদিকে না তাকিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সানসেট পয়েন্টের দিকে।

সে কী অপূর্ব দৃশ্য সেখানকার ! দূরের দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের বুকে, সরু ফিতের মতো দেনরা নদের জলের ওপর লালের আভা ফেলে, চারদিকের বনভূমি রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত গেল। অস্ত যাওয়ার পরেও ধূসর গোধূলি যেন আরও অপরূপ মনে হল ওদের চোখে।

আর কী ? এবার প্রত্যাবর্তন।

বীর সিং বলল, "চলো, যাওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "এক মিনিট। একটু কাজ এখনও বাকি আছে। আমাদের এবারের এই অভিযানে আমার পিস্তল থেকে একটিমাত্র গুলি খরচ করেছিলাম। এখন আর-একটা করি।" বলেই আকাশের দিকে পিস্তলটা উঁচিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল বাবলু। শব্দ হল 'ডিসুম'।

পঞ্চু আনন্দে একটা লাফ দিয়ে ওর স্বরে ডেকে উঠল একবার, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

কর্নেল থর্প রহস্য

শিবতোষ ঘোষ

বাবার চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেল সেলা। প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট সে চিঠি হাতে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

বড় অদ্ভুত মানুষ তার বাবা কর্নেল হার্দ। কোনওদিন একবার চোখের দেখাও দেখতে আসেননি মেয়েকে। মা মারা যাওয়ার পর তিন বছরের শিশুকে সেই যে কোলে করে নিয়ে গিয়ে গিথার চার্চে ফেলে দিয়ে এলেন, ব্যস! বাবার স্পর্শ বলতেও এইটুকুই তার মনে আছে।

আরও অবাক হয়ে যায় সেলা, তার বাবা তাকে কোনওদিন একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিঠিও লেখেননি। শুই মানি অর্ডার ফর্মে দু' লাইন, "ভাল থেকো, ভালভাবে পড়াশোনা কোরো। ভগবান তোমাকে রক্ষা করবেন।" একই কথা পনেরো বছর ধরে, প্রতি মাসে পড়তে-পড়তে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সেলা।

চিঠি লিখে যে বাবাকে অভিমান দেখাবে, রাগ প্রকাশ করবে, বলবে, "আমাকে অনেক দয়া করেছ, আর নয়, আমি এতদিন অক্ষম ছিলাম, তোমার টাকা ছাড়া হয়তো বাঁচতে পারতাম না, কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি, চাকরি করছি। তোমার মতো নিষ্ঠুর বাবার হাত থেকে আমি মুক্তি চাই।"

রাগে-দুঃখে মাঝে-মাঝেই চিঠি লিখে ফেলে সেলা, কিন্তু পাঠাতে পারে না, কারণ তার বাবা তাকে কোনও ঠিকানাই দেননি। এখন বাবার ওপরে সেলার এতটাই ক্ষোভ বা অভিমান যে, সে যেদিন থেকে চাকরির টাকা পাচ্ছে সেদিন থেকে বাবার টাকায় হাত দিচ্ছে না, কোনওদিন দেখা হলে ফেরত দেবে। আর যদি দেখা না হয়? সেলা তার বাবাকে একটুও বিশ্বাস করে না! তার বাবার পক্ষে সবই সম্ভব। বড় ভেঙে পড়ে সেলা। মনে-মনে প্রার্থনা করে অন্তত একবার যেন দেখা হয়! সে জানতে চায় তার বাবা কেন তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে গেলেন, কী তার অপরাধ!

যতভাবে সম্ভব সেলা তার বাবার খোঁজ করেছে। পুলিশেও জানিয়েছে। মানি অর্ডার ফর্মের ছাপ ধরে পুলিশ তল্লাশও করেছে কিন্তু কোনও ফল হয়নি। তাঁর নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানা আছে কি না পুলিশ সেটাই হদিস করতে পারল না। তিনি এ-মাসে যদি বুদাপেস্ট থেকে টাকা পাঠান পরের মাস চেকোস্লোভাকিয়া থেকে, দেখা যাবে পরের মাসে উনি ব্রাজিলের কোনও শহরে। তিনি এখন কী করেন, আর সত্যি-সত্যি তিনি কর্নেল হার্দ কি না.... ?

কোথাও-না-কোথাও থেকে তাকে যেন ঘাপটি মেরে লক্ষ করে যাচ্ছে। রাতে শুয়ে পড়েও সে উঠে-উঠে দরজা-জানলা টেনে-টেনে দেখে। সেলা তার বাবার নামের কর্নেল হার্দকে চরম ষড়যন্ত্রকারী, তার জীবন বিপন্নকারী হিসেবেই অতি দুঃখের সঙ্গে ভেবে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কারও বিশেষ কোনও অসুবিধে না থাকলে এ-শহরে কেউ থাকে না, এই এক-দেড় মাস শহরটা জনমানবশূন্য বিষণ্ণপুরী হয়ে ওঠে। কিন্তু সেলা বন্ধুবান্ধব সকলকে জানিয়ে দিল, সে এবার বেরোচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না, কী অসুবিধে, কাউকে খুলে বলতেও পারছে না। তারা যখন জিদ ধরে তখন চোখে জল এসে যায় সেলার। বন্ধুবান্ধবরা তাকে না জেনে দুঃখ দেওয়ার অপরাধে লজ্জিত হয়, ক্ষমা চায়।

এই অসহ্য কষ্টকর পরিস্থিতি সে যখন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তখনই বা সেরকম সময়েই চিঠিটা তার হাতে এল। না, এ-চিঠি তার বাবার চিঠি নয়, কর্নেল থর্পের চিঠি।

চিঠি পড়ে বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেলা পুলিশ সুপার মিস্টার মন্টিকে ফোন করে।

"কে, সেলা?"

"হ্যাঁ আঙ্কল।"

"আজ তোমাকে খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে, কী ব্যাপার?"

"আমি সত্যি নার্ভাস আঙ্কেল, তুমি বাড়িতেই থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি।"

পুলিশ সুপার সেলাকে খুবই স্নেহ করেন, অবশ্য ওর মতো মেয়েকে স্নেহ না করে উপায় নেই। মিস্টার মন্টি বলেন, "স্বয়ং ঈশ্বর তিনি নিজেই তোমাকে তাঁর সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বসে আছেন, তো আমরা কোন ছার!" বলেই মিস্টার মন্টি হাহা করে প্রাণখোলা হাসি হাসতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখেন সেলার চোখে জল। সেলা বলে, "আঙ্কল, শৈশবে মাকে হারিয়েছি, বাবাকেও কোনওদিন চোখে দেখিনি। মায়ের মতো বাবাও যদি মারা যেতেন তা হলেও বোধ হয় এত কষ্ট হত না, তুমি তবু বলবে ঈশ্বর আমাকে...।"

মন্টিআঙ্কল মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলেন, "আর আমরা যে তোমাকে সবাই এত ভালবাসি, চার্চের ছেলেমেয়েরা, মাদার আন্না, আমি, তোমার আন্টি... এগুলো বোধ হয় কিছুই

তিনি একসময় সৈন্যবিভাগে চাকরি করতেন। রুমানিয়া থেকে চলে গিয়ে হাঙ্গারির সৈন্যবিভাগে কীভাবে চাকরিটা পেয়ে যান। তিনি মাঝে-মধ্যে, বছরে একবার-দু'বার বর্ডার টপকে রুমানিয়ায় আসতেন, বাড়িতে আসতেন। সৈন্যবিভাগে কর্তব্যপরায়ণ সৈনিক হিসেবে একসময় তাঁর খুব সুনাম ছিল। তবে এ-সবই তার শোনা কথা এবং তা পনেরো-বিশ বছর আগের ঘটনা।

এই প্রথম সেলা তার বাবার লেখা পূর্ণাঙ্গ চিঠি পেল। এবং আরও অবাক হয়ে গেল তার বাবার ঠিকানা দেখে। যখন সে ধরে নিয়েছিল এ-লোক তার বাবা নন, বাবা এরকম হতে পারেন না! পুলিশও সাবধান করে দিয়েছে যে, একজন ভণ্ড লোক তার পিছু নিয়েছে। কিন্তু 'মোটিভ' কী? সবসময় তো আগে থেকে মোটিভ জানা যায় না!

সেলাও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, এ-লোকটি তার বাবা নন, একজন ভণ্ড লোক। তার দায় কেবল পোস্টম্যানের কাছ থেকে সই করে টাকা নিয়ে আবার সেটা পোস্ট অফিসে জমা করে দেওয়া, তার বাবা তার কাছে মাস-পয়লা ওইটুকু কাজের মধ্যে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিলেন।

সেলা গিথার চার্চের প্রাইমারি স্কুলেই ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ায়, ভালই লাগে, সময় কেটে যায় ওদের নিয়ে। সে পড়াশোনায় ভালই ছিল, আরও ভাল এবং বেশি বেতনের চাকরিও পেতে পারত। কিন্তু ওই ভণ্ড লোকটার জন্য.... এমনিতে সে খুবই সাহসী মেয়ে, ঘোড়ায় চড়তে পারে, বন্দুক-পিস্তল চালাতে পারে, তবু... ইদানীং হঠাৎ করে যেন বেশি ভয় বেড়ে গেছে সেলার। তার সবসময় মনে হয় ওই ভণ্ড লোকটা

নয়! মা-বাবার ভালবাসা তো সব ছেলেমেয়েই পায় কিন্তু যে অন্যের ভালবাসা পায় সে-ই ধন্য, ওটাই ঈশ্বরের ভালবাসা। ঈশ্বর তো আর নিজের হাতে করে কিছু দেন না, অন্যের মারফত পাঠান। নাও, চোখ মুছে এবার একটু হাসো তো!"

সেলা চিঠিটা দাঁতে চেপে মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পুলিশ সুপার মন্টিআঙ্কলের বাড়ির উদ্দেশে।

চিঠিটা ছিল এরকম—

"আমি তোমাকে আমার সহস্র আদর জানিয়ে চিঠি লেখা শুরু করছি। কামনা করি তোমার সহস্র বর্ষ পরমায়ু।

আমি জানি আমার চিঠি পেয়ে তোমার বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। আমিও বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, পনেরো বছর ধরে যে চিঠি তোমাকে লিখতে পারিনি আজ তা লিখে ফেলতে পারলাম। অবশ্য না লিখে আর আমার উপায়ও ছিল না।

প্রথমেই বলে নিই যে, আমি তোমার বাবা কর্নেল হার্দ নই, আমার নাম কর্নেল থর্প, আমি তোমার বাবার সৈনিকজীবনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুমাত্র। তুমি অনেক বুদ্ধিমতী, তাই আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছ যে, আমি লোকটা একটা ভণ্ড। সত্যিই তো, বাবা না হয়েই পনেরো বছর মানি অর্ডার ফর্মে প্রতি মাসে 'বাবা' লিখে গেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি ভণ্ড নই, আমার বড় লোভ ছিল যে, আমি যেন সারাজীবন তোমার বাবা সেজেই বেঁচে থাকি, আর কিছু চাই না।

তুমি প্রশ্ন করবে, তা হলে এতদিন আপনি আসেননি কেন, কেন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়িয়েছেন, একটা চিঠিও কোনওদিন লেখেননি, কেন? কারণ আমিই তোমার বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছিলাম, তোমার পিতৃহন্তা হয়ে কিছুতেই পারলাম না তোমার সামনে দাঁড়াতে। হ্যাঁ, অপরাধ করেছিল হার্দ, সৈনিক হয়ে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আমাদের সঙ্গে। আমাকেও দলে টানতে চেয়েছিল, আমি গেলাম না, ব্যস, শুরু হয়ে গেল দুই পরম বন্ধুর মধ্যে চরম শত্রুতা। একদিন হার্দ আমাকে বলেই ফেলল যে, আট নম্বর ছাউনিতে একজন কর্নেল থাকবে, হয় হার্দ, নয় থর্প।

হার্দ এসেছে রুমানিয়া থেকে, আমি এসেছি অস্ট্রিয়া থেকে, ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে হাঙ্গারিতে এসে চাকরি পাই। অনেকটা ভাড়াটে সৈনিকের চাকরি। তা হলেও আমরা সৈনিক তো! এতদিন আমরা যে কর্মদক্ষতা দেখিয়েছি, তার ফলে আমাদের পদোন্নতি হয়েছে, আমরা বিশ্বাস অর্জন করেছি, এ-সবই মিথ্যে? সৈনিকও যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তা হলে মানুষ বিশ্বাস করবে কাকে? আমি হার্দকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি, কিন্তু কোনও লাভ হল না।

এর পর থেকে আমি সাবধানে থাকতাম তবু একদিন রাত্রিবেলা অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করল হার্দ। আমি শেষ সময় অনন্যোপায় হয়েই গুলি চালাই।

আমি জানতাম,ওর একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে আছে, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মেয়েকে চার্চে রেখে এসেছে, এই মেয়ের জন্য ওর বেঁচে থাকা খুবই দরকার। আর আমার তো কেউ নেই, আমি যদি হার্দের গুলিতে মারাও যেতাম, কোনও ক্ষতি ছিল না। তবু ঘটনা হল, আমি মারা না গিয়ে... হার্দের লুটনো দেহ বুকে করে অনেকক্ষণ কাঁদলাম।

কিন্তু ধরা দিতে পারলাম না। হার্দের দেহ টেনে সরাতে গিয়ে তার বুক পকেট থেকে বেরিয়ে পড়ে গিয়েছিল একটি ছবি, তার মেয়ের ছবি, হার্দ সবসময় বুকে করে রাখত এই ছবিটা। আমি ছবি হাতে নিয়ে আরও অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমার মনে হল, হার্দ চলে গেল, এখন আমিও যদি... ধরা দেওয়া মানে অবধারিত ফাঁসি, তখন এই মেয়েটির কী হবে! এই ছোট্ট হাসিখুশি ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো মেয়েটির জন্য সেদিন ছাউনি থেকে পালালাম, সেই সেদিন থেকে আমি পালিয়ে-পালিয়ে বাঁচতে লাগলাম। সেই থেকে কর্নেল থর্প হয়ে গেল কর্নেল হার্দ, আর এই ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো মেয়েটি হয়ে গেল তারই মেয়ে।

তারপর আমার পালানোর ইতিবৃত্ত তো তুমি জানোই। মানি অর্ডার ফর্ম দেখেই বুঝতে পেরেছ কোনও মাসে টাকা পাঠাচ্ছি লিসবন থেকে তো কোনও মাসে লিসা থেকে।

কিন্তু তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে, জীবনের মহামূল্যবান এত বছর আমি অযথা পালিয়ে-পালিয়ে বেড়িয়েছি, আর তোমাকেও এত কষ্ট করে বড় হতে হল! পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছিল ঠিকই, তবে ফাঁসি দেওয়ার জন্য নয়। সরকার আমার নামে বিশাল অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, আমাকে খোঁজা হয়েছিল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার জন্য। আসলে হার্দ মারা যায়নি, ভাল রকমের জখম হয়েছিল মাত্র। তার কাছ থেকে সে-সময় যেসব কাগজপত্র, চিঠি ইত্যাদি উদ্ধার করা হয় সেই থেকে প্রমাণ হয়েছিল যে, কর্নেল হার্দ একজন বিশ্বাসঘাতক এবং কর্নেল থর্প একজন সাচ্চা সৈনিক। একজন চেয়েছিল দেশকে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দিতে, একজন চেয়েছিল রক্ষা করতে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্নেল থর্পকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করার নির্দেশ দিল এবং হার্দের শাস্তি হল আজীবনের জন্য দ্বীপান্তর।

আমি যখন এ-খবর জানলাম তখন আমার জীবন থেকে একটা যুগ চলে গেছে। পালাতে-পালাতে আমি হয়ে পড়েছি ক্লান্ত, রুগ্ণ, অসুখে-অসুখে জরাজীর্ণ। হঠাৎ এক জাহাজ-ঘাটিতে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, চেনার কথা নয়, তবু সে কীভাবে চিনে ফেলে।

বরফ পড়ছে। প্রচণ্ড বেগে ঝোড়ো বাতাস বইছে, আর গায়ে কাঁটা বেঁধার মতো বৃষ্টি। এজন্যই জাহাজ বাতিল হয়ে যায়, প্যাসেঞ্জার সব ফিরে আসছিল। আমি রাস্তার ধারে একচিলতে টিনের শেডের তলায় ছেঁড়া কোট চাপা নিয়ে শুয়ে আছি। আমি তখন এমনই অসুস্থ যে, আমার কোথাও নড়ারও ক্ষমতা নেই। অথচ আমি জানতাম মাস শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই, মেয়েকে টাকা পাঠাতে হবে। টাকা পাঠাতে না পারলে মেয়ে জেনে যাবে, তার বাবা আর বেঁচে নেই। আমার জীবনের ধ্যানজ্ঞানই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাসের শেষে যে-কোনও উপায়ে আমার জ্যোৎস্নাময়ী কন্যাকে কিছু টাকা পাঠানো। তা সে যত কষ্টই হোক এই টাকাটা আমি উপার্জন করতাম। নিজেকে ও জ্যোৎস্নাময়ীর বাবাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এই অসুস্থ শরীর নিয়ে এরকম ঝড়বৃষ্টিতেও উপার্জন করার চেষ্টা করছিলাম, অনন্যোপায় হয়ে সেদিন ভিক্ষে করছিলাম। ভিক্ষে দিতে এসেই আমার সৈনিক বন্ধু আমাকে চিনে ফেলে।

তুমি ভাবছ এর পরের ঘটনা খুবই সহজ-সরল। আমি দেশের সর্বাধিনায়কের কাছে গেলাম এবং রাতারাতি একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক হয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, এতদূর পর্যন্ত মোটামুটি ঠিক ছিল। কিন্তু এর পর আমার যন্ত্রণা

বাড়ল। আমার এত বড় বাড়ি, এত সুখ-সমৃদ্ধি, অথচ আমার মেয়ে কত না কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছে! যখন নিঃস্ব ছিলাম তখন এক, আজ আমি বিত্তবান, এই বিত্ত যদি আমার একমাত্র কন্যাকে সুখ দিতে না পারে তা হলে এসবের মূল্য কী! আমি মেয়ের জন্য ছটফট করতে লাগলাম। মাঝে-মাঝে মনে হত, যাই, মেয়েকে নিয়ে আসি, মাঝে-মাঝে মনে হত, চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিই, কিন্তু ভয়ে আমার হাত-পা বাঁধা হয়ে যেত। তুমি যখনই জেনে যাবে আমি কর্নেল হার্দ নই, তখনই জেনে যাবে আমি বাবাও নই। এর চেয়ে বরং মৃত্যু আমার কাছে অনেক শ্রেয় মনে হত।

এই ক'বছরের মধ্যে আরও ঘটনা ঘটল। আমার শরীর ভেঙে পড়েছে, আমি এখন প্রকৃত অর্থেই মৃত্যুপথযাত্রী। ডাক্তার বলেই দিয়েছেন মেয়েকে যদি দেখতে চান তবে এখনই তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। ডাক্তারকে আমি মিথ্যে বলেছিলাম আমার এক মেয়ে আছে।

না, আমার মিথ্যাভাষণ নয়, আমি আমার চরম বিশ্বাসের কথা বলেছিলাম ডাক্তারকে।

সম্প্রতি এখানে আরও এক মারাত্মক ঘটনা ঘটল, দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটল, তারই ফলস্বরূপ যেখানে যত বন্দি ছিল সকলকে মুক্তি দেওয়া হল। এই নির্দেশে কর্নেল হার্দও একদিন মুক্তি পেয়ে গেল।

মাত্র কয়েকদিন আগে হার্দের একটা চিঠি এসেছে। আমার নতুন বাসভবনের ঠিকানা কীভাবে সংগ্রহ করেছে, লিখেছে, 'আমি ছাড়া পেয়েছি থর্প, অচিরেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।' আমি জানি হার্দ আমার ওপর প্রতিশোধ নিতেই আসছে, ওর এই এত বছরের দ্বীপান্তরবাস, সে তো আমার জন্যই, সুতরাং...

যাক গে, ওটা হার্দের কাজ, ও কী জন্য আসছে সেটা ওর ব্যাপার। এখন আমি আমার জীবন নিয়ে ভাবি না, আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। হার্দ আসছে ভালই তো, বাবা মেয়েকে ফিরে পাবে, মেয়ে বাবাকে ফিরে পাবে, আর আমি এতদিন অনধিকারভাবে যে বাবা সেজে থেকেছি সেজন্য বাবা-মেয়ে দু'জনের কাছেই ক্ষমা চেয়ে নেব। তুমি আর-কিছুর জন্য না আসো, এই ব্যর্থ পিতাকে ক্ষমা করার জন্য একটিবার এসো!

তোমাকে নিয়ে আসার জন্য স্টেশনে আমার লোকজন অপেক্ষা করবে। আমি সুস্থ থাকলে নিজেই উপস্থিত থাকতাম। আবার সহস্র আদর জানাই, তোমার সহস্র বর্ষ আয়ু কামনা করি।

—ইতি কর্নেল থর্প"

চিঠিটা আদ্যোপান্ত দু'বার পড়লেন পুলিশ সুপার। তিনি বললেন, "তুমি অবশ্যই যাবে। ওখানকার একজন পুলিশ অফিসার আমার পূর্বপরিচিত, আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখছি। ওর নাম উইলিয়াম জোন্স, তোমার যখন যা দরকার হবে জোন্সের সাহায্য পাবে।

মিস্টার মন্টি সেলা-র মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, "আরে তুমি তো সাহসী মেয়ে, ঘোড়ায় চড়তে পারো, পিস্তল চালাতে পারো, তোমার ভয় কী?"

"আচ্ছা আঙ্কল, কর্নেল থর্প সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? উনি কি ভণ্ড, না...?"

"পুলিশের একটা কী দোষ জানো মা, তারা ভালমানুষকেও অনেক সময় ভণ্ড মনে করে। তবে কর্নেল থর্প ভাল হোন বা ভণ্ড হোন, তুমি কিন্তু সবসময় সাবধান থাকবে, সাবধানের মার নেই।"

॥ ২ ॥

সেলা ট্রেন থেকে স্টেশনে নামার সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন লোকের একটা দল ফুল-মালা, আরও নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে ঘিরে ধরল তাকে। লম্বা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে এগিয়ে আসছিল সেলা, একজন কাছে এসে জিজ্ঞেস করে "ম্যাডাম, আপনি কি গিথার চার্চ থেকে আসছেন?"

"আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি কোনও চার্চ থেকে আসছি?"

সেলার পরনে আমেরিকান জিন্‌স, ব্রাজিলিয়ান শার্ট।

তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল সেলা, কিন্তু এখানেও সেই ফুলের মালা, ফুলের স্তবক হাতে...

"কী চান আপনারা?"

সেলা রেগে গেল।

একজন বয়স্ক মানুষ এগিয়ে এলেন। বললেন, "মা, আপনি কি মহামান্য কর্নেল থর্পের মেয়ে? উনি আমাদের মালিক, তিনি পাঠিয়েছেন মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁর বর্ণনা অনুসারে আমাদের মনে হচ্ছে আপনিই....।"

"কী বর্ণনা দিয়েছেন উনি?"

"উনি বলেছেন আমার মেয়ে হল জ্যোৎস্নাময়ী, জ্যোৎস্নার রং, রূপ, আভা যার মধ্যে দেখতে পাবে নিশ্চিত জানবে সে-ই হল আমার মেয়ে।"

"হ্যাঁ ম্যাডাম, জ্যোৎস্না খুঁজে-খুঁজে আমরা হয়রান হয়ে গেছি, তাই আপনাকে বিরক্ত করছি।"

হেসে ফেলে সেলা। সঙ্গে-সঙ্গে সকলে হইহই করে ওঠে তাকে আপ্যায়ন করার জন্য।

সেলা জিজ্ঞেস করে, "উনি ভাল আছেন?"

বৃদ্ধ বললেন, "হ্যাঁ, অন্যান্যদিনের চেয়ে আজ উনি বেশি ভাল আছেন।"

গাড়িতে যেতে-যেতে নানা ধরনের প্রশ্ন করল সেলা, সে কর্নেল থর্পের রহস্য বুঝতে চাইছে। "এরকম কি হয়, বন্ধুর মেয়ের জন্য নিজের সারাজীবন এমন করে... !"

সে জানতে চাইল, "ওঁর অসুখটা কী, মানে কী হয়েছে ওঁর?"

সে আরও জানতে চাইল, "তোমরা ছাড়া বাড়িতে আর কে-কে থাকে? আচ্ছা, দিনকয়েকের মধ্যে কি কেউ বাইরে থেকে এসেছিলেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে?"

কিন্তু এরা কেউ বিশেষ কিছু বলতে পারল না। এরা কেউ কলে কাজ করে, কেউ খামারে, কেউ ডেয়ারি চালায়, হাসপাতালের একজন নার্সও সঙ্গে আছেন, রাস্তায় যদি মেয়ের শরীর খারাপ হয়! এরাই বলল, "কী করেননি উনি, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল-কারখানা-বিশাল দুগ্ধকেন্দ্র... এমনকী, দেশরক্ষার জন্য সৎ, দেশপ্রাণ সৈনিক তৈরির উদ্দেশ্যে আর্মি স্কুল করেছেন।"

সেলা হঠাৎ প্রশ্ন করে, "উনি যদি এতই অসুস্থ তা হলে এই এত সব চালান কী করে?"

উত্তরে একজন লোক তাকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখল। একটু ভয় পেয়ে গেল সেলা। ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে পকেটে পুরে নিল।

কিন্তু রাস্তার দু'ধারের প্রকৃতি এতই সুন্দর যে, জীবনসংশয়ের সন্দেহও তার কাছে ফিকে হয়ে এল। পাহাড়-ঝরনা, পাহাড়ি পাখি, কোথাও-কোথাও নদীর কলতান... সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এইসব দেখতে ও শুনতে লাগল। তাদের একেবারে গেটের সামনে পর্যন্ত পাহাড়-ঝরনা-নদী। বাস করার জন্য যিনি এরকম একটা জায়গা নির্বাচন করতে পারেন, তিনি বাবা না হলেও তাঁকে বাবা বলতে ইচ্ছে করল, সেলা

ঠিক করল সে কর্নেল থর্পকে বাবাই ডাকবে।

সেলা ভেবেছিল কর্নেল যখন, তখন নিশ্চয়ই বিশাল দশাসই চেহারা, বিশাল জোড়া গোঁফ... কিন্তু সে যখন দেখল এসব কিছুই খুঁজে পেল না, সাধারণ আর-পাঁচটা বাবার মতোই কর্নেল থর্প। বিছানায় বই, মাথার পাশে বইয়ের আলমারি, আর মাথার একেবারে কাছে বিরাট করে বাঁধানো একটি বাচ্চা মেয়ের ফোটো। সেলা-র বুঝতে কষ্ট হল না এই ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েটিকে। ছবি দেখে তারও জ্যোৎস্নাময়ী বলে ভ্রম হল।

কর্নেল থর্প শুয়ে আছেন, সেলা খুব আস্তে পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকল। কাছে এসেই ডাকল, "বাবা !"

যাঁর বিছানায় বই... বই আর পিস্তল, মানুষ একই সঙ্গে নিয়ে শুতে পারে ! সেলা মন্টিআঙ্কলের কথামতো তবু সাবধান হল, পকেটে পিস্তলের গায়ে একবার হাত দিল। তবে কর্নেল থর্পকে দেখে মনে করতে পারল না যে একজন খুনি শুয়ে আছে।

মেয়েকে দেখে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন কর্নেল, কিন্তু সেলা তাড়াতাড়ি করে ধরে ফেলে, "না, একদম ওঠা চলবে না !" সঙ্গে-সঙ্গে চোখে জল এসে যায় তাঁর, সেলা মুছে দেয়। কিন্তু হাতে চোখের জল নিয়েও সে ভাবে, এ বাবার চোখের জল, না ভণ্ড লোকের অভিনয় ?

ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই কর্নেল থর্প বাচ্চা শিশুর মতো ন্যাওটা হয়ে পড়লেন সেলার, সে না খাওয়ালে খাবেন না, না ঘুম পাড়ালে ঘুমোবেন না। কিন্তু মুশকিলে পড়ল সেলা, তাকে মন্টিআঙ্কল বলে দিয়েছিলেন যে-যে বিষয়ের ওপর নজর রাখতে, মাঝে-মাঝে সে সবই ভুলে যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে সন্দেহ করতেই ভুলে যাচ্ছে।

দু-চারদিনের মধ্যেই কর্নেল থর্পের প্রকৃত কন্যা হয়ে গেল সেলা, সে যে কর্নেল হার্দের মেয়ে, এটাও যেন ভুলে বসলেন থর্প। যে মানুষ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না, তিনি আটদিনের মধ্যেই বাগানে বেড়াতে লাগলেন মেয়ের হাত ধরে।

সেলা একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেই বসল, "কর্নেল হার্দ আসছেন কবে ?"

কর্নেল থর্প বললেন, "কর্নেল হার্দ নন, উনি তোমার বাবা !"

সেলা বলল, "আমি হার্দ বুঝি না, থর্প বুঝি না, দু'জনের মধ্যে যাঁর বাবা হওয়া উচিত আমি তাঁর দিকে।"

সে আবার জিজ্ঞেস করে, "কই আপনি তো বললেন না, কর্নেল হার্দ কবে আসছেন ? ওঁকে আর হয়তো আপনার দরকার নেই, কিন্তু আমার আছে !"

"আজই হার্দের আসার কথা।"

"আজ !"

"হ্যাঁ। তবে কখন আসবে সময়টা জানায়নি।"

"সেজন্য আজ আপনাকে এত বিষণ্ণ লাগছে ?"

"বিষণ্ণতা নয়, ভয়। মেয়েকে হারানোর ভয়। তবে আমি ঠিক করেছি হার্দ এলে ওর হাতে-পায়ে ধরে বলব, আর ক'দিনই বা বাঁচব, যে-ক'টা দিন আছি মেয়েকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো না !"

"আপনি এইসব ভেবে শরীর খারাপ করছেন ! আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না, হল তো ! আসুন !"

বাগানে টেনে নিয়ে গেল সেলা।

বেড়াতে-বেড়াতে কর্নেল একটা ফুল দেখালেন সেলাকে।

"ফুলটার নাম কী জানো, জ্যোৎস্নাময়ী। জ্যোৎস্নার মতো রং বলে আমিই নাম দিয়েছি, আমার মেয়ের নামে নাম।"

একটা ঝোপের ভেতরে ফুটে ছিল ফুলটা। কর্নেল ঝোপের কাছে গিয়ে ফুলের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল, "হার্দ ! তুমি !"

ঝোপের আড়াল থেকে তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন কর্নেল হার্দ, হাতে পিস্তল।

"হার্দ শোনো, আমাকে মেরো না !"

কাকুতিমিনতি করছেন কর্নেল থর্প।

"তোমার জন্য আমি বারো বছর দ্বীপান্তর খেটেছি থর্প !"

"তুমি অপরাধ করেছিলে, তার জন্য তোমার শাস্তি হয়েছে, এতে আমার কোনও হাত ছিল না ! বিশ্বাস করো !"

"তোমার জন্যই আমার এই হাল হয়েছে, নইলে আজ তুমি যে জায়গায়, আমারও সেই জায়গায় থাকার কথা। যে-দেশের জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি তা তোমারও দেশ নয়, আমারও দেশ নয়, তুমি আমাকে সরানোর জন্যই সেদিন দেশপ্রেমিক সেজেছিলে।"

"না, আমিও বারো বছর পলাতক ছিলাম, আমিও তোমার মতোই ভীষণ কষ্টে ছিলাম হার্দ।"

"শুধু এই নয়, আমি গিথার চার্চে গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমিই কর্নেল হার্দ বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছ, এখানে তাকে নিজের মেয়ে বলে চালাচ্ছ, আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়েছ আমার কাছ থেকে !"

"না, হার্দ শোনো, মেয়েকে জিজ্ঞেস করো, এ তোমার মিথ্যে ধারণা !"

কিন্তু কর্নেল হার্দ আর কিছু শুনলেন না, তাঁর পিস্তল গর্জে উঠল কর্নেল থর্পের বুক লক্ষ্য করে।

চকিতে এরকম ঘটনা ঘটে যাবে, সেলা বুঝতেই পারেনি। আহত থর্প পড়ে যাচ্ছিলেন, সেলা দৌড়ে এসে ধরে ফেলে।

কর্নেল হার্দ বেরিয়ে এলেন ঝোপের আড়াল থেকে। মেয়েকে ডাকলেন, সেলা কাঁদছিল।

হার্দ বললেন, "তুমি কাঁদছ কেন, ও যুদ্ধক্ষেত্রে একসময় আমার বন্ধু ছিল, ব্যস ! আমিই কর্নেল হার্দ, আমিই তোমার বাবা। শোনো, লোক-জানাজানির আগে টাকাপয়সা, সোনাদানা যা আছে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই !"

সেলা শেষবারের মতো একবার দেখে নিল কর্নেল হার্দের মুখটা, তারপর চকিতে পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি চালাল তার বুক লক্ষ্য করে। হার্দের দাঁড়ানো শরীর দেখতে-দেখতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

সেলা লোকজন ডাকল, ডাক্তার ডাকল, পুলিশেও খবর দিল। তখন থর্প এবং হার্দ দু'জনেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

পুলিশ দু'জনকেই জিজ্ঞেস করলেন, দু'জনেই অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দেন। কর্নেল হার্দ স্বীকার করলেন, "আমি ঈর্ষাবশত কর্নেল থর্পকে গুলি করেছি। এই শাস্তিই আমার যোগ্য শাস্তি। আমার কোনও অভিযোগ নেই, কোনও দুঃখ নেই।"

কর্নেল থর্পকে জিজ্ঞেস করতে তিনিও ক্ষীণকণ্ঠে একই রকম কথা বললেন পুলিশকে, "আমি ঈর্ষাবশত কর্নেল হার্দকে গুলি করেছি। জ্যোৎস্নাময়ী আমার মেয়ে নয়, হার্দের মেয়ে, ও এসেছিল মেয়েকে নিয়ে যেতে, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয় এবং এ হল তারই পরিণতি।

ডাক্তারের পরামর্শেই সেলাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সে প্রচণ্ড কাঁদছিল। কাঁদতে-কাঁদতে অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে কার জন্য এত কাঁদছিল, কর্নেল হার্দের জন্য, না কর্নেল থর্পের জন্য ? কেউ সঠিক বুঝতে পারছিল না।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

গেল গেল

শিবায়ন ঘোষ

‘গেল গেল’ বলছে লোকে, যাচ্ছে নাকি ? যাক গে
যাবার কথাই লেখা আছে কলিকালের ভাগ্যে ।

কিন্তু দাদা যাচ্ছে কোথায় ? মাছ রয়েছে জলে,
ছেলেরা সব ধাঁই-ধপাধপ মারছে লাথি বলে ।
বুড়োরা সব সকাল-বিকেল খাচ্ছে হাওয়া, শস্তা
আম-আমড়া যাচ্ছে পাওয়া, খাওগে দু-চার বস্তা
আসছে গাড়ি গড়গড়িয়ে, ভাসছে জাহাজ নৌকো,
তীর সেরকম তেরছা আছে, খাট সেরকম চৌকো ।

তার মানে ভাই যায়নি কিছুই ; দেখছি তো ঝাউগাছে
ফিঙেরা সব ফুর্তি পেয়ে ফড়িং হয়েই নাচে
চড়াই ডাকে কড়িং-কড়িং, বিড়াল ডাকে মিঁউ
আমিও আছি ‘আই’ হয়ে আর তুমিও আছ ‘ইউ’,
সকাল আছে সাড়ে-ছ’টায়, সন্ধে সাতটা পাঁচে
সেই অবিকল ফুল ধরেছে ঝিঙে-পটল গাছে...

যা ছিল তাই আছে,
যা ছিল তা-ই আছে ।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

জিরাফ যেখানে বন্ধু
বিনায়ক মিশ্র
কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি
শহরের প্রান্তে অরণ্যের প্রবেশপথে
তৈরি হয়েছে 'জিরাফ
সেন্টার'। সেখানে জিরাফ
মিতালি পাতায় মানুষের সঙ্গে।
আফ্রিকার অরণ্যের এই মনোহরণ
দৃশ্য মানুষকে প্রকৃত অর্থের করে
তোলে প্রকৃতিপ্রেমী।
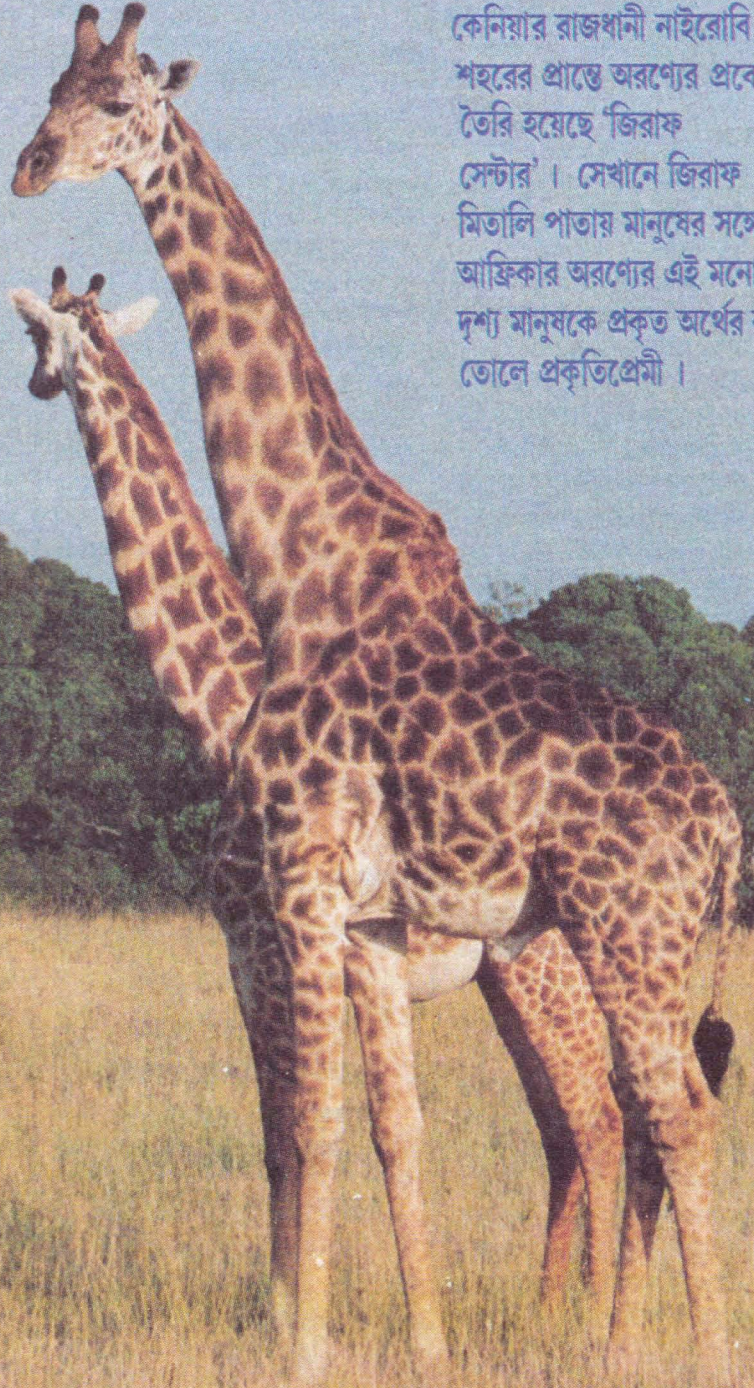
জঙ্গলের গায়ে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি বাড়ি। রূপকথার ছবি থেকে কেটে নিয়ে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে এখানে, এই সবুজের আলোছায়ায়। অপূর্ব সুন্দর। সন্ধে হতে তখনও কিছু বাকি। মধ্যদিনের সূর্য ক্রমশ নরম হতে-হতে এখন দিনশেষের সুয্যি, লটকে আছে বাওবাব গাছের ডালে, টুকটুকে লাল ফলের মতো। জঙ্গল চুঁইয়ে মরা রোদের হামাগুড়ি। এখানে-ওখানে। তার থেকে একফালি ঠিকরে লেগেছে বাড়িটার টোপরে। আর তাতেই তৈরি হয়েছে এক মোহময় পরিবেশ। দেখলে মনে হয়, কোনও এক জাদুকরের মায়া-তুলির স্পর্শ লেগেছে বাড়িটার সর্বাঙ্গে। গাছের ডালে লেগেছে শীতের কাঁপন। জঙ্গল ভেদ করে ধেয়ে আসছে কনকনে হিমেল হাওয়া। সামনে লম্বা সিঁড়ি। বেশ কয়েক ধাপ উঠলে খোলামেলা প্রশস্ত বারান্দা। ভূমিতল থেকে অনেকখানি উঁচু এই বারান্দা বলয়ের মতো ঘিরে আছে গোল বাড়িটাকে। মাথার ওপর মস্ত ছাদ। তালপাতার টোকার মতো। টুকরো-টুকরো কাঠ সাজিয়ে তৈরি গোটা বাড়িটা। আরণ্যক পরিবেশের সঙ্গে বড় মানানসই। এখানে দাঁড়ালে দৃষ্টি প্রসারিত হয় অরণ্যের গভীরে। সামনে আদিগন্তবিস্তৃত বনভূমি। একটু-একটু করে অরণ্য উন্মোচিত হচ্ছে চোখের সামনে। মন দিয়ে বুঝে নিচ্ছি অরণ্যের ভাষা। হৃদয় ক্রমশ ডুব দিচ্ছে তার গহন অন্তরে। এই মুহূর্তে নিজেকে আর বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে না সমগ্র বনভূমি থেকে। বন্যপ্রাণীরাও বুঝি এই অরণ্যগৃহটিকে মেনে নিয়েছে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে। ওই তো একটু দূরে সার-সার অ্যাকাসিয়া গাছের আড়ালে ওরা কারা ? মগডাল ছুঁই-ছুঁই লম্বা গলা ! দেহ জুড়ে বরফি কাটা নকশার বাহারি পোশাক। গাঢ় বাদামি রং। কিছুটা শুকনো পাতার মতো। অরণ্যের আবরণ সরিয়ে এগিয়ে আসছে ধীর গতিতে। ঠাস বুনোন লম্বা ঘাসের ঢেউয়ে ডুবে আছে দেহের বেশ কিছুটা অংশ। শুধু জেগে আছে লম্বা গলা। ঠিক যেন ঘাসের সমুদ্রে 'জীবন্ত পেরিস্কোপ'। একটা...দুটো...ওই আরও দুটো—চার-চারটি জিরাফ।

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি। এই শহরের গগনচুম্বী বাড়িগুলিকে পেছনে ফেলে নাইরোবি, লাংগাটা রোড ধরে কিছুটা এগোলে আফ্রিকার আদিম অরণ্য হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই আহ্বান উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। তাই আপাতত পথের নিশানা গোগো ফল্‌স রোড। এখানেই তৈরি হয়েছে 'জিরাফ সেন্টার'। এটি আসলে পৃথিবীবিখ্যাত ডেইজির বাসভূমি। রথসচাইল্ড জিরাফকুলে ডেইজি এক বিশেষ নাম। কারণ দুনিয়া-কাঁপানো দুটি চলচ্চিত্র একে দিয়েছে জগৎ-জোড়া পরিচিতি। 'রেইজিং ডেইজি রথসচাইল্ড' এবং 'দ্য লাস্ট জিরাফ'।

জিরাফ আফ্রিকার অরণ্যগৌরব। এখানে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায় প্রধানত তিন ধরনের জিরাফ—'মাসাই', 'রেটিকুলেটেড' ও 'রথসচাইল্ড'। আসলে এদের প্রজাতি একটিই। 'জিরাফা ক্যামেলোপার্ডেলিস'। ক্যামেলোপার্ডেলিস প্রজাতির অধীনে এগুলি আলাদা উপপ্রজাতি। বিজ্ঞানীদের ভাষায়, 'টিপেলস্কির্চি' (মাসাই), 'রেটিকুলাটা' (রেটিকুলেটেড) ও 'রথসচাইল্ডি' (রথসচাইল্ড)। বাইরে থেকে দেখলে এদের দেহের গঠনে অমিল প্রায় চোখেই পড়ে না। পার্থক্য কেবল বরফি-কাটা নকশায়। এ ছাড়া এদের প্রত্যেকের চারণভূমিও আলাদা। এই তিনটি উপপ্রজাতির মধ্যে রেটিকুলেটেড সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। তুলনায় রথসচাইল্ড অনেক, অনেক কম। মূলত পশ্চিম কেনিয়া, উগান্ডা ও সুদানের বনাঞ্চলেই এরা সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও মানুষের শত্রুতা, এই দুয়ে মিলে এদের প্রাণ জেরবার। এমনিতেই এই উপপ্রজাতির জিরাফ বিরল প্রাণী। তার ওপর 'খাঁড়ার ঘা'। এখন এরা রীতিমত বিপন্ন। ক্রমশ পিছু হটছে অসহায় রথসচাইল্ডের দল, তাদের প্রিয় বাসভূমি থেকে। কিন্তু আশার কথা, পৃথিবীতে চিরকাল একদল মানুষ থাকেন যাঁদের বিবেক ধারালো অস্ত্রের মতো প্রখর। জক লেসলি মেলভিন ও বেট্টি লেসলি মেলভিনের নাম এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতিপ্রেমিক দম্পতি তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন রথসচাইল্ড জিরাফের জন্য। অসহায় প্রাণীদের প্রতি ভালবাসা তাঁদের ঘর থেকে টেনে এনেছে অরণ্যের মাঝখানে। বিপন্ন প্রাণীর আর্তনাদ হৃদয়কে করেছে তোলপাড়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একটাই ভাবনা, কেমন করে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবেন এইসব হতভাগ্য অরণ্যবাসীকে ! যারা না থাকলে বনাঞ্চলের যাবতীয় সুষমা-গরিমা ম্লান হয়, লুটিয়ে যায় নিষ্করুণ মাটিতে, ঝরাপাতার মতো। অবশেষে চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে তাঁরা নামলেন কাজের পথে। হাতে ভিক্ষের ঝুলি। মনে কিন্তু দুর্বার প্রতিজ্ঞা। একমাত্র অবলম্বন অদম্য সাহস। পথই এখন তাঁদের আশ্রয়। প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হলে পথেই হবে জীবনের অবসান। কিন্তু না। নিঃস্বার্থ, দরদী মানুষ জীবনে কখনও ব্যর্থ হন না। এল ১৯৭৭ সাল। তৈরি হল 'আফ্রিকান ফান্ড ফর এনডেনজারড ওয়াইল্ড লাইফ', সংক্ষেপে 'আফিউ'। বেঁচে গেল জিরাফা ক্যামেলোপার্ডেলিস রথসচাইল্ডি। প্রাণী সংরক্ষণের ইতিহাসে রথসচাইল্ড জিরাফ একটি উদাহরণ হয়ে রইল। এই উদাহরণ সামনে রেখে প্রতিটি বন্যপ্রাণীর প্রতি ভালবাসার কথা মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দিতে চেষ্টা করছে আফিউ। সন্দেহ নেই, এটি একটি আন্দোলন। যে আন্দোলনের মূল কথা 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'। কিন্তু গহন অরণ্যের চাপ-চাপ অন্ধকারে দুর্যোগের মেঘ ঘনাচ্ছিল অগোচরে। হঠাৎ একদিন এই বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিদায় নিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক জক লেসলি মেলভিন। অরণ্যচারী নিরীহ প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখাই ছিল যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, তাঁকেই আর বাঁচিয়ে রাখা গেল না। বন্ধুহারা হল সমস্ত অরণ্যবাসী। একা হয়ে গেলেন বেট্টি। এই অবস্থায় ভেঙে পড়লে চলবে কেন ? জীবনের ব্রতপালন এখনও অনেক বাকি। দীর্ঘদিন স্বামীর পাশে থেকে বনবাসী প্রাণীদের ভালবাসতে শিখেছেন। অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁর ভাবধারায়। তিল-তিল করে হৃদয়ে সঞ্চয় করেছেন ভালবাসার রূপ, রস, গন্ধ। এখানেই থামলে চলবে না।

পৃথিবীতে একদল মানুষ থাকেন যাঁদের বিবেক ধারালো অস্ত্রের মতো প্রখর। জক লেসলি মেলভিন ও বেট্টি লেসলি মেলভিনের নাম এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতিপ্রেমিক দম্পতি তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন রথসচাইল্ড জিরাফের জন্য।

পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ। মিঃ মেলভিনের স্মৃতি থেকে-থেকেই উসকে দিয়ে যায় বেট্রির কর্মপ্রবাহকে। জিরাফের জন্য নিবেদিত যাঁর জীবন, তাঁর উপলব্ধিকে একটা স্থায়ী রূপ দেওয়া খুব দরকার। উথালপাথাল হয়ে ওঠে মন। অবশেষে এল সেই সুযোগ। আফিউর প্রতিষ্ঠাতা জকের স্মৃতিতে গড়ে উঠল 'জিরাফ সেন্টার'—প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা। হ্যাঁ, প্রকৃত অর্থেই পাঠশালা। স্কুলের ছাত্ররা দল বেঁধে আসে। বন্যপ্রাণী বিষয়ে বক্তৃতা শোনে। চলচ্চিত্র দেখে। তারপর আসে সেই দুরন্ত মুহূর্ত। জিরাফের সঙ্গে মিতালি। সে এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি ঘটে বলে জানা নেই। এখানেই শেষ নয়। এর পর হাতে-কলমে শেখার পালা। তখন তারা হারিয়ে যায় জঙ্গলের মাঝে যে যার মতো। বনপথে যেতে-যেতে পথ আগলে দাঁড়ায় ওয়ার্ট হগ। বুশ বাক, ডিক ডিক ক্ষণিকের দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় ঝোপের আড়ালে। যেন এক বিদ্যুৎ ঝিলিক। মাথার ওপর ঝুলে থাকা গাছের ডালে সদা সন্ত্রস্ত গিরগিটি। 'হুপো', 'স্টারলিং', 'হেরন', 'এগরেট', 'মারাবু স্টর্ক', 'ঈগল', 'প্লোভার', এদের হাজারও ডানার স্পন্দন আঁকিবুঁকি কাটে আকাশ-স্লেটে। প্রায় ১৬৮টি প্রজাতির পাখির সঙ্গে পরিচয় ঘটে এই অভয়ারণ্যে। শুধু কি তাই ? পিঁপড়ের বাসা, মথের গুটি, ফড়িংয়ের ফুড়ুত, সবই চোখ মেলে দেখে নেওয়া যায় এখানে। প্রকৃতির কোলে বসে প্রকৃতিপাঠ, এ যেন মায়ের কোলে থেকে চাঁদ দেখা। সুখের অনুভূতিটাই অন্যরকম। তাই তো ছাত্রদের কাছে এই উদ্যানের আকর্ষণ দুর্নিবার। ছোট্ট একটি পরিসংখ্যান এটি বোঝাতে যথেষ্ট। ১৯৯০ সালে ২৫,০০০-এরও বেশি কিশোর পড়ুয়া এখানে এসেছিল। এখন আরও অনেক বেশি সংখ্যায় ওরা আসছে। জিরাফের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছে। ফেরার সময় নিয়ে যাচ্ছে সহানুভূতি ও সমবেদনার শিক্ষা, এ বনস্থলীর প্রতিটি পাতা, ঘাস ও মাটির কণা থেকে। শিকারের ফাঁদে বা ফাঁসে নয়, মানুষের ভালবাসাতেই বাঁধা পড়ছে অরণ্যের মুক্ত প্রাণী, জিরাফ।
ওই তো ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে ওরা এসে পড়ল খোলামেলা একটা জায়গায়। এর পর হাঁটায় গতির সঞ্চার হল। হাঁটা তো নয়, যেন নৃত্যের ভঙ্গি।
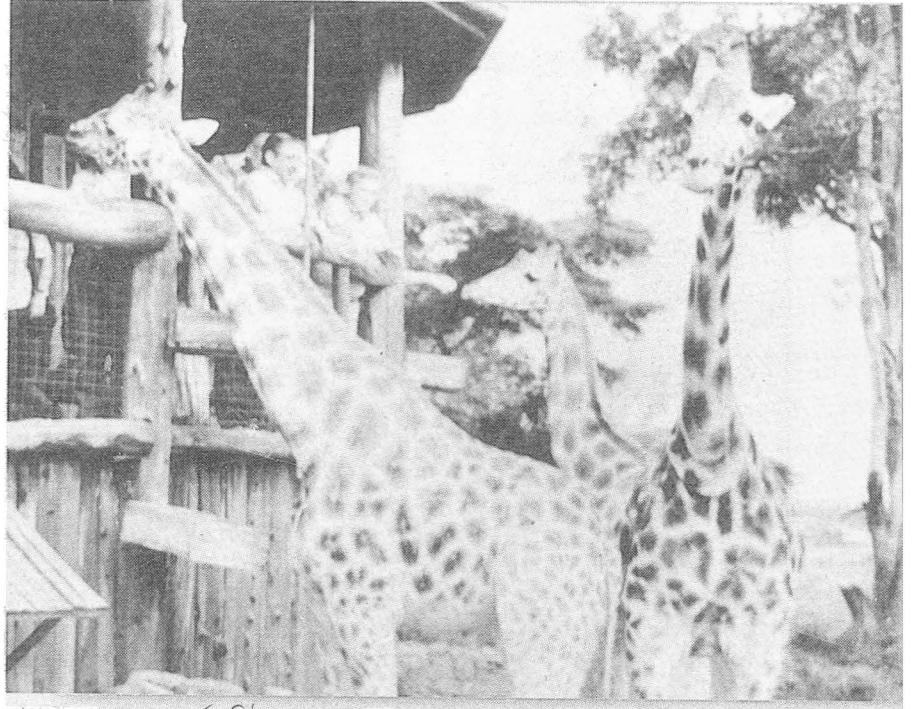
মানুষের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বের

চার-চারটে জিরাফ লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে নির্ভয়ে। ঘন নীল আকাশে হালকা সিঁদুরে ছোপ। উদাসীন সবুজ প্রান্তর। ছাতার মতো অ্যাকাসিয়া গাছ। সব মিলিয়ে প্রেক্ষাপট অতি মনোরম। আর তারই মাঝে মনে হয়, একদল অরণ্যশিল্পী রনপা নৃত্যে মেতে উঠেছে আপন খেয়ালে। কতক্ষণ বিভোর হয়ে ছিলাম জানা নেই। সংবিৎ ফিরতেই দেখি একটা জিরাফের মুখ আমার মুখের কাছে। বিঘতখানিক ব্যবধান মাত্র। মানুষের এত কাছে চলে এসেছে ওরা ! বিস্ময়ের ঘোর যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। মুগ্ধ হয়ে দেখছি। কী নিরীহ, নিষ্পাপ।

মায়াজড়ানো মুখ। হাত বুলিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। নিশ্চল, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। অথচ চোখে-মুখে অদ্ভুত অস্থিরতা। কী বলতে চায় ওরা ? মানুষের প্রতি ভালবাসা ঝলমল করছে ওদের দৃষ্টিতে। গলায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব কি না ভাবছি। আমার হাতটা ওর মাথার কাছে নিয়ে যেতেই এক অবাক কাণ্ড। বিরাট লম্বা জিভখানি মেলে ধরল সামনে। স্পর্শ করল আমার হাত। বুঝলাম, ও খেতে চাইছে। পাশেই রাখা ছিল বিস্কুটের কৌটো। বিশেষ ধরনের লম্বাটে বিস্কুট। জিরাফের খাওয়ার উপযোগী। তুলে নিলাম একটা। আর তখনই জিভের ডগাটা গোল করে পাকিয়ে দুষ্টু ছেলের মতো ছোঁ মেরে নিল আমার হাত থেকে। কিছুটা আঁকশি দিয়ে ফল পাড়ার মতো। তারপর বিস্কুটটি মুহূর্তে চালান করে দিল মুখের মধ্যে। কৃতজ্ঞতা যেন ওর চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল খুশি হয়ে। অথচ এই মনোহরণ চিত্রের পাশে মাসাইমারার জঙ্গলের একটি দৃশ্য রাখলে বিস্মিত হতে হয়। হুডখোলা চলন্ত জিপের রড ধরে দাঁড়িয়ে আছি। বের হয়েছি সেই কোন আলোআঁধারি ভোরে। সূর্য এখন এ-তল্লাটের সবচেয়ে লম্বা গাছটার মাথায় চড়েছে। তবু জঙ্গলের সবচেয়ে উঁচু প্রাণীটির দেখা মিলল কই ? এ-কথা ভাবতে-না-ভাবতে চোখে পড়ল দুটি জিরাফের ছন্দোবদ্ধ মিতালি। কী অপূর্ব ভঙ্গি ! চালককে বললাম কাছে যেতে। নির্দেশমতো জিপ থামল। জিরাফ দুটি তখনও অচঞ্চল। বনভূমির ফ্রেমে আঁটা দৃশ্যের মতো। লোভ চকচক করে ক্যামেরার লেন্সে। শাটারে আঙুল রেখে অতি সন্তর্পণে পা রাখলাম মাটিতে। আর চকিতে উধাও হল জিরাফ দুটি। না, মানুষ আর জিরাফের মাঝে ব্যবধান এখানে এক বিঘতের চেয়ে কিছুটা বেশি। অন্তহীন অবিশ্বাসের এই দূরত্ব প্রাণীরা বোঝে। যেমন বোঝে মানুষের ভালবাসার আকর্ষণ।

ফোটো : লেখক

M O N A C O
মোনাকো পেশ করছে এবার
1000-টি নতুন ফ্লেভার
অলবেলা ভেল
পনীর দিলওয়ালা
চীজ চটপটা
খাণ্ডবী কামাল
প্রথম পাতে পাঁচ পাণ্ডব
ঢ্যাঁড়শের বাহার
PARLE
MONACO
OVEN FRESH SALTED BISCUITS
New 75g pack
মোনাকো কখনো খোলা বিক্রী হয় না
বিনামূল্যে
মোনাকো টপিংস রেসিপি পুস্তিকা # 1 পেতে হলে আপনার নাম ও ঠিকানা সহ এখানে লিখুন:
মোনাকো মজা, পো.অ. বক্স নং 907, জি.পি.ও., বম্বে-400 001
এমনি খেতেই চমৎকার। টপিংস-এর সাথে আরো মজাদার।
একেবারে ঠিক-ঠিক নোন্‌তা বিস্কিট

বড়গল্প

রাক্ষস

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপ্রকাশ সেন গোয়েন্দা নন। জীবনে কখনও ভাবেননি, গোয়েন্দাগিরি করবেন। পেশায় তিনি জিওলজিস্ট। ভূবিজ্ঞানী। পেশার সূত্রে ঘুরেছেন পাহাড়ে-জঙ্গলে। নির্জন উপত্যকায়। মরু প্রান্তরে। পেশাটাই একসময় নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুপ্রকাশ সেনকে এ-নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমার কিন্তু কোনও নেশা নেই। কাজটা করে আনন্দ পাই, এটাই বড় কথা। যে-কাজে আনন্দ নেই, সে-কাজ আমি করি না।"

কথাটা তিনি আদৌ বাড়িয়ে বলেননি। আনন্দ ছাড়া আর কী! পাথর দেখে তিনি চিনতে পারেন, তার বয়স কত। আজ যেখানে পাহাড়, সেখানে একসময় সমুদ্র ছিল কি না, তাও তিনি বলে দিতে পারেন অনায়াসে। পুরনো একটা গর্ত দেখে তিনি যদি বলেন, লক্ষ বছর আগে ওখানে উল্কা পড়েছিল, তা হলে তাঁর কথাটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ না করাই ভাল। কারণ এসব বিষয়ে সুপ্রকাশ সেনের জ্ঞানগম্যির তুলনা নেই। পুঁথি-পড়া বিদ্যেটাই

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

তাঁর সম্বল নয়। ঘুরে-ঘুরে দেখেছেন, শিখেছেন। আর এভাবে তাঁর জ্ঞানের পরিধিটাই বেড়ে গেছে। মনে আনন্দ না থাকলে, শেখার কাজে আনন্দ না পেলে এটা সম্ভব হত না। এটাই তাঁর সাফল্যের সূত্র, আর সূত্রটা সবাইকে জানিয়ে দিয়েও আনন্দ পান সুপ্রকাশ সেন।

তিনি মাঝে-মধ্যে আর একটা কথাও বলে থাকেন। "আমি গোয়েন্দা নই। গোয়েন্দাগিরি করার কথাও কখনও ভাবিনি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই দেখতে পাচ্ছি গোয়েন্দাগিরি ব্যাপারটা মানুষের রক্ত-মজ্জার মধ্যে ঢুকে আছে।"

"তা হলে সবাই গোয়েন্দা হয় না কেন?" প্রশ্ন করেছিলেন অনুপমবাবু। অনুপম ঘোষ। সুপ্রকাশ সেনের ছেলেবেলার বন্ধু। দুই বন্ধুর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ তেমন হয় না। দু'জনেই কাজে ব্যস্ত। কিন্তু যখন দেখা হয়, গল্প করতে-করতে সময়ের হিসেব আর থাকে না। এমনকী নাওয়া-খাওয়াও ভুলে যান দু'জনে।

সুপ্রকাশ সেনের বাড়ি আমলাপাড়ায়। তাঁর বাবা জেলার এই সদর শহরে রাজস্ব দফতরে কাজ করতেন। রিটায়ার করার আগে এই বাড়িটি করেছিলেন। বছর কয়েক হল তিনি গত হয়েছেন। খুব অল্প বয়স থেকেই বাড়ির বাইরে-বাইরে আছেন সুপ্রকাশ সেন। হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছেন। তারপর চাকরি। সে-চাকরিও এমন যে, বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকতে হয়। আমলাপাড়ার বাড়িতে থাকেন তাঁর মা। বাড়ির কাজকর্ম যাঁরা করেন, সেই গিরিধর ও উমাও এই বাড়ির আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে। সুপ্রকাশ সেনের মায়ের দেখাশোনার দায়িত্বও বলতে গেলে উমা ও গিরিধরের।

ছুটিছাটায় সুপ্রকাশ সেন বাড়ি আসেন। অনুপম ঘোষও ঠিক সেই সময় চলে আসেন সরকারগঞ্জে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে। দুই বন্ধুর যেন নাড়ির টান! কে কখন ছুটি নিয়ে বাড়ি আসবে, তা দু'জনেই নিঃশব্দে টের পেয়ে যান। কাউকেই বলতে হয় না, "তুই অমুক সময়ে আসিস, আমিও আসব।" দু'জনের ছুটির দিন ও কাজের সময় যেন একই সুতোয় বাঁধা!

এরকমই কোনও এক ছুটিতে দুই বন্ধুর আড্ডা জমে উঠেছে। আমলাপাড়া থেকে সরকারগঞ্জ খুব একটা দূরেও নয়। একই শহরের এ-পাড়া ও-পাড়া। মাঝখানে ছোট একটা নদী। নাম ইরিনডোবা। মাছ ধরার নৌকো আছে নদীতে। সপ্তাহে দু'দিন, সোম ও শুক্র হাট বসে সরকারগঞ্জে। সে দু'দিন ছোট-ছোট নৌকোয় জিনিসপত্র আসে হাটে। তবে পারাপারের জন্য নৌকোয় সচরাচর কাউকে উঠতে দেখা যায় না। খিলান-দেওয়া সাঁকো পেরিয়েই সবাই যাতায়াত করে। রিকশায় সাঁকো পেরিয়ে আমলাপাড়ায় বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিতে আসেন অনুপম ঘোষ। সরকারগঞ্জে বন্ধুর বাড়ি রিকশাতেই যান সুপ্রকাশ সেন।

সেদিন দুই বন্ধুর আড্ডাতেই উঠল গোয়েন্দাগিরির কথা। সুপ্রকাশ সেন বললেন, "যা'ই বলিস, আমরা কিন্তু গোয়েন্দাই।"

অনুপম ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"গোয়েন্দার কাজটা কী? অত্যন্ত পুরনো একটা কাজ। সত্যের অনুসন্ধান। সেই কাজটাই তো আমরা করে যাচ্ছি। সত্য আর তথ্যের মধ্যে তফাত তো কিছু নেই। বাঁচতে হলে সবাইকে সঠিক খোঁজখবর রেখেই চলতে হয়। কোন ডাক্তার ভাল, কোন ডিসপেনসারিতে মাঝরাতে ওষুধ পাওয়া যায়, কোন অঙ্কের টিচার ছেলেদের একশোর মধ্যে একশো পাইয়ে দিতে পারেন—এসব খবর না রাখলে চলে?"

"তুই তো বিয়ে-থা করিসনি। তা হলে অঙ্কের টিচারের খবর রেখে কী হবে?" অনুপম ঘোষ বললেন।

"আমার না হয় ও-খবরে দরকার নেই। কিন্তু অন্যদের দরকার নেই, তা কি বলা যায়? গোয়েন্দাগিরি মানে শুধু খুনের তদন্ত আর অপরাধীকে খুঁজে বের করা, তা কিন্তু নয়।"

"এবার বুঝলাম তোর কথাটা।" অনুপম ঘোষ হাসতে-হাসতে বললেন।

"আসলে কৌতূহলটা থাকা দরকার। কেন হচ্ছে, কী হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে—এ-ধরনের কিছু না কিছু প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে থাকেই। জানার আগ্রহ। তা থেকেই আসে অনুমানক্ষমতা। আমরা জানতে চাই। গোয়েন্দাদের সঙ্গে তফাতটা অবশ্য অন্য জায়গায়। তারা সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায়। আমরা কিন্তু সবসময় ওরকম বিচার-বিশ্লেষণ করি না।"

"ও একটা বিশেষ ক্ষমতা। সবার থাকে না।" অনুপম ঘোষ বললেন।

কথাটা বলার সময় তিনি কিন্তু ওঁর বন্ধুর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করলেন। সুপ্রকাশ সেন কথাটা যেন শুনেও শুনলেন না। বেশ অন্যমনস্ক মনে হল তাঁকে। মনে হল, এই মুহূর্তে সুপ্রকাশ সেন আড্ডায় থেকেও নেই। তাঁর মনটা এখন অন্য কোথাও পড়ে আছে।

কিন্তু কেন? সেটাই জিজ্ঞেস করবেন ভাবছিলেন অনুপম ঘোষ। উত্তরটা সুপ্রকাশ সেনই জানিয়ে দিলেন।

"কেন গোয়েন্দাগিরির কথা বলছি, জানিস? একটা ধাঁধার উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। সেইজন্যেই মনটা বেশ চঞ্চল হয়ে আছে। কাজ করি, বই পড়ি, আড্ডা দিই, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারি না, একটা রহস্যের সমাধান করতে পারলাম না। যখনই এই কথাটা মনে পড়ে যায়, তখনই ভেতরে-ভেতরে বেশ অস্থির হয়ে উঠি। শান্তি পাই না।"

"এই সেদিন পড়লাম, কয়েকশো বছর নাকি একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। অঙ্কে যাঁদের মাথা ভাল, তাঁরা বছরের পর বছর বুদ্ধি খাটিয়েও ওই অঙ্কের উত্তর খুঁজে পাননি। কেউ কেউ দাবি করেছিলেন, অঙ্কের উত্তর তাঁরা বের করেছেন, তারপর দেখা গেল সেটা ভুল। তা, তোর ধাঁধাটা কী, শুনি?" অনুপম ঘোষ জানতে চাইলেন।

"ধাঁধাটা কোনও পত্রিকা বা বইয়ের পাতায় নেই। এটাকে বলতে পারিস একটা জলজ্যান্ত ধাঁধা। আমার চোখের সামনেই উত্তরটা আছে, নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমার চোখে সেটা ধরা পড়ছে না।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

তাঁর মন তখন চলে গেছে জব্বলপুরের কাছে সিনাপুর নামের সেই পাহাড়ি গ্রামটায়, ভূতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে যেখানে তিনি ক্যাম্প করে বেশ কয়েকটা মাস কাটিয়ে এসেছেন। উঁচুনিচু বিশাল একটা ডাঙার পাশে গ্রাম। গ্রাম না বলে ছোট একটা পাড়া বললেই ছবিটা চোখের সামনে স্পষ্ট তুলে ধরা যায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কয়েকটা চালাঘর। সংখ্যায় খুব একটা বেশিও নয়। গোটা ষাটেক, না হলে কিছু বেশি। এখানকার মাটি লাল বালি-কাঁকরে মেশা। চাষের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। তা ছাড়া, বৃষ্টিও সময়মতো হয় না। সিনাপুর গ্রামের মানুষ তাই চাষের ওপর নির্ভর করেন না। গ্রামের পাশেই আছে কয়েকটা স্টোন কোয়ারি। সেখানেই তাঁরা পাথর ভাঙেন।

নারী, পুরুষ ও শিশু মিলে শ'চারেক মানুষের গ্রাম এই সিনাপুরের বিশাল ডাঙা পেরোলেই ছোট একটা নদী। জল তেমন নেই। শুকনো নদীটাই টিলা ও পাহাড়ের গা ঘেঁষে এঁকেবেঁকে দিগন্তে মিশে গেছে। দূরে শাল-তমালের বন। এখানকার মানুষ মাটির চেয়ে পাথরই বেশি চেনেন। মাটির নীচে কোথায় পাথর আছে, ওঁরা তা চোখের নিমেষে বুঝতে পারেন। দেখতে-দেখতে বেশ কয়েকটা স্টোন কোয়ারি এখানে গড়ে উঠেছে। এসব পাথর বাড়ি ও রাস্তা তৈরির কাজে লাগে। পাথর ভেঙেই চারপাশের গ্রামের মানুষ রুজি-রোজগার করেন।

সুপ্রকাশ সেন এখানে গবেষণা করে দেখেছেন, এই অঞ্চলে কয়েক কোটি বছর আগে বেশ কয়েকবার ভূমিকম্প হয়েছিল। এখানকার টিলা ও পাহাড়গুলির জন্ম ওই সময়েই।

কিন্তু এই আবিষ্কারে তিনি মোটেই আশ্চর্য হননি। কারণ, পৃথিবীতে এরকম অঞ্চল আরও অনেক আছে। পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবর্তনের ইতিহাস এইসব অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে মোটামুটি ভালই বোঝা যায়।

সুপ্রকাশ সেন অবাক হয়েছেন সিনাপুর গ্রামের মানুষদের কথায়। গ্রামের পাশের বিশাল ডাঙাটিকে ওঁরা বলেন রাক্ষস ডাঙা। কেন ওঁরা রাক্ষসডাঙা বলেন, সেই কারণটিই খুঁজে বের করতে চেয়েছেন সুপ্রকাশ সেন। তিনি জানেন, মুখে-মুখে অনেক কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়ে। পৌরাণিক অনেক চরিত্র ও ঘটনার বাস্তব ভিত্তি না থাকলেও, গ্রাম-গঞ্জের উপকথায় সেগুলি বেঁচে থাকে। পৌরাণিক চরিত্রের নামে গ্রাম-গঞ্জের নাম আছে। গ্রামের পাশে একটা বন, কিংবা নদী। গ্রামের মানুষের কাছে সেটাই কোনও পৌরাণিক ঘটনার সাক্ষী। পুরাণ ও বাস্তব অনেক সময় তাঁদের কাছে মিলেমিশে যায়। সুপ্রকাশ সেন ভেবেছিলেন, ওরকমই কোনও পুরাণ জড়িয়ে আছে রাক্ষসডাঙা নামের সঙ্গে।

ভূবিজ্ঞানের কাজের পাশাপাশি এর পর তিনি পুরাণ, কিংবদন্তি, ইতিহাস ও লোককাহিনী নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু রাক্ষসডাঙা নামের উৎপত্তির কারণ খুঁজে পাননি। শুধু সিনাপুর গ্রামেই খোঁজখবর নেননি, চারপাশে যত গ্রাম আছে সেইসব গ্রামে ঘুরে-ঘুরে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। বৃদ্ধ থেকে শিশু কয়েকশো লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কিন্তু রহস্যের জট খোলেনি। শুধু খোলেনি নয়, রহস্যের সমাধানে একচুলও এগোতে পারেননি সুপ্রকাশ সেন।

এই কথাটাই উনি বললেন অনুপম ঘোষকে।

অনুপম ঘোষ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "সব সময় সবকিছুর ব্যাখ্যা খোঁজা ঠিক নয়।"

"কেন নয় ? বিজ্ঞানীর মন তো ব্যাখ্যাই খোঁজে। এই খোঁজার কাজটা বন্ধ হয়ে গেলে নতুন-নতুন আবিষ্কারের পথটাই তো বন্ধ হয়ে যাবে।" সুপ্রকাশ সেন বললেন। তাঁর কথাতেই স্পষ্ট, মনের যন্ত্রণাটা তিনি কিছুতেই গোপন করতে পারছেন না।

অনুপম ঘোষ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। সকালবেলা হাটবাজার সেরে, জলখাবার খেয়ে বন্ধুর বাড়ি এসেছেন। দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। কয়েক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খাওয়া হয়নি। দুপুরের খাবারের ডাক এসেছে বাড়ির ভেতর থেকে। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। কিন্তু দুই বন্ধু এমন মশগুল হয়ে আছেন যে, সে-ডাকে কেউই সাড়া দেননি। শুধু কথা আর কথা। কথার টানেই সময় কেটে যায়। দুই বন্ধুরই আছে ঘড়ি। কিন্তু ক'টা বাজল, আড্ডা ছেড়ে কখন উঠতে হবে, সে-খেয়ালই ওঁদের নেই।

সুপ্রকাশ সেন বললেন, "আকাশ থেকে উল্কা পড়ে। কিন্তু ডিকশনারির কোনও শব্দ আকাশ থেকে পড়ে না। মানুষ সৃষ্টি করেছে এক-একটা শব্দ। শব্দের একটা অর্থ থাকতেই হবে।"

"ধরে নিলাম আছে। কিন্তু সব শব্দের অর্থ জানার দরকার আছে কি ?" অনুপম ঘোষ বললেন।

"তুই তো ইতিহাসের অধ্যাপক। তোর কৌতূহল আমার চেয়ে কম হওয়ার কথা নয়।"

"তোর এই একটা প্রবলেম। কিছু একটা মাথায় ঢুকলেই হল, আর দেখতে হচ্ছে না।"

"আমি তোকে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। শোন মন

দিয়ে। আমলাপাড়া নামটা কেন হয়েছে, বলতে পারিস ?"

"আমলাদের পাড়া মানেই আমলাপাড়া।" অনুপম ঘোষ বললেন।

"হ্যাঁ। আমলারা এখানে বাড়ি করেছেন বলেই পাড়ার নাম হয়েছে আমলাপাড়া। কিন্তু এই পাড়ার সব বাড়িই আমলাদের নয়। কিন্তু পাড়ার উৎপত্তির কারণটা নামের মধ্যেই থেকে গেল।"

"আমাদের সরকারগঞ্জ নামটাও এভাবে এসেছে। জমিদারের নায়েব রাখহরি সরকার সেই কবে ইরিনডোবা নদীর পাড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছিলেন। সরকারমশাইয়ের নামেই জায়গাটার নাম হয়ে গেল সরকারগঞ্জ।"

"যা ঘটে, তার একটা কার্যকারণ থাকে। নামের উৎপত্তির পেছনেও থাকে এরকম কিছু কার্যকারণ।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"কিন্তু নদীর নাম ইরিনডোবা, এর কারণটা কী ? তুই নিশ্চয় বলবি না, নদীতে জল খেতে এসে হঠাৎ একটা হরিণ ডুবে গিয়েছিল, আর তা থেকেই লোকমুখে নাম হয়ে যায় হরিণডুবা। হরিণ কথাটারই অপভ্রংশ ইরিন।" অনুপম ঘোষের গলায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ছোঁয়া।

এবং তা সুপ্রকাশ সেনকে স্পর্শও করল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "শাস্ত্রে কী লেখে জানিস ? বিদ্রূপ হল দুর্বলের অস্ত্র।"

"আমি দুর্বল হতে যাব কোন দুঃখে ?" অনুপম ঘোষ পালটা আক্রমণ করলেন।

"হ্যাঁ, মুগুর-ভাঁজা চেহারায় কেউ কি নিজেকে দুর্বল ভাবে ? ভাবা উচিত নয়।"

"তাও ভাল, আমাকে রাক্ষস-টাক্ষস বলিসনি।"

"রাক্ষস কথাটা কিন্তু মোটেই খারাপ নয়।"

"তোকে রাক্ষসে ধরেছে, বুঝতে পারছি। দেখিস বাবা, আসল রাক্ষসের পেটে যাস না।" অনুপম ঘোষ বললেন।

"আসল রাক্ষস ? আছে বুঝি ?" সুপ্রকাশ সেন ওঁকে খোঁচা দিতে চাইলেন।

"থাকতেও তো পারে !"

"বলছিস ?"

"হ্যাঁ। তোর সন্দেহ আছে ?"

"নিজের চোখে না দেখে কিছু বলব না। নিজের চোখে দেখার জন্যেই আবার আমি সিনাপুরে যাব। ওখানে গিয়ে থাকব।"

"চাকরি ছেড়ে দিবি ?"

"চাকরির জন্যেই তো আবার ওখানে যেতে হবে। চাকরি করব, আর সময় পেলে রাক্ষসের খোঁজ করব।"

"অত সময় পাবি ?"

"গিয়ে দেখি, তারপর সব বোঝা যাবে।"

"যাই, মাসিমাকে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি। সুপ্রকাশ চলল রাক্ষসের খোঁজ করতে।" অনুপম ঘোষ উঠে দাঁড়ালেন।

"তুমি আর নতুন কী খবর দেবে বাবা ?" সুপ্রকাশ সেনের মা হাসতে-হাসতে ঘরে এসে ঢুকেছেন। "আমি আগেই সব খবর পেয়ে গেছি। আমাকে না জানিয়ে ও কখনও কিছু করেনি।"

আসলে উনি এসেছেন দু'জনকে স্নান-খাওয়ার তাগাদা দিতে। আড্ডা এবার সত্যিই ভাঙল।

॥ ২ ॥

দুষ্টু ছেলেকে শান্ত করার জন্য মা অনেক সময় বলেন, "ঘুমিয়ে পড়, রাক্ষস আসছে।" মাটির ঘরে লণ্ঠনের আধো-অন্ধকারে রাক্ষসের নামে দুষ্টু ছেলেও ভয় পায়। রাক্ষস কেমন দেখতে, সত্যিই তাকে ভয় পাওয়া উচিত কি না, ছোট্ট ছেলের মনে এসব প্রশ্ন ওঠে না। তাকে শান্ত করার জন্য রাক্ষস নামটাই যথেষ্ট।

বম্বে মেলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দু'টিয়ার কোচের বার্থে শুয়ে এ-কথাই ভাবছিলেন সুপ্রকাশ সেন। হাওড়া থেকে চেপেছেন বম্বে মেলে। নামবেন জব্বলপুরে। হাওড়া থেকে জব্বলপুরের দূরত্ব প্রায় বারোশো কিলোমিটার। আর জব্বলপুর থেকে সিনাপুরের দূরত্ব একশো সত্তর কিলোমিটারের কিছু বেশি। কিন্তু মাণ্ডলা, টিকারিয়া হয়ে সড়কপথে ঘুরে আসার জন্য দূরত্বটা বেড়ে যায়।

এবার সুপ্রকাশ সেনের সঙ্গী হয়ছেন অনুপম ঘোষ। রহস্য-রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে তিনি কলেজে ছুটি নিয়েছেন। সুপ্রকাশ সেনের পাশের বার্থে গায়ে নরম কম্বল মুড়ে তিনি এখন বেশ আরামে শুয়ে আছেন। বাইরে গরম হলেও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচটা বেশ ঠাণ্ডা। হালকা কম্বল, না হয় চাদর গায়ে 'জার্নি' বেশ উপভোগ করা যায়।

শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছেন অনুপম ঘোষ। গণ্ডোয়ানা যুগে পৃথিবীটা কেমন ছিল, কেমন ছিল সেই সময়ের প্রাণীরা, এই নিয়ে একেবারে হালের একটা 'বেস্টসেলার'। লেখক শিবনারায়ণ যোশি 'প্যালিওঅন্টলজিস্ট'। প্রত্নভূবিজ্ঞানী। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর নানা রহস্য উন্মোচন করে প্রত্নভূবিজ্ঞানীরা আজকের মানুষদের মাঝে-মধ্যে চমকে দেন। শিবনারায়ণ যোশির 'গণ্ডোয়ানাল্যান্ড' বইটিতে অবশ্য তেমন কিছু চমক নেই। ইংল্যান্ডের এক বিখ্যাত প্রকাশক বইটি বের করেছেন। 'পপুলার সায়েন্স'-এর বই। পড়তে ভালই লাগে। অনুপম ঘোষ ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর খুব একটা খোঁজখবর রাখতেন না। এ-বিষয়ে যতটুকু না জানলেই নয়, তার বেশি কিছু তিনি কখনওই জানার চেষ্টা করেননি। তবে সুপ্রকাশ সেনের পাল্লায় পড়ে বিষয়টি নিয়ে ইদানীং এক-আধটু চর্চা শুরু করে দিয়েছেন।

"জব্বলপুরে তো গণ্ডোয়ানা যুগের পাললিক শিলার খোঁজ পাওয়া গেছে তাই না ?" অনুপম ঘোষ ওঁর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন।

সুপ্রকাশ সেনও তখন এক 'থ্রিলার'-এর পাতায় ডুবে আছেন। বইয়ের পাতা থেকে চোখ না সরিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, "এ তো পুরনো খবর।"

"আমার কাছে নতুন। যোশির বইটায় লিখেছে।" অনুপম ঘোষ ওঁর হাতের বইটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলেন।

সুপ্রকাশ সেনও সে-দিকে না তাকিয়েই বললেন, "বইটায় একটাও নতুন কথা নেই।"

"তুই পড়েছিস ?"

"না পড়লে বলব কেন ? যোশিকেও আমি চিনি।"

"বইয়ের 'ব্লার্ব'-এ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে যেসব কথা লেখা হয়েছে—"

"ওসব তো লিখতেই হয়।" সুপ্রকাশ সেন যোশির বেস্টসেলারকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

"তা, আমরা জব্বলপুরে থাকছি ক'দিন ?" অনুপম ঘোষ জানতে চাইলেন।

"রাতটা শহরে কাটিয়েই পনের দিন সকালে আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

"ভেরাঘাটের ধুঁয়াধার ফলস কি দেখতে পাব না ?"

"ধুঁয়াধার ফল্সের কথা তো যোশির বইয়ে নেই।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"আছে। তবে এই বইটায়।" বালিশের পাশ থেকে 'টুরিস্ট গাইড' বইটা দেখালেন অনুপম ঘোষ।

এবার উঠে বসলেন সুপ্রকাশ সেন। বললেন, "আমরা কি

বেড়াতে যাচ্ছি যে, 'সাইট সিইং' করব ? যাচ্ছি রাক্ষসের খোঁজ করতে।"

তা হলে না হয় ফেরার পথে দেখা যাবে। জব্বলপুরে এসে মার্বেল রক্স না দেখে ফিরে যাব ? জব্বলপুর থেকে নাকি মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে ভেরাঘাটে এই মার্বেল পাহাড় ? লোকে বলে, ধুঁয়াধার ফলসের নাকি তুলনা হয় না ? নর্মদা নদী মার্বেলের একটা খাদের পথ্যে পড়ে এই জলপ্রপাত তৈরি করেছে।"

"শুধু নর্মদা কেন ? আমি তোকে আরও অনেক নদী দেখাব। গোড়, মাহী, হিরণ। ভারী সুন্দর এক-একটা নদীর নাম। আর যদি হাতির পা, ঘোড়ার পা দেখতে চাস, তাও দেখিয়ে দেব। তবে এখন নয়। যদি রাক্ষসের খোঁজ পাই, তবেই।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"হাতির পা, ঘোড়ার পা দেখার জন্যে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে এতদূর আসব কেন ? চিড়িয়াখানা তো কলকাতা শহরেও আছে। শীতের সময় আমাদের মফস্বল শহরে সার্কাসেও ওসব দেখে নিতে পারি।" অনুপম ঘোষ বন্ধুর কথায় কিছুটা বিরক্ত হয়েছেন মনে হল।

ওঁকে শান্ত করার জন্যই সুপ্রকাশ সেন বললেন, "জ্যান্ত হাতি বা ঘোড়ার পা নয়। জলের স্রোতে পাথর কেটে তৈরি হয়েছে হাতির পা, ঘোড়ার পা। দেখে আর চোখ ফেরাতে পারবি না ! এত সুন্দর !"

"রাক্ষসের খোঁজ না পেলে, এসব দেখতে পাব না ?"

"না। তখন কি আর 'মুড' থাকবে ?"

"রাক্ষসের খোঁজ পাওয়াটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। খোঁজ পাব, এমন 'গ্যারান্টি' নেই। তা ছাড়া, কোনও 'টাইমফ্রেম'ও নেই যে, অমুক সময়ের মধ্যে ওর দেখা পাবই। দিনের পর দিন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে, না হয় উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াতে হবে বনে-জঙ্গলে।" অনুপম ঘোষ বললেন।

"এখনই হতাশ হচ্ছিস কেন ? এসেছি যখন দেখি না চেষ্টা করে। আর তেমন হলে তুই চলে আসিস।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"তোকে ওখানে একা ফেলে রেখে আসব ? আশ্চর্য মানুষ তো তুই। ভাবলি কী করে ?"

"এতদিন তো একাই ওখানে ঘোরাঘুরি করেছি।"

"আমি যে তোর সঙ্গে এলাম, এটা কি তোর পছন্দ নয় ?" অনুপম ঘোষ জানতে চাইলেন।

"তা কেন ?"

"শোন, তা হলে বলি। আমারও জেদ চেপে গেল। রাক্ষসের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত সিনাপুর থেকে আমি একচুলও নড়ছি না। তাতে যদি কয়েক বছরও থাকতে হয়, থাকব।"

"কয়েক বছর ? তোর কলেজের চাকরি, ছাত্র-ছাত্রী, বাড়ি-ঘর। পারবি থাকতে ? সব ছেড়ে-ছুড়ে দিবি ?"

"দরকার হলে দেব। পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ফিরতে পারব, এমন তো কথা নেই। ধর, আমরা রাক্ষসের দেখা পেলাম। তোর কাছে একটা রিভলভার আছে, জানি। কিন্তু ধর, দেখা গেল তোর ওই অস্ত্রটাও যথেষ্ট নয়। রাক্ষস আমাদের জ্যান্ত গিলে খেয়ে নিল ! বলা তো যায় না ! খারাপটাই আমি আগে ধরে নিচ্ছি।"

"রাক্ষস আছে, এটাই আগে ধরে নিচ্ছিস ? তা'ই তো ?"

"গিয়ে দেখি, তারপর বলব।"

"রাক্ষসডাঙা নামটা এল কোত্থেকে ? রাক্ষস বা রাক্ষসের মতো কিছু একটা না থাকলে, গ্রামের লোকেরা হঠাৎ ওরকম একটা নাম রাখতে যাবে কেন ?"

"নিছক কল্পনাও তো হতে পারে ?"

"কল্পনারও কি একটা ভিত্তি থাকে না ?" সুপ্রকাশ সেন বোধ হয় নিজেকেই প্রশ্নটা করলেন।

অনুপম ঘোষ উঠে বসলেন। ট্রেনটা যে বেশ জোরে ছুটছে, তা এই বন্ধ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচে বসে ততটা বোঝা যায় না। ট্রেনটা মাঝে-মধ্যে দুলে উঠছে। এখন হয়তো গ্রামের ঘুমন্ত কোনও স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে লাইন বদল করছে। ছুটন্ত চাকা ও হাওয়ার শব্দ আসছে। কিন্তু বন্ধ কাচের জানলার ওপার থেকে শব্দটা তত তীব্র হয়ে কোচের ভেতরে ঢুকতে পারছে না।

মাঝরাত। কোচের পরদাঢাকা এই অংশটায় নীচের দুটো বার্থে আরও দু'জন যাত্রী অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এরই মধ্যে একজন 'আঁ-আঁ' শব্দে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। হয়তো কোনও দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। মানুষ যেখানেই ঘুমোক—পাঁচতারা হোটেলে, বাড়ির বিছানায় কিংবা ট্রেনের বার্থে—দুঃস্বপ্নের তাতে কোনও হেরফের হয় না।

ওই ভদ্রলোকের পাশের বার্থের কম্বল মুড়ি দেওয়া লোকটিও এমন সময় ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী যেন বলে উঠলেন। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কথা বলার অভ্যেস আছে অনেকের। এও তা'ই।

কিন্তু অনুপম ঘোষের মনে হল, লক্ষণটা শুভ নয়। একে তো ওঁরা যাচ্ছেন এমন এক কাজে, যা রীতিমত গা-ছমছমে, তার ওপর সহযাত্রীদের এই আচরণ !

ওঁর মনের কথাটা টের পেলেন সুপ্রকাশ সেন। তিনি আবার বার্থে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, "ভয় পাস না। আতঙ্ক ব্যাপারটা ভাল নয়। ঘুমিয়ে পড়।"

বন্ধুর কথায় আশ্বস্ত হয়ে আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন অনুপম ঘোষ। নিয়ন আলোর সুইচটা হাত বাড়িয়ে 'অফ' করে দিলেন। মনের আতঙ্ক হালকা হতে-হতে কখন যে একসময় মিলিয়ে গেল, তা তিনি ঘুমের মধ্যে টেরও পেলেন না।

বম্বে মেলের অক্লান্ত ছুটে-চলার মধ্যে অনুপম ঘোষের ঘুম ভাঙল সকালবেলা। বাইরে ঝলমলে রোদ। রোদ-চশমার মতো জানলার কাচ দিয়ে সে-রোদের অল্প একটু আভা ট্রেনের কামরায় এসে পড়েছে। অনুপম ঘোষ দেখলেন, ওঁর বন্ধু আগেই ঘুম থেকে উঠেছে। মুখ-টুখ ধুয়ে, মাথার এলোমেলো চুল আঁচড়ে একেবারে তরতাজা চেহারা নিয়ে নীচের সিটে এসে বসেছে। অন্য দুই যাত্রীরও ঘুম ভেঙেছে আগে। অনুপম ঘোষ হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। সাড়ে আটটা। অন্যদিন ওঁর ঘুম কিন্তু ভোরবেলাতেই ভেঙে যায়। আজ একটু বেশি ঘুমিয়েছেন। তা হোক, কাজ তো কিছু নেই। টানা এতক্ষণ ঘুমনোর পর শরীরটা বরং ঝরঝরেই লাগছে।

বিকেলে ওঁরা পৌঁছে গেলেন জব্বলপুর। স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে উঠলেন। এই হোটেলটা সুপ্রকাশ সেনের চেনা। তাঁকে দেখে হোটেলের ম্যানেজার বলে উঠলেন, "পাথর খোঁজা কি এখনও শেষ হয়নি আপনার ?"

"খোঁজার কি আর শেষ আছে মশাই !" সুপ্রকাশ সেন হেসে বললেন।

"খুঁজুন। খুঁজে যান। এর চেয়ে যদি সোনা খুঁজতেন ভাল হত !" ম্যানেজারও হাসলেন।

"আমি যে পাথর খুঁজি, সেগুলো সোনার চেয়েও দামি। টাকা থাকলে সোনা কিনতে পারবেন বাজারে। কিন্তু এসব পাথর তো দোকানে সাজানো থাকে না।"

"বাধা দিচ্ছে কে মশাই ! যত পারেন খুঁজুন, খুঁজে যান। মনের সুখে খুঁজুন। যার যাতে আনন্দ।" হোটেলের মাঝবয়সী বাঙালি ম্যানেজার রামকানাইবাবু বললেন। সুপ্রকাশ সেনের সঙ্গে ওঁর যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা আছে, তা ওঁর এই কথাতেই বোঝা গেল।

সন্ধে হল। হোটেলের ঘর-লাগোয়া ব্যালকনিতে সুপ্রকাশ

সেন ও অনুপম ঘোষ পাশাপাশি দুটো ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। সোনার থালার মতো বড় চাঁদ উঠেছে আকাশে। নীল জ্যোৎস্নায় চারপাশ ভেসে যাচ্ছে।

অনুপম ঘোষ বললেন, "আজ পূর্ণিমা। তা'ই না?"

"হ্যাঁ।" সুপ্রকাশ সেন উত্তর দিলেন।

উত্তরটা দিয়েই তিনি ভাবলেন, তাঁর বন্ধু এখন নিশ্চয় পূর্ণিমায় মার্বেল রক্সের অনুপম সৌন্দর্যের কথা ভাবছেন। টুরিস্ট গাইডে হয়তো পূর্ণিমায় মার্বেল রক্স দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রকাশ সেন এই মুহূর্তে ওঁর বন্ধুর জন্য মনে-মনে কষ্ট পেলেন। সত্যিই তো, তাঁর বন্ধু এই প্রথম জব্বলপুরে এলেন। এমনিতেই সে ঘরকুনো মানুষ। পরে আবার সে জব্বলপুরে আসতে পারবে কি না, ঠিক নেই। সুতরাং বাড়ি ফেরার আগে ওঁকে মার্বেল রক্স না দেখালেই নয়! সুপ্রকাশ সেন ভাবলেন।

তবে কথাটা মুখে বললেন না। বরং পুরনো একটা কথারই পুনরুক্তি করলেন। "আগে কাজটা সেরে আসি। তারপর তোকে সব ঘুরিয়ে দেখাব।"

"আমি কিন্তু মার্বেল রক্সের কথা আর ভাবছি না। ভাবছি সিনাপুর আর সেই রহস্যময় ডাঙাটার কথা। পূর্ণিমার চাঁদ তো সেখানেও ওঠে। সেখানেও নদী আছে, পাথর আছে।" অনুপম ঘোষ বললেন।

"এমনও কি হতে পারে ওখানে রহস্য কিছুই নেই? আমিই একটা রহস্যের আবহাওয়া তৈরি করে নিয়েছি? এটা নিছক একটা ফ্যান্টাসি? সাধারণ মানুষের মনে নানারকম সংস্কার থাকতে পারে। রাক্ষসডাঙা নামটা শুনে আমি বেশিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েছি। নিজের ওপরেই আমার সন্দেহ হচ্ছে।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

॥ ৩ ॥

সন্দেহটা কিন্তু অমূলক। রাক্ষস ছিল এবং এখনও আছে, এটাই সিনাপুরের মানুষ বিশ্বাস করেন।

সুপ্রকাশ সেন ও অনুপম ঘোষ কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ওঁদের জানতে দেননি, তাঁরা রাক্ষসের খোঁজে এসেছেন। আগে যেমন সুপ্রকাশ সেন মাটি খোঁড়াখুড়ি করতেন, পাথর দেখতেন, এখনও তা'ই করছেন। তাঁর দেখাদেখি অনুপম ঘোষও ওই কাজটি করছেন। যাতে কারও কোনও সন্দেহ না হয়। কারণ, গ্রামের মানুষ যদি জানতে পারেন তাঁরা শুধু রাক্ষসের খোঁজেই এসেছেন, তা হলে তাঁরা বাধা দেওয়ারই চেষ্টা করবেন। না হয় এমন কিছু বললেন, যাতে দুই বন্ধু ভয় পান।

ভয় কিন্তু তাঁরা পাননি। ভয় পাওয়ার লোক তাঁরা দু'জনেই নন। সুপ্রকাশ সেন তাঁর বন্ধুকে বললেন, "আমি এবার নতুন চোখে রাক্ষসডাঙার মাটি, পাথর সব পরীক্ষা করে দেখব।"

সিনাপুর গ্রামের পাশে ঝাঁকড়া একটা ছাতিম গাছের নীচে ওঁদের ক্যাম্প। বড় একটা তাঁবুতে ওঁরা দু'জনে থাকেন। পাশের ছোট তাঁবুতে আছে ওঁদের জিনিসপত্র। সেখানে কেরোসিনের স্টোভে রান্নাও হয়। সিনাপুরের একটি ছেলে ওঁদের রান্না করে দেয়। জলখাবারের ব্যবস্থা করে। ছেলেটির নাম রামলাল।

তাঁবুর সামনে সন্ধেবেলা ক্যাম্প-চেয়ারে বসে দুই বন্ধু কথা বলছিলেন। ছোট একটা টুলের ওপর হ্যাজাক জ্বলছে। পাশের তাঁবুতে রান্না করছে রামলাল। রাক্ষসডাঙার নামটা শুনেই সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা রাক্ষসের কথা বলছ?"

"কেন?" সুপ্রকাশ সেন পালটা প্রশ্ন করলেন।

"উহা মত যাইয়ে। রাক্ষস হ্যায়।" রামলাল বলল।

"কহাঁ রাক্ষস? উসে দেখ কিঁউ নহি পা রহা হুঁ? রাক্ষসের দেখা পাচ্ছি না কেন?" অনুপম ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন।

"জমিনকে নীচে শো রহা হ্যায়। আচানক জগ যায়ে গা।" রামলাল বলল। সে বোঝাতে চাইল, রাক্ষস মাটির নীচে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ সে জেগে উঠবে।

"দেখনে মে ক্যায়সা হ্যায়? উসে তুমনে দেখা হ্যায়?" সুপ্রকাশ সেন প্রশ্ন করলেন।

রামলাল বলল, "বিশাল পক্ষী কি তরহ।"

রাক্ষস দেখতে বিশাল একটা পাখির মতো। শক্ত ঠোঁট। একটা ঠোক্কর দিলেই তোমার মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে যাবে। সখ্ত হোঁট। এক ঠোকর সে হি তুমহারা মাথা ফাট কর ঢাকনা চুর হো যায়েগা। রাক্ষস সম্পর্কে এটাই রামলালের ধারণা।

সুপ্রকাশ সেন এবার মজা করে জানতে চাইলেন, "নিগল তো নহি যায়েগা? গিলে খাবে না তো?"

"যদি ইচ্ছে করে, গিলে খাবে। তবে শুধু তোমাকে কেন? একসঙ্গে দশটা মানুষকে সে গিলে খেতে পারে।" রামলাল বলল। ওর কথাটা হল, "যদি চাহে তো নিগল লেগা। মগর কেবল তুমকো কিঁউ? এক সাথ দশ লোগো কো নিগল সকতা হ্যায়।"

একই সঙ্গে রামলাল আরও জানিয়ে দিল, "রাক্ষস মর কর পাত্থর হো গয়া হ্যায়। উসকা শরীর মিট্টিমে নহি মিলতা, উসকো দফনায়া নহি যাতা।"

অর্থাৎ, রাক্ষস মরে পাথর হয়ে গেছে। ওদের শরীর মাটিতে মিশে যায় না, আগুনে ওদের পোড়ানো যায় না।

সুপ্রকাশ সেন জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে একটু আগেই বললে, রাক্ষস মাটির নীচে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ জেগে উঠবে। তা হলে এখন কেন বলছ, রাক্ষস মরে পাথর হয়ে গেছে। পাথরই যদি হবে, তা হলে সে জেগে উঠবে কী করে?"

প্রশ্নটা মোটেই পছন্দ হল না রামলালের। সে কটমট করে সুপ্রকাশ সেনের দিকে তাকাল। অন্ধকারেও সুপ্রকাশ সেনের মনে হল, ওর দুটো চোখে আগুন জ্বলে উঠল। রাক্ষসের অস্তিত্ব সে বিশ্বাস করে। শুধু বিশ্বাসই করে না, রাক্ষস নিয়ে কোনওরকম কথাবার্তাও সে পছন্দ করে না।

কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন সুপ্রকাশ সেন কিংবা অনুপম ঘোষকে করতে হল না। রামলাল নিজেই জানিয়ে দিল, সে চায় না কেউ গিয়ে রাক্ষসকে বিরক্ত করুক। নিশ্চিন্তে ঘুমনোর অধিকার রাক্ষসেরও আছে। সে যদি বিরক্ত হয়, রেগে যায়, তা হলে আর রক্ষে নেই। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু এরকম একটা ধারণা রামলালের হল কী করে? রাক্ষস আছেই, এরকম একটা বিশ্বাস ওর মনে কী করে জন্মাল? অনুপম ঘোষ এটাই জানতে চেয়েছিলেন ওঁর বন্ধুর কাছে।

সুপ্রকাশ সেন বললেন, "এটা শুধু রামলালের একার বিশ্বাস নয়, এটা এখানকার সবার বিশ্বাস। নিজেদের মধ্যে এটা-ওটা নানা বিষয়ে বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু একটা ব্যাপারে সবাই একমত। রাক্ষস আছেই। সে যদি মরে গিয়ে থাকে, তা হলে তা নিতান্তই এক সাময়িক ঘটনা। যে-কোনও সময় জেগে-ওঠার ক্ষমতা রাক্ষসের আছে। কী করে এই বিশ্বাস ওদের মনে জন্মাল, সেটাই আমাদের জানতে হবে। আর সেটা জানতে পারলেই রাক্ষস-রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।"

পরের দিন সকাল-সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে দুই বন্ধু পৌঁছে গেলেন রাক্ষসডাঙায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও বৈশিষ্ট্যই এর চোখে পড়ে না। কয়েকটা জায়গায় অবশ্য বেশ বড়-বড় গর্ত।

অনুপম ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, "গর্তগুলো কিসের?"

সুপ্রকাশ সেন জানালেন, "ডাঙার মাটি কেটে এখান থেকে ট্রাকে করে মোরাম নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

বেশ বড়-বড় গর্ত। এক-একটা দশ-বারো ফুট গভীর।

সুপ্রকাশ সেন বললেন, "নীচে নেমে দেখতে হবে। ক্যাম্প থেকে দড়ির মইটা নিয়ে আসি। না হলে নামা যাবে না।"

তিনি গেলেন ক্যাম্পে মই আনতে, আর অনুপম ঘোষ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। মোরামের খাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে এক সময় ওঁর মনে হল, সুপ্রকাশ কি দেখেছেন, এখান থেকে ট্রাকে মোরাম নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? রামলালের কথাটাই সেই মুহূর্তে ওঁর মনে পড়ে গেল। মাটির নীচে রাক্ষস ঘুমিয়ে থাকে। গর্তগুলো রাক্ষসের ঘুমনোর জায়গা নয় তো?

সকাল দশটায় রোদ বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। চারপাশে কোথাও কোনও রহস্যের ছিটেফোঁটাও নেই। তা হলে অনুপম ঘোষের মনে ওরকম একটা প্রশ্ন দেখা দিল কেন? প্রশ্নটা তিনি নিজেকেই করলেন। উত্তরটাও তৈরি করে নিতে হল নিজেকে। যে-কাজে তাঁরা এসেছেন, তাতে প্রতিটি জিনিসকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হচ্ছে। সবে শুরু। অভিযান শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। এখন থেকেই সবকিছু যাচাই করে চলতে হবে। সূত্র বা ঘটনা সামান্য হলেও তাকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না।

দড়ির মই নিয়ে এসে গেছেন সুপ্রকাশ সেন। সঙ্গে লোহার খুঁটি ও হাতুড়ি। হাতুড়ি পিটিয়ে লোহার খুঁটি শক্ত ডাঙায় পুঁতে তার সঙ্গে দড়ির মইটা বেঁধে এর পর তিনি নীচে নেমে গেলেন। গর্তের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন অনুপম ঘোষ।

বড় খাদের এদিকে-ওদিকে ঘুরতে-ঘুরতে সুপ্রকাশ সেন এক জায়গায় উবু হয়ে বসে কী যেন দেখতে থাকলেন। গর্তের মধ্যে আর-একটা গর্ত।

"আর-একটা গর্ত পেলাম।" চিৎকার করে কথাটা তিনি জানিয়ে দিলেন বন্ধুকে। অনুপম ঘোষ অধীর আগ্রহে খাদের ওপরে অপেক্ষা করছেন।

তিনিও চিৎকার করে বললেন, "গর্তের মধ্যে কি আর একটা গর্ত থাকতে পারে?'

"পারে। ওপরে উঠে সব বলব।"

পুরো খাদটা তন্নতন্ন করে দেখতে থাকলেন সুপ্রকাশ সেন। মোরাম কেটে ট্রাকে করে সে-মোরাম বাইরে পাঠানো হয়েছে। এটাই সবাই জানে। কিন্তু সুপ্রকাশ সেনের চোখে এমন কিছু ধরা পড়ল, যার তাৎপর্য থাকলেও থাকতে পারে।

দুপুর নাগাদ তিনি খাদ থেকে উঠলেন। মাথার ওপরে সূর্য জ্বলছে। শোলার টুপিতে মাথা ঠাণ্ডা থাকলেও সারা শরীরে জ্বালা ধরেছে। এবার ওঁরা ক্যাম্পে ফিরবেন। খিদেও পেয়েছে। চটপট স্নান-খাওয়া সেরে আবার ওঁরা রাক্ষসডাঙায় ফিরে আসবেন, এটাই ঠিক ছিল। রুটিনের নড়চড় হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু নড়চড় হল।

খেতে বসে সুপ্রকাশ সেন বললেন, "খাদটা যা ভেবেছিলাম, মোটেই তা নয়।"

"তুই আর-একটা গর্ত দেখেছিস বললি?"

"হ্যাঁ। খাদে নেমে বুঝতে পারলাম, সাধারণ শ্রমিকরা ওখানে মাটি কাটেনি।"

"ওখান থেকে কি মোরাম নিয়ে যাওয়া হয়নি?"

"শুনেছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু খাদে নেমে দেখলাম মাটির পুরনো এক-একটা স্তর বেশ হিসেব-নিকেশ করেই কাটা হয়েছে। এই কাজে বিশেষ দক্ষতা দরকার। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ফসিল খুঁজতে গেলে আমরা যেভাবে সাবধানে মাটি কাটি, এখানেও ঠিক তা'ই করা হয়েছে। যেমন খুশি কোদাল, গাঁইতি চালানো হয়নি। পুরাতাত্ত্বিক খননের কাজও এভাবে সাবধানে করতে হয়।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"তার মানে, এখানে মাটি কেটে কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ফসিল আবিষ্কার করা হয়েছে?" অনুপম ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিক এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। ওখানে যত খাদ আছে, আমাকে নেমে দেখতে হবে। আরও অনেক কিছু খুঁটিয়ে দেখা দরকার। তারপর সিদ্ধান্ত।"

এই অঞ্চলে কি ডাইনোসরের আস্ত ফসিল কিংবা হাড়গোড় কিছু পাওয়া গেছে?"

"সিনাপুর থেকে মাইল সাতেক দূরে নদীটার বাঁকে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের একটা আস্তানার খোঁজ পাওয়া গেছে। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। জিওলজিকাল সার্ভের একটা রিসার্চ টিম ওখানে পেয়েছিল বেশ কয়েকটা ডাইনোসরের ফসিল। এ ছাড়া, ডাইনোসরের কিছু ডিমও পাওয়া গিয়েছিল।"

"ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই অঞ্চলে ডাইনোসরের বসতি ছিল।"

"হ্যাঁ। মেসোজোইক যুগের শেষদিকের প্রাণীদের ফসিলই এখানে পাওয়া গেছে। মেসোজোইক যুগের শেষদিকে ডাইনোসররা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। ঠিক সেই পর্বেরই আগেকার প্রাণের চিহ্ন এখানে বিজ্ঞানীরা পেয়েছে।"

"তা হলে তো, এই জায়গাটার বেশ গুরুত্ব আছে বলতে হবে।"

"আমি ও আমার সঙ্গের লোকজন যে এতদিন ধরে এখানে কাজ করেছি, তার কারণও কিন্তু এই ফসিল। এখানকার লোকেরা জানে, আমি পাথর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সেগুলো যে ফসিল সে-খবর ওরা রাখে না। আসলে, ফসিলও তো পাথর। প্রাণীদের কঙ্কাল, হাড়গোড়, মাথার খুলি কোটি-কোটি বছর মাটির নীচে চাপা পড়ে পাথরে পরিণত হয়।"

"তা, যে খাদটায় তুই নেমেছিলি সেখানে কি এরকম কোনও ফসিল ছিল বলে মনে হয়?" অনুপম ঘোষের কৌতূহলের শেষ নেই।

"নিশ্চয় ছিল। আর মাটি থেকে তুলে সেটাকেই কোথাও পাচার করে দেওয়া হয়েছে।"

"বিজ্ঞানীরা কি এখানে গবেষণা করতে আসেননি।"

"এই ধরনের গবেষণার কিছু নিয়ম থাকে। আমার মনে হচ্ছে, সেই নিয়মটা এখানে মানা হয়নি। অর্থাৎ, কাজটা করা হয়েছে গোপনে।"

"গ্রামের লোকদের চোখে কি ধুলো দেওয়া যায়? রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি কিছু পাচার করতে হলেও তো ওরা টের পেয়ে যাবে। আর ডাইনোসরের ফসিল নিশ্চয় কেউ পকেটে নিয়ে চম্পট দেয়নি?"

"এখানকার লোকদের বোকা বানানোর একটা উপায় ওরা বের করেছিল। আমার ধারণা, ট্রাকে করে মোরাম পাঠানোর সময় ওরা কিছু ফসিলও এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, মোরাম পাঠানোর নাম করে ওরা এই কাণ্ড করেছে।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"কিন্তু যদি সত্যিই দেখা যায়, কোনও সরকারি ঠিকেদার এখান থেকে মোরাম নিয়ে গেছে? আর মোরাম নিতে হলে তো ট্রাকে করেই নিতে হবে।"

"কথাটা ঠিক। কিন্তু মোরামের আড়ালে ফসিল পাচারও অসম্ভব নয়।"

"আচ্ছা ধর, মোরাম কাটতে গিয়ে আস্ত একটা ফসিল বেরিয়ে এল?"

"তুই বলছিস, হঠাৎ একটা ফসিল পাওয়া গেল? তার মানে চান্স ফ্যাক্টর।"

"চান্স ফ্যাক্টরকে কিন্তু আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না! আজকের ঘটনাটাই ধর। তুই এতদিন ধরে এখানে কাজ করছিস, কিন্তু আজই প্রথম খাদে নামলি, আর শুধু নামা নয়, প্রথমবার খাদে নেমেই এমন কিছু তোর চোখে পড়ল যা থেকে তোর
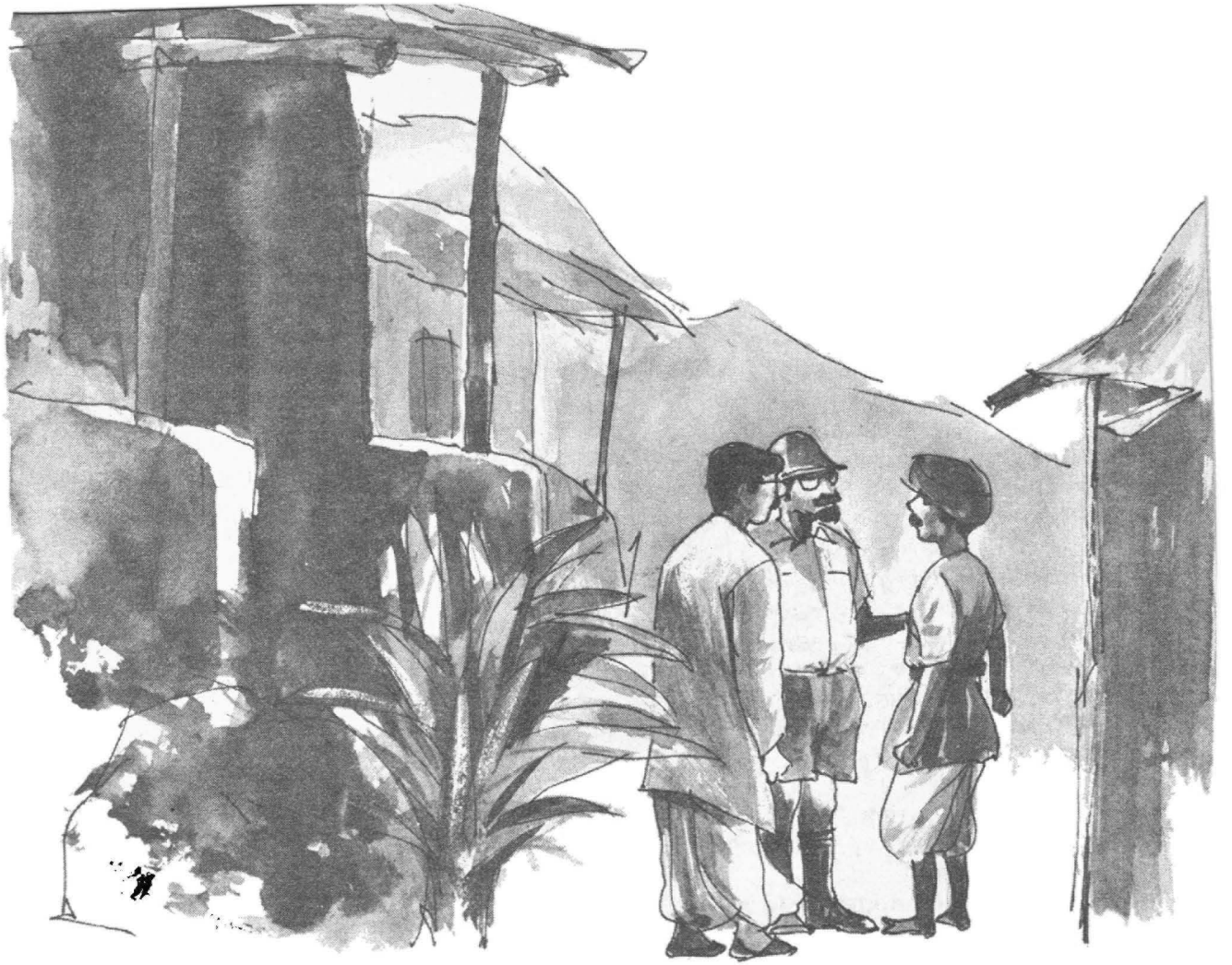
ধারণা, এখানে একটা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ফসিল ছিল। এটাও তো চান্স ফ্যাক্টর।"

"আমি কি বলেছি, মাত্র একটা ফসিল ছিল ? বলিনি তো ! আমার মনে হয়, ওরা এখানে একটা ডাইনোসর কলোনির খোঁজ পেয়েছিল। একটু আগে যে-খাদে নেমেছিলাম, সেখান থেকে একাধিক ফসিল পাওয়া সম্ভব। খাদের মেঝেটা সমতল নয়। ছোট-বড় নানা মাপের গর্ত ওখানে আছে। গর্তের মধ্যে যে গর্তের কথা তোকে বললাম, সেটা এমনভাবে কাটা হয়েছে দেখে মনে হয়, সেখানে একটা আস্ত ফসিল ছিল। যারা গর্ত কেটেছিল, তাদের পেছনে এমন কেউ ছিল, যে কি না ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। তার বুদ্ধি অত্যন্ত পাকা। এমনও হতে পারে, সে একা নয়। কারণ, এতদূরে এসে এরকম একটা কাজ করার সাহস তার একার পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। তাকে মদত দেওয়ার জন্যে স্থানীয় কোনও লোক নিশ্চয় ছিল।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"এ যে দেখছি গোয়েন্দা-কাহিনী হয়ে যাচ্ছে।" অনুপম ঘোষ বললেন।

"তোকে বলেছিলাম না, আমরা গোয়েন্দা ? আমরা না চাইলেও গোয়েন্দাগিরি কিছু-না-কিছু আমাদের করতে হয়।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

খাওয়ার পাট অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। হাত-মুখ ধুয়ে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে ওঁরা এতক্ষণ কথা বলছিলেন। সুপ্রকাশ সেন জানেন, আবার রাক্ষসডাঙায় ফিরতে হবে। আরও একটা মোরামের খাদে নামতে হবে। কথায়-কথায় এদিকে অনেকটা সময় কেটে গেছে। এখন মোরামের খাদে গিয়ে নেমে সব দেখে-টেখে ক্যাম্পে ফিরতে সন্ধে গড়িয়ে যাবে। রুটিনের নড়চড় হয়ে গেল। অথচ আগেই সব ঠিক করা ছিল। ব্রেকফাস্ট, আউটডোর, লাঞ্চ, আবার আউটডোর, তারপর ক্যাম্পে ফেরা—সবকিছুর জন্যই তিনি ঘড়ি ধরে সময় বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রথমদিনই সব ওলটপালট হয়ে গেল।

কিন্তু এখন তো ক্যাম্পে বসে কুঁড়েমি করারও মানে হয় না। সুপ্রকাশ সেন বললেন, "চল, বেরিয়ে পড়ি।"

"বিকেল হয়ে এল। এখন আবার খাদে নামবি ?" অনুপম ঘোষ বললেন।

"না, এখন গ্রামের লোকদের সঙ্গে একটু কথা বলব। পাথরখাদান থেকে ওদের ফেরার সময় হয়ে গেল।"

দুই বন্ধু গ্রামে গেলেন। সুপ্রকাশ সেনকে গ্রামের মানুষ আগে থেকেই চেনেন। ভূপতি মাণ্ডি, মিশিয়া, বুধন, মহাদেব, ভূতনাথ, ফিরকি, চাকুয়া, চাকুয়ার স্ত্রী ছবি, ছবির বোন পাখি—এঁদের সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সুপ্রকাশ সেন।

গ্রামের রাস্তায় প্রথমেই তাঁর সঙ্গে দেখা ভূতনাথ-এর। তিনি ওঁকে জিজ্ঞেস করলন, "কেইসে হো ? আছ কেমন ? খবর ভাল ?"

ভূতনাথ জানালেন, "শুখা চল রহা হ্যায়।"

"শুখা তো চলতাহি হ্যায়। তো, তুমহারে পাথরকে খান কী কেয়া খবর হ্যায় ?"

"মজদুরি তো বাড়হা নহি বাবু। তুমি আমাদের কাজ দাও।"

"কী কাজ ?"

"দিনমজুরের আবার আলাদা কাজ কী ! তা, তুমি কি মোরামের ব্যবসা শুরু করবে ? ঠিকে নিয়েছ ?" ভূতনাথ জিজ্ঞেস করল।

"কেন বলো তো ?"

"শুনলাম তুমি নাকি মোরামের খাদানে নেমেছ ?"

"হ্যাঁ। নেমেছিলাম।"

"এখানকার মোরাম খুব ভাল বাবু। তবে কী জানো ? যোশিবাবু নামে আগের ঠিকেদার আমাদের কাজ দেয়নি।"

"যোশিবাবু ? তিনি আবার কোত্থেকে এলেন ?"

"জানি না বাবু। তবে বাইরে থেকে লোকজন এনেছিলেন। বিশ-পঁচিশটা ছাউনি পড়েছিল। আমাদের কাউকে কাজ দেননি। সব বাইরের মজুর।"

সুপ্রকাশ সেন এবার এগিয়ে গেলেন। ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা তিনি আর তুললেন না। কিন্তু যা জানার ছিল, তা ভূতনাথের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। গ্রামের লোকজন যাতে ফসিলের কথা জানতে না পারে, সেইজন্যই বাইরে থেকে লোকজন এনে তাদের কাজে লাগানো হয়েছিল। ঠিকেদারের নামটাও সুপ্রকাশ সেনের জানা হয়ে গেছে। যোশিবাবু।

আচ্ছা, ভূতনাথের এই যোশিবাবু শিবনারায়ণ যোশি নন তো ? সুপ্রকাশ সেন ভাবলেন, ফসিল আবিষ্কারের কাজটা কাঁচা লোকের কাজ নয় ! যোশি নিজে ভূবিজ্ঞানী। এইসব জায়গায় তিনি আগেই ঘোরাঘুরি করেছেন, সুপ্রকাশ সেন এখানে আসার আগে, অনেক আগে। সিনাপুর থেকে মাইল সাতেক দূরে নদীর বাঁকে ডাইনোসর কলোনি আবিষ্কারের পর সুপ্রকাশ সেনকে তাঁর দফতর থেকে এখানে পাঠানো হয় আরও খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। এলাকাটা ঘুরে দেখে সুপ্রকাশ সেন সিনাপুরেই ক্যাম্প করেছিলেন। তার অনেক আগেই রাক্ষসডাঙা থেকে মোরামের সঙ্গে ফসিল পাচার হয়ে গেছে। সুপ্রকাশ সেন এখানে এসে এবড়ো-খেবড়ো ডাঙাটাই দেখেছেন, ট্রাকভর্তি মোরাম অন্য জায়গায় পাঠানোর কথা শুনেছেন আর শুনেছেন রাক্ষসের গল্প। রাক্ষস নিয়ে কৌতূহল তাঁকে আবার নতুন করে জায়গাটা চিনিয়ে দিচ্ছে। যোশি নামটা শোনার পর থেকেই তাঁর ধারণা আরও নিশ্চিত হয়ে উঠছে যে, রাক্ষসডাঙায় ফসিল ছিল। এবং সেই ফসিল ডাইনোসরের না হয়ে যায় না। হাতেনাতে প্রমাণ অবশ্য তিনি এখনও পাননি। কিন্তু তীক্ষ্ণ অনুমানক্ষমতা থেকে পুরো ব্যাপারটা তাঁর কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' বোধ হয় একেই বলে। দেখা যাক, গ্রামের আর সব লোকের কাছে নতুন কী খবর পাওয়া যায় ?

এর অনেক পরে খবরটা অবশ্য এনেছিলেন অনুপম ঘোষ। রোজ নিয়ম করে রাক্ষসডাঙায় এক-একটা খাদে নামতেন সুপ্রকাশ সেন। প্রতিদিনই ওঁর সঙ্গে যেতেন অনুপম ঘোষ। শেষে একদিন বললেন, "তুই তোর কাজ কর, আমি আমার কাজটা করি।"

"তোর আবার নিজের কাজ কী ? আমরা তো একটা কাজ নিয়েই এখানে এসেছি।" সুপ্রকাশ সেন বলেছিলেন।

"হ্যাঁ। সেই কাজটাই করতে যাচ্ছি। তুই একা আর কত ঘোরাঘুরি করবি ? আমি নিজে একটু ঘুরে দেখি।"

ঘুরে দেখার কাজটা যতটা সহজ ভেবেছিলেন অনুপম ঘোষ, তা কিন্তু নয়। সুপ্রকাশ সেন পরেন খাকি হাফ প্যান্ট ও সাদা টি-শার্ট। মাথায় নেন শোলার টুপি। অনুপম ঘোষ কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই এসেছেন। চিরাচরিত পোশাকটি বদলাতে চাননি। রোদে ঘুরোঘুরির জন্য এনেছেন ছাতা। ঢেউখেলানো প্রান্তর দিয়ে ছাতা মাথায় হাঁটতে কষ্টই হয়। সকাল থেকেই এখানে শোঁ-শোঁ করে হাওয়া বইতে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের উত্তাপ বাড়ে। হাওয়াও বেশ গরম হয়ে ওঠে। মুখ, হাত, পা প্রায় ঝলসে যায়। কষ্ট হলেও তবু তাকে আমল দিলেন না অনুপম ঘোষ।

এবং কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর এক সময় দেখলেন, কষ্টটাও গা-সওয়া হয়ে গেছে। এবং একদিন তো ওঁর রীতিমত আনন্দই হল। আবিষ্কারের আনন্দ। এবং সেই আবিষ্কারটা তিনি করলেন নিতান্তই আকস্মিকভাবে।

সিনাপুর থেকে মাইলসাতেক দূরে নদীর বাঁকে যেখানে কোটি-কোটি বছর আগে ছিল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের কলোনি, সেই জায়গাটা তিনি নিজের চোখে দেখতে গিয়েছিলেন। সে এক পোড়া লালমাটির প্রান্তর। সেই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সারা গায়ে একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলেন ইতিহাসের অধ্যাপক অনুপম ঘোষ। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি এতদিন মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের ঘটনার কথা পড়িয়েছেন, কিন্তু সেদিন যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানকার ইতিহাস আসলে সৃষ্টির বিশাল একটা অধ্যায় চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। মনে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করলেন অনুপম ঘোষ। মানুষের পরিণতিও কি একদিন এরকম হবে ? ভাবতেই কষ্টটা আরও বাড়ল।

কিন্তু কষ্টের পাশাপাশি সেদিন এক আনন্দের অভিজ্ঞতাও হল অনুপম ঘোষের। নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি একটা গ্রাম পেলেন। সিনাপুরের মতোই একটা গ্রাম। সমৃদ্ধির ছিটেফোঁটাও নেই এই গ্রামে। এখানকার অধিকাংশ লোকও কাজ করে পাথরখাদানে। দুপুরবেলা তাই গ্রামের বিশেষ কারও সঙ্গেই দেখা হল না ওঁর। নারী-পুরুষরা দুপুরের চড়া রোদ মাথায় নিয়ে কাছাকাছি কোনও স্টোনকোয়ারিতে পাথর ভাঙছে আর ছোট ছেলেমেয়েরা গ্রামের বটতলা না হয় শিমুলতলায় খেলে বেড়াচ্ছে। গ্রামে একজন অচেনা বিদেশিকে দেখেও ওদের খেলা বন্ধ হল না। আসলে ওঁকে ওরা লক্ষই করল না।

গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখলেন অনুপম ঘোষ। খেলা বন্ধ হচ্ছে না দেখে ওদেরই একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের এই গ্রামের নাম কী ?"

ছোট মেয়েটি কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুট গলায় বলল, "মকদমবাহী।"

অনুপম ঘোষ ভাবলেন, মকদমবাহী নামের কি কোনও মানে আছে ? হয়তো আছে, হয়তো নেই। হয়তো এটা অপভ্রংশ। লোকমুখে উচ্চারণ বিকৃতি ঘটতে-ঘটতে এরকম উদ্ভট শোনাচ্ছে।

তবে এ-নিয়ে আর ভাবনাচিন্তা না করে তিনি এবার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী ?"

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। ইতিমধ্যে অন্য ছেলেমেয়েরাও খেলা ছেড়ে ওখানে এসে ভিড় করেছে।

অনুপম ঘোষ কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। শেষপর্যন্ত ওদের জানালেন, "আমি সিনাপুর থেকে এসেছি।"

সিনাপুর ওরা জানে। তাই সিনাপুর নামটা শোনামাত্রই ওরা এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকল।

অনুপম ঘোষ আবার বললেন, "হ্যাঁ, আমি সিনাপুর থেকে আসছি।"

ওদের মধ্যে যে ছেলেটি বয়সে একটু বড়, সে এবার এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে কী করছ তুমি ?"

সে বুঝতে পেরেছে সিনাপুরে ওঁর বাড়ি নয়।

"রাক্ষসের খোঁজ করছি।" সরাসরি কথাটা বলে ওদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন অনুপম ঘোষ।

"রাক্ষস ? ও আমাদের দাদু জানে।" সেই ছেলেটি সহজ গলায় বলল।

"দাদু জানে ? তোমাদের দাদুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে ?"

"কেন নিয়ে যাব না ? ওই তো দাদুর বাড়ি।" ছেলেটি একটা চালাঘরের দিকে আঙুল দেখাল।

"তোমরাও চলো আমার সঙ্গে।"

"আমরা এখন খেলব।" ছেলেটি বলল।

"দাদু আমাকে চেনেন না। আমিও ওঁকে চিনি না। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে, চলো।"

ছেলেটি ওর সঙ্গীদের বলল, "তোরা খেলা শুরু কর। আমি এখনই আসছি।"

অনুপম ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সে দাদুর বাড়ি গেল। যেতে যেতে বলল, "দাদুর তবিয়ত ভাল নেই। খাটিয়ায় শুয়ে থাকেন। উঠতে পারেন না।"

লাল ধুলোর ছোট একটা ডাঙার ধারে দাদুর বাড়ি। ছেলেটি দাওয়ায় উঠে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। অনুপম ঘোষ বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন, ছেলেটি ভেতরে কথা বলছে। একটু পরেই সে বেরিয়ে এসে বলল, "ভেতরে যাও, দাদু ডেকেছেন।"

কথাটা বলেই সে দৌড়ে চলে গেল। সে না গেলে খেলা শুরু হবে না। সঙ্গীরা অপেক্ষা করছে।

অনুপম ঘোষ বাড়ির ভেতরে গেলেন। বাইরে যত গরমই থাক, বাড়ির ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। তিনি দেখলেন নিচু একটা খাটিয়ায় এক বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। শরীরটা প্রায় কঙ্কাল। খাটিয়ায় উঠে বসার ক্ষমতাও তাঁর নেই। বহুদিন ধরে রোগে ভুগছেন। চিকিৎসাও হয়নি। হবেই বা কী করে? ডাক্তারখানা এখান থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। তাঁকে এই অবস্থাতেই রেখে বাড়ির সবাই কাজে বেরিয়ে যান। তাঁদেরই বা উপায় কী? সংসারের জন্য রোজগার তো করতেই হবে।

মাটির ঘরে ছোট একটা জানলা। পাল্লা নেই। অল্প একটু আলো এসে পড়েছে ঘরে। বৃদ্ধ মানুষটি ময়লা, ছেঁড়া একটা চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছেন। খোলা দুটো চোখ। একদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন ঘরের চালার দিকে। ঘোলাটে সেই দৃষ্টি। কিছুই তিনি দেখছেন না। বাইরে থেকে লোক এসেছে ঘরে, তাও তাঁর সাড়াশব্দ নেই।

অনুপম ঘোষের মনে হল, তিনি এক মানুষ-ডাইনোসরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর বয়স কত, তা তিনি জানেন না। তবে বুঝতে দেরি হল না, এই অঞ্চলে বয়সে উনিই সবচেয়ে প্রবীণ। ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন অনুপম ঘোষ। বৃদ্ধ মানুষটি একটু নড়ে উঠলেন। ক্ষীণকণ্ঠে কী যেন বললেন। ঠিক বোঝা গেল না।

এবার অনুপম ঘোষ বললেন, "দাদু, অনেক দূর থেকে আমি আপনার কাছে এসেছি। আমাকে একটা খবর দিতে পারেন? রাক্ষসডাঙার নাম শুনেছেন আপনি? গ্রামের লোকেরা বলেন, ওখানে রাক্ষস আছে। সত্যিই কি তাই? আমি তো জানি রাক্ষস বলে কিছু নেই।"

দাদু বোধ হয় শুনতে পেলেন না। দুটো ঠোঁট একবার শুধু কেঁপে উঠল। কথা বলার চেষ্টা হয়তো করলেন। পারলেন না।

অনুপম ঘোষ তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথাগুলো আবার বললেন। তখন দাদুর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। এবার সংক্ষেপে, উঁচু গলায় কথা বললেন অনুপম ঘোষ। "রাক্ষসডাঙার নাম শুনেছেন? ওখানে কি রাক্ষস থাকে?"

দাদুর পুরো শরীরটা কেঁপে উঠল। তিনি কী যেন বলছেন। তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলেন অনুপম ঘোষ।

"ওদের তোমরা শান্তিতে থাকতে দাও।" দাদু বলছেন।

"তা হলে ওরা ছিল?"

"মরে যাওয়ার পরেও মানুষ ওদের শান্তি দেয়নি। ওদের হাড়গোড়গুলো পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে।"

"আপনি দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ। এখন আমি চোখে দেখতে পাই না। তখন সব দেখতে পেতাম।"

"ওরা দেখতে কেমন ?"

"লুঠেরার দল।"

"আমি রাক্ষসগুলোর কথা জানতে চাইছি।"

"রাক্ষস ? হাতির চেয়েও মোটা। পাহাড়ের চেয়েও লম্বা।"

"রাক্ষসডাঙায় ওরা ছিল ?"

"হ্যাঁ। এখানে আরও অনেক জায়গায় ওদের বসত ছিল। আমরা ওদের বসতজমি কেড়ে নিয়েছি।"

"ওদের হাড়গোড় এখনও পাওয়া যায় ?"

"যায়। খুঁজে দ্যাখো। সিনাপুরের লোকদের জিজ্ঞেস করো।"

"ওরা জানে না।"

"জানে, সব জানে।" দাদু মাথা ঝাঁকালেন।

"আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"ওদের বাড়ির পাশেই তো রাক্ষস থাকত। ওরা জানে না ?"

"ওরা শুনেছে। সে অনেককাল আগের কথা।"

"ওদের চোখের সামনে রাক্ষসদের হাড়গোড় সব নিয়ে চলে গেল। ওরা দ্যাখেনি ?"

"ওরা বুঝতে পারেনি।"

"তা হবে !"

অন্ধ, বৃদ্ধ মানুষটি দৃষ্টি খুলে দিলেন অনুপম ঘোষের। রৌদ্রে, ছাতা মাথায় অনেকটা পথ হাঁটতে তাঁর আর কষ্ট হল না। তিনি হনহন করে হাঁটছেন। খবরটা বন্ধুকে তাড়াতাড়ি দিতে হবে।

স্নান-টান সেরে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন সুপ্রকাশ সেন। দু'জনে লাঞ্চ খাবেন, তারই অপেক্ষা। বন্ধুর ফিরতে দেরি দেখে কিছুটা চিন্তাও হচ্ছিল। যখন দেখলেন, রৌদ্রে ঝাপসা দিগন্তের শেষ প্রান্তে ছাতা মাথায় একজন দ্রুত পায়ে এদিকে আসছেন, তখন নিশ্চিন্ত হলেন সুপ্রকাশ সেন।

ক্যাম্পে পৌঁছেই চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লেন অনুপম ঘোষ। এতটা রাস্তা জোর কদমে আসার জন্য হাঁফাচ্ছেন। মনে দারুণ একটা উত্তেজনাও হচ্ছে। মকদমবাহী গ্রামের যে বৃদ্ধ মানুষটিকে তিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর কাছে যা শুনেছেন, তা বন্ধুকে এখনই জানাতে না পারলে ওঁর স্বস্তি নেই।

সুপ্রকাশ সেন বললেন, "কী বলবি মনে হচ্ছে ? খবর আছে ?"

"জোর খবর। এখানকার সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটির কাছে শুনে এলাম, হাড়গোড় সব নিয়ে চলে গেছে।"

"এ আর নতুন কথা কী ! জিওলজিকাল সার্ভে আইন মেনে কাজ করে। ওরা কিছু ফসিল উদ্ধার করেছে। তা নিয়ে কিছু লেখালেখিও হয়েছে।"

"যা বলছি, মন দিয়ে শোন না। তোর অনুমান যে সত্যি, তা বৃদ্ধ মানুষটির কথায় জানা গেল।"

"কী বললেন উনি ?"

"সিনাপুরের লোকদের চোখের সামনে রাক্ষসদের হাড়গোড় সব নিয়ে চলে গেল। ওঁর ধারণা, গ্রামের লোকেরা এটা দেখেছে।"

"রাক্ষসের কথা কিছু বললেন ?"

"হ্যাঁ। বললেন, ওরা হাতির চেয়েও মোটা, পাহাড়ের চেয়েও লম্বা।"

"তার মানে, উনি ডাইনোসরদের কথা বলেছেন। আফ্রিকার আধ ডজন জাম্বো হাতির মতো ছিল ব্রন্টোসরাস। কোনও কোনও ডাইনোসর ছিল লম্বায় তিরিশ মিটার, বা আরও বেশি। কিন্তু এ-সবই তো পুরনো খবর।"

হাতপাখা নাড়তে-নাড়তে অনুপম ঘোষ বললেন, "তোকে কিছুতেই খুশি করা যায় না কেন, বল তো ?"

সুপ্রকাশ সেন বললেন, "খুশি হব যদি তুই তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিস। খিদে পেয়েছে।"

খেতে বসে আবার দু'জনের আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সুপ্রকাশ সেন বললেন, "পৌরাণিক জীবের অস্তিত্ব আধুনিক পৃথিবী মানে না। এখানকার গ্রামের মানুষ আধুনিক পৃথিবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, এটা মনে করারও কারণ নেই।"

"এখনও এখানে ইলেকট্রিক আসেনি। শহরের সঙ্গে যোগাযোগও তেমন নেই।" অনুপম ঘোষ বললেন।

"কিন্তু মনের দিক থেকেও কি ওরা পিছিয়ে আছে ?"

"মনের গঠন নির্ভর করছে বাস্তব অবস্থার ওপর।"

"তার মানে, একটা কিংবদন্তিকেই এখানকার মানুষ বাস্তব বলে মনে করছে ? তা কিন্তু নয়। ওরা যাকে রাক্ষস বলছে আমরা তার পাথুরে প্রমাণ তো পেয়েছি। ডাইনোসরকেই ওরা রাক্ষস বলে ধরে নিয়েছে। ডাইনোসরকে বোঝাতে হলে রাক্ষস শব্দটাই উপযুক্ত। অন্তত ওরা এই শব্দটাকেই নিয়েছে। কিন্তু এখানেও এক খটকা থেকে যাচ্ছে।"

"কেন ?"

"ডাইনোসর যখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যায়, তার কয়েক কোটি বছর পরে মানুষ এসেছে। আমরা কেউই ডাইনোসরকে চোখে দেখিনি। ফসিল যা পাওয়া গেছে, তা থেকেই ডাইনোসরের চেহারা আমরা গড়ে নিয়েছি। কিন্তু ডাইনোসরকে কেউ রাক্ষস বলছে, এই প্রথম শুনলাম।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"ঠিক কী ধরনের ডাইনোসরের ফসিল রাক্ষসডাঙায় পাওয়া গেছে, তা যদি জানতে পারতিস, তা হলে হয়তো একটা সুরাহা হত।"

"সেদিন যে যোশিবাবুর কথা শুনলাম ভূতনাথের কাছে, সে শিবনারায়ণ যোশি নয় তো ? দুষ্প্রাপ্য মূর্তি চুরি, রত্ন চুরি—এ-ধরনের চুরির কথা শোনা যায়। গোয়েন্দা গল্পেও পড়েছি। কিন্তু ডাইনোসরের ফসিল চুরির কথা শুনিনি। তবে, ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। চুরি যা হওয়ার তা আমি এখানে আসার আগেই হয়ে গেছে। তখন যদি রাক্ষসডাঙা ঘুরে দেখতাম, তা হলে এত বোকা বনতে হত না। মোরামের কথাটাও আমি বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। কোনও সন্দেহই হয়নি। জিওলজিকাল সার্ভে রাক্ষসডাঙায় ফসিল আবিষ্কার করেছে, এমন কোনও খবরও আমি পাইনি। আসলে, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়েছে অত্যন্ত গোপনে। মোরামের ট্রাক আসলে কামুফ্লাজ।

"বারবার আমরা কিন্তু এই একটা পয়েন্টে এসে থেমে যাচ্ছি। আমরা এসেছি রাক্ষসের খোঁজ করতে ? দেখতে-দেখতে মাসখানেক কেটে গেল। আমরা কি রাক্ষসের খোঁজ পেয়েছি ?" অনুপম ঘোষ বললেন।

"হ্যাঁ, পেয়েছি। ডাইনোসরই ওদের কাছে রাক্ষস।"

"ডাইনোসরের অনেক রকমফের আছে। কেমন ছিল এখানকার ডাইনোসর ?"

"জিওলজিকাল সার্ভে যে ফসিলগুলো পেয়েছে তা থেকেই বোঝা যাবে।"

"রাক্ষসডাঙায় কি একই রকম ডাইনোসর ছিল ?"

"থাকতেও পারে। একই এলাকায় যখন।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"ব্যস, আমাদের গোয়েন্দাগিরি শেষ। আর তো কিছু জানার

নেই।" অনুপম ঘোষ খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে তাঁবুর বাইরে গেলেন। সুপ্রকাশ সেনও ওর দেখাদেখি উঠে গেলেন।

কিন্তু আলোচনার শেষ নেই। কয়েক মিনিটের বিশ্রাম, তার মধ্যেই দুই বন্ধুর কথাবার্তা শুরু হল।

"রাক্ষস না বলে ওরা কি অন্য কিছু বলতে পারত? আমি জানতে চাইছি, ডাইনোসরের সঙ্গে রাক্ষসের মিলটা কোথায়?" সুপ্রকাশ সেন এখনও উত্তর খুঁজছেন।

অনুপম ঘোষ বললেন, "মিল খুঁজছিস? তোকে একটা প্রশ্ন করি। ক্রোকোডিলোপলিসের নাম শুনেছিস?"

"না।"

"প্রাচীন মিশরে একটা শহর ছিল তার নাম ক্রোকোডিলোপলিস।"

"তার সঙ্গে রাক্ষসের কী সম্পর্ক?"

"ক্রোকোডাইল থেকে ক্রোকোডিলোপলিস! ফারাওদের আমলে কুমিরকে দেবতার মতো সম্মান করা হত। কুমির-দেবতার সম্মানে যে শহর গড়ে তোলা হয়েছিল, তার নামই ক্রোকোডিলোপলিস। তোকে একটা সূত্র জানিয়ে দিলাম। এবার ভেবে দ্যাখ, এমন কোনও ডাইনোসর আছে কি না, যার নামের সঙ্গে রাক্ষস কথাটার মিল আছে।"

"কথায় বলে না, মিল-খোঁজা মূর্খ? আমিও বোধ হয় তা'ই।" কথাটা সুপ্রকাশ সেন হাসতে-হাসতে বললেও, তাঁর মনের মধ্যে এখনও তোলপাড় চলছে। কেন রাক্ষস? কেন আর অন্য কিছু নয়?

॥ ৪ ॥

"রাক্ষসের খোঁজে আর কতদিন এখানে আমাদের পড়ে থাকতে হবে?" অনুপম ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন। "অনেক তো হল, চল, এবার বাড়ি ফিরে যাই।" ওঁর আর ভাল লাগছে না, বাড়ির জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সুপ্রকাশ সেন বিয়ে-থা না করলেও, অনুপম ঘোষ রীতিমত সংসারী। ওঁর স্ত্রী এক স্কুলে পড়ান। ছেলে কল্যাণ বি. এসসি পড়ছে। মেয়ে মণিদীপা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় বসবে এ বছরই। পরীক্ষার আর দেরিও নেই। এ-কথা ভেবেই বেশ

শব্দসন্ধানের সমাধান

আ	প	ন	কা	র		প	লা		শ			স	বা	কা	র		জ	ন	ম
ব	রা	ভ	য়			রা	জ	দূ	ত		অ	ব	ধা	ন		প	রা	গ	ত
হ	ত		দা	গ		ভ		র	বা	হূ	ত			ন	ফ	র		র	বি
মা				জ	বা	ব		দ	র		র্ক			কু	ল				রো
ন	ত		ম	ল	ম			র্শ		বা	ণী			সু	বা	স		বা	ধ
	মা	লা	ই		না		আ	ন	ন্দ	ম	য়			ম	ন	মা	তা	ন	
সু	ল	ভ			ব	না	ম									জ	মি		
		বা	ই		তা	গা	দা			অ						প	ল	ক	
	দা	ন	সা	গ	র		নি			স		চ	প	ল	ম	তি		মা	মা
জে	ব		রা	ত		সে			দ	স্তু		প	লা	য়	ন				কু
ঠা				বা	স্ত	বি	ক		শ	ব			শ		সি	ক		ক	ন্দ
ম	রা		নি	র	ব	কা	শ		হ			ফাঁ		র	জ	ত	ব	র্ণ	
	স	ও	দা						রা			ক	র	ণ		ল	ক্ষ্য		
		জ	ন									তা	মা	কু			মা	কা	ল
	ক	র	কা	পা	ত			অ	মৃ	ত	ফ	ল		শ		প্র	ণ	ত	
ভ	র্তা		ল	টা	রি			ভি		রু	টি			ল	হ	মা		লা	ল
য়				ত	ত			বা	ঘা		ক		বি	তা	ন				জ্ঞা
ত	ম		বা	ন	র			দ	ম	বা	জ		ত		ন	খ		আ	শ
রা	ম	দা	স		কা	শ	ব	ন		মা	ল	দা	র			ব	ন	ক	র
সে	তা	র		প	রি	ক	র			ল		প	ণ		স	র	গ	র	ম

চঞ্চল হয়ে উঠেছেন অনুপম ঘোষ। লেখাপড়ার ব্যাপারে বাবার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে মণিদীপা। মেয়ের পরীক্ষার 'প্রিপারেশন' কেমন হল, এ নিয়েই সারাক্ষণ ভাবছেন অনুপম ঘোষ।

কিন্তু এসব চিন্তা বা দুশ্চিন্তাকে একেবারেই আমল দিচ্ছেন না তাঁর বন্ধু। অনুপম ঘোষ আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোর প্রোগ্রামটা কী, বল!"

"প্রোগ্রাম! আজ রাতটা রাক্ষসডাঙায় কাটাব।"

"কী দেখবি সেখানে? কিছু কি দেখার আছে?"

"আগে যাই, তারপর বলব।"

"আমাকে নিয়ে যাবি না?"

"সেটা তুই জানিস।"

"মনে হচ্ছে, রাগ করেছিস?"

"না, রাগ করব কেন? তোর যদি ইচ্ছে হয়, যাবি।"

"ভাবলি কী করে, আমি যাব না? নিশ্চয় যাব।"

রামলালকে আগেই বলা ছিল, ডিনার সে সন্ধে সাড়ে সাতটাতেই দিয়ে গেল। রামলালকে কেমন যেন গম্ভীর দেখাচ্ছে। একটাও কথা বলছে না। সে জানতে পেরেছে, ওঁরা আজ রাতটা রাক্ষসডাঙায় কাটাবেন। সে নিষেধ করেনি।

ডিনার সেরেই ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন। রওনা হওয়ার আগে অনুপম ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, "তোর সেই জিনিসটা নিয়েছিস তো?"

সুপ্রকাশ সেন অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কোন জিনিসটা?"

"রিভলভার।"

"ভয় পাচ্ছিস কেন? নিয়েছি। তবে কোনও কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।"

"কেন?"

"তুই কি ভাবছিস হঠাৎ একটা রাক্ষস এসে আমাদের সামনে হাজির হবে? আমাদের বলবে, আমরা যেন এখান থেকে চলে যাই? ভয় দেখাবে? গিলে খাবে?"

"আমি কি তা বলেছি? তোর দেখছি মেজাজ ঠিক নেই। এমন খিটখিট করছিস কেন?"

"ভয় পাস না, চল।"

"রাক্ষসের ব্যাপারটা তোর একটা 'অবসেশন' হয়ে উঠেছে। আমার এটাই আপত্তি। গ্রামের লোকদের আর দোষ দিয়ে লাভ কী!"

"অবসেশন কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও খুঁজে পাইনি।" সুপ্রকাশ সেন এমন রূঢ় গলায় কথাটা বললেন যে, এর পর আর কোনও কথা বলার উৎসাহই পেলেন না অনুপম ঘোষ।

দু'জনে চুপচাপ এগোতে থাকলেন। সুপ্রকাশ সেন সামনে, পেছনে অনুপম ঘোষ।

টর্চের আলোয় ওঁরা এগোচ্ছেন। সুপ্রকাশ সেন বুঝতে পেরেছেন, তাঁর কথায় বন্ধু রাগ করেছেন। পরিস্থিতি হালকা করার জন্য তিনি বললেন, "কী রে সামনে আসবি, না পেছনে থাকবি?"

"পেছনেই থাকি। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে জানিস?"

"প্রবাদ?"

"আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সোনা পায়!" অনুপম ঘোষ বললেন।

"বাজে কথা। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা আমাদের! আগে গেলে বাঘে খাবে কেন? আমরা কি এগিয়ে যাব না? পেছনেই পড়ে থাকব?"

"পরে তর্ক করিস। এখন টর্চটা নিভিয়ে দে।"

"কেন ?" ঘুরে দাঁড়ালেন সুপ্রকাশ সেন। যা দেখলেন, তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আদৌ।

টর্চের আলোয় সুপ্রকাশ সেন দেখলেন তাঁর প্রিয় বন্ধুর চোখমুখ হিংস্র হয়ে উঠেছে। আর যা দেখলেন, তাও রীতিমত এক অকল্পনীয় ব্যাপার। বন্ধুর হাতে রিভলভার।

"যোশিবাবু, নিজে এভাবে ধরা না দিলেও পারতেন।"

"চুপ, একটাও কথা নয়।"

"দ্যাখ অনুপম, তুই আমাকে অত বোকা ভাবিস না। আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিস। কিন্তু আমি জানি, সব জানি। যোশিবাবু সেজে বেশ কয়েক বছর আগে তুই-ই যে এখানে এসেছিলি, তা ভূতনাথের কাছে জানতে পেরেছি। আমার সঙ্গে সেদিন তোকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। তোকে সে চিনতে পেরেছিল। তুই লক্ষ করিসনি, কিন্তু আমি দেখেছিলাম, ভূতনাথের চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ দেখা দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল। আমি তখনই পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করে দিয়েছিলাম।"

"কী বলতে চাস, তুই ? ডাইনোসরের ফসিল আমি চুরি করেছি ?"

"তা কিন্তু আমি বলিনি। তুই যে আগে এখানে এসেছিলি, সেটাই তোকে জানিয়ে দিলাম। এখান থেকে ডাইনোসরের ফসিল চুরির কথাটা কোনওভাবে আমার দফতরের কর্তাদের কানে গেছে। তাঁরাই আমাকে এখানে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন।"

"তা হলে ফসিল চুরি করল কে ?" অনুপম ঘোষের গলার ঝাঁঝটা এখন কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

"কে চুরি করল, সেটা আমার জানার বিষয় নয়। ওটা সত্যিকারের গোয়েন্দাদের কাজ।" সুপ্রকাশ সেন বললেন।

"তোর গোয়েন্দারা আমায় ধরতে পারবে ভাবছিস ?"

"তুই তো চুরি করিসনি। তা হলে ভয় পাচ্ছিস কেন ?"

"ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু তোকে এখন বলতে হবে, যোশিবাবু সেজে আমি এখানে এসেছিলাম কেন ? সত্যিই কি এসেছিলাম ? তুই তো সবজান্তা। বল, সত্যি কথাটা বল।" অনুপম ঘোষ আবার গলা চড়িয়ে কথা বলছেন।

"যোশি তোর বিজনেস পার্টনার। তোদের দু'জনের একটা প্রকাশন সংস্থা আছে। কলেজ ইউনিভার্সিটির অনেক টেক্সট বই তোরা ছাপিয়েছিস। এ ছাড়াও যোশির আরও 'অ্যাকটিভিটি' থাকতে পারে। সেটা গোয়েন্দারা খোঁজ নেবে।"

"আমার প্রশ্নের এটা উত্তর নয়। আমিই যে যোশি সেজে এসেছিলাম, তার প্রমাণ কী ?"

"যোশিও নিশ্চয় সেই সময় এখানে এসেছিল। তুই ওর সঙ্গে এসেছিলি। হয়তো যোশিই তোকে এনেছিল। মোট কথা, সিনাপুর গ্রামের লোকেরা সেই সময় তোকে এখানে দেখেছে। আর আমার কাছে তুই আগাগোড়া এমন ভান করেছিস যেন, এদিকে আগে কখনও আসিসনি। তোর হাতে টুরিস্ট গাইড দেখে ট্রেনে আমার হাসিই পেয়েছিল।"

"কথা ঘোরাচ্ছিস কেন ? একটু আগেই বললি না, আমি যোশিবাবু সেজে এসেছিলাম ?"

"তোর মুখ থেকে আসল কথাটা আদায় করার জন্যেই আমাকে এটা বলতে হয়েছে। জেনে রাখ, মোটামুটি আমি সব আঁচ করতে পেরেছি। মকদমবাহী গ্রামের বৃদ্ধ মানুষটির যেসব কথা আমাকে বলেছিস, তার মধ্যে কোনও ভেজাল নেই। তবে মকদমবাহী যাওয়ার উদ্দেশ্যটাই আমার কাছে গোপন করেছিস। সেটা তোর পক্ষে বলা সম্ভবও ছিল না। তুই ওখানে আরও ফসিলের খোঁজে গিয়েছিলি।"

"ফসিল কোথায় পাওয়া যেতে পারে, আমি জানব কী করে ? ওটা আমার চর্চার বিষয় নয়।" অনুপম ঘোষ বললেন।

হ্যাঁ, তোর ছাপমারা ডিগ্রিটা অবশ্য ভূবিজ্ঞানের নয়। কিন্তু আমার অনুমান, এ-নিয়ে তুই আলাদাভাবে চর্চা করেছিস। অর্থাৎ, বইপত্র পড়েছিস। পড়েছিস পত্রপত্রিকার নানা লেখা। টেকনিকাল লেখাও তার মধ্যে থাকতে পারে। যোশি এ-ব্যাপারে তোকে সাহায্য করে থাকতে পারে।"

"কিন্তু আমার স্বার্থ কী ?" অনুপম ঘোষ বুঝতে পারছেন, সুপ্রকাশ সেনের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর জেতার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে আসছে। তবে, সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তিনি নন।

"লোভ। যোশির সঙ্গে আর কোনও 'বিজনেস ডিল' তোর হয়েছে কি না জানি না। হতেও পারে। আন্তর্জাতিক পাচারচক্রে যোশি যদি তোকে জড়িয়ে থাকে, অবাক হব না। কিন্তু দুঃখটা কোথায় জানিস অনুপম ? আমি তোর ছেলেবেলার বন্ধু। অথচ আমাকেই তুই বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিস। তোর হাতে কলম মানায়, রিভলভার নয়। কেন বল তো, তোর হাতে রিভলভার ? আমি তোর কী ক্ষতি করেছি ?"

"তা আর বলতে ? যথেষ্ট ক্ষতি করেছিস। রাতের অন্ধকারে তুই যে আমাকে খাদে ঠেলে দিতিস না, তার কী গ্যারান্টি আছে। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই। আর যা'ই হোক, আমি মার খেতে কিংবা মরতে এখানে আসিনি। নিজের নিরাপত্তার কথা যে লোক ভাবে না, সে-ই আসল বোকা।"

"কিন্তু তোকে দুটো প্রশ্ন আছে। রামলালকে দিয়ে আমাকে রাক্ষসের ভয় দেখিয়েছিলি কেন ? তুই তো আমাকে ছেলেবেলা থেকেই চিনিস। তুই কি জানিস না, আমি ভয় পাই না। বিশেষ করে কেউ যদি আমাকে ভয় দেখায়, তখন আমার সাহস আরও বেড়ে যায়। এটা তো তোর জানার কথা। আর একটা প্রশ্ন, তুই কি ভেবেছিলি ক্রোকোডাইল দেবতার শহর ক্রোকোডিলোপলিস থেকে আমি এমন একটা আদিম প্রাণীর নাম খুঁজব যার সংক্ষেপিত রূপ হিসেবে গ্রামের লোকেরা রাক্ষস শব্দটা পেয়েছে ? তুই ভেবেছিলি, আমি ফোরোরাকোসের কথা ভাবব, তা'ই না ? ফোরোরাকোসকেই গ্রামের লোকেরা রাক্ষস বলে, আমি এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে, মহানন্দে বাড়ি ফিরব, এটাই ছিল তোর ধারণা। তা'ই না ? এবং পরে আমি একটা 'রিসার্চ আর্টিক্‌ল' লিখে এই বলে কৃতিত্ব নেব যে, সিনাপুর এলাকায় থাকত প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় পাখি ফোরোরাকোস ?"

পরের দিনই দুই বন্ধু জব্বলপুর এল। এখান থেকে একই ট্রেনে, পাশাপাশি দুটো বার্থে শুয়ে ওরা বাড়ি ফিরবে।

জব্বলপুরে এসে সুপ্রকাশ সেন তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন, "আজ পূর্ণিমা। চল, মার্বেল রক্‌স দেখে আসি।"

"অনুপম ঘোষ মুখ গোমড়া করে ব্যালকনিতে বসে ছিলেন। উত্তর দেননি।

ছবির পৃথিবী
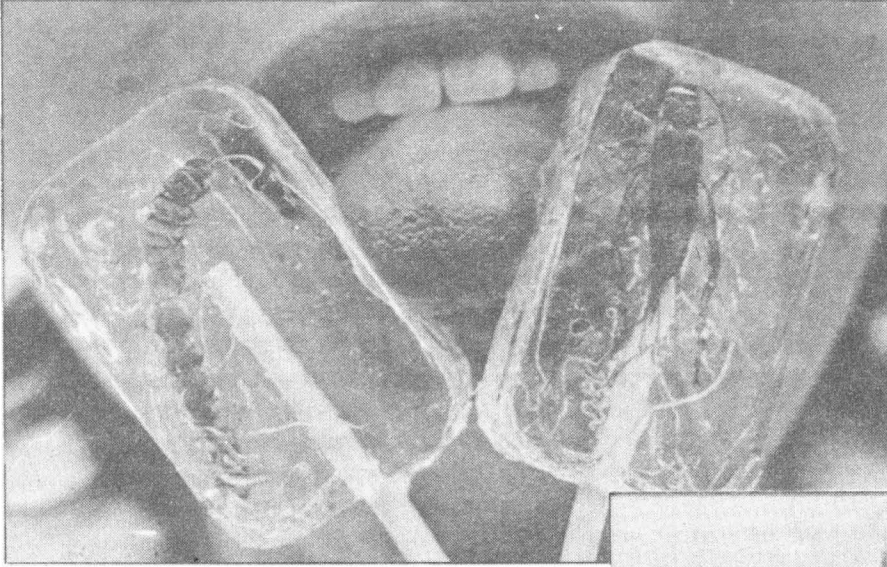
ললিপপের মধ্যে এসব কী ? ভয়ের কিছু নয়, খাওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছে এসব ললিপপ । দেখতে ভয়ানক হলেও জার্মানির ছোট ছেলেমেয়েরা কিন্তু বেশ উপভোগ করছে নতুন এই ললিপপ ।

জাপানি এই মোটরবোট চলে সৌরশক্তির সাহায্যে । 'মারমেড' নামের এই জলযানে চড়ে ১৬,০০০ কিলোমিটার সমুদ্রপথ পাড়ি দেওয়ার অভিযানে নেমেছেন কেনিচি হোরি ।
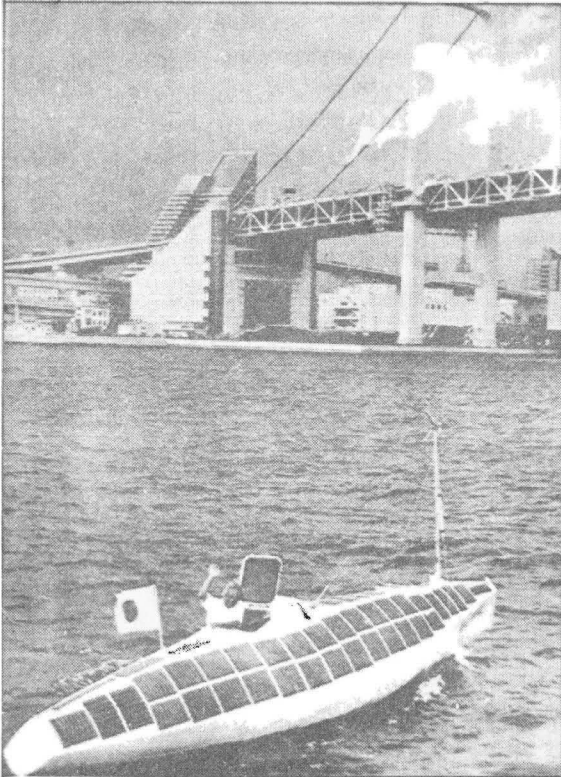
সবচেয়ে উঁচু বাড়ির শিরোপা এখন পেয়েছে কুয়ালালামপুরের পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার্স । ৪৫১.৯ মিটার উঁচু ৮৮ তলার এই নতুন বাড়িটি তৈরির কাজ এ-বছরই শেষ হওয়ার কথা ।

বুদ্ধি থাকলে সব হয়

ছায়া থেকে কায়া

দেওয়ালের ছায়া সবসময়েই আমাদের অবাক করে দেয়—আবার কখনও বা ভয় দেখায়। মোমবাতির অস্থির শিখায় অনেক চেনা জিনিসের ছায়া আমাদের কাছে হয়ে যায় অচেনা। ছায়া নিয়ে গল্প-কবিতা কিছু কম লেখা হয়নি। সুকুমার রায়ের 'ছায়াবাজি' কবিতায় ছায়ার রহস্যময় ব্যাপারস্যাপারের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। দু'হাতের দশ আঙুলের ছায়া দেওয়ালে ফেলে কত না অদ্ভুত সব ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেন ছায়া-শিল্পীরা। এত দেখেশুনে প্রশ্ন জাগে মনে, কেন ছায়া এত রহস্যময় ? আমার ধারণা, ছায়ার রহস্যময়তার প্রধান কারণ, ছায়া দেখে সঠিক বস্তুটিকে আঁচ করা বেশ কঠিন। অর্থাৎ, কায়া থেকে ছায়ায় যাওয়া যতটা সহজ, ছায়া থেকে কায়া খুঁজে বের করা ততটা সহজ নয়। উদাহরণ হিসেবে নীচের ছবির বৃত্তাকার ছায়াটাই ধরা যাক। বলতে পারো, কী ধরনের কায়া থেকে এইরকম ছায়া তৈরি হওয়া সম্ভব ? একটু ভেবেচিন্তে উত্তর দিয়ো, কারণ উত্তরটা যতটা সহজ ভাবছ ততটা নয়।
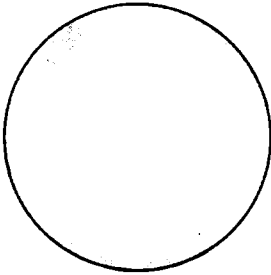
নয়ছয়

চারটে ৯ আর চারটে ৬-কে এমনভাবে গাণিতিক চিহ্ন দিয়ে সাজাতে পারো যাতে উত্তর হয় ১ ? এখানে জানিয়ে দিই, অনেকরকমভাবেই এই ধাঁধার উত্তর বের করা যায়। তবে সবচেয়ে সেরা উত্তর সেটাই, যেখানে সংখ্যাগুলোর সঙ্গে মাত্র একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

ছ'টা দেশলাইকাঠি, চারটে ত্রিভুজ

এই খেলাটার জন্য লাগবে ছ'টা দেশলাইকাঠি আর খানিকটা 'বাব্‌ল গাম'। প্রথমে তিনটে দেশলাইকাঠি আর বাব্‌লগামের আঠা ব্যবহার করে একটা ত্রিভুজ তৈরি করো। এর পর তোমার হাতে রইল আরও তিনটে দেশলাইকাঠি। এই তিনটে কাঠি প্রথম ত্রিভুজটার সঙ্গে জুড়ে মোট চারটে ত্রিভুজ তৈরি করতে পারো ?

কাঁটায়-কাঁটায় রহস্য

এই সমস্যাটা ঘড়ির কাঁটা নিয়ে। আর উত্তরও চাই কাঁটায়-কাঁটায়—একেবারে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ পর্যন্ত। বেলা বারোটার সময় আমরা দেখতে পাই ঘড়ির কাঁটা দুটো মিশে এক হয়ে গেছে। বলতে পারো,

এর পর আবার কখন কাঁটা দুটো এইরকম অবস্থায় পৌঁছবে ? এটার সমাধান করতে হলে ঘড়ির মিনিটের কাঁটা আর ঘণ্টার কাঁটার দু'রকম কৌণিক গতিবেগের কথা খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ, একটা কাঁটার বেগ আর-একটা কাঁটার তুলনায় ১২ গুণ বেশি। দ্যাখো তো, এই সূত্র ধরে প্রশ্নটার সমাধান করতে পারো কি না !
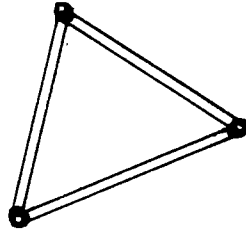
পুকুরের গভীরতা কত

শুনেছি এই সমস্যাটা নাকি ভারতীয় গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' গ্রন্থে আছে। ভাস্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১১১৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর কন্যার নাম ছিল লীলাবতী। এই মেয়ের নামেই তাঁর গণিত পুস্তকের নাম দিয়েছিলেন ভাস্করাচার্য। এই বইয়ে তিনি পাটীগণিত ও জ্যামিতিচর্চা করেছিলেন। এ-জাতীয় বইয়ের নাম কেন 'লীলাবতী' তা নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। ভাস্করাচার্য জ্যোতিষচর্চা করতেন। তিনি মেয়ের কোষ্ঠীবিচার করে জানতে পারেন যে, সে সারাজীবন কুমারী থাকবে। তখন বিপন্ন পিতা ভাস্করাচার্য জ্যোতিষের যাবতীয় জ্ঞান প্রয়োগ করে মেয়ের বিয়ের উপযোগী একটি পবিত্র মুহূর্ত নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। সেই মুহূর্তটি জানার জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন একটি জল-ঘড়ি। এই জল-ঘড়ির নির্দেশ করা বিশেষ সময়ে বিয়ে দিলেই সুখী হবে লীলাবতী। কিন্তু ভাস্করের এই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় কন্যা লীলাবতী নিজেই। সে বালিকা-কৌতূহল নিয়ে বারবার ছুটে যাচ্ছিল জল-ঘড়ির কাছে, ঝুঁকে পড়ে দেখছিল যন্ত্রটিকে। এইভাবে বারবার দেখার সময়ে তার গয়না থেকে একটি মুক্তোর দানা পড়ে যায় জল-ঘড়ির পাত্রে। জল বেরনোর ছিদ্রটি আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভাস্করের নির্ণয় করা সেই পবিত্র মুহূর্ত পার হয়ে যায় সকলের অজান্তে। তখন মেয়েটি চিরকুমারী থেকে যায়। দুঃখী মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে ও তার নাম অক্ষয় করে রাখার চেষ্টায় ভাস্কর তাঁর গণিত পুস্তকের নাম দেন, লীলাবতী। এই গল্প সত্যি হোক বা মিথ্যে, ভাস্করাচার্যের লীলাবতী আজও অক্ষয় হয়ে আছে গণিতশাস্ত্রে।

এখন বলা যাক সমস্যাটার কথা। একটি পুকুরে অনেক পদ্মফুল ফুটে আছে। তার মধ্যে একটি পদ্মফুল জলের ওপরে ঠিক এক ফুট মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। হঠাৎই খুব জোরে বাতাস বয়ে এল। পদ্মফুলটি হেলে পড়ল বাতাসের ধাক্কায়। হেলে পড়তে-পড়তে ওটা জল ছুঁয়ে ফেলল একসময়। ফুলের ডাঁটিটা খাড়া অবস্থায় প্রথম যেখানে ছিল সেখান থেকে জল-ছুঁয়ে-ফেলা ফুলটির দূরত্ব পাঁচ ফুট। বলতে পারো, পুকুরের গভীরতা কত ?

বুদ্ধি থাকলে সব হয়

জন্মদিনের কেকের টুকরো

রুমকির আজ জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে বাপি সুন্দর একটা কেক কিনে এনেছেন। কেকটা চেহারায় বৃত্তের মতো, তবে অনেকটা পুরু, আর নানা রং দিয়ে সাজানো। ফুঁ দিয়ে দশটা মোমবাতি নেভাল রুমকি। সঙ্গে-সঙ্গে হাততালি, হইহই। আর তারপরই রুমকির বন্ধুবান্ধবরা সবাই মিলে 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ' করার পর এল কেক কাটার পালা। মা ছুরি দিলেন রুমকির হাতে। যেই ও কেক কাটতে যাবে, অমনই বাপি বলে উঠলেন, "কেক কাটার একটা শর্ত আছে, মা-মণি। প্রথমত, এমনভাবে কেক কাটতে হবে যেন প্রত্যেকবারে ছুরি কেকের একদিক থেকে আর একদিকে সরলরেখায় চলে যায়। সাদা কথায় যাকে কোপ বলে। আর দ্বিতীয় শর্ত হল, চারবারের বেশি ছুরি চালানো যাবে না।"
বাপির কথায় হাসল রুমকি। তারপর এমনভাবে চারবার ছুরি চালাল যে, কেকটা অনেক টুকরো হয়ে গেল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে রুমকি হেসে বলল, "চারবার ছুরি চালিয়ে এর চেয়ে বেশি টুকরো কেউ করতে পারবে না।"

তোমরা বলতে পারো, রুমকি কেকটাকে ক'টা টুকরো করেছিল?
রুমকির মা গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবছিলেন। হঠাৎই বললেন, "আচ্ছা, বলো তো, চারবারের বদলে পাঁচবার ওইভাবে ছুরি চালালে কেকটা সবচেয়ে বেশি ক'টা টুকরো করা যেত?"

রুমকি উত্তরটা বলতে না পেরে তাকাল বাপির দিকে। বাপি হেসে বললেন, "ষোলো টুকরো। কিন্তু বলো দেখি, কেকটা যদি বৃত্তের মতো না হয়ে পঞ্চমীর চাঁদের মতো হত, তা হলে চারবার ছুরি চালিয়ে ওটাকে সবচেয়ে বেশি ক'টা টুকরো করা যেত?"
তোমরা দিতে পারো এর উত্তর?

দশ অঙ্কের সংখ্যার সমস্যা

নীচের ছবিতে পর পর দশটি খোপ আঁকা আছে। খোপগুলোর ওপরে ০ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো লেখা আছে। এই দশটি খোপে দশ অঙ্কের একটি সংখ্যা লিখে ফেলতে হবে। সংখ্যাটি এমন হবে যাতে তার প্রথম অঙ্ক নির্দেশ করবে সংখ্যাটিতে মোট কত শূন্য আছে, '১' নামাঙ্কিত খোপের অঙ্কটি বলে দেবে সংখ্যাটিতে মোট ক'টা ১ আছে। এইভাবে অন্যান্য খোপের বেলাতেও ঠিক একই শর্ত। অর্থাৎ, শেষ খোপটিতে লেখা অঙ্ক জানিয়ে দেবে দশ অঙ্কের সংখ্যাটিতে মোট ক'টা ৯ আছে। বলতে পারো, দশ অঙ্কের সংখ্যাটা কী?

পিঁপড়ে, মশা, সাপ, হাতি, ঘোড়া

পিঁপড়ে, মশা, সাপ, হাতি, ঘোড়া—এই পাঁচটি কীট, পতঙ্গ, প্রাণী তোমাদের খুব চেনা, কিন্তু ওদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর কি রাখো তোমরা? সত্যি কতটুকু খবর রাখো সেটা বোঝা যাবে নীচের পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরের ধরন দেখে। প্রতিটি প্রশ্নের পাশে তিনটি করে উত্তর দেওয়া হল। তোমাদের বলতে হবে কোন উত্তরটা ঠিক।

১. পিঁপড়ে নিজের ওজনের কতগুণ ওজন বইতে পারে?
(ক) ১০ গুণ (খ) ৩০ গুণ (গ) ৫০ গুণ।

২. পৃথিবীতে মোটামুটিভাবে কতরকম প্রজাতির মশা আছে?
(ক) ১০০০ (খ) ৫০০০ (গ) ২০০০০

৩. সাপ ঘ্রাণ নেয় কী দিয়ে?
(ক) নাক দিয়ে (খ) জিভ দিয়ে (গ) কান দিয়ে
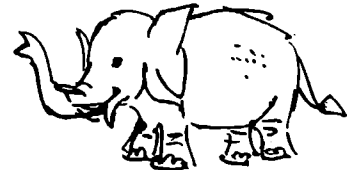
৪. হাতির শুঁড়ে পেশির সংখ্যা মোটামুটিভাবে কত?
(ক) ১০০ (খ) ৫০০০ (গ) ৪০০০০

৫. একটা ঘোড়ার গড় কর্মক্ষমতাকে 'হর্স পাওয়ার' বা 'অশ্বশক্তি'র এককে প্রকাশ করলে মান কত দাঁড়াবে?
(ক) ১ হর্স পাওয়ার (খ) ০.৫ হর্স পাওয়ার (গ) ০.৬৬ হর্স পাওয়ার

অনীশ দেব (উত্তর ৫৬৭ পাতায়)

আসল কয়েন, নকল কয়েন

প্রথমবারের ওজনে বোঝা যাচ্ছে, ১, ২, ৩ ও ৪ নং কয়েনের মধ্যে একটা কয়েন ভারী, অথবা ৫, ৬, ৭, ৮ নং কয়েনের মধ্যে একটা কয়েন হালকা। বাকি কয়েনগুলো, অর্থাৎ, ৯, ১০, ১১, ১২ নং কয়েন, আসল।
দ্বিতীয়বারের ওজনে বোঝা যাচ্ছে, ৩ অথবা ৪ নং কয়েন ভারী, নয়তো ৫ নং কয়েনটা হালকা। কারণ, আগেরবারের ওজনেই জানা গেছে, ৯, ১০ ও ১১ নং কয়েন আসল। আর ৬ এবং ৭ নং কয়েন প্রথমবারের ওজনে দাঁড়িপাল্লার হালকা দিকে ছিল।
তৃতীয়বারের ওজনে দেখা যাচ্ছে, ৩ ও ৪ নং কয়েনের ওজন সমান। অর্থাৎ, এগুলো আসল কয়েন। তা হলে ৫ নং. কয়েনই হচ্ছে নকল কয়েন। আর প্রথম ও দ্বিতীয়বারের ওজন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই নকল কয়েনটা আসল কয়েনের চেয়ে হালকা।

গুণের গুণাগুণ

```
   ৭৭৫
    ৩৩
  ২৩২৫
 ২৩২৫
 ২৫৫৭৫
```

ডাকাতির ঘটনায় যমজ সমস্যা

প্রথমেই ধরে নেওয়া যাক, বিজয় নির্দোষ। তা হলে নিশ্চয়ই অমল বা কমল অপরাধী। আবার অমল বা কমল শাগরেদ ছাড়া 'কাজ' করে না। এদিকে বিজয় একেবারেই শাগরেদ পছন্দ করে না। সুতরাং অমল বা কমলের শাগরেদ বিজয় হতে পারে না। আবার যেহেতু অমল বা কমল হাতিবাগানের হোটেলে ভাত খাচ্ছিল, সেহেতু যমজ ভাইয়ের একজন এই ডাকাতিতে জড়িত নয়। অন্য ভাইও নির্দোষ, কারণ সে শাগরেদ হিসেবে নিজের ভাইকে পায়নি। সুতরাং, বিজয় দোষী। বিজয় একা 'অপারেশন' করা পছন্দ করে। অতএব যমজ ভাই অমল আর কমল নির্দোষ।

ছায়া থেকে কায়া

ছায়াটা যে-কোনও গোলক বা গোলাকার চাকতির ছায়া হতে পারে এটা বোধ হয় অনেকেই ধরে ফেলেছ। কিন্তু শঙ্কু বা চোঙের ছায়াও বৃত্তাকার হতে পারে। এ ছাড়াও অসংখ্য আকৃতির জিনিসের ছায়া এইরকম হতে পারে। যেমন, থালা,

বুদ্ধি থাকলে সব হয় : উত্তর

গ্লাস, বাটি, ঘটি, শিশি-বোতল, আরও কত কী! তবে লক্ষ রাখতে হবে, বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে আলো যেন সঠিক দিক থেকে ফেলা হয়, যাতে বৃত্তাকার ছায়া দেওয়ালে পাওয়া যায়। কিন্তু বৃত্তাকার ছায়া পেতে হলে সাধারণ নীতি কী হতে পারে? সেটা হল, বস্তুটির আকার যেরকমই হোক না কেন, আলো ফেলার দিক বরাবর বস্তুটির সবচেয়ে বড় মাপের প্রস্থচ্ছেদ বৃত্তাকার হওয়া চাই। নীচের ছবিতে এরকম একটা উদাহরণ দেখানো হল।

এ ছাড়া আরও একটা বস্তুর ছায়া বৃত্তাকার হতে পারে। সেটা হল ইলিপ্স্ বা উপবৃত্তের আকারের কোনও পাত বা কার্ডবোর্ড। তবে আলো ফেলার দিকের সঙ্গে পাতটিকে সামান্য হেলিয়ে ধরতে হবে। তোমরা এটা বাড়িতে তৈরি করে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।
সুতরাং বুঝতেই পারছ, ছায়া থেকে কায়া খুঁজে বের করার ব্যাপারটা নেহাত সহজ কাজ নয়।

নয়ছয়

সবচেয়ে সেরা উত্তর হল : $\frac{৯৯৬৬}{৯৯৬৬} = ১$
এ ছাড়া অন্যান্য যে সমাধান হতে পারে সেগুলো হল : $\frac{৯}{৯} \times \frac{৯৬৬}{৯৬৬} = ১$
অথবা, $৯ - ৬ - \frac{৬}{৯} - \frac{৬}{৯} - \frac{৬}{৯} = ১$,
বা এই জাতীয় আরও অনেকরকম উত্তর।

ছ'টা দেশলাইকাঠি, চারটে ত্রিভুজ

বাকি তিনটে দেশলাইকাঠি দিয়ে ছবির
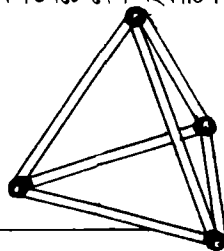
মতো একটা পিরামিড তৈরি করলেই তুমি মোট চারটে ত্রিভুজ পেয়ে যাবে।
বোঝাই যাচ্ছে, ত্রিভুজ দ্বিমাত্রিক হলেও ত্রিমাত্রিক পিরামিডের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল সঠিক সমাধান।

পুকুরের গভীরতা কত

নীচের ছবিতে A হল পদ্মফুলের প্রথম অবস্থান, আর D হল তার জল-ছুঁয়ে-ফেলা অবস্থা। পুকুরের
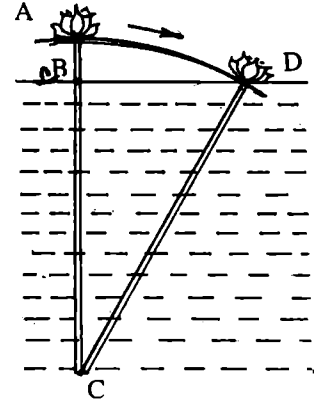
গভীরতা BC। পদ্মফুল তার জায়গা পরিবর্তন করে AD বৃত্তচাপ বরাবর। অতএব AC ও CD পরস্পর সমান।
দেওয়া আছে, AB = ১ এবং BD = ৫।
যদি পুকুরের গভীরতা x মনে করি তা হলে
BC = x এবং CD = ১ + x
BDC সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই
$BD^2 + BC^2 = CD^2$
অর্থাৎ, $৫^2 + x^2 = (১ + x)^2$
এই সমীকরণ সমাধান করে x-এর মান পাওয়া যায় ১২। অতএব, পুকুরের গভীরতা ১২ ফুট।

কাঁটায়-কাঁটায় রহস্য

যেহেতু মিনিটের কাঁটা সেকেন্ডের কাঁটার তুলনায় ১২ গুণ জোরে চলে, তাই ১২ ঘণ্টা সময়ে তারা ১১ বার মিলিত হবে। কাঁটা দুটোর গতিবেগের কোনও হেরফের হয় না বলে নির্দিষ্ট সময় পর পর তাদের দেখা হবে। অর্থাৎ, $\frac{১২}{১১}$ ঘণ্টা সময় পর পর ওরা মিলিত হবে। হিসেব কষলে দেখা যাবে, $\frac{১২}{১১}$ ঘণ্টা মানে হল, ৬৫ মিনিট ২৭ $\frac{৩}{১১}$ সেকেন্ড। অতএব, বেলা বারোটার পর এই নির্দিষ্ট সময় পার করে ওরা মিলিত হবে। তখন ঘড়িতে সময় হবে, বেলা ১টা বেজে ৫ মিনিট ২৭ $\frac{৩}{১১}$ সেকেন্ড।

জন্মদিনের কেকের টুকরো

চারবার ছুরি চালিয়ে রুমকি জন্মদিনের কেকটাকে ১১ টুকরো করেছিল। নীচের ছবিতে সমাধান দেখানো হল :
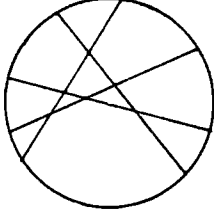
রুমকির মায়ের প্রশ্নে বাপি বলেছেন, পাঁচবার ছুরি চালালে সবচেয়ে বেশি ১৬ টুকরো করা যাবে। উনি ঠিকই বলেছেন, কারণ, কোনও বৃত্তকে সরলরেখা দিয়ে (অনেকটা কেকে ছুরি চালানোর মতোই) নানা অংশে ভাগ করার সাধারণ সূত্র হল : n যদি সরলরেখার সংখ্যা হয়, তবে টুকরোর সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে :

$$১ + \frac{(n^2 + n)}{২}$$

পঞ্চমীর চাঁদের মতো বা কাস্তের মতো

বুদ্ধি থাকলে সব হয় : উত্তর

আকারের বেলায় সাধারণ সূত্রটি হল : n যদি সরলরেখার সংখ্যা হয় তবে টুকরোর সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে :

$$১ + \frac{(n^2 + ৩ n)}{২}$$

এই সূত্রে n-এর মান ৪ বসালেই বাপির প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ১৫। তোমরা কাগজে ছবি এঁকে এটা হাতে কলমে যাচাই করে দেখতে পারো।

পিঁপড়ে, মশা, সাপ, হাতি, ঘোড়া

১ (গ), ২ (ক), ৩ (খ), ৪ (গ), ৫ (গ)।

দশ অঙ্কের সংখ্যার সমস্যা

০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৬	২	১	০	০	০	১	০	০	০

ANANDAMELA PUJA NUMBER 1996
REGD. NO. WB/CC/264 MH-BY-SOUTH 683 TN/MS(C)7